

বাংলা সাময়িকপত্র : পাকিস্তান পর্ব

বাংলা  
সাময়িকপত্র  
পাকিস্তান পর্ব

ইসরাইল খান

ইসরাইল খানের জন্ম ১৯৫৭ সালের ২১ এপ্রিল গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী থানার মহেশপুর গ্রামে। পিতা : জয়নাল খান। মাতা : ফাতেমা বেগম। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে ১৯৭৭ সালে স্নাতক (সম্মান) ও ১৯৭৮ সালে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করেন। ১৯৯৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধীনে 'বাংলাদেশের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সমাজের অগ্রগতিতে সাহিত্য পত্রিকার ভূমিকা (১৯৪৭-১৯৭১)' শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভের জন্য তিনি পিএইচ.ডি ডিগ্রী লাভ করেন, তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের তালিকা নিম্নরূপ : ভাষা রাজনীতি ও বাঙলার সমস্যা (১৯৮৬), সাময়িকপত্র ও সমাজ গঠন (১৯৮৮), বুদ্ধিজীবীদের দৃষ্ণ ও সাহিত্যসমাজে অবদান (১৯৮৯), বন্দিবিবেক সমাজ ও সাহিত্যজগতে বৈশ্যবৃত্তি (১৯৯০), বাংলাদেশের রাজনীতি ও ভাষা পরিচিতি (১৯৯১), মোহাম্মদ লুৎফর রহমান : জীবন ও চিন্তাধারা (১৯৯৮), মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি (১৯৯৯), পূর্ববাঙলার সাময়িকপত্র (সম্পাদনা ১৯৯৯), কবি নজরুলের অসুস্থতা : তর্ক-বিতর্ক ও দলিলপত্র (২০০৪)।

ইসরাইল খান একজন গবেষক ও প্রাবন্ধিক।

# বাংলা সাময়িক পত্র : পাকিস্তান পর্ব

ইসরাইল খান



বাংলা একাডেমী ঢাকা

প্রথম প্রকাশ  
আষাঢ় ১৪১১/ জুন ২০০৪  
বাএ ৪৪৩২  
[ ২০০৩-২০০৪ গসফো : গবেষণা ৪ ]

মুদ্রণসংখ্যা : ১২৫০

পাণ্ডুলিপি  
গবেষণা উপবিভাগ

প্রকাশক  
মঈনুল হাসান  
পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)  
গবেষণা সংকলন ও ফোকলোর বিভাগ  
বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১০০০

মুদ্রক  
মোঃ হামিদুর রহমান  
ব্যবস্থাপক  
বাংলা একাডেমী প্রেস  
বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১০০০

প্রচ্ছদ  
মামুন কায়সার

মূল্য  
দুইশত সত্তর টাকা

---

BANGLA SAMAYIKPATRA : PAKISTAN PARBA [ The Role of Literary Journals in the Advancement of Literature, Culture and Society of Bangladesh 1947—71 ]. by Israil Khan. Published by Moyeenul Hasan, Director (in Charge), Research Compilation and Folklore Division, Bangla Academy, Dhaka, Bangladesh. First edition : June 2004. Price : Taka 270.00 only.

ISBN 984-07-4441-0

## গ্রন্থ প্রসঙ্গে

আমি এই অভিসন্দর্ভ প্রণয়ন করি পিএইচ.ডি উপাধির জন্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত গবেষণার বিষয় ছিল ‘বাংলাদেশের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সমাজের অগ্রগতিতে সাহিত্য-পত্রিকার ভূমিকা ১৯৪৭-৭১’। গবেষণা-তদ্ব্যবধায়ক ছিলেন বাংলা বিভাগের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক, আবুল কাসেম ফজলুল হক। ১৯৯৫ সালে আমি পিএইচ.ডি উপাধি লাভ করি। তবে অভিসন্দর্ভ প্রকাশে সীমাবদ্ধতা দেখা দেয়। এমতাবস্থায়, বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক মনসুর মুসা বিষয়বস্তুর গুরুত্ব বিবেচনা করে এটি প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

আমি গভীরভাবে বিশ্বাস করি অনেক সীমাবদ্ধতা, ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও এ-গ্রন্থ বাংলাদেশের, বাঙালি সমাজের জাতীয় প্রয়োজনে লাগবে। গবেষক ও সাধারণ পাঠকদের অনেক কাজ সহজ করে দেবে। জাতীয় শ্রম লাঘব করবে। জনতার জ্ঞানপিপাসা নিবৃত্ত করবে। যাঁরা এগ্রন্থ প্রকাশে সদর্থক অবদান রেখেছেন, তাঁরা তাই জাতীয় দায়িত্বই পালন করেছেন।

গবেষণা উপবিভাগের উপপরিচালক জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন, বাংলা একাডেমী প্রেসের ব্যবস্থাপক জনাব মোঃ হামিদুর রহমান ও কম্পিউটার শাখার জনাব মোঃ আলতাফ হোসেন-এর আন্তরিকতায় পাণ্ডুলিপিটি সম্পাদিত হয়ে মুদ্রিত হতে পেরেছে। প্রফ সংশোধনের গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন একাডেমীর কর্মকর্তা জনাব শেখ সারোয়ার হোসেন। তাঁদের তৎপরতা দেখে আমি প্রীত ও মুগ্ধ হয়েছি।

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের জেনারেল ম্যানেজার জনাব মোঃ জয়নাল আবেদীন এবং বন্ধুবর সাঈদ আহমদ আনিস এবং আমার কনিষ্ঠভ্রাতা, এনসিটিবির কারিকুলাম স্পেশালিস্ট মোঃ ইকরামুজ্জামান খান এবং বাংলা একাডেমীর সচিব ও গ্রন্থের প্রকাশক জনাব মঈনুল হাসান, বাংলা একাডেমীর অন্যতম পরিচালক কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা, উপপরিচালক জনাব মোহাম্মদ আবদুল হাই এই গ্রন্থ প্রকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে মূল্যবান সহযোগিতা ও উৎসাহ প্রদান করেছেন। ধৈর্য ও শ্রমসাধ্য নির্ঘণ্ট তৈরি করে দিয়েছে আমার বড় ছেলে আসিফ খান অপু।

সব প্রিয়জনদের কাছে আমার ঋণ অপরিশোধ্য।

ঢাকা

মে ২০০৪

ইসরাইল খান



## ভূমিকা

বাংলাদেশের সমাজ সংস্কৃতি ভাষা ও সাহিত্যের অগ্রগতির ক্ষেত্রেই শুধু নয়—বিশ্বের সকল দেশ সমাজ সভ্যতা সংস্কৃতি ভাষা ও সাহিত্যের নবজাগরণে পুনর্গঠনে তথা বিকাশের সার্বিক প্রক্রিয়ায় সংবাদসাময়িকী ও সাহিত্য বিষয়ক পত্রপত্রিকার এক বিরাট বিচিত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

উনিশ শতকে বাংলা ভাষায় যে সমস্ত পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলো ধর্মপন্থী, রক্ষণশীল, মানবতাবাদী ও মার্কসবাদী সকল শ্রেণীর গবেষকের ইতিহাস-অনুসন্ধানের মৌলিক তথ্যের আকররূপে ব্যবহৃত হতে দেখা গেছে।

বিশ শতকের পত্রপত্রিকা থেকেও তথ্য সংগৃহীত হয়ে সাহিত্য সংস্কৃতি ও সমাজের অগ্রগতির বহুবিচিত্র ইতিহাস তৈরি হয়েছে। গবেষকরা লক্ষ্য করেছেন—পত্র-পত্রিকাই বাঙলার জাগরণের মূল অবলম্বন, এবং সাময়িকপত্রের পাতেই বাঙলার জাগরণের এবং জাতির চিন্তাচর্চার আসল চেহারা ফুটে উঠেছে। ‘পাকিস্তান আন্দোলন’ এবং ‘ভারত বিভাগ’ তথা উপমহাদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে পত্র-পত্রিকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা ইতিহাস পাঠে জানা যায়।

শুধু ভারত বিভক্তি ও স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে এবং ত্রিশ ও চল্লিশপঞ্চাশের দশকের রাজনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক এবং শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের সহায়ক মাধ্যম হিসেবেই কেবল নয়, এর পূর্বে ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্তকালে আর প্রত্যেক যুগে প্রধান প্রধান সামাজিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন ও জাতীয় জীবনাদর্শের বিবর্তনকালে প্রচলিত পত্রপত্রিকাসমূহ যুক্তিতর্ক, বাদ-প্রতিবাদ, সমর্থন-অসমর্থন ও বিরোধিতায় অংশগ্রহণ করেছে। এসব আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য সাহিত্যিক শিল্পী সাংবাদিক সমাজকর্মী ও প্রতিভাবান শুবুদ্বিসম্পন্ন নাগরিকরা নতুন নতুন পত্র-পত্রিকা ও শিল্প সাহিত্যের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জন্মও দিয়েছেন। সমাজের সৃষ্টিশীল ব্যক্তিবর্গ নানান পত্রিকার প্রকাশ, প্রচার ও সম্পাদনার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দান করে সমাজের চিন্তাধারাকে সংগঠিত ও পরিচালিত করেছেন।

ফলে শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার ধারা বিকশিত হয়েছে। শিল্পের দর্শন, বক্তব্য ও নৈতিক প্রশ্নে এবং সাহিত্য শিল্পের সাংগঠনিক কাঠামোর বিতর্কে অংশ নিয়ে সক্রিয়ভাবে কোনো কোনো পত্রিকা বাংলা সাহিত্যের বিবর্তন ও বিকাশের ধারায় ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে।

১৯৪৭-৭১ পর্বে বাংলাদেশ (তৎকালীন পূর্ববঙ্গ ও পূর্ব পাকিস্তান) থেকে যে সমস্ত পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলোর মূল্য মুক্তিযুদ্ধের ও পরবর্তী অগ্রগতির পটভূমি আলোচনায় তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, সামাজিক রাজনৈতিক ঘটনাবলীর এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রশ্নে ১৯৪৭-৭১ পর্বে বাংলাদেশের পরিস্থিতি ছিলো দাবি আদায়ের সংগ্রাম-আন্দোলনে মুখর ও বিতর্কে বিক্ষুব্ধ।

এসব সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিতর্কসমূহ প্রচলিত সাহিত্য পত্রিকাতে অনেক সময় প্রধান আলোচ্য বিষয়রূপে স্থান লাভ করেছে। পত্রিকাগুলোর পাতা মেললেও দেখা যায় পাকিস্তানের সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক আদর্শগত প্রশ্নে তখন (১৯৪৭-৭১) অনেক বিতর্ক সংঘটিত হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক সাহিত্য পত্রিকাগুলোর ভূমিকা বাঙালির স্বার্থপ্রণোদিত না হলেও ঘটনাক্রমে বাংলা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা লাভ করেছে। বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্ররূপে বিশ্বের বুকে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। 'বাংলাদেশের সাহিত্য' নামে ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সংযোজন ঘটেছে। এসবের পেছনে অবশ্যই কতিপয় পত্র-পত্রিকা আর লেখক বুদ্ধিজীবীর অবিস্মরণীয় সদর্থক ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু সেগুলো কোন শ্রেণীর পত্রিকা, কারা সেই পত্রিকার লেখক সম্পাদক ও ব্যবস্থাপক, প্রযোজক? এই প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানের আবশ্যিকতা রয়েছে। কারণ সাময়িকপত্রের মাধ্যমেই মুক্তিসংগ্রামের কলম সৈনিকরা যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। বস্তুতগক্ষে ১৯৫২ সালের আগেই এ যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়।

ব্রিটিশ শাসনামলে রাজনৈতিক কারণে পূর্ববঙ্গে সাময়িকপত্র ও গৃহজগতের বিকাশ তেমন ঘটেনি, তখন কলকাতাই ছিল শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র। ঢাকায় তখন 'উন্নত মানের প্রকাশনা-শিল্প' বলতে কোনো কিছুই অস্তিত্ব ছিল না বললেই চলে। ১৯৪৭ এর স্বাধীনতা বাংলা বই-পুস্তক তথা সাময়িকপত্র পত্রিকার বিকাশকে তেমন প্রশস্ত করেনি। বরঞ্চ শাসক শ্রেণীর বৈরী মনোভাব সর্বদা বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সংস্কৃতির বিকাশকে জন্ম-স্তম্ভ করার ষড়যন্ত্রই করেছে। যার ফলে বাংলা বই ও বাঙালির সংস্কৃতি জন্ম হয়েছে। বিকৃত ও বিভ্রান্ত হয়েছে বাঙালির চিন্তাধারা। অধিকাংশ লেখক-সম্পাদক, সমাজকর্মী সরকারি ছত্র-ছায়ায় পাকিস্তানবাদী ধ্যান-ধারণার পুষ্টি যুগিয়েছেন। ব্যতিক্রম দু-চারজন বাদে সকলে নির্বাঙ্গাট খাকার চেঁচা করায় আলোচ্যকালে পূর্ব বাঙলা থেকে জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার সহায়ক উন্নত মানের সৃষ্টিশীল সাহিত্য-শিল্প বিষয়ক পত্র-পত্রিকা তেমন প্রকাশিত হতে পারেনি বা হয়নি।

এই কালের বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আর্থসামাজিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতিতে পূর্বে নিয়মিত প্রকাশিত হতো এমন পত্রিকাও প্রকাশের ক্ষেত্রে অনিয়মিত হয়ে পড়ে। বহু পত্রিকা এসময়ে নতুন আবির্ভূত হয়েছে, কিন্তু কোনোটাই দীর্ঘজীবী ও সুদূরপ্রসারী হয়নি। সওগাত (১৯১৮) মোহাম্মদী (১৯২৭), আল-ইসলাহ (১৯৩২), নওরোজ (১৯৪২) প্রভৃতি পত্রিকা সাতচল্লিশের পরে পূর্বের মান-মর্যাদা অনুযায়ী নিয়মিত প্রকাশিত হয়নি। সীমান্ত (১৯৪৭) ; অগত্যা (১৯৪৯) ; নওবাহার (১৯৪৯) ; ইমরোজ (১৯৪৯) ; দ্যুতি (১৯৪৯) ; সমকাল (১৯৫৭) ; উত্তরণ (১৯৫৮) ; লেখক সংঘ পত্রিকা ও পরিক্রম (১৯৬২) ; পূর্বমেষ (১৯৬০) ; পূবালী (১৯৬০) ; নাগরিক (১৯৬৪) ; কণ্ঠস্বর (১৯৬৫) প্রভৃতি নিয়মিত



প্রকাশের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ পত্রিকাগুলো স্বল্পকালই নিয়মিত ছিল এবং কৃষ্টি, সীমান্ত, অগত্যা, সওগাত, সমকাল, উত্তরণ, পূর্বমেঘ, কণ্ঠস্বর ইত্যাদি গুটিকয়েক পত্রিকার ব্যতিক্রমী নিদর্শন বাদে নিয়মিত প্রকাশের আশ্বাস দেয়া অনিয়মিত মাসিক, দ্বিমাসিক, ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকাগুলোর প্রায় কোনোটাই নতুন কালের প্রবণতাকে ধরবার চেষ্টা করেনি।

সরকারি পত্রিকা মাহেনও ১৯৪৯ থেকে যদিও ১৯৭১ সাল পর্যন্ত নিয়মিতই প্রকাশিত হয়েছে, তবু এই পত্রিকা সৃষ্টিশীল লেখক-পাঠকদের চাহিদা পূরণে প্রায়ই সক্ষম হয়নি। সীমান্ত, দ্যুতি, সওগাত, সমকাল, উত্তরণ, লেখক সংঘ পত্রিকা, পরিক্রম, কণ্ঠস্বর প্রভৃতি পত্রিকাকে কেন্দ্র করে একটা সৃষ্টিশীল 'সাহিত্যিক আড্ডা' এবং সৃষ্টিশীল রচনার জোয়ার ঘটাবার অফুরন্ত সম্ভাবনা দেখা দিলেও অদূরদর্শিতা, প্রতিভার সীমাবদ্ধতা, দৃঢ়তার অভাব আরও অব্যক্ত অনেক কারণে উদ্যমসমূহ বেশি দূর অগ্রসর হতে পারেনি।

ঈর্ষা-বিদ্বেষ, বাণিজ্যিক অসাফল্য ও দলীয় কোন্দলের ফলে এসব পত্রিকার কোনোটাই দুই তিন কিংবা চার বছরের বেশি একটানা চলতে পারেনি। প্রায় প্রতিটি ভালো পত্রিকাই স্কুলিঙ্গের ন্যায় জ্বলে উঠেই নিতে গিয়েছে। সরকারি কোপানল এবং সরকার খঁষা মন মানসিকতা সম্পন্ন বুদ্ধিজীবীদের অসহযোগিতা সত্ত্বেও পত্রিকার প্রধান উদ্যোক্তা বা সম্পাদকের একক প্রচেষ্টা ও ত্যাগী প্রয়াসের ফলেই প্রথম দিকে কিছুদিন নিয়মিত চলেছে, কিন্তু ক্ষণকালের মধ্যেই উদ্যম নির্জীব হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। একালের কোনো পত্রিকাই বাণিজ্যিকভাবে সাফল্য লাভ করতে পারেনি। প্রখ্যাত সাহিত্যপত্র 'কণ্ঠস্বর' (১৯৬৫) বিতর্কের ঝড় তুললেও দৃঢ় আর্থিক ভিত্তিতে দাঁড়াতে পারেনি বলে, নির্দিষ্ট কোনো সাইজে মাপে ওজনে ও মানে কখনোই নিয়মিত প্রকাশিত হয়নি। বারে বারে আকার আকৃতি প্রভৃতি পরিবর্তিত হয়েছে। উপযুক্ত পত্রিকাগুলো ছাড়া ১৯৪৭ সালের পর থেকে আজ পর্যন্ত যেসব সাহিত্য বিষয়ক সৃষ্টিশীল জ্ঞানচর্চামূলক পত্রিকা প্রকাশিত হতে দেখা গেছে—সেগুলোরও কোনোটাই দীর্ঘদিন নিয়মিত প্রকাশিত হয়নি।

সমাজ গঠনে সাহিত্য ও সাময়িক পত্রিকার প্রয়োজনীয়তার কথা ভেবে পঞ্চাশের দশক থেকেই যেহেতু নতুন উদ্যমে ঢাকা শহরে ব্যক্তিগতভাবে, কখনও কোনো কোনো সংগঠনের পক্ষ থেকে বেশ কিছু অনিয়মিত সাহিত্য-সংকলন প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং অনিয়মিতভাবে হলেও কিছুদিন ধরে তা চলেছে। ফলে যত ক্ষীণই হোক মননশীল সাহিত্য সৃষ্টির একটি ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল। এসব সংকলন ও সাহিত্য-প্রয়াসের সংগঠক, সম্পাদক ও প্রকাশকদের অধিকাংশই ছিলেন বয়সে তরুণ। তবে অপেক্ষাকৃত অভিজ্ঞ প্রবীণদের উদ্যোগেও তখন বেশ কিছু সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। এঁদেরই চিন্তাচর্চার পরিণতিতে বাংলা ভাষার মর্যাদার প্রশ্ন উচ্চকিত থেকেছে। বাঙালির জাতীয়তাবাদী ধ্যান ধারণা এবং ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির ধারা শুকিয়ে যায়নি। সেজন্য স্বল্পপ্রাণ ক্ষীণদেহ লিটল ম্যাগাজিনসমূহ, আর দু-চারটি প্রগতিশীল মাসিক ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্রিকা যুগোপযোগী সেবকের ভূমিকা যে পালন করেছে, তা অবশ্যই ইতিহাসে যথার্থ মূল্যে স্বীকৃতি লাভ করবে। বর্তমান আলোচনায় সেগুলোর মূল্য যথারীতি নিরূপিত হয়েছে। পর্যবেক্ষণ করলে দেখা

যাবে, সাহিত্যপত্রিকাগুলোর সমান্তরালে অনিয়মিত সংকলনগুলোও নানা কারণে প্রভাবশালী ও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কারণ মেধাবী প্রতিভাবানেরা সৃষ্টিশীলতার তাগিদে প্রাণ খুলে হাত মেলে দরাজ দিলে লিখেছেন এসব পত্রিকাতেই। যা বলা যায়নি প্রাতিষ্ঠানিক, সরকারি পত্রিকাতে, তা তাঁরা বলতে বদ্ধপরিকর ছিলেন অনিয়মিত সংকলনগুলোর জন্য রচিত লেখাগুলোতে।

এছাড়া একুশে ফেব্রুয়ারি (১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি পর) ও অন্যান্য তাৎপর্যপূর্ণ দিবস উপলক্ষেও প্রকাশিত হয়েছে অনেক সংকলন। হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত এবং পুঁথিপত্র প্রকাশিত ১৯৫৩ সালের বিখ্যাত সংকলনটি এক্ষেত্রে মাইল ফলক হয়ে রয়েছে। এই পত্রিকাকে ঘিরে যতো শহীদদিবস সংখ্যা ও একুশে ফেব্রুয়ারির সংকলন প্রকাশ পেয়েছে, তার দ্বারা এদেশের মানুষ ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সঙ্গে সম্পৃক্ত একাত্ম হতে পেরেছেন। একারণে স্বাধীনতা সংগ্রামে এই সংকলনগুলোর উচ্চমূল্য ভূমিকা বা অবদান লক্ষ্য করা গেছে। এসবের সাহিত্য সংস্কৃতি ও রাজনীতিগত এবং সমাজতাত্ত্বিক তাৎপর্য অপরিসীম। সেই তাৎপর্য অনুসন্ধানের জন্য এবং আমাদের সামাজিক সাংস্কৃতিক অগ্রগতির ইতিহাস উদ্ঘাটনের তাগিদে এই অনিয়মিত পত্রিকাগুলোর অধ্যয়ন অনুশীলন বিশ্লেষণ ও মর্মেদঘাটনও অত্যন্ত জরুরি।

কিন্তু বর্তমান অভিসন্দর্ভে অনিয়মিত এসব সংকলনের মূল্যমান বিচারের প্রয়াস নেই। সাপ্তাহিক ও পাক্ষিক অনেক পত্রিকাতে সাহিত্য বিরাট জায়গা জুড়ে থাকলেও তা সংবাদপত্রশ্রেণীর অন্তর্গত বিবেচনায় সাহিত্য-পত্রিকার আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। শিশু, মহিলা এবং বিজ্ঞান ইত্যাদি বিশেষ বিষয়ের বিশেষায়িত পত্রিকাও প্রস্তাবিত গবেষণার অন্তর্গত করে নেয়া যায়নি,—যেমন ‘গবেষণা’ পত্রিকাগুলোর মূল্যবিচার এক্ষেত্রে লক্ষ্য হয়নি। প্রতিটি বিষয়েই স্বতন্ত্র অনুসন্ধান ও সন্দর্ভ প্রণয়নের দাবি অস্বীকার করা যায় না।

প্রস্তাবিত বর্তমান গবেষণার কাজ সম্পন্ন করার জন্য বিবেচ্য সাহিত্যপত্রিকাগুলোর ধারাবাহিক সূচিপত্র সংকলন করে, প্রকাশিত লেখাগুলো প্রথমে পাঠ করেছি। প্রতিটি পত্রিকার প্রতিটি সংখ্যা আদ্যোপান্ত পৃষ্ঠা উল্টে মূল্যবান রচনাগুলোর মর্ম অনুধাবনপূর্বক সামাজিক সাহিত্যিক গুরুত্ব নির্ণয়ের চেষ্টা করেছি। বুঝতে চেয়েছি প্রকাশিত রচনার দ্বারা পত্রিকাগুলোর পালিত সামাজিক ভূমিকা কি ছিলো? সাহিত্যিক মান এবং সামাজিক চাহিদার প্রেক্ষিতে পত্রিকার বক্তব্য ও সামাজিক চেতনা বিষয়ে নিজস্ব মতামত নোট খাতায় লিপিবদ্ধ করেছি। পত্রিকার পাতা থেকেই সংগ্রহ করেছি প্রয়োজনীয় তথ্য ও উদ্ধৃতি। যেসব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে এইসব পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে তাঁদের খোঁজ করে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করেছি। তাছাড়া পত্রিকার উদ্যোক্তাদের সমকালীন পত্রিকা সম্পাদক ও লেখকদের নিকট থেকে তাঁদের বক্তব্য যেমন সংগ্রহ করেছি তেমনি ১৯৪৭-৭১ পর্বে সক্রিয় ছিলেন এমনসব প্রধান চিন্তাবিদ, লেখক-সাহিত্যিকদের সাক্ষাৎকারের মাধ্যমেও সেকালের সাহিত্যজগত ও পত্রিকা-পরিস্থিতি অনুধাবনের চেষ্টা করেছি। পত্র-পত্রিকা ও পুস্তক-পুস্তিকাসূত্রেও জেনে বুঝবার চেষ্টা করেছি পত্রিকাগুলোর

প্রয়াস-প্রচেষ্টার সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক মূল্য, মর্যাদা ও প্রকৃতি। বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি নিস্পৃহ মনে নিরপেক্ষ বিবেচনায় তুলনা করে সত্যাসত্য নির্ণয় ও মর্ম সংকলনের চেষ্টা করেছে।

‘বাংলাদেশের সাহিত্য সংস্কৃতি ও সমাজের অগ্রগতিতে সাহিত্যপত্রিকার ভূমিকা (১৯৪৭-৭১)’ নির্ণয়ের জন্য আমাদের অনুসন্ধান ও মূল্যায়ন করতে হয়েছে ১৪ আগস্ট ১৯৪৭ সালের ভারত বিভক্তির পর থেকে যুদ্ধপূর্ব বাংলাদেশের তথা পূর্ব পাকিস্তান ভূ-খণ্ড থেকে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত সাহিত্যপত্রিকাসমূহের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় ; এর প্রকাশক, লেখক, শুবানুধ্যায়ীদের শ্রেণীগত অবস্থান এবং এইসব পত্রিকায় প্রকাশিত রচনাবলীর সাহিত্যিক মূল্য, চিন্তাধারার এবং সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ও সামাজিক ভূমিকা। পূর্ববর্তীকাল দ্বারা এইকাল কতটা প্রভাবিত হয়েছে এবং পরবর্তী কালকে এই কাল কতোটা প্রভাবিত করেছে তাও বুঝতে চেয়েছি। গবেষণার ফলাফল উপস্থাপনের জন্য সন্দর্ভটিকে ৬টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করে বর্ণনা ও বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে সাহিত্য পত্রিকার সংজ্ঞা ও স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়েছে। অতপর বাংলা ভাষায় সাহিত্য পত্রিকার ঐতিহ্য অনুসন্ধান সমাচার দর্পণ (১৮১৮) থেকে কণ্ঠস্বর (১৯৬৫) পর্যন্ত পত্রিকাগুলো কিভাবে সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক অগ্রগতিতে ভূমিকা পালন করেছে তা অতিসংক্ষেপে কোথাও কেবল সূত্রাকারে দেখাবার প্রয়াস আছে। এই অধ্যায়েই সাহিত্যপত্রিকাসমূহ কিভাবে নানা আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে তার পরিচয়ও পাওয়া যাবে। বর্তমান অভিসন্দর্ভের বিষয়বস্তুর গুরুত্ব অনুধাবনের জন্য সাময়িকপত্রিকা নিয়ে গবেষণার ধারা বর্ণনা করে আলোচ্যকালের পত্রিকা-পরিস্থিতি প্রকটিত করা হয়েছে। গবেষণার বিষয়বস্তু এবং কালের পটভূমি হিসেবে দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচ্য পাকিস্তান পর্বের অব্যবহিত পূর্ব ও পরবর্তীকালের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি বর্ণনা করা হয়েছে ঐতিহাসিক প্রধান প্রধান ঘটনাবলীর সূত্র ধরে। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে ১৯৪৭-৭১ পর্বে প্রকাশিত পত্রিকাগুলোকে চিহ্নিত করা হয়েছে। বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নিম্নোক্ত তিনটি শিরোনামের অধীনে সেগুলো বিন্যস্ত করা হয়েছে। যথা :

১. পাকিস্তানের আদর্শে বিশ্বাসী, ইসলামী-পুনর্জাগরণবাদী সরকারি ও বেসরকারি সাহিত্য-পত্রিকা ;
২. মানবতাবাদী ও বাঙালি জাতীয়তাবাদী ধারার সাহিত্যপত্রিকা এবং
৩. মার্কসীয় মতবাদ প্রভাবিত কতিপয় সাহিত্যপত্রিকা।

প্রধান ও অপ্রধান পত্রিকাগুলোকে আলাদাভাবেই আলোচনা করা হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে সমগ্র আলোচনার সার-সংক্ষেপ করা হয়েছে এবং আলোচ্যকালের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সমাজের অগ্রগতিতে প্রকাশিত সাহিত্যপত্রিকাসমূহের ভূমিকা সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে ঘটনা-উত্তর সামাজিক সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক প্রবণতার দিকে লক্ষ্য রেখে।

## বিষয়বস্তুর গুরুত্ব

বিনয় ঘোষ—এর পূর্বে জেমস লঙ, কেদারনাথ এবং ব্রজেন্দ্রনাথের তিনটি উদ্যোগ ব্যতীত আর কোনো প্রয়াস—এর কথা জানা যায় না বলে একথা বলতে দ্বিধা থাকে না যে, বিশ শতকের ষাটের দশকের প্রান্ত থেকে সত্তর ও আশির দশকে ক্রমবশি ত্রিশ বছরের মধ্যেই সকল সাময়িকপত্র বিষয়ক গবেষণামূলক রচনা প্রকাশিত হয়েছে এবং অধিকাংশ কর্মই অবলম্বন করেছে উনিশ ও বিশ শতকের প্রথমার্ধের মধ্যে প্রকাশিত পত্র—পত্রিকা।

১৯৪৭—এর দেশ বিভাগের পরে পাকিস্তানের বাংলাভাষি অঞ্চল থেকে যতো পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল, তার একটি অসম্পূর্ণ তালিকা শামসুল হক প্রস্তুত করলেও তাতে কোনো আলোচনা বা মূল্যায়ন নেই। আবদুল হক, হাসান হাফিজুর রহমান, মোহাম্মদ আবদুল কাইউম, আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, আবুল কাসেম ফজলুল হক প্রমুখ সওগাত, সমকাল, কণ্ঠস্বর, প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা বা মূল্যায়নের প্রয়াস পেলেও সার্বিকভাবে দেশকাল সমাজ সংস্কৃতি ও রাজনীতি ইত্যাদির প্রেক্ষাপটে পাকিস্তান আমলের সাহিত্য পত্রিকাগুলোর মূল্যায়ন তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল না। আবার মোহাম্মদ আবদুল কাইউম এবং গোলাম সাকলায়েন পাকিস্তানের বাংলা সাহিত্য পত্রিকাগুলোর নামোল্লেখ করে একটি রূপরেখা তৈরি করলেও ধারাবর্ণনার অতিরিক্ত তা কোনো গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা নয়। এ কারণেই পূর্বপাকিস্তান থেকে প্রকাশিত পত্র—পত্রিকার সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক ভূমিকা নির্ণয়ের পর্যাপ্ত অবকাশ রয়েছে। গবেষকেরা এখনও এই সময়কালে প্রকাশিত সাহিত্য পত্রিকাসমূহের অবদান নিরূপণের উদ্যোগ গ্রহণ করেননি। রচয়িতাদের ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দ এতে প্রতিফলিত হয়েছে। ইতিহাসের ধারা অনুসরণের কিংবা তথ্য পরিবেশনের চেষ্টা নেই।

দেশ—বিভাগ এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি যে সংকটের সম্মুখীন হয়, সেই সংকট মোকাবিলায় সীমান্ত (১৯৪৭) থেকে পলিমাটি (১৯৬৬) পর্যন্ত একগুচ্ছ পত্রিকা সম্মুখ—সমরে লড়াইয়ের মানসিকতা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিল। পাকিস্তানবাদী ধারাকে পরাজিত করে মানবতাবাদী এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদী ধারার বিজয়—সূচনার মাধ্যমে ‘বাংলাদেশ’ প্রতিষ্ঠার পটভূমি তৈরি করেছিল একদল সম্পাদক ও লেখক কয়েকটি পত্রিকাকে অবলম্বন করে। কিন্তু এই পত্রিকাগুলোর ভূমিকা নির্ণয়ের জন্য এ পর্যন্ত কোনো গবেষণার পরিকল্পনা গৃহীত হয়নি। এই কারণেই এ বিষয়ে গবেষণার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের প্রেক্ষিতে এ বিষয়ে গবেষণামূলক কোনো কাজের সন্ধান এখনও পাওয়া যায় না।

এই গবেষণার মাধ্যমে উদঘাটিত হবে বাংলাদেশের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও রাজনীতির ইতিহাসের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। নানা বিষয়ে যেসব জনশ্রুতি এবং কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, তার অনেকগুলোই পড়বে ভেঙ্গে এবং প্রকাশিত হবে অনেক অজানা সত্য ও তথ্য। তরুণ সমাজ বিচার বিবেচনাসহীন ভাবে এবং পূর্ব অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন না—করে, যুক্তিহীন আবেগের সঙ্গে সাহিত্য সংস্কৃতি ক্ষেত্রে যেভাবে কাজ করে যায়—এই

[ তের ]

গবেষণা প্রকাশিত হলে তা প্রভাবিত হবে বলে আশা করা যায়। তরুণরা জানতে পারবে এক্ষেত্রে পূর্ব অভিজ্ঞতার স্বরূপ এবং আগ্রহী হবে নিরেট আবেগকে পরিহার করে যুক্তির দ্বারা নিজেদেরকে পরিচালিত করতে। সাহিত্য ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে ভবিষ্যত অগ্রগতির পরিকল্পনা প্রণয়নেও এই গবেষণার ফলাফল দীর্ঘকাল প্রয়োজনীয় বিবেচিত হবে বলে ধারণা করা যায়।

ঢাকা  
মে ২০০৪

ই খান



## সূচিপত্র

### প্রথম অধ্যায়

সাহিত্যপত্রিকা ও তার বহুমাত্রিক ভূমিকা ১-৩৪

সাহিত্যপত্রিকার স্বরূপ ; সাহিত্যপত্রিকা ও কালের দাবি ; সাহিত্যপত্রিকা, সাহিত্য-আন্দোলন ও সাহিত্যিক গোষ্ঠী ; পাকিস্তান আমলের পত্রিকা পরিস্থিতি ও প্রধান পত্রিকা ; বিভিন্ন ধারার সাহিত্য প্রয়াসের বিচিত্র পরিচয়।

### দ্বিতীয় অধ্যায়

পূর্ব বাংলার সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সাহিত্যিক সাংস্কৃতিক পটভূমি ৩৫-১০৭

সামাজিক অবস্থার রূপান্তর ; রাজনৈতিক আন্দোলন ও ঘটনাবলি ; বাংলার রাজনীতি ও সাহিত্য-সংস্কৃতি ভাবনায় কমিউনিস্ট আন্দোলন এবং মার্কসীয় চিন্তাধারার প্রভাব ; পাকিস্তানের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ধরন ; পাকিস্তানের প্রধান সাংস্কৃতিক ঘটনাবলী।

### তৃতীয় অধ্যায়

পাকিস্তানের আদর্শে বিশ্বাসী, ইসলামী পুনর্জাগরণবাদী সরকারি ও বেসরকারি প্রধান সাহিত্যপত্রিকা ১০৮-২৭০

প্রস্তাবনা : মোহাম্মদী (১৯০৩-৭০) ; মোহাম্মদীর রচনা পরিচয় ; মোহাম্মদীর ভাষা ও সাহিত্যচিন্তা ; সাহিত্য-সম্মেলন প্রসঙ্গে মোহাম্মদী ; মোহাম্মদীর সংস্কৃতিচিন্তা ; মোহাম্মদীর সমাজচিন্তা ; আল-ইসলাহ (১৯৩২-৭১) ; মাহেনও (১৯৪৯-৭১) ; দিলরুবা (১৯৪৯-৬৪) ; নওবাহার (১৯৪৯-৫৩) ; তাহজিব (১৯৫০) ; দ্যুতি (১৯৪৯-৫০) ; দ্যুতি (নবপর্যায়ে ১৯৫২-৫৩) ; পূর্ববী (১৯৬০) ; লেখক সংঘ পত্রিকা (১৯৬১) ; সংলাপ (১৯৬১-৭০) ; উত্তর-অন্বেষা (১৯৬৭-৭১)।

পাকিস্তানপন্থী, ইসলামী পুনর্জাগরণবাদী ধারার কতিপয় অপ্রধান পত্রিকা ২৭১-২৮৬

নওরোজ (১৯৪২-৭১) ; জাগরী (১৯৫৬) ; অতএব (১৯৬০-৬২) ; প্রবাহ (১৯৬১) ; দিগন্ত (১৯৬৬) ; অভিযান (১৯৫৪-৬৪)।

**চতুর্থ অধ্যায়**

মানবতাবাদী ও বাঙালি জাতীয়তাবাদী ধারার সাহিত্য পত্রিকা ২৮৭-৪২৫

প্রস্তাবনা : সওগাত (১৯১৮-৮০) ; ইমরোজ (১৯৪৯-৫৪) ; সমকাল (১৯৫৭-৭৭) ; পূবালী (১৯৬০-৬৭) ; পূর্বমেঘ (১৯৬০-৭১) ; পরিক্রম (১৯৬২-৭০) ; কণ্ঠস্বর (১৯৬৫-৮৬) ।

মানবতাবাদী ও বাঙালি জাতীয়তাবাদী ধারার কতিপয় অপ্রধান পত্রিকা ৪২৬-৪৬৫

মেঘনা (১৯৫৭) ; সাহিত্য (১৯৬০-৬২) ; যাত্রী (১৯৬০-৬২) ; সুন্দরম (১৯৬৩-৬৪) ; স্বাক্ষর (১৯৬৩-৬৬) ; স্বদেশ (১৯৬৩-৭০) ; পূর্বলেখ (১৯৬৬-৬৭) ; মেঘনা (চট্টগ্রাম ১৯৬৭-৭০) ।

**পঞ্চম অধ্যায়**

মার্কসীয় মতবাদ প্রভাবিত কতিপয় সাহিত্য পত্রিকা ৪৬৬-৫৮৫

প্রস্তাবনা : কৃষ্টি (১৯৪৭) ; সীমান্ত (১৯৪৭-৫২) ; সংকেত (১৯৪৮-৪৯) ; অগত্যা (১৯৪৯-৫২) ; মুক্তি (১৯৫০) ; পরিচিতি (১৯৫১-৫৩) ; যাত্রিক (১৯৫৩) ; স্পন্দন (১৯৫৩) ; উত্তরণ (১৯৫৮-৬১) ; পলিমাটি (১৯৬৪-৯৪) ; নাগরিক (১৯৬৪-৭০) ।

**ষষ্ঠ অধ্যায়**

উপসংহার ৫৮৬-৫৮৯

পরিশিষ্ট ৫৯০-৬২৬

নিষর্গ ৬২৭-৬৪৮



## প্রথম অধ্যায়

# সাহিত্যপত্রিকা ও তার বহুমাত্রিক ভূমিকা

## ১. সাহিত্যপত্রিকার স্বরূপ

‘সাহিত্য’ যে-পত্রিকায় স্থানলাভ করে তাই ‘সাহিত্য পত্রিকা’, এটাই হলো সাহিত্য পত্রিকার সহজ ও সাধারণ সংজ্ঞা। সাহিত্যের পরিধি ‘একটি জাতির সর্বাঙ্গীন জীবন সাধনার’ মতো বিশাল। ভাষা সৌন্দর্য সৃষ্টি ও জ্ঞানার্জনের বাহন। আর সাহিত্য ‘মানব-হৃদয়ের ক্ষুধা-তৃষ্ণার’ একমাত্র ‘পানাহার’। সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করেছেন বাংলা ভাষার আধুনিক যুগের সকল প্রধান লেখক। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-৯৪), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১), শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৭), বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-৭৪), আবু সয়ীদ আইয়ুব, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯১০-১৯৫৬) প্রমুখ ভাবুক সাহিত্য সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বহু মতামত লিপিবদ্ধ করে গেছেন। কাব্যের ভাষায় একজন বলেছেন :

সাহিত্যের মাধ্যমে মূক পায় স্পন্দন, বীর পায় অমিত তেজ, যোদ্ধা পায় চঞ্চল শোণিতের আস্থান, শিল্পী পায় সুরের রেশ, কবি পায় কাব্যের ছন্দ, প্রেমিক পায় হৃদয় নিংড়ানো বিরহ-মিলনের আমেজ, ধার্মিক পায় কল্পলোকের সন্ধান, আর জাতি পায় বেঁচে থাকার প্রাণ।

লেখকের প্রধান লক্ষ্য তাই পাঠকসমাজ।

কারণ জাতির বেঁচে থাকার প্রাণ-সাধনায় মিলিত হবার লক্ষ্যে শিল্পী সাহিত্য সৃষ্টি করেন। সাহিত্য ও সাহিত্য-স্রষ্টার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে চার্লস-অগাস্টিন সাত্তবভ লিখেছেন :

সাহিত্যিক (‘ক্লাসিক’) হচ্ছেন সেই লেখক যিনি মানুষের আত্মাকে সমৃদ্ধ করেছেন, জ্ঞানের ও অনুভূতির ভাণ্ডারে নতুন সম্পদ সংযোজন করেছেন, মানবতাকে দিয়েছেন কোনো দ্ব্যর্থহীন নৈতিক সত্যের নিশ্চিত সন্ধান কিংবা কোনো শাস্ত্র আবেগের অনন্য উপলব্ধি; অনিবার্য করে তুলেছেন অগ্রগতির কোনো নতুন ধাপ; যিনি তাঁর চিন্তাধারাকে, অনুসন্ধানের ফলাফলকে, আবিষ্কৃত বিরল সত্যকে তুলে ধরেছেন ব্যাপ্ত উদারতায়, রুচির পরিশীলনে, যুক্তিবিচারের প্রশান্তিতে ও সৌন্দর্যের দীপ্তিতে; যিনি স্রষ্টার আসনে বসে অনন্য শৈলীতে কথা বলেছেন, অথচ বলেছেন পৃথিবীর মানুষের মনের কথাই; তাঁর সে শৈলী নব্যতাকে অস্বীকার করলেও নতুন, নতুন ও পুরাতন বা দুই-ই; প্রতিটি যুগের মানুষের কাছেই তিনি সমকালীন। যথার্থ ক্লাসিকের, সাহিত্যিকের এই-ই হলো স্বরূপ, কেবল রূপসীতির প্রশ্নই তাতে অপরিহার্য ও মুখ্য নয়।<sup>২</sup>

আমাদের দেশের সাম্প্রতিক কালের পত্রিকা এবং সাহিত্য-পরিস্থিতি সম্পর্কে সমালোচক লিখেছেন :

একটি জাতির সর্বাঙ্গীন জীবন সাধনা বহুমুখী। অর্থনৈতিক ক্রিয়া-কলাপ থেকে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত পর্যন্ত, সামরিক কর্মকাণ্ড থেকে ললিত কলার চর্চা পর্যন্ত তা ব্যাপ্ত। সাহিত্য সাধনা এই বহুমুখী বহুব্যাপ্ত সার্বিক কর্মধারারই

একটি অংশ মাত্র। তবে সাহিত্যের পরিধিও সর্বব্যাপী;—জীবন-জগতের সকল বিষয়ই সাহিত্যের বিষয়বস্তু হতে পারে। একটি জাতির সাহিত্যের সুস্থবিকাশ ও পূর্ণ স্ফূর্তির অপরিহার্য শর্ত হিসেবে দরকার সেই জাতির সার্বিক জীবনানুশীলনের অভিজ্ঞতা এবং সাহিত্য-চর্চার পাশাপাশি সর্বমুখী-জ্ঞানের গভীরতর অনুশীলন। বলাবাহুল্য, যে-সমাজে দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, সমাজ-বিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব, অর্থনীতি, রাজনীতি ইত্যাদি মানবিক জ্ঞানের সকল শাখার পর্যাপ্ত চর্চা নেই, সেই জ্ঞানচর্চার সঙ্গে উন্নত জীবন ও উন্নত সমাজ গঠনের বাস্তব কর্মের যোগ, সে-সমাজে সাহিত্য কখনও পুষ্টি ও স্ফূর্তি লাভ করতে পারে না। সাহিত্য জীবন ও সমাজের সঙ্গে যেমন অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে যুক্ত, তেমনি যুক্ত সর্বপ্রকার অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের সঙ্গেও। এজন্যই সাহিত্য বিচারের পটভূমি হিসেবে জ্ঞানানুশীলনের ধারাও অবশ্য বিবেচ্য। এই বিবেচনার অভাবে সাহিত্যের আলোচনা হয়ে পড়ে তাৎপর্যহীন এবং সাহিত্যও হয় ক্ষীণপ্রাণ, বিবর্ণ, ফ্যাকাশে।

প্রত্যেক কালের শিল্পী-সাহিত্যিকের কাছেই সমাজের ও কালের দাবি থাকে। দাবি থাকে যে ‘লেখকেরা জীবন ও সমাজের প্রতি তাকাবেন নানা বাতায়ন দিয়ে—সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, ধর্মতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি, রাজনীতি, জড়বিজ্ঞান, প্রাণিবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান ইত্যাদি সকল বাতায়নপথে জীবন-জগতের রহস্যকে অবলোকন করবেন তাঁরা।’<sup>৩</sup>

অতএব একটি জাতির সর্বাঙ্গীণ জীবনানুশীলনের অভিজ্ঞতা এবং সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি সর্বমুখী জ্ঞানের গভীরতর অনুশীলন ঘটে যেসকল শিল্পগুণ সম্পন্ন রচনায়, সেগুলোকে ‘সাহিত্য’ অভিহিত করে যেসমস্ত পত্রিকায় তা প্রকাশিত হয় তাকে ‘সাহিত্যপত্রিকা’ আখ্যা দেয়া যায়। এই আলোকে সাহিত্য-পত্রিকার স্বরূপ নির্ণয় করা যায় এভাবে :

কোনো সাহিত্য পত্রিকা কেবল ‘গতানুগতিক সাহিত্য’ ধারণ করে প্রকাশিত হবে না। তা ‘সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজ-বিজ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন, গণনীতি, সংস্কৃতি এবং সমসাময়িক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী বিষয়ক আন্তরিকতাপূর্ণ সৃষ্টিশীল রচনাবলীর আধার হয়ে সমাজ-জীবনে জাগরণ সৃষ্টির দূরসাহসিক অভিযানে অভিযাত্রী হবে এবং বর্তমান যুগ-সংক্রান্তির বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন ধারণাসমূহকে সংহত করে এক নতুন যুগ সৃষ্টির অদম্য প্রয়াসে ব্রতী হবে।’<sup>৪</sup>

অবশ্য ‘সাহিত্য-পত্রিকা’র এই ধারণা প্রথম দিকে প্রচলিত ছিল না। সাম্প্রতিক কালে যুগের চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে এই ধারণা পুষ্টি লাভ করলেও গোড়াতে সাহিত্য-পত্রিকা বা ‘লিটারেরি জার্নাল’ কিংবা ‘পিরিয়ডিক্যালস্’ বা ‘ম্যাগাজিন’ অন্য অর্থ বহন করতো। ‘দি ওয়ার্ল্ড বুক এনসাইক্লোপিডিয়া’; ‘ওয়েবস্টার থার্ড নিউ ইন্টারন্যাশনাল ডিকসনারী’; ‘ওয়ার্ল্ড বুক ডিকসনারী’; এবং ‘এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা’ তে Periodical বা Magazine এর যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তার সঙ্গে নির্দিষ্ট সময়ান্তরে সাহিত্য, সংস্কৃতি, সমাজ, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয় নিয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে বিবৃত মাসিক, দ্বিমাসিক (বঙ্গদর্শন, সবুজপত্র, সওগাত, সমকাল প্রভৃতি) ত্রৈমাসিক ইত্যাদি সাহিত্য-পত্রিকার বৈশিষ্ট্যের মিল আছে।

Encyclopedia Britannica (volume-17, 1963, p-513) তে PERIODICAL এর সংজ্ঞায় লেখা হয়েছে : ‘This term, which was once applied to all

publications appearing at regular intervals, is now used by librarians and others to designate all such serials except newspapers.'

প্রথম দিকের Periodicals সম্পর্কে উক্ত সূত্রে বলা হয়েছে ; The forebears of the literary periodical in the 17th century were the book notices inserted by publishers in the early news-books. By 1646 such notices, accompanied by short critical comments, were appearing with some regularity ; about 1650 they began to be grouped together and to form a regular feature of the news books or paper,' ইত্যাদি।

'দি ওয়ার্ল্ডবুক ডিকসনারী'তে পিরিয়ডিক্যাল সম্পর্কে লেখা হয়েছে : 'a magazine that appears regularly, but less often than daily : The quarterly magazine is a periodical published every three month...published at regular intervals, less often than daily : Periodical publications are usually bought by subscription through the mailhappening at regular intervals ;'

'ডিকসনারি অব লাইব্রেরি অ্যান্ড ইনফরমেশন সায়েন্স' (Vol. 3) এ সম্পর্কে লিখেছে : 'Refers to a publication with a distinctive title which appears at stated or regular intervals, generally oftener than once a year, without prior decision as to when the last issue shall appear. If contains articles, stories or other writings, by several contributors. News papers, Whose chife function is to disseminate news, and the memoirs, proceedings, journals, etc. of societies are not considered periodicals under the cataloguing rules. At the general conference of unesco, held at paris on 19th November 1964, it was agreed that a publication is a periodical if it constitutes on issue in a continuous series under the some title, published at regular or irregular intervals, overn an indefinite preiod, individual issues in the series being numbered consecutively or each issue being dated.'

ম্যাগাজিন সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে 'দি ওয়ার্ল্ডবুক এনাসাইক্লোপিডিয়া'-য় বলা হয়েছে : হাজার হাজার মানুষ পড়ে, অধিকাংশ বুক স্টলে এবং অনেকেইঘরে সরবরাহ পেয়ে ; বিপুল সংখ্যক পাঠক বিজ্ঞাপন দিয়ে ম্যাগাজিনের আকর্ষণ বৃদ্ধি করে এবং এর আয়ের প্রধান উৎস বিজ্ঞাপন। এর প্রতিটি সংখ্যা একজন অথবা একদল সম্পাদক কর্তৃক পরিকল্পিত হয়ে সপ্তাহে অথবা মাসে মাসে প্রকাশিত হয়। সম্পাদকগণ বিষয় নির্ধারণ বা পছন্দ করেন এবং তাঁরাই নির্বাচন করেন লেখক এবং দিক নির্দেশ দেন ম্যাগাজিনের চিত্রগ্রাহক ও অঙ্কসজ্জার শিল্পীদেরকে। সমযোগ্যযোগী লেখার জন্য রচয়িতারা জনগণের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন এবং ফটোগ্রাফার নাটকীয় ছবি সংগ্রহ করেন রচনাকে 'ইলাস্ট্রট' করার জন্য। মুদ্রণ ও বাঁধাইয়ের পর ম্যাগাজিনসমূহ ডাক মারফত গ্রাহক পাঠকদের নিকট প্রেরণ করা হয়। Magazine is a collection of articles or stories—or both—published at regular

intervals. Most magazines also include illustrations. Magazine Provide a wide variety of information, opinion, and entertainment. For example, they may cover current events and fashions. discuss foreign affairs, or describe how to repair appliances or prepare food.

ব্যবসা, সংস্কৃতি, শখ, চিকিৎসা, ধর্ম, বিজ্ঞান ও খেলাধুলার বিষয় নিয়ে হরেক রকমের ম্যাগাজিন এখন প্রকাশিত হয়। কোনো কোনো পত্রিকা (ম্যাগাজিন) কেবলমাত্র গল্প উপন্যাস নাটক কবিতা কার্টুন ছবি বা টেলিভিশন শো অথবা চিত্রতারকাদের কথকত্ব নিয়েও প্রকাশ পায়। দৈনিক পত্রিকাও বহু লেখক সাংবাদিকের যৌথকর্ম, কিন্তু দৈনিক সংবাদপত্র থেকে ম্যাগাজিন বিষয় ও আকৃতিগত দিক থেকে ভিন্নতর বৈশিষ্ট্যের দাবিদার। ম্যাগাজিন সংবাদপত্রের থেকে বেশি সময় অন্তর প্রকাশিত হয়। কারণ, তা সাইজে ক্ষুদ্র এবং উন্নত মানের কাগজে ছাপা হয়। অধিকাংশেরই স্বতন্ত্র প্রচ্ছদ বা মলাট থাকে এবং তা সেলাই অথবা স্ট্যাপলস করে বাঁধাই করতে হয়। সংবাদপত্র থেকে ম্যাগাজিনে তুলনামূলকভাবে কম বিষয় থাকে। তবে ম্যাগাজিনের বিষয়বস্তু দ্রুত পরিবর্তন করতে হয়। অর্থাৎ বিষয় বৈচিত্র্য সৃষ্টি করতে হয়। কোনো কোনো ম্যাগাজিন বা সাময়িকী নিউজপেপারের আকারে প্রকাশিত হয়। আবার দীর্ঘ বিস্তৃত রচনা নিয়েও সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন ধরনের লেখাও তাতে থাকে। ঘটনাভিত্তিক, বাস্তবকাহিনী ব্যক্তিগত চংয়ে আবেগময় ভাষা ও ভঙ্গিতে ম্যাগাজিনে উপস্থাপন করা হয়। জাতির শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ এবং লেখকেরাও বিশেষ বিশেষ সংখ্যায় অথবা নিয়মিতভাবে সাময়িকী বা ম্যাগাজিনে লিখে থাকেন। অনেক সুপরিচিত মহৎ লেখকের প্রথম দিকের রচনাবলী ম্যাগাজিন বা সাময়িকীতে প্রথমে প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিভাবান এবং খ্যাতিমান লেখকেরা ম্যাগাজিন ও সাময়িকীতে লিখেই সুপরিচিত হয়েছেন।

ম্যাগাজিনসমূহকে মোটামুটি দুটি বড় ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। ট্রেড বিজিনেস, ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রভৃতি বিশেষায়িত ম্যাগাজিনসমূহ প্রফেশনাল গ্রুপের পাঠক সদস্যদের নিকট ডাকে পাঠানো হয়। জনপ্রিয় বাণিজ্যিক পত্রিকাগুলো বুকস্টলে বিক্রির জন্য সজ্জিত থাকে। এগুলোর মধ্যে থাকে আবার চিলড্রেন্স ম্যাগাজিনস্, হবিস ম্যাগাজিনস্, ইনটেলেকচুয়ালস্ ম্যাগাজিনস্, মেনস্ ম্যাগাজিনস্, উইমেনস্ ম্যাগাজিনস্, এবং সার্ভিস ম্যাগাজিনস্। ‘Intellectual Magazines provide a thoughtful analysis of current cultural and political events. This publications include opinion magazines, which discuss current events from a particular economic or political viewpoint. Many intellectual magazines publish fiction and poetry as well as factual articles.’<sup>৬</sup>

সাহিত্য পত্রিকা বা ম্যাগাজিনের বিকাশের ইতিহাস সম্পর্কে The world Book Encyclopedia-য় বলা হয়েছে : ‘The earliest magazines probably developed from newspapers or from book seller cataloges. Such cataloges, whicheviewed books on sale, first appeared during the 1600’s in France then other

countries. Pamphlets published at regular intervals appeared in England and America in the 1700's, primarily as literary publications'<sup>9</sup>

বাংলা ভাষার সাময়িকীগুলোর দিকে তাকিয়ে বলা যায়—টেক্সট বইয়ের প্রয়োজন মেটায় এমন পত্রিকা থেকে আরম্ভ করে শিশু, পুরুষ, মহিলা, বিজ্ঞান, খেলাধুলা, সিনেমা, রাজনীতি, ধর্মীয় এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ভিত্তিক বিশেষায়িত এবং বাণিজ্যিক-উদ্দেশ্যে প্রকাশিত পত্রিকা উনিশ শতক থেকেই প্রকাশিত হচ্ছে। ১৯৪৭-৭১ পর্বেও পূর্ব বাঙলা থেকে বাংলা-ভাষায় দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, দ্বিমাসিক, ত্রৈমাসিক, যাক্ষমাসিক, বার্ষিক, শিশু, মহিলা, বিজ্ঞান, সিনেমা, মৌলিকগণতন্ত্রী, বইয়ের পরিচিতিমূলক এবং ব্যবসা-বাণিজ্যভিত্তিক পত্র-পত্রিকা অসংখ্য প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু সকল পত্রিকার মান এক রকম ছিল না। প্রচার সংখ্যা এবং গ্রাহক পাঠকের সংখ্যায়ও পার্থক্য আছে।

## ২. সাহিত্যপত্রিকা ও কালের দাবি

ইতিহাসের দিকে তাকালেই দেখা যায়—সংবাদ-সাময়িকী ও সাহিত্যপত্রিকা প্রকাশের মূল প্রেরণাই ছিল সমাজ ও সংস্কৃতি-ভাবনা। বেঙ্গল গেজেট (১৭৮০) থেকে বঙ্গাল গেজেট (১৮১৮) পর্যন্ত ইংরেজি ভাষায় যতোগুলো পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল, তাও প্রকাশিত হয়েছিল সমাজ-সমালোচনার লক্ষ্যে : যদিও বহিরাগত ধনিকদের স্বার্থচিন্তা ছিল এর মূলে কার্যকর ; তথাপি এইসব প্রয়াসের মাধ্যমে সমাজ সংস্কৃতির রূপান্তরের ক্ষেত্রে পত্র-পত্রিকার ভূমিকা সম্পর্কে এদেশবাসী অবহিত হতে পেরেছিল।

ইন্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সামাজিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক নানা অনাচারের কাহিনী পত্রিকার পৃষ্ঠায় প্রকাশের ফলে সরকারের উচ্চস্তরে, ও প্রশাসনের অভ্যন্তরীণ কৌশল ও পদ্ধতিতে পরিবর্তন অনিবার্য হচ্ছিল। ফলে পত্রিকায় সমাজ সমালোচনার প্রবণতা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে ; পাশাপাশি জনমত দমন করার জন্যে কয়েমী স্বার্থবাদী ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী সেন্সরশীপ প্রথার উদ্ভাবন করে। সেই ধারা আজও চলছে। সমাজ-সংস্কারকেরা মতাদর্শ প্রচারের মুখ্য মাধ্যম হিসেবে আগেই যেকোনো পত্রিকা প্রকাশের চিন্তাই করে থাকেন।

কে না জানেন, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামোর ভিত্তি কাঁপিয়ে দিতে এবং স্বাধীন সার্বভৌম ভারতীয় রাষ্ট্রসমূহের প্রতিষ্ঠার পেছনে কালে কালে পত্র-পত্রিকাগুলো কি অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করেছিলো। বাংলাদেশের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সমাজের অগ্রগতিতে সাহিত্যপত্রিকাসমূহের যুগান্তর সৃষ্টিকারী ভূমিকার কথাও ইতিহাসকারগণ উচ্ছ্বসিত ভাষায় লিপিবদ্ধ করবেন।

সমাচার-দর্পণ (১৮১৮)—এ কোনো বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি পাওয়া না গেলেও, তা বাঙলার নবযুগের পত্রিকা হয়ে উঠেছিল। এবং লক্ষণীয়, 'মিশনারীদের পত্রিকা হওয়া সত্ত্বেও' তাঁতে 'খ্রিস্টীয় আদর্শ প্রচারের উৎকট চেষ্টা ছিল না'। সম্পাদক মার্সম্যান সমাচার দর্পণ পত্রিকার

নামের নিচে পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্যসংবলিত এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করেছিলেন : “দর্পণে মুখ সৌন্দর্যমিব কার্যবিচক্ষণা। বৃত্তানিহ জনস্ত সমাচারাস্য দর্পণে॥”

পত্রিকাতে নবযুগের চাঞ্চল্যকর ধর্মান্তরণ ঘটনা, ইংরেজি শিক্ষার ফলে বাঙালি যুবকদের অস্থিরচিন্ততা ও নানান সামাজিক ক্রিয়াকলাপ প্রকাশ পাবার ফলে উদ্ভূত সামাজিক সংকট মোকাবিলার জন্য রামমোহন, ঈশ্বরগুপ্ত, দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয় দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ প্রধান সম্পাদকবৃন্দ উনিশ শতকের পত্র-পত্রিকা প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছিলেন। সংবাদ প্রভাকর (১৮৩১) আধুনিক বাঙালি সমাজের প্রথম বাণীবহ; সংবাদ পরিবেশনের সঙ্গে তাতে থাকত গদ্যে লেখা দীর্ঘ রচনা এবং কবিতা। সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরগুপ্তের (১৮১২-৫৯), সংবাদ প্রভাকরও পরিবর্তনশীল সমাজের মুখপত্র হয়ে উঠেছিল। সঞ্জানে না হলেও উনিশ শতকের বাঙলার রেনেসাঁস-এর পটপরিবর্তন এই পত্রিকায় প্রতিফলিত হয়েছিল সম্পাদক-ব্যক্তিত্বের অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্যের কারণেই। সম্পাদক সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে মতামত দিতেন, ভালোমন্দ সমালোচনা করতেন। সম্পাদক ও লেখকগণ সামাজিক দায়িত্ববোধ-সচেতন হওয়ায় পত্রিকাটি সংস্কৃতি ও সমাজ-ভাবনার ক্ষেত্রে ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়ে জাগরণের স্বর্ণযুগের প্রতিনিধি হয়ে গিয়েছিল।

‘তত্ত্ববোধিনী’ পত্রিকা প্রকাশিতই হয়েছিল একটি সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিশিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে। ‘সমুদয় শাস্ত্রের নিগূঢ়তত্ত্ব’ ও ‘বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যার প্রচার’ তখন সমাজের জন্য বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে মিশনারী কর্তৃক হিন্দুধর্মের উপর হানিত আঘাতকে প্রতিহত করার জন্য ‘সমস্ত হিন্দু (তখন) একযোগে সমাজ সংস্কারে অগ্রসর’ হয়েছিলেন। মিশনারীদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ‘আঘাতকে প্রতিঘাত করিবার মধ্যেই বাঙ্গালী তাহার আত্মশক্তির পরিচয়’ পেয়েছিল। প্রতিঘাত-কর্মটি মুখ্যত প্রকাশিত হয়েছিল ব্রাহ্মধর্মান্দোলনের মধ্য দিয়ে। ‘তত্ত্ববোধিনী’ প্রকাশের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল তাই ধর্মচর্চা ও ব্রাহ্মধর্ম প্রচার। কারণ উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ধর্মের আদর্শ ও প্রত্যয়সমষ্টি কেন্দ্র করে রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথের দ্বারা ব্রাহ্মধর্মের অভ্যুদয় হয়েছিল।

সমাজবিজ্ঞানীরা বলেছেন : ‘বাংলাদেশের তো বটেই, সারা ভারতবর্ষে উনিশ শতকের যে রেনেসাঁস বা নবজাগরণের ঐতিহাসিক লক্ষণ সমাজ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছিল, তাতে রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথ-কেশবচন্দ্র প্রবর্তিত ব্রাহ্মধর্মান্দোলনের গভীর ও ব্যাপক প্রভাব বিদ্যমান’।<sup>৮</sup>

বলাবাহুল্য, একাজে তত্ত্ববোধিনী (১৮৪৩) প্রধান অবলম্বন হয়েছিল।

উনিশ শতকের প্রারম্ভে ভাষা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রশ্নে সমাচার দর্পণ, ...প্রভাকর, তত্ত্ববোধিনী প্রভৃতির পরে জ্ঞানান্বেষণ, বেঙ্গলস্পেস্ট্রটর, সোমপ্রকাশ, বঙ্গদর্শন, ভারতী প্রভৃতি পত্রিকার মতামত সমালোচনা এবং জনমত-গঠন প্রয়াসের কথা ইতিহাসে উচ্চমূল্য লাভ করেছে। যুক্তিতর্কের মাধ্যমে বাঙলার জাগরণকে রূপ দিয়েছিল এই সব পত্রিকা-ই। ফারসি ভাষার পরিবর্তে ইংরেজি ভাষা প্রবর্তনের কালে সমাচার দর্পণ বাংলা ভাষার পক্ষে

জোর সংগ্রাম করেছিল। প্রভাকর সম্পাদক সাজাত্যবোধ ও স্বদেশপ্রেমের বীজ অঙ্কুরিত করেছিলেন সংবাদ-প্রভাকরে স্বদেশপ্রেমমূলক কবিতা লিখে।

ইয়ংবেঙ্গলদের পত্রিকা জ্ঞানান্বেষণ ও বেঙ্গলস্পেক্টরের উদারপন্থী চিন্তা-চর্চার ধারায় পুষ্টি জুগিয়েছে। প্রকারান্তরে এঁরা রামমোহনের ‘চিন্তাধারারই উত্তর-সাহক’।

সোমপ্রকাশ-এর চেতনাধারায় ছিল রাজনৈতিক প্রবণতা। জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকাশের লক্ষ্যে সজ্ঞানে বঙ্কিমচন্দ্র ‘বঙ্গদর্শন’ প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছিলেন। তাঁকে কেউ এ-বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছিলেন কিংবা এ-কাজে নিযুক্ত করেছিলেন, এমন খবর ইতিহাসের জানা নেই। শম্ভুচন্দ্র মুখার্জিকে লেখা ১৮৭২-এর চিঠিতে দেখা যায় এভাবনাটা তাঁর মধ্যে নিজের থেকেই এসেছিল।<sup>১০</sup>

‘বঙ্গদর্শন’ের সূচনায় বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন : ... ‘বঙ্গালী সমাজে ইহা তাঁহাদিগের বিদ্যা, কল্পনা, লিপিকৌশল এবং চিত্তোৎকর্ষের পরিচয় দিক। তাঁহাদিগের উক্তি বহন করিয়া, ইহা বঙ্গ-মধ্যে জ্ঞানের প্রচার করুক। অনেক সুশিক্ষিত বাঙ্গালী বিবেচনা করেন যে, এরূপ বার্ষিকবহের কতকদূর অভাব আছে। সেই অভাব নিরাকরণ এই পত্রের এক উদ্দেশ্য। আমরা যে কোন বিষয়ে, যে কাহরও রচনা, পাঠোপযোগী হইলে সাদরে গ্রহণ করিব। এই পত্র, কোন বিশেষ পক্ষের সমর্থন জন্য বা কোন সম্প্রদায় বিশেষের মঙ্গল সাধনার্থ সৃষ্ট হয় নাই।’<sup>১০</sup>

পত্র-সূচনায় সম্পাদক সুশিক্ষিত, ‘কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ের হস্তে’ বঙ্গদর্শন অর্পণ করবার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন এই কারণে যে, তৎপূর্ববর্তী পত্রিকাসমূহ (‘বার্ষিকবহ’) ‘পাঠোপযোগী’ ছিল না এবং ‘সুশিক্ষিত বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা রচনায় বিমুখ’ ছিলেন। বঙ্গদর্শন-সম্পাদকের তাই ‘প্রথম উদ্দেশ্য’ই হল সুশিক্ষিত বাঙ্গালীর পাঠোপযোগী সাহিত্যপত্রিকা প্রকাশে ‘যত্নবান’ হওয়া। পত্রিকার সামাজিক উদ্দেশ্য ছিল : ‘যাহাতে নব্য সম্প্রদায়ের সহিত আপামর সাধারণের সহায়তা সম্বর্ধিত হয়—সাধ্যানুসারে তা ‘অনুমোদন’ করা।’<sup>১১</sup>

বঙ্গদর্শন বাঙ্গালীর সমাজ, সংস্কৃতি ও মনন সাধনার অগ্রগতিতে যে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিল, তার আদর্শ অনুসরণ-অনুকরণের চেষ্টা যুগে যুগে হয়ে আসছে। কিন্তু যা সম্ভব হয়েছিল বিশেষ দেশকাল ও সমাজ-পরিস্থিতিতে এবং প্রতিভাশ্রেষ্ঠ বঙ্কিমের কারণে, তা আর কোনও যুগে কারো দ্বারাই সম্ভব হয়নি। কিছুটা হয়েছিল ‘ভারতী’ দ্বারা। আর পরবর্তীকালে সওগাত, মোহাম্মদী ও সমকাল-এর মাধ্যমে।

বঙ্গদর্শনের আদর্শ অনুপ্রাণিত উচ্চমানের সাময়িকপত্র-জ্ঞানান্দুর, আর্ঘদর্শন, বাঙ্কব, প্রতিবিশ্ব, ভ্রমর প্রভৃতি প্রকাশের পর উনিশ ও বিশ শতকের অন্যতম প্রধান ও দীর্ঘজীবী পত্রিকা ভারতী (১৮৭৭) প্রকাশিত হয়েছিল সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যুগান্তর সৃষ্টির অভিপ্রায় নিয়ে। বঙ্গদর্শন চার বৎসর চলে বন্ধ হয়ে সঞ্জীবচন্দ্রের (১৮৩৪-৮৯) সম্পাদকত্বে পুনঃপ্রকাশিত হলেও হৃতগৌরব আর ফিরে পায়নি। শেষের দিকে বঙ্গদর্শন হিন্দুধর্মের নতুন ব্যাখ্যা দিয়ে সমাজকে গৌড়ামির দিকে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল।

‘বঙ্গদর্শন’ের এই রক্ষণশীলতা ও গৌড়ামীর বিরুদ্ধে প্রগতিশীল এবং ধর্মে, সমাজে ও সাহিত্যে সংস্কারমূলক চিন্তাধারা প্রচারের প্রয়োজন অনুভূত হইতে থাকে। ১২৮৪ বঙ্গাব্দে

(সঞ্জীবচন্দ্র সম্পাদিত) বঙ্গদর্শন বন্ধ হইবার পর এই নব ভাবধারাকে রূপ দিবার জন্যে ঐ বৎসর শ্রাবণ মাস হইতে ভারতী (১৮৭৭, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদক) প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করে।<sup>১২</sup>

সব মিলে ভারতী পত্রিকা উনিশ শতকের শেষার্ধের পরিণততম বাঙালি মনীষার প্রকাশস্থল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ...বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে ভারতীযুগ বলতে বিশেষ সাহিত্যদর্শকেই বুঝিয়েছে যা বাঙালির চিন্তা ও কল্পনার ধারক। বঙ্গদর্শন বলতে যেমন বন্ধিমীচিন্তা ও আদর্শকে বোঝায়—যার অনেকখানি সঞ্চারিত হয়েছে বাঙালি সমাজে, ভারতী বলতে তেমনি ঠাকুর পরিবার তথা রবীন্দ্রীয় চিন্তা ও আদর্শকে বোঝায়—যা বিশেষভাবে ছড়িয়ে পড়েছে বিশ শতকে।<sup>১৩</sup>

সবুজপত্র (১৯১৪) ও কল্লোল (১৯২৩) মাধ্যমে শুরু হয় পালা বদল। সওগাত-শিখা-মোহাম্মদী-গুলিস্তা-বুলবুল-চতুরঙ্গ প্রভৃতি যে ধারার সূচনা করে তাতে সমাজে ঘটে আর এক রূপান্তর। বিশ শতকে যে-এক দল সম্পাদক সাহিত্যপত্রিকা সম্পাদনে ব্রতী হয়ে সমাজ সংস্কৃতি ও সাহিত্য-ভাবনায় মাত্রাযোগের সাধনা করেছিলেন, তাঁরা সকলে সমাজ ও সংস্কৃতির যুগগত চাহিদা বা কালের দাবি সমানভাবে মেটাতে সক্ষম হননি বটে; কেউ কেউ সংরক্ষণশীল ভূমিকা অবলম্বন করে প্রগতিবাদীদেরকে তীক্ষ্ণ-তীব্র কটাক্ষ ও বিদ্রপও করেছেন। কিন্তু এতে প্রকৃতপক্ষে প্রগতিবাদীরা আরও বেপরোয়া হতে পেরেছেন বলে খুব ক্ষতি হয়নি। স্ফুলিঙ্গ জ্বালার জন্য প্রয়োজনীয় সংঘর্ষ সৃষ্টি করে পরোক্ষভাবে তাঁরাও কালের সঠিক মাত্রাকে ছুঁয়ে যেতে সহযোগিতা করেছেন।

‘শনিবারের চিঠি’, (১৯২৪) ও ‘মোহাম্মদী’ (১৯২৭) ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত উনিশ শতকের রক্ষণশীল সমাচার-চন্দ্রিকা (১৮২২)-র ন্যায় সংরক্ষণকারি ছিল; কিন্তু তাঁরাও সমাজের মঙ্গল চিন্তা থেকেই কথাগুলো বলতেন, কাজ করতেন, মনে রাখতে হবে। অমঙ্গল তাঁরাও চাইতেন না। কিন্তু পরিবর্তনে ভয় পেতেন। মেধার সীমাবদ্ধতা এবং সৃজনক্ষমতার অভাবও তাঁদের ছিল। কিন্তু বাদ-প্রতিবাদে অংশ নিয়ে প্রগতিপন্থীদের চিন্তা ও কর্মে প্রেরণা দিয়ে প্রাণ-রস-সঞ্চার কিংবা উস্কানি প্রদান করে পরোক্ষভাবে তাঁরাও সামাজিক ক্রিয়াকর্মে, অগ্রগতির বিতর্কে ভূমিকা পালন করেছিলেন। ফলে উনিশ ও বিশ শতকের পত্র-পত্রিকার ইতিহাসে সমাচার-চন্দ্রিকা, শনিবারের চিঠি ও মোহাম্মদী প্রভৃতি পত্রিকার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে উপস্থাপিত ও আলোচিত হয়ে থাকে।

ভারতীর পরে বিশ শতকের সাহিত্য ও সংস্কৃতি ভাবনায় প্রগতিশীল ধারার নেতৃত্ব দান করে ‘সবুজপত্র’ (১৯১৪), ‘কল্লোল’ (১৯২৩), ‘সওগাত’ (১৯২৬), ‘শিখা’ (১৯২৭), বুলবুল (১৯৩৩) প্রভৃতি পত্রিকা। তবে বিশ শতকের গোড়া থেকে প্রথম সারির একগুচ্ছ সাহিত্য-পত্র সমাজ, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের অগ্রগতির সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছিল। বঙ্গদর্শন, ভারতী, সবুজপত্র, কল্লোল-শিখার ধারাকেই এরা পুষ্ট দান করেছিল এবং এর পরও দুই বাঙলায় অনেক উন্নত মানের সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে এবং হচ্ছে। এদের প্রধান প্রশ্ন এবং প্রকাশের নেপথ্যে প্রেরণা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংকট



মোকাবেলা করা এবং মানব সমাজের সমৃদ্ধির সাধনার সঙ্গে কিভাবে একাত্ম হওয়া যায়— তার পথ খুঁজে বের করা।

১৯৪৭ পূর্ববর্তীকালে বাঙালির সমাজ ও সংস্কৃতির প্রশ্নকে উচ্চকিত করে যে সমস্ত পত্রিকা খ্যাতি অর্জন করেছে (প্রগতিপন্থীগুলোর ভেতর) তার মধ্যে প্রবাসী (১৯০১) ; বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা (১৯১৮) ; মোসলেম ভারত (১৯২০) ; সাম্যবাদী (১৯২৩) ; কালি-কলম (১৯২৭) ; সওগাত (নবপর্যায়ে ১৯২৬) ; ধূপছায়া (১৯২৭) ; মোয়াজ্জিন (১৯২৮) ; পরিচয় (১৯৩১) ; গুলিস্টা (১৯৩২) ; অগ্রগতি (১৯৩৫) ; চতুরঙ্গ (১৯৩৮) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

বলাবাহুল্য পুরোভাগে থেকে এইসব পত্রিকা আরও শত শত সাহিত্য-পত্রিকার পথ প্রদর্শন করেছে। এই সমস্ত সাহিত্য পত্রিকা প্রাণরস আহরণ করেছে আবহমান বাঙলার প্রধান মনীষীদের চিন্তা ও কর্ম থেকে। সাহিত্য-সম্পদ গ্রহণ করেছে জয়দেব, বিদ্যাপতি, ভারতচন্দ্র, মধুসূদন, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রমুখের কালজয়ী ক্লাসিক সৃষ্টিসম্ভার থেকে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্ব সাহিত্যের প্রাণ সম্পদ ও প্রাণ স্পন্দনও তাঁরা স্বীকার করে নেন। ফলে চিন্তা-চেতনায় ঘটে বিপ্লব। রবীন্দ্র-পরবর্তীকালে সাহিত্যের নতুন সুরটি বেঁধে দেন প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬)।

আলো ও আঁধারের রহস্য-মিতালীর মধ্যে একটি বিদ্যুৎ-ঝলকের মতোই প্রমথ চৌধুরী বাঙলার সাহিত্যাকাশে আবির্ভূত হয়েছিলেন। ডক্টর অজিত কুমার ঘোষ লিখেছেন : ‘আমাদের জলভারানত নিবিড় মেঘাচ্ছন্ন সাহিত্য-জীবনের মধ্যে এই বিদ্যুৎ ঝলক এক তীব্র জ্বালাময় জ্যোতির প্রকাশ ঘটালো। তাতে জীবনের পুঞ্জিভূত বেদনা ও মদির বিহ্বল স্বপ্ন মুহূর্তের মধ্যে স্বচ্ছ লঘু ও তরল হয়ে গেলো।’<sup>১৪</sup> এই কর্মে ‘সবুজপত্র’ তাঁর হাতিয়ার হয়েছিল।

সবুজপত্রের প্রকাশ প্রথম মহাযুদ্ধের (১৯১৪) সমকালে। এর পূর্বেই সমগ্র বিশ্বসাহিত্যে একটি নতুন জীবন-জিজ্ঞাসা, সমাজ-চেতনা, প্রচলিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদ ধুমায়িত হয়ে উঠেছিল। যুদ্ধ ও যুদ্ধপরবর্তী বিদ্রোহী চিন্তা বাংলা সাহিত্যে সবুজপত্রের মাধ্যমে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছিল বলে কালের দিক থেকে এই পত্রিকার ঐতিহাসিক মূল্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রমথ চৌধুরী ‘যৌবনে দাও রাজটীকা’ শীর্ষক প্রবন্ধেও লিখেছেন :

সমাজে নতুন প্রাণ, নতুন মন, নীত্য জন্মলাভ করেছে। অর্থাৎ নতুন সুখ-দুঃখ, নতুন আশা, নতুন ভালবাসা, নতুন কর্তব্য ও নতুন চিন্তা নীত্য উদয় হচ্ছে। সমগ্র সমাজের এই জীবনপ্রবাহ যিনি নিজের অন্তরে টেনে নিতে পারবেন, তাঁর মনের যৌবনের আর ক্ষয়ের আশঙ্কা নেই। এবং তিনিই আবার কথায় ও কাজে সেই যৌবন সমাজকে ফিরিয়ে দিতে পারবেন।<sup>১৫</sup>

এই যৌবনাবেগে উদ্দীপিত হয়েই সবুজপত্র সেদিন প্রচলিত নীতি, সংস্কার ও জীবন বোধের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জানিয়েছিল। পরবর্তী কল্লোলযুগে সমাজ-বিপ্লব যে বহুসংস্কার

আকারে ছড়িয়ে পড়েছিল, তার সৃচনা হয়েছিল এই সবুজপত্র থেকে নিক্ষিপ্ত অগ্নিশলাকা থেকে।<sup>১৬</sup>

‘সবুজপত্র’ প্রকাশের পেছনে কোন ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য ছিল না। উন্নত রুচির পত্রিকা বলেই নিয়মিত লেখকের সংখ্যাও বেশি থাকতো না। পত্রিকার জন্য অনেক লোকসান দিয়েও প্রমথ চৌধুরী নিজের রুচি বজায় রেখে দেশের আর পাঁচজনের চিন্তকে জাগাতে এবং সাংস্কৃতিক রুচির আভিজাত্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পত্রিকা প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছিলেন। সবুজপত্র বাংলা গদ্যরীতির প্রচলনের বৈপ্লবিক কর্মও সাধন করেছিল। পত্রিকার নাম এবং মলাটের সবুজরঙেও তারুণ্য ও প্রাণধর্মের প্রতীকী নির্দেশ করত। সম্পাদকীয় (‘সবুজপত্র’ শীর্ষক রচনা)-তে প্রমথ চৌধুরী লিখেছিলেন : ‘আমাদের কর্মযোগীরা আর জ্ঞানযোগীরা ... আমাদের মনকে রাতারাতি পাকা করে তুলতে চান। ...এরা ভুলে যান যে জোর করে পাকাতো গিয়ে আমরা শুধু হরিৎকে পীতের ঘরে টেনে আনি, মৃত্যুকে যেন প্রাণের দারস্থ করি।

তাই তারুণ্যের জয়ধ্বজা তুলে জীবন সমালোচনা দিয়ে শুরু করে জীবনের দুর্লক্ষণগুলোকে আঘাত হেনে সবুজপত্র পত্রিকার লেখকগোষ্ঠী যুগের প্রধান দাবি মেটালেন। জীবনের উচ্ছ্বসিত প্রকাশ আচারের বেড়া জালে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। কাজেই সবুজপত্রের বিদ্রোহ, জীবন-সংগ্রামেরই অন্য নাম। প্রচলিত ব্যবসায়িক পত্রিকার মতো বিজ্ঞাপন ছবি আর ফিচার কিছুই থাকত না তাতে। কারণ সাধারণের উদ্দেশ্যে এই পত্রিকা পরিকল্পিত ও প্রকাশিত হয়নি। যুদ্ধ ও যুদ্ধ পরবর্তীকালের যে নতুন চিন্তাধারা বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকে আঘাত হানছিলো, প্রবেশের দ্বার খুঁজছিলো—তাকে দেশীয় রীতিতে মিলিয়ে দেওয়াই ছিল সবুজপত্রের উদ্দেশ্য। বক্তব্য ও বলার ভঙ্গীতে নতুনত্ব সৃষ্টি উভয়ই ছিল তার বৈশিষ্ট্য। এতে সাহায্য করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এবং ফরাসি সাহিত্য, ভারতচন্দ্রের কাব্য, কৃষ্ণনাগরিক সংস্কৃতি আর প্রাচীন ভারতের পৌরাণিক শাস্ত্র-সাহিত্যের টীকা-ভাষ্যকারদের সাহিত্য-সম্পদ থেকে প্রমথ চৌধুরী আত্মীকৃত করেছিলেন মুক্তিবাদ, ভাষার সংহতিগুণ, বুদ্ধির আধিপত্য এবং বাক-নৈপুণ্য প্রভৃতি।

সমালোচকেরা এজন্যই লিখেছেন সব্যসাচী প্রমথ চৌধুরীর ‘গাণ্ডীব’ ছিল সবুজপত্র। সবুজ-সভার সভ্যরা হচ্ছেন পাণ্ডব-সেনার দল। বাংলা সাহিত্যে ‘বীরবলী যুগ’ বা ‘বীরবলীচক্র’ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সবুজপত্র ছিল মাধ্যম। সমসাময়িক এবং নিকট আত্মীয় হয়েও প্রমথ চৌধুরী রবীন্দ্রনাথের সর্বগ্রাসী সর্বাশ্রয়ী সম্ভবপর প্রভাব থেকে ‘মুক্ত ছিলেন’।<sup>১৭</sup>

আরও লক্ষণীয় ‘... সবুজপত্রের মানসিকতা দেশজ মানসিকতা নয় ...প্রথম মহাযুদ্ধের কালে বাঙালি পাঠককে তা মুক্তি দিয়েছিল। সে মুক্তি কিসের মুক্তি? রক্ষণশীলতা ও সংকীর্ণতার অন্ধ গৃহা থেকে মুক্তি, জাত্যাভিমান ও শ্রেষ্ঠত্বের অহমিকা থেকে মুক্তি, ভাবালুতা ও উচ্ছ্বাস থেকে মুক্তি।’<sup>১৮</sup>

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমথ চৌধুরীর সংবর্ধনা উপলক্ষে প্রকাশিত ‘প্রমথ চৌধুরীর গল্পসংগ্রহ’ (১৯৪১)-র ভূমিকায় লিখেছেন : ‘সবুজপত্রে সাহিত্যের ... একটি নতুন ভূমিকা রচনা

প্রমথের প্রধান কৃতিত্ব।’ তিনি মানুষের মনকে নিদ্রার অধিকার থেকে ছিনিয়ে এনে জাগিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। কারণ সম্পাদক লক্ষ্য করেছিলেন বাঙালি জাতির সবচেয়ে বড় অভাব হলো মনের ও চরিত্রের। জাতির ‘আত্মহত্যা থেকে রক্ষা’ করার জন্য তাই সবুজপত্র প্রকাশিত হয়েছিল। একটি জাতির জীবনে ‘প্রাণ’ সঞ্চারের দায়িত্ব কাঁধে নিতে অভিলাষী হয়েছিল একটি সাহিত্য পত্রিকা একি কম কথা?

জাতি গঠনে, সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে এবং সমাজ সংস্কারে একটি সাহিত্য পত্রিকা কিভাবে ভূমিকা পালন করে, তা অনেকটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে ‘সবুজপত্রের’ যুগগত বৈশিষ্ট্য ও আরম্ভ কর্ম মিলিয়ে অনুধাবন করলে।

বিশ্বযুদ্ধের ঘটনাচক্রের অন্তর্নিহিত ভাবাবর্তে বাঙালির মনোজগতের ভিত্তিভূমি ধ্বসে গিয়েছিল। এই কারণেই তখন বাঙলাদেশের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হয়েছিল মানসিক সংগঠনের। বর্তমান দুনিয়ার বাতিলকৃত হৃদয়-ধর্মের স্থলাভিষিক্ত বুদ্ধিবাদ, যুক্তিশীলতা এবং ব্যক্তিস্বাভিত্ত্যকে মূলমন্ত্র করে ‘সবুজপত্র ...এই যুগগত বুদ্ধিবাদকে, সর্বাদিক্ষু, মননশীলতাকে বাংলাদেশে প্রচার করেছে। তাছাড়া, বিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের আবিষ্কার হচ্ছে—গণবাদ (গণতন্ত্র), সমাজতন্ত্রবাদ, প্রগতিবাদ, যুক্তিবাদ ও ব্যক্তিস্বাধীনতাবাদ। এর মধ্যে প্রগতিবাদ প্রচারে ‘কল্লোলের’ এবং সমাজতন্ত্রবাদ প্রচারে ‘পরিচয়ের’ কৃতিত্ব অধিক হলেও অন্য তিনটি মতবাদ প্রচারের কৃতিত্ব মুখ্যত সবুজপত্রের প্রাপ্য। তাই সবুজপত্রকে বলা যায় বিংশ শতাব্দীর বাংলার আধুনিকতার অন্যতম বাহক।<sup>১৯</sup> সবুজপত্রের প্রথম সংখ্যায় সম্পাদক ‘ও প্রাণায়স্বাহা’ বলে জাগরণমন্ত্র উচ্চারণ করে এই যাত্রা শুরু করেছিলেন।

বাংলা সাহিত্যে ‘কল্লোল’ (১৯২৩) পত্রিকা সৃষ্টি করেছিলো এক নতুন যুগের। ইতিহাসের পাতায় কোনো-না কোনোভাবে এই যুগ অবশ্যই আলোচিত হয়ে থাকে। কারণ ‘কল্লোল’ তরুণ সমাজকে এতোবেশি আলোড়িত করেছিল এবং প্রাচীন, রক্ষণশীলদের দ্বারা এমন আক্রান্ত হয়েছিলো যে, সমাজ সংস্কৃতি ও মননের ক্ষেত্রে তা ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। যদিও প্রথম সংখ্যাতেই সুনির্দিষ্ট কোনো লক্ষ্য তাঁরা ব্যক্ত করেন নি বা করতে পারেন নি। তবে এ-কথা ঠিক—বঙ্গদর্শন, ভারতী, সবুজপত্র প্রভৃতি পত্রিকার মতো কল্লোল কোনো বিধিবদ্ধ বা পরিচ্ছন্ন চিন্তা কিংবা বিঘোষিত কোনো উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে প্রকাশিত না হলেও, ক্রমান্বয়ে তাঁরা নানাভাবে উদ্দেশ্যকে ব্যক্ত করতে সক্ষম হন। এবং তাতে সাহিত্যসমাজ এক ব্যাপক আলোড়ন অনুভব করে। বিতর্কের ঝড় ওঠে তাঁদের চিন্তা ও কর্ম নিয়ে। ‘মাসিক পত্রিকা কল্লোলের জন্মের বীজ নিহিত ছিলো ফোরআর্চস (১৯২১-২২) ক্লাবের স্বম্পায়ু সত্তার মধ্যে। কল্লোলেরও লক্ষ্য ছিলো শক্তি সঞ্চারের দিকে। ‘জীবনের দুঃখ ঝড় বিচ্ছেদ ...এর ভেতরেই যে জীবনের সম্ভাবনা আছে তা আমরা ভাবতে পারি না বলেই জীবন শুকিয়ে যায়। এ সমস্তগুলির ভেতর থেকে রস সঞ্চয় করে নেওয়াটাই জীবনে আনন্দের কারণ। সেই থেকে শুরু হয় মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে জীবনের জন্ম। তারই মধ্যে সত্যের খ্যাতির, নির্ভীক চিন্তের প্রতিষ্ঠা। কল্লোল এই নির্ভীক চিন্তের বাঁচার মন্ত্র, জীবনের শত দুঃখের মধ্যে প্রাণের সাড়া জাগিয়ে তোলার আদর্শ বাংলাদেশে প্রচার করতে চেয়েছিল।’

সবুজপত্র যেমন ছিল অল্প সংখ্যক প্রজ্ঞাবান শিক্ষিত ভদ্রলোকের পত্রিকা, তেমনি কল্লোলও ছিল ‘পূর্ণবয়স্ক ও চিন্তাশীল পাঠক-পাঠিকাদের জন্য। অল্প বয়স্ক বা যাহারা কিছু পড়িয়া সময় কাটাইতে চান তাহাদের জন্য’ কল্লোল প্রকাশিত হয়নি। আদর্শগত তিনটি চিন্তা—পরিণত সৌন্দর্যের প্রশান্তি, প্রেমের ধ্রুবত্ব ও সৌন্দর্য এবং ‘কামনার অশান্তি ও বেদনা’-র উপর কল্লোলের আগ্রহ ছিল। ‘আরম্ভের দিন থেকেই কল্লোল কর্তৃপক্ষ কাগজটির উদ্দেশ্যকে উচ্চমানের বলেই মনে করতেন। বাংলার জাতি, ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি তাতে ত্বরান্বিত হবে বলে তাঁদের বিশ্বাস ছিল।’

বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক শেষে বাঙলার ভাষা, সাহিত্য ও সমাজের পটভূমিকার এবং জীবনবৃত্তের পরিবর্তন হলো। ‘প্রথম মহাযুদ্ধ অনুকূল সংঘটনে অনেক বাঙালি তরুণের মনে অন্তত তাদের প্রাথমিক চেতনায়, একটা উদ্দাম যৌবন ও বাধাবন্ধনহীন অভিযাত্রার স্পৃহা জাগিয়ে তুলেছিলো। জাতীয় ভাগ্য বা স্বাধীনতা অর্জনের দুর্জয় স্বপ্নাবেগ সৃষ্টি করেছিলো। যুদ্ধোত্তর তরুণ বাংলার মানসলিপির এই সংকেত সাহিত্যের মোড় ফেরার প্রয়াসে একটা নির্জর সত্য হিসেবে আজও স্মরণীয়।’<sup>২০</sup>

কারণ, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ইউরোপের মানসভাণ্ডারে জমিয়ে তুলেছিলো যে হতাশ্বাস, নৈরাশ্য, শূন্যতাবোধ ও বিষাদ চেতনা তা ভালোর দিকের সঙ্গে বাঙলার শিক্ষিত তরুণদের মনেও আঘাত হেনেছিল। তাছাড়া যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর ভূগোলে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার উদ্ভব (১৯১৭-২১) শুমু রাজনৈতিক ও সামাজিক বিপ্লবের বাস্তব দৃষ্টান্ত হিসেবে নয়, বাঙালির চিন্তা অনুভূতি ও চেতনার ভিতকেও একেবারে বদলে দিতে উদ্যত হলো। কিন্তু এই বিপ্লবের আদর্শে সাধারণ শ্রমিক জনতার জীবনের বহুকৌণিক সমস্যার গভীরে মানবিক অনুপ্রবেশের ক্ষমতা বেশির ভাগ তরুণের মন-মনন-বোধ ও চেতনাতে ছিল না। কল্লোলে সমাজতন্ত্র ও মার্কসীয় লেখা প্রকাশের ফলে সমাজ-মানসে প্রগতিবাদী ধারণার প্রসার ঘটেছে। মার্কসীয় সমাজতান্ত্রিক ধারণার চর্চার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের মধ্যে আরও কিছু সমাজ-দর্শনও কৌতূহলের সৃষ্টি করে। তবে ‘ফ্রয়েডীয় গবেষণা ও মনস্তত্ত্ব তরুণ দলের মনকে আকর্ষণ করলো সবচেয়ে বেশি। সেই মনস্তাত্ত্বিক আলোক-সম্পাতের ফলে স্বপ্নের আকাশ নতুন অর্থ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করলো ; নারী-পুরুষ, জননী-সন্তান, দেহ-মন, প্রেম-কাম ইত্যাদি সম্পর্কে পুরনো ধারণাগুলি একেবারে পাল্টে গেলো।’

ফ্রয়েডীয় চর্চা কল্লোলগোষ্ঠীর তরুণদের মনে আলোড়ন সৃষ্টি করার ফলে অতঃপর এই ধারায় কল্লোল পত্রিকা এবং ঐ গোষ্ঠীর লেখকেরা প্রচুর সাহিত্য সৃষ্টি করলেন। আরও বিভিন্ন বিজ্ঞানের চর্চাও তাঁরা করেছিলেন—সমাজবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব প্রভৃতি। আর বিদেশি সাহিত্যের বিভিন্ন প্রান্তরের প্রতিও দৃষ্টি পড়লো তাঁদের। ফলে, বাঙালির ‘সাহিত্যিক ক্ষুধা বেড়ে গেলো।’ ‘ইংরেজি ও ফরাসি সাহিত্যের বাইরেও যে যুরোপীয় সাহিত্যের এক মহৎ ভাণ্ডার আছে, এ সংবাদ বাঙালি চৈতন্যে নূতন সাজা না জাগিয়ে পারেনি।’ এসবই সম্ভব হয়েছিল কল্লোলের প্রভাবে। গবেষকেরা লক্ষ্য করেছেন :

‘তরুণ বাঙালির মন যুরোপীয় সাহিত্য থেকে যুদ্ধোত্তর কালে পেয়েছিলো মনুষ্যে শ্রদ্ধেয়তা, বাস্তব ও জনগণতান্ত্রিক চেতনা, যৌবন সংলগ্নতাবোধ, মিথুনাসক্তি, প্রেমের মনস্তাত্ত্বিকতা, পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্কের পুনর্বিচারজাত নতুন মূল্যবোধ এবং দুঃখাত্মকতা ও বিষাদচেতনা। আর সেই সব নতুন মত ও পথ তাঁরা বিশেষভাবে দেখতে পেয়েছিলেন ফুবেয়ার, জোলা, ইবসেন, নুট হামসন, গোর্কি, গোগোল, টুর্গেনিভ, চেখভ, ডস্টয়ভস্কি, টলস্টয়, মেটারলিঙ্ক, জোহান, বোয়ার, বেনাভান্তে, জাসিন্তো ইত্যাদির মধ্যে।’

এসব ছাড়াও বাঙালার অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক, সামাজিক পরিস্থিতিতে বাঙালি যুবকদের মধ্যেও ‘অবসাদ, শূন্যতাবোধ ও বিষাদাত্মকতা’ ছড়িয়ে পড়লো। বেকার সমস্যা প্রকট হয়ে উঠলো। মোটকথা কল্লোলের কাল ছিল ‘বাংলাদেশের মোড় ফেরার কাল—জীবন চর্চায় ও মানসিকতায়। গ্রামীণ সুর ছাপিয়ে বড় হয়ে উঠলো সংস্কৃতিতে ‘নাগরিক সুর’। সমাজের কুসংস্কার, অন্ধতা, নিষ্পেষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ধ্বনিত হতে শুরু করলো। এসবই রূপায়িত হলো কল্লোলগোষ্ঠীর লেখকদের রচনায় এবং কল্লোল পত্রিকায়। ফলে বাংলা সাহিত্যে পালা-বদল ঘটাতে তাঁরা সক্ষম হলেন। কল্লোলগোষ্ঠী শূধু সাধারণ মানুষের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন না—তাঁরা দাঁড়ালেন জনগণের সপক্ষে। তাঁদের জীবনের শরিক হয়ে।

সুতরাং কল্লোলগোষ্ঠীর রচনায় জনজীবন নতুন তাৎপর্যে অভ্যর্থিত হয়ে ভবিষ্যতের প্রান্তরে ছড়িয়ে পড়লো বিচিত্র ভঙ্গিমায়, বিচিত্র বিষয়ে। তাই শূধু সমকালে নয়, কল্লোলোত্তর বাংলা সাহিত্যের মধ্যেও কল্লোলের অবদান নিহিত রয়েছে। বাঙলা ও বাঙালির সংস্কৃতিতে নতুন জীবন চেতনার সঞ্চারণ করেছিল একটি পত্রিকা ‘কল্লোল’।<sup>২১</sup>

সাহিত্যপত্রিকা সমাজ ও সংস্কৃতির অগ্রগতিতে কালে কালে বৈপ্লবিক ভূমিকা যে পালন করে গেছে ইতিহাস তার সাক্ষী। ‘শিখা’ পত্রিকা এবং ‘মুসলিম সাহিত্য সমাজ’ ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে কি রকম আলোড়ন তুলেছিলো সে ইতিহাস আজও সকলের জানা। শিখা গোষ্ঠীর মূলমন্ত্র ছিলো ‘বুদ্ধির মুক্তি’ Emancipation of the intellect। ‘মুসলিম সাহিত্য সমাজ’ (ঢাকা, ১৯২৬) সেই দিনে এই মতবাদ প্রচার করে বাংলার শিক্ষিত মুসলমানদের মন মননের ও যুক্তিবাদের উপরে উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করেছিল, অবশ্যই তা শিখা পত্রিকার মাধ্যমে। কাজী আবদুল ওদুদ লিখেছেন : ‘বাংলার জাগরণের একটি অপেক্ষাকৃত অল্প পরিসর কিন্তু বেগবস্ত ধারা যে এই দল বাঙলার মুসলমানদের মধ্যে অল্প কিছু কালের জন্য (হলেও) প্রবাহিত করতে পেরেছিল সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই।’<sup>২২</sup>

অর্থ ও শিক্ষার অভাবে কুসংস্কার, সামাজিক প্রথা, অতীতমুখীনতা, ললিতকলা বিমুখীনতায় মুসলমান সমাজ যখন বন্ধতায় আবর্তিত হচ্ছিল, মুক্তির বাণী নিয়ে ঢাকার মুসলিম সাহিত্য সমাজ তখন সামাজিক প্রতিরোধ ও লাঞ্ছনা-গঞ্জনাতে ক্রকুটি দেখিয়ে এগিয়ে এসেছিলো সমাজ-সংস্কারের বৈপ্লবিক ভূমিকা গ্রহণ করতে। ফ্রেয়েডীয়ে ও মার্কসীয় মনস্তত্ত্ব সমাজতত্ত্ব ও নরনারীর জৈবিকজীবনের নবতর ব্যাখ্যা ও সম্পর্কের বিবরণ কল্লোল পত্রস্থ করে যেমন ব্যঙ্গ বিদ্রূপ, প্রতিবাদের সস্মুখীন হয়েছিলো, ঠিক তেমনি, প্রায় সমকালে বাঙলা মুসলিম সম্প্রদায়ের এক বিদ্রোহী তরুণ দল ইসলাম, তথা ধর্ম ও জীবনের নানান আবশ্যকীয় বিষয়ের নতুনতর ব্যাখ্যা নিয়ে উপস্থিত হয়ে নিজেদের জীবন বিপন্ন করে তুলেছিলেন।

ধর্মকে তাঁরা জীবনের সহায়ক মতাদর্শরূপে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। মনে রাখতে হবে যে কোনো বিশেষ সমস্যা সম্বন্ধে নয়, মুসলিম সমাজের সর্বব্যাপী সমস্যা নিয়ে ‘মুসলিম সাহিত্য সমাজ’ চিন্তা করেছে। অন্তর্জীবন ও বহির্জীবন, এর মনন ও আচরণ, এর কুসংস্কার, পরিবার জীবন, সামাজিক প্রথা, গোঁড়ামী, অতীতমুখীনতা, পশ্চিমমুখীনতা, ললিতকলাবিমুখতা, শিক্ষা-সমস্যা, কোনো কিছুকেই সাহিত্য সমাজ এড়িয়ে যেতে চাননি। সব কিছু সম্বন্ধে সমকালীন চিন্তাধারার গলদ তাঁরা উন্মোচন করেছেন এবং করেছেন বলেই তাঁরা বৃহত্তর সমাজের অপ্রীতিভাজন হয়েছেন।<sup>২৩</sup>

সাহিত্য সমাজের বিভিন্ন অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধ, অভিভাষণ এবং প্রতিষ্ঠানের কার্যবিবরণী ও কুচিৎপ্রাপ্ত নিবন্ধ আর অন্যান্য রচনা শিখায় ছাপা হত। এটি ছিল একান্তভাবে মতবাদমূলক বার্ষিক পত্রিকা, গল্প উপন্যাস নাটক কবিতা ছাপা হতো না। এর প্রথম সংখ্যা ১৩৩৩ সালের চৈত্র মাসে এবং পঞ্চম ও শেষ সংখ্যা ১৩৩৮ সালে বের হয়েছিল। কিন্তু মাত্র পাঁচটি সংখ্যায় (বার্ষিকী) কর্তৃপক্ষ যে গুরুতর প্রশ্নগুলো উত্থাপন করেন, তাতে ‘শিখা’ ও ‘সমাজ’ যুগান্তর ঘটিয়ে নতুন জীবনে পৌঁছে যাবার স্পর্ধা দেখিয়েছিল। ‘শিখা’ তার সমকালে যেমন বৈপ্লবিক আলোড়ন তুলেছিল, উত্তর কালেও তা বাঙালির উচ্চস্তরের কল্যাণকামী মানবপ্রেমিক প্রগতিবাদী মননে সুদূরপ্রসারী গভীর প্রভাব সৃষ্টি করে গেছে। মুসলিম সমাজের সংস্কৃতি ভাবনা, শিক্ষাচিন্তা ও সাহিত্যচর্চায় শিখাগোষ্ঠী ইতিহাসের মাইল স্টোন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। মাত্র পাঁচটি সংখ্যায় একটি পত্রিকা পূর্ণাঙ্গ জীবনবেদ, সামাজিক চাহিদা এবং ভবিষ্যৎ মুসলিম বাঙালি সম্প্রদায়ের সাহিত্য ভাবনার ক্ষেত্রে যে দিক-পরিবর্তন ঘটিয়েছে এবং দিক-নির্দেশ প্রদান করে গেছে তার তুলনা বিরল।

সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনকার্যে মেয়েদের স্থান গ্রহণের সহায়তার উদ্দেশ্যে ঢাকা থেকে বেরিয়েছিল ‘জয়শ্রী’ (১৩৩৮) সচিত্র মাসিক পত্রিকা। একাধিকবার সরকারি লাঞ্ছনা সয়ে সয়ে অর্ধশতাব্দীকালেরও অধিক বাংলার সমাজ সংস্কৃতি ও সাহিত্যের অগ্রগতিতে ‘জয়শ্রী’ও এক অনবদ্য ভূমিকা পালন করে। ‘জয়শ্রী’ পত্রিকায় (১৩৫৩, ফাল্গুন) সম্পাদিকা ‘জয়শ্রীর বলবার কথা কী?’ প্রসঙ্গে বলেছিলেন : ‘সর্বধ্বংসী পরাধীনতার বিরুদ্ধে ; সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জয়শ্রী করে চলেছে আপোষহীন সংগ্রাম ... সমাজব্যবস্থার বিভিন্ন দিক নিয়ে, তার রাষ্ট্রিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক রূপ নিয়ে জয়শ্রীর ধারণা ও পরিকল্পনা ক্রমশ -তার পাতায় প্রকাশ পাবে।’<sup>২৪</sup>

কল্লোলোত্তর যুগে ‘পরিচয়’ এবং ‘জয়শ্রী’সহ কতিপয় পত্রিকা মার্কসীয় মতাদর্শ ও মার্কসীয় চিন্তাকে সাহিত্যের মাধ্যমে রূপায়িত করে তার দ্বারা সমাজ-পরিবর্তনের সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিল। ‘পরিচয়’ এর খ্যাতি অনেক, ‘জয়শ্রী’ও বাঙালার সাহিত্য সংস্কৃতি জগতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। রবীন্দ্রনাথ থেকে বাঙালার তাবৎ লেখকই লিখেছেন তাতে। ১৯৩১ থেকে আরম্ভ প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল ধরে এই পত্রিকা বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় প্রকাশনা বলে পরিগণিত হয়েছে। এমন কোনো বাঙালি মনীষীর বা উজ্জ্বল সাহিত্য সেবকের নাম দেখছি না যার কোনো না কোনো রচনা এই ‘জয়শ্রী’র কোনো না কোনো

সংখ্যায় অন্তর্ভুক্ত হয়নি। বৈপ্লবিক সংগ্রামের মধ্যাহ্নকালে, বিশ ও ত্রিশের দশকের সংগ্রামের তেজোদগ্ধ পৌরুষে, সর্বস্বপণ ত্যাগ ও সেবায় মাতৃভূমির শৃঙ্খলমোচনের বৈপ্লবিক কার্যক্রম বেগবান হয়ে উঠেছে—সেই পটভূমিতে লীলাবতী নাগ (পরে রায়) প্রতিষ্ঠিত ও সম্পাদিত জয়শ্রী মাসিক পত্রিকা ১৯৩১ সালের মে মাসে ১৩৩৮ এর বৈশাখে আত্মপ্রকাশ করে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের এই আশীর্বাণী নিয়ে : ‘সংকোচের বিহ্বলতা নিজেদের অপমান/সংকটের কল্পনাতে হয়ো না ম্রিয়মাণ : /মুক্ত করো ভয়/আপনা মাঝে শক্তি ধরো নিজেদের করো জয়।’

পর্যায়ের শৃঙ্খল মোচন এবং সমাজ পরিবর্তন—এই দুই লক্ষ্য সামনে রেখে প্রথম সংখ্যা থেকেই জয়শ্রী নির্ভীক মত প্রকাশের এবং স্বচ্ছচিত্তার স্বাক্ষর রেখেছে...গোড়াতেই স্পষ্টতরভাবে উল্লেখ করেছে : এ পত্রিকার উদ্দেশ্য সর্বপ্রকার দেশ সেবা। এইরূপ আদর্শকে সামনে রেখে খুব কমসংখ্যক সাহিত্যপত্র বলিষ্ঠ পদযাত্রায় উত্তেজিত হয়েছেন। জয়শ্রীর রচনাবলির বিষয়বস্তু জাতীয় জীবনের প্রায় সর্বক্ষেত্রে বিস্তীর্ণ—‘এইসব প্রবন্ধ দীর্ঘকাল আমাদের জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে রাখবে। এসব প্রবন্ধে বাঙালির জাতীয় চরিত্রের অনেক দিক বিধৃত হয়েছে, এমন সব দিক যার মধ্যে বাঙালি ও ভারতীয় ব্যক্তিসত্তার অগ্রগতির রূপ ও শক্তি পরিস্ফুট হয়েছে অথবা নিদেনপক্ষে আভাসিত হয়েছে। ... (জয়শ্রী স্মৃতি) আমাদের চেতনায় নিয়ে আসে বিগত অর্ধ শতাব্দীর ভারতবর্ষে, বিশেষত বাংলাদেশে বহু বিষয়ের জ্ঞানসম্পৃক্ত স্মৃতি : স্বাধীনতার চিন্তা, শিক্ষা-সমাজ-শিক্ষা-বিজ্ঞানের ভাবনা, ভাষা-সমস্যা, নারীর মর্যাদা, বাংলাদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির রূপান্তর এবং বিবর্তন, গণসংগ্রামের প্রয়োজন ও পদ্ধতি, পল্লী সংগঠনের রীতি প্রকৃতি। এই সঙ্গে আমরা তিনটি ব্যক্তিসত্তার ভাস্বর প্রতিকৃতি দেখতে পাই... লীলা রায়, অনিল রায়, নেতাজী সুভাষা।’<sup>২৫</sup>

উপরের আলোচনায় এ কথা সুস্পষ্ট হয়েছে যে, বাঙালার সামাজিক, রাজনৈতিক, সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতির ইতিহাসে সাময়িকী ও সাহিত্য পত্রিকার অবদান অনস্বীকার্য। ব্রজেন্দ্রনাথের পরেও যঁরাই সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করতে কাজে লেগেছেন, তাঁরাই আকর-উৎস হিসেবে বিবেচনা করে সমকালীন পত্র-পত্রিকার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। কারণ পত্র-পত্রিকাই যুগ সমস্যা নিয়ে আলোচনা ও তর্ক বিতর্কের পর নবযুগের দিক নির্দেশ করতে অগ্রসর হয়েছে আগে। ফলে সমাজ, সংস্কৃতি ও রাজনীতি অর্থনীতির প্রশ্ন পত্রপত্রিকার ভূমিকা সর্বাগ্রে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

বিদেশী শাসন থেকে মুক্তির ব্যাপারে, জাতীয়তাবাদের বিকাশে, নানা ধ্যান-ধারণার প্রচারে, সংস্কৃতি ও চিন্তার বিবর্তনে পত্রপত্রিকার ভূমিকা স্পষ্ট হওয়ায় এখন একথা ধ্রুব সত্যে পরিণত হয়েছে যে, বাংলার নবজাগরণের ও সাহিত্য সংস্কৃতির বিকাশের ইতিহাস—বাংলা সাময়িকপত্রেরই ইতিহাস। যঁরা এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন, তাঁরা বাংলা ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, বাঙালার রাজনীতি ও চিন্তাজগতের নেতা, বুদ্ধিজীবী। একথার সমর্থন পাওয়া যায় ব্রজেন্দ্রনাথের উক্তিতেও :

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ, আমাদের সমাজে ইংরেজি শিক্ষা ও ইউরোপীয় প্রভাবের বিস্তার, দেশের তৎকালীন সামাজিক, আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় অবস্থা এবং ধীরে ধীরে তাহার পরিবর্তন, এক কথায় ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি জীবনের সুখ দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, সকল দিক সম্বন্ধেই সে যুগের সংবাদপত্রের মধ্যে বহু অমূল্য উপকরণ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। আবার ঊনবিংশ শতাব্দীতে যাহাদের আবির্ভাবে বঙ্গের ইতিহাস উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল, তাঁহাদের জীবন-চরিত রচনা করিতে গেলেও সমসাময়িক পত্রের মূল্য অপরিহার্য।<sup>২৬</sup>

### ৩. সাহিত্যপত্রিকা, সাহিত্য-আন্দোলন ও সাহিত্যিক-গোষ্ঠী

সাহিত্যপত্রিকার মাধ্যমে সাহিত্যের অগ্রগতি তথা বিকাশ ঘটে ; কিন্তু পত্রিকাটি যদি কোনো গোষ্ঠীবদ্ধ সাহিত্যকর্মীদের যৌথ-প্রয়াস হয়, তাহলে সেই পত্রিকায় যেরূপ প্রাণ-প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়, কোনো একক ব্যক্তির রুটিন মাসিক কমাশিয়াল পত্রিকায় অনুরূপ প্রায় সম্ভব হয় না। কোনো একদল কর্মী বা সভ্য কিংবা সদস্য অথবা সতীর্থ-সম্মিলন হলেই, তা রূপ নেয় গোষ্ঠী কিংবা পরিষদে। এই পরিষদ, 'আড্ডা', 'সভা', 'চক্র' বিভিন্ন নামে চিহ্নিত হতে পারে—কিন্তু মূল অর্থ একই। আসল কথা হলো, 'কোনো পত্রিকাকে আশ্রয় করে সাহিত্যিকদের একটি 'আড্ডা', না জন্মে উঠলে সে-পত্রিকাও জন্মে ওঠে না। নতুন ক্ষমতামালী লেখকদেরও সন্ধান পাওয়া যায় না।<sup>১৭</sup>

এই কাজে উপযুক্ত নেতার দরকার হয়। পত্রিকার সম্পাদকই হন সভার সংগঠক। সংগঠনশক্তি, সম্পাদকীয় দক্ষতা, স্বকীয় সৃষ্টিসম্ভব প্রতিভা, আর্থিক পরিকল্পনায় সিদ্ধহস্ততা যদি থাকে কোনো উদ্যোক্তার, তাহলে তাঁর নেতৃত্বে সবকিছু মিলে একটি লেখক-গোষ্ঠী একপ্রাণ হয়ে কোনো মহৎ-উদ্দেশ্যে একটি পত্রিকা চালিয়ে যেতে পারলে, তার দ্বারা নতুন নতুন সাহিত্য-আন্দোলন সৃষ্টি করা সম্ভব হয়ে থাকে। তাই এই বিষয়গুলো পারস্পরিক আপেক্ষিক সম্পর্কে সম্পর্কিত দেখা যায়। আর যে ক্ষেত্রে এইসব গুণ একত্র হতে পেরেছিল, তাঁদেরই পক্ষে কোনো সাহিত্য পত্রিকা নিয়মিত কিছুদিন চালিয়ে জন্ম দেয়া সম্ভব হয়েছে কোনো সাহিত্য আন্দোলনের।

প্রসঙ্গক্রমে বিংশ শতাব্দীর প্রথম বৈপ্লবিক সাহিত্য-পত্রিকা 'সবুজপত্রের' (১৯১৪) কথাই প্রথমে উল্লেখ করা দরকার। এর সম্পাদক প্রথম চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬) নিজে প্রচুর লিখেছেন, সবুজপত্র ছিল তাঁর প্রধান কীর্তি। কিন্তু শুধু পত্রিকা সম্পাদনাই তাঁর প্রধান কীর্তি নয়, 'সবুজ সভা' পরিচালনার যোগ্যতা ও সার্থকতাও ইতিহাসে স্মরণীয় ঘটনা। সমভাব ও সম-আদর্শে বিশ্বাসী একটি সাহিত্যিক-গোষ্ঠী গঠন করে সাহিত্যের ইতিহাসকে নতুনপথে নিয়ে যাবার অভিপ্রায়কেও পত্রিকা-সম্পাদনা বোঝায়। এ জাতীয় কাজকে রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১) বলেছেন 'সাহিত্যের কর্মকাণ্ড'।

একাজের জন্য বিশেষ একটি শক্তির প্রয়োজন হয় এবং সে-শক্তি খুব সুলভও নয়। 'আর এই কাজ যিনি সুষ্ঠুভাবে করিতে পারেন তিনি সাহিত্যের একটি মহৎ উপকার সাধন করেন।'<sup>১৮</sup>

প্রথম চৌধুরী প্রকৃতিতে মজলিশী মানুষ ছিলেন। 'কমলহীরে বিদ্যা আর তার দ্যুতি কালচারের সম্বল নিয়ে তাঁর 'কমলালয়ে' সাহিত্য মজলিশও গড়ে উঠলো। এই মজলিশের যজ্ঞেশ্বর ছিলেন তিনি স্বয়ং—আর তাঁর উত্তর-সাধক ছিলেন অতুলচন্দ্র গুপ্ত, ধূজটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, কিরণশংকর রায়, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বপতি চৌধুরী, সতীশচন্দ্র ঘটক, হারিতকৃষ্ণ দেব, বরদাচরণ গুপ্ত, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়, সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। প্রতি শুক্তবার সন্ধ্যায় মজলিশটি বসতো ... সকলেরই আপন মত ব্যক্ত



করার ও তর্ক-বিতর্কে যোগ দেওয়ার অবাধ সুযোগ ছিল। তবে সমস্ত বক্তব্যেরই লক্ষ্য থাকতেন প্রমথ চৌধুরী। সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ভাবতত্ত্ব, সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি, ইতিহাস, প্রভৃত্ত্ব ইত্যাদি সব কিছুই আলোচনা সেখানে হতো। আলোচনার লক্ষ্য ছিল—এসব বস্তু যাতে মনকে পুষ্ট ও স্ফূর্তি দেয়, তারা বোঝা না হয়ে উঠে। মজলিশ স্বীকার করে নিয়েছিলো, বিনা বিচারে কোনো কিছু মানা হবে না। বুদ্ধিতে যা বাধে তাকে অগ্রাহ্য করতে হবে, তার সমর্থনে যত বড়ো নামই থাকনা কেন।<sup>১২৯</sup>

পত্রিকার লেখাগুলোর মধ্যে যে সজীব, যুক্তিশীল অভিনব চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়, তাতে সবুজপত্রীদের গোষ্ঠীগত সমধর্মিতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এই পত্রিকার সংগ্রামী চরিত্র ও অখণ্ড সুরের কথা মনে করিয়ে বুদ্ধদেব বসু মন্তব্য করেছিলেন : তাতে বিদ্রোহ ছিলো, যুদ্ধ ঘোষণা ছিলো, সে সঙ্গে ছিলো গোষ্ঠীগত সৌম্য। ...যেখানে সমধর্মীরা পরস্পরের মনের স্পর্শে বিকশিত হয়ে ওঠেন, তাকেই বলে গোষ্ঠী। সেটা যখন ঘটে তখনই কোনো পত্রিকায় সবুজপত্রের মতো সুরের ঐক্য দেখা দেয়, চরিত্রের অমন অখণ্ডতা, প্রকাশের অমন প্রথামুক্ত নির্ভয় ভঙ্গি। ...যে সংখ্যায় বহুলোকের লেখাও বেরিয়েছে, সেটিও রূপ নিয়েছে সম্পূর্ণ একটি রচনার ; অর্থাৎ সেই বছর মধ্যে দপ্তরির সুতো ছাড়াও আন্তরিক একটি সম্বন্ধ থেকে গেছে। এই অখণ্ডতা গোষ্ঠীসাপেক্ষ, তাই গোষ্ঠী ছাড়া সাহিত্যপত্র হয় না।<sup>১৩০</sup>

প্রথম চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য সবুজপত্রীরা নতুনভাবের নতুন ধাচের সাহিত্যের কথা শুধু পাঠককে শুনিয়ে গেলেন না, নিজেরা লিখে তার পরিচয় দিয়ে গেলেন। অভিনবকে শুধু তত্ত্বে নয়, বাস্তবে দেখিয়ে গেলেন। প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, ধূজটিপ্রসাদ, অতুলচন্দ্র, বরদাচরণ, সুনীতিকুমার, কিরণশঙ্কর, সতীশ ঘটক, সুরেশ চক্রবর্তী, হাযীকেশ সেন ; গল্পে রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, সুরেশ চক্রবর্তী, বীরেশ্বর মজুমদার ; কবিতায় রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, কাস্তিচন্দ্র ঘোষ, অমিয়চক্রবর্তী, সুরেশ চক্রবর্তী প্রমুখ যে সৃজনশীলতার পরিচয় দেন, তা সবুজপত্রেরই পরিচয়।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রধান স্রষ্টা রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীরও এই গুণ ছিল। এই গুণযোগে বহুলোকের সমবায় ঘটিয়ে তিনি সাহিত্য পরিষদ গড়ে তুলেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রে এই শক্তি প্রচুর পরিমাণে ছিল। যার ফলে দেখা যায় সমভাবাপন্ন একটি সাহিত্যিক গোষ্ঠী গঠন করে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা তিনি সম্পাদনা ও প্রকাশ করেছিলেন।<sup>১৩১</sup> সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র যা করেছিলেন, তার আদর্শ এযুগেও কিছু কিছু অনুসৃত হচ্ছে বলেই সাহিত্যপত্রিকা দাঁড়াতে পারছে ; সাহিত্য-আন্দোলনও সৃষ্টি হয়েছে।

বঙ্গদর্শনের সম্পাদকের নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্যটি লক্ষ্যযোগ্য : বঙ্গদর্শনে উপন্যাস লিখতেন বঙ্কিমচন্দ্র, কবিতা লিখতেন হেমচন্দ্র, প্রবন্ধ লিখতেন বঙ্কিমচন্দ্র, রামদাস ঘোষ, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, জগদীশনাথ রায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার। তাছাড়া আরও কেউ কেউ লিখেছেন। ড. শশীভূষণ দাশগুপ্ত 'বঙ্গদর্শনের লেখক' হিসেবে যাদের নাম উল্লেখ করেছেন তাঁদের মধ্যে (উপরোক্তদের বাদ দিয়ে) আছেন বঙ্কিমের অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র, চন্দ্রনাথ বসু, যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, পূর্ণচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।<sup>১৩২</sup>

বঙ্গদর্শনে তখন লেখকদের নাম থাকত না। অনেক লেখকের, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, সমাজ, শিক্ষা এবং সংস্কৃতি বিষয়ক বিবিধ প্রবন্ধ বঙ্গদর্শনে ছাপা হয়েছে। লঘু-গুরু বহু সাহিত্যিক প্রবন্ধ তাতে রয়েছে। কিন্তু ‘লক্ষ্য করলে দেখা যায় বঙ্গদর্শনের নানা বিষয়ের লেখার স্টাইল এবং বক্তব্যের মধ্যে ঐক্যের কারণ সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র। পরবর্তীকালে বঙ্কিম সুরেশচন্দ্র সমাজপতিকে বলেছেন যে এ পত্রিকা যখন আরম্ভ হয়, তখন দেশে লেখকের সংখ্যা খুব বেশি ছিল না। একখাটার অর্থ এই যে সাধারণভাবে তথ্য সংগ্রহ করে লিখতে পারে, এমন লেখক হয়তো তখন পাওয়া যেত ; কিন্তু বঙ্কিম যেমন সুগঠিত সুপরিণত ভাবুক লেখকদের প্রয়োজন অনুভব করতেন, তেমন হয়ত খুব বেশি ছিলেন না। ইংরেজিতে উচ্চশিক্ষিত লেখক ছিলেন, তাঁরা বাংলা লিখতে চাইতেন না। বঙ্কিম ইংরেজিতে কৃতবিদ্য ব্যক্তিদের দিয়ে যিনি যে বিষয়ে অভিজ্ঞ তাঁকে সেই বিষয়ে লেখালেন।

বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদক হিসেবে একটি বড় বিশেষত্ব দেখিয়েছিলেন। কে কোন বিষয়ে বাংলায় লিখতে পারবে, তিনি সেই ব্যক্তিকে চিনে নিতে পেরেছেন। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রামদাস সেন, রমেশচন্দ্র দত্তকে তিনিই বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে যান। বঙ্কিম নব্য লেখকদের রচনা নিজে খুব ভালো করে পড়ে ভাষার এবং বক্তব্যের পরিমার্জনা করে দিয়েছেন। এর ফলে বঙ্গদর্শনের ভাষায় এবং দৃষ্টিভঙ্গিতে একটা ঐক্য সৃষ্টি হয়েছিল। বস্তুনিষ্ঠ যুক্তিবাদী চিন্তা, ইতিহাসপ্রীতি, স্বদেশানুরাগ, এবং গদ্যে স্পষ্টতা বঙ্গদর্শনের বৈশিষ্ট্য। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তি লিখেছেন, কিন্তু তাঁরই মধ্যে বঙ্গদর্শনের ভঙ্গি স্পষ্ট হয়ে উঠল। বঙ্কিম নিজে একজন যুগ নায়ক ছিলেন বলেই যুগ ও জাতি চিন্তায় নিজেকে ফেলেছিলেন। যেসব লেখক তাঁকে ঘিরে চাঁক বেঁধেছিলেন সকলের মধ্যেই এই ভাবনাটা তিনি সঞ্চারিত করতে পেরেছিলেন।<sup>৩৩</sup>

বাংলা সাময়িকপত্রের প্রাচীনতর কালে উইলিয়াম কেরী, গুপ্তকবি ঈশ্বরচন্দ্র ও তত্ত্ববোধিনীর নেতৃত্বে সাংগঠনিক কার্যাবলির মধ্যে এই গোষ্ঠী শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। সমভাবাপন্ন পণ্ডিতদেরকে সমসূত্রে স্থাপন করে তাঁরা বাংলা গদ্যের সূত্রপাত করেছিলেন। ঈশ্বরগুপ্ত, দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়দত্ত নিজেদের সজ্ঞানীশক্তি বলে আকর্ষণ করেছিলেন বাংলার শ্রেষ্ঠ লেখক, কবি, ভাবুক ও চিন্তাবিদদেরকে। ভারতী গোষ্ঠীতে যারা ছিলেন তাঁরা বঙ্গদর্শন গোষ্ঠীতে ছিলেন না।

১৮৭৬ এ ‘বঙ্গদর্শন’ প্রকাশ বন্ধ হয়ে গেলে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ি থেকে ভারতী প্রকাশিত হলে আর একটি গোষ্ঠী তৈরি হয়েছিল। ভারতী গোষ্ঠীর বিশেষত্ব ছিল গল্প উপন্যাস কবিতা রচনায়। ‘ভারতী (১৮৭৭-১৯২৩) আগাগোড়া ঠাকুর পরিবার গোষ্ঠীর নেতৃত্বে পরিচালিত হয়েছে। এ কারণেই হয়ত ভারতী গল্প কবিতা প্রভৃতি সৃষ্টিমূলক রচনার একটা নিজস্ব আদর্শ অনুসরণ করে এসেছে। বিংশ শতাব্দীতে ভারতী গোষ্ঠী ছিল একান্তভাবে রবীন্দ্রকব্যাদর্শের অনুগামী। বস্তুত ভারতী ঠাকুর পরিবারে বন্ধ থেকে একটি বিশিষ্ট সাহিত্যাদর্শকে সচল রেখেছে। বঙ্গদর্শনের সমাজকেন্দ্রিক দৃষ্টির পাশে ভারতীর লেখকদের আত্মকেন্দ্রিক সৃষ্টিরসের চর্চা পরের শতকে হয়েছে প্রধান সাহিত্যাদর্শ।<sup>৩৪</sup>

এসবই বাংলা সাহিত্যের মহৎ ঘটনা, ইতিহাসের প্রধান-প্রধান স্তম্ভ।

‘সাহিত্য রচনার গৌরবের অপেক্ষা সাহিত্য-ঘটনার গৌরব লঘুতর নয়, অনেক সময়েই গুরুতর। এই গৌরবের আসনে বাংলা গদ্যের ঘটয়িতা উইলিয়াম কেরি, বঙ্গদর্শন সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রতিষ্ঠাতা রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।’<sup>৩৫</sup>

একাধিক পত্রিকার সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ, সবুজপত্রের সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী প্রমুখের সঙ্গীরাপে বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে আরও অনেক সংঘটক, সম্পাদক ও সাংস্কৃতিক নেতৃত্বের উদ্ভব হয়েছে। ‘কল্লোলযুগের’ অথবা ‘কল্লোল-গোষ্ঠীর’ তথা ‘কল্লোলের বিশ্বকর্মা’ দীনেশরঞ্জন দাশ, ঢাকার ‘শিখাগোষ্ঠী’ (বা ‘মুসলিম সাহিত্য সমাজের’)র কর্মযোগী আবুল হুসেন এবং কাজী আবদুল ওদুদ; ‘প্রগতি’ ও ‘কবিতার’ নেতা বৃহদেব বসু, ‘পরিচয়ের আড্ডা’ এবং ‘পরিচয়’ পত্রিকা, আশু চট্টোপাধ্যায়ের ‘অগ্রগতি’র সাহিত্যিক আড্ডা এবং তাঁর পত্রিকা ‘অগ্রগতি’র প্রকাশ; ‘সংগাত সাহিত্য মজলিশ’ ও ‘সংগাত’ পত্রিকা এবং মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন; ‘মোয়াজ্জিন’ পত্রিকা ও ‘খাদেমুল এনসান সমিতি’ এবং সৈয়দ আবদুর রব; পূর্বশার বৈঠক, মোহাম্মদী-আজাদ-গ্রুপ ও মৌলানা আকরম খাঁ; এবং পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি; পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ ও পাকিস্তান তমদুন মজলিশ ও ‘সৈনিক’, ‘দ্যুতি’, সংস্কৃতি সংসদ, ‘সমকাল’ পত্রিকা ও সিকানদার আবু জাফর; ‘কণ্ঠস্বর গোষ্ঠী’ প্রভৃতির রসতত্ত্ব থেকে উর্গানাভের সাহিত্যের জাল তৈরি করেছেন আড্ডা-রসিক মন।

এইসব আড্ডায় জন্ম নিয়েছে বাংলার সুখ্যাত এই সাহিত্য পত্রিকাগুলো এবং পত্রিকা-কেন্দ্রিক সাহিত্য সৃষ্টির সুফল যে কতো বিরাট তা এক কথায়ও বোঝা যায়, তাহলে প্রতিষ্ঠিত লেখকদের প্রাতিষ্ঠানিক পত্রিকায় নতুন লেখকদের মৌলিক ভাবনা, স্বাধীন চিন্তা এবং নব্যতর আঙ্গিক যেক্ষেত্রে স্বীকৃত হয় না, সেক্ষেত্রে নতুন নবীন উৎসাহী সাহিত্যিকর্মীদের নিজেদের পত্রিকায় তাঁরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আত্মপ্রকাশের পথ পান। এই পথ না-পেলে বাঙলার অনেক বড় কবি, লেখক, সাহিত্যিকের আবির্ভাব (হয়ত) ঘটতেনা। বিকশিত হতো না নতুন সাহিত্য, নতুন আইডিয়া, নতুন চিন্তা ও নতুন শিল্প প্রকরণ।

উনিশ শতক থেকেই দেখা যায় কোনো-না-কোনো বিশেষ আড্ডায় জন্ম হচ্ছে কোনো বিশেষ সাহিত্য পত্রিকার এবং তাকে অবলম্বন করেই বাংলা সাহিত্য গড়ে উঠেছে; চিন্তাধারা বিকশিত হচ্ছে। তবে যখনই কোনো পত্রিকা দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে বা প্রতিষ্ঠানে রূপ গ্রহণ করেছে, তখন তার চরিত্র পাল্টে গেছে। কারণ প্রতিষ্ঠিত সাহিত্য পত্রিকা বিরাট স্টাবলিশ্‌মেন্টের শর্তে জড়িত হয়ে পড়ায় বিনিয়োগ ও পুঁজির সাথে সাথে পুঁজিপতি বিনিয়োগকর্তার স্বার্থে ব্যবহৃত হয়ে সৃজনশীলতা ধ্বংস হয়ে গেছে। সেক্ষেত্রে চালচলোহীন লিটল ম্যাগাজিনই সাম্প্রতিক কালে আধুনিক চিন্তার বিকাশের প্রধান দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। যা কেউ বলতে বা প্রকাশ করতে সাহস করেন না বা করছেন না, তাই বলেন এবং করেন লিটল ম্যাগাজিনের তরুণ সম্পাদক ও নবীন লেখকেরা। এঁদের কখনো প্রয়োজনা করেন শুব্বুদ্ধি সম্পন্ন প্রবীণেরা; কোনো কোনো প্রগতিশীল আদর্শনুসারী মুক্তবুদ্ধির ধারক, বাহক,

প্রচারক সাহিত্যিক সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী রাজনৈতিক আড্ডা বা 'ব্যক্তিত্ব'। এইসব আড্ডার উপর ('পরিচয়ের আড্ডা') পুস্তক লিখিত হয়েছে। অবশ্য এ কথাও স্মরণযোগ্য যে, সাময়িক পত্রিকাগুলো অনেক সময় যেমন একটা সাহিত্যিক আড্ডা বা সঙ্ঘ গড়ে তুলে সাহিত্য সৃষ্টিতে উৎসাহিত করে—অন্যদিকে আবার সে সাময়িক সাহিত্যই গড়ে তোলে। যথার্থ, মহান, ক্লাসিক সাহিত্য তাঁরা উত্তেজনাবশে সৃষ্টিতে মন দেন না। সাহিত্য ও সাংবাদিকতার পার্থক্যহেতু সাময়িক পত্রিকা অনেক ক্ষেত্রেই 'সাহিত্য' সৃষ্টি করতে পারে না।

যে সাহিত্য চিরস্থায়ী নয়, তাই সাংবাদিক রচনা। যে সাংবাদিক রচনা টেকে তাই—ই 'সাহিত্য'।<sup>৩৬</sup> অবশ্য সাংবাদিক সাহিত্য মর্যাদায় নগণ্য হলেও সমাজের চিত্র ও চিন্তাধারার বৈচিত্র্য এবং গতি-প্রকৃতি নির্দেশেও প্রভূত সাহায্য করে। এদিক থেকে সাময়িক পত্রিকার রচনাগুচ্ছ বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন কালে মূল্য অর্জন করে থাকে। কোনোটা পায় সাহিত্যিক মূল্য, কোনোটা পায় সামাজিক বা ঐতিহাসিক কিংবা তথ্যগত মূল্য। একারণে অনেক পত্রিকার অনেক বিজ্ঞাপনও অনেক সময়ে প্রভূত মূল্য পেয়ে থাকে।

### ৪. পাকিস্তান আমলের পত্রিকা-পরিস্থিতি ও প্রধান পত্রিকা

১৯৪৭-এর পূর্ববর্তীকালে সাহিত্য ও সংস্কৃতির রাজধানী ছিল কলকাতা। আধুনিককালে বাঙালার নবজাগরণের সূত্রপাতও কলকাতায়। অতএব প্রধান প্রধান সাময়িকপত্র, সম্পাদক, সাহিত্যিক ও শিল্প-সংস্কৃতি কলকাতাকে কেন্দ্র করেই সৃষ্টি ও পুষ্টি লাভ করেছিল। ঢাকা তখন একটি গুরুত্বপূর্ণ জেলা শহর। বড় বড় জেলা শহরও তখন বেশ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ফলে কলকাতা থেকে প্রধান পত্রিকাগুলো অধিক হারে প্রকাশিত হলেও, বিভিন্ন মফস্বল শহর থেকেও নানান জাতের পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হতো। ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, যশোর, ফরিদপুর, রাজশাহী, সিরাজগঞ্জ, পাবনা, টাঙ্গাইল, কুষ্টিয়া, বগুড়া, বরিশাল, রংপুর, কুমিল্লা প্রভৃতি জেলা মফস্বল শহর থেকেও বৃষ্টিশ-শাসিত ঔপনিবেশিক আমলে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ, সাময়িকী ও সাহিত্যপত্র প্রকাশিত হয়েছে।<sup>৩৭</sup> বিভাগ-পরবর্তীকালে সেগুলোর কোন কোনটার প্রকাশ অব্যাহত ছিল। নতুন পত্রিকাও মফস্বল থেকে প্রকাশিত হতে দেখা যায়। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সম্পাদিত 'তকবীর' (পাক্ষিক ১৯৪৭), দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ সম্পাদিত 'নওবেলাল' (সাপ্তাহিক, ১৯৪৭-১৩৫৪) প্রকাশিত হয় যথাক্রমে বগুড়া ও সিলেট থেকে।

'ঢাকা প্রকাশ' ঢাকা থেকে শতবর্ষ পূর্বেই প্রকাশ পেতো। 'অমৃতবাজার', 'আজাদ' প্রভৃতি দৈনিক পত্রিকার ঢাকাস্থ অফিস এবং ম্যানেজারিয়েল ব্যবস্থা বলবৎ ছিল। 'আইনুল ইসলাম' (১৯২৩) ; 'তরুণপত্র' (১৯২৫) ; 'দরদী' (১৯২৫) ; 'অভিযান' (১৯২৬) ; 'সবুজপল্লী' (১৯২৬) ; 'শিখা' (১৯২৭) ; 'জাগরণ' (১৯২৮) ; 'সঞ্চয়' (১৯২৮) ; 'চাবুক' (১৯৩৩) ; 'জিন্দগী' (১৯৪৭) প্রভৃতি পাক্ষিক, মাসিক, সংবাদ সাময়িকী ও সাহিত্যপত্র ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

সাতচল্লিশ সনে স্বাধীনতা লাভের সময়ে এবং পরবর্তীকালেও চাবুক প্রভৃতি পত্রিকার প্রকাশ অব্যাহত ছিল। অতএব পূর্ববঙ্গ বা ঢাকা থেকে পত্রিকা প্রকাশের ঐতিহ্য দীর্ঘ। কিন্তু উন্নত মানের অথবা সাধারণ মাপের প্রকাশনা সামগ্রীর দুস্শাপ্যতা ছিল। বড় প্রেস ও মুদ্রণশিল্প বলতে তেমন কিছুই ছিল না। প্রকাশনায় বৈচিত্র্য আনার ইচ্ছা থাকলেও উপায় ছিল না।

‘চাবুক’ ১৯৪৭ সনেই বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানায়। চাবুক পাকিস্তান যুগের প্রথম বাংলা সাময়িকপত্র যা ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি ‘পূর্ববঙ্গের জাতীয়তাবাদী সাপ্তাহিক’ ছিল। বিভাগ পরবর্তীকালে সম্পাদক হিন্দু বিধায় ভারতে চলে গেছেন অনুমান করলে পত্রিকা বন্ধের কারণ পাওয়া যায়।<sup>৩৮</sup>

১৯৪৭-৭১ পর্বে ২০১টি মাসিক, ১২৮টি সাপ্তাহিক, ৫৭টি পাক্ষিক ও ২৭টি দৈনিক, ২৭টি ত্রৈমাসিক; ১৪টি দ্বিমাসিক, ১০টি ষষ্ঠমাসিক, ৭টি অর্ধ-সাপ্তাহিক, ৭টি সংকলন, ৬টি বার্ষিকী; চতুর্মাসিক ২টি, মহিলা বিষয়ক ১৭টি, কিশোর পত্রিকা ৩৩টি, বিজ্ঞান বিষয়ক ১৮টি এবং ১১টি ধর্ম বিষয়ক পত্রিকা প্রকাশিত হয়।<sup>৩৯</sup>

রাজধানী থেকে কিছু প্রকাশিত হয়, অধিকাংশই জন্ম নেয় মফস্বলে। জিলা, মহকুমা ও থানা পর্যায় থেকেও প্রকাশিত হয়েছে। রাজধানী থেকে প্রকাশিত প্রথম শ্রেণীর পত্রিকা মাহেনও, দিলরুবা, সওগাত, সমকালই এখন দুস্শাপ্য হয়ে উঠেছে। মফস্বলের সাময়িকীগুলোর তো কোনো কথাই নেই। অধিকাংশ পত্রিকারই দু এক বা দুচার, পাঁচ সংখ্যা সংগৃহীত হয়েছে। বহু পত্রিকার কেবল নাম শোনা যায়। কিছুই জানা যায় না, এমন অনেক পত্রিকাও আছে। কিন্তু তার পরও প্রায় ৫০০ খানা পত্রিকা পূর্ববাংলা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল বলে অনুমান করা যায়। উন্নত মানের কোনো সাহিত্যপত্রিকা এখানে নিয়মিত প্রকাশিত হতে পারেনি। পত্রিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং কারিগরী প্রতিবন্ধকতা ছিল প্রকট। বড় অভাব ছিল ভালো লেখার। লেখক সম্প্রদায় তখন কেবল গড়ে উঠছেন। অথচ হঠাৎ করে অসংখ্য পত্রিকা প্রকাশ পেতে আরম্ভ করলো। এ অবস্থায় নব্য-শিক্ষিত, হাতে খড়ি-দেয়া লেখকদের রচনাতেই ভরে থাকতো তাবৎ পত্রিকা। দুচারজন সম্পাদক উন্নতমানের লেখক নির্বাচন করে ভালো লেখা সংগ্রহ করতে পেরেছেন। ফলে পূর্ববঙ্গে খুব অল্প সংখ্যক পত্রিকাই দাঁড়াতে পেয়েছে। আবার সাম্প্রদায়িক কারণে হিন্দু লেখক ও শিক্ষিত সম্প্রদায় ভারত গমনের ফলে বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হয়। তা পূরণ করতে গিয়ে স্বল্পশিক্ষিত মুসলমান বাঙালি এগিয়ে এসেছেন, কিন্তু সাহিত্যিক স্ট্যান্ডার্ড মান তাঁরা বজায় রাখতে পারেন নি। তা অর্জন করতে সময় ক্ষেপণ করতে হয় অনেক।

পূর্ববঙ্গে বাঙালির ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির মূল্যহীনতা প্রকট হয়ে উঠল, সাহিত্যক্ষেত্রে প্রকৃত সৃষ্টিশীলতা ও জাতীয় অনুভূতির বাস্তবতা যখন অস্বীকৃত হল, তখন, সেই সংকটময় শূন্যতার কালে, পূর্ব বাঙলায় প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছিল সুস্থ মানবিক চিন্তা-ভিত্তিক জাতীয় সংস্কৃতি ও জাতীয় সাহিত্য চর্চার উপযুক্ত উন্মুক্ত পরিবেশ। সেজন্য দরকার ছিল ভালো সাহিত্যপত্র ও সাময়িকপত্রের। আর সঙ্গীত নৃত্য অভিনয় ও অঙ্কনের বিভিন্ন ধারার

গতিশীল সংস্কৃতি চর্চার অফুরন্ত অবকাশ থাকা দরকার হলেও, সরকারের নিষেধাজ্ঞা ও সাবধানতা এমন পর্যায়ে ছিল যে, বাঙালি সংস্কৃতির চর্চা যে কেউ করতে পারেন, তা ছিল তখন সরকারি বিবেচনায় অসম্ভব ও অভাবনীয়। সরকার-সমর্থক, সাম্প্রদায়িক, উগ্র পাকিস্তানবাদী কবি-সাহিত্যিকেরাও ঘরের শত্রু বিভীষণের মতো জাতীয় স্বার্থের প্রতিপক্ষে দাঁড়িয়ে চরম শত্রুতা ও মুনাফেকি করতে লেগে গেলেন। এমনি এক বন্ধ্যা, সৃষ্টি বিরোধী সামাজিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক পরিস্থিতিতে উত্তরকালের, ১৯৭১ এর স্বাধীনতা সংগ্রামের শক্তি-সহায়ক সাহিত্য সংস্কৃতির পরিবেশ সৃষ্টির জন্য সাতচল্লিশ সন থেকেই কাজ শুরু করেছিলেন একদল কবি-সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিকর্মী।

.দেশের কোনো কোনো অঞ্চলে এই শুববাদীরা সরকারি আদর্শের, সাম্প্রদায়িক চিন্তার, হীন উদ্দেশ্যে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারের এবং বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশের প্রক্রিয়াকে প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে নানান নামের সাময়িকপত্র প্রকাশ আরম্ভ করেছিলেন। তাঁরা কলম ধরেছিলেন প্রগতিশীল মানবতাবাদী নীতি অবলম্বন করে এবং বাংলাভাষার বিকাশের ও বাংলা সংস্কৃতি চর্চার উদ্দেশ্যে। এ ধারাতে প্রথমেই প্রকাশিত হলো—ঢাকার অদূরে নারায়ণগঞ্জ থেকে কার্তিক ১৩৫৪, অক্টোবর-নভেম্বর ১৯৪৭ সনে ‘কৃষ্টি’ নামের একটি মাসিক পত্রিকা। উদ্যোক্তাদের প্রায় সকলেই ছিলেন হিন্দু। সম্পাদনা পরিষদে ছিলেন সুধাংশু রায়, প্রভাত সরকার, সাধন চ্যাটার্জী, ফুলদা রায়, জীবন গোস্বামী প্রমুখ। আর মুসলমানদের ইসলামি প্রজাতন্ত্রে, এক ধর্মজাতির রাষ্ট্রে ভিন্ন মতাবলম্বী লোকদের পক্ষে প্রয়োজনীয় সত্য উচ্চারণে অনেক বাধা ছিল। রাষ্ট্রটি গঠিতই যেখানে মিথ্যা ও বিভ্রান্তির মধ্য দিয়ে, সঠিকতা সেখানে আক্রমণের শিকার হবেই। কাজেই ‘কৃষ্টি’ বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেনি। কালের দীর্ঘপথ পরিক্রমার পর কৃষ্টির মাত্র একটি সংখ্যা এখন পাওয়া গেলেও একাধিক সংখ্যা যে প্রকাশিত হয়েছিল তারও প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না।

একই সময়ে (কার্তিক ১৩৫৪) ‘সীমান্ত’ প্রকাশিত হয় চট্টগ্রাম থেকে মাহবুব উল আলম চৌধুরী ও সুচারিত চৌধুরীর সম্পাদনায়। সম্পাদক ও উদ্যোক্তাদের ঘিরে যে মানবতাবাদী, গণতান্ত্রিক ও সাম্যবাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল আদর্শ, বাঙালির সংস্কৃতি ও সাহিত্যের অখণ্ড অবিভাজ্য ঐতিহ্যের অনুরাগী, সর্বোপরি দাঙ্গাবিরোধী সম্প্রীতির মনোভাব-পুষ্ট সাহিত্য সংস্কৃতি সৃষ্টি হতে লাগলো—তা কালে ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও প্রাধান্য বিস্তার করল। ‘সীমান্ত’ পত্রিকার সম্পাদক মাহবুব উল আলম চৌধুরী ও সহকর্মী সমমনাদের সমন্বয়ে গড়ে উঠা ‘প্রান্তিক নবনাট্য সংঘ’ অনুষ্ঠিত করলে পূর্ববাঙলার প্রথম সাহিত্য সংস্কৃতি সম্মেলন, ১৯৫১ সনের মার্চ (১৬-১৯ তারিখ) মাসে চট্টগ্রামের হরিখোলার মাঠে। এই সম্মেলনের সাফল্য ও আনন্দ উদ্বুদ্ধ করে সংগ্রামী সংস্কৃতি কর্মীদেরকে ১৯৫২ সনে কুমিল্লায়, ১৯৫৪ সনে ঢাকায় এবং ১৯৫৭ সনে কাগমারিতে সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত করতে।

এরপরই ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় অন্যতর একটি প্রধান সাহিত্য পত্র ‘সংকেত’ (১৯৪৮; পৌষ ১৩৫৫; সম্পাদক সিরাজুর রহমান)। এঁরা দাবি করেছিলেন ‘সংকেত’ পূর্ব পাকিস্তানের একমাত্র প্রগতিশীল মাসিক’ পত্রিকা। প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়

ঘোষণায় বলা হয়—‘যাত্রাপথে তলিয়ে দেখতে ইচ্ছে করে বিগত দেড় বছরের খতিয়ান—সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক নতুন দায়িত্ববোধের সূচনা হলো—দেশ ভাগের ফলে বাঙালি মুসলমানদের অধিকাংশই পড়লেন পূর্ব বাঙলার আওতায়। তাদের জীবন ও মননকে ফুটিয়ে তোলা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়লো।’—এইরূপ উচ্চাকাঙ্ক্ষী পত্রিকাটিকে মৃত্যু এসে গ্রাস করে। দ্বিতীয় সংখ্যার পর ‘সংকেত’ আর প্রকাশিত হয় বলে জানা যায় না।

অতপর ফজলে লোহানী (১৯২৮-৮৫) প্রতিষ্ঠিত ‘অগত্যা’ (১৯৪৯) প্রকাশিত হলো। একদল তরুণ ছিলেন লোহানীর সহযাত্রী। ফলে তিন-চার বছর পত্রিকাটি অগ্রসর হতে পেরেছিল। জনপ্রিয়তাও জোটে তাঁদের কপালে। অবশ্য প্রধান, প্রতিষ্ঠিতদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মধ্যেই তাঁদের আলোচিত হবার প্রধান কারণটি খুঁজে পাওয়া যায়। আবদুল গণি হাজারী (১৯২৫-৭৬) এবং মাহবুব জামাল জাহেদী সম্পাদিত সরদার জয়েনউদ্দীন (১৯১৮-৮৬) প্রকাশিত একটি ভালো সাহিত্যপত্র ‘মুক্তি’ (১৯৫০) প্রকাশিত হয়ে মাত্র তিন-চার সংখ্যার পরেই মৃত্যুবরণ করে। চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক ‘পরিচিতি’ (১৯৫১-৫৩) মফিজউল হকের সম্পাদনায় তিন বছর চলে বন্ধ হয়ে যায়। প্রগতিশীল সাহিত্যকর্মী ও চিন্তাবিদ একান্তরের শহীদ ডা. আবদুল আলীম চৌধুরী (১৯২৮-৭১) ও আহমদ কবির সম্পাদিত ‘যাত্রিক’ (১৯৫৩) এর ভাগ্যলিপিও ‘মুক্তি’র অনুরূপ হয়েছিল।

ঢাকা থেকে মহিউদ্দীন আহমদ প্রতিষ্ঠিত ও প্রকাশিত ‘স্পন্দন’ একটি পরিচ্ছন্ন সাহিত্যপত্র ছিল। কিন্তু তাও দুই-তিন বছরের বেশি অগ্রসর হতে পারেনি। মেধাবি সাহিত্যকর্মী, সংস্কৃতি সেবক ড. এনামুল হক তরুণ বয়সে আইউব খানের সামরিক শাসনামলে ‘উত্তরণ’ (১৯৫৮) প্রকাশ করে সকলকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। চারুকলার ব্যাকরণগত মানসম্পন্ন বিচিত্র রঙের চিত্রশোভিত সাহিত্য-পত্র ‘উত্তরণ’ ৩য় বর্ষে পদার্পণ করে আর বের হতে পারেনি। গোয়েন্দা বিভাগ থেকে ‘সম্পাদককে’ চাপ সৃষ্টির মাধ্যমে ‘উত্তরণের’ কঠরোধ করা হলো। ‘নাগরিক’ ১৯৬৪ সনে প্রকাশিত হয়ে বেশ ক’বছর চলে। আর ঐ বছরেই ক্ষীণকায় পত্রিকা ‘পলিমাটি’ প্রকাশিত হয়ে ১৩৭৮ বা ১৯৭১ সন পর্যন্ত ৫টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ/রচনা তাতে প্রকাশিত হয়েছিল। বক্ষ্যা, অন্ধকারাচ্ছন্ন সাহিত্য সংস্কৃতির জগতে উজ্জ্বল আলোক সম্প্রদায়ের প্রয়াসী এইসব সাহিত্য পত্রিকা প্রতিক্রিয়াশীল পত্রিকা গ্রুপের মাত্র একটির সমান আকৃতি-ওজনের হলেও এগুলোর মধ্যেই নবযুগের অতীশ্কা ব্যক্ত হতে চেয়েছিল। বাঙালির চিন্তা তখন গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের আলোকে উদ্ভাসিত হতে চলেছে।

কিন্তু পাকিস্তান সরকারের ক্ষমতাসীনেরা পাকিস্তানকে দীর্ঘায়ু করার উপায় খুঁজছিলেন। তাঁরা পূর্বেছেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন প্রচার মাধ্যমের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য। তাই পাকিস্তানপন্থী ইসলামী পুনর্জাগরণবাদী অথবা ধর্মীয় আদর্শের প্রচারের মুখ্য অস্ত্র রূপে একগুচ্ছ শক্তিশালী পত্রিকার আবির্ভাব ঘটলো, যেগুলো প্রগতিকের রোধ করার জন্য কোমর বেঁধেছিল। এগুলোর মধ্যে প্রথমে বের হয় মোহাম্মদী (১৯২৭-৭০) আল ইসলামী ও (১৩৩৯-৭৮) মাহেনও। সরকারি তথ্যকেন্দ্র প্রযোজিত ‘মাহেনও’ প্রথমে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এবং

পরে অচিরেই ঢাকা থেকে (চৈত্র ১৩৫৫) জোরে সোরে প্রকাশিত হতে আরম্ভ করলো। ঐদেরকে অনুসরণ করলো একগুচ্ছ সাহিত্যপত্র—‘দিলরুবা’ (১৯৪৯) ; ‘নওবাহার’ (১৯৪৯) ; ‘দু’তি’ (১৯৪৯) ; ‘তাহজিব’ (১৯৫০) ; ‘পূর্ববী’, ‘লেখকসংঘ পত্রিকা’, ‘পরিক্রম’, ‘সংলাপ’, ‘উত্তর অনুষা’ প্রভৃতি।

বলাবাহুল্য সরকারি খরচে এবং সরকারি কর্মকর্তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় কিংবা অনুপ্রেরণায় বিচিত্র, শত শত সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক ও বার্ষিক সংকলন এই ধারাকে পুষ্টি জোগালেও শিক্ষিত সমাজে পাকিস্তানবাদীদের ফাঁকি এবং স্বার্থপরতা অচিরেই নগ্নভাবে প্রকট হয়ে উঠলো। ক্রমে এক শ্রেণীর লেখক সম্পাদক পৃষ্ঠপোষক উদারনৈতিক ভাবধারায় বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন। তরুণ দলের মুখপত্র কম থাকায় তাঁরাও ঐদের সাথে মানবতাবাদ এবং সাধারণভাবে গণতন্ত্রের পক্ষাবলম্বন করলেন।

১৯৫২ সনের ভাষা-আন্দোলন সংঘটিত হওয়ার ফলে ঐদের মানসে যে বিক্ষোভ ও বিদ্রোহী চেতনার নির্যাস তৈরি করলো—তাকে পরিচায়িত করা যায় ‘বাঙালি জাতীয়তাবাদী ও মানবতাবাদী ভাবধারা’ বলে। পাশাপাশি মার্কসীর চিন্তাধারায় বিশ্বাসীদের দলও ভারী হচ্ছিলো প্রধানত অনিয়মিত সংকলন, রাজনৈতিক পার্টির বুলেটিন ইত্যাদি অবলম্বন করে। কিন্তু ঐদের কোন নিয়মিত, দীর্ঘায়ু, উন্নত মানের বিশালবপু সাহিত্য পত্রিকা ছিল না। পাকিস্তানকালে কেবল নয়, পরবর্তীকালেও মার্কসীয় ধারার কোনো সাহিত্যপত্রিকা কল্লোল, প্রগতি, অগ্রগতি কিংবা সমকালের মতো খ্যাতি অর্জন করেনি। এই শ্রেণীর লেখক সাহিত্যিকদের রচনা প্রকাশিত হয়েছে এবং হচ্ছে বাংলাদেশের প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মসূচির মতোই বুর্জোয়া কোনো বড়ো দলের আশ্রয়ে প্রশ্রয়ে। যে সমস্ত পত্রিকায় বাঙালি জাতীয়তাবাদী লেখকেরা লিখেছেন সেগুলোই কালে প্রধান ধারা হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু ছয় দফা পরবর্তীকালেই ঐদের চেতনায় পরিবর্তনের ধারাটি স্পষ্ট লক্ষ্যযোগ্য হয়ে ওঠে। তবে সকলের নয়, কারো কারো মধ্যেই তা সৃষ্টিশীলতার রূপ নেয়। অধিকাংশেরই চিন্তাধারার সঙ্গে পাকিস্তানবাদী ধারার পত্রিকার, লেখকগোষ্ঠীর সায়ুজ্য, সৌহার্দ্য, আন্তরিকতা ছিল। এক্ষেত্রে স্বার্থবোধ সমাজের বিবেককে প্রচণ্ডভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। বহু কবি, সাহিত্যিক, সম্পাদক, শিল্পী, সংস্কৃতিকর্মী পাকিস্তানবাদী ইসলামীধারার চিন্তাবিদ বুদ্ধিজীবীদের সহযোগী হিসেবে কাজ করেছেন সত্তর-একাত্তর সন পর্যন্ত। এ অবস্থায় তরুণ সম্প্রদায় বন্দিবিবেক সমাজের অতন্ত্র প্রহরীরূপে জাগ্রত থেকে কাজ করলো ‘শিখা অনির্বাণ’ এর মতো।

মানবতাবাদী ধারার পত্রিকা হিসেবে যেগুলোকে চিহ্নিত করা চলে, তার মধ্যে প্রধান ও প্রথম পত্রিকা মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন (১৮৮৯-১৯৯৪) প্রতিষ্ঠিত ‘মাসিক সওগাত’ (১৯১৮ ; পাকিস্তানপর্বে প্রথম প্রকাশিত হয় অগ্রহায়ণ ১৩৫৯, ১৯৫২ সনে)। এই কালের প্রধান পত্রিকারূপে যেটি নতুন করে খ্যাতিলাভ করে সেটা হচ্ছে সিকান্দার আবু জাফর (১৯১৯-৭৫) সম্পাদিত ‘সমকাল’ (১৯৫৭)। এ ধারায়ই বিশিষ্ট কতিপয় পত্রিকা প্রকাশিত হয় পরপর। ‘ইমরোজ’ (১৯৫০) ; ‘সাহিত্য’ (১৯৬০) ; ‘পূর্বমেঘ’ (১৯৬০) ; ‘পূবালী’ (১৯৬০) ;



‘স্বদেশ’ (১৯৬০) ; ‘স্বাক্ষর’ (১৯৬৩) ; ‘সুন্দরম’ (১৯৬৩) ; ‘কণ্ঠস্বর’ (১৯৬৫) ; ‘পূর্বলেখ’ (১৯৬৫) ; ‘মেঘনা’ (১৯৬৭) প্রভৃতি উল্লেখ করার মতো।

### ৫. বিভিন্ন ধারার সাহিত্যপ্রয়াসের বিচিত্র পরিচয়

পাকিস্তান আমলের বাংলা সাময়িকী বা সাহিত্যপত্রিকার পাতায় সম্পাদকীয় ও ভূমিকায় ‘সাহিত্যপত্রিকা’ সম্পর্কে উচ্চারিত কয়েকটি উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো। এতে তখনকার পরিস্থিতি অনুধাবনে সহায়তা করবে। ১৯৫৮ সনে ‘সবার পত্রিকা’র সম্পাদকীয়তে সম্পাদক কায়সুল হক লেখেন : ‘এতোবড়ো দেশ এই পূর্ব পাকিস্তানে প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য পত্রিকার সংখ্যা মর্যাস্তিকভাবে অল্প। লেখকদের ভাবতে হয়, কোথায় তাঁরা লিখবেন? লিখে বাঁচবার মতো অর্থও তাই কোনো লেখকের ভাগ্যে জ্যোটে না। রুচিবান প্রকাশকও এদেশে বিরল। অথচ শিল্প সাহিত্যের ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তান আর সব দেশের মতন অগ্রসর হতে পেরেছে— নিঃসন্দেহে এটা গৌরবের! <sup>৪০</sup>

সচিত্র মাসিক ‘রূপকথা’র সম্পাদক আবদুল কুদ্দুস সাদী ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যায় (ডিসেম্বর ১৯৫৯) ‘সম্পাদকের অচলকলমে’ পত্র-পত্রিকার জন্ম-মৃত্যু সম্পর্কে মন্তব্য করেন : ‘মানুষের জন্মটা যেমন বিস্ময় এবং মৃত্যুটাই স্বাভাবিক, তেমনি অর্থপূর্ণ পূর্ব পাকিস্তানের বাজারে পত্র-পত্রিকার জন্ম-মৃত্যুর ইতিহাসও। তবে পার্থক্য এই যে, জন্মপ্রাপ্ত মানুষের আয়ুর কিছুটা কাল নির্দেশ মোটামুটিভাবে দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু এখানকার নবজাত পত্রিকার বেলায় সে নিশ্চয়তা আদতে নেই। তাই শুরুতেই জোর করে কোন কথা বলতে যাওয়া ঠিক হবে না। দেশ বিভক্ত হবার পর এই দীর্ঘ তের বৎসরে জন্ম-মৃত্যুর খাতায় অনেক মাসিক, পাক্ষিক এবং সাপ্তাহিক পত্রিকার নাম উঠেছে। যেগুলোর নাম এখনো মৃত্যুর খাতায় ওঠেনি। তাদের সংখ্যাও কম এবং মেরুদণ্ডও খুব শক্ত নয়। কেননা এর-ওর কাঁধের উপর ভর করেই তাঁদের বেঁচে থাকতে হচ্ছে বলেই আমাদের মনে হয়। <sup>৪১</sup>

মাসিক ‘পাঁচমিশালী’ পত্রিকায় (সম্পাদক : ইবনুল হাসান ; সহ-সম্পাদক : সৈয়দা সুলতানা আরা, সৈয়দা জাহান আরা লাইজু) লেখা হয় ; ‘ঈদুল ফিতর’ আর ‘পাকিস্তান দিবসের’ মত জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিন দুটোকে উপলক্ষ করে পাঁচমিশালীর যে আত্মপ্রকাশ তা আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। এই পত্রিকার নিয়মাবলীতে বলা হয় ; ‘পাঁচমিশালীর পরিচালকবর্গকে খুব বেশি পরিশ্রম করতে হয় বলে লেখক লেখিকাদের পারিশ্রমিক দেওয়া সম্ভব নয়।’

বিভিন্ন মন্তব্য, বক্তব্য, সম্পাদকীয় ইত্যাদি থেকে এবং সবকিছু মিলে পত্রিকাগুলোর ‘বেশিষ্ট্য’ ও ‘চারিত্র্য’ সম্পর্কে আরো যে ধারণা জন্মেছে তা মোটামুটিভাবে এই—

ক. একই সঙ্গে পত্রিকা রাজনৈতিক সামাজিক ভূমিকা পালন করতে পেরেছে। কিশোর ও মহিলা পত্রিকাগুলোও সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করতে চেয়েছে। প্রতিটি পত্রিকাই সাহিত্যের আবরণে সজ্জিত হতে অভিনাষী হয়েছে। প্রত্যেক লেখার পেছনে প্রেরণা বা প্রবণতা কাজ করেছে।

খ. এই সময়ে প্রায় প্রতিটি পত্রিকাই ‘ঈদসংখ্যা’ এবং ‘আজাদী সংখ্যা’ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। (মানবতাবাদী ও প্রগতিশীল ধারার পত্রিকায় কিছু ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যাবে)। লেখার জন্য সম্মানী দেয়া হতো না। ভালো সাহিত্য পত্রিকার সংখ্যা নিতান্তই অল্প এবং ক্ষণজীবী। প্রায় সকল পত্রিকাই নিয়মিত প্রকাশের অঙ্গীকার ব্যক্ত করে যাত্রা শুরু করেছে। কিন্তু এক দুই তিন বা চার-পাঁচ সংখ্যা প্রকাশের পরই তা বন্ধ হয়ে গেছে।

গ. অনেক সাপ্তাহিক ও পাক্ষিক পত্রিকা ‘সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক পত্রিকা’ হিসেবেই আত্মপ্রকাশ করেছে। অনেক পত্রিকায় পাক্ষিক সংবাদপত্র ঘোষণা থাকলেও ভূমিকা পালন করেছে ‘মাসিক সাহিত্য পত্রিকা’র। যেমন ‘আলো’ ও ‘সবার পত্রিকা’।<sup>৪২</sup>

ঘ. সাপ্তাহিক থেকে মাসিক কিংবা দৈনিকে রূপান্তরিত হয়েছে। এবং এক সময়ে প্রচার বন্ধ হয়ে গেছে। সাতচল্লিশ-একাত্তরপর্বে প্রকাশিত সমকাল-কণ্ঠস্বর ছাড়া কোন পত্রিকা বাহাত্তরের পর প্রকাশিত হয়নি। ‘বেগম’ চলেছে। কিন্তু সে-বেগম নেই।

ঙ. ঢাকায় ১৯৪৭ সনে পত্র-পত্রিকা প্রকাশের উপযুক্ত পরিবেশ ছিল না। ‘কাফেলা’ (সাপ্তাহিক) পত্রিকার ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রথম সংখ্যার (মাসিকরূপে ১৯৪৭) ‘কৈফিয়ৎ’ এ বলা হয় (সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ছিলেন—কাজী নজমুল হক, বেগম সুফিয়া কামাল, মোসলেমউদ্দিন, বেগজাদী মাহমুদা নাসির প্রমুখ) :

পাকিস্তানে টাইপ ফাউন্টরী, ব্লক ভৈরীর কোন প্রতিষ্ঠান না থাকায় কলকাতার মত সাপ্তাহিক আকারে পত্রিকা প্রকাশ করাও এখানে সম্ভব হচ্ছে না। এখনও টাইপ এবং ব্লক এখানে পাওয়ার কোন উপায় নেই। আর কবে যে পাওয়া যাবে, তারও কোন স্থির নিশ্চয়তা নেই। এতগুলো অসুবিধা সত্ত্বেও দেশ, দশ ও সমাজের খেদমতে আল্লার কৃপায় ‘কাফেলা’ মাসিক আকারে প্রকাশ করছি। ইনশাআল্লাহ অতিসত্তর আমরা আপনাদের প্রিয়পত্রিকা ‘কাফেলা’ পুনরায় সাপ্তাহিক আকারে প্রকাশ করতে সমর্থ হন।

চ. অধিকাংশ পত্র-পত্রিকা প্রকাশের নেপথ্যে কোনো মহত উদ্দেশ্য ও সুনির্দিষ্ট আদর্শ ব্যক্ত হতো না। ‘তারুণ্যের উচ্ছ্বাস’ আর গতানুগতিক ‘দেশ, দশ ও সাহিত্য সেবার’ অঙ্গীকার আছে মাত্র।

ছ. পূর্ব পাকিস্তানে পত্র-পত্রিকা প্রকাশ খুব কঠিন কাজ। সহজ, স্বচ্ছন্দ নয়—পত্রিকায় এ ধরনের মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছে। আরো বলা হয়—একাজ মফস্বলে আরো কঠিন, লেখা পাওয়া যায় না, ছাপানো কঠিন। নিয়মিত করা দুর্সম্ভব ইত্যাদি।<sup>৪৩</sup>

জ. ১৯৬৩ তেই পূর্ব পাকিস্তানের পত্র-পত্রিকায় গণ-জীবনে সূচিত জাগরণের কথা ব্যক্ত হতে থাকে। ‘পৃথিবী’র মতো ‘ধর্মীয় পত্রিকা’তেও সাহিত্যের সীমা এবং সামাজিক ভূমিকাকে অস্বীকার করা হয়নি ;

সাহিত্য বলতে আমরা এক ব্যাপক পরিধি বুঝি যার সীমার মধ্যে সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কোন কিছুই বাদ নেই, বাদ নেই এমন কিছু যা নিয়ে আমাদের জীবন পরিপূর্ণ এবং এসবের মধ্যদিয়ে সাহিত্য মানুষকে সেই স্তানাদান করবে, যা দিয়ে আমরা বিশ্বসভ্যতা তথা মানব সমাজের অগ্রগতির মূলসূত্রটি বা ধারাটিকে বুঝতে পারব, এবং তা সমাজ জীবনকে আরো উন্নত করে তোলার জন্য প্রয়োগ করতেও সক্ষম হব।

গণ-জাগরণ ও সাহিত্যের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ‘পৃথিবী’র বক্তব্য :

পৃথিবী তার সীমাবদ্ধ ক্ষমতা নিয়ে এগিয়ে যাবার শপথ গ্রহণ করছে। কিন্তু এই সঙ্গে আমরা বেশি করে আশা করছি যে সাম্প্রতিক কালে পূর্ব পাকিস্তানের গণ-জীবনে যে জাগরণ দেখা দিয়েছে, তরুণ সাহিত্যিকেরা তা হতে উদ্বুদ্ধ হয়ে সাহিত্যক্ষেত্রে নৈরাশ্যকে বিতাড়িত করতে সক্ষম হবেন। এইসব সাহিত্যিকদের প্রতি সাহায্য ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবার জন্যই জন্ম নিয়েছে ‘পৃথিবী’।<sup>৪৪</sup>

৪. পূর্ববঙ্গের নারী-সমাজের মধ্যে ব্যাপক জাগরণ বা সচেতনতা লক্ষ্য করা যায়। সাহিত্য ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে মহিলাদের সদস্ত, গর্বিত আত্মপ্রকাশ, বলিষ্ঠ ভূমিকা এবং নারী জাগরণের সাংগঠনিক তৎপরতা লক্ষ্যযোগ্য। ১৯৬৩ সনেই ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় গৃহিণীদের একটি সমিতি ‘ঢাকা গৃহিণী সমিতি’। এঁদের বার্ষিক মুখপত্র ‘গৃহস্ট্রী’ (১৩৭০)র উদ্দেশ্য :

গৃহিণীদের মনের সৌন্দর্যে সুন্দর হয়ে উঠবে আমাদের প্রতিটি গৃহ—এ গৃহই হবে প্রিয়জনের পরম কাম্যবস্তু।

মহিলারা রাজনৈতিক সাংগঠনিক এবং সামাজিকভাবে সক্রিয় হয়ে উঠছেন। পত্র-পত্রিকায় তাঁদের বক্তব্য জোরে-সোরে উপস্থাপিত হচ্ছে। এঁদের বৃহৎ সংগঠন ‘নিখিল পাকিস্তান মহিলা সমিতি’র পূর্বাঞ্চল শাখার মুখপত্র ‘রশ্মি’ বার্ষিকী ১৯৬৫ সনে জোবেদা খানমের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। পুরুষ-শাসিত সমাজের পশ্চাৎপদ ‘মুক-ভাষাধীন অবরোধ বাসিনীদের মুখে কথা ফোটারোর জন্য ‘মহিলা সাপ্তাহিকী ‘লাবণী’ (১৯৭০) প্রকাশিত হয় হাজেরা তালুকদার এর সম্পাদনায় (হাজেরা নজরুল ?)। ‘ললনা’র (১৯৬৬) উদ্দেশ্য ছিলো :

‘মহিলা সমাজের সকল প্রকার দাবি দাওয়া, সুবিধা-অসুবিধা এবং সর্বতোভাবে তারই প্রয়োজনে যথাসাধ্য কাজ করে যাওয়া’।

অনগ্রসরতার জন্য নারী সমাজে ফ্লোভ সৃষ্টি হচ্ছে।<sup>৪৫</sup>

৫. সরকারের মুখ্য ব্যক্তি, এসডিও প্রমুখ সম্পাদিত মৌলিক গণতন্ত্রীদের পত্রিকার রবীন্দ্র-নজরুল সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার তথ্যও পাওয়া যায়। সিরাজগঞ্জের এস. ডি.ও ইনাম আহমদ চৌধুরী সম্পাদিত ‘যমুনা’ (পাক্ষিক)—র ২৩-২৪ যুগ্ম সংখ্যা প্রকাশিত হয় রবীন্দ্র-নজরুল সংখ্যারূপে।<sup>৪৬</sup>

ট. সমাজ-মানস বিচিত্রভাবে বিকশিত ও বিস্তৃত হচ্ছে। পাশ্চাত্য-ধরনের-প্রবীণ-সংঘ গড়ে উঠেছে ১৯৬৩ তে এবং এঁদের মুখপত্র দীর্ঘদিন ধরে (১৯৬৮ পর্যন্ত) প্রকাশিত হয়েছে। ‘পাকিস্তান প্রবীণ হিতৈষী’ শীর্ষক পত্রিকা প্রকাশ করেছে ‘পাকিস্তান এসোসিয়েশন ফর দি এজেন্ট’ (৭৮ ধানমণ্ডি রেসিডেন্টসিয়াল এরিয়া, রোড, -৫ থেকে, সম্পাদক ; ডা. একে.এম আবদুল ওয়াহেদ, সহ সম্পাদক : ডা. আলিমউদ্দিন আহমেদ)।

ঠ. জেলা কাউন্সিল বা জেলা প্রশাসকদের প্রযত্নে প্রকাশিত মৌলিক গণতন্ত্রীদের পত্রিকা (বগুড়া জেলা কাউন্সিলের পাক্ষিক মুখপত্র—‘মহাস্থান’, ২য় বর্ষ ১ম সংখ্যা ১৬ জানুয়ারি ১৯৬৬)—র সম্পাদকীয় উদ্দেশ্য ছিল এইরূপ :

জেলা কাউন্সিলের মুখপত্র হিসেবে মুখ্যত জেলা কাউন্সিল এবং অন্যান্য মৌলিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের সহিত জনসাধারণের পরিচয় ঘটানো ইহার লক্ষ্য। সঙ্গে-সঙ্গে দেশের অভ্যন্তরে পাঠকদের অবগতির জন্য জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ সংবাদও পরিবেশন করা হইবে।

ড. স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে বাঙালির কাক্ষিক্ষিত উন্নতি (সর্ব প্রকারের) না হওয়ার বিচিত্র বর্ণনা প্রায় সকল বাংলা পত্রিকায় ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু কার্যকরভাবে জনগণের প্রকৃত মুক্তি কামনায় মাত্র গুটি কতক পত্রিকায় জাতীয়-সমস্যার গভীর আন্তরিক শিল্পসম্মত গ্রন্থ ভাষায় যুক্তিসিদ্ধ উপস্থাপন (ব্যক্ত) হয়েছে। ভালো লেখার বড় অভাব পত্রিকাগুলোর। সুসম্পাদনার ছাপও কুচিৎ মেলে। অর্থাভাব এবং নানা সংকটের আহাজারি ছাড়া কোনো পত্রিকার যাত্রা আরম্ভ হয়নি। কাল কাটেনি নির্বিঘ্নে। সমাজ যে স্থবির হয়ে পড়েছে—তার পরিচয় পাওয়া যায় 'উত্তরণ' (১৯৭০ ; এনামুল হক সম্পাদিত 'উত্তরণ' নয়) এর সম্পাদকীয়তে :

বহু বাধা-বিপত্তি এবং ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে সমাজ-মনে অনিশ্চয়তা এবং বুদ্ধি ও চিন্তার রাজ্যের জড়তা তথা অরাজকতা সৃষ্টি হয়েছে। তা থেকে উত্তীর্ণ হবার আশায় এবং নিজস্ব সাহিত্য ও সর্বস্বীন সৃষ্টিশীল প্রচেষ্টার অব্যাহত বিকাশের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টির চেতনায় আমাদের এ সংগঠন প্রয়াস এবং তারই ফলশ্রুতি উত্তরণ।<sup>৪৭</sup>

ঢ. সরকার খঁষা পাকিস্তানবাদী বুদ্ধিজীবীদের ইসলামী ধারার পত্রিকায় অথবা সরকারি নানা অপচেষ্টায় লিপ্ত বিভিন্ন সংস্থার পক্ষ থেকে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকায় কিরণ 'মাকাল ফলের' ব্যবসা করা হতো তার একটি নমুনা ড. হাসান জামান সম্পাদিত 'পূবালী (১৯৭০) পত্রিকার সম্পাদকীয় থেকে দেয়া যায়—

সাময়িক পত্রিকা আজ একাধারে দেশের সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক, রাজনীতিক, অর্থনৈতিক, সংস্থার ও অন্যান্য বহু পরিবর্তনের আলেখ্য। সমাজের এই চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতেই আমরা পূবালী প্রকাশে ব্রতী হয়েছি। অনুসন্ধিৎসু ও আনন্দলিপ্সু মনের চাহিদা মেটানোই এর মুখ্য উদ্দেশ্য, কোনো আদর্শ বা নীতি প্রচার নয়।

কোনো আদর্শ বা নীতি ছাড়া পত্রিকা বের করার কি মানে তা বোঝা যায় না। যদিও তাঁরা স্বীকার করেন 'সাময়িকপত্র সকল পরিবর্তনের আলেখ্য'। কোনো নীতি, আদর্শ এঁদের সামনে ছিল না (ছিল জনগণকে বিভ্রান্ত করার নীতি) বলেই এরূপ অস্পষ্ট, অর্থহীন ভাষায় কাঁচ-কাঁচানি করা হতো।<sup>৪৮</sup>

১৯৬৮ সনের অক্টোবর মাসে (আইউব খানের শাসনামলে) বাংলা একাডেমী সপ্তাহব্যাপী একটি সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচী গ্রহণ করে। পূর্বপাকিস্তানের বিশ বছরের সাহিত্যের ব্যাপক পর্যালোচনামূলক সাহিত্য সেমিনার অনুষ্ঠান এই কর্মসূচির অন্যতম অংশ ছিল। এই সেমিনারে 'পূর্ব পাকিস্তানের সাময়িকপত্র' বিষয়ে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন ডক্টর মোহাম্মদ আবদুল কাইউম। আলোচনা করেন ডক্টর রফিকুল ইসলাম, জনাব মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ ; সভাপতিত্ব করেন জনাব মুজীবুর রহমান খাঁ (আজাদের এককালীন সম্পাদক)। আলোচনা কালে রফিকুল ইসলাম বলেন :

... একটি তথ্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তা হল এই যে পূর্বপাকিস্তানে গত বিশ বছরে অনেক পত্রিকা প্রকাশিত হলেও তার মধ্যে অল্প কয়েকটি মাত্র দীর্ঘ জীবন লাভ করেছে। বস্তুত ... প্রকাশকেরা চান যে তাঁদের পত্রিকা টিকে থাকুক, অথচ পত্রিকা কিছুদিন চলার পরেই বন্ধ হয়ে যায় কেন? এ সমস্যা আলোচনার যোগ্য আমাদের দেশে শিক্ষিতের হার কম। আবার শিক্ষিতদের মধ্যেও পাঠকের সংখ্যা আরও কম। এমন অবস্থায় স্বাভাবিকভাবেই আমাদের দেশে পত্র-পত্রিকার প্রচার সীমাবদ্ধ। কাজেই কেবল পত্রিকা বিক্রয়ের মূল্য দিয়ে কোনো পত্রিকার খরচ উঠতে পারে না। আবার পত্রিকা বিক্রয় হলেও তার মূল্য যথাযথভাবে প্রকাশকের কাছে ফিরে আসে না। সুতরাং স্বাভাবিক ভাবেই সাময়িকপত্রিকাকে বিজ্ঞাপনের ওপর নির্ভর করতে হয়। দৈনিক পত্র-পত্রিকার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সাময়িকপত্রগুলি খুব বেশি বিজ্ঞাপন পায় না ফলে সে উপায়েও পত্র-পত্রিকার আর্থিক সমস্যার সমাধান হয় না। আমাদের দেশে নিয়মিত পত্রিকা প্রকাশের পথে একটা প্রধান প্রতিবন্ধিকতা হল ছাপাখানার অবস্থা। অধিকাংশ ছাপাখানাই নির্দিষ্ট সময়ে কাজ দিতে সক্ষম হয় না। ছাপার খরচও খুব বেশি। কাগজ এবং ব্লকের সমস্যাটো রয়েছেই। তদুপরি সাহিত্য সাময়িকীগুলোকে রম্য বা প্রমোদ পত্রিকার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হয়। এমন অবস্থায় সরকারি উদ্যম বা সহযোগিতা ছাড়া বা কোনো দৈনিক পত্রিকার সহায়তা ছাড়া এখানে নিছক বেসরকারি প্রয়াসে খুব কম সাহিত্য সাময়িকীই টিকে থাকতে সক্ষম হয়েছে।<sup>৪০</sup>

জনাব মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ বলেন :

বিভিন্ন সাময়িকপত্রের উদ্দেশ্য ও আদর্শ কি ছিল, সেগুলোকে কেন্দ্র করে কোন সাহিত্য আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছে কিনা অথবা কোন সাহিত্য আন্দোলন সৃষ্টিতে তাঁরা কতখানি সহায়ক হয়েছেন সেগুলোর বিচার আবশ্যিক।<sup>৫০</sup>

সভাপতির ভাষণে জনাব মুজীবুর রহমান খাঁ বলেন :

স্বাধীনভাবে আপন সন্তায় প্রকাশিত, আর্থিক দিক থেকে আত্মনির্ভরশীল এবং জনগণের বিভিন্ন ধ্যান-ধারণার বাণীবহ সাহিত্য পত্রিকার অভাব আজ আমাদের সাহিত্য ক্ষেত্রে এক বড় সমস্যা হিসাবে বিরাজ করছে। তিনি বলেন, আমরা আজ এমন সব সাহিত্য পত্রিকার প্রত্যাশী যা সাহিত্য চেতনায় বিপ্লব আনবে, জমাট সাহিত্য আন্দোলন সৃষ্টি করবে এবং সাহিত্যিক গোষ্ঠী গড়ে তুলবে। ... চিন্তায় বিপ্লব সাধনকারী বলিষ্ঠ সাময়িকপত্র আমরা পাচ্ছি না; একটা নৈরাশ্য যেন ক্রমেই আমাদের ঘিরে ফেলছে। ... এক্ষেত্রে তেমন কোন উন্নতি হয়নি... কাগজ বেরুচ্ছে, টিকেও আছে হয়ত, ... এর অধিকাংশই কোন বিভাগ বা প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র মাত্র। কোনক্রমেই সাহিত্য আন্দোলনের সার্বিক অগ্রগতির পরিচায়ক নয়... কোন প্রতিষ্ঠানের ছত্রছায়ায় প্রকাশিত একটি বা দুইটি সাময়িকপত্রে আমাদের চিন্তাধারা কতটুকু প্রতিফলিত হতে পারে তা সঠিকভাবে বলা যায় না। ... স্বাধীন এবং আত্মনির্ভরশীল পত্রিকা প্রকাশের ব্যাপারে আর্থিক সমস্যা একটা বিরীতা সমস্যা। ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রকাশিত বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকার অকাল মৃত্যু... দুঃখজনক... আর্থিক সমস্যা এবং ব্যক্তিত্বশালী সম্পাদকের অভাব এ পরিস্থিতির জন্য অনেকাংশে দায়ী।<sup>৫১</sup>

আহমদ ছফা এক সাক্ষাৎকারে বলেন : বাংলাদেশের মধ্যে সুস্থ সাংস্কৃতিক পরিবেশ নির্মাণ এবং জাতীয় সংস্কৃতির বিকাশ সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই নানারকম প্রয়াস-প্রযত্ন লক্ষ্য করা যায়। তার প্রমাণ দেখা যাবে অজস্র স্বাস্থ্যবান রুচিসমৃদ্ধ অনিয়মিত সংকলন, একুশের বিশেষ সংখ্যা এবং কতিপয় (নিয়মিত প্রকাশের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ) সাহিত্য পত্রিকাতে। এই প্রয়াস শুধু ঢাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সুদূর প্রত্যন্ত অঞ্চলেও এই ধরনের সাংস্কৃতিক উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায়। একটা বেদনাদায়ক ব্যাপার হলো এই পত্র-পত্রিকাগুলোর আয়ু দীর্ঘ হতে পারেনি। তার একটি সুনিশ্চিত কারণ এই যে, এই পত্র-পত্রিকাসমূহের পিছনে কোনো সুনিশ্চিত সুগঠিত আর্থিক ও সামাজিক সহযোগিতা এবং

সহায়তা ছিল না। তাছাড়া আর একটি কথা ভুলে গেলে চলবে না, পাকিস্তান-সরকার সবসময় সুস্থ পত্র-পত্রিকার প্রকাশনা নিরুৎসাহিত্য করতো। আরও একটি বিষয় পাশাপাশি লক্ষ্য করার মতো ১৯৫২ সনের পর ভাষা-আন্দোলনকে কেন্দ্র করে হামিদুল হক চৌধুরী সম্পাদিত ইংরেজি দৈনিক ‘পাকিস্তান অবজারভার’ পূর্ব পাকিস্তানের দাবি দাওয়া তুলে ধরার ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে থাকে। পত্রিকাটি সরকারবিরোধী ভূমিকার জন্য একাধিকবার সরকারি কোপানলে পড়ে। আশ্চর্য ব্যাপার, যেই পত্রিকাগোষ্ঠী জাতীয় দাবি দাওয়া জনসমক্ষে উত্থাপন করে আসছিলো, সেই পত্রিকাগোষ্ঠী প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করে ‘চিত্রালী’ নামে একটি সাপ্তাহিক সিনেমা পত্রিকা প্রকাশ করে। উল্লেখ্য, সেই সময়ে, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে একটিও চলচ্চিত্র নির্মাণ হয়নি। বিকাশমান মধ্যশ্রেণীর বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করে গণরুচি দূষণের এমন কারখানা তৈরি করার দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে বোধ করি অধিক নেই।

অবজারভার এর পরে সঙ্গত কারণেই ‘ইত্তেফাক’ পত্রিকাটির কথা আসবে। সবাই জানেন, পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতির বিশেষ এক গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতিতে ইত্তেফাক পত্রিকার জন্ম। ভাষা আন্দোলনের শহীদদের রক্তের অঙ্গীকার এই পত্রিকাটি বহন করেছিল। শুরুতে মজলুম গণনায়ক মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী (১৮৮০-১৯৭৬) ছিলেন এই পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা। পত্রিকার শিরোভাগে মওলানা সাহেবের নাম শোভা পেত। আওয়ামী লীগের রাজনীতিকে জনপ্রিয় করার ব্যাপারে এই পত্রিকাটি অনন্যসাধারণ ভূমিকা পালন করে। একটা সময়ে ইত্তেফাক, শেখ মুজিব এবং বাংলাদেশের স্বায়ত্ত্বশাসন তথা স্বাধীনতা সমসূত্রে এসে দাঁড়িয়েছিল। জাতীয় সংস্কৃতির বিকাশে নির্ভীক সাংবাদিক মরহুম তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া যে ভূমিকা গ্রহণ করলেন, তা অবজারভার পত্রিকার মালিক হামিদুল হক চৌধুরীর থেকে ভিন্ন নয়। তিনিও ‘পূর্বাণী’ নামে অধিকতর রঙচঙে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করলেন। এরপর এরকম আর দশটি সাপ্তাহিক সিনেমা পত্রিকা বাজারে প্রকাশ পেতে আরম্ভ করে। কিন্তু একটিও রুচি-স্নিগ্ধ সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা প্রকাশিত হয়নি। এ থেকেই প্রমাণিত হবে, তৎকালীন ধনবান শ্রেণী, যাঁরা জনমত গঠন করছিলেন, তাঁদের সংস্কৃতি-চিন্তার স্বরূপ কেমন ছিল।<sup>৫২</sup>

আর একজন বুদ্ধিজীবী লেখক-এর ভাষ্য অনুযায়ী : পাকিস্তানকে দীর্ঘায়ু করার বিকৃত প্রচেষ্টায় সহযোগী ছিলেন কিছু সংখ্যক বাঙালি বুদ্ধিজীবী। বুদ্ধিজীবীদের কিনে নেয়ার ধূর্ত কৌশলরূপে সরকারি তথ্য বিভাগ জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থা, পাকিস্তান কাউন্সিল, নজরুল একাডেমী ও আরও অনেক সরকারি ও আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সরকার লেখকদেরকে বিপথগামী করার জন্য প্রচুর অর্থ প্রদান করেছে..

একটি শ্রেণী হিসেবে বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর শেষ পর্যন্ত কোন পারস্পর্যশীল ভূমিকা ছিল না। বিশেষ ভাবে আইডবী শাসনামলে, বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর যে অংশ আগাগোড়াই নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য পাকিস্তানবাদী চক্রের সঙ্গে সহযোগিতা করেছে তাদের ছাড়াও অপর অংশটিও জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। পূর্ববাঙলার বুদ্ধিজীবীদের বিপথগামী করার জন্য পাকিস্তানবাদী চক্রের অপকৌশলের কোন অন্ত ছিল না। বেতার

টেলিভিশন, সরকারী পত্র-পত্রিকা এবং তথ্য ও প্রচার বিভাগ প্রভৃতিকে সরকার ব্যবহার করেছে নিজেদের সাংস্কৃতিক পরিচালনা বাস্তবায়নের মাধ্যম হিসেবে। ব্যবসায়ীরা ও সরকার সাহিত্য পুরস্কারের যে ব্যবস্থা করেছিল, তার পশ্চাতেও কোন সং উদ্দেশ্য ছিল না। এমনকি একান্তভাবে ভাষা-আন্দোলনেরই ফলে সৃষ্ট বাংলা একাডেমী যা পুরোপুরি সরকারী প্রতিষ্ঠান বলে পরিচিত নয়—তাকেও সরকার আশ্চর্য কৌশলে ব্যবহার করেছে স্বার্থ হাসিলের হাতিয়ার হিসেবে। বাংলা একাডেমীর পরিচালককে দিয়ে কখনও কখনও সরকার রবীন্দ্র-বিরোধী আন্দোলন করিয়েছে, বাংলা বর্ণমালা সংস্কার-ষড়যন্ত্রে ব্যবহার করেছে।

সাম্প্রদায়িকতা প্রচারের মাধ্যম হিসেবে পাকিস্তান কাউন্সিল, জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থা, নজরুল একাডেমী প্রভৃতি অন্যান্য সরকারি, আধা-সরকারি ও সরকারি সাহায্যপুষ্ট প্রতিষ্ঠানকে একাজে ব্যবহার করা হয়েছে নিলঞ্জিত ভাবে। পাকিস্তান বাঁধা ছিল সাম্রাজ্যবাদী গাট ছড়ায়। মার্কিনি ও পাকিস্তানি যোগসাজসে বুদ্ধিজীবী শ্রেণীকে নানা উৎকোচ, হলিউডী চলচ্চিত্র ও যৌনবিকৃতির উপাচার পাঠিয়ে চিন্তাবিদ ও তরুণ সমাজকে সাধারণভাবে বিপথগামী করতে চেয়েছে। কিন্তু শূভবাদী বুদ্ধিজীবীরা ও তরুণ ছাত্রসমাজকে সহজে বিভ্রান্ত করা যায়নি... পাকিস্তানের কোন লাভ হয়নি বরং পূর্ববাঙলায় এর জন্য আন্দোলন তীব্র হয়েছে—পাকিস্তান অধিকতর স্বল্পায়ু হয়েছে। আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনও গড়ে উঠেছে। সমস্ত আঘাতই লেগেছিল ‘পাকিস্তানের উপনিবেশবাদী সরকারের মসনদের গোড়ায়’।<sup>৫৩</sup>

আলোচ্যকালে পূর্ব বাঙলায় সামাজিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে যে নানা মাত্রাযোগ ও বিবর্তন-ধারা লক্ষ্য করা যায়, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও শিল্পজগতে তারই প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। সমকালের অকপট চিত্র বিধৃত হয় সাময়িকপত্রে। একালের সাময়িক-সাহিত্যপত্রই তাই পাকিস্তানিযুগের বাংলা সাহিত্যের ও আমাদের সমাজের প্রধান দর্পণ।

বিভাগ পরবর্তীকালে সাংস্কৃতিক ঘটনাক্রম ও পরিস্থিতি বিপর্যয়ের দরুন দ্রুত বিকশিত হয়েছে বাঙালি জাতীয়তাবোধ। পাকিস্তানি জাতীয়তাবোধের বিরুদ্ধে বাঙালি জাতীয়তাবোধের আত্মপ্রকাশের ক্রম বিবর্তনধারা একশ্রেণীর সাহিত্য পত্রিকার পাতা মেললেই স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। আরও দেখা যায় ‘ধর্মীয় জীবনদৃষ্টির নিগড় ভেঙে মাথা তুলেছে যুক্তি অভিজ্ঞতা ও বিজ্ঞানভিত্তিক জীবনদৃষ্টি। পরকালের দিক থেকে মানুষ দৃষ্টি ফেরাতে চেয়েছে ইহকালের দিকে। আর শ্রেণী-নিরপেক্ষ মানবিকতাবাদী মতবাদের বিপরীতে শ্রেণী-সংগ্রামের প্রসার ঘটেছে’।<sup>৫৪</sup>

এইসব মতবাদ প্রসারের নেপথ্যে কাজ করেছে একশ্রেণীর প্রগতিশীল তরুণ সাহিত্যশিল্পী ও সংস্কৃতিকর্মীদের কর্মকাণ্ডগুলো। মুখপত্র ছিল কিছু পত্র-পত্রিকা। সেসবের মধ্যে ছোট, ক্ষুদ্র অনিয়মিত সংকলনই বেশি। কিছু নিয়মিত পত্রিকায় এঁদের দলের কেউ কেউ সাহিত্যের মর্যাদা পেতে পারে এমন লেখার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন তাঁদের চিন্তাধারা। অধিকাংশই ছিল পাকিস্তানবাদী। তাঁরা পূর্ব পাকিস্তানের ধর্মীয় বেশিষ্টের, সাহিত্যিক স্বাতন্ত্র্যের উপর গুরুত্ব দেন। এঁদের বিশ্বাস হলো : পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল ‘ইসলামের ভিত্তিতে সমাজ ব্যবস্থাকে পুনর্বিদ্যমান করার প্রয়োজনে।’ এঁদের রচিত প্রবন্ধ ও

গদ্য রচনাগুলোর মূল্য, গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী মন্তব্য করেছিলেন। সাহিত্যের স্থলে সাময়িকী বা সাহিত্য পত্রিকার ভূমিকা হুবহু এক ধরে নিয়ে বলা যায় ; এই কালে প্রকাশিত সাহিত্য পত্রিকাগুলোর—

গা থেকে প্রকাশ কালের চিহ্ন মুছে দিয়ে যদি আমরা ভাবীকালের কাছে পাঠিয়ে দিই তাহলে ঐ কালের সমাজবিজ্ঞানীর পক্ষে চিনে নিতে কষ্ট হবে না যে এরা লিখিত ও প্রকাশিত হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরবর্তীযুগে। তিনি বলে দিতে পারবেন যে, সেই সময়টায় নতুন মধ্যবিত্তশ্রেণী গড়ে উঠেছিল... তার মনে জিজ্ঞাসা ছিল বেশ কিছু বিষয়ে। তার ভারি মুশ্কিল হয়েছিল আত্মপরিচয় নিয়ে। সে জানত যে গৌরব করার মত বড় একটা ঐতিহ্য তার আছে। কিন্তু নিশ্চিত জানত না যে কোনটা সেই ঐতিহ্য : বঙ্গ ও গ্রহণের বিচিত্র তরঙ্গে তার চিন্ত দোদুল্যমান থাকত। সেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সুযোগ ছিল দেশ ভ্রমণের, অবকাশ ছিল স্মৃতি মছনের। তার সমাজে বিজ্ঞান আসছিল ধীরে ধীরে। আর দেশের সাধারণ মানুষ কি করত, কোন কোন দ্বন্দ্ব ও সংকটে তারা পীড়িত ছিল তার একটা ছায়া মধ্যবিত্তদের এইসব লেখায় যদিবা পড়েছে বলে মনে হয় তবু সেটা ছায়া। ভাবীকালের সেই সমাজবিজ্ঞানী হয়তো আরও বলবেন যে, সাধারণ মানুষের দুর্দশার ছবি তৎকালীন সংবাদপত্রে পাওয়া যায় ; আর সংবাদপত্রের চিত্রকে নির্ভরযোগ্য মনে করলে তারা হয়ত এও বলতে বাধ্য হবেন যে ১৯৪৭-৬৮ (১৯৭১ ধরে নিলেও ক্ষতি নেই) এর সেই নব্য মধ্যবিত্তদের ব্যস্ত চিন্তা ও উৎসাহিত কল্পনা জন-জীবনের বিপলাংশকে মোটেই স্পর্শ করেনি।<sup>৫৫</sup>

### তথ্যপঞ্জি

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, ত্রয়োবিংশ খণ্ড, কলকাতা ১২৮৪, পৃ. ৩৪৩।
২. চার্লস-অগাস্টিন সঁতভভ, 'ক্লাসিক কি' (What is a Classic?), আবুল কাসেম ফজলুল হক অনূদিত, নবযুগের প্রত্যাশায়, ঢাকা ১৯৯৩, পৃ. ৫০।
৩. আবুল কাসেম ফজলুল হক, 'বাঙলাদেশের প্রবন্ধ ও গবেষণা : কয়েকটি প্রসঙ্গ কিছু মন্তব্য', বাঙলাদেশের প্রবন্ধ, সম্পাদক : সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, ঢাকা (প্রকাশের তারিখ নেই) পৃ. ৪৬-৪৭।
৪. লোকায়তর মুখপত্র, লোকায়ত, ঢাকা ১ বর্ষ, ১ সংখ্যা, অক্টোবর ১৯৮২।
৫. সংজ্ঞাগুলো নেয়া হয়েছে 1. The world book dictionary, vol-2, p-1551 ; 2. Webster's Third New International dictionary and seven Language dictionary, (1981) vol-11, p-1680 ; 3. The world book encyclopedia. vol-13, p. 43 ; 4. Encyclopaedia Britannica, vol-17, (1963) p. 512-513 ; 5. Encyclopaedic : Dictionary of library and information science, vol-3 (India 1989) p. 862 থেকে।
৬. The World Book Encyclopedia, vol-13, p. 43.
৭. পূর্বোক্ত।
৮. বিনয় ঘোষ, সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩১। এইসঙ্গে আরও দ্রষ্টব্য শ্রী সুশীলকুমার গুপ্ত প্রণীত 'উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ' (কলকাতা ১৯৫৯) ; এবং হরিপদ ভৌমিক প্রণীত 'সেকালের সংবাদপত্রে কলকাতা', ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪।
৯. ভবতোষ দত্ত, পূর্বোক্ত।
১০. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্গদর্শনের পত্রসূচনা ; বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা ১৩৯২ (৯ম মুদ্রণ) পৃ. ২৮৩।



১১. পূর্বোক্ত।
১২. সুনীল দাস, ভারতী : ইতিহাস ও রচনাপঞ্জি, কলকাতা ১৯৮৪, পৃ. ১।
১৩. ভবতোষ দত্ত, পূর্বোক্ত।
১৪. অজিতকুমার ঘোষ, বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধারা, কলকাতা ১৯৬৮, পৃ. ৪১১-২৫।
১৫. প্রমথ চৌধুরী, 'যৌবনে দাও রাজটীকা', প্রবন্ধ-সংগ্রহ, কলকাতা, ১৯৬৮, (পুনর্মুদ্রণ ১৯৯০) পৃ. ৪৫৭।
১৬. অজিতকুমার ঘোষ, পূর্বোক্ত।
১৭. জীবেন্দ্রসিংহ রায়, প্রমথ চৌধুরী, (৪র্থ সংস্করণ) কলকাতা ১৯৮৬, পৃ. ৯।
১৮. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, বীরবল ও বাংলা সাহিত্য, কলকাতা (৩য় সং) পৃ. ২০।
১৯. জীবেন্দ্রসিংহ রায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১।
২০. পূর্বোক্ত, কল্লোলের কাল, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃ. ২৩, ১১৪।
২১. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৫-৫৬।
২২. কাজী আবদুল ওদুদ, বাংলার জাগরণ, কলকাতা, ১৯৫৬, পৃ. ১৯৬।
২৩. আবদুল হক, সাহিত্য ঐতিহ্য মূল্যবোধ, ঢাকা ১৯৭৬, পৃ. ১২৩, ১২৭।
২৪. ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাময়িকপত্র সম্পাদনে বঙ্গনারী, কলকাতা ১৩৫৭।
২৫. অমলেন্দু বসু (ভূমিকা), সুনীল দাস সম্পাদিত 'জয়শ্রী সুবর্ণ জয়ন্তীগ্রন্থ ১৯৮৩, কলকাতা ১৩৯০।
২৬. ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সংবাদপত্রে সেকালের কথা, কলকাতা, ১৩৩৯ (১ম খণ্ড) ভূমিকা দ্রষ্টব্য।
২৭. আশু চট্টোপাধ্যায়, কল্লোল যুগের পরে, কলকাতা ১৯৯৩, পৃ. ১১-১২।
২৮. প্রমথনাথ বিশী, বাংলার লেখক (প্রথম খণ্ড) কলকাতা ১৩৫৭, পৃ. ৭৬।
২৯. জীবেন্দ্র সিংহ রায়, প্রমথ চৌধুরী, কলকাতা ১৯৮৬, পৃ. ৬।
৩০. বুদ্ধদেব বসুর উদ্ধৃতি লিপিবদ্ধ করেছেন জীবেন্দ্রসিংহ রায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫।
৩১. প্রমথনাথ বিশী, পূর্বোক্ত।
৩২. শশীভূষণ দাশগুপ্ত, পূর্বোক্ত।
৩৩. ভবতোষ দত্ত, পূর্বোক্ত।
৩৪. পূর্বোক্ত।
৩৫. প্রমথনাথ বিশী, পূর্বোক্ত।
৩৬. শশীভূষণ দাশগুপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩।
৩৭. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, আনিসুজ্জামান, ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মুনতাসীর মামুন এবং মোহাম্মদ আবদুল কাইউম দ্রষ্টব্য।
৩৮. মোহাম্মদ আবদুল কাইউম; ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ সম্পাদিত পাক্ষিক 'তকবীর' কে 'আজাদী যুগের প্রথম সাময়িকপত্র' বলে উল্লেখ করেছেন (দ্বিতীয় সংখ্যার প্রকাশকাল ২৪ অক্টোবর ১৯৪৭, বাংলা ৬ই কার্তিক ১৩৫৪)। এর পরে তিনি উল্লেখ করেছেন চট্টগ্রামের 'সীমান্ত' পত্রিকার কথা। তিনি মন্তব্য করেছেন : 'আশ্চর্যের বিষয় আজাদী লাভের পর প্রথম বছরে ঢাকা থেকে কোন পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হয়নি। কিন্তু এসময়ে মফস্বল থেকে কয়েকটি সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয়েছিল বলে জানা যায়।' প্রাপ্ত তথ্য উপর্যুক্ত বর্ণনার বিপরীত। 'চাবুক' (১৯৩৩) সাপ্তাহিক পত্রিকাটি প্রকাশের পর বিরতীহীনভাবে ঢাকা (৫২ জনসন রোড, সম্পাদক : শ্রী বন্ধিমচন্দ্র সাহা) থেকে প্রকাশিত হয়। 'চাবুক' এর ১৫ বর্ষ ৪৯ ও ৫০ সংখ্যা (অর্ধ-সাপ্তাহিক হয়েছিল শেষের দিকে) ৮ ও ১১ নভেম্বর ১৯৪৭ সনে প্রকাশিত হয়।

পত্রিকার শিরোনাম এর নিচে লেখা ছিল—‘পূর্ববঙ্গের জাতীয়তাবাদী অর্দ্ধ সাপ্তাহিক’। তাছাড়া কার্তিক ১৩৫৪ তেই ‘কৃষ্টি’ (১৯৪৭ সনের অক্টোবর) নামের প্রখ্যাত মাসিক পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ঢাকার নারায়ণগঞ্জ থেকে।

৩৯. শামসুল হক, বাংলা সাময়িকপত্র (১৯৪৭-৭১) ; ঢাকা ১৯৭৩। ৪৭-৭১ সময়কালে প্রকাশিত সকল দৈনিক, সাপ্তাহিক, সরকারী-বেসরকারী বিভিন্ন দপ্তরের, বিদেশী দূতাবাসের বিভিন্ন মুখপত্রের এবং প্রতিটি প্রশাসনিক ইউনিট থেকে মৌলিকগণতন্ত্রীদের মুখপত্র অন্তর্ভুক্ত করার পরও মাত্র ৪৭৬টি পত্রিকার নাম শামসুল হকের বইয়ে পাওয়া যায়। তিনি এই তালিকা প্রণয়নের জন্য বিজ্ঞাপন, বিভিন্ন লেখকের রচনা এবং লোকশ্রুতি ব্যবহার করে তালিকা লম্বা করেছেন। সমস্ত পত্রিকা সংরক্ষিত নেই কোন গ্রন্থাগারে। আবার কোনো পত্রিকা থাকলেও সকল সংখ্যা পাওয়া যায় না। ‘সমকালের’ মতো একটি দুটি পত্রিকার উদাহরণ এখানে গণনীয় নয়। এ-বইয়ে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে প্রকাশিত পত্রিকার নামও আছে। তালিকা দীর্ঘ হবার কারণ সেটাও একটা। কিন্তু তালিকা বড় হলেও উন্নতমানের পত্রিকা পাকিস্তান থেকে বেশি প্রকাশিত হয়নি।
৪০. উদ্ধৃতি, কায়সুল হক ; ‘সবার পত্রিকার সম্পাদকীয়। দ্রষ্টব্য ‘বাংলা সাময়িকপত্র’ (১৯৪৭-৭১), পৃ. ৯৮।
৪১. দ্রষ্টব্য, বাংলা সাময়িকপত্র, ১৯৬০ সনের পত্রিকার তালিকা অংশ।
৪২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৮।
৪৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৮।
৪৪. পৃথিবী, সম্পাদক : মোজাম্মেল ইসলাম, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৬৯ (সম্পাদকীয় দ্রষ্টব্য)। এই পত্রিকার উপদেষ্টা-পরিষদে ছিলেন মুহাম্মদ বরকতুল্লাহ, মৌলভী ফরিদ আহমদ, মওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী, অধ্যক্ষ এ. এ. রেজাউল করিম চৌধুরী প্রমুখ। পরে এই পত্রিকা ঢাকার ‘ইসলামিক রিসার্চ একাডেমীর মুখপত্র’ রূপে প্রকাশিত হয়। সম্পাদক হন আবদুল মান্নান তালিব।
৪৫. শামসুল হক, বাংলা সাময়িকপত্র, পৃ. ২৪৪।
৪৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৬-৬৭।
৪৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৪।
৪৮. মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম সম্পাদিত ‘পূবালী’ পত্রিকার নামে এটি প্রকাশ করেন পাকিস্তান পুনর্গঠন সংস্থা। কেন এই নাম ব্যবহার করতেন তার অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না। মুদ্রিত হতো কনসেন্ট প্রিন্টার্স, ২৫ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-২ থেকে। পৃ. ৭৫। দাম : ৫০ পয়সা। দেখুন শামসুল হক, পৃ. ২৪৬।
৪৯. রফিকুল ইসলাম, পূর্ব পাকিস্তানের সাময়িকপত্র (আলোচনা) ; আমাদের সাহিত্য, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৬৯, পৃ. ৬৬২-৬৩।
৫০. মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৬।
৫১. মুজীবুর রহমান ঝাঁ, সভাপতির অভিভাষণ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৫-৬৬। •
৫২. লেখক কর্তৃক আহমদ ছফার সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ৩০-০৭-১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দ।
৫৩. আবুল কাসেম ফজলুল হক, মুক্তি সংগ্রাম, ঢাকা ১৯৭২ পৃ. ২৬।
৫৪. পূর্বোক্ত, বাংলাদেশের প্রবন্ধ ও গবেষণা (প্রবন্ধ), বাংলাদেশের প্রবন্ধ (তারিখবিহীন), সম্পাদক : সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ৫৪-৫৫।
৫৫. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, ১৯৬৮ সনে বাংলা একাডেমী আয়োজিত সেমিনারে পঠিত ‘পূর্ব পাকিস্তানের প্রবন্ধ সাহিত্য’ শীর্ষক প্রবন্ধ। দেখুন বাংলাদেশের প্রবন্ধ, পৃ. ৩৪, অথবা বা/এ প্রকাশিত (১৯৬৮) আমাদের সাহিত্য।

## দ্বিতীয় অধ্যায়

# পূর্ব বাংলার সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সাহিত্যিক সাংস্কৃতিক পটভূমি

### ২.১. সামাজিক অবস্থার রূপান্তর

[পলাশীর পাপের ফল ; সামাজিক অবস্থার রূপান্তর ও ভারত-বিভক্তির সম্ভাবনা ; বৃটিশ ভারতের গণবিদ্রোহ ; চিরস্থায়ী বন্দোবস্তজনিত সামাজিক পরিবর্তন ও সাহিত্য সংস্কৃতিতে মধ্যশ্রেণীর প্রাধান্য ; হিন্দু জাগরণের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় মুসলিম নবজাগরণ ; মুসলিম-লীগের প্রভাব ; ভারত বিভক্তি ও স্বাধীনতার রুদ্ধপুলকের ফুটন্ত আবেগের পথরোধ ; মুসলিম লীগের প্রতিক্রিয়াশীল অংশের পাকিস্তানের ক্ষমতা দখল ; সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ; উদ্বাস্ত ও মোহাজের সমস্যা ; কৃষি ও কৃষক এবং পাটচাষীদের দুর্ভোগ ; আর্থিক অবস্থার অবনয়ন ; পূর্ব পাকিস্তানে কেন্দ্রীয় মুসলিম নেতাদের অন্ধ-অনুসারীদের অপতৎপরতা ; বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা ধ্বংসের পায়তারা]

পলাশী যুদ্ধের (১৭৫৭) পরিণতিতে এ-উপমহাদেশের হাজার বছরের অতীত সভ্যতা, সংস্কৃতি ও জীবন-পদ্ধতির পরিবর্তন ত্বরান্বিত হয়। স-সহচর ক্লাইভ ইন্স্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য সামাজিক ও রাজনৈতিক যে-সমস্ত ব্যবস্থার প্রচলন করেন,—তাতে এদেশের সাধারণ মানুষের মনে ও মননে, সমাজ ও জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। সমাজ-ব্যবস্থা ও চিন্তাচেতনা থেকে মধ্যযুগের লক্ষণগুলো অপসৃত হয়ে আধুনিকতার আভাস দ্রুত ফুটে উঠতে থাকে। কিন্তু ‘পলাশীর পাপে’ ১৯৪৭ সন পর্যন্ত বাঙালির জীবনে ও সমাজে আধুনিকতা ‘সম্পূর্ণ আত্মপ্রতিষ্ঠিত হতে’ পারেনি।<sup>১</sup>

পূর্ববঙ্গ বা পূর্ব পাকিস্তানের পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত সাহিত্য-সংস্কৃতি, সমাজ ও রাজনীতি বিষয়ক রচনার মর্ম অনুধাবন করতে গেলে পাকিস্তান পূর্বকালের সামাজিক, রাজনৈতিক ভাব-বিপর্যয়ের অভিনব রূপান্তরের কাহিনী বিস্মৃত হওয়া চলে না। সাহিত্য সমাজেরই সৃষ্টি। বর্তমান কালকে বোঝার জন্য পুরাতনের স্মরণ আবশ্যিক।

তাছাড়া আধুনিক কালে, বিশেষত বিংশ শতাব্দী জুড়ে যে সমস্ত সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে, তার একটি বড় অংশের উদ্দেশ্যই ছিল সমাজ, ধর্ম ও রাষ্ট্রাদর্শের পরিবর্তন।<sup>২</sup> যুগে-যুগে কালে কালে গণমানুষের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ও সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তন চেয়ে সংঘটিত নানা বিপ্লবী কর্মকাণ্ড, যুদ্ধ সংঘর্ষ ও প্রতিরোধ আন্দোলন বিপ্লবী গণসাহিত্য সৃষ্টির পটভূমি ও

প্রেরণার সৃষ্টি করেছে। আধুনিকতম বাংলা সাহিত্যের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণকালে সামাজিক রাজনৈতিক আন্দোলনের বিকাশ ও বিবর্তনের ইতিহাসও তাই সূত্রাকারে মনে রাখা দরকার।

দেখা যায় ‘পৃথিবীর অন্য বহু দেশের মত ভারতবর্ষের গণ-বিদ্রোহের ইতিহাসও অতি দীর্ঘ। শোষণ উৎপীড়ন থেকেই এই বিদ্রোহের সৃষ্টি। কিন্তু ভারতবর্ষে বিদেশী ইংরেজ শাসনের অতি নিষ্ঠুর, বর্বর-সুলভ শোষণ উৎপীড়নের ফলে ভারতের গণবিদ্রোহ সংখ্যায় ও ব্যাপকতায় অন্য বহু দেশকেই ছাড়িয়ে গেছে। এই সব গণ-বিদ্রোহ নিয়েই গড়ে উঠেছে বিদ্রোহী ভারতের দীর্ঘ ইতিহাস।’

আধুনিক কালের বিদ্রোহী ভারতের ইতিহাসের আরম্ভ বাঙলা ও বিহারের ‘সন্ন্যাসী বিদ্রোহ’ (১৭৬৩-১৮০০) থেকে। এরপর সারা ভারতে অসংখ্য কৃষক-বিদ্রোহ, এবং ১৮৫৭-৫৮-র ‘মহাবিদ্রোহ’ (বিভিন্ন শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের মিলিত) ইংরেজ শাসনের ভিত্তিমূল পর্যন্ত ধ্বংস করতে উদ্যত হয়। ১৮৮৫ ও ১৮৯৮ সন থেকে আরম্ভ হয় ভারতের শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি এবং বিপ্লবী সশস্ত্র বিদ্রোহ। চলে ১৯৪৭ পর্যন্ত। বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে আরম্ভ হয় ভারতে শ্রমিক-শ্রেণীর বিদ্রোহ। ১৯২৮ বা ১৯৩০ থেকে আরম্ভ হয় ভারতের পাঁচশত দেশীয় রাজ্যের সর্বশ্রেণীর প্রজা বিদ্রোহ। স্বাধীনতার (১৯৪৭) পরেও গণ-বিদ্রোহের ঝড় দুর্বীর গতিতে বেড়ে চলেছে। পাক-ভারত উপমহাদেশের গণ-বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করেছে আদিবাসী কৃষক, সর্বনিম্নস্তরের অগণিত অস্পৃশ্য, শ্রমিক, দিনমজুর, স্বল্পবেতনের কর্মচারী এবং বিত্তহীন সকল শ্রেণীর জনগণ।<sup>৩</sup>

১৯৭১-এর স্বাধীনতা লাভের পরে আজও জনগণ অর্থনৈতিক শোষণ উৎপীড়নের কবল থেকে ‘মুক্তি’কে ছিনিয়ে আনতে পারেনি।

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঘটনাবলী ঘটে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যে যোগ হয় নানা মাত্রা, নতুন নতুন উপাদান। সাহিত্য সৃষ্টি করে ভবিষ্যতের নানা ঘটনা আন্দোলন ও বিস্ফোরণ। ফলে সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি এবং চিন্তার জগতে নতুন নতুন উপাদান জড় হয়। প্রগতির সঙ্গে প্রতিক্রিয়ার ওৎপ্রোত সম্পর্ক। প্রগতি-বিরোধী সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক ভাবধারার সাংস্কৃতিক কার্যক্রম ও সাহিত্যচিন্তা সমাজ সম্পর্কের মধ্যেই উন্মেষ লাভ করে।

ইংরেজ শাসনের পত্তনের ফলে সমাজ ব্যবস্থার রূপান্তর সৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখে ১৭৯৩ সনের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তজাত জমিদারি ব্যবস্থা। গোটা ঔপনিবেশিক শাসনামলে বলবৎ এই ভূমি ব্যবস্থার ফলে সৃষ্ট সংকট মোকাবিলা করার জন্য অসংখ্য প্রতিরোধ সংগ্রাম সংঘটিত হয়েছে। বৃটিশ শাসনান্তর পাকিস্তানি আমলেও জমিদারদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও আন্দোলন অব্যাহত ছিল। জমিদারি প্রথার বিলুপ্তি ঘটে পাকিস্তান সৃষ্টির পর, ১৯৫০ সনে।

উনিশ শতকে বাংলাদেশে যে নতুন জমিদার শ্রেণী গড়ে ওঠে তাঁরাই শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাজনীতি সাহিত্য ও চিন্তার ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকায় অবস্থিতি লাভ করেন। ফলে বাংলা সাহিত্যে মধ্যশ্রেণীর জীবন ভাবনাই প্রধানত মূর্ত হয়েছে। ঔপনিবেশিক শাসকদেরকে দীর্ঘকাল ধরে ঐরাই সহযোগিতা করে পরাধীনতাকে দীর্ঘতর করেছেন। বাংলা সাহিত্যের

প্রধান স্রষ্টা মাইকেল মধুসূদন দত্ত বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র সকলেই মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানসন্ততি। ইংরেজ ও ঔপনিবেশিক শাসকদের সঙ্গে তাঁদের ও অন্যান্য পরিবারের পারিবারিক ও ব্যবসায়িক লেনদেনের গভীর সম্পর্ক ছিল। পাকিস্তান আমলের বাংলা সাহিত্যের যারা প্রধান কারিগর শিল্পী—তাঁদেরও ছিল এই ‘মধ্যবিত্ত চারিত্র’। সামাজিক রাজনৈতিকভাবে জনগণের স্বার্থের দিকে না তাকিয়ে তাঁরাও পাকিস্তান সরকারের কৃপা লাভের জন্য চিন্তা ও কর্মকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করেছেন।

হিন্দু জাগরণের পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়ায় মুসলমান সমাজের নেতাদের মধ্যেও সমাজ প্রগতির চেতনা জাগ্রত হয়। নবাব আবদুল লতিফ, সৈয়দ আমীর আলী প্রমুখের সাংগঠনিক কর্মতৎপরতায় মুসলিম জীবনে যে চেতনাবোধের সঞ্চার হয়, তারই ফল ১৯০৬ সনের ‘মুসলিম লীগ’। লীগ ও কংগ্রেসের নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক আন্দোলনের ফলে সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক এমন উষ্ণ ও উগ্র হয়ে ওঠে যে ভারত বিভাগ অনিবার্য হয়ে ওঠে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলেই এদেশের রাজনীতিতে পেশী ও পশু-শক্তির উদ্ভব। ভারতবর্ষে কালে কালে যতোগুলো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হয়েছে, পশু-শক্তির অনশীলন ততো নতুন মাত্রা লাভ করেছে।

১৯৪০ থেকে ১৯৪৭ সনের মধ্যে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা অর্জন করে মুসলিম ভারতের বৃহত্তম রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়েছিল। ভারতের মুসলমানগণ পাকিস্তান চায় কিনা তা নির্ণয় করার জন্য ১৯৪৬ সনে ভারতবর্ষে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৫৪ সনে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনের সময় বাংলাদেশে মুসলিম লীগের ঘেরকম ভরাডুবি ঘটছিল, ১৯৪৬ সনের নির্বাচনে মুসলিম লীগ বিরোধী মুসলমানদের অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলিরও সে দশা হয়েছিল। ‘মুসলিম লীগ অর্থাৎ পাকিস্তান আন্দোলনের বিরুদ্ধে যদি কোন মুসলমান ক্ষীণ প্রতিবাদও করতো তবে তার আর রক্ষা ছিল না।’<sup>৪</sup>

পাকিস্তান দাবির জন্য হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা যে ভ্রাতৃঘাতী নৃশংসতার জন্ম দেয় তার তুলনা ইতিহাসে বিরল। এর প্রকোপ ১৯৪৭ সনে কমে গেলেও লোকবিনিময়-নীতির সূত্রে সংখ্যালঘুদের বিতাড়নের নতুন উপায়ও পাওয়া গিয়েছিল। সংখ্যাগুরুরা (সংখ্যালঘুদের উপর) নানা অত্যাচার শুরু করলেন। ফলে ভারত-বিভক্তির পরও দু’দেশের হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কের উন্নতি ঘটলো না। ‘স্বাধীনতা’ বা ‘আজাদী’ লাভের ইচ্ছার মূলে ছিল মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও মানবিক মুক্তির প্রেরণা। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পরেও কোনো ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যকর কোনো পরিবর্তনের সম্ভাবনাই সূচিত হলো না। পশ্চিম পাকিস্তানি রাজনৈতিক ও আমলাদের শোষণের নতুন কৌশল প্রবর্তনের ফলে এদেশের জনগণের কাছে স্বাধীনতা-প্রাপ্তি প্রতিভাত হলো ‘তথাকথিত আজাদী’ বা ‘অর্থহীন স্বাধীনতা’ রূপে। ৮ নভেম্বর ১৯৪৭ সনে অর্ধ-সাপ্তাহিক ‘চাবুক’ এর সম্পাদকীয় নিবন্ধে লেখা হয়েছিল :

তথাকথিত স্বাধীনতা লাভের পর আমরা আশা করিয়াছিলাম এইবার মানুষের জন্য মানুষের সত্যিকার প্রীতির উৎসমুখ অন্তত কিছুটা ভার মুক্ত হইবে। কিন্তু প্রাণের কোনও স্পন্দন অনুভূত হয় নাই। ... দেশের নানা স্থানে পৈশাচিকতার তাণ্ডব (সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা) স্বাধীনতার প্রথম-প্রভাতে রুদ্ধ পুলকের ফটুস্ত আবেগের পথ রোধ করিয়াছে। এই অমানুষিক বর্বরতা জাতি গঠনের প্রথম প্রভাতটিকে মর্মান্তিক ব্যথায় ম্লান করিয়া তুলিয়াছে।

এই অবস্থাতে ভাগ্য-দেবতার নিষ্ঠুর অভিশাপ মাথা পেতে নেবার শক্তি ও সাহস সকল শুবুদ্বিসম্পন্নরাই আপন অন্তরে সঞ্চার করতে চেয়েছিলেন, কারণ তাঁরা বিশ্বাস করতেন 'ভাগ্যাকাশে বন্ধনমুক্ত জ্যোতিস্মান ভবিষ্যতের সূচনা অবশ্যস্তাবী।' মুসলিম লীগের নির্যাতনের ফলে সে আশাও মরীচিকায় পরিণত হয়।

'পাকিস্তান' প্রস্তাব উত্থাপনের পেছনে ক্রিয়াশীল ছিল হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ। আর এই বিরোধ মুসলিম মনে জাগ্রত হয়েছিল 'হিন্দু-জাগরণের' ও 'হিন্দু-রাজ্য গঠনের' জিগির থেকে। ফলে 'ধর্ম-মোহ' এদেশের মানুষের সৃষ্টি ধর্মের সাধনায় ব্যর্থতার প্রতিরূপে প্রকট হয়ে উঠলো। আমাদের দেশের প্রধান চিন্তাবিদ, নেতৃবর্গও এই 'ধর্ম-মোহ' বৃদ্ধিতে কার্যকর অবদান রেখেছেন। মহাত্মাগান্ধী, মহাকবি ইকবাল উন্নততর মানবতাবাদী হয়েও সকলকে স্বধর্মনিষ্ঠ ধার্মিকরূপে গড়ে উঠতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। এতে করে এইসব মনীষীরাই প্রকৃতপক্ষে ধর্মের নেশায় জনগণকে মোহাক্ষ করে তুলেছিলেন। এই মোহাক্ষতা থেকেই হিন্দু-মুসলমানের বিরোধকে তাঁরা চিরস্থায়ী সমস্যারূপে দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন।<sup>৬</sup>

কিন্তু শুবুদ্বিসম্পন্ন বুদ্ধিজীবীরা ধর্মীয় মোহাক্ষতা এবং পাকিস্তান প্রস্তাবকে মেনে নিতে পারেন নি। তাঁরা দেখেছিলেন মহাকবি ইকবালের পরিকল্পনা অনুযায়ী ভারতবর্ষ বিভক্ত হলে মুসলমানেরা আর্থিকভাবে দুর্বল ও পঙ্গু হয়ে পড়বে। কারণ 'মুসলমানদের ভাগে দেশের যে অংশ পড়বে তা সাধারণত অনুর্বর। অথচ দেশকে ভাগ যদি করতেই হয় তবে এ ভিন্ন অন্য কোন রকমের ভাগ অসম্ভব বলেই মনে হয়। বাঙলা আর পাঞ্জাবকে বিশেষভাবে ইসলামি দেশে পরিণত করবার চেষ্টা শুধু যে বাঙালি হিন্দু আর পাঞ্জাবি শিখের কাছ থেকে প্রবল বাধা পাবে তাই-ই নয়, সে চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হলেও অসার্থক হবে ভৌগোলিক কারণে—পাঞ্জাব থেকে বাঙলার দূরত্বের জন্যে।'<sup>৭</sup>

কিন্তু তবুও কুচক্রীদের কারসাজিতে ভারত ও বঙ্গভঙ্গ হলো (১৯৪৭)। কুচক্রীদের মধ্যে অবাঙালি রাজনৈতিক নেতা, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের দালাল-এজেন্ট বুদ্ধিজীবী কায়মীস্বার্থী পুঁজিপতি এবং ব্রিটিশ কূটনীতিকবৃন্দ প্রধান শক্তি হিসেবে সক্রিয় ছিলেন। কুচক্রী ও তাদের সহযোগিরা সফল হয়েছিলেন। কারণ বাঙালি মুসলমান ও হিন্দু নেতাদের মধ্যেও উপরিউক্ত চক্রান্তকারীদের সহায়ক সহযোগী ছিলেন, এবং ভারত বিভাগের কালে রাজনৈতিক কূটচালে তাঁরাই প্রধান ভূমিকা পালন করেছিলেন। বিভিন্ন ধারার শুবুদ্বিসম্পন্ন মানবতাবাদীদের ভূমিকা তখন বিশেষ প্রভাব বিস্তারকারী ছিল না।

এ. কে. ফজলুল হক, এইচ. এস. সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিম প্রমুখ নেতৃবর্গ তখন নাজিমউদ্দীন ও আকরম খাঁ-পন্থীদের উপদলের এবং জিন্নাহ লিয়াকতপন্থী দ্বিজাতিতত্ত্বের অনুসারী কূটবুদ্ধি-প্রধান রাজনীতিকদের চালে ঘটনার আবের্তে অনেকটা 'ক্রীড়নক' হয়ে পড়েছিলেন। বাঙলা তাই জম্মু-কাশ্মির ও অপরাপর ছোটবড় সমস্যাজটিল অঞ্চল ও প্রদেশের মতোই নানা সমস্যাকে চিরজনমের মত আত্মস্থ করে ভাগ হয়েছিল। ফলে পূর্ব বাঙলার কৃষিপণ্য ও কৃষক-শ্রমিকের ধনে-সম্পদে গড়ে ওঠা কলকাতা ও সন্নিকটবর্তী কারখানাসমূহ রয়ে গেল ভারতের অঙ্গরাজ্য পশ্চিম বাঙলায়; কিন্তু পাটচামের উপযুক্ত জমি

ও পাটচাষীরা রয়ে গেলেন পূর্ব বাঙলায়। শিল্পকারখানা বিশেষ করে পাট উৎপাদনের প্রধান অংশ থেকে যায় পূর্ববঙ্গে। সমস্ত চটকল ছিল কলকাতা ও শহরতলী অঞ্চলে। কাঁচা পাটের উৎপাদন ব্যবস্থা পূর্ববঙ্গে কিন্তু পাটকল এ অংশে ছিল না। পরে নতুন করে গড়ে উঠলো খুলনা ও দৌলতপুরে।

পূর্ব বাঙলার সংস্কৃতিকর্মী, শিক্ষিতশ্রেণী, সাহিত্যকর্মী, চিন্তাবিদদের প্রধান সক্রিয় গোষ্ঠী (হিন্দুই অধিক) সাম্প্রদায়িক উগ্রতার জন্য 'উদ্বাস্ত' হলেন ভারতের। আর পূর্ব বাঙলায় 'মোহাজের' ভাতারূপে বরণ করে নেয়া হল লক্ষ লক্ষ দরিদ্র অশিক্ষিত অবাঙালি মুসলমানদেরকে; যারা অচিরেই বাঙালির অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের বিকাশের পথে প্রধান প্রতিবন্ধক রূপে দাঁড়িয়ে গেল। তারা শত্রুতা শুরু করে যে দেশের ভাতে কাপড়ে তাদের জীবন বাঁচল, সেই দেশের মানুষের ভাষা, সংস্কৃতি ও অর্থনীতির সঙ্গে। ফলে ঢাকা, এবং বিভিন্ন শহর বন্দরে অবাঙালি মুসলমানেরা স্থানীয় কুচক্রীদের সহায়তায় যেভাবে বাঙালি-উচ্ছেদে বৃত্তী হলো, তাতে সমাজের অভ্যন্তরে এক নতুন সমস্যার সৃষ্টি হয়। জোর করে হিন্দুদের বাড়ি দখল করায় এবং ভারতের মুসলমানরা অনুরূপ অত্যাচারের শিকার হয়ে পাকিস্তানে চলে আসায় জনজীবনে, সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে বিষক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।

বাঙলার ইতিহাসের যে-অধ্যায়ে ব্যাপক হারে বাস্তবত্যাগ ঘটেছিল, তা উভয় বাঙলার এক অতি দুঃসময়ের কাহিনী। হিন্দুর পাড়ায় মুসলমানের যাওয়ায় বিপদ ছিল; আর মুসলমানবহুল অঞ্চলেও হিন্দুর গতিবিধি নিরাপদ ছিল না। এই অবস্থায় দুই বাঙলার হিন্দু-মুসলমান 'উদ্বাস্ত' ও 'মোহাজের' হিসেবে দুর্ভোগের জীবন বেছে নিতে বাধ্য হয়। দুর্দশাগ্রস্ত লোকদের পুনর্বাসনের অছিলায় দু'দেশেই ব্যাপকভাবে জোর-জবরদস্তি বাড়িঘর দখলের হিড়িক পড়ে যায়। দখলের প্রয়োজনে দরকার হয় দাঙ্গার। ১৯৪৭ সনে ঢাকায় জোর করে বাড়ি দখলের ঘটনা ঘটে সংখ্যাগুরু সদস্যদের এমনকি প্রশাসনের নাকের ডগায়।<sup>৮</sup>

১৯৫০ সনে ভারত বর্ষের বিভিন্ন স্থানে মর্মান্তিক দাঙ্গার প্রতিক্রিয়ায় ঢাকায় মারাত্মক দাঙ্গা আরম্ভ হয় ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৫০ থেকে। মাসিক 'মাহেনও' পত্রিকায় সেই দাঙ্গা সম্পর্কে লেখা হয় : মাগরেবি (পশ্চিম) বাংলায় সাম্প্রতিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও সংখ্যালঘিষ্ট মুসলমানদের উপর যে অকথ্য ও অচিন্ত্যনীয় জুলুম করা হয়েছে সে-সব্বন্ধে মাগরেবী বাঙ্গালার ব্যবস্থা-পরিষদের ৭ জন সদস্য নেহেরুর নিকট স্মারকলিপি দাখিল করেন। এটা প্রামাণ্য দলিল। এতে দেখা যায়... (বিভিন্ন) স্থানে হত্যা, লুটতরাজ গৃহদাহ এবং মুসলিম তরুণী নিখোঁজ হয়েছে। ১০ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় এর প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ফলে ১২ ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানদের উপর হিন্দুদের নৃশংসতা চরমে ওঠে। ১৯ জানুয়ারি হতে ৪ মার্চ ১৯৫০ পর্যন্ত একইভাবে অবাধগতিতে মুসলমান পীড়ন চলে।<sup>৯</sup>

একথা বলা চলে যে, উচ্চস্তরের নেতৃবৃন্দের (কংগ্রেস ও লীগ—জিন্নাহ ও নেহেরু) ঘোষণার মধ্যেই উদ্বাস্ত-সমস্যার বীজ নিহিত ছিল। জিন্নাহ ২৫ নভেম্বর ১৯৪৫ তারিখে লোক-বিনিময়ের পরামর্শ দিয়েছিলেন। নেহেরু ঘোষণা দিয়েছিলেন : 'দেশ বিভাগের পর

যাদের নাড়ীর যোগ ভাবি ভারত রাষ্ট্রের সহিত ছিন্ন হবে, অথচ—যারা রয়ে যাবে ভাবী পাকিস্তান রাষ্ট্রে, তাদের কল্যাণচিন্তা ভারতের ভাবী শাসকদের মনে নিত্য জাগ্রত থাকবে এবং এমনকি প্রয়োজন হলে তারা যদি অবস্থা বিপর্যয়ে দেশত্যাগী হতে বাধ্য হয়, তাদের ভারতের মধ্যে পুনর্বাসনের জন্য সকল সুযোগ-সুবিধা দেবার ব্যবস্থা করা হবে।<sup>১০</sup>

নেতাদের অঙ্গীকার ভবিষ্যৎ দুর্দিনের আশঙ্কা থেকে পরিত্রাণ লাভ করবার একমাত্র ক্ষীণ আশার আলোকবর্তিকা রাপেই সেদিন জনগণের সম্মুখে বিরাজ করেছিলো বটে; কিন্তু এই আশ্বাসেই লঘুদের বাড়ি দখল, লুণ্ঠতরাজ করার জন্য গুরুদের পেশীতে পশুশক্তির সঞ্চার হয়েছিল। বঙ্গ বিভাগের ফলে বাঙলার অখণ্ড অর্থব্যবস্থা বিভক্ত হয়ে পড়ে। ১৯৪৩ (১৩৫০)—এর স্মরণকালের ঐতিহাসিক দুর্ভিক্ষের স্মৃতিচিহ্ন তখনও জনমানস থেকে মুছে যায়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর (১৯৩৯-৪৫) পরিস্থিতিতে প্রশাসন কর্তৃক গৃহীত কালাপাহাড়ি সিদ্ধান্তের দ্বারা (ইচ্ছাকৃতভাবে) বাঙলাকে দুর্ভিক্ষ কবলিত করে দেয়া হয়েছিল। অভাব, অনটন, দুর্ভিক্ষ, অশিক্ষা, সাম্প্রদায়িক হীনমন্যতা দেশভাগের (স্বাধীনতা লাভের) পরেও দুর্নীতিবাজিতে মানুষকে মত্ত করে তুললো। কালোবাজারি, মোনাফাখোরি, চোরাকারবারী ফাঁকি প্রভৃতি ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ ব্যবসা বাণিজ্য এবং অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে ধ্বংস করে দিচ্ছিল। স্বাধীনতার পরে পরেই জনগণ তাই 'ইয়া আজাদী খুঁটা হ্যায়' শ্লোগান কম দুঃখে তুলেছিল না।

দীর্ঘকাল ধরে মোটের উপর যে অখণ্ড, অনেকটা সুসংবদ্ধ অর্থ-ব্যবস্থা, বাঙলাদেশে গড়ে উঠেছিল তাকে হঠাৎ অবৈজ্ঞানিকভাবে ভেঙ্গে দেওয়ায় দেশ নানা অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিল। বিশেষ আঘাত আসে কৃষি ক্ষেত্রে, কৃষকদের উপর। অন্নবস্ত্রের অভাব ও সামাজিক অব্যবস্থার ফলে অনিবার্য পরিণতিরূপে দেখা দেয় গণবিক্ষোভ। এ থেকে দানা বাঁধে গণআন্দোলন। একে দমন করার জন্য পাকিস্তান সরকার আইন, আদালত, পুলিশ, জেল জুলুম, হত্যা, ধর্ষণ ইত্যাদি নিয়ে এগিয়ে এল বাঙালিদের দমন করার জন্য।<sup>১১</sup>

সামাজিক অত্যাচার নিপীড়ন সৃষ্টির নেপথ্যে কুচক্রীদের শক্তির উৎস ছিল দ্বিজাতিতন্ত্রে বিশ্বাসী রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত মুসলিম লীগ সরকার। পূর্ব পাকিস্তানের মুসলিম লীগকে নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানি অবাঙালি মুসলমানদের নতুন উপনিবেশরূপে পূর্ববঙ্গকে গড়ে তোলার ব্যবস্থা করেন লিয়াকত নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ। জিন্নাহ যে প্রকৃত প্রস্তাবে যুক্ত বাঙলার প্রস্তাব সোহরাওয়ার্দীকে উত্থাপনের জন্য উস্কানি দিয়েছিলেন কি উদ্দেশ্যে তা আজ আর অস্পষ্ট নেই। কায়েদে আজম পরবর্তীতে রহস্যজনকভাবে নির্বাক থেকে কুট মতলবকে স্বীকৃতি দিয়ে গেছেন। মুসলিম লীগের ষড়যন্ত্রে কলকাতা পূর্ব পাকিস্তানের হাতছাড়া হয়। এই ভয়ই ছিল যে, বৃহৎ বঙ্গ এক থাকলে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বাঙলাদেশকে শোষণ ও শাসন করা যাবে না। ওদিকে কংগ্রেসের অবাঙালি নেতৃত্বদণ্ড কলকাতা ভারতের সঙ্গে থেকে গেলে ক্ষতি কি, এই প্রশ্ন ও সংশয় তথা দ্বিধা বা লোভের টোপ ফেললেন হিন্দু নেতৃত্বদের সামনে। মুসলিম লীগের হীনমন্য নেতাদের তড়িঘড়ি সিদ্ধান্তে পাকিস্তান ভারতের অনূর্বর অঞ্চলগুলো নিয়েই গঠিত হলো। ক্ষতিপূরণ দাবির প্রতিও তাঁরা অতঃপর গুরুত্ব দিলেন না।



মুসলিম লীগের মধ্যে ক্ষমতা দখলের দ্বন্দ্ব চরমে উঠার ফলেই—

বঙ্গভঙ্গ রোধের বিশেষতঃ কলিকাতাকে পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করা, অন্যথায় কলিকাতার বিনিময়ে ক্ষতিপূরণ আদায়ের সংগ্রাম যখন গতিশীল হইয়া উঠিয়াছে ঠিক সেই সময় হঠাৎ ২৭ জুন প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির জরুরী সভায় মাত্র ৬ জন সদস্যের উপস্থিতিতে প্রস্তাব গ্রহণ করা হইল যে, ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তানের অস্থায়ী সদর দফতর স্থাপিত হইবে।

অথচ সোহরাওয়ার্দী বগুড়ার মুহাম্মদ আলী প্রমুখ মুসলিম লীগ নেতাদের বক্তব্য ছিল :  
যেহেতু

বাঙলার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণ বঙ্গ বিভাগ চাহে নাই, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ই এই বিভাগ দাবি করিয়াছেন, সুতরাং সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বাঙলার রাজধানীর উপর দাবি করিতে পারে না।

মুসলিম লীগের কতিপয় নেতার এই সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে তদানীন্তন মন্ত্রী বগুড়ার মুহাম্মদ আলী যে বিবৃতি প্রচার করেন, তাতে বলা হয় :

কলিকাতা পূর্ববঙ্গের অন্তর্ভুক্ত থাকিবে এবং কলিকাতা হইতেই পূর্ববঙ্গের শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হইবে।

মুসলিম নেতৃত্বকে দ্বিধাবিভক্ত করে কেন্দ্রীয় অভিসন্ধি চরিতার্থের প্রক্রিয়ায় কলিকাতার উপর আমাদের (মুসলমানদের) দাবি পরিত্যক্ত হইল। এমনকি ক্ষতিপূরণের টাকা আদায়ের (১২ কোটি?) প্রশ্নটিও অবলীলাক্রমে চাপা পড়িয়া গেল। বাংলার লীগ নেতৃত্বের মধ্যে চূড়ান্ত বিরোধ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পাকিস্তান আন্দোলনের সর্বাপেক্ষা সংগ্রামী (দল) ‘বঙ্গীয় মুসলিম লীগ কাউন্সিল’ ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইল। বলাবাহুল্য, দেশ বিভাগের পরপরই কেন্দ্রীয় হাই কমন্ড কর্তৃক চৌধুরী খালেদুজ্জামানকে পাকিস্তান মুসলিম লীগ সংগঠনের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। এই দায়িত্ব পালনের নামে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশের, এমনকি বিভক্ত পাঞ্জাবের মুসলিম লীগ বাতিল করিলেন না, বাতিল করিলেন একমাত্র বাঙলার মুসলিম লীগ—পাকিস্তান আন্দোলন ও প্রতিষ্ঠার মূলে যার ভূমিকা ছিল অনন্যসাধারণ। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর লীগের মধ্যে বিরোধ কিংবা ক্ষমতা দখলের দ্বন্দ্ব প্রত্যেক প্রদেশেই কমবেশি মাথাচাড়া দিয়া উঠে, কিন্তু অন্য প্রদেশে পরিবর্তন না ঘটাইয়া ‘পকেট লীগ’ গঠন করা হয় কেবল পূর্ব পাকিস্তানে।<sup>১২</sup>

লিয়াকত—নেতৃত্ব প্রথম থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের জননেতাদের দেশপ্রেমের প্রতি অসহিষ্ণু মনোভাব প্রদর্শন করতে থাকেন। বিরোধী মতবাদীদের প্রতি লিয়াকত ছিলেন অসহিষ্ণু ও প্রতিশোধপরায়ণ। যুক্ত বাঙলা সম্পর্কে কায়দে আজমের মনোভাব প্রকাশ্যভাবে প্রচারিত না—হবার মূলে কোনো উদ্দেশ্য ছিল এবং তিনি কোনো কারণে, কোণঠাসা করার জন্যই শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে এ—ব্যাপারে উৎসাহিত করেছিলেন। পাকিস্তান আন্দোলনকারী অনেকের স্মৃতিকথায় (ইতিহাসে) এই বক্তব্যের স্বীকৃতি রয়েছে। অথচ পরবর্তীকালে যুক্ত বাঙলার প্রস্তাবকে যখন শহীদ সাহেবের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয় তখন কায়দে আজম রহস্যজনকভাবে ‘নির্বাক’ থাকেন।<sup>১৩</sup>

মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার লক্ষ্যে পাকিস্তান আন্দোলন ঘনীভূত হলেও মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করার কাজে ধর্মকেও টানা হয়েছিল। কিন্তু ক্ষমতাসীন হয়েই মুসলিম লীগ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রশ্নকে সময়ে পরিহার করে শুধু ধর্মীয় বন্ধনকে সম্মুখে তুলে ধরে অথচ ভারতের মুসলিম আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে বিকৃত করে, প্রকৃত সমস্যা এড়াবার এবং শোষণ ও বৈষম্য অব্যাহত রাখার দূরভিসন্ধি

আঁটতে লাগলো। ধর্ম কোনো মূলমন্ত্র না হলেও ধর্মকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার লক্ষ্যে ব্যাপকভাবে ব্যবহারের নানা উদযোগ-আয়োজন করতে পূর্ব পাকিস্তানের ‘পকেট লীগ’ সরকার উঠে পড়ে লেগেছিল। পাকিস্তানের প্রায় প্রত্যেক শাসকেরই এই মনোভাব ছিল যে, এই প্রদেশের ‘জনগণের সহিত যাঁহাদের কিছুটা যোগাযোগ আছে এবং যাঁহারা জনগণের দাবি-দাওয়া, আশা-আকাঙ্ক্ষা তুলিয়া ধরিতে চাহেন বা বর্তমান শাসন ব্যবস্থার কোন প্রকার বিরোধিতা করেন, যে কোন পন্থায় তাঁহাদের জব্দ করিয়া রাখাই’ হবে অন্যতম পবিত্র দায়িত্ব। অথচ ‘কত রঙিন মধুর স্বপ্ন আর মহান আদর্শ নিয়াই না পাকিস্তান আন্দোলন গড়িয়া উঠিয়াছিল। কত ত্যাগ-তিতিক্ষা আর রক্তদানের মাধ্যমেই না পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন; নিজের ভিটামাটি ত্যাগ করিয়া মোহাজের সাজিয়াছিলেন। সেই স্বপ্ন কি সফল হইয়াছে? তাঁহাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা কি পূর্ণ হইয়াছে? তাঁহারা জানমাল ও মান ইজ্জতের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা পাইয়াছেন?’<sup>১৪</sup>

১৯৪৬ সনের নির্বাচনে পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলিম লীগ নেতৃত্ব আশানুরূপ ফল লাভ করতে ব্যর্থ হয়। পূর্ববাঙলার জনগণই পাকিস্তান অর্জন করে। কিন্তু পূর্ববাঙলার লোকদের নৈতিক মনোবল নষ্ট করার জন্য ‘পাকিস্তান হাসিলের কৃতিত্ব’ কয়েদে আজম লিয়াকত আলী প্রমুখ পশ্চিম পাকিস্তানি ব্যক্তি-বিশেষের ওপর অর্পণ করা হয়েছিল। নিজেদের দাবি করবার মতন কিছুই ছিল না বলে তারা কবি ইকবালকে পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা এবং কয়েদে আজমের নেতৃত্বে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সকল কৃতিত্ব প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল প্রচার মাধ্যমগুলোকে নিয়ন্ত্রণভুক্ত করে। গোটা পাকিস্তানের পত্র পত্রিকা, সিনেমা রেডিও, টিভিতে পশ্চিম পাকিস্তানিদের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালি ছাপোষা ব্যক্তিত্বহীন মেরুদণ্ড বিবর্জিত গণ্ডিত বুদ্ধিজীবী, কবি-সাহিত্যিক-রাজনীতিবিদেরাও ঐ শ্লোগান তুলতে উন্মাদ হয়ে যেতেন।

মুহাম্মদ ইকবাল উপমহাদেশের একজন প্রখ্যাত কবি সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহাকে যদি পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টারূপে গ্রহণ করিতে হয়, তবে বলিতে হয় যে, তাঁহার পরিকল্পনা আদৌ স্পষ্ট ছিল না। এমনকি, তাঁহার স্বপ্নে ভারতের পূর্বাঞ্চল বা পূর্ব পাকিস্তানের কোন স্থানই ছিল না; বরং বিভিন্ন সময়ে তিনি ভারতের অখণ্ডতার জয়গান গাইয়াছিলেন; কখনও বা বিশ্বকবি হিসাবে ‘সারা জাহাঁ ছে আচ্ছা হিন্দুস্তাঁ হামারা’ অথবা ‘চীন ওয়া আরব হামারা হিন্দুস্তাঁ হামারা’—এই ধরনের ভাবধারারও পরিচয় দিয়াছেন। জিন্নাহ সাহেবের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, নেতৃত্বের বিচক্ষণতা ও চারিত্রিক দৃঢ়তা সম্বন্ধে কোন বিতর্ক নাই, কিন্তু যাঁহারা স্বাধীনতা-আন্দোলনে জনগণের ভূমিকাকে তুচ্ছ স্থান দিয়া ব্যক্তি বিশেষের নেতৃত্বকে ফুলাইয়া-ফাঁপাইয়া তুলিতে প্রয়াসী তাঁহারা হয় রাজনৈতিক এতিম নয় গণবিরোধী।

পূর্ববাঙলার জনগণ (অধিকাংশ) মানসিকভাবে যে, ‘এতিম’ হয়ে পড়েছিলো—তার পেছনে অনেক কারণ ছিল। কলকাতা হাতছাড়া হবার পর পূর্ববাঙলায় বড় নগর ও শহর ছিল না। ঢাকা তখন ৯/১০ বর্গ মাইলের একটি ক্ষুদ্র মফস্বল শহর (১৯৭১ সনে ২০ লক্ষ লোকের অধিবাস ছিল), যেখানে আধুনিক জীবনযাত্রার উপকরণ ছিল না বরঞ্চ নাগরিক জীবনে ছিল পর্যাপ্ত গ্রাম্যতা এবং লৌকিক সংস্কৃতির প্রাবল্য। ভারত বিভাগ কালে বিশেষত বাঙলাদেশ বিভক্ত হয়ে কলকাতা পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, তাতে ফেডারেল রাজধানী পশ্চিম পাকিস্তানে স্থাপিত হওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিলনা।

দ্বিতীয়তঃ অবিভক্ত ভারতে উচ্চপদস্থ মুসলিম সরকারি কর্মচারীদের যে হার ছিল তাতে পূর্ব পাকিস্তান অনেক পেছনে পড়েছিল। প্রাক্তন আই.সি.এস.দের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানি মুসলমান ছিলেন মাত্র একজন।

ভারত হইতে ‘অপশন’ দিয়া যে সকল মুসলিম আই.সি.এস. এবং উচ্চপদস্থ কর্মচারি পাকিস্তানে আগমন করেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রথমদিকে অবাঙালিরাই ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ। স্বভাবতঃই কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থায় পশ্চিম পাকিস্তানে বসবাসকারি অবাঙালি অফিসাররাই প্রাধান্য বিস্তার করেন।<sup>১৫</sup>

কায়েদে আজম দেশ শাসনের ব্যাপারে রাজনীতিকদের থেকে আমলাদেরই পছন্দ করতেন বেশি। এক শ্রেণীর রাজনীতিক পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে ও পরে ব্যক্তিগত সুবিধা ও পদমর্যাদা লাভের লোভে এমন ব্যক্তি-পূজা ও স্তাবকতা শুরু করেন যে, তাদের যোগ্যতা ও দেশপ্রেম সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে। একারণেই ‘জিন্নাহ মন্ত্রী সভায় গোলাম মুহাম্মদ ও স্যার জাফরুল্লাহ খানের মতন আমলাদের স্থান দিলেন। তাতে স্বাভাবিকভাবেই কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থায় আমলাদের প্রভাব দিন দিন বাড়তে থাকে। একটা উল্লয়নকামী দেশে উদ্বৃত্ত বাজেট ধোঁকাবাজি ছাড়া আর কিছুই নয়। অথচ গোলাম মুহাম্মদ অর্থমন্ত্রী হিসাবে বছরের পর বছর উদ্বৃত্ত বাজেট পেশ করতে লাগলেন। রাজনৈতিক তাক লাগানো ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য তাতে ছিল না। রাজনীতিকদের চেয়ে আমলাদের দেশ শাসনের ব্যাপারে যে অধিকতর দক্ষতা আছে তা প্রমাণের জন্য তাঁরা ধোঁকাবাজির সৃষ্টি করতেন। পত্র-পত্রিকাগুলো অন্ধভাবে বাজেটের প্রশংসা করতো, আর ভারতের সঙ্গে তুলনা করে পাকিস্তান-এর প্রচার মাধ্যমগুলো খুব আত্মপ্রসাদ লাভ করতো। খুব কম পত্রিকাই অর্থনীতির এই ধোঁকা বুঝতে পারত এবং বুঝলেও সঠিক সমালোচনা করতে সাহস পেত না। লিয়াকত চক্দের কারসাজিতে পূর্ব পাকিস্তানে দুর্বল নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে মৌলানা আকরম খাঁকে পূর্ব পাকিস্তানের মুসলিম লীগের সংগঠক ও কর্ণধার নিয়োগ করা হয়েছিল। ফলে এক ধরনের বঙ্ক্যাত্ত, নৈরাজ্য ও অন্ধকার সমাজের সর্বত্র সঙ্ক্যা ঘনিয়ে আসার মতোই অশুভ ছায়ায় পূর্ববাঙলাকে ঘিরে ফেলেছিল।

### তথ্যপঞ্জি

১. গোপাল হালদার, বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা, ঢাকাই সংস্করণ, ১৯৮৭, পৃ. ৫।
২. আহমদ শরীফ, বিচিত্র চিন্তা, ঢাকা (২য় সং) ১৯৭৫, পৃ. ১৩০।
৩. সুপ্রকাশ রায়, বিদ্রোহী ভারত, কলকাতা ১৯৮৯, ভূমিকা দৃষ্টব্য।
৪. তাফাজ্জল হোসাইন, স্মৃতিকণা, মুক্তধারা, ঢাকা ১৯৮৪ (২য় সং) পৃ. ৯৪।
৫. সাপ্তাহিক (তখন অর্ধ-সাপ্তাহিক) চাবুক, ঢাকা ৮ নভেম্বর ১৯৪৭ ১৫ বর্ষ ৪৯ সংখ্যা দৃষ্টব্য।
৬. মহাত্মা গান্ধীর অসাম্প্রদায়িক মানবতাবাদ, নিরবচ্ছিন্ন ও নিষ্কলুষ সত্য-প্রীতি এবং জগতের হিত সাধনার প্রচেষ্টা বস্তুগতভাবে ‘ব্যর্থ’ হয়ে একালের হিন্দুকে যে স্বর্ধর্মের প্রতি অভিমানী আচারনিষ্ঠ করে তুলেছিল, এবং মহাকবি মুহাম্মদ ইকবাল-এর অধ্যাত্ম সাধনা ও আত্মতত্ত্ব বা ‘আমি-তত্ত্বের প্রভাব মুসলিম-মানসে প্রতিফলিত হয়ে প্রকৃতপক্ষে বিচ্ছিন্নতাবাদী করে তুলেছিল—সে সম্পর্কে ‘বাংলার জাগরণ’-পন্থী চিন্তক, মনস্বী কাজী আবদুল ওদুদ-এর যুক্তিসিদ্ধ অনেক আলোচনা আছে তাঁর

‘শাহতবঙ্গ’ গ্রন্থে বিশেষ করে ‘শতবর্ষ পরে রামমোহন’ এবং ‘ইকবাল’ শীর্ষক প্রবন্ধে। (দ্র. বাংলা একাডেমী প্রকাশিত ওদুদ রচনাবলী)

গান্ধী ও ইকবালের চিন্তাধারার রাজনৈতিক প্রভাবের আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মাগান্ধী ও মুহম্মদ ইকবালের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করার পরও একথা অস্বীকার করে লাভ নেই যে, বাঙলা, তথা ভারতের হিন্দু ও মুসলমানের জনচিত্তে এই সকল চিন্তানায়কের ধর্ম দর্শন ও কর্মের উল্টো প্রভাব পড়েছিল। তিনি বলেন, ১৯৪৭ সনের স্বাধীনতা যে দেশের সর্বসাধারণের জন্য সার্থক হয়ে ওঠেনি, তার কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে দেখা যায়,— উপরিউক্ত মনীষীদের জনপ্রিয়তার মূলে ছিল যে ধর্মবোধ, মনীষা বা মহাপ্রাণতা—তার পরিবর্তে তাঁদের কোন কোন কথায় ও আচরণে দেশের শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সমাজের আত্ম অভিমান (‘আমি সনাতনী, হিন্দু’ বা ‘আমি মুসলমান, এক আল্লাহর দাস’) লালিত হবার সুযোগ পেয়েছে। ১৯৪৯ সনে কাজী আবুল ওদুদ পাকিস্তান সৃষ্টি বা ভারত-বিভাগের পরে, ব্যথিত চিত্তে এক সভায় বলেছিলেন—‘এ ব্যাখ্যা ভিন্ন পরীক্ষার দিনে তাঁদের অনুরাগীদের এমন শোচনীয় পরিচয়ের আর কি হেতু খুঁজে পাওয়া দুঃসাধ্য?... প্রতিভার সার্থকতা, বহুল পরিমাণে নির্ভর করে তার চারপাশের শিক্ষিত সমাজের গুণগ্রাহিতার উপরে।’ ‘আমাদের দেশের শিক্ষিত সমাজ আমাদের একালের বরণ্য—নেতাদের বিশেষত গান্ধীর তপস্যা কিভাবে ব্যর্থ করেছে—সে সম্বন্ধে স্মরণীয় কাজী আবদুল ওদুদের উপযুক্ত উক্তি।

“... মহাত্মাগান্ধীর কথা ভাবা যাক। তাঁর সাধনার প্রধানত দুটি স্তর। প্রথম স্তরে তিনি সব ধর্মকে জ্ঞানতেন স্বয়ংসম্পূর্ণ বলে। দ্বিতীয় স্তরে তিনি ভগবান বলতে বুঝলেন সত্য; প্রত্যেক কর্মকেই জ্ঞানলেন কিছু কিছু ক্রটি পূর্ণ আর সেজন্মা প্রত্যেক ধর্মের মহত্তম বিকাশ প্রয়োজনীয় জ্ঞান করলেন; ধর্ম বলতে তিনি বুঝলেন নিরবচ্ছিন্ন ও নিশ্চল সত্য-প্রীতি ও জগৎ-হিত-সাধনা,—কোনো সাম্প্রদায়িক বা আচারপরায়ণ জীবন নয়। কিন্তু অগণিত জনচিত্তে তিনি লাভ করলেন কী-রূপ! তাঁর অপূর্ব সত্যপ্রীতি, জীব-প্রীতি তাঁর অনুরাগীদের অনুধাবনের বিষয় হলো না। তাঁদের জন্ম সত্য হলো তাঁর মূর্তির ও স্মৃতির সাড়স্বর পূজা-প্রদক্ষিণ,... রাম কৃষ্ণ বিবেকানন্দ ও মহাত্মাগান্ধীর মতো মহাজ্ঞান দেশে বিপুলভাবে আদৃত হয়েও ব্যর্থ হচ্ছেন এই বড় কারণে যে তাঁদের তপস্যা সক্রিয় হতে পারেনি তাঁদের অনুরাগীদের অন্তরাআত্মায়, তাঁরা বরণ্য ব্যবহৃত হয়েছেন তাদের অভিমান, মুখ্যত স্বধর্মের অভিমান, চরিতার্থতার কাজে। কিন্তু অভিমান তাদের জীবনে অনর্থ না ঘটিয়ে কি আর করবে? অভিমান কেন, স্বদেশপ্রীতির মতো মূল্যবান ভাবও মানুষকে সত্যকার কল্যাণপথে বেশি দূর এগিয়ে নিতে পারে না যদি সেই স্বদেশপ্রীতি গঢ়ভাবে যুক্ত না থাকে সত্য প্রীতি ও সর্বমানবপ্রীতির সঙ্গে।” (শাহতবঙ্গ,)

কবি ইকবালের প্রসঙ্গে কাজী আবদুল ওদুদ আলোচনা করেছেন অনেক, ‘ইকবাল’ শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি বলেন, তাঁর প্রধান মতবাদ—আত্মতন্ত্র বা আমিত্ত্ব-তন্ত্র বিকশিত হয় মুসলমান দেশসমূহের বিপদ ও ভারতের দুর্দশা মোচনের চিন্তা থেকে। ইকবালের মতে মুসলমানদের ‘পতনের মূলে সুফীমতের আত্মবিসর্জন ও বৈরাগ্য-বাদ। এই আত্মবিসর্জন ও বৈরাগ্যবাদ পরিহার করে তাদের হতে হবে আত্মবিকাশশীল ও সংসারে বরণ্য।’

সদাসক্রিয় অনন্ত লোলুপ আমিত্ত্বের সাধনা প্রাচ্যের সুপরিচিত কমহীন প্রশান্তির প্রবণতার বিপরীতে ইকবালের চিন্তাধারা খুবই যুগোপযোগী ও বিশেষ অর্থপূর্ণ ছিল বলে তিনি হয়ে উঠেছিলেন এযুগের প্রাচ্যের এক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। ‘এশিয়া-আফ্রিকার সব চাইতে বড় প্রয়োজন যেটি সেটি হচ্ছে তাঁর জড়তা-বিসর্জন আর প্রাত্যহিক জীবনকে সুন্দরতর মহত্তর করবার আগ্রহ। এ আগ্রহ ব্যক্ত হয়েছে প্রাচ্যের বহু কর্মী ও ভাবুকের বাণীতে। সেই আগ্রহ ইকবালের কাব্যে ধারণ করেছে এক প্রবল, অগ্নিশিখার মতো মোহনরূপ। তাই তিনি যে এ যুগের তরুণ সমাজের—আপাতত মুসলিম তরুণের—প্রাণের মানুষ হয়েছেন, এ অনেকটা অপরিস্রব।’

মুসলিম জাগরণের ক্ষেত্রে কবি ইকবালের এই সার্থকতা হিন্দু-চিন্তে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাবের সঙ্গে তুলনীয়। নীটসের সঙ্গে তুলনা করে কাজী আবুল ওদুদ বলেন :

“চিন্তানেতা নীটসে যেমন পরোক্ষভাবে ইউরোপের বর্তমান (আলোচনার কাল, ১৯৪২) ধ্বংসলীলার কারণ হয়েছেন তেমনি ইকবালের চিন্তাধারারও এমন অপব্যাখ্যা সম্ভবপর—এমন অপব্যাখ্যা বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাধারার হয়েছে—যার ফলে তাঁর মনুষ্যত্ব ও প্রতিভা তাঁর স্বদেশীয়দের আনন্দের কারণ না হয়ে দুঃখের কারণ হতে পারে দীর্ঘদিনের জন্য।”

৭. কাজী আবদুল ওদুদ, শাস্ত্রত বঙ্গ (ঢাকা ১৯৮৩) পৃ ১৯৪-৯৫ ও সাপ্তাহিক চাবুক, শারদীয় সংখ্যা ১৩৪৫ এ প্রকাশিত তাঁর ‘একটি প্রশ্ন’ শীর্ষক আলোচনা দেখা যেতে পারে। ইসরাইল খান সংগৃহীত একটি প্রশ্ন ছাপা আছে ঢাকার ‘লোকায়ত’ পত্রিকায়। সম্পাদক : আবুল কাসেম ফজলুল হক।
৮. অর্ধ-সাপ্তাহিক চাবুক, ১৫ বর্ষ, ৪৯ ও ৫০ সংখ্যা, ৮ ও ১১ নভেম্বর ১৯৪৭।
৯. মাহেনও (সম্পাদকীয়, ১ বর্ষ, ১২ সংখ্যা, মার্চ ১৯৫০, পৃ. ৫৬।
১০. শ্রী হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, উদ্বাস্ত, কলকাতা ১৯৭০, পৃ. ৮।
১১. আবদুল্লাহ রসুল, কৃষক সভার ইতিহাস, তৃতীয় সং কলকাতা ১৯৮২, পৃ. ১১১-১২।
১২. তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া, পাকিস্তানী রাজনীতির বিশ বছর, ঢাকা ১৯৮১, পৃ ৩৩-৩৪।
১৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪।
১৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬, ১৮ ও ১৯।
১৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৯।

## ২.২. রাজনৈতিক আন্দোলন এবং ঘটনাবলি

[ পাকিস্তানি সংস্কৃতি ও সংহতির জন্যে নানা বিকৃত উপায়ের অবলম্বন ; ভাষার প্রশ্নে পাকিস্তানের প্রথম সরকার বিরোধী গণ আন্দোলন ; একুশে ফেব্রুয়ারি আন্দোলনের আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ; যুক্তফ্রন্টের একুশ দফা ; যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনি ফলাফলে পশ্চিম পাকিস্তানিদের তথা কেন্দ্রীয় সরকারের গাত্রদাহ ; নির্বাচনের ফলাফল বানচালের পায়তারা ; পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক অস্থিরতা ; রাজনৈতিক দলের পুনরুজ্জীবন ; নয় নেতার বিবৃতি ; পাক-ভারত যুদ্ধ ; ছয় দফার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন দাবি ; ছয় দফা আন্দোলন দমনের জন্য আইউব সরকারের দমন-নির্যাতন-নিপীড়ন নীতি অবলম্বন ; আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামী শেখ মুজিব ও অন্যান্য বন্দীদের উপর নির্যাতনের অভিযোগ ; গণতান্ত্রিক আন্দোলন থেকে উদ্ভূত ১১ দফার দাবিতে ছাত্রদের আন্দোলন ; উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান ও গণবিদ্রোহের পরিণতিতে ক্ষমতার মঞ্চ থেকে আইউব খানের বিদায় গ্রহণ ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে ক্ষমতার মঞ্চে ইয়াহিয়া খানের আবির্ভাব ; উপকূলবর্তী অঞ্চলে সত্তরের ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় ও সত্তরের সাধারণ নির্বাচন ; আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ জয়লাভ ; নির্বাচনের ফলাফল বানচালের জন্য পশ্চিম পাকিস্তানিদের ষড়যন্ত্র এবং বাঙালি দমন-নিধনের জন্য সামরিক বাহিনীর নির্লজ্জ নির্মম হত্যায়ত্ত ; বাঙালির প্রতিরোধ সংগ্রাম এবং বাঙলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন । ]

কংগ্রেস ও লীগ, হিন্দু আর মুসলমান যদি একমত হতো তাহলে হয়ত বাঙলাদেশ অবিভক্ত থাকতো।<sup>১</sup> অবিভক্ত স্বাধীন বাঙলাদেশের সম্ভাবনা যে কারণে অক্ষুরে বিনষ্ট করে দেয়া হয়েছিল, সেই কারণেই সাম্প্রদায়িক মনোভাব টিকিয়ে রাখা হলো। পাকিস্তানে বাঙালি-সংস্কৃতির চর্চা পাকিস্তানবাদী সরকারের কাছে ভীতির বিষয় হয়ে রইলো। কারণ বাঙলাকে যারা দ্বিখণ্ডিত করেছেন, তাঁরা বাঙালি সংস্কৃতির অখণ্ডতা, বিকাশ বা অগ্রগতি মেনে নিতে পারেন না। পাকিস্তানের সিভিল ও মিলিটারি আমলা এবং দৃশ্যমান ও অদৃশ্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বাঙালিদের বিভেদকে স্থায়ী করার ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে ধর্মভিত্তিক সমাজ ও ইসলামি রাষ্ট্র কায়মে করার সংগ্রামে অবতীর্ণ হলেন। ফলে কোন অমুসলিম ব্যক্তি পাকিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধান হতে পারবেন না, এমন অগণতান্ত্রিক, অমানবিক বিধিও পাকিস্তানের সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। পাকিস্তানের কায়মি স্বার্থবাদী সরকার গণসাহিত্য ও গণসংস্কৃতির চর্চাকে প্রবলভাবে বাধা দিল।<sup>২</sup>

দেশ বিভাগের পর পাকিস্তানের রাষ্ট্র কাঠামোতে যখন বাঙালির ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির মূল্যহীনতা প্রকট হয়ে উঠল, আর সাহিত্যক্ষেত্রে প্রকৃত সৃষ্টিশীলতা ও জাতীয় অনুভূতির বাস্তবতা অস্বীকৃত হল, তখন সেই সংকটময় শূন্যতার কালে পূর্ব বাঙলায় প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছিল সুস্থ মানবিক চিন্তা ভিত্তিক জাতীয় সংস্কৃতি ও জাতীয় সাহিত্য চর্চার উপযুক্ত উন্মুক্ত পরিবেশ।

বিভিন্ন সাময়িকপত্রে বিভাগ পূর্বকালেই বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব পেশ করা হয়েছিল। সাতচল্লিশের পরেই বাঙালি জাতীয়তাবাদী একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী সাংবাদিক

সাহিত্যিক পত্র-পত্রিকায় 'বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষারূপে স্বীকৃতিদানের জন্য অনুরোধ করেছিলেন।<sup>১৩</sup> ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক ১৯৪৭ সনেই 'কৃষ্টিতে স্পষ্টই বাংলার অমর্যাদার পরিণতি ভালো হবে না বলে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ১৯৪৮ সনের বিভিন্ন বক্তৃতায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ন্যায় একটি উন্নততর কেন্দ্রীয় সাহিত্য সমিতি (বাংলা একাডেমী যার ফল) স্থাপনের প্রস্তাব করে আসছিলেন। ফলে সরকার এ-বিষয়ে সচেতন ও সতর্ক হয়ে ওঠে। তখন থেকেই শহরে শহরে সরকার মুৎসুদ্দী, বুদ্ধিজীবী সরল বাঙালির মাধ্যমে বাংলা ভাষার উৎসগত, বর্ণগত, বানান-গত এমনকি লিখনভঙ্গিগত নানা ক্রটির কথা প্রচারের ব্যবস্থা করে।

এ প্রচার জনগণকে সহজেই প্রভাবিত করে অন্য এক মনস্তাত্ত্বিক কারণে। বাঙালি মুসলমানেরা জন্মাবধি দেখছিল—জমিদার হিন্দু, মহাজন হিন্দু। শিক্ষিতেরা হিন্দু, চাকুরেরা হিন্দু, উকিল ডাক্তার ব্যবসায়ীরা হিন্দু; অফিস হিন্দুর, প্রশাসনও হিন্দুর। স্কুল কলেজের বাংলা বইগুলোতেও ছিল হিন্দুর লেখা ও হিন্দুর কথা। ফলে অর্থে বিশ্বে বেসাতে ও শিক্ষায় বঞ্চিত মুসলিম-মনে হিন্দুর প্রতি ঈর্ষা ক্ষোভ ও বিদ্বেষ ঘন হয়ে ওঠে।<sup>১৪</sup>

এই মনোভাবকে কাজে লাগাবার জন্য সরকারি পর্যায়ে বাংলার ওপর তিনদিক থেকে দুই দফায় হামলা চালানো হলো। নির্বিচারে আরবি ফারসি উর্দু শব্দ ঢুকিয়ে বাংলা ভাষার মুসলমানি রূপ ফুটিয়ে তোলা, আরবি হরফে বাংলা লেখা এবং উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করে জাতীয় জীবন থেকে বাংলাকে সরিয়ে দেবার ষড়যন্ত্র এর অন্যতম ঘটনা। বর্ণ ও বানান সংস্কারের ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম যবানের পার্থক্য সৃষ্টি করে ইসলামী স্বাভাব্য প্রদানের এবং 'বর্ণে বানানে, লিখনে জটিলতা, অসঙ্গতি ও অনিয়ম প্রমাণ করে রাষ্ট্রভাষা করানোর দাবি পরিহার করানো বা বাতিল করা।<sup>১৫</sup>

পাকিস্তানের অস্তিত্বিত দুর্বলতা ঘুচাবার কোনো স্বাভাবিক উপায় ছিলনা। তাই বিকৃত উপায়ের আশ্রয় গ্রহণ করতে হল। ভারত বিদ্বেষের মদিরা দিয়ে বাঙালিকে মাতাল করতে চাইল পাঞ্জাবি-শাসকগণ। কিন্তু বাঙালি চিন্তে জেগে উঠল ধর্ম-নিরপেক্ষ মানবতাবাদী ভাবধারা ও ভারতের প্রতি সৌহার্দ্য। পাকিস্তানবাদীরা স্বৈরাচারের আশ্রয়ে বাঙালিকে দমন করতে চাইল, গণতন্ত্রের আকাঙ্ক্ষায় বাঙালি উন্মাদ হয়ে উঠল। 'পাকিস্তানবাদীরা আঞ্চলিক শোষণ ও শ্রেণী-শোষণের সাহায্যে বাঙালি জাতিটাকে চিরকালের জন্য দাস করে রাখার ষড়যন্ত্র আঁটল—বাঙালিরা প্রাণপণে স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্রের মস্ত্রে দীক্ষা নিল। দিন যেতে লাগল, পাকিস্তানের দুর্বলতা ঘুচাবার বিকৃত চেষ্টা তীব্রতর হতে থাকল, আর তারই প্রতিক্রিয়া হিসেবে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা দ্রুত অনিবার্যতার দিকে এগুতে লাগল এবং ১৯৭১ সনের ২৫ মার্চ পূর্ব বাংলার জনগণের উপর ইয়াহিয়ার নির্বোধ সামরিক আক্রমণের পর স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাকে রোধ করার শক্তি পৃথিবীতে আর কারো রইল না।<sup>১৬</sup>

পাকিস্তানকে দীর্ঘায়ু করার জন্য যত বিকৃত প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছিল তার প্রতিটিই প্রতিক্রিয়া ও বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছে। পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলের বিকাশের

স্বাভাবিক গতিকে তারা চেয়েছিল কৃত্রিম প্রচেষ্টা দ্বারা নিজেদের অভীষ্ট খাতে প্রবাহিত করতে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল এক দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার সাহায্যে পাকিস্তানের পূর্ব খণ্ডের জনগণের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করে দিয়ে উর্দু ভাষা সাম্প্রদায়িক সাহিত্য ও পাকিস্তানি সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করতে। সেজন্য তারা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও সঙ্গীত নিষিদ্ধ করতে উদ্যত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র এবং হিন্দুরচিত সাহিত্যচর্চা সীমিত করা হয়। পৌরাণিক কাব্য-কবিতা-কাহিনী মুদ্রণ নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

পাশাপাশি সাম্প্রদায়িক সাহিত্য ও পাকিস্তানি সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার জন্য রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্র, সরকারি ও আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, স্কুল, টেক্সটবুক বোর্ড, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় সর্বত্র ব্যাপক আয়োজন করা হয়। এসবের মধ্যে উর্দু রাষ্ট্রভাষা, বাংলা হরফের পরিবর্তে আরবি ও রোমান হরফ প্রবর্তনের ষড়যন্ত্র এবং ১৯৫৭-তে সিপাহী বিদ্রোহের শতবার্ষিকী পালন এবং কতিপয় সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্মেলন এবং সাহিত্যিক আড্ডার কথা ইতিহাসে খ্যাতি অর্জন করে আছে। এখানে এসবের মাধ্যমে এক ধর্ম, এক জাতি ও একরাষ্ট্রের জিগির তুলে তারা ভেবেছিল দেশটাকে অঙ্গতা ও মুখতার অন্ধকারে ডুবিয়ে রেখে চিরকাল শাসন চালিয়ে যাবে। পাকিস্তানোসত্তর সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ঘটনা-প্রবাহ মিলিয়ে দেখলে দেখা যাবে, পাকিস্তানের রাষ্ট্রকাঠামোতে পূর্ব বাঙলাকে এক বিশেষ ধরনের পরিপূর্ণ উপনিবেশ করাই ছিল তাদের মূল উদ্দেশ্য।

পাকিস্তানের চর্বিশ বছরের আয়ুষ্কাল পাকিস্তানবাদী চক্র সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যে-সব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল, তা ছিল সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক, প্রাকৃতিক নিয়ম বিরোধী, নিবুদ্ধিতা প্রসূত হাস্যস্পন্দ ও কাণ্ডজ্ঞানশূন্য। কিন্তু সেসব আয়োজন পূর্ব বাঙালার জনগণের কাছে এসেছিল জীবনমরণ সমস্যার মতো এক বিরাট চ্যালেঞ্জ রূপে। অতএব বাঙালি সংগ্রামে, প্রতিরোধে পিছপা হয়নি।

পাকিস্তানের শাসকচক্রের সঙ্গে পূর্ব বাঙালার জনগণের বিরোধের প্রথম বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে। ১৯৪৮ সনের ২১ মার্চ রমনার রেসকোর্স ময়দানে এবং ২৪ মার্চে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিশেষ সমাবর্তন উৎসবে। পাকিস্তানের সৃষ্টা ও প্রথম গভর্নর জেনারেল মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঘোষণা করেন, 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। অন্য কোন ভাষা নয়।' রাষ্ট্রভাষারূপে বাংলা ভাষার প্রতিষ্ঠাকামীদের তিনি নানান কটুক্তি সহকারে তিরস্কারপূর্বক ধমক ও হুমকি প্রদর্শন করেন। পূর্ব বাঙলা সরকারের দমন নীতিকে এবং পাশবিক অত্যাচারকে সমর্থন করেন। এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ পূর্ববাঙলায় ভাষা-আন্দোলন ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং রাষ্ট্রভাষার গুরুত্ব সম্পর্কে জনগণ অবহিত হচ্ছিল। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ১৪৪ ধারা উপেক্ষা করে ১৯৫২ সনের ২১ থেকে ২৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ঢাকায় ছাত্র জনতা অবিরাম প্রচণ্ড বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। পুলিশের গুলিতে সালাহউদ্দীন, আবুল বরকত, আবদুল জব্বার, রফিক উদ্দীন, আবদুস সালাম প্রমুখ নিহত হন।

ভাষার প্রশ্নে পূর্ববঙ্গে ১৯৫২ সনের 'একুশে ফেব্রুয়ারি আন্দোলন' ও বিক্ষোভের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠলেও, এর পেছনে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শোষণ ও তা



থেকে মুক্তির প্রেরণাই মূল চালিকার শক্তিরূপে কাজ করেছিল। ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায় : ১৯৪০ সনের লাহোর প্রস্তাবের সময় থেকে ১৯৪৭ সনের ১৪ই আগস্টে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময় পর্যন্ত—পূর্ব বাঙলার জনসাধারণের মনে ভবিষ্যৎ স্বাধীন আবাসভূমিকে ঘিরে অনেক স্বপ্ন জেগেছিল। এক শোষকের বদলে নতুন আর এক শোষককে, এক অত্যাচারীর বদলে নতুন আর এক অত্যাচারীকে তারা ক্ষমতায় বসাচ্ছে—একথা তারা তখনও ভাবতে পারেনি। অনায়াসমুক্ত, অভাবমুক্ত, প্রেমপ্রাচুর্য ও ঐশ্বর্যপূর্ণ নতুন জীবনের স্বপ্নই তাদেরকে একদা পাকিস্তান আন্দোলনে আকৃষ্ট করেছিল।

মুসলিম লীগ নির্বাচনকালে (১৯৪৬) বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ ঘটিয়ে কৃষক—জনতার জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করে ইনসাফ প্রতিষ্ঠাপূর্বক সুখি—সুন্দর নতুন জীবন সৃষ্টির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। তা ছাড়া সোহরাওয়ার্দী আবুল হাশিম পরিচালিত মুসলিম লীগের নাজিমউদ্দিন—আকরম খাঁ—বিরোধী গ্রুপও তখন মানুষের মনে নতুন আশা—আকাঙ্ক্ষার জাগরণ ঘটিয়েছিল। সোহরাওয়ার্দী আবুল হাশিম প্রমুখ এবং ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি, নিখিল ভারত কিষাণ সভা ফজলুল হক পরিচালিত কৃষক প্রজা পার্টি প্রভৃতির আন্দোলনের ফলেও পূর্ব বাঙলার কৃষক জনতার মনে নব নব আশার সঞ্চার হয়েছিল। দীর্ঘদিনের হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা রায়টের বীভৎস স্মৃতি, তিক্ত জীবনাভিজ্ঞতা, জনসাধারণের মনকে ধীরে ধীরে দাঙ্গা—বিরোধী অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক করে তুলেছিল। তাদের মানসনেত্রে প্রত্যক্ষ হচ্ছিল একটা নতুন দেশ, সম্পূর্ণ নতুন সুস্থ ও স্বাভাবিক মনুষ্যজীবনের ছবি। কিন্তু লীগ শুধু মিথ্যা প্রতিশ্রুতি আর ভাওতাই দিয়েছিল। উন্নত সমাজব্যবস্থা ও রাষ্ট্রবিধির ক্রোন পরিকল্পনা দূরের কথা সেসবের চিন্তা পর্যন্তই ছিল না তাদের।

ফলে ক্ষমতায় গিয়ে (১৯৪৭ এর ১৪ আগস্ট এবং পরবর্তীতে) তাঁদের কিছুই করার উপায় ছিল না। এ—অবস্থায় তাঁরা আশ্রয় নিয়েছিল ‘রাজনৈতিক ইসলাম’ প্রচার, ভারতের কাশ্মির দখল করে নেয়ার জুঁজুর ভয় প্রদর্শন, ভারত—বিরোধী প্রচারণা ; সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বিতরণ ও উস্কানিদান এবং সীমান্ত সংঘর্ষের নামে গণমনে ভীতি—সঞ্চার আর কমিউনিষ্ট—নিধন ও মিথ্যা প্রচারের। কিন্তু জনসাধারণের মনে প্রায় সব সময় এ ধরনের প্রচারের ফলে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল।

এই পরিস্থিতিতেও কৃষক—শ্রমিক—ছাত্র মধ্যবিত্ত জনসাধারণ স্থানীয়ভাবে মাঝে মাঝেই আন্দোলনে অগ্রসর হয়ে চরম নির্যাতনের সম্মুখীন হয়েছে। গণ আজাদী লীগ, গণতান্ত্রিক যুবলীগ, তমদ্দন মজলিশ, পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগ, পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম আওয়ামী লীগ, পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টি, পূর্ব পাকিস্তান কৃষক সমিতি ইত্যাদি বহু সংগ্রামী প্রতিষ্ঠান বায়াম্মো সনের একুশের ফেব্রুয়ারির অভ্যুত্থানের আগেই আত্মপ্রকাশ করে বিভিন্ন আদর্শ, দাবিদাওয়া ও কর্মসূচির ভিত্তিতে আন্দোলন চালিয়ে আসছিল। “বস্তুত, ১৯৫২ সনের ফেব্রুয়ারি অভ্যুত্থান পূর্ব বাঙলার জনসাধারণের চার বছরের জমাট বাধা বিক্ষোভেরই ব্যাপক বিস্ফোরণ। সারা দেশ জুড়ে মানুষের মনে যে আক্রোশ সঞ্চিত হয়েছিল, ঢাকার ছাত্রদের ও জনসাধারণের মনে তাই সাহস, শক্তি ও প্রেরণা জুগিয়েছিল। আর সে আন্দোলনে জনসাধারণের আশা—আকাঙ্ক্ষাও ছিল বিভিন্নমুখি।”

কৃষকদের দাবির মধ্যে ঐক্য ছিল, আবার বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষকদের দাবির মধ্যেও ছিল বৈচিত্র্য। শ্রমিকদের দাবি ছিল এক রকম, কিন্তু মধ্যবিত্তের বিভিন্ন অংশের দাবি ছিল বিভিন্ন রকম। “ভাষার দাবি ও সরকারের ১৪৪ ধারা জারির ঘটনা উদ্ভূত পরিবেশে অগ্নিসংযোগ করেছিল মাত্র।”<sup>১৭</sup>

একারণেই ১৯৪৮ সনের ফেব্রুয়ারি-মার্চ ও ১৯৫২-র জানুয়ারি-মার্চ এর আন্দোলনের মধ্যে ‘সচেতনতা, ব্যাপকতা, সাংগঠনিক তৎপরতা ইত্যাদির ক্ষেত্রে তারতম্য’ বুঝতে হলে ‘মধ্যবর্তী চার বছরের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অগ্রগতির খতিয়ান’ মনে রাখতে হয়।<sup>১৮</sup>

পূর্ববাঙলার ভাষা আন্দোলন প্রাথমিকভাবে (১৯৪৮) সাংস্কৃতিক আন্দোলনরূপে বিকশিত হলেও পরবর্তীতে (১৯৫২-তে) রাজনৈতিক সংগ্রামের উন্নততর পর্যায়ে উত্তরণ লাভ করেছিল। বদরুদ্দীন উমর লিখেছেন : ‘১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলন যে সীমিত এলাকায় ঘটেছিল এবং ছাত্র-শিক্ষকসহ বুদ্ধিজীবীদের একাংশের মধ্যে যেভাবে সীমাবদ্ধ ছিলো ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন সেইভাবে সীমাবদ্ধ থাকেনি। দ্বিতীয় পর্যায়ের ভাষা আন্দোলন শুধু ভাষার প্রশ্নে সীমাবদ্ধ না থেকে তা শ্রমিক কৃষক ছাত্র বুদ্ধিজীবী ও মধ্যবিত্তের এক ব্যাপক গণপ্রতিরোধ আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়ে সমগ্র পূর্ব বাঙলায় এক অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। তা কেবল মুষ্টিমেয় ছাত্র শিক্ষক বুদ্ধিজীবীর আন্দোলন ছিলো না। শিক্ষাগত অথবা সাংস্কৃতিক আন্দোলনও ছিল না। বস্তুতপক্ষে তা ছিল পূর্ব বাঙলার ওপর সাম্রাজ্যবাদের তাবেদার পাকিস্তানি শাসক ও শোষক শ্রেণীর জাতিগত নিপীড়নের বিরুদ্ধে এক বিরাট ও ব্যাপক গণ আন্দোলন।’<sup>১৯</sup>

আন্দোলনের ঘটনাবলি ও পটভূমি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় শুধু জাতিগত নিপীড়নই নয়, পূর্ব বাঙলার অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন প্রকাশ শ্রেণীশোষণ ও শ্রেণীনিপীড়নও এই আন্দোলনের পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল। যুদ্ধ দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা দেশভাগ প্রভৃতি মফস্বল শহর, গ্রাম-গঞ্জে ক্রমাগত বিক্ষোভ বিদ্রোহ ও সংগ্রামের আগুন জ্বালিয়ে তোলে। ‘রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই’ শ্লোগান তুলে সারা পূর্ব বাঙলার আপামর জনতা মুখরিত হয়ে ওঠে। ছাত্রলীগ, যুবলীগ, আওয়ামী লীগ ও বামপন্থী কর্মী বাহিনীর নেতৃত্বে এই আন্দোলন এত তীব্র হয়ে ওঠে যে সরকারের পতন প্রায় অনিবার্য হয়ে পড়ে। কিন্তু বহু ছাত্র, শিক্ষক, রাজনৈতিক কর্মী ও নিরীহ মানুষকে গ্রেফতার করে, পরিশেষে এক দারুণ সন্ত্রাসের সৃষ্টি করে স্বৈরাচারি সরকার আন্দোলন দমন করে বটে, কিন্তু এই দমন নির্যাতন পূর্ব বাঙলার রাজনীতি ও সংস্কৃতি ভাবনায় এক নতুন মাত্রা সংযোগ করে দেয়।

পাকিস্তানি শাসকদের ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্র ও সমাজগঠনের নীতির উপর ভাষা আন্দোলন দারুণ আঘাত হেনেছিল। দলমত ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণী ও পেশার মানুষ একাত্ম হয়ে ধর্মনিরপেক্ষ মতাদর্শের জন্ম দিতে সক্ষম হয়। ‘পাকিস্তান আন্দোলন’ কালে যে সাম্প্রদায়িক এবং শ্রেণীভিত্তিক মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছিল এই আন্দোলন তা দূরীভূত করে সকল বাঙালিকে একমস্ত্রে একমঞ্চে মিলিত হবার সুযোগ করে দিয়েছিল। ফলে বায়ান্ন-সংলগ্ন

কালে পূর্ববঙ্গে ভাষা আন্দোলন সৃষ্ট জাতীয় চেতনার আলোকে তাঁদের দলীয় কর্মসূচি গ্রহণ ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়া চালু করতে বাধ্য হন। আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৮-১৯৭৯) তাঁর রাজনৈতিক আত্মজীবনী ‘আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর’ শীর্ষক গ্রন্থে লিখেছেন ২১ ফেব্রুয়ারিকে চিরস্মরণীয় করে রাখার ইচ্ছায় ফ্রন্টের বিভিন্ন অঙ্গদলের মেনিফেস্টোর সমন্বয়ে ১৯৫৪ সনের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের একুশ দফা প্রণীত হয়েছিল। তিনি লিখেছেন : ...২১ ফিগারটাকে চিরস্মরণীয় করিবার অতিরিক্ত উপায় হিসেবে যুক্ত ফ্রন্টের নির্বাচনী কর্মসূচিকে একুশ দফার কর্মসূচি করিলে কেমন হয়?১০

দফাগুলোর দিকে তাকালেই বোঝা যায় কেন মুসলিম লীগের চূড়ান্ত ভরাডুবি হয়েছিল।১১

পক্ষান্তরে পাকিস্তান মুসলিম লীগের কোন নির্বাচনী মেনিফেস্টো ছিল না। রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে মুসলিম লীগ নীরব ছিল। ‘ইসলাম বিপন্ন’; ‘পাকিস্তান বিপন্ন’ এই-ই ছিল মুসলিম লীগের নির্বাচনী অভিযানের সার কথা। তাছাড়া মুসলিম লীগের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন নূরুল আমীন, যিনি অন্যান্য দমননীতি ছাড়াও ১৯৫২ সনের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকালে ছাত্র-জনতার উপর গুলি চালাবার নির্দেশ দিয়ে জনপ্রিয়তা হারিয়েছিলেন। আর যুক্তফ্রন্টের নেতৃত্বে ছিলেন এ.কে. ফজলুল হক, মওলানা ভাসানী এবং এইচ এস সোহরাওয়ার্দী প্রমুখ জননন্দিত বাঙলার ঐতিহ্য স্থানীয় নেতৃবৃন্দ। একুশ দফার রচয়িতাদের শ্রেণীচরিত্র বিশ্লেষণ করে একজন সমালোচক দেখিয়েছেন :

সুবিধাবাদী উচ্চ ও মধ্যশ্রেণীর স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী ‘অধিকতর সুবিধাবাদী রাজনৈতিক নেতারা’ মূলত তাঁদের শ্রেণীগত আশা-আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতে রচনা করেছিলেন...তবু পূর্ববর্তী আন্দোলনসমূহের চাপে ও ৫২-র ফেব্রুয়ারি-অভ্যুত্থানের অব্যবহিত পরে যুক্তফ্রন্টের নেতাদের পক্ষে নির্বাচনী কর্মসূচি প্রণয়নের সময় বিভিন্নস্তরের জনসাধারণের দাবি-দাওয়া ও আশা-আকাঙ্ক্ষাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা সম্ভব হয়নি। ফলে একুশ দফার প্রতিশ্রুতিতে বিভিন্ন স্তরের জনগণের বিভিন্নমুখী দাবির ও আকাঙ্ক্ষার একটা মোটামুটি প্রতিফলন ঘটেছিল।১২

এবং পরবর্তীকালে আন্দোলনে নেতৃত্ব দানকারীদের পক্ষে এর থেকে ন্যূনতম দাবি নিয়ে জনসম্মুখে হাজির হওয়া সম্ভব হয়নি। ফলে ‘এই একুশ দফা মেনিফেস্টো পরবর্তীকালে পূর্ব বাঙলার ছাত্র জনতার জীবনবাণী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।’১৩

এজন্যই বায়ান্নো সনের ফেব্রুয়ারি অভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক তাৎপর্য উপলব্ধির জন্য যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের ২১ দফা কর্মসূচির মর্ম অনুধাবন প্রাসঙ্গিক, আর ১৯৫৪-র নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিরাত বিজয় যে বিশেষভাবে ভাষা-আন্দোলনের অবদানেই সম্ভব হয়েছিল তা আজ সর্বজন স্বীকৃত। প্রতিবছর ২১ ফেব্রুয়ারি উদযাপনের মধ্য দিয়ে পূর্ব বাঙলার জনগণের অধিকার ও স্বাভাবিক চেতনা; বঞ্চনাবোধ ও বিদ্রোহের তাগিদ দৃঢ়তর করার প্রেরণা তারা এখন থেকেই লাভ করে। ভাষা-আন্দোলনের ফলে বা প্রভাবে ধর্মনিরপেক্ষ অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি-চর্চার ধারা সৃষ্টি হয়। ফলে ছাত্র সংগঠন ও রাজনৈতিক দল গঠনের প্রক্রিয়ায় ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ অনুসৃত হতে থাকে। ২৪ জুন ১৯৪৯ সনে গঠিত ‘আওয়ামী মুসলিম

লীগ' নাম থেকে অতপর 'মুসলিম' কথাটি বাদ পড়ে। ১৯৫২-র ২৬ এপ্রিল তারিখে অসাম্প্রদায়িক ছাত্রসংগঠন 'ছাত্র ইউনিয়ন' গঠিত হয়। ২৭ এপ্রিল ১৯৫২-তে গঠিত হয় 'গণতন্ত্রী দল'। ১৯৫৩-র ২৬ জুলাই গঠিত হয় 'কেএসপি' বা কৃষক-শ্রমিক পার্টি। 'পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ' নাম থেকেও 'মুসলিম' কথাটি বারে পড়ে। অসাম্প্রদায়িক বেশ কটি প্রতিষ্ঠান অতপর গড়ে ওঠে। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ, আওয়ামী লীগ প্রভৃতিতেও কোন সাম্প্রদায়িক পরিচয় রাখা হলো না।

যুক্তফ্রন্টের (নির্বাচনে) বিজয়ে (১৯৫৪ সনের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত হয়) পশ্চিম পাকিস্তানে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। তাঁদের চূড়ামণিরা তখনও কেন্দ্রের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল, যে কোন উপায়ে তারা এই বিজয়কে নস্যৎ করতে বদ্ধপরিকর ছিল। তাই শেষ পর্যন্ত ১৯৩৫ সনে জারীকৃত ব্রিটিশ সরকারের ৯২-ক ধারার প্রয়োগ করে যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে দেয়া হল। চরম নির্যাতন ও সন্ত্রাস নেমে এল পূর্ব বাঙলার জনগণ ও রাজনৈতিক (ফ্রন্টভুক্ত আওয়ামী লীগ, কেএসপি প্রভৃতি) দলের নেতাকর্মীদের উপর। যে চক্রটি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর কেন্দ্রীয় ক্ষমতায় জেঁকে বসেন, তাদের জানা ছিল যে পূর্ব পাকিস্তানে তাদের কোনো প্রভাব নেই।

পাকিস্তানের জন্মলগ্নে এই অঞ্চলে রাজনৈতিক চক্রান্তের মাধ্যমে যে দুর্বল নেতৃত্ব ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই দুর্বল নেতৃত্ব ১৯৪৯ সালের এপ্রিল মাসে টাঙ্গাইলের উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইতে দেন নাই। এইভাবে প্রদেশে (পূর্ব বাঙলায়) একে একে ৩৫টি উপ-নির্বাচন স্থগিত রাখা হয়।

যুক্তফ্রন্টের বিরুদ্ধে মুসলিম লীগ-শাসকচক্র সর্বশক্তি নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছিল। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বৃহৎ পুঁজিপতিরা প্রকাশ্যে ক্ষমতাসীন দলকে অর্থ যুগিয়েছিলেন। 'দেশের সংবাদপত্রগুলিও প্রায় একচেটিয়া মুসলিম লীগকে সমর্থন দিতে লাগিল' (পত্র পত্রিকাগুলোর প্রায় অধিকাংশ, দুঃখজনক হলেও সত্য, সব সময়ই জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করে) নতুন পত্রিকা ইন্ডেফাক (তখন সাপ্তাহিক ছিল এবং ঘটনাক্রমে দৈনিক মিল্লাত) যুক্তফ্রন্টের সমর্থক ছিল। যুক্তফ্রন্ট গঠনের পর লীগের পরাজয় অবধারিত মনে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে প্রধানমন্ত্রী বগুড়ার মোহাম্মদ আলী ফজলুল হকের সঙ্গে আঁতাদের চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। পরে আইন শৃঙ্খলার অজুহাতে নির্বাচন পিছিয়ে এবং ফ্রন্ট সমর্থক সাত-আটশত কর্মীকে গ্রেফতার করেও ফল হলো না। ৯৬.৩টি আসন পেয়ে 'পাকভারতের নির্বাচনী ক্ষেত্রে এক নতুন রেকর্ড সৃষ্টি' এবং উপমহাদেশে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি' করলো যুক্তফ্রন্ট। কেন্দ্রের কায়মি স্বার্থবাদী শাসকচক্র 'পশ্চিম পাকিস্তানে প্রচার শুরু করিলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতি ঘণা বিদ্বেষ সৃষ্টি করিয়াই মূলত যুক্তফ্রন্ট জয়যুক্ত হইয়াছে।' পরাজয়ের গ্লানি ঢাকার জন্য কেন্দ্রীয় কূচক্রী শাসকবৃন্দ মিথ্যা ও কাল্পনিক উক্তি করে পূর্ব পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে হিংসা-বিদ্বেষ ও ঘণার বীজ ছড়াতে লাগলো। কায়মি স্বার্থীদের ধর্মই হল, স্বার্থের ব্যাঘাত ঘটলেই তারা দ্বিগ্বিদ্ধিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে। তবে এর দ্বারা তখন জাতীয় স্বার্থ ও সংহতি বিপুলভাবে বিঘ্নিত হয়। কিন্তু সুদূরপর্যায় 'স্বাধীনতা' ত্বরান্বিত হলো।

পশ্চিম পাকিস্তানি শাসক শোষণ রাজনীতিক এবং আমলাদের কাছে জাতীয় স্বার্থ, সংহতি ও স্থিতিশীলতার অর্থ ছিল তাদের নিজেদের স্বার্থ ও স্থায়িত্ব। এদেরই চক্রান্তে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন ও মন্ত্রীসভা ভঙুল হয়। তবে অভ্যন্তরীণ কোন্দল ইত্যাদির জন্য 'জনসাধারণ যুক্তফ্রন্টের নেতৃবৃন্দের উপর যে নজিরবিহীন আস্থা স্থাপন করিয়াছিল, তাঁরা সেই আস্থার মর্যাদা রক্ষা করিতে ব্যর্থ হন।<sup>১৪</sup>

যুক্তফ্রন্টের দুর্বলতা ছিল এর অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন দলের মত-পথের পার্থক্য। তাছাড়া ফ্রন্টের প্রধান তিন নেতার মধ্যেও মতের অনৈক্য সৃষ্টি হয়। ফ্রন্টের (সরকারের) প্রধানমন্ত্রী হক সাহেবের নানান উক্তিকে দেশদ্রোহীতার নমুনা রূপে উপস্থাপন করে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হয়। পূর্ব বাঙলার রাজনৈতিক নেতাদের উপর নির্যাতনের ঝড় বয়ে যায়। কিছুকাল পর গভর্নরের শাসন প্রত্যাহার করা হলে পুনরায় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। পূর্বেই আওয়ামী লীগ যুক্তফ্রন্ট ত্যাগ করেছিল (১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৫)। তাঁরা বিরোধী দলের ভূমিকা গ্রহণ করেন। ১৯৫৬ সনের জুলাই-আগস্ট মাসে পূর্ব বাঙলার তীব্র খাদ্য সংকট দেখা দিলে ভুখা-মিছিলের মুখে ৩০ আগস্ট ১৯৫৬ সরকার পদত্যাগ করে। ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৫৬ পূর্ব বাঙলায় আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ কংগ্রেস কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়। ১৯৫৪ থেকে ১৯৫৮ পর্যন্ত পূর্ববঙ্গে দলভাঙন, ঘন ঘন সরকার পরিবর্তন দেশের পরিস্থিতিকে ঘোলাটে করে দেয়।

পাকিস্তান সৃষ্টির পরপরই পাকিস্তানের শাসনক্ষমতা ব্রিটিশের ট্রেনিং প্রাপ্ত আমলাদের (আমলাতন্ত্রের) কবলিত হয়ে পড়ে। অথচ স্বাধীনতা-উত্তরকালে প্রয়োজন ছিল রাষ্ট্রীয় জন-কল্যাণমুখি সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্যোগ—যার দায়িত্ব ছিল একমাত্র রাজনীতিকদের ; অথচ পাকিস্তানের রাষ্ট্র-ব্যবস্থা এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে আমলাদের প্রাধান্যই স্বীকৃত ছিল। 'ফলে দেশের গণতান্ত্রিক রাজনীতি বিপর্যস্ত ও অর্থনৈতিক কাঠামো অগণমুখি হয়ে পড়ে। এমনিভাবে গোড়াতেই শাসন ব্যবস্থায়, রাষ্ট্রীয় নীতি-নির্ধারণ প্রভৃতিতে আমলাদের প্রশ্রয় দেবার ফলে তাঁরা (চৌধুরী মুহম্মদ আলী, ইস্ফান্দার মীর্জা প্রমুখ) ধীরে ধীরে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাও কব্জা করে বসেন। জেনারেল মুহম্মদ আইউব খান সেই পদাঙ্ক অনুসরণ করে 'প্রেসিডেন্ট' হয়েছিলেন। ইস্ফান্দার মীর্জা ব্রিটিশ এজেন্ট হিসেবে ষড়যন্ত্র, ঘুষ আদান-প্রদান ও অন্যান্য দুর্নীতিতে হাত পাকিয়ে যখন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় গভর্নর জেনারেল হিসেবে তখন পাকিস্তানের রাজনীতি সম্যকভাবে ষড়যন্ত্রের রাজনীতিতে পর্যবসিত হয়।

পাকিস্তানের প্রথম গণপরিষদ দেশকে কোনো শাসনতন্ত্র দিতে পারেনি। ১৯৪৬-এ নির্বাচিত বিধানসভার সদস্যদের মনোনীত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত গণপরিষদে মুসলিম লীগের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকায় সরকার গণপরিষদকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করে। ১৯৫৪-র ২৪ অক্টোবর গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ গণপরিষদ বাতিল করেন। ১৯৫৫-র ৩১ মে পাকিস্তানের দ্বিতীয় গণপরিষদ গঠিত হয়। ৭ জুলাই ১৯৫৫ এর প্রথম অধিবেশন বসে। মুসলিম লীগ-যুক্তফ্রন্ট কোয়ালিশন সরকার ৯ জানুয়ারি ১৯৫৬-তে শাসনতন্ত্রের একটি খসড়া বিল গণপরিষদে উপস্থাপন করলে কিছু সংশোধনীর পর তা গৃহীত হয়। ২৩ মার্চ ১৯৫৬ থেকে

এই শাসনতন্ত্র অনুযায়ী দেশ শাসিত হতে আরম্ভ করে। গণপরিষদ পার্লামেন্ট হিসেবে কাজ করে। পার্লামেন্ট সদস্যদের ভোটে ইস্কান্দার মীর্জা গভর্নর জেনারেল থেকে পাকিস্তান ইসলামিক প্রজাতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

এই শাসনতন্ত্রে ‘পূর্ব বাঙলা’কে ‘পূর্ব পাকিস্তান’ করা হয়। জনসংখ্যার ভিত্তি পরিহার করে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সংখ্যাসাম্যের ভিত্তি মেনে নেয়া এবং পশ্চিম পাকিস্তানের চারটি প্রদেশকে বিলুপ্ত করে দিয়ে এক ইউনিট হিসেবে ‘পশ্চিম পাকিস্তান’ প্রদেশ গঠন করা হয়। এতে পাঞ্জাবি পুঁজিপতি ও সামন্ত স্বার্থের সুযোগ পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলেই অব্যাহত হয়। উর্দু এবং বাংলা এই দুটি ভাষাকেই ভবিষ্যতে রাষ্ট্রভাষারূপে প্রতিষ্ঠার স্বীকৃতি দেয়া হয়। পাকিস্তান পত্তনের সাড়ে আট বছরেও ‘শাসনতন্ত্র’ প্রণীত না-হওয়ার পেছনে পাকিস্তানবাদী চক্রের অশুভ ষড়যন্ত্র কার্যকর ছিল। লাহোর প্রস্তাবের মূলনীতিকে পাশকাটিয়ে ‘একধর্ম এক রাষ্ট্র একজাতি’ ‘পাকিস্তানের’ অন্তরায় বাঙালিহু ধ্বংসের কাজগুলো শেষ করার জন্যই শাসনতন্ত্র প্রণয়নে কর্তারা দীর্ঘসূত্রিতা দেখাচ্ছিল। শাসনতন্ত্রের প্রয়োজন দেশে খুব তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছিল বলে পূর্ববাঙলার নেতৃবৃন্দ স্বায়ত্ত্বশাসন ও ন্যায়সঙ্গত অনেক স্বার্থ বিসর্জন দিয়েও ১৯৫৬ সনের অগণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র গ্রহণে সম্মতি দিয়েছিলেন বলে অনেক ভাষ্যকার মন্তব্য করে থাকেন।

যুক্তফ্রন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ অঙ্গদল আওয়ামী লীগ দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল ভাসানীর নেতৃত্বে ১৯৫৭ সনের ২৫ জুলাই। রাষ্ট্র ক্ষমতায় অংশ গ্রহণকারী সোহরাওয়ার্দীর অনুসারি আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ, বিশেষ করে সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি, পূর্ব বাঙলার স্বায়ত্ত্বশাসন ও ১১ দফা বাস্তবায়নের প্রশ্নে ভাসানীপন্থীদের তীব্র বিরোধের ফলেই ‘ন্যাপ’ এর আত্মপ্রকাশ ঘটে। গণতন্ত্রীদল ন্যাপের সঙ্গে একীভূত হয়ে যায়। অন্যান্য বামপন্থীরাও ন্যাপে যোগদান করেন। ‘ন্যাপ’ পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্ত্বশাসন কায়ম, পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট ব্যবস্থা বাতিল, স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ, কল্যাণমূলক রাষ্ট্রগঠন সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা ও সমাজতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে পাকিস্তানের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের কর্মসূচি গ্রহণ করে। এবং এই পার্টির নেতৃত্বেই চরম নির্যাতনের মধ্য দিয়েও পূর্ব বাঙলায় স্বায়ত্ত্বশাসনের আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল।

পশ্চিম পাকিস্তানের চারটি প্রদেশ নিয়ে এক ইউনিট বা প্রদেশ-গঠনের বিরোধিতাও এই দল করেছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের রিপাবলিকান পার্টিও এই ব্যবস্থার বিরোধিতা করে, কারণ এই ব্যবস্থায় পশ্চিমের ছোট ছোট প্রদেশগুলো পাঞ্জাবের নিয়ন্ত্রণভুক্ত হয়ে পড়েছিল। সোহরাওয়ার্দী তাঁর কোয়ালিশন সরকারের প্রধান শরিকদল রিপাবলিকান পার্টির (ড. খান সাহেব ১৯৫৬-র ২৩ এপ্রিল লাহোরে গঠন করেন) মতামত উপেক্ষা করে এক ইউনিটের পক্ষে জনমত গঠনের জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন শহরে জনসভা করতে থাকেন। প্রধানমন্ত্রীর এ রাজনৈতিক প্রক্রিয়া রিপাবলিকানদের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না বলে সোহরাওয়ার্দীর উপর থেকে তাঁদের সমর্থন প্রত্যাহার করে নেবার কথা ইস্কান্দার মীর্জাকে অবহিত করলে ১৬ অক্টোবর ১৯৫৭ তিনি সোহরাওয়ার্দীকে প্রধানমন্ত্রীর পদ ত্যাগ করার

নির্দেশ দেন। ১৮ অক্টোবর ১৯৫৭ কেন্দ্রে চুল্লীগড়-মস্তীসভা ক্ষমতাসীন হয়ে যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতির পরিবর্তে পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা পুনরায় প্রবর্তনের পদক্ষেপ গ্রহণ করলে যুক্ত নির্বাচন বনাম পৃথক নির্বাচন বিতর্কে দেশের রাজনৈতিক অঙ্গন উত্তপ্ত রূপ ধারণ করে।

চুল্লীগড় কোয়ালিশন সরকার এর প্রধান শরীকদল রিপাবলিকান পার্টি অতঃপর প্রধানমন্ত্রীকে যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থা অক্ষণ্ন রাখার জন্য পরামর্শ দেয়। কিন্তু আই আই চুল্লীগড় রিপাবলিকানদের সাথে নির্বাচনপদ্ধতি সম্পর্কে একমত হতে না পেরে ১১ ডিসেম্বর ১৯৫৭ প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করেন। তাঁর সরকারের আয়ুষ্কাল ছিল মাত্র ঊনষাট দিন।

১৯৫৬ সালের ২৩ মার্চ পাকিস্তানের প্রথম যে শাসনতন্ত্র গৃহীত হয় তার ভিত্তিতে দেশে কোনো নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। রিপাবলিকান পার্লামেন্টারি পার্টির নেতা ফিরোজ খান নূন ১৩ ডিসেম্বর ১৯৫৭ সনে কেন্দ্রে সরকার গঠন করে। কংগ্রেস ও কে-এস-পি এতে যোগদান করে। যুক্ত নির্বাচন প্রথম দ্রুত জাতীয় পরিষদের নির্বাচন দেয়ার শর্তে আওয়ামী লীগ নূন-সরকারের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করলে প্রদত্ত শর্ত মোতাবেক ১৯৫৯ সনের ১৫ ফেব্রুয়ারি পার্লামেন্টের নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ ধার্য হয়। মুসলিম লীগ ব্যতীত অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলো সরকারের এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানায়। সাথে সাথে কায়মি-স্বার্থী ষড়যন্ত্রও শুরু হয়ে যায়। তারা বুঝতে পেরেছিল দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলের বিজয় সুনিশ্চিত। নির্বাচনের মাধ্যমে কেন্দ্রে জনসমর্থিত, জবাবদাহিমূলক ও স্থিতিশীল সরকার অধিষ্ঠিত হলে তাদের চিরস্থায়ী স্বার্থের ব্যাঘাত ঘটবে। তাই সামরিক ও বেসামরিক আমলাতন্ত্র শিল্পপতি ও পুঁজিপতিগণ এবং পশ্চিম পাকিস্তানের ভূস্বামীরা একজেট হয়ে নির্বাচন বানচাল ও ক্ষমতা দখলের গোপন চক্রান্তে লিপ্ত হয়।

পাকিস্তানের অর্থনৈতিক অবস্থা গোড়া থেকেই ভালো যাচ্ছিল না। পূর্ব পাকিস্তানে পাটের দর পড়ে গিয়েছিল। ঘাটতির ফলে বৃদ্ধি পেয়েছিল খাদ্যশস্যের মূল্য। মার্কিন ঋণের উপর দেশ নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল (তখনই এই অবস্থা। আর এখন?) দেশের রাজনীতিতে কলহ, কোন্দল, দলাদলি ও নীতিহীনতা চরমে পৌঁছায়। পরিষদ সদস্য ও রাজনৈতিক নেতা বুদ্ধিজীবীরা অহরহ দলমতগোত্র বদল করতেন। কোন্ সদস্য কোন্ কবি সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী বা এলিট কখন কেন দলে আছেন তা নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়তো। কেন্দ্রে ও প্রদেশে ঘনঘন সরকার পরিবর্তন ঘটতে থাকায় সরকারের উপর মানুষের আস্থা ও শ্রদ্ধাবোধ শিথিল হয়ে পড়েছিল।

পূর্ব পাকিস্তানের পরিষদে এসময় একটি ন্যাঙ্কারজনক ঘটনা ঘটে। পরিষদের ডেপুটি স্পীকার শাহেদ আলী ১৯৫৮-র ১৯ সেপ্টেম্বর কৃষক শ্রমিক পার্টি ত্যাগ করে আওয়ামী লীগে যোগদান করেন। পরের দিন ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৫৮ পরিষদের অধিবেশন বসে। ঐদিন ন্যাপ সদস্য দেওয়ান মাহবুব আলী পরিষদের স্পীকার আবদুল হাকিমের বিরুদ্ধে অনাস্থা উত্থাপন করেন। আওয়ামী লীগ কংগ্রেস ও ন্যাপের সদস্যরা অনাস্থা প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেন। প্রস্তাবটি সংখ্যাধিক্য ভোটে পাশ হয়। ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৫৮ ডেপুটি স্পীকার শাহেদ

আলীর সভাপতিত্বে পরিষদের অধিবেশন পুনরায় শুরু হয়। বিরোধী দলগুলোর (কৃষক-শ্রমিক পার্টি, মুসলিম লীগ ও নেজামে ইসলাম) সদস্যরা স্পীকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাশের সত্যতা অস্বীকার করে। বাকবিতণ্ডার পরিণতিতে সংঘর্ষে আহত শাহেদ আলী ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৫৮ হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন।

পশ্চিম পাকিস্তানেও সুস্থ রাজনীতিচর্চার পরিবেশ ছিল না। দেশের বিশৃঙ্খল অবনতিশীল আর্থ সামাজিক রাজনৈতিক অবস্থা জনসাধারণের মনে প্রবল অসন্তোষের সৃষ্টি করে। এই সুযোগ ক্ষমতালিপ্সু ষড়যন্ত্রকারীরা সেনাপতি আইউব খানের নেতৃত্বে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ৬ অক্টোবর ১৯৫৮ শাসনতান্ত্রিক সরকার উৎখাত করে অবৈধ পন্থায় ক্ষমতা দখল করে নেন। এই ষড়যন্ত্রের ও অভ্যুত্থানের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যোগ ছিল বলে অনুমান করা হয়।

প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা ১৯৫৮-র ৭ অক্টোবর সারা পাকিস্তানে সামরিক আইন জারী করে আইউব খানকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিযুক্ত করেন। আইউব খান ২৭শে অক্টোবর ইস্কান্দার মীর্জাকে বল প্রয়োগ দেশ থেকে বহিস্কৃত করে প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হন। ১৯৫৬ সনের শাসনতন্ত্র, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা, জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ, সমস্ত রাজনৈতিক দল ও কার্যক্রম বাতিল করা হয়। সকল মৌলিক অধিকার স্থগিত রাখা হয় এবং সভা ও মিছিলের ওপর নিষেধাজ্ঞা এবং সংবাদপত্রের ওপর সেন্সরশীপ আরোপ করা হয়। রাজনৈতিক নেতাদেরকে পাইকারি হারে কারারুদ্ধ করা হয়। এবডো (Elective Bodies Disqualification Ordinance 1959) আইনের মাধ্যমে প্রায় ৭০০০ নেতা ও কর্মীকে রাজনীতি থেকে বাধ্যতামূলক অবসর গ্রহণ করানো হয়। দুর্নীতির অভিযোগে অনেক সরকারি বড় কর্মকর্তা (সিএসপি-ইঞ্জিনিয়ার প্রমুখ)-র বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। আতঙ্কের ফলে অনেক অসুস্থ হন ও মৃত্যুবরণ করেন। আত্মহত্যা করেন অনেক আত্মসম্মান বোধসম্পন্ন অফিসার। ১৯৫৯ সনের জুলাই মাসের মধ্যে ৮১৩ জন বরখাস্তসহ ১৬৬২ জন অফিসার শাস্তিপ্রাপ্ত হন।

মার্শাল ল রেগুলেশনে কোনো প্রকার রাজনৈতিক তৎপরতা এবং সংহতি-বিরোধী কার্যকলাপের জন্য মৃত্যুদণ্ডের পর্যন্ত ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সামরিক শাসনের সুদূর প্রসারী প্রতিক্রিয়া কি হবে তা নিয়ে সচেতন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বগণ উদ্ভিগ্ন-উৎকণ্ঠিত হলেও ‘সাধারণ মানুষের মধ্যে বেশ কিছুটা উল্লাসের ভাব লক্ষ্য করা গেল’ ক্ষমতায় এসেই আইউব পূর্ব বাঙলায় জনপ্রিয় হতে পেরেছিলেন—যদিও এজন্য তাঁর নিজস্ব কোন কৃতিত্ব ছিল না। ঐতিহাসিক কারণেই তিনি জননন্দিত হবার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। এবং বলাবাহুল্য, যুক্তফ্রন্ট নেতাদের প্রতি জনগণ আস্থা হারিয়ে ফেলেছিলেন এবং রাজনৈতিক অঙ্গনে তারা কোন নতুন শক্তির আবির্ভাব কামনা করছিলেন। আইউব খান যেহেতু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নতুন এসেছিলেন, মূলত সেই কারণেই পূর্ব বাঙলার জনগণ তাঁকে অভিনন্দিত করেছিলেন। তাছাড়া দেশে গণতান্ত্রিক পরিবেশ প্রতিষ্ঠার জন্যে তিনি কাজ করবেন এবং অচিরেই ক্ষমতা ছেড়ে চলে যাবেন—এইসব আশ্বাস দ্বারা জনগণকে আশ্বস্ত করা সম্ভব হয়েছিল।



সামরিক শাসনের ভয়ে দ্রব্যমূল্য, দুর্নীতি ও রাজনীতি কিছু কালের জন্য স্থগিত থাকলেও মাস ছয়েকের মধ্যে দ্বিগুণ হয়ে গেলো। দুর্নীতি পরায়ণ ব্যবসায়ী আর সরকারি কর্মচারীরা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। ১৯৬১ সালের শেষ দিক থেকে কঠোর স্বৈরাচারি শাসন-নিপীড়নের মধ্যেও আইউব সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন ও সংগ্রাম দানা বাধতে থাকে। সরকার নতুন শাসনতন্ত্র (১৯৬২) জারির একমাস পূর্বে ১৯৬২-র ৩০ জানুয়ারি করাচীতে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে গ্রেফতার করে। প্রতিক্রিয়ায় ঢাকায় ছাত্রদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৬২ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এ গ্রেফতারের প্রতিবাদে ধর্মঘট পালন করে। উপর্যুপরি পাঁচদিন ধর্মঘট অব্যাহত থাকে। ৬ ও ৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৬২ ছাত্ররা সামরিক বিধি-নিষেধ অগ্রাহ্য করে ঢাকার রাস্তায় প্রচণ্ড বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। শোভাযাত্রীরা সামরিক আইনের বিরুদ্ধে গগনবিদারী ধ্বনি তোলে। তারা সামরিক আইন প্রত্যাহার গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও সোহরাওয়ার্দীসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি দাবি করে। আন্দোলন দমনের উদ্দেশ্যে পূর্ব পাকিস্তানে রাজনৈতিক নেতা, কর্মী ও ছাত্রদের ব্যাপকহারে ধরপাকড় শুরু হয়। আবুল মনসুর আহমদ, কফিলউদ্দিন চৌধুরী, শেখ মুজিবুর রহমান, তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া এবং আরও বহু রাজনৈতিক নেতাকর্মী ও ছাত্রদের গ্রেফতার করা হয়। ফলে আন্দোলন তীব্রতর আকার ধারণ করে।

এই আন্দোলনের মুখেই প্রেসিডেন্ট আইউব ভোটাধিকারের প্রশ্নে জনমত যাচাইয়ের জন্য কমিশন গঠন করেন। কিন্তু ভোটাধিকার কমিশন-এর সুপারিশ উপেক্ষা করে আইউব ক্যাবিনেট কমিটি গঠন করে তাদেরকে নতুন শাসনতন্ত্র প্রণয়নের দায়িত্ব দেন। সামরিক শাসন ও শাসনতন্ত্র বিরোধী এ আন্দোলন পূর্ব বাঙলার সকল শহর বন্দর ও গ্রামগঞ্জে ছড়িয়ে পড়ে। আইউব খানের বজ্র কঠিন সামরিক আইনের বিরুদ্ধে ছাত্রদের এ আন্দোলন সরকার-বিরোধী ভবিষ্যৎ আন্দোলন পরিচালনায় অনুপ্রাণিত করেছিল। এ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয় ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন। প্রেসিডেন্ট আইউব খান কর্তৃক অগণতান্ত্রিক ও স্বৈরাচারি পন্থায় শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করে 'মৌলিক গণতন্ত্র' ও 'ইসলামিক প্রজাতন্ত্র' প্রবর্তন করা হয় (১ মার্চ ১৯৬২)।

ছাত্রদের শাসনতন্ত্রের মতোই এক্ষেত্রেও অমুসলমানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতার অধিকার খর্ব করা হয়। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার সংখ্যাগরিষ্ঠ নীতি এবং পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট বীবস্থা বলবৎ রাখা হয়। নয়া শাসনতন্ত্রে আইন প্রণয়ন ক্ষমতার অনেকখানি বিকেন্দ্রিকরণ করা হলেও জাতীয় গুরুত্বসম্পন্ন বিষয়াবলিকে একটিমাত্র তালিকায় স্থান দিয়ে তালিকাটির একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ করা হয় কেন্দ্রীয় সরকারকে। অবশিষ্ট বিষয়াবলি প্রদেশের হাতে রাখা হলেও দেশের দুই অঞ্চলের মধ্যে সংযোগ সমন্বয় ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্যাপারে চূড়ান্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের কুক্ষিগত করা হয়। এই শাসনতন্ত্রে কেন্দ্রের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ আরও বেশি রাখা হয়। প্রদেশের গভর্নরের নিয়োগকর্তাও হন প্রেসিডেন্ট। এবং তাঁকে গভর্নর পদে বহাল রাখা না-রাখা প্রেসিডেন্টের অভিরুচির উপর নির্ভরশীল করা হয়। প্রাদেশিক মন্ত্রীরা কেন্দ্রীয় সরকারের এজেন্ট। গভর্নর

রাষ্ট্রপতির অধস্তন কর্মচারী বিশেষ। এইসব কারণে দেশের প্রশাসনিক কাঠামোতে ফেডারেল সরকার অপেক্ষা ইউনিটারী ধরনের বৈশিষ্ট্যই ছিল বেশি।

বলা বাহুল্য, ১৯৬২ সনের ১ মার্চ প্রেসিডেন্ট আইউব প্রদত্ত শাসনতন্ত্রে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ও দেশের রাজনৈতিক দল রাখার কোন বিধান ছিল না। মৌলিক গণতান্ত্রিক প্রথায় ১৯৬২-র ২৮ এপ্রিল নিদলীয় ভিত্তিতে জাতীয় পরিষদের যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তাতে উপরোক্ত 'এবডো' প্রয়োগ করে দেশের শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদেরকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে দূরে রাখা হয়। ১৮ জুন ১৯৬২-তে রাওয়ালপিণ্ডিতে জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশন বসে এবং সামরিক আইন প্রত্যাহত হয়। সামরিক শাসন অবসানের পরপরই ছাত্র আন্দোলনের মুখে ২৪ জুন পূর্ব পাকিস্তানের নয়জন নেতা আইউবী শাসনতন্ত্র বাতিল এবং প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নয় শাসনতন্ত্র রচনার দাবিতে যুক্ত বিবৃতি দিলেন। এই নয় নেতা হলেন—নূরুল আমীন, আতাউর রহমান খান, আবু হোসেন সরকার, হামিদুল হক চৌধুরী, পীর মোহসীন উদ্দিন দুদুমিঞা, সৈয়দ আজিজুল হক নান্না মিয়া, ইউসুফ আলী চৌধুরী মোহন মিয়া, মাহমুদ আলী এবং শেখ মুজিবুর রহমান।

এই বিবৃতি প্রকাশের মাত্র ৮ দিন পূর্বে ১৬ জুন শেখ মুজিবুর রহমান এবং ইন্তেফাক সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া জেল থেকে মুক্তি পান। শহীদ সোহরাওয়ার্দীসহ অন্যান্য রাজবন্দীর মুক্তির দাবিতে ও নয় নেতার বিবৃতির সমর্থনে পশ্চিমে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রদেশব্যাপী এই নয় নেতার বিবৃতিতে এক আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল। শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মুক্তির দাবিতে পরিষদে ও পরিষদের বাইরে তুমুল আন্দোলন দানা বেঁধে উঠলো। এরপরে ১৯৬২-৭১ সেপ্টেম্বর আইউব বিরোধী ছাত্র আন্দোলন প্রমাণ করে যে আইউব-সরকারও অপরাজেয় নয়।

১৯৬২ সালের ছাত্রদের শিক্ষা কমিশন বিরোধী উপর্যুক্ত আন্দোলন ছিল মূলত দেশে গণতন্ত্র প্রবর্তন ও মানবিক অধিকারসমূহের নিশ্চয়তা বিধানের দাবি। কিন্তু তার স্ফূরণ ঘটে কমিশনের শিক্ষা-সংকোচন নীতির কালো দলিল বাতিলের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। সেইরূপ পূর্ববাঙলার স্বায়ত্তশাসনের দাবিও তখন নতুনভাবে উঠতে 'ন্যাপ' গঠন কালে স্বায়ত্তশাসনের দাবি করলেও (১৯৫৭) বাষট্টি পরবর্তীকালে প্রধানত আওয়ামী লীগ এই দাবিকে সোচ্চার রাখে। এসময়ে বিভিন্ন পত্রপত্রিকা ও পুস্তিকার মাধ্যমে অর্থনৈতিক বৈষম্য ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে পূর্ববাঙলার বঞ্চনার চিত্রটি সরকারের ও জনগণের গোচরীভূত হতে থাকে।

১৯৬২ সনের শাসনতন্ত্র এবং শাসনতন্ত্র অনুযায়ী মৌলিক গণতন্ত্রীদার মাধ্যমে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচন উপলক্ষ করে পূর্ব পাকিস্তানের যে আন্দোলন দেখা দেয় তার ফলে সামরিক শাসন প্রত্যাহত হয়েছিল। এবং সঙ্গে সঙ্গে সারা পাকিস্তানে, বিশেষত পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ বাষট্টি শাসনতন্ত্র ও মৌলিক গণতন্ত্র বাতিল এবং প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গঠিতব্য গণ-পরিষদের মারফত নয়া শাসনতন্ত্র প্রণয়নের দাবি উত্থাপন করেন। কিন্তু শহীদ সোহরাওয়ার্দী জেল থেকে ১৯ আগস্ট ১৯৬২ তারিখে মুক্তিলাভের পর এই দাবি সমর্থন না করে গণতান্ত্রিক পথে আন্দোলন পরিচালনার

স্বার্থে প্রচলিত শাসনতন্ত্র সম্পূর্ণ বাতিলের পরিবর্তে শাসনতন্ত্র গণতন্ত্রায়ণের (democratization of the constitution) দাবি উত্থাপন করেন। তাঁর যুক্তি ছিল, প্রচলিত শাসনতন্ত্র বাতিল করলে দেশে পুনরায় শাসনতান্ত্রিক শূন্যতার সৃষ্টি হবে।

৫ অক্টোবর ১৯৬২ তিনি দুই প্রদেশের সর্বদলের ৫৪ জন নেতার সমন্বয়ে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের (National Democratic Front) গঠন করেন। এই সংস্থা দেশের অকুঠ সমর্থন লাভ করতে ব্যর্থ হয়। কারণ ফ্রন্ট নেতাদের অনেকেই ছিলেন গণধিকৃত। মওলানা ভাসানী ফ্রন্টের কোন সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি নেই বলে তাতে যোগদান করা থেকে বিরত থাকেন। নিজেও কোন কর্মসূচি না দিয়ে ফ্রন্টের মতই দাবি উত্থাপন করেন। ব্যাপক জনমতের প্রেক্ষিতে প্রেসিডেন্ট আইউব ভোটাধিকার প্রশ্ন বিবেচনার জন্য একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিশন গঠন করেন এবং ঘোষণা দেন যে, জনগণ প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার দাবি করলে তিনি তাতে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবেন না। এই সময় তাঁর সম্মতিতে জাতীয় পরিষদে মৌলিক অধিকার বিল পাস হয়।

কিন্তু পরবর্তীকালের ঘটনাপ্রবাহ সবকিছু ওলট-পালট করে দেয়। সোহরাওয়ার্দীর পুনরুজ্জীবন লাভ পাকিস্তানের রাজনৈতিক অঙ্গনকে নতুনভাবে গড়ে তুলতে প্রয়াসী হয়। ফ্রন্টের ঐক্য ভেঙ্গে গিয়ে ভালোই হলো। ৬ দফার আন্দোলন জম্মলাভের ক্ষেত্র প্রস্তুত হলো শেখ মুজিবের 'আওয়ামী লীগ' পুনরুজ্জীবনের (১৫ জানুয়ারি, ১৯৬৪) মাধ্যমে। নয় নেতার বিবৃতির শুব্দ প্রতিক্রিয়ায় দলমত নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধভাবে গণতান্ত্রিক আন্দোলন-এর সম্ভাবনা দেখা দিলে সরকারও এর মোকাবিলা করার জন্য রাজনৈতিক দল গঠনের নীতিমালা এবং নতুন আইন প্রণয়ন করেন।

রাজনৈতিক দল গঠনের অধিকার দেয়া হলে ১৯৬২-র ৪ সেপ্টেম্বর করাচীতে চৌধুরী খালিকুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কনভেনশনে মুসলিম লীগ পুনরুজ্জীবিত হয়। খালিকুজ্জামান দলের প্রধান সংগঠক নির্বাচিত হন। 'কনভেনশন মুসলিম লীগ' নামে এই দল আইউব খানের কার্যাবলি সমর্থন করতো। মন্ত্রীরা ছিলেন এর কর্মকর্তা। আইউব খান ১৯৬৩ সনের ২৭ মে খালিকুজ্জামানকে অপসারণ করে কনভেনশন মুসলিম লীগের সভাপতি হন। পক্ষান্তরে আইউব-বিরোধী মুসলিম-লীগাররা ঢাকার বার লাইব্রেরি হলে ১৯৬২ সনের ২৭ অক্টোবর অনুষ্ঠিত সম্মেলনে খাজা নাজিমুদ্দিন ও সরদার বাহাদুর খানকে (আইউব খানের ভাই) যথাক্রমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক করে 'কাউন্সিল মুসলিম লীগ' গঠন করে সরকার-বিরোধি ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। এর পূর্ব পাকিস্তান শাখার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে খাজা খয়েরউদ্দীন ও শফিকুল ইসলাম। শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৬৪-র ২৫ জানুয়ারি আওয়ামী লীগ পুনরুজ্জীবিত হয়। ৮ মার্চ ১৯৬৪ ঢাকায় অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশনে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোট পোর্টালমেট ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন, পরিষদের প্রাধান্য স্বীকার করে একটি গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র প্রণয়ন, পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন কায়ম ও দেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রবর্তনের কর্মসূচি গৃহীত হয়।

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ২৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৪ সনে ঢাকায় 'ন্যাপ' পুনর্গঠিত করেন। প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার ও প্রত্যক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থার দাবিতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করার লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ, ন্যাপ ও নেজামে ইসলাম সমন্বয়ে ১১ মার্চ ১৯৬৪ সনে একটি সংগ্রাম আন্দোলনের ফলে সর্বজনীন ভোটাধিকারের দাবি জনপ্রিয়তা লাভ করে।

মৌলিক গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সারা পাকিস্তানে বিভিন্ন স্তরের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৬৪-৬৫ সনে। নির্বাচনের প্রাক্কালে সংঘবদ্ধভাবে অবতীর্ণ হবার জন্য পুনরায় ঐক্যবদ্ধ হবার তাগিদ অনুভব করেন বিরোধী দলগুলো। মওলানা ভাসানী থেকে আরম্ভ করে মওলানা মওদুদী পর্যন্ত সকল বিরোধী নেতা ও দল একত্রিত হয়ে (২ জুলাই ১৯৬৪) গঠন করেন কম্বাইন্ড অপোজিশন পার্টি (কপ) বা সম্মিলিত বিরোধীদল। কপের অঙ্গদলগুলোর মধ্যে ছিল আওয়ামী লীগ, কাউন্সিল মুসলিম লীগ, ন্যাপ, নেজামে ইসলাম ও জামাতে ইসলাম। ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্ট আইউব খানে বিরুদ্ধে ১৯৬৫ সনের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য কপ 'মাদারে মিল্লাত' ফাতেমা জিন্নাহকে (১৮৯৪-১৯৬৭) প্রার্থী মনোনয়ন দান করেন এবং নয়দফা কর্মসূচি প্রকাশ করা হয়। পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন এর অন্যতম শর্ত ছিল।

বিপুল উদ্যমে নির্বাচনী প্রচারণায় অবতীর্ণ হয়ে জনগণকে তাঁরা বল্লেন মিস জিন্নাহ নির্বাচনে জয়লাভ করলে সর্বজনীন ভোটাধিকার, পার্লামেন্টারি পদ্ধতির সরকার এবং বাক-ব্যক্তি ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হবে। নির্বাচনে আইউব খানের জয় হয়েছিল। ফাতেমা জিন্নাহকে দিয়ে জনগণ শুধু আইউবের পরাজয়ই কামনা করেছিল। কিন্তু জনগণের ভোটাধিকার ছিল না। তাঁরা যাদেরকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছিলেন, সেই মৌলিক গণতন্ত্রীদের কিনে নিতে আইউবের খুব বেশি খরচ করতে হয়নি এবং বেগও পেতে হয়নি। আইউবের জয় পূর্ব থেকেই নিশ্চিত ছিল।

'কপ' গঠন এবং ফাতেমা জিন্নাহকে মনোনীত করার ক্ষেত্রে, রাজনৈতিক নেতা ও দলসমূহের চিন্তাধারা ও কর্মসূচিতে বিরাট অসঙ্গতি ফুটে ওঠে :

যারা ইতিপূর্বে প্রায় দুই বছর ধরে প্রচার করেছেন যে (১৯৬২-৬৪) আইউব প্রদত্ত শাসনতন্ত্র সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক, এই শাসনতন্ত্র তাঁরা মানেন না, এই শাসনতন্ত্রকে মেনে নিয়ে কমিশনকালেও কোন গণতান্ত্রিক শক্তির পক্ষে ক্ষমতায় আসা কিংবা আইউব-সরকারের পতন ঘটানো সম্ভব নয়,—তাঁরাই এই শাসনতন্ত্রের অধীনে নির্বাচনে অংশ গ্রহণে তৎপর হয়ে ওঠেন। তাঁদের এই মত পরিবর্তন সম্পর্কে কোন ব্যাখ্যা জনগণের সামনে কেউই উপস্থাপিত করেননি। আর একটি লক্ষ্য করবার মত বিষয় এই যে, ১৯৫৪ সনের যুক্তফ্রন্টের ব্যর্থতার করুণ অভিজ্ঞতা থাকার পরও...গঠন করেছিলেন সম্মিলিত বিরোধী দল। তাছাড়া দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সকল সমস্যা অত্যন্ত প্রকট হয়ে ওঠার পরও তাঁরা একমাত্র গণতন্ত্র ও অন্যান্য কয়েকটি রাজনৈতিক বিষয়ের দাবি ছাড়া অন্য কোন কর্মসূচি জনসমক্ষে তুলে ধরতে পারেননি। আর গণতন্ত্রের প্রশ্নেও কারও কোন সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা ছিল না।

নির্বাচনে জয়লাভ করার পর আইউব সরকারের অত্যাচার শতগুণ বেড়ে যায়।

মৌলিক গণতন্ত্রী, টাউট, বদ মাতব্বর, আমলা, ব্যবসায়ী ও কনভেনশন লীগের লোকেরা যারা আইউবের সমর্থক ছিল—দেশের সকল স্তরের জনগণের উপর অকথ্য নির্যাতন আরম্ভ করে। এই নির্যাতন মধ্যযুগের

কুখ্যাত অত্যাচারী সামন্ত শাসকদের বর্বরতাকেও অতিক্রম করে যায়। ছাত্রদের মধ্যে সকারি পৃষ্ঠপোষকতায় জাতীয় ছাত্র ফেডারেশন (এন এস এফ) নামে এক সুসংগঠিত গুণ্ডাবাহিনী গড়ে তোলা হয়। এই গুণ্ডাবাহিনীর অত্যাচারে সারা পূর্ব বাঙলায় ছাত্রদের ও শিক্ষকদের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল।<sup>১৫</sup>

আইউব খান বীরত্ব প্রকাশের অভিনায়ে এবং আজীবন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট থাকার উচ্চাকাঙ্ক্ষায় কাশ্মীর বিজয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করে ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরে ‘মুজাহিদ বাহিনী’ নাম দিয়ে পাকিস্তানি সৈন্যদের অনুপ্রবেশ ঘটান। যুদ্ধের সময় (৬ সেপ্টেম্বর ১৯৬৫) আইউব সরকার ভারত-বিদ্রোষের শ্লোগান দিয়ে এবং ইসলামের দোহাই দিয়ে সারা দেশের জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম হন। জনগণ আইউব সরকারকে তখন দেশের স্বার্থের দিকে তাকিয়ে সমর্থন জ্ঞাপন করেন, কিন্তু অভ্যন্তরীণ নীতির ব্যাপারে জনগণের অনাস্থার মনোভাবে পরিবর্তন ঘটে সামান্যই। বরং যুদ্ধের অভিজ্ঞতা নতুন করে পূর্ববঙ্গবাসী জনগণের মনে নতুন সংশয়ের সৃষ্টি করে দেয়। স্বায়ত্তশাসনের আকাঙ্ক্ষা যুক্তিভিত্তি পেয়ে তীব্রতর হয়। যুদ্ধকালে পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় বাঙলার রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের একাংশের মনে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর রূপরেখা সম্পর্কে নতুন চিন্তা দানা বাঁধে।<sup>১৬</sup>

নির্বাচনে জয়লাভ করে আইউব খান পাকিস্তানের পররাষ্ট্রনীতিতে মৌলিক পরিবর্তন ঘটান। রাশিয়ার সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলেন। ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ক্ষুব্ধ হয়ে পাকিস্তানে অর্থ সাহায্য সুস্থচিত করে ফেলে। তবে সেজন্য আইউব খানকে বিপাকে পড়তে হয়নি রাশিয়ার জন্য। রাশিয়া পাকিস্তানের উন্নয়ন প্রকল্পগুলোতে আর্থিক ও কারিগরি সাহায্য প্রদান কর।

‘ন্যাপ’ আইউবের এই পররাষ্ট্রনীতির সমর্থক হয়ে ওঠে। ভাসানী ১৯৬৩ সনে সরকারি দলের নেতারূপে চীনের বিপ্লব বার্ষিকীতে যোগদান করতে যান। সেখানে নাকি মাওসেতুঙ ভাসানীকে আইউবের বিরোধীতা না করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। রাশিয়ার মধ্যস্থতায় পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইউব খান ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর মধ্যে ১৯৬৬ র ১০ জানুয়ারি তাসখন্দে স্বাক্ষরিত এক চুক্তিপত্রে ভারত ও পাকিস্তানের দখলীকৃত এলাকা থেকে ১৯৬৬-র ২৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে নিজ নিজ দেশের সৈন্য ১৯৬৫-র ৫ সেপ্টেম্বরে সীমানায় সরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ চুক্তিতে কাশ্মীরের জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের দাবি স্বীকৃত না-হওয়ায় পশ্চিম পাকিস্তানে তাসখন্দ চুক্তির বিরুদ্ধে ব্যাপক বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয় এবং পরিস্থিতি মূল্যায়নের জন্য ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬তে লাহোরে আওয়ামী লীগ, কাউন্সিল মুসলিম লীগ, জামাতে ইসলাম ও নেজামে ইসলাম প্রভৃতি বিরোধী দলগুলোর এক জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

এই সম্মেলনের সাবজেক্ট কমিটির কাছে শেখ মুজিবুর রহমান পূর্বপাকিস্তানের মুক্তি সনদ ৬ দফা কর্মসূচি উপস্থাপন করেন। কিন্তু সম্মেলনের উদ্যোক্তারা আলোচনার জন্য তা বিষয়-নির্বাচনী কার্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করতে অস্বীকার করায় শেখ মুজিবুর রহমান সম্মেলন বর্জন করে ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেন। ঢাকায়, বিমান বন্দরে ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬ তে তিনি

সাংবাদিকদের কাছে ৬ দফা প্রকাশ করেন। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক শোষণ-নিপীড়নে অতিষ্ঠ জনগণের কাছে ৬ দফা মুক্তির দূত রূপে আবির্ভূত হয়েছিল। কারণ জনগণ অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে একটা আমূল পরিবর্তন কামনা করছিল। এ-প্রয়োজন অনেক আগে থেকে অনুভূত হয়ে আসলেও তা তখন পরিপক্বতা লাভ করে তীব্র হয়ে উঠেছিল। ঠিক সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তে, শেখ মুজিবুর রহমান চরম নিপীড়নের এবং মারাত্মক ক্ষতির ঝুঁকি নিয়ে বিরাট নৈতিক সাহসের সঙ্গে জনগণের নিকট ছয় দফা ব্যাপকভাবে প্রচারের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন।<sup>১৭</sup>

লাহোর প্রস্তাবের মর্ম অনুযায়ী ১৯৪৭ সনে পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলে দুটি স্বাধীন স্বায়ত্তশাসিত ও সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা ভণ্ডুল হবার পর দুই অঞ্চলের লোকেরাই এক পাকিস্তান মেনে নিয়েছিল। পূর্ববঙ্গের কোন রাজনৈতিক দল বা সংস্থা কর্তৃক লাহোর প্রস্তাবের পূর্ণ বাস্তবায়ন দাবি করেননি বটে তবে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি গোড়া থেকেই উত্থাপিত হয়ে এসেছে। এই দাবি ক্রমশ জোরদার হয়ে ৬ দফা কর্মসূচিতে রূপলাভ করেছিল।

প্রেসিডেন্ট আইউব ক্ষমতা কুক্ষিগত করে পূর্বপাকিস্তানিদের শাসন-শোষণের জন্য পূর্বসূরিদের নীতিতে বস্তুত কোন পরিবর্তন ঘটাননি বরং একনায়ক সুলভ মানসিকতা নিয়ে সেই নীতিগুলো অনুসরণ করে গেছেন। রাজনৈতিক আমলে (১৯৪৭-৫৮) পূর্ব পাকিস্তানে যে রাজনৈতিক নির্যাতন ও অর্থনৈতিক বৈষম্য ছিল আইউব এর শাসনমলে তা আরও শতগুণ বৃদ্ধি পায়। পূর্বে কেন্দ্রের অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সুযোগ ছিল। কিন্তু আইউবের স্বৈরাচারি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা নিরাপদ ছিল না। প্রাদেশিক প্রশাসন যাদের উপর ন্যস্ত ছিল, তাঁরাও ছিলেন তাঁরই বসংবদ ও কৃপাপ্রার্থী। মৌলিক গণতন্ত্রের মাধ্যমে আইউব পূর্ব পাকিস্তানেও কয়েমি-স্বার্থী গোষ্ঠী সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর দরবারে প্রকৃত জন-প্রতিনিধিদের স্থান ছিল না। ন্যায্য অধিকারের দাবি যারা করেন, জনস্বার্থের কথা তোলেন—তাঁরা রাষ্ট্রদ্রোহী আখ্যায়িত হন ; তাঁদের উপর চলে জেল ও জুলুম। কোন বিরোধীদলীয় নেতা আইউব খানের কোপানল থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছেন এমন নজীর বিরল। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মত নেতাকে বৃদ্ধ বয়সে আইউব খানের অভিরুচি অনুযায়ী কারাজীবন বরণ করতে হয়েছিল। লাহোর প্রস্তাবের প্রণেতা পাকিস্তান আন্দোলনের প্রধানতম কর্মীনেতা এ কে ফজলুল হক পাকিস্তানি শাসকদের দ্বারা কম নির্যাতিত নিগৃহীত হননি।

পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক যে বৈষম্য সৃষ্টি করা হয়, আইউব খানের আমলে এই বৈষম্যজনিত সমস্যাবলি উত্তরোত্তর জটিলতর ও তীব্রতর হয়ে সমাধানের অসম্ভব পর্যায়ে পৌঁছেছিল। ১৯৫৮-৬৬ সময়কালে সামরিক আইন, অগণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র ও দমন নীতির দ্বারা জনমত ব্যাহত স্তিমিত করা গেলেও জনগণের পুঞ্জীভূত বিক্ষোভের পরিণতি চিন্তা করে আইউব-চক্র দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। দেশ-শাসনের ব্যাপারে বাঙালিরা কখনোই প্রকৃত অংশীদার হতে পারেনি। স্বাধীনতার পূর্ণ আনন্দ থেকেও তারা বঞ্চিত হয়েছিল। এ-অবস্থায় ছয় দফা কর্মসূচি প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব বাঙলায় বিরাট সাড়া পড়ে যায়।

বাঙালিরা ব্যাপকভাবে এই কর্মসূচি সমর্থন করেন। আওয়ামী লীগ রাতারাতি জনগণের মন জয় করে নিতে সক্ষম হয়। আইউব সরকার এবং বিরোধী দলগুলোর কেউ-ই (জামাতে ইসলামী, কাউন্সিল মুসলিম লীগ) ছয় দফা সম্পর্কে একেবারে নীরব থাকতে কিংবা সমর্থনও দিতে পারলো না। অতএব আওয়ামী লীগের প্রতি কঠোর নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা নেমে এলো। কারাগারে নিষ্কিণ্ত হলেন অধিকাংশ। সাধারণভাবে আওয়ামী ও ছাত্রলীগের সকল নেতাকর্মী ও সক্রিয় সমর্থকদের (সমর্থক দলগুলোরও) জীবন বিপন্ন হয়ে পড়লো। ৬ দফা প্রচারকালে দেশে যুদ্ধকালীন জরুরি অবস্থা বিরাজ করছিলো, তাছাড়া যুদ্ধের সময় আইউব খানের প্রতি সমর্থন-এর সুযোগে কনভেনশন লীগ ও এন. এস. এফ-এর গুণ্ডাদের অত্যাচারও বেড়ে গিয়েছিল। এদের সমর্থনে সহযোগিতায় ছিল পুলিশ, ই. পি. আর ও সামরিক বাহিনী। এই লৌহ কঠিন অত্যাচারের বিরুদ্ধে নির্ভয়ে ছয় দফা আন্দোলন অগ্রসর হয়ে চলল। দক্ষিণপন্থী দলগুলো ইসলামের ধোঁয়া নতুন করে তুললো। জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য তারা সমাজ-পরিবর্তনের নানা ব্যাখ্যা দিতে লাগলো। সমাজতন্ত্রের কথা মওলানা ভাসানী প্রচার করতেন বলে এদের রোষ তাঁর উপরও কম ছিল না। উপরন্তু তিনিও ১৪ দফার একটি কর্মসূচি এই সময় (১৯৬৬-র ফেব্রুয়ারি-মার্চ) প্রচার করেন। কিন্তু তিনি নগ্নরূপে দৃষ্টিতে আওয়ামী লীগের সমালোচনায় মুখর হন। আওয়ামী লীগের সঙ্গে সম্পর্কিত অন্যান্য দলও (যেমন কৃষক সমিতি, শ্রমিক ফেডারেশন প্রভৃতি) ছয়-দফা সম্পর্কে অসহিষ্ণু হয়ে মন্দভাবে সমালোচনায় অংশগ্রহণ করে।

তবে কেউ-ই পূর্ব বাঙলার স্বায়ত্তশাসন ও বঞ্চনা থেকে মুক্তির আবশ্যিকতা ব্যাখ্যার দায়িত্ব এড়াতে পারেননি। এ সময়ে 'ন্যাপ' এবং সম্পর্কশীল দলগুলো বিভক্ত হয়ে গেলে একাংশ ছয় দফার পক্ষে আস্থা ব্যক্ত করে। আন্দোলন দমন করার উদ্দেশ্যে সরকার ৬ দফা আন্দোলনকে রাষ্ট্রদ্রোহীতামূলক ও দেশের সংহতিবিরোধী কাজ বলে ঘোষণা করেন। ৮ মে ১৯৬৬ শেখ মুজিবুর রহমান, তাজউদ্দীন আহমদ, খন্দকার মোশতাক আহমদ, জহর আহমদ চৌধুরী প্রমুখ নেতৃবৃন্দকে কারাগারে আটক করা হলো।

৭ই জুন ১৯৬৬ তে ৬ দফার দাবিতে এবং মুজিবসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি ও সরকারি দমননীতির প্রতিবাদে আওয়ামী লীগের আহ্বানে পূর্ব বাংলায় সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। জনগণ স্বতস্ফূর্তভাবে এই হরতাল ও আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। বাঙালির এই স্বতস্ফূর্ততা সরকারের সহ্য হবার কথা নয়। পুলিশ ও ইপিআর বাহিনীকে দমন নির্যাতন অত্যাচারের নির্দেশ দিলে ঢাকা নারায়ণগঞ্জ ও দেশের নানা স্থানে বহু লোকের প্রাণ যায়। তবু জনগণ ৬ দফার দাবি থেকে সরে আসতে ছিলেন নারাজ।

'ইত্তেফাক' ছিল তখন গণমানুষের কঠিন ও ৬ দফার মুখপত্র। ১৬ জুন ১৯৬৬তে সরকার 'ইত্তেফাক' এর মালিক-সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়াকে গ্রেফতার পূর্বক কারারুদ্ধ করে এবং ইত্তেফাক এর প্রকাশনা বন্ধ করে দেয়া হয়। ৬ দফাকে প্রতিহত করার লক্ষ্যে এনডিএফ, জামাতে ইসলাম, নেজামে ইসলাম ও কাউন্সিল মুসলিম লীগ সংঘবদ্ধ হয়ে ১৯৬৭-র ৩০ এপ্রিল পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট (পিডিএম) নামে একটি দক্ষিণপন্থী

জোট গঠন এবং ৮ দফা কর্মসূচি প্রচার করে। জুলফিকার আলি ভুট্টো ১৯৬৭-র ৩০ নভেম্বর লাহোরে পিপিপি (পাকিস্তান পিপলস পার্টি) গঠন পূর্বক ৬-দফা বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

উল্লেখ্য যে, ৬-দফা পশ্চিম পাকিস্তানের কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি; বরং এর বিরুদ্ধে সেখানে নানা মনগড়া কথা প্রচার করে বাঙালিদের বিরুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসীদের ক্ষেপিয়ে তোলা হয়। সরকার শেখ মুজিবের প্রাণ হরণ করে বাঙালিদের নেতৃত্বহীন, হতাবুদ্ধি, দুর্বল করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ এনে ১৯৬৮-র জানুয়ারিতে ‘আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা’ দায়ের করে। দেশরক্ষা আইনে ১৯৬৬-র ৮ মে থেকে শেখ মুজিব ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক ছিলেন। ১৯৬৮-র ১৭ জানুয়ারি মুক্তি দেয়ার কথা বলে তাঁকে আবার ১৮ জানুয়ারি (১৯৬৮) আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামীরূপে ঢাকা কুর্মিটোলা সেনানিবাসে অন্তরীণ করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানের ৬ দফা সমর্থক নেতা-কর্মীদের আটক নির্যাতন দমন প্রভৃতির মাধ্যমে এক নৈরাজ্যিক পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হয়। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, এবং ৬-দফা দাবির ফলে পূর্ববঙ্গবাসীদের উপর নির্যাতনের ঘটনায় সরকারের প্রতি জনগণের ঘৃণা তীব্র থেকে তীব্রতর হতে-হতে তখন বিপ্লবের পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল।

৭ জুন আন্দোলনের পর চরম নির্যাতনের মুখে এবং প্রধান নেতা-কর্মীদের কারাগারে আটক রাখার ফলে আওয়ামী লীগ প্রায় নেতৃত্বহীন অবস্থায় পতিত হয়। কিন্তু আন্দোলনের ধারা তবু অব্যাহত থাকে। একজন প্রত্যক্ষদর্শী ভাষ্যকারের মতে

‘১৯৬৮-র ডিসেম্বরে ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানের সূচনা হবার পূর্ব পর্যন্ত সময়টা ছিল পূর্ব বাঙলার জন্য সবচেয়ে অন্ধকারময় সময়।’

৬ দফা আন্দোলন দমনের জন্য আইউব খান শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্যদের বিরুদ্ধে যে মিথ্যা ষড়যন্ত্র মামলা রুজু করেন তার প্রতিক্রিয়া ও প্রভাব সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শী ঐ ভাষ্যকার পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে লিখেছেন :

পূর্ব বাঙলার জনগণের ওপর আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিরুদ্ধে এক অভাবনীয় প্রতিক্রিয়া হয়। মামলা আরম্ভ হওয়ার আগেই জানা গিয়েছিল যে, মামলার অভিযুক্ত ব্যক্তিদের কারও কারও উপর নানা স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য নির্মম শারীরিক নির্যাতন চালানো হয়েছিল। জনৈক অভিযুক্তের স্ত্রী এ-ব্যাপারে কোর্টে মামলা দায়ের করার ফলে এ মামলার খবর হিসেবে এ-সম্পর্কে পত্রিকায় প্রামাণ্য তথ্য প্রকাশিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব বাঙলার জনগণের মধ্যে আইউব সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয় এবং জনগণের মনোভাব ছয় দফা থেকে সরে গিয়ে স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হয়।

এই মামলা সাজিয়ে আইউব সরকার এতই নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়েছে যে, পূর্ব বাঙলায় যে প্রতিক্রিয়া সরকার আশা করেছিল, বাস্তবে ঘটেছে ঠিক তার বিপরীতটি। তখন সরকারি অত্যাচার এতই লৌহ দৃঢ় ছিল এবং সন্ত্রাস এতই ভয়াবহ ছিল যে, তৎক্ষণাৎ জনগণের পক্ষে কোন প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা সম্ভব ছিল না। সরকার যে কোন গণ-আন্দোলন দমাবার জন্য পুলিশ, ইপিআর ও সামরিক বাহিনীকে মোতায়েন রেখেছিল। প্রায় প্রতিদিন প্রতিরাত্র অস্ত্র-সজ্জিত ইপিআর বাহিনী আক্রমণোদ্ভূত অবস্থায় শহরের রাস্তায় টহল দিয়ে বেড়াত। আহাম্মকের মত আইউবের আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা সাজাবার ফলেই পূর্ব বাঙলার গণজাগরণ এত দ্রুত



হয়েছে। ১৯৬৮ সালের সারাটা বছর জনগণ প্রতিবাদের, প্রতিশোধের, বিদ্রোহের ও অভ্যুত্থানের উপায় অনুেষণ করেছে। পূর্ব বাঙলার স্বাধীনতার, শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য রাজবন্দীর মুক্তির এবং অত্যাচার-অনাচার-অবিচারের অবসানের উদ্দেশ্যে সংগ্রামের প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়ে গোপনে বহু বেনামি বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয়েছে। সারা দেশে-গ্রামে ও শহরে বিচ্ছিন্নভাবে তরুণেরা বহু গোপন দল সংগঠিত করেছে এবং সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আইউব-মোনেম সরকারের উৎখাতের উপায় খুঁজছে।<sup>১৮</sup>

পশ্চিম পাকিস্তানের কতিপয় আমলা-পুঁজিপতি-ব্যবসায়ী সম্পদের পাহাড় গড়ে তুললেও সেখানকার সাধারণ মানুষ বাঙালিদের মতই ধনিক বণিক জায়গীরদার জমিদার ও শাসকদের দ্বারা শোষিত ও নিগৃহীত ছিল। আইউব খানের কালা কানুন পশ্চিম পাকিস্তানের নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত তথা বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার হরণ করেছিল। সে অঞ্চলের সাধারণ মানুষের মনেও সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ চাঙ্গা হয়ে উঠেছিল।

এই পরিস্থিতিতে ১৯৬৮ সনের ৭ নভেম্বর একটি সাধারণ ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাওয়ালপিণ্ডিতে আইউব-বিরোধী ছাত্র-আন্দোলনের সূচনা হয়। সেখানকার ছাত্র হত্যা, নির্যাতন, সাক্ষ্য আইন প্রভৃতির প্রতিবাদে ঢাকায় ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন সশ্ৰমিতভাবে ১৯ নভেম্বর ১৯৬৮ প্রতিবাদ দিবস পালন করে এবং এর মধ্য দিয়ে পূর্ব বাঙলায় আইউব-বিরোধী গণ-আন্দোলনের সূচনা হয়। রিকশা চালকদের ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে ঐ আন্দোলন গতি লাভ করেছিল। পুলিশী-জুলুম-নির্যাতনের প্রতিবাদে ২ ডিসেম্বর ১৯৬৮ থেকে ঢাকায় রিকশা চালকরা ধর্মঘট করে আসছিলেন। মওলানা ভাসানী ৬ ডিসেম্বর পল্টন ময়দানে এক জনসভার আয়োজন করেছিলেন। জনসভায় পূর্ববাঙলার জনগণকে আন্দোলনের মাধ্যমে দাবি আদায়ের, রাজবন্দীদের মুক্ত করার এবং অন্যান্য-অবিচারের অবসান ঘটাবার আহ্বান জানানো হয়। রিকশাচালক ইউনিয়নের জনৈক নেতার অনুরোধে মওলানা ভাসানী ঐ মঞ্চ থেকে পরদিন ৭ ডিসেম্বর ১৯৬৮ ঢাকা শহরে সর্বপ্রকার যানবাহন ধর্মঘট আহ্বান করেন। ঐ দিন নীলক্ষেত্রে ও জিন্নাহ এভিনিউতে ছাত্র-জনতার সাথে পুলিশের তীব্র সংঘর্ষের জের হিসেবে পুলিশের গুলিতে নীলক্ষেত্রে আবদুল মজিদ ও জিন্নাহ এভিনিউতে আবু নামে এক কিশোর নিহত হয়। মওলানা ভাসানী ৬ ডিসেম্বরের সভামঞ্চ থেকে গভর্ণর মোনেমের ‘গভর্ণর ভবন’ ঘেরাও করে দাবি পেশের জন্য জনগণকে আহ্বান জানান। মওলানা সাহেবের নেতৃত্বে সেদিন জনগণ গভর্ণর ভবন ঘেরাও করে। আইউব খানের পদত্যাগ এবং ১৯৬৯ সনের ২৫ মার্চ পুনরায় সামরিক শাসন নিয়ে ইয়াহিয়ার অভ্যুদয় না ঘটা পর্যন্ত ঘেরাও আন্দোলন অব্যাহত থাকে।

৭ ডিসেম্বর ১৯৬৮ হরতালের সময় পুলিশী হামলার প্রতিবাদে পরদিন পুনরায় স্বতস্ফূর্তভাবে ঢাকা ও অন্যান্য স্থানে হরতাল পালিত হয়। অতপর মওলানা ভাসানীর আহ্বানে পূর্ব বাঙলায় কৃষক আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলন দমন করতে গিয়ে পুলিশ আরও বহু-লোকের প্রাণ হরণ করে। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে গুলি করে ছাত্র-জনতা হত্যা করার প্রতিবাদে আওয়ামী লীগ, ন্যাপ (মস্কাপন্থী) ও পিডিএম-এর যৌথ আহ্বানে ১৩

ডিসেম্বর ১৯৬৮ ঢাকাসহ সারা পূর্ব পাকিস্তানে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। ১৯৬৯ এর ৫ জানুয়ারি ঢাকায় সুনির্দিষ্ট কর্মসূচির ভিত্তিতে আন্দোলন সংগঠিত করে অর্ধবহু গণ-আন্দোলন সৃষ্টির লক্ষ্যে ডাকসু-র নেতৃত্বে ছাত্রলীগ ও ছাত্র-ইউনিয়ন (উভয়গুণ) এবং ছাত্র ফেডারেশনের একাত্মক সংঘবদ্ধ করে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়।

৬ দফাসহ সকল শ্রেণীর দাবি-দাওয়ার প্রতিফলন ঘটিয়ে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ কর্তৃক গৃহীত ১১ দফা কর্মসূচি জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয় ১৪ জানুয়ারি ১৯৬৯ তারিখে। ৮ জানুয়ারি ১৯৬৯ ঢাকায় আওয়ামী লীগ (৬ দফা পন্থী), ন্যাপ (মস্কোপন্থী), এনডিএফ, কাউন্সিল মুসলিম লীগ, জামাতে ইসলাম, নেজামে ইসলাম, আওয়ামী লীগ (পিডিএমপন্থী) ও জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের সমন্বয়ে ডেমোক্রেটিক অ্যাকশন কমিটি-‘ডাক’ বা গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটি ৮ দফা কর্মসূচি নিয়ে গঠিত হলে তাঁদের ডাকে ১৭ জানুয়ারি ১৯৬৯ বায়তুল মোকাররম চত্বরে এবং ১৮ জানুয়ারি ১৯৬৯ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে জনমনে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি করতে সক্ষম হন।

আন্দোলন মারমুখি হয়ে ওঠে প্রকৃতপক্ষে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের কার্যক্রমেই। ২০ জানুয়ারি ১৯৬৯ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের বিশাল বিক্ষোভ মিছিলের ওপর পুলিশ গুলি বর্ষণ করলে ছাত্রনেতা আসাদ নিহত হন। এ-হত্যাকাণ্ড আন্দোলনকে আরও তীব্র আর মারমুখি করে তোলে। আসাদের রক্তমাখা শার্ট নিয়ে হাজার হাজার মানুষ ঢাকার রাস্তায় সরকার-বিরোধী বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। আন্দোলনের নেতৃত্ব পুরোপুরি ছাত্র সংগ্রাম কমিটির হাতে চলে যায়। আসাদ হত্যার প্রতিবাদে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ২৪ জানুয়ারি ১৯৬৯ প্রদেশব্যাপী হরতাল আহ্বান করেন। ‘গণ-আন্দোলন’ পরিস্থিতির মোড় পরিবর্তন করে নিরস্ত্র জনতার ‘অভ্যুত্থানে’ রূপান্তরিত হয়।

এতদিন যারা জনগণের উপর অত্যাচার চালিয়েছে সেইসব কনভেনশন লীগার, আমলা, মৌলিক গণতন্ত্রী, টাউট, বদ-মাতব্বর ইত্যাদিকে জনগণ হত্যা করতে লাগল; অনেক জায়গায় অত্যাচারীদের বাড়ীঘর পুড়িয়ে দিতে লাগল এবং তাদের সম্পদ ছিনিয়ে নিতে আরম্ভ করল। বহুলাংশে কোন নেতৃত্বের ধার না-ধরেই জনগণ এই আন্দোলন চালিয়ে যেতে লাগল। সরকারের আর কোন অস্তিত্বই প্রকৃতপক্ষে দেশে রইল না।<sup>১৯</sup>

দক্ষিণপন্থী দলগুলো গণ আক্রমণের ভয়ে ১১ দফার বিরোধীতা করতে আর সাহসী হলো না। বাঙালি পুলিশ ইপিআর প্রভৃতি নিষ্ক্রিয় নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করতে থাকে। পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাদের দ্বারা পূর্ববাঙলার বিপ্লবীদের দমন করাও তখন সম্ভব ছিল না। সেখানেও (পশ্চিম পাকিস্তানে) চলছে তখন বিরাট গণআন্দোলন। আইউবের ক্ষমতার প্রধান উৎস মৌলিক গণতন্ত্রীরা ছাত্র-সংগ্রাম পরিষদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে দলেদলে পদত্যাগ করতে আরম্ভ করলেন। আইউব খান এই পরিস্থিতিতে নরম ও কৌশলগত লাইন গ্রহণ করেন। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তিনি আর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন না বলে বেতারে এক ঘোষণা দিলেন। আগরতলা মামলা ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ প্রত্যাহার করে নিয়ে সকল রাজবন্দীদের মুক্তি দেয়া হল। শেখ মুজিবের মুক্তিতে জনগণ পরম আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। ছাত্র সংগ্রাম

কমিটি তাঁকে ২৩ ফেব্রুয়ারি রমনার রেসকোর্স ময়দানে এক বিরাট গণ-সম্বর্ধনা জ্ঞাপন পূর্বক 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করেন। বঙ্গবন্ধু বলতে মানুষ ১৯৭২ সন পর্যন্ত আবেগে আপ্নত হয়ে উঠতেন।

আন্দোলনের জোয়ার উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো। প্রেসিডেন্ট আইউবের আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের গোলটেবিল বৈঠকের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো। দেশবাসীকে শাস্ত করার শেষ চেষ্টা হিসেবে গণধিকৃত গভর্নর আবদুল মোনাম্মেদ খানকে অপসারণ করে ড. এম. এন. হুদাকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিযুক্ত করা হয়। পদচ্যুত করা হয় পশ্চিম পাকিস্তানের গভর্নরকেও। কিন্তু জনগণের রোষ-ক্ষোভ কোনকিছুতেই আর নিবৃত্ত হলো না। আন্দোলনের ঢেউ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতেই থাকে।

পাকিস্তানকে রক্ষা করার কোন উপায়ই আর দেখতে না পেয়ে ২৫ মার্চ ১৯৬৯ দেশের প্রধান সেনাপতি জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানের পরামর্শ অনুযায়ী তাঁর নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করে তিন মাসের ছুটির কথা বলে আইউব খান ক্ষমতার মঞ্চ থেকে চিরবিদায় নেন।

ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা গ্রহণ করেই সারা পাকিস্তান সামরিক শাসন জারিপূর্বক মৌলিক গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র বাতিল ও আইন পরিষদসমূহ বিলুপ্ত করে মন্ত্রীপরিষদ ভেঙ্গে দিয়ে গভর্নরকে পদচ্যুত করেন। বলাবাহুল্য তিন মাস ছুটির পর আইউব খান আর ক্ষমতায় ফিরে আসেননি। বাঙালার রাজনীতিতে এর পরের ঘটনাপ্রবাহের নায়ক গণহত্যায়জ্ঞের জল্পাদ সেনাপতি ইয়াহিয়া খান। তিনি প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও প্রেসিডেন্টের পদে আসীন হয়ে ২৬ মার্চ ১৯৬৯ প্রথম জাতির উদ্দেশ্যে যে ভাষণ দেন, তাতে এবং বিভিন্ন প্রসঙ্গে পূর্ব বাঙালার জাগ্রত জনতার ভয়ে সর্বত্র সৎ উদ্দেশ্যই ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছিলেন, জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রাপ্ত বয়স্কদের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ গঠন, জনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর, নবনির্বাচিত জাতীয় পরিষদের সদস্যদের হাতে নতুন শাসনতন্ত্র রচনার ক্ষমতা প্রদান প্রভৃতি দায়িত্ব পালন করে তিনি ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়াবেন। আরও বলেছিলেন, তিনি নিজে কোন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন না কিংবা কোন রাজনৈতিক দল গঠন করবেন না।

অতপর ১৯৭০ সনের ডিসেম্বর মাসে সাধারণ নির্বাচনের তারিখ ধার্য হয়। ১২ নভেম্বর ১৯৭০ পূর্ব পাকিস্তানের উপকূলবর্তী অঞ্চলে ভয়বহ ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে প্রচুর মানুষজন ও সম্পদ ধ্বংস হয়। উপক্রত এলাকায় রাজনৈতিক দলগুলোর রিলিফ কাজ চালানোর জন্য ন্যাপ এবং কোনো কোনো পার্টি নির্বাচন পিছিয়ে দেয়ার দাবি করলেও আওয়ামী লীগ তথা শেখ মুজিবের ভয়ে নির্বাচন পিছানো হয় না। কেবলমাত্র উপক্রত এলাকায় কয়েকটি আসনের নির্বাচন পিছিয়ে দেয়া হয়।

শেখ মুজিব নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে কালবিলম্ব করতে চাননি দুটি কারণে—যথা কোন কারণে পিছিয়ে গেলে নির্বাচন অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত হয়ে পড়তে পারে ;

দ্বিতীয়ত নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত ছিলেন। যারা হঠকারী এবং কায়েমী স্বার্থী—তারা নানা প্রতিবন্ধকতা এবং অজুহাতের সৃষ্টি করতে চাইলেও শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত প্রোগ্রাম অনুযায়ী জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হলো এবং পূর্ব বাঙলার জনগণ ৬ দফা ও ১১ দফার কর্মসূচির ভিত্তিতে পরিচালিত আওয়ামী লীগের কর্মসূচিকে সফল করার জন্য নিরঙ্কুশভাবে সমর্থন জানালেন। মাত্র দুটি আসন ব্যতীত সকল আসনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী জয়ী হলেন। আওয়ামী লীগ ব্যতীত অপর দুটি আসনে (ময়মনসিংহের নান্দাইল থেকে) পিডিপির চেয়ারম্যান নূরুল আমীন এবং (পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে) রাজা ত্রিদিব রায় স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানের (প্রাদেশিক পরিষদ) একশ বাষট্টিটি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ একশত ষাটটি আসন লাভ করেন। জুলফিকার আলী ভুটোর নেতৃত্বাধীন পিপসল পার্টি পশ্চিম পাকিস্তান একশ আটত্রিশটি আসনের মধ্যে একাশিটি আসনে বিজয়ী হয়। তিনশ আসন বিশিষ্ট জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। তবে পশ্চিম পাকিস্তানে তারা কোন আসন পায়নি।

অপরদিকে পিপসল পার্টি পূর্ব পাকিস্তান কোন প্রার্থীই দিতে পারেনি। আইনানুগভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের অধিকার অর্জন করে এবং পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রীরূপে শেখ মুজিবুর রহমানকে পূর্ববাঙলার জনগণ মনে মনে বরণ করে নেয়।

কিন্তু এক্ষেত্রেও পশ্চিম-পাকিস্তানি শাসকচক্র নতুন চক্রান্ত শুরু করে। পূর্ব বাঙলাকে শোষণের অধিকার হাতছাড়া করতে তারা ছিল নারাজ। কিন্তু ন্যায়সঙ্গত অধিকার কেউ খর্ব করতে পারে না। নির্বাচনের পর ইয়াহিয়া খান ১৯৭১ সনের ৩ মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশন আহ্বান করেন। আওয়ামী লীগ এ অধিবেশনে যোগদানের জন্য প্রস্তুত ও ইচ্ছুক কিন্তু ইয়াহিয়া খান তথা পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকচক্র আওয়ামী লীগকে সে সুযোগ দিতে প্রস্তুত ছিল না। আওয়ামী লীগ বিজয় লাভ করায় ইয়াহিয়া খানসহ পশ্চিম পাকিস্তানের সকল সরকারি ও বেসরকারি মহল অসন্তুষ্ট হয়েছিল। পরিষদের লোক দেখানো তারিখ নির্ধারণ ছিল প্রকৃত প্রস্তাবে অধিবেশন বানচাল করার কুমতলবে জুলফিকার আলী ভুটোর সঙ্গে গোপন আঁতাতে লিপ্ত হবার সুযোগ এবং পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে সঠিক পন্থা নির্ধারণ করার জন্য কৌশল অন্বেষণ।

শেখ মুজিবুর রহমান ৬ দফার প্রশ্নে আপোষ করতে রাজি না-হওয়ায় ভুটোর পিপিপি জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করতে অস্বীকার করায় জটিলতার সৃষ্টি হয়। একে অজুহাত করে ইয়াহিয়া খান ১ মার্চ ১৯৭১ আকস্মিক ভাবে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন। অধিবেশন মূলতবি রেখে নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করায় পূর্ব বাঙলায় মারাত্মক বিপরীত ফল ফললো। সকল জনতা স্বাধীনতার দাবিতে সোচ্চার হলেন এবং সস্মুখ সশস্ত্র সংগ্রাম ও যুদ্ধ করে হলেও স্বাধীনতা লাভের জন্য তাঁরা প্রস্তুত হয়ে গেলেন।

দিকে দিকে স্বাধীন বাঙলার পতাকা উজ্জ্বল হতে আরম্ভ করলো। ইয়াহিয়া খান মার্চ মাসের পুরো সময়ে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সৈন্য ও আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্র পূর্ব বাঙলায় জমায়েত করতে লাগলেন। গণহত্যার মাধ্যমে পূর্ব বাঙলার জনগণের দাবিকে চিরতরে স্তব্ধ করে দেবার জন্য ২৫ মার্চ ১৯৭১-এর কালোরাত্রিতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কামান গর্জে উঠল নিরস্ত্র বাঙালির কলিজা তাক করে। শেখ মুজিবকে বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হল পশ্চিম পাকিস্তানে।

বাঙলার জনগণ জান দিতে জানে, কিন্তু মুক্তির আশা ছাড়তে পারে না। তাঁরা 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম' বঙ্গবন্ধুর এই বাণীকে জীবন-মন্ত্ররূপে অবলম্বন করে সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রামে ঝাঁপিড়ে পড়লেন। দীর্ঘ নয় মাসের সশস্ত্র সংগ্রামে ত্রিশ লক্ষ বাঙালির জীবনদান, ক্ষয়ক্ষতি এবং বাঙালি মা বোন শিশু বৃদ্ধ নরনারীর প্রাণ মান সম্মান ইজ্জত ও 'এক সাগর রক্তের বিনিময়ে' ১৯৭১ সনের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশকে হানাদার মুক্ত করে বাঙালিরা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয় নতুন, স্বাধীন, স্বাৰ্বভৌম বিজয়ের পতাকা সম্বলিত এক জাতি ও রাষ্ট্রের—যার নাম 'বাঙালি' ও 'বাংলাদেশ'।

## তথ্যপঞ্জি

১. অমদাশংকর রায়, সংহতির সংকট, কলকাতা ১৯৮৪, পৃ. ১২০।
২. ইসরাইল খান, চট্টগ্রামের প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের এক পর্ব, লোকায়ত (ঢাকা), ১১ বর্ষ, ১ সংখ্যা, অক্টোবর ১৯৯২, পৃ. ৫৯।
৩. অর্ধ-সাপ্তাহিক চাবুক, পূর্বাঞ্জন, মাসিক সীমান্ত (১৩৫৪-র কার্তিক-অগ্রহায়ণ ও পরবর্তী কয়েকটি সংখ্যা) এবং 'কৃষ্টি' (কার্তিক ১৩৫৪) ইত্যাদি বিভিন্ন পত্রিকায় বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব মুদ্রিত আছে। গণপরিষদেও (১৯৪৮ সনে) বাংলাকে গণপরিষদের ভাষা করার প্রস্তাব উখিত হয় সাংসদ শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত কর্তৃক। কিন্তু মুসলিম লীগের বিরোধিতায় তা কার্যকর হয় না।
৪. আহমদ শরীফ, বাংলাভাষা সংস্কার-আন্দোলন, ঢাকা ১৯৮৬, পৃ. ১।
৫. পূর্বাঞ্জন, ভূমিকা।
৬. আবুল কাশেম ফজলুল হক, মুক্তি সংগ্রাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগ, ১৯৭২, পৃ. ৫।
৭. পূর্বাঞ্জন, একুশে ফেব্রুয়ারি আন্দোলন, ঢাকা ১৯৭৬, পৃ. ২০।
৮. বদরুদ্দিন উমর, পূর্ববাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, ১ ও ২ খণ্ডের ভূমিকা।
৯. পূর্বাঞ্জন।
১০. আবুল মনসুর আহমদ, আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, ঢাকা ১৯৭০, পৃ. ৩২১।
১১. বাংলাদেশের স্বাধীনতায়ুদ্ধ : দলিলপত্র, প্রথম খণ্ড, ঢাকা ১৯৮২, পৃ. ৩৭৩-৭৪ এ 'দফা' মুদ্রিত আছে। আবুল কাশেম ফজলুল হকের বিভিন্ন লেখায় ২১ দফার তাৎপর্য সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা আছে। তাছাড়া ২১ দফা এখন 'সংস্কৃত লভ্য বিধায় উদ্ধৃত করা হয়নি। ২১ দফা বাঙলার জনমনে জনপ্রিয়তা পায়।
১২. আবুল কাশেম ফজলুল হক, একুশে ফেব্রুয়ারি আন্দোলন, ঢাকা ১৯৭৬, পৃ. ২৫।
১৩. আবুল মনসুর আহমদ, পূর্বাঞ্জন।

১৪. তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬। ২৬ সংখ্যক পাদটীকার পরের সাধুভাষার উদ্ধৃতিগুলোর জন্য এগ্রন্থের ৪৬-৫৬ পৃ. দ্র।
১৫. আবুল কাসেম ফজলুল হক, মুক্তি সংগ্রাম, পৃ. ৫৬-৫৭। ১২ নং পাদটীকার পরের অংশ 'মুক্তি সংগ্রাম ; সাঈদ-উর-রহমান প্রণীত 'পূর্ব বাঙলার রাজনীতি সংস্কৃতি ও কবিতা' (পৃ ৬৪-৬৫) ; তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার 'পাকিস্তানী রাজনীতির বিশ বছর' (পৃ ১০০-১২০) ও নূরুল ইসলাম প্রণীত 'একাত্তরের ঘাতক-দালাল যা বলেছে যা করেছে' (ঢাকা ১৯৯১, পৃ. ৮-২২) অবলম্বনে লিখিত।
১৬. নূরুল ইসলাম, একাত্তরের ঘাতক-দালাল যা বলেছে যা করেছে, পৃ. ২৫।
১৭. শেখ মুজিবুর রহমানের জবানীতে ছয় দফা কর্মসূচির অসংখ্য পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র : দ্বিতীয় খণ্ডে সংকলিত পুস্তিকাটি প্রকাশের তারিখ ৪ চৈত্র ১৩৭২ (মার্চ ১৯/২০, ১৯৬৬)। ঐ ছয় দফা পুস্তিকার প্রকাশক ছিলেন : আবদুল মমিন, প্রচার সম্পাদক, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ, ৫১ পুরানা পল্টন, ঢাকা ২। গ্লোরি প্রিন্টার্স, ঢাকা ১ থেকে মুদ্রিত হয়েছিল। ছয় দফাও বর্তমানে অনেক গ্রন্থে মুদ্রিত অবস্থায় পাওয়া যায় বলে এখানে উদ্ধৃত করা হয়নি।
১৮. আবুল কাসেম ফজলুল হক, মুক্তি সংগ্রাম, পৃ. ৬৮।
১৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭১।

## ২.৩. বাঙলার রাজনীতি ও সাহিত্য-সংস্কৃতি ভাবনায় কমিউনিস্ট আন্দোলন এবং মার্কসীয় চিন্তাধারার প্রভাব

[ ভারতবর্ষ তথা বাঙলায় কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা ; মার্কসীয় রাজনীতি, সংস্কৃতি চর্চার প্রভাব ; পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি গঠন ও তার কার্যক্রম ; যুবলীগ গঠন ; গণতন্ত্রী দলের জন্ম ; ভাষা-আন্দোলন ও ১৯৫৪ সনের মুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা ; কমিউনিস্ট পার্টির কার্যক্রম দমনের জন্য পাকিস্তান সরকারের নিবর্তনমূলক কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ ; কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ঘোষণা ; ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ)-র জন্ম এবং পাকিস্তানের মার্কসীয় চিন্তাধারার কর্মীদের মধ্যে চীন-সোভিয়েত মহাবিতর্কের প্রভাব ; কমিউনিস্ট পার্টি ও তার বিভিন্ন অঙ্গ দলের মধ্যে ভাঙন ; সাংস্কৃতিক অঙ্গনে চীন-রাশিয়ার মার্কসীয় সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রভাব ; বাঙালি কবি-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের মার্কসীয় ভাবধারায় অনুপ্রেরণা লাভ। ]

বাঙলায় কমিউনিস্ট আন্দোলন ও মার্কসীয় চিন্তাধারার প্রভাব সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করা দরকার। কারণ আলোচ্য কালের রাজনীতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের প্রধান প্রাগুসর ধারা হচ্ছে মার্কসীয় মতবাদী কিংবা অনুসারীদের বিকাশ ও পুষ্টির ইতিকথা। এঁদের শত্রু ও প্রতিপক্ষ ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক কায়েমি স্বার্থবাদী প্রতিক্রিয়াশীলেরা। এঁরা সংঘবদ্ধ হয়েছিলেন মুসলিম লীগের সৈরাচারি সরকারের ছত্রছায়ায়। বিপক্ষের প্রধান বিকাশমান শক্তি কমিউনিস্ট বা মার্কসীয় মতবাদে দীক্ষিত ও অনুপ্রাণিত রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব এবং এঁদের সৃষ্ট সাহিত্য-শিল্প। মোটামুটিভাবে এঁরা সবসময় সরকার-বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ ছিলেন। এঁদের প্রভাব ও প্রচার কাজে লেগেছে মধ্যপন্থী উদার মানবতাবাদীদের জাগরণে। চরম ও পরম, সাম্প্রদায়িক ও কমিউনিস্টদের মধ্যে সেতুবন্ধরূপে কাজ করেছেন গণতান্ত্রিক মানবতাবাদীরা।

১৯২১ সনে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠার পর থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-৪৫) পর্যন্ত সময়টা ছিল বাঙলার তথা ভারতের সমাজ-মানস, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অঙ্গন মার্কসীয় চিন্তাধারা দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হবার কাল। ঔপনিবেশিক শাসন থেকে অব্যাহতি লাভ তথা ৪৭-এর স্বাধীনতা সংগ্রামে এই ভাবাদর্শ দ্বারা আলোড়িত ও উদ্বোধিত চেতনার কবি সাহিত্যিক, লেখক বুদ্ধিজীবী, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মীবৃন্দ ব্যাপক সদর্থক ভূমিকা পালন করেছিলেন। এদেশে কমিউনিস্টরাই গণ সাহিত্যের, গণ নাটকের, গণসঙ্গীতের স্রষ্টা। ১৯৩০ সনের পর থেকে শিল্পোন্মীর্ণ মার্কসীয় সাহিত্য সৃষ্টি হতে থাকে। ১৯৩৬ সনে প্রগতি লেখক সংঘ ভারতীয় গণনাট্য আন্দোলন শুরু করে। আর ১৯৪৩ সনে বাঙলায় গণনাট্য সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। মার্কসবাদের প্রভাবে 'এই প্রথম অতীত বিরহী বর্তমানে স্থিত নাস্তিক মানুষ সৃষ্টি হতে থাকে।'<sup>১</sup>

কিন্তু ভারতে রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মতো বাঙলায় কোনো 'বিপ্লব' কিংবা আমূল পরিবর্তিত সমাজ-ব্যবস্থা কায়েমের ক্ষেত্রে কমিউনিস্টরা কোনো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেননি। কারণ 'কমরেড' হলেও গুরুত্বপূর্ণ যুগ-সম্বন্ধক্ষেপে ভারতবর্ষের এই

মার্কসবাদী কর্মীরা ছিলেন ‘হিন্দু’ ও ‘মুসলমান’। হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ ও তার ফলে সংঘটিত দাঙ্গা, ও হত্যার ঘটনাসমূহ ‘কমরেড’দের চিত্তলোককে এমন ভাবে তৈরি করে যে— ‘হিন্দুস্থান’ ও ‘পাকিস্তান’ সৃষ্টিতে কোনো অন্তরায় সৃষ্টি হয়নি। পাকিস্তান সৃষ্টির পরও কমিউনিস্টরা মুসলিম লীগের নেতৃত্বাধীন পূর্ববঙ্গে, পশ্চিম পাকিস্তানে এবং কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন হিন্দুরাজ্য ভারতের কমিউনিস্টরা ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থায় ব্যাপক কোনো পরিবর্তন সৃষ্টি করতে পারেননি। বিভাগে পরবর্তীকালে কলকাতায় (২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ৬ মার্চ ১৯৪৮ পর্যন্ত) ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুসারে পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়। সাধারণ সম্পাদক পশ্চিম পাকিস্তানের সাজ্জাদ জহির এবং সদস্য খোকা রায়, নেপাল নাগ, জামালুদ্দীন বুখারা, আতা মোহাম্মদ, ইব্রাহীম, মণি সিংহ, কৃষ্ণবিনোদ রায় ও মনসুর হাবিব প্রমুখ। পাকিস্তান কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক ব্যুরো গঠিত হয় সাজ্জাদ জহির, কৃষ্ণ বিনোদ রায় ও খোকা রায়কে নিয়ে।

পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টিতে শ্লোগান তোলা হয় : ‘ইয়ে আজাদী খুঁটা হ্যায়, লাখো ইনসান ভুখা হ্যায়’। এটা মূলত ঔপনিবেশিক আমলের সংগ্রামেরই ধারাবাহিক রূপ। কমিউনিস্ট পার্টি কৌশল হিসেবে ভারতের কংগ্রেস ও পাকিস্তানের লীগ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করার কথা ঘোষণা করেন। কিন্তু খাজা নাজিমুদ্দীননের পঞ্চ-বাহিনী কমিউনিস্টদের ভাবমূর্তি নষ্ট করার লক্ষ্যে জোর প্রচারণা চালায় এই বলে যে,—তারা ধর্মে বিশ্বাস করে না, ভারতের দালাল, পাকিস্তানকে হিন্দুস্থান বানাতে চায়, স্বাধীনতা মানে না ইত্যাদি। এতে জনগণ বিভ্রান্ত হয়। তাছাড়া কমিউনিস্ট ও প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক কর্মীদের উপর নিপীড়ন চালানোর ফলে মার্কসীয় মতাদর্শের প্রভাব স্তিমিত হয়ে আসে। এরই মধ্যে কমিউনিস্টরা দেশের হাজং ; বিয়ানীবাজার, নাচোল, খুলনা বিভিন্ন স্থানে সশস্ত্র সংগ্রামের চেষ্টা চালায়। কিন্তু নিপীড়নের মুখে তাও অচিরেই দমিত হয়ে পড়ে। তখন পার্টির লাইন ছিল হঠকারি কার্যক্রম পরিচালনা করা। রণনীতি ছিল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও গণতান্ত্রিক বিপ্লব একাকার হয়ে গেছে।<sup>১২</sup>

১৯৪৭ সনের ৬ ও ৭ সেপ্টেম্বর সাম্যবাদী চিন্তায় অনুপ্রাণিত কতিপয় তরুণের উদ্যোগে ঢাকায় ‘গণতান্ত্রিক যুবলীগের’ পূর্ব বাঙলা শাখা গঠিত হয়। এর সভাপতি ছিলেন শামসুল হক এবং নেতৃত্বের মধ্যে ছিলেন মোহাম্মদ তোয়াহা (১৯২২-১৯৯০) কামরুদ্দীন আহমদ (১৯১৩-৮২) নইমুদ্দীন আহমদ, তাজউদ্দীন আহমদ (১৯২৮-৭৫) ও অলি আহাদ প্রমুখ। সরকারি ও সরকারের সমর্থকদের নির্যাতনের মুখে দলটি উঠে যায়। তবে দলের মুদ্রিত কর্মসূচি দ্বারা শ্রমিক শ্রেণীর প্রাধান্য এবং ‘সমষ্টির মালিকানা’র ধারণা সমাজে ব্যপ্ত হয়েছিল।<sup>১৩</sup>

গণতান্ত্রিক যুবলীগের মার্কসীয় মতবাদে প্রভাবিত কর্মীবৃন্দ পুনরায় সংঘবদ্ধ হয়ে ১৯৫১ সনের ২৭ মার্চ ঢাকার বার লাইব্রেরি হলে এক সম্মেলনের আয়োজন করেন। কিন্তু পুলিশ ১৪৪ ধারা জারি করে স্থানটি দখল করে থাকায় সম্মেলন ব্যর্থ হয়ে যায়। অতপর এপ্রিল মাসে বুড়িগঙ্গা নদীতে নৌকার উপরে উদ্যোক্তাবৃন্দ সম্মেলন আহ্বান করেন এবং ‘পাকিস্তান



যুবলীগ গঠিত হয়। ধর্মীয় রাজনীতির জোয়ারের দিন ‘অসাম্প্রদায়িকতার’ মূলনীতি নিয়ে দল গঠন করে যুবলীগ কন্নীরা দেশের প্রতি প্রেম ও কল্যাণ ভাবনার পরিচয় দেন। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির এই দলটি ১৯৫৮ সনের সামরিক অভ্যুত্থানের পরিণতিতে বেআইনী ঘোষিত হয়।<sup>৪</sup>

১৯৫৩ সনের মার্চ মাসে পশ্চিম পাকিস্তানের কমিউনিস্ট নেতাদের উপর ‘রাওয়ালপিণ্ডি ষড়যন্ত্র মামলা’ চাপিয়ে দেয়া হয় এবং পশ্চিম পাকিস্তানের কমিউনিস্ট নেতাদের গ্রেফতার করে কমিউনিস্ট পার্টির কার্যক্রমে স্তিমিত করে দেয়া হয়।

১৯৫৩ সনের জানুয়ারি মাসে পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরা ঢাকার আরমানীটোলা ময়দানে পাকিস্তানের বৃকে ডেমোক্রটিক পার্টি বা গণতন্ত্রী দল নামে একটি প্রগতিশীল অসাম্প্রদায়িক ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী রাজনৈতিক দলের পত্তন করেন। এই দলের পূর্ববাঙলা শাখার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন যথাক্রমে হাজী মোহাম্মদ দানেশ ও মাহমুদ আলী। সভায় গৃহীত প্রস্তাবের মধ্যে ছিল :

বর্তমান গণপরিষদ বাতিল করে প্রাপ্তবয়স্কদের যুক্ত নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন গণপরিষদ প্রতিষ্ঠা করা, মূলনীতি উপসংঘের রিপোর্ট বাতিল করা, কেন্দ্রের এখতিয়ারে দেশরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক ও আন্ত-আঞ্চলিক যোগাযোগ রেখে পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের কনফেডারেশনের ভিত্তিতে নতুন শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা, বৃটিশ কমনওয়েলথের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করা এবং রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিয়ে অবাধ গণতন্ত্রের পথ সুগম করা।<sup>৫</sup>

এই দলের অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক নীতি ও কর্মসূচির মধ্যে সেদিন মূর্ত হয়ে উঠেছিল বাঙলার সবচেয়ে প্রগতিশীল মতাদর্শ। এই সময় পার্টির লাইন ছিল আওয়ামী লীগ, গণতন্ত্রীদল প্রভৃতির মধ্যে কাজ করা। কমিউনিস্ট পার্টির স্বতন্ত্র ভূমিকা নিয়ে দাঁড়ানোর চিন্তা ও কার্যক্রম কমিউনিস্ট নেতাদের মধ্যে তখনও ছিল না। এই সময় থেকে পার্টি শ্রেণীসংগঠন ও সংগ্রামের লাইন ছেড়ে দেয়। যদিও এই ধরনের কাজের বিরুদ্ধে পার্টিতে জোরালো বক্তব্য উত্থাপিত হয়েছিল। ১৯৫৩-৫৬ পর্যায় পার্টিতে মূল লাইনের বিরুদ্ধে বক্তব্য নিয়ে সোচ্চার হয়েছিলেন কুমার মিত্র, সত্য মৈত্র, মারুফ হোসেন প্রমুখ নেতা। তাঁরা জেল থেকে এক বক্তব্য (বা দলিল) উপস্থিত করেন। এতে পার্টিকে স্বতন্ত্র ভূমিকা নিয়ে অগ্রসর হবার কথা বলা হয় ; এবং আওয়ামী লীগের সঙ্গে মিলে কাজ করার লাইনকে ভ্রান্ত বলে আখ্যায়িত করা হয়। এই দলিন ‘খিসিস অব জেল কমরেডস’ নামে পরিচিত হয়েছিল।<sup>৬</sup>

১৯৪৮-৫২ পর্বে পরিচালিত ‘ভাষা আন্দোলন’ বা ‘একুশে ফেব্রুয়ারি আন্দোলনে’ কমিউনিস্ট পার্টির কন্নীরা অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন বলে আন্দোলন শক্তিশালী হয়েছিল। আন্দোলনে মার্কসীয় মতাদর্শের ছাত্র-নেতা কর্মীদের সংখ্যা কম ছিল না। ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ পার্টি ভাষা-আন্দোলনের মূল্যায়ণ করে নূরুল আমীন সরকারের পদত্যাগ দাবি করে এবং এই আন্দোলনের সঙ্গে কৃষক শ্রমিক ছাত্রসহ মেহনতী জনতার দাবি-দাওয়ার সম্পর্ক নির্ণয় করে। ভাষা-আন্দোলনের ধারাবাহিকতা রক্ষা করার জন্য কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে ১৯৫২ সনের ২৬ এপ্রিল ‘পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন’ নামে প্রগতিশীল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ছাত্র

সংগঠনটি গড়ে তোলা হয়। নভেম্বর (১৯৫২) মাসে এই সংগঠনের নামকরণ করা হয় ‘পূর্বপাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন’। এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন মোহাম্মদ সুলতান।<sup>৭</sup>

ভাষা-আন্দোলনের ন্যায় ১৯৫৪ সনের যুক্তফ্রন্ট-নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য, কর্মী ও নেতৃবৃন্দ মুসলিম লীগ-বিরোধী নির্বাচনী যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। এবং সম্মিলিতভাবে জয় লাভ করেন। কমিউনিস্টদের ভাবমূর্তির বিরূপ প্রতিফলনের আশঙ্কায় ফ্রন্টে কমিউনিস্ট পার্টি অন্তর্ভুক্ত ছিল না। কিন্তু যেখানে সুপরিচিত কমিউনিস্ট প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন, সেখানে ফ্রন্ট কোনো প্রার্থী না দিয়ে কমিউনিস্টদের সহযোগিতা স্বীকার করেন। বিভিন্ন দলের ছদ্মাবরণে নির্বাচিত কমিউনিস্ট সদস্যদের সংখ্যা ছিল ২৬ জন।<sup>৮</sup>

১৯৫৪ সনের নির্বাচনের ফলাফল পাকিস্তান সরকার পশ্চিমাদের শোষণ অবসানের আলামত মনে করে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা বাতিল করার সময়ে ধ্বংসাত্মক কর্ম-তৎপরতা চালাচ্ছে মর্মে অভিযোগ এনে কমিউনিস্ট পার্টিও নিষিদ্ধ করে দেয়া হয় (৫ জুলাই ১৯৫৪)। পূর্ব বাঙলায় কোন কমিউনিস্টকে থাকতে দেয়া হবে না—এই ছিল তখনকার পাকিস্তান সরকারের অনুসৃত নীতি। পার্টি বেআইনী ঘোষিত হবার পর আন্ডার গ্রাউন্ডে চলে যায় এবং আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে থেকে কাজ করতে থাকে। ১৯৫৬ সনে কলকাতায় অনুষ্ঠিত গোপন-বেঠেকে পার্টিকে পূর্ববঙ্গ ভিত্তিক কমিউনিস্ট পার্টি হিসেবে কাজ করার সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়। এই বেঠেকে কোনো কোনো নেতা পূর্ব-পাকিস্তানকে পৃথক রাষ্ট্ররূপে গড়ে তোলার প্রস্তাব করেন। অতএব কমিউনিস্টদের দ্বারাই প্রথম পূর্ব পাকিস্তানকে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসেবে গড়ার প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছিল। যদিও তা শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসের ভোটভুক্তিতে বাতিল হয়ে যায়।

যাহোক, ১৯৫৭ তে ‘ন্যাপ’ গঠিত হলে কমিউনিস্টরা আওয়ামী লীগ ছেড়ে ন্যাপের সঙ্গে কাজ করতে থাকেন। কিন্তু ১৯৫৮ সনের ৭ অক্টোবর সামরিক শাসন জারি হলে কমিউনিস্টদের কার্যক্রম আবার আন্ডার গ্রাউন্ডে চলে যায়। প্রকৃতপক্ষে প্রকাশ্য কোন রাজনৈতিক তৎপরতাই তখন ছিল না।<sup>৯</sup>

পরবর্তীতে চীন-সোভিয়েত মহাবির্তকের প্রভাবে কমিউনিস্ট পার্টিতে ভাঙন ধরায়। স্টালিনের মৃত্যুর (১৯৫৩) পরে ১৯৫৬ সনে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির ২০তম কংগ্রেসে স্টালিনের ভূমিকা মূল্যায়নে এবং আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের রণনীতি ও কৌশলের প্রশ্নে কমিউনিস্ট-শিবির দ্বিধা বিভক্ত হয়েছিল। একদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো, অপর দিকে ছিল চীন ও আলবেনীয়। এই বিতর্ক ১৯৫৬ সনে শুরু হয় এবং ১৯৬৪ সন নাগাদ মীমাংসার অসাধ্য পর্যায়ে উপনীত হয়। পৃথিবীর সকল দেশের কমিউনিস্টদের মতো পাকিস্তানের কমিউনিস্ট-আন্দোলনেও এই বিতর্ক গভীর প্রভাব বিস্তার করে।

১৯৬৪ সন থেকে জোর বিতর্ক আরম্ভ হয়। নেতা কর্মীরা দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েন। রুশ-চীন মহা বিতর্ক কলহের কালে কেন্দ্রীয় কমিটির ১১জন সদস্যের মধ্যে ৯ জনই

আন্তর্জাতিক তথা স্টালিন ; যুদ্ধ ও শান্তি ; বিপ্লব ; জাতীয় মুক্তি-আন্দোলন ও যুগোশ্লাভাকিয়ার প্রশ্নে ক্রুশ্চেভ (রাশিয়ার)-নেতৃত্বের বক্তব্যকে সঠিক বলে গ্রহণ করেন। সুখেদু দস্তিদার ও মোহাম্মদ তোয়াহা উপযুক্ত প্রশ্নে চীনের মতামতকে সমর্থন করেছিলেন। তাঁদের বক্তব্য 'দুইনীতি' হিসেবে পরিচিত ছিল।

এছাড়া, ১৯৬২ সনের চীন-ভারত যুদ্ধ ও শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বের প্রশ্নেও মস্কা ও চীনপন্থী কমিউনিস্টদের মধ্যে মত পার্থক্যের সৃষ্টি হয়। ১৯৬৫ সনের পাক-ভারত যুদ্ধ নিয়েও এঁদের মধ্যে মতান্তর সৃষ্টি হয়। তবে অধিকাংশই ভারতের পক্ষে মনোভাব ব্যক্ত করেন। শ্রমিক নেতৃত্ব বিসর্জন দিয়ে শ্রমিক ও দেশপ্রেমিক বুর্জোয়াদের যৌথ নেতৃত্বের তত্ত্ব প্রচার করেছিলেন। তাছাড়া ১৯৬৫ সনের পাক-ভারত যুদ্ধের সময়ও তাঁরা আক্রান্ত দেশ ও আক্রান্তকারীর বৈশিষ্ট্য নির্ণয়ে প্রয়াসী হননি।

এই বিরোধের প্রশ্ন প্রথমে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও ক্রমান্বয়ে কর্মী ও পার্টি বহির্ভূত প্রগতিশীল ছাত্র বুদ্ধিজীবী, লেখক সাহিত্যিক এবং সমর্থক দরদীদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের মধ্যেও এই বিরোধ বিতর্ক ক্রিয়া করে এবং উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। ফলে ১৯৬৫ সনের (১-৩ এপ্রিল, ঢাকা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে অনুষ্ঠিত বার্ষিক) সম্মেলনে পূর্বপাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন 'মেনন গ্রুপ' ও 'মতিয়া গ্রুপ' এ বিভক্ত হয়ে পড়ে।

এই ভাঙন এদেশের প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী ও বামপন্থী মহলে গুরুতর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। সারা দেশের ছাত্র সংগঠনগুলোতে বিভক্তিকরণের কাজও সম্পন্ন হয়। ছাত্র ইউনিয়ন এর ভাঙনের ফলে পূর্ব পাকিস্তান কৃষক সমিতি, ন্যাপ, শ্রমিক ফেডারেশন প্রভৃতিতেও ভাঙন ধরে। মস্কাপন্থী নেতৃত্বকে কেন্দ্রে বেশি থাকলেও জেলা পর্যায়ে পিকিংপন্থী নেতাকর্মীর সংখ্যা অধিক ছিল। এভাবে নেতাদের মধ্যে ছল চাতুরী হঠকারিতা বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং বামপন্থীদের মধ্যে হিন্দু সদস্যের প্রাধান্যের কারণে পাক-ভারত, চীন-রাশিয়া প্রভৃতি যুদ্ধ ও মূলকর্মধারার প্রশ্নে পূর্ব বাঙলার কমিউনিস্ট আন্দোলন ক্রমান্বয়ে বিভক্ত হতে হতে দুর্বল ও জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। কেউই একপার্টি কাঠামোর মধ্যে মতাদর্শগত সংগ্রাম চালাবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি। দুই পক্ষের সাংগঠনিক তৎপরতাই কেবল নিজেদের নেতৃত্ব ঠিক রাখার কাজে মগ্ন ছিল।

১৯৭১ সন পর্যন্ত মস্কাপন্থী কমিউনিস্টরা আওয়ামী লীগকে সমর্থন করেন। তাঁরা ছয় দফার সমর্থন করেন আর পিকিংপন্থীরা বিরোধীতা করেছিলেন। মস্কাপন্থীদের মধ্যে আবার আওয়ামী লীগ ও সোভিয়েত-ভারতের প্রতি অন্ধ আনুগত্যের ইস্যুতে ভাঙন ধরে। নাসিম আলীর নেতৃত্বাধীন 'হাতিয়ার গ্রুপ' পার্টির সংশ্রব ত্যাগ করে এবং পিকিং পন্থীরা আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ১৯৬৫ পরবর্তী গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, ৭০ এর নির্বাচন এবং ৭১ এর মুক্তি সংগ্রামে নেতিবাচক ভূমিকা পালন করেন।

১৯৫৪ সন থেকে পার্টির লাল পতাকা ছিল নমিত। পার্টি নিষিদ্ধকরণ, কর্মীদের কারারুদ্ধকরণ ইত্যাদি কারণে মার্কসবাদী রাজনৈতিক সংগঠনগুলো ছিল গোপনীয় এবং

বিপজ্জনক। ফলে কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধি পেতে পারেনি। কিন্তু বুদ্ধিজীবী, শিল্পী সাহিত্যিকদের মধ্যে মার্কসবাদের প্রভাব ও প্রচার হওয়ায় এদেশের সাহিত্য শিল্পে এ ধারার বিকাশ ঘটেছিল। তখন অবশ্য সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে মার্কসীয় চিন্তা চেতনা ও কার্যক্রম আতঙ্কের বিষয় ছিল না।

কিছুটা নৈতিক বল, দৃঢ় চারিত্রিক শক্তি এবং ত্যাগী মনোভাব না থাকলে কেউ বামপন্থী চিন্তা করতেন না। স্বার্থবাদীরা সরকারের সাম্প্রদায়িক পাকিস্তানবাদী ধারায় কাজ করতে আয়াস বোধ করতেন। চতুরেরা প্রগতিশীল বলে আত্মপরিচয়দানকারী মানবতাবাদী ধারায় নিজেদের চিহ্নিত করতে উৎসাহী ছিলেন। সুবিধাবাদী বুদ্ধিবৃত্তিক ও রাজনৈতিক কর্মীদের কেউ কেউ নিরাপদ দূরত্বে থেকে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রী সাজতে বা ভাববাদী সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার প্রচার করতে তৎপর হতেন।

মুসলিম রাষ্ট্রের মুসলমান লেখক সাহিত্যিক রাজনৈতিক কর্মীবৃন্দ নাস্তিক্যবাদের প্রচারক মার্কসবাদকে গ্রহণ করতে দ্বিধাম্বিত ছিলেন। তবুও বলতে হয়, বিভাগ পরবর্তী কালের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক কূট কৌশলের নানান পরিবর্তন ও নতুন সিদ্ধান্তের ফলে এদেশে মার্কসীয় চিন্তাধারা বা রাজনীতির মতো সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রেও বিস্তার লাভ করেছিলো।

নিষিদ্ধ জিনিসের প্রতি একটা আকর্ষণ ও মোহ থাকে। ফলে গোপন, আন্ডার গ্রাউন্ড পার্টির কার্যক্রম যেমন এদেশের সাধারণ মানুষের জীবনে কৌতূহলের সৃষ্টি করেছিল, তেমনি শিক্ষিত-মহলেও লাল বই ও মার্কসীয় চিন্তা ফ্যাশনের মতো সংক্রামিত হয়েছিল। কিন্তু একথা সত্য, গুরুত্বপূর্ণ অধ্যয়ন অনুশীলন (মার্কসীয় চিন্তা চর্চা) হয়নি।

যেহেতু সং ও আন্তরিক কমিউনিস্ট আন্দোলন এদেশে গড়ে ওঠেনি, সেহেতু শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি জগতেও শিল্পপান্ডিত্য বা গুরুত্বপূর্ণ, গভীর ও আন্তরিক কোনো সৃষ্টির বা চিন্তা চর্চার পরিচয় পাওয়া যায় না। সাতচল্লিশ পরবর্তী কালে মার্কসীয় চিন্তাধারার প্রভাব সম্পর্কে এদেশের একজন সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী ও গবেষক লিখেছেন :

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ব বাঙলায় মার্কসীয় চিন্তাধারার প্রসারের... কার্যক্রম নিদারুণ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। তবে পিপার্বয়ের মধ্যেও ধারাতী কোনোভাবে সচল থাকে, বন্ধ হয় না।... তথাপি তথ্যের দিকে তাকালে বলতে হয় যে, পূর্ববাঙলার ভূখণ্ডে ১৯৫০ এর দশক পর্যন্ত মার্কসীয় পুস্তকাদির... প্রচার সামান্যই হয়েছে। প্রকাশ্যে আকস্মিক ও অভাবনীয় ব্যাপকতার সঙ্গে এদেশে মার্কসীয় পুস্তকাদির আমদানী শুরু হয় ১৯৬৩-৬৪ সনের দিক থেকে। তখন থেকে মার্কসবাদী রাজনৈতিক কর্মীদের কারও কারও লেখায় মাও সেতুঙের জ্ঞানতত্ত্ব বিষয়ক রচনাবলির উল্লেখ ও তাঁর চিন্তাধারার প্রতি সমর্থনের, বলা যায় বিচার বিবেচনাহীন মোহমুগ্ধ, অন্ধ, উগ্রসমর্থনের পরিচয় পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে যৌক্তিক দৃষ্টিভঙ্গিও ছিল, তবে উগ্রতার প্রবল স্রোতে তা দানা বাঘতে পারেনি।

১৯৬২ সনে চীন-ভারত সীমান্ত যুদ্ধের সময়ে ঘটনা পরম্পরায় সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের নেতা সোভিয়েত ইউনিয়ন সমাজতান্ত্রিক চীনের বিরুদ্ধে অসমাজতান্ত্রিক ভারতকে সমর্থন দেয়। তখন থেকে চীন প্রকাশ্যভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নকে প্রথমে সংশোধনবাদী, পরে ধনতন্ত্রের পথগামী, এবং আরও পরে সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী বলে নিন্দা করতে থাকে।

মার্কসীয় বিশ্বদৃষ্টির স্বরূপ, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির বৈশিষ্ট্য এবং মার্কসবাদীদের কর্তব্য ও কর্মপন্থা ইত্যাদি বিষয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ও সরকারের সঙ্গে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির ও সরকারের মতবিরোধ তীব্র হয়ে ওঠে। কার্যত চীনের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্পর্ক হয়ে দাঁড়ায় চরম শত্রুতামূলক। ধনতান্ত্রিক বিশ্বে এই ঘটনা প্রতিভাত হয় কমিউনিস্ট শিবিরের ও মার্কসীয় মতাদর্শের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতারূপে। এই পরিস্থিতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন ধনতান্ত্রিক বিশ্ব বিভক্ত কমিউনিস্ট শিবিরের প্রতি—বিশেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের প্রতি এবং মার্কসীয় মতাদর্শের প্রতি তার মূলনীতি অপরিবর্তিত রেখেও কর্মকৌশল পরিবর্তন করে। তার ফলে ধনতান্ত্রিক বিশ্বের অন্তর্গত ঋণ-রিলিফ-নির্ভর দরিদ্র দেশগুলো চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপনের কার্যকর সুযোগ লাভ করে।

ঐ-অবস্থায় সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের সঙ্গে তৎকালীন পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং ১৯৬৩ কি ৬৪ সন থেকেই ওই দুই দেশ থেকে ব্যাপকভাবে মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, স্টালিন ও মাও সেতুঙের রচনাবলি বাংলাদেশের ভূখণ্ডে আসতে থাকে। তার আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে ঋণদাতা রিলিফদাতা আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের নিয়ন্ত্রণের (শর্ত আরোপের) ফলে পাকিস্তান কালে এদেশে চীন-রাশিয়া থেকে পুস্তকাদি আমদানি করা সম্ভব হত না।

১৯৬৬ সনে সূচিত হয় চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব। দেশব্যাপী বিভিন্ন কেন্দ্রে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির অনেক নেতাকে 'পুঁজিবাদের পথগামী' হতে দেখে এক পর্যায়ে মাও সেতুঙ জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন Bombard the headquarters. তাঁরই নেতৃত্বে দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা পার্টিকে ভেঙে দিয়ে সকল কেন্দ্রে বিপ্লবী কমিটি গঠনের জন্য সেদিন তিনি দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন। ঐ সময়ে পুস্তিকা, পত্র পত্রিকা ও বেতারের মাধ্যমে চীন যেভাবে পৃথিবীব্যাপী মার্কসীয় আদর্শ ও মাও সেতুঙের চিন্তাধারা প্রচার করেছে, মাও সেতুঙের রচনাবলি ও বাণী প্রচার করেছে, তা ধনতান্ত্রিক বিশ্বের দেশে দেশে তরুণদের মনে প্রচণ্ড ঝড়ের সূত্রপাত করে। পিকিং সাংহাই ক্যান্টনে তো বটেই, সুবিশাল চীনের সর্বত্র তরুণেরা সেদিন স্লোগান তুলেছে 'Father is dear to us, mother is dear to us, but chairman Mao is dearer to us.

ঢাকায় ও কলকাতায় নয় শুধু, বাংলাদেশাধী ভূখণ্ডের গ্রামাঞ্চলেও তরুণদের একাংশ সেদিন এক ভয়াবহ উন্মাদনায় মেতেছিল। দেয়ালে দেয়ালে তারা লিখেছিল : 'চীনের চেয়ারম্যান—আমাদের চেয়ারম্যান'। আর গগনবিদারী স্লোগান তুলেছিল : 'মুক্তি যদি পেতে চাও—হাতিয়ার তুলে নাও', 'মুক্তির মতবাদ—মার্কসবাদ-লেনিনবাদ', 'মাও সেতুঙের চিন্তাধারা-বিশ্বকে দিচ্ছে নাড়া'। যাদের কেশোর যৌবনে প্রচারিত হয়েছে সাংস্কৃতিক বিপ্লব, এবং সেই সঙ্গে প্রথমবারের মত হাতে এসে পৌঁছেছে মাও সেতুঙের রচনাবলী, সেদিন যেন 'সেই মায়ায় না-মজে তাদের উপায় ছিল না'। সেই উন্মাদনার রেশ আজও চলছে।<sup>১০</sup>

## তথ্যপঞ্জি

১. আহমদ শরীফ, বাংলাদেশের চিন্তা-চেতনার বিবর্তন ধারা, ঢাকা ১৯৮৭, পৃ. ১৮৯-৯০।
২. আমজাদ হোসেন, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলন, বিচিত্রা, ২১ নভেম্বর ১৯৮৬, পৃ. ১৯-২৩।
৩. সাঈদ-উর রহমান, পূর্ব বাংলাদেশের রাজনীতি সংস্কৃতি ও কবিতা, পৃ. ১৬।
৪. আমজাদ হোসেন ও সাঈদ-উর-রহমান, পূর্বোক্ত।
৫. সাঈদ-উর-রহমান, পূর্বোক্ত।
৬. আমজাদ হোসেন, পূর্বোক্ত।
৭. পূর্বোক্ত পৃ. ২১।
৮. সাঈদ-উর-রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১-২২।
৯. আমজাদ হোসেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২।
১০. আবুল কাসেম ফজলুল হক, আশা-আকাঙ্ক্ষার সমর্থনে, ঢাকা ১৯৯৩, পৃ. ৩৪৯-৫১।

## ২.৪. পাকিস্তানের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ধরন

[যুক্ত অর্থনীতির নামে পুঁজিপতি ২২ পরিবার সৃষ্টি এবং কৃষক জনসাধারণকে শোষণের মাধ্যমে ভূমিহীনে রূপান্তরের ষড়যন্ত্র ; পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনীতিতে বৈষম্য : আইউব সরকারের গৃহীত অর্থনৈতিক পদক্ষেপ ;]

পূর্ব বাঙলার মুক্তি-আন্দোলনে অর্থনৈতিক বঞ্চনার বোঝাই সবচেয়ে বড় উত্তেজক হিসেবে কাজ করেছে। 'অর্থের প্রশ্নটি যখন সামনে এসে দাঁড়ালো, ধর্মের বাঁধন তখন গেল টুটে, এক জাতি, এক প্রাণ, একতা'র মোহটাকে ভেঙ্গে নব জাতীয়তার মোক্ষ সন্ধান করল বাঙালি।'

পাকিস্তান সরকার নিরপেক্ষ নীতির ধোঁয়া তুললেও প্রকৃতপক্ষে অর্থনীতিতে নিরপেক্ষতা অনুসৃত হয়নি ; হলে পূর্ববঙ্গ তথা পাকিস্তান অর্থিকভাবে আত্মনির্ভরশীল হতে পারত। ঔপনিবেশিক আমলে এদেশ সর্বতোভাবে বৃটিশ শাসকদের উপর নির্ভরশীল ছিল। ১৯৪৭ সনে রাজনৈতিক স্বাধীনতালাভের পরও পাকিস্তান বিদেশী সাহায্যের উপর পুরোমাত্রায় নির্ভরশীল থেকেছে। আত্মনির্ভরশীল হতে চেষ্টা করেনি। সামরিক শাসন প্রবর্তনের পর (১৯৫৮) বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা আরও বহুগুণ বৃদ্ধি পায়।

রাজনৈতিক শাসনের আমলে (১৯৪৭-৫৮) ১২ বৎসরে গৃহীত বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্যের মোট পরিমাণ যেখানে ছিল ৪৯ কোটি টাকার মতন সেখানে সামরিক শাসন ও প্রেসিডেন্টশিয়াল আমলে (১৯৫৮-৬৮) ১০ বৎসরে তার পরিমাণ দাঁড়ায় ২০০০ (দুই হাজার) কোটি টাকার উপর।... বৈদেশিক সাহায্যের উপর এই ক্রমবর্ধমান নির্ভরশীলতার কারণ, পাকিস্তানের অনুসৃত তথাকথিত স্বাধীন মুক্ত অর্থনীতি আর এই অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়নের দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল একশ্রেণীর বুজ্জিয়া, বৃটিশের ট্রেনিঙ্গাপ্ত এবং তাঁদের স্বার্থ সংরক্ষণে সচেষ্ট আমলার উপর। এই অর্থনীতিতে নির্দিষ্ট সংখ্যক (২২ পরিবার)-এর পুঁজি ও সম্পদ বৃদ্ধি পায়।

এই অর্থনীতিতে দেশের গোটা সম্পদ ও মোট জনসংখ্যার কোনো আর্থিক উন্নতি ঘটেনি। সাধারণ মানুষের স্বার্থের পরিপন্থী আইউব সরকারের অর্থনীতিতে রাষ্ট্রীয় খাতে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো নামমাত্র মূল্যে কতিপয় পুঁজিপতির মালিকানা-দখলে চলে যায়। মুক্ত অর্থনীতির সুবাদে অল্পবিস্তের কিছুলোক রাতারাতি কোটিপতি হয়ে ওঠে। এক দশক পূর্বে যে পরিবার দশ লক্ষ টাকার মালিক ছিল আইউব খানের শাসনমলে সে পরিবার দশ কোটি টাকার মালিক হয়। একই পরিবার বা একই গ্রুপ একই সঙ্গে শিল্প প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক ও বীমা, কনসালটেন্সি অফিস, কনস্ট্রাকশন ফার্ম ও বাণিজ্যিক সংস্থার স্বত্বাধিকারী হয়। এমনি ভাবে বিপুল ধন-সম্পত্তির অধিকারী হয়ে পাকিস্তানের চিহ্নিত বাইশ পরিবার গড়ে ওঠে। দেশের শিল্প সম্পদের শতকরা ষাট ভাগ, ব্যাংকিং সম্পদের শতকরা আশি ভাগ ও বীমা সম্পদের শতকরা উনাশি ভাগ ২২ পরিবার কুক্ষিগত করে।

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে শহরাঞ্চলের জনসংখ্যা দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ১০ ভাগের বেশি ছিল না। কিন্তু পাকিস্তান আমলে শহরাঞ্চলের কিছুটা জৌলুস ও শ্রীবৃদ্ধি ঘটলেও উৎপাদনধর্মী কাজ বেশি হয়নি। তথাপি অনুৎপাদনশীল কার্যক্রমে দেশের বিপুল সম্পদ ব্যয় করা হয়েছে। নতুন রাজধানী তৈরি করেও 'পাকিস্তান সরকার বিশ্বের দরিদ্রতম দেশ ও

এখানকার জনসাধারণের মাথাপিছু আয় সর্বনিম্ন এই অপবাদ ঘোচাতে পারেনি। করাচী থেকে রাওয়ালপিন্ডিতে অন্তর্বর্তীকালের জন্য রাজধানী স্থানান্তরের ব্যয়—বাহুল্য, ইসলাম বাদে এক হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে নতুন রাজধানী প্রতিষ্ঠা এবং পূর্ব পাকিস্তানে লোক দেখানো অপ্রয়োজনীয় দ্বিতীয় রাজধানী নির্মাণে ১৭ কোটি টাকা ব্যয় অগঠনমূলক অনুৎপাদনশীল অর্থনীতির নমুনা। বৈদেশিক সাহায্যের অনুৎপাদক খাতে ব্যয়ের মাধ্যমেই পশ্চিম পাকিস্তানের কতিপয় (২২ পরিবার) ব্যবসায়ী আমলা ফড়িয়া কন্ট্রাকটরকে কোটিপতি পুঁজিপতি বানানো হয়েছিল।

তখন এবং এখনও পূর্ববঙ্গ ও পাকিস্তান কৃষি প্রধান দেশ। উভয়রাষ্ট্রের শতকরা ৮৫ জন অধিবাসী কৃষি নির্ভর। পাকিস্তান অর্জনের পর কৃষি উন্নয়নে বিপুল পরিমাণ ঋণ গ্রহণের পরও পূর্ব পাকিস্তানের (পাট, চা, চামড়া যা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতো) কৃষির উন্নয়নের প্রতি বিশেষ নজর দেয়া হয়নি। দু একটা সার কারখানা নির্মাণ করা হয়েছে; মাঝে মাঝে বিদেশ থেকে কিছু পরিমাণ সার ও বিদ্যুৎচালিত পাম্প ইত্যাদিও আমদানি করা হয়েছে বটে—কিন্তু কৃষকদের মূল সমস্যার প্রতি আদৌ নজর দেওয়া হয়নি। তাদের মূল সমস্যা ছিল ঋণ ভার, ও কর্ষণযোগ্য ভূমির মালিকানাহীনতা। সর্বোপরি তাদের ক্রয়-ক্ষমতার নিদারুণ অভাব ছিল। পক্ষান্তরে দেশকে শিল্পায়িত করার এবং পুঁজিগঠনের জন্য শিল্পপতি ব্যবসায়ীদেরকে প্রথম থেকেই ট্যাক্স হালিডে, সংরক্ষিত বাজার, সাবসিডি প্রদান, বোনাস ভাউচার প্রভৃতির মাধ্যমে আর্থিক সুযোগ দেয়া হয়েছে।

কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের বিনিময়ে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার দ্বারা শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের সুযোগ দেয়া হলেও কৃষক-সমাজের ঋণ ও কর মুক্তির কোন বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। তাই কৃষককুলের অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটেনি, বরং ভূমিহীনের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, কৃষি উৎপাদনের পরিমাণ কমেছে, পাটচাষীদেরকে পাট-ব্যবসায়ী ও চটকল মালিকদের শোষণ থেকে রক্ষা করা হয়নি। ভারত বিভাগের পূর্বে এক মণ পাট বিক্রয় করে যেখানে দুই মণ চাউল ক্রয় করা যেত, সেখানে পাকিস্তান আমলে (১৯৬৭-৬৮) দুই মণ পাট বিক্রয় করে একমণ ধান ক্রয় করা সম্ভব হয়নি। যারা পাট ও অন্যান্য ফসল উৎপাদন করে—গ্রামাঞ্চলের সেই জনসাধারণ বৎসরের প্রায় ছয়মাস একবেলা-আধবেলা বা অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে দিনান্তিপাত করেছে। অথচ এই কৃষকদের উৎপাদিত পাট আর অন্যান্য ফসলেই উপরোক্ত পরিবারগুলো লক্ষপতি থেকে কোটিপতি হবার সৌভাগ্য অর্জন করেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খাদ্যের (চাল-গম-ভুট্টা) উপর অতি নির্ভরতার কারণেই কৃষি উন্নয়নের প্রতি মনোযোগ দেয়া হয়নি। তাছাড়া সার্বিকভাবে পূর্ববাঙলাকে শোষণ করার ইচ্ছাই তাদের ছিল। তাই এখানে উন্নয়নের কোন পদক্ষেপ তাদের কাম্য ছিল না।

তবে ষাটের দশকের মাঝামাঝি বিশ্বে খাদ্যের চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় এবং খাদ্য সরবরাহ নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতির পরিবর্তন ঘটায় ও শর্তের বহুমুখি চাপ বৃদ্ধি পাওয়ায় পাকিস্তান সরকার সার আমদানি ও ইরি ধানের চাষ ইত্যাদি বৃদ্ধির প্রতি মনোনিবেশ করেছিল, যদিও তা অনেকটা প্রচার কার্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল—এ-ব্যাপারে তাদের

কোনদিনই আন্তরিকতা ছিল বলে মনে হয় না। তাই কৃষকদের মূল সমস্যার প্রতি তারা তাকাতে চায়নি। কৃষকদেরকে ঋণভার ও করভার থেকে মুক্ত করার কোন ইচ্ছা জাগেনি। জনগণের বাঁচার স্বার্থে নিতাপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্যও হ্রাস করা হয়নি। উপরন্তু জমির কর থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন করের পরিমাণ বৃদ্ধি করে জনজীবন দুর্বিসহ করে দেয়া হয়েছে। জনগণের উপর প্রশাসনের জুলুম ও শোষণ এবং তহশিলদার, আমলা ও ফড়িয়াদের দুর্নীতি রেকর্ড ভঙ্গ করে যায়। বকেয়া খাজনা ও বকেয়া ঋণ পরিশোধের জন্য লক্ষ লক্ষ সার্টিফিকেট ও বেআইনী আইনের আশ্রয় গ্রহণ করে কৃষক জনসাধারণকে পরাধীনতার শৃঙ্খল পরানো হয়েছে নতুন করে। এই পরিস্থিতিতে পূর্ব বাঙলার ৮০% ভাগ জনগণ জীবনমুত অবস্থায় পতিত হয়। তাঁদের কল্যাণের জন্য কোন প্রকার খাজনা বা কর মওকুফের সিদ্ধান্ত পাকিস্তানি আমলারা গ্রহণ করতে দেননি। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানি শিল্পপতিদের শত শত কোটি টাকার কর মওকুফ করে দেয়া হয়েছে। ধনী আরও ধনী হয়েছে। প্রশাসনে জনপ্রতিনিধিদের কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা না-থাকার কারণে আমলারা জনস্বার্থ-বিরোধী আর্থিক পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে পেরেছেন। তবে আইউব খান বা পশ্চিমা শাসকদের যে উদ্দেশ্য ও মনোভাব ছিল আমলারাতো তাই-ই বাস্তবায়িত করেছিল।

ফেডারেল রাজধানী পশ্চিম পাকিস্তানে থাকায় এবং পুঁজি বিনিয়োগকারীদের ইচ্ছানুসারে (কারণ তারা পশ্চিম পাকিস্তানি) পশ্চিম পাকিস্তান অধিকতর শিল্পায়িত হয়েছিল। সেখানে ব্যবসা-বাণিজ্য অধিকতর সম্প্রসারিত হয়। এবং দেশের মূলধন সেখানে গড়ে ওঠে। কেন্দ্রীয় সেক্রেটারিয়েট ও সামরিক বাহিনীর দফতর এবং ঘাঁটিগুলো সেখানেই অবস্থিত ছিল। এসবের অর্থনৈতিক গুরুত্ব ছিল। অপারিসীম কটর ধনতন্ত্রবাদী ব্যবস্থায় পাকিস্তানের অর্থনীতি গড়ে ওঠার ফলে বৈদেশিক কজের পরিমাণও বেড়ে যায় এবং ১৯৭০ সনে শুধু ঋণের সুদের পরিমাণই দাঁড়ায় ১০০ কোটি টাকা।

বৈদেশিক সাহায্য ছাড়া যে-দেশের মানুষকে অনাহারে মরতে হয়, সেদেশের পক্ষে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করা সম্ভব ছিল না। ফলে শিবির নির্বিশেষে সকল বৃহত্তর শক্তিবর্গের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনের জন্য পাকিস্তান তৎপর হয়ে উঠেছিল। কোনও নির্দিষ্ট স্বার্থের বশবর্তী হয়ে চীন রাশিয়া আমেরিকা সকলেই পাকিস্তানের বন্ধু সাজলেও প্রকৃত প্রস্তাবে কেউ-ই পাকিস্তানকে বিশ্বাস করেনি। সেজন্যই সিয়াটো ও সেন্টো জোটের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন না করলেও পুঁজিবাদী ভূস্বামী প্রভাবিত পাকিস্তানকেও কমিউনিস্ট চীন বন্ধু করেছিল।

রাশিয়ার সঙ্গে আইউবের বন্ধুত্ব হলে আমেরিকা পাকিস্তানের উপর ক্ষুব্ধ হয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদী যুক্তরাষ্ট্র পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন উষ্মে দিয়েছিল। রাশিয়া বাঙলাদেশের স্বাধীনতা-যুদ্ধে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বাঙলাদেশের পক্ষে কাজ করেছিল। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্য ও অদূরদর্শী পররাষ্ট্রনীতি এবং নানান ক্ষেত্রে অসংখ্য ভ্রান্ত পরিকল্পনা পাকিস্তানকে দ্রুত ধ্বংসের সম্মুখে এগিয়ে নিয়ে যায়।<sup>১</sup>

আন্তর্জাতিক ও জাতীয় অর্থনীতির ভ্রান্ত পরিকল্পনার কথা বাদ দিলেও, পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় পূর্ব বাঙলাকে বঞ্চিত রাখার সাম্প্রদায়িক-ঔপনিবেশিক মনোভাব



পশ্চিম পাকিস্তানিদের কবল থেকে, বিশেষত অখণ্ড পাকিস্তানের মোহ থেকে বাঙালিকে দ্রুত মুক্ত হতে অনুপ্রাণিত করেছিল। স্বাধীনতার পর পাকিস্তানের রাষ্ট্র কাঠামোতে পূর্ব বাঙলার সংস্কৃতি যেমন স্বাভাবিকভাবে বিকশিত হতে পারেনি, “তেমনি তার অর্থনৈতিক বিকাশের সম্ভাবনাও সম্পূর্ণ ব্যাহত” হয়েছিল। অথচ অফুরন্ত সম্ভাবনাময় পূর্ববাঙলা স্বাধীনতা লাভের পর অর্থে সম্পদে শিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে ওঠার প্রাকৃতিক, ভৌগোলিক, কৃষিজ্ঞ এবং খনিজ সকল দিক দিয়ে যোগ্যতার অধিকারী ছিল। কিন্তু পূর্ব বাঙলাকে মরুভূমির দিকে অগ্রসর করিয়ে দিয়ে মরুভূমিসদৃশ অনূর্বর পশ্চিম পাকিস্তানের মাটিকে উর্বর করার কৌশল গ্রহণ বৈষম্য নীতির নামান্তর। এই বৈষম্য ছিল রোমহর্ষক। শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি, শিক্ষা, সামরিক ও বেসামরিক, বৈদেশিক বাণিজ্য—সকল ক্ষেত্রে এমন সব নীতি প্রণীত হয় যে, পূর্বপাকিস্তানের অর্জিত সম্পদে পশ্চিম পাকিস্তান দ্রুত সমৃদ্ধ হয়েছে, আর নিঃস্ব-রিজ্ত হয়েছে পূর্ববাঙলা। ১৯৬৯ আইউবের পতনের পর তিনজন বিদেশী অর্থনীতিবিদ একটি গবেষণামূলক পর্যালোচনায় যা বলেন, তার কিয়দংশ থেকে পাকিস্তান সরকারের অর্থনৈতিক আগ্রাসনের ধরন বোঝা যায় :—

পাকিস্তান সরকারের পরিকল্পনা কমিশনের বিশেষজ্ঞদের একটি প্যানেল কর্তৃক প্রণীত একটি সাম্প্রতিক রিপোর্টে দেখা যায় যে, ১৯৫৯-৬০ সালে যেখানে পশ্চিম পাকিস্তানের গড় (মাথা পিছু) আয় পূর্ব পাকিস্তান অপেক্ষা ৩২% বেশি ছিল, সেখানে দশ বছর পর ১৯৬৯-৭০ সালে এই বৈষম্য প্রায় দ্বিগুণ হয়ে ৬১% এ পৌঁছেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের ট্যারিফ, আমদানি নিয়ন্ত্রণ, শিল্প অনুমোদন, বৈদেশিক সাহায্য পরিকল্পনা ও বিনিয়োগ বন্টন বিভাগকে ব্যবহার করা হয়েছে বিনিয়োগ ও আমদানিকে এমনভাবে পরিচালনা করতে, যাতে পশ্চিম পাকিস্তানে উচ্চ মূল্যের শিল্প গড়ে উঠতে পারে। আমদানি কোটা ও ট্যারিফের দেয়ালের দ্বারা বন্দী পূর্ববাঙলার বাজারই এইসব শিল্পের লাভকে নিশ্চিত করেছে। যদিও পাকিস্তানের লোকসংখ্যার প্রায় ৬০% ভাগই পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসী তবু কেন্দ্রীয় সরকারের উন্নয়ন ব্যয় এই অঞ্চলের জন্য ১৯৫০-৫১ থেকে ১৯৫৪-৫৫ সন পর্যন্ত সর্বনিম্ন ২০% এবং ১৯৬৫-৬৬ থেকে ১৯৬৯-৭০ পর্যন্ত সর্বোচ্চ ৩৬% এর মধ্যেই উঠানামা করেছে। পূর্ব পাকিস্তানের ব্যক্তিগত বিনিয়োগের ভাগ ২৫% এরও কম হয়েছে। ঐতিহাসিকভাবে পাকিস্তানের বৈদেশিক আয়ের ৫০% থেকে ৭০% ভাগই অর্জিত হয়েছে পূর্ব পাকিস্তানের উৎপন্ন দ্রব্য দ্বারা। এতদসত্ত্বেও বৈদেশিক আমদানীর (রফতানী আয় ও বৈদেশিক সাহায্যের দ্বারা যার অর্থ পরিশোধ করা হয়) ক্ষেত্রে তার ভাগ ২৫% থেকে ৩০% এ সীমাবদ্ধ থেকেছে। পূর্ব পাকিস্তান থেকে যে অর্থ উদ্বৃত্ত করা হয়েছে তা ব্যবহৃত হয়েছে মূলত বিদেশের কাছে পশ্চিম পাকিস্তানের যে ঘাঁটতি তা পূরণের কাজে এবং তাতে যে নেট সম্পদ স্থানান্তরিত করা হয়েছে (১৯৪৮-৪৯ থেকে ১৯৬৮-৬৯ সন পর্যন্ত) তার পরিমাণ একটি সরকারি রিপোর্টে অনুমান করা হয়েছে ২.৬ বিলিয়ন।<sup>৩</sup>

... অনুমান করা হয়েছে যে ১৯৪৭ সন থেকে (১৯৬৯ পর্যন্ত) পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে যে সম্পদ চলে গেছে তার মোট পরিমাণ ৩০০০ মিলিয়ন। পশ্চিম পাকিস্তান মোট উন্নয়ন ব্যয়ের ৭৭% ভাগ লাভ করেছে মোট জনসংখ্যার ৪০% ভাগের জন্য। রাজস্ব যেখানে পূর্ব-পাকিস্তান থেকে আয় হয় ৬০% সেখানে (পূর্ব পাকিস্তান) নিজের খরচের জন্য পায় ২৫% ভাগ। পশ্চিম পাকিস্তানের রাজস্ব খাতে আয় মাত্র ৪০% সেখানে খরচের জন্য পায় ৭৫% ভাগ।<sup>৪</sup>

দেশী-বিদেশী গবেষকেরা পশ্চিম ও পূর্ব-পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বৈষম্যের অনেক খতিয়ান এবং তুলনামূলক চিত্র তৈরি করে পূর্ব পাকিস্তানের উপর পশ্চিম পাকিস্তানের

ভয়াবহ অর্থনৈতিক শোষণের ইতিকথা তুলে ধরেছেন। সে সবেবর বিস্তারিত এখানে বর্ণনার অবকাশ নেই, প্রয়োজনও নেই। তবে শুধু পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণের পরিমাণ উপলব্ধির জন্য এখানে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা হলো। পূর্ব বাঙলার রাজনীতি বিষয়ে একজন লেখক লিখেছেন : “১৯৪৭-৬৯-এ বিদেশে পণ্য রফতানী করে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে যথাক্রমে দুই হাজার চার শত ছত্রিশ কোটি দশ লক্ষ টাকা ও দুই হাজার সাতান্ন কোটি বিশ লক্ষ টাকা। এ সময়ে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে আমদানী করা হয় যথাক্রমে এক হাজার নয় শত সাতানব্বই কোটি টাকার পণ্য ও চার হাজার তিনশত ছিয়ানব্বই কোটি সত্তর লক্ষ টাকার পণ্য। এ হিসাব অনুসারে পূর্ববঙ্গ আয় করেছে ৫৫.২% ভাগ, আমদানীর বেলায় ভাগ পেয়েছে ৩১.১% ভাগ। পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ববঙ্গের অর্জিত চারশত উনআশি কোটি দশ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করেছে। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে উন্নয়ন খাতে পূর্ব পাকিস্তানে মাথা পিছু ব্যয়ের পরিমাণ ছিল দুই শত চল্লিশ টাকা, আর পশ্চিম পাকিস্তানে পাঁচশত বিশ টাকা। মাথাপিছু রাজস্ব ব্যয়ের পরিমাণ ছিল পূর্ব পাকিস্তানে সত্তর টাকা আর পশ্চিম পাকিস্তানে তিনশত নব্বই টাকা। এ বৈষম্যমূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দরুনই তৃতীয় পরিকল্পনা কালে মাথা নিছু জাতীয় উৎপাদন পশ্চিম পাকিস্তানে শতকরা আঠারো ভাগ, আর পূর্ব পাকিস্তানে শতকরা সাতভাগ বৃদ্ধি পেয়েছিল।<sup>৫</sup>

ভিয়েনার একটি বিশেষজ্ঞদল পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বৈষম্য লক্ষ্য করে লিখেছিলেন :

পূর্ব পাকিস্তানের অস্তিত্ব ছিল শুধুমাত্র পশ্চিম পাকিস্তানী ঔজ্জ্বল্য, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, ও কন্ট্রাক্টরদের এবং সামরিক ও সিভিল আমলাদের জন্য। গত ২৪ বছর ধরে পাকিস্তান সরকার যার অধিকাংশ সদস্যই পশ্চিম পাকিস্তানী—রাষ্ট্রীয় নীতিকে একটা উদ্দেশ্যমূলক কর্মপন্থা দ্বারা এমনভাবে পরিচালিত করেছে যাতে পশ্চিম পাকিস্তানের শূন্য মরুভূমির উন্নয়ন ঘটে, এবং এই নীতির ফলে পূর্ব পাকিস্তান নিঃশেষে পরিণত হয়। ব্যাপক বৈষম্যের তথ্য যাতে প্রকাশিত হয়ে না পড়ে তার জন্য পাকিস্তান সরকার অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে। তবুও সরকারি সূত্র থেকেই যতদূর তথ্য পাওয়া গেছে তাতে সত্য সম্পূর্ণ টাকা দিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি।<sup>৬</sup>

পৃথিবীর কোথাও একই রাষ্ট্রের এক অঞ্চলের উপর অন্য অঞ্চলের এমন নগ্ন নির্লজ্জ ও ভয়াবহ অর্থনৈতিক শোষণ, সাংস্কৃতিক নিপীড়ন ও রাজনৈতিক আধিপত্যের দৃষ্টান্ত দেখা যায় না। একমাত্র একটি ঔপনিবেশিক দেশই তার একটি উপনিবেশের উপর এমন শোষণ, নিপীড়ন ও আধিপত্য চালাতে পারে। যতদিন পর্যন্ত শুধু সাংস্কৃতিক দমন ও রাজনৈতিক নিপীড়নের প্রশ্রুটি পূর্ববাঙলার জনগণের দৃষ্টিতে এসেছিল, ততদিন স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন তাই এত তীব্র হয়ে ওঠেনি। কিন্তু যখনই অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে পূর্ব বাঙলার উপর নির্মম শোষণ ও একচ্ছত্র আধিপত্যের বিষয়টি বাঙালির গোচরে আসল তখনই এই আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে ওঠে।<sup>৭</sup>

পূর্ব বাঙলার নেতৃবৃন্দ প্রথম থেকেই আর্থিকভাবে বঞ্চনার জন্য অভিযোগ উত্থাপন করে আসলেও পশ্চিম পাকিস্তানিরা বাঙালিদের নানাভাবে দমন-নিপীড়ন করে, লোভ-লালসা, পদ-পুরস্কার দিয়ে দমিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে। পাকিস্তানের প্রায় অর্ধেকটা কাল কাটে আইউব খানের দারুণ সন্ত্রাস ও নিপীড়নের মধ্যে। কিন্তু তবু পূর্ব বাঙলার জনগণ

আইউবের সময়ই কঠোর নির্যাতন নিপীড়ন নিবর্তনমূলক আইন অগ্রহণ করে শোষণ-মুক্তির দাবি নিয়ে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন চেয়েছিল।

### তথ্যপঞ্জি

১. আবুল কাসেম ফজলুল হক, মুক্তি সংগ্রাম, পৃ. ৩৭।
২. তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া, পাকিস্তানী রাজনীতির বিশ বছর, ঢাকা ১৯৮১, পৃ. ১৩৮-৫৫।
৩. History of Economic and Political Domination of East Pakistan--Paper Reviewed for the Ripon Society by J. Lee Auspitz, Stephen A. Marglin : and Gustav F. Papenek ; Bangladesh Documents, P. 5-6 উদ্ধৃত : আবুল কাসেম ফজলুল হক প্রণীত মুক্তি সংগ্রাম পৃ. ২৮-২৯।
৪. Why Bangladesh by A group of Scholars in Viena, Bangladesh Documents, পৃ. ১৬ উদ্ধৃতি পূর্বেক্ত সূত্র থেকে।
৫. নূরুল ইসলাম, একান্তরের ঘাতক-দালাল যা বলেছে যা করেছে, ঢাকা ১৯৯১, পূর্বেক্ত, পৃ. ৪১।
৬. আবুল কাসেম ফজলুল হক, মুক্তি সংগ্রাম, পৃ. ২৮-৩১।
৭. পূর্বেক্ত, পৃ. ৩৬-৩৭।

## ২.৫. পাকিস্তানের প্রধান সাংস্কৃতিক ঘটনাবলী

[পূর্ব পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি ; চট্টগ্রামের সাংস্কৃতিক অবস্থা ; হরিখোলার মাঠে অনুষ্ঠিত ১৯৫১ সনের সাংস্কৃতিক সম্মেলন ; সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবসমূহ ; সভাপতি আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ ও অন্যান্য প্রধান ব্যক্তিদের বক্তব্য ও ভাষণ ; সম্মেলনের মূল্যায়ণ ; ঢাকা ও বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সাংস্কৃতিক সম্মেলন, আন্দোলন এবং এক্ষেত্রে চট্টগ্রামের সংস্কৃতিকর্মীদের ভূমিকা ; ১৯৫২ সনের কুমিল্লা সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্মেলন ; সম্মেলনের কার্যক্রম ও সভাপতির ভাষণ ; ১৯৫৪ সনে ঢাকার কার্জন হলে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্মেলন ও এর সমালোচনা ; চট্টগ্রাম প্রান্তিক নবন্যটি সংঘের পরে 'ইস্ট এণ্ড ক্লাব' ও 'কৃষ্টি কেন্দ্রের' উজ্জীবন এবং 'নারী সমিতি' ; পাকিস্তান লেখক সংঘের মাধ্যমে আইউব কর্তৃক দেশের বুদ্ধিজীবীদের সমর্থন লাভের চেষ্টা ; প্রগতি লেখক সংঘের পরে 'পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ' এর প্রতিষ্ঠা ; একুশে ফেব্রুয়ারি সংকলন ও পুঁথিপত্র প্রকাশনার সৃষ্টি ; 'বাফা' ও 'বাংলা একাডেমীর' প্রতিষ্ঠা ; হরফ ও ভাষা সংস্কারের উদ্যোগ ; ১৯৪৮-৪৯ সনের পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন ; ১৯৫২ সনের নিখিল পাকিস্তান চিত্রপ্রদর্শনী (ঢাকা) ও তমদ্দুন মজলিশের ইসলামী সাংস্কৃতিক সম্মেলন ১৯৫২ ; ১৯৫৭ সনের নিখিল পাকিস্তান সঙ্গীত সম্মেলন ; সিপাহী যুদ্ধের শত-বার্ষিকী পালন ; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইংরেজী বিভাগের সাহিত্য সেমিনার (১৯৫৮) ; ১৯৫৮ সনের চট্টগ্রামের পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন ; পাকিস্তান লেখক সংঘের প্রতিষ্ঠা (১৯৫৯) ; পাক ভারত যুদ্ধ ও ৬ই সেপ্টেম্বর পুরস্কার প্রবর্তন ; ১৯৬৮ সনের 'উন্নয়ন দশক' পালন ও বাংলা একাডেমীর সাহিত্য সেমিনার ; উন্নয়ন দশক পালনের উদ্দেশ্য ; রবীন্দ্রসঙ্গীত নিষিদ্ধকরণের বিতর্ক ও 'ছায়ানট' এর প্রতিষ্ঠা ; পহেলা বৈশাখ বাংলা নববর্ষ উদযাপনের রেওয়াজ চালু ; পাকিস্তান : দেশ ও কৃষ্টি বই নিয়ে আন্দোলন এবং বুদ্ধিজীবীদের মুক্তিসংগ্রামের শপথ গ্রহণ ।]

২.৫. ক. পাকিস্তানি-রাজনীতির আলোচনা পূর্ণাঙ্গ হয় না—যদিহা, সাংস্কৃতিক ঘটনাবলীর সঙ্গে তার সংশ্লেষণ ঘটানো হয়। পাকিস্তান বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনের আরম্ভ হয়েছিল পশ্চিম-পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে পূর্ব বাঙলার জনগণের প্রতিরোধ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। এই প্রতিরোধ প্রথমে প্রতিবাদের স্বরূপে উচ্চকিত হয়েছিল ঢাকা ও চট্টগ্রামের প্রগতিশীল সাহিত্যিক ও সকল দলমতের সংস্কৃতিকর্মীদের মধ্যে বাংলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতির পক্ষে জনমত গঠন করতে গিয়ে। তবে চট্টগ্রামের সাংস্কৃতিক কার্যাবলি কতিপয় ঐতিহাসিক কারণে দ্রুত সুসংগঠিত হয়ে সরকার বিরোধী আন্দোলন বা বাঙালি সংস্কৃতির বিরোধীতাকারীদের বিপক্ষে বিদ্রোহ বিপ্লবে রূপ নিতে পেরেছিল।

ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, বিদ্রোহী বাঙলার উর্বর ক্ষেত্ররূপে চট্টগ্রাম বহুকাল আগে থেকেই চিহ্নিত হয়ে আসছে। মধ্যযুগে এ অঞ্চলে বাংলাভাষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল এবং এখান থেকে অনেক উন্নতমানের সাহিত্য-শিল্প সৃষ্টি হয়েছিল। বর্তমান শতকের বিশ ও ত্রিশের দশকে বৃটিশ বিরোধী বিদ্রোহ বিপ্লব অভ্যুত্থান তথা সূর্যসেনের বৃটিশ

বিরোধী কার্যক্রম ও চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের কথা স্মরণীয় ঘটনা। সাতচল্লিশে স্বাধীনতা অর্জনের পরে, পাকিস্তান বিরোধী চিন্তাধারার বীজও বহুল পরিমাণে পাওয়া গিয়েছিল চট্টগ্রাম থেকেই। ১৯৭১ সনের সশস্ত্র সংগ্রামের কৃতিত্ব বিচার করতে গেলেও চট্টগ্রাম রণাঙ্গনের কথা বিস্মৃত হওয়া চলে না।

বৃটিশের ক্ষমতা হস্তান্তরের পর সাম্প্রদায়িক রাজনীতির পরিপোষক সদ্য নির্মিত পাকিস্তান এর চট্টগ্রাম অঞ্চলে কলকাতা থেকে আগত প্রগতিশীল সাহিত্যিক শিল্পী সংস্কৃতিকর্মীদের একটা উজ্জ্বল দল চট্টগ্রামে জড়ো হয়েছিলেন। কারণ তখন কলকাতার সঙ্গে চট্টগ্রামের যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল ভাল। তদুপরি তখন চট্টগ্রামে যেসব প্রাগসর ভাবুক চিন্তক কর্মীগোষ্ঠীর সন্ধান পাওয়া গেল, তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় কর্মী সদস্য সমর্থক ও শূভার্থী। বলা বাহুল্য, বিভাগ পূর্ববর্তী কালেই চট্টগ্রামে কমিউনিস্ট পার্টির সুসংহত সংগঠন গড়ে উঠেছিল। নবগঠিত চট্টগ্রাম কেন্দ্রের রেলওয়ে বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যেও কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন কতিপয় সক্রিয় সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। অর্থনৈতিকভাবেও বন্দর নগরী চট্টগ্রাম কিছুটা উন্নত আগে থেকেই ছিল। শিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা তাই ও অঞ্চলে তুলনামূলকভাবে বেশি পাওয়া যায়। এসব কারণেই পূর্ব পাকিস্তানের প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলন এবং সংস্কৃতি ও সাহিত্য শিল্পের প্রাগসর ধারার চর্চা চট্টগ্রাম থেকেই শুরু হয় এবং ক্রমে সারা পূর্ববাঙলায় তা ব্যাপ্তিলাভ করে।

রাজধানী ঢাকায় আগত সংস্কৃতি কর্মী ও লেখক সাহিত্যিকেরা (অধিকাংশই সরকারের সঙ্গে সম্পৃক্ত পাকিস্তানপন্থী, ইসলামী জোসে উজ্জীবিত পাকিস্তান আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী ছিলেন) গদি বা ক্ষমতা দখল এবং দলীয় ও ব্যক্তিগত স্বার্থ-সংরক্ষণে তৎপর ছিলেন। প্রগতির সপক্ষ তরুণ শিল্পী সাহিত্যিকেরা শাসকদের কঠোর নিয়ন্ত্রণ ও নির্যাতনের মুখে কিছু করে উঠতে পারছিলেন না। তবু তাঁরা কিছু কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন, যার বর্ণনা ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ আছে।

তরুণেরা কিছু সংখ্যক শুবুদ্ধিসম্পন্ন প্রবীণের সমর্থন পেয়ে এ-ধারাকে সচল করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ড. কাজী মোতাহার হোসেন, ড. মুহম্মদ এনামুল হক ও প্রবীণ সংবাদপত্রসেবী মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীনকে সামনে রেখে তাঁরা ১৯৪৭-৪৮ এবং ৫২-৫৩ নাগাদ ঢাকায়ও একটি সুসংগঠিত সাংস্কৃতিক কার্যক্রম চালু করেছিলেন, যা ১৯৫৩-৫৪ থেকে জোরদার হয়। ১৯৪৭ সংলগ্ন সময় কালে চট্টগ্রামের সাংস্কৃতিক অঙ্গনের এক উৎসাহী কর্মী আজিজ মিছির (সিরাজুল ইসলাম) লিখেছেন :

চট্টগ্রামের রেলওয়ে ইনস্টিটিউট বা ওয়াজিউল্লাহ ইনস্টিটিউট বাম-পন্থী রাজনৈতিক আন্দোলনের একটা প্রাণকেন্দ্র ছিল। রেলওয়ে এমপ্লয়ীজ লীগে তখন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য এবং সমর্থক ছিল অনেকেই।...প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বীজ এই..ইনস্টিটিউটকে কেন্দ্র করেই রোপিত হয়।...একটা কথা আজ ভাবতে অবাক লাগে যে, যখন পূর্ব পাকিস্তানের কোন জায়গায়—এমনকি ঢাকায়ও প্রগতিশীল সংস্কৃতি চর্চা ছিল না—সেই সময় চট্টগ্রামে প্রথম প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সূচনা হয়।<sup>১</sup>

১৯৪৮ সনের আগেও চট্টগ্রামে উল্লেখযোগ্য না হলেও কিছু কিছু সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ছিল। ‘আর্যসঙ্গীত সমিতি’ ও ‘সঙ্গীত পরিষদ’—এ শিল্প সঙ্গীত প্রশিক্ষণের একটা শুল্ক ও নিরুত্তাপ প্রচেষ্টা পাকিস্তান আমলেও অব্যাহত ছিল। এনায়েত বাজারে রেলওয়ের ওয়াজিউল্লাহ ইনস্টিটিউটে পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটক মঞ্চায়নের একটা অনিয়মিত প্রচেষ্টা চলিষ্ণু ছিল। এই পরিস্থিতিতে বাঙালি জাতীয়তাবাদী প্রগতিশীল ভাবনা চিন্তার এক ঝাঁক কর্মী চাটগাঁয়ে এসে একত্রিত হয়ে,—দেশ ভাগের ফলে উদ্বাস্ত হয়ে ভারত গমনের ফলে সৃষ্ট হিন্দুদের শূন্যস্থানে সংস্থাপিত হলেন। ঐদের মধ্যে শওকত ওসমান, মোতাহের হোসেন চৌধুরী, এবনে গোলাম নবী, কলিম শরাফী প্রমুখের নাম উল্লেখ করা যায়। তাছাড়া ঐতিহ্যবাহী চট্টগ্রামে প্রতিষ্ঠিত প্রবীণ গবেষক চিন্তাবিদ লেখক এবং তরুণ সাহিত্যিকদের অবস্থান আগে থেকেই ছিল। ঐদের মধ্যে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, ওহিদুল আলম, মাহবুবউল আলম, আবুল ফজল, কবিয়াল রমেশ শীল এবং চট্টগ্রামের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সম্পাদক নবী সেনগুপ্ত, চট্টগ্রামের প্রগতি লেখক সংঘের সম্পাদক সুধাংশু সরকার, ‘সীমান্ত’ পত্রিকার সম্পাদক মাহবুবউল আলম চৌধুরী এবং সূচরিত চৌধুরীর কথা বলতেই হয়।

বিভিন্ন সংগঠনের অনেক কর্মী—যেমন মোসলেহউদ্দীন, জলিলউদ্দীন আহমদ, চৌধুরী হারুনর রশিদ, সাদেক নবী, যাত্রাশিল্পী অমলেন্দু বিশ্বাস, আবদুল হামিদ, মোঃ সাদেক আলী, আবদুল জব্বার, এমদাদুল হক, ইদ্রিস মীনা, ডি. বি. চৌধুরী, চিরঞ্জীব দাসশর্মা, অচিন্ত্যকুমার চক্রবর্তী, নির্মল মিত্র, স্নেহময় রক্ষিত, রমেন মজুমদার, মাহবুব হাসান, গোপাল বিশ্বাস, আজিজ মিছির, আহমদ শরীফ, তারাপদ ঘোষ, সয়ীদুল হাসান, ফরিদা হাসান, এম. এ. জামান, কাজী আলী ইমাম, ফনী বড়ুয়া, এ. কে. মান্নান, সুনীল চক্রবর্তী, এম. এ. সামাদ এবং নাম না জানা আরও অনেকে ছিলেন তখন চট্টগ্রামে।

ঐদের মধ্যে তরুণতর সংগঠক মাহবুবউল আলম চৌধুরী অবিভাজ্য বাঙালি সংস্কৃতি ও বাঙালিকে রাষ্ট্রভাষা করার নিরপেক্ষ বক্তব্য নিয়ে ‘সীমান্ত’ নামে কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন একটি মাসিক সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশে প্রথম উদ্যোগী হন ১৯৪৭ সনের আগস্ট সেপ্টেম্বর নভেম্বর মাসেই। তিনি পাকিস্তানের সরকারি দল মুসলিম লীগের একজন প্রধান সংগঠক ও নেতা, আহমদ সগীর চৌধুরীর ভগ্নি-পুত্র। অর্থবিস্তের জন্য তাঁর ভাবনা বেশি ছিল না। অতএব ‘সীমান্ত’ মোটামুটি নিয়মিত বের হতো।

প্রথম সংখ্যা সীমান্ত প্রকাশের পর আয়োজন করা হয় প্রকাশনা-উৎসবের। পত্রিকাটি বেশ সুনাম অর্জন করে এবং অনতিকাল মধ্যেই প্রসার সৃষ্টি করে। এই পত্রিকাকে ঘিরেই গড়ে ওঠে একটি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী—‘সাংস্কৃতিক বৈঠক’। মাহবুবউল আলম চৌধুরী লিখেছেন : প্রগতিগোষ্ঠী ও সাহিত্য সংঘ যখন সরকারের হামলায় ভেঙ্গে গেল তখন সমস্ত প্রগতিশীল শিল্পী সাহিত্যিকেরা এই ‘সাংস্কৃতিক বৈঠক’—এ এসে জমায়েত হলেন। তাঁরা গল্প কবিতা পাঠ করতেন। আহমেদুল কবির, সানাউল হক, মোতাহের হোসেন চৌধুরী, শওকত ওসমান প্রমুখ প্রতিষ্ঠিত লেখকেরা এতে যোগ দিতেন। তিনি আরও লিখেছেন,

১৯৫০ এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কালে দাঙ্গা প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে দাঙ্গা-বিরোধী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও সমাবেশ করার জন্য চট্টগ্রামের মাদার বাড়ী ক্লাব, নন্দন কাননের শক্তি সংঘ, দেওয়ান বাজারের অগ্রণী সংঘ প্রভৃতি ক্লাব সংগঠিত করে জে. এস. সেন হল প্রাঙ্গণে 'সমাবেশের আয়োজন করে মানুষকে সচেতন করে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।'<sup>২</sup>

তখন ইসলামের জিগির তুলে দেশের প্রতিক্রিয়াশীল চক্র সমস্ত প্রগতিশীল ও উদারনৈতিক চিন্তাধারার পথ রুদ্ধ করে দিচ্ছিল। একে প্রতিহত করতে হলে শুধু সাংস্কৃতিক সংঘ দিয়ে রোধ করা যায় না। একটা পূর্ণাঙ্গ সংগঠনের প্রয়োজন। কিন্তু তখন কোন সংগঠিত পার্টি ছিল না। তিনি জানাচ্ছেন ১৯৫০ সনের এই গণ-সমাবেশ পূর্ব পাকিস্তানে সর্বপ্রথম বিশ্বশান্তি পরিষদের চট্টগ্রাম শাখা স্থাপিত হয়।

'চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সম্পাদক ও সভাপতি নির্বাচিত হন যথাক্রমে মাহবুবউল আলম চৌধুরী ও আবদুল হক দোভাষ। আণবিক বোমা নিষিদ্ধ করণের দাবিতে তাঁদের নেতৃত্বে পরিষদ প্রায় সাত লক্ষ স্বাক্ষর সংগ্রহ করে। বিশ্ব শান্তি পরিষদ এর আবেদন এবং কার্যক্রম 'সীমান্ত' পত্রিকায় প্রচার করা হতো। সীমান্ত এক ঐতিহাসিক দাঙ্গা বিরোধী সংখ্যাও প্রকাশ করেছিল। এইসব প্রচেষ্টাই তখন ছিল পূর্ব পাকিস্তানে ব্যতিক্রমী। 'সীমান্ত'র 'সাংস্কৃতিক বৈঠক' কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠল 'প্রান্তিক নবন্যাট্য সংঘ'। আর 'প্রান্তিক নব ন্যাট্য সংঘ' এবং সাংস্কৃতিক বৈঠকের সদস্যদের শক্তিকে সুসংহত করার লক্ষ্যে আমরা সর্ব প্রথম পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৫১ সনের ১৬, ১৭, ১৮ ও ১৯ মার্চ, হরিখোলার (চট্টগ্রাম) মাঠে একটি সাংস্কৃতিক সম্মেলন করি।'<sup>৩</sup>

এই সম্মেলন পূর্ব পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক-জগতে প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। প্রগতিশীলতার বন্ধ দুয়ার যেন খুলে গেল। কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল মহল—দৈনিক আজাদ, মনিং নিউজ প্রভৃতি পত্রিকা এবং মুসলিম লীগ সরকার সমর্থক অপরাপর প্রচার মাধ্যম এর বিরুদ্ধে আগেই কমিউনিস্টদের সম্মেলন বলে প্রচার শুরু করে সম্মেলনের বিরুদ্ধে এমন প্রতিবাদ উত্থাপন করতে থাকেন যে সরকারি চাকুরে শিল্পী-সাহিত্যিকেরা সম্মেলনে অংশগ্রহণ করতে সাহসী হননি। এ. বি. এম. হাবিবুলাহ, কাজী মোতাহার হোসেন, অমিয়ভূষণ চক্রবর্তী, অজিত গুহ প্রমুখ নিমন্ত্রিত অতিথি কেউই গেলেন না। ঢাকা থেকে সম্মেলনের একজন প্রধান অতিথি হিসেবে কবি বেগম সুফিয়া কামাল (জ. ১৯১১-১৯) এবং 'সত্যযুগ' পত্রিকার সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার (অন্যতম অতিথি) যোগদান করেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ থেকেও অনেক শিল্পী সাহিত্যিক আসেন। এঁদের মধ্যে সুচিত্রা মিত্র, দেবব্রত বিশ্বাস, হেনা বর্মন, প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

বিভিন্ন স্থান থেকে যে সমস্ত লেখক শিল্পী সম্মেলনে যোগদান করেন—তাঁদের মধ্যে আলাউদ্দীন আল আজাদ, মোহাম্মদ আলী (সম্পাদক নও-বেলাল) মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, সলিল চৌধুরী, রমেশ শীল এর নাম উল্লেখযোগ্য। সম্মেলন উদ্বোধন করেন বেগম সুফিয়া কামাল এবং সভাপতিত্ব করেন আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ। ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, সিলেট ও পশ্চিম বঙ্গের খ্যাত-অখ্যাত, হুবুখ্যাত বহুলোকের সমাগমে সম্মেলনটি সার্থকতার পথ নির্দেশ করতে সক্ষম হয়। কীর্তন, রবীন্দ্রসঙ্গীত ও কবিগানের মাধ্যমে সমাবেশের বিপুল সংখ্যক শ্রোতা দর্শক বাঙালি-সংস্কৃতির আশ্বাদ লাভ করেন। সমাবেশের

মূল প্রস্তাব ছিল সমাজ পরিবর্তনের উপায় সম্পর্কে। নিজেদেরকে তাঁরা সবাই প্রাচীন ও আধুনিক কালের অবিভাজ্য বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী বলে দাবি করেন। প্রশ্ন উঠতে পারে কেন এই সম্মেলন? এর ব্যাখ্যা দিয়ে একজন সমালোচক সমকালীন একটি পত্রিকায় (ত্রৈমাসিক ‘পরিচিতি’) লিখেছিলেন :

শিল্পী সাহিত্যিকেরা জনতার বিবেকের প্রতিনিধি। মনুষ্যত্বের চরম অবমাননা, অর্থনৈতিক সংকটের আঘাতে সমাজজীবন বিপর্যস্ত, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, দাঙ্গা, যুদ্ধের বিভীষিকা, জনজীবনে এনেছে অমঙ্গলের বড়। ভূখা জনতার আশা আকাঙ্ক্ষা ও ভবিষ্যত সুস্থ সুন্দর জীবনের ছবি বুদ্ধদের মত মিলিয়ে যাচ্ছে অসীম শূন্যে। ইতিহাসের গতিকে স্তব্ধ করে দেবার ষড়যন্ত্র চলছে প্রতিনিয়ত। বৃহত্তর জনতার (যারা সংস্কৃতির কর্ণধার) জীবনে শান্তি, অবসর, নিরাপত্তা নেই।... দারিদ্র্য, মহামারী, দাংগা, যুদ্ধের বিভীষিকার বিরুদ্ধে লড়াই করে বাস করতে হচ্ছে জীবনের অধিকাংশ সময়। অথচ বৃহত্তর জনতাকে বাদ দিয়ে সংস্কৃতিক উন্নতির কথা ভাবতে যাওয়া কাল্পনিক বিলাস মাত্র। বৃহত্তর জনতার জীবনে নিরাপত্তা, শান্তি, প্রচুর্য চাই। শিল্প-সাহিত্য সংস্কৃতির ব্যাপক প্রবাহকে এগিয়ে নিতে শিল্পী সাহিত্যিক সংস্কৃতিসেবকরা আজ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। সংস্কৃতিকে নিয়ে আঙ্গ ছিনিমিনি খেলা চলছে। বৃহত্তর জনতার মাতৃভাষাকে দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করবারও আয়োজন চলছে পুরোমাত্রায়। ব্যক্তিগত বা দলীয় স্বার্থে সংস্কৃতির নামে বিভ্রান্তিকর পথে বৃহত্তর জনতাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে অজ্ঞতার অঙ্ককারে, মৃত্যুর অতল গহবরে। জনতার বিবেকের প্রতিনিধি বলেই শিল্পী সাহিত্যিকদের সংবেদনশীল মনে তুলেছে বিক্ষোভের তুফান। কালের যাত্রাধ্বনি বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করতে শিল্পী সাহিত্যিকেরা কোনদিনই পিছপা হয়নি। আজকের শিল্পী সাহিত্যিক সংস্কৃতিসেবীরাও এগিয়ে এসেছে দৃঢ় পদক্ষেপে। তাই এই ঐতিহাসিক সম্মেলনের আয়োজন।

একই পত্রিকায় সম্মেলনের গৃহীত প্রস্তাব সম্পর্কে লেখা হয় :

১. আমরা বিশ্বাস করি সাহিত্য শুধু জীবনের নিছক প্রতিফলন নয়, সাহিত্য সমাজ উন্নয়নের শক্তিশালী অবলম্বন। ক্ষুধা, বেকারী এবং অশান্তির হাত থেকে সমাজ জীবনকে রক্ষা করা—তার গতিশীলতাকে ...এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পবিত্র দায়িত্ব আজ শিল্পী, সাহিত্যিকদের। দুর্ভিক্ষে বাঙলাদেশের ৩৫ লক্ষ নরনারীর মৃত্যু, গত মহাযুদ্ধে জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে ভাঙন, যে ধ্বংস, আজকের দৈনন্দিন জীবনে আমাদের যে অর্থনৈতিক সংকট—অভাব-অনটন, জীবনের এই বাস্তব সত্য—তাকে বাদ দিয়ে সমস্যাকে এড়িয়ে কোন সাহিত্যই মানুষের কল্যাণ সাধন করতে পারে না। অতএব বিভিন্ন মতবাদের শিল্পী সাহিত্যিকের এ সম্মেলনে আমরা প্রস্তাব করছি—মানুষের কল্যাণের জন্য যে সাহিত্য, সমাজের গতিশীলতাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে সাহিত্য আমরা সে সাহিত্যের প্রতি আস্থাশীল। মানুষের ভাল করবার, মানুষের মঙ্গল করার সদিচ্ছাকে অঙ্গীভূত করে যে সাহিত্য, শোষণের বিরুদ্ধে এক দেশের উপরে অন্য দেশের প্রভুত্বের বিরুদ্ধে, যুদ্ধের বিরুদ্ধে, সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে আমরা মতবাদ নির্বিশেষে মানবতার নামে সে-সাহিত্যের অনুসারী। আমরা বিশ্বাস করি আজ এ সাহিত্যই জনসাধারণের একমাত্র কাম্য।

২. নিরবচ্ছিন্ন শান্তি ব্যতীত কোন দেশের সাংস্কৃতিক উন্নতি সম্ভব নয়। এই সম্মেলনে আমরা প্রস্তাব করছি—ভবিষ্যতে কোন যুদ্ধকেই আমরা বরদাস্ত করব না। আক্রমণকারী যে হোক না কেন তার বিরুদ্ধে আমরা মানবতাবিরোধী জঘন্য কাজ হিসাবে নিন্দা করবো।

৩. ...বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ করে অক্ষর পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে বাংলা ভাষার মূল আঘাত করার যে নীতি গ্রহণ করা হচ্ছে এবং মূলনীতি কমিটির<sup>৪</sup> প্রস্তাবে বাংলা ভাষার দাবিকে কোন প্রকার প্রাধান্য দেওয়া হয়নি দেখে আমরা অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করছি। অবিলম্বে বাংলা ভাষাকে যেন রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়।

৪. খুনী বাঙলা—বাঙলাদেশের পরিচয় নয়। বিগত দাঙ্গা হাঙ্গামায় ভাইয়ের রক্তে ভাইয়ের হাত কলুষিত হতে দেখে প্রত্যেক শিল্পী সাহিত্যিকই অত্যন্ত পীড়া অনুভব করেছেন।



৫. সংস্কৃতির মূল ভিত্তি শিক্ষা। শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ছাড়া জাতীয় সংস্কৃতির মান উন্নয়ন অসম্ভব।...অতএব এ সম্মেলন সাধারণ ছাত্র শিক্ষকদের অর্থনৈতিক অবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখে মাতৃভাষার মাধ্যমে জনশিক্ষার প্রসার করার জন্য সরকারকে অনুরোধ জানাচ্ছে।

৬. সংস্কৃতি বিকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা না পেলে যে কোন জাতি ক্রমশ পঙ্গু হয়ে পড়তে বাধ্য। শিল্প, সাহিত্য, সংগীত, চিত্র, ভাস্কর্য, নৃত্য, ইত্যাদি সাংস্কৃতিক অবদানগুলোর উৎকর্ষ ও পরিপূর্ণতা সাধন না হলে জাতীয় জীবনে কোন প্রকার অগ্রগতি সম্ভব নয়। আমাদের সংস্কৃতি বিকাশের জন্য আজ পরিপূর্ণ স্বাধীনতা একান্ত প্রয়োজন। এ না হলে জাতীয় জীবনের অগ্রগতি ব্যাহত হবে। কুসংস্কারের নাগপাশে আমরা চিরদিন জড়িত হয়ে থাকব। মানবতামুখী কোন নতুন চিন্তাধারাকে আমাদের মহান জাতীয় ঐতিহ্যের বলে সঞ্জীবিত করে গ্রহণ করার মত মানসিক ঔদার্য আমরা হারিয়ে ফেলব। নতুনকে বর্জন করে পুরাতনের আবর্জনা স্তূপে আমরা নিমগ্ন হয়ে পড়ব। তাই আজ গতিশীল জীবনের জন্য একান্ত প্রয়োজন যাবতীয় সৃষ্টিশীল কল্যাণধর্মী শিল্প সাহিত্য প্রকাশ ও প্রচারের; পুস্তক, পত্র, পত্রিকা প্রকাশের; সংগীত ও নাট্যানুষ্ঠানের এবং সকল নতুন চিন্তাধারার ব্যাপক আলোচনার অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া হোক।

৭. দেশের সমস্ত শিক্ষায়তনগুলি সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান বাহন রূপে কাজ করে। কিন্তু আমরা দেখছি সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও ছাত্ররা স্বাধীনভাবে আপন আপন বিশ্বাস অনুযায়ী সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টায় অবাধ অংশগ্রহণ করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। এতে জাতিতে হয়তো শিক্ষিত করে তোলা হয় কিন্তু সভ্য করে গড়ে তোলা হয় না। তাই শিল্পী সাহিত্যিকের এ সম্মেলন প্রস্তাব করে—সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও ছাত্রদের এই অধিকার ও সুযোগ প্রদান করা হোক যেন তারা আপন আপন বিশ্বাস অনুযায়ী সর্বপ্রকার সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টায় অংশ গ্রহণ করতে বাধা প্রাপ্ত না হয়।

৮. আমাদের সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান পুরোধা কবি কাজী নজরুল ইসলাম। তাঁর অবদানে বাংলাদেশের সংস্কৃতি নতুন প্রাণ-স্পন্দনের সন্ধান পেয়েছে। কিন্তু আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির এই শ্রেষ্ঠ পুরোহিত আজ পক্ষাঘাতগ্রস্থ হয়ে অচিকিৎসায় অনটনে কোনমতে বেঁচে রয়েছেন। অথচ আজ তাঁকে নিয়ে চলেছে নির্লজ্জ টানাটানি। তিনি নীরব বলে আজ তাঁর অবদানগুলোকে চূড়ান্ত অপব্যখ্যায়, সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে টেনে আনবার চেষ্টা হচ্ছে। এমন কি তাঁর নাম বিকৃত পর্যন্ত করবার চেষ্টা চলছে। রুগ্ন কবিকে চিকিৎসার জন্য আজো সুইজারল্যান্ডে প্রেরণের ব্যবস্থা করা গেল না। আমরা মনে করি উভয় বাঙলার সরকারদ্বয় ইচ্ছা করলে জনগণের প্রিয় কবি নজরুলের জন্য পৃথিবীর সমস্ত চিকিৎসা বিজ্ঞানকে এনে হাজির করতে পারেন। এমন কি নজরুলের চিকিৎসার জন্য যদি জনসাধারণের উপর কর ও বসানো হয় তাতেও কেউ কোন আপত্তি করবে না। এই সম্মেলন তাই আবেদন করে যে উভয় বাঙলা, সরকারদ্বয় চিকিৎসার জন্য নজরুলকে সুইজারল্যান্ডে প্রেরণ করে তাঁর চিকিৎসার বন্দোবস্ত করুন। নজরুলের সৃষ্টির যারা অপব্যখ্যা করেছে এবং নজরুলকে নিয়ে যারা সুবিধা আদায়ের অপচেষ্টা করছে এ সম্মেলন তাদের প্রতি তীব্র ঘণা প্রকাশ করছে।

৯. এই সম্মেলন প্রস্তাব করছে যে এখানে বিভিন্ন জেলা থেকে যারা এসেছেন তাঁদের সাথে পরামর্শ করে সম্মেলনের কার্যকরী কমিটি আমাদের প্রথম প্রস্তাবনার ভিত্তিতে প্রদেশব্যাপী একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য একটি আহ্বায়ক কমিটি গঠন করেন। সেই কমিটি অবিলম্বে অন্যান্য জেলার সংগে যোগাযোগ করে প্রত্যেক জেলা থেকে প্রতিনিধি নিয়ে আহ্বায়ক কমিটিকে পরিবর্দ্ধন করবেন ও আর একটি প্রতিনিধিমূলক সম্মেলন আহ্বানের জন্য প্রস্তুতি চালাবেন।<sup>৬</sup>

প্রস্তাবগুলো থেকে সম্মেলনের মহৎ উদ্দেশ্যসমূহ স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। সভাপতির ভাষণে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ যা বলেন, তা ছিল তখনকার সমাজে দিকদর্শনের মতো এবং সংসাহসী সমাজসেবীর পবিত্র দায়িত্ববোধের স্মারক :

ঐতিহ্য সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটি শ্রব নক্ষত্র বিশেষ। ঐতিহ্যের অনুসরণ ও সেই স্রোতধারাকে চির বহমান করিয়া তোলাই সংস্কৃতিসেবীর আসল কাজ। যঁারা তা মানেন না, তাঁদের কাছে আমার সাধনার কোন

মূল্য নাই। তাঁহাদের সহিত আমি তর্কে প্রবৃত্ত হইব না। কিন্তু আপনাদের বলিতে চাই, ঐতিহ্যের পটভূমির সহিত যাহাদের যোগ নাই, তরুলতার ক্ষেত্রে যেমন পরভোজী শব্দ ব্যবহার করা হয়—এখানে ঐ জাতীয় ব্যক্তিদের জন্য তেমন বিশেষণই আরোপ করা চলে। সমাজ জীবনেও দেখিবেন ইহারা পরভোজী। মানবতার সহিত তাঁহাদের কোন সম্পর্ক নাই। জনসাধারণের মস্তকে কাঁচাল ভাঙ্গিয়া দিনাতিপাত করেন। এই জাতীয় ব্যক্তিদের উপদেশ কোনদিন গ্রহণ করিবেন না।

ঐতিহ্যের শ্রেম সাংস্কৃতিক সাধনার আসল সোপান। দেশের ইতিহাস এই জন্যই ভাল রাপে জানা দরকার।...ভুলিয়া যাইবেন না, অতীত আমাদের পথ প্রদর্শন করে। সেই আলোকে আমাদের বর্তমান নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে। এই জন্য ঐতিহ্যের কথা বারবার স্মরণ রাখা দরকার। ঐতিহ্যহীন কোন কিছু গড়িতে গেলে আপনারা ভুল করিবেন। সাধনা পণ্ডশ্রম হইবে মাত্র। অথবা জাতীয় বিকাশের পথ রুদ্ধ করিয়া দিবে।...ঐতিহ্য হইতে তাহারা দূরে সরিয়া যাইতে বলে। মনে রাখিবেন, ঐতিহ্য হইতে দূরে সরিয়া যাওয়ার অর্থ জীবন হইতে দূরে সরিয়া যাওয়া। জীবন হইতে দূরে সরিয়া যাওয়ার অর্থ...মৃত্যু। ঐতিহ্যের সহিত দেশের ইতিহাস, ধর্ম, ভাষা, লৌকিক আচার, জলবায়ু, গাছ-পালা, এমনকি তরুলতা পর্যন্ত জড়িত। বৃকে দেশশ্রেম না থাকিলে তাহা কাহাকেও বুঝাইয়া দেওয়া মুশকিল।<sup>৬</sup>

তাঁর আলোচনায় একথা পরিষ্কার হয় যে অতীতের গর্ভে নিহিত সকল উজ্জ্বল উপাদানসমূহ পাঠ্যে করে ভবিষ্যতের পথে যাত্রা করতে হবে। ‘অতীতের সঙ্গে ভবিষ্যতের যোগসূত্র রচনা করে, বৃহত্তর জনতার বাস্তব জীবনকে ভালবেসে সমস্ত সংবুদ্ধিসম্পন্ন, মানবতার পূজারী শিল্পী সাহিত্যিকদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সমবেত প্রয়াস ও প্রচেষ্টা দিয়ে গড়ে তুলতে হবে নয়া শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি’। সংস্কৃতি কোন নির্দিষ্ট সীমা রাখায় আবদ্ধ নয়। সারা দুনিয়ার সঙ্গে সে সংস্কৃতির নিবিড় আত্মীয়তা রয়েছে।

কবি সুফিয়া কামাল প্রধান অতিথির ভাষণে বলেন : ‘বিশ্বের সঙ্গে, সকল জাতির সঙ্গে, আমাদের পরিচয় যত নিবিড় হবে, ততই আমাদের মনের সংকীর্ণতা ও গোঁড়াই দূর হবে। ফলে আমাদের সাহিত্য হবে সুদূরপ্রসারী ও বহুবিস্তৃত।’

সম্মেলনে শিল্পী-সাহিত্যিকদের তথা জনগণের ব্যাপক দারিদ্র্য দূরীভূত করে অর্থনৈতিক সক্ষমতা সৃষ্টির পক্ষেও বক্তব্য উচ্চারিত হয়। চারদিনব্যাপী সংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে দর্শকরা ধৈর্য ও উৎসাহ নিয়ে স্থানাভাবে দাঁড়িয়েও অনুষ্ঠানটি উপভোগ করেন। এই অনুষ্ঠানে সলিল চৌধুরীর নেতৃত্বে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ একটি সম্মিলিত সঙ্গীতে অংশগ্রহণ করেন। তাছাড়া ভারতের প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পীবন্দ অংশগ্রহণ করায় অনুষ্ঠানটি বহুগুণে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল। ‘প্রান্তিক নব নাট্য সংঘের’ দলটি চিরঞ্জীব দাসশর্মার নেতৃত্বে গণসঙ্গীত পরিবেশন করে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কবিয়াল রমেশ শীল ও ফণী বড়ুয়ার কবির লড়াই সকলকে মুগ্ধ করে। এই অনুষ্ঠানের নিমন্ত্রণপত্রটি শওকত ওসমান এবং সয়ীদুল হাসান এর যৌথ স্বাক্ষরে প্রকাশিত হয়। প্রান্তিক নবনাট্য সংঘের উদ্যোক্তাদের অন্যতম সদস্য ছিলেন রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী কলিম শরাফী।

‘সাংস্কৃতিক বৈঠকের’ মাত্রা বৃদ্ধি পায় প্রান্তিক নবনাট্য সংঘ দ্বারা। এর সভাপতি ছিলেন কবিয়াল রমেশ শীল, সহ সভাপতি শওকত ওসমান। দপ্তর সম্পাদক : চৌধুরী হাফসুর রাশিদ এবং সাংগঠনিক সম্পাদক মাহবুব উল আলম চৌধুরী। সম্মেলনের সার্থকতার ফলে

প্রান্তিকের গানের ‘স্কেয়াড’ গ্রামে গিয়ে ভ্রাম্যমান অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে অধিকার সচেতন করে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। জীবনঘনিষ্ঠ বিভিন্ন নাটক মঞ্চস্থ করেও তাঁরা সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে অসামান্য অবদান রাখতে থাকেন। এই সম্মেলন পূর্ব বাঙলার প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকে পথের সন্ধান দিয়েছিল। পরে যত সম্মেলন হয় তার মূলসুর ছিল এটাই।

১৯৫২ সনে কুমিল্লায় অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তানের দ্বিতীয় সাংস্কৃতিক সম্মেলন তার প্রমাণ। এই সম্মেলনেও চট্টগ্রামের প্রত্যক্ষ অবদান ছিল খুব বেশি। তখনকার কুমিল্লার ‘প্রগতি মজলিশ’ এর কর্মকর্তারা এবং জনাব সালাহউদ্দীন, অধ্যাপক আবুল খায়ের, অধ্যাপক আসহাব উদ্দীন প্রমুখ চট্টগ্রামের সম্মেলন দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে কুমিল্লায়ও একটা সাংস্কৃতিক সম্মেলন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। তবে অর্থ ও শিল্পী-সাহিত্যিকদের সংগ্রহ ও সমাবেশের, আয়োজনের সিংহভাগ দায়িত্ব আলোচনার মাধ্যমে চট্টগ্রামের সংগঠনগুলোকে অর্পণ করা হয়। চট্টগ্রামের কর্মীশিল্পীদের সাগ্রহসংযোগিতায় ১৯৫২ সনের ২২, ২৩, ও ২৪ আগস্ট কুমিল্লা শহরে যে, পূর্ব পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তারও মূল সভাপতি ছিলেন আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ। ‘বর্ণাঢ্য রাজকীয় রঙ্গমঞ্চ’র অনুষ্ঠানে বিভিন্ন শাখায় চট্টগ্রাম থেকে অংশগ্রহণ করেন মাহবুব উল আলম চৌধুরী (সমাজ ও সাহিত্য); গোপাল বিশ্বাস (সমালোচনা সাহিত্য); সুচরিত চৌধুরী (পরিহাস); শওকত ওসমান (পূর্ববঙ্গের নাটক ও রঙ্গমঞ্চ); সুনীল চক্রবর্তী (কাব্যসাহিত্য); সমরেন্দ্র দত্ত (স্বরচিত কবিতা); আহমদ শরীফ (তন্ত্রসংকট) প্রমুখ। ‘প্রান্তিক নবনাট্য সংঘ’ চট্টগ্রামের লোকগীতিগুচ্ছ পরিবেশন করেন। চট্টগ্রামের ‘ইন্ট এণ্ড ক্লাব’ পরিবেশন করে সুচরিত চৌধুরীর নাটিকা ‘পার্কের কোণ থেকে’ এবং কবিয়াল রমেশ শীল প্রশিষ্যসহ রাই গোপালের সঙ্গে পরিবেশন করলেন কবির লড়াই ‘যুদ্ধ বনাম শান্তি’।

সভাপতির ভাষণে সাহিত্যবিশারদ বাঙলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির তৎকালীন অবস্থা, রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কিত বিতর্ক, সাহিত্যে বিভিন্ন আদর্শের সংঘাত সম্পর্কে আলোচনা করে বলেন : “আজ প্রশ্ন উঠিয়াছে—বাঙলা আমাদের সংস্কৃতির ভাষা হইতে পারে না। আমাদের ধর্ম, ঈমান এই ভাষায় অটুট থাকিতে পারে না। এই প্রশ্নের জবাব দেওয়া আমাদের কাছে লজ্জার ব্যাপার।... সংস্কৃতি ধ্বংসের অনেক পথ আছে। জনসাধারণ বিরোধী ও সমাজ বিরোধী গোঁয়ার-নীতি তার অন্যতম উপায় বটে। কিন্তু তার পরিণাম পারস্যে আরবদের ভাগ্যের মতই হইতে বাধ্য।” তরুণ সমাজের ভবিষ্যৎ দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে তিনি উক্ত ভাষণে বলেন :

আমাদের সংস্কৃতি-ধ্বংসের যে হীন আয়োজন নেপথ্যে চলিতেছে, তাহা ব্যর্থ করিতে পারেন কেবল আপনারাই। কারণ সংস্কৃতির নির্বাণোন্মুখ দীপশিখা আবার আপনারাই জ্বলাইতে পারেন। একটি কথা আপনারা প্রায় শুনিয়া থাকেন—‘জীবন বোধ’। কিন্তু দেশের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের ছবি সম্মুখে থাকিলেই শূন্য জীবনবোধ জাগৃত হইতে পারে। এই পথে অগ্রসর হইতে হইলে দেশের ও মানুষের ইতিহাস জ্ঞান দরকার। এক কথায় স্বদেশ-প্রেমের মালা গাঁথিয়া গলায় পরা আবশ্যিক। জ্বলন্ত স্বদেশপ্রেম ছিল বলিয়াই

রবীন্দ্রনাথ, নজরুল জাতীয় কবির মর্যাদা লাভ করিয়াছেন। আমার এই বিশ্বাস আছে যে, আমার দেশের মৃত্যু নাই, আমার দেশের আত্মা যে জনগণ, তারও মৃত্যু নাই, তেমনিই অমর আমার এই বাংলাভাষা।<sup>৫৭</sup>

সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবে দেশের সংস্কৃতি তথা বাংলা ভাষা-আন্দোলনকে দমিয়ে রাখার ষড়যন্ত্রের নিন্দা করা হয় এবং যুদ্ধ বন্ধ রাখা ও শান্তির অনুকূলে প্রচার চালানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সেখানে ঘোষিত হয় যে, প্রগতি শান্তি ও জীবন সৃষ্টি করার জন্য সম্মেলন বন্ধপরিষ্কার।

চট্টগ্রামের এই সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ধারা পূর্ব বাঙলার সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে নতুন প্রেরণা দিয়েছিল। কুমিল্লা (১৯৫২) ; ঢাকা (১৯৫৪) ও টাঙ্গাইল (১৯৫৭) এর বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সম্মেলনে এবং ১৯৬১ তে রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষ পালনের কালে চট্টগ্রামের ভূমিকা ছিল অনন্য।

১৯৫৪ সনের ২৩, ২৪, ২৫ ও ২৬ এপ্রিলে ঢাকার কার্জন হলে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন—এ চট্টগ্রাম থেকে মাহবুব উল আলম চৌধুরীর নেতৃত্বে প্রায় শতাধিক শিল্পী-সাহিত্যিকের একটি দল অংশগ্রহণ করে। এঁদের সামন্তবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সঙ্গীত শ্রোতাদের মনে দারুণ উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। গণসঙ্গীত ছাড়াও ২৪ এপ্রিল সোমবার লেডি গ্রেগরি রচতি ‘রাইজিং অব দি মুন’ অবলম্বনে সলিল চৌধুরীর অনূদিত নাটক ‘অরুণোদয়ের পথে’ মঞ্চস্থ হলে কুশলীবন্দ বিপুল সুনাম অর্জন করেন। গণসঙ্গীত, নৃত্য, নাটক প্রভৃতিতে চট্টগ্রামের শিল্পীবন্দ প্রকৃতপক্ষে যে দক্ষতা দেখান তাতে চর্চা ও মেধার পরিচয় পাওয়া যায়। ভারত থেকে সুভাষ মুখোপাধ্যায়, মনোজ বসু, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, কাজী আবদুল ওদুদ, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, দিপ্তেন্দু সাম্যাল এবং আরও কতিপয় শিল্পী সাহিত্যিক এসেছিলেন। এই সম্মেলন অনুষ্ঠানের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে সাঈদ উর রহমান লিখেছেন :

‘১৯৫৩ সনের শেষের দিকে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে বিরোধী দলগুলোর নির্বাচনী যুক্তফ্রন্ট গঠিত হলে প্রদেশের সংস্কৃতিসেবীরাও ঐক্যবদ্ধভাবে সাংস্কৃতিক সম্মেলন অনুষ্ঠানের জন্য উদ্যোগী হন। কয়েকবার তারিখ পরিবর্তিত হওয়ার পর শেষ পর্যন্ত সেটা অনুষ্ঠিত হয়... ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এর উদ্বোধন করেছিলেন।’<sup>৫৮</sup>

তিনি তাঁর ভাষণে লীগ সরকারের সাহিত্য সংস্কৃতি ক্ষেত্রে ষড়যন্ত্রের কথা উল্লেখ করেন। এবং বলেন, ‘১৯৪৮ সনের পর বিষাক্ত আবহাওয়ায় এই পর্যন্ত কোন সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন সম্ভব হয়নি। আজ জনপ্রিয় পূর্ব বাঙলার গভর্নমেন্টের আশ্রয়ে আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে এক সর্বদলীয় সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন করেছি।’ সকল জেলা থেকে আগত প্রতিনিধির মাধ্যমে অনুষ্ঠেয় উক্ত সম্মেলনে আলোচনা, সঙ্গীত, প্রদর্শনী, আবৃত্তি, পাঠ ও মুশায়েরা হয়। বিভিন্ন সংবাদপত্র ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি ১০৮ জন শিল্পী-সাহিত্যিকের এক যুক্ত আবেদনপত্রে সম্মেলনের মূলনীতি পরিস্ফুট হয়েছে বলে মনে করা সঙ্গত।

তাঁরা বলেন : ‘সাহিত্য ও সংস্কৃতির জন্য পূর্ববাঙলার শিল্পী সাহিত্যিকদের ব্যাপকতম ঐক্য তাঁদের মূল মন্ত্র। তাঁরা মনে করেন, তাঁদের দায়িত্ব হলো জাতীয় প্রগতি,

বিশ্বশান্তি ও দেশ মানবের কল্যাণে সৃষ্টিক্ষমতাকে কাজে লাগানো, বাংলা সাহিত্যের গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যকে প্রবহমান ধারায় এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, সকল রকম বিকৃতি, কুসংস্কার, কূপমন্ডুকতা এবং জাতি ধর্ম বর্ণ ও সম্প্রদায়গত সকল প্রকার বৈরীভাবে বিরুদ্ধে মানবতার আদর্শকে সাহিত্যের উপজীব্য করা এবং রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনের সকল ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ন্যায্য আসনের জন্য চেষ্টা করা। তাঁরা আরও মনে করেন পূর্ব বাঙলার সাহিত্যের বক্ষ্যাত্মক কারণ সাহিত্যিকদের অনৈক্য, ব্যাপক নিরক্ষরতা ও অজ্ঞানতা, অর্থনৈতিক অবস্থার ক্রমাবনতি, পুস্তক প্রকাশের সমস্যা, রাজনৈতিক সংকীর্ণতা ইত্যাদি।<sup>৯০</sup>

১৯৫৪-র ঢাকা সম্মেলনে চট্টগ্রামের প্রান্তিক সাফল্য কাল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাঁরা সরকারি কোপানলে পতিত হন। প্রান্তিক এর সদস্যদের গৌড়া কমিউনিষ্ট বলে সরকার ধরে নিলেন। প্রান্তিকের সদস্যদের উপর নির্যাতন চলতে থাকলো। কেউ কেউ কারাবন্দী হলেন। কেউ বা ‘আগার গাউণ্ডে’ গা ঢাকা দিলেন। কেউ চলে গেলেন ভারতে। এ পরিস্থিতিতে ‘প্রান্তিক’ এর জামাল খান রোডস্থ দড়মার বেড়ার দোচালা ঘর তালাবন্ধ হয়। এরপর মাহবুব হাসান প্রমুখের ‘ইস্ট এণ্ড ক্লাব’ গড়ে ওঠে।<sup>৯১</sup>

৯২ (ক) ধারা জারির পর ‘প্রান্তিক’কে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। অনেক সদস্য ‘প্রান্তিক’ এর ছত্রতলে জড় হতে ভয় পেলেন রাজরোষের কারণে। ‘কৃষ্টি কেন্দ্র’ (১৯৫৬) নামে প্রান্তিক-কে অতঃপর টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয়। এই কৃষ্টিকেন্দ্রের সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হন যথাক্রমে আবুল ফজল ও আবুল হাসনাত।<sup>৯২</sup>

রাজকাপুর লেনে একটা ঘর ভাড়া নিয়ে ‘কৃষ্টিকেন্দ্রের’ সাহিত্য সঙ্গীত ও নাট্য বিভাগ চালু করা হয়। সাহিত্য বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন সুধাংশু ভট্টাচার্য। সাহিত্য-আসরে নিয়মিত যোগ দিতেন শওকত ওসমান, মোতাহের হোসেন চৌধুরী, আবুল ফজল, বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর, আইনুন নাহার, নুরুন্নাহার, দীননাথ সেন, সুচরিত চৌধুরী, সুনীল চক্রবর্তী প্রমুখ। নাট্য বিভাগে তৎপর ছিলেন কাজী আলী ইমাম, মাহবুব হাসান, দীননাথ সেন, সি. এম. রোজারিও, আমিনুল ইসলাম, মনি ইমাম, মীরা সেন প্রমুখ। সঙ্গীত বিভাগের নেতৃত্বে ছিলেন কলিম শরাফী। ‘কৃষ্টিকেন্দ্র’ মাহবুব উল আলম চৌধুরীর নেতৃত্বে ১৯৫৭ সনের কাগমারী সম্মেলনে শতাধিক শিল্পী সাহিত্যিকের দল নিয়ে যোগদান করেন।

উল্লেখ্য পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের বিশেষ কাউন্সিল অধিবেশন উপলক্ষে আয়োজিত কাগমারী সম্মেলনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের একটি ছিল সাংস্কৃতিক সম্মেলন। আন্তর্জাতিক সম্মেলনে রূপ দেবার জন্য দূতাবাস এর মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শিল্পীদেরও দাওয়াত দেওয়া হয়। এতে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ভারত ও মিশর থেকে প্রতিনিধি আসেন। তৎকালে কাগমারী সম্মেলন ব্যাপক আলোড়ন তুলেছিল। এই সম্মেলনের পরে আওয়ামী লীগ ভেঙ্গে ‘ন্যাপ’ গঠিত হয় মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে। সেজন্য রাজনৈতিক ইতিহাসেও এই সম্মেলন গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয়। সম্মেলনের নানা বক্তব্য রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মহলে তুমুল বিতর্ক সৃষ্টি করে।

নারীদের সমাজ সচেতন করে তোলার লক্ষ্যে মহিলা পরিচালিত সংগঠনও (ফৌজিয়া সামাদ এর 'নারী সমিতি') চট্টগ্রামে গড়ে ওঠে। আইউব খানের শাসনামলে প্রগতিশীল সংগঠনগুলো ক্রমে ধ্বংসের মুখোমুখি হয়। বুদ্ধিজীবী সাহিত্যিকেরা আপোষকামিতার পথে অগ্রসর হয়ে ব্যক্তিস্বার্থ রক্ষা করতে সচেষ্ট হন।

তাছাড়া 'পাকিস্তান লেখক সংঘ' প্রতিষ্ঠা করা হলে এর মাধ্যমে বুদ্ধিজীবী, কবি, সাহিত্যিকদেরা সংঘের ছত্রতলে আইউবের উদ্দেশ্য অভিপ্রায়কে সফল সার্থক করে তুলেছিলেন। অতঃপর দেখা যাচ্ছে সরকারি সাহায্য ছাড়া সাহিত্য ও শিল্প-সংগঠন করার তেজ নষ্ট হয়ে যায়। ফলে পুরোপুরি না হলেও মোটামুটিভাবে বিপ্লবী-সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্র উঠে যায়। একদশক ধরে আইউব যে স্বৈর-শাসন চালাতে পেরেছিলেন এবং পূর্ব বাঙলার উপর যে অর্থনৈতিক শোষণ চলে, দেশের ৬৫% ভাগ কৃষক ভূমিহীন পরিণত হয়, আর বিপরীতে কতিপয় ভূইফোড় ব্যক্তি ফুলে ফেঁপে ধণাঢ্য শিল্পপতি হবার সুযোগ পান—তার নেপথ্যে মধ্যবিত্ত বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা ছিল অপরিসীম।

২.৫. খ. ঢাকায় প্রগতি-লেখক সংঘের সর্বশেষ কার্যক্রম : অত্যন্ত টিমে তালে হলেও ১৯৫০-৫১ পর্যন্ত সক্রিয় ছিল। ১৯৪৮ সনের ৩ ডিসেম্বর তারিখের কাউন্সিল নির্বাচনে মুনীর চৌধুরী 'ঢাকা প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের' পরবর্তী মেয়াদের সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন।<sup>১২</sup>

'বিবিধ সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের মাধ্যমে দেশ বিভাগের পূর্বে ঢাকায় একটি প্রগতিশীল সাহিত্য পরিবেশ সৃষ্টি হলেও পাকিস্তান-প্রাপ্তির পরে ইসলামী সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার সাম্রাজ্যবাদী বা নয়া উপনিবেশবাদীদের জোর জুলুম নির্যাতন নিপীড়নমূলক আগ্রাসনের ফলে প্রগতিশীল কমিউনিস্ট কার্যক্রম স্তিমিত হয়ে পড়েছিল। অনেকেই কারাগারে এবং ভারতে চলে যাবার ফলে প্রগতি-র ধারার সংগঠিত কার্যক্রমটি বিশৃঙ্খল ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। সেখানে বিভাগ পূর্ববর্তীকালের অবিভাজ্য বাঙালি সংস্কৃতির বিরোধীতাকারী নব্য কৃত্রিম পাকিস্তানি ইসলামপন্থী সংস্কৃতির ধ্বংসকারীদের কার্যক্রম বা ধারা উচ্চকিত প্রশস্ত হচ্ছিল।

১৯৪০ সনে কলকাতায় 'মোহাম্মদী' পত্রিকাগোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে গঠিত 'পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি', ১৯৪২/৪৩ সনে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ' এবং ১৯৪৭ সনে গঠিত 'তমদ্দুন মজলিশ' (ঢাকা ১৯৪৭) এর ধারা (মাত্রার পার্থক্য ও উদ্দেশ্যের বৈচিত্র্য থাকলেও) মোটামুটিভাবে প্রগতিশীলতা, বাম-পন্থী চিন্তাধারা এবং কমিউনিস্ট প্রভাবিত সমাজ ব্যবস্থার প্রতিকূল অসৃষ্টিশীল আবহাওয়া তৈরিতে সহায়তা করেছিল।

১৯৫২ সনের শেষের দিকে (১৯৫৩ র প্রথম দিকে মতান্তরে) প্রগতি লেখক সংঘের উত্তরসূরি বলে আত্মপরিচয় দিতে উৎসাহী লেখক সাহিত্যিকদের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান 'পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ' এর আবির্ভাব কাল পর্যন্ত ঢাকায় কোনো সুসংগঠিত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি এবং সাহিত্য সংস্কৃতি জগতে বাঙালি জাতীয়তাবাদী প্রগতিশীল ধারার সংস্কৃতিসেবী ও চিন্তাবিদদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাও চোখে পড়ে না। কতিপয় ক্ষীণপ্রাণ

সাহিত্য পত্রিকা তখন প্রকাশিত হতে চাচ্ছিল, সামাজিক পরিবর্তনের অভিপ্রায় বৃক্কে বেঁধে, কিন্তু বৈরী পরিবেশে তাও প্রাণ স্ফূর্তি লাভ করতে পারেনি। দু-এক বা তিন-চার সংখ্যা প্রকাশের পরই তা মৃত্যুর মুখ দর্শন করতে বাধ্য হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক ‘সংস্কৃতি সংসদ’, ১৯৫১ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ‘অসাম্প্রদায়িক মানবতাবাদী গণচেতনা’ ও দেশাত্ত্ববোধক নাটক-সঙ্গীত ইত্যাদির মাধ্যমে ব্যতিক্রমী জীবনঘনিষ্ঠ সাংস্কৃতিক আবহাওয়া সৃষ্টির চেষ্টা করলেও তা ছিল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ভিত্তিক এবং ১৯৫৪ কিংবা ১৯৬০-৬১ পর্যন্ত এর কার্যক্রম ছিল ‘সীমিত’। ‘একুশে ফেব্রুয়ারি আন্দোলন’ বাংলা ভাষা ভিত্তিক অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি করতে, পরবর্তী কালে বাংলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতি রক্ষার তাগিদে এদেশের একাংশ সচকিত হবার ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের উদ্যোগগুলো সমর্থক শুবানুধ্যায়ী সহৃদয় হৃদয়সংবেদীদের পরিপোষণ লাভ করে ক্রমে পূর্ব বাঙলার সাংস্কৃতিক অঙ্গনকে দিক নির্দেশনা দিতে সক্ষম হয়ে ওঠে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সেকালে একালেও রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতি আন্দোলনের কেন্দ্র হওয়ায় সংস্কৃতি সংসদের পরোক্ষ প্রভাব পড়েছিল সারা প্রদেশে।<sup>১৩</sup>

‘পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ’ এর কোনো কোনো চিন্তক সংগঠক কর্মকর্তার বিবেচনায় এটা (পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ) ত্রিশের দশকের ‘সওগাত সাহিত্য মজলিশের’ ধারাবাহিক উত্তরসূরি প্রগতিশীল অসাম্প্রদায়িক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানও বটে। মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন ‘হাসানের সাহিত্যিক জীবনে প্রথম অধ্যায়’ শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন :

সে সময়ে এখানে (পূর্ব পাকিস্তান/ঢাকায়) কোনো সক্রিয় সাহিত্য প্রতিষ্ঠান ছিল না...এমন দুর্দিনে ১৯৫৩ সালের গোড়ার দিকে হাসান হাফিজুর রহমান কয়েকজন তরুণসহ...সওগাত কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করে ‘সওগাত সাহিত্য মজলিশের’ অনুরূপ প্রতিষ্ঠান গড়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন।...সওগাত কার্যালয় সংলগ্ন (৬৬ লয়াল স্ট্রিট, ঢাকা ১) একটি প্রশস্ত ঘর ও সম্প্রস্তু খোলা জায়গা ছিল। স্থির হলো ওখানেই... তাঁদের নব প্রতিষ্ঠিত ‘পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ’ এর কাজ” আরম্ভ হবে।... হাসান হাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে ঢাকার কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক দলে দলে এসে ভীড় জমালেন সওগাত কার্যালয় সংলগ্ন তাঁদের জন্য প্রদত্ত স্থানটিতে।<sup>১৪</sup>

উক্ত প্রবন্ধে উদ্ধৃত হাসান হাফিজুর রহমানের (১৯৩৬-৮৩) নিজের কথা :

আমরা ধূমকেতুর মত তেজে প্রখর, কিন্তু নিরাবলম্ব। ঠাই ছিল না, তাই আমরা সঙ্গঠিতও ছিলাম না। অসংগঠিত আমরা প্রবল উত্তেজনা অস্থির...কিন্তু সংহত নই বলে শক্তি ও তাৎপর্যকে অপরের অনুভবে তীব্র করে তুলতে পারছিলাম না। সেই সময় ‘প্রগতি লেখক সংঘ’ ভেঙে গেছে। তরুণ সাহিত্যিকদের নতুন চেতনা নতুন বক্তব্যের সংগঠিত মাধ্যমের খোঁজে আমরা ছটফট করছি। সময়টা ১৯৫২ সাল, ভাষা-আন্দোলনের তুমুল মুহূর্ত। সেই সময়ে আমি (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র) হঠাৎ সওগাত প্রকাশনালয়ের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ি... (সওগাতকে কেন্দ্র করে) তরুণ সাহিত্যিকমীদের ভীড় জমতে লাগলো...নাসিরউদ্দীন সাহেবকে কেন্দ্র করে প্রগতিশীল সাহিত্যিকরা সওগাতের প্লাটফরমে একত্র হয়েছিলাম এটাই বড় কথা।

নাসিরউদ্দীন সাহেবের সঙ্গে আমাদের এই যোগাযোগ প্রগতিশীল সাহিত্য আন্দোলনের এক স্বর্ণপ্রসূ ভবিষ্যতের দ্বার খুলে দিল। আমরা ‘পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ’ গড়ে তুললাম সেই ১৯৫২ সনেই। প্রগতিশীল সাহিত্যিকদের প্রথম সংগঠন নাসিরউদ্দীন সাহেবের পৃষ্ঠপোষকতায় সঙ্গঠিত হলো। কাজী মোতাহার হোসেন

সাহেব (১৮৯৭-১৯৮১, প্রথমাবধি) সভাপতি। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন, বেগম সুফিয়া কামাল, অজিত কুমার গুহ, কামরুল হাসান, মুনীর চৌধুরী, আবদুল গনি হাজারী, শামসুর রাহমান, আলাউদ্দিন আল আজাদ, ফয়েজ আহমদ, মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, ফজলে লোহানী, আনিস চৌধুরী, বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর, সাইয়িদ আতীকুল্লাহ, আতোয়ার রহমান, আবদুল গাফফার চৌধুরী, আনিসুজ্জামান, খালেদ চৌধুরী, লায়লা সামাদ, আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ প্রমুখ এই সংগঠনের সদস্য হিসেবে সক্রিয় হয়ে উঠলেন।...সেই সময়ে সাহিত্য সভায় প্রতিটিতেই প্রায় দুশো আড়াইশো লোক জমায়েত হতেন।...নাসিরউদ্দীন সাহেবের কাছে এদেশের সাহিত্য সংস্কৃতির ইতিহাস অশেষ ঋণী।<sup>১৫</sup>

এই সকল ব্যক্তিদের শ্রেণীচরিত্রগত অবস্থান ছিল যাকে বলে ‘মধ্যশ্রেণী’তে। বিশ্বাসী ছিলেন তাঁরা কেউ কেউ সাম্যবাদে; অনেকেই বুর্জোয়া উদারনীতিতে। নিয়মিত অধিবশনের অতিরিক্ত বিশেষ সভাও তাঁদের হতো। ১৯৫২-৫৩ সনে ম্যাক্সিম গোর্কি, ১৯৫৩ সনে বন্ধিমচন্দ্র ও ১৯৫৫ সনে রবীন্দ্রনাথের উপর অনুষ্ঠানগুলো বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ছিল। এই সংসদের কোনো কোনো কর্মীর উদ্যোগেই ১৯৫৩ সনে একুশের প্রথম সংকলন ‘একুশে ফেব্রুয়ারি’ (হাসান হাফিজুর রহমানের সম্পাদনায়) প্রকাশিত হয়। এঁদের প্রধান কর্ম ১৯৫৪তে অনুষ্ঠিত ঢাকার পূর্বোক্ত সর্বদলীয় সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন। ১৯৫২-৫৩ বর্ষের ‘পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ-এর কমিটি ছিল নিম্নরূপ :

সভাপতি : ড. কাজী মোতাহার হোসেন, সহ সভাপতি : বেগম সুফিয়া কামাল, অধ্যাপক খান সরওয়ার মুর্শেদ, আবদুল গনি হাজারী; মুস্তাফা নূরউল ইসলাম; সাধারণ সম্পাদক : ফয়েজ আহমদ; সহ সম্পাদক : হাসান হাফিজুর রহমান; বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর; বিভাগীয় সম্পাদক : আলাউদ্দীন আল আজাদ; ফজলে লোহানী (সাহিত্য); আবদুল্লাহ আল মুতী (বিজ্ঞান); আমিনুল ইসলাম (চিত্রকলা); এম. আর. আখতার (প্রচার); সদস্য : শামসুর রাহমান; আনিস চৌধুরী; দৌলতননেসা খাতুন, লায়লা সামাদ; সরদার জয়েনউদ্দীন; আতাউর রহমান; আবুজাফর ওবায়দুল্লাহ; আনিসুজ্জামান; শেখ লুৎফর রহমান। (বাংলাদেশের স্বাধীনতায়ুদ্ধ : দলিলপত্র : প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩৯৭)

‘একুশে ফেব্রুয়ারি’ (১৯৫৩) প্রকাশের ঘটনা পূর্ববাঙলার সাংস্কৃতিক জগতে নতুন মাত্রা এনে দিয়েছিল। এর প্রকাশক মোহাম্মদ সুলতান ‘পুঁথিপত্র প্রকাশনী’র সৃষ্টি করে প্রগতিশীল পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশের যে সুযোগ ঘটান, তাতে কমিউনিস্ট প্রভাবিত রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোর মুখপত্র ও প্রচার-পুস্তিকা প্রকাশ ও প্রচারের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছিল। এজন্য ‘পুঁথিপত্র প্রকাশিনী’র মূল্য গুরুত্ব বিস্মৃত হওয়া চলে না। যেমন চলে না ‘একুশে ফেব্রুয়ারি’র প্রসঙ্গ এড়িয়ে চলা। পুঁথিপত্র প্রকাশনী এবং ‘একুশে ফেব্রুয়ারি’ ইতিহাস বাঙালির সংস্কৃতির উজ্জীবনে আত্মত্যাগের এক উজ্জ্বল নমুনা। এর অর্থ সংগৃহীত হয়েছিল সম্পাদকদের পৈত্রিক চাষের জমি বিক্রি করে। কিন্তু বই বিক্রি করে আর টাকা ফেরত এলো না। প্রকাশের (মার্চ ১৯৫৩) অব্যবহিত পরেই এটি তৎকালীন সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়। পরে ১৯৫৬ সনের দিকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহত হয়, কিন্তু আর্থিক ক্ষতি পোষায়নি।

১৯৫৫ সনে বাঙালির সংস্কৃতি-জগতে পর পর দুটি নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠায় এক প্রবল জোয়ারের সত্তাবনা সূচিত হয়েছিল। এর একটি. বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী রশিদ আহমদ চৌধুরী ওরফে বুলবুল চৌধুরীর (১৯১৯-১৯৫৪) স্মৃতিতে ‘বুলবুল ললিত কলা একাডেমী’র



(বাফা) প্রতিষ্ঠা (১৯৫৫) এবং অন্যটি বাংলা একাডেমীর (১৯৫৫) উদ্বোধন। বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব ১৯৪৮-৪৯ সনে ঢাকায় অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন এর প্রথম অধিবেশনের মূল সভাপতির অভিভাষণে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ প্রথম উত্থাপন করেছিলেন। ১৯৫৪-র যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের 'একুশ দফার' ষোড়শ দফায় বলা হয়েছিল : 'বর্ধমান হাউসকে...বাংলা ভাষার গবেষণাগারে পরিণত করা হইবে'। যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে জয়লাভ করার প্রেক্ষিতে ফ্রন্ট সরকার (পূর্ব বাঙলার) একাডেমী প্রতিষ্ঠার কাজ বাস্তবায়ন করলে বাংলা ভাষার জয়যাত্রার আর এক ধাপ উত্তরণ ঘটে।

২.৫. গ. বাংলা ভাষার হরফ পরিবর্তন (আরবী/ রোমান প্রভৃতি) : মুসলমানী চেহারা গঠন (শব্দ পরিবর্তন—আরবী ফারসী উর্দু শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে) ; এবং রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা হরণ (উর্দুকে রাষ্ট্র ভাষা করে জাতীয় জীবন থেকে বাংলা ও বাঙালিত্ব সরিয়ে) করার ষড়যন্ত্র পাকিস্তানপূর্ব ও তৎপরবর্তীকালে বিভিন্নভাবে চলে আসছিল। রেনেসাঁ সোসাইটি (১৯৪০) 'মুসলমানী শব্দ অকাতরে' বাংলাতে অনুপ্রবেশ ঘটাবার সুপারিশ করেছিল। ৪৭ সনের আজাদী লাভের আগেই বাংলার পরিবর্তে উর্দুকে রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা দানের প্রস্তাবও ছিল। পূর্ববাঙলা সরকারের বাঙালি শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান (১৯০৫-৬৬) 'পূর্ব পশ্চিমের রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক ঐক্য সহজতর' করার যুক্তিতে বাংলা হরফ পরিবর্তন করে আরবী হরফ প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৫০ সন নাগাদ আরবীতে বাংলা শিক্ষাদানের ২০টি বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রে বিনামূল্যে আরবী হরফের বাংলা বই দেয়া হতো।<sup>১৬</sup>

পাকিস্তান সরকারের এই সমস্ত উদ্দেশ্য হাসিলের একটি পন্থা ছিল মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর নেতৃত্বে (সেক্রেটারী ছিলেন কবি গোলাম মোস্তফা ১৮৯৫-১৯৬৪) গঠিত বাংলা ভাষা সংস্কার কমিটি (১৯৪৯)। এই কমিটি বাংলা ভাষা, এর ব্যাকরণ ও বর্ণমালার গুরুতর সংস্কারের সুপারিশপূর্বক 'সহজ বাংলা'র প্রস্তাব করেছিলেন। জনগণের ব্যাপক প্রতিবাদ, প্রতিরোধ-সংগ্রাম ও আন্দোলনের মুখে সমস্ত উদ্যোগ যদিও ব্যর্থ হয়েছিল তবু এঁদের প্রয়াস থেমে ছিল না। নানাভাবে বাঙালিদের মনের ভাবনার, চিন্তার, আকাঙ্ক্ষার এবং শৃঙ্খলার পরিবর্তন ও বিকৃতি সাধনের উপায় অন্বেষণ করে চলেছিলেন। ১৯৭১ পর্যন্ত পাকিস্তান সরকার ও তাঁর তাবেদার প্রতিক্রিয়াশীল বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের বাঙালিপনা, বাঙালিত্ব ও বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি ধ্বংসের নানা উদ্যোগ একটার পর একটা গ্রহণ করা হতেই থাকে।

১৯৫৮ সনে আইউব খান পাকিস্তানের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়েই প্রস্তাব করে বসলেন যে পাকিস্তানের সবকটি ভাষার জন্যে এক রোমান হরফ প্রবর্তন করতে হবে। প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি হিসাবে পাকিস্তানের ঐক্য, সংহতি, বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ ও বিজ্ঞানের দোহাই দেওয়া হল। তিনি আরও বললেন, বাংলা ও উর্দুকে এক হরফে লিখতে পারলে ভবিষ্যতে পাকিস্তানের জন্য একটি জাতীয় ভাষা সৃষ্টি করাও সম্ভব হবে। আইউব খান এই প্রস্তাব করার সঙ্গে সঙ্গে কিছু ভাড়াটে বুদ্ধিজীবী আইউব খানের এই প্রস্তাব সমর্থন করে সংবাদপত্রে বিবৃতি প্রচার করেন। এই সময় (১৯৫৯) বাংলা ভাষা সংস্কারের নানা উদ্যোগও গৃহীত হয়। কিন্তু প্রতিবাদের মুখে বলাবাহুল্য, সেসব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যায়।

২.৫. ঘ. সরকারি মতাদর্শের সমর্থনে এবং ইসলামী তমদ্দুনের পুনর্জাগরণে বিশ্বাসী সংস্কৃতিকর্মীদের বেশকিছু সম্মেলন : পাকিস্তানি আমলে এইসব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রাদেশিক স্বাস্থ্যমন্ত্রী হবিবুল্লাহ বাহার (১৯০৬-৬৬) এর উদ্যোগে ১৯৪৮ সনের ৩১ ডিসেম্বর ও ১৯৪৯ সনের ১ জানুয়ারি ঢাকার কার্জন হলে অনুষ্ঠিত ‘পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন’ এর উদ্দেশ্য ছিল মোটামুটি, ‘পাকিস্তানী সাহিত্যের পুনর্জাগরণ’—কিন্তু হবিবুল্লাহ বাহার এবং ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯; মূল সভাপতি) বিবেকের তাড়নায় সত্য মস্তব্য উচ্চারণ করেন, তাতে সরকারি উদ্দেশ্য ব্যাহত হয় এবং ড. শহীদুল্লাহর এই বক্তব্য :

আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙালি। এটি কোন আদর্শের কথা নয়, এটি একটি বাস্তব কথা। মা প্রকৃতি নিজের হাতে আমাদের চেহারা ও ভাষায় বাঙ্গালিদের এমন ছাপ মেরে দিয়েছেন যে, মালা-তিলক-টিকিতে কিংবা টুপি-লুঙ্গি-দাড়িতে ঢাকবার জো টি নেই।—

এই বক্তব্য পাকিস্তানপন্থীদের প্রবল আক্রমণের সম্মুখীন হয়। দৈনিক আজাদ ও তমদ্দুন মজলিশের মুখপত্র ‘সাপ্তাহিক সৈনিক’ ড. শহীদুল্লাহর উপযুক্ত বক্তব্যের প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে।

১৯৫২ সনের নিখিল পাকিস্তান চিত্র প্রদর্শনী (ঢাকা) ও তমদ্দুন মজলিশের উদ্যোগে ১৯৫২ সনের ১৭-২০ অক্টোবর-এ ঢাকায় অনুষ্ঠিত ইসলামী সাংস্কৃতিক সম্মেলনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল ‘ইসলামী রাষ্ট্রের স্বরূপ’ অন্বেষণ এবং ‘আধুনিক দুনিয়ার বিভিন্ন মতবাদ ও সমস্যাবলীর তুলনায় ইসলামকে যাচাই করে... ইসলামই যে শ্রেষ্ঠতম মানবকল্যাণকর আদর্শ তা... গোঁজামিল না দিয়ে বুঝে নিতে... বুঝিয়ে দেওয়া।

১৯৫৭ সনে ঢাকা আর্ট কাউন্সিল এর উদ্যোগে ‘নিখিল পাকিস্তান সঙ্গীত সম্মেলন’ এর উদ্দেশ্যও ছিল দুই পাকিস্তানের সৌহার্দ্য সৃজন। ১৯৫৯ সনের ১-৪ মেতে দ্বিতীয় সম্মেলন ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় এবং ব্যাপক শ্রোতা-দর্শক পাওয়া যায়। সাহিত্যিকদে সরকারি অপ-কৌশলের হাতিয়াররূপে ব্যবহারের লক্ষ্যে আইউব খানের ‘পাকিস্তান লেখক সংঘ’ (১৯৫৯) গঠনের পূর্বে প্রতিক্রিয়াশীল বা সাম্প্রদায়িক অথবা সংরক্ষণবাদী দৃষ্টিভঙ্গির বুদ্ধিজীবী সাহিত্যিকদের আরও উল্লেখযোগ্য অন্তত দুটি কার্যসূচি পূর্ব বাঙলায় সাফল্য লাভ করেছিল। একটি : ১৯৫৭ তে ‘সিপাহী বিপ্লব শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান’ এবং অপরটি ‘রওনক’ সাহিত্য সংস্থা গঠন। -

১৯৫৭ সনের মার্চ মাসে পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিশ, পাকবাংলা সাহিত্য মহফিল, পাকিস্তান সাহিত্য মজলিশ, এছলামী সংস্কৃতি পরিষদ প্রভৃতি তামদ্দুনিক গোষ্ঠী সিপাহী বিপ্লবের (১৮৫৭) শতবার্ষিকী পালনের সিদ্ধান্ত নেন। অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি কমিটির আহবায়ক ছিলেন অধ্যাপক হাসান জামান। মূল সভাপতি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মোহাম্মদ ইব্রাহীম (১৮৯০-১৯৬৬) এবং উদ্বোধক ছিলেন প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান। অনুষ্ঠানের মূল সুর ছিল ‘সাম্প্রদায়িক’। ‘রওনক’ সাহিত্য সংস্থা গঠনের উদ্দেশ্য ছিল : ‘জাতীয় ভিত্তিতে তমদ্দুন গঠনের সহায়তা করার জন্য সর্বপ্রকার সাহিত্যিক ও

তামদুনিক প্রচেষ্টা চালানো। এই সংস্থার কজন প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন আবুল কালাম শামসুদ্দীন, মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ, মতিনউদ্দীন আহমদ প্রমুখ।

১৯৫৮ সালের প্রথম দিকে রকফেলার ফাউন্ডেশন পূর্ব বাঙলার সমসাময়িক সাহিত্য সম্পর্কে পর্যায়ক্রমিক আলোচনার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে ৩৭০০ ডলার অনুদান দেয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগ এর তদানীন্তন অধ্যক্ষ ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন এর তত্ত্বাবধানে বিশালাকার আলোচনা সভার মূল উদ্দেশ্য ছিল দেশের প্রতিনিধিত্বশীল সকল সাহিত্যিক ও সাহিত্য সমালোচকদেরকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পয়সা খাওয়ানো এবং ‘পূর্ববাঙলার সাহিত্য সংস্কৃতিসেবীদের মধ্যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ‘প্রভাব’ বিস্তার করা।

এই পর্বে (মে, ১৯৫৮) চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত ‘পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন’ অনুষ্ঠানের মূল তাৎপর্য ছিল প্রগতিশীল আন্দোলনের আদি কেন্দ্র চাটগাঁয়ে, ‘পাকিস্তানী আদর্শ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা’। ‘পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য মহফিলের’ উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন কয়েকজন বুজ্জোয়া শিল্পপতি। মূল সভাপতি ছিলেন মুসলিম লীগের দক্ষিণপন্থী নেতা মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ। পাকিস্তানের রাজনীতি ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে ভাষা আন্দোলন ও যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের সাফল্য এবং বাঙালি সংস্কৃতি ও বামপন্থী প্রগতিবাদী চিন্তাধারার প্রসার, বিস্তার—এ আতঙ্কিত বুজ্জোয়া, পুঁজিপতি, সাম্প্রদায়িক, নয়া উপনিবেশবাদী ‘পাকিস্তানপন্থীরা’ ইসলামী সংস্কৃতির ধ্বংসাঙ্কন সন্মুখে নিয়ে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। এই আয়োজনের ব্যাপকতা ও জাঁকজমক কম ছিল না। কারণ ব্যক্তিগত ও দলীয় নগদ স্বার্থ সংরক্ষণ তাঁদের কর্মকাণ্ডের মূল প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছিল।

আইউব খান বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ব্যাপক অবক্ষয় সাধনের ব্যবস্থা করেছিলেন ‘পাকিস্তান লেখক সংঘের’ প্রতিষ্ঠা করে। সামরিক আইন জারির তিন মাসের মধ্যে (১৯৫৯ সনের ২৯, ৩০ ও ৩১ জানুয়ারি) শিক্ষা সচিব কুদরুতুল্লাহ শাহাব এবং কতিপয় উর্দু ভাষার লেখকের উদ্যোগে করাচীর গোয়ানিজ হলে পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যিকদের এক মহাসমাবেশ ঘটানো হয়, প্রধানত বিনাব্যয়ে একটি ‘ভ্রমণ’ এবং বিলাস ব্যসনে আনন্দ ফূর্তিতে মজিয়ে দেবার জন্য। পূর্ব বাঙলার বহু কবি সাহিত্যিক করাচী লেখক সম্মেলনে যোগদানের অছিলায় জীবনে সর্ব প্রথম উড়োজাহাজ চড়তে, আর দামী হোটেলে থাকতে খেতে পেরেছিলেন। এতে উচ্ছ্বাস আনন্দ ও গর্ব ছিল অনেকেই যে, সরকার তাঁদেরকে ‘সাহিত্যিক’ বিবেচনায় এমন অপূর্ব সুযোগ দিয়েছেন! পাকিস্তানের পক্ষে কথা বলতে তাঁদের আগেই কোনো দ্বিধা ছিল না। এখন চক্ষুলজ্জাও দেখা দিল।

সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে যে, ‘পাকিস্তান লেখক সংঘ’ প্রতিষ্ঠা করা হয়, তার পূর্ববাঙলা শাখার সক্রিয় উৎসাহী সদস্য ছিলেন না, এমন লেখক সাহিত্যিকদের খুঁজে পাওয়া ভার ছিল। ইব্রাহীম খাঁ, গোলাম মোস্তফা, জসীমউদ্দীন, আবদুল কাদির, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদ, আবুল হোসেন, ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, আসকার ইবনে শাইখ, মুহাম্মদ আবদুল হাই, মুনীর চৌধুরী, কবীর চৌধুরী, আহমদ শরীফ, আনোয়ার পাশা, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, আবদুল গনি

হাজারী, হাসান হাফিজুর রহমান, ফয়েজ আহমদ, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, আনিসুজ্জামান, শামসুর রাহমান, রফিকুল ইসলাম, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান প্রমুখ সকল বাঙালি প্রতিভাবানেরা তখন লেখক সংঘের ছত্রছায়ায় একত্র হতে পেরেছিলেন এবং বই-পুস্তক-পত্রিকা-সেমিনার ইত্যাদির মাধ্যমে পাকিস্তান-আমলে বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতির খেদমতে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। মুনীর চৌধুরী ও আনিসুজ্জামানের বিখ্যাত বইগুলো ('মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য') লেখক সংঘ থেকে আইউব খানের টাকায় বের হয়।

পাকিস্তান লেখক সংঘের তহবিল গড়ে ওঠে সরকার কর্তৃক বিনা সুদে প্রদত্ত এক লক্ষ টাকার ঋণ দিয়ে। লেখক সংঘের চেষ্টায় বিভিন্ন পুঁজিপতি, আমলা-মুৎসুদ্দি-সামন্তরা অর্থ-সাহায্য দিয়ে নানা প্রকার সাহিত্য পুরস্কারের ব্যবস্থা করেন। পাকিস্তানি ধ্যান-ধারণার পরিপোষক হলেই পুরস্কার পাওয়া যেত। বাঙালি-সংস্কৃতির প্রাধান্য থাকলে আদমজী পুরস্কার (প্রতিষ্ঠা ১৯৭০) দাউদ পুরস্কার (১৯৬৩) ন্যাশনাল ব্যাংক পুরস্কার (১৯৬৪) এবং আইউব খান কর্তৃক প্রবর্তিত সাহিত্য-শিল্পের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় পুরস্কার 'প্রেসিডেন্টস এওয়ার্ড ফর প্রাইড এণ্ড পারফরমেন্সেস' পাওয়া যেত না। অথচ প্রধান বাঙালি লেখক-সাহিত্যিক-গবেষক-অধ্যাপক প্রায় সকলেই আইউবী-শাসনামলে পশ্চিম-পাকিস্তানি শাসকদের উদ্দেশ্য-প্রণোদিত 'সাহিত্য-পুরস্কার' অর্জন করেছেন। বাংলা একাডেমী প্রকাশিত 'চরিতাবিধান' এবং 'বাংলা একাডেমী লেখক অভিধান'-এ বাংলাদেশের খ্যাতিমান সাহিত্যিকদের পরিচিতিতে এই তথ্য পাওয়া যাবে।

২.৫. ৬. আইউব খান নিজের কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের যুদ্ধ (১৯৬৫ সনের ৬ সেপ্টেম্বর) ঘোষণা করলে দেশরক্ষার খাতিরে শিল্পী সাহিত্যিকেরা দেশাত্মবোধক সাহিত্য সৃষ্টিতে আত্মনিয়োগ করেন। ফলে পাকিস্তানের সংহতি বৃদ্ধি পেয়েছিল। পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ বিরোধী স্বায়ত্তশাসনের রাজনৈতিক আন্দোলনের সমকালে পাক-ভারত যুদ্ধ ভারত-বিরোধী জেহাদী মনোভাব জাগ্রত করিয়ে বাঙালির বুদ্ধিবৃত্তিক মহলে বিপরীত ফল ফলাতে সক্ষম হয়েছিল।

এই পাকিস্তান লেখক সংঘ বাংলা ও উর্দু সাহিত্যের জন্য (১৯৬৭ সনে) '৬ সেপ্টেম্বর পুরস্কার' প্রবর্তন করলে পুরস্কার প্রাপ্তির লক্ষ্যে লেখকেরা 'পাকিস্তানের ভৌগোলিক অখণ্ডতা ও সংহতি রক্ষায় সহায়তাকারী গ্রন্থ' প্রণয়নের দিকে ঝুঁকেছিলেন। বাংলা সাহিত্যে এই পুরস্কার প্রথম লাভ করেন একুশের প্রথম সংকলনের সম্পাদক হাসান হাফিজুর রহমান, তাঁর 'সীমান্ত শিবির' গ্রন্থের জন্য। বুদ্ধিজীবীদের দিয়ে 'উন্নয়ন দশক' (১৯৬৮) পালনের সময়ে অনেক সেমিনার আলোচনা অনুষ্ঠান ইত্যাদির আয়োজন আইউব খান করেছিলেন। সরকারি টাকার ছড়াছড়ি হয় তখন। ঢাকার বাংলা একাডেমী ১৯৬৮ সনের অক্টোবর (১৮-২৪) মাসে 'আমাদের সাহিত্য' পর্যায়ে একটি ব্যাপক সেমিনারের আয়োজন করে। কাব্য, উপন্যাস, নাটক, ছোটগল্প, প্রবন্ধ, শিশু সাহিত্য, এবং সাময়িক পত্র এই সাতটি বিষয়ের উপর আলোচনাগুলো সংগঠিত হয়।

বাংলা একাডেমীর সাহিত্য সেমিনারের উদ্বোধনী ভাষণ দেন পাকিস্তান সরকারের শিক্ষামন্ত্রী কাজী আনোয়ারুল হক। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান এর সভাপতি ছিলেন বাংলা একাডেমীর তৎকালীন পরিচালক ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ। ‘পূর্ব পাকিস্তানের বিশ বছরের কবিতা’ শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন সৈয়দ আলী আহসান। আলোচনা করেন ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ও ড. বোরহান উদ্দীন খান জাহাঙ্গীর। সেদিনের অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন ডক্টর ময়হারুল ইসলাম। ‘বিশ বছরের বাংলা নাটক’ পর্যায়ের অনুষ্ঠানে প্রবন্ধ পাঠ করেন ওবায়দ উল হক। আলোচনায় অংশ নেন : আশকার ইবনে শাইখ, আনিস চৌধুরী, সাবেরা মুস্তাফা এবং জিয়া হায়দার ; সভাপতি—মুনীর চৌধুরী। ‘পূর্ব পাকিস্তানের প্রবন্ধ সাহিত্য শীর্ষক’ প্রবন্ধ পড়েন ডক্টর সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ; আলোচক : ডক্টর আশরাফ সিদ্দিকী, ডক্টর আনিসুজ্জামান ; ডক্টর নীলিমা ইব্রাহিম ; সভাপতি : ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক। ‘পূর্ব পাকিস্তানের উপন্যাস’ শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন আতোয়ার রহমান। আলোচক : সৈয়দ শাহাদৎ হোসেন, সরদার জয়েনউদ্দীন ও শামসুল হক ; সভাপতি : আবুল কালাম শামসুদ্দীন। ছোটগল্প বিভাগে ‘আমাদের গল্প সাহিত্য’ শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন আবু জাফর শামসুদ্দীন। আলোচনায় অংশ নেন মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, শহীদ আখন্দ, হাসনাত আবদুল হাই এবং সভাপতি : শাহেদ আলী। ‘পূর্ব পাকিস্তানের সাময়িকপত্র’ শীর্ষক প্রবন্ধ পড়েন ড. মোহাম্মদ আবদুল কাইউম। আলোচনা করেন রফিকুল ইসলাম, মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ ; সভাপতি : মুজীবুর রহমান ঝা। ‘শিশু সাহিত্য’ বিভাগে ‘আমাদের শিশু সাহিত্য’ শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন রোকনুজ্জামান খান (দাদা ভাই) ; আলোচক : মোহাম্মদ নাসির আলী, ডক্টর আবদুল্লাহ আলমুতী শরফুদ্দিন, হাবিবুর রহমান, এম. এ. আজম. হোসেন আরা কামাল এবং সভাপতি, মোহাম্মদ মোদাবেব।<sup>১৭</sup>

ডক্টর সাঈদ-উর রহমান লিখেছেন : ‘উন্নয়ন দশক’ পালনের মূল উদ্দেশ্য ছিল দুটো : বিরামহীন বর্গাচ্য প্রচারণার দ্বারা আইউব খানের এক মহিমাময় ব্যক্তিত্ব দেশবাসীর সামনে গড়ে তোলা এবং এর দ্বারা ১৯৬৯ সনের মৌলিক গণতন্ত্রীদের নির্বাচন ও ১৯৭০ সনের জানুয়ারি মাসের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে প্রভাবিত করা। প্রচারণা চলে নানাভাবে—সরকারি কাগজপত্র, লেফাফা, স্ট্যাম্প, টেলিগ্রাম, মানিঅর্ডার ফরম ইত্যাদির উপর উন্নয়ন দশকের ছাপ দেওয়া হয়। রেডিও টেলিভিশন থেকে কথিকা প্রচার করা হয়। সরকারি ভাবে লক্ষ লক্ষ প্রচার পুস্তিকা বিতরণ করা হয়।

এর মূল বক্তব্য ছিল : ১৯৫৮-৬৮ মধ্যবর্তী সময়ে (পাকিস্তানের)... অর্থনীতিতে বিরোট উন্নতি হয়েছে, পররাষ্ট্র-নীতিতে এসেছে অভাবনীয় সাফল্য, দেশের পশ্চাৎপদ সমাজ কাঠামো পড়েছে ভেঙ্গে, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে পাকিস্তানের ইজ্জত বেড়েছে বহুগুণ, এবং এর সবই সম্ভব হয়েছে সৈনিক রাজনীতিবিদ আইউব খানের গতিশীল নেতৃত্বে ও মহিমাময় ব্যক্তিত্বে—ফলকথা ইকবাল যার স্বপ্ন দেখেছিলেন, জিন্নাহ যার ভিত গঁথেছিলেন, সেই পাকিস্তানের সার্থক স্থপতি হলেন ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ আইউব খান।

পাকিস্তানি সংস্কৃতির রূপায়ণে সহায়তা করার লক্ষ্যে ১৯৬৮ সনের ২৪ মে উদ্বোধন করা হয় ‘নজরুল একাডেমী’। ‘মুসলিম বাংলার রেনেসাঁর অগ্রদূত হিসাবে নজরুলের

ভূমিকাকে চির জাগরুক রাখা, পাকিস্তানি জীবনাদর্শের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আধুনিক ও প্রগতিশীল ভাবধারার সকল উপাদানকে আত্মস্থ করা এবং ‘মুসলিম ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারের ভিত্তিতে পাকিস্তানি সংস্কৃতির সংহতি ও বিকাশ সাধন করা’ প্রভৃতি উদ্দেশ্য লক্ষ্য সামনে নিয়ে। প্রেসিডেন্ট আইউব খানের ব্যক্তিপূজার জন্য তাঁর সম্মানে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে সঙ্গীত ও নৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন (২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৬৮) ছাড়াও ঐ একাডেমী বছর খানেক যাবৎ আনন্দের সঙ্গে নজরুলের জন্মবার্ষিকী ইত্যাদি কয়েকটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল।

২.৫. চ. পাক-ভারত যুদ্ধের (১৯৬৫) সময় থেকে রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রচার বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। ঐ নির্দেশ পরবর্তীতেও বহাল ছিল। এর মধ্যে ১৯৬৭ সনের জুন মাসে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের বাজেটের অধিবেশনে পূর্ববাঙলার সংস্কৃতি ও এতে রবীন্দ্রনাথের অবদান বিষয়ে বিতর্ক উত্তপ্ত রূপ ধারণ করলো। তথ্যমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দীন জাতীয় পরিষদে জানান জাতীয় আদর্শ ও ভাবধারার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় বলে বেতার ও টেলিভিশনে রবীন্দ্রসঙ্গীত আর প্রচার করা হবে না। আবদুস সবুর খান (সরকারি দলের নেতা) যা বলেন তার মূল কথা হলো : ইদানিং পূর্ববাঙলায় সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনের এক অশুভ তৎপরতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। পহেলা বৈশাখ ও রবীন্দ্র-জয়ন্তী উদযাপনের নামে বিদেশি সংস্কৃতি এদেশে অনুপ্রবেশ করে ইসলামি জীবনাদর্শের ভিত্তিতে সৃষ্ট পাকিস্তানের মূলে আঘাত হনছে।

উল্লেখ্য যে ১৯৬১ সনের রবীন্দ্রজন্মশত বার্ষিকীর সময় আইউব সরকার বিশেষ তৎপর হয়ে ওঠে যাতে পূর্ববাঙলায় তা পালিত না হয়। পাকিস্তানবাদীদের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় এ সম্পর্কে বহু আক্রমণাত্মক রচনা প্রকাশিত হয়। কিন্তু সরকারের এই নীতির প্রতিক্রিয়ায় প্রায় একটা গণ-আন্দোলনের উত্তেজনা নিয়ে পূর্ব বাঙলার জনগণ রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী উৎসব উদযাপন করে।<sup>১৮</sup>

এই বার্ষিকী উদযাপনের সাফল্যে ঢাকায় রবীন্দ্রসঙ্গীতের চর্চা ও বিকাশের লক্ষ্যে ‘ছায়ানট’ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬২ সনে। পাকিস্তান প্রাপ্তির পরে পহেলা বৈশাখের উৎসব হারিয়ে যেতে বাসেছিল। কিন্তু ১৯৬১-পরবর্তী বছরগুলোতে আবার বাঙলা নববর্ষ পালনের আয়োজন বৃদ্ধি পেতে থাকে। ক্রমেই উৎসাহ উদ্দীপনা বৃদ্ধি পায়। ১৯৬৪ থেকে প্রাদেশিক সরকার পহেলা বৈশাখ সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা করে বাঙালি সংস্কৃতির স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হন।

পাক-ভারত যুদ্ধের অবসানের পর সরকার ভারত থেকে পুস্তক আমদানি নিষিদ্ধ করে দেয়। গভর্নর মোনায়েম খানের সরকার এক অর্ডিন্যান্সের দ্বারা ভারতীয় পুস্তকের পুনর্মুদ্রণ বন্ধ করে। এর ফলে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদসমূহের সঙ্গে পূর্ববাঙলার জনগণের নিরবচ্ছিন্ন সংযোগ ব্যাহত হয়। এই সরকারি রীতির বিরুদ্ধে ছাত্ররা এবং শিক্ষিত সমাজ অনেক আন্দোলন করেন। কিন্তু সরকার তা গ্রাহ্য করেনি। এ সময় ছাত্র-ছাত্রী ও পাঠক-সাধারণের চাহিদা পূরণের জন্য চর্চাপদ শীক্শকীর্তন থেকে আরম্ভ করে বিদ্যাগার মধুসূদন দীনবন্ধু বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথের রচনাবলি পূর্ববাঙলায় পুনর্মুদ্রিত হয়। তাছাড়া আরও অত্যাধুনিক

পশ্চিমবঙ্গীয় লেখকদের রচনারও বহু ফুটপাথ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এ নিয়ে অনেক বিতর্ক সভাসেমিনার অনুষ্ঠিত হয় এবং দোষ-গুণ বিষয়ে মতামত ব্যক্ত হতে থাকে।

এই সময় (১৯৬৮) বাংলা একাডেমীর ব্যর্থ পুরাতন উদ্যোগ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ভাষা-সংস্কার করার পদক্ষেপ আবার গৃহীত হয়। তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপর্ষদের মাধ্যমে ভাষা, লিপি ও বানান সংস্কারের উদ্যোগ প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। রোমান হরফ প্রবর্তনের প্রচারও এই সময় নতুন করে আরম্ভ হয়। আইউব খান অভিন্ন সংস্কৃতির জন্য এক 'জাতীয় ভাষা' প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৯৬৯ সনের শেষের দিকে পূর্ব বাঙলায় বাঙালি সংস্কৃতি, বাঙালি জাতি ও স্বাধীন চিন্তার পরিপোষক পুস্তকাদি বাজেয়াপ্ত করার উদ্যোগ নেয়া হয় পাকিস্তান সরকারের এক প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন্স অর্ডিন্যান্স বলে। ১৯৫৯ সনে প্রতিষ্ঠিত বি. এন. আর (B.N.R) বা জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থা (Bureau of National Reconstruction) কে ১৯৬৯ সনের সামরিক শাসনামলে সার্বক্ষণিক পরিচালক নিযুক্তির (ড. হাসান জামানকে, ১৯২৮-৮১) মাধ্যমে সক্রিয় করা হয় এবং পর্যাপ্ত বাজেট (মূলধন) দিয়ে সংস্থাতিকে অপসংস্কৃতি প্রচারের এবং বুদ্ধিজীবী-লেখকদের দিয়ে বই লেখানোর মাধ্যমে টাকা বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়।

মোটামুটিভাবে প্রতিষ্ঠিত লেখকদের দ্বারা উচ্চমূল্যে পুস্তক রচনা করিয়ে তাঁদের নিরপেক্ষ করে তোলা (হল)।...পূর্ববাঙলার প্রতিষ্ঠিত লেখকদের এক বিরাট অংশকে সংস্থার গণবিরোধী ভূমিকা সম্পর্কে নীরব রাখতে সমর্থ হলেন।

ঐ সময় পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদ প্রচার ও প্রসারের জন্য পাঠ্যক্রম পরিবর্তনের মাধ্যমে নবম ও দশম শ্রেণীর (১৯৭০-৭১ শিক্ষাবর্ষে) পাঠ্যরূপে 'পাকিস্তান : দেশ ও কৃষ্টি' নামের দু'খণ্ডের একটি পুস্তক প্রণীত হয়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য ড. আজিজুর রহমান মল্লিকের (জ. ১৯১৮-১৯৯৭) সভাপতিত্বে গঠিত উপদেষ্টা পরিষদের তত্ত্বাবধানের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর ইসলামের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক এবং ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. সিরাজুল ইসলাম (জ. ১৯২৬) এই বই রচনা করেন। ভারতবর্ষে কখন থেকে মুসলিম জাতীয়তাবাদের উৎস খোঁজা উচিত ও পাকিস্তানের মাধ্যমে কিভাবে তার পূর্ণ বিকাশ ঘটলো এই হলো ঐ বইয়ের মূল দৃষ্টিভঙ্গি। পাকিস্তানে অখণ্ড জাতীয়তাবাদী চেতনা জাগ্রত করার এই অপচেষ্টা পাকিস্তানি শাসন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাংলাদেশ, স্বাধীনতা অর্জন করার মাত্র একবছর পূর্বে, বাঙালি লেখক-গবেষক-অধ্যাপকদের দ্বারাই প্রণীত হয়েছিল।

গ্রন্থের ভূমিকায় (২য় খণ্ড) গ্রন্থকার লিখেছিলেন :

পাঠক লক্ষ্য করিবেন যে, পাকিস্তানী কৃষ্টির কতকগুলি দিক যেমন : ভাষা, সাহিত্য ও সমাজ, স্থাপত্য ও ললিতকলা সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে বইটিতে।...পৃথিবীর যেকোনও উন্নত দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় জাতির শিল্প-কলা-কৃষ্টিগত বুনিন্যাদ সম্পর্কে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরেই শিক্ষার্থীকে অবহিত করিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় কিন্তু ইহাই প্রথম প্রচেষ্টা। তাই প্রদেশের শিক্ষা বোর্ডগুলি এবং সে-সঙ্গে টেকস্টবোর্ড তাঁহাদের এই নীতি ও পদক্ষেপের জন্য অবশ্যই অভিনন্দনযোগ্য।<sup>১৯</sup>

কিন্তু পূর্ব বাঙলার ছাত্র-জনতা-বুদ্ধিজীবীরা এই রকম একটি বিকৃত আদর্শের ভাণ্ডার পুস্তককে পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সংগঠিত ভাবে আন্দোলন আরম্ভ করেন। চাপের মুখে সরকার আপোষমূলক বক্তব্য প্রচার করে উত্তেজনা প্রশমনের চেষ্টা করলেও এই বই আর ছাত্রদের ছুঁয়ে দেখার প্রয়োজন পড়েনি।

পূর্ব বাঙলার বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিকগণ বারে বারে গণ-বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। ক্ষমতার সঙ্গে আপোষ করে জনগণের স্বার্থকে বিসর্জন দেয়া হয়েছে। শিল্পী সাহিত্যিকেরাও গণ বিচ্ছিন্ন বুদ্ধিজীবী, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও নেতাদের মতো হঠকারিতার আশ্রয় নিয়ে যা-খুশি তাই করেছেন, ব্যক্তিগত লাভালাভ ও ভালো-মন্দকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তবু এই কালের বুদ্ধিজীবী লেখক সাহিত্যিকেরাই আবার জনমতের প্রতি লক্ষ্য রেখেই হোক, কিংবা দেশি বা বিদেশি কোন সংস্থা থেকে তাগাদা ও নগদ মুনাফা পেয়েই হোক, অথবা বন্দীবিবেকের করুণ আর্ত-চিৎকার-ধ্বনিরূপ সজাগমুহূর্তের সচেতন কর্মপ্রয়াস হিসেবেই হোক—ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন কতিপয় স্মরণীয় কর্মপন্থাও তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন ; যা পূর্ব বাঙলার স্বায়ত্তশাসনকামী রাজনৈতিক আন্দোলনের ধারাকে পুষ্ট করেছিল এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদ, বাঙলাভাষা ও বাঙালি-সংস্কৃতির পরিপোষকদের শৈল্পিক মানসিক ক্ষুধা তৃষ্ণার পানাহার সরবরাহ করেছিল।

চট্টগ্রাম (১৯৫১) ঢাকা (১৯৫৪) ও কাগমারী (১৯৫৭) সংস্কৃতি সম্মেলন, রবীন্দ্র-জন্মশতবর্ষ পালন (১৯৬১) এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ কর্তৃক কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড ও পূর্ব পাকিস্তান জাতীয়পুনর্গঠন সংস্থার (BNR) আর্থিক সাহায্যে আয়োজিত ‘বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ’ (১৯৬৩ সনের ২২-২৮ সেপ্টেম্বর) সেকালের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছিল। এতে বি.এন. আর. এর কালো পয়সার দোষ ঢেকে গিয়েছিল। প্রচুর শোতা-দর্শক অসীম আগ্রহ-উদ্দীপনা ও কৌতূহল নিয়ে ছাত্র-শিক্ষকদের সপ্তাহব্যাপী ঐ অনুষ্ঠান উপভোগ করেছিলেন—কারণ, বাঙলাভাষা ও সাহিত্যের হাজার বছরের ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে রচিত ও পরিকল্পিত আবৃত্তি, সঙ্গীত, সংস্কৃতি প্রদর্শনী ও আলোচনা অনুষ্ঠান স্ফুটনোন্মুখ বাঙালি-জাতীয়তাবাদী চেতনাকে পুষ্ট করেছিল। দেশবাসীর মনের সাংস্কৃতিক চাহিদাকে নিবৃত্ত করতে সক্ষম ছিল অনেক কার্যক্রম।<sup>১০</sup>

লেখক সংঘের কার্যক্রম বুদ্ধিজীবীদের নিন্দার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। স্বার্থ নিয়ে দলাদলি হানাহানি এবং বিভিন্ন প্রকার গোপন তৎপরতা বুদ্ধিজীবীদেরকে জনগণের স্বার্থ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।<sup>১১</sup>

কিন্তু ১৯৬৮ সনে লেখক সংঘের পূর্বাঞ্চল শাখা মহাকবি স্মরণোৎসব (৫ জুলাই-৯ জুলাই ১৯৬৮) ও আফ্রো-এশীয় সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান (২০-২১ অক্টোবর ১৯৬৮) তাঁদেরকে কিছুটা জনগণের কাছে এনেছিল। এগুলো দ্বারা তাঁরা নিজেদের গণবিচ্ছিন্ন দালালি কার্যক্রমের অপবাদ ঢাকতে কিছুটা হলেও সফল হয়েছিলেন। কারণ অনুষ্ঠানে লোক সমাগম হতো বলে, জনমনে সাড়া জাগাতে পেরেছিল ভালো। ভেতরের সব কথা জনগণ খুঁটিয়ে জানতে চায়নি।



## তথ্যপঞ্জি

১. আজিজ মিহির, 'পঞ্চাশ দশকের শুরু : প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলন'; চট্টগ্রামে সাংস্কৃতিক আন্দোলন : প্রগতিশীল ধারা, সম্পাদক : মাহবুব হাসান, চট্টগ্রাম, ১৯৯১ পৃ. ৩২।
২. মাহবুব উল আলম চৌধুরী, সাংস্কৃতিক আন্দোলনে চট্টগ্রাম; চট্টগ্রামে সাংস্কৃতি আন্দোলন : প্রগতিশীল ধারা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫-৬। তিনি লিখেছেন : এই সমাবেশে এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-বিরোধী... মিছিলে নেতৃত্ব দেন রফিকউদ্দিন সিদ্দীকী, আবদুল হক দোভাষ, প্রিন্সিপাল আবু হেনা, মোতাহের হোসেন চৌধুরী, শওকত ওসমান, যোগেশ সিংহ প্রমুখ। এই মিছিলের বৈশিষ্ট্য ছিল ; দুই হাজারেরও অধিক ক্লাবকর্মী ইউনিফর্মে সজ্জিত হয়ে ড্রাম বাজিয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-বিরোধী গান গেয়ে গোটা শহরে প্রদক্ষিণ করতো। গানের নেতৃত্বে থাকতেন সাদেক নবী।' ও ভাই দেশ ছাইড়া যাইওনা/এক ভাই যখন ঝাইচ্যা আছে আর ভয় কইরোনা।' গানটির রচয়িতা—মাহবুবউল আলম চৌধুরী। সংখ্যালঘুদের মনে এই গান দারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। ফলে অনেকে দেশ ছেড়ে চলে যাবার সংকল্প পরিত্যাগ করেন (পৃ ৭)।
৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮।
৪. ১৯৪৮ সনে পাকিস্তানের মূলনীতি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এই মূলনীতিতে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের কথা ছিল না। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার কোন স্বীকৃতিও ছিল না। ঐ রিপোর্টে পূর্ব পাকিস্তানের অত্যন্ত ন্যায্য দাবিগুলোকেও অস্বীকার করা হয়। তৎকালে পত্রপত্রিকায় সমালোচনা প্রকাশ পেলেও কোনো কার্যকর প্রতিবাদ বা গুরুত্বপূর্ণ সমালোচনা না হওয়ায় এবং দমন নির্যাতনের মাধ্যমে প্রতিবাদ স্তব্ধ করে দেয়া হয় বলে নীতির পরিবর্তন হয় না।
৫. ত্রৈমাসিক পরিচিতি, সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি মফিজ উল হক, চট্টগ্রাম, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা বৈশাখ ১৩৫৮।
৬. মাসিক সমকাল, সম্পাদক : সিকানদার আবু জাফর, চতুর্থ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৬৭।
৭. উদ্ধৃত, দীননাথ সেন 'পঞ্চাশের তরঙ্গ'; চট্টগ্রামে সাংস্কৃতিক আন্দোলন : প্রগতিশীল ধারা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৯।
৮. সাঈদ উর রহমান, পূর্ববাঙলার রাজনীতি সংস্কৃতি ও কবিতা, পৃ. ৩৭-৩৯।
৯. পূর্বোক্ত, পৃ।
১০. শংকর দাশগুপ্ত (শ্রী শংকর), 'পঞ্চাশ ও ষাট দশকের সাংস্কৃতিক চর্চা : প্রসঙ্গ নৃত্য'; চট্টগ্রামে সাংস্কৃতিক আন্দোলন : প্রগতিশীল ধারা, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩০।
১২. ১৯৫৬ সনে চট্টগ্রামের 'কৃষ্টিকেন্দ্র' উদ্বোধনী অনুষ্ঠান উপলক্ষে প্রকাশিত দীননাথ সেন সম্পাদিত 'কৃষ্টি' স্মরণিকায়ে অধ্যাপক আবুল ফজলের ভাষণ (কৃষ্টিকেন্দ্র প্রসঙ্গে) থেকে জানা যায় ; "...এই পরিবেশে যাদের মনে বেদনার সঞ্চার করেছে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটুখানি সুস্থ পরিবেশ রচনার জন্য... তাঁদের কয়েকজন এগিয়ে এলেন... ফলে ; 'কৃষ্টি কেন্দ্রের' জন্ম ও আবির্ভাব সম্ভব হলো। দলমত নির্বিশেষে সবরকম সংস্কৃতিসেবীদের মনে একটুখানি প্রাণ-স্পন্দন জাগিয়ে তোলা, তার জন্য যতটুকু সম্ভব অনুকূল পরিবেশ রচনা ও তরুণ শিল্পসেবীদের জন্য শিল্পচর্চার একটুখানি সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করা—সংক্ষেপে কৃষ্টি কেন্দ্রের এই লক্ষ্য।... হোক ক্ষুদ্র হোক সংকীর্ণ এই পথ—পথিকের লক্ষ্য যদি হয় ধ্রুব, সংকল্প যদি হয় দৃঢ়, এই পথই হয়ত একদিন আজকের অবহেলিত ও উপেক্ষিত সংস্কৃতিসেবীদের এক নতুন ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দিতে সক্ষম হবে।' (উদ্ধৃত, চট্টগ্রামে সাংস্কৃতিক আন্দোলন : প্রগতিশীল ধারা, পৃ. ১৬—১৭)

১২. আবদুল কাদির (সভাপতির ভাষণ) ; মুনীর চৌধুরী মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী আনোয়ার পাশা, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৭২ পৃ. ৩৩।
১৩. সাঈদ উর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮।
১৪. মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন, 'হাসানের সাহিত্যিক জীবনের প্রথম অধ্যায়', হাসান হাফিজুর রহমান (স্মারক-গ্রন্থ), সম্পাদক : খালেদ খালেদুর রহমান, জুন ১৯৮৩, পৃ. ১৮-১৯।
১৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ২১।
১৬. সাঈদ উর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০।
১৭. 'আমাদের সাহিত্য' বইএর প্রচ্ছদ আঁকেন শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী, 'প্রসঙ্গ-কথা' লেখেন বাংলা একাডেমীর তৎকালীন পরিচালক কবীর চৌধুরী ; সম্পাদনা করেন সরদার ফজলুল করিম। বইটি প্রকাশিত হয় সেমিনারের সকল প্রবন্ধ, আলোচনা-সমালোচনা ও সভাপতিদের ভাষণ ইত্যাদি নিয়ে ১৯৬৯ সনের নভেম্বর (কার্তিক ১৩৭৬) মাসে বাংলা একাডেমী ঢাকা থেকে।
১৮. আবুল কাসেম ফজলুল হক, মুক্তি সঙ্গ্রাম, পৃ. ১৭। কবি রবীন্দ্র-বিতর্কের পক্ষে-বিপক্ষে যেসব বুদ্ধিজীবী অংশগ্রহণ করেন, তাঁরা হলেন : পক্ষে : ড. মুহম্মদ কুদরত-ই-খুদা, ড. কাজী মোতাহার হোসেন, বেগম সুফিয়া কামাল, জয়নুল আবেদিন, এম. এ. বারী, অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই, অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, ড. খান সরওয়ার মুর্শিদ, সিকানদার আবু জাফর, অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, ড. আহমদ শরীফ, ড. নীলিমা ইব্রাহিম, কবি শামসুর রাহমান, কবি হাসান হাফিজুর রহমান, কবি ফজল শাহাবুদ্দীন, ড. আনিসুজ্জামান, অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম ও ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান।
- রবীন্দ্র সংগীত সাহিত্য প্রচারের বিপক্ষে : ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, এম. শাহাবুদ্দীন, মোহাম্মদ মোহর আলী, এ. এফ. এম. আবদুর রহমান, কে. এম. এ. মুনীম, মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ, আবুল মনসুর আহমদ, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খাঁ, বিচারপতি আবদুল মওদুদ, মুজীবুর রহমান খাঁ, মোহাম্মদ মোদাবেবর, কবি আহসান হাবীব, কবি ফররুখ আহমদ, ড. কাজী দীন মুহম্মদ, ড. হাসান জামান, ড. গোলাম সাকলায়েন, ড. আশরাফ সিদ্দিকী, কবি বেনজীর আহমদ, কবি মঈনুদ্দিন, অধ্যক্ষ শেখ শরফুদ্দিন, আ. কা. মু. আদমউদ্দীন, কবি তালিম হোসেন, শাহেদ আলী, আ.ন.ম বজলুর রশীদ, মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, সানাউল্লাহ নূরী, আবদুস সাত্তার, কাজী আবুল কাসেম (শিল্পী), মুফাখখারুল ইসলাম, শামসুল হক, ওসমান গনি, মফিজউদ্দিন আহমদ, আনিসুল হক চৌধুরী, মোস্তফা কামাল, মোহাম্মদ মতিউর রহমান, জহরুল হক, ফারুক মাহমুদ, মোহাম্মদ নাসির আলী, এ কে এম নূরুল ইসলাম, জাহানারা আরজু, বেগম হোসেনে আরা, মাহফুজ চৌধুরী, কাজী আবদুল ওয়াদুদ ও আখতার উল আলম। [সূত্র : মুক্তি সঙ্গ্রাম, পৃ. ১৯-২১]
১৯. মুহম্মদ সিরাজুল ইসলাম, পাকিস্তান : দেশ ও কৃষ্টি (২য় খণ্ড) প্রথম প্রকাশ মার্চ ১৯৭০ ডুম্কা দ্রষ্টব্য।
২০. বিস্তারিত জ্ঞানার জন্য দ্রষ্টব্য 'ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ ১৩৭০' ; সম্পাদক মুহম্মদ আবদুল হাই (সহকারী সম্পাদক আনিসুজ্জামান ও রফিকুল ইসলাম) ; বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বৈশাখ ১৩৭১।
২১. লেখক সংঘের সদস্যরা যে বিশেষ 'চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য' ধারণ করেছিলেন, তা তাঁদের ১৯৭১ সনের ৫ মার্চ এর 'শপথ গ্রহণ' কর্মসূচির প্রতি দৃষ্টি দিলেই উপলব্ধি করা যায়। তাঁরা এমন কাজ করেছিলেন,—যার জন্য 'শপথ গ্রহণের' প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। তাঁরা এ-ও ভেবেছিলেন, লেখকেরা অংশগ্রহণ না-করলেও জনগণ বাংলাদেশ স্বাধীন করেই ছাড়বে। জনগণ তখন নেতৃত্বের অপেক্ষা করছে না। নেতৃত্ব জনতার সংগ্রামের অনুসারী মাত্র। নেতারা পিছনে পড়ে থাকলে নেতৃত্বই চলে যায় তাঁদের। লেখক-শিল্পী-সাহিত্যিকেরাও ধিকৃত হবার ভয়ে অতীতের সকল পাপ ভুলে জনগণের সংগ্রামের সাফল্যের

শরিক হন। ‘মুক্তি সংগ্রাম’ গ্রন্থে লেখা হয়েছে ৫ মার্চ ১৯৭১ ঢাকার লেখক শিল্পীরা জনতার মুক্তি সংগ্রামের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেন এবং পরে শহীদ মিনারে গিয়ে পশথ গ্রহণ করেন। দৈনিক পাকিস্তান (৬ মার্চ ১৯৭১) পত্রিকার খবর উদ্ধৃত করে উক্ত গ্রন্থে লেখা হয় : “ঢাকার লেখক ও শিল্পীবৃন্দ পূর্ববাঙলাকে জাগ্রত বাঙালীর প্রার্থিত দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামের শপথ ও সংগ্রামী জনগণের সাথে তাঁদের একাত্মতা ঘোষণা করেছেন। গতকাল শুক্রবার বিকেলে শহীদ মিনারে এক সভায় সমবেত হয়ে হাত তুলে তাঁরা এই শপথ গ্রহণ করেছেন।... তাঁরা শপথ নিয়ে বলেন যে, অতীতের সকল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, কলহ, মতানৈক্য ভুলে গিয়ে আজ তাঁরা একে অপরের সাথে একাত্ম হয়ে এগিয়ে যাবেন সংগ্রামের সাফল্যের দিকে। লেখক ও শিল্পীরা ঢাকার তোপখানা রোডে লেখক সংঘের অফিস থেকে মিছিলে शामिल হয়ে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এসে সভা করেন।... এক প্রস্তাবে বলা হয় যে, দেশের এই রাজনৈতিক বিপর্যয়ের সময় বাঙলাদেশের লেখকেরা আর নিশ্চুপ থাকতে পারেন।। যে কারণে দেশের সর্বত্র গণআন্দোলনে সাধারণ নিরীহ নিরস্ত্র মানুষ প্রাণ দিচ্ছে, লেখক-শিল্পীরাও তার সাথে একাত্ম অনুভব করছেন।... জনাব মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী লেখক সংঘকে পরিত্যাগ করে পূর্ব বাঙলার লেখকদের ‘বাঙলা লেখক সমিতি’ নামে একটি সংস্থা গঠনের জন্য প্রস্তাব দেন।” উদ্ধৃত, মুক্তি সংগ্রাম, পৃ. ২৭৭-৭৮।

## তৃতীয় অধ্যায়

# পাকিস্তানের আদর্শে বিশ্বাসী, ইসলামী পুনর্জাগরণবাদী সরকারি ও বেসরকারি প্রধান সাহিত্যপত্রিকা

## প্রস্তাবনা

বাঙালি মুসলমানের স্বাতন্ত্র্যবাদী চেতনা সৃষ্টির জন্য প্রকাশিত, পাকিস্তান আন্দোলনের মুখপত্র এবং অসাম্প্রদায়িক মানবতাবাদী চেতনার পৃষ্ঠপোষক সাহিত্যপত্রগুলোর কয়েকটি ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে অনন্যসাধারণ ভূমিকা পালন করে। এগুলোর মধ্যে কর্মসূচি ও চিন্তাধারাতে মাত্রাগত প্রভেদ থাকলেও তখনকার সওগাত, মোহাম্মদী, মোয়াজ্জিন, আল-ইসলাহ, বুলবুল, গুলিস্তা, চতুরঙ্গ, নওরোজ এর ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সাতচল্লিশের পরেও মোহাম্মদী, সওগাত, নওরোজ, আল-ইসলাহ প্রায় গোটা পাকিস্তানি আমল জুড়ে প্রকাশিত হয়।

আজাদী লাভের পরে পাকিস্তান সরকারের তথ্য দফতর থেকে মাহেনও (এপ্রিল ১৯৪৯, চৈত্র ১৩৫৫) প্রকাশের পর থেকে আরও একগুচ্ছ পত্রিকা এগুলোকে অনুসরণ করে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই এদেশের সাহিত্য-স্রবণকে সক্রিয় ও সরব করে তোলে। এধারায় প্রকাশিত পত্রিকার মূল লক্ষ্যই ছিলো পাকিস্তানকে কল্যাণকর স্থায়ী আধুনিক রাষ্ট্ররূপে গড়ে তোলা। এই ধারার পত্রিকার দার্শনিক ভিত্তি ‘ইসলাম’ এবং জিন্নাহর ‘বিজ্ঞাতিতত্ত্ব’। তবে বিভিন্ন সাহিত্যিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংকটকালে এদের মূল আদর্শের ক্ষেত্রে অভিন্নতা দেখা গেলেও বক্তব্য এবং দৃষ্টিভঙ্গিতে বেচিত্র্য ছিল।

কোনো কোনো পত্রিকা ‘পাকিস্তান জিন্দাবাদ’, ‘কায়েদে আজম জিন্দাবাদ’ বলে পুলক অনুভব করলেও বাঙলা ও বাঙালির সাহিত্য ও সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে, সংকট কালে প্রগতিশীল দেশপ্রেমিকের উন্নত স্বচ্ছ চিন্তার পরিচয় দিয়েছিলো। যেমন সিলেটের আল-ইসলাহ, কৃষ্টি-সীমান্তর সমকালে, ১৩৫৪র কার্তিক অর্থাৎ ১৯৪৭ এর অক্টোবর-নভেম্বর মাসে বাঙলা ভাষার প্রশ্নে উর্দুর পরিবর্তে বাংলারই সপক্ষে নিঃসঙ্কোচে সমর্থন জ্ঞাপন করে মুখ্য গণতান্ত্রিক সামাজিক ভূমিকা পালন করেছিল। জাতির মনন ও চিন্তাধারার গঠনে তাই এই পত্রিকার ভূমিকা গৌণভাবে দেখা চলে না।

তবে বলাবাহুল্য, আর্থিক সামর্থ্যের কারণে এবং মফস্বল থেকে প্রকাশিত বলে, বিশেষত একটি সমিতির (‘সিলেট কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সমিতি’) মুখপত্ররূপে আত্মীকরণের ফলে, এবং মহিলা-শিশু শিক্ষানবীসদের অনেক কাঁচা লেখাও এতে প্রকাশিত হতো বলে; আর পত্রিকার আকার-আকৃতি ও মুদ্রণ-পারিপাট্য, আর্থিক ও শৈল্পিক মানের সীমাবদ্ধতার কারণে আল-ইসলাহকে খুব উন্নতমানের পত্রিকা করা সম্ভবপর হয়নি।

তবে উদ্যোক্তা ও কর্ণধারদের যত্নের আর আন্তরিকতার কোনও অভাব ছিল না। ফলে এতে যাই-ই ছাপা হোক, একালের পত্রিকার মতো অসংখ্য মুদ্রণ ত্রুটি পরিদৃষ্ট হয় না। প্রথম দিকের সংখ্যাগুলোতে মুদ্রণ প্রমাদ খুবই কম। পরের দিকে, ষাট-সত্তরের দশকে—সামাজিক-রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে এবং সাহিত্যবোধের অবক্ষয় ঘটানো বাস্তব শ্রেষ্ঠিকতকে ধরে রেখেছে বলেই এসব ত্রুটি কিছু চোখে পড়ে।

দিনাজপুরের নওরোজ ও তাই। মাহেনও, মোহাম্মদী সুপ্রতিষ্ঠিত, প্রাতিষ্ঠানিক পত্রিকা ছিল। কিন্তু অপরাপর পত্রিকা স্থায়ী, দীর্ঘজীবী এবং নিয়মিত হতে পারেনি। এক্ষেত্রে ব্যক্তিক-উদ্যোগ হিসেবে কেবল ব্যতিক্রম 'দিলরুবা'। এটি প্রায় পনের বছর চলেছিল। আর বাঙালি জাতীয়তাবাদী ও মানবতাবাদী ধারার পত্রিকা সওগাত (নবপর্ষায়ে ১৯৫২ থেকে); সমকাল (১৯৫৭); পূবালী (১৯৬০); পূর্বমেঘ (১৯৬০); পরিক্রম (১৯৬২) প্রভৃতি পত্রিকা অনিয়মিতভাবে ১৯৭০-৭১ সন পর্যন্ত ধারা বজায় রেখে প্রকাশিত হয়েছিল। তাছাড়া এদেশের আর কোনো সাহিত্য পত্রিকা নিয়মিত, দীর্ঘ জীবন নিয়ে প্রকাশিত হয়নি।

উল্লেখ্য মোটামুটিভাবে এদেশের জনগণ পাকিস্তান এর রাষ্ট্রিক কাঠামোগত স্থায়ী সত্তাকে মেনে-বুঝেই সাহিত্যিক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সকল কার্যক্রম চালিয়েছিল। ইসলাম ও পাকিস্তানের রাষ্ট্রকাঠামোর প্রতি বিরুদ্ধভাবে, 'নাস্তিকতা' এবং 'স্বাধীন বাঙলার' চিন্তা অর্থাৎ ধর্ম ও রাষ্ট্র-র আদর্শবিরুদ্ধ বিপ্লবীভাব বিক্ষিপ্তভাবে কমিউনিস্টদের (বা বামপন্থী) কোনো কোনো নেতাকর্মীর চিন্তাকর্মে বিরাজ করলেও ব্যাপকভাবে তার স্বীকৃতি ছিল না। মুসলমান বাঙালিদের প্রধান দাবি ছিল মূল লাহোর প্রস্তাবের (১৯৪০) ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসিত পূর্ববাঙলা অর্থাৎ বঙ্গনা ও শোষণহীন সৃষ্টিশীল সম্ভাবনাময় পূর্ব বাঙলার প্রতিষ্ঠা কামনা। এই প্রশ্নে ঋা প্রথমাবধি নিরপেক্ষভাবে সক্রিয় সচেতনভাবে যুক্তি প্রয়োগ তৎপর ছিলেন, তাঁদেরকে প্রগতিবাদী প্রাণসর মানবতাবাদী গণতান্ত্রিক চিন্তাধারায় গণ্য করে মূল্যায়ন করা হয়েছে।

যাঁরা একদমই পাকিস্তান সরকারের পক্ষপাণ্ডব হিসেবে সাম্প্রদায়িক, গোঁড়া, কূপমণ্ডক, ভারতবিশ্বেষী এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের অপসংস্কৃতি ও অপকর্মের সমালোচনায় প্রতিবাদে প্রতিরোধে অনুৎসাহী; পাকিস্তান সরকারের কার্যবলীকে জনসমাজে গ্রহণ করার মানসিকতা সৃষ্টির কাজে নিয়োজিত ছিলেন, অন্তত প্রগতিশীলতার আবির্ভাবকে কঠোরভাবে প্রতিরোধ করার পক্ষপাতি ছিলেন, তাঁদেরকে পাকিস্তানবাদী, ইসলামী পুনরুজ্জীবনবাদী ধারায় গণ্য করা হয়েছে।

এই শ্রেণীর অসংখ্য পত্রিকা আলোচ্যকালে প্রকাশিত হয়েছে। কোন উচ্চ আদর্শ লালন করতো না বলে অধিকাংশই কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে। তবে তৎকালে খ্যাতি অর্জন করেছিল এবং সামাজিক ভাবে কোনো না কোনো কারণে গৃহীত, অথবা ব্যাপকভাবে পঠিত হতো এমন পত্রিকার মধ্যে অবশ্যই মোহাম্মদী (১৯২৭-৭০); আল-ইসলাহ (১৯৩২-৮৩); মাহেনও (১৯৪৯-৭১); দিলরুবা (১৯৪৯-৬৪); নওবাহার (১৯৪৯-৫০); তাহজিব (১৯৫০); দূতি (১৯৪৯-৫২); পূর্ববী (১৯৬০); লেখক সংঘ পত্রিকা (১৯৬১-৬২); সলোপ (১৯৬১-৭০); উত্তর অব্বেষা (১৯৬৭-৭০) প্রভৃতির গুরুত্ব অস্বীকার করা চলে না। এই অধ্যায়ে এই সমস্ত পত্রিকার স্বরূপ উদঘাটন করা হয়েছে।

তাছাড়া কয়েকটি অপ্রধান পত্রিকা যেমন নওরোজ (১৯৪২-৭০); জাগরী (১৯৫৬); অতএব (১৯৬০-৬২); প্রবাহ (১৯৬১); দিগন্ত (১৯৬৬); অভিযান (১৯৫৪-৬৪)—এর আলোচনাও এই অধ্যায়ের শেষে সংযোজন করা হয়েছে। কারণ ওগুলো ছিলো দেশের প্রধান পত্রিকাগুলোরই প্রসূণ। কৃচিং মৌলিকত্ব চোখে পড়বে। আদর্শ ঐদের সরকারি কোপানলে পড়া নয়।

'পাকিস্তানবাদী' বলতে 'পাকিস্তানের আদর্শে বিশ্বাসী' বুঝানো হয়েছে—'পাকিস্তানবাদী' কথাটার তাৎপর্য এখানে ব্যাখ্যা করা হলো আবুল কাশেম ফজলুল হক প্রণীত 'মুক্তি-সংগ্রাম' শীর্ষক গ্রন্থ (পৃ. ৬) অবলম্বনে : 'পাকিস্তান আন্দোলনের সময়কার ও পাকিস্তানোত্তর কালের যেসব নেতা পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলের বৈচিত্র্য, স্বাতন্ত্র্য ও পার্থক্যকে অস্বীকার করে 'এক ধর্ম, রাষ্ট্র ও এক জাতি'র যুক্তি দেখিয়ে পূর্ববাঙলাকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে শোষণ ও দমন করার এবং পূর্ববাঙলার সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে সেখানে পাকিস্তানি সংস্কৃতির প্রবর্তন করার চেষ্টা করতেন, তাঁদেরকেই..পাকিস্তানবাদী বলে উল্লেখ করা হয়েছে।' পাকিস্তানবাদীর এই তাৎপর্য পাকিস্তানের আদর্শে বিশ্বাসীদের বেলায় প্রযোজ্য।

## ১. মোহাম্মদী (১৯০৩-১৯৭০)

মাসিক মোহাম্মদী ও তার সম্পাদক মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ (১৮৬৮-১৯৬৮) সম্পর্কে অধিক বিবৃতি নিশ্চয়োজন। তাঁর সম্পর্কে কমবেশি সকলেই অবহিত। তাঁর নাম জানে না, এমন শিক্ষিত বাঙালি খুঁজে পাওয়া ভার। তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা যুগে যুগে মুসলমানদের পথের দিশা দিতে সচেষ্ট ছিল। পাকিস্তান আন্দোলনে মাসিক মোহাম্মদীর আপোষহীন ভূমিকার কথা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে।

মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ ১৯৪৮ সনে কলকাতা থেকে ঢাকা আসেন। তখনও তিনি প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি। এবং বলাবাহুল্য তখন পাকিস্তানের রাষ্ট্রক্ষমতায় মুসলিম লীগের মওলানা আকরম খাঁদের ডানপন্থী গ্রুপই অধিষ্ঠিত। এই গ্রুপের অন্যতম প্রধান নেতা মনে রাখতেই হবে, মোহাম্মদীর মালিক-সম্পাদক আকরম খাঁ। অতএব মোহাম্মদীর ভূমিকা পাকিস্তান আমলে কি হবে বা হতে পারে তা কিছুটা সহজেই অনুমেয়। তবে স্মরণ রাখা দরকার পাকিস্তান অর্জনের পূর্ব পর্যন্ত পাকিস্তান প্রত্যাশী জনগণের নিকট ‘পাকিস্তান’ ছিল স্বপ্নের স্বর্গরাজ্য প্রাপ্তির মতো একটি বড় আকাঙ্ক্ষার বাস্তব স্বরূপ। মোহাম্মদী সেই স্বপ্ন কল্পনার বাস্তবায়নে ছিল নিরাপোষ।

অতএব মুসলিম জাতীয়তাবাদের জাগরণের কালের মোহাম্মদী (১৯২৭-১৯৪৭)র সঙ্গে স্বাধীনতা পরবর্তীকালের (১৯৪৭-৭০) মোহাম্মদীর বৈশিষ্ট্যে চরিত্রে, মেজাজে, ভাষায়, বক্তব্যে ও আদর্শ ব্যাখ্যানের গাভীরের বিচারে দুটি কালে, দুটি যুগে অথবা দুটি পর্যায়ে বিভক্ত করে দেখাই সঙ্গত।

উপর্যুক্ত বিচারে সাতচল্লিশ পূর্ববর্তী মাসিক মোহাম্মদী বাঙালি মুসলমানের জাগরণের বা উজ্জীবনের এবং স্বাধীনতা-সংগ্রামের জ্বলন্ত এক প্রতীক। আর সাতচল্লিশ পরবর্তী মাসিক মোহাম্মদী অবক্ষয়ের, আর পূর্ব বাঙলার জনগণের ন্যায্য অধিকার আদায়ের প্রতিবন্ধক,—বাঙালির প্রগতিশীল চিন্তা কর্ম ও আন্দোলনগুলোর বিপক্ষে প্রতিরোধে সোচ্চার, মূর্ত প্রতিক্রিয়ার স্বাক্ষর। অবশ্য একথা ভুললে চলবে না যে, মোহাম্মদী পত্রিকার স্বভাবজাত যে সাহিত্যিক উচ্চমান ছিল, তার কারণেই প্রতিক্রিয়ার ভাষা মোলায়েম থেকেছে।

মওলানা আকরম খাঁর সহজাত যুক্তিবাদিতা আর মোহাম্মদী সংশ্লিষ্ট কর্মী কর্মচারীরাও সাধারণ, নিম্ন বা নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের লোকেরাই ছিলেন বলে পাকিস্তান সরকারের পক্ষাবলম্বন করতে গিয়েও তাঁরা একেবারে ভুলে যেতে পারেননি জনগণের অর্থাৎ নিজেদের ন্যায্য স্বার্থকে এবং মনে রয়েছে সবসময়ই যে, তাঁরাও পূর্ববাঙলার অধিবাসী; মাতৃভাষা তাঁদের বাঙলা। শিক্ষার মাধ্যম বাঙলা হলে লাভ-ক্ষতি কি—তা কেউ কেউ বুঝতে না-পারলেও অনেকেই বিস্মৃত হতে পারেননি। বাঙলা ও বাঙালির স্বার্থে অনেক যুক্তিসিদ্ধ কথা তাই মোহাম্মদী লিখেছে, এবং নিয়মিত ব্যাপক সাকুলেশনের ঐতিহ্যবাহী মাসিক মোহাম্মদীর প্রভাব জনমনে অবশ্যই পড়েছে। বিশেষত আকরম খাঁর মুসলিম লীগ ত্যাগ (১৯৫৪) বা

সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ (১৯৬২) এবং মৃত্যু পরবর্তী (১৯৬৮) সংখ্যাগুলোর রচনা নির্বাচনে কিংবা সম্পাদকীয় বক্তব্য ও চারিত্র্য নির্ধারণ করতে গেলে খুব বেশী প্রতিক্রিয়াশীল পত্রিকা হিসেবে মোহাম্মদীকে চিহ্নিত করা চলে না।

মোহাম্মদীর একমাত্র সীমাবদ্ধতা, এটা ধর্মীয় এবং পাকিস্তানবাদী পত্রিকা ছিল। যে কোনো অবস্থাতে দুই পাকিস্তানের একে ঐরা বিশ্বাস করতেন। য়ারাই পূর্ব বাঙলার স্বাধীকার-স্বায়ত্তশাসনের কথা বলেছেন, তাঁদেরকেই ভেবেছেন তাঁরা হিন্দু-বাঙলার সঙ্গে আঁতাতকারী। মোহাম্মদী হিন্দু-বাঙালিদের বড় বেশি ভয় করতেন (নাকি ঈর্ষা?)। তবে হিন্দু লেখকদের অনেক লেখাই দুই পর্বের মোহাম্মদীতে ছাপা হয়েছে। তবে পাকিস্তান আমলে সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়ের মত হিন্দু-গবেষকেরা বাঙলার সাহিত্য সংস্কৃতিতে মুসলিম অবদান বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন। বামপন্থী বদরুদ্দীন উমর, কিংবা যুক্তিবাদী প্রগতিশীল লেখক ড. আহমদ শরীফও মোহাম্মদীতে লিখেছেন। অবশ্য এগুলোর বিষয়বস্তু মুসলিম ঐতিহ্য। এবং মধ্যযুগের মুসলিম রচিত সাহিত্য নিয়ে গর্ব প্রকাশ এবং প্রকৃত সত্য তুলে ধরে প্রমাণ করা যে মুসলমানরাও ঐতিহ্যে, ইতিহাসে, কর্মে হীন নয়। ভূঁইফোড়তো নয়ই। অতএব শিকড় সন্ধানই মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব বাঙলার তৎকালীন প্রায় তাবৎ লেখকের।

মোহাম্মদী ১৯২৭ সন থেকে ১৯৪৭ সনের নভেম্বর পর্যন্ত কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়েছে। কলকাতা থেকে প্রকাশিত শেষ সংখ্যার সূচক ২১ বর্ষ, ১ সংখ্যা, কার্তিক ১৩৫৪। সম্পাদকের নিবেদনে বলা হয়, আশা করা গিয়েছিল যে একবিংশ বর্ষ মোহাম্মদী ঢাকা থেকে প্রকাশিত হবে। কিন্তু নানা প্রতিকূলতার কারণে তা সম্ভব হয়নি। কলকাতা থেকেই একবিংশ বর্ষের প্রথম যাত্রা আরম্ভ সংখ্যা প্রকাশ করতে হয়। কিন্তু একবিংশ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা পুরো দু'বছর বন্ধ থাকার পর ১৩৫৬-র অগ্রহায়ণ মাসে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। স্বাধীনতা প্রাপ্তির (১৪ আগস্ট ১৯৪৭) পর কলকাতা থেকে প্রকাশিত মোহাম্মদীর ২১ বর্ষের ১ সংখ্যার সম্পাদকের নিবেদনে বলা হয়েছিল :

আজি হইতে ২৫ বৎসর পূর্বে মোহলেম বাঙলার জ্ঞান বিশ্বাস, সংস্কার ঐতিহ্য এবং তাহার সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে আরম্ভ করিয়া দেওয়া হয় একটা গুরুতর রকমের সাংস্কৃতিক অভিযান। সুযোগ ও সুসময় মনে করিয়া মোহলেম সমাজের পঞ্চমবাহিনীও এই অভিযানে সহায়তা করার জন্য পূর্ণ উদ্যমে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া পড়েন। ২০ বৎসর পূর্বে মাসিক মোহাম্মদীর আবির্ভাব হইয়াছিল, প্রধানত এই অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইবার জন্য। ... যতটা পারিয়াছি, করিয়া আসিয়াছি। ... আজ আবার ডাক আসিয়াছে— মুক্ত-ভারতে মুক্ত এছলামকে প্রতিষ্ঠা করার একটা অভূতপূর্ব সুযোগ ও সম্ভাবনা আজ আমাদের সাম্মুখে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে হইবে। পাকিস্তানের বহু প্রকার ভিত্তি সম্বন্ধে সংবাদ-পত্রে বহু জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। হওয়ার দরকারও আছে খুবই। কিন্তু দুঃখের সহিত ইহাও বলিতে হইতেছে, এগুলি আনুমানিক উপকরণ হইলেও, পাকিস্তানের মৌলিক ভিত্তি ইহার কোনটাই নয়। আমার জ্ঞান-বিশ্বাস মতে পাকিস্তানের মূলভিত্তি হইতেছে মনস্তাত্ত্বিক। মুছলমানের মন ও মস্তিষ্কে, এমন একটা পুলক, এমন একটা প্রেরণা এবং এমন একটা ভাবাবেগ জাগাইয়া তুলিতে হইবে, যাহার অপরিহার্য নির্দেশে বাঙলার মুছলমান আদর্শ-সাধনার জন্য যে-কোন ত্যাগ স্বীকারে স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে প্রস্তুত হইয়া যাইবে—মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি বলিতে মোটামুটিভাবে এই জিনিসটাকেই বুঝাইতে চাহিয়াছি।

পাকিস্তান আমলে মাসিক মোহাম্মদী 'পাকিস্তানের মনস্তাত্ত্বিক-ভিত্তি প্রস্তুতের' সাধনায় লিপ্ত হয়েছিল। কিন্তু বলাবাহুল্য, মোহাম্মদীর সে উদ্দেশ্য ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। পাকিস্তান টিকে থাকেনি। বাঙালির চিন্তাধারাতে কিংবা মন-মানসে 'মনস্তাত্ত্বিক-ভিত্তি' গড়ে ওঠেনি। দিন যতো গেছে, ততোই বাঙালি জাতীয়তাবাদী ভাবের বা বোধের জাগরণ ঘটেছে। ধ্বংসে পড়েছে পাকিস্তানের 'মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি'। এবং আশ্চর্য না-হয়ে উপায় নেই, মোহাম্মদী সেই পরিবর্তনের চিহ্নকেও ধরে রেখেছে।

১৯৬৮ সনের পরে, মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর মৃত্যুর কারণেই হোক, অথবা পূর্ববঙ্গে আইউব-বিরোধী তথা পাকিস্তান-বিরোধী আন্দোলন জাগৃত হবার ফলেই হোক, কিংবা ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে গিয়েই হোক—'রূপান্তরের মুখে' যে বাঙলা ও বাংলা সাহিত্য এসে পড়েছে—সেই কথা নিয়ে জোরালো ভাষার যুক্তিসিদ্ধ প্রবন্ধও তখন মোহাম্মদীতে কিছু প্রকাশিত হয়েছিল। তাছাড়া মোহাম্মদীর ২২ বছরের (১৯৪৯-৭০) সকল সংখ্যাতেই পাওয়া যায় পশ্চিম পাকিস্তানিদের অবিশ্বাসের সমালোচনা এবং পশ্চিম পাকিস্তানি কর্তৃক পূর্ববঙ্গের লোকদের অবিশ্বাস করা যে ঠিক নয়, মোহাম্মদী বারে বারে সে-কথাও বলতে চেয়েছে বিভিন্ন প্রসঙ্গে। ফলে মোহাম্মদীর পাতাগুলো পাকিস্তান কালের সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক এবং সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক ঘটনাবলির বিশ্বস্ত দলিলরূপে আজও মূল্যবান বিবেচিত হবে।

দৃষ্টিভঙ্গিতে পার্থক্য আছে, অনেক ব্যাপারে নিরবতা অবলম্বনের অকপট পরিচয় আছে—তবুও বহু ঘটনার সাক্ষী মাসিক মোহাম্মদী। মাসিক পত্রিকা মোহাম্মদী আকার আকৃতি ও বিষয়-বৈচিত্র্যের নানা পরিবর্তনের মধ্যদিয়েও পাকিস্তান-শাসনাধীন পূর্ববাঙলার সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক—তথা সামাজিক অগ্রগতি বা রূপান্তর-পরিবর্তনের চিত্র শোভিত বর্ণাঢ্য উপহার দিতে সার্থক হয়েছে।

মোহাম্মদীর সম্পাদকীয় বিভাগে অনেকে সহযোগী হিসেবে কাজ করলেও মোটামুটিভাবে মওলানা আকরম খাঁর নামই সম্পাদক হিসেবে ছাপা হয়েছে। মাঝে মধ্যে দু'এক সংখ্যাতে সম্পাদক হিসেবে আজাদ-মোহাম্মদী গোষ্ঠীর কোনো প্রধান ব্যক্তিত্বের নামও ছাপা হতে দেখা গেছে। মোহাম্মদীর ২৯ বর্ষ ১ম কার্তিক ১৩৬৪ সংখ্যায় সম্পাদক হিসেবে নাম ছাপা হয় মুজিবুর রহমান খাঁ-র। ২১ বর্ষ প্রথম সংখ্যা কলকাতা থেকে আবদুল হাকিম খান কর্তৃক মোহাম্মদী প্রেস থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছিল। সাতচল্লিশ পরবর্তীতে আবদুল হাকিম খান কর্তৃকই 'আজাদ প্রেস' রমনা, ঢাকা-২ থেকে প্রকাশিত হয়েছে। প্রায় দশ বছর পর ৩১ বর্ষ ৮ম, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৭ সংখ্যা প্রকাশিত ও মুদ্রিত করেন মোহাম্মদ বদরুল আনাম খাঁ। আকরম খাঁর মৃত্যুর পর (১৯৬৮) মোহাম্মদীতে সম্পাদক হিসেবে নাম ছাপা হয় মোহাম্মদ বদরুল আনাম খাঁর। ১৯৭০ সনের নভেম্বর-ডিসেম্বর (অগ্রহাণ ১৩৭৭) মাসে প্রকাশিত শেষ ৬৮তম বর্ষ : ৮ম সংখ্যার প্রকাশক ও মুদ্রকও ছিলেন মোহাম্মদ বদরুল আনাম খাঁ। সাধারণত প্রচ্ছদ শিল্পীর নাম মোহাম্মদীতে উল্লেখ করা হতো না। ৩৪ বর্ষ ৬ষ্ঠ, চৈত্র ১৩৬৯ সংখ্যায় লেখা হয় প্রচ্ছদশিল্পী আবদুল হাই এবং অঙ্গসজ্জায় হাশেম খান।



১৯৪৭-৭০ সময়ে (যুগ্ম সংখ্যা আছে অনেক) মোহাম্মদী সাড়ে একশ বর্ষের মতো (২১ বর্ষ ২ সংখ্যা :  $২১ \times ১২ + ২ = ২৫৪$  সংখ্যা) প্রকাশিত হয়েছে। এর আগে কলকাতা থেকে বিশ বছর পুরো নিয়মিত (কাগজ সংকটে মাঝেমাঝে আকার আকৃতি ছোট করতে হয়েছে, বিজ্ঞাপন, কভার নিউজপ্ৰিন্টে ছাপতে হয়েছে) প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু মোহাম্মদী শেষের দিকে হঠাৎ করে সিদ্ধান্ত নেয় যে 'বাংলা বর্ষ' শুরু হয় বৈশাখ থেকে। কিন্তু এতদিন ধরে 'মাসিক মোহাম্মদী'র বর্ষ শুরু হয়ে আসছিল কার্তিক থেকে। "এবার থেকে আমরাও আল্লাহর মর্জি বৈশাখ মাস থেকেই আমাদের বর্ষ শুরু করব। তাই গত আশ্বিন মাসে পূর্বতন হিসাব অনুসারে বর্ষ শেষ হলেও আগামী চৈত্রমাস পর্যন্ত একই বর্ষে (৩৯ বর্ষ) আমাদের অবশিষ্ট ছয়টি সংখ্যা প্রকাশিত হবে।" এই সিদ্ধান্ত ছাপা হয়েছিল ৩৯ বর্ষ ১৩-১৪ যুগ্মসংখ্যার শেষ পৃষ্ঠায় (অগ্রহায়ণ ১৩৭৫)। এভাবে ৩৯ বর্ষ ১৮ সংখ্যা প্রকাশের পর মোহাম্মদী বৈশাখ ১৩৭৬ সনে প্রকাশিত করে তার ৬৭ বর্ষের প্রথম সংখ্যা। এভাবে বর্ষ শেষ করে বৈশাখ ১৩৭৭ এ ৬৮ বর্ষ প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ৬৮ বর্ষ অষ্টম সংখ্যা অগ্রহায়ণ ১৩৭৭ সনে প্রকাশিত হয়। ডিসেম্বর ১৯৭০ সনের সাধারণ নির্বাচনে স্বাধীন বাংলাদেশের সকল সম্ভাবনা পরিস্ফুট হয়ে ওঠার পর আর মোহাম্মদী প্রকাশের কোনো সার্থকতা ছিল না। এর দুমাস ২৪দিন পরই বাংলাদেশ বীর-বিক্রমে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

মোহাম্মদী ৬৭ বর্ষ শুরু করেছিল ১৯০৩ সনে 'মাসিক মোহাম্মদী' নামে আকরম খাঁর সম্পাদকত্বে প্রকাশিত পত্রিকার বর্ষক্রম অনুসারে। আকরম খাঁর মৃত্যুর পরে ঐতিহ্যবাহী বংশধররা তাঁদের অবদানকে দীর্ঘতর ও মহীয়ান করে তোলার জন্য এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানের পূর্বক্ষেণে 'বাঙালী' হয়ে বাংলা নববর্ষে মোহাম্মদীর বর্ষ আরম্ভ করার প্রবণতাও লক্ষণীয়। প্রসঙ্গত বিভাগ পূর্ববর্তীকালের নিয়মটিও স্মরণ করা যেতে পারে। ১৩৫৪-র অগ্রহায়ণ থেকে ১৩৫৬-র কার্তিক পর্যন্ত পুরো দু'বছর বন্ধ থাকার পরও একশ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যাই বের হলো ১৩৫৬ সনের অগ্রহায়ণে। এখানে ইতিহাস লম্বা করার প্রবণতা নেই। বরং খাটো করেও গ্রাহকদের জন্য সংখ্যার হিসাব ঠিক রাখা হয়েছে? কিন্তু মূল মোহাম্মদী ১৯২৭ সনে প্রকাশিত হলেও ১৯০৩ সনে প্রকাশিত স্বপ্নামু মোহাম্মদীকে প্রাস্ত ধরে সন গণনা করা ঠিক হয়নি। কারণ ১৯২৭ সনের পূর্বে বস্তুতপক্ষে গণনা করার মতো মোহাম্মদীর ঐতিহ্য সৃষ্টি হয়নি। ১৯০৩ সনে আকরম খাঁর সম্পাদনায় কয়েক সংখ্যা মোহাম্মদী প্রকাশিত হলেও ১৯২৭ সনে প্রকাশিত মোহাম্মদীর আয়োজন ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং চরিত্র নতুন। তাছাড়া ১৯২৭ সালে মোহাম্মদীর প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যার প্রকাশ করে ৩৯ বছর চালানোর পর এই সব ওলোট-পালট সঙ্গত হয়নি। এমন ভিন্নমতি সওগাত এর ক্ষেত্রেও ঘটে। ৩৯ বর্ষ দ্বাদশ সংখ্যার পরে গণনায় ৩৯ বর্ষ ১৩ সংখ্যাকে ৪০ বর্ষ প্রথম সংখ্যা বিবেচনা করলে যে-সংখ্যা ৬৮তম বর্ষ ৮ম সংখ্যারূপে প্রকাশিত হয়েছে, সে সংখ্যার গায়ে লেখা থাকতো ৪২শ বর্ষ ২য় সংখ্যা। সেই হিসেবে মোহাম্মদী বছরে ১২টি ধরে মোটামুটি ৪২ বছরে  $৪২ \times ১২ + ২ = ৫০৬$  সংখ্যার মত প্রকাশিত হয়। ৬৭ আর ৬৮ যাই-ই লেখা হোকনা কেন।

১৯৬৮ সনের আগে একুশে ফেব্রুয়ারি উদযাপনের সংবাদ ছাপা হয়েছে বলে জানি না। ফাল্গুন ১৩৭৪ সংখ্যায় শহীদ দিবসের বিবরণ ও মন্তব্য প্রকাশ করা হয়েছে। কার্তিক ১৩৭১ (৩৬ বর্ষ প্রথম) সংখ্যা থেকে পত্রিকার চারিত্র বর্জন বা পরিবর্তন করে আজাদের ‘মুকুলের মহফিল’ বাগবানের নেতৃত্বে মোহাম্মদীতেও চালু করা হয়। বিভাগ পূর্ববর্তী মোহাম্মদীতে আকার অনুযায়ী পঠন সামগ্রী ছিল প্রচুর। সিনেমার নায়িকাদের ছবি ছাপা হতো না। শিশু বা মহিলাদের জন্যও কোন বিশেষ বিভাগ ছিল না। কিন্তু ১৯৬০ এর দশক থেকে পত্রিকার চাহিদা বৃদ্ধি বা পাঠক আকৃষ্ট করার জন্য নানান কৌশল অবলম্বন করা হয়। প্রথম থেকেই ‘চিন্তাধারা’ শীর্ষক বিভাগে বিভিন্ন লেখকের মন্তব্য অনেকটা বিতর্কের ন্যায় প্রকাশ করা হতো। ‘সংকলন’ বিভাগে মাঝে মাঝেই বিভিন্ন পত্রিকা অথবা মোহাম্মদীর পুরাতম সংখ্যা থেকে পুনর্মুদ্রণ অথবা সংকলন করা হতো। ২৪ বর্ষ প্রথম সংখ্যা থেকে ‘আন্তর্জাতিক পাঠাগার’ শীর্ষক বিভাগ নতুন খোলা হয়। বিদেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, ইত্যাদির পরিচয়, সাম্প্রতিক ঘটনা, বিশেষ বিশেষ সম্মেলন প্রভৃতি সম্পর্কে ছোট ছোট সম্পাদকীয় ধরনের লেখাও প্রকাশ করা হতো।

৩০ বর্ষ অষ্টম সংখ্যা থেকে ‘খেলাধুলা’ বিভাগ চালু করা হয়। দুই পাকিস্তানের বৈষম্য খেলার ক্ষেত্রেও যে কতোটা প্রকট, তা এবং পাকিস্তানি খেলার মাঠের পরিচয় এখানে পাওয়া যায়। ২৯ বর্ষ প্রথম সংখ্যা থেকে চালু করা হয় ‘মাসের খবর’। ৩৪ বর্ষ প্রথম সংখ্যা থেকে শুরু করে বিভিন্ন ব্যক্তি-পরিচয়, বন্যাদুর্গতদের এবং প্রখ্যাত বিভিন্ন শিল্পীদের আঁকা ছবি, বিচিত্র বিশ্ব সংবাদ প্রকাশের জন্য ‘পাঁচরঙা’ নামের বিভাগ খোলা হয়। ৩৬ বর্ষ ১৩৭১ থেকে মুকুলের মহফিল ও মহিলা মহফিল এর সঙ্গে ‘ফিল্মিস্তান’ খুলে সিনেমার সচিত্র রসাত্মক আলোচনা প্রকাশ করা হয়। এতে দীর্ঘদিনের মোহাম্মদী-চারিত্রে চলচ্চিত্রশিল্পের প্রভাব, তথা চিত্রাঙ্গী-পরবর্তীকালের পাকিস্তানি সংস্কৃতিক অঙ্গনে সিনেমা পত্রিকার দাপট সম্পর্কেও ধারণা জন্মে। সকল সাহিত্য পত্রিকায়ই সিনেমা জায়গা করে নিয়েছিল। এসব ছাড়া সাহিত্য পত্রিকা কেউ কিনতো বা পড়তো বলে মনে হয় না। ৬০ এর দশকে এসে ‘সম্পাদকীয়’ লেখা বন্ধ হয়। ৩২ বর্ষ নবম সংখ্যায় সম্পাদকীয় লেখার পর আর সম্পাদকীয় নেই। ক্রমান্বয়ে ভালো ও প্রধান লেখক ও কবি-সাহিত্যিকেরা মোহাম্মদীতে অনুপস্থিত থাকতে শুরু করেন। অজ্ঞাত, অপরিচিত, নতুনদের আগমন হচ্ছে। প্রতি সংখ্যায় লেখক ও লেখার বিষয়-বৈচিত্র্য কমে আসছে? আগে বহু বিষয়ে ছোট ছোট লেখা হরেক রকমের শিরোনামে প্রকাশ করা হতো। কিন্তু ষাটের দশক থেকে লেখক ও বিষয়বস্তু চোখে পড়ার মতো কমে আসে।

প্রণয়-কাতর নায়িকাদের ছবি, মহিলা, শিশু ও কিশোরদের জন্য বিচিত্রবিষয় ধারণ করে বারোয়ারী পত্রিকা হয়ে মোহাম্মদী ক্রমে ধার ভার এবং লক্ষ্যভেদী তিক্ততা নষ্ট করে ফেলে। ষাটের দশকে তাই প্রধান লেখকেরা সমকাল, পূর্বমেঘ, পূবালী, পরিক্রম ইত্যাদিতে লিখতে পারলে যতটা আত্মপ্রসাদ বা সন্তুষ্টি অনুভব করতেন, এগুলোতে তেমন নয়। তবে অধিকাংশ লেখকই পয়সার জন্য সব পত্রিকাতেই লিখতেন। কারো কারো বাসনা ছিল বহুল প্রচারিত পত্রিকায় ছেপে তাঁর বক্তব্যকে ব্যাপক জনসমক্ষে তুলে ধরার। তাছাড়া সকল

পত্রিকার লেখা নিজস্ব বা মনোনীত প্রিয় কতিপয় লেখকতো থাকেনই। মোহাম্মদীতেও ছিলেন পাকিস্তানপন্থী ইসলামি ধারার এক বিরাট লেখকগোষ্ঠী। তাঁদের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন বিভিন্ন সময়ে ভিন্নমত পথের অধিকারী লেখকেরাও।

## ২. মোহাম্মদীর রচনা-পরিচয়

২. ক. কবিতা : মোহাম্মদীতে প্রকৃত কবি ছাড়াও অনেক অকবিও কবিতা লিখেছেন। প্রবন্ধ-গল্প লিখিয়েরা এবং ‘অধ্যাপক’ (কলেজ-মাদ্রাসার শিক্ষক বলতেই অধ্যাপক?) বৃন্দ অনেক কবিতা লিখেছেন। মোটামুটিভাবে মোহাম্মদীতে কবিতা লিখেছিলেন তৎকালের সকল সক্রিয় লেখকেরাই। যেমন, বেগম সুফিয়া কামাল, শোএব আহমদ, শাহেদা খানম, শাহাদৎ হোসেন, তালিম হোসেন, নুরুন্নাহার, হাবীবুর রহমান, মুফাখখারুল ইসলাম, আলাউদ্দীন আল আজাদ, সিকানদার আবু জাফর, কাজী আবুল হোসেন, শামসুদ্দীন, জসীমউদ্দীন, সুফী মোতাহার হোসেন, কে. এম. শমসের আলী, আশরাফ সিদ্দিকী; কাদের নওয়াজ, সিদ্দিক আহমদ খান, সৈয়দ বেলায়েত হোসেন চৌধুরী, শ্রী নরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, আহসান হাবীব, কবির আহমদ, মমহারুল ইসলাম, মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম, শশীভূষণ দাস, আজিজুর রহমান, বেনজীর আহমদ, ছদরুদ্দীন, নূর মোহাম্মদ, সায়মা চৌধুরী, আ. ন. ম. বজলুর রশীদ, বন্দে আলী মিয়া, লতীফা রশীদ, মোহাম্মদ আজিজুল হক, মমতাজুর রহমান, রওশন ইজদানী, আবদুর রশীদ খান, বদরুল হাসান, চৌধুরী ওসমান, মতিউল ইসলাম, রথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী, শ্রী মনোমোহন বর্মণ, শ্রী করুণাময়ী বর্মণ, আবদুর রউফ, মঈনুদ্দীন, নেয়ামাল বাসির, সৈয়দ আলী আহসান, কাজী হাসান ইমাম, আলী আসগর, এইচ. এম. আজিজুর রহমান, আনোয়ারা বেগম প্রমুখ।

অনেক কবিতা আছে ‘মহিলা মহল’ ও ‘মুকুলের মহফিল’ এ। এই দুই বিভাগে প্রকাশিত সকল কবিতা/পদ্য/ছড়ার রচয়িতাদের তালিকা উপস্থাপন পাঠকদের জন্য ক্লাস্তিকর হতে বাধ্য। (কিন্তু কেউ কেউ শুনতে আগ্রহী হতে পারেন। তাঁদের জন্য রচিত বিস্তৃত সূচিপত্রের বই, বাংলা একাডেমী প্রকাশিত (১৯৯৯) ‘পূর্ববাঙলার সাময়িকপত্র’ দেখা যেতে পারে।)

তবে সাহিত্যিক মানের বিচারে কবিদের তালিকায় এদের অধিকাংশই স্থান পাবার উপযুক্ত নয়। যারা কবিতা লিখেছিলেন মোহাম্মদীতে তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন না তখনকার বাংলার প্রকৃত কবি। কবিতা অনেক অনূদিতও হয়েছে। ধর্মীয়ভাব ও রসের একজন প্রধান অনুবাদক আবদুস সান্তার খলীল জীবরান এবং অসংখ্য আরবী কবির কবিতা অনুবাদ করে মোহাম্মদীতে প্রকাশ করেছেন।

২. খ. উপন্যাস : সাতচল্লিশ-সত্তর সময়কালে প্রকাশিত মোহাম্মদীর পৃষ্ঠায় দূচারটে অনূদিত বড় গল্প বা উপন্যাস ছাপা হলেও মৌলিক বাংলা উপন্যাসও বেশ কিছু প্রকাশিত হয়েছে। কোনো কোনো উপন্যাস বাংলাদেশের সাহিত্যের ইতিহাসে ঐতিহাসিক অথবা শৈল্পিক যেকোনো কারণেই হোক—কিছুটা স্থায়ী অথবা অন্তত উচ্চমূল্য লাভ করেছে

সন্দেহ নেই। আবুল মনসুর আহমদের ‘আবে হায়াত’ (৩৪ বর্ষ ৩য় ও তৎপরবর্তী কয়েক সংখ্যায়) ; আবু রুশদ এর ‘নোঙর’ (৩৬ বর্ষ ৮ ও তৎপরবর্তী সংখ্যাগুলোতে) এবং ইব্রাহীম খাঁর ‘বাতায়ন’ (২৬ বর্ষ ৪ ও তৎপরবর্তী কতিপয় সংখ্যায়) প্রভৃতি একালের মোহাম্মদীর পৃষ্ঠাতেই ছাপা হয়েছিল। আরও যেসকল উপন্যাস অথবা উপন্যাসধর্মী রচনা আলোচ্যকালের মোহাম্মদীতে ছাপা হয়েছিল—তার কতিপয় হলো : শওকত ওসমান—ধূলিজাল (২১ বর্ষ ১ ও তারপর) ; আজহারুল ইসলাম—মনিরার বিরাগ (২১ বর্ষ ৭ থেকে ক্রমশ) ; আশরাফ উজ্জামান—সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত (২২ বর্ষ ১ থেকে ক্রমশ) ও কালোছায়া (২৬ বর্ষ ১ম থেকে ক্রমশ) ; রওশন ইজদানী—আল্লাহর অসি (২৩ বর্ষ ৩ থেকে ক্রমশ) ; আহসান হাবীব—জাফরানী রঙ পায়রা (২৪ বর্ষ ১ থেকে ক্রমশ) ; হামেদ আহমদ—প্রবাহ (২৫ বর্ষ ১ থেকে ক্রমশ) ; আবুল কালাম শামসুদ্দীন—স্বর্ণাধারা (২৬ বর্ষ ১ থেকে) ইত্যাদি।

তাছাড়া এলিজাবেথ পেজ এর রচনা থেকে ‘মুক্তি মুখর’ শিরোনামে একটি উপন্যাস অনুবাদ করেন সাহানা বেগম (২৯ বর্ষ ২ সংখ্যার পরও চলে) ; আর স্যার ওয়াল্টার স্কট থেকে মওলা বঙ্গ অনুবাদ করেন ‘সার্জন কন্যা’ (৩১ বর্ষ ৫ থেকে)।

২.গ. নাটক/গীতিনাট্য : মোহাম্মদীতে গীতিনাট্য খুব বেশী প্রকাশিত হয়নি। কে.এম. শমসের আলী ‘গীতিনাট্য’ শিরোনামে লিখেছিলেন—‘গাঁয়ের পথে’ (২১ বর্ষ ৩ সংখ্যায়) চৌধুরী মোহাম্মদ গোলাম আকবর সাহিত্যভূষণ অনেকগুলো গ্রাম্য গীতিনাট্য বা নকশা সংগ্রহ করে মোহাম্মদীতে (৩০ বর্ষ ১, ২, ৩, ৪, ৫ সংখ্যা ও তারপর) প্রকাশ করেছিলেন। আরও কয়েকটি নকশা প্রকাশিত হয় যেমন ওসমান গনির ‘তালাক’ (৩৪ বর্ষ ২ সংখ্যা) ; আ. ন. ম. বজলুর রশীদের কাব্যনাটিকা—‘মারুই মারুর কন্যা’ (৩৪ বর্ষ ৭ সংখ্যা) এবং মালিহা কোরেশীর নকশা—‘দৈনন্দিন’ (৩৪ বর্ষ ১২ সংখ্যা)। তাছাড়া সবই একাক্ষিকা বা ‘একাক্ষ-নাটক’ অথবা সম্পূর্ণ নাটিকা বা নাটক।

যাঁরা নাট্যরচনায় মোহাম্মদীতে অংশগ্রহণ করেছিলেন—তাঁরা হলেন : আবু জাফর শামসুদ্দীন—শনিগ্রহ ও পৃথিবী (২১ বর্ষ ৩ থেকে ক্রমশ) ; নেয়ামাল ওয়াকিল—স্পেন বিজয় (২২ বর্ষ ১০ সংখ্যা ; আকবরউদ্দীন—নাদির শাহ (২৪ বর্ষ ১ থেকে ক্রমশ) ; সিকান্দার আবু জাফর—অভিযাত্রী (২৪ বর্ষ ৪ থেকে) ; জহুরুল আলম—মিসেস এম. রহমান (ছোটনাটিকা—২৪ বর্ষ ৫ সংখ্যা) ; আবুল কালাম শামসুদ্দীন—আশিয়ানা (২৫ বর্ষ ১ সংখ্যা)। আবদুল হক রচনা করেন একাক্ষিকা—‘দেওয়াল’ (২৫ বর্ষ ৩ সংখ্যা) ইত্যাদি। এরস্কিন কডওয়েল এর নাটক থেকে ‘একটি ছোট দিন’ অনুবাদ করেছিলেন আবদুল মান্নান সৈয়দ (৩৬ বর্ষ ৩য় সংখ্যায়)। জঁয় পল সাঁত্রের থেকে নাট্যানুবাদ করেছিলেন জিয়া হায়দার ও আতাউর রহমান ‘দ্বাররুদ্ধ’ শিরোনামে (৩৯ বর্ষ ১৮ সংখ্যা চৈত্র ১৩৭৫)। মোহাম্মদী তৎকালীন প্রধান নাট্যরচয়িতাদের সাহিত্যকর্ম ছাপতে পেরেছিল এটা অনুধাবন করা যায়।

২.ঘ. পুস্তক-সমালোচনা : পুস্তক সমালোচনা বিভাগে আলোচিত হয়েছে অনেক বই। তবে সব সংখ্যায় পুস্তক সমালোচনা প্রকাশ করা হয়নি। সিরিয়াস সাহিত্যালোচনার মর্যাদা দেয়া যায় এরকম পুস্তক-সমালোচনা খুব কম আছে। অধিকাংশই দশ, বারো বা পনের

লাইনের সর্বোচ্চ এক পৃষ্ঠার আলোচনা। বিভিন্ন সংখ্যায় আলোচ্য কয়েকটি পুস্তক সমালোচনার কথা উল্লেখ করা হলো :

মতিউল ইসলাম প্রণীত ‘মাটির কান্না’; আ. কা. শ. নূর মোহাম্মদ প্রণীত কবিতার বই ‘আজান’; সিকানদার আবু জাফর প্রণীত উপন্যাস ‘নতুন সকাল’ (২১/১), নাজিরুল ইসলাম সুফিয়ান প্রণীত ‘বাঙ্গালা সাহিত্যের নতুন ইতিহাস’ (২১/৩), কয়েক সংখ্যার আলোচিত বই। মৌলবী আলী আহমদ প্রণীত ‘বাংলা কলমী পুঁথির বিবরণ’-এর আলোচনা ও বহু পত্রিকায় প্রকাশ পায়। মোহাম্মদীতে আলোচনা করেন ইবনে বতুতা। মোহাম্মদ ইসলাম চাখারী প্রণীত উপন্যাস ‘মায়ের কলঙ্ক’ আলোচনা করেছেন ইবনে বতুতা। ‘দাঙ্গার পাঁচটি গল্প’ (মুস্তাফা নূরউল ইসলাম ও আলাউদ্দীন আল আজাদ সম্পাদিত) গ্রন্থের আলোচনা লিখেছিলেন আবদুল হক ২২ বর্ষ ৬ সংখ্যায়। রওশন ইজদানীর ‘চিনুবিবি’ এবং জসীমউদ্দীন প্রণীত ‘মাটির কান্না’ কাব্যগ্রন্থের আলোচনা করেছেন নূরী। কবি গোলাম মোস্তফা প্রণীত কবিতার বই ‘কালাম-ই-ইকবাল’ তালিম হোসেন প্রণীত কবিতার বই ‘দিশারী’ এবং মতিউল ইসলাম প্রণীত কবিতা—‘সপ্তকন্যার’ আলোচনা করেন আবদুর রহমান ওসমানী (২৯/১)।

একই সংখ্যায় আবদুল্লাহ এবে মজিদ আলোচনা করেন আ.ন.ম. বজলুর রশীদ এর ‘মরু সূর্য’। আবুল কালাম শামসুদ্দীন প্রণীত-উপন্যাস ‘খরতরঙ্গ’-র আলোচনা করেন আবদুর রহমান ওসমানী (২৯/৩)। কবি মঈনউদ্দীনের ‘পালের নাও’ গ্রন্থের আলোচনাও করেছিলেন আবদুর রহমান ওসমানী (২৯/৪)। রেনল্ডস থেকে নাসির আলী অনূদিত ‘আকাশ যারা করলো জয়’ এবং এ.কে.এম মকবুল আহমদ প্রণীত গল্প—‘ধূসর মাটি নীল আকাশ’ শীর্ষক গ্রন্থের আলোচনা করেন মোহাম্মদীর সম্পাদকীয় কর্মীবন্দ (২৯/২)। আবদুর রশীদ ওয়াসেকপুরী পরিচয় প্রদান করেন মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ প্রণীত ‘কারবালার’। মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ লিখেছেন—মিন্নাত আলী প্রণীত গল্পের বই ‘মফস্বল সংবাদ’ এর ওপরে। নজরুল হক লিখেছেন—আবদুস সাত্তার প্রণীত ‘বৃষ্টিমুখর’ কবিতার বইয়ের আলোচনা (৩০/১০)। ‘নটীর প্রেম’ কাজী মোহাম্মদ ইদরিস প্রণীত বইয়ের আলোচনা (৩২/২)। ‘সিন্ধু নীলাবদেশে’ জগলুল হায়দার আফরিক প্রণীত বই আলোচনা করেন আজাহরুল ইসলাম। ‘দুই সাগরের দেশে’ (ভ্রমণ কাহিনী) আনাম বজলুর রশীদ প্রণীত একটি বই, আলোচনা করেন লতিফা হিলালী। মুফাখ্খারুল ইসলাম পুণঃ আলোচনা করেন মোঃ নাজিরুল ইসলাম সুফিয়ানের নতুন দৃষ্টিকোণে রচিত ‘বাঙ্গালা সাহিত্যের নতুন ইতিহাস’ (৩৮/৮)। কবি মঈনউদ্দিন আলোচনা করেন কে.এম. সালাহউদ্দীন প্রণীত কবিতার বই ‘এদেশ এ মাটি’।

২.৬. গল্প : মোহাম্মদীতে গল্প লিখেছেন বাঙলার প্রায় তাবৎ গল্পলিখিয়েরা। তাছাড়া অনেক অনুবাদ হয়েছে বিশ্বসাহিত্যের প্রখ্যাতনামা সাহিত্যিকদের রচনা থেকে। যেমন পার্লামেন্ট, সমারসেট মম, মোপাসাঁ, কৃষ্ণ চন্দর, এরস্কিম কডওয়েল, এলিজাবেথ পেজ, খাজা আহমদ আব্বাস, প্রেমচন্দ, মাহমুদ তৈমুর প্রমুখের অনেক গল্প অনূদিত হয়েছে। দেশের প্রখ্যাত লেখকেরা মোহাম্মদীর পৃষ্ঠাকে অবহেলা করতে পারেন নি। লেখা প্রকাশের

এবং লেখক খ্যাতি অর্জনের জন্য তাঁদের অবলম্বন করতে হয়েছে নিয়মিত এই মাসিকপত্রটিকে।

যাঁরা গল্প লিখেছিলেন, তাঁরা হচ্ছেন, আবদুল গনি হাজারী (কেন্দ্রবন্দী, ২১/১) ; সিদ্দবাদ (কবির প্রিয়া, ২১/১) ; বেগম জেনুয়েসা (আমি এসেছি, ২২/২ ; জয়পরাজয়, ২২/৪, শুক্তি, ২৩/২) ; আবু রুশদ (মেকী সোনা, ২১/১) ; শোএব আহমদ (নয়ানতলীর দরিদ্র মোড়ল, ২১/৬ ; দেশ, ২১/৭ ; তুফান, ২১/৯ ; মিয়াবাড়ীর কোরবানী, ২২/১ ; চাঁদ, ২৩/৫ ; মাথা, ২৬/৪ ; একটি শুভ বিবাহ, ২৬/৫) ; শামসুল হক (দ্বিতীয় পক্ষ, ২১/৫) ; মুসাফের (দুগুথে যাদের জীবন গড়া, ২১/৬ ; জয়যাত্রা, ২১/৮) ; আতোয়ার রহমান (হেথা নয়, অন্য কোথা, ২১/৬ ; কেন বোন পারুল কাঁদো, ২২/৯ ; একমাসের ব্যবসা, ২২/১২ ; নতুন পাতা, ২৪/১) ; কাজী ফজলুর রহমান (যাত্রী, ২১/৭ ; ফাঁসী, ২১/৯) ; মফিজউল হক (ক্ষয়, ২১/৮ ; রং, ২২/৫) ; আশরাফউজ্জামান (বিস্মৃতি, ২১/৭, গাড়ীওয়ালা, ২১/১১) ; জহরুল ইসলাম (মিথ্যে মিথ্যে গল্প, ২১/৮) ; বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর (নীল চোখ, ২১/৯ ; মনে মনে, ২২/১২ ; আরমানিটোলার মাঠে, ২৩/৬) ; আবুল কালাম শামসুদ্দীন (প্রথম হাসির ইতিকথা, ২১/৯ ; বন্যা, ২৩/৯ ; টেলিপ্রিন্টার, ২৩/১১) ; শাহেদ আলী (মা, ২১/১২ ; রোমের সুলতান, ২৩/৩ ; শয়তান, ২৩/১০ ; বেগম হাসমত রশীদ (তিন তসবীর, ২২/৩ ; সমতল, ২৯/২ ; প্রতিশোধ, ২৯/৭) ; মোজাম্মেল সিদ্দিক (সেপাই, ২২/২ ; আগুনওয়ালা, ২২/৪ ; অভিন্ন ২৩/৬ ; অন্তস্তোত্র, ২৩/১১) ; আবদুল গাফফার চৌধুরী (অকৃত্রিম, ২২/৩ ; মাসকাটাল, ২২/৬ ; বৃত্ত ২২/৮ ; হিসাব, ২২/১১) ইত্যাদি।

২.৮. প্রবন্ধ : মোহাম্মদীতে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে অসংখ্য, তার পূর্ণাঙ্গ ফিরিস্তি প্রদান অনেকটা নিরর্থক এবং বস্ত্ততপক্ষে একঘেয়ে, ক্লাস্তিকর। তবে মোটামুটিভাবে খুবই নিম্নমানের রচনার লেখকদের বাদ দিয়ে মোহাম্মদীতে যাঁরা প্রবন্ধ লিখেছিলেন—যাতে চিন্তা বা সমাজ-ভাবনার কিছু পরিচয় রয়েছে—সেগুলোর তালিকা উপস্থাপন করলে, মোহাম্মদীর চিন্তা ও চারিত্রের স্বরূপ স্পষ্টতর হয়ে উঠতো। লেখকদের নামের সাথে লেখাগুলোর শিরোনাম নির্দেশ করে দিলে বোঝা যেতো বিশেষ লেখক তাঁর রচনায় কি বলতে চেয়েছেন। কিন্তু এই গ্রন্থে তার সুযোগ গ্রহণ করা যাচ্ছে না গ্রন্থাকৃতির কথা ভেবে। তবে মোহাম্মদীর বিস্তারিত সূচিপত্র মৎপ্রণীত, বাংলা একাডেমী প্রকাশিত, ‘পূর্ববাঙলার সাময়িকপত্র’ শীর্ষক গ্রন্থে পাওয়া যায় বলে নিম্নে কতিপয় প্রবন্ধের প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি সহযোগে মোহাম্মদীর বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে। কারণ পত্রিকার চারিত্র মোটামুটি গদ্য ও প্রবন্ধে ব্যক্ত স্পষ্ট মতামত বা দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভর করে। অবশ্য ‘চিন্তাধারা’ বিভাগে যে সমস্ত আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে, তাও প্রবন্ধই। তাই ‘চিন্তাধারা’ বিভাগের কিছু রচনার নাম উল্লেখ করা হয়েছে, এই কারণে যে পত্রিকাটি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে ঐ বিভাগে যা প্রকাশ করেছে—তাতে কি বিষয়ে কারা বলতেন—তা পাঠকের জিজ্ঞাসার মধ্যে আসতে পারে। মোহাম্মদীতে লেখেন নি কে? এ কালের সকল লেখকই এতে কোনো না কোনো সময়ে লিখেছেন।

২.৯. চিন্তাধারা : এই বিভাগের রচনাগুলো চিন্তা ও বক্তব্য প্রধান। এই বিভাগে প্রকাশিত কতিপয় রচনা নিম্নরূপ :

মোহাম্মদ আলী হোসেন—আধুনিক সাহিত্য-জিজ্ঞাসা (২১/১) ; এম. আবদুল কাদের—বিবাহ ও সভ্যতা (২১/১) ; সৈয়দ মামান বখস—লিবিয়ার জাতীয় আন্দোলন (২১/১) ; খায়রুল ফয়েজ—ইছলাম বনাম কমিউনিজম (২১/৩) ; হাবীবুর রহমান—শিক্ষা ও শিক্ষক (২১/৩) ; আমীর হোসেন আহমদ—পূর্ব

পাকিস্তানের প্রকৃত শিক্ষা (২১/৫); মরতুজ্জা রেজা চৌধুরী—ইসলামী সংস্কৃতির স্বরূপ (২১/৫); ওবায়দুল হক—রাষ্ট্রগঠনে আমাদের নারীসমাজের দায়িত্ব (২১/৬); অধ্যাপক এস. এম. ছদরুদ্দীন—শিশু মন ও ভীকতা (২৩/৩); ক্রোম ও ঈর্ষা (২৩/৪); ঘণা-বিদ্বেষ ও ক্ষমতাস্পৃহা (২৩/৫); মোহাম্মদ আবদুর রহীম—ইসলামী অর্থনীতির দার্শনিক বনিয়েদ (২৩/৮); সায়ীদ জামিল—আত্মত্যাগ ও বস্তুবাদ (২৩/১১); বদরুদ্দীন উমর—আত্মত্যাগ ও বস্তুবাদ (২৩/১২); এবনে গোলাম সামাদ—মানবতার সপক্ষে (২৪/৩); ইবনে সিনা—ইসলামী আইনের পটভূমি (২৪/৪); মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী—আমাদের সাংস্কৃতিক সমস্যা (২৪/৯); সৈয়দ আলী আশরাফ—শিশু ও পিতামাতা (২৪/১০); মোহাম্মদ মোস্তফা আলী—বহুবিবাহের অন্তরালে (২৫/৪); নারী-পুরুষ (২৫/১০); মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল—আমাদের সাহিত্যের ধারা (২৯/৪); মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ—শিক্ষা প্রসঙ্গে (২৯/১২); নূর মোহাম্মদ আজমী—একমাত্র পথ (৩২/৫); জহির বিন কুদ্দুস—সাহিত্য সমালোচনার ধারা (৩৪/২); নূরুল ইসলাম খান—জাতীয় জীবনে গঠন (বুদ্ধিজীবী-সংস্কৃতির কথা) (৩৪/৬); কাজী আমিনা বেগম—আমাদের সাহিত্যদর্শন (৩৪/১২); অধ্যাপক মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান—কুরআনের ইয়াম ও তার ইতিহাস (৬৭/৭); আবদুল মান্নান তালিব—শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠন (৬৭/৭); ইত্যাদি।

### ৩. মোহাম্মদীর ভাষা ও সাহিত্যচিন্তা

১৯৪৮ সনে ভাষা-আন্দোলন আরম্ভ হবার প্রায় দুবছরের মাথায় ১৯৪৯ সনের ডিসেম্বর মাসে মোহাম্মদী ঢাকা থেকে প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে। কিন্তু পাকিস্তানের রাজনৈতিক মঞ্চে মোহাম্মদী সম্পাদকের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানের কারণে স্বাভাবিকভাবেই বাংলাভাষা ও ভাষা-আন্দোলনের পক্ষে এ পত্রিকা জোরদার সংগ্রাম করতে পারেনি। উপরন্তু মওলানা আকরম খাঁ ১৯৪৯ সনে গঠিত প্রাদেশিক সরকারের বাংলাভাষা কমিটির সভাপতি ছিলেন। ঐ কমিটির সেক্রেটারি ছিলেন ‘নওবাহার’ পত্রিকার মালিক কবি গোলাম মোস্তফা। উক্ত কমিটির রিপোর্টে উর্দু বা রোমান হরফে তাৎক্ষণিকভাবে বাংলা লেখার কোনো সুপারিশ ছিল না বটে, তবে অন্তত ২০ বছর পর হলেও উর্দু ভাষাকে প্রয়োজনীয়রূপে সংস্কার করে উর্দু হরফে বাংলা লেখার যে-প্রস্তাব কমিটি করেছিলেন বা করতে বাধ্য হয়েছিলেন—তার কারণেই গোলাম মোস্তফার ‘নওবাহার’ উর্দুর পক্ষে স্পষ্ট সুপারিশ করতে দ্বিধাম্বিত হয়নি। এবং তাঁরা বাংলা ভাষার নানান দোষ দেখতে পেয়েছিলেন। মোহাম্মদীও উর্দুর বিপক্ষে কোনো কথা বলতে পারেনি—যদিও বাংলার জন্য কিছু সুপারিশ পাকিস্তান আমলের প্রথমদিকে কলকাতা থাকতে করেছিল।

১৯৪৭ সনের সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে, ১৩৫৪ সনের আশ্বিন মাসে প্রকাশিত সংখ্যায় ‘দফতরীর ভাষারূপে বাংলা’ শীর্ষক ‘আলোচনা’য় মোহাম্মদী লিখেছিল : ‘পশ্চিম বাংলায় সরকারি ভাষা বাংলা হয়েছে, পূর্ব পাকিস্তান সরকারও এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া আমাদের মাতৃভাষা বাংলাকে সম্মান দান করিয়া তথাকার সাড়ে চার কোটি বাংলাভাষী জনগণের প্রতি সম্মান দেখাইবেন এবং বাংলাভাষার গৌরবময় এক অধ্যায়ের সূচনা করিবেন।’

কিন্তু পরবর্তীকালে রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে এরূপ স্পষ্ট মতামত মোহাম্মদীতে পাওয়া যায় না। কমিটির সুপারিশ বা দিকনির্দেশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে উর্দু ভাষার কিরূপ সংস্কার

দরকার, বাংলা ভাষা কি জন্য সহজীকরণের দাবি রাখে এবং মুসলমানি শব্দ কতটা কি থাকা উচিত—ইত্যাদি বিষয়ে অনেক আলোচনা, নিবন্ধ ও প্রবন্ধ প্রকাশ করলেও তাতে স্থির নিশ্চিত কোনো বক্তব্য জোরালো ভাষায় প্রকাশিত হয়নি। অনেক ক্ষেত্রেই তাঁদের অস্পষ্ট বক্তব্যে বিভ্রান্ত হতে হয়। আলোচনা পাঠে পাঠকের বাংলার প্রতি আকর্ষণ যেন কমে যায়। উপরন্তু অনেক আলোচনায় উর্দুর তারিফই করা হয়েছে বলে ভুল (?) করার অবকাশ থাকে।

১৯৫০ সনে, ২১ বর্ষ ১ সংখ্যায় ‘উর্দুর প্রসার’ শীর্ষক ‘আলোচনায় বলা হয় :

দেশ বিভাগের পর ভারত সরকারের ও ভারতীয় হিন্দু রাজনীতিকদের প্রথম কোপদৃষ্টি পড়ে উর্দু ভাষার উপর। কারণ তাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, এছলাম ধর্মের শিক্ষা এবং মোহলেম সমাজের জাতীয় সভ্যতা, তাহাদের নিদ্র স্বসংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রধান বাহন হইতেছে উর্দু ভাষা। তাই, সাম্প্রদায়িকতার অভিশাপকে দেশ হইতে নিঃশেষে মুছিয়া ফেলার জন্য উর্দু ভাষাকে বিলুপ্ত করিয়া পরিবেষ্টনের কল্যাণে এবং হিন্দুভারতের এই আঘাতের প্রতিক্রিয়ায় পাকিস্তানে উর্দু ভাষার প্রভাব ও প্রসার দিনদিনই দ্রুতগতিতে বাড়িয়া চলিয়াছে। এমনকি মেহর (মিসর) প্রভৃতি দেশের বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানেও, ‘পাকিস্তানী মুছলমানের জাতীয় ভাষা’ হিসাবে উর্দু শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা সরকারিভাবে প্রবর্তিত হইয়াছে ও হইতেছে। নানা সঙ্গত ও অসঙ্গত প্রতিবন্ধক বর্তমান থাকা সত্ত্বেও, আমাদের পূর্ব পাকিস্তানেও, উর্দুর প্রসার কিরূপ বাড়িয়া চলিয়াছে, পাঠকগণের অনেকেই তাহা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছেন। যাহারা মনে করেন যে, কোন প্রকার বাধা-বিঘ্ন উপস্থিত করিয়া উর্দুর অগ্রগতিকে ঠেকাইয়া রাখা সম্ভব ও সঙ্গত, তাঁহারা নিজেদের মতবাদ নিয়া সন্তুষ্ট থাকুন। তাহাদের সঙ্গে কোনও বাদবিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হওয়ার দরকার নাই। কিন্তু আমরা যাহারা মনে করি যে, উর্দু ভাষার প্রসারে বাধা দেওয়া দেশবাসীর পক্ষে সম্ভব হইবে না এবং সঙ্গতও হইবে না, তাহাদিগকে আজ প্রশ্রুতির সবদিক সম্মুখে ধীরস্থিরভাবে আলোচনা করিয়া দেখিতে হইবে—এই পথের সমস্যাগুলির সমাধান নিজেরাই করিয়া লইতে হইবে।

ভাষা-সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে মোহাম্মদী উর্দু ব্যাকরণের মৌলিক নিয়ম ও নীতি সম্বন্ধে আলোচনাপূর্বক ভাষাকে সহজ করার সুপারিশ করেছিল, যাতে বাঙালিরা সহজে উর্দু শিখতে পারেন। অতপর আলোচনা করা হয় পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের লোকেরা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় কি পদ্ধতিতে অংশগ্রহণ করলে ন্যায় বিচার হবে, সে সব বিষয়ে। মোহাম্মদীর প্রবন্ধগুলোর শিরোনাম দেখে বিষয় অনুসারে ভাগ করলে দেখা যায় বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের অবদান সম্পর্কে সকলে সচেতন হয়ে নিজেদের ঐতিহ্য অনুসন্ধান করছেন এবং সেসব নিয়ে গর্ব অনুভব করা হচ্ছে, হিন্দুদের একদেশদর্শী বা একচক্ষু দৃষ্টির তীব্র সমালোচনা নিন্দা এবং প্রতিরোধ করা হয়েছে। মুসলমান লেখকদের উপর হিন্দুদের প্রভাবও আলোচ্য হয়েছে।

এজাতীয় প্রবন্ধের মধ্যে আহমদ শরীফের একটি প্রবন্ধের উল্লেখ করা চলে। তিনি রচনাটির আরম্ভ করেছেন এই ভাষায় :

অনেকেই মনে করেন, বাংলা সাহিত্যের মুসলিম ধারায় হিন্দুয়ানীর প্রভাব এত বেশী যে, তা দিয়ে মুসলিম বাংলার গৌরব করবার কিছুই নেই, এবং ফলে এ সাহিত্য মুসলিম জাতীয় জীবনের ধ্বংসের উৎসও হতে পারেনি। ঠাৱা এরূপ মনে করেন, তাঁরা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলিম অবদান সম্বন্ধে সম্যক অবগত নন,



এবং এ যুগের মুসলিম-রচিত সাহিত্য সম্বন্ধেও সজাগ নন। নতুবা এক কথায় এমন মত প্রকাশ করতে পারতেন না।

অতপর তিনি মধ্যযুগে মুসলিম রচিত সাহিত্যে হিন্দু-প্রভাবের সমাজতাত্ত্বিক কারণ নিরূপণ করে প্রবন্ধের শেষাংশে বলেন :

... সুতরাং আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি—ভাবসাদৃশ্য ও উদ্দেশ্যের ঐক্যই মুসলমান কবি সাধককে উপরোক্ত হিন্দুয়ানি বিষয়ের রূপকে তত্ত্বালোচনায় প্রলুব্ধ করেছে। তিনি আরও বলেন :

আধুনিক যুগেও মুসলমান লেখকের রচনায় হিন্দুয়ানীর অভাব নেই ; তাও একই কারণবশত। মুসলমানরা ধর্মদর্শ্যে আরব্য আর তমদ্দন-তাহজীবীবে আরব্যপারসিকপ্রবণ। আরবি ইরানি ও বাঙালিয়ানা ভাবের ত্রিধারার সামঞ্জস্য ঘটিয়ে চিন্তাধারার ত্রিবেণীসঙ্গত করাতে পারেনি বলেই স্বকীয় আদর্শ গড়ে ওঠেনি। ফলে তাদের মননশক্তি পঙ্গু এবং সাহিত্য সাধনা ব্যর্থ। কারণ আমাদের যা কাম্য ছিল, তা আমরা নাগালের মধ্যে পাইনি—চেয়েছিলাম আলীর জুলফিকার, পেয়েছি অর্জুনের গাণ্ডীব ; হামজ্জার তলওয়ার চেয়েছিলাম, পেয়েছি ভীমের গদা, খালেদ, তারেক, সালেহ, মুসাকে পরিচয়ের অভাবে বরণ করতে পারিনি, ভীষ্ম, কর্ণ, দ্রোণকে অনিচ্ছায় আদর্শ জীবের গৌরব দান করেছি। সোহরাব-রুস্তম দূরে ছিলেন, তাই রাম-লক্ষ্মণকে আপনজন মনে করেছি। কারবালার মরুপ্রান্তরের ধারণা ছিল না, তাই কুরুক্ষেত্রকেই সমরক্ষেত্র বলে বেছে নিয়েছি, নীলফোরাতেকে পাইনি, ফলে গঙ্গা যমুনাকেই আমাদের কম্পনারাজ্যে পানি যোগানের কার্যে নিয়োগ করেছি ; জানি না বলেই ইসমাইলের জীবন-দান চেয়ে দধীচির আত্মত্যাগকে বড় মনে করেছি ; সীতা সাবিত্রীর সঙ্গে রোজ দেখা হয়, তাই ফাতেমা রহিমাকে শূদ্ধা জানাবার সুযোগ ঘটেনি ; খেজুর গাছ, আতর, মেহেন্দী রং ও গোলাপের সৌন্দর্যকেও দেখিনি, তাই তালতমাল, চন্দন, আলতা ও পদ্ম আমাদের সৌন্দর্যবোধের প্রতীক হয়ে আছে। দ্রাক্ষাকুণ্ডে বাসে বুলবুলের গান শুনবারই বাসনা ছিল কিন্তু সে সাধ কদমতলায় কোকিলের গানেই মিটতে হয়েছে।

এভাবে আপন ঘর ও আপনজনের অভাবে নিজের চাল পরের ঘরে সিদ্ধ করে ক্ষুধা নিবৃত্ত করেছি, তাতে রসসৃষ্টি হয়েছে, পিপাসাও যে যেটেনি তাও নয়, তবে উপকৃত হইনি। সাড়া জাগায়নি সমাজ-ধর্ম-রাষ্ট্রক্ষেত্রে কোথাও। এ সাহিত্যে জাতীয় মনের প্রতিচ্ছবি পাইনি, যে অর্থে সাহিত্যকে জাতীয় জীবনের মুকুর বলা হয়, সে অর্থে এ সাহিত্য ব্যর্থ। যা হওয়া উচিত ছিল, তা হয়নি, যা পেয়েছি তাতে ভাবভঙ্গী, উপমা-অলঙ্কারে হিন্দুয়ানি ঘিরে আছে—যেমন মোশাররফ হোসেন 'বিষাদসিন্ধুতে' হিন্দুদের দেবির ন্যায় বেহেস্ত থেকে হজরত আলীকে সপরিবারে কারবালার প্রান্তরে নামিয়েছেন, পাহাড় এনে হানিফাকে বন্দী করেছেন। কায়কোবাদ 'শিব-মন্দির' কাব্যে প্রেতনী দেখিয়েছেন। নজরুল ইসলাম 'রক্তামরধারিণী মা' ও কালো মেয়ের বন্দনা গেয়েছেন, তাঁর দায়িত্ব, সিদ্ধু প্রভৃতি প্রায় অধিকাংশ কবিতায় হিন্দু পৌরাণিক কাহিনী উপাদান বা প্রেরণা জুগিয়েছে। জসীমউদ্দীন শ্যামাসঙ্গীত রচনা করেছেন, শাহাদাৎ হোসেনের কবিতায়ও লক্ষ্মী, কম্পতরু, মন্দাকিনী, সুরনটি, ত্রিদিব, দর্বাঙ্গা প্রভৃতি পৌরাণিক দেব-দেবতা-মানসের ঠাই হয়েছে।

এরূপে অত্যাধুনিক মুসলিম কবিগণও এ প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেননি' প্রমাণ—সৈয়দ আলী আহসানের 'আর যে ঝাঁপটী ছিল, শ্রী রাখার নয়নেতে আনিত সে ঘুম।' দোষ তাঁদের নয় শুধু, আমাদের সকলেরই আছে। ... ইসলামী আদর্শ এবং ঐতিহ্যঅঙ্কতরই কুফল।

উপসংহারে তিনি মন্তব্য করেন ; 'আমাদের বাংলা ভাষায় স্বকীয় আদর্শে সাহিত্য সৃষ্টি করতে হবে। আদর্শ হবে কোরআনের শিক্ষা, আধার হবে মুসলমানী ঐতিহ্যানুগ, আর বিষয়বস্তু হবে ব্যক্তি বা সমাজ অথবা বৃহদর্থে জগত ও জীবন। এভাবে আমাদের জাতীয় সাহিত্য ও জাতীয় জীবন গড়ে উঠবে। সাম্প্রতিক সাহিত্যে তরুণ কবি ফররুখ আহমদ

একান্তভাবে মুসলিম ঐতিহ্যের পরিপ্রেক্ষিতে কাব্য সাধনা করে পথের দিশারীর গৌরব অর্জন করেছেন।’

সমকালীন পত্রপত্রিকায় ইসলামী আদর্শের বিরুদ্ধে অথবা পাকিস্তানি তমদ্দুনের বা আদর্শের বিরোধী বক্তব্য প্রকাশিত হলেই মোহাম্মদী তীব্র বেগে খপ করে ধরে সঙ্গে সঙ্গে তুলোদোঁপা করে ছাড়ত। যেনো কোনো অবস্থাতেই সমাজ, ধর্ম ও রাষ্ট্রের কোনো অকল্যাণ আতাতকারী-মোনাফেক-দেশোদ্দ্রোহীরা করতে না-পারে। এদিক থেকে মোহাম্মদী গ্রুপের হামবড়াভাবটি মাঝেমাঝে বড় বিরক্তির উদ্রেক করে। দিলরুবা ও সওগাত পত্রিকায় প্রকাশিত (১৩৫৯) ড. কাজী মোতাহার হোসেনের ‘পূর্ববাঙলার সাহিত্য’ শীর্ষক এক দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। মোহাম্মদী এর নানা বক্তব্য সমালোচনা করে লেখে : ‘... কাজী সাহেবের ‘গবেষণা’ বাঙলা সাহিত্যের হিন্দু ঐতিহাসিকদের উদ্দেশ্যমূলক প্রচারণার পুনরাবৃত্তিমাত্র, সত্য উদঘাটনের চিহ্নমাত্র তাতে নাই। এ সম্পর্কে নাজিরুল ইসলাম তাঁর ‘বাঙ্গলা সাহিত্যের নূতন ইতিহাসে’ বলিয়াছেন :

পুঁথি সাহিত্যের ভাষায় আজ আরবী-ফার্সি শব্দ ব্যবহার করার অর্থ এই নয় যে, কেহ ইচ্ছা করিয়া বাঙ্গলা ভাষাকে বিকৃত করিতে চাহিয়াছে। বাঙ্গলা ভাষার চর্চা প্রথম কয়েক শতাব্দী আরবি-ফার্সি জানা লোকই করিয়াছেন। আর করিয়াছেন ধাঁহার। ব্রাহ্মণ্যসমাজে নীচু জাতি বলিয়া পরিচিত, তাঁহারাই। ...ইহা আপনি আসিয়া পড়িয়াছিল এবং তখনকার দিনের স্বাভাবিক ভাষাও ছিল ইহাই। ইহাই ছিল তখনকার দিনের চলতি ভাষা। এই চলতি ভাষায় সাহিত্য রচনা করিয়া সেকালের সাহিত্যিকেরা কিছুমাত্র অন্যায্য করেন নাই।

এই ধরনের আলোচনার এক পর্যায়ে কাজী মোতাহার হোসেনের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে মোহাম্মদী বলে : ‘এর মতো অসত্য উক্তি আর হইতে পারে না। বিরোধীপক্ষের উদ্দেশ্যমূলক মিথ্যা প্রচারে যাঁর বুদ্ধি আচ্ছন্ন হইয়া আছে, তিনিই মাত্র স্বজাতির এমন গ্লানি প্রচারের আশ্পর্ক দোষাইতে পারেন।’ মোহাম্মদীতে প্রসঙ্গত আরো বলা হয় : ‘বর্তমানে যারা এদেশের অনুকরণ-পরায়ণ সাহিত্যিক গুণ্ডিকে সুস্থ হইতে বলিতেছেন, এবং পাকিস্তান এদেশের চিন্তারাজ্যে যে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন আনিয়াছে, তাহা বুঝিয়া খাঁটি পূর্ব পাকিস্তানি সাহিত্য রচনায় প্রবৃত্ত হইতে আস্থান জানাইতেছেন, কাজী সাহেব তাঁহাদিগকেও এক হাত লইয়াছেন। তিনি গভীরভাবে তাহাদিগকে উপদেশ দিয়াছেন ; ‘আজ আমাদের মনে যে নানারকম সন্দেহ, কুটিলতা, অবিশ্বাস গ্লানি। এর প্রভাব আমরা কাটিয়ে উঠতে পারি না। আশা করি, নূতন জীবনের টানে আবার আমাদের দৃষ্টিতে পরিচ্ছন্নতা এবং হৃদয়ের ঔদার্য ফিরে আসবে। বিশেষ করে বাংলাদেশে শতকরা ত্রিশজন অমুসলমানকে অগ্রাহ্য করে আমরা সাহিত্য বা সমাজ কিছুই পরিপূর্ণভাবে গড়ে তুলতে পারব না।’

কাজী মোতাহার হোসেনের ‘উপদেশ’ সম্পর্কে মোহাম্মদীর মন্তব্য : উপদেশটা মূল্যবান সন্দেহ নাই। কিন্তু এ উপদেশ তাঁদের জন্যই বেশি প্রয়োজনীয়, যারা পাকিস্তানি আবেষ্টনে সাহিত্যের বহিরঙ্গে একটা পরিবর্তন আসিতে বাধ্য, এই সহজ কথা বুঝিয়া উঠিতে পারেন না, বা ইচ্ছা করিয়াই বুঝিতে চাহেন না। সাহিত্যের চিরন্তন সত্য যা, তার পরিবর্তন কেহই চায় না—চাহিতে পারে না। কিন্তু স্থানকালপাত্র ভেদে বহিরঙ্গে পরিবর্তন আসিয়াছে—আসিতে বাধ্য। পাকিস্তানবাদ শূণ্য রাজনীতি ক্ষেত্রে নয়, চিন্তারাজ্যেও একটা পরিবর্তন। ইহার পরিপ্রেক্ষিতে সাহিত্যের চেহরায় ধাঁরা একটা পরিবর্তন কামনা করিতেছেন তাঁরা দুইশত

বৎসরের সাহিত্যিক পরবশ্যতা হইতে পূর্বপাকিস্তানি সাহিত্যের মুক্তির কথাই বলিতেছেন। সেদিনকার সাহিত্যে অনুকরণের ঝাঁদরামিই বেশি চলিয়াছিল—বিশেষ করিয়া এদেশের মুসলমানদের রচিত সাহিত্যে। পরানুকরণের এই অভিশাপ হইতে মুক্ত হইতে না—পারিলে পূর্ব পাকিস্তানি সাহিত্য স্বস্থ হইবে না। এই পরানুকরণের অভিশাপ ষাংহারা কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছেন না, পিছনের হাতছানি ষাংহাদিগকে পরানুকরণের মোহগ্রস্ততা—মুক্ত হইতে দিতেছে না, তাঁহাদের মনেই ‘সন্দেহ, কুটিলতা, অবিশ্বাস’ বাসা ষাংধিয়াছে। ফলে চিন্তাক্ষেত্রে পাকিস্তানবাদের মর্মকথা তাঁরা বুঝিতে পারিতেছেন না।

বাঙলাদেশে শতকরা ত্রিশজন অমুসলমানকে বাদ দিয়ে সাহিত্য রচনার পরামর্শ অনৌদার্যের পরিচায়ক—কাজী মোতাহার হোসেনের এই বক্তব্যও মোহাম্মদী খণ্ডন করে—

ইহাও অর্থহীন। কারণ পাকিস্তানবাদি কেহ তেমন কথা বলেন না—বলিতেও পারেন না। তবে মুসলমান সাহিত্যব্রতীগণকে যদি বলা হয়, তোমাদের জীবনের কথা, সমাজের কথা, তমদ্দনের কথা সাহিত্যে সুস্থরূপে রূপায়িত করিয়া তোলা, তাহা হইলে একথা বলা চলে না যে, ইহা অনুদার পরামর্শ দেওয়া হইল। মুসলমান সাহিত্যিকদের জন্যতো উহাই স্বাভাবিক পথ। রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র বাঙলার মুসলমানের জীবন আঁকেন নাই বলিয়া আমরা দুঃখ করিতে পারি, কিন্তু সাহিত্যধর্ম পালনে তাঁরা ত্রুটি করিয়াছেন, একথা বলিতে পারি না। মুসলমান সাহিত্যিকদের পক্ষে মুসলমানদের জীবন আঁকিতে যাওয়াই স্বাভাবিক ; হিন্দুজীবন চিত্রিত করিতে গিয়া তাঁদের ভুল হওয়ার সম্ভবনা পদে পদে রহিয়াছে। নূতন সাহিত্যব্রতীদের পক্ষে যা সহজ, যা স্বাভাবিক, সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করাই তো উচিত। শক্তিশালী প্রতিভার পক্ষেই মাত্র বাহিরের সমাজের সফল চিত্র আঁকা সম্ভব। তার বিরোধিতা কে করিতেছে—কে করিতে পারে? কাজেই ঔদার্যের প্রসঙ্গ এক্ষেত্রে অবাস্তব ও হাস্যকর।<sup>১৫</sup>

আবদুল গনি হাজারীর লেখা ‘সাহিত্যে বিপ্লববাদ’ শীর্ষক এক প্রবন্ধও অগ্রহায়ণ (১৩৫৯) এর সওগাতে প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধেরও আলোচনা করে মোহাম্মদী।

ড. কাজী মোতাহার হোসেনের মতো ইনিও মনে করেন, কলিকাতা কেন্দ্রিক সাহিত্যধারা থেকে ষাংরা পূর্ব পাকিস্তানি সাহিত্যকে মুক্ত করিয়া নূতন ষাংতে প্রবর্তিত করার আহ্বান জানাইতেছেন, তাঁহারা ভ্রান্ত। ইনি ড. মোতাহার হোসেনকে এক প্রশংসামূলক সার্টিফিকেটও দিয়া ফেলিয়াছেন। ড. মোতাহার হোসেন কৃতার্থ হইবেন আশা করি।<sup>১৬</sup>

আবদুল গনি হাজারীর ‘সাহিত্যে বিপ্লববাদ’ প্রবন্ধের সমালোচনাশটুকু মোহাম্মদীর দৃষ্টি কোণ উপলব্ধির জন্য এখানে উদ্ধৃত করা সঙ্গত। মোহাম্মদীর আলোচক লিখেছেন :

প্রবন্ধের এক স্থানে লেখক বলিয়াছেন ; ‘পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পাঁচ বৎসর চলে গেছে। এর মধ্যে পুরাতন সাহিত্যিকদের অধিকাংশই সরেজমিন থেকে সরে পড়েছিলেন। কিছু সংখ্যক নূতন লেখকই বরং আমাদের গত পাঁচ বৎসরের অতঃপর সম্ভাব্য লঙ্কাকর সাংস্কৃতিক বন্ধ্যাত্ত থেকে ব্রহ্মা করেছেন। এজন্য তাঁদের আমি আজ একবার জোরগলায় অভিনন্দন জানাতে চাই। নূতন শিল্পী সাহিত্যিক বলিষ্ঠ পদক্ষেপে ক্রমেই এগিয়ে চলছেন। অসারেরা তাই এখন তর্জন গর্জন শূন্য করেছেন। নূতনদের অভিসম্পাত দিচ্ছেন, তাদের অবিশ্বাসের ধোয়া ছড়াবার চেষ্টা করছেন। ঐরা নূতন সাহিত্যিকগণকে ষাংর্যার চোখে দেখেন এবং সেইজন্যই এই অবিশ্বাসের জন্ম।

কিন্তু আজ পাঁচ বৎসর ধরে ঢাকায়, চট্টগ্রামে, কুমিল্লায়, সিলেটে যদি কেউ সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে কিছু করে থাকেন, তা নূতন শিল্পী ও সাহিত্যিকেরাই করেছেন। আমি তাঁদেরকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাই।

আবদুল গনি হাজারীর এই আলোচনার জবাবে মোহাম্মদীর ব্যঙ্গাত্মক বক্তব্য : ‘কিছু সংখ্যক নূতন সাহিত্যিক যে সত্যিই শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অস্বীকার করার উপায়

নাই। আহসান হাবীব, ফররুখ আহমদ, তালিম হোসেন ও রওশন ইজদানীর কবিতা, শওকত ওসমানের কোনো কোনো গল্প ও নাটিকা সত্যই উচ্চ প্রশংসার যোগ্য। অতি আধুনিকদের মধ্যে আশরাফ সিদ্দিকী, আবদুর রশীদ খাঁ, ময়হারুল ইসলাম প্রভৃতি কবিদের অনেক রচনা আমাদের মনে সত্যই আশা জাগাইয়াছে। অতি আধুনিক প্রবন্ধ লেখকদের মধ্যে সুলতান আহমদ ভূঁইয়ার রচনায় সাহিত্য-সাধকের নির্ভুল ছাপ রহিয়াছে দেখিয়া আমরা পুলকিত হইয়াছি। কিন্তু পাকিস্তান হওয়ার পর যে-রচনা আমাদের কাছে সবচাইতে বেশি আনন্দ দিয়াছে ও আমাদের মনে বিপুল আশা জাগাইয়াছে, তাহা হইতেছে নাজিরুল ইসলামের ‘বাঙ্গালা সাহিত্যের নূতন ইতিহাস’। এই বিরাট গবেষণামূলক গ্রন্থে তথ্যের দিক দিয়া ত্রুটি হয়ত কিছু কিছু আছে, কিন্তু ইহাতে যে দৃষ্টি কোণ দিয়া সাহিত্যের ইতিহাস লিখিবার প্রচেষ্টা হইয়াছে, তাহা উচ্চপ্রশংসা পাইবার যোগ্য। পাকিস্তান হওয়ার পর, পাকিস্তানের সাহিত্যে এযাবত এর চাইতে বড় সাহিত্যিক অবদান আর কিছু পাওয়া যায় নাই বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। কিন্তু আলোচ্য প্রবন্ধ লেখক ইহাদিগকে ‘আন্তরিক মোবারকবাদ’ জানাইয়াছেন, এরূপ কেহ মনে করিবেন না। কারণ ইহাদের অধিকাংশই চট্টগ্রাম, ঢাকা, কুমিল্লা, সিলেটের ‘সাংস্কৃতিক’ প্রদর্শনীর সাথে জড়িত ছিলেন না বা জড়িত হওয়া আনাবশ্যক মনে করিয়াছেন।

এই আলোচনা থেকেই তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায় এবং বুঝা যায়, ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লায়, সিলেটে প্রগতিশীল সাহিত্যিক সাংস্কৃতিক কর্মীদের দ্বারা যে সকল সাংস্কৃতিক প্রদর্শনী বা সাহিত্যসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল—সেগুলোকে তাঁরা সুনজরে দেখেননি এবং তাঁরা সেসব আয়োজনকে পাকিস্তানের কল্যাণের জন্যও ভাবতে পারেননি। তাই প্রতিবাদ-প্রতিরোধে সোচ্চার হয়েছেন ঐসকল অনুষ্ঠান পণ্ড করার জন্য। অনুষ্ঠিত সম্মেলন সম্পর্কে জনমনে বিরূপ ধারণা সৃষ্টি করার জন্য লেখনী চালনা করেছেন। উপরন্তু তাঁরা স্বাগত জানিয়েছেন পাকিস্তানপন্থী ইসলামি ভাবধারার লোকেরা যেসব উদ্যোগ নিয়েছেন সেসবকে।

১৯৫৭ সনে সিপাহীযুদ্ধের শতবার্ষিকী পালনকে পৃষ্ঠপোষকতা করে মোহাম্মদী সিরাজুদ্দৌলাকে মহান করে তুলে ধরেছিল। ১৯৫৭ সনের কাগমারী সম্মেলনকে প্রতিরোধ করেছিল। ১৯৫৮ সনের চট্টগ্রাম সাহিত্য সম্মেলনকে এবং ১৯৫৯ সনে আইউব খান কর্তৃক ‘পাকিস্তান লেখক সংঘ’ গঠিত হলে মোহাম্মদী খুব উচ্চ প্রশংসা করেছিলেন। উদ্যোগগুলোকে ‘যথার্থ’ মূল্যায়ন পূর্বক দেশের কল্যাণের জন্য যে এসব করা হয়েছে, সেদিন জনগণকে তাই বুঝানো হয়েছিল।

লক্ষণীয় মোহাম্মদী ইচ্ছা করেই প্রগতিশীল ধারার লেখকদের প্রতিভা ও মেধার স্ফূরণকে অস্বীকার করে গেছে। দলীয় লোক হলেই তাঁকে কালজয়ী লেখক, সাহিত্যিক প্রতিভা বলে তুলে ধরেছে। কিন্তু কালের বিচারে সেসব কোথায় মিলিয়ে গেছে। যেমন সুলতান আহমদ ভূঁইয়া ছিলেন মোহাম্মদীর দৃষ্টিতে অত্যাধুনিক প্রবন্ধলেখকদের মধ্যে ‘নির্ভুল সাহিত্যসাধক।’ কিন্তু বাংলাদেশের প্রবন্ধ সাহিত্যের ইতিহাসে সুলতান আহমদ

ভূঁইয়ার কোনো নামই নেই। উপরন্তু আহমদ শরীফের লেখা মোহাম্মদীতে ছাপা হলেও তাঁর প্রাবন্ধিক সত্তা বা প্রতিভার মাত্রা মোহাম্মদী উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়। শামসুর রাহমান বা সাইয়িদ আতীকুল্লাহ পঞ্চাশের দশকের প্রধান কবি এবং তাঁরা বাংলাদেশের আধুনিক কাব্য-সাহিত্যের পুরোধাগ্রন্থীর সদস্য। অথচ এঁদের আধুনিক কবিতার আধুনিকত্ব বা মেধার কৃতিত্বও উপলব্ধি করতে মোহাম্মদী ব্যর্থ হয় এবং এঁদের কাব্যপ্রয়াসকে গালাগালি করা হয় ‘বাঁদরামী’ বলে।

কিন্তু ইতিহাস সম্পূর্ণ ভিন্ন হয়েছে। দুঃখের বিষয় মোহাম্মদীর মনোস্বাক্ষম সিদ্ধ হয়নি। আধুনিক চিন্তাসমৃদ্ধ সাহিত্য রচনায় বিভাগ পরবর্তী কালের পূর্ববাঙলার নতুন লেখকদের কৃতিত্ব যে অপরিসীম-সেকথা এ বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায়ে পটভূমিকায় উল্লেখ করা হয়েছে। পাকিস্তানবাদী প্রতিষ্ঠিত লেখকেরা হিজরত করে এসে নতুন দেশে আখের গোছাতে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁরা জাবর কাঁটাছিলেন পাকিস্তান আন্দোলনকালীন অথবা বিভাগ পূর্ববর্তীকালীন বক্তব্যসমূহই। নতুন সৃষ্টি তাঁদের থেকে বের হচ্ছিল না।

অথচ নতুন দেশের নতুন সমাজগঠনের জন্য দরকার ছিল নতুন প্রাণ, নতুন রাপের, নতুন স্রষ্টার—আর নতুন শিল্পীর—যাঁরা প্রাণস্পন্দন ফিরিয়ে আনবেন স্থবির, হতাশাগ্রস্ত, বিধবস্ত, পঙ্গু, ভঙ্গুর, শোকবিধুর পূর্ববাঙলার সমাজদেহে। সৃষ্টি করবেন নতুন রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া। এই ‘নতুন প্রাণ’ সৃষ্টিতে সক্ষম শিল্পী সাহিত্যিক কবিদের নিতান্তই অভাব যে ক্ষেত্রে—সেখানে পূর্ববাঙলার পঞ্চাশ দশকের তরুণ লেখকসাহিত্যিক-সংস্কৃতিকর্মীরাই অঙ্কের হাতের যশী। কিন্তু মোহাম্মদীর বিবেচনায় এঁদের সৃষ্টি হলো বাঁদরের বাঁদরামী আর কলকাতার বস্তাপচা সাহিত্যের অন্ধ অনুকরণ। হয়তো নবীন এই সাহিত্যশিল্পী সংস্কৃতিকর্মীদের কাজে কর্মে মেধায় প্রতিভার অনন্যসাধারণত্ব তেমন ফুটে ওঠেনি,—হয়তো অনুকরণের বা প্রতিভাধরের প্রভাব কাটিয়ে স্বকীয়তা অর্জনে তাঁরা সক্ষম হননি তখনও—কিন্তু মেধার বা প্রতিভার স্ফূরণ যে কিছু না কিছু ঘটছিল—তা ধরতে মোহাম্মদী ব্যর্থ হয়েছে এবং নতুনদের স্বাগত জানাবার ঔদার্য তাঁদের মধ্যে সৃষ্টি হয়নি। বরঞ্চ নবীনত্ব, আধুনিকত্ব ইত্যাদিকে কটাক্ষ করতে পারলেই যেন মোহাম্মদীর সমালোচকেরা আত্মপ্রসাদ অনুভব করতেন।

শামসুর রাহমান (১৯২৯) ও সাইয়িদ আতীকুল্লাহর (১৯৩৩-৯৯) ন্যায় তরুণ লেখকদেরকে আবদুল গনি হাজারী (১৯২৫-১৯৭৬) মোবারকদের জানিয়েছিলেন ১৯৫২ সনে পূর্ব পাকিস্তানের নতুনসাহিত্যে বলিষ্ঠ পদভরে আবির্ভূত হবার কারণে। পঞ্চাস্তরে মোহাম্মদী বেছে বেছে ১৯৫২ সনে শামসুর রাহমানের ‘মেফিষ্টোফিলিসের প্রতি ফাউন্ট’ ও সাইয়িদ আতীকুল্লাহর ‘তিমির বিদার’ শীর্ষক কবিতার চরণ উদ্ধৃত করে মন্তব্য করেন যে ;

‘পূর্ব পাকিস্তানি সাহিত্যক্ষেত্রে ‘বলিষ্ঠ পদক্ষেপ’ই বটে। কলিকাতা-কেন্দ্রিক সাহিত্যের বস্তাপচা চুরি করা মাল লইয়াই অবশেষে আমাদিগকে গৌরব করিতে হইবে। বর্তমানে কলিকাতায়ও এসব মাল আস্তাকুড়ের আবর্জনায়া বিসর্জিত হইয়াছে ও হইতেছে। কবে ইহারা বুঝিবেন যে, চুরি করিয়া বা অনুকরণ করিয়া সৃষ্টি হয় না।’

সাইয়িদ আতীকুল্লাহর 'তিমির-বিদার' কবিতার ৫ লাইন উদ্ধৃত করেছিল মোহাম্মদী ; 'ভঙ্গুর আকাশে তবু গ্রানিটের রথ/মহুর শ্বাস টেনে আয়ুহীন সময়ের ক্লাস্ত সরীসৃপ/ তবু চলে, তবু চলে, তবু চলে, /দ্বিধাহীন মিছিলের মুখে জ্বলে, মুখে জ্বলে,/জ্বলে মুখে একটা প্রণাম।' পরে, মন্তব্য :

অনুরণের বাদরামির ইহাও একটা সুন্দর নিদর্শন। কলিকাতা হইতে আমদানি সাত নকলে-আসল-খাস্তা মাল। এই কবিশোপ্রার্থীরাই নাকি 'গত পাঁচ বৎসরের সম্ভাব্য লঙ্কার সংস্কৃতিক বন্ধ্যাত্ম' (হাজারীর উক্তি) হইতে পূর্ব পাকিস্তানি সাহিত্যকে রক্ষা করিয়াছেন। ইহারাই নাকি ঈর্ষার পাত্র। তবে কৃপার পাত্র কাহারো?¹

বলাবাহুল্য মোহাম্মদীর এইসব সমালোচকেরা বর্তমানের বাংলাদেশের সাহিত্যক্ষেত্র মোটেই ঈর্ষার পাত্র নন। এমনকি এই কথা কে বলেছিলেন, তাও কেউ খবর রাখা না আজ।

পূর্ববঙ্গের সাহিত্য ও সংস্কৃতি যখন সত্যিই বিপন্নপ্রায় পশ্চিম পাকিস্তানিদের এবং পাকিস্তানবাদীদের ষড়যন্ত্রে,—তখন মোহাম্মদী বিপন্নবাদীদের বক্তব্যের অসারত্ব প্রমাণে অগ্রসর হয় এবং 'গণ-সাহিত্য' সৃষ্টির দাবিকে পরোক্ষভাবে নিরুৎসাহিত করে 'সাহিত্য কি শুধুই ইরিট্যান্ট হইবে?' শীর্ষক সম্পাদকীয় লিখে। সাহিত্য বিপন্ন কিনা এ সম্পর্কে মোহাম্মদীর অগ্রহায়ণ ১৩৫৯ সংখ্যায় লেখা হয় ; 'পূর্বপাকিস্তানের সাহিত্য ও তমদ্দুন বিপন্ন, এ বিষয়ে একটি তর্ক চলিতেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে বা কখনও বাহিরে এই বিতর্কের অভিব্যক্তি মাত্রা ছাড়াইয়া যাইতেছে ;

তার চাইতেও বড় কথা, ভিতরে ভিতরে এই ক্ষত বিষাক্ত হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা...(তাই) সমস্যা সম্পর্কে অতি ধীরে ও সুস্থভাবে চিন্তা করা উচিত, তাহা অনেক ক্ষেত্রেই করা হইতেছে না। স্মরণ রাখা উচিত যে, বিপন্নবাদ অধিকাংশ ক্ষেত্রে সুস্থতার লক্ষণ নয় ; ইহা মূলত দুর্বলতার পরিচায়ক। আমাদের সাহিত্য ও তমদ্দুন (সংস্কৃতি) সত্যি বিপন্ন কিনা, এ বিচার করিতে হইলে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরে যে সাহিত্য সৃষ্টি হইয়াছে, তার প্রতি নজর দেওয়া আবশ্যিক। সুধী সমালোচকগণের নিরপেক্ষ দৃষ্টি সে দিকে পড়িবে বলিয়া আশা করা যায়। আমরা সে বিষয়ে...পূর্বেই বলিয়াছি যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ব পাকিস্তানি সাহিত্য এখনও সৃষ্টি হয় নাই—মাত্র সৃষ্টির পথে। সুতরাং এই সাহিত্যের বিচার এখনই করা সম্ভব নয়। তবে, একথাও ঠিক যে, অনেক আবেগ ও অবাস্তব ও অব্যক্তি বস্তু আসিয়া পড়িয়াছে। ইহাও অস্বাভাবিক নহে ; তবে এগুলি বর্জন করা আবশ্যিক। আবেগের জমিলে স্বাস্থ্যহানি হয় না, একথা কেহই বলিবেন না।

'নূতন সাহিত্য' শিরোনামে সম্পাদকীয় বক্তব্যে মোহাম্মদীর চিন্তাধারার পরিচয় আছে :

নূতন ও পুরাতন, নবীন ও প্রবীণ, প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ায়, এই রকম কতকগুলি শব্দের আড়ালে একটা লড়াইয়ের মহড়া চলাইবার প্রচেষ্টাও দেখা যাইতেছে। প্রকৃতপক্ষে এসব কথাগুলিই অবাস্তব। প্রগতির নামে ভিনদেশি জের টানা অথবা নিজস্ব ঐতিহ্যের প্রতি ঔদাসীনা যেমন সত্যিকার সৃষ্টির সহায়ক নয়, তেমনি পুরাতনের নামে সেকালের সবকিছু আঁকড়াইয়া বসিয়া থাকা মারাত্মকরূপে ক্ষতিকর।

একই কথা বারবার বলিতে হয়—পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে একটা বিশিষ্ট আদর্শের ভিত্তিতে ; সেই আদর্শ রপায়ণের গুরুদায়িত্ব অর্পিত হইয়াছে পাকিস্তানিদের উপর।...পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টি করিতে গিয়া এর বিচিত্র মানুষ ও পরিবেশ ত্যাগ করিয়া মেফিষ্টোফিলিস, গ্রানাইটের রথ ইত্যাদির পিছনে ছোট্ট কোন অর্থ আছে কিনা, বলা কঠিন নহে। এদেশের সাহিত্যক্ষেত্রে এখানকার মানুষ, সমাজ, প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং তাদেরই অতীত ও বর্তমানের প্রতি সন্ধানী দৃষ্টিপাত করিতে হইবে, একথা বোধহয় কেহ অস্বীকার করিবেন না। ভিনদেশি সাহিত্য হুবহু অনুরণ ও অনুসরণ করিলেই যে নূতন সাহিত্যের হাওয়া উড়িবে, এ ধারণা পোষণের সঙ্গত কারণ ঋঞ্জিয়া পাওয়া যায় না।

‘সাহিত্য কি শুধুই ইরিট্যান্ট হইবে?’ শীর্ষক সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

বর্তমান যুগ সাধারণ মানুষের যুগ; রাজা বাদশাহ, আমীর-ওমরাহদের কাল চলিয়া গিয়াছে। সাধারণ মানুষের শোষণ ও বঞ্চনার কথাপ্রকাশই নাকি বর্তমান বানুতন সাহিত্যের একমাত্র দায়িত্ব। কথাটা সত্য; কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য নহে। কেবল শোষণ ও বঞ্চনার চিত্র অঙ্কিত করিয়া যে ইরিট্যান্ট বা উত্তেজনার সৃষ্টি করা হয়... নিছক উত্তেজনার মধ্যে রস বা সৌন্দর্যবোধের প্রকাশ কতদূর সম্ভব, তাহা বিবেচনা যোগ্য। দেহে তাপমাত্রার আধিক্য সুস্থতার লক্ষণ নয়; অনেক ক্ষেত্রে তা এনিমিয়া বা রক্তহীনতার লক্ষণও হইতে পারে। আজিকার এই উত্তেজনা-প্রবণতা রক্তহীনতার লক্ষণ কীনা, তাহা চিন্তা করিয়া দেখা উচিত। এমনও হইতে পারে যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তদানীন্তন চলতি ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়ার ফলে, বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেও নূতন পরিস্থিতি প্রহেলিকার মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে; অনেক ক্ষেত্রেই একটা কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভাব দেখা দিয়াছে। যে ভিতের উপর এতদিন জীবনটা দাঁড়াইয়াছিল, যে পরিবেশের মধ্যে জীবনের গতি নিয়ন্ত্রিত হইতেছিল, তা আজ নাই। ইহার দরুন হতবুদ্ধি হওয়া হয়ত সম্ভব। জাতীয় জীবন যত গড়িয়া উঠিবে, আবজ্ঞানাত্মক ও ততই অপসারিত হইবে। নূতন সাহিত্য তখনই সৃষ্টি হইবে। আজিকার যা, সে নূতনও নয়, পুরাতনও নয়; স্বাদ-গন্ধহীন পাঁচ-মিশেলি খিচুড়ি। সুখের বিষয়, পূর্ব পাকিস্তানে আজ যে সাহিত্য সৃষ্টি শুরু হইয়াছে, তাতে আবর্জনা প্রচুর থাকিলেও কারণ ও কারণ শক্তির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, ভবিষ্যতে আরও সংযোগ হইবে নিশ্চয়ই এবং তাহাই একদিন বিশাল মহীরাহে পরিণত হইবে। তবে পাকিস্তানী আদর্শ এবং এদেশের জীবন ও পরিবেশের সহিত সঙ্গতি না রাখিয়া যাহা সৃষ্টি করা হইবে, তাহা হইবে নিরর্থক প্রচেষ্টা; এদেশের সাহিত্যে তাঁর স্থান হইবে না এবং বিশ্ব-সাহিত্যেও নয়।<sup>৮</sup>

ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে অসংখ্য রচনা মোহাম্মদীতে প্রকাশিত হয়েছে। লেখক এবং কালভেদে রচনার বক্তব্য পরিবর্তিত হয়েছে। কখনও কখনও মোহাম্মদী জনগণের মনের বা মুখের কথাটাই বলতে পেরেছে। এদিক থেকে জনসংশ্লিষ্টতা এঁদের ছিল এবং খুব বেশি বিচ্ছিন্ন হতে পারেননি এঁরা জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা থেকে।

১৩৫৯ সনের মাঘ সংখ্যায় মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী ‘ভাষা ও সাহিত্যের সংস্কার’ শীর্ষক আলোচনার এক পর্যায়ে বলেন :

ভাষা কোন গ্রামে থাকবে? মিঞালী জবান বা বাবুয়ানী ভাষাকে সাহিত্যের আসর জুড়ে থাকার অবধা অধিকার দিয়ে রাখলে সাহিত্যের ভাষা থেকে জনগণ দূরে পড়ে থাকতে বাধ্য হয়; সুতরাং তা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাদীন সম্পদের মতো অত্যন্ত অস্পষ্টসংখ্যক লোকের ব্যবহার্য বা উপভোগ্য হয়ে দাঁড়ায়। আজকার গণতন্ত্রের যুগে সাহিত্যিক ভাষার এই কৃত্রিম আভিজাত্য আস্তে আস্তে কমিয়ে ফেলতে চেষ্টা করা সকলেরই কর্তব্য। অবশিষ্ট এ-চেষ্টা খুবই কঠিন; এবং কোনো অক্ষম ও অসতর্ক সাহিত্যিক এ-কাজে হাত দিতে চাইলে হয়তো ভালোর চাইতে মন্দই করবেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, পশ্চিমবঙ্গে জনভাষার একটা সাধারণ রূপ সহজেই আবিষ্কার করা যায়; কিন্তু জনকথিত ভাষার দিক দিয়ে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন এলাকার মধ্যে পার্থক্য এত বেশি যে, এই প্রদেশে জনভাষা বলতে বিশেষ কিছুই বুঝায় না। এই অবস্থার পরিবর্তন হবে; কিন্তু তা হতে চের সময় লাগবে। রাজধানী, শিল্পকেন্দ্র ও বাণিজ্যকেন্দ্রে প্রদেশের বিভিন্ন এলাকার লোক এসে জড়ো হবেই। তাদের পরস্পরের মেলামেশার ফলে ধীরে ধীরে একটা পূর্ববঙ্গীয়, জনভাষা রূপলাভ করবে। সেইটাই হবে এখনকার নতুন এক আদর্শ কথ্যভাষার ভিত্তি। এই প্রক্রিয়া সফল হতে ২/৩ পুরুষ লেগে যেতে পারে। সুতরাং আগামী বহু বৎসর যাবত পশ্চিমবঙ্গীয় আদর্শ কথ্যভাষাই আমাদের সামনে থাকবে। তাহলেও ততোদিন জন-সম্পর্কহীন আভিজাত্যে ভাষাকে অটল রাখার প্রয়োজন নেই।

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী মনে করেন, পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত জনভাষার যে-সব শব্দ সারা প্রদেশে বোধ্য ও চলনযোগ্য মনে করা সঙ্গত হবে, সেগুলো এখন থেকেই

কঠিন বাবুয়ানী ভাষার সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে তাকে হাল্কা করার চেষ্টা হওয়া উচিত। অতপর তিনি 'সাহিত্যের সংস্কার' প্রসঙ্গে বলেন : সাহিত্যের কাঠামো ও বিষয়বস্তুর সংস্কার বা পরিবর্তন সংগত ও সম্ভবপর হলেও তার মূলধর্মের কোনো পরিবর্তন ঘটে না। মানুষই সাহিত্যের স্রষ্টা এবং সাহিত্য মানুষের জন্যে। এই কারণে সাহিত্য মূলত মানবকল্যাণের ভাবময়, রসঘন বাণীরূপ ছাড়া আর কিছু নয় এবং হতে পারে না। বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন দেশে এবং বিভিন্ন সমাজে সাহিত্য যে-রূপই গ্রহণ করুক বা যে বিষয়বস্তুরই বাহন হোক না কেন, তার এই ধর্ম থেকে বিচ্যুতি ঘটতে পারে না। এবং বলপূর্বক ঘটাতে গেলো তা আর সাহিত্য থাকে না।

এই কারণে পাকিস্তান ইসলামভিত্তিক রাষ্ট্র ঘোষিত হওয়ায় আমাদের সাহিত্যিকদের ভেতর সাহিত্যের সংস্কার বা নবরূপায়ণ সম্পর্কে যে আকুল আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে, তাকে ঠিক পথে চালানোর প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। ওয়াজেদ আলী সাহেব বলেন, অনেকের মনে হয়তো এই-রকম একটা ধারণা কাজ করছে যে, অতপর ইসলামচর্চাই সাহিত্যিকদের প্রধান কর্তব্য হওয়া উচিত। কিন্তু এই ধারণার বিশ্লেষণ হওয়া প্রয়োজন। নইলে আমাদের নব-সৃষ্টব্য সাহিত্য স্বধর্ম ত্যাগ করে শুধু একটা প্রচারণার রূপ গ্রহণ করতে পারে। প্রকৃত প্রস্তাবে সাহিত্যিকদের দৃষ্টিতে ইসলাম একটা ভাবধারা মাত্র। ইসলাম মানব-মনে কল্যাণ সম্পর্কে যে বিশেষ ধারণা বা প্রবণতা জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করে, সাহিত্যে তা প্রতিবিস্মিত হলেই ইসলামের প্রতি সাহিত্যিকের কর্তব্য প্রতিপালিত হয়। এর বেশি কিছু করতে গেলে সাহিত্যের অপব্যবহার ঘটতে বাধ্য। মানে, পূর্ববঙ্গের বাংলা সাহিত্যে পাকিস্তানি যুগে যেটুকু সংস্কার বা পরিবর্তন স্বাভাবিক, তা এই যে, এখনকার সাহিত্যে মুসলিমসমাজের জীবনমন আগের চাইতে বেশি করে চিত্রিত হবে, এবং সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার ভেতর দিয়ে মানব কল্যাণের যে ইংগিত ফুটে উঠবে, তাতেও মর্মত ইসলামের অনুরঞ্জন থাকবে। এর চাইতে অন্যভাবে বা স্থূল আকারে ইসলামপ্রীতি সাহিত্যে চরিতার্থ করতে চাইলে ভুল হবে এবং তার ফলে আমাদের এই প্রদেশের সাহিত্যিক মান খুবই নেমে যাবে। নিছক সাহিত্যিক বিচারে একে লাভ বলা যায় না। আর একটা কথা... ইসলাম চাইতে হলে যে শুধু বিদেশের পানেই তাকাতে হবে, তা নয়; আমাদের স্বদেশ,—যার প্রত্যেকটি ধূলিকণা আমাদের কাছে পবিত্র,—তাকেও প্রাণ ভরে দেখতে হবে, এবং ইসলামি মনের বিপুল প্রসারে তাকেও আয়ত্ত করতে হবে, তার থেকেও সেই মনের পুষ্টি সংগ্রহ করতে হবে। ...এ সম্পর্কে একটা আশ্চর্য ব্যাপারের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে লেখক বলেন, ইসলামের নামে বিদেশমুখিতা আমাদের ভিতর এতোখানি শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, হাতেমতায়ী, সোহরাব-রুস্তম, বাদশাহ নওশেরওয়ান ইত্যাদির কীর্তিকাহিনী পড়তে আমাদের আগ্রহ ও রসবোধ বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত বা সংকুচিত হয় না; যদিও এঁরা সবাই অমুসলিম ছিলেন। কিন্তু পাক-ভারত উপমহাদেশের অনুরূপ অমুসলিম কীর্তিমানদের কাহিনী পড়ার আগ্রহকে বর্তমানে আমরা যেন এক ধরনের ইসলাম বিমুখতার লক্ষণ বলে ধরে নিচ্ছি। শুধু তাই নয়; এদেশের অমুসলিমদের কিসসা সম্বলিত রচনাগুলোকে বাদ দিয়েই আমাদের সাহিত্য রস পিপাসা চরিতার্থ হওয়া উচিত বলে



প্রচার করছি এবং তদনুরূপ কর্মপন্থাও অবলম্বন করছি। একে ঠিক সুস্থ মনোভাব বলা চলে না।

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর মতে : আমার মনে হয়, ইসলামের প্রেরণায় সাহিত্যের সম্প্রসার হাত দিতে হলে মোটের ওপর ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি বলতে যে ব্যাপারটা বোঝায়, তাকে আয়ত্ত করাই সব চাইতে বড় প্রয়োজন। সেই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে মানুষ ও প্রকৃতির দিকে তাকাতে শেখাই আসল কাজ। একাজের ক্ষেত্র দেশ, সমাজ, এমনকি সারা বিশ্ব। এছাড়া হিন্দু পুরাকাহিনী থেকে এতো দিন যেভাবে তুলনা, উপমা, রূপক ইত্যাদি নিয়ে নেয়ার প্রথা ছিল, মুসলিম পুরা-কথা থেকেও এখন সেইভাবে ওগুলো নিতে হবে। তবে এর জন্যে হিন্দু পুরাকাহিনীর সংস্রব একদম ত্যাগ করা প্রয়োজন এই মত অব্যাহে গ্রহণ করা কঠিন। তাতে সাহিত্যে রস-সৃষ্টির ব্যাপারটা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়বে, সাহিত্যের রসা-শায়িতাও হ্রাস পাবে। এই ক্ষুণ্ণতা-স্বীকার কি সত্যিই অপরিহার্য? <sup>১৯</sup>

মোহাম্মদী মুসলমানদের প্রকৃত রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাহিত্যিক ইতিহাস রচনার কাজ দ্রুত সমাপনের জন্য সুপারিশ করেছে এবং বাংলাভাষী মুসলমানদের উন্নতির জন্যে কতিপয় প্রস্তাবও পেশ করেছে : যেমন ; ১. বাংলা একাডেমীর প্রতিষ্ঠা করতে হবে ; ২. পূর্ব পাকিস্তানের তথা বাংলাভাষী মুসলমানদের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাহিত্যিক ইতিহাস রচনার ব্যবস্থা করতে হবে ; ৩. শিক্ষায়তনসমূহের বিভিন্ন স্তরে পূর্বপাকিস্তানের ইতিহাসকে পাঠ্য তালিকাভুক্ত করতে হবে ; ৪. বাংলাভাষী মুসলমানগণ কর্তৃক রচিত পাণ্ডুলিপি ও পুস্তকাদির প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে হবে। এসব কাজ সরকারি ও বেসরকারি সমবেত প্রচেষ্টায় করা সম্ভব বলে মন্তব্য করা হয়। <sup>২০</sup>

‘পূর্ব বাংলার সাহিত্য’ প্রসঙ্গে নুরুল ইসলাম খান বলেন : পূর্ব বাংলার সমাজ বিভাগপূর্ব যুগের বাংলা সাহিত্যে ছিল উপেক্ষিত, এখন তাই সেই সাহিত্যিকের প্রয়োজন যারা অবহেলিত সমাজ জীবন খেঁটে তার পরিপূর্ণ বৈচিত্র্য, বৈশিষ্ট্য ও রূপককে সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করবেন। তিনি বলেন,

সত্যিকথা বলতে কি, পূর্ব বাংলার আয়তন অনুসারে লেখক সংখ্যা কম। পত্রিকার সংখ্যাও আশানুরূপ নয়। নিত্য-নতুন সাহিত্যিকের আগমন হবে আমাদের তরুণতম বংশধরদের মধ্য থেকে—তাই তাদের প্রতিভা বিকশিত করে তোলার জন্য লেখকেরা অভিজ্ঞতা ও নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী গঠন করে তুলবেন। তাদের লেখা যখন সরস ও...উপযোগী হবে, তখন তাদের তুলে আনা হবে পরিণত সাহিত্যের ক্ষেত্রে। এইরূপে ঘটবে সাহিত্যিকের নিত্য আবির্ভাব।

আলোচকের মতে, এঁরা শুধু শহর জীবনেই অভ্যস্ত থাকবেন না ; তাঁরা আসবেন পল্লী থেকেও ; পল্লীজীবন উত্তমরূপে পর্যবেক্ষণ করে সাহিত্যের উপাদান সংগ্রহ করবেন তাঁরা। কি কি উপাদান সংগ্রহ করবেন ? কিসের অভাব পূর্ব বাঙলার সাহিত্যে ? লেখকের এই বর্ণনায় তার একটি চমৎকার বিবরণ পাওয়া যায়—পূর্ব বাংলায় প্রথমেই চোখে পড়ে ভূমিহীন কৃষককুলকে। তাদের সীমাহীন দুর্দশা তারই ফাঁকে আশাভাষা বুনটের কাহিনী—ব্যর্থতা পারিবারিক জীবনের হাসিকাম্মা, মিলন-বিরহ প্রভৃতিতে সাহিত্যের দরবারে পরিপূর্ণভাবে হাজির করতে হবে। পূর্ব বাঙলার বিপুল সংখ্যক নারী-হৃদয়ের রূপকথা, গোত্রভেদে নারীর কাহিনী, তার জীবনযাত্রা—তার ক্ষুধা-পিপাসা, আশা-আগ্রহ, মর্মবেদনা ; সংসার জীবনে

নারীর অধিকার, স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক, বধূ-শাশুড়ী সম্পর্ক আরো কত কি। তারপর গড্ডালিকা ধারার মধ্যেও মানুষ আনন্দের অনুসরণ করে, তাই এককালে সৃষ্টি হয়েছিল কবিগান, জারী, খেমটা, যাঁত্রাগান, পালাগান ইত্যাদি। আজ সে সবই লুপ্ত হতে বসেছে। পূর্ব বাঙলার শ্রমিক রাখালী তরুণ জীবনের সঙ্গে এদের সংযোগ নষ্ট হতে বসেছে। বৈচিত্র্যময় এই পূর্ববাঙলা। এর নদীনালা... নিয়েই কাহিনী গড়ে উঠতে পারে। নৈসর্গিক সংগঠন পূর্ববাঙলার বৈচিত্র্য বড় কম নয়। দক্ষিণে এর বঙ্গোপসাগর; তারই তটপ্রান্তে শ্রাপদসংকুল সুন্দরবন—নোনা পানিতে তার শস্ত্র ধূসর মাটির নিবিড় বন্ধুত্ব সেখানে, দুঃসাহসী মাল্লাদের জীবন কাটে সেই সাগর আর অরণ্যের সাথে মিতালী করে। বরিশাল, খুলনা, নোয়াখালী, চাটগাঁয়ের দিকে মানুষের জীবন কাটে ভয়ঙ্কর সুন্দরের সঙ্গে অবিরাম পাল্লা দিয়ে।

উপর্যুক্ত প্রবন্ধে লেখক বলেন, বৈচিত্র্যময় জীবন—সুন্দরীর কাহিনী কি সেখানে শুনতে পাওয়া যায় না? হাসুলী ঝাঁকের উপকথার স্থান কি সেখানে নাই? নতুন জীবনের দোলা লাগে বাঙলার প্রত্যেক চঞ্চলা ঋতুতে। দিবারাত্রি ঢল নামে, তুফান দ্বিঘিঞ্জয়ে বার হয়, বসুন্ধরা হর্ষে নেচে ওঠে, পদ্মা, মেঘনা, ব্রহ্মপুত্রে শুরু হয় কীর্তিনাশা নর্তন। জীবনের রূপালী দোলা,... পূর্ববাঙলার হৃদয় কত অভাবিত ভাবে পরিবর্তিত হয়, কে তার খোঁজ রাখে। কাজুরিয়া ধান ও পাট কাটার গান শুরু হয় তখন। জীবনযাত্রার এমনি কত সমাবেশ। এখনো ব্যয়ে গেছে অস্পষ্ট আমাদের জীবনের দিবা-রাত্রির হাসিকান্না, আমাদের ঘরকনো মনোবস্তির গ্লানি ও লজ্জা—তার মধ্যে শাস্ত্র জীবনের এক ফোটা সৌরভ এখনো রয়ে গেছে। ছন্নছাড়া মানুষের গৃহবন্ধনের গুপ্তকথা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিন্ন বিছিন্ন এই কথা-কাহিনীকে সাহিত্যের মারফতে গেঁথে তুলতে হবে। ... শুধু তাই নয়, পূর্ববাঙলায় স্বাধীনতা লাভের সাথে সাথে বন্যার মত এসেছে মোহাজের, চলে গেছে বাস্তব্যাগীরা। দুপক্ষের এই গৃহহীনদের অবর্ণনীয় যাতনার মধ্যেও পূর্ব বাঙলার গল্পের একাংশ—তারপর রয়েছে বাস্তবহীনদের আপন করার মধ্যে একটা সংগোপন আত্মানুভূতি, তারপর স্বাধীনতার স্বাক্ষর। এই আমাদের স্বাধীনতা। পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়ে আমরা একে কতোখানি পেয়েছি? এই স্বাধীনতাকে যুদ্ধপরবর্তী ও স্বাধীনতা পরবর্তী আমলের কণ্ঠিপাথরে বিচার করা চলে মানুষের মনের মধ্যে। ... পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকা নতুন জীবন পেয়েছে। বহু মানুষের মিলনে এর মধ্যেও নিত্য নতুন কাহিনীর খাতায় ঐকে রাখা অবশ্য কর্তব্য। এ সমস্ত উপাদান অফুরন্ত পলির মত কালের গতির সাথে সাথে কাহিনীও বেড়ে চলে—নতুন সাহিত্যিকও আসে। প্রবহমান নদী যেমন বারেবারে নতুন নতুন পলি দিতে থাকে, তেমনি নতুন নতুন উপাদান, নতুন সাহিত্যসৃষ্টি আমাদের সাহিত্যের দরবার সমৃদ্ধ করে তুলবে; নতুন রশ্মির সাহায্যে আদিগন্ত আলোকিত করে তুলবে।<sup>১১</sup>

‘সাহিত্যে স্বাতন্ত্র্য’ শীর্ষক অপর এক প্রবন্ধে লেখক সাহিত্যের আন্তর্জাতিকতাকে স্বীকার করেও ইসলামি বা মুসলমানি সাহিত্য সৃষ্টির পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ মতামত লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি বলেন : সাহিত্য সকল সমাজের কথাই বলে। ... কলাকৌশল ও উপস্থাপনার ব্যাপারে বৈদেশিক তত্ত্বগত ব্যাপার নতুনত্বের অবতারণা করলে আমরা অবশ্যই গ্রহণ করবো। ... সর্বজনীনতার সাথে আঞ্চলিক সূক্ষ্ম ও সর্বজনগ্রাহ্য বস্তু ও ধারণার পরিবেশন

কুশলী হাতে প্রয়োগ করলে তা কালক্রমে বিদেশি লেখকদের অনুপ্রাণিত করবে এবং তামদ্দুনিক সমন্বয় ও দেশীয় তমদ্দুনে গ্রহণযোগ্যতার পরিচয় পাওয়া যাবে। নিজেদের সংগুণাবলি সম্পর্কে নিস্পৃহ হয়ে লোক নিন্দার ভয় করে আমাদের আঞ্চলিক ভাষার বিশেষ ধরনের অর্থবহ শব্দ প্রয়োগ ও বিশেষ ধরনের চালচলন ও ধ্যান-ধারণাকে দূরে ঠেকিয়ে রাখলে আমাদের চলবে না। জীবনযাত্রাতে সমাজই হোক বা দেশই হোক কোনখানেই লেখক সমাজ একটা সুনির্দিষ্ট মান বেঁধে দিতে পারেন না। সামাজিক মূল্যবোধ রূপান্তরশীল ও ব্যক্তিভেদে তার রকমফের তো রয়েছেই।... আজ আমাদের নিজস্ব সাহিত্য ও তমদ্দুনে স্বাতন্ত্র্য আনতে হলে নিজেদের বস্তুনির্ভর কাঠামোটিকে ঠিক রেখে বিশ্বজগতের উন্নয়নশীল ধ্যান-ধারণা ও কলাকৌশল এমনকি গ্রহণযোগ্য চালচলন আত্মস্থ (Adopt) করেই আমরা সত্যিকারের সুস্থ সাহিত্য গঠন করতে পারি। আমরা মিলন ও গ্রহণে পরাম্ভুখ নই। সাহিত্যের সবল ও সজীব কাঠামো গঠন করতে না পারলে জাতির আত্মার জাগরণ ও উন্নয়ন সম্ভব নয়। একে আরো গঠনমুখী ও সংস্কারবিহীন ভাবে গ্রহণ করতেই হবে।»

### ৩.১. সাহিত্য সম্মেলন প্রসঙ্গে মোহাম্মদী

মোহাম্মদী সাহিত্য সংস্কৃতির প্রায় সকল বিষয়েই অভিভাবকসুলভ মতামত বা মন্তব্য দিয়ে অভ্যস্ত সেই প্রথম—বিশ ও ত্রিশের দশক থেকে। ১৯৫৪ সনের ‘সর্বদলীয় সাহিত্য সম্মেলন’ সম্পর্কেও ঐরা মতামত দিয়েছিলেন। রিপোর্ট করার সময় তাঁরা সৌজন্য দেখাননি এবং কাজী আবদুল ওদুদ—এর নামটা শুদ্ধরূপে উল্লেখ করেননি। মোহাম্মদীর পর্যবেক্ষণ : ‘যে উদ্দেশ্যে সম্মেলন আহূত হইয়াছিল, তাহা কতটা সফল হইয়াছে, জাতীয় জীবনে উহার মূল্য বা সার্থকতা কতটুকু, জাতিকে সত্যকার পথনির্দেশদানে সম্মেলন সফল হইয়াছে কতটুকু, সাহিত্য সৃষ্টির পক্ষেই বা ইহা কতদূর সার্থক হইয়াছে, এইসব প্রশ্নই মূলত প্রশ্নধানযোগ্য ও বিবেচনাসাপেক্ষ।’

‘সাহিত্যে সর্বদলীয়তা’ প্রসঙ্গে মোহাম্মদীর সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছে :

‘সর্বদলীয় সাহিত্য সম্মেলন’ কথাটা শুনিয়া প্রথমেই থমকিয়া দাঁড়াইতে হয়। রাজনীতি বা পলিটিক্সের অনুরূপ সাহিত্যক্ষেত্রেও বিভিন্ন দল আছে এবং সেইসব দলের সমন্বয়ে একটা সম্মেলন অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা আছে—কথাটা নূতন, ধোঁয়াটে; ইহার সঠিক ও সুস্পষ্ট অর্থ নির্ধারণ করিতে আমাদের মত সাধারণ মানুষের একটু বিলম্ব হয়। সাহিত্য লইয়া যেখানে কারবার, সেখানে মূল্য বিচারের মাপকাঠি একাধিক, একথা দুনিয়ার কোনো সাহিত্যিক বা সাহিত্যিকগোষ্ঠীর জানা নাই। জীবনের প্রকাশভঙ্গী, সুন্দরের রূপায়ণ স্থান-কাল-পাত্র ভেদে হয়ত পৃথক হইতে পারে; কিন্তু তাহা সত্যকার সাহিত্য হইল কিনা, সে-বিচারের মাপকাঠি একটাই—তাতে যা উৎরাইল তাহাই স্থায়ী এবং যা উৎরাইল না, সাময়িকভাবে চটকদার হইলেও তাহা আবর্জনাশূন্য পরিণত হইতে বাধ্য। তাই সাহিত্যিকের দৃষ্টিতে ও বিবেচনায় ‘সর্বদলীয় সাহিত্য সম্মেলন’ কথাটি দুর্বোধ্য—বিশেষ করিয়া পূর্ব-পাকিস্তানে, সেখানে সাহিত্য সম্পর্কে আশাবাদী হইবার মত কোন কারণ এখনও ঘটে নাই। সাহিত্য সাহিত্যই—লজিক, ফিলজফি, পলিটিক্স বা ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন্স নয়। সাহিত্যে মত বা প্রকাশভঙ্গীতে পার্থক্য থাকিতে পারে, কিন্তু তাতে দল হয় এবং সেই কারণে ‘সর্বদলীয়’ সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তা আছে, এরূপ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। প্রকৃতপক্ষে ‘সর্বদলীয়’ ব্যাপারগুলি পলিটিক্সের আওতাভুক্ত; সেখানে ‘অল-পার্টিজ’ বা ‘ইউনাইটেড ফ্রন্ট’ ইত্যাদি করা চলে; সাহিত্যে তা অচল।’

‘সম্মেলনের উদ্দেশ্য’ শীর্ষক কলামে (সম্পাদকীয়তে) বলা হয় :

সর্বদলীয় সাহিত্য সম্মেলনের মত একটা অচল ও অবাস্তব বস্তুকে চালু করার চেষ্টা উদ্দেশ্যমূলক কিনা, এই প্রশ্ন বহুজনের মনে উদয় হইয়াছে। যাহারা এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন, তাঁহাদের বস্তুব্য : সম্মেলনের কার্যকলাপ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং বিশেষ বিশেষ মন্তব্য হইতে একমাত্র এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব যে, বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদ অর্থাৎ কম্যুনিজম প্রচারের উদ্দেশ্য লইয়াই জনকয়েক প্রবীণ ব্যক্তিকে সামনে রাখিয়া এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যে সঙ্গীতাদি পরিবেশিত হইয়াছে, সেগুলি দেখিয়া শুনিয়া এ অভিযোগ অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সাহিত্য বলিয়া এগুলিকে দাবী করা হয় নাই, এইটুকু সুখের বিষয়। কিন্তু ইহাকে পূর্ব-পাকিস্তানের ‘সংস্কৃতি’ বলিয়া চালাইয়া দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে এবং তাহা কম দুর্ভাগ্যের কথা নয়। তথাকথিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে পাকিস্তানের দূরে থাক, পূর্ব-পাকিস্তানের স্বরণ ফুটিয়া উঠে নাই, প্রকট হইয়া উঠিয়াছে একটা বিদ্বিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী, বিদেশ হইতে ধারকরা একটা গিষ্ঠ করা দ্রব্য, যাকে খাঁটি বলিয়া পরিচয় দিবার চেষ্টা হইয়াছে। ‘সাংস্কৃতিক’ অনুষ্ঠানগুলি যে বিশেষ মতবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। এ-পরিচালনায়, এ অনুষ্ঠানে মস্কো-পিকিং এবং কলিকাতার ধারা সুশৃঙ্খলিত। বহিমুখী দৃষ্টি লইয়া এই সব পরিচালিত হইয়াছে, এ-অভিযোগ প্রকৃত উদ্যোক্তাগণ অস্বীকার করিতে পারেন বলিয়া মনে হয় না।

‘প্রবীণ ও নবীন’ শীর্ষক কলামে বলা হয় : ‘সর্বদলীয়’ কথাটির পিছনে যে বিশেষ অর্থ রহিয়াছে, তাহা ‘প্রবীণ’ ও ‘নবীন’ এই শব্দ দুইটির উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করায় বুঝা যাইতেছে। সম্মেলনের যুগাসম্পাদকের রিপোর্ট এবং বিভিন্ন অভিভাষণ ও মন্তব্য হইতে দেখা গিয়াছে যে, একটি দল ‘প্রবীণ’ ও ‘নবীন’ সাহিত্যিকদের দুইটি ক্যাম্পে বিভক্ত করিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, প্রবীণ ও নবীন এই দুই দল মিলিয়া সম্মেলনের অধিবেশন করিতেছেন। ইহারই অন্তরালে আরও প্রমাণ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে যে, প্রবীণদের দিন অতীত হইয়াছে, এখন নবীনদের যুগ। কাল হিসাবে প্রবীণদের আয়ু অন্তিমিত প্রায়, একথা স্বীকার করিতে প্রবীণরা দ্বিধাবোধ করিবেন, এ-আশঙ্কা আমাদের নাই। কিন্তু এই প্রমাণ-প্রচেষ্টার অন্তরালে প্রবীণদের প্রতি যে উপেক্ষা এবং নবীনদের যে ঔদ্ধত্য সুপ্রকট, তাকে জাতির কল্যাণ বলিয়া পরিগণিত করিতে দ্বিধা থাকা স্বাভাবিক। নবীন বহন করিয়া চলে প্রবীণের ধারা এবং সেই কারণেই প্রবীণ অমর হইয়া থাকে নবীনের মধ্যে। সুতরাং প্রবীণ ও নবীনের মধ্যে অস্বীকৃতির সম্পর্ক কোথায়, তাহা আজ দুর্বোধ হইয়া পড়িয়াছে।’

‘সম্মেলনের প্রতিপাদ্য বিষয়’ উপশিরোনামে উক্ত সম্পাদকীয়তে বলা হয় : ‘সর্বদলীয় সাহিত্য সম্মেলনে’ যে বিষয়গুলি প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে, তার গুটিকয়েক সংক্ষেপে আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :

১. পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের বাংলা সাহিত্য এক ও অভিন্ন।
২. উভয় অঞ্চলের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, ভাষা, চিন্তাধারা এক ও অভিন্ন।
৩. পূর্বপাকিস্তানের সাহিত্যের ভাষা ও আদর্শে কোন বৈশিষ্ট্য নাই ; পদ্মাতীরের ভাষা অচল, গঙ্গাতীরের ভাষাই হইবে পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যের ভাষা।
৪. এছলাম অচল, কিন্তু বস্তুবাদ সচল ; এছলামী সাহিত্য বলিয়া কিছু হইতে পারে না, কিন্তু বস্তুবাদী তথা কম্যুনিষ্ট সাহিত্য সত্য।

মুহম্মদীর প্রতিনিধি বলেন, এই সব প্রসঙ্গের আলোচনা সংক্ষিপ্ত পরিসরে সম্ভব নয়।  
 ১. এটাও মনে করি মোহাম্মদী যা যা বলেছে তার সবটা উদ্ধৃত করা সহজ নয়। দু একটি বিষয়ে কেবল তাঁদের মতামত সংক্ষেপে উদ্ধৃত করা হলো : ‘গঙ্গাপার ও পদ্মাপার’ শীর্ষক কলামের ভাষা :

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ পশ্চিমবঙ্গের তথা গঙ্গাতীরের বাংলা সাহিত্যের ভাষাকে বর্জন, পদ্মাপারের কথ্য-ভাষাকে সাহিত্যে স্থানদান এবং অত্যধিক আরবি-ফারসি-উর্দু শব্দের প্রচলনকে বাতুলতা বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। ইহার যে কোন একটিকে বাতুলতা পর্যায়ে স্থান দেওয়াতে আপত্তি নাই। কিন্তু গঙ্গাপার বনাম পদ্মাপারের সমস্যা তাহার মনে কেন উদ্ভিত হইয়াছে, তাহার নিরাকরণ দুষ্কর। অতি সাধারণ অসাহিত্যিকের মত তিনি এই সব প্রশ্ন তুলিয়াছেন। তিনি প্রবীণ ব্যক্তি, অন্তত অর্ধ শতাব্দীর খবর তাঁহার অজানা নয়। প্রাক-পাকিস্তানকালীন পাকিস্তান আন্দোলন ও সংগ্রাম সম্পর্কে তাঁহার মতামতও অনেকের সুবিদিত। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশক হইতে হিন্দুয়ানি বাংলা এবং মুসলমানি বাংলা সম্পর্কে যে প্রচণ্ড বিতর্ক ও বাদ প্রতিবাদ চলিয়াছে, তাহা তাঁহার অজ্ঞাত বলিয়া আমরা মনে করি না। পাকিস্তানোত্তর কালে গঙ্গাতীরের ভাষা সম্পূর্ণ বর্জন করিয়া পদ্মাতীরের কথ্যভাষাকে সাহিত্যে চালু করিবেন বা কারণে অকারণে আবরি-ফার্সি-উর্দু প্রচলন করিবেন, এমন কথা কোন সুস্থবুদ্ধি পূর্ব পাকিস্তানি বলিয়াছেন, একথা কাহারও জ্ঞান নাই। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লেখক হিসাবে ডাক্তার সাহেবের সম্ভবতঃ একথাও জ্ঞান আছে যে, বিগত বছরের মধ্যে বাংলা ভাষার রূপ বহুব্যাপার পরিবর্তিত হইয়াছে। সে পরিবর্তনের ধারা স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে, একথা তিনি বলেন... পদ্মাতীরের কথ্য ভাষাকে বহু পূর্বপাকিস্তানি সাহিত্যে স্থান দিতে হইবে, একথাও কেহ বলেন নাই। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ব পাকিস্তানের বিশেষ পরিবেশের মধ্যে গঙ্গাতীরের ভাষার পরিবর্তন ঘটিবে না, এই মত কেহ জোর করিয়া বলিতে পারেন কি? অবশ্য গঙ্গাতীরমুখী যাহাদের দৃষ্টি, তাহাদের পক্ষে এ কথা বলা অসম্ভব নহে। পূর্ব পাকিস্তানি সাহিত্যের ভাষার ভবিষ্যৎ রূপ সম্পর্কে বিতর্কে প্রবৃত্ত হওয়া মূঢ়তার পরিচায়ক। যাহা সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে আসিবে, তাহাই হইবে এই সাহিত্যের ভাষার রূপ। ফরমায়েস দিয়া সাহিত্য সৃষ্টি করা যায় না, ভাষাও তৈয়ারী হয় না। পূর্বপাকিস্তানে এখনও কোন ষ্টাণ্ডার্ড ডায়েলেক্ট বা কথ্য ভাষা নাই; বিভিন্ন অঞ্চলের কথ্য ভাষা পরস্পরের কাছে দূর্বোধ্য। শিল্প ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের সাথে সাথে আঞ্চলিক মেলামেশার মাত্রা বৃদ্ধি হইবে। তখন পরস্পরের বোধগম্য একটা Standard Dialect হয়ত তৈয়ারী হইবে। এই কথ্য ভাষার কাঠামোর সহিত গঙ্গাতীরের ভাষার কাঠামোর মিল থাকা স্বাভাবিক; কিন্তু নূতন নূতন শব্দ আমদানী হইলে বিম্মিত হইবার কারণ নাই। পূর্ববঙ্গের বর্তমান সাহিত্যিকগণ এখনও গড়ের মাঠ, বালিগঞ্জ, কলিকাতার Gutters ও Shems-এর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া আছেন; পূর্ববঙ্গের জনজীবন এখনও তাহাদের অনুপ্রাণিত করে নাই। যেদিন তা হইবে, সেদিন এই সব অবাস্তব প্রশ্ন তুলিয়া মস্তিস্ক বিব্রত করিবার প্রয়োজন হইবে না। সাহিত্যের ভাষা নির্ণীত হইবে সাহিত্যিকের প্রতিভা এবং বিষয়বস্তুর পরিপ্রেক্ষিতে।

‘এছলামী সাহিত্য’ শিরোনামের প্রবন্ধে বলা হয় :

এছলামের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন এবং নিজেকে এছলাম অনুসারীরূপে পরিচয় না দেওয়ার চেষ্টা নবযুগের রেওয়াজ। এককালে ভদ্র বলিয়া পরিচয় দিতে হইলে ধৃতি চাদর পরিয়া ‘জী হাঁর পরিবর্তে “আজ্জে হ্যা” বলা যেমন রেওয়াজ ছিল, বর্তমানে নিজেকে এছলাম অনুসারী না বলিয়া কম্যুনিষ্ট নেহায়েৎ পক্ষে প্রগতিশীল রূপে পরিচয় দান করাই রেওয়াজ হইয়াছে। আসলে দুইটিই একই বস্তুর এপিঠ ও পিঠ—পরমুখাপেক্ষী, পরানুকরণকারী, স্বাতন্ত্র্যবিহীন মনের পরিচয়। সারা উনিশ শতক ছুড়িয়া পাক-ভারত উপমহাদেশের মুহলমান কোন রকমে আত্মরক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে; বাংলাভাষী মুহলমানদের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। তার প্রমাণ উনিশ শতকের পুঁথি সাহিত্য। বিংশ শতাব্দীর গোড়া হইতে শুরু হয় তাহাদের আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা, যাহা পরবর্তীকালে পাকিস্তানে বাস্তব রূপ গ্রহণ করিয়াছে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, ইহার ইতিহাস আজও লিখিত হয় নাই; অথচ পাকিস্তানি জাতির জন্য ইহার প্রয়োজনীয়তা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। যাহা

হউক, আমরা পাঠক ও সৃষ্টিবর্গের দৃষ্টি একটি বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ করিতে চাই। এছলামী সাহিত্য বলিতে এছলামের নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে রচিত ও গঠিত সাহিত্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়। এছলাম তথা ধর্ম চিরন্তন সত্যের বাণী বহন করে এবং স্থান ও কালের পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ বিশেষ মানবগোষ্ঠী সেই চিরন্তন সত্যের বাস্তব রূপায়ণের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া থাকে। মানুষ স্বভাবত সন্ধীর্ণ গণ্ডিতে আবদ্ধ; কিন্তু এই সঙ্গে একথাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, মানুষ সমস্ত সন্ধীর্ণতার উর্ধ্বে উঠিতেও সক্ষম। ধর্মীয় ক্ষেত্রেও তার প্রকাশ এই স্বাভাবিক নিয়মানুযায়ী হইয়া থাকে। সুতরাং কোন সাহিত্যকে কেবল এছলামী সাহিত্য বলিয়া উপেক্ষা করা চলে না। এছলাম অনুসারীদের সাহিত্যও তাহাদের ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত সংকীর্ণতা অতিক্রম করিয়া চিরন্তন সত্যের বাণীর ধারক ও বাহক হইতে পারে।

‘পাকিস্তানি ও পাক-বাংলা সাহিত্য’ শিরোনামের সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

সাধারণভাবে মানুষের পরিবেশ সন্ধীর্ণ-Physical, intellectual, social, geographical, এইসব দিক বিবেচনা করিলেই তার সন্ধীর্ণতার হেতু উপলব্ধি করা যাইবে। কিন্তু এসব ছাড়াইয়া তার একটা বৃহত্তর সত্তা ও অনুভূতি আছে, ইহাও অনস্বীকার্য। ব্যক্তি আছে, তাঁর স্ত্রী-পুত্র আছে; ইহাদের লইয়া সে নিজের পঁচাল দেওয়া বাড়ীতে বাস করে; কিন্তু তাই বলিয়া সে পল্লী বা পল্লীর বাহিরের দুনিয়াকে অস্বীকার করে না, করিতে পারে না। এছলামী নীতি ও আদর্শ অনুযায়ী জীবনগঠনের উদ্দেশ্যে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা। তার অর্থ এ নয় যে, পাকিস্তান বাহিরের জগৎকে অস্বীকার করে। কিন্তু এ-কথাও সত্য যে, পাকিস্তান তার মর্মমূল; ইহাকেই কেন্দ্র করিয়া পাকিস্তানি যাত্রা শুরু। পূর্ববঙ্গ বাংলাভাষী পাকিস্তানিদের আবাসভূমি। এখানে যে সাহিত্যের সৃষ্টি হইবে, তা হইবে পাকিস্তানি-বাংলা বা পাক-বাংলা সাহিত্য। এছলামের নীতি ও আদর্শ, তার চিরন্তন সত্য পাক-বাংলার জীবনধারার পটভূমিতে রূপায়িত হইবে বাস্তবে। পশ্চিমবঙ্গীয় সাহিত্য বাংলা সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত নয়, একথা কেহই বলে না; বৈষ্ণব সাহিত্য বা পশ্চিমবঙ্গীয় সাহিত্য বাংলা-ভাষী মুছলমানদের আশা-আকাঙ্ক্ষার, জীবন-বোধ ও জীবনাদর্শের ধারক ও বাহক, একথা বোধ হয় কেহই বলিবেন না। বাংলা-ভাষী প্রত্যেকে বাংলা-সাহিত্যকে স্বীকার করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের নাম বাংলা সাহিত্যে স্বীকার করিতে হইবে; কিন্তু মুছলমান তাঁহার ‘বন্দেমাতরম’ সঙ্গীতকে আপন বলিয়া গ্রহণ করে নাই, করিবে না, করিতে পারে না। বিগত হাজার বছরের বাংলা সাহিত্যে দুইটি প্রবহমান ধারা সুপরিষ্ফুট; উভয়ই সত্য, উভয়ই বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্য। একটির স্বীকৃতি অন্যটির অস্বীকৃতি নহে। পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গ পৃথক হওয়ায় এই দুইটি ধারার প্রকাশ নিজে নিজে বিশিষ্ট ধারায় রূপায়িত হইবার ক্ষেত্র সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং পূর্ববঙ্গের বাংলা সাহিত্য শুধু বাংলা সাহিত্য নয়, শুধু পাকিস্তানি সাহিত্য নয়, ইহাকে পাক-বাংলা সাহিত্যরূপে অভিহিত ও উপলব্ধি করাই সঙ্গত। এই কারণে আমরা প্রত্যেককে তা তিনি দলীয়, অদলীয় বা সর্বদলীয় হউন-আত্মস্থ হইতে আত্মবিশ্লেষণ করিতে, নিজেকে জানিতে ও চিনিতে এবং সর্বোপরি নিজেকে স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠা দান করিতে অনুরোধ জানাই।<sup>১৩</sup>

মোহাম্মদীতে যেসকল লেখক-সাহিত্যিককে আক্রমণ করা হয়, সেই সমস্ত সাহিত্যিকদের অনেককেই মোহাম্মদীতে লিখিতে দেখা গেছে। মোহাম্মদীও ছেপেছে আক্রান্ত ব্যক্তির লেখা। এই রহস্য অনুধাবন করলে বেশ লাভ ঘটে। উক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ মোহাম্মদী কর্তৃক আক্রান্ত হলেও তাতে আবার লিখেছেন,—অবশ্য সেই লেখার মর্মকথা মুসলমানদের কৃতিত্ব বর্ণনা। ‘মুসলিম বিজয় ও বাংলা সাহিত্য’ শীর্ষক এক রচনায় ড. শহীদুল্লাহ চর্যাগীতি থেকে ১৮ শতক পর্যন্ত সাহিত্যের আলোচনাপূর্বক মন্তব্য করেছেন—

...মুসলিম রাজত্বে যে বাংলা সাহিত্যের উৎপত্তি হয়, তাই আজ সর্বঙ্গসুন্দর সাহিত্যে পরিণত হয়েছে। এর প্রথম উৎসাহদাতা যে মুসলমান সুলতান ও ওমরাহগণ তা আমরা চিকাল স্মরণ রাখবো।<sup>১৪</sup>

ডক্টর কাজী দীন মুহাম্মদ বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগকে 'ক্রান্তিকাল' আখ্যায়িত করে ঐ নামে প্রবন্ধ লিখে মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে তাঁদের অত্যাচারে সাহিত্য-সৃষ্টির পরিবেশ ছিল না-প্রচলিত এই মতবাদ খণ্ডন করেছেন। তিনি লিখেছেন কোন রক্তপাত ঘটানোর প্রয়োজন ছিল না।

বিনা রক্তপাতে শতের জন অশ্বারোহীসহ ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজী এদেশ দখল করেন। দেশ অত্যাচারে উৎপীড়নে এতটা অতীষ্ঠ হয়ে উঠেছিল যে কোন বিদেশি শাসককে তাঁরা স্বাগত জানাতে উৎসুক হয়ে রয়েছিল।...তুর্কীর মুসলমানেরা না-এলে বাংলা আরও কশ বছর পিছিয়ে যেত তা কে জানে? <sup>১৫</sup>

ডক্টর আনিসুজ্জামান 'মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের দান' শীর্ষক প্রবন্ধে বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের কতিপয় উল্লেখযোগ্য কবি ও কাব্যের পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে মধ্যযুগের বা মুসলমান শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত বাংলা সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করেছেন।

মুসলমানদের দ্বারা বাংলাদেশ বিজয়ে নতুন যুগের সূচনা কেন হলো, সে কথাটা বলা দরকার। এ দেশে...মুসলিম বিজয়ের ফলে সংস্কৃত ভাষা তার আগের প্রতিষ্ঠা হারালো। তার জায়গা নিল কোন বিদেশি ভাষা নয়-বাংলা ভাষা। মুসলমান শাসকেরা দেশী কবিদের পৃষ্ঠপোষকতা করলেন, তাঁদেরকে দিয়ে কাব্য রচনা করালেন, পারিতোষিক ও খেতাব দিলেন কবিদের। এমন করে দেশময় ব্যাপ্ত হলো বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা। এক প্রাথমিক নতুন যুগের সূচনা হলো বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস। <sup>১৬</sup>

শিক্ষা পদ্ধতির ও বিভিন্ন ভাষা শেখার গুরুত্ব বিশ্লেষণ মোহাম্মদীতে করা হয়েছে। শিক্ষার বয়স এবং কোর্সের মেয়াদ সম্পর্কেও তথ্যভিত্তিক সিরিয়াস আলোচনা এতে অনেক হয়েছে। বাংলাভাষা সংস্কার, সহজীকরণ এবং রোমান হরফে বাংলা লেখার নানান হুজুগের সময়েও মোহাম্মদীতে প্রচুর লেখা ছাপা হয়েছে। এতে সরকারি উদ্যোগকে সব সময় নিরঙ্কুশভাবে সমর্থন করা হয়নি। বিশেষ করে আইউব খান, তাঁর শাসনকালে দুই দফায় যেসমস্ত উদ্যোগ গ্রহণ করেন, সেগুলোকে উচ্ছসিত সমর্থন দেয়া হয়নি।

মনে রাখতে হবে, আকরম খাঁ সক্রিয় রাজনীতি থেকে তখন অবসর নিয়েছেন। আর আইউবের পতনকালীন মরণকামড়-এর সময় আকরম খাঁ মৃত্যুশয্যায় এবং অতপর পরলোকগত। মোহাম্মদীতে নানান মতের বেকার তরুণ সাহিত্যিকেরা কাজের জন্য ভীড় করতেন। তখন চিন্তাধারায়ও এসেছে একটা অস্থিরতা, ওলট-পালট ভাব। তাই বাংলা ভাষার সহজীকরণের এবং সংস্কারের বিশেষত পাক-বাংলা সৃষ্টির নিরাপোষ সংগ্রামী মোহাম্মদী আইউব খানের শাসন আমলে 'বর্ণমালা সংস্কার' এর উদ্যোগকে প্রতিরোধ করে দীর্ঘ এক প্রবন্ধ ছেপেছে 'বর্ণমালা সংস্কার না সংহার?' শিরোনামে। তাতে প্রথমেই বলা হয়েছে;

বাংলা ভাষাকে যখন পাকিস্তানের অন্যতম জাতীয় ভাষারূপে আমাদের জাতীয় জীবনে প্রতিষ্ঠার দাবী সোচ্চার হয়ে উঠেছে, ঠিক তখনই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক বর্ণমালা সংস্কারের ধূয়া তোলা অনেকের কাছেই তাৎপর্যপূর্ণ মনে হতে পারে।...সংস্কারের উদ্দেশ্য, কয়েকটি মৌলিক বর্ণের নিধন বা সংহার। <sup>১৭</sup>

এই নিধন বা সংহারের নেপথ্যকাহিনী প্রতিরোধী ভাষায় মোহাম্মদীতে অপর এক লেখক 'বাংলা ভাষা সংস্কারের অন্তরালে' শীর্ষক এক প্রবন্ধ লিখে জনসমক্ষে প্রকাশ করেছিলেন :

...অনেক রক্তক্ষয়ী করণ ইতিহাসবিধৃত ভাষা-আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে অবশেষে বাংলাভাষা পাকিস্তানের জাতীয় ভাষার মর্যাদা লাভ করতে সক্ষম হয়। যে ভাষা আন্দোলনের নিষ্পত্তিমূলক পরিসমাপ্তি বহু পূর্বেই ঘটেছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত তারই পুরুল্লেক্ষ করে প্রদেশবাসীর মনে বিদ্রোহভাবে আবার পুনরুজ্জীবিত করে তুলেছে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর হতেই বাংলা ভাষার উপর দিয়ে যে দুর্বীর দুর্বিপাক বয়ে গেছে, তারই জলন্ত ইতিহাস ১৯৫২ সনের ২১শে ফেব্রুয়ারির রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। অবশেষে রক্তের বিনিময়ে বাংলা তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখার পরও একশ্রেণীর স্বার্থান্বেষী তথাকথিত সাহিত্যসেবীরা বাংলাভাষার বামপন্থীদের (?) চক্রান্ত বাংলার আক্ষরিকরূপ পরিবর্তন করে নতুন ভাষার উদ্ভবে তৎপর হয়ে উঠেছিল। তাদের সমস্ত চক্রান্ত যখন ধুলিস্যাৎ করে বাংলাভাষা তার অস্তিত্বের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসল, তখনই তার উপর 'বর্ণমালা সংস্কার' নামক ভাষা সংহারের নতুন খড়গ উদ্যত। উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে বাংলা ভাষাকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে নিয়মান্বয়ের আখ্যায়িত করাই যে তাদের উদ্দেশ্য, তাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

লেখক উল্লেখ করেন যে, ১৯৬৮ সনের ২৫ সেপ্টেম্বর ঢাকায় নজরুল একাডেমী আয়োজিত অনুষ্ঠানে আইউব খান অদূরভবিষ্যতে পাকিস্তানে একটি মাত্র জাতীয় ভাষা গড়ে তোলার আহ্বান জানান এবং এর অব্যবহিত পরেই লাহোরের আঞ্জুমানই তরক্ক-ই-উর্দু আয়োজিত ২ দিন ব্যাপী সম্মেলনে প্রেসিডেন্টের প্রস্তাবের জোর সমর্থন জানিয়ে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেয়ার দাবি জানানো হয়। ১ অক্টোবর ১৯৬৮ প্রেসিডেন্টের মাস-পয়লা বেতার ভাষণে সমগ্র দেশে একটি মাত্র ভাষা সৃষ্টি এবং এক ও অভিন্ন সংস্কৃতি গড়ে তোলার পুনরুল্লেখ করে পাকিস্তানের বিভিন্ন সংস্কৃতির অস্তিত্ব অনৈসলামিক বলে ঘোষণা করেন। বাংলা ভাষার উন্নয়ন প্রশ্নে একশ্রেণীর সংস্কারধর্মী সাহিত্যানুরাগী যখন উদ্দেশ্যমূলকভাবে বর্ণমালা সংস্কার করে বাংলা ভাষার রূপ রাতারাতি পরিবর্তনে ব্যস্ত, ঠিক তখনই এক ও অভিন্ন জাতীয় ভাষা ও সংস্কৃতি সৃষ্টি করার জোর প্রস্তাব উত্থিত হচ্ছে। সুতরাং বাংলা ভাষা সংস্কারের অন্তরালে যে দুরভিসন্ধি কাজ করে যাচ্ছে তা যে অচিরেই বাংলা ভাষাকে নিশ্চিহ্ন করণে সহায়ক হবে, তাতে তর্কের অবকাশ নেই। বস্তুত বাংলা ভাষার উপর এহেন বিপর্যয় আজ নতুন করে দেখা দেয় নাই এবং প্রশ্নের বিনিময়ে হলেও বাঙালি যে বাংলা ভাষার মান অক্ষুণ্ণ রাখবে তা অস্বাভাবিক কিছুই নয়। তবুও বামপন্থীদের চেষ্টার বিরাম নাই।

লেখক আরো বলেন :

শুধু ভাষার প্রশ্নই নয়, এবারে সংস্কৃতির প্রশ্নও জড়িত হয়েছে। জাতীয় সংহতির খাতিরে আঞ্চলিক সংস্কৃতি বিলুপ্তি করণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জাতীয় তমদ্দুন কি হবে তা অবশ্য বিবেচ্য, কিন্তু নিজ নিজ তমদ্দুন বর্জন করে এ সম্পূর্ণ নতুন সংস্কৃতি গ্রহণ করা যে রাতারাতি সম্ভব নয়—তা বলাই বাহুল্য। যে ভৌগোলিক কারণে পাকিস্তানে ভিন্ন ভিন্ন তমদ্দুনের উৎপত্তি তাকে অস্বীকার করলে পাকিস্তানের ভৌগোলিক সীমারেখাকেও অস্বীকার করা হয়। পাকিস্তানের উভয় অংশে ভৌগোলিক অবস্থান হেতু যে ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতির উদ্ভব হয়েছে, তাদের অস্তিত্ব কখনও অস্বীকার করার উপায় নাই। একই দেশে প্রচলিত ভিন্ন ভিন্ন



সংস্কৃতি যে অনৈসলামিক নয়—তা সম্প্রতি রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত নিখিল পাকিস্তান ইতিহাস সন্মেলনে ভাষণ দানকালে প্রবীণ ঐতিহাসিক ডক্টর মাহমুদ হোসেন দ্ব্যর্থহীনভাষায় ঘোষণা করেছেন। বস্তুত সংস্কৃতি ও সংহতি সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস—ইহা কখনও একে অপরের পরিপন্থী হতে পারে না। সংস্কৃতি মানুষের দৈনন্দিন জীবনের প্রেম, আবেগ-অনুরাগ ইত্যাদির অভিব্যক্তি। ইসলামের দৃষ্টিতে সকল মানুষ সমান-পরস্পর পরস্পরের ভাই ভাই ; কিন্তু তাই বলে ইসলাম কখনও আঞ্চলিক কৃষ্টিকে বর্জন করার নির্দেশ দেয় নাই। ইসলাম কখনও ভৌগলিক সীমারেখা অস্বীকার করেনা। এজন্য বিশ্বের বিভিন্ন ইসলামিক রাষ্ট্রে ধর্মীয় কৃষ্টির সহিত বিভিন্ন আঞ্চলিক কৃষ্টির সহ-অধিষ্ঠান দেখতে পাই—যদিও এ সকল দেশের অধিবাসীদের ধর্মমত একই। উদাহরণস্বরূপ ইরান, ইন্দোনেশিয়া, তুরস্ক, মিশর প্রভৃতি দেশের অধিবাসীরা ইসলাম ধর্মাবলম্বী হলেও—তাদের প্রাকইসলামিক কৃষ্টিতেই গর্বের সাথে পালন করছে, কিন্তু এজন্য তাদের ধর্মমত শিথিল হয়েছে বলে জানা নেই।...পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলের লেখকদের চিন্তাধারা এক হলেই তাদের বিভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতি এক হতে হবে—এমন নয়।...সংস্কৃতি যেহেতু সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি করে না।...বাংলাভাষা সংস্কারের যে প্রকৃতস্বরূপ উদঘাটিত হয়েছে তাতে প্রদেশবাসীর মনে ভাষা আন্দোলনের পূর্বের ইতিহাসই উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। অভিষ্ঠ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে যারা সংস্কারের নামে বাংলা ভাষার মান ক্ষুণ্ণ করে বিলুপ্তি সাধনে ব্যস্ত, বাঙালী জনসাধারণ তাদের থেকে সাবধানে থাকলেই বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিবেন।<sup>১৮</sup>

উপর্যুক্ত রচনাটি যে মোহাম্মদীতে ছাপা হয়েছিল, তা ভাবতে একটু খটকা লাগে। আবুল কাসেম ফজলুল হকের ‘রূপান্তরের মুখে আমাদের সাহিত্য’ শীর্ষক নিম্নোক্ত প্রবন্ধও যে মোহাম্মদী ছেপেছিল—এটাও বিশ্বাস করতে সামান্য হলেও বেগ পেতে হয়। কম্যুনিজম, সমাজতন্ত্র, চীন-রাশিয়ার সাহিত্যের আদর্শবিরোধী প্রচারে যে মোহাম্মদী উচ্চকণ্ঠ—সেই মোহাম্মদী বামপন্থীশিবিরের মুক্তবুদ্ধির উপাসক (কম্যুনিষ্ট নন) আবুল কাসেম ফজলুল হকের এই ব্যতিক্রমী, গতানুগতিকতার মূলে আঘাতকারী বক্তব্য ছেপেছিল এই কারণে যে তখন পাকিস্তানবাদী ধ্যানধারণায় পঁচন ধরেছে এবং পশ্চিমপাকিস্তানীরা যে পূর্ববঙ্গকে সংহত পাকিস্তানের এক সংস্কৃতি ও সাহিত্যাদর্শের নামে শোষণ করে চলেছে—তা তারা বুঝতে শিখেছে ব্যাপকভাবে। তাই সারাদেশে আইউব-বিরোধী তথা পূর্ববঙ্গের স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে উচ্চকিত আন্দোলনএর জোয়ার তখন বয়ে চলেছে। সমাজব্যবস্থাই যেখানে পরিবর্তনের সম্মুখীন—সেখানে সাহিত্যও যে রূপান্তরের প্রত্যাশী তা সকল বিবেকবানই হয়ত উপলব্ধি করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেই নতুন সাহিত্য যা সমাজ-সভ্যতাকে পাশ্টে দেবে, গড়ে তুলবে নতুন মন-মনন—তা সৃষ্টি করার মত যোগ্যতরের আবির্ভাব তখনও ঘটেনি, তাই হয়তো রূপান্তরের সম্ভাবনাই কেবল আলোচিত হচ্ছিল। কিন্তু তার মূল্যও কি কম ?

লেখক বলেন : ‘আধুনিক বাংলা সাহিত্য এবং পূর্ববাংলার সাহিত্যে যে ধারা আজও অব্যাহত, বিবর্তনের সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে সে ধারা বর্তমানে এক রূপান্তরের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে।’ কারণ পরিমাণ ও বহিরঙ্গের দিক থেকে সাহিত্যের প্রাচুর্য ও ঐশ্বর্য পরিলক্ষিত হলেও ‘আন্ত-সম্পদের সমৃদ্ধি বিচার করতে গেলেই দেখা যায় পূর্ববাংলার সাহিত্য নিতান্ত দরিদ্র।’ এই ‘দরিদ্র’ সাহিত্যস্রষ্টারা কয়েকভাবে নিজেদেরকে বিভক্ত করে সৃষ্টিতে নিরন্তর সক্রিয় ও সচল থাকলেও কোন দিক থেকেই তাঁরা নতুন প্রাণের ও নবজীবনের প্রাণ সঞ্চারিত করতে পারছেন না।

প্রথমত পূর্ববাংলার অভিজাত সাহিত্যিকদের একাংশ ক্ষয়িষ্ণু পশ্চিমা ধনতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদী সমাজব্যবস্থাজাত জীবনভাবনায় আক্রান্ত। আন্তর্জাতিকতাবাদের অনুসারী হতে গিয়ে তাঁরা স্বদেশের বৃহত্তর জনজীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন হয়ে পড়েছেন ; তারা 'শিল্পের জন্য শিল্প' এই শ্লোগানেরই অনুসারী।...পাকিস্তানোত্তরকালে পূর্ববাঙলায় যে কবি সাহিত্যিকেরা প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন তাদের অধিকাংশই এই শাখার অনুসারী।

দ্বিতীয়ত অভিজাত সাহিত্যিকদের আর এক অংশ অতীতের আদর্শের পুনরুজ্জীবনের কথা বলে কার্যত ইতিহাসের চাকাকে পেছনের দিকে ঘুরাতে চান। এখনও তাঁরা সামন্ত যুগের জীবনভাবনায় আচ্ছন্ন—জীবনজগতের প্রতি তাঁরা তাকান মধ্যযুগের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ; অথচ আধুনিকতার আবরণ দিয়ে তাঁরা মধ্যযুগীয় ভাবনা—চিন্তাকে ঢাকতে চান। অতিরিক্ত আরবি-ফার্সি-উর্দু শব্দের অলঙ্কার পরিয়ে বাংলাভাষাকে তারা এছলামী জ্বানে পরিণত করতে প্রয়াসপন্ন। মধ্যযুগের অলৌকিকতানির্ভর জীবনভাবনাকেই তাঁরা বর্তমানের পটভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করতে চান। বিজ্ঞানের অনন্ত সম্ভাবনাকে স্বীকার করতে তাঁরা অনিচ্ছুক। তাঁরা রবীন্দ্রসাহিত্য ও বাংলাসাহিত্যের এক বিরাট অতীতকে বর্জন করার কথা বলেন। এক এক সময় ধর্মীয় আদর্শের এক এক রকম বিকৃত ব্যাখ্যা দিয়ে তাঁরা পশ্চিমা আদর্শের সঙ্গে ইসলামী আদর্শের সমন্বয় সাধনের কথা বলেন। তাদের সৃষ্টির কতটুকু পশ্চিমা আর কতটুকু ইসলামী তা বুঝা মুশকিল। প্রকৃতপক্ষে তাঁদের সৃষ্টি ইসলামিক নয়, পশ্চিমাও নয়, তার মধ্যে কোন স্বাভাবিক সূত্র সুন্দর জীবন—জিজ্ঞাসার অভিব্যক্তিও নেই।

তৃতীয়ত অভিজাতসাহিত্যিকদের অপর একটি ক্ষুদ্র অংশ যারা ধনবাদী, সাম্যবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী সমাজব্যবস্থাজাত ধ্যান-ধারণার অন্তসারণন্যতা বুঝতে পেরে ভিন্নতর দৃষ্টিভঙ্গির এবং দোদুল্যমানচিত্তের পরিচয় দিয়ে প্রায়শ পশ্চিমা ভাবধারার স্রোতেই গা ভাসিয়ে দেন। তাঁদের রচনা শিল্পগুণ বিচারে শ্লোগানোত্তীর্ণ হতে পারেনি।

কোন জিনিস গ্রহণ অথবা বর্জন করতে হবে তা তারা জানেন না। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হয়েই হোচট খান। সাহস নিয়ে যাত্রাপথে নির্বিঘ্নে অগ্রসর হবার মেরুদণ্ডও তাঁদের নেই। চতুর্থত অভিজাত বৃহত্তর বাইরে সচরাচর অভিজাত পরিবেশে অনালোচিত, উপেক্ষিত অর্ধশিক্ষিত কবিয়াল ও পুঁথিকার শ্রেণীর সাহিত্যস্রষ্টা ও সংস্কৃতিকর্মীর কিছু অস্তিত্ব রয়েছে, কিন্তু তাঁরা আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের সুযোগবঞ্চিত এবং সেকারণে পশ্চাত্যবর্তী। তাঁদের পক্ষে এখনও উন্নতমানের সাহিত্য রচনা সম্ভব নয়। অথচ বর্তমান যুগ সামন্তবাদ পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের চূড়ান্ত অবসানের যুগ,—বর্তমান যুগ বিশ্বজুড়ে বিজ্ঞানের বিজয়ের যুগ, বিজ্ঞানকে মানুষের কল্যাণে প্রয়োগ করার যুগ। আজ প্রয়োজন সামন্তবাদী, পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী যুগের ধ্যান-ধারণাকে পরিত্যাগ করা ও সেই সঙ্গে বিজ্ঞানভিত্তিক নতুন বিশ্বদৃষ্টি অনুসন্ধান করা—অর্জন করা এবং সেই নতুন বিশ্বদৃষ্টি নিয়ে জীবন ও জগতকে নতুন করে উপলব্ধি করা। 'অথচ পূর্ববাঙলার সাহিত্যে এর বিপরীত লক্ষণই প্রকট। নতুন বিশ্বদৃষ্টির অনুসন্ধিৎসা হঠাৎ আলোর বলকানীর মত এক আধটু দেখা দিয়েই তা আবার নিশ্চত হয়ে যায়।'

'পূর্ববাঙলার বর্তমান সাহিত্যের ঐতিহাসিক পটভূমি' সম্পর্কে লেখক বলেন : মধুসূদনের সময় থেকে বাংলা সাহিত্যের যে ধারার সূচনা—বর্তমানে সে ধারা তার শৈশব-কৈশোর-যৌবন অতিক্রম করে বার্ধক্যের শেষধাপে এসে পৌঁছেছে। মধুসূদনের সময় ছিল বাংলাসাহিত্যের এ ধারার শৈশব, বঙ্কিমের সময় কৈশোর, রবীন্দ্রনাথের সময় যৌবন এবং

কল্লোলের সময় থেকেই এর বার্ষিকের সূচনা। কিন্তু এই ধারার গভেই আবার জন্ম নিয়েছে নতুন এক ধারা—সে ধারা হল নজরুল-সুকান্ত-মানিক-সুভাষের দ্বারা সূচিত সাম্যবাদের চেতনায় উদ্বুদ্ধ ধারা এবং এই ধারাতেই বর্তমানে আমরা সেই সব লেখককে পাই যারা সামন্তবাদী, পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী যুগের ভাবধারাকে বর্জন করে নতুন মূল্যবোধের অনুসন্ধান করেন, অথচ দোদুল্যচিন্তার পরিচয় দিয়ে অনেক সময়ই পশ্চিমা ভাবধারার স্রোতে গা ভাসিয়ে দেন। প্রকৃতপক্ষে নজরুল-সুকান্ত-মানিক-সুভাষের দ্বারা, বাংলাসাহিত্যের যে ধারার সূচনা হয়েছিল, পূর্ববাঙলার সাহিত্যে সেধারা আজও মোটেই উৎকর্ষ অর্জন করেনি।

স্বাধীনতা অর্জনের ফলে পূর্ববাঙলার সাহিত্যে গুণগত কোন পরিবর্তন আসেনি, এমনকি স্বাধীনতার চেতনায় পুষ্ট তেমন সাহিত্যও পাকিস্তান আমলে সামান্যই সৃষ্টি হয়েছে। স্বাধীনতা অর্জনের মধ্য দিয়ে মানুষ যে সুখী-সুন্দর সমাজজীবনের স্বপ্ন দেখেছিল, স্বাধীনতা অর্জনের পর সে স্বপ্ন সম্পূর্ণ নস্যৎ হয়ে যাওয়ার ফলেই হয়তো এটা হয়েছে। ১৯৫২ সনের ভাষা-আন্দোলনের চেতনা পূর্ববাঙলার সাহিত্যে এক উল্লেখযোগ্য ছাপ রেখে গেছে। সামন্তবাদী জীবনভাবনাকে বিসর্জন দেয়ার এক বলিষ্ঠ প্রয়াস তখন থেকে তরুণ লেখকদের মধ্যে দেখা দেয়। ধনতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদী যুগের জীবন ভাবনাকে বিসর্জন দেওয়ার চেষ্টাও লক্ষিত হয়। ... সাম্যবাদী ধারার প্রতিও তরুণ লেখকদের আগ্রহ দেখা দেয়, ভাষা-আন্দোলনের পর থেকে ‘আমাদের লেখকেরা পুরোনো মূল্যবোধকে যতটা অস্বীকার করেছেন নতুনের অন্বেষণে ততটা অগ্রসর হননি। ভাষা আন্দোলন যখন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সঠিক পথ ধরে যৌক্তিক পরিণতির দিকে অগ্রসর হতে পারেনি, সাহিত্যও তখন আর প্রগতিশীল পথে অগ্রসর হতে পারেনি—হতাশার অন্ধকারে নিমগ্ন হয়েছে।’

বাঙালি মুসলমান কবিসাহিত্যিক এবং বুদ্ধিজীবী-রাজনীতিবিদদের বৃহদাংশ বুর্জোয়া মধ্যশ্রেণীর সদস্য। ঔপনিবেশিক আমলে তারা প্রভুভক্ত প্রাণীর মত ইংরেজদের অনুগ্রহের জন্য লালায়িত ছিল। কোন সক্রিয় আদর্শ সামনে নিয়ে সাময়িকভাবেও ইংরেজ প্রভুদের বিরুদ্ধে কোনদিন আপোষহীন হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এই শ্রেণীর যে অংশ ক্ষমতায় গিয়েছে তা আগাগোড়াই সাম্রাজ্যবাদের ছত্রছায়ায় লালিত হয়েছে, আর যে অংশ ক্ষমতায় যেতে পারেনি তারা বিভিন্ন মতামতে বিভক্ত হয়ে কোন আদর্শে অটল থাকতে পারেনি। কিংবা আদর্শের সন্ধানে একনিষ্ঠ হতে পারেনি সমগ্র জনগণকে আদর্শের পতাকাতে একত্রিত করা দূরের কথা। এই শ্রেণী সামগ্রিকভাবে এখন মুমু্ষু অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। ‘বাংলা সাহিত্যের আধুনিক ধারা শৈশব-কৈশোর-যৌবন প্রভৃতি স্তর অতিক্রম করে বর্তমানে বার্ষিক্যে পৌঁছেছে। তেমনি পূর্ববাঙলার বর্তমান অভিজাতশ্রেণীও তার জীবনের শৈশব-কৈশোর-যৌবন প্রভৃতি স্তর অতিক্রম করে এখন বার্ষিক্যের শেষ প্রান্তে পৌঁছেছে। এই শ্রেণীর রাজনীতিকেরা আজ স্ববিরোধী কথা বলেন। যারা ক্ষমতায় আছেন তাঁদেরও কথার সঙ্গে কাজের সঙ্গতি নেই এবং আজকের কথার সঙ্গে কালকের কথা সামঞ্জস্যহীন। আর যারা ক্ষমতায় নেই, তাঁরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হলেও প্রত্যেক দলেরই অবস্থা মূলত

এক। কথা ও কাজ পরস্পর সম্পর্কহীন—বক্তব্য পারমপর্যহীন। এই শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীর ফাঁকা মস্তিষ্ক ও নিবীৰ্যতার পরিচয়ও আজ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই শ্রেণীর শ্রেণীগত অবস্থানে অটল থেকে তাদের পক্ষে চিন্তার ক্ষেত্রে প্রগতিশীল নেতৃত্বদান আজ আর সম্ভব নয়। অনুগ্রহলোলুপ, করুণালোভী, আত্মবিক্রীত বুদ্ধিজীবীদের কাছ থেকে চিন্তার ক্ষেত্রে প্রগতিশীল নেতৃত্বদান আজ আর সম্ভব নয়। অনুগ্রহলোলুপ, করুণালোভী, আত্মবিক্রীত বুদ্ধিজীবীদের কাছ থেকে চিন্তার ক্ষেত্রে প্রগতিশীল নেতৃত্ব আশা করা আজ বাতুলতা মাত্র। এই শ্রেণীর তরুণদেরও ছাত্রদের একাংশ আজ চরম উচ্ছৃংখল ও উন্মার্গগামী। তবে তরুণদের মধ্য থেকে এবং ছাত্রদের মধ্য থেকে অনেকের শ্রেণীচ্যুত হয়ে জনগণের সঙ্গে মিশে গিয়ে প্রগতিশীল আন্দোলনে অংশ গ্রহণের ও নেতৃত্বদানের সম্ভাবনা রয়েছে। এই শ্রেণীতে যারা আজ ভাল মানুষ বলে এবং প্রগতিশীল বলে পরিচিত, তারা নিতান্ত নিরীহ—বলা চলে একেবারেই পৌরুষহীন। প্রগতিশীল ভূমিকায় কোন ক্ষেত্রেই নেতৃত্বদান তাদের পক্ষে সম্ভব না হলেও যদি দেশে কোন বলিষ্ঠ প্রগতিশীল নেতৃত্ব আত্মপ্রকাশ করে, তাহলে তারা সেই নেতৃত্বের ছায়াতলে দাঁড়াতে হয়তো কুষ্ঠিত হবেন না এবং অনেকে হয়তো সেই নেতৃত্বকে সাহায্য করতেও এগিয়ে আসবেন। যে শ্রমিক কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষের উৎপাদনের ওপর নির্ভর করে এই শ্রেণী আজও সমাজের উপরতলায় অবস্থান করছে। তারাও আজ সচেতন হয়ে উঠেছে, ‘ভাবছ তোমরা রহিবে তেতলার উপরে আমরা রহিব নীচে, অথচ তোমাদের দেবতা বলিব সে ভরসা আজ মিছে’। আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদও আজ দুর্বল হয়ে এসেছে। তাই মৃত্যুর আগে শেষ মরণকামড় দেবার চেষ্টা করলেও বিশ্বজুড়ে জনগণের রুদ্ধরোধের সামনে সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে বিদেশে ক্ষয়িষ্ণু ধনিক শ্রেণীকে ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখার অবস্থা হয়তো আর বেশিদিন থাকবে না। তাই সব দিক থেকেই এই শ্রেণী আজ সহায়হীন—ইতিহাসের মঞ্চ থেকে এই শ্রেণীর এখন বিদায় নেবার পালা। Classes struggle ; Some classes triumph, others are eliminated such is history, such is the history of civilization for thousands of year. ‘—এই কথা যদি সত্যি হয় তাহলে এই শ্রেণী অবশ্যই ইতিহাসের মঞ্চ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে।’

‘পূর্ববাঙলার বর্তমান সাহিত্য পরিবেশ’ সম্পর্কে উপর্যুক্ত লেখক বলেন, ‘আধুনিক বাংলাসহিত্য পূর্ববাঙলায় যে রূপ লাভ করেছে, তাতে তার সামনে গতানুগতিক ধারায় বিকাশ লাভের প্রচুর বাহ্য সুযোগ রয়েছে, কিন্তু বিকাশের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা তার নেই। অপর দিকে এ ধারার গর্ভে সাম্যবাদী চেতনায় পুষ্ট যে নতুন ধারা জন্ম নিয়েছে তার সামনে বিকাশের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা অফুরন্ত, কিন্তু বিকাশের পথ বন্ধুর ও কন্ট্রাক্টরী।’

সাম্যবাদী পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী যুগের জীবনভাবনাকে সাহিত্যে রূপ দিয়ে প্রকাশ করার মত পত্র-পত্রিকার অভাব নেই। রেডিও, টেলিভিশন থেকে আরম্ভ করে সরকারি বেসরকারি অসংখ্য পত্রপত্রিকা প্রদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আজ প্রকাশিত হচ্ছে। এ ধরনের বইপত্র প্রকাশের ক্ষেত্রেও প্রকাশকের অভাব নেই। যে সব বই উন্নতমানের বলে পরিচিত, সেগুলোর পাঠকসংখ্যা ধর্তব্যের প্রায় বাইরে হলেও ক্রেতার অভাব নেই। ...এসব সাহিত্যের

পৃষ্ঠপোষকতায় দেশের ধনিকেরা এবং সরকার আজ এগিয়ে এসেছেন... অনেকগুলো সাহিত্যপুরস্কারের ব্যবস্থা হয়েছে... সাহিত্যিকদের জন্য সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় লেখকসংঘ, জাতীয় সংহতি কাউন্সিল, বাংলা একাডেমী, বাংলা উন্নয়ন বোর্ড ও বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থা প্রভৃতির মাধ্যমে প্রচুর অর্থও সরকার ব্যয় করছেন। ব্যয়বহুল অভিজাত হোটেল আজকাল বেশ ঘনঘন সাহিত্যসভাও অনুষ্ঠিত হচ্ছে—মৃত্যুর দিন যখন ঘনিয়ে এসেছে, তখন তাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আয়োজনের অন্ত নেই।

অপর দিকে সাম্যবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ যে নতুন সাহিত্য-ধারা জন্ম নিয়েছে, তার সামনে বিকাশের পথ কষ্টকাকীর্ণ। কোন ধনবান ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান আজ এ ধারার কোন সাহিত্যকে পুরস্কৃত করার জন্য কিংবা কোন দরদী প্রকাশক এ ধারার সাহিত্য প্রকাশ করার জন্য অপেক্ষা করে নেই। এ ধারার সাহিত্য যদি অভিজাত শ্রেণীর লেখক-লেখিকা ও পাঠকপাঠিকার হাতে পড়ে, তাহলে তাঁরা তাকে অপাৎক্ষেয় করে রাখেন। বলিষ্ঠতার সঙ্গে এ ধারার সাহিত্য যদি আত্মপ্রকাশ করে তাহলে তার উপর চরম নির্যাতন নেমে আসারই সম্ভাবনা।

লেখক বলেন, তথাপি 'বিকাশের অন্তস্থিত সম্ভাবনা বর্তমানে এই ধারারই রয়েছে এবং সে সম্ভাবনা অফুরন্ত'। কিন্তু তাঁর প্রশ্ন : নতুন ধারার সাহিত্য বিকশিত হয়ে ওঠার অন্তরায় সম্পর্কে পরিবেশের অজুহাত কি যুক্তিসিদ্ধ? 'নতুন তো কোনদিন পরিবেশের দাসত্বকে বরণ করে নেয় না—সে হয় পরিবেশের প্রভু। ... 'পূর্ববাঙলার প্রতিশ্রুতিশীল তরুণ সাহিত্যিকদের' এই শ্রেণীর (প্রগতিশীল বলে পরিচিতদের) মোহ থেকে মুক্ত হতে হবে—নিজেদেরকে এই শ্রেণীর বাইরে এবং বিপুল জনগণের অন্তর্গত বলে ভাবতে হবে এবং মনে রাখতে হবে এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত থাকতে আজ আর কল্যাণ নেই। তাঁদের নতুন সাহিত্য রচনায় অটল থাকতে হলে আপোষহীন ভাবে জনগণের ভূমিকায় দাঁড়াতে হবে—জনগণকে জানতে হবে, জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিনিধিত্ব করতে হবে।' সেজন্য লেখক-লেখিকার শ্রেণীগত অবস্থান ও ভূমিকার প্রশ্নটিকে অবশ্যই আজ একটি মৌলিক ও নীতিগত প্রশ্ন হিসেবে বিবেচনা করার প্রস্তাব উপস্থাপন করেছেন, কারণ অভিজাত শ্রেণীর ভূমিকায় থেকে 'কোন অবস্থাতেই আন্তরিকভাবে নিজেদের সাহিত্যপ্রচেষ্টায় অটল থাকা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হবেনা।' তাছাড়া প্রগতিশীল বলে পরিচিতদের বিগত দুই দশকের সামাজিক ভূমিকা বিশ্লেষণ করে আলোচক বলেন-সাংস্কৃতিক আন্দোলনে তথা চিন্তার ক্ষেত্রে নেতৃত্বদানের ক্ষমতা ঐসব প্রতারক প্রগতিশীলদের নেই—

সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অন্যায, অবিচার, উচ্ছ্বলতা অব্যবস্থা ও আদর্শহীনতার ফলে আমাদের দেশের মানুষ আজ এক রুদ্ধশ্বাস অবস্থার সম্মুখীন। দেশের বর্তমান অবস্থার তুলনা হতে পারে একমাত্র অন্ধকার যুগের সঙ্গেই। এই সঙ্কটের হাত থেকে দেশকে সমাজকে মানুষকে মুক্ত করার কাজে সাহিত্যিকগণ আজ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন এবং সেভূমিকা পালন না করলে আমাদের শিল্পীসাহিত্যিকেরা তাঁদের ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার পরিচয় দেবেন ও তার ফলে ক্রান্তিকালের অবসান ঘটিয়ে দেশে এক গৌরবময় নতুন যুগের সৃষ্টিও সম্ভব হবে না। বর্তমান সামাজিক সঙ্কটের অবসান ঘটিয়ে এক গৌরবময় নতুন যুগের সৃষ্টির কাজে তরুণদেরকেই আজ এগিয়ে আসতে হবে। সকল প্রকার প্রতিকূলতা ও ব্যর্থতার ভয়কে

অগ্রাহ্য করে বিপ্লবী চেতনাসম্পন্ন তরুণ সাহিত্যিকেরাই নতুন ধারায় সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে তুলতে পারেন।<sup>১৯</sup>

মোহাম্মদীতে রবীন্দ্র-বিরোধিতার স্পষ্ট পরিচয় নেই। বরং একালের মোহাম্মদীতে রবীন্দ্রসাহিত্যের এবং রবীন্দ্র প্রতিভার অনন্যসাধারণত্ব স্বীকার করা হয়েছে। ডক্টর আনিসুজ্জামান ‘মওলানা আকরম খাঁ সাহিত্যিক ও সাংবাদিক’ শীর্ষক এক প্রবন্ধে একটি বাক্যে একটি মন্তব্য করেছিলেন : ‘বলা নিশ্চয়োজন যে, রবীন্দ্রপ্রতিভা মোহাম্মদীর সমাদর লাভ করেনি।’<sup>২০</sup>

একথাটিকে কিভাবে বিশ্লেষণ করা চলে? মোহাম্মদী মুসলমান সমাজের জাগরণের মুখপত্র। তাঁরা নিজেদের উন্নতির চিন্তাতে এতই বিভোর যে দিবারাত্র নিজেদের অনুন্নতির কারণ অনুসন্ধান করেছেন। পতনের সম্ভাবনা দেখলেই চিৎকার করে স্বজাতিকে সতর্ক করতে চেয়েছেন। উন্নত সমাজের উন্নত কবির মহৎ কাব্য প্রতিভার প্রশংসা করার তাঁরা প্রয়োজন বোধ করেননি। কারণ মধুসূদন-বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের সাহিত্যের সমাদর করার লোকের ও পত্রেরও অভাব নেই। বরং মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে গিয়ে, স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে যাদেরকে প্রতিপক্ষরূপে চিহ্নিত করতে হয়েছে মধু-বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ তাঁদেরই গর্বের বিষয় ও বস্তু বিধায় স্বাতন্ত্র্যবাদীরা অন্যত্র প্রাণরস আহরণ করেছেন। তাছাড়া মোহাম্মদীর আয়ুষ্কাল আর পাকিস্তানবাদ-এর উন্মেষ ও পাকিস্তান-আন্দোলন তীব্র হবার কাল এবং পাকিস্তান সৃষ্টির পর তার পরিবর্ধনের সময় পরিসরেই মোহাম্মদীর জন্ম, শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও প্রৌঢ়ত্ব এবং জ্বরাজীর্ণ বৃদ্ধকালের পর মৃত্যু ঘটেছে। এই সময়ে মুসলমান সমাজ, ইসলাম, ইসলামি-বিশ্ব, পাকিস্তানের মনস্তাত্ত্বিকভিত্তি ইত্যাদি বিষয় নিয়েই উন্মত্ততার মধ্য দিয়ে চলেছে।

অতএব রবীন্দ্রসাহিত্যের সমাদর না করার জন্য তাঁদেরকে দোষ দেয়া যায় না। কিন্তু, যেকথা আগে পূর্ববাঙলার অতি আধুনিক কবি-সাহিত্যিক-প্রাবন্ধিকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, সেকথারই পুনরুক্তি করে বলতে হয়,—সর্বজনস্বীকৃত প্রতিভাকে যখন তাঁরা হীন বলেন, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেন, তখন খুবই বিরক্তি লাগে, মুর্থতার চূড়ান্ত বলে হয়। ঐরকমই রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁদের কোনো কোনো উক্তি বিভাগপূর্ববর্তীকালে অর্থাৎ ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে রবীন্দ্রপ্রসঙ্গে আছে বটে, এবং তাতে ভাবখানা এমন ফুটে উঠেছে যে, মুসলমানদের মধ্য থেকে রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির মতো মহান কাব্য অনেকেই লিখেছেন বটে, কিন্তু নোবেল পুরস্কার পান গীতাঞ্জলির কবি ! নিশ্চয়ই এর মধ্যে গুরুতর পলিটিঙ্গ আছে !

সে-যাই হোক, সাতচল্লিশপর্ববর্তীকালে প্রকাশিত মোহাম্মদীতে রবীন্দ্রসাহিত্যের ওপরে কতিপয় রচনা প্রকাশ পেয়েছে। এতে রবীন্দ্র-বিদ্বেষ প্রকাশ পায়নি, আর রবীন্দ্র-সাহিত্য বর্জনের ধূয়া ওঠার কালে ঐরা চুপচাপ ছিলেন (‘মোহাম্মদী’ই বিবেচ্য এখানে, ‘আজাদ’ নয়)। তবে একটু সদয়ভাবে পরীক্ষা করলে দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথকে মোহাম্মদী পরিত্যাগ করেনি। ২৪ বর্ষ ৯ সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৬০ এ শ্রী মোহিনীমোহন দত্ত ‘রবীন্দ্রানুধ্যান’ শীর্ষক কলামে লিখেছেন (‘সাহিত্য প্রসঙ্গ’; পৃ ৭২৫) “জ্যোতিষ্মণ্ডলীর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যথাথই ‘রবি’।

বসুধা চক্রবর্তী বর্ষ ২২, সংখ্যা ১ এ ১৯৫০ সনের নভেম্বরে (কার্তিক ১৩৫৭) লিখেছিলেন প্রবন্ধ ‘রবীন্দ্রোত্তরযুগে রবীন্দ্রনাথ’। ভবেশ মুখোপাধ্যায় ২২ বর্ষ ৯ সংখ্যায় (আষাঢ় ১৩৫৮) লিখেছিলেন ‘রবীন্দ্রনাটক’ শীর্ষক প্রবন্ধ। মাহফুজুল হক ২৩ বর্ষ ১ সংখ্যায় (কার্তিক ১৩৫৮) লিখেছিলেন ; “রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে ব্যক্তি ও সমাজ”। এবনে গোলাম সামাদ ‘বলাকার দর্শন’ নিয়ে প্রবন্ধ লিখেছিলেন ২৪ বর্ষ ৬ সংখ্যায় (চৈত্র ১৩৫৯)। শ্রী শিশিরকুমার বসাক লিখেছিলেন ‘রবীন্দ্রনাথের ওপর ইংরেজ কবিদের প্রভাব’ (বর্ষ ২৯, সংখ্যা ৭, বৈশাখ ১৩৬৫)।

কবিতায় রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের নিদর্শনও আছে। ২৫ বৈশাখ এ রবীন্দ্রনাথের স্তুতি করে কবিতা লিখেছিলেন শামসুল হক (পঁচিশে বৈশাখ, বর্ষ ২৪, সংখ্যা ৬ চৈত্র ১৩৫৯, পৃ ৪২৮) ; এবং আ.ন.ম. বজলুর রশীদ (পঁচিশে বৈশাখ, ২৪ বর্ষ, সংখ্যা ৭, পৃ, ৫১৬) ; এবং আরও অনেকে। শরৎসাহিত্য এবং আরও অসংখ্য হিন্দুসাহিত্যিক, কবির কাব্যপ্রতিভার ওপর প্রবন্ধ রচনার নিদর্শন ভুরিভুরি আছে মোহাম্মদীতে। হিন্দুলেখকেরাও অনেক লিখেছেন। এখানে সাহিত্যপত্রিকার চারিত্র খুঁজলে ব্যর্থ হবার সম্ভাবনা নেই। তবে হ্যাঁ, মোহাম্মদীর লেখক সমালোচকেরা নজরুল, ইকবাল, মীর মোশাররফ হোসেন এবং আধুনিক ও মধ্যযুগীয় মুসলিম কবি সাহিত্যিক, আর আরব-ইরানের সুফী দার্শনিক, কবিসাহিত্যিক, রুমী-সাদী-নিজামীর কাব্যপ্রতিভা ; এবং পশ্চিম-পাকিস্তানি কবি-সাহিত্যিকদের প্রতি যতোটা অনুরাগী হয়েছিলেন, তাতে বিশেষত্ব আছে।

বৈশাখ ১৩৬৮ সনের মোহাম্মদীর সম্পাদকীয়তে লেখা হয় ; ‘রবীন্দ্রনাথ ও ইকবালের জন্মবার্ষিকী পালন করা দরকার কারণ, ইকবাল পাকিস্তানের স্বপুত্র কবি। রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষাকে বিশ্বের দরবারে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। তবে রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী পালন যেন শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রপূজায় পর্যবসিত না হয়—এই দিকে লক্ষ্য রাখা আজ যথার্থ রবীন্দ্রভক্তদেরও কর্তব্য।’ (পৃ ৫৮৮) ; লেখকেরা মনে করতেন মোহাম্মদীতে লিখতে হলে মুসলিম ঐতিহ্যে গর্বিত হয়েই লিখতে হবে। এজন্য মোহাম্মদীর বিষয়বস্তু ইসলাম ও মুসলিম প্রধান। মোহাম্মদীর দর্শন হলো মুসলিম বা ইসলামী জাতীয়তাবাদ এবং তার ভৌগোলিক ভিত্তি পাকিস্তান। ‘প্রবাসী’তে ঠিক এরকমই দেখা যায়। সেখানে মুসলিম লেখক ও বিষয়বস্তু অতিশয় নগণ্য।

## ৪. মোহাম্মদীর সংস্কৃতি-চিন্তা

সংস্কৃতি-চিন্তার ক্ষেত্রেও তাঁরা এই স্বাতন্ত্র্য মনে রেখেছেন। পাকিস্তান কায়েম হওয়ার পর জীবনের অন্যান্যদিকের ন্যায় সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও কিছুটা সমস্যা দেখা দেয় এবং মোহাম্মদীর লেখকেরা সেজন্য সংস্কৃতিক সমস্যা সমাধানের পথ অন্বেষণ করেছেন। পাকিস্তানের সংস্কৃতিকে গ্রহণেচ্ছু যুগোপযোগী করা ছাড়া উপায় নেই বলে ব্যাখ্যাতারা মত দিয়েছেন। কারণ দেশের সকল যুগের উপযোগী ধর্ম-দর্শন হিসেবে গণ্য করে ইসলামীরাষ্ট্রেও আধুনিক সংস্কৃতি—চারুকলা, নৃত্য, অভিনয়, সিনেমা (নারী-পুরুষের যৌথ অবশ্যই) সবকিছুকে

স্বীকার করে নেবার পক্ষেই মত দেয়া হয়েছে। না দিয়ে উপায় কি? সমাজ পরিবর্তিত, আধুনিক যুগের সঙ্গে তাল রেখে চলতে গেলে রাষ্ট্রীয়ভাবেই এসবকে পৃষ্ঠপোষকতা না করে উপায় নেই। রাষ্ট্রীয়ভাবে পৃষ্ঠপোষকতা দান করতে গিয়ে দেখা গেল যারা ইসলামের অনুমোদিত সমাজব্যবস্থার জন্য এককালে সংগ্রাম করেছিলেন তাঁরাই এখন একটি আধুনিক রাষ্ট্রের কর্ণধার। তাঁদেরকে বিদেশে গিয়ে অত্যাধুনিক অনৈসলামিক রাষ্ট্রের পতিদের সঙ্গে ওঠাবসা খাওয়া-দাওয়া করতে হয়। সেসব দেশের সাংস্কৃতিক ট্রেডিশনকে অস্বীকার করে মনে মনে ঘৃণা অনুভব করলেও বিশ্বের একটি অংশের সমাজপতি হিসেবে ঘরের কোণে চুপ করে বসে থাকা চলে না। একারণেই পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক জীবনে আধুনিকতার সকল বৈশিষ্ট্যকে মেনে নেয়া হয়েছে; পত্রপত্রিকার আলোচনাতেও সেগুলো না মেনে উপায় কি? বরঞ্চ এ কথা জোরে-সোরে উপস্থাপন করা হয়েছে। কখনও কারণবশত জনমতকে নিরস্ত্র করা হয়েছে, বহির্বিশ্বের আধুনিক এই সাংস্কৃতিক প্রভাবকে অনৈসলামিক বলে যাতে হেঁচো না করা হয়। প্রতিনিধিত্বকারী কয়েকটি রচনার সারাংশ উদ্ধৃত করে মোহাম্মদীর সাংস্কৃতিক চিন্তা-ভাবনার পরিচয় গ্রহণ করা যেতে পারে।

১৯৫২ সনের আগস্ট মাসে আবদুল হক কার্জন হলের এক বিচিত্রানুষ্ঠানে গিয়ে আত্ম-জিজ্ঞাসায় লিপ্ত হন :

এই নাচ গান কি জায়েজ? অনুষ্ঠানে মুসলমান মেয়ে ও পুরুষ শিল্পীরা মিলে নাচ-গান করলো, মুসলমান মহিলা ও পুরুষ দর্শকদের দ্বারা হলঘরটি ঠাসা ছিল; আর এই অনুষ্ঠানের আয়োজনও করেছিলেন ইসলামীরষ্ট্র পাকিস্তানের খোদ সরকারি একটি প্রতিষ্ঠান—যাদের পাকিস্তান ও ইসলামের প্রতি আনুগত্য সম্বন্ধে কেউ প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারেন না কোনদিন—, কিন্তু প্রশ্ন হলো “মুসলমান মেয়েদের এই নাচ, আর মুসলমান মেয়ে পুরুষদের দলবঁধে ঠাসাঠাসি করে এই নাচ-গান দেখা কি ইসলাম সমর্থন করে?” উত্তরে লেখক নিজেই বলেছেন : ‘আমি নিঃসন্দেহেই বলতে পারি যে, নগণ্য ব্যতিক্রমের কথা বাদ দিলে, আজকের শিক্ষিত মুসলিম সমাজে এ প্রশ্ন আজ কোনো প্রশ্নই নয়। এ সমাজের জন্য চাই আনন্দের আয়োজন, চাই নাচ, গান, থিয়েটার, সিনেমা। কার্জন হলের যে অনুষ্ঠানের কথা উল্লেখ করেছি, সেরকম অনুষ্ঠান আজকাল হরহামেশাই হয়ে থাকে, আর এসবের রূপায়ণে অংশ নিয়ে থাকে যেমন মুসলমান পুরুষ, তেমনই মুসলমান নারী। দেখার জন্য ভিড়ও করে উভয় শ্রেণীই, আনন্দ পেলে তারা হাততালি দেয়, তারপর তাজা মন নিয়ে ফিরে আসে। এসব আজ তাদের সাংস্কৃতিক জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ। এর মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু আছে, একথা কেউ মনে করে না। কিন্তু এও আমি নিঃসন্দেহেই বলতে পারি যে, সেই ইসলামপুর গ্রামের লোকগুলো (ধর্মীয় অনুশাসন দ্বারা কঠোর ভাবে শাসিত, বিভাগ পূর্ববর্তী কালের মুসলিম বাংলার একটি গ্রাম) যদি এই রাজধানীতে বেড়াতে এসে কৌতূহল বশে সেদিন কার্জন হলে ঢুকতো আর দেখতো যে, মেয়ে-পুরুষের নাচ-গান চলছে, আর সেসব মেয়ে-পুরুষ মুসলমান, তবে ইসলামী রাষ্ট্রে, এসব কাণ্ডকারখানা দেখে তারা শূণ্যে আশ্চর্য হতো তাই নয়, ঠাসাঠাসি করে হাততালি দেওয়ার পরিবর্তে ‘তওবা তওবা’ বলতে বলতে তারা কার্জন হল শূণ্য করে চলে যেত।

এখন পাকিস্তানের আদর্শ-উদ্দেশ্য অনুযায়ী ইসলামপুর গ্রাম, আর ঢাকার কার্জন হলের অনুষ্ঠানে সমবেতশিল্পী ও দর্শক শ্রোতৃমণ্ডলী এই দুটি সমাজের কোনটি ইসলামের অনুবর্তী বলে পাকিস্তানে বিকশিত হতে দেওয়া উচিত? কোন দৃষ্টিভঙ্গী পাকিস্তানের অনুকূল? লেখকের নিঃসন্দেহ জবাব : ‘এ প্রশ্নও আজ অপ্রাসঙ্গিক ও অনাবশ্যক।’ তিনি বলেন—এই



বাঙলারই মুসলমানেরা জারি-সারি-কবি-মারফতী-ভাটিয়ালী প্রভৃতি গান আবহমানকাল ধরে গেয়ে আসছে আর শূনে আসছে। তারই সঙ্গে প্রতিবেশী (হিন্দু?) সমাজের যাত্রা, থিয়েটার, নৃত্য, উত্তর ও পশ্চিম ভারতের মুসলিম কাওয়াল, গুস্তাদ, সংগীত ও সিনেমাশিল্পী এবং অভিনেত্রীরা বাঙলার মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজের বর্তমান সাংস্কৃতিক বিকাশের পথ প্রস্তুত করেছে, যা রুদ্ধ করার উপায় আজ আর নেই। এমন একদিন ছিল, যেদিন নাচ, গান, সিনেমা, থিয়েটার, চিত্রকলা, পর্দা, সুদ, বীমা, পোষাক ইত্যাদি নানান রকম সামাজিক প্রশ্ন নিয়ে উত্তপ্ত বাহাস হয়েছে, মসলা-মাসায়েল প্রচারিত হয়েছে। পত্রপত্রিকায় প্রবন্ধ লেখা হয়েছে, কিন্তু সেসব আজ অতীতের কথা। আজ লাখো লাখো লোক ব্যাংকে টাকা রাখে, সরকারি ঋণপত্র কেনে, এবং সুদ নেয়, কিন্তু তার বিরুদ্ধে কাউকে উচ্চবাক্য করতে দেখা যায় না।

...দেখেছি, পাড়াগাঁয়ে ইন্সিওরেন্স দালালী ব্যর্থ হয়েছে ; ...অথচ আজ ইসলামিকরাষ্ট্রে শুধু যে ইন্সিওরেন্স কোম্পানীগুলোর পসার বাড়ছে, তাই নয়, যাতে আরও পসার বাড়ে এবং সর্বসাধারণ ইন্সিওরেন্সের সুফল পেতে পারে, সেজন্য সরকার স্বয়ং চেষ্টা করছেন। সেভিংস সার্টিফিকেটে ১০ টাকা খাটালে বার বছর পরে কত টাকা পাওয়া যাবে, তারই বিজ্ঞাপনে সরকার দেশ ছেয়ে ফেলেছেন। বিনা ব্যাক্যব্যায়েই যে এসব হচ্ছে, তা নয়। তবে ব্যাক্য ব্যয়ের ধরনটা বদলে যাচ্ছে। ব্যাংক আর ইন্সিওরেন্সের বিরোধিতা যারা করেছেন তাঁরা ইসলামের নামেই করেছেন, আর আজ যারা এসব ব্যবসায়ের পসারের জন্য চেষ্টা করছেন তাঁরাও ইসলামি রাষ্ট্রের স্বার্থে অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত ইসলামেরই স্বার্থে সে চেষ্টা করছেন এবং সে চেষ্টাকে কেউ খারাপ বলছে না। অর্থাৎ দৃষ্টিভঙ্গীর একটা বিপুল পরিবর্তন এসেছে। এমনি পরিবর্তনের আরেকটা উদাহরণ দিচ্ছি। মাস কয়েক আগে ইসলামিক রিভিউ-এর মলাটে একটা ছবি ছাপা হয়েছিল। ১৯৫১ সালের আজাদী দিবসে করাচীর রাজপথে মহিলা ন্যাশনাল গার্ডদের কুচকাওয়াজের ছবি। গভর্নর-জেনারেল তাদের অভিবাদন নিচ্ছেন আর অগণিত লোক রাস্তার দুপাশে থেকে, তিনতলা বাড়ীর প্রত্যেকটি জানালা বারানদা আর আলিশায় ভিড় করে তাই দেখছে।

লেখক সুবিস্তৃত করে বলেন, আজকের পাকিস্তানের মহিলা ন্যাশনাল গার্ডের কুচকাওয়াজ এমন কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়, সত্যিকথা বলতে কি, দেশরক্ষা ব্যবস্থায় তাঁরা আজ অপরিহার্য বলে গণ্য হয়েছেন। কিন্তু লক্ষ্য করার ব্যাপার এই যে, অল্পদিন আগেও স্রেফ ইসলামধর্মের নীতি প্রচার করাই ছিল যে পত্রিকার একমাত্র উদ্দেশ্য, সেই পত্রিকার মলাটের উপরেই যে শুধু এই ছবি অসংকোচে ছাপা হয়েছে, তাই নয়, ছবির ক্যাপসনে বলা হয়েছে : The picture on the cover is symbolic of the resurgent world of Islam.

এ ছবি হচ্ছে মুসলিম জাহানের জাগরণের প্রতীক।...মোটের উপর, নারীস্বাধীনতা চান আর না চান, ওটা আজ বাস্তব সত্য। পর-পুরুষের সামনে মেয়েদের বের হওয়া ভাল মনে করুন আর মন্দ মনে করুন, ছোট কেরানী থেকে শুরু করে বড় বড় রাষ্ট্রনায়ক এবং রাষ্ট্রদূত পর্যন্ত অনেকেই আজকাল স্ত্রীকে সংগে নিয়ে শুধু মে রাস্তায় হাওয়া খেতে বের হন তাই নয়, মার্কেটিং করেন, সভা-সমিতি ও সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দেন, এবং নারীপুরুষ নির্বিশেষে অনেক সময় হ্যাণ্ডসেকও করেন। এই নিয়ে নিষ্ফল গুঞ্জন কিছু কিছু শোনা গেলেও, জাতীয় নেত্রীদের ব্যাপারে তারও আজ অস্তিত্ব নেই। বেগম শাহনওয়াজ, ফাতেমা জিন্না বা শায়েস্তা একরামুল্লাহ এঁরা শুধু নারীদের নন, দেশের সর্বসাধারণের শ্রেয়্যা। এঁরা দেশে বিদেশে সফর

করেন, সভাসমিতি ও পার্লামেন্টে বক্তৃতা করেন, এতে অস্বাভাবিক কিছু আছে বলে কেউ মনে করেন না।

তারপরও মেয়েদের জীবিকার্জনের প্রশ্ন। আস্তে আস্তে এ প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে।...শিক্ষয়িত্রীর আবির্ভাব হয়েছে মধ্যযুগ থেকেই, এযুগে দেখা দিচ্ছেন আস্তে আস্তে মহিলা ডাক্তার, টেলিফোন-অপারেটর, টাইপিষ্ট ও স্টেনো-টাইপিষ্ট, রয়টারের রিপোর্টার, একাউন্ট্যান্ট প্রিন্টিং অফিসার, শিল্পপতি, এমনকি এয়ারহোস্টেস, ও সিনেমা অভিনেত্রী—বিশ্বাস করুন—এই পাকিস্তানেই। ...অনেকেই দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলবেন এসব দেখে, শিউরে উঠবেন,...বলবেন, ‘না না এসব আমরা চাইনি, আমরা চেয়েছিলাম ইসলামী রাষ্ট্র, এবং তাই আমরা চাই। কিন্তু এসব যে পুরাদস্তুর অসৈলামিক। এসব দমন করতে হবে।’

কিন্তু বিপদ এইযে, এসব অসৈলামিক কাণ্ড কারখানারও প্রচুর সমর্থন পাওয়া যাবে। অনেক যুক্তি দেখিয়ে...কোরান হাদিসের ব্যাখ্যা করে তাঁরা বলবেন,

...ইসলামের আক্ষরিক ও বিকৃত ব্যাখ্যা করে তোমরা প্রগতির পথ রুদ্ধ করতে পারনা। ভুলে যেওনা, ইসলাম সকল দেশের সকল যুগের উপযোগী ধর্ম। ভুলে যেওনা, তোমরাই একদিন স্যার সৈয়দ আহমদকে পদেপদে বাধা দিয়েছিলে, ইংরেজী শিক্ষার বিরোধিতা করেছিলে, ইকবাল-নজরুলকে প্রথমদিকে গোমরাহ বলেছিলে। ভুলে যেওনা, কয়েদে আজম খাঁটি মুসলমান নন, তিনি নামাজ পড়েন না ইত্যাদি বলে তোমরাই একদিন লীগের সংহতিতে ভাঙন ধরাবার চেষ্টা করেছিলে, ইত্যাদি।

স্থানকালভেদে ইসলামের বিচিত্র রকমের ব্যাখ্যা যুগেযুগে করা হয়েছে, আজও করা হচ্ছে। ইসলামী রাষ্ট্রে পাকিস্তানের আইন-কানুনে নারীদের ভোটাধিকার স্বীকার করা হচ্ছে, আবার ইসলামেরই নাম করে মিসরে নারীদের ভোটাধিকার দেওয়া হচ্ছে না। এ বিশ্বাসও আমি করি যে মিসরের নারীরা একদিন ভোটাধিকার পাবে, এবং শুধু তাই নয়, ইসলামের নামেই পাবে।

লেখক অত্যন্ত দূর্বদৃষ্টির সঙ্গেই লক্ষ্য করেছিলেন যে : ‘পাকিস্তানের মধ্যবিশ্ব মুসলিম সমাজের যে রূপান্তর দেখা যাচ্ছে, তা ইসলাম অনুমোদিত পথেই ঘটছে কিনা’ সে প্রশ্নের মীমাংসা করার সামর্থ্য কারুরই নেই। কারণ অতীতে এসব সামাজিক প্রশ্ন নিয়ে অনেক বাহাস হয়ে গেছে কিন্তু মীমাংসা হয়নি, অথচ সমাজের রূপান্তরও নিশ্চল হয়ে থাকেনি। “কখনো ইসলামের নতুন ব্যাখ্যা করে, কখনো বা সেরূপ ব্যাখ্যার অপেক্ষা না করেই মুসলিম মধ্যবিশ্বের আধুনিক জগতের সংস্কৃতি, ভাবধারা ও জীবনযাত্রাপদ্ধতিকে গ্রহণ করেছে এবং করছে। এইটেই আজকের মুসলিম সমাজের প্রবণতা। সামন্তযুগীয় সংস্কৃতি, ভাবধারা ও জীবনযাত্রাপদ্ধতি কখনোবা কিছুটা বিতর্কের পর, কখনোবা নিঃশব্দে পরিত্যক্ত হচ্ছে।

অথচ যা পরিত্যক্ত হচ্ছে, তা হয়তো এতদিন ইসলামী সমাজেরই বৈশিষ্ট্য বলে বিবেচিত হয়েছে এবং আজ পরিত্যাগ করার সময় হয়তো তাকেই ইসলামের বিকৃতি বলে পরিত্যাগ করা হচ্ছে।’

পুরাতনকে পরিত্যাগ করার এবং নতুনকে গ্রহণ করার এই যে প্রবণতা, মুসলমান সমাজের এই যে রূপান্তর, এর সবই যে ভাল আর এর সবই যে ইসলাম-অনুমোদিত, তা

হয়তো নয়। কিন্তু একে রোধ করা কি আর সম্ভব? নাচ, গান, সিনেমা, থিয়েটার নারী স্বাধীনতা, এসবই যুগধর্ম। এই যুগধর্মকে কি অস্বীকার করা সম্ভব? জনাব আবদুল হক বলেন : 'অন্যে যাই মনে করুন, আমি তো তা সম্ভব মনে করি না। কারণ, এসব নিছক যুগধর্ম বা যুগের হুজুগ নয়। একটা অপ্রতিরোধ্য রূপান্তর রয়েছে এই সামাজিক রূপান্তরের মূলে—সেটা হচ্ছে অর্থনৈতিক রূপান্তর। পাকিস্তানের সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি আজ দ্রুত রূপান্তরিত হচ্ছে বুর্জোয়া অর্থনীতিতে, এবং এই বুর্জোয়া অর্থনীতির উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে মুসলিম বুর্জোয়া সমাজ ও মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজ, এই অর্থনীতির পরিপ্রেক্ষিতেই গড়ে উঠেছে নতুন সংস্কৃতি, ভাবধারা ও জীবনযাত্রা পদ্ধতি। অর্থনীতি বদলে যাবে অথচ সমাজের মানসজগত ও বহিঃপৃষ্ঠ বদলাবে না, এটা অসম্ভব।

অবশ্য তারই সঙ্গে রয়েছে বিদেশি সমাজ ও সংস্কৃতির অনিবার্য প্রভাব। বায়ু যেমন সর্বগামী, এই প্রভাবও তেমনি সর্বগামী। এ প্রভাব বন্ধ করা যেত, যদি এমন একটা ব্যবস্থা করা সম্ভব হতো যে, উচ্চশিক্ষা, শিল্প, ব্যবসায়, রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক সম্মেলন—কোনো উপলক্ষেই পাকিস্তান থেকে কাউকে বিদেশে যেতে দেওয়া হবে না এবং বিদেশ থেকেও কেউ এদেশে আসতে পারবে না, 'বিদেশ থেকে কোনো সিনেমা বা বই পত্রিকা আমদানী করতে দেওয়া হবে না, রেডিও ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না, এক কথায় বলতে গেলে, পাকিস্তানকে আট কোটি রবিনসন ক্রুশার জাতিতে পরিণত করা হবে। সেটা সম্ভব নয়। মুসলিম সমাজে আজ যেসব নতুন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, সেগুলো তাই অনিবার্য, সেগুলোকে ইসলামি বলে স্বীকার করুন চাই না করুন।'

পাকিস্তানের সংস্কৃতিতে ইসলামি ভাবাদর্শের সংযোজন না ঘটে যতোসব অনৈসলামিক ভাবধারার সংযোগ হচ্ছে বলে যারা ব্যথিত হৃদয়ে বলবেন, পাকিস্তান যে ইসলামি রাষ্ট্র তাকি মিথ্যা? পাকিস্তানে গড়ে উঠবে ইসলামি অর্থনীতি, ইসলামি সমাজ, বিকাশ লাভ করবে ইসলামি সংস্কৃতি—এসবই কি নেহাৎ কল্পনা? এর জবাবে লেখক বলেন, এসব কল্পনা বা মিথ্যা যদিও নয়।

তবু এটা কি কল্পনা করা যায় যে পাকিস্তানে ব্যাংক এবং ইন্সিওরেন্সের ব্যবসা, সেভিংস সার্টিফিকেট ও গভর্নমেন্ট লোন ইত্যাদি থাকবে না, আর থাকলেও তাতে সুদের প্রয়োগ থাকবে না? 'এটা কি কল্পনা করা যায় যে, নিছক ইসলামি কারণেই মহিলা ন্যাশনাল গার্ড, মহিলা ন্যাভাল রিজার্ভ, গার্ল গাইডস ও ব্লু বার্ড ভেঞ্চে দেয়া হবে? এটা কি কখনো কল্পনা করা যায় যে, ভাবীকালের পাকিস্তানে একটা মহিলাকেও বোরখা ছাড়া রাস্তায় বের হতে দেওয়া হবে না, একটা মহিলাকেও রিপোর্টার, টেলিফোন-অপারেটর, টাইপিষ্ট ও স্টেনোগ্রাফার, একাউন্ট্যান্ট ও প্রিন্টিং অফিসার, এম. এন. এ ও এম. এল. সি হতে দেয়া হবে না? মেয়ে পুরুষের মিশ্রিত মজলিশে কোনো মেয়ে গান গাইতে পারবে না, নাচতে পরবে না, থিয়েটারে অভিনয় করতে পারবে না, সিনেমায় অভিনয় করতে পারবে না এবং সাফসুফ কথা—নাচ, গান, থিয়েটার ও সিনেমা নিষিদ্ধ করে দেওয়া হবে—এটা কি কল্পনা করা যায়? মেয়েরা অংশ নিক আর না নিক, ইসলামি সংস্কৃতির কথা বিবেচনা করেও তো নাচ, গান, থিয়েটার, সিনেমা, জারি, সারি ইত্যাদি নিষিদ্ধ করা উচিত। এও কি আশা করা যায় যে, বিদেশে উচ্চশিক্ষার জন্য কোনো মেয়েকে বিদেশে পাঠানো হবে না (কারণ বিদেশে পর্দা নেই) এবং দেশে আমাদের নেতৃবৃন্দ ও রাষ্ট্রনায়কের পত্নী ও বিদেশে আমাদের রাষ্ট্র-প্রতিনিধিদের পত্নী বিনা বোরখায় সামাজিক অনুষ্ঠানে বের হতে পারবেন না? প্যান্ট, কোট, টাই ও হ্যাট পরা এবং দাড়ী কামানো কেরাণী থেকে

শুরু করে উচ্চতম রাষ্ট্রনায়ক পর্যন্ত সকলের পক্ষেই নিষিদ্ধ করা কি সম্ভব? মুসলিম সমাজের যে প্রবণতা আজ লক্ষ্য করছি, তাতে মনে হয়, এ সমাজের কাছে এসব প্রশ্ন অপ্রাসংগিক, অনাবশ্যিক, প্রতিক্রিয়াশীল। আধুনিক জীবন ছেড়ে মধ্যযুগীয় জীবনে ফিরে যাওয়ার প্রশ্ন যেমন উঠতে পারে না, আধুনিক জীবনের এই বহিঃপ্রদ ও এই সংস্কৃতিকে বর্জন করার প্রশ্নও তেমন উঠতে পারে না। মোটের উপর, পক্ষীশাবক আজ ডানা মেলে নয়া দিগন্তের সন্ধানী, তাকে জন্মনীড়ে বেঁধে রাখার চেষ্টা বৃথা।<sup>২১</sup>

মোহাম্মদীর একজন প্রধান লেখক, চিন্তাবিদ মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী ‘আমাদের সাংস্কৃতিক সমস্যা’ নিয়ে ভেবেছেন গভীরভাবে এবং তিনি জাতির সামনে উপস্থিত করেছিলেন কতিপয় বক্তব্য—যা তখন অবশ্যই গুরুতর ভাবনার পরিচায়ক বলে স্বীকৃত হয়েছিল। বলাবাহুল্য, পাকিস্তানবাদী লেখক হিসেবে বিভাগপূর্ব কাল থেকেই মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী পাকিস্তানের সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি, ভাষা, ধর্ম, সাহিত্য ও দর্শন সম্পর্কে সুপ্রচুর লিখেছেন।

এই প্রবন্ধেও তাঁর ভাবনার আন্তরিকতা পাঠককে স্পর্শ করে। ‘সাংস্কৃতিক সমস্যা’ নিয়ে আলোচনার প্রারম্ভেই তিনি সংস্কৃতির ‘সংজ্ঞা’ নিয়ে ভেবেছেন, লিখেছেন : ‘সংস্কৃতির সংজ্ঞা যা—ই হোক না কেন, সংস্কৃতি বলতে আমরা এ—যুগে সাধারণত বুঝতে শিখেছি, চারুকলা, সংগীত, নৃত্য ও অভিনয়। অভিনয় বলতে বোঝায় সাধারণত নাট্যাভিনয় ও সিনেমা বা চিত্রাভিনয়।’ এ—সম্পর্কে আলোচনা না করলে ‘সংস্কৃতির কতকাংশ বিস্মৃত বা কোণঠাসা হয়ে থাকতে বাধ্য হবে’। তার ফলে সাধারণ সমাজের সঙ্গে সংস্কৃতির যোগাযোগ নিবিড় বা ব্যাপক হয়ে উঠবে না। ‘অথচ সমাজের সঙ্গে সংস্কৃতির অব্যাহত মিল-মিশ না ঘটলে তাকে সাংস্কৃতিক জীবনের সুস্থ বা স্বাভাবিক অবস্থা বলা যায় না।’

লেখক বলেন, পাকিস্তানে ‘ইসলামের আসন রচিত হবে’ একথা সাধারণভাবে সর্বত্র স্বীকৃতি লাভ করার জন্যই সংস্কৃতি সম্পর্কে ভালোভাবে সব কথা ভেবে দেখার প্রয়োজন অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেননা নাচগান, অভিনয়, চারুকলা, সাহিত্য প্রভৃতির অধিকাংশেরই প্রকাশ ও বিকাশ ইসলামের প্রথম যুগে সম্ভব ছিল না।

কাজেই মক্কীয় ও মদিনীয় ইসলামের প্রধানতম বা একমাত্র বৈশিষ্ট্য ছিল কঠোর শাসন ; নিরলস সংগঠন ও নিশ্চিন্দ্র নিয়মানুবর্তিতা। যখন বেঁচে থাকা ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করাই সব-চাইতে বড়ো সমস্যারূপে দেখা দেয়, সে—অবস্থায় এছাড়া আর কোনো দিকে মানুষ মনোনিবেশ করার ফুরসৎ বা সুযোগ পায় না। সেটা আসে পরে, যখন আত্মরক্ষার প্রশ্ন আর থাকে না, কিংবা বিশেষ জোরালো থাকে না ; এবং শক্তির প্রতিষ্ঠা অনেকখানি সন্দেহাতীত হয়ে দাঁড়ায়। এটা আরবীয় ইসলামের জীবনেও সত্যি হয়েছিল। মদিনীয় যুগের পরবর্তী কালে তার অনুবর্তীদের ভেতর সংস্কৃতির প্রকাশ ঘীরে ঘীরে দেখা দিতে থাকে। দেশ, কাল ও পাত্রভেদে তাতে অনেক রকমের বৈচিত্র্যও এসে পড়ে। সিনেমার ব্যাপারটা অত্যন্ত আধুনিক যুগের ঘটনা। এছাড়া কৃষ্টিগত জীবনের প্রায় আর সব—কিছুই মুসলিমরা ক্রমে ক্রমে গ্রহণ বা আয়ত্ত করেছিলেন, তার অনেক কিছুই ইসলামের শাসিত্রিক ব্যাখ্যা তাদের অনুমোদন পায়নি। ফলে শাস্ত্রীয় ইসলাম ও মুসলিমদের সাংস্কৃতিক জীবনের মধ্যে কালে কালে একটা অসংযোগ বা অসম্মিলন, এমনকি বলতে গেলে একটা বিরুদ্ধতার সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছে। এর পরিণতি শূন্য হয়নি। সংস্কৃতি অবশ্য মারা পড়েনি, কিন্তু সে কোণগ্রস্ত হয়ে রয়েছে, এবং সমাজের গোটা অবয়বে জায়গা জুড়ে বসতে পায়নি—সহজে, স্বচ্ছন্দে বা বিনা বিধায়। যতোটুকু স্থান সে পেয়েছে, সেখানে শাস্ত্রীয় ইসলামের দিক থেকে তার জন্য কোনো অভ্যর্থনা নেই, বরং আছে তিরস্কার ও বহিষ্কারের উদ্যত দণ্ড।

এই সমস্যার বা পরিস্থিতির মোকাবিলা কিভাবে হবে স্বাধীন পাকিস্তানে? সংস্কৃতি কি এখানে 'চোরাকারবারের শামিল হয়ে থাকবে? না, তাকে খোলা হওয়ায় চলতে ফিরতে দেয়া হবে?' এই প্রশ্ন সামনে রেখে লেখক প্রতিটি বিষয়ের আলোচনা শেষে নিজস্ব মতামত লিপিবদ্ধ করেছেন। 'সাহিত্য' সম্বন্ধে তিনি বলেন, আইনেই অশ্লীল সাহিত্য নিষিদ্ধ রয়েছে। চারুকলা বা চিত্রশিল্প কিন্তু এতোখানি অবাধ বা অনির্দিষ্ট হতে পারেনি। এরও চর্চা ও উপভোগ চলছে, সরকারি পৃষ্ঠপোষণ রয়েছে, তবে মুদ্রা, কারেক্পী, নোট বা ডাক-টিকিটে এখনও প্রাণীর ছবি ছাপা হচ্ছে না। 'গীতবাদ্যও সরকারিভাবে—অস্তুত এ পর্যন্ত নিষিদ্ধ হয়নি। কিন্তু কখনও হতে পারে না বা হবে না কি? আর যদি নাও হয়, পাকিস্তানি মুসলিম সমাজে—সাধারণভাবে তার চল হতে দেয়া হবে কি? যদি না হয়, সংস্কৃতির এই দিকটা সমাজের এক কোণে পড়ে থাকতে বাধ্য হবে; সাধারণের সমাদর সে কোনদিনই পাবে না। সে—অবস্থায় সংস্কৃতির এই দিক দিয়ে আমাদের গোটা সামাজিক অবয়ব ক্ষুদ্র ও ক্ষুণ্ণ হয়ে থাকবে। তাকে সমাজের সাংস্কৃতিক উন্নয়ন বলা চলবে কি?'

লেখক বলেন, এটা ভরসার কথা যে, ইসলামের শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা তাদের মধ্যে কেউ কেউ যন্ত্র-সঙ্গীত ও কণ্ঠসঙ্গীতকে নির্দোষ বলে ফৎওয়া দিয়েছেন।

কিন্তু এও দেখবার বিষয় যে, এইসব শব্দাস্পদ ফৎওয়াদাতার মধ্যে সম্ভবত কেউই আজ পর্যন্ত গীত-বাদ্য-চর্চার মজলিসে শরীক হওয়াও পছন্দ করতে পারেননি, পরিবারে গীত-বাদ্যের প্রচলন তো বহুত দূরের কথা। সুতরাং এক্ষেত্রে কিছুটা ভরসা পাওয়া গেলেও সমস্যা থেকেই যাচ্ছে। মানে, গীত বাদ্যের পিয়াসী মুসলিমদের পক্ষে পারিবারিক পরিবেষ্টনীর মধ্যে—মাতা, ভগিনী, জায়া, কন্যা ও পিতা-ভ্রাতা-পুত্রের সাহচর্যে সেটা চর্চা বা উপভোগ করার কথা চিন্তা করা সাধারণত সম্ভবপর নয়।

লেখকের পূর্বোক্ত বক্তব্য সঙ্গীত সম্পর্কে কতকটা বিবাস্তিকর, তা তাঁর এই বক্তব্যেও সুপ্রকট। মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর মতে সঙ্গীত পিপাসা মেটাতে হলে যেতে হবে 'অভদ্র' বা 'কুৎসিৎ' যে কোনো মজলিস বা আস্তানায়। 'শুধু ভদ্র স্থানে যেতে হলে কৃষ্টির প্রকাশ অস্তুত সংকীর্ণ বা সীমাবদ্ধ হয়ে থাকবে। আর ইতর জায়গায় যেতে হলে তার সংকীর্ণতার ছিদ্র-পথে সমাজদেহে নোংরামি প্রবেশ করবে।'

যেন বেশ্যালয় বা বাঈজী পাড়া ছাড়া নাচ-গান কেউ করে না এবং গীত-বাদ্য পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে একসঙ্গে বসে একদমই উপভোগ করা অসম্ভব। গীতবাদ্য প্রসঙ্গে লেখকের এই মন্তব্য খুবই লক্ষণীয় যে এসব শুনতে হলে বেশ্যালয়ে যেতে হবে। যন্ত্র ও কণ্ঠসঙ্গীত সম্পর্কে লেখকের বক্তব্য :

মোট কথা হলো, যন্ত্রসঙ্গীত ও কণ্ঠসঙ্গীত সাধারণভাবে সমাজে আপাতজ্ঞেয় হয়ে থাকবে কিনা, সে-বিষয়ে মত একটা স্থির হওয়াই দরকার। যদি একে চলতে দেয়া না হয়, তাহলে একদম বন্ধ করে দিয়ে সংস্কৃতির অংগচ্ছেদ ঘটানোর জন্যে অস্তুতঃ চেষ্টা পাওয়া সম্ভব হবে। আর যদি চলতে দেয়াই উচিত ভাবা হয়, সেই অভিমতকে সাধারণভাবে সমাজে চালু হওয়ার সুযোগ দেয়াই ঠিক হবে। যাঁরা সাংস্কৃতিক সম্মেলন বসাতে প্রায়ই উৎসাহ প্রকাশ করে থাকেন, তাঁদের উচিত এসম্পর্কে একটা পরিষ্কার সিদ্ধান্ত স্থির করা বা দাবী করা। সমস্যার খানিকটা মনের ভেতর পুষে রেখে এবং বাকী খানিকটা সংকোচে বা নিরাপদ সংকীর্ণতার ভেতর ছড়িয়ে দিয়ে প্রকৃত প্রস্তাবে সমস্যার কোনো সুরাহা হতে পারে না। যোগ্য ব্যক্তিদের এ সম্বন্ধে আলোচনায় নেমে পড়া একান্ত কর্তব্য।

নাচের সমস্যাটিও কম ব্যাপক বা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। একটা শিল্প হিসেবে নৃত্য মুসলিম কৃষ্টির ইতিহাসে স্থান পেয়েছে। কিন্তু এর সংগে এমন অনেক প্রশ্ন জড়িয়ে আছে, যেগুলোর সম্বন্ধে আজকার ধারণা সুস্থির হওয়া প্রয়োজন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, নৃত্যের সমস্যাটি শুধু পুরুষ জাতির সঙ্গে জড়িত নয়; নারী জাতির সঙ্গেও এর সম্বন্ধ কম্পনা করে মত ঠিক করতে হবে। নাচকে যদি ইসলাম-সম্মত জীবনে স্থান দেয়া সংগত বা সম্ভবপর ভাবা চলে, তাতে পুরুষের মতো নারীরও অংশগ্রহণের প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবে দেখা দেবে। এর একটা মীমাংসা হওয়া উচিত। ...নৃত্য কলা গ্রহণীয় হলে তাকে পারিবারিক ও প্রকাশ্য—দুইরূপেই বিচার করতে হবে, এবং নারী-পুরুষ উভয়ের দিক থেকেই দেখতে হবে। ...সংস্কৃতির অঙ্গ হিসেবে অভিনয়ের প্রসংগটি আরো জটিল, আরো গুরুতর, আরো চিন্তাসাপেক্ষ।

গাঁ-গ্রামে জারি, যাত্রা, কবি ইত্যাদি সঙ্গীত ও অভিনয়ের আখড়া পূর্বে যতো সংখ্যায় ছিল, ইসলামের নৈষ্ঠিক রূপের অভিযানের ফলে এখন আর ততো সংখ্যায় নেই। কিন্তু শহরে এগুলো সংস্কৃতির অংগ হিসেবে বেশমতোই মুখ পাচ্ছে; ...শাস্ত্রীয় ইসলামের নৈষ্ঠিকরূপের ব্যাখ্যাভাবের পক্ষ থেকে এ সম্পর্কে শ্রুতিযোগ্যভাবে তেমন কিছুই বলা হচ্ছে বলে জানিনে। এটা কিসের লক্ষণ, বলতে পারিনে। হয়তো সংস্কৃতিকামীদের মোকাবিলায় ঐসব ব্যাখ্যাভাব আর শক্তি অনুভব করছেন না; কিংবা হয়তো পাকিস্তানে ইসলামের গৃহে সংস্কৃতির এই প্রকাশকে স্থান দেয়া হবে বলে প্রকারান্তরে বুঝতে দেয়া হচ্ছে। ব্যাপার যাই হোক, শহরে, বাজারে, গঞ্জে, যাত্রা, থিয়েটার ও সিনেমার প্রসার ও প্রভাব প্রাক-পাকিস্তান যুগের চাইতে এখন ঢের বেশী বেড়ে গেছে এবং আরো যাবে বলে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। এর তাৎপর্য কী?

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর ভাবনা : সিনেমাকে সংস্কৃতির অংগ হিসেবে পাকিস্তানে স্থান দিতে হলে নারী অভিনেত্রীদের কথাও চিন্তা করতে হবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, অভিনেত্রী কোথায় পাওয়া যাবে? সাধারণ সমাজ থেকে? না, সাধারণ সমাজের সংগে সম্পর্কহীন বিশেষ বিশেষ গৃহ বা পরিবার থেকে? অর্থাৎ জিজ্ঞাসার বিষয়—অভিনেত্রীরা সমাজের স্বাভাবিক অবস্থানে এসে দাঁড়ানোর অধিকার পাবেন কিনা। 'যদি না পান, যাত্রা, থিয়েটার বা সিনেমাকে কৃষ্টির অংগ মনে করার পক্ষে যৌক্তিকতা কি।' অভিনয়শিল্প সমাজ উপভোগ করবে 'অথচ যোগানদার নারী-শিল্পীর সম্মানজনক অবস্থান-সমাজে হবে না, এরূপ পরিস্থিতি প্রশান্তচিন্তে কম্পনা করা, অন্তত-ইসলামের দিক দিয়ে কঠিন; অসম্ভব বললেও অত্যুক্তি হয় না। সমাজের এক অংশ সুস্থ ও স্বাভাবিক বলে গণ্য হবে, অপর এক অংশ ইতর ও অপাৎক্রেয় বিবেচিত হয়ে কোণে পড়ে থাকবে, এই ধরণের ব্যবস্থাপনাকে সমাজ সম্পর্কে ইসলামি পরিকল্পনার অন্তর্গত ভাবা চলে না।... আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনের এই সব সমস্যা ছাড়াও আর একটা ব্যাপার লক্ষণীয়। আমাদের গ্রাম্য সংস্কৃতি ও শহুরে সংস্কৃতি অনেকখানি আলাদা হয়ে পড়েছে। গাঁ-গ্রামের সাংস্কৃতিক জীবনে অপরিচ্ছন্নতা ও অশালীনতা দেখা যায়, শহরে পারিপাট্য ও ভদ্র পরিবেশের চাকচিক্য। ইসলাম-পরিকল্পিত সমাজে এই প্রভেদ কি স্বাভাবিক ও সহনীয়?

কৃষ্টির মূলভিত্তি হলো শিক্ষা ও বিদ্যাচর্চা। ইসলামে বিদ্যাচর্চা প্রত্যেকটি মুসলিম পুরুষ এবং প্রত্যেকটি মুসলিম নারীর পক্ষে অপরিহার্য কর্তব্য বলে নির্দেশিত হয়েছে। কিন্তু এতো দিন এই নির্দেশ কার্যত উপেক্ষিত হয়ে এসেছে। ফলে যেখানে শতকরা প্রায় নব্বইজন মুসলিমের বাস, সেই গ্রামে অশিক্ষা ও অবিদ্যার রাজত্ব চলছে; বিশেষ করে নারীসমাজকে মুখতার আস্তাকুঁড়ে রাখা হয়েছে। শহরের অবস্থা এর চাইতে সামান্য কিছুটা উন্নত। এরই পরিণতিস্বরূপ পাড়াগাঁ ও শহরে সাংস্কৃতিক জীবনের প্রকারে ও প্রকাশে বিরাট ব্যবধান গড়ে উঠেছে। তার কারণ শিল্পী, সাহিত্যিক ও শিক্ষিত লোকদের সমাবেশ ঘটে শহরেই; এবং সংস্কৃতির উপকরণ ও আয়োজন যাদের হাতে, সেই ধনীরাও সুযোগ ও লাভের প্রত্যাশায় ছোটেন সেখানেই। পাকিস্তানে এই ধরনের অব্যবস্থা চলতে থাকবে বা চলতে দেয়া হবে কিনা; এবং চলতে দেয়া হলে তার পরিণতি কি হবে তা সমাজ-নায়কদের ভেবে দেখতে হবে। ... উপসংহারে লেখকের মন্তব্য :

আমার মূল বক্তব্য এই যে, আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনের প্রকাশ বলতে যে-যে বিষয় ও বস্তু আমরা বুঝতে চাচ্ছি, তার সঙ্গে ইসলামের এবং প্রত্যেকটি মুসলিম নর ও নারীর সম্পর্ক নির্ণয় করতে হবে। সংস্কৃতির ব্যাপক প্রকাশ ও সমাজের ওপর তার প্রতিক্রিয়ার শেষ পরিণতি সম্পর্কে আজ আমাদের চিন্তা কুণ্ঠিত বা জড়তাগ্রস্ত থাকলে জোড়াতালি বা গৌজামিল দেখা দিতে বাধ্য। এ অবস্থা সামাজিক স্বাস্থ্যের অনুকূল নয়। সমাজদেহের ওপর সংস্কৃতিকে গৌদ হয়ে থাকতে দেয়া যায় না। তাকে হয় ছেঁটে ফেলতে হবে, নয়তো সমাজের আবয়বিক স্বাস্থ্যে তাকে পরিশোধন করে তার অঙ্গশ্রীকে স্বাভাবিক চেহারা দান করতে হবে। নইলে ইসলাম রুগ্ন, দ্বিধাগ্রস্ত, সূতরাং কৃত্রিম বা শক্তিহীন হয়ে শুধু বঞ্চনাই বহন করে চলবে। তার এই অগৌরবকে স্থায়ী করার জন্যেই কি পাকিস্তান কায়েম হয়েছে? যদি না হয়ে থাকে, তাহলে আমাদের... সাংস্কৃতিক সমস্যার... সম্মুখীন হওয়া... কর্তব্য।

পাকিস্তানোত্তর কালের ইসলামি সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর মন্তব্য : ‘পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে ইসলাম সুসংহত ও ঐক্যবদ্ধ রূপ নেয়ার পরিবর্তে যেন তার ত্রিধা বিভক্ত হয়ে পড়ার লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে। এক দল পাশ্চাত্য আধুনিকতাবাদের প্রায় সবটুকুকেই ইসলাম এবং তার বিপরীত প্রায় সবকিছুকেই ইসলাম-বিরোধী বলে প্রচার করছেন। অন্যদল পুরানো শাস্ত্র-ব্যাখ্যাভিত্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার-বিবেচনায় প্রবৃত্ত হয়ে আধুনিকতাবাদের প্রায় সবকিছুকেই অপাংক্তেয় বলে ব্যবস্থা দিচ্ছেন।’ তৃতীয় মধ্যপন্থী একদল এই দুই মতবাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে দুহাত দুদিকে বাড়িয়ে রেখেছেন। এইসবের মধ্যে প্রথমোক্ত দলটিকে নিয়ে সংস্কৃতির দিক দিয়ে কোনো সমস্যা নেই, কেননা তাঁরা সমাজের যেরূপ কল্পনা করছেন, তার ভেতর সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টা সর্ববিধ প্রতিক্রিয়া বা পরিণতিই সহনীয়, এমনকি গ্রহণীয়। এক হিসেবে দ্বিতীয় দলটিকে নিয়েও কোনো সমস্যা নেই; কেননা তাঁরা সংস্কৃতির অধিকাংশকেই বাদ দিয়ে সামাজিক অবয়বের রূপ কল্পনা করতে আগ্রহশীল—যদিও তাঁদের সে আগ্রহ বহুলত উপেক্ষার সম্মুখীন। এই দুই দলে সংঘর্ষ নিবারণের ব্রত নিয়েছেন মধ্যপন্থী দল এবং তাঁদের জন্যেই সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। আধুনিকতাবাদের খানিকটা বাদ দিতে তাঁরা উৎসুক; প্রাচীনপন্থীদেরও অনেক বক্তব্য তাঁরা বেঁড়ে ফেলতে চান। ফলে সংস্কৃতি তে-টানার মধ্যে

পড়ে একটা গৌজা-মিলের আকার নিয়েছে। সাহিত্য থেকে আরম্ভ করে সিনেমা পর্যন্ত সবখানেই চলছে এই গৌজামিল। পাকিস্তানকে ইসলামি রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য যারা ভাষা ছাড়ছেন এস্তার, আশা করছেন বিস্তার এবং আয়োজন করছেন সুদীর্ঘসূত্রী, এ গৌজামিলে তাঁরা হয়তো আশ্বাদ পাচ্ছেন দেদার ; কিন্তু সমস্যা তার ফলে ঘিরে ধরছে গোটা সমাজ জীবনকে। এই সমস্যায় অনেক আশংকা লুকিয়ে আছে। সেগুলো বাঘ হয়ে আমাদের গ্রাস করবে, এরূপ সুযোগ বা সম্ভাবনা থাকতে দেয়া কখনই উচিত নয়।<sup>২২</sup>

‘সংস্কৃতি’ নিয়ে অনেক আলোচনাই মোহাম্মদীতে হয়েছে। কিন্তু ইসলামীধারার সংস্কৃতি ছাপিয়ে আধুনিক বুজ্জোয়া সংস্কৃতিই চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। জাগ্রত হয়েছে শোষিত জনগণের সংস্কৃতি-চিন্তা। এগুলোর জন্য অবশ্য ধর্মীয় ভাবধারার পত্রিকার কৃতিত্ব সামান্য। সাংস্কৃতিক অঙ্গনের বর্তমান পরিস্থিতির বিবরণ দান করাতেই এঁদের উদ্যোগ বেশির ভাগ সীমিত। সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি পরিবর্তনের জন্য জোরালো বক্তব্য এঁরা উপস্থাপন করতে পারেন নি। গাড়ী চলে যায়, ধোঁয়া পেছনে পড়ে থাকে। মোহাম্মদীর সংস্কৃতি চিন্তা অনুরূপ-সমাজ এগিয়ে চলেছে—মোহাম্মদী আলোচনা করেছে পরে—কিসের কোনটি কতোটুকু ইসলামিক, কি অইসলামিক ইত্যাদি। তবু এঁরা ধর্মভীরুদের কাছে আধুনিক সংস্কৃতিকে গ্রহণ করার মানসিকতা তৈরী যুক্তিবুদ্ধি নিয়ে উপস্থাপিত হয়েছিলেন, এবং এঁদের সংস্কৃতি-জিজ্ঞাসার জবাব দিয়ে পাঠক চাহিদা নিবৃত্ত করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

ডক্টর কাজী দীন মুহাম্মদ ‘আমাদের সমাজ সংস্কৃতি ও ধর্ম’, শীর্ষক প্রবন্ধে ‘সংস্কৃতি’ শব্দের অর্থ ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে পাকিস্তানের সমাজ-ভাবনায় সংস্কৃতি-চিন্তার গুরুত্ব বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, ‘সংস্কৃতির সাধারণ অর্থ ‘শোধন’ বা Refinement. এই অর্থ নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। ইংরেজীতে এর অর্থ করা হয়ে থাকে Refined state of the understanding and manners and tastes, phase of this prevalent at a time or place, instilling of it by training. এতদ্ব্যতীত শোধন বা রিফাইনমেন্ট ছাড়া সংস্কৃতির অন্য উপাদানও আছে, যেমন কলা ও কারুকলা, সাহিত্য সৃষ্টি এবং দৈনন্দিন খাদ্য তালিকা, পোশাক-পরিচ্ছদ, অলংকারের সাহায্যে অলংকরণ, চুলের বিন্যাস সাধন, অস্ত্যোষ্টিক্রিয়া ও ধর্মবিশ্বাস ইত্যাদি সহ ব্যক্তিজীবনের যাবতীয় আচার-অনুষ্ঠান, হাবভাব এবং এমনকি জাতি কিংবা সমাজ দেহের রীতি-নীতির বিভিন্ন কুসংস্কারগুলোকেও এর সাথেই ধরা হয়ে থাকে। ... অবশ্য ইসলাম সংস্কৃতির যে সংজ্ঞা নির্দেশ করেছে তা সত্যি চিন্তাকর্ষক। শহুরে সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত হওয়ার প্রবণতার সাথে সাথেই ইসলাম অভ্যুদয়ের প্রাথমিক অবস্থায় সংস্কৃতির অর্থ আরবি শব্দকোষে অনুসন্ধান করা যেতে পারে। ‘তামাদ্দুন’ আরবি শব্দ। একে আমরা ইংরেজি প্রতিশব্দ ‘কালচার’ অথবা বাংলা প্রতিশব্দ সংস্কৃতি বলে প্রয়োগ করে থাকি। কিন্তু আমাদের মধ্যে এমন অনেক লোক আছেন, যারা অনুরূপ ব্যবহারের প্রতি কটাক্ষ করে থাকেন। পরন্তু যদি আপনি ‘তামাদ্দুন’ এর বুৎপত্তিলব্ধ অর্থের প্রতি লক্ষ্য করেন এবং স্বীকার করেন যে, আধুনিক সংস্কৃতির উৎপত্তি শহুরে জীবনে, তাহলে আপনাকে স্বীকার করতেই হবে যে, অন্য যে কোনও শব্দ অপেক্ষা ‘তামাদ্দুন’-এর সঙ্গত অর্থ-প্রকাশক। ‘তামাদ্দুন’, ‘মদিনা’, ‘শহর’ শব্দ থেকে উৎপত্তি হয়েছে, এর অর্থ নগর বা শহর।’



লেখক বলেন, এই 'ব্যাখ্যার দ্বারা এই প্রতীয়মান হয় যে, কোন জাতি বা সমাজের মূল ও মোটামুটি জীবন-অভিজ্ঞতার সমষ্টিগত আখ্যাই সংস্কৃতি, তাহলে আমরা আর একটু বাড়িয়ে বলতে পারি যে, জাতির জীবন রূপায়ণে ধর্মের দায় শুধু বৃহৎই নয়, বরং সনাতন ও নিয়ত প্রবহমান। আধুনিক জাতি একটা বিশেষ রাষ্ট্রের অধীনে উন্নীত হওয়ায় এবং জাতীয়তায় উপলব্ধি ব্যাপকতা লাভ করায় খৃষ্টান সভ্যতা এমনকি বর্তমানকালের শাসন ব্যবস্থা পর্যন্ত ভাবাবেগের সমুদ্রে পরিণত হয়েছে, বিশেষ করে এটা যখন হিংস্রনীতিতে পৌঁছে। অন্যান্য ধর্মমতের মতই ইসলামও একটা ইসলামিক ও মুসলিম সংস্কৃতির সৃষ্টি করেছে যা সর্বাপেক্ষা খাঁটি, ঐতিহাসিক, শক্তিশালী অস্তিত্বের উপরে প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু অন্যরূপ অন্যান্য ধর্ম কর্তৃক প্রবর্তিত সংস্কৃতি ইসলাম কর্তৃক প্রদত্ত সংস্কৃতির দানের সমকক্ষ হতে পারে না, কেননা সংস্কৃতিতে ইসলামের যে দান তা সরাসরি ব্যাখ্যা ও সুস্পষ্ট সমঝোতার দাবী করতে সক্ষম।

...সুতরাং সংস্কৃতি ক্ষেত্রে এবং সমাজে ইসলামের যে ব্যাপক দান তা শুধু কতকগুলি ধর্মীয় বিধিবিধান ও প্রথার মাধ্যমেই সীমাবদ্ধ নয়, ইসলাম দান করেছে একটা আদর্শ, এ আদর্শ ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে একটা সর্বসম্মত পদ্ধতিও। বিশ্ব উপলব্ধি ও মানবিক জীবন সংগঠনে সমতা রক্ষাকল্পে এ আদর্শ একটা সমাজজাতীয় জীবন পদ্ধতি—সমগ্র বিশ্বের জন্য একই সৃষ্টিকর্তার উপলব্ধি যার উৎপত্তি এক জাতীয়তাবোধের আবশ্যিকতার মূল উৎস থেকে উৎসারিত এবং যার মধ্যে নিহিত রয়েছে সৃষ্টিরহস্যের ব্যাখ্যা এবং যে জন্য মানবসমাজে অংশ গ্রহণের আবশ্যিকতা যা সমতা রক্ষার জন্য শিরা-উপশিয়ার মত ক্রিয়াজীবী।

এজন্যই সংস্কৃতির ইসলামিক উপলব্ধি হচ্ছে একদিকে সত্তার স্বীকৃতি... অন্যদিকে...সর্বোচ্চ আদর্শ ও সামাজিক গঠনতন্ত্র ব্যাপারে উপলব্ধি...ইসলামি আর্টে নগ্নতা এজন্য বর্জন করা হয়েছে, যেহেতু এর দ্বারা ব্যক্তি জীবনে ও সমাজ জীবনে অনিষ্টকর ভাবাবেগের সৃষ্টি হয়ে থাকে। আর যৌন চেতনায় অবাধমিলনকে এজন্য বর্জন করা হয়েছে যাতে করে জীবনের মূলভীতে অশ্লীলতা অনুপ্রবেশ করতে না পারে। জীবনে ও সমাজে শুধু আবশ্যিকীয় মৌলিক বিষয়গুলির পৃষ্ঠপোষকতা ও অনুশীলনের জন্যই ঐ সমূহকে ইসলামিক উপলব্ধির অন্তর্গত করা হয়নি...বিশ্বের এক জাতীয় আদর্শের ভিত্তিতে সমাজ-জীবনের সমতা রক্ষার উদ্দেশ্যে।

...যদি উপরোক্ত মূলনীতির ভিত্তিতে অথবা ইসলামকে বুঝতে চেষ্টা করি এবং আমাদের জাতীয় সমস্যাগুলির প্রতি দৃষ্টি রাখি তাহলে যেকোন বিরাট রকমের জীবন আমাদের কাছে এক জাতীয়তাবোধে সহায়তা করেছে। আমাদের দুই অঞ্চলের হাজার মাইল ব্যবধানও নিশ্চয়ই দুই ভাইয়ের, যাদের জীবন ইসলামিক মূলনীতির একই সূত্রে গাঁথা, মনের মধ্যে এক ইঞ্চি দূরত্বের ভাবও জাগাতে পারবে না। ইসলামিক এক জাতীয়তা জীবনের বিভিন্ন রকম প্রকারভেদকে অস্বীকার করে না; যদি তাই হত তাহলে ইসলাম কিছুতেই উপজাতীয় আরবগণ ছাড়াও পশ্চিম দেশের সর্ব পশ্চিম প্রান্ত হতে সুদূর প্রাচ্যের শেষ সীমা

পর্যন্ত সমস্ত মানুষের হৃদয় জয় করতে মোটেই সক্ষম হত না। ... আমাদের দুই অঞ্চলের মধ্যে হাজার মাইলের ব্যবধান হলেও এক আল্লাহর বিশ্বাসই আমাদের দুইটি অঞ্চলের মিলনে একটি সংযুক্ত জাতি সৃষ্টি করে দিয়েছে।’

উপসংহারে লেখক বলেন :

জাতির দুর্বলতার উৎস হচ্ছে এর জীবনদর্শনের অভাব, সেদিক দিয়ে আমরা সুসমৃদ্ধ, উহাই আমাদের শক্তি। ... কিন্তু শুধু বিশ্বাসই যথেষ্ট নয়, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ইসলামের মূলনীতিগুলিকে বিপুলভাবে গতিদান আমাদের করতেই হবে... আমাদের কাছে খাঁটি মুসলিম তথা প্রকৃত মানুষ বলে প্রমাণিত করতে হবে।’ পাকিস্তানের নাগরিকদের জীবনে ইসলামের যথাযথ প্রয়োগের জন্য প্রয়োজন ইসলামের বুদ্ধিদীপ্ত প্রগতিশীল বা সঠিক ব্যাখ্যার।

একাজ শিক্ষিতশ্রেণীর উপর নির্ভরশীল। তথাকথিত ‘আলেম’দের উপর দায়িত্ব ছেড়ে দেয়া ‘উচিত হবে না।’ ‘ইসলামের ব্যাখ্যার পরিচালনানীতি হবে ইসলামকে বর্তমান বিশ্বের সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির (সহায়ক ধর্মান্দর্শনরূপে) তৈরী করা। আমাদের বেলায় পাকিস্তানকে বৈজ্ঞানিক ও শিল্পবিষয়ক ব্যাপারে আধুনিক কল্যাণরাস্ট্রে উন্নীত করার জন্য ইসলামই হবে আমাদের একমাত্র অস্ত্র। আমরা বিপুল শক্তিতে সমৃদ্ধ একটা নতুন জাতি। আমাদের কোন কিছুই অভাব নেই, শুধু অভাব হচ্ছে আত্মবিশ্বাসের। মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত—আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। কিন্তু এও সত্য যে, ইতিহাসের মধ্যদিয়ে জীবনের ভ্রমণ পথে মানুষ প্রায়ই আত্মশক্তির কথা ভুলে যায়। আমাদের ব্যাপারে, যেখানে আমরা একটা নতুন রাষ্ট্রগঠনে মনোযোগী হয়েছি, আমাদের নিজস্ব শক্তির কথা ভুলে চলে না—যে শক্তি আমাদের দর্শনের শক্তি এবং যা প্রকৃত ইসলাম ও এর ইতিহাস সৃষ্টির গৌরবময় ঐতিহ্য।<sup>২৩</sup>

রনেশ দাশগুপ্ত ‘শিল্প ও সাহিত্যে জনগণের ভূমিকা’ নির্ণয় করতে গিয়ে সংস্কৃতিক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জনগণের অভ্যুদয়-বিপ্লবাত্মক অভ্যুত্থানের জন্য জসীমউদ্দীন ও রমেশ শীলের ন্যায় কবি-শিল্পীর সংস্কৃতিবোধের বিকাশ চেয়েছেন। তিনি এক পর্যায়ে বলেন :

আমাদের একশ্রেণী ফেড্রারীর গণ-অভ্যুত্থান আমাদের সামনে রেখেছে উপরোক্ত জনতার তাগিদকে। জনতার অধিকার সচেতন সংগ্রাম আমাদের শিল্পীদের বিচ্ছিন্ন মেরুবাসী হতে দিতে পারে না, দেবে না। তবু হয়তো শেষ পর্যন্ত একটা প্রশ্ন থাকবে। শিল্পরূপের অবিশ্রান্ত প্রবাহের শরীক হওয়ার ব্যাপারে জনতা কি নিত্যন্ত তৃতীয়পক্ষ? শিল্পরূপের সৃষ্টির ব্যাপারে তার কি কোন প্রত্যক্ষ সক্রিয় ভূমিকা নেই? সেও কি শিল্পী হতে পারে না? ... আজ এই সংগ্রামী জাতশিল্পীদের ডাক দিতে হবে। আমাদের দেশে সাংস্কৃতিক অচলাবস্থা যেখানে যেখানে ঘটছে—সেখানে অভ্যুদয় ঘটানোর জন্যে একতরফা কিছু করার জন্য নয়, সর্বাঙ্গিক মুক্তির জন্যে এই অহ্বান। জনতাকে হতে হবে সচেতন। শিল্পদৃষ্টি সম্পন্ন জনতা। রূপের জগতকে দিতে হবে মূল্য।<sup>২৪</sup>

## ৫. মোহাম্মদীর সমাজচিন্তা

মোহাম্মদীর সমাজ-ভাবনা অবশ্যই বিভাগপূর্ববর্তী কালে অগ্রগতির সহায়ক ছিল। পাকিস্তান-আন্দোলন পাক-ভারতীয় অথবা বিশ্বের মুসলিম সমাজের জন্য জাগরণের বা বিজয়ের পথে একধাপ অগ্রসরের সংগ্রাম রূপে বিবেচিত হলে, এই আন্দোলনের দিক নির্দেশনাদানে এবং প্রেরণা-সঞ্চারে মোহাম্মদী যে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে,

বাংলাভাষার খুব কম পত্রিকার পক্ষে করা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু বলাবাহুল্য, ১৯৪৭ সনের পরে দেখা গেলো পূর্ব বাংলার মুসলিম জনগণের জন্য পাকিস্তান সুফল বয়ে আনেনি। অতএব পাকিস্তান থেকে বেরিয়ে আসার সাধনাই হলো বাঙলার মুসলমানের প্রধান সামাজিক-রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনা ! কিন্তু গোটা পাকিস্তান আমলে মাসিক মোহাম্মদী পাকিস্তানের স্থায়িত্বই কামনা করেছে। এদিক থেকে মোহাম্মদীর এই সীমাবদ্ধতা রয়েছে, এবং সত্যিকথা বলতে কি অন্যান্য প্রধান প্রখ্যাত পত্রিকাও বাংলাদেশের স্বাধীনতার কথা স্পষ্ট উচ্চারণ করতে পারেনি। এই সীমাবদ্ধতা বাঙালির বুদ্ধিজীবী সমাজের ছিল।

তবে কিছু কিছু পত্রিকায় পাকিস্তানের বৈষম্যমূলক আচরণ এবং বাঙালি স্বার্থবিরোধী কার্যক্রমকে তীব্র ভাষায় প্রতিরোধ-প্রতিবাদ করা হয়েছে। এই বিবেচনাতেই বাঙালির ভাষা সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতির অগ্রগতিতে পত্রিকাগুলোর অবদান বিচার করতে হবে। মোহাম্মদীতে কিছু প্রতিবাদ, প্রতিরোধের পরিচয় যে পাওয়া যায় না, তা নয়। তবে মোহাম্মদীর তথ্যনিষ্ঠ সমকালীন বিষয়বলির ওপরে লিখিত আলোচনার মধ্যদিয়ে অন্যান্য পত্রিকাওয়ালারা এবং লেখক-বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় জানতে-বুঝতে পেরেছেন বহুকথা এবং তাঁদের নিজস্ব মতামত গঠনে মোহাম্মদীর আলোচনাগুলো প্রাণরস ও জীবনীশক্তি সরবরাহ করেছে।—এই বিবেচনায় মোহাম্মদীর সমাজ-ভাবনার গুরুত্ব অপরিসীম।

তাছাড়া, একটি সুপ্রতিষ্ঠিত মাসিকপত্রিকার ব্যাপক স্টাবলিশমেন্ট এবং একটি দৈনিক পত্রিকার (আজাদ) সংবাদ, তথ্য, ও মুদ্রণসুবিধা ভোগী মোহাম্মদী সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, কূটনীতি প্রভৃতি বিষয়ে যেসব মতামত মন্তব্য উপস্থাপিত করেছে—তা খুব কম সংখ্যক বাংলাপত্রিকাই করতে পেরেছে।

তাছাড়া অন্যান্য পত্রিকা হঠাৎ আবির্ভূত হয়ে এক বা দুই কিংবা তিন চার বছর মাত্র প্রকাশিত হয়েছে ; তারপর হয় অনিয়মিত নয় বন্ধ হয়ে গেছে। পাশাপাশি মোহাম্মদী পাকিস্তান আমলে বাইশ বছর নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছে (বিলম্বে এবং যুগ্ম সংখ্যা হিসেবে প্রকাশের কথা মনে রেখেই বলা হচ্ছে)। গোটা পাকিস্তান আমলের সমাজ ও রাজনীতির মোটামুটি সকল প্রধান ঘটনার কথা তাই মোহাম্মদী তার পৃষ্ঠাগুলোতে ধারণ করে আছে এবং স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে মোহাম্মদী প্রায় সকল ঘটনা বা প্রসঙ্গ কিংবা সিদ্ধান্ত অথবা কার্যক্রম সম্পর্কে মতামত বা মন্তব্য প্রদান করেছে।

প্রথম দিকে পাকিস্তানের প্রধান সমস্যা ছিল অধিবাসী বিনিময়ের সমস্যা। এ-প্রসঙ্গে ভারতের জাতীয় নেতাদের ১৯৪৭ সনের আগস্ট মাসের আগের আর পরের বক্তব্য যে কতো প্রভেদাত্মক তা তাঁদের নিচের এই আলোচনা থেকেই বোঝা যায়। মনে রাখতে হবে, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ, জিন্নাহ ও নেহেরু উভয় কর্তৃক পাক-ভারত ভাগ হয়ে হিন্দুস্থান-পাকিস্তান হলে অপশনের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত রাষ্ট্রে ‘হিজরতের’ অধিকার নির্বিবাদে মেনে নেয়া হয়েছিল। ভাগ-বাটোয়ারা সম্পর্কে আগের অনেক শর্তের কথাই বিভাগ-পরবর্তীকালে যে মানা হয়নি তার একটি নমুনা হলো লোক-বিনিময় সমস্যা নতুন করে উত্থাপন এবং তাতে নতুন যুক্তির অবতারণায়। মোহাম্মদী পাকিস্তান সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী

প্রতিফলিত করেছে, এবং বলাবাহুল্য ভারত-সরকারের কার্যাবলীর (বিহেবিয়ার) প্রতিক্রিয়াতেই পাকিস্তান এসব চিন্তা করেছে। ভারতীয় নেতৃবৃন্দ কখনও নিজেদের অঙ্গীকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন না। তাঁরা মনে হয় কথা মুখ দিয়ে বলেন না !! তার প্রমাণ ভারত পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষতিপূরণের টাকা দেয়নি। দুই অঞ্চলের অনেক নদীর পানি নিয়ন্ত্রণ করেছে দরকষা কষির লক্ষ্যে, কোন কোন নদীর পানি একেবারে বন্ধ করে দিয়েছে। আর ১৯৪৮ সনের পাক-ভারত যুদ্ধের কথা এবং কাশ্মির-সমস্যার প্রসঙ্গ মনে রাখলে পাকিস্তান সরকারের এই মতান্তরের কারণ বুঝা যায়।

পূর্ববঙ্গের হিন্দু অধিবাসী ভারতে গমনের পরিবর্তে ভারতের সকল মুসলমানকে পাকিস্তানে আনার কি সমস্যা মোহাম্মদী তা জনসংখ্যার বিশ্বস্ত পরিসংখ্যান তুলে ধরে স্পষ্ট করেই বলে : ১৯৪১ সনের আদমশুমারীর হিসাব মতে কলকাতাসহ পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা ছিল মোট ৫৩,০৫,৬৯৬ জন। কলকাতা থেকেই ৫ লক্ষ কর্মচারী পাকিস্তানে চলে আসে। যদি কমও ধরা হয় (৩,০৫,৬৯৬ জন?) তাতেও পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চাশ লক্ষ মুসলমান আছে, তার বেশী নয়। পক্ষান্তরে পূর্ববঙ্গের হিন্দু অধিবাসীদের সংখ্যা মোট ১,০৭,২৭,৯৬৬ জন। সিলেট পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ১০,৭০,০০০ হিন্দু পাকিস্তানে আসে। ফলে ১,১৭,৯৭,৯১৯ জন হিন্দু পাকিস্তানের অধিবাসী। ১৯৪৭ সনে বঙ্গবিভাগের অব্যবহিত পরে, প্রথম চোটেই পূর্ববঙ্গের ৮ লক্ষ লোক কলকাতায় চলে যায়। এর ফলে পূর্ববঙ্গে হিন্দুর সংখ্যা কোনমতেই ১ কোটির অধিক হতে পারে না। পশ্চিমবঙ্গের ৫০ লক্ষ লোকের বিনিময়ে ৫০ লক্ষ পশ্চিম পাকিস্তানের হিসাবে জমা হতে পারে।

‘হিন্দুস্থানে মুসলমানের সংখ্যা’ শীর্ষক উপসম্পাদকীয়তে লেখা হয় : ‘পাকিস্তানের অর্ধ সরকারী রিপোর্টে দেখিতেছি ১৯৪৯ সনের ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ৬৬ লাখ মুসলমান হিন্দুস্থান হইতে হিজরত করে পশ্চিম পাকিস্তানে পৌঁছে। বিহার, কলকাতা, দিল্লী, পূর্ব পাঞ্জাব ও দেশীয় রাজ্যসমূহে নিহত মুসলমান এই গণনার বহির্ভূত... ১৯৪৭ সনের প্রথম দিকে বর্তমান হিন্দুস্থানী এলাকায় যত মুসলমান বাস করিত তাহার মধ্য হইতে—কমবেশি এক কোটি লোক ১৯৪৯ সনের ডিসেম্বর পর্যন্ত পাকিস্তানে চলে আসে—১৯৪১ সনের আদমশুমারী অনুসারে সমগ্র ভারতে জনসংখ্যা ছিল ৩৮,৮৯,৯৭,৯৯৫ জন (প্রায় ৩৯ কোটি)। এর মধ্যে ৯,৪০,০০০,০০ জন মুসলমান।

আমাদের হিসাবে মোটামুটি ৭ কোটি মুসলমান এখন পাকিস্তানে বাস করিতেছে, তাহলে হিন্দুস্থানে মুসলমান ২ কোটি ৪০ লাখের অধিক হয় না। ইহার উপর আরও ১০ লাখ হিসাবের খাতিরে অতিরিক্ত ধরিয়া নিলেও এই সংখ্যা মোট দাঁড়ায় আড়াই কোটি। এই আড়াই কোটির মধ্যে বাংলার প্রাপ্য এক কোটি বাদে পশ্চিম পাকিস্তানের ভাগে পড়ে দেড় কোটি। এ পর্যন্ত প্রায় ৭০ হাজার মুসলমান হিন্দুস্থান হইতে হিজরত করিয়া পশ্চিম পাকিস্তানে চলিয়া গিয়াছে। তাহার উপর বর্তমান আড়াই কোটি অর্থাৎ মোটের উপর ৩ কোটি ১৬ লাখ নূতন অধিবাসীকে পশ্চিম পাকিস্তানে স্থান দেওয়া দুঃসাধ্য। অধিবাসী বিনিময়ে ইহাই প্রধানতম সমস্যা। এজন্য

হিন্দুস্থানের একটা অঞ্চল পাকিস্তানের হস্তগত হওয়া চাই। বস্তুত ইহা শুধু পূর্ববঙ্গের সমস্যা নহে।<sup>২৫</sup>

মোহাম্মদী তার পৃষ্ঠাগুলোতে হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কটি অত্যন্ত চমৎকার ভাবে চিহ্নিত করে রেখেছে। এম. এন. রায়ের The Historical Role of Islam শীর্ষক গ্রন্থের এই অংশটি তাই মোহাম্মদীর অনুবাদক-লেখকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল :

একশত বৎসর ব্যাপী দুটা সম্প্রদায় একসঙ্গে একই দেশে বসবাস করলো অথচ পরস্পরের সভ্যতা ও সংস্কৃতি সহানুভূতির সঙ্গে বুঝবার চেষ্টাই করলো না—পৃথিবীর ইতিহাসে সত্যিই এমন দৃষ্টান্ত আর মেলে না। পৃথিবীর কোন সভ্য জাতিই ভারতীয় হিন্দুদের মতো ইসলামের ইতিহাসে সম্পর্কে এমন অস্বস্তি এবং ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে এমন ঘৃণার ভাবও পোষণ করে না। ভারতীয় হিন্দুদের জাতীয়তাবাদীতার আদর্শই হলো আধ্যাত্মিক সাম্রাজ্যবাদ। কিন্তু ইসলাম তথা মোহাম্মদের ধর্মের সঙ্গে সম্পর্ক-বিচারে হিন্দুদের এই অপ্রশংসনীয় মনোবৃত্তি আরও উগ্র আকার ধারণ করে। আরবের নবীর জীবন যে বাণী এবং শিক্ষা বহন করে এনেছে তার সম্পর্কে এদের একটা অত্যন্ত ভুল ধারণা রয়ে গেছে।... ইসলামের এই বিজয় অভিযানের কারণ ছিলো এক অননুভূতপূর্ব বৈপ্লবিক সূরের মধ্যে লুকিয়ে ; গ্রীস, রোম, পারস্য, চীন—এমনকি ভারত বর্ষেরও প্রাচীন সভ্যতায় যুগ ধরে যাওয়ায় বিপুল জনসাধারণ যে চরমতম দুঃখ দুর্ধর্ষার সশ্মুখীন হলো তা থেকে ঠাট্টিয়ে ইসলাম এক আলো-ঝলকিত দেশের নির্দেশ তাদের দিতে পেরেছিলো বলেই তার এই অনন্যসাধারণ বিস্তার সম্ভব হয়েছিল।<sup>২৬</sup>

‘পাকিস্তানের সংস্কৃতি ও পূর্বপাকিস্তানের সাহিত্য’ শীর্ষক প্রবন্ধে সমাজের দিকে তাকিয়ে লেখকেরা লিখেছিলেন : ‘অন্যান্য সভ্যতার গ্রাসকারী প্রভাব থেকে পাকিস্তান ইসলামি সংস্কৃতিকে মুক্ত করে পরিপূর্ণ প্রকাশ দিতে চায়। এই সভ্যতা গড়ে উঠবে পাক-জনসাধারণের ইচ্ছামূলী জীবনধারণার রূপ ও প্রকৃতি থেকে। আমাদের জীবনযাত্রা-প্রণালী এখনো ঠিক ইসলামি হয়ে ওঠেনি হিন্দু ও ইউরোপীয় প্রভাবের কবলে পড়ে। উভয় সভ্যতার শৃঙ্খল থেকে যারা পাকিস্তানের উদ্দেশ্যগত বিশেষ সভ্যতাকে মুক্ত করতে পারেন, তাঁরা হলেন পাকিস্তানের বর্তমান ও ভাবী সাহিত্যিকেরা। পশ্চিম পাকিস্তানের সাহিত্যে মুছলিম সংস্কৃতির প্রভাব অধিকই বলতে হয়—পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যে তা বলা চলে না ; তাই পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যকে আজ কোন পথ ধরে স্বীয় সত্তা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, সে সম্পর্কে ভাবার সময় এসেছে।<sup>২৭</sup>

‘জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা’ শীর্ষক প্রবন্ধের উপসংহারের মন্তব্যটিও লক্ষণীয়—এই মতামত ১৯৫০ সনের মার্চ-এপ্রিলের—‘জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা উভয়েরই বিশ্বমানব-সমাজে প্রচুর প্রয়োজনীয়তা আছে। যেহেতু ইহারা পরস্পরবিরোধী নহে, কাজেই আপনসীমার মধ্যে থাকিয়া উভয়ই মানবসমাজের অশেষ কল্যাণ করিতে পারে। তবে আন্তর্জাতিক মঙ্গলের জন্য জাতীয়তাবাদীগণকে কিছু আত্মত্যাগ করিতে হইবে। তাহা না হইলে ইহার পূর্ণ সফুরণ সম্ভব নহে। অতএব নিখিল বিশ্ব মানবের সর্বজনীন মঙ্গল ও শান্তি রক্ষার জন্য প্রত্যেক জাতিরই কিছু আত্মত্যাগ স্বীকারপূর্বক আন্তর্জাতিক বিধিনিষেধ মানিয়া চলা উচিত। তাহা হইলেই আমাদের মধ্যে প্রীতিপূর্ণ মধুর মিলন ও তজ্জনিত শান্তিকল্যাণ আসিবে।<sup>২৮</sup>

ইসলাম দিয়ে সমাজতন্ত্রকে এতদিন প্রতিহত করা হয়েছে, কিন্তু ১৯৬৪ সনে চীনের সঙ্গে সম্পর্ক হওয়ায় মোহাম্মদী আতঙ্কিত হয়ে পাকিস্তানে ইসলাম কল্যাণকর কি সমাজতন্ত্র

কল্যাণকর-সেই প্রশ্নে উচ্চকিত হয়েছে এবং ‘সমাজতন্ত্রকে সন্ত্রাসবাদী শক্তি’ অথবা ‘নিহিলিজমের’ (Nihilism) প্রোগ্রামকে ঠেকানো আবশ্যিক হয়ে পড়ে। সমাজতন্ত্রের সাম্যবাদী ভাবধারার প্রশংসা করলেও ব্যবহারিক জীবনে সমাজতন্ত্রের সার্থকতা ও কল্যাণকর ভূমিকা স্বীকার করা হয়নি। ‘সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে সমাজবাদী ব্যবস্থা অনেক দেশ ও অনেক জাতির পক্ষে কল্যাণ আনার বদলে অকল্যাণ এনেছে বেশি। অবশ্য প্রচলিত সমাজ ও অর্থনীতির ব্যবস্থা চলতে দেওয়া হলেও সন্ত্রাসবাদী শক্তি নিহিলিজমের প্রোগ্রাম নিয়ে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে। এবং সেই শক্তি যে কমিউনিজম—বিভিন্ন দেশের ইতিহাসে তার নজির আছে। ১৯১৭ হতে সর্বাভ্যবাদী (Totalitarian) দেশগুলিতে যে বিয়োগান্ত নাটক অভিনীত হয়ে আসছে তা কোন বুদ্ধিমানের কাম্য হতে পারে না। তাছাড়া সমাজতন্ত্রের নাম করেই রশিয়া বা চীন যে কমিউনিজমকে কবুল করেছে তার পরিণতি সম্পর্কেও আমাদের কাছে হুঁশিয়ার হতে হবে। বস্তুত দেশের মধ্যে পূর্ণ গণতন্ত্র কায়েম করে, জনগণের সরকারের দ্বারা সে আদর্শের রূপদান ছাড়া পাকিস্তানের সম্মুখে অন্য কোন পথ খোলা নেই।...সেই জন্য ইসলামের অর্থনীতির ব্যাপক আলোচনা হওয়া প্রয়োজন।’<sup>২৯</sup>

‘ধর্মের প্রয়োজন’ সম্পর্কেও তাই গুরুত্বের সঙ্গেই মোহাম্মদীতে লেখা হয়েছে : ‘জীবনকে যারা ধর্মীয় গণ্ডীর বাইরে রাখতে চায়—তাদের জীবনে কোনদিন শান্তি আসে না। স্বাধীন মনোভাব—তাদের জীবন থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়...এবং ধর্মবিমুখ মানুষের একটা বড়কাজ হচ্ছে যে, তারা সমাজে ধ্বংসাত্মক কাজ করাকেই গৌরবের মনে করে...মনে মনে খুব তৃপ্তিলাভ করে।’ সমাজের অবাস্থিত বলে এরা পরিচিত হয়ে থাকে।<sup>৩০</sup>

লেখক মোতাহের হোসেন চৌধুরীর নাম উল্লেখ না করে, এবং তাঁর সংস্কৃতি কথার মূল বক্তব্য খণ্ড না করে ধর্মের প্রাধান্য সৃষ্টি করে বলেন ধর্মের প্রাণবায়ু ও তার বিচিত্র অনুভূতি থেকে যে সমাজ বস্তুত, সে সমাজ নেহায়েত ছোটলোকের সমাজ, অবাস্থিত জাতির সমাজ। এ সমাজের জীবনে ‘চাওয়া ও পাওয়া’ বলতে কিছুই নেই। দৃষ্টিভঙ্গীর বিক্রম না ঘটলে কোন মানুষই ধর্মকে এড়িয়ে চলার প্রয়াস পায়না। ধর্মবিমুখ লোকদের জীবনযাত্রা ও জীবনপদ্ধতি হচ্ছে একটা হতাশ জীবন। জিজ্ঞাসার কোন সমাধান এধরনের জীবনে মেলে না। শুধু ধর্মীয় জীবনই এই জিজ্ঞাসার যোগ্য জওয়াব দিতে পারে। ‘মানুষের ব্যক্তিগত দৃষ্টি-দ্বন্দ্ব-সাম্রাজ্য, ব্যক্তিগত আকৃতির ত্বরিত জবাব কেবলমাত্র ধর্মের কাছেই মিলে।...কমিউনিষ্ট ছাড়া দুনিয়ার প্রত্যেকটি মানুষ আল্লাহতে বিশ্বাসী। তবে আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান ও তাঁর আরাধনার নিয়ম-পদ্ধতি ও ধারা সম্পর্কে ভিন্নতা রয়েছে।’ স্যার রেভারেন্ড রবার্ট আই ওয়েলস—এর ‘ভাষ্যে কমিউনিজম ও কমিউনিষ্টদের সম্পর্কে বলা হয় : ‘শ্রমিক ও সংখ্যালঘুদের মুক্তি সাধক বলে নিজেদের পরিচয় দিয়ে কমিউনিষ্টরা প্রকৃতপক্ষে বিশৃঙ্খলা ও সমাজবিরোধী-কার্যকলাপেই লিপ্ত হয়ে আছে। সামাজিক দুর্নীতি-দূরীকরণ এদের লক্ষ্য নয় বরং সামাজিক দুর্নীতির সুযোগ গ্রহণ করে বিশ্বব্যাপী এক বিপ্লব সৃষ্টিই এদের মুখ্য উদ্দেশ্য।’<sup>৩১</sup>

এই লক্ষ্যে মোহাম্মদী জোরদারভাবে পুনরায় ‘মানবজাতির মুক্তিছন্দ কোরআন’ এই বক্তব্য প্রমাণের জন্য ড. জনসন, কার্লাইল, নলডেক প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিত, দার্শনিকদের

সমাজতন্ত্র-বিরোধী বক্তব্য উপস্থাপন করে বহু প্রবন্ধ প্রকাশ করে। সমাজতন্ত্রের সঙ্গে ইসলামের দার্শনিক তুলনায় নয় কেবল, সমাজকল্যাণের ক্ষেত্রেও যে ইসলাম উৎকৃষ্ট আদর্শ—তাও মোহাম্মদী প্রমাণ করতে সচেষ্ট হয়েছে। ‘অধর্মের প্রবল স্রোতের যুগে ধর্মের নামে, ইসলামের নামে, পাকিস্তান অর্জিত হয়েছে। সুতরাং আমাদের সমাজকল্যাণের কাজেও ইসলামি শিক্ষা ও আদর্শকে রূপায়িত করতে তুলবে। কারণ ইসলামে সমাজ কল্যাণের সব মৌলিক উপাদানেরই প্রাচুর্য রয়েছে।’<sup>৩২</sup>

এছলামকে গুটিকয়েক আচার বা অনুশাসনের আওতায় সীমাবদ্ধ করে দেখলে একটা মস্ত ভুল করা হবে। আধুনিক সভ্যতার বস্তুতাত্ত্বিক সংকীর্ণতার জন্য বিশ্বব্যাপী দৈন্য, হানাহানি, ও ভেদ-বৈষম্যের সৃষ্টি হয়েছে। এই আবর্জনা মুক্ত করে পৃথিবীতে পুণরায় শান্তি প্রতিষ্ঠা একমাত্র এছলামের দ্বারাই সম্ভব। এছলামের পথ সিরাতুল মুস্তাক্বিমের পথ—এছলামের পথ সহজ, সরল।<sup>৩৩</sup>

আবার ধর্মের বর্তমান অবস্থা হচ্ছে : ‘এবাদত যেন একটা আনুষ্ঠানিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে।’ তাই মুখে ইসলামের সমস্ত জীবন সমস্যার সমাধান রয়েছে বলে স্বীকার করলেও বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায় ‘জীবন সমস্যার সমাধানের জন্য অন্যত্র ছুটছি। কাজে... কর্মের এই অনৈক্যই আজকের দিনে মুছলমানের দুর্দশার সব থেকে বড় কারণ। কিন্তু একথা ভুললে চলবে না...বিশ্বে এছলামী জীবনদর্শনের মূল্য চিরদিনই সমান থাকবে।’<sup>৩৪</sup>

ইসলামের প্রকৃত আদর্শকে বিকৃত ব্যাখ্যা দিয়ে হীনস্বার্থ সাধনের হাতিয়ার রূপে ব্যবহারের সামাজিক প্রবণতা লক্ষ্য করে মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ ১৯৬৬ সনে ‘এছলামের আদর্শ’ সম্বন্ধে আলোচনা করতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন :

এছলামের আদর্শ কথাটা অত্যন্ত গভীর, অত্যন্ত ব্যাপক। এছলামের প্রকৃত স্বরূপ সম্যক উপলব্ধি করিতে না পারিলে সে আদর্শের যথাযথ ধারণা করা সম্ভবপর হইয়া উঠে না। অথচ এই উপলব্ধির জন্য জ্ঞানের ও ভাবের মধ্য দিয়া যে সাধনার আবশ্যিক হয়, তাহার আয়াস স্বীকারে আমরা অনেক সময় কচ্ছিতও হইয়া থাকি।...ফলে অবস্থা এই দাঁড়িয়ে আছে যে, আলোচনার সময় একদল সেই আদর্শকে টানিয়া হেঁচড়াইয়া নিজেদের ধারণা ও সংস্কারের সহিত সামঞ্জস্য করিয়া লইতে প্রয়াস পাইতেছেন, আর একজন নিজেদের সাময়িক খিয়াল, হুজুগ বা পরিকল্পনার সহিত সেই আদর্শকে অসমঞ্জস্য মনে করিয়া, সম্মিলিত মুসলমানকে তাহার মায়াপাশ মুক্ত করিয়া ফেলার জন্য ব্যাকুলি প্রকাশ করিতেছেন। এইরূপে এছলামের আদর্শের মারাত্মক সংকট বাঁধাইয়া অথবা অন্যায়রূপে তাহার সংহার সাধনের চেষ্টা করিয়া নিজনিন্দ্র শিক্ষা রুচি ও আবশ্যিক অনুসারে সাময়িক ভাবে বর্তমানে যে স্বস্তি বা তৃপ্তিলাভের চেষ্টা করা হইতেছে, বস্তুত তাহা আত্মবঞ্চনার এবং সামাজিক হিসাবে আত্মহত্যার নামান্তর মাত্র।...নিজের সংস্কারের সহিত সামঞ্জস্য করিয়া লওয়ার জন্য তাহার সেই বিরাটায় গর্ব করিতে যাওয়া যেমন অন্যায়, সাময়িক পরিকল্পনা বিশেষের সহিত অসামঞ্জস্যের আশংকায় তাহাকে অস্বীকার করিতে যাওয়াও সেইরূপ অসমীচীন, অযৌক্তিক। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, পরিবর্তনশীল বর্তমানের কল্পিত বাস্তবতার মধ্যে কোন আদর্শকে আবদ্ধ করিতে যাওয়া, আর আদর্শ শব্দের মূল তাৎপর্যকে অস্বীকার করা, একই কথা।...এছলামের আদর্শ এক দিকে যেমন বর্তমানকে অস্বীকার করে না, অন্য দিকে বর্তমানকে মাত্র অবলম্বন করিয়া তাহার মধ্যে সমাপ্ত হইয়া যায় না, সীমাবদ্ধ হইয়া থাকে না। ভবিষ্যতের অসংখ্য অনাগত বাস্তব নতুনের সৃষ্টির জন্য চিরকালই আদর্শের সদাসম্পূর্ণ পটীয়সী শক্তির অনুসরণ করিয়া চলিতে থাকিবে। কোরণের বর্ণিত বিশ্বমানবের এই অবিরত অপ্রতিহত সাধনাকে, সুনিয়ন্ত্রিত সুপরিচালিত সাফল্যমণ্ডিত করার নিমিত্ত সে আদর্শের আবশ্যিক চিরকালই হইতে থাকিবে।<sup>৩৫</sup>

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ‘প্রাচীন ভারতে গোবধ’ প্রবন্ধে গুরু জবাই নিয়ে (ইসলামী মতে কোরবানীই মূল সমস্যা) হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ-এর উপর মন্তব্য করেন ১৯৬৭ সনে পাক-ভারত যুদ্ধের পরে সম্ভবত ভারতে হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রেক্ষাপটে। প্রাচীন শাস্ত্রাদি পর্যালোচনাপূর্বক উপসংহারে তিনি মন্তব্য করেন : মাংসখাতক (ভারতীয়) জাতি কিরূপে বর্তমানে মাংসবিমুখ জাতিতে পরিণত হলো এবং গুরু গোমাতারূপে পূজিত হল, এর উত্তর কঠিন নয়।

তিনি বলেন, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রভাবে লোকে সম্পূর্ণরূপে না হইলেও অনেকটা নিরামিষ ভোজনের পক্ষপাতি হইয়া উঠে। মহারাজ অশোক রাজ্যমধ্যে যাগযজ্ঞে পশুবধ নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন ; ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ বলিয়া বৈদিক যুগ হইতেই গুরু অতি মূল্যবান সম্পদ বলিয়া বিবেচিত হইত। সেজন্য কেবল যাগযজ্ঞে ও বিশিষ্ট অতিথি সেবার জন্য গোবধ হইত। ক্রমশ যাহা অর্থনৈতিক ছিল, তাহাই ধর্মীয় হইয়া উঠে। রাজশক্তির প্রভাবে কিরূপে খাদ্য পরিবর্তন হয়, তাহার সাক্ষী হাঁস ও মুবগীর মাংসের প্রচলন, যাহা পূর্বে নিষিদ্ধ ছিল। এই কারণেই বন্যবরাহ অধিকাংশে হিন্দু-সমাজে অভক্ষ্য হইয়াছে। আমরা অর্থনৈতিক কারণে দুগ্ধবতী গাভী ও মহিষ এবং কর্মক্ষম ষাঁড় ও মহিষের রক্ষা প্রয়োজন স্বীকার করি।... তজ্জন্য সপ্তাহে দু'একদিন মাংসশূন্য দিন করা যাইতে পারে। কিন্তু আমরা গোপূজা সমর্থন করিতে পারি না। তাহা প্রাচীন হিন্দু-শাস্ত্রেও স্বীকার করে না। একমাত্র গোমাতার উক্ত সন্তান ভিন্ন কেহ গোহত্যা নিবারণের জন্য সত্যগ্রহ করিতে পারে না।<sup>৩৬</sup>

আইউব খানের বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম কুমিল্লা পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর মাধ্যমে প্রথমে শুরু হয় পরগাছাজীবী ইমামকে কেন্দ্র শিক্ষক রূপে নিয়োগের মাধ্যমে। কিন্তু শীঘ্রই দেখা গেল এঁরা পরগাছাজীবী বটেন। মোহাম্মদীর মন্তব্য এ-প্রসঙ্গে :

ঈমাম নামে খ্যাত... শতকরা নব্বইজনের বাঙলাভাষায় জ্ঞান এবং (হিসাব শিক্ষা অর্থাৎ গণিতের উপর) পাণ্ডিত্য দেখে বুঝা গেল, এরা... নিরক্ষর বয়স্কদের শিক্ষাদানে সক্ষম নয়।... সামান্য খুঁটিনাটি ব্যাপারে মিথ্যার বেসাতি চালিয়ে ঈমাম বিক্রী করে খেতে ঈমাম (?) শ্রেণীর লোকদের মতন আর কাউকে দেখিনি।

অতএব উপযুক্ত পন্থার মাধ্যমে প্রদেশময় বয়স্কশিক্ষা সম্প্রসারণ করতে হবে।<sup>৩৭</sup>

তঁারা বলেন, ব্যাপক অর্থে শিক্ষকগণ হলেন সমাজের শিক্ষাদাতা এবং... শিক্ষকগণই সমাজের অগ্রগতির মূলে... বস্তুত শিক্ষকদের সেবা ও অবদান সমাজের জীবনে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান।... একথাও সত্য যে সমাজের প্রতি শিক্ষকদের যে কর্তব্য ও দায়িত্ব তা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তা পালন করতেও শিক্ষকদের তেমন নিষ্ঠাবান হওয়া উচিত।<sup>৩৮</sup>

মোহাম্মদীতে লেখকেরা ইতিহাস চেতনার গুরুত্ব সম্পর্কেও গুরুতর আলোচনা করেছেন। অধ্যক্ষ মুখলেসুর রহমান ‘জাতীয় ইতিহাস রচনায় পুরাতাত্ত্বিক আবিষ্কারের গুরুত্বকে উপেক্ষা করলে চলবে না’ বলে সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন। ‘তাহলে আমাদের ইতিহাসের ভিত্তি হবে দুর্বল এবং পুরাতাত্ত্বিক সমর্থনের অভাবে তথ্যাদিও হবে না নির্ভরযোগ্য।’<sup>৩৯</sup>

দেশের সামাজিক অবস্থার বিবর্তন ও পূর্ববাঙলার অরিজিন্যাল নাগরিক দরিদ্র চাষী মুসলমানদের সামাজিক ও মানসিক প্রবণতার পরিচয়ও মোহাম্মদীর পাতাতে পাওয়া যায়। ঔপনিবেশিক শাসক, অমুসলমানরা চলে যাওয়ার পর নতুন নবাগত মোহাজের, মুসলমান



রিফিউজীরা এসে পূর্ববাঙলার বিস্তারিত উৎস এবং শিল্প কারখানাগুলো দখল করে নিল। এদেশের ‘আনসার’ মুসলমানেরা এই মোহাজেরদেরকে ‘নতুন সাহেব’ আর ‘বেগম সাহেবা’রূপে বরণ করে নিল :

মোহাজেরদের মধ্যে ব্যবসায়ী বিত্তশালী শেঠও ছিলেন, আবার রিক্তহস্ত নিঃস্ব দরিদ্রও ছিল। চালচলনে তারা এয়ারিস্টোক্রাটিক আর মহিলারাও পর্দাবদ্ধিত, কাছেই এদেশের সরলপ্রকৃতির গরীব জনসাধারণ তাদেরকে বিলেতী সাহেব-মেমদের পর্যায়ে দেখতে লাগলেন।... অনতিবিলম্বেই তারা অমুসলমানদের ফেলে যাওয়া ব্যবসা ও শিল্পকারখানা ধরে নিলেন, বসবাসের জন্য, বড় বড় হালফ্যাশনের ইমারত খাড়া হয়ে গেল; নতুন মডেলের গাড়ী চালু হলো; আয়েস আরামের জন্য আধুনিককালের সাজ-সরঞ্জাম সবকিছুই আমদানী হয়ে গেল। স্টাণ্ডার্ড খুবই হাই হয়ে গেল। তদদৃষ্টে নিজেদের নীচ স্টাণ্ডার্ড যেন কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারলেন না। কারণ তারা ভাবতে শুরু করলেন স্টাণ্ডার্ডটাই বুঝি পাকিস্তানি মুসলমানের আসল স্টাণ্ডার্ড।

বাঙালির মধ্যে অনুকরণপ্রিয়তার সাইকোলজি স্টাডি করে অবাঙালি মুসলমান শিল্পপতিরা নানাবিধ প্রসাধন সামগ্রির ‘কারখানা স্থাপনে যত্ববান হলেন’...গ্রামেগঞ্জে মেয়েরা পর্যন্ত এখন ঠোঁটে রঙ লাগায় গালে রুজ ঘষে।

অনেকেরই চোখে চশমা ও হাতের কবজিতে ঘড়ি। ঘড়ি অপেক্ষা তার বন্ধনীটাই আরো বেশী জমকালো ও দামী!... অথচ পেটে ভাত নেই।

লেখক দুর্নীতির উৎস খুঁজতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন : এই স্টাণ্ডার্ডে উঠার ‘দুরাকাজ্জা’ থেকেই উদ্ভব হলো সর্বগ্রাসী দুর্নীতি। সুন্নীতির মাধ্যমে অর্থাগম সময়সাপেক্ষ। ‘কিন্তু দুর্নীতির কল্যাণে আরব্য উপন্যাসের আশ্চর্য প্রদীপের ন্যায় রাতারাতি ধনী হওয়া যায়।’ চুরি-ডাকাতি শিক্ষিত ভদ্রসমাজে নিন্দনীয় কিন্তু ঘৃণ-ভেজাল-কালোবাজারি-মুনাফাখোরি, চোরাচালন, চিটিং প্রভৃতি সমাজদেহে নিঃশব্দে প্রবাহিত হচ্ছে; তা ধরার মত যন্ত্র এখন কারো হাতে নেই। অতএব নিরাপদ। অর্থের লোভে শিশুর জীবনরক্ষাকারী ঔষধও নকল হয়। ভেজালে প্রতাপ নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্র সবকিছুতেই।

পাশ্চাত্যের বস্ত তত্ত্ববাদ আমাদের পবিত্র এছলামের অধ্যাত্মবাদকেও একেবারে পঙ্গু করে দিয়ে গেছে। আমাদের উত্তরাধিকারীরা এখন তারই জের ধরে আনায় টেনে চলেছে। জাতীয় চরিত্রের অধপতন ঘটেছে। আত্মসংঘম হারিয়ে ফেলেছি। ঈমান, শৃঙ্খলা ঐক্যবোধ আমাদের মধ্যে একেবারেই লোপ পেয়েছে। পরিতাপের বিষয় এই যে মুসলমানের মনুষ্যত্বের স্টাণ্ডার্ড কোন অতলে তলিয়ে গেছে। মানবীয় স্টাণ্ডার্ড বেধে দেয়ার জন্যই একদা এছলামের শেষ নবী রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়ার বুক অবতীর্ণ হয়েছিলেন।<sup>৪০</sup>

১৯৬৮ সনে ছয় দফা আন্দোলন শুরু হয়ে যাবার পর, আইউব খানের শাসনামলের শেষ দিকে, উন্নয়ন দশকের জাক-জমকের মধ্যে মোহাম্মদীর একজন লেখক ‘দেশের সংকটময় পরিস্থিতিতে আমাদের বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা’ দেখে বিক্ষুব্ধচিত্তে লিখেছিলেন :

দেশ আজ তমসাজ্জন্ন। আজ জনসাধারণকে তার মানবাধিকারের জন্য সংগ্রাম করতে হচ্ছে। অম্লাভাব, প্রায় সব জিনিসেরই হু হু মূল্যবৃদ্ধি; শিল্পে বাণিজ্যে মন্দা, বেকার-সমস্যার সম্প্রসারণ ইত্যাদি মিলিয়ে সাধারণ মানুষ আজ ক্ষুব্ধ। এদিকে রাজনীতিবিদেরা জনসাধারণের এই ধুমায়িত ক্ষোভকে সংগঠিত করতে পারছেন না। এবং তাঁরা পরস্পর কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি, দল ভাঙাভাঙি নিয়ে ব্যস্ত। কিছু-কিছু রাজনীতিক জনসাধারণের এই ক্ষুব্ধতার সঠিক মূল্যায়ণ করে সংগ্রামে-যে না-নেমে এসেছিলেন তা নয়, কিন্তু তাঁদের কারাগারে শিক্ষিত

করে এবং বিভিন্ন মামলায় জড়িত করে যখন তাঁদের নির্ধারিত করা হচ্ছে, ঠিক তখনই অন্যান্য রাজনীতিকরা ঠিক দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। যুবসমাজ আজ হতাশাগ্রস্ত। তাদের শিক্ষার দ্বার রুদ্ধ; সম্মুখে বেকারত্ব তারা আজ মুক্তির পথ পাচ্ছে না। তারা মাঝে-মাঝে ফেটে পড়ছে এবং সরকারের নিপীড়নের সম্মুখে গুমড়ে গুমড়ে মরছে। আজ আমাদের বুদ্ধিজীবীশ্রেণী নীরব; মাঝে মাঝে তাঁরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত হয়ে দুচারটে ভাল-ভাল কথা বলার মত দায়সারা কাজ ছাড়া আর কিছুই করছেন না। দেশের প্রকৃত সমস্যা অনুধাবন করে এবং সমস্যার প্রকৃত সমাধান কিভাবে হতে পারে, তার দিক নির্দেশন তাঁরা দিতে পারছেন না বা দিচ্ছেন না। পৃথিবীর প্রত্যেক দেশেই বুদ্ধিজীবীদের বিশেষ একটা ভূমিকা রয়েছে।

লেখক বলেন, রাজনীতিবিদেরা পড়াশোনা করেন না, কোনোরকম জ্ঞানচর্চার সঙ্গে তারা সম্পৃক্ত নন। বুদ্ধিজীবীদের এক্ষেত্রে করণীয় আছে; কিন্তু তাঁরাও তা করেন না। লেখক 'বুদ্ধিজীবী'র ভূমিকা সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা ত্যাগিত হয়েছেন—

বুদ্ধিজীবী তিনিই, যিনি আমাদের দেশের সত্যিকার সমাস্যাগুলো জানেন, যিনি তার ক্রিয়াকাণ্ড দ্বারা জীবনকে জানতে চেষ্টা করেন, এবং তার মনোভাব তার কর্ম দ্বারা প্রকাশ করেন এবং সমাধানের চেষ্টা করেন... তাঁরা সংস্কৃতি ও ইতিহাসের ধারক ও বাহক। স্বাধীনতা পূর্বকালে আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা নগণ্য ছিল না।... কিন্তু বর্তমানে আমাদের দেশের এই সংকটময় পরিস্থিতিতে বুদ্ধিজীবীরা কোন ভূমিকাই পালন করছেন না। দেশের মানুষ যখন মুক্তির পথ খুঁজছে তখন রাজনীতিকদের মত তাঁরাও দর্শকের ভূমিকা পালন করছেন। মনে হয়, জনসাধারণের মত তাঁরাও হতাশাগ্রস্ত। একজন সত্যিকার বুদ্ধিজীবী তিনিই, যিনি ব্যস্তব অবস্থা সম্পর্কে জানেন, এবং এর সমাধান সম্মিলিতভাবে করতে জানেন; যিনি জনসাধারণের সৃজনশীল শক্তিতে বিশ্বাস করেন এবং আস্থা রাখেন, যে-বিশ্বাস আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের শ্রেণা যুগিয়েছিল, ঠিক সেই বিশ্বাসই আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছিয়ে দেবে।<sup>৪১</sup>

রাজনীতিকদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও লেখক বলেন :

রাজনৈতিক ব্যক্তিদের পুরাতন পবিত্র চরিত্র ও চিন্তাধারা আর নাই—জনসেবার স্থানে দেখা দিয়াছে উদরসেবা, আর দেশপ্রেমিকের নেশা ছুটিয়া গিয়া সেখানে জন্ম লইয়াছে, রাজনৈতিক রসাল পেশা। শুধু ক্ষমতা লাভের সপ্তাঘটাই এখন রাজনৈতিক দলের মহাকর্তব্য কর্ম বলিয়া গণ্য হইয়াছে।<sup>৪২</sup>

সহশিক্ষার মাধ্যমে তরুণদেরকে 'নৈতিকতাহীন করার' বিপক্ষে মোহাম্মদী সোচ্চার ছিল। তাঁদের মতে 'এই সহশিক্ষা আমাদের স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবর্তিত থাকার দরুন জাতির ভবিষ্যতের আদর্শচ্যুত, নৈতিকতাবিবর্জিত হয়ে জাতীয় আদর্শের সোপানকে ভেঙ্গে খান খান করে দিচ্ছে। আর প্রতিটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান প্রেমাগার হয়ে গেছে।' এই ব্যবস্থার উচ্ছেদ ঘটানো গেলে 'জাতির তরুণরা আশার আলো দেখতে পাবে'। একটি 'ইসলামিয়াত' বই পড়ানো হলেও 'ইসলামী শিক্ষার' বিকৃতি ঘটানো হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষিতরাও 'দুনিয়া সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকে—বহুমুখী সমস্যা তাদেরকে বিভ্রান্ত করে দেয়'। বহুমুখী জ্ঞান অর্জনের সুযোগ মাদ্রাসা-শিক্ষাব্যবস্থায় রাখা হয়নি। বিজ্ঞানকেও তেমনিভাবে 'ইসলামীকরণ' করা হয়নি। যে জাতির নিজস্ব 'তাহজিব তমদ্দুন' আছে সেজাতি কখনো বিজাতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানকে অপরিবর্তিত রেখে তার নতুন বংশধরদেরকে তা পড়াতে পারে না। 'প্রচলিত দ্বিমুখী শিক্ষানীতির মাধ্যমে জাতির তরুণরা কিছুতেই জাতীয় আদর্শের দিকে... অগ্রসর হতে সক্ষম হবে না' বলে মোহাম্মদী মন্তব্য করে।<sup>৪৩</sup>

দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, ধর্ম, শিক্ষা, সমাজতন্ত্র প্রভৃতি সকল বিষয়েই মোহাম্মদী বক্তব্য পেশ করেছে তাদের বক্তব্য কখনও কখনও খুবই প্রাসঙ্গিক ছিল। আবার অনেক মন্তব্য ও বক্তব্য ছিল দলীয় দৃষ্টিকোণের দ্বারা সীমাবদ্ধ। যেমন যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনের

ফলাফলে মোহাম্মদী স্তব্ধ হয়ে পড়েছিল, আবার যখন মন্ত্রীসভা বাতিল হলো তখন তাঁরা নানা বিষয়ে মতামত দিয়ে ফ্রন্টের কার্যক্রম ইত্যাদি মূল্যায়নপূর্বক মন্তব্য তথা সমালোচনা উপস্থিত করতে লাগলেন। শেরে বাংলা ফজলুল হক কলকাতা যা যা করেছিলেন বা বলেছিলেন নিষ্করণ-ক্ষমাহীন কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকারের মনোভাব নিয়ে তার সমালোচনা করেছিলেন মোহাম্মদীর কর্তৃপক্ষ। কেন্দ্রীয় সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলো যথার্থ ছিল—এরকমই তাঁদের রায়। তবে বাঙালির সমাজের প্রগতির জন্য তাঁরা স্বাস্থ্যবান জনসম্পদের গুরুত্বও উপলব্ধি করেছেন। ‘স্বাস্থ্যের সঙ্গে খাদ্যের এবং খাদ্যের সঙ্গে কৃষির যোগসূত্র রয়েছে। ফলে প্রত্যক্ষভাবে কৃষির উন্নতির উপরই যে নির্ভর করছে যে কোন জাতির জনস্বাস্থ্য।’

‘কৃষির উন্নয়নের আশু প্রয়োজন’ বলে পত্রিকা ভেবেছে। কিন্তু কৃষি উন্নয়ন এবং খাদ্য বৃদ্ধি যে কিভাবে ঘটেতে পারে এবং পুষ্টিহীন নিঃস্ব মানুষের ক্রয়ক্ষমতা যে কিরূপে বৃদ্ধি পাবে, এবং স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে—সে সম্পর্কে গভীর চিন্তা মোহাম্মদী করতে পারেনি। তাঁরা এই চিন্তায় সীমিত যে;

জীবন ধারণের জন্য যে খাদ্যের প্রয়োজন তা সবই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষি অথবা কৃষিজাত দ্রব্যের উপর নির্ভরশীল। অতএব কৃষিকেই জাতীয় জীবনের প্রথম প্রয়োজনীয় জিনিস বলে ধরে নিতে হবে।<sup>৪৪</sup>

‘পাকিস্তানের মূল সমস্যা কি?’ এই প্রশ্নে মোহাম্মদী খাদ্য সমস্যাকেই ‘মূল সমস্যা’ রূপে চিহ্নিত করে লিখেছে, ‘পূর্ব পাকিস্তানে বিশেষ করে নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগে খাদ্য ঘাটতি দেখা দেয়, এখানে লোকবসতি ঘন, লোক সংখ্যা বিভিন্ন কারণে ক্রমশ বাড়িতেছে অথচ জনসংখ্যাবৃদ্ধির সহিত খাদ্যশস্যের উৎপাদন সমানতালে বৃদ্ধি পাইতেছে না।<sup>৪৫</sup>

সমস্যা সমাধানের জন্য মোহাম্মদী নানাভাবে যুক্তিবুদ্ধি দেবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তাতে কী-ই-বা ফল ফলেছে? এমনকি পাকিস্তানপূর্ববর্তী বাংলাদেশের প্রায় শতাব্দীর সাধনায়ও এই ভূখণ্ড খাদ্যে, কৃষিতে, শিল্পে বাণিজ্যে উৎপাদনে কোনো অগ্রগতি সাধন করতে পারেনি। এই ব্যর্থতা এদেশের সার্বিক ব্যর্থতার মতো পত্র-পত্রিকাগুলোরও—তারা জনমত এমনভাবে গঠন করতে পারেনি—যাতে সরকার এই দিকে গভীরভাবে আশু সমাধানের পদক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে বাধ্য হয়।

মোহাম্মদীর প্রাণ-পুরুষ মুসলিম বাঙলার অন্যতম পুরোধা, সাহিত্যিক-সাংবাদিক-ব্যক্তিত্ব মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর সাফল্যের সঙ্গে মোহাম্মদী-আজাদের সাফল্য একই সূত্রে জড়িয়ে রয়েছে। আকরম খাঁকে মুসলিম জাগরণের মহান পুরুষ হিসেবে গণ্য করা হয়। তাঁর এই পুরুষকারের প্রাণপ্রতিষ্ঠাকারী মাসিক মোহাম্মদী। মওলানা আকরম খাঁর শতবর্ষে পদাশ্রয় উপলক্ষে মুসলিম বাঙলার প্রধান চিন্তাবিদ, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং কবি-সাহিত্যিক গবেষকবৃন্দ কলম ধরেছিলেন তাঁর অবদানের মূল্য দিতে, মূল্যায়ন করতে তাঁর চিন্তা ও কর্মাবলীর। চিন্তাবিদ আবুল হাশিম তখন লিখেছিলেন,

মাসিক মোহাম্মদীর মাধ্যমে মওলানা সাহেব একদিকে আমাদের সাংস্কৃতিক নিষ্কলিতা ও বৈশিষ্ট্যগুলিকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিবার জন্য লেখনী চালনা করিয়াছেন, অন্যদিকে গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছেন আত্ম-চেতনায় বলিষ্ঠ এক মুসলিম সাহিত্যিকগোষ্ঠী। সেদিন মুসলিম সমাজের লেখকমাত্রেরই মাসিক মোহাম্মদীর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছেন। কারণ ‘মোহাম্মদীই ছিল তাঁহাদের সাহিত্য-প্রতিভা বিকাশের সর্বাপেক্ষা বলিষ্ঠ বাহন। কাজেই পাকিস্তানের বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসেও ‘মাসিক মোহাম্মদীর অবদান উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে।<sup>৪৬</sup>

## তথ্যপঞ্জি

১. পত্রিকার ২১ বর্ষ ১ সংখ্যার সৃষ্টি থেকে ৬৮ বর্ষ ৮ সংখ্যার সৃষ্টিপত্র অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে খাঁরা কবিতা লিখেছেন, তাঁদের নাম পর্যায়ক্রমে উল্লেখপূর্বক একটি তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে এবং অন্য গ্রন্থে প্রকাশ করার পরিকল্পনা আছে। এতে ১৯৪৭ সনে কারা লিখতেন আর ১৯৭০ সনে কারা নতুন আসছেন বুঝা যায়। প্রবন্ধ, নাটক, উপন্যাস এবং গল্পগুলোও অনুরূপভাবে, পত্রিকার প্রথম থেকে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে এবং এ গ্রন্থে তাও সম্মিবেশ করা হয়েছে।
২. মাসিক মোহাম্মদী, ২০ বর্ষ, ১২ সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৫৪, পৃ. ১০৩১।
৩. পূর্বোক্ত, বর্ষ ২১, সংখ্যা ১১, ভাদ্র, ১৩৫৭, পৃ. ৬৮৩-৮৪।
৪. আহমদ শরীফ, বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ধারায় হিন্দুপ্রভাব, পূর্বোক্ত, ২৩ বর্ষ ৩ সংখ্যা, (সাহিত্য প্রসঙ্গ) পৌষ ১৩৫৮, পৃ. ১৮০-৮২।
৫. মাসিক মোহাম্মদী, 'সহযোগী সাহিত্য' বিভাগ, ২৪ বর্ষ, ১ সংখ্যা, কার্তিক ১৩৫৯, পৃ. ৮৭-৮৯।
৬. মোহাম্মদীর এইসব আলোচনায় ড. কাজী মোতাহার হোসেনের নামের বানান বারবার 'মোতাহের' লেখা হচ্ছে। ডক্টরকে ডাক্তার লিখছেন অবশ্য 'ডক্টর' কে 'ডাক্তার' বলা বা লেখার রেওয়াজ আগে ছিল। এটা তাঁদের নিন্দার দিক। এমন ভুল করা উচিত নয়। সাহিত্যে বিরোধীপক্ষের কবি-সাহিত্যিকের নামও শুদ্ধ করে লেখার মহান ট্রেডিশন আছে। কিন্তু এমন বিকৃত বানানে কারও নাম লেখায় মোহাম্মদীর লেখকদেরকেই হীনমন্য না ভেবে উপায় নেই।
৭. মাসিক মোহাম্মদী, ২৪ বর্ষ, ১ সংখ্যা, কার্তিক ১৩৫৯, পৃ. ৮৯-৯০।
৮. পূর্বোক্ত, ২৪ বর্ষ, ২ সংখ্যা, পৃ. ১৬৯-৭০।
৯. মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, ভাষা ও সাহিত্যের সংস্কার, পূর্বোক্ত, ২৪ বর্ষ, ৪ সংখ্যা, মাঘ ১৩৫৯, পৃ. ২৫৩-৫৯।
১০. পূর্বোক্ত, মাঘ ১৩৫৯, পৃ. ৩৩১।
১১. নূরুল ইসলাম খান, পূর্ব বাংলার সাহিত্য, পূর্বোক্ত, ২৪ বর্ষ, ১১ সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৬০, পৃ. ৮৮৫-৮৬।
১২. পূর্বোক্ত, সাহিত্যে স্বাতন্ত্র্য, পূর্বোক্ত, ৩৮ বর্ষ, ৯ সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৭৪, পৃ. ৪৮৪।
১৩. পূর্বোক্ত, ২৫ বর্ষ, ৭ সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৬১, পৃ. ৫৩৪-৩৭।
১৪. ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, মুসলিম বিজয় ও বাংলা সাহিত্য, পূর্বোক্ত, ৩৮ বর্ষ, ২-৪ যুগ্ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ-মাঘ ১৩৭৩, পৃ. ৬১।
১৫. ডক্টর কাজী দীন মুহাম্মদ, ক্রান্তিকাল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৩।
১৬. ডক্টর আনিসুজ্জামান, মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে মুসলমানদের দান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৭।
১৭. আবদুল গাফফার চৌধুরী, বর্ণমালা সংস্কার না সংহার?, পূর্বোক্ত, ৩৯ বর্ষ, ১২ সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৭৫, পৃ. ৭৬৫-৭৮২।
১৮. আবদুল হামিদ, সাময়িক প্রসঙ্গ—বাংলা ভাষা সংস্কারের অন্তরালে, পূর্বোক্ত, ৩৯ বর্ষ, ১৩-১৪ সংখ্যা কার্তিক অগ্রহায়ণ ১৩৭৫, পৃ. ৯০৫-৭।
১৯. আবুল কাসেম ফজলুল হক, রূপান্তরের মুখে আমাদের সাহিত্য, পূর্বোক্ত, ৬৭ বর্ষ, ১ সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৭৬ (এপ্রিল ১৯৬৯) পৃ. ১-৯।
২০. ডক্টর আনিসুজ্জামান, মওলানা আকরম খাঁ সাহিত্যিক ও সাংবাদিক, পূর্বোক্ত, ৩৯ বর্ষ, ৯ সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৭৫, পৃ. ৫১৬।
২১. আবদুল হক, মুলিম সমাজ কোনপথে?, পূর্বোক্ত, ২৩ বর্ষ, ১১ সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৫৯, পৃ. ৬৪৯-৫২।
২২. মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, আমাদের সাংস্কৃতিক সমস্যা ('চিন্তাধারা'); পূর্বোক্ত, ২৪ বর্ষ, ৯ সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৬০, পৃ. ৭১৭-২০।

২৩. ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ, আমাদের সমাজ সংস্কৃতি ও ধর্ম ; পূর্বেক্ত, ৩৯ বর্ষ, ১৬ সংখ্যা, মাঘ ১৩৭৫, পৃ. ১০০৭-১০।
২৪. রশেখ দাসগুপ্ত, শিল্পে ও সাহিত্যে জনগণের ভূমিকা, পূর্বেক্ত, ৩৯ বর্ষ ১২ সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৭৫, পৃ. ৭৮৩-৮৪।
২৫. সম্পাদকীয় ('আলোচনা') পূর্বেক্ত, ২১ বর্ষ, ৩ সংখ্যা পৌষ ১৩৫৬, পৃ. ২০০।
২৬. এম. এন. রায়ের The Historical role of Islam এর থেকে 'ইসলামের ঐতিহাসিক ভূমিকা' নামে অনুবাদ করেন মুহম্মদ আবদুল হাই, পূর্বেক্ত, ২১ বর্ষ, ১ সংখ্যা, কার্তিক ১৩৫৪, পৃ. ২৭।
২৭. এ.এ. রেজাউল করিম, পাকিস্তানের সংস্কৃতি ও পূর্বপাকিস্তানের সাহিত্য, পূর্বেক্ত, ২১ বর্ষ ৩ সংখ্যা পৌষ ১৩৫৬, পৃ. ১৫১।
২৮. এ. কে. বজলুল হক, জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা, পূর্বেক্ত, ২১ বর্ষ, ৬ সংখ্যা, চৈত্র ১৩৫৬, পৃ. ৩৫৯।
২৯. মোস্তফা দৌলত, সমাজতন্ত্র ও পাকিস্তান, পূর্বেক্ত, ৩৬ বর্ষ, ২ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৭১, পৃ. ৭১।
৩০. এ. এফ. এম. গোলাম কিবরীয়া, ধর্মের প্রয়োজন, পূর্বেক্ত পৃ. ৮২।
৩১. পূর্বেক্ত, পৃ. ৮৪।
৩২. মোহাম্মদ মোস্তফা আলী, সমাজকল্যাণ ও ইসলাম, মোহাম্মদী, ৩৬ বর্ষ, ৩ সংখ্যা, পৌষ ১৩৭১, পৃ. ২৪৭।
৩৩. হাফিজ মোহাম্মদ, বর্তমান পৃথিবীতে এছলামী জীবনদর্শনের ভূমিকা, পূর্বেক্ত, ৩৬ বর্ষ, ৫ সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৭১, পৃ. ৩২৭।
৩৪. পূর্বেক্ত, পৃ. ৩২৮।
৩৫. মোহাম্মদ আকরম খাঁ, এছলামের আদর্শ, পূর্বেক্ত, ৩৮ বর্ষ, ২-৪ যুগ্ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মাঘ সংখ্যা ১৩৭৩, পৃ. ১-২।
৩৬. ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, প্রাচীন ভারতে গোবধ ; পূর্বেক্ত, ৩৮ বর্ষ, ৮ সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৪, পৃ. ৪০৩।
৩৭. মুহম্মদ আলী আজম, বয়স্ক শিক্ষার কার্যক্রম রূপায়ণে, পূর্বেক্ত, ৩৯ বর্ষ, ১৬ সংখ্যা, মাঘ ১৩৭৫, পৃ. ১০২৯।
৩৮. অধ্যাপক মুহম্মদ হজরত আলী, শিক্ষক ও সমাজ, পূর্বেক্ত, পৃ. ১০৬৬।
৩৯. অধ্যক্ষ মুখলেসুর রহমান, আমাদের জাতীয় ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব, পূর্বেক্ত, ৩৯ বর্ষ, ১৭ সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৭৫, পৃ. ১০৭৭।
৪০. ওবায়দ উল হক, আমাদের স্টাণ্ডার্ড বনাম ঈমান, পূর্বেক্ত, পৃ. ১০৯৩।
৪১. মেসবাহ উদ্দীন আহমেদ, দেশের সংকটময় পরিস্থিতিতে আমাদের বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা, পূর্বেক্ত, পৃ. ১১৫৪।
৪২. ড. এ. এম. হাকনুর রশীদ, পরিবর্তন, পূর্বেক্ত, ৬৮ বর্ষ, ২-৩ সংখ্যা, পৃ. ১৩০।
৪৩. মুহাম্মদ রেজাউল করিম (সুয়া), আমাদের শিক্ষা ও ইহার আদর্শিক পুনর্গঠন, পূর্বেক্ত, ৩৯ বর্ষ, ১৮ সংখ্যা, চৈত্র ১৩৭৫, পৃ. ১২০৩।
৪৪. এস. এম. ইদরিস, পুষ্টিহীনতা ও প্রতিকার, পূর্বেক্ত, ৩৬ বর্ষ, ৩ সংখ্যা, ১৩৭১, পৃ. ১০০০।
৪৫. অধ্যাপক এস. এম. আলী হায়দার চৌধুরী, পাকিস্তানের খাদ্যসমস্যা, পূর্বেক্ত, ২১ বর্ষ, ৩ সংখ্যা, পৃ. ১৫৯।
৪৬. আবুল হাশিম, মওলানা সম্পর্কে দুটি কথা, পূর্বেক্ত, ৩৯ বর্ষ, ৯ (বিশেষ) সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৭৫, পৃ. ৫৩৪।

## ২. আল-ইসলাহ (১৯৪৭-৭১)

সংস্কারক ও সেবকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে সওগাত, মোহাম্মদী, শিখা, মোয়াজ্জিন, গুলিস্তা, বুলবুল ও নওরোজের সমকালে সিলেট থেকে মৌলবী মুহাম্মদ নূরুল হক (১৯০৭-৮৭) প্রকাশ করেছিলেন মাসিক আল-ইসলাহ (১৯৩২)। সমাজ সংস্কৃতি ও সাহিত্যক্ষেত্রে পত্রিকার অনুসৃত ধর্মীয় দর্শন, শিল্প ও রাজনৈতিক আদর্শ পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়—উপর্যুক্ত প্রতিষ্ঠান ও পত্রিকাগুলোর সঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গিতে মাত্রা ও গুণগত পার্থক্য থাকলেও স্বসমাজের কল্যাণ-সাধনের মূলগত প্রেরণার দিক থেকে তাঁরা ছিলেন সতীর্থ, সহযোগী।

বিশ, ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে বাঙালি মুসলমানের সমাজে যে ‘জাগরণ’ লক্ষ্য করা যায়—সেই জাগরণের বাণী ও বার্তা আল-ইসলাহর পৃষ্ঠাগুলোতেও কিছুনা কিছু ধ্বনিত ও ঘোষিত হয়েছিল। ‘মুসলিম সাহিত্য সমাজ’ ও ‘শিখা’-র প্রধান পুরুষ মনীষী কাজী আবদুল ওদুদের (১৮৯৪-১৯৭০)লেখা আল-ইসলাহর প্রথম দিককার সংখ্যাগুলোতে প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৩৮ সনে মনীষী আবুল হুসেনের (জন্ম : ১৮৯৭ মৃত্যু ১৯৩৭) অকাল-মৃত্যুতে আল-ইসলাহ গভীর শোক ও শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিল।

পাকিস্তান আন্দোলনের সময়ে আল-ইসলাহ আবার মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মুসলিম লীগ ও মোহাম্মদীর অনুগামী সহযাত্রীরূপে কাজ করেছিল। শিখা সওগাত বুলবুল গুলিস্তা প্রভৃতির সঙ্গে এর সাহিত্যিক আদর্শ ও শিল্প-সংস্কৃতি ভাবনার সঙ্গতি রয়েছে। ‘মুসলিম সাহিত্য সমাজ’ (ঢাকা, ১৯২৬) এবং ‘মোয়াজ্জিন’ ও ‘খাদেমুল এনসান সমিতি’ (১৯২৮, ফরিদপুর ও কলকাতা)র সুনাম সুখ্যাতি ও তৎপরতায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন ইসলাহ-সম্পাদক মুহাম্মদ নূরুল হকও।

সমাজকল্যাণ ও সামাজিক অগ্রগতির ইতিহাসে ঢাকার সমাজ ও শিখার কর্মকর্তা লেখকগোষ্ঠী এবং সৈয়দ আবদুর রব (১৯০৩-১৯৬৯) ও তাঁর এনসান সমিতি ও ‘মোয়াজ্জিন’ এর সঙ্গে মুহাম্মদ নূরুল হক এবং সিলেট কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সমিতির (সমিতিও সংসদ-দুই-ই লেখা হয়েছে) ভূমিকাকে তাই কোনো অবস্থাতেই গৌণ করে দেখা চলবে না।

অবিভক্ত ভারতের বাঙলায়, এবং পার্শ্ববর্তী আসাম, বিহার ও উড়িষ্যাতে খাদেমুল এনসান সমিতি সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান হিসেবে জনসেবার এক সুমহান আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করেছিল এবং তৎকালে অনুরূপ দৃষ্টান্ত আর একটিও ছিল না। সিলেট কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সমিতিও মফস্বল-এর সীমিত গণ্ডিতে, সামান্য আর্থিক যোগ্যতায়, শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যে গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন গড়ে তুলেছিল তারও তুলনা মেলে না। একারণেই হয়তো পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইউব খান ১৯৬৩ সনে ১৭তম স্বাধীনতা দিবসে রাষ্ট্রীয়ভাবে সমিতির সম্পাদক মুহাম্মদ নূরুল হককে ‘তঘমা-ই-খিদমত’ উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেছিলেন।

‘সিলেট কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সমিতি’ (১৯৩৬) গড়ে উঠেছিল ‘আল-ইসলাহ্’ (১৯৩২/১৩৩৯) পত্রিকাকে অবলম্বন করে। ১৯৪৭ সনের পূর্বে যুদ্ধের কারণে কিছুকালের জন্য ইসলামহ কাগজ সংকটের কারণে অনিয়মিত ও বন্ধ ছিল। ১৯৪৭ সনের আগস্ট মাসে এর দশমবর্ষ পঞ্চম সংখ্যা চলছিল। এরপরেও স্বাধীন পাকিস্তানে কাগজ সংকটের কারণে ১৯৪৭ সনের এপ্রিল থেকে ১৯৪৮ সনের এপ্রিল পর্যন্ত এক বছর পত্রিকা বন্ধ ছিল।<sup>১</sup>

এরপরও মধ্যে-মধ্যে অনিয়মিত হয়ে পড়েছে। দুই তিন বা চার-এমনকি, ছয় সংখ্যাও একত্রে প্রকাশিত হয়েছে। যেভাবেই হোক, ১৯৭১ সন (মার্চ) পর্যন্ত পত্রিকার প্রকাশ অব্যাহত ছিল। একান্তর পরবর্তীকালেও পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু সেগুলোর তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো ভূমিকা আছে বলে মনে হয় না। নতুন কালের প্রবণতাকে ধরবার যোগ্যতাই ইসলামহ হারিয়ে ফেলেছিল। অবশ্য পত্রিকার অবক্ষয় শুরু হয়েছিল পঞ্চাশের দশক থেকেই। একালে নতুন-নতুন বিষয় ও নাম পাঠককে অধিক আকৃষ্ট করেছে। ইসলামহর পাতাক্ষতা তখন ছিল। যাহোক, ৪৭ ও ৭১ এর পূর্ববর্তী দুই পর্বে আল-ইসলাহ সামাজিক, সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিকে ক্ষেত্রে যে ভূমিকা পালন করেছিল—ইতিহাসে তা প্রকৃতপক্ষে স্বর্ণাক্ষরেই লিখিত থাকবে।

বিশেষত বাঙলা ও বাঙালির স্বার্থে এই পত্রিকাটি স্ত্রানত আপোষ করতে চায়নি। যদিও মূল দার্শনিক ভিত্তি ছিল এঁদের ‘ইসলাম’; এবং ‘সমাজ’ বলতে বুঝেছিলেন তাঁরা মুসলমান সম্প্রদায়। কিন্তু বিজ্ঞান চিন্তায় এবং সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের মানুষের সমান অধিকার আর অখণ্ড বাঙলা সাহিত্যের ঐতিহ্য সম্পর্কে তাঁরা বিমুখ ও বিরূপ ছিলেন না। মাহেনও মোহাম্মদী তাহজিব দ্যুতি প্রভৃতি পত্রিকায় রবীন্দ্র-সাহিত্য কম চর্চিত হলেও ‘আল-ইসলাহ’ এবং ‘সিলেট কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সমিতি’ রবীন্দ্রচর্চায় ঔদার্যের পরিচয় দিয়েছিল। ১৯৬১ সনে রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী এই সমিতির পক্ষ থেকেও পালিত হয়েছিল এবং আল-ইসলাহ ‘শতবর্ষ পরে’ ইত্যাদি শিরোনামে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে রচিত অনেক লেখা প্রকাশিত করেছিল।

বিভাগ পূর্বকালে, পাকিস্তান আন্দোলনের মোক্ষম সময়েও ইসলামহ রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর সাহিত্য সম্পর্কে রচনা প্রকাশ করেছে। উর্দুর পরিবর্তে বাঙলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে জনমত গঠনে, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যবর্জনের বিপক্ষে, বাঙলা নববর্ষ উদযাপন এবং বাঙলা ভাষার জন্যে একুশে ফেব্রুয়ারির আন্দোলনে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জালনে এবং পরবর্তীকালে রাষ্ট্রীয়কাজের সকল স্তরে বাঙলা ভাষা প্রচলনের দাবীতে গোটা পাকিস্তানী আমলে আল-ইসলাহ অনেক প্রাগ্রসর ও প্রতিবাদী বক্তব্য প্রদান করেছে। সামাজিক ভূমিকার দিক দিয়ে এবং ভাষা ও সাহিত্য সংস্কৃতি চিন্তার স্বরূপ বিচারেও আল-ইসলাহ ঠিক মোহাম্মদী মাহেনও, নওবাহারের সমগোত্রীয় পাকিস্তানি পত্রিকা নয় বটে, তবে পাকিস্তানবাদী পত্রিকার মতোই এঁরা আবার কায়দে আজম, ইকবাল, ইসলাম এবং মুসলমান সমাজ নিয়ে এমন আন্তরিক কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন যে, পাকিস্তান সরকারের, রাষ্ট্রপ্রধানের দেয়া পুরস্কার বা আর্থিক সাহায্য থেকে কোন সময়ই বঞ্চিত হননি। বাংলা একাডেমী বিভিন্ন পত্রিকায় যখন থেকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া শুরু করে, আল-ইসলাহও তখন থেকে আর্থিক অনুদান লাভ

করেছে। জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থার মূল উদ্দেশ্য এঁরা উপলব্ধি করতে চাননি, বরঞ্চ সংস্থার কাজে অনেক ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেছেন।

রচনা নির্বাচনেও খুব পরিচ্ছন্ন শিল্পীসুলভ উচ্চ মানসিকতার পরিচয় দিতে পারেননি। পাকিস্তানবাদী অনেক লেখকের বাঙলা ও বাঙালি-সংস্কৃতি-বিরোধী বহু সাধারণ বা নিম্নমানের রচনাও এতে প্রকাশিত হয়েছে। এক্ষেত্রে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী হয়তো ছিল ‘মুক্তমঞ্চ’ তৈরী করা। কিন্তু এতে সুনির্দিষ্ট একরৈখিক চরিত্র ফুটে ওঠেনি। এবং এটাই হলো এর প্রধান সীমাবদ্ধতা। বিতর্ক বলতে যা বোঝায়, তা না হয়ে এসব রচনা প্রকাশের জন্য এতে প্রকটিত হয়ে উঠেছে স্ববিরোধিতা। বাঙলার পক্ষেও লড়াই করেছেন। আবার সম্পাদকীয় মন্তব্য ছাড়াই উর্দু-আরবীর সপক্ষীয় রচনাও প্রকাশ করা হয়েছে। অবশ্য এমন হতে পারে যে, আঞ্চলিক ভাবে সমিতিতে সকল সদস্যের মত প্রকাশের অধিকার না দিলে পত্রিকা বা সমিতি টিকে থাকতো না। সেজন্যই অনেক ক্রটি বা সীমাবদ্ধতাকে আল-ইসলাহ হজম করে নিয়ে এগুতে চেয়েছিল। সেজন্য দেখা যায় অনেক প্রাচীনপন্থীর অনাধুনিক ভাষায় রচিত প্রবন্ধ, সমালোচনা এতে প্রকাশিত হয়েছে। সাধু ভাষার রচনা প্রকাশও একে আধুনিক সাহিত্য পত্রিকারূপে প্রতিষ্ঠিত হতে দেয়নি। এই রকম নানা সীমাবদ্ধতা এবং অনুচ্চ আদর্শের উদাহরণ দেয়া যাবে কিন্তু সদর্থক দিকও এর অনেক আছে।

আল-ইসলাহ ‘সাহিত্য পত্রিকা’ ছিল। পাঠকদের পক্ষ থেকে ১৯৩৮ সনে (কার্তিক ১৩৪৫) পঞ্চম বর্ষ, প্রথম সংখ্যায় ‘ইসলামিক কায়দা কানুন ইহাতে দূরে সরিয়া পড়িয়াছে’ মর্মে উত্থাপিত এক অভিযোগের জবাবে সম্পাদক বলেন : ‘আল ইসলাহ সাহিত্য পত্রিকা। ইহাতে গল্প উপন্যাস, প্রবন্ধ কবিতাতো থাকিবেই। তবে যতদূর সম্ভব আমরা গর-ইসলামিক মতবাদকে এড়াইয়া চলিতে চেষ্টা করিয়া আসিয়াছি। ভ্রমবশত এমন কোন কিছু যদি থাকিয়াই থাকে, তবে সেটা ক্ষমার্হ সন্দেহ নাই।’<sup>২</sup>

উপর্যুক্ত আদর্শের কারণে একে ইসলামিক সাহিত্য-পত্রিকা আখ্যা দেওয়াই সম্ভব। ৬ষ্ঠ বর্ষ ৯ম-১০ম যুগসংখ্যা থেকে আল-ইসলাহ কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সমিতি (সিলেট)র ‘মাসিক মুখপত্র’ রূপে প্রকাশিত হয়। ফলে তাঁরা ইসলামিক আদর্শের বন্ধনে আরো কঠিনভাবে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু যেটা বিশেষ লক্ষণীয় তাহলো : শিখা ও মুসলিম সাহিত্য সমাজ (ঢাকা) এর আদর্শ অনুসারী ইসলামই এঁদের পাথেয় ছিল। সেজন্য গোঁড়া ইসলামি পত্রিকা একে বলতে হয়ত দ্বিধান্বিত হতে হবে। একটি বিজ্ঞাপনে বলা হয় ‘পূর্ব বাঙলা ও আসামের মুসলমান পরিচালিত সর্বশ্রেষ্ঠ মাসিক..., ইহাতে প্রচলিত শাস্ত্র ব্যাখ্যাকে যুগ-ধর্মী মানব-মনের নবপ্রয়োজনে নবরূপে গ্রহণ, আধুনিক জীবনে ইসলামের নবযুগের বিবিধ সমস্যা ও তার সমাধানের বহুমুখী প্রচেষ্টা, বাঙ্গালী মুসলমানের দুঃসহ জীবনের বেদনার ইতিহাস, অন্ধ সংস্কার গতানুগতিকতা ও গোঁড়ামীর বিরুদ্ধে কূঠারাম্বাত, সত্য ও কল্যাণ জিজ্ঞাসায় নিতীকচিন্তা, ধর্মধ্বজীদের ভণ্ডামীর বিপক্ষে নিঃসঙ্কোচ সমালোচনা পাইবেন। দেখিবেন—ইহার বীর লেখকগণ গতানুগতিকতার মোহকে কিভাবে কাটাইয়া উঠিয়াছেন। বাস্তবিক আল-ইসলাহ মুসলিম বঙ্গ ও আসামের নবজাগরণ ও নব



তপস্যার এক সুস্পষ্ট ইঙ্গিত লইয়া আবির্ভূত হইয়াছে।... অশ্লীল অথবা প্রতারণামূলক কোন বিজ্ঞাপন আল-ইসলাহে গৃহীত হয় না।<sup>৩</sup>

উল্লেখ্য, আল-ইসলাহ শব্দ দুটির অর্থ সংশোধক, সংশোধন বা শুদ্ধিকরণ।

পাকিস্তান জন্মলাভ করতে যাচ্ছে এই সময় অর্থাৎ ১৯৪৭ সনে আল-ইসলাহ নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছিল এবং আসামের মুসলিম প্রধান অংশ পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত হতে চায় কিনা—সেই প্রশ্নে সংঘটিত ‘গণভোটে’ পাকিস্তানের পক্ষে ব্যাপক প্রচার প্রপাগাণ্ডা চালায়।<sup>৪</sup>

প্রচারণায় পত্রিকা মনুষ্যের বসবাসোপযোগী সুখী-সুন্দর পাকিস্তানের স্বপ্ন তুলে ধরেছিল। ফলে পাকিস্তান প্রাপ্তির পর ‘... সাহিত্য সমিতি’ আনন্দ-উৎসবের এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল, এবং পত্রিকার সম্পাদকীয়তে ও অন্যান্য রচনায়ও পাকিস্তানকে স্বাগত জানানো হয়েছিল।

কায়েদে আজমকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি হিসাবে পাইয়া আমাদের আর ভয়ের কিছু রহিল না। আমরা শূন্য হইতেই পরাধীনতার জিঞ্জীর মুক্ত হইয়া স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হইলাম। পাকিস্তান জিন্দাবাদ। কায়েদে আজম জিন্দাবাদ।

পাকিস্তানের আদর্শ-সংক্রান্ত ভাবনা উচ্চকিত হয়েছে যে—কটি উক্তি, তাতে ইসলামের সমাজ-ভাবনার স্বরূপও বোঝা যায় :

আমাদের লক্ষ লক্ষ দেশবাসী দুবেলা গোট পুরিয়া খাইতে পায় না। একেই কি বলে সভ্যতা? এই কি উদ্দেশ্য পাকিস্তানের? এই যদি হয় পাকিস্তান সে পাকিস্তানে আমার প্রয়োজন নাই। আমাদের জমিদার ও পুঁজিওয়ালাদের যদি এতটুকু বুদ্ধি থাকে, আধুনিক যুগের সমান ভালে (আধুনিক মানে সদ্য-স্বাধীন দেশ—এর সমকালকে বোঝানো হয়েছে) চলার তারা অভ্যাস করিবে। যদি তারা তা না পারে আল্লাহ তাদের সহায় হইবেন কিনা জানি না, আমাদের তারা সমর্থন পাইবে না কিছুতেই (১০ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৫৪ পৃ-১২৯)।

সংখ্যালঘু সম্পর্কেও কায়েদে আজমের উক্তি উদ্ধৃত করে পত্রিকায় বলা হয় : সকলেই পাকিস্তানের নাগরিক তবে অপপ্রচারে লিপ্ত সংখ্যালঘুরা নাগরিকের মর্যাদা বা অধিকার আশা করিতে পারে না (পূর্বোক্ত, পৃ-১৩০)। ইসলাম-র রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক ভাবনাও গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

কার আয় কতখানি হবে, কে কতটুকু সম্পত্তি পাবে—এ নিয়ে যত তর্ক বিচারই হোক, মনের যত অনৈক্যই থাক—একথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে ভাত কাপড় এবং বাসস্থানের উপর মানুষের চিরন্তন অকাটা দাবী আছে। মানবের সেই অপরিহার্য দাবী সর্বাগ্রে পূর্ণ করতে হবে। সমাজে একটি মানুষও যতক্ষণ অনাহারে অথবা অর্ধাহারে দিন কাটাবে, একটি শিশুও যতক্ষণ অনাহারে দুধের অভাবে মাতৃকোড়ে কাঁদবে ততক্ষণ মোটার কার, হীরার দুল অথবা পীয়ানো ব্যবহার করার কারও অধিকার থাকতে পারে না (সূত্র : পূর্বোক্ত)।

ইসলাহ হিন্দু-বিদ্বেষ ও সাম্প্রদায়িকতার বিষ-বাষ্প ছড়ায়নি। সমিতিতে এবং পত্রিকাতে হিন্দু-সম্প্রদায়ের লোকেরা (সাহিত্যিক, অথবা সংস্কৃতিসেবী) সমবেত হতেন। এতে বোঝা যায় ইসলামি মানবতাবাদে আস্থা রেখে সকল মানুষেরই তাঁরা সমান ভাবে কল্যাণ কামনা করেছেন। তবে, এবং প্রয়োজনে কঠোরভাবে মুসলিম-বিদ্বেষকে প্রতিরোধও করা হয়েছে। মুসলমান সম্পর্কে আপত্তিকর বক্তব্য যেখানে দেখেছেন, সেখানেই তাঁরা

তথ্যকে তুলে ধরে নিন্দাবাক্য উচ্চারণ করেছেন। পাকিস্তানের অমঙ্গল কামনাকারীদেরও নিন্দা-জ্ঞাপন করা হয়েছে বা তাঁদের রাষ্ট্র ও সমাজবিরোধী স্বরূপ উন্মোচন করে দেয়া হয়েছে। ভারতের সরকারের এবং রাজনৈতিক দল কংগ্রেসের পাকিস্তান বিরোধী মনোভাবকেও নিন্দা করা হয়েছে।

মুহম্মদ শামসুল হক কবি কাজী নজরুলের অনুকরণে ‘মজলুম’ শীর্ষক কবিতায় শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি আনুগত্য এবং পুঁজিপতি-বুর্জোয়াদের ঝিক্কার জানিয়েছেন : “বাবুসাব কারে বল ? কোন সে/ ঐশী শক্তির বলে বাবু সাব ওরা হল ?” (সূত্র : ১০মে বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, কার্তিক ১৩৫৪ পৃ-২২১)।

‘স্বাধীন বাতাস’ বা স্বাধীনতা প্রাপ্তি পত্রিকার লেখকদেরকে প্রতিবাদী, সংগ্রামী, আত্মসচেতন, আত্মগর্ভী, দেশপ্রেমিক এবং স্বশ্রেণীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তুলেছে। নতুন দেশের সংস্কৃতি ও সমাজ ভাবনায় তাই ঘুরে ফিরে এসেছে ‘স্বাধীন পাকিস্তান’ এর নানা প্রসঙ্গ—দেশ, জাতি, মানুষ, সমাজ, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ভাষা এবং ধর্মীয় আদর্শ। গল্প, কবিতা, বিভিন্ন ধরনের রচনায় নতুন দেশের আবহাওয়া, স্বাধীনতা সংগ্রামের জের, মোহাজির ও উদ্বাস্ত সমস্যা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশত্যাগ প্রভৃতির ফলে জনগণ তথা নর নারীর জীবনের জৈবিক নৈতিক, জীবন-জীবিকা এবং মানসিক সংঘাত সংঘর্ষ, বিচ্ছিন্নতা,— প্রেমে, বিরহে, লোভে, দুর্নীতিতে কিভাবে মানুষের চরিত্র পরিবর্তিত হয়েছে আল-ইসলাহর পৃষ্ঠাগুলোতে তারও কিছু পরিচয় পাওয়া যায়।

আল-ইসলাহের নিয়মিত লেখক ছিলেন সমিতির সদস্য এবং সিলেটের সকল নতুন পুরাতন, খ্যাত, অখ্যাত, হবু খ্যাত, উন্নত, মধ্যম, নিম্ন ও অতিসাধারণ শ্রেণীর লিখিয়েরা। তবু অনেক ভালো ভালো রচনাও এতে স্থান পেয়েছে। অনেক লেখক দেশ ও কালের ইতিহাসের উজ্জ্বল স্থান দখল করেছেন। চিন্তাবিদ কাজী আবদুল ওদুদ, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, মনীষী আবু সয়ীদ আইউব, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, কবি জসীমউদ্দীন, সানাউল হক, ড. মুহম্মদ এনামুল হক, ড. এম. আবদুল কাদের, এম. আখলাকুর রহমান, মীজানুর রহমান, মোহাম্মদ ওয়াজেদী আলী, সৈয়দ মুজতবা আলী, সৈয়দ মুর্তাজা আলী, মাহবুব উল আলম, মুহম্মদ মুসলিম চৌধুরী, দেওয়ান একলিমুর রেজা চৌধুরী, মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, দেওয়ান মুহম্মদ আজরফ, অধ্যাপক শাহেদ আলী, মীর্জা আবদুল হাই, এ. জেড. এম. শামসুল আলম, দিলওয়াল, অ. কা. শ. নূর মোহাম্মদ, শ্রী মনোমোহন বর্মণ, সৈয়দ মোস্তফা আলী, মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন সাহিত্যরত্ন, মোহাম্মদ গোলাম আকবর চৌধুরী, মতিনউদ্দীন আহমদ, খান মোহাম্মদ আবদুল হাকীম, মুফাখ্খারুল ইসলাম, রওশন ইজদানী, আলাউদ্দীন আল আজাদ, আবুল ফজল (বানী) মোহাম্মদ আহবাব চৌধুরী, ফররুখ আহমদ, ডাঃ মোঃ হাবিবুর রহমান, আবু ফাতেমা মোহাম্মদ ইসহাক, আখতার উল আলম, মুহম্মদ নূরুল হক, দেওয়ান আবদুল হামিদ প্রমুখ লেখকতো লিখেছেনই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের নতুন এবং পুরাতন সাধারণ গোছের লেখকেরা আর সিলেট অঞ্চলের প্রায় সব হাতে-খড়ি দেয়া নব্য সাহিত্যিকবন্দ আল-ইসলাহে প্রচুর লিখেছেন।

হজরত শাহজালাল, কবি নজরুল এবং মুসলমান সম্প্রদায় ও সিলেটের আঞ্চলিক ইতিহাসকে গুরুত্ব দিয়ে ইসলামের বিশেষ বিশেষ সংখ্যাও প্রকাশিত হয়েছে। অধিকাংশই অতি-সাধারণ কিন্তু অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে রচিত এসব রচনা আঞ্চলিকভাবে হলেও সমাজগঠনে কম গুরুত্ব রাখেনি। সিলেট ও আশেপাশের শিক্ষিত লোকদেরকে একটি মানবতাবাদী সমাজ ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষশূন্য বাঙালি-সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহশীল করে তোলার ক্ষেত্রে অবদান রেখেছিল।

রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে আল-ইসলাহ ‘বাঙলার’ পক্ষে সবসময় বক্তব্য প্রচার করেছে। সমিতির সাহিত্য-সভায় উর্দু ও বাঙলার বিতর্ক-রও আয়োজন করা হয়েছিল। এতে প্রখ্যাত সাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবা আলীও বক্তব্য রেখেছেন। একজন গবেষক লিখেছেন ; “ভাষা আন্দোলনের ঢেউ ক্রমে ক্রমে পূর্ব বাঙলার মফস্বল শহর, এমনকি গ্রামে-গঞ্জেও ছড়িয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে সিলেটের ভূমিকা অগণ্য। দেশ-বিভাগের দু’তিন মাসের মধ্যেই মাতৃভাষার আলোচনা সেখানে প্রাধান্য লাভ করে। প্রতিক্রিয়াশীলদের ঘাঁটিও ছিল বেশ শক্ত। তাঁরা ইতিমধ্যে শহরে উর্দু আঞ্জুমান স্কুল প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করছে। এমনি পরিবেশে ১৯৪৭ সনের ৯ই নভেম্বর ‘সিলেটে কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদ’-এর উদ্যোগে রাষ্ট্রভাষা সংক্রান্ত একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় মুহম্মদ মুসলিম চৌধুরী ‘পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা’ শীর্ষক একটি সারগর্ভ প্রবন্ধ পাঠ করেন।”

তিনি রাষ্ট্রভাষার ক্ষেত্রে তমদ্দুন মজলিসের প্রস্তাবের যথার্থ প্রমাণ করে বলেন, তিনি ‘পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা’ বিতর্কে শরিক হওয়ার গৌরব হতে নিজেকে বঞ্চিত করতে চান না বলেই এ বিষয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন। তিনি বলেন জনসংখ্যার অনুপাতে গরিষ্ঠ সংখ্যক জনগণের ভাষা বলে বাঙলাকে রাষ্ট্রভাষা করার যুক্তি ধোপে টেকে না, কিন্তু ভাষার সাহিত্যিক সম্পদে উৎকর্ষের বিচারে বাঙলা রাষ্ট্রভাষা হবার দাবি রাখে। কারণ

বাঙলা ভাষার পক্ষে সবচেয়ে প্রবল যুক্তি হইতেছে এই যে সমৃদ্ধির দিক বিবেচনা করিলে অন্য কোন ভাষাই বাঙলা ভাষার প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ার কাবিল নহে। অতএব কি লোক সংখ্যার দিক, কি ভাষার দিক যে দিক দিয়াই দেখি না কেন বাঙলা ভাষাই যে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হওয়ার পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত ভাষা তাহাতে সন্দেহের অবকাশ থাকে না।...উর্দু ভাষা পাকিস্তানের কোন প্রদেশের মাতৃভাষা নহে...তবে অনধিকার চর্চাকারীদের গায়ের জোর প্রবল থাকে, উর্দুভাষারও সে জোরটা রয়েছে।

একমাত্র রাষ্ট্রভাষা ‘বাঙলা’ হলে পশ্চিম পাকিস্তানের বিকাশ বাধাগ্রস্ত হবে বলে তমদ্দুন মজলিশের প্রস্তাব সমর্থন করে তিনি আরো স্পষ্ট করে বলেন বাঙলা এবং উর্দু অথবা পশ্চিম পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা যা হয়—তাকে রাষ্ট্রভাষা করা উচিত :

বাংলা ভাষা হইবে পূর্ব পাকিস্তানের স্কুল কলেজের প্রথম ভাষা এবং পশ্চিম পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা (খুব সম্ভব উর্দু) হইবে দ্বিতীয় ভাষা এবং ইংরেজি, আরবি এবং সংস্কৃত এই তিনটি ভাষার যে কোনও একটিকে ছাত্রেরা তাহাদের তৃতীয় ভাষারূপে গ্রহণ করিতে পারিবে। তমদ্দুন মজলিশের প্রস্তাবে কেবল ইংরেজিকে তৃতীয় ভাষা রূপে গ্রহণ করিবার কথা বলা হইয়াছে। আমরা তিনটি ভাষার একটিকে গ্রহণ করিতে এই কারণে বলিতেছি যে, আন্তর্জাতিক ভাষা হিসাবে ইংরেজি শিখার যেরূপ আবশ্যিকতা আছে তেমনি আমাদের ধর্মীয় ভাষার অনুশীলন করারও প্রয়োজন রহিয়াছে। যাহারা পাকিস্তানের কর্মচারী হিসাবে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে

চাকুরি করিবেন অথবা উচ্চতম বিজ্ঞান-শিক্ষায় যাহারা আত্মনিয়োগ করিবেন তাঁহারা যেমন ইংরেজি ভাষা শিখিবেন, তেমনি যাহারা ইসলাম ও হিন্দু-ধর্মে বিশেষ জ্ঞানলাভ করিতে চাহিবেন তাঁহারা আরবী ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিবার সুযোগ পাইবেন।

প্রসঙ্গত শিক্ষানীতি সম্পর্কেও তিনি মতামত প্রদান করেন : 'বাধ্যতামূলক শিক্ষাকাল অর্থাৎ ১৩/১৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত অন্যান্য আবশ্যিকীয় বিষয়ের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রছাত্রীরা কেবল বাংলা ভাষাই শিখিবে। মুসলমান বালক-বালিকাদের কোরান পড়ার ব্যবস্থা এই সব স্কুলে থাকিবে এবং ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে আবশ্যিকীয় বিষয় মাতৃভাষার পাঠ্যপুস্তক হইতে শিখিবে। যাহারা উচ্চতর শিক্ষালাভ করিতে চাহিবে অথবা উচ্চতর শিক্ষা লাভের উপযুক্ত বিবেচিত হইবে, তাহাদিগকে বাংলা, পশ্চিম পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা এবং ইংরেজি আরবি ও সংস্কৃত এই তিনটি ভাষার একটি অবশ্যই পড়িতে হইবে। এইভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের স্কুল কলেজের প্রথম ভাষা হইবে পশ্চিম পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা (সম্ভবত উর্দু), দ্বিতীয় ভাষা হইবে বাংলা এবং তৃতীয় ভাষা ইংরেজি, আরবি, সংস্কৃত এবং গুরুমুখি এই চারটি ভাষার যে কোন একটি।'

কেন্দ্রীয় সরকারের রাষ্ট্রভাষা একাধিক হলে কাজের কোন অসুবিধা ঘটবে কিনা সেই প্রশ্নের জবাবে লেখক বলেন : 'ইউএনওর মতো পৃথিবীর সব সভ্যজাতির সমবায়ে গঠিত একটা বিরাট প্রতিষ্ঠানের কাজ যখন কোন নির্দিষ্ট রাষ্ট্রভাষা ছাড়াই চলিতেছে, রাশিয়াতে যখন একাধিক রাষ্ট্রভাষা থাকতেও কাজের কোন অসুবিধা ঘটিতেছে বলিয়া শোনা যায় নাই, তখন আমাদের পাকিস্তানেও দুইটি রাষ্ট্রভাষা দ্বারা রাষ্ট্রের কাজ সম্পন্ন করিতে কোন অসুবিধা হইবে না। এখানে আরও একটি বিষয় ভাবিয়া দেখা দরকার। তাহলো পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষাকে পশ্চিম পাকিস্তানের এবং পশ্চিম পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষাকে পূর্ব-পাকিস্তানের উচ্চ শিক্ষার্থীদের জন্য বাধ্যতামূলক করা একান্ত আবশ্যিক কি না। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের মারফত পূর্ব ও পশ্চিম-পাকিস্তানের মধ্যে যোগসূত্র রক্ষা করা হইবে। এমতাবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে যাহারা চাকুরী করিবেন কেবল তাঁহাদেরই দুইটি রাষ্ট্রভাষা শিক্ষা করিলে চলিতে পারে। তাহা হইলে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের খুব অল্প সংখ্যক লোকের পক্ষে উভয় রাষ্ট্রভাষা শিখিবার দরকার হইবে। বাঙ্গাল মুন্সুফের ভাষা শিখিবার প্রয়োজনীয়তা হইতে রেহাই পাইয়া অনেক পশ্চিম পাকিস্তানি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিবেন এবং আমরা উচ্চ-শিক্ষার্থী মুসলমান ছাত্রদের জন্য আরবি এবং হিন্দু ছাত্রদের জন্য সংস্কৃত ভাষা দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে বাধ্যতামূলক করিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিব। তখন দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে ইংরেজি ও পশ্চিম পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার যে কোনও একটিকে গ্রহণ করিলেই চলিবে। সাধারণত পূর্ব পাকিস্তানের লোক পূর্ব পাকিস্তানে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের লোক পশ্চিম পাকিস্তানের সরকারি চাকুরিতে নিযুক্ত হইবেন। যদি পূর্ব পাকিস্তানের কাহাকেও পশ্চিম পাকিস্তানের সরকারী চাকুরীতে নিযুক্ত করা হয় তখন তাঁহাকে পশ্চিম পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার একটা নির্ধারিত পরীক্ষায় প্রদত্ত সময়ের মধ্যে উত্তীর্ণ হইতে হইবে। পশ্চিম পাকিস্তানের কেহ পূর্ব পাকিস্তানের সরকারি চাকুরি গ্রহণ করিলে তাঁহাকে অনুরূপ পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার পরীক্ষা পাশ করিতে হইবে।'

উপসংহারে লেখক বলেন : ‘পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হইবে বাংলা। মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষা আমাদের শিক্ষার বাহন হইতে পারে না। যতদিন না পর্যন্ত বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান দর্শন ও ধর্ম প্রভৃতি বিষয়ক গ্রন্থাদি যথেষ্ট পরিমাণে অনূদিত ও রচিত না হইয়াছে ততদিন পর্যন্ত বাংলা ও ইংরেজি এই দুই ভাষায়ই পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রের কাজ চলিবে।... ইংরেজি ভাষা শিক্ষার বাহন হিসাবে গ্রহণ করার ফলে... মাতৃভাষার উন্নতি করার সুযোগ (হারা ইয়াছিল আবার আজ অন্য ভাষাকে শিক্ষার বাহন হিসাবে গ্রহণ করিলে) পূর্ববর্তী অবস্থায় ফিরিয়া যাইবে।... আমাদের উদ্ভাবনা শক্তি বিনষ্ট হইবে।... আমাদের মাতৃভাষা বাংলার প্রধান্য কমাইয়া যে ভাষা আমাদের স্বকীয়তা ও স্বাধীনতা বিনষ্ট করিতে চাহিবে, রক্তমাংসের মানুষকে কলের মানুষে পরিণত করিতে চেষ্টা করিবে, আমরা তাহার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিব। প্রতিপক্ষ যতই প্রবল হউক তাহাতে আমরা দমিব না ; কারণ এখানে রহিয়াছে আমাদের জীবন মরণ সমস্যা। কেবল একটি ভাষা না জানার জন্য শিক্ষায় ও জ্ঞানে কাহারও চেয়ে পশ্চৎপদ না হওয়া সত্ত্বেও আমাদের বর্তমান শিক্ষিত সমাজ রাতারাতি অশিক্ষিত বনিয়া যাইবে, রাষ্ট্রের কাজের অযোগ্য বিবেচিত হইবে, আর একটি ভাষা জানার সুযোগ গ্রহণ করিয়া অন্যেরা আমাদের ওপর কর্তৃত্ব করিবে, আমাদের কৃপার পাত্র মনে করিবে ইহার চেয়ে লজ্জাকর ও অপমানজনক আর কি হইতে পারে ?

‘সর্বশেষে পূর্ব পাকিস্তানের আলেম সমাজের কাছে আমাদের বিনীত আরজ তাঁহারা যেন উর্দুর পক্ষাবলম্বন করিয়া নিজের পায়ে নিজে কুঠার না মারেন। তাঁহারা কিছুটা উর্দু জানেন, তাই উর্দু রাষ্ট্রভাষা হইলে তাঁহাদের ইজ্জত ও প্রতিপত্তি বাড়িবে—এমন যদি তাঁহারা ভাবিয়া থাকেন, তবে আমাদের বিশ্বাস তাঁহারা গোড়াতেই ভুল করিয়া ফেলিয়াছেন। পশ্চিমা আলেমরা আমাদের দেশের আলেমগণকে সাধারণত অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন, এবং জ্ঞানে যথেষ্ট নিম্ন হইলেও নিজেদের বাঙ্গাল মুসল্লীকে আলেমদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করেন, তাঁহাদের অনেকেরই উর্দু ভাষাটা হয় মাতৃভাষা না হয় লেখ্য ভাষা।... এই কারণে আমাদের দেশের আলেমরাও তাহাদিগকে যথেষ্ট সমীহ করিয়া চলেন। বর্তমান সময়ই যখন অবস্থা এইরূপ তখন উর্দুর যখন প্রধান্য স্বীকৃত হইবে, তখন পশ্চিমা মুসল্লী বাঙ্গলাদেশে আসিয়া বাঙলার বড় বড় আলেমগণকে স্থানচ্যুত করিয়া ফেলিবে এবং বাঙ্গাল-মুসল্লীকে আলেমদের তলফ-ফুজ (উচ্চারণ) একদম খারাপ ইত্যাদি বলিয়া আমাদের দেশের আলেমগণকে লোকচক্ষে হয়ে প্রতিপন্ন করিবে। সুতরাং পূর্বাঙ্কেই সতর্ক হওয়া আবশ্যিক।’

পরিশেষে তিনি আলেম সমাজের নিকট প্রশ্ন উত্থাপন করে বলেন, হিন্দু-পণ্ডিত ও সাহিত্যিকেরা যেমন সংস্কৃত সাহিত্যের সার বাংলায় সুলভ করে তুলেছেন, তদ্রূপ ইসলাম ধর্ম ও ইসলামি-সাহিত্যের সার বাঙালি মুসলমানের নিকট সহজলভ্য করে ‘জাতির মানসিক বিকার দূর করিবার বিরাট দায়িত্ব (কি তাঁহারা) গ্রহণ করিবেন না?’<sup>৬</sup>

নূরুর রহমান খান একটি প্রবন্ধে লিখেছেন ভাষা-আন্দোলনে সিলেট কেন্দ্রীয় সাহিত্য সংসদ-এর-সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অবদান ৩০ নভেম্বর, ১৯৪৭ সনে পূর্ব পাকিস্তানের ‘রাষ্ট্র ভাষা বাংলা না উর্দু হওয়া উচিত’-শীর্ষক আলোচনার উদ্দেশ্যে সুধীসমাবেশ। এই সমাবেশে ড.

সৈয়দ মুজতবা আলীকে আলোচনায় অংশ গ্রহণের জন্য বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানানো হয়। এক শ্রেণীর লোকের অপ-প্রচারণার ফলে নির্দিষ্ট দিনে অসংখ্য অবাক্ষিত লোকের উপস্থিতিতে সৈয়দ মুজতবা আলী তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন শুরু করলে তাদের চাঞ্চল্য উচ্ছ্বলতা চরমে পৌঁছায়। এবং নানা রকম কটুক্তিতে বক্তৃতায় বাধা সৃষ্টি করতে থাকে।

এক পর্যায়ে ক্রুদ্ধ আলী সাহেবও বলতে বাধ্য হন, ‘আপনারা জেনে রাখুন আমার বাড়ীও সিলেট, আমিও সিলেটা পুয়া, দরকার হলে মাথা ফাটাফাটি করতে আমিও জানি, সুতরাং বেশী চেষ্টামেচি না করে প্রথমে আপনারা আমার কথা শুনুন, পরে যদি আপনাদের কোন বক্তব্য থাকে সভায় পেশ করুন। অথথা হৈ ছল্লোড় করে অনুষ্ঠানকে পণ্ড করার চেষ্টা করবেন না।’

হট্টগোলের মধ্যে শেষ পর্যন্ত বক্তৃতা অসমাপ্ত রেখে আলী সাহেব সভাস্থল পরিত্যাগ করেন। তিনি সংসদের সেক্রেটারী নূরুল হক সাহেবকে আশ্বস্ত করেন যে, তাঁর সম্পূর্ণ বক্তব্য লিখে পাঠাবেন এবং তা সংসদের মুখপত্রে প্রকাশিত হলে তাঁদের উদ্দিষ্ট সার্থক হবে। মুজতবার এই মূল্যবান ভাষণটি ‘চতুরঙ্গ’ পত্রিকায় ও ‘পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা’ শিরোনামে প্রকাশিত হয়। পরে এটি আল-ইসলাহর ১৩৫৬ সনের কার্তিক-চৈত্র, ১১শ বর্ষ, ৭ম-১২শ সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত হয়। তবে পাদটীকায় বলা হয় : ‘কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য-সংসদের (সিলহট) ১১শ বর্ষের ৩য় সাহিত্য সভায় প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ।’

অতপর প্রবন্ধটি চট্টগ্রাম ও কলকাতা থেকে যথাক্রমে ১৯৫৬ ও ১৯৭০ সনে পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হয়। (প্রঃ নূরুর রহমান খান, বাঙালী মুসলমানের মাতৃভাষা চেতনা, নিবন্ধমালা, ৩য় খণ্ড, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৮৭, পৃ. ১২২)।

‘পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা’ শীর্ষক প্রবন্ধে সৈয়দ মুজতবা আলী প্রথমেই বলেন, ‘পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা যে শেষ পর্যন্ত বাঙলা ভাষাই হবে সে সম্পর্কে আমাদের মনে কখনো কোন সন্দেহ ছিল না। এবং একথাও নিঃসন্দেহে জানি যে যদিও এখনকার মত বাঙলার দাবী মেনে নেওয়া হয়েছে তবু উদুওয়ালারা আবার সুযোগ পেলেই মাথা খাড়া করে উঠতে পারেন। আমরা যে এতদিন এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করিনি তার প্রধান কারণ বাঙলা-উর্দু দ্বন্দ্ব রাজনৈতিক রঙ ধরে নিয়ে দলাদলির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল ; সে অবস্থায় সুস্থ মনে, শাস্ত চিন্তে বিচার করবার প্রবৃত্তি কোনো পক্ষেরই ছিল না। আবহাওয়া এখন ফের অনেকটা শান্ত হয়ে এসেছে, এই বেলা উভয় পক্ষের যুক্তিগুলো ভালো করে তলিয়ে দেখে নিলে ভবিষ্যতের অনেক তিক্ততা অর্থহীন দ্বন্দ্ব থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে।’

আলোচনার পরিশেষে তিনি মন্তব্য করেন : ‘তাই আমাদের সবিনয় নিবেদন, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান যেন কোনো মহত্তর আদর্শের অনুপ্রেরণায় ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হয়। পূর্বেই নিবেদন করেছি, গুণীরা সে আদর্শের সন্ধান করবেন। আমার জ্ঞান অভিজ্ঞতা অত্যল্প, কিন্তু নানা দেশের গুণীদের মুখে শুনছি, নানা সৎ-গ্রন্থে পড়েছি, দীন ইসলাম বলেন, সে আদর্শ হবে রাষ্ট্রের দীন-দুঃখীর সেবা করা। উভয় পাকিস্তান যদি এই আদর্শ সামনে ধরে যে তাদের

রাষ্ট্র-ভিত্তি নির্মিত হবে চাষী-মজুরকে অন্ন দিয়ে, দুগ্ধকে সেবা করে, অঙ্ককে জ্ঞান দান করে, এক কথায় 'সাইল'কে (অভাবে আতুরকে) 'গনী' (অভাবমুক্ত) করে, তাহলে আর ভয় নেই, ভাবনা নেই। উভয় প্রান্তে গণরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে তারা যে ঐক্যসূত্রে সম্মিলিত হবে সে সূত্র ছিন্ন হওয়ার ভয় নেই। সেই মহান আদর্শের দিকে উদ্দীপ্ত করতে পারে সতেজ সবল সাহিত্য। সে জাতীয় সাহিত্য মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য কোনো ভাষাতে কেউ কখনো নির্মাণ করতে পারেনি। জনগণের মাতৃভাষা উপেক্ষা করে গণরাষ্ট্র কখনই নির্মিত হতে পারে না।

সৈয়দ মুজতবা আলীর উপসংহারের বক্তব্য : 'যুদ্ধ কাম্য বস্তু নয়। অন্যের বিনাশ বাসনা সর্বথা বজ্রনীয়। পাকিস্তান বিনষ্ট হলে ভারতীয় ইউনিয়নের লাভ নেই, ভারতীয় ইউনিয়ন বিনষ্ট হলে পাকিস্তানের লাভ নেই। উভয় রাষ্ট্র সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে বিস্তবান হোক, এই আমাদের প্রধান কাম্য। ইউরোপের তাণ্ডব-লীলা থেকে আমরা কি কোনো শিক্ষা গ্রহণ করব না? শিক্ষাগ্রহণ করি আর নাই করি, কিন্তু আক্রান্ত হওয়ার ভয় অহরহ বৃকে পুষে সেই দৃষ্টি-বিন্দু থেকে সর্ব-সমস্যার সমাধান অনুসন্ধান করা মারাত্মক ভুল। বাড়ীতে আগুন লাগার ভয়ে অষ্টপ্রহর চালে জল ঢালা বুদ্ধিমানের কর্ম নয়। আজ যদি আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কায় মাতৃভাষা বর্জন করি তবে কাল প্রাণ যাওয়ার ভয়ে মাতৃভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য হব।' (আল্ ইসলাহ, ১১শ বর্ষ, ৭ম-১২শ সংখ্যা, কার্তিক-চৈত্র ১৩৫৬ সন, পৃ.-২৪৯-২৭৯)।

আল-ইসলাহের উপর্যুক্ত সংখ্যায় মনীষী আবু সয়ীদ আইউব-এর দুটি রচনা প্রকাশিত হয়। তাঁর 'সাধু ও সজ্জন' শীর্ষক প্রবন্ধটি (পথের শেষ কোথায়, কলকাতা, ১৩৯০, ৩য় সং, গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে) প্রথম প্রকাশিত হয় আল-ইসলাহে। আবু সয়ীদ আইউব ১৯৫০ সনের ৮ জানুয়ারি, রবিবার পূর্ববঙ্গের ব্রাহ্মণবাড়িয়া অঞ্চলে 'আঞ্জুমানে এসলাহুল মুসলিমীন' এর প্রথম কনফারেন্সের সভাপতির অভিভাষণ হিসেবে এটি পাঠ করেন। তাঁর অপর প্রবন্ধ 'সাম্য ও স্বাধীনতা' চতুরঙ্গ থেকে ইসলাহে সংকলিত হয়। মানবতাবাদের মাহাত্ম্যকীর্তন এবং উন্নত নৈতিক ও চারিত্রিক গুণাবলীর বিশ্লেষণ আর মুক্তবুদ্ধির ভিত্তিতে কাল-মাত্রের দর্শনের ও চিন্তাধারার ব্যাপক গভীর পর্যালোচনা এবং রাশিয়ার সমাজতন্ত্রের ডগমেটিজমের ধারণার কঠোর, যুক্তিভিত্তিক আলোচনা আল-ইসলাহের মনপূত হয়েছিল বুঝা যায়। উচ্চতর মানবিক আদর্শ ও মুক্ত-বুদ্ধির চর্চার প্রতি পাঠকদের আকৃষ্ট করার প্রচেষ্টা শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে।

পাকিস্তানের সাহিত্যের গতিধারা বিশ্লেষণেও আল্ ইসলাহের লেখকেরা উন্নতমনের ও রুচিন্সিদ্ধ চিন্তাধারার পরিচয় দিয়েছিলেন। 'আমাদের সাহিত্যের গতি' শীর্ষক প্রবন্ধে মুহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী বলেন, আমাদের সাহিত্যে এখনও এমন কোন ধারার সৃষ্টি হয়নি যা জাতির জীবনকে পুষ্ট ও সমৃদ্ধ করতে পারে। 'যে পরিবর্তন ভীক পশ্চাৎমুখী সমাজ সৃষ্টির নূতন নূতন উপাদান যোগাইতে পারেনা, সেই সমাজ মানসের প্রভাব ব্যক্তি মানসকে বেশীদূর আগাইয়া লইয়া যাইতে পারে না। কিন্তু ইহাতেও আবার সন্দেহ নাই যে আমাদের জীবন কেবল একটানা দুঃখেরই নহে যে, আমাদের সাহিত্যিকদের মনে জাগাইয়া তুলিবে শুধু হতাশা আর

বিষ্কোভ।... পরিচয়ের গভীরতা ও সম্পর্কের নিবিড়তা না থাকায় আমাদের সাহিত্যিকরা জীবনের বহুমুখী প্রকাশকে তাহাদের সাহিত্যে রূপায়িত করিতে পারেন নাই।’

লেখক জনগণের সকল স্তরের জীবনের মহত্তম দিককে সাহিত্যের মাধ্যমে প্রতিফলিত করে পাঠকগণকে উজ্জীবিত করার প্রস্তাব দিয়ে বলেন, ‘সাহিত্য কোন মতবাদের দাসত্ব করে না।’ শ্রেণী সংগ্রামের যুগে লেখকদের স্ব শ্রেণীর মনের প্রতিনিধিত্ব করার গুরুত্ব বর্ণনা করে তিনি আরো বলেন, ‘সমাজ বা শ্রেণীর মনের ভিতর দিয়াই বিশ্বমানবমন প্রকাশ পায় এবং যে সাহিত্যে এই বিশ্বমানবমন রূপায়িত হয়—সে সাহিত্য হয় বিশ্ব সাহিত্য বা সর্বজনীন সাহিত্য।’

বিজ্ঞানের সঙ্গে ইসলামের সম্বন্ধ সম্পর্কেও লেখক মুক্ত-মনের পরিচয় দিয়েছেন। ‘বিজ্ঞানের সঙ্গে ইসলামের কোন বিরোধ থাকিতে পারে না।... যুগোপযোগী ব্যাখ্যা না হওয়ার ফলে ইসলাম গোটা কয়েক ধর্মীয় অনুশাসনের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া গিয়াছে এবং একটা বিশেষ সেন্টিমেন্ট জাগাইয়া তোলার কাজে ব্যবহৃত হইতেছে, মানুষের জীবনকে সুষ্ঠু ও সুন্দর করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারিতেছে না।’

তিনি বলেন : ‘আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান সম্বন্ধে নিতান্ত অজ্ঞ থাকা সত্ত্বেও যখন কোরান সম্পর্কে কথা বলার অধিকার অর্জন করা যায় বরং এই অজ্ঞতাকে শ্লাঘার বিষয় মনে করিতেও যখন বাধে না তখন মানবজীবনের যাবতীয় সমস্যার সমাধান কোরান, হাদিস হইতে পাওয়ার আশা সুদূর পরাহত।’ সমাজগঠনে সাহিত্যের ভূমিকা এবং বাঙলা ভাষার ‘স্বাভাবিক গতি’র বিশ্লেষণ শেষে উপসংহারে লেখক বলেন :

‘সাহিত্যিকরা যদিও জ্ঞাতির সমস্যা ও যুগের দাবী অস্বীকার করিতে পারেন না তবুও তাঁহারা আমাদের ফরমাইশ মারফিক সাহিত্য সৃষ্টি করিবেন এরূপ আশা করা অন্যায্য। সাহিত্য বা আর্ট সর্বজনীন। ইহা বিশেষ জাতি বা সমাজের হইয়াও সকল মানুষের ও সর্বকালের।’

উন্নতমানের সাহিত্য সৃষ্টির আবশ্যিকতায় আশাবাদী লেখক বলেন,... ‘এরূপ সর্বজনীন সাহিত্য সৃষ্টি সকলের পক্ষে সম্ভবপর হয়না জানি, কিন্তু তাই বলিয়া সকলেই কেবল সাময়িক বিষয় নিয়া ব্যস্ত থাকিবেন এমন হইতে পারে না।’ পাকিস্তানের উদ্দেশ্য মারফিক ‘ইসলামী’ বা ‘পাকিস্তানি সাহিত্য’ সৃষ্টির ব্যাপারে স্পষ্টতই লেখক বলেন, যেখানে স্বাধীনচিন্তা ও সর্বজনীন সাহিত্য সৃষ্টির পথে নানারকম ‘ফতোয়া’ ঘোরে—

সেখানে প্রকৃত আর্ট ব্যবহৃত না হইয়া পারে না।...আজাদী লাভের সঙ্গে প্রতিক্রিয়া যেন নূতন চেতনা লাভ করিয়াছে।...তবে সুখের বিষয় যুগে যুগে প্রতিক্রিয়া পরাজিত হইয়াছে। এই পরাজয়ের কাহিনী লেখা আছে ওমর খৈয়াম ও হাফেজের রুবাইয়াতে, আছে মোগল স্থাপত্য ও সঙ্গীতে—তাজমহলে, তানসেনে।

(সংসদের ত্রয়োদশ বৎসরের দ্বিতীয় সাহিত্য সভায় ২৩-১০-১৯৪৯ তারিখে পঠিত প্রবন্ধের শেষাংশ, দ্র. আল-ইসলাহ, কার্তিক-চৈত্র ১৩৫৬ সংখ্যা, পৃ-২৯৭)।

মাহবুব উল আলম ‘আব্বাসউদ্দীন’ শীর্ষক কথোপকথনের মধ্য দিয়ে কোরানের তথা ইসলামের সঙ্গে সঙ্গীত ও শিল্প সাহিত্যের সম্পর্ক নির্ণয় করে পাকিস্তানের আদর্শের সঙ্গে গান-বাজনা নৃত্য-চিত্র ইত্যাদির সংঘাত নেই বলে মন্তব্য করে বলেন : ‘নৃত্যের মধ্য দিয়াও পাকিস্তানকে রূপায়িত করা যায়। বরং আমার মনে হয় পাকিস্তানেরও একজন উদয় শংকরের



অপরিহার্য-রূপে প্রয়োজন। কোরানের উদার দৃষ্টিভঙ্গী কাহাকেও এবং কিছুকেই অবজ্ঞা করিতে শিক্ষা দেয় না। কোরান সম্পূর্ণতার দাবী করে এবং সত্যই উহা সম্পূর্ণ। কিন্তু অপর কেহ সত্যের অধিকারী নয় এবং আর কিছুতেই সত্য নাই—কোরান এই শিক্ষা দেয় না। পাকিস্তানের সুদূর ইমারত একমাত্র এই বুনিয়াদের উপরই গড়িয়া উঠিতে পারে।<sup>৭</sup>

দেওয়ান মুহম্মদ আজরফ সাহিত্য সৃষ্টিতে প্রতিভার গুরুত্ব এবং জীবনে নৈতিকতার প্রতিফলন ঘটে এমন মহৎ সাহিত্য সৃষ্টির গুরুত্ব বর্ণনা করে প্রবন্ধ লিখেছেন (উপেক্ষিত সাহিত্যিক, ১০ বর্ষ ৮ম সংখ্যা, পৃ-২৭৭-৭৯), ছোহেলউদ্দীন আহমদ অবক্ষয়-কবলিত পাকিস্তানের সমাজচিত্র তুলে ধরেছেন ‘সমাজতন্ত্রের পাকিস্তানী বিবর্তন’ শীর্ষক প্রবন্ধে (দ্র. আল ইসলাম, ১০ বর্ষ ১১শ সংখ্যা, পৌষ ১৩৫৪, পৃ. ৩০০-৩০৭)।

মোহাম্মদ আহবাব চৌধুরী জাতিগঠনে সংবাদপত্র ও নিজস্ব সংবাদ মাধ্যমের গুরুত্ব বর্ণনা করে প্রবন্ধ লিখেছেন ‘সংবাদপত্র’ শিরোনামে (১১ বর্ষ, ৭-১১ সংখ্যায়, পৃ. ৩০৯)। সিলেটের আঞ্চলিক ইতিহাস এবং ‘হজরত শাহ জালাল’ এর উপর অসংখ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।<sup>৮</sup> আর সিলেটের লোক-সাহিত্যের বিস্তৃত পরিচয়ও এ পত্রিকায় পাওয়া যায়। ফলে জাতির ইতিহাস-ঐতিহ্যের দলিল হিসেবে আজও আল-ইসলাহর ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম।

### তথ্যপঞ্জি

১. আল-ইসলাহ ১১ বর্ষ ১ সংখ্যা বৈশাখ ১৩৫৬, মে ১৯৪৯ সংখ্যায় বলা হয় ‘দীর্ঘ এক বৎসর নীরবতার পর আল-ইসলাহ পুনঃ প্রকাশিত হল...আঞ্চলিক নতুন রাষ্ট্রের প্রান্তে এক মফস্বল শহরে বসে কাগজ জোগাড় করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হয়েছিল। অনেক সাধ্যসাধনার পরে এবং অনেক বিলম্ব হলেও—কাগজ পেতে সমর্থ হয়েছি (পৃ. ৩৬)।
২. আল-ইসলাহ, ৫ বর্ষ, ১ সংখ্যা, কার্তিক ১৩৪৫।
৩. পূর্বোক্ত, ৬ বর্ষ ৯-১০ সংখ্যা, ১৩৪৬।
৪. গণভোটের তারিখ ছিল ৬ ও ৭ জুলাই ১৯৪৭। পাকিস্তানে যোগদানের পক্ষে ২৩৯৬১৯ এবং বিপক্ষে (ভারতে থাকার পক্ষে) ভোট পড়ে ১৮৪,০৪১ টি। পাকিস্তানবাদীরা বেশী ভোট পান ৫৫৫৭৮ টি। সূত্র : আল ইসলাম শ্রাবণ ১৩৫৪ (১০/৪) সংখ্যা।
৫. নূরুর রহমান খান, বাঙালী মুসলমানের মাতৃভাষা-চেতনা : রাষ্ট্রভাষাচিন্তা ও সৈয়দ মুজতবা আলী, নিবন্ধমালা, তৃতীয় খণ্ড, উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৭, পৃ ১২১।
৬. মুহম্মদ মুসলিম চৌধুরী, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা, আল-ইসলাহ ১০ বর্ষ, ৭ সংখ্যা, কার্তিক ১৩৫৪, পৃ. ২২২-২৩৩। প্রবন্ধটি কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদের (সিলেট) ১১ বর্ষের ২ সভায়, ৯ নবেম্বর ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে পঠিত হয়।
৭. মাহবুব উল আলম, আব্বাসউদ্দীন, আল-ইসলাহ, ১১ বর্ষ, ৭-১২ সংখ্যা, কার্তিক-চৈত্র ১৩৫৬, পৃ. ৩১৮-২০।
৮. ছাব্বিশ বর্ষের সংখ্যাগুলোর রচনা সবই হজরত শাহজালাল এর ওপর। সম্পাদক মুহম্মদ নূরুল হক সিলেটের পল্লীকবিগণ-এর বিস্তৃত ইতিহাসও এতে সংকলিত করেছেন। শ্রীহট্টের ইতিহাস নিয়ে লিখেছেন অনেক লেখক। একটি অঞ্চলের অজানা ইতিহাস প্রণয়নের গুরুদায়িত্ব আল-ইসলাহ সম্পন্ন করেছে বলে স্বীকার করতে হবে। সিলেটের ইতিহাস পূর্বকার আসামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল—একথা মনে করলে সাতচল্লিশ পরবর্তীকালের সাধনার স্বতন্ত্র মূল্য স্বীকৃত হবে।

### ৩. মাহেনও

(১৯৪৯-৭১)

১৯৪৯ সনের এপ্রিলে পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের মুখপত্র উর্দু মাসিক মাহেনও এর বাংলা সংস্করণ পূর্ববাংলায় প্রচারের উদ্যোগ নেয়া হয়। উদ্দেশ্য অবশ্যই পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় আদর্শের প্রচার এবং নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক ভিত্তিভূমি সুদৃঢ়রূপে তৈরী করা।

রাজনীতিতে আধুনিক প্রচার মাধ্যমের গুরুত্বের কথা সরকার উপলব্ধি করে এই পত্রিকার মাধ্যমে শিক্ষক, অধ্যাপক, বুদ্ধিজীবী, আমলা, সংস্কৃতিকর্মী, লেখক ও সকল শিক্ষিত সম্প্রদায়কে সুসংগঠিত ও সুনিয়ন্ত্রিত করার ঐকান্তিক অভিপ্রায় নিয়ে সরকার 'মাহেনও' প্রকাশ করেছিল। সরকারি পত্রিকা বলে এর আয়-ব্যয়ের কোনো চিন্তা ছিল না! গৌরিসেনের টাকায় কাড়ি কাড়ি লেখা মাসে মাসে ছাপা হয়েছে এবং সম্মানী দিয়ে সরকারমুখী করে তোলা হয়েছিল। সরকারের অভিলাষ সফল হয়েছিল। খ্যাতমান অধিকাংশ কবি-সাহিত্যিক এই পত্রিকায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নিয়মিত লিখেছেন। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ড. কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল ফজল, সুফিয়া কামাল, শওকত ওসমান, আহমদ শরীফ, হাসান হাফিজুর রহমান, শামসুর রাহমান, আতাউর রহমান, বদরুদ্দীন উমর, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, আবু হেনা মোস্তফা কামাল, বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর, আজিজুল হক, এবং একালের গল্প লেখক সেলিনা হোসেন, কবি আবুল হাসান সকলেই মাহেনও এর পৃষ্ঠায় লেখা প্রকাশ করতে দিতেন।

সৈয়দ আলী আহসান এবং চিহ্নিত পাকিস্তানবাদী লেখক সম্প্রদায় তো লিখতেনই। তবে দেখা যাবে প্রগতিশীল বা মানবতাবাদী ধারার পত্রিকাতেও এই সমস্ত লেখক এবং তাঁদের উত্তরসূরি নবীন লেখকেরা পর্যাপ্ত লিখেছেন। আরও দেখা যাবে এক শ্রেণীর লেখক পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক অঙ্গনের প্রধান দুটি ধারা—'সাম্প্রদায়িক' ও 'অসাম্প্রদায়িক' উভয় শ্রেণীর পত্র পত্রিকায় সমানতালে নিয়মিত লিখেছেন। ফলে সামাজিক সাংস্কৃতিক ভাবে জনগণ মাঝে মাঝেই বিভ্রান্ত হয়েছেন। বুঝতে পারেননি কি তাঁদের করা উচিত। কারা কি ভাবছেন, তাও অস্পষ্ট থাকতো অনেক সময়।

'মাহেনও' কথার আক্ষরিক অনুবাদ (মাহ' মানে চাঁদ, এবং 'নও' মানে নতুন) নতুন চাঁদ—এর ব্যঞ্জনার্থ 'নবযুগ' মনে করা যায়, কিন্তু উদ্যোক্তাদের মাথায় সেটা ছিল কিনা বলা যায় না। 'নতুন চাঁদ' তাঁরা ইসলামি তাৎপর্যেই গ্রহণ করেছিলেন। ১৩৫৫ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে পাকিস্তানের সাহিত্যক্ষেত্রে 'নবযুগ' সৃষ্টির (?) প্রত্যাশা নিয়ে মাহেনও সচিত্র মাসিক রূপে আবদুর রশিদ এর সম্পাদনায় 'পাকিস্তান পাবলিকেশনস' এর পক্ষে এম. আরশাদ হোসেন কর্তৃক করাচী থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। করাচী বা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত হলেও মুদ্রিত হতো ভোলানাথ বসাক কর্তৃক শ্রীকান্ত প্রেস ৫ নয়া বাজার, ঢাকা থেকে। বার্ষিক মূল্য সডাক সাড়ে পাঁচ টাকা। প্রতি সংখ্যা আট আনা। সাইজ ৯ ।। ইঞ্চি × ৭।। ইঞ্চি।

মাহেনও এর প্রথম সম্পাদক আবদুর রশিদ প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা থেকে দ্বিতীয় বর্ষের অষ্টম সংখ্যা পর্যন্ত সম্পাদনা করেন। দ্বিতীয় বর্ষের দ্বাদশ সংখ্যা থেকে চতুর্থ বর্ষের প্রথম

সংখ্যাগুলোর অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন মীজানুর রহমান। চতুর্থ বর্ষের চতুর্থ সংখ্যা থেকে চতুর্থ বর্ষ অষ্টম সংখ্যা পর্যন্ত সম্পাদনা করেন অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন। এরপর চতুর্থ বর্ষের নবম সংখ্যা পৌষ ১৩৫৯ থেকে ষোড়শ বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যা পর্যন্ত সম্পাদক ছিলেন কবি আবদুল কাদির। ষোড়শ বর্ষ নবম সংখ্যা থেকে (পৌষ ১৩৭১ : ডিসেম্বর ১৯৬৪) পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন কবি তালিম হোসেন। উপরে যে সংখ্যাগুলোর উল্লেখ নেই, তাতে, সম্পাদক হিসেবে কারো নাম ছিল না। তবে নামে কিছু এসে যায় না। সরকারি পত্রিকা কার্যালয়ের রুটিনমাসিক ছাপা হয়েছে। কোনো প্রতিবন্ধকার সৃষ্টি হয়নি।

মীজানুর রহমান এম.এ. ১৯৪৭ সনে পূর্ব পাকিস্তান সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপসচিব ছিলেন। তিনি সরকারি অভিপ্রায় অনুসারে তথ্য দফতরের নিয়ন্ত্রণাধীন মাহেনও পত্রিকার অবৈতনিক সম্পাদক হয়েছিলেন। তাতে এমন কোনো বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা বাতুলতা। বরঞ্চ লক্ষ্য করতে হয় আগ্রহের সঙ্গে যে, পাকিস্তান সরকারের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, প্রভৃতি বিষয়ে নীতিমালা তিনি কতোখানি বাস্তবায়িত করতে পেরেছিলেন। আবদুর রশিদ একজন সাধারণ লেখক, সরকারের কর্মচারি ছিলেন। তিনি আধুনিক কবিতার (আশরাফ সিদ্দিকীর) যুগ্ম-সম্পাদক আবদুর রশিদ খান নন।

অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, কবি আবদুল কাদির এবং কবি তালিম হোসেনের পরিচয় প্রদানের প্রয়োজন পড়ে না। 'হারামণি' (পাঁচ খণ্ডের)—সংকলক এবং বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক প্রখ্যাত অধ্যাপক, মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন এবং 'শিখা' গোষ্ঠীর একজন লেখক ও কয়েক সংখ্যা 'শিখা'র সম্পাদক, ছান্দসিক কবিবর, সম্পাদক আবদুল কাদিরকে এদেশের প্রায় সকলেই জানেন।

মাহেনও পত্রিকায় কাজ করতেন কবি মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ। তিনি 'পূবালী' সম্পাদনায়ও বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন। তবে যে কথা বলা দরকার, তাহলো সম্পাদকদের রচনা নির্বাচনে এবং আদর্শ নির্ধারণে স্বকীয় রুচি ও আদর্শ অনুসরণ করার অধিকার বা ক্ষমতা ছিল না। সরকারি পত্রিকায়, সরকারের নীতিমালা অণুসরণ করতে হতো। পত্রিকার রচনা নির্বাচনে মতান্তরের কারণে চার সংখ্যার পরে মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছিল। কায়েদে আজম, কবি আল্লামা মুহম্মদ ইকবাল, পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন এলাকার ভৌগোলিক, সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক পরিচয় সরকারের প্রধান ব্যক্তিত্বদের ভাষণ, ছবি, সরকারি ঘোষণা আর উর্দু মাহেনও-এর প্রধান লেখার বাঙালি লেখকদের অনুবাদ পত্রিকার বিরাট অংশ জুড়ে ছাপা হয়েছে।

এদেশের লেখকেরা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে যা লিখেছেন, তার মধ্যে আবার বেশিরভাগই ছিল মধ্যযুগ ও উনিশ শতকের বাঙালি মুসলমান কবি সাহিত্যিকদের জীবন ও সাহিত্যের, চিন্তা ও মূল্যবোধের স্বরূপ উপস্থাপন প্রচেষ্টা। আধুনিক সমকালীন সমাজ ও সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে লিখিত কবিতা, গল্প, উপন্যাস এবং প্রবন্ধ আলোচনা সমালোচনা প্রভৃতির মাধ্যমে এদেশের লেখকেরা বাংলা সাহিত্যে যে মূল্যবান সংযোজন ঘটিয়েছেন, তারও কিছু মূল্য অবশ্যই আছে। অনেক স্থায়ী শিল্পমূল্যের গল্প, কবিতা, এবং ইতিহাসের আলোচনা

সমালোচনা এতে প্রকাশিত হয়েছে। এর লেখক ছিলেন পূর্ব বাংলার সকল খ্যাত, হবু-খ্যাত অধ্যাপক, গবেষক, কবি সাহিত্যিক, সংস্কৃতিসেবী এবং শিল্পীবৃন্দ। ফলে পাকিস্তান সরকারের আদর্শ বিরোধী না-হয়েও অনেক রচনা সামাজিক সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক বিচারের মাপকাঠিতে মূল্যবান বিবেচিত হয়েছে বা হতে পারে।

কাজী নজরুল ইসলাম এর পরবর্তী বাঙালি মুসলমান রচিত আধুনিক সাহিত্যের ইতিহাসে মাহেনও-এর তাই একটি সদর্থক ভূমিকা রয়েছে। পত্রিকার এই ভূমিকা প্রথমে যেভাবে শুরু হয়েছিল—করাচী থেকে প্রকাশিত হলে কতোটুক তা সম্ভব হতো বলা যায় না। তবে পাঁচটি সংখ্যা সেখান থেকে প্রকাশের পর ঢাকা এসে যখন ষষ্ঠ সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৫৬ তে প্রকাশিত হয়, তখনই এই সুযোগ অব্যবহৃত হলো।

সম্পাদকীয়তে ঢাকায় আগমন সম্পর্কে (ভাদ্র ১৩৫৬, ৬ষ্ঠ সংখ্যায়) বলা হয় :

আপাতত ঢাকাতে ‘মাহেনও’র নিজস্ব দপতর কায়েম হয়েছে। পরিচালনার নতুনতর এনতেজামও করা হয়েছে। ‘মাহেনও’কে সর্বাঙ্গ-সুন্দর মাসিক পত্রিকায় পরিণত করা মোনতাজেমগণের আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা।...‘মাহেনও’-র ক্রমোন্নতির কোশে আমাদের কাম্য। ফলাফল আল্লাহর রহমৎ এবং লেখক লেখিকা ও পাঠক পাঠিকাগণের সাহায্য সহানুভূতি ও সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল। আমরা কামনা করি সকলের নেকনজর হামদদী ও মেহেরবানী।

পত্রিকার উদ্দেশ্য সম্পর্কে একই সূত্রে বলা হয় :

মাহেনও’র আসল মকসাদ নিয়ে কাহারো মনে ঝটকা রয়েছে বলে মালুম হয়। সাহিত্যের মারফতে আত্ম-চেতনা ও আত্ম-পরিচিতির পরিবেশে পাকিস্তানের খেদমত ‘মাহেনও’র আসল উদ্দেশ্য। পাকিস্তান আমাদের জাতীয় রাষ্ট্র। পাকিস্তানের সোবেহ উস্মিদে শুরু হয়েছে আমাদের নতুনতর জীবনের জয়যাত্রা। আমাদের জাতীয় জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ ও সফলতার জন্য দরকার সাহিত্য ক্ষেত্রে নতুনতর অনুপ্রেরণার সঞ্চার—নতুনতর পরিবেশ ও পরিবেষ্টনীর সৃষ্টি। ‘মাহেনও’ কোশে করছে এবং করবে পাকিস্তানের বিভিন্ন অংশের বাসেন্দাগণের মধ্যে আত্মীয়তা এবং পারস্পরিক পরিচিতির সোনালী বন্ধন সৃষ্টি করতে। ‘মাহেনও’ এশতেকবাল করে সহযোগিতা করবে সকল সাময়িক পত্রিকার সহিত নিজস্ব নীতির দায়েরাতে। নিজেদের ভাবধারা প্রকাশের জন্য ‘মাহেনও’ কাহারো উপর কোনও ফরমাস দিবার অহমিকা রাখে না। ভাবপ্রকাশের জন্য ভাষা। কে কেমন ভাবে নিজের কথা প্রকাশ করবেন, তা লেখক-লেখিকার নিজস্ব অধিকার এবং দায়িত্ব। কোন্ লেখা কার কতটুকু বোধগম্য, সে বিচারের দায়িত্ব কেউ নিতে পারে না। অতীতে বাংলা ভাষা নানা মোড় ঘুরেছে। বর্তমানে শুরু হয়েছে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের নতুন যুগ। নতুন যুগের সাথে তাল ঠুকে চলবার কোশে করবে ‘মাহেনও’। বিষয়টি নেহায়েৎ গুরুত্বপূর্ণ। যথায়ময়ে আমরা আরো বিশদভাবে আলোচনা করবো নতুনতর আবহাওয়া সম্পর্কে। আজকে বিসমিল্লাহ মাত্র।

মাহেনও-এর প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় ‘কায়েদে আজম রাহমাতুল্লাহ আল্লাইহে’র উপর ‘হিজ্র এন্ডসেলেন্দী আলহাজ্ব খাজা নাজিমউদ্দিন’ এর প্রবন্ধ ছাপা হয়। ১৯৪৯ সনের জানুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির আহ্বায়ক প্রাদেশিক স্বাস্থ্যমন্ত্রী মুহম্মদ হাবীবুল্লাহ বাহারের ‘অভিভাষণ’ এবং জসীমউদ্দীন এর ‘পাকিস্তান’ ও ‘মাহেনও’ শীর্ষক কবিতা আর কায়েদে আজম ও তাঁর বর্তমান আত্মীয় সজনের বংশ পরিচয়, কায়েদে আজমের ইন্তেকাল ও পরবর্তী চল্লিশ দিবসের কার্যক্রমের বিবরণ প্রভৃতি সচিত্র ছাপা হয়। কায়েদে আজম, পাকিস্তানের উন্নয়ন কার্যক্রম এবং পাকিস্তান ও ইসলামের

ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং সম্প্রীতি বৃদ্ধিমূলক রচনার এক বিশাল সমাহার হলো মাহেনও। মাহেনও এর লেখক কে ছিলেন না, তাই খুঁজে বের করা এক কষ্টকর কর্ম। ইতোপূর্বে উক্ত সম্পাদকীয়র ভাষাতেই পত্রিকার নেক ‘মকসাদ’ এর আভাস রয়েছে। এই ‘মকসাদ’ ভাষার ক্ষেত্রে, বলাবাহুল্য, ‘বাংলাভাষা সংস্কার কমিটি’র এবং পাকিস্তানি-সাহিত্যের প্রবর্তকদের সুপারিশ বাস্তবায়নেরই অংগ। সরকারি ষড়যন্ত্রের এস্তেজাম করতে গিয়ে মাহেনও পূর্ব বাংলার ঐতিহাসিক ভাষা ও সাহিত্যের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল।

প্রথম বর্ষ সপ্তম সংখ্যায় মাহেনও ঘোষণা করে যে ‘আমাদের মাতৃভাষার আলোচনা’ পত্রিকাতে নিয়মিতভাবে সাদরে প্রকাশ করা হবে। ‘আমাদের গোজারেশ’ শীর্ষক সম্পাদকীয় (‘আমাদের কথা’ ইত্যাদি না বলে বলা হতো ‘আমাদের গোজারেশ’) তে বলা হয় :

গোজাশতা এশায়াতে আমরা অতীতে বাংলা ভাষার নানা মোড় পরিবর্তনের কথা মোখ্‌তাসার ভাবে উল্লেখ করেছিলাম। বাংলা ভাষার ইতিহাস সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল সকলকে স্বীকার করতেই হবে যে, শৈশবে বাংলাভাষা মুসলমান বাদশাহ এবং আমীর-ওমরাহদের নেকনজরেই পরওয়ারেশ পেয়েছিল এবং শাহী দরবারের শান শওকত হাসিল করেছিল।... ভারতে ব্রিটিশ রাজত্বের আগ পর্যন্ত মুসলমানি আমলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য মুসলিম প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিল। ফারসি ভাষা ছিল রাজভাষা এবং সরকারি ভাষা।... আজও রয়েছে আরবি-ফারসি শব্দের প্রাচুর্য এবং সার্বলীল সৌন্দর্য। দুইশত বৎসরের ব্রিটিশ রাজত্বে সাবেক শব্দের অনেকগুলি ইংরেজি শব্দে পরিবর্তিত হলেও মুসলিম আমলদারির আলামত মিসমার হয়ে যায়নি... তখাকথিত শুদ্ধ বাংলায় রূপান্তরিত হয়নি এবং কখনো হবে না।... বাংলা ভাষা জন্ম হতেই পাঁচ-মিশালী ভাষা। বাংলা ভাষার জাত নিয়ে নাজ করা নিছক সংস্কার—অসংগতও বলা যেতে পারে। জাতের বলাই নেই বাংলা ভাষায়। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের তাহজীব তমদ্দনের তায়াল্লুক বর্জিত বাংলা ভাষা মাশেরেকি পাকিস্তানের সাধারণ মাতৃভাষা নয় এবং হবেনা, হতে পারে না। একথা ভুলে যাওয়া হবে বোকামি।

মাশেরেকি বাংলা বা পাকিস্তানে প্রচলিত মাদেরি জবানের সন্ধান নিলে দেখা যাবে মুসলমান সমাজের প্রচলিত শব্দ সমূহের অন্তত আধা আধি আসলে আরবি-ফারসি ভাষা হতে আমদানী। উর্দু ভাষায়ও এগুলি প্রচলিত। এই সকল শব্দের সমবায়ে গঠিত ভাষাই প্রকৃত প্রস্তাবে মাশেরেকি পাকিস্তানের সত্যিকার মাতৃভাষা।... সাহিত্যিক বাংলার কথা অবশ্য আলাহিদা। সকল দেশেই সাহিত্যিক ভাষা সাধারণভাবে প্রচলিত মাতৃ ভাষা হতে মোটামুটি পৃথক কৃত্রিম।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় আমাদের জাতীয় জীবনে এসেছে নতুনতর জিনদেগীর জোয়ার। আত্মপরিচিতি ব্যতীত আত্মপ্রতিষ্ঠা অসম্ভব।... পাকিস্তানের objective Regulation এর মূলনীতি মনে রেখেই আমাদের চলতে হবে। ভুলে গেলে চলবেনা ইসলাম কেবল ধর্ম গ্রন্থ এবং আরবি ভাষার শ্রেষ্ঠতম সাহিত্য। দুনিয়ার সাহিত্যিক দরবারেও কালামুল্লাহ কোরাণ শরীফ শ্রেষ্ঠতম আসনের মোস্তাহেক। সাহিত্যিক দায়েরাতেও কোরান আমাদের আদর্শ এবং অণুপ্রেরণার প্রতীক।... আজাদীর সোনার কাঠির পরশে আমাদের অবলুপ্ত চেতনা অচিরো ফিরে আসুক ‘মাহেনও’ তা সর্বাঙ্গকরণে কামনা করে।<sup>২</sup>

পরবর্তী সংখ্যায় ‘পরিষ্কার প্রমাণ’ শীর্ষক সম্পাদকীয় নিবন্ধে আবারও ভাষার আদর্শ কি হওয়া উচিত সে সম্পর্কে বলা হয় : ‘বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে... আমাদের আলোচনার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে যে সকল অভিমত আমাদের হস্তগত হয়েছে, তাতে আমরা আশান্বিত হয়েছি।... বাংলা ভাষার বর্ণমালা নিয়ে ইদানিং বেশ জোরালো আলোচনা দেখা যাচ্ছে।... বর্ণমালার সংস্কারের আবশ্যিকতা সর্ববাদীসম্মত। তবে কেমন করে এবং কতোটুকু

—এখনো সাব্যস্ত হয়নি। পূর্ব বাংলা সরকার এই ব্যাপারে ইতোপূর্বেই একটি কমিটি গঠন করেছেন। কমিটির কাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সুদূরপ্রসারী সম্ভাবনায় ভরপুর। আমরা কমিটির সদস্যগণের খেদমতে দু'চারটি কথা আরজ করবো।

...পূর্ব বাংলার ধর্মনিরূপণ কমে যায়নি এবং উবেও যায়নি। ইসলাম এবং পাকিস্তানের জন্য তাঁহাদের দরদ, গরজ ও ফরজ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইসলামের বুনিয়াদ কালামুল্লাহ কোরান শরীফ। কোরান আরবি ভাষায় এবং আরবি হরফে লিখিত কোরান শরীফের প্রতি মুসলমানদের দরদ ও সম্মান আলোচনা করে বুঝাবার দরকার করেনা। আধুনিক আলোক প্রাপ্ত কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে গোমরাহ দুচারজন বুদ্ধিজীবীর কথা অবশ্য আলাহিদা। তাঁহারা আসলে সখাত সলিলে বা গোমরাহীর নাপাক পানিতে নিমজ্জমান। ধর্মভীরু মুসলমানের চোখে কোরান শরীফের ভাষা এবং বর্ণমালা পবিত্র। পবিত্র জিনিসের সহিত সংশ্লিষ্ট বস্তু বা পবিত্র বস্তুর বাহনকে পবিত্র মনে করাই স্বাভাবিক। ধর্মভীরুতা অপরাধ বা অগৌরবের নহে—শ্রেষ্ঠতম গৌরব। ইম্মা আকরামাকুম এনাদালাহে আতকাকুম—তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ধর্মভীরু বা মোস্তাকী মানুষই আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বেশি সম্মানিত—ইহা হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের সহী হাদীস। সাদ্কা মুসলমানদের নিকট আ—হজরতের হাদীস বিভ্রান্ত—মস্তিষ্কের কূট-তর্কের চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান ও মর্যাদার মোসতাহেক।<sup>৩</sup>

ধর্মের কথা বলে জনসাধারণকে কিভাবে প্রতারিত করতো পাকিস্তান সরকার—তা মাহেনও এর এইসব বক্তব্যে বুঝা যায়। সরকারি পত্রিকায় সরকারের গঠিত কমিটিকেও প্রভাবিত করা হতো আগাম আলোচনার দ্বারা—

আধুনিক আলোকপ্রাপ্ত মুসলমান পণ্ডিতগণের কথায় কোরান হাদিসের ভক্ত ও অনুরক্ত মুসলমান জনসাধারণ কোরান শরীফের হরফকে বাংলা ইংরেজী বা অন্য যে কোন বর্ণমালার চেয়ে বেশি ভক্তি করবে ইহা স্বাভাবিক এবং সম্ভব। কোরান শরীফ নাজিল হবার আগে আরবি হরফ পবিত্র কি অপবিত্র ছিল, তর্ক বেকার। হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার মক্কা বিজয়ের আগ পর্যন্ত মক্কার কাবা ছিল বুৎ-খানা।<sup>৪</sup>

ভাষা ও বর্ণমালা সংস্কার সম্পর্কে মাহেনও এর দৃষ্টিভঙ্গি সরকারেরই আদর্শকে প্রতিফলিত করে। ১৯৪৯ সনের ভাষা ও বর্ণমালার বিতর্ক সম্পর্কে বলা হয় :

ভাষা এবং বর্ণমালার সমস্যাটি জ্ঞাতির পক্ষে অত্যন্ত জরুরী। ভাষা-কমিটির সদস্য সাহেবানদের খেদমতে আমাদের আরজ তাঁহারা যেন সকল দিক বিশেষভাবে বিবেচনা করে এবং মুসলমান জনসাধারণের মনোভাব মনে রেখে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির ফয়সালা করেন। আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার কল্যাণে আমরা আণবিক বোমার যুগে উপনীত হয়েছি। মনে রাখা দরকার যে মধ্যযুগে ইসলামের নুরানী আলোকেই আধুনিক সভ্যতা গর্বিত ইউরোপের অন্ধকার বিদূরিত হয়েছিল। গিলটি সোনার সম্মাহনে আমরা যেন আসল সোনার সমাদর ভুল না যাই।

...মানুষের জীবন মুশকিলাতে ভরা। মুশকিলাতের ভয়ে মুসড়ে যাওয়া কাপুরুষতা। বাংলা হরফের সংস্কার বা পরিবর্তন, বিরাট যুগান্তকারী ব্যাপারে মুশকিলাতের মুকাবিলা করতে হবে, তাহা স্বাভাবিক। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায়ও মুশকিলাত কম ছিল না। এখনও সকল মুশকিলের অবসান হয়নি।<sup>৫</sup>

১৯৪৯ এর ডিসেম্বর নাগাদ আরবিকে রাষ্ট্রভাষা করার ষড়যন্ত্র জোরদার হয়েছিল। এব্যাপারে মাহেনও ভূমিকা পালন করে। আরবি রাষ্ট্রভাষা হবে কিনা সে সম্পর্কে স্পষ্ট বক্তব্য প্রচার করে। ডিসেম্বর ১৯৪৯ সংখ্যায় 'আরবি ভাষা' শীর্ষক প্রবন্ধে এ বিষয়ে আলোচনার সূত্রপাত করা হয়। 'আমাদের গোজারেশ' এ 'নতুন আবহাওয়া' সৃষ্টির আনন্দ বার্তা ঘোষণা

করা হয়। লক্ষণীয় মাহেনও-এর লেখকবন্দ সরকারি উদ্দেশ্য সার্থক করার জন্য উৎসাহে কত না রচনা লিখেছেন?

সম্পাদকীয়তে বলা হয় : 'নতুন বছরকে এস্তেকবাল করতে গিয়ে নতুন আবহাওয়ার কথা মনে পড়ছে। 'এস্তেকবাল' কথাটির এসতেমালই নতুন আবহাওয়ার প্রমাণ। এই সংখ্যায় প্রকাশিত 'আরবি ভাষা' প্রবন্ধে নতুন আবহাওয়ার আরো বেশি সন্ধান পাওয়া যাবে। আরবি জ্বানকে পাকিস্তানের হুকুমাতী জ্বান করার নতুন তাহরীকের প্রতিই ইশারা। আমরা আপাততঃ এ-সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা মোনাসেব মনে করি না। চারিদিকে দেখছি উৎসবের সয়লাব। বিষয়টি নেহায়েত গুরুত্বপূর্ণ। মাহেনওর পাঠক পাঠিকাগণকে আলোচনার অবসর দিবার জন্যই আমরা এই মাসে পহেলা প্রবন্ধ প্রকাশ করলুম।'<sup>৬</sup>

মাহেনও এর পৃষ্ঠা সাক্ষী দেয় ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ ও আরবি ভাষার পক্ষে একদা কলম ধরেছিলেন। উর্দু সাহিত্যের উপর প্রবন্ধ লিখেছেন অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আবদুল হাই। এবং আরো অনেক বড় বড় পণ্ডিত। শহীদুল্লাহর প্রবন্ধের নামই 'আমাদের কওমী যবান—আরবি'। তিনি আরবি ভাষার, ভাষাতাত্ত্বিক পরিপ্রেক্ষিত ও বিবর্তনের ইতিহাস এবং ভৌগোলিক বিশাল-পরিমণ্ডলের পরিচয় দিয়ে বলেন :

রাজনীতির দিক হইতে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত সমস্ত উত্তর আফ্রিকা এবং মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়ার বিস্তৃত ভূ-ভাগে যে ৬০ কোটি মুসলমান আছে, তাহাদিগকে এক মিল্লতের (ধর্ম সম্প্রদায়ের নিবিড় প্রাত্ত্বের বন্ধনে) আবদ্ধ করিতে হইলে আরবি ভাষা অপরিহার্য।

প্রসঙ্গত ইসলাম ধর্মের গণ্ডীবন্ধনে 'ইসলামের' মাহাত্ম্য ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন, ইসলাম ...একটি Socio-politico religious system সামাজিক রাজনৈতিক ধর্মনৈতিক পদ্ধতি। আমরা পাকিস্তানকে কেবল পাক ভারত উপমহাদেশের মধ্যে বিচ্ছিন্ন ভাবে ফেলিয়া রাখিতে পারি না। পাকিস্তানের স্থায়িত্ব ও উন্নতির জন্য আজ প্রয়োজন হইয়াছে বিশ্ব মুসলিম রাষ্ট্র সংঘ সংগঠন। এই সংগঠনের জন্য আরবি ভাষার একান্ত প্রয়োজন। এই জন্যই আমরা পাকিস্তানের রাষ্ট্রের ভাষা আরবি দেখিতে চাই।...বাংলা ভাষা আরবি অক্ষরে লিখিয়া কিংবা উর্দুভাষা অথবা অন্য কোনও ভাষা দ্বারা আরবি ভাষার প্রয়োজন নিষ্পন্ন করা যাইবে না। মুসলিম জাহানের ঐক্যের জন্য আল্লাহ ও আল্লাহের রসুলের (দঃ) ভাষা আরবি চাই। এই আরবিই আমাদের 'কওমী যবান' (জাতীয় ভাষা)।'<sup>৭</sup>

মোহাম্মদ শহীদুল্লাহর মতো ব্যক্তির সমর্থন (?) লাভ করাতেই বুঝি মাহেনও-এর আরবি প্রেমিক, উর্দু-বিমোহিত, বাংলার প্রতি শ্রদ্ধাহীন সম্পাদকেরা দিব্য চোক্ষে দেখেছিলেন একটি নতুন দিন আগত। 'সাহিত্যের মোড়' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

পাকিস্তানের কল্যাণে বাংলা সাহিত্যের মোড় ঘুরেছে বলে প্রতীয়মান হয়। সাময়িক পরিস্থিতির সহিত সাহিত্যের বিকাশ বিশেষভাবে বিজড়িত। পাকিস্তান আমাদিগকে পরাধীনতার অন্ধকার ও অভিশাপ হতে আজাদীর আলোক ও আশীর্বাদে টেনে এনেছে। আজাদী জাতির বড় নিয়ামত। নতুনতর আলোকের সোবেহ সাদেকে আমরা উপনীত। আত্মভোলা এবং সম্মোহিত কাফেলাকে হাতছানি দিচ্ছে নতুন আলোক, নতুন মনঞ্জিল। চলছে কাফেলা নতুন পথে। শতাব্দীর ঘূমের ঘোর কাটিয়ে জেগে উঠেছে 'আসাহাবে কাহাফ'।

বাংলা সাহিত্যের আসরে আমরা দেখছি নতুনতর ইশারা নতুনতর উম্মাদনা, নতুনতর আশা ও আকাঙ্ক্ষার প্রাণ চঞ্চল শিহরণ। আমরা মোবারকবাদ জানাই এই নতুনতর শিহরণকে।<sup>৮</sup>

আবুল ফারাহ ‘আরবি ভাষা’ রাষ্ট্রভাষা হলে কি লাভ হবে তা যুক্তিসহ ব্যাখ্যা করে বলেন :

বর্তমানে বাঙালি মুসলমান শিক্ষার্থীকে অনেকগুলি ভাষার চাপে নিশ্চেষ্ট হতে হয়; যথা : বাংলা, ইংরেজি, আরবি ও উর্দু। মনোবিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত এই যে, সব শিশুর ভাষা-শিক্ষার ক্ষমতা সমান নয়। যাদের ভাষা শিক্ষার স্বাভাবিক প্রবণতা নেই, তাদের উপর তিন-চারটি ভাষা-শিক্ষার চাপ দিয়ে আমরা তাদের মেধা ও প্রতিভাকে অন্ধকূরেই নষ্ট করে দেই,—তারা স্বাভাবিক বিকাশ লাভের সুযোগ পায় না। এতে যে বিরাট জাতীয় অপচয় হচ্ছে, তা একটু চিন্তা করলেই বুঝা যাবে। আরবি রাষ্ট্রভাষা রূপে গৃহীত হলে সাধারণ লোকের পক্ষে মাতৃভাষা ছাড়া ধর্মকর্ম ও রাজ্য কার্যে অংশগ্রহণ করার জন্য শুলু আরবি শিখলেই চলবে। তাছাড়া অধিকাংশ লোক তোতা পাখির মত না বুঝে যে কলিমা নামাজ, দোআ-দরুদ আওড়ায় ও খুৎবা বা মীলাদ শুনবে, সে অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবে। মানুষকে ‘আকল’ বা বুদ্ধি দিয়ে খোদাতাআলা ‘আশরাফুল মখলুকাত’—সৃষ্টির সেরা রূপে পয়দা করেছেন, না—বুঝে মস্ত্র আওড়িয়ে আমরা খোদাতাআলার সে মহাদানের অবমাননা করছি। ইসলামের বুনয়াদ ন্যায় ও যুক্তির ওপর স্থাপিত। আরবি শিখে আমরা আমাদের অন্ধভক্তিকে মুক্ত বুদ্ধি ও জ্ঞানের দীপ্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত ও আলোকিত করতে পারব। সমাজ এতদিন আরবি শিক্ষিতদের অবহেলা করেছে। আরবি রাষ্ট্রভাষা হলে তাঁদের ন্যায্য মান ও অধিকার তাঁরা ফিরে পাবেন এবং রাষ্ট্রের খেদমতে তাঁদের কর্মশক্তি ও প্রতিভা নিয়োজিত হতে পারবে, এতে মুসলিম সমাজের ঐক্য ও সংহতি আরো সুদৃঢ় হবে।

তবে প্রবন্ধকার একাধিক ভাষা শেখার কষ্ট লাঘবের পরামর্শ শেষ পর্যন্ত দিতে পারেননি। তিনি মাতৃভাষা বাংলা এবং আরবি ছাড়াও ইংরেজি শিক্ষার কথা বলেছেন। তিনটি ভাষা শেখার পরও তাঁর মত : ‘আরবি রাষ্ট্রভাষা রূপে গৃহীত হলে ধর্মীয়, রাষ্ট্রীয় ও কৃষ্টিগত সুবিধা ছাড়াও আমাদের শিক্ষার্থীরা বহু ভাষার চাপ থেকে মুক্তি পেয়ে তাদের প্রতিভা বিকাশের অধিকতর সুযোগ পাবে।’<sup>৯</sup>

ভাষার প্রশ্নে অসংখ্য আলোচনা সমালোচনা, প্রস্তাব, প্রচেষ্টা, কৌশল হয়েছে। কিন্তু সেসব ঔপনিবেশিক ষড়যন্ত্র টেকেনি, বাংলা ভাষা তার নিজস্ব গতিতে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু ইতিহাসের উপাদান হিসেবে মাহেনও এর কতিপয় রচনার পরিচয় লিপিবদ্ধ করার গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না।

মীজানুর রহমান যিনি ‘মাহেনও’ এর সম্পাদক হয়েছিলেন, পাকিস্তানের সামগ্রিক কল্যাণ কামনায় তিনি এতটাই উদগ্রীব ছিলেন যে, বলতে লজ্জা পাননি; বাংলা তাঁর ‘মাদেরী জবান’ হলেও বরাবর উর্দু ভাষার অধিকতর চর্চার পক্ষপাতী ছিলেন তিনি। তাই কায়্যা বজায় রেখে ছায়া বদলের প্রস্তাব করেছিলেন তিনি—কারণ, উর্দু বর্ণমালা ও ইসলামী-ভাবধারার কল্যাণে এবং সে-ভাষার নিজস্ব শক্তি ও সৌন্দর্যের দণ্ডলতে মুসলমানের নিকট খুবই আদরণীয়। উর্দু ও বাংলাকে সম্পর্কিত করে তিনি বলেন : ‘মাশরেকি পাকিস্তানেও উর্দুর কদরদানী ব্যাপক। মুসলমানি বাংলা এবং মুসলমানি উর্দু শব্দ সম্পর্কে বলতে গেলে খালাত ভাই। মাশরেকি পাকিস্তানের মুসলমান সমাজে নিত্য প্রচলিত শব্দসমূহের শতকরা ৬০/৭০টি শব্দ উর্দু ভাষাতেও প্রচলিত বলে আমার বিশ্বাস। সাহিত্যিক বাংলার কথা অবশ্য আলাহিদা।



তথাকথিত সাহিত্যিক বাংলা মাশরেকি পাকিস্তানের সাধারণ মাতৃভাষা নহে, তাহা অবশ্যই স্বীকার্য। মোকামি জ্বান এবং আদাবি জ্বানের পার্থক্য সকল দেশেই বর্তমান। মোকামি জ্বানই আসলে মাদেরী জ্বান।' তাঁর মতে উর্দু ও বাংলার পার্থক্য কেবল লিখন-প্রণালীতে :

মাশরেকি পাকিস্তানের বাংলা জ্বানের লিখনরীতির পরিবর্তনের কথা উঠেছে। আরবি হরফে লিখিত হলে মুসলমানি-বাংলা এবং মুসলমানি-উর্দুর বর্তমান পার্থক্য কালক্রমে বিলোপ পাওয়া বিচিত্র নহে। পাকিস্তানের কল্যাণে আমাদের জীবনে অনেক কিছু পরিবর্তন এসেছে এবং আরো আসবে। রাজনৈতিক আবর্নন বিবর্তনের সহিত ভাষার আবর্তন-বিবর্তন বিশেষ ভাবে বিজ্ঞড়িত। ভাব প্রকাশের জন্যই ভাষা। ভাবধারার পরিবর্তনের সংগে ভাষার পরিবর্তনও আবশ্যকীয়।

লেখকের বক্তব্য : মুসলিম জাতীয়তা ভৌগোলিক সীমারেখায় সীমাবদ্ধ নহে।... ভাবধারার উৎস যেহেতু এক সেহেতু ভাবের বাহন ভাষাও মোটামুটি এক-কেন্দ্রিক হওয়াই স্বাভাবিক। যেহেতু হিন্দীকে 'হিন্দুস্থানী' বলা হয়েছে, সেহেতু পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার নাম 'উর্দুর' পরিবর্তে 'পাকিস্তানি' বলাই সম্ভব।

উর্দুর সপক্ষে মীজানুর রহমান বলেন : 'কায়েদে আজম নির্দেশ দিয়ে গেছেন-উর্দু হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। কায়েদে আজমের নির্দেশ যুক্তিসঙ্গত। পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবার কাবেলিয়াত উর্দুর রয়েছে। এই সমস্যার সমাধানের বুনিয়াদ তৈরি হয়ে গেছে। আনজামের এন্তেজাম শুধু বাকী।... রাষ্ট্রভাষার নাম 'পাকিস্তানি',... গৃহীত হলেই আমার বিশ্বাস মুসলমানি বাংলা এবং মুসলমানি উর্দুর Ultimate Fusion এর পথ অধিকতর প্রশস্ত হবে। মুসলমানি বাংলা এবং মুসলমানি উর্দুর সমবায় গঠিত হবে Common Script... মাশরেকি এবং মাগরেবি পাকিস্তানের জ্বানি সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান এই পথে।'

মীজানুর রহমানের মতে—তৎকালীন 'পাকিস্তানের সবচেয়ে সমুল্লত ভাষা (হলো) উর্দু এবং বাংলা। অন্য কোন প্রাদেশিক ভাষা বাংলার ন্যায় এতটা বিকশিত নহে।... পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার নাম পাকিস্তানি রাখা হলে মাশরেকি ও মাগরেবি পাকিস্তানের ভাষাগত সমন্বয়ের পথ সহজ ও কোশাদা হবে। পাকিস্তানি কথাটায় পাকিস্তানের বাসেন্দাগণের প্রাণে যতটা অনুপ্রেরণার সঞ্চার করবে অন্য কোন নামে তাহা সম্ভবপর নহে। অনুপ্রেরণার কথাটা বিশেষভাবে কাবেলে কদর।' পাকিস্তানি বাংলা ও পাকিস্তানি উর্দু স্বাভাবিক ভাবেই চলবে ইসলামী তাহজিব-তমদুনের পথে। ভারতীয়-উর্দু এবং পশ্চিম বাংলার বাংলা ভাষা চলবে অন্যপথে। দুই বিভিন্নমুখী ভাষার এক নাম অসংগত নহে কি? এই দিক দিয়ে বিবেচনা করলেও পাকিস্তানি বাংলা ও পাকিস্তানি উর্দুর নাম পরিবর্তনের আবশ্যিকতা অনুভূত হবে।<sup>১০</sup>

মাহেণ্ডর ভাষা-চিন্তা থেকে সাহিত্য-শিল্পের রূপকল্পনার স্বরূপ উপলব্ধি করা যায়। পাকিস্তানের মন্ত্রী, সাহিত্যিক চিন্তাবিদ, মুহম্মদ হাবীবুল্লাহ বাহার 'উস্তরাধিকার' শীর্ষক প্রবন্ধে বলেন :

দেশবিভাগের ফলে সংস্কৃতিক্ষেত্রে যে সমস্ত প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, পাকিস্তানের সংস্কৃতি-জিহ্বাসা তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের সংস্কৃতির রূপ কি হবে এনিয়ে বহু আলোচনার অবকাশ রয়েছে।...এই প্রসঙ্গে আমাদের ভেবে দেখা দরকার এই নতুন রাষ্ট্রের কী ঐতিহ্য, কী এর

সাংস্কৃতিক ভিত্তি, তমদ্দুনিক বুনয়াদ। পাকিস্তান রাষ্ট্রের ঐতিহ্যের কথা বলতে গিয়ে প্রথমেই আজ মনে পড়ছে আমরা মুসলিম, আমরা ছিলাম ভারতীয়, বাঙালি, আজ আমরা পাকিস্তানি। পূর্ব পাকিস্তানের নাগরিক বলতে আমাদের দ্বিধা নেই—আমরা মুসলিম তমদ্দুনের মানস সন্তান—ভারতীয় বিশেষ করে বাঙালি সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী।

বাংলার মুসলামানের বিশিষ্ট ঐতিহ্যের সঙ্গে আরবের সাদৃশ্য কল্পনা করে তিনি আরো বলেন : ‘আমাদের দেশ নদীমাতৃক, সমুদ্র বিধৌত। আমাদের সভ্যতাও আরব সভ্যতারই মত সাগরমুখী। পূর্ব বাঙ্গালার দুঃসাহসী মুসলমান সব সময়ই শোনে-সাগরের ডাক।’<sup>১১</sup>

আবুল কালাম শামসুদ্দীন প্রাক-পাকিস্তান আমলের শিল্প-সাহিত্য ধারার পরিবর্তনকে অবশ্যজ্ঞাবী বলে মন্তব্য করেছেন। কারণ পাকিস্তান তাঁর মতে কেবল রাজনৈতিক আন্দোলনই ছিল না। ‘এদেশে জনসাধারণের চিন্তাধারার একটা বিপ্লবাত্মক পরিবর্তনও এর মূলে ক্রিয়ামূলক হয়েছিল।...এদেশের মানুষের চিন্তারাজ্যের বিপ্লবই মূলতঃ রাজনৈতিক রূপায়ণকে বাস্তব করে তুলেছে।’ নতুন প্রজন্মের সাহিত্যিকদের প্রতি তাঁর আহ্বান : ‘এদেশের মানুষের জীবনের গভীরে প্রবেশ করে...রচনার উপাদান সংগ্রহ করতে হবে...বিদেশি সাহিত্যের কোনো চরিত্রকে শুধু নাম বদলিয়ে পাকিস্তানি চরিত্র বলে চালাবার চেষ্টা এখানে আর চলবে না। বিজাতীয় ভাবধারা, বিজাতীয় উপমা রূপক শব্দ কোন কিছুই আর নতুন পোষাক পরে পাকিস্তানি সাহিত্যে চালু হতে পারে না।—এই উপলব্ধির ভিত্তিতে যে সত্যকার পাকিস্তানি সাহিত্য জন্ম নেবে তারই আয়োজনে আমাদের সাহিত্যিকগণ নিয়োজিত আছেন, তাতে আমার সন্দেহ নেই।’<sup>১২</sup>

আবদুল ওয়াজেদ ‘সাহিত্যে পাকিস্তান’ শীর্ষক প্রবন্ধে বিভাগ পূর্বকালীন স্বাতন্ত্র্যবাদী মুসলমান লেখকদের সুরে সুর মিলিয়ে বলেন : হিন্দু লেখকদের রচনায় মুসলমানদের জীবনচিত্র নেই। যাও আছে, তা হীনভাবে অঙ্কিত। অতএব অখণ্ড বাংলা সাহিত্য মুসলমানদের আরাধ্য হতে পারে না। ‘এতকাল পরে পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীরা তাদের আত্মবিশ্বাসকে ফিরে পেয়েছে। এখন এমন করে তারা তাদের নিজেদের সাহিত্য গড়তে চায়, যাতে পাকিস্তানবাসী অন্যান্য জাতির সভ্যতার ও কৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম তমদ্দুনের সম্যক বিকাশ হবে। মুসলমান যে একটি প্রগতিশীল জাতি—যার অতীত গৌরব কোন ঐতিহ্য অপেক্ষা নিকট নয়, আজ আজাদ পাকিস্তানের সাহিত্যিককে তা জগতের সামনে তুলে ধরতে হবে। আজ সাহিত্য, ইতিহাস, কলা, দর্শন, রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি সব বিষয়েই জাগাতে হবে নতুন অনুসন্ধান-স্পৃহা। আবার গড়তে হবে জাগরণের তাজমহল। আমরা যেন আর অনুন্নত বা কৃপাপ্রার্থী জাতিরূপে অপরের মুখাপেক্ষী হয়ে না থাকি।’<sup>১৩</sup>

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী ‘নয়া জিন্দেগী’ শীর্ষক প্রবন্ধে আমাদের নতুন... জীবনে... প্রাণধর্মকে আবার নতুন করে ফিরে পেতে ইসলাম ধর্মের অনুসরণে খাঁটি মুসলিম রূপে প্রতিষ্ঠার পরামর্শ দেন। কারণ, ‘ইসলাম...নৈসর্গিক বিকাশের এক মহান সম্ভাবনা। আমাদের নয়া-জিন্দেগীর অর্থই হলো এই সম্ভাবনাকে ভিতরে-বাহিরে-অন্তরে-আচরণে সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করা।’<sup>১৪</sup>

ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন... মুসলিম জীবন ও ইসলামিক সভ্যতার ছাপ বাংলা সাহিত্যে আশানুরূপ হয়নি বলে 'বর্তমানে বিভক্ত বাংলায় তা আশা' করেছেন। 'বাস্তবদর্শী নবীন স্রষ্টারা নতুন নতুন ঐশ্বর্যে ভাষার ভাণ্ডার পূর্ণ করবেন। এর লক্ষণ চারদিকের আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হচ্ছে।'<sup>১৫</sup>

সৈয়দ আলী আহসান পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে বলেন : 'এই নবলঙ্ক আজাদীর পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের সাহিত্য কিরূপ নেবে?... ভবিষ্যত সাহিত্য কি হবে? দেশভাগের আগে অনুষ্ঠিত বিতর্কে, আলাপ-আলোচনায় স্পষ্ট হয়েছিল যে, পরিবর্তিত পটভূমিতে আমরা পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নতুন সাহিত্য চাই।' তবে তিনি অবিভাজ্য বাংলা সাহিত্যের উত্তরাধিকার বহু কষ্টে স্বীকার করলেও বলেন :

কলকাতা কেন্দ্রিক সাহিত্য আমাদের নিজেদের হতে পারেনি, তার উপাদানে আমাদের মনের সত্য ধরা পড়েনি। অনেক আগে থেকেই এই সাহিত্য পূর্ব বাংলার প্রভাত, মধ্যাহ্ন ও তারকাখচিত আকাশের কথা বলেনি...(তাই) পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যের ধারা সম্পূর্ণ বাংলার সাহিত্যের ধারা হতে হবে ভিন্ন।<sup>১৬</sup>

পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যের আদর্শ সংক্রান্ত সৈয়দ আলী আহসানের বহুলালোচিত 'পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা সাহিত্যের ধারা' শীর্ষক ঐতিহাসিক প্রবন্ধটি ছাপা হয় মাহেনও এর তৃতীয় বর্ষ, পঞ্চম... আগস্ট ১৯৫১ (ভাদ্র ১৩৫৮) সংখ্যায়। উপর্যুক্ত প্রবন্ধে তিনি বলেন : একই ভাষাভাষি জনগণকে দুই অংশে বিছিন্ন করে দেখলে কেমন দেখায়, তা কেউ কখনো করেনি। অথচ আজ চিরকালের জন্য আলাদা... হবার পর সাহিত্য ক্ষেত্রেও... ভিন্ন গোত্রীয় বলে ভাবতে হচ্ছে। ...এখন সমস্যা হয়েছে সাহিত্যে পাকিস্তানি অনুভূতি কতটা জাগ্রত, সত্য ও জীবন্ত করা যায়।

তিনি বলেন, একটা কথা স্বীকার করেই আমাদের নবতম সাহিত্য সাধনায় নামতে হবে, তা হচ্ছে এই, পাকিস্তান একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রাষ্ট্র।... আদর্শের দিক থেকে এদের মধ্যে কোনো সমন্বয় থাকা বাঞ্ছনীয় বলে মনে হচ্ছে না। অনেকে এভাবেও চিন্তা করছেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের ভাষাকে পশ্চিমবঙ্গের ভাষা থেকে আলাদা করে ফেলতে হবে।... একমাত্র ভাষাগত ঐক্যের কারণেই পশ্চিমবঙ্গকে বিদেশ বলে মনে হয় না।... প্রথমে পার্থক্য ও ব্যবধানকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে পরে ঐক্যতত্ত্বের অন্বেষণ করতে হবে। যদি প্রথমেই ঐক্যতত্ত্বের অন্বেষণ করি, তবে রাজনৈতিক অনুভূতিতে বিশৃঙ্খলা আসতে বাধ্য।... পাকিস্তান হবার পর ইসলামের ইতিহাস শুধু উপাদান আনেনি, নতুন পথের নির্দেশও দিয়েছে। রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে যেমন ইসলামের আদর্শকে আমরা আমাদের জন্য পথনির্দেশক করেছি, তেমনি তমদ্দুন, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের ক্ষেত্রেও নতুন আশার সঞ্চয়ের জন্য- ইসলামের দ্বারস্থ হয়েছি।

পাকিস্তানবাদী সাহিত্যের আদর্শ উদ্দেশ্য ও সিদ্ধি সম্পর্কে ত্রিশ ও চল্লিশ এবং পঞ্চাশ এর দশকের মুসলিম-সাহিত্য চর্চার ধারা আলোচনা করে তিনি 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' বা 'শিখা-গৌরী'র ভূমিকা সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করে বলেন, উর্দু কবি হাফিজ জালালুরী 'শাহানামা-ই-ইসলাম' পাকিস্তানি বাংলা সাহিত্যের পথ প্রদর্শক হতে পারে। দেশ বিভাগের পূর্বে মুসলমান লেখকেরা হিন্দু-ভাবধারায় দীক্ষিত ছিলেন।

এই দীক্ষার চরম নিদর্শন মেলে ঢাকার মুসলমান (মুসলিম?) সাহিত্য সমাজের তথাকথিত মুক্তবুদ্ধির আন্দোলনে। ইসলামী নীতিবোধকে লাঞ্চিত করে যে মুক্তবুদ্ধির প্রতিষ্ঠা তা বিকৃত মানসের সৃষ্টি, তাতে নতুনত্বের উদ্ভাঙ্গনা আছে; কিন্তু স্থির বিবেচনার প্রশান্তি নেই। এই মুক্তবুদ্ধির আন্দোলনকে বাঙলার মুসলমান কখনও স্বীকার করে নেয়নি। কেননা তাদের ধারণায় এ আন্দোলন প্রকৃত প্রস্তাবে বুদ্ধিকে শিথিল করেছে এবং সাহিত্য ক্ষেত্রে জীবনবোধকে অস্বীকার করেছে। সত্যিকার ভাবে পূর্ব পাকিস্তানের জীবন, পরিবেশ ও ভাবধারাকে সাহিত্যে রূপ দেবার প্রথম প্রয়াস দেখা যায় 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ' স্থাপনের সময় (১৯৫৩)।... স্পষ্টভাবে সাহিত্যে ইসলামি আদর্শের বিকাশের আরম্ভ এই সময় থেকেই।... কাব্য ও সাহিত্যক্ষেত্রে ব্যক্তিগত দক্ষতা যে বড় কথা নয়, বরঞ্চ বড় কথা হল একটা ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার—এ বিশ্বাস এখন অধিকাংশ পাকিস্তানি সাহিত্যিকদের হয়েছে। হযত অনেকে ভুলে যাচ্ছেন যে, উত্তরাধিকারের সঙ্গে প্রতিভার সংমিশ্রণ থাকা দরকার; কিন্তু এই ভুলে যাওয়াটা সাময়িক। আজকের দিনে পরিবর্তিত পটভূমিকায় জীবন যখন নতুন করে শুরু করলাম তখন সাহিত্যের চিরন্তন আদর্শের কথা কিছুদিনের জন্য ভুলে থাকাই বরঞ্চ মঙ্গলের।

সৈয়দ আলী আহসানের মতে পশ্চিম বঙ্গের সামনে তো কোন সমস্যাই নেই। তাঁদেরই চেষ্টায় যে সাহিত্য... সেই সাহিত্য তাঁদেরই রয়েছে। সেই সাহিত্যের প্রাক্তন ধারাই আজও অব্যাহত। সম্পূর্ণ বাংলা যদি তাঁদের হাতছাড়া হতো, আর উড়িষ্যার মাটিতে যদি তাঁদের বসতি স্থাপন করতে হতো, তবে তাঁদের সাহিত্য কিরূপ নিতো তা কল্পনা করে দেখা যেতে পারে। আধুনিক বাংলা সাহিত্য হচ্ছে কলকাতা কেন্দ্রিক।... বিভাগের পর—কলকাতা—কেন্দ্রিক সাহিত্যও আমাদের জন্য অর্থহীন হয়েছে।... পাঠ করবো... উপভোগ করবো... কিন্তু তাকে কখনও আমাদের সাহিত্য বলব না। এটা কোনও গুরুতর সমস্যা নয়। ইংলণ্ডের সাহিত্য যে অর্থে আমাদের সাহিত্য নয়, পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যও অবিকল সেই অর্থেই আমাদের সাহিত্য হবে না।... এক ভাষায় লেখা হলেই সমস্ত কিছু এক হয়ে যায় না। ভাব-সম্পদ ও জীবনের মূল্য নিরূপণের দিক সম্পূর্ণ আলাদাই থাকে।

মনে রাখতে হবে যে, পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিলো স্বাতন্ত্র্যবোধের উপর ভিত্তি করে। এই স্বাতন্ত্র্যবোধের পরিচয় মিলবে আমাদের সাহিত্যে ও কাব্যে। সুতরাং প্রাক্তন বঙ্গের দুই অংশের মধ্যে সম্পৃক্তগত এক আসতে পারে না—শুধুমাত্র সম্পৃক্তগত বোঝাপড়া হলেও হতে পারে। আমরা আদর্শের ক্ষেত্রে মিলিত হতে চাইনে, কিন্তু একে অন্যের সঙ্গে পরিচিত হতে চাই।

বাংলা ভাষায় আরবি-ফার্সি শব্দের বহুল প্রয়োগ সম্পর্কে তিনি বলেন ঠিকই আছে, এমন কিছু খারাপ বা পরিচিত গতির বিরুদ্ধে কিছু ঘটছে না। প্রাক্তন উভয় বাংলার সাহিত্যের ভাণ্ডারে সকলেরই সমান অধিকার আছে, 'কিন্তু এই অধিকার থাকার অর্থ এই নয় যে, সেই সাহিত্যের ট্রাডিশনও আমরা গ্রহণ করবো। নতুন রাষ্ট্রের স্থিতির প্রয়োজনে আমরা আমাদের সাহিত্যে নতুন জীবন ও ভাবধারার প্রকাশ খুঁজবো। সে সংগে এটাও সত্য যে, আমাদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখবার এবং হয়তোবা জাতীয় সংহতির জন্য যদি প্রয়োজন হয়, আমরা রবীন্দ্রনাথকেও অস্বীকার করতে প্রস্তুত রয়েছি।'

'সাহিত্যের চাইতে রাষ্ট্রীয় সংহতির প্রয়োজন আমাদের বেশি। শিল্প আজ আমাদের কাছে তদ্ভবেতু। নিছক সাহিত্য-বিলাস খুব কম লোকই এখন করছে।... বর্তমান পরিবেশ ও রাষ্ট্রীয় অনুভূতিকে ভুলে যেয়ে আমাদের পক্ষে সাহিত্য-চর্চা করা সম্ভবপর নয়। দুনিয়ার কোনো মহৎ সাহিত্যই শুধুমাত্র সৌন্দর্যসৃষ্টি করেই ক্ষান্ত হয় না।'<sup>১৭</sup>

আবুজাফর শামসুদ্দীনও এই ধরনের কথাই বলেছিলেন : ‘পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যের ভূমিকা হবে এত দিন প্রচলিত কলকাতা কেন্দ্রিক ভাষা ও সাহিত্য থেকে ভিন্ন’।<sup>১৮</sup>

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন মিছিলে গুলি চালনার আদেশদানকারী মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীনের ৩রা মার্চ ১৯৫২ সনের বেতার-ভাষণ প্রকাশ করায় মাহেনও এর দৃষ্টিভঙ্গি বোঝা যায়। নূরুল আমীন তাঁর বক্তৃতায় ভাষা আন্দোলন বা একুশে ফেব্রুয়ারি আন্দোলনকে ‘কম্যুনিষ্ট বিদেশী চরদের... ধ্বংসাত্মক চক্রান্ত’ বলে অভিহিত করেছিলেন।<sup>১৯</sup>

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের ‘বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস’ প্রণয়নের জন্য গঠিত কমিটিকে ‘জাতীয় ও সামাজিক জীবনের নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে’ ইতিহাস রচনার গুরুদায়িত্ব পালনের জন্য মাহেনও—এর পক্ষ থেকে অনুরোধ করা হয়।<sup>২০</sup> ইসলামী ভাবধারায় পুষ্ট পাকিস্তানের ‘নতুন সাহিত্য’ সৃষ্টির পরামর্শ আছে মাহেনও এর প্রায় সকল লেখকের রচনায়।<sup>২১</sup> তবে কোনো-কোনো লেখক যে তখনকার সাহিত্য পরিস্থিতিতে সত্যকথাও উচ্চারণ করেননি, তা নয়। সিদ্দিক আহমদ খান ‘আজকের সাহিত্য’ শীর্ষক প্রবন্ধে বাংলাদেশের সাহিত্যের দৈন্য তুলে ধরে বলেন, আমাদের সাহিত্যে এমন কোনো বিশেষ স্ফূরণ ঘটেনি—যা দিয়ে নতুনত্বের কিছুটা গর্ব করা যায়। সাহিত্যিকরা কেবল যেন অভ্যাসবশত লিখে চলেছেন, যাতে উন্নত সাহিত্য সৃষ্টির কোনোও সম্ভাবনা নেই।

স্বাধীনতা পরবর্তী সাহিত্যপত্রিকা এবং অজস্র সাহিত্যের প্রসূণকে ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড হিসেবে চিহ্নিত করে বলা হয়, যে সাহিত্য জাতির মান নির্ণয় করে, এখন সেটা ব্যবসায়ের মানও ঠিক করছে... তাই সাহিত্য ভরে উঠেছে দুর্নীতিতে। উদ্দেশ্য সিদ্ধির অনুকূলে তাঁরা এমন সব সাহিত্যের পরিবেশন করছেন যা সাহিত্যতো নয়ই বরং নিজেদের দৈন্যের নগ্নরূপ। প্রতিভাধরের সাধনায় এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে, স্থায়ী সাহিত্য সৃষ্টি হবে। তাঁর একটি সঙ্গত প্রশ্ন—ব্যবসায়িক কারণে কষ্টকল্পিত লেখা কিভাবে স্থায়ী হতে পারে? <sup>২২</sup> এই প্রশ্নবাণ তৎকালের সাহিত্য পরিস্থিতি দেখে হতাশ একজন সমালোচকের। শিশু সাহিত্য নিয়ে যারা লিখেছেন, তাঁদেরও প্রত্যাশা ছিল—‘নিষ্কলুষ আনন্দ’ জোগাতে পারে, এমন সাহিত্য সৃষ্টির জন্য দেশের সাহিত্যিকেরা কাজে অবতীর্ণ হবেন।<sup>২৩</sup> সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন লেখক গোষ্ঠীর মূল বক্তব্য প্রকাশ পেয়েছে ‘আমাদের হুঁশিয়ারী’ শীর্ষক মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর প্রবন্ধে : ‘পাকিস্তানের সংরক্ষণ ও সংগঠনের’ কাজ চলাকালীন সময়ে ‘ইসলাম’কে রক্ষার জন্য পাকিস্তানিদের সর্বাত্মকভাবে (পাক-ভারত উপমহাদেশে) ব্রাহ্মণ্যবাদের মোকাবিলা করার জন্য শক্তি অর্জন করতে হবে।<sup>২৪</sup>

পাকিস্তানের সরকারি পত্রিকা হিসেবে সকল বিষয়ে মতামত জ্ঞাপনের দায়িত্ব মাহেনও পালন করেছিল। শিক্ষা, অর্থনীতি, নাচ গান, শিল্প সাহিত্য, কলা বিজ্ঞান দর্শন—ইতিহাস সকল ব্যাপারেই নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী মাহেনও তার তার বক্তব্য উপস্থাপন করেছে। পত্রিকাটির প্রভাব প্রচারগুণে সমাজে ব্যাপক হয়েছিল।

‘পূর্ব পাকিস্তানের মাধ্যমিক শিক্ষা সমস্যা’ শীর্ষক একটি প্রবন্ধের বক্তব্য ছিল,

বর্তমানে পাকিস্তানের অধিবাসী এবং শিক্ষার্থীরা...অন্তত...৮৫ জন মুসলিম।...সম্ভবত এক তৃতীয়াংশ মাদ্রাসায় ও অবশিষ্ট দুই তৃতীয়াংশ ইংরেজি স্কুলে শিক্ষা পায়। একদিকে মাদ্রাসার শিক্ষায় ছাত্রদের অধিকাংশই বর্তমানে দুনিয়ার পক্ষে কতকটা Misfit হইয়া গড়িয়া উঠে। আবার ইংরেজি স্কুলগুলিতে ধর্মীয় শিক্ষার অভাব।...এই ২/৩ অংশ ছাত্র ও যুবক নিজেদের তাহজীব-তমদুন ভুলিয়া এক অমুসলমানি মনোভাব গড়িয়া তুলে।...এই দুই বিপরীতমুখী প্রভাব হইতে আমাদের ভবিষ্যত বংশধরদিগকে রক্ষা করিতে হইবে সকল শ্রেণীর ছাত্রদিগকে সমবেতভাবে একই ধরনের স্কুলে অন্তত কিছু কাল যাবত শিক্ষা দিতে হইবে। এই শিক্ষা ম্যাট্রিকুলেশন পর্যন্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়।...অন্যান্য প্রগতিশীল রাষ্ট্রগুলির ন্যায় এই সকল শিক্ষার পরিকল্পনা বিষয়ে সরকার ও শিক্ষায়তনগুলির মধ্যে নিবিড় সহযোগিতা রাখিতে হইবে।<sup>২৫</sup>

‘শিক্ষার সংস্কার’ বিষয়ে লিখিত এক প্রবন্ধে দেশের প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মহান আদর্শ সম্পর্কে বেশ গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ রেখেছিলেন ‘মাহেনও’ এর লেখক আবদুর রহমান। তিনি শিশু, বয়স্ক লোক, নারী—সকলের জন্যই পাকিস্তানের উপযুক্ত নাগরিক হবার মতো শিক্ষাদানের জন্য গৃহে, মসজিদে, মাদ্রাসায়, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এবং স্কুল-কলেজে শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করার কথা বলেন। তবে শিক্ষার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের মাধ্যম সম্পর্কে বলেন তা হবে মাতৃভাষায়। ‘মাধ্যমিক শিক্ষায় ইংরেজীর স্থান রাখতে হবে; এবং উচ্চ-শিক্ষায় ইংরেজি ও মাতৃভাষা উভয়কে কিছুকালের জন্য শিক্ষার বাহন করতে হবে।’ প্রসঙ্গত তিনি রোমান অক্ষরে বাংলা লিখে সরলীকরণের পরামর্শও দিয়েছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে সমালোচনা করে লেখক বলেন :

বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণেও পরিবর্তন আবশ্যিক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আরম্ভ হয়েছিল Teaching University রূপে, এবং অল্পদিনের মধ্যে নামও করেছিল বেশ। কিন্তু আস্তে আস্তে এর ভেতর রাজনীতি ঢুকে যায়; ফলে বড় বড় অধ্যাপকেরও মন বিক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। ক্ষমতার এমনি মাদকতা যে একবার এর আশ্বাদন পেলে যাকে শিক্ষাম পুরুষ বলে মনে হয় সেও প্রলুব্ধ হয়ে উঠে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের শাসন ক্ষমতা থেকে সম্পূর্ণ নিলিপ্ত রাখতে হবে, তবেই তাঁদের পূর্ণ বিকাশের সুযোগ দেওয়া হবে। দেশের নতুন পরিস্থিতিতে (১৯৪৯) বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা আরো জটিল হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৌলিক প্রকৃতি অক্ষুণ্ণ রাখলে তার থেকে যা আশা করা যেত, এখন তা হয়ত আকাশ কুসুম হবে। আমার মনে হয়, এখনো তার পূর্ববস্থা ফিরিয়ে দেওয়া উচিত আর তার উপর যে নতুন ভার চাপানো হয়েছে তার জন্য রাজশাহী ও চট্টগ্রামে দুটো affiliating University স্থাপন করা উচিত।

এছাড়া বিজ্ঞানচর্চার জন্য দুই পাকিস্তানে দুইটি বিজ্ঞান গবেষণাগার প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবও করা হয়। ছাত্রদের মজ্জাগত নকল-প্রবণতা দূরীকরণের ব্যবস্থাও গ্রহণ করা উচিত বলে তিনি মন্তব্য করেন।<sup>২৬</sup>

জমিদারি প্রথার সামাজিক ব্যাধি কৃষক আন্দোলনের চাপে দূরীকরণের পদক্ষেপ নেয়া হলেও মাহেনও কিন্তু ব্যবস্থার রহিতকরণের উদ্যোগকে সমর্থন করেছিল। সরকারি ব্যবস্থাকে স্বীকৃতি না-দিয়েও অবশ্য তাঁদের উপায় ছিল না। তবু ‘চিরস্থায়ী ব্যবস্থার গোর দেওয়া হয়েছে’ বলে তাঁরা সম্পাদকীয় লিখেছিলেন।

মাহেনও আশা প্রকাশ করে : ‘পূর্ব পাকের কৃষক সমাজে আবার দেখা দেউক প্রাচুর্য্য, আর সম্পদ ও গৌরব বাড়ুক সমগ্র রাষ্ট্রের।’<sup>২৭</sup>

পাকিস্তানের 'নূতন অবস্থায় ইতিহাস' নতুন করে প্রণয়ন করতে হবে বলেও এই পত্রিকার প্রধান লেখকেরা মতামত ব্যক্ত করেছিলেন। সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন বলেন : পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তামাদ্দুনিক জীবনকে নতুন ভাবে গড়ে তোলার সমস্যা হচ্ছে পাকিস্তান-উত্তর নতুন সামাজিক সমস্যাবলির অন্যতম সমস্যা। তাঁর মতে 'পাকিস্তান' প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য হলো : 'একটা বিশিষ্ট জীবনাদর্শ, একটা বিশিষ্ট তমদ্দুনকে বাঁচিয়ে তোলা।'

তাই পাকিস্তান সৃষ্টির পর 'আমাদের জীবনের প্রত্যেকটি সমস্যাকেই নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে হচ্ছে এবং তার নতুন সমাধানও আবিষ্কার করা আবশ্যিক হয়ে পড়েছে।' কারণ 'অবিভক্ত ভারতে আমরা যে দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে জীবনকে দেখেছি এবং বিচার করেছি পাকিস্তানের নূতন পরিপ্রেক্ষিতে তার মূল্য কিছুই নেই; কারণ তখন আমাদের নিজস্ব জাতীয় অস্তিত্ব বলে কোন অস্তিত্ব ছিলনা এবং জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কোন কিছু বিবেচনা করবার প্রয়োজন তখন ঘটেনি। সে প্রয়োজন যদিও আমরা কখনও অনুভব করতাম প্রকাশ্যে সে-কথা স্বীকার করবার এবং তামাদ্দুনিক জীবনে সেই অনুভূতিকে রূপায়িত করবার সুযোগের অভাব ছিল। আজ রহমানুর রহীমের অনুগ্রহে সে অবস্থা আমাদের নেই। তাই আমাদের সবকিছু সম্বন্ধেই নতুন করে ভাবতে হচ্ছে।'

তামাদ্দুনিক সমস্যার দিক থেকে

বড় দায়িত্ব হচ্ছে ইতিহাস পুনর্লিখনের সমস্যা। অবিভক্ত ভারতে আমাদের যেমন জাতীয় জীবন বলে কিছু ছিল না তেমনি জাতীয় ইতিহাসও আমাদের ছিল না। বরং বহুক্ষেত্রে আমরা ভারতের অখণ্ডে আঘাত লাগবে বলে নিজেদের ইতিহাসের বহু ঘটনাকে বিকৃত করেছি বা করতে বাধ্য হয়েছি।

অতএব পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এখন এবং ভবিষ্যতে আর সেভাবে যে 'ইতিহাস পড়া চলবে না, তা বলাই বাহুল্য। ভবিষ্যতে পাকিস্তানি অথবা আরও পরিষ্কার ভাবে মুসলমান হিসাবে আমাদের ইতিহাস বিচার করতে হবে।

'ইতিহাস কি?' এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন : ইতিহাস অর্থ অতীতের ঘটনার তালিকা নয়, অতীতের ঘটনার অর্থপূর্ণ ব্যাখ্যা। অতীতের যে ঘটনার সঙ্গে বর্তমানের কোন যোগ নেই—যার কোন অর্থ নেই—সে ইতিহাস নয়। পৃথিবীর সর্ব প্রাচীন ঐতিহাসিক গ্রীক হিরোডোটাস যখন ইতিহাস লেখেন তিনিও ইতিহাসকে এভাবেই বিচার করে গেছেন, খ্রিস্টিয় ডিউসেরও এর ব্যতিক্রম নন। গিবনের রোমক সাম্রাজ্যের ইতিহাসে তথ্যের দিক থেকে বহু ত্রুটি আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু তবু তার মূল্য কমেনি; কারণ গিবন রোমান ইতিহাসকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করে গেছেন এবং সে ব্যাখ্যার মূল্য রয়েছে।

এই পটভূমিকায় পাকিস্তানের ইতিহাস—বেস্তার প্রধানতম কর্তব্য হবে ইসলামের পরিপ্রেক্ষিতে পাক—ভারত উপমহাদেশের ইতিহাস—রচনা। অবিভক্ত ভারতে আমরা 'ভারতীয়' হবার ব্যর্থ চেষ্টায় প্রাক-ইসলামিক যুগের বহু অনিশ্চিত তথ্যকে ইতিহাসের মর্যাদা দিয়েছি। আমাদের পাঠ্য-পুস্তকে হর্ষবর্দ্ধন, চন্দ্রগুপ্ত অথবা অশোককে যে স্থান দেওয়া হয় সে স্থান সত্যিকার ঐতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে তাঁদের বিচার করলে তাঁরা হয়ত পাবেন না।

তাছাড়া প্রাক-ইসলামিক যুগে তাঁদের স্থান যাই হোক, পাকিস্তানের পাঠ্য পুস্তকে সে স্থান তাঁরা পেতেই পারেন না। তারপর মুসলমান যুগের বহু ঘটনা সম্পর্কেও আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি আমূল পরিবর্তন করতে হবে।

প্রসঙ্গত লেখক আকবর এবং আওরঙ্গজীবের উল্লেখ করে বলেন : আকবর ইসলামকে ভারতের বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলবার চেষ্টা করেছেন যথাসাধ্য ; আর আওরঙ্গজীব ইসলামকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য সংগ্রাম করেছেন আজীবন। অথচ নিরপেক্ষতার দোহাই দিয়ে এ যাবৎ আকবরকেই আওরঙ্গজীবের উপর স্থান দেওয়া হয়েছে। মুসলমান ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে যে এ নিরপেক্ষতা সর্বনাশকর তা বোধ হয় না বললেও চলে। এরকমের উদাহরণ পাক-ভারত উপমহাদেশের ইতিহাসে আরও অনেক মিলবে।

ইতিহাসের বিভ্রান্তি প্রসঙ্গে লেখক ডক্টর সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন বলেন : এযাবৎ ভারতীয় মুসলমানদের ইতিহাসকে এসলামের সাধারণ ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখে আসছি। তার ফল হয়েছে এই যে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী হয়ে গেছে সংকীর্ণ এবং ভৌগোলিক জাতীয়তার মাপকাঠিতে ইউরোপীয় আদর্শে আমরা ইতিহাসের সমস্ত ঘটনাকে বিচার করতে শিখেছি। আরব, মিশর, ফেলিস্তিন, ইরান প্রভৃতি দেশের ইতিহাসকে আমাদের আলাদাভাবে দেখতে হচ্ছে এবং এসমস্ত দেশে মুসলমান বাস করে একথা আমরা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করি বললে অতিশয়োক্তি করা হবে।... আরও মারাত্মক পরিণাম হচ্ছে... মধ্যযুগীয় এসলামের সমস্ত ইতিহাস আমরা ভুলতে বসেছি এবং সভ্যতায় ইউরোপের দান সম্পর্কে আমাদের মনে অনেক অতিরঞ্জিত ধারণা দানা বেঁধেছে। ইউরোপীয় কায়দায় আমরা মধ্য-অন্ধকার যুগ আখ্যা দিচ্ছি অথচ একথা কখনও আমাদের স্মরণ হয় না যে ইউরোপের পক্ষে যেটা অন্ধকার যুগ এসলামের ইতিহাসে অর্থাৎ এশিয়ার ইতিহাসে সেটা সবচেয়ে আলোকময় যুগ। সে যুগে সভ্যতার কেন্দ্র ছিল এশিয়ায় ইউরোপে নয়। এধরনের ভুল ত্রুটি আমাদের ইতিহাসে রয়েছে প্রচুর।

তাই “পাকিস্তানি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যখন আমরা ইতিহাস লিখতে বসব তখন এ সমস্ত ভুল-ত্রুটি সংশোধন করাই হবে আমাদের প্রধান কাজ।”<sup>২৮</sup>

মাহেনও এর পাতায় কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থনীতি, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের পর্যালোচনা করা হতো, কখনো প্রবন্ধে, কখনো সম্পাদকীয় নিবন্ধে। কিন্তু এই সমস্ত আলোচনায় পূর্ববঙ্গের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির প্রশ্নে পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গির কঠোর সমালোচনা অথবা পূর্ব বঙ্গের জনসাধারণের জাগৃতির লক্ষ্যে অনুপ্রেরণা বা দিক নির্দেশমূলক বক্তব্য বা ভাষার ইঙ্গিত, কখনো দেয়া হয়নি। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর পূর্ববঙ্গের প্রতি অনৈতিক প্রবঞ্চনামূলক মনোভাব স্পষ্ট হলেও পত্রিকার আলোচনায় সেসবের কোন চিত্র প্রকটিত হয়নি ; বরঞ্চ পূর্ববঙ্গের স্বার্থকে আড়াল করে রাখার প্রচেষ্টা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

একটি আলোচনা লক্ষ্য করা যাক—তাতে পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নতির সঙ্গে তুলনা না করে সান্দ্রনামূলক ভাষায় বলা হয় :



সাড়ে চার বছর একটা জাতির বা দেশের জীবনে কিছুই নয়, কিন্তু এ-সময়ের মধ্যে পূর্ব বাংলা প্রগতির পথে যতখানি এগিয়ে গেছে তা নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। এ সময়ের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের যে উন্নয়ন হয়েছে তা বিচার করার সময় স্মরণ রাখতে হবে যে, যেসব জেলা নিয়ে এই প্রদেশ গঠিত সেগুলো অবিভক্ত বাঙলার সবচেয়ে অনুন্নত জেলা ছিল। দেশ বিভাগ যখন হলো, তখন শিল্প ও ব্যবসায়ের কেন্দ্রগুলো সবই অন্তর্ভুক্ত হলো পশ্চিমবঙ্গের, আর শুধু সেইসব জেলাই পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হলো যেগুলোর একমাত্র কাজ ছিল কাঁচামাল উৎপাদন করা। আজাদী লাভের অব্যবহিত পরে দুর্লভ্বনীয় বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়ে সরকার এই অনুন্নত প্রদেশের উন্নয়নের কাজে হাত দেন। কোনো কোনো মহলের ধারণা যে, এ প্রদেশের উন্নয়নের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার যথাযথ মনোযোগ দেননি। কিন্তু গত চার বছরের সরকারী কার্যক্রমের আলোচনা করলেই বোঝা যাবে যে এ ধারণা ভুল।

দুই প্রদেশের তুলনামূলক চিত্র উপস্থাপন করে ঐ আলোচনার উপসংহারে মন্তব্য করা হয় : এই পর্যালোচনা থেকে সহজে প্রতীয়মান হয় যে, পূর্ব পাকিস্তানের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার সর্বদাই যত্নশীল। একান্ত অনুন্নত অবস্থা থেকে এই প্রদেশ প্রগতির পথে যথেষ্ট অগ্রসর হয়েছে, একথা বিদেশি পর্যটকেরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে থাকে।<sup>৯২</sup>

উপর্যুক্ত রচনা প্রকাশের তিন বছর পর ১৯৫৪ র একটি সম্পাদকীয়তে একই ধরনের বক্তব্য ‘পাকিস্তানের বাজেট’ প্রসঙ্গে বলা হয় : পাকিস্তানের অর্থনীতিতে উন্নতি ও স্বয়ংসম্পূর্ণতা বাজেটে সহজেই চোখে পড়বে।<sup>৯৩</sup>

দেশরক্ষা খাতে পূর্ব পাকিস্তানকে অর্থবরাদ্দ করা হতো নামে মাত্র এবং নিরাপত্তাহীনতার জন্য এবং দেশরক্ষার কোন ব্যবস্থা নেই বলে ছয়দফা আন্দোলনের জের পাকিস্তানকে বিভক্ত করে দিলেও মাহেনও এর আলোচনার সুর ছিল এরূপ : এবারকার বাজেটে দেশরক্ষা খাতে মার্শারেকি পাকিস্তানের জন্য যে বিশেষ নজর দেয়া হয়েছে তজ্জন্য আমরা শুররিয়া আদায় করছি।<sup>৯৪</sup>

চট্টগ্রাম পূর্ববঙ্গের একটি অঙ্গ, তার ভৌগোলিক, বাণিজ্যিক ও রাষ্ট্রিক গুরুত্ব ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। অথচ সেই নগরীর উন্নয়নের জন্য বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে মাত্র ১১ লক্ষ টাকা। পাশাপাশি একই অর্থ বছরে পশ্চিম পাকিস্তানের একটি শহর বেলুচিস্তান এর জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ৩৭ লক্ষ টাকা। কিন্তু পূর্ব বাঙলা থেকে বাঙলা ভাষায় বাঙালিদের লেখা নিয়ে প্রকাশিত এই মাহেনও পত্রিকায় এই প্রসঙ্গে নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলা হয় :

আপাতত দৃষ্টিতে মনে হবে চট্টগ্রাম-বন্দরের আধুনিক গুরুত্বের অনুপাতে ব্যয়-বরাদ্দের পরিমাণটা যেন সঙ্গতি রক্ষা করে না। এসম্বন্ধে ‘উজীরে মালিয়াত’ (অর্থমন্ত্রী) যে বিবৃতি দিয়েছেন সেটা প্রশ্নাধনযোগ্য। চট্টগ্রাম বন্দরের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের পরিকল্পনা বিশেষজ্ঞ কর্তৃক এখনো চূড়ান্তভাবে তৈরি হয়নি। এমতাবস্থায় আন্দাজী অর্থবরাদ্দের কোনো মানে হয় না...গোলাম মোহাম্মদ সাহেব আশ্বাস দিয়াছেন যে, চট্টগ্রামের জন্য পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হলে তিনি আবশ্যকীয় অতিরিক্ত অর্থ মঞ্জুর করবেন। এতে বোঝাই যাচ্ছে যে চট্টগ্রাম বন্দরের গুরুত্ব সম্বন্ধে তিনি আদৌ উদাসীন নন।<sup>৯৫</sup>

দেশরক্ষা, শিক্ষা, উন্নয়ন সকল বিষয়ের বাজেট সমালোচনাতেই এই রকম দৃষ্টিভঙ্গি পরিস্ফুট।

পত্রিকার প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় স্বাধীনতা পরবর্তী পূর্ববঙ্গের সাহিত্য পরিস্থিতির বর্ণনাপূর্বক ‘মাহেনও’ এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছিল :

একটা প্রথম শ্রেণীর বাংলা মাসিক পত্রিকার আবশ্যিকতা বহুদিন হইতেই বিশেষভাবে অনুভূত হইতেছিল, পূর্ব পাকিস্তানে আজ দেড় বৎসর যাবৎ সময় ও কালোপযোগী বই, পুস্তক, খবরের কাগজ ও সাময়িক পত্রিকার অভাব অনেকটা দুর্ভিক্ষের আকার ধারণ করিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। নবলব্ধ আজাদীর সঙ্গে সঙ্গে যে নতুন ভাবধারার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা সুন্দর, সুষ্ঠু ও নিয়মিত ভাবে জনসাধারণের সামনে পেশ করিবার উদ্দেশ্য নিয়েই ‘মাহেনও’ এর জন্ম।...অবিভক্ত বাংলা, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত কয়েকটি নামকরা বাঙলা মাসিক পত্রিকার উপর নির্ভরশীল ছিল। দেশবিভাগের পর ঢাকায় রাজধানী স্থাপন করায় মাসিক পাকিস্তানবাসী সেই সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইল। তাছাড়া, পাকিস্তান এখন আলাদা রাষ্ট্র।

“হিন্দুস্থানের কলিকাতা নগরী হইতে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকাসমূহে পাকিস্তানি তার নিজের আদর্শের তাহজ্জিবের ও তামাদ্দুনের, কোন কিছুই সাফাৎ পায় না। অন্যদিকে আমাদের যেই এক আধখানা মাসিক পত্রিকা ছিল সেইগুলিও রোজ রোজ ক্ষীণ কলেবরে পরিণত হইয়া বিলীন হইল। তাই তীক্ষ্ণভাবে অনুভূত হইল একখানা মাসিক পত্রিকার আবশ্যিকতা। দেখা দিল সমস্যা। তারপর আল্লাহর রহমতে সমস্যার ফয়সালা করিয়াই আজ বাঙলার সাহিত্যিক ও পাঠকদের সামনে ‘মাহেনও’ লইয়া হাজির হইলাম। প্রচার বা কোন কিছুই মামুলি প্রোগাণ্ডা ইহার উদ্দেশ্য নহে। ইহার আদর্শ পাকিস্তানের তাহজ্জিব ও তামাদ্দুন। ইহার উদ্দেশ্য দেশের প্রবীণ সাহিত্যিকদিগকে কদর দেওয়া ও নয়া আজাদীর আবহাওয়া-পরিপুষ্ট নবীন লেখকলেখিকা সৃষ্টি করা। বিগত যুগের সাহিত্যিকদের আদর্শে আজাদীর রং ফলাইয়া অনাগত যুগের সাহিত্যিক জন্ম নিলেই আমরা আমাদের চেষ্টা সার্থক হইয়াছে বলিয়া মনে করিব। এই জন্যই ইস্তেকবাল জানাইতেছি প্রবীণ ও নবীন লেখক-লেখিকাদিগকে সমভাবে...তারপর মাসিকের ও মাগরেবি পাকিস্তানের মধ্যে বিরাত ব্যবধান দূরত্বের মাপকাঠিতে কিন্তু আদর্শ ও ভাববাহু্যে কোন ব্যবধান আছে বলিয়া আজ আর মনে করা যায়না। তাই একাশের চিন্তাধারা অপর অংশে পরিবেশন করিতে হইবে। ‘মাহেনও’-এর মারফতে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলে পশ্চিমাঞ্চলকে দেখিবে, বুঝিবে, আর খোদ বাংলা ‘মাহেনও’ পশ্চিমাঞ্চলের জোড়ে বসিয়া নিজের স্বত্তা বুঝাইয়া দিবে। কথাটা আরও একটু খোলসা করিয়া বলি। আমাদের বাংলা ‘মাহেনও’-এ প্রকাশিত মূল্যবান প্রবন্ধগুলি ইংরেজি ‘পাকিস্তান’ ও উর্দু ‘মাহেনও’ ও সিন্ধী ‘নই-জিদেগী’ তে তর্জমা করিয়া প্রকাশ কবিবার ব্যবস্থাও হইবে।...জনগণের সস্তাটাই আমাদের কাম্য ও লেখক-লেখিকাদের সহানুভূতিই আমাদের সম্পদ।”<sup>৩</sup>

‘মাহেনও’ পাকিস্তানের তাহজ্জিব-তমাদ্দুন গঠনে সহায়তা করার জন্য দীর্ঘ সংগ্রাম করে গেছে। কারণ, তাঁরা বুঝেছিলেন ‘সংস্কৃতি ও সাহিত্য জাতীয় বুনিয়াদ গঠনের আসল বুনিয়াদ’। সেই বুনিয়াদ রচনা করে পাকিস্তানকে সুখী ও সমৃদ্ধিশালী দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে এ-পত্রিকা দেশের প্রতিটি লেখক, শিল্পী, ভাবুক, চিন্তাশীল, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিককে দিয়ে লিখিয়েছেন। তাঁদের সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়নি। মাহেনও ছিল পূর্ব পাকিস্তানের একমাত্র পত্রিকা যার প্রচার সংখ্যা ছিল ‘অনতিক্রম্য’।

এই পত্রিকার আদর্শ বুঝে সকল লেখকই পাকিস্তানের তাহজ্জিব-তমাদ্দুন এবং রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের কথা স্মরণে রেখে গোটা পাকিস্তানি আমল জুড়ে সাহিত্যচর্চা করেছেন। রচনা মুদ্রণের লোভে এবং সম্মানীর প্রয়োজনে লেখকেরা ‘মাহেনও’-এর উপযুক্ত ঘোষিত আদর্শকে ব্যাহত না-করে বিষয় ও বক্তব্য নিয়ন্ত্রণ করতেন।

কবি শামসুর রাহমানের মতো অন্যতম প্রধান বাঙালি কবিও, ১৯৭১ সনের শেষ, যখন বাংলাদেশ স্বাধীন হবার মাহেস্ত-ক্ষণে উপনীত—কবিতা লিখেছেন মাহেনও এর জন্য ‘আজাদ পাকিস্তান/আমাদের ওয়াতান/ শান্তির দেশ সুন্দর এই পাকিস্তান।’ জুলাই ১৯৭১ সংখ্যায় প্রকাশিত তাঁর এই কবিতাটি মাহেনও-এর আদর্শ বাস্তবায়নের সাফল্য প্রমাণের জন্য নিম্নে

উল্লেখ করা হলো। শামসুর রাহমানের নিম্নোক্ত কবিতার সঙ্গে অপূর্ব মিল পাকিস্তানবাদী কবি, ফররুখ আহমদের ‘মাহেনও’-এর একই পৃষ্ঠায় একই সংখ্যায় মুদ্রিত কবিতার-

কবি শামসুর রাহমান লিখেছেন :

শান্তির দেশ সুন্দর এই  
অমাদের ওয়াতান।  
আজাদ পাকিস্তান।

বিপদ বাধাকে করি নির্ভয়  
শক্তি সাহস চির দুর্জয়  
এ পাক জমিন ভাল যে বেসেছে  
হাসিমুখে তাজা প্রাণ॥

নতুন আশা স্বপ্ন রঙীন  
আমরা এনেছি উজ্জ্বল দিন  
গ্রামে বন্দরে সবখানে আজ  
নবজীবনের গান।<sup>৩৪</sup>

কবি ফররুখ আহমদের কবিতা :

আজাদ পাকিস্তান  
আসমানে যার ঝাঙা ওড়ে হিলালী নিশান  
বীর মুজাহিদ আনলো যারে  
তপ্ত বুকের রক্ত ধারে,  
লাখো শহীদ প্রাণ দিয়ে ভাই  
পেলো খোদার দান॥... ৩৫

মাহেনও এর অপর লক্ষ্য নতুন লেখকদের পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করে বাংলা সাহিত্যের উন্নতি ঘটানো—তাও ব্যর্থ হয়নি। এতে লিখেছেন প্রতিষ্ঠিত এবং নতুন আবির্ভূত প্রায় তাবৎ লেখক। মাহেনও এ লিখে বাংলা সাহিত্যের শ্রী কিছু বৃদ্ধি অবশ্যই করেছেন তাঁরা। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, সরদার জয়েনউদ্দীন, শওকত ওসমান প্রমুখের বহুখ্যাত অনেক গল্প, (যেমন ‘পাগড়ী’) এবং আবুল ফজলের ‘রাঙা প্রভাত’ এই পত্রিকায়ই প্রকাশিত হয়েছে। দাঙ্গা ও দেশবিভাগ-এর শ্রেণ্যপটে মোহাজের, বস্তিবাসী প্রভৃতির জীবনচিত্র বাংলা সাহিত্যে রূপায়িত হয়েছে। ‘মাহেনও’ এর মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তান এবং মুসলিম বিশ্বের পরিচয় লাভের সুযোগও হয়েছিল বাঙালি পাঠকের।

মাহেনও আজাদী যুগের প্রথম দিকের পত্রিকা বিধায় এতে পাকিস্তান আমলের দক্ষিণ এশিয়ার কিছু সমাজচিত্রও ঠাই পেয়েছে। পাকিস্তান থেকে পত্রিকা প্রকাশের অন্তরায় সম্পর্ক বলা হয় পাকিস্তানে তখন পর্যন্ত ‘ব্লক’ তৈরির কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ‘এখনও মাহেনও

এর ব্লক তৈরি করে আনতে হয় করাচী থেকে। ভারত সরকার Metal Restrictions orders বলে পাকিস্তানে মেটাল জিনিস আমদানি বা রফতানি কড়াকড়ি করে দেয়। পূর্ব বাঙলায় এ্যামেচার ফটোগ্রাফার—এর অভাবে ভালো ফটো পেতে বেগ পেতে হয়।

মাহেনও পত্রিকায় বঙ্গদ্র উল্লেখ করেছিল। পরে খ্রীষ্টাব্দ হয়েছিল। এর পর আবার হিজরী সন সংযুক্ত হয়। প্রচ্ছদে মসজিদের ছবি অথবা ইসলামি স্থাপত্য শিল্পের ছবি থাকত। ভিতরে বিভিন্ন প্রদেশের প্রাকৃতিক ফুল, ফল এবং উন্নয়ন কার্যক্রমের নানান ছবি দেয়া হতো। কখনও মন্ত্রী, উজীর-নাজীরের ছবি থাকতো। প্রথম দিকে বিজ্ঞাপন ছাপা হতো না। তৃতীয় বর্ষ থেকে বিজ্ঞাপনের হার দিয়ে বিজ্ঞাপন দেবার আহ্বান জানানো হয়েছিল। কবি নজরুলের ছবি, বিভিন্ন ভাষার লেখকদের হস্তলিপি, চাঁদতারা, পতাকা প্রভৃতির প্রতিলিপি থাকতো। প্রথম বর্ষে ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে বের হতো। তৃতীয় বর্ষ থেকে বাংলা মাসের হিসাবে প্রকাশ পায়।

সম্পাদক, প্রকাশক ইত্যাদি পরিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে নিয়মও পাল্টায়। প্রথম দিকে রবীন্দ্রনাথকে একবার (তৃতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যা) সম্পাদকীয়তে (জন্মতিথি বৈশাখে) শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয় 'বাংলার কবি সম্রাট', 'বাংলা সাহিত্যের সৌরাধিপতি', শুধু বাংলার নন, সারা প্রাচ্যেরই গৌরব' ইত্যাদি গুণবাচক শব্দদ্বারা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের উপর কোনো প্রবন্ধ মাহেনও ছাপেনি। বরং রবীন্দ্রনাথকে বর্জনের পক্ষে লেখা ছেপেছে।

ষাটের দশকে রবীন্দ্র-বিতর্কের উত্তেজনার সময় মাহেনও এ-বিষয়ে নিশ্চুপ থেকেছে। যদিও হিন্দু লেখকদের রচনাও এতে প্রকাশিত হয়েছে। তারাপদ রায়, দার্শনিক জে সি দেব, কিরণশংকর সেনগুপ্ত প্রমুখের অনেক রচনা এতে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু তাঁদের কাঙ্ক্ষিত (মাহেনও এর) নিজস্ব লেখকগোষ্ঠী গড়ে ওঠেনি। কোনো সাহিত্যিক আন্দোলনও গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয় মাহেনও।

'ইখওয়ানে আদব' নামে একটি নতুন বিভাগ সাহিত্যিক ভ্রাতৃত্ব বা Literary brotherhood সৃষ্টির জন্য তাখাল্লুম বা ছদ্মনামে সাহিত্যালোচনায় আগ্রহীদের পত্রের মাধ্যমে সাহিত্যালোচনার জন্য খোলা হয়েছিল এবং 'সাহিত্যিক গোষ্ঠী' সৃষ্টির জন্য 'নতুন চারা রোপন করা হয়েছে' বলে সম্পাদকীয়তে বলাও হয়েছিল। কিন্তু কোনো সুফল পাওয়া সম্ভবপর হয়নি। 'পাকিস্তান পাবলিকেশনস' থেকে 'পাকিস্তান', 'আলবশীর', 'মাহেনও' প্রভৃতি যতো পত্রিকাই প্রকাশ করুক, তাতে প্রকৃতপক্ষে সাহিত্যসেবার লক্ষ্য কি ছিল আর ফল কোন দিকে কতোটা হয়েছে; এবং দেশের লোকেরা পাকিস্তানকে কিভাবে পেতে চেয়েছিল, আর কিচোখে দেখেছিল আজাদ পাকিস্তানকে, তা জানার জন্যে, এবং সমাজতাত্ত্বিক ও গবেষকদের কৌতূহলের অনন্ত উৎসরণে 'মাহেনও'এর গুরুত্ব আজও কম নয়।<sup>৩৬</sup>

### তথ্যপঞ্জি

১. মাহেনও, ১ বর্ষ, ৬ সংখ্যা ভাদ্র ১৩৫৬, পৃ. ৫৪।
২. আমাদের গোজারেশ, মাহেনও, ১ বর্ষ, ৭ সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৫৬।

৩. পূর্বোক্ত, ৮ সংখ্যা, কার্তিক ১৩৫৬, পৃ. ৫২-৫৪।
৪. পূর্বোক্ত।
৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫।
৬. পূর্বোক্ত, ৯ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৫৬।
৭. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, আমাদের কওমী যবান—আবরী; পূর্বোক্ত, ১ বর্ষ, ১০ সংখ্যা, পৌষ ১৩৫৬, পৃ. ৩।
৮. আমাদের গোজারেশ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫।
৯. আবুল ফারাহ, আবরী ভাষা, পূর্বোক্ত, ১ বর্ষ, ৯ সংখ্যা অগ্রহায়ণ ১৩৫৬, পৃ. ৫৩।
১০. মীজানুর রহমান, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার নাম, পূর্বোক্ত, ১ বর্ষ, ৫ সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৫৬, পৃ. ৯৪।
১১. মুহম্মদ হবীবুল্লাহ বাহার, উত্তরাধিকার; পূর্বোক্ত, ১ বর্ষ, ২ সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৫৬, পৃ. ৪৭।
১২. আবুল কালাম শামসুদ্দীন, পাকিস্তানে শিল্পসাহিত্যের সম্ভাবনা, পূর্বোক্ত, ১ বর্ষ, ৩ সংখ্যা জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৬, পৃ. ৫।
১৩. আবদুল ওয়াজ্জেদ, সাহিত্যে পাকিস্তান, পূর্বোক্ত, ১ বর্ষ, ৪ সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৫৬, পৃ. ৫২।
১৪. মোহাম্মদ ওয়াজ্জেদ আলী, নয়-জিন্দেগী, পূর্বোক্ত, ১ বর্ষ, ৫ সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৫৬, পৃ. ৯।
১৫. ড. কাজী মোতাহার হোসেন, বাংলাসাহিত্যের অতীত ও বর্তমান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১২।
১৬. সৈয়দ আলী আহসান, পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৮।
১৭. পূর্বোক্ত, পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা সাহিত্যের ধারা, পূর্বোক্ত, ৩ বর্ষ, ৫ সংখ্যা, আগস্ট ১৯৫১, পৃ. ৫০-৫৪।
১৮. আবু জাফর শামসুদ্দীন, পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যের ভূমিকা, পূর্বোক্ত, ৫ বর্ষ ১ সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৬০, পৃ. ৫৩।
১৯. মাহেনও, ৪ বর্ষ, ১ সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৫৯, এপ্রিল ১৯৫২, পৃ. ৪৫-৪৮।
২০. আমাদের গোজারেশ, পূর্বোক্ত, ৪ বর্ষ, ১০ সংখ্যা, জানুয়ারি ১৯৫৩, পৃ. ৫৬।
২১. মাহেনও, ৪ বর্ষ, ১০ সংখ্যা, জানুয়ারি ১৯৫৩র 'আমাদের জাতীয়তা' শীর্ষক সম্পাদকীয় এবং মোহাম্মদ ওয়াজ্জেদ আলী রচিত 'নতুন সাহিত্য' শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।
২২. সিদ্দিক আহমদ খান, আজকের সাহিত্য, পূর্বোক্ত, ২ বর্ষ ২ সংখ্যা, মে ১৯৫০, পৃ. ৫৩।
২৩. মোহাম্মদ মোদায়েব, পূর্ববাংলার সাহিত্যের ধারা (শিশু সাহিত্য), পূর্বোক্ত, ২ বর্ষ ১১ সংখ্যা, জানুয়ারি ১৯৫০, পৃ. ৩৪।
২৪. মোহাম্মদ ওয়াজ্জেদ আলী, আমাদের হুঁশিয়ারী, পূর্বোক্ত, ৬ বর্ষ ৫ সংখ্যা, পৃ. ৭৪।
২৫. আবদুল ওয়াজ্জেদ খান চৌধুরী, পূর্ব পাকিস্তানের মাধ্যমিক শিক্ষা-সমস্যা, পূর্বোক্ত, ২ বর্ষ ৯ সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৫০, পৃ. ৫০।
২৬. আবদুর রহমান, শিক্ষার সল্ফকার, পূর্বোক্ত, ১ বর্ষ ৪ সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৫৬, পৃ. ২৬-২৭।
২৭. মাহেনও, মার্চ ১৯৫০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।
২৮. ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, নতুন অবস্থায় ইতিহাস, পূর্বোক্ত, ১ বর্ষ ১২ সংখ্যা, মার্চ ১৯৫০, পৃ. ২-৩।
২৯. আবদুল হক, কেন্দ্রীয় সরকার ও পূর্ব পাকিস্তান, পূর্বোক্ত ৩ বর্ষ ১২ সংখ্যা, চৈত্র ১৩৫৮, পৃ. ২১-২৫।
৩০. আমাদের গোজারেশ ('পাকিস্তানের বাজেট'), পূর্বোক্ত, ৬ বর্ষ ১ সংখ্যা, এপ্রিল ১৯৫৪, পৃ. ৫৬।
৩১. পূর্বোক্ত।
৩২. মাহেনও, বৈশাখ ১৩৫৬, পৃ. ৩।

৩৩. পূর্বোক্ত (সম্পাদকীয়), ১ বর্ষ ১ সংখ্যা, চৈত্র ১৩৫৫।
৩৪. শামসুর রাহমান, আজাদ পাকিস্তান, মাহেনও, ২৩ বর্ষ, ৪ সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৭৮, পৃ. ৩১। এই কবিতাটি রেডিও পাকিস্তানেও তিনি পাঠ করেন। কবিতার পাদটীকায় লেখা আছে 'রেডিও পাকিস্তান, ঢাকা থেকে প্রচারিত'।
৩৫. ফররুখ আহমদ, আজাদ পাকিস্তান, মাহেনও পূর্বোক্ত।
৩৬. পাকিস্তান পাবলিকেশনস থেকে ইংরেজিতে প্রথম শ্রেণীর ত্রৈমাসিক প্রকাশিত হতো—নাম Pakistan. আরবি পত্রিকা ছিল 'আলবশীর'। উর্দু 'মাহেনও' এবং বাংলা 'মাহেনও' ছাড়া আরো একটি বার্ষিক পত্রিকা ছিল 'Pakistan. সরকারি নিয়ন্ত্রণে আরও পত্রিকা থাকলেও এগুলো ছিল সাহিত্যপত্রিকা।



## ৪. দিলরুবা

(১৯৪৯-১৯৬৪)

মাহেনও এর এক মাস পরে দিলরুবা আবির্ভূত হয়েই সাহিত্য জগতের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এই পত্রিকা প্রকাশের নেপথ্যে কাজ করেছিল একটি মহত্তম অনুভূতি—‘প্রেম’। ব্যক্তিগত প্রেম সর্বজনীন মানব প্রেমের রূপে জনকল্যাণের ব্রত নিয়ে সর্বস্তরের মানুষের মননে অনুরণন তুলতে চেয়েছিল বলেই হয়তো এর লক্ষ্য-আদর্শে তার গভীর প্রতিফলন ঘটেছিল। উদ্যম নিঃশেষ হবার প্রাককালেও তাই তার যেটুকু রেষ ছিল, তাও মূল্যবান বিবেচিত হয়েছিল।

সমাজের কথা ভেবেছিল বলে সকল বিষয়েই দিলরুবা বক্তব্য উপস্থাপন করতে নিঃসঙ্কোচ ছিল। এতে ঘটেছিল বহু মুক্ত-বুদ্ধির ধারক-বাহক-লেখকদের সমাবেশ। বারে বারে সম্পাদক ও সম্পাদনা-পরিষদের সদস্য পরিবর্তন হলেও কেন্দ্রীয় ব্যক্তি ছিলেন একজন এ এইচ এম আবদুল কাদের—মিসেস দিলরুবার স্বামী, যিনি অকালে প্রিয়তমা স্ত্রীর বিয়োগ ব্যথাতুর-হৃদয় নিয়ে স্ত্রীর স্মৃতি ও আদর্শকে স্থায়ীভাবে ব্যাপ্ত করে দিতে চেয়েছিলেন সাহিত্যের মাধ্যমে, দেশ ও সমাজের হিত সাধনের কাজে।

লক্ষণীয়, অনেকেই স্ত্রীর মৃত্যুর পরে স্মৃতি-রক্ষার জন্য অনেক কিছু করেন, কিন্তু স্ত্রীর নামে সাহিত্য-পত্রিকা প্রকাশ করে সাহিত্যের উন্নতির মাধ্যমে দেশের সেবার মহত্তর-পস্থা অবলম্বন করেছিলেন আমাদের জানা মতে এই একজন। দিলরুবার স্বত্বাধিকারী আবদুল কাদের ঢাকা সেন্ট্রাল ল’ কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ। শিখা বা মাহেনও-র সম্পাদক এবং দিলরুবা শীর্ষক কাব্য-গ্রন্থের রচয়িতা, কবি ছন্দসিক আবদুল কাদের তিনি নন। মোহাম্মদী-সওগাতের প্রথম-দিককার সংখ্যাগুলোতে মুসলিম সভ্যতার পরিচয় মূলক অনেক রচনার লেখক এবং বহু গ্রন্থের প্রণেতা সরকারি চাকুরে (মেজিস্ট্রেট) ড. এম আবদুল কাদেরও তিনি নন।

আইনজীবী এ. এইচ. এম. আবদুল কাদেরের স্ত্রী প্রথম সম্মান প্রসবকালে কলকাতায় ১৯৪৬ সালে মারা গিয়েছিলেন। অবিভক্ত ভারতের সিভিল সার্ভিসের কঠিন প্রতিযোগিতা-মূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে দিলরুবা মেজিস্ট্রেট হিসেবে কর্ম জীবনে প্রবেশ করেন। মৃত্যুর পর তাঁর সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে সমাজসেবার দ্বারা তাঁর স্মৃতিকে অমর করে রাখার উদ্দেশ্যেই স্বামী আবদুল কাদের স্ত্রীর নামে পত্রিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তবে একান্তভাবে এটা মহিলাদের সাহিত্যপত্রিকা ছিল না। যদিও শিশু ও নারীদের সাহিত্য-চর্চায় এ পত্রিকা পরে বিশেষ নজর দিয়েছিল। অনেক বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে এবং বিশেষ বিভাগ খুলে ও (মহিলা বিভাগ ও সবুজ সংঘ) সম্পাদনা-পরিষদে খ্যাতিনাম্নী মহিলা সাহিত্যিকদের সংশ্লিষ্ট করে এবং নারী জাতির নানা সমস্যা ইত্যাদি ব্যাপারে অনেক রচনা প্রকাশের মাধ্যমে দেশের নারী প্রগতিতে দিলরুবা কিছু মূল্যবান অবদান রাখলেও সার্বিকভাবে তা যে ভূমিকা পালন করে তা আরও ব্যাপক।

বেসরকারি বা ব্যক্তিক উদ্যোগের কোন পত্রিকাই দিলরুবার ন্যায় দীর্ঘ পনের বছর যাবত প্রকাশিত হতে পারেনি। শুধু বাংলা মাসিক দিলরুবাই নয়, অনন্তর তিনি (আবদুল কাদের) উর্দু ও ইংরেজিতেও ‘দিলরুবা’ প্রকাশিত করেন ; পাকিস্তান সরকার যেমন উর্দু মাহেনও ইংরেজিতে প্রকাশ করেছিল।

অতএব উদ্যোক্তা দুঃসাহস করেছিলেন সরকারি পত্রিকা ‘মাহেনও’ এর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে টিকে থাকার। কিন্তু ইংরেজি ও উর্দু ‘দিলরুবা’ ইতিহাসের পাতায় অন্তর্ভুক্তি পায়নি। আর ‘মাহেনও’ এর মতো সরকারের সহায়ক উদ্দেশ্যমূলক পত্রিকা হিসেবেও ‘দিলরুবা’ চিহ্নিত হতে পারেনি। বরং প্রায় সকল ক্ষেত্রেই সরকার-বিরোধী বা বাঙালির স্বার্থমুখী বক্তব্যই প্রচার করেছে। বাংলা ভাষার পক্ষে প্রথমাবধি ঐরা মতামত ব্যক্ত করেছেন। একুশে ফেব্রুয়ারির গণহত্যাকে নিন্দা করেছেন। শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাপোষণ করতেন দিলরুবার আদর্শ নিয়ন্ত্রকেরা ; আর যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনেও তাঁরা আনন্দ লাভ করেছিলেন। মুসলিম লীগের স্বৈরতন্ত্র নিপাত যাক তাও তাঁরা মোলায়েম ভাষায় উচ্চারণ করেছেন। ১৯৬২ সনের ছাত্র আন্দোলনকেও দিলরুবার সম্পাদকীয় বক্তব্য সমর্থন না করে পারেনি। শহীদমিনার গড়ার এবং শহীদদিবসের সরকারি স্বীকৃতির ব্যাপারে (গভর্নর আজম খানের সময়) যে-সমস্ত বক্তব্য দিলরুবা প্রদান করেছে-তাতে একে গণ-বিরোধী বলবার কোনো উপায় নেই।

বাংলা একডেমী, ইসলামিক একাডেমী এবং লেখক সংঘের সমালোচনায়ও মুক্তবুদ্ধির পরিচয় দিতে দিলরুবা কার্পণ করেনি। সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সমাজের সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁরা যে মতামত ব্যক্ত করতেন, তাতে মাহেনও এর অনেক লেখকের মত ‘বাংলা মাদেরী জবান হলেও উর্দুই আমি ভালোবাসি’-ধরনের মনোভাব প্রকাশ পায়নি। তথাপি এই পত্রিকা পুরো না হলেও অনেকটাই পাকিস্তানবাদী, এবং বেশির ভাগ ইসলাম-পন্থী। ইসলামি ধারার গণতন্ত্র তাঁরা সব সময়ই পছন্দ করেছেন। (সাতচল্লিশের পর ১৯৫৪ পর্যন্ত) দীর্ঘদিন পাকিস্তানে নির্বাচন দেয়া হয়নি বলে দিলরুবা সরকারের কঠোর সমালোচনা করেছে। ১৯৫৬ ও ৬২ সনের শাসনতন্ত্রে পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করাতেও ‘দিলরুবা’ নিশ্চুপ থাকতে পারেনি। কখনও কখনও সুরে দৃষ্টিভঙ্গিতে মোহাম্মদীর সমালোচনার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষিত হলেও কোথাও কোথাও ‘দিলরুবা’ আবার প্রগতিশীলদের মতোই কথা বলেছিল। তবে মার্কসবাদ দিলরুবা কখনোই সমর্থন করেনি।

রাশিয়া-চীনের থেকে আমেরিকার প্রতিই সম্পাদকের আনুগত্য বেশি প্রকাশিত হয়েছে। আর কোরআন মজিদের অনুবাদ ও প্রচার এবং ইকবাল-নজরুল কায়েদে আজম এর প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধা ছিল গভীর। কিন্তু রবীন্দ্রবিরোধী তাঁরা ছিলেন না। আইউব খানের রোমান হরফ প্রবর্তনের প্রস্তাবকে যেভাবেই হোক আদর্শে ঐক্য না রেখে তাঁরা সমর্থন করে বসেছিলেন। লেখক ও সাহিত্য-শিল্পীদের আইউবী-পৃষ্ঠপোষণের উদ্দেশ্যমূলক স্কীমকেও দিলরুবা সজোরে নিন্দা জানাতে পারেনি। বরং একটা সময়ে তাঁদেরকে ভারী আপোষকামী বলেই মনে হয়। কি জন্য আপোষ করতে চাচ্ছিলেন, আর কি জন্যই বা পরে গণমুখী হয়ে পড়লেন—



এটা গভীর অনুসন্ধানের বিষয় নয়, যেটা বড়—তাহলো, এঁরা খুব ক্ষতিকর, পশ্চাৎপদ, প্রতিক্রিয়াশীল বক্তব্য প্রচার করতে তৎপর হননি। তখন অনেকেই এরকম উল্টো-পাল্টা ভেবেছেন। সামরিক শাসনের ভয়েও, অনেকে ব্যবসার স্বার্থে বা গা বাঁচাবার তাগিদে, অনেক সময় গায়ে-পড়ে তোয়াজ তোষামোদে বক্তব্য প্রচার করতে উদ্যত ছিলেন। এসব সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করে যেটুকু স্ববিরোধিতা এর মধ্যে লক্ষণোচর হয়—তা বিভ্রান্তির মতো মনে করলে এর অসংখ্য সদগুণ পাঠক ও গবেষককে অভিভূত না করে পারে না।

এগুলোর মধ্যে প্রথমেই দৃষ্টি কাড়ে প্রতিটি (জাতীয়ভাবে) তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়ে এঁরা মতামত প্রদান করেছেন। জনমত গঠন করতে চেয়েছেন জনগণের স্বার্থের এবং প্রয়োজনের দিকে খেয়াল রেখেই। কিন্তু একেবারেই পত্রিকার ব্যবসায়িক দিক ভুলে গিয়ে কোনো কাজ করতে তাঁরা চাননি, লেখকদের সম্মানী বা পারিশ্রমিক দিতে চাইতেন না মালিক জনাব আবদুল কাদের। লোক বুঝে আবার অনেককেই তা দেয়া হতো। বিজ্ঞানপনদাতাদেরকে আগে কপি সরবরাহ করে পরে লেখকদের কপি প্রদানের কথা চিন্তা করতেন বলেও জানা গেছে।<sup>১</sup> সেজন্য পরের দিকে পত্রিকার আকার আকৃতি, মান ক্ষয়ে নড়বড়ে হয়ে যায়।

যে পনের বছর চলেছিল পত্রিকা, তার প্রথমার্ধ যদি উজ্জীবনের কাল হয়—শেষার্ধ তাহলে অবক্ষয়ের। ১০, ১১, ১২ ও ১৩ বর্ষের প্রথম সংখ্যার সম্পাদিকীয়তে মান পড়ে গেছে বলে পত্রিকার পক্ষ থেকেই আফসোস করে অথবা কৈফিয়তের ঢংয়ে কারণ ব্যাখ্যা করে এসব কথা বলা হয়েছে। কৈফিয়তে অবশ্য পূর্ববাঙলার সাহিত্য পত্রিকার প্রধান (Common) সমস্যা বা অন্তরায়গুলোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সাহিত্যপত্রিকায় বিজ্ঞাপন পাওয়া যায় না। কাগজ ও মুদ্রণ ব্যবস্থা ব্যয়বহুল। সরকারের সাহিত্য বা শিল্পনীতিতে সাহিত্য সংস্কৃতির বিকাশ কামনার পরিচয় ছিল না। এস্তার সব সমস্যার কথা বলা হয়েছে। অনিয়মিত হয়ে পড়েছে সেজন্য। যুগ্ম সংখ্যা প্রকাশ করে ধারা বজায় রাখা হয়েছে। মাসের নির্দিষ্ট দিনে দ্বিতীয়ার্ধের খুব কম সংখ্যাই পাঠক বা গ্রাহকদের নিকট পৌঁছেছে। তবু এই পত্রিকা মোহাম্মদী-আল ইসলাহ-সওগাত-মাহেনও ব্যতীত দীর্ঘকাল ধরে প্রকাশিত পূর্ববাঙলার একমাত্র বেসরকারি বাংলা মাসিক সাহিত্য পত্রিকা।

সমকাল দিলরুবার আট বছর পরে প্রকাশিত হয়েছিল এবং একাত্তরের যুদ্ধের পূর্বে মাত্র ১৩ বছর অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত হবার সুযোগ পায়। স্বাধীনতার (১৯৭১) পরবর্তী সংখ্যাগুলোর হিসেব কষলে বলতে হবে দীর্ঘ জীবনের মাপকাঠিতে দিলরুবার একমাত্র সহযাত্রী অপর বেসরকারি প্রতিষ্ঠান-সমকাল। অবশ্য সওগাত-মোহাম্মদীর কথা এখানে আনা হচ্ছে না। এ দুটি পত্রিকা বিভাগ পূর্বকালেই সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। তাছাড়া পরিক্রম, পূবালী ও পূর্বমেঘ যথাক্রমে ৮, ৭ ও ১১ বছর চলেছিল। এর পর আর কোন পত্রিকাই নেই—যা দীর্ঘদিন চলেছিল।

দিলরুবার প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় বৈশাখ ১৩৫৬ সনে। পরিচালক সমিতির যে বিবরণ দেয়া হয়—তাতে দেখা যায়, প্রকাশের পূর্বে একটি সমিতির মতো সংস্থা তৈরি করা হয়েছিল। অতএব উদ্যোগটি সুপারিকল্পিত ছিল। এর প্রথম সংখ্যায় উল্লিখিত

সমিতির সদস্য ছিলেন বেশির ভাগই সম্প্রান্ত বাঙালি-মুসলিম মহিলা। ১. বেগম রওশন আখতার খানম। চেয়ারপার্সন), ২. বেগম সাইদা করিম (কোষাধ্যক্ষ); ৩. সৈয়দা সাকিনা ইসলাম খান; ৪. ম্যানেজার ও পরিচালক সমিতির সেক্রেটারী বেগম রাবেয়া এম. হোসেন; ১০. সহ-সেক্রেটারি এ. এন. এম. শামসুদ্দীন; ১১. এসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার সৈয়দ মঞ্জুর আলী, ১২. রেজা হোসেন খান প্রমুখ। এই সঙ্গে বিভিন্ন জেলা প্রতিনিধিদের নামের দীর্ঘ তালিকাও ছাপা হয়। প্রথম সংখ্যায় পত্রিকা প্রকাশের ত্রিবিধ-উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা হয়েছিল :

প্রথম উদ্দেশ্য বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্যের দৈন্য দূর করার চেষ্টা করা। বাংলা ভাষায় এ দৈন্যের কৈফিয়ৎ তুলে অনেকেই আজকাল মাদেরী জ্বান ছেড়ে অন্য ভাষার দিকে নজর দিচ্ছেন। এ দৈন্য যে সত্যিই আছে তা অনস্বীকার্য। কিন্তু সেটার কারণ এতকাল এত অধিকাংশ মুসলিম অশিক্ষিত ছিলেন আর তার ফলে মাতৃভাষার চর্চা তাদের মধ্যে বিকাশ লাভ করেনি। আজ আমাদের কাছে এটাই স্বাভাবিক আর সহজ বলে মনে হয় যে, আমরা এ ভাষার পরিপূষ্টি সাধনে তৎপর হব। এতে মুসলিম জাতীয় জীবনের কাহিনীর চিত্রণ চাই, ইসলামের দর্শন, সমাজনীতি প্রভৃতির আলোচনা চাই, এর কাব্য-চর্চার পিছনে নতুন জীবন-দর্শন প্রয়োজন। তবেই এ-ভাষা আর দীনহীন থাকবে না—আমাদের জাতীয় ভাবের সত্যকার বাহক হবে।

আমাদের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য পূর্ব পাকিস্তানে বাংলা সাহিত্যের গতিপথ নির্দেশের চেষ্টা করা। পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গে চিরকালই একটা ভাবগত বৈষম্য ছিল। আজাদী লাভের পর সেটাই স্পষ্ট হয়ে চোখে ধরা দিচ্ছে। এদেশের অধিকাংশ অধিবাসীর যোগ মাটির সংগে, নদীর সংগে, ঐদের চালচলতি সবই মুসলমানী কায়দায় গড়ে উঠেছে, কারণ সংখ্যা মুসলমানেরা অত্যধিক। আমাদের সাহিত্যে এরূপ প্রকাশিত হত বাধ্য। তবে আমাদের পত্রিকায় যে এখনই সেরূপ ধরা দিয়েছে তা বলতে সাহস করিনে, কারণ এখনও আমাদের ওপর পশ্চিম বাঙলার সাহিত্যিক প্রভাব খুবই প্রবল। এ প্রভাব কাটিয়ে উঠতে কিছু সময় লাগবে। লাগুক, ক্ষতি নেই, কিন্তু কাটিয়ে ওঠাই দরকার।

আমাদের তৃতীয় উদ্দেশ্য পত্রিকার দ্বারা ভবিষ্যতে কোন সমাজ সেবার কাজ করা যায় কিনা সেদিকে লক্ষ্য রাখা। এ পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে বেগম দিলরুবা কাদেরের স্মৃতিকে স্মরণ করে। তিনি অল্প বয়সেই কলিকাতার লেডী প্রেসিডেন্সী ম্যাঞ্জিষ্ট্রেটের পদ পেয়েছিলেন, কিন্তু বেশিদিন জীবিত ছিলেন না; প্রসব সংকটে ১৯৪৬ সনের ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখে তিনি ইন্তেকাল করেন। তিনি বিদ্যোৎসাহী, তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিসম্পন্ন বহুগুণান্বিতা ছিলেন। নারী শিক্ষার দিকে তাঁর বিশেষ লক্ষ্য ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে বিশেষ কিছু তিনি করে যেতে পারেন নি। তাঁরই সম্পদ ও আদর্শ কেন্দ্র করে তাঁরই আত্মার প্রেরণায় ‘দিলরুবা’ প্রকাশিত হল। ভবিষ্যতে লভ্যাংশ দ্বারা সমাজের কল্যাণ সাধন বিশেষত নারী শিক্ষা ও দুঃস্থ মানবতার সেবা আমাদের অন্যতম লক্ষ্য—তাছাড়া আজ তাঁর মৃত্যুর পর শুমুমাত্র তাঁর নাম স্মরণ করে পত্রিকা প্রকাশ অর্থহীন।

পত্রিকার পক্ষ থেকে বলা হয় : তাঁদের এ উদ্দেশ্যের সফলতা নির্ভর করে কতকটা তাঁদের ওপর, কিন্তু অনেকটাই নবীন লেখক ও পাঠকদের ওপর। তবে লিখিয়েদের আদর্শ হবে স্বদেশী। ‘যারা নয়া নয়া লিখছেন তাদের উচিত পশ্চিম বাঙলায় বর্ধিত সাহিত্যকে আদর্শ না করে নতুন একটা আদর্শ গড়ে তোলা। ঢাকা শহরের ইট কাঠ পাটকেলের মধ্যেও যেন তাদের সাহিত্য সীমাবদ্ধ না হয়—তারা যেন বিশাল দেশকে চেনেন...’

উপরোক্ত বক্তব্যে পত্রিকার দৃষ্টিভঙ্গী বোঝা যায়। ১৯৪৯ সনের বাঙলা দেশের সমাজ-সভ্যতার-গতি প্রকৃতি সম্পর্কেও উপর্যুক্ত সম্পাদকীয়-বক্তব্যে একটি চিত্র পাওয়া যায় :

নানা বিভাগে দেশ এখন বহুধাবিচ্ছিন্ন। সব চাইতে বড় বিভেদ আধুনিক শিক্ষিত সমাজ আর গ্রাম্য চাষী সমাজের মধ্যে। প্রাচীনকালে আমাদের দেশে যে শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল তা এ বিভেদ কখনও সৃষ্টি করত না; তার

কারণ শিক্ষিতেরা আধুনিক কালের মত বিজ্ঞাতীয় শিক্ষা লাভও করতেন না, আবার শিক্ষা লাভ করার উদ্দেশ্য তাদের জ্ঞান অর্জনই ছিল। বর্তমান কালের মত চাকুরি অন্বেষণ ছিল না। আমরা আজকাল যে শিক্ষালাভ করে থাকি, সে শিক্ষার সঙ্গে আমাদের দেশের, আমাদের জাতির প্রাণের যোগ নেই। আমাদের জাতির মূলভিত্তি ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এ শিক্ষার সঙ্গে ধর্মের কোন যোগাযোগ নেই। তার জন্যই যারা এ শিক্ষা লাভ করেন তাদের সঙ্গে দেশের অধিকাংশ লোকের যোগাযোগ ক্ষীণ হয়ে আসে, দ্বিতীয়ত : এ শিক্ষা বিজ্ঞাতীয় শিক্ষা। পাশ্চাত্য বস্তুতন্ত্র এ শিক্ষার পশ্চাতে কাজ করেছে। ফলে এ শিক্ষার সংস্পর্শে যারাই আসছেন তাঁরাই কিছু না কিছু সেই বস্তুতন্ত্র দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। সেই বস্তুতন্ত্রের সঙ্গে আমাদের ধর্মের, আমাদের মনোভাবের চিরকালের বিরোধ। তাই সেই বস্তুতন্ত্র আমাদেরকে দেশের অধিকাংশের থেকে দূরে সরিয়ে নিচ্ছে। এ ছাড়াও আছে আমাদের চাকুরির উদ্দেশ্যে শিক্ষালাভ করা... আমাদের এ দূরবস্থা দূর করতে পারি কি হলে? প্রথম কথাই হচ্ছে আমাদের উচ্চশিক্ষিত সমাজকে নিয়ে। তাঁদের মনে রাখা উচিত যে নূতনভাবে আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিকল্পনা করা দরকার। কিন্তু সে পরিকল্পনার পূর্বে চিন্তা করতে হবে আমাদের সমাজের কথা, আমাদের জাতির কথা এবং আমাদের ধর্মের কথা।—কোরআন শরীফে সেই জীবনাদর্শ প্রচারিত হয়েছে—রসুলের জীবনাদর্শ প্রচারিত হয়েছে—রসুলের জীবনে ও কার্যাবলীতে তার রূপায়ণ... কিন্তু এই আদর্শের সঙ্গে আমাদের কর্ম-পদ্ধতির যোগসূত্র হারিয়ে গেছে। আমাদের চিন্তা অন্যমুখী। যে চিন্তাশক্তির সাহায্যে ইসলামি সভ্যতার প্রারম্ভে মুসলমানেরা তাঁদের জীবনের সঙ্গে আদর্শের যোগ খুঁজে পেতেন আজ আমাদের মধ্যে সেই চিন্তাশক্তির অভাব ঘটেছে।—পাশ্চাত্য বস্তুতাত্ত্বিকতার শ্রেষ্ঠ বিকাশ যে কমিউনিজম—সেই কমিউনিজম ইসলামী আদর্শের পরিপন্থী।—আমাদের সমাজনীতি অর্থনীতি সমস্ত পাঠ্যবই-ই পাশ্চাত্য ধরনের হয়ে থাকে। পাকিস্তানে নূতন ইসলামিক স্কুল অব ইকোনমিক্স এর উদ্ভব সম্বন্ধে আমাদের চিন্তা করা দরকার এবং সেপথে গবেষণা চালানোর জন্য নবীন ছাত্রদের উৎসাহ দেওয়া প্রয়োজন।<sup>২</sup>

দিলরুবা আবুল হোসেন চৌধুরী কর্তৃক দি সিটি প্রেস, ১৬/৩ কোর্ট হাউস স্ট্রিট থেকে মুদ্রিত এবং তৎকর্তৃক বি. কে. রায় লেন বংশী বাজার, ঢাকা থেকে প্রকাশিত হত। ষষ্ঠ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হয় ৩ প্যারীদাস রোড, ঢাকা থেকে। ভালো নিউজপ্রিন্ট, ডাবল কলাম, সাড়ে ছয় ইঞ্চি x সাড়ে নয় ইঞ্চি সাইজ চুয়ান পৃষ্ঠায় পত্রিকা প্রকাশিত হতো। দ্বিতীয় সংখ্যায় সম্পাদক হিসেবে নাম মুদ্রিত হয় সৈয়দ আলী আশরাফ-এর। যুগু-সম্পাদিকা : বেগম জেরিনা আলিম। প্রথম বর্ষ চতুর্থ, ঈদ ও আজাদী সংখ্যার সম্পাদকমণ্ডলীতে নাম মুদ্রিত হয় অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খাঁ ; ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন ; ডক্টর এস. হেদায়েতুল্লাহ ; বেগম সুফিয়া কামাল ; অধ্যাপক অজিত কুমার গুহ প্রমুখের। কর্মসচিব : মজবুল আল হোসায়েন। পরের (১/৫) সংখ্যাতেই এঁদের নাম মুদ্রিত হয়নি। সম্পাদক হিসেবে নাম ছাপা হয় অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন এবং যুগু সম্পাদিকা : বেগম সুফিয়া কামাল-এর। তৃতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যার (মে ১৯৫১) 'আমাদের কথা' শীর্ষক সম্পাদকীয়ঠে বলা হয় :

তৃতীয় বর্ষের সূচনায় সম্পাদনা পরিষদ নূতন করিয়া গঠিত হইল। বিদায় লইলেন ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন, বেগম সুফিয়া কামাল, সম্পাদনা-সচিব জনাব আবুল হোসেন চৌধুরী। যোগদান করিলেন বেগম মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা ও বেগম দৌলতম্নেছা খাতুন—দিলরুবার মূলে রহিয়াছে নারী সংস্কৃতির উন্নয়নে সম্ভবমত সহায়তা করা। ঠিক ইহাকে মহিলাদের মুখপত্র করিয়া নয় বরং সাধারণের আসরে বিশেষ ও প্রচুর স্থানের সন্নিবেশ করিয়া... কাগজের দুর্লভ্য দিলরুবার অঙ্গ-সৌষ্ঠব বর্দ্ধনে বেশ ব্যাঘাত ঘটাইয়াছে।<sup>৩</sup>

ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার হয় কখনো কখনো যে, তিনি শিখা-গোষ্ঠীর সঙ্গে গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট, মুক্তবুদ্ধির আন্দোলন-প্রভাবিত বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত

সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। পাকিস্তানের সময়সীমার মধ্যে প্রদত্ত বক্তৃতারাজি এবং রচিত প্রবন্ধ ইত্যাদির মধ্যে বিশেষ করে প্রথমার্ধ ১৯৬০ নাগাদ ইসলামি ভাবধারার মুসলিম প্রধান অঞ্চল পূর্ব বাঙলার বাংলা সাহিত্যে নতুন ও স্বতন্ত্র জীবন-ভাবনা রূপায়ণের পক্ষে বক্তব্য উপস্থাপন করলেও তিনি মোটামুটিভাবে বাঙালি-সংস্কৃতি ও অবিভাজ্য বঙ্গসাহিত্যের বৃক্কে কুঠারাঘাত করার বিরোধী ছিলেন। মুক্তবুদ্ধির ধারক যে তিনি—সেকথাও ভুলতে পারেননি একেবারে। সেইজন্যেই হয়তো মতান্তর ঘটেছিল, কিন্তু কলহ বা কাঁদা-ছোড়াছুঁড়ি করতে তাঁদের রুচিতে হয়তো বাঁধতো। তাই বিদায় উপলক্ষে তিনি আভাসে বললেও হীনতর অর্থে অভিযোগ করে দিলরুবার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেননি। পরের সংখ্যাগুলোতেও তাই মোতাহার-তনয়া সন্জিদা খাতুন (পরে ডক্টর) এর রচনা ছাপা হয়েছে। কাজী মোতাহার হোসেন সম্পাদনা পরিষদ থেকে বিদায় উপলক্ষে বলেন :

চিন্তার স্বাধীনতা সাহিত্যিক অগ্রগতির একটা প্রধান শর্ত। এই চিন্তা প্রকাশ করবার একটা ক্ষেত্র মাসিকপত্রিকা। এর মারফতে অনেকেই নতুন চিন্তা পরিবেশন করেছেন। অবশ্য চিন্তার ধারা নতুন হলেই শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ হয় না। তারজন্য বিচার আবশ্যিক। এই সাহিত্যিক বিচারের সুযোগ দেবার জন্য আমরা নিজেদের মতের সম্পূর্ণ অনুকূল না-হলেও কোনও কোনও বিষয় প্রকাশ করেছি। তার কারণ দশজনের বিচারে আমাদের পূর্বগঠিত মতামতের পরিবর্তন হওয়া আশ্চর্য নয়। 'বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পর্দা' এর একটা দৃষ্টান্ত। এজন্য অর্ধেক না হয়ে বরং যুক্তির আশ্রয় নিয়ে নানা দিক দিয়ে জিনিসটা বুঝতে চেষ্টা করলে লাভ ছাড়া ক্ষতি নাই। আমরা ভিন্ন মতাবলম্বীদের রচনা প্রকাশ করেছি। আমাদের বিশ্বাস এই হচ্ছে সাময়িক পত্রিকার সাধারণ শিষ্টাচার সম্মত পন্থা।<sup>৪</sup>

নতুন সম্পাদিকার যোগদান উপলক্ষে বেগম মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা বলেন :

সাধারণ সাহিত্যচর্চায় নারী ও পুরুষের কোন তফাৎ নাই; তবুও জননী ও গৃহিনীর গুরু-দায়িত্ব—নারী কিছুটা পশ্চাৎপদ। দিলরুবার পৃষ্ঠায় নারীর বিশেষ স্থান আছে এবং ঘর ঘরণীতে উহা সীমাবদ্ধ নহে। সাহিত্যসেবা এবং বিশেষভাবে এই সুযোগের সম্বাবহার করাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য।<sup>৫</sup>

তৃতীয় বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যরূপে নাম ছাপা হয় মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা; দৌলতল্লোসা খাতুন; এস. রহমান এবং সাধারণ সম্পাদক : এ. এইচ. এম. আবদুল কাদের। তৃতীয় বর্ষ পঞ্চম সংখ্যার সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য পূর্বেক্ত তিনজনের সঙ্গে যুক্ত হন আজহারুল ইসলাম ও আবদুল্লাহ আল মুতী। তৃতীয় বর্ষ দশম সংখ্যায় সম্পাদক হিসেবে কেবল এ. এইচ. এম. আবদুল কাদের এর নাম ছাপা হয়। পরের সংখ্যাতেই সম্পাদনা পরিষদের সদস্য হিসেবে আবু রাফেদ ও দৌলতল্লোসা খাতুন এর নাম যোগ হয়। সাধারণ সম্পাদক, আবদুল কাদের।

পরবর্তী (৩/১২) সংখ্যাতেই আবার পূর্বেক্তদের সঙ্গে ফয়েজ আহমদ এর নাম সংযুক্ত হয়। চতুর্থ সংখ্যায় দুই সদস্য বিশিষ্ট সম্পাদনা পরিষদের নাম ঘোষিত হয়। এঁরা হলেন দৌলতল্লোসা খাতুন এবং ফয়েজ আহমদ। 'বিশেষ সহকারী' মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা এবং আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী। রূপসজ্জায় : আমিনুল ইসলাম এবং প্রচ্ছদশিল্পী আনোয়ারুল হক। ৬ষ্ঠ বর্ষের ৫ম সংখ্যায় (ভাদ্র ১৩৬১) সাধারণ সম্পাদক এ. এইচ. এম. আবদুল কাদের এবং ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ইজ্বাব উদ্দিন আহমদ। ১৩ বর্ষের সপ্তম সংখ্যায় (কার্তিক

১৩৬৮) ‘সহকারী’ রূপে নাম ছাপা হয় রাবেয়া চৌধুরী ও মাহমুদ যকীমুল্লাহ-র। বিভিন্ন সংখ্যায় বিভিন্ন জনের নাম সম্পাদনা ও প্রকাশনার সঙ্গে সংযুক্ত হলেও মূল নেতৃত্বে কাদের সাহেব ছিলেন বলে পনের বৎসর যাবত দিলরুবা একনাগাড়ে প্রকাশিত হতে পেরেছিল। এবং পত্রিকাটি সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সমাজ, রাজনীতি, রাষ্ট্রীয়-ভাবনায় কালিক চাহিদার পরিচয় দিতে চেয়েছিল। পত্রিকার বিষয় ও আঙ্গিক পরিকল্পনায় বৈচিত্র্য ও নতুনত্ব সৃষ্টির চেষ্টা ছিল। এর লেখক-সূচিতে রয়েছেন অসংখ্য নবীন-প্রবীণ শিশু-মহিলা অখ্যাত-প্রখ্যাত লিখিয়েরা। নামজাদা ইসলামী চিন্তাবিদ, মুসলিম সভ্যতার বিষয়ে রচনার লেখকবৃন্দও রয়েছেন এই তালিকায়।

দিলরুবাবার লেখক গোষ্ঠীতে রয়েছেন : শইখ আবদুর রহিম, অধ্যক্ষ শেখ শরফুদ্দীন, আবুল ফজল, বেগম শামসুল্লাহার (মাহমুদ), ফররুখ আহমদ, কিরণ শংকর সেনগুপ্ত, সৈয়দ আলী আশরাফ, রওশন ইজদানী, আশরাফ সিদ্দিকী, আবদুর রশীদ খান, রাশীদুল হাসান, সৈয়দ আলী আহসান, আবদুল মওদুদ, অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খাঁ, অধ্যাপক অজিত কুমার গুহ, নূরুল মোমেন, ডাঃ এ. কে. এম. আবদুল ওয়াহেদ, ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন, বেগম সুফিয়া কামাল, শাহাদাৎ হোসেন, আ. ন. ম. বজলুর রশীদ, মুফাখখারুল ইসলাম প্রমুখ।

দিলরুবাবার বিস্তারিত লেখক তালিকা থেকে দেখা যায় পূর্ব বাঙলার প্রধান লেখকেরা মাহেনও-র মতো এতেও রচনা প্রকাশের জন্য এসেছেন। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের নতুন, প্রধান লেখক-গোষ্ঠীর অনেক সদস্য-শামসুর রাহমান, আহমদ শরীফ, সাইয়িদ আতীকুল্লাহ, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, হাসান হাফিজুর রহমান, আল মাহমুদ, আবু হেনা মোস্তফা কামাল প্রমুখ দিলরুবায় আধুনিক সাহিত্য চর্চা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ, আধুনিক শিল্পকলা ও কথাসাহিত্য-সাধনার বিচারে দিলরুবাবার ভূমিকা গৌণ নয়। জ্যৈষ্ঠমাসের দ্বিতীয় (প্রথম বর্ষের ১৩৫৬) সংখ্যাতে কাজী নজরুল ইসলামের কাব্য, সাহিত্য-চিন্তা ও শিল্পের উৎকর্ষ-অপকর্ষের আলোচনায় দিলরুবাবার লেখকেরা এদেশে নজরুল চর্চার ইতিহাসে এক নতুন মাত্রা সংযোগ করেছিলেন। কাজী মোতাহার হোসেন তাঁর নিকট লিখিত ‘নজরুলের পত্রাবলী’ সংকলিত করেছিলেন—যা বিশেষ আকর্ষণীয় ছিল এবং পূর্ব বাঙলার পত্র-পত্রিকায় নজরুলের অপ্রকাশিত পত্র-মুদ্রণ এর প্রয়াস দিলরুবাবাই প্রথম গ্রহণ করেছিল।<sup>৫</sup>

কাজী মোতাহার হোসেন ‘নজরুলের জীবন ও কাব্য’ সম্পর্কেও দিলরুবাবাতে আলোচনা করেন। ১৯৪৯ সনের জুন মাসের আগে এদেশ থেকে প্রকাশিত পত্রিকায় নজরুল-চর্চা তখনও ব্যাপকভাবে দেখা যায় না। সেক্ষেত্রে দিলরুবাবার এই নজরুল সংখ্যাটি (জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৬, ১/২) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কাজী মোতাহার হোসেন ব্যতীত এই সংখ্যায় লিখেছিলেন।

বেগম সুফিয়া কামাল (কবিতা—তুমি সকলের পরমাত্মীয়) ; শাহাদাৎ হোসেন (স্মৃতি—পুরানো কথা) ; সৈয়দ আলী আহসান (প্রবন্ধ—নজরুল ইসলাম, এটি তাঁর অপ্রকাশিত বইয়ের পাণ্ডুলিপি থেকে, ভূমিকাংশ ; তিনি একালের অপরাপর পত্রিকাতেও নজরুল সম্পর্কে যা লিখেছেন, তাও তাঁর এই অপ্রকাশিত বইয়ের

পাণ্ডুলিপি, পাদটীকায় সে তথ্য উল্লেখ করে ছাপা হয়েছে;—দেখা যাবে); আনম বজলুর রশীদ (কবিতা—বিদ্রোহী নজরুল); কিরণশংকর সেনগুপ্ত (প্রবন্ধ—নবযৌবনের কবি নজরুল); মুফাখ্খারুল ইসলাম (কবিতা—আবির্ভাব); অধ্যাপক অমিয়ভূষণ চক্রবর্তী (প্রবন্ধ—আমার প্রশ্নাম); অধ্যাপক অজিতকুমার গুহ (প্রবন্ধ—নজরুলের সর্বশেষ কাব্য); আশরাফ সিদ্দিকী (কবিতা—কাজী নজরুল ইসলাম); অধ্যাপক মোহাম্মদ ওসমান গনি (প্রবন্ধ—বিপ্লবী কবি নজরুল); মনোরমা গুহ ঠাকুরতা (প্রবন্ধ—নজরুল স্মৃতি); মঈনুদ্দীন (প্রবন্ধ—নজরুল প্রসঙ্গে); রওশন ইজদানী (কবিতা—বিদ্রোহী কবি নজরুল); ফতেহ লোহানী (প্রবন্ধ—গীতিকার নজরুল); মোহিতলাল মজুমদার (প্রবন্ধ—নজরুল কাব্যের প্রাথমিক বিচার—পুনর্মুদ্রণ/সংকলন); খোদকার আবদুল হামীদ (প্রবন্ধ—নজরুল ইসলাম); জাহানারা আরজু (কবিতা—জেগে ওঠ তুমি কবি); খোদেজা খাতুন (প্রবন্ধ—নজরুল কাব্যে নারী); এস. এম. আবদুল জলিল (কবিতা—কথা কও কবি); নাজীর আহমদ (প্রবন্ধ—বাংলা সঙ্গীতে রবীন্দ্র ও নজরুল-যুগ); রাশিদুল হাসান (প্রবন্ধ—হাস্যরসিক নজরুল); আবুল ফজল (প্রবন্ধ—নাট্যকার নজরুল) প্রভৃতি।

প্রতি বছর জ্যৈষ্ঠ মাসে নজরুল জন্মজয়ন্তীতে দিলরুবা বিশেষ আয়োজন করেছে। তাছাড়া মাঝে মাঝে নজরুল-আলোচনা এবং সম্পাদকীয়তে নজরুলের বিষয়ে নানান গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য প্রচার করা হয়েছে। নওবাহার নজরুল সম্পর্কে প্রকাশিত গোলাম মোস্তফার প্রতিক্রিয়াশীল বক্তব্যকে দিলরুবা প্রতিরোধ করেছে। সব মিলিয়ে দিলরুবা নজরুল চর্চায় বিশেষ অবদান রাখে। রবীন্দ্রনাথের ওপর লিখিত কিছু প্রবন্ধও দিলরুবা প্রকাশ করেছে। ধারাবাহিকভাবে শ্রী নরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর ‘দরদী রবীন্দ্রনাথ’ ৬ষ্ঠ বর্ষের ৬, ৭, ৮ প্রভৃতি সংখ্যায় ছাপা হয়েছে—যাতে পূর্ববঙ্গের স্মৃতিময় স্থান শাহজাদপুর সম্পর্কে অনেক কথা রয়েছে। মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ‘ক্ষণিকা কাব্যে রবীন্দ্রনাথ’ (১৩/১) শীর্ষক প্রবন্ধ লিখেছেন। প্রফেসর আহমদ শরীফ লিখেছিলেন (৩/১১) ‘রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প’।

দ্বিতীয় বর্ষ ১০ম মাঘ ১৩৫৭ সংখ্যা বিশেষ চিত্রকলা প্রদর্শনীর ওপর প্রকাশ করে দিলরুবা সুধীজনের অশেষ প্রশংসা কুড়িয়েছিল। এ সংখ্যায় আবদুল্লাহ আলমুতী, আলাউদ্দীন আল আজাদ, অমিয়ভূষণ চক্রবর্তী এবং অজিতকুমার গুহ ‘ঢাকা গ্রুপ চিত্র প্রদর্শনী’র সমালোচনা কিংবা পরিচয়মূলক যে চারটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন তা পূর্ববাঙলার পাঠকদের শিল্প-রস-পিপাসা নিবৃত্তিতে সহায়তা করেছিল।

১৯৫২ সনের ১১ মার্চ ঢাকা আর্ট গ্রুপের সৌজন্যে ঢাকা যাদুঘরে এদেশের শিল্পীদের যে চিত্র প্রদর্শনী হয় তার ওপরও বিশেষ আয়োজন করে দিলরুবা। তৃতীয় বর্ষের একাদশ সংখ্যায় (মাঘ ১৩৫৮) আশরাফ সিদ্দিকী ‘চিত্র প্রদর্শনী’র বিস্তারিত পরিচয়মূলক সমালোচনা লেখেন এবং প্রদর্শিত ছবির প্রতিচিত্র সংকলন করে দিলরুবা পাঠকদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছিল।

ছায়া-ছবির জগতের খবর-খবর ছবি ও ছবির সমালোচনা এবং জাতিগঠনে ছায়া-ছবির ভূমিকা বিষয়ে নানা গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ ও নিবন্ধ প্রকাশ করে দিক-নির্দেশ দানের প্রয়াস গ্রহণ করেছিল দিলরুবা। পরিচ্ছন্ন রুটির সিনেমা নির্মাণে সামাজিক দায়িত্ব পালনের পথে চিত্রজগতের কর্তব্যজ্ঞদের মনোযোগ বা দৃষ্টি আকর্ষণে প্রবন্ধ বা আলোচনাগুলোর প্রভাব পড়েছে নিঃসন্দেহে। অন্তত এটা বলা চলে যে দর্শকদের মধ্যে ভালো ছবির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন পত্রিকার আলোচকেরা।

কিন্তু আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রে দেশে অপসংস্কৃতির জোয়ার সৃষ্টির জন্য হলিউড-বোস্বের সংস্কৃতি আমদানীর যে প্রচেষ্টা তখন সরকারিভাবে গৃহীত হয়েছিল, সেই জোয়ারের মুখে এইসব আলোচনা সত্যি কোন প্রাণ পেতে পারেনি, কিন্তু শুভ উদ্যোগ আর আন্তরিক চেষ্টার মূল্য না দিয়ে পারা যায় না। শিশুদের জন্য ‘সবুজ সংখ্যা’ এবং মহিলাদের জন্য ‘মহিলা মহল’ খুলে দিলরুবা দ্বিতীয় বর্ষ থেকেই কার্যক্রম বহুমুখী করে তোলে<sup>১</sup>।

অষ্টম বর্ষের ৭ম-৮ম (যুগ্ম) ‘মহিলা’ এবং দ্বাদশ শিশু-সংখ্যা (চৈত্র ১৩৬৩) অত্যন্ত মূল্যবান। দিলরুবাবার আজাদী সংখ্যা ; পাকিস্তান দিবস সংখ্যা ও ঈদ সংখ্যাগুলোও বিশেষ আদরের বিবেচিত হতো। চতুর্থ বর্ষের চতুর্থ (শ্রাবণ ১৩৫৯), বিপুলায়তন (২০০ পৃষ্ঠার) বিশেষ সংখ্যাটি এগুলোর মধ্যে অন্যতম। আবদুল গাফফার চৌধুরীর ‘চন্দ্রদ্বীপের উপাখ্যান’ শীর্ষক পূর্ণাঙ্গ প্রখ্যাত উপন্যাসটি এ-সংখ্যাতেই প্রকাশিত হয়।

দৌলতল্লাস খাতনের ‘পথের পরশ’ শীর্ষক সম্পূর্ণ উপন্যাস, সৈয়দ আলী আহসানের ‘চাহার দরবেশ’ এবং আবদুল করিম সাহিত্যবিদ্যারদের ‘ইউসুফ-জুলেখা’, ‘আলাওল’ এবং অন্যান্য প্রমুখের মধ্যযুগীয় কবি ও সাহিত্যের উপর লিখিত আলোচনাসমূহ দিলরুবাতে প্রকাশিত হয়।

আহমদ শরীফ (পরে ডক্টর) ইসলামী বিষয় নিয়ে দিলরুবাতে লিখলেও মানবতাবাদী দৃষ্টিতে ইসলামে নারীর অবস্থান বা মর্যাদার বিষয়ে লিখে সমাজের নারী-বিদ্বেষী মনোভাব দূরীকরণের প্রয়াস পেয়েছেন। এক শ্রেণীর প্রচারক সাধারণত ধর্মের নামে নারীকে পাপের আকর হিসেবে গণ্য করে পর্দার অন্তরালে, গৃহে অন্তরীণ রাখার এবং সর্বদা পরিহার করে চলার উপদেশ দিয়ে নারী যেন মানুষ নয়, কেবলই নারী—এমন ধারণা সমাজে সৃষ্টি করতেই নারীর অধিকার ও মর্যাদার সপক্ষে এসব আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হবে।

এ পত্রিকার মহিলা লেখকেরাও নারীর অধিকার বিষয়ে উপর্যুপরি বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ইসলামের পর্দাপ্রথার আলোচনা-সমালোচনা এবং ঝাঁটি ইসলামের অনুসন্ধান-প্রচেষ্টার দ্বারা সমাজ অন্ধ-কুসংস্কার থেকে মুক্তির দিশা কিছু না কিছু পেয়েছিল বলতেই হয়।

আহমদ শরীফ লিখেছেন :

হজরত মুহম্মদ ব্যক্তিগত জীবনে নারীর প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন। তিনি বলতেন ফুল, সুগন্ধ ও নারী আল্লাহর শ্রেষ্ঠ দান।...আগেকার ধারণা পুরুষের দৈহিক ভোগের প্রয়োজনেই ঘরে ঘরে নারী লালিত ও পালিত হতো—এখন দেহ গৌণ ; মন মুখ্য ; এখন আগে প্রেম, পরে কাম।...(তবে) Chastity ও Morality সম্বন্ধে ব্যক্তির ও সমাজের ধারণা পরিবর্তিত না হলে পুরুষের পক্ষে নারীর সমাধিকার স্বীকার করা আজো কার্যত সম্ভব হবে না।<sup>২</sup>

ভাষা-বিতর্ক : শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেই বোঝা যায় বাংলা ভাষার স্বাভাবিক বিকাশেই ‘দিলরুবা’ আস্থাশীল ছিল। এর বিকৃতি-সাধনের প্রয়াসে ঐদের সমর্থন ছিল না। ১৯৫২ সনের মাঘ ১৩৫৮ সংখ্যায়,...গুলি চালানার পরে দিলরুবা লিখেছিল...

...শুরু হইল রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলন, সে-আন্দোলনের পুরোভাগে রহিয়াছে চির-উদ্যমশীল ছাত্রদল—কিন্তু তাহাদের পেছনে রহিয়াছে পূর্ব-পাকিস্তানের জনসাধারণের প্রেরণা। গ্রাম্য জনসাধারণ করাচীর শিরীন-উর্দু বুলির সন্মোহনে মাতৃভাষার বাংলার কথা ভুলিতে পারে না। কাজেই তাহাদের সন্তানরাই করিতেছে বাংলার দাবী।<sup>৯</sup>

১৩৬৮ সনের (১৯৬২, মার্চ) সংখ্যায় বাংলা ভাষা ও একুশে ফেব্রুয়ারি সম্পর্কে সম্পাদক 'আমাদের কথা'য় বলেন শহীদদের পরিবারকে আর্থিক সাহায্য দান করা উচিত।

বাংলা ভাষার ইতিহাসে ২১শে ফেব্রুয়ারি একটি স্মরণীয় দিন।...কিন্তু সংগ্রামের এই গৌরবময় দিনটিকে সরকার এতদিন ইহার স্বাভাবিক মর্যাদা দান করেন নাই।...দশ বৎসর পর আজ তাহা সার্থকরূপ লাভ করিয়াছে। এবং ইতিহাসের এমনই পরিহাস যে—সে স্বীকৃতি দান করিলেন স্বয়ং সামরিক সরকার। জনমতের স্বীকৃতিদান কোনও শাসক গোষ্ঠীর দুর্বলতার পরিচায়ক নহে—বরং জনমতকে শ্রদ্ধা করিয়া চলাই প্রকৃষ্ট রাজনীতি।...আশা করি ২১শে ফেব্রুয়ারি পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর লেঃ জেনারেল আজম খানের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে রাষ্ট্রীয় দফতরে উপযুক্ত মর্যাদা লাভ করিবে এবং ইহা একটি রাষ্ট্রীয় উৎসব দিবস বলিয়া পরিগণিত হইবে।...যে সরকার শহীদদের স্মৃতিফলক (শহীদ মিনার) নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে, সে সরকার যথার্থভাবেই শহীদানের ওয়ারীশানদের জন্য পেনশন নিদিষ্ট করিতে পারেন।...সর্বশেষে আমরা সরকারকে বাংলা সাহিত্য পত্রিকাগুলির উৎকর্ষ সাধনে অগ্রণী হইতে অনুরোধ করিব।...সরকারি সাহিত্য পত্রিকাগুলির লোকসানের টাকা সরকারি তহবিল হইতে...পূর্ণ করা হয়...সেমতে সরকার পত্রপত্রিকা নির্বিশেষে সকল প্রকাশিত সাহিত্য-পত্রিকাকেই স্বত্বল-কলেজ এবং সাধারণ পাঠাগারগুলির তালিকাভুক্ত করিবেন। ইহাতে দেশের সাধারণ সাহিত্যের চর্চা বৃদ্ধি পাইবে। পাঠক সমাজ বাড়িয়া উঠিবে এবং বাংলা সাহিত্য প্রতিযোগিতার মাধ্যমে উত্তরোত্তর উৎকর্ষ লাভ করিবে।<sup>১০</sup>

পূর্ব বাঙলার প্রগতিশীল সংস্কৃতি-সম্মেলনগুলোর প্রতি দিলরুবা শ্রদ্ধাপূর্ণ মনোভাব পোষণ করেছে। মাহেনও-র মতো নিশ্চুপ থেকে যেতে চায়নি। মোহাম্মদীর মতো আক্রমণও করেনি। বরং আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, কাজী মোতাহার হোসেন প্রমুখের বক্তৃতার পূর্ণবিবরণ প্রকাশ করে এবং বিভিন্নভাবে সাংস্কৃতিক জীবনে উজ্জীবন সৃষ্টির নানা প্রয়াস পেয়েছে দিলরুবা। একটি সম্পাদকীয়তে সাংস্কৃতিক-দৃষ্টিভঙ্গী কিভাবে ধরা দিয়েছে দেখা যাক :

সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা আমরা পাকিস্তান জন্ম লইবার সঙ্গে সঙ্গেই পাইয়াছি। এই আমাদের ধারণা। কিন্তু সংস্কৃতির কোনো সংজ্ঞা এখনও নিরূপিত হয় নাই। উর্দু ও বাংলার বোঝাপড়া, আরবি হরফে বাংলা লেখার বচসা এখনও শেষ হয় নাই। যে রাষ্ট্রে একাধিক ভাষা বর্তমান এবং যে রাষ্ট্রের ভৌগোলিক পরিবেশ বিভিন্ন, সেখানকার সংস্কৃতি এক হইতে পারে না। সুতরাং এক বিশেষ ছাঁচে সব কয়টি প্রদেশকে ঢালাই করিতে চাওয়া অর্থই সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা খর্ব করা। আমরা চাই ইসলামী সংস্কৃতির মাধ্যমে পাকিস্তানের বিভিন্ন এলাকার মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হউক। যতদিন আমরা এই সকল দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিয়া নিজেদেরকে স্বাধীন মনে না করিতে পারিব ততদিন আমরা শুধু পাকিস্তানি হইবার গৌরবই করিয়া যাইব। সংস্কৃতি ও ভাষা এক নয়, ভাষা ও সাহিত্যও এক নয়। সুতরাং কাহারও ব্যক্তিগত সংস্কৃতি বা প্রাদেশিক সংস্কৃতিতে হস্তক্ষেপ করাই আজাদীর বরখেলাপ। পাকিস্তানে চাই আমরা এমন আজাদী যাহাতে এই সব ধরণের নিরাপত্তা বজায় থাকিবে। আমরা তখন বুক ফুলাইয়া বলিব, আজাদ পাকিস্তান জিন্দাবাদ!<sup>১১</sup>

সমাজের প্রতিটি ব্যাপারেই দিলরুবা স্পষ্ট মতামত প্রদান করেছিল বলে সমাজ ও রাষ্ট্রীয়-ভাবনার দিক থেকে ইতিহাসে এ পত্রিকা বিশেষ মূল্য পেতে থাকবে। শিক্ষা-ব্যবস্থার



অধপতন রোধ করার জন্য শিক্ষকদের প্রতি প্রকৃত শিক্ষকতার আদর্শ অনুসরণের এবং সরকারকে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দিলরুবা প্রস্তাব করেছে।

‘প্রাইভেট টিউশনি’ বর্তমানে আমাদের প্রধান সামাজিক ব্যাধি রূপে দেখা দিয়েছে। কিন্তু ১৯৪৯-৫০ এর দিকেই এই ব্যবস্থা অবক্ষয়ের শেষ পর্যয়ে চলে গিয়েছিল দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। দিলরুবা প্রাইভেট টিউশনি, খাতা দেখে পয়সার ধান্দা করা, তা নিয়ে দুর্নীতিতে লিপ্ত হওয়া, টেকস্ট বই ছেপে, পাঠ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্তির কুটিল রাজনীতি দ্বারা সমাজ শিক্ষা সংস্কৃতি নৈতিকতা প্রভৃতির ধ্বংসসাধনের প্রয়াসকে দিলরুবা নানাভাবে সমালোচনা বা নিন্দা করেছে।<sup>১২</sup>

এ থেকে তাঁদের নিঃসঙ্কোচ নিরাপোষ মনোভাব ধরা পড়ে, এবং পাঠকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। সমাজভাবনায় কাতর ‘দিলরুবা’ লিখেছে, পাকিস্তানের ৪ বৎসর বয়স হলো। কিন্তু স্বাধীনতার প্রকৃত মূল্যায়ন জাতি করতে পারলো না। রাজনৈতিক পাকিস্তানের ‘সত্তা অনুভব’ করলেও কায়িক নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অগ্রগতি কতোটা হয়েছে সে প্রশ্নই বড়।

... স্বাধীনতা শব্দের অর্থ উচ্ছ্বলতা নহে বরং নিরাপত্তা—কায়িক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক। জাতি ও ব্যক্তি প্রত্যেকের বেলায়ই ইহা প্রযোজ্য। জাতিগত ব্যাপারে পাকিস্তান এই তিনটি বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে কতটুকু কৃতকার্য হইয়াছে তাহা পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে বাজেটে দেশরক্ষা বরাদ্দ প্রত্যেক বারই প্রাধান্য পাইয়াছে। জল, স্থল ও হাওয়ায় পাকশক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমরা সেজন্য মাননীয় দেশরক্ষা-সচিবকে মোবারকবাদ দিতে প্রস্তুত। কিন্তু পরক্ষণেই পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছি যে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের দেশরক্ষা ব্যবস্থা ও সরঞ্জাম একরূপ নহে। পূর্ব পাকিস্তানে জনবল থাকিলেও তেমন কোনও অস্ত্র ও বারুদের কারখানা এখানে নাই। আর যদি পাকিস্তানের একটি অংশ—তথা পূর্ব পাকিস্তান বিকলই রহিল তবে রাষ্ট্রের নিরাপত্তার ব্যাঘাত হইতে বাধ্য। এদিক দিয়া আমরা পূর্বপাক প্রধানমন্ত্রী ও পাক দেশরক্ষা সচিবকে আরও সক্রিয় হইতে অনুরোধ করি। দুর্যোগে পশ্চিম পাকিস্তান হইতে রসদ আনাইয়া পূর্বপাক রক্ষা করা কঠিন হইবে একথা কি তাহারা জানেন না? যদি জানেন তবে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক সম্পদ কেন সমপর্যয়ে বর্ধিত করেন নাই? পাকিস্তানের এই দুইটি অংগের ব্যবধানের দিকে চাহিয়া আত্মরক্ষার জন্য ইহাদেরকে স্বয়ং সম্পূর্ণ করিয়া তোলা তো রাষ্ট্র নেতাদের ফরজ কাজ। এ কর্তব্যে নীতিগত ঘোষণায় তাঁহারা আমাদের সহিত একমত হইলেও তাঁহাদের মন্থর-গতি আমাদিগকে উতলা করিয়া তুলিয়াছে।

এই তো গেলো বাহ্যিক নিরাপত্তা। তারপর আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা। ওদিক দিয়াও পাকিস্তান লাভের পর আমাদের বিশেষ কিছু উন্নতি হয় নাই।... বন্দুকের আওয়াজ করিলে চোরের হাত হইতে... পাল্টা আওয়াজ শুনিত হইয়াছে।... দুর্নীতির জন্য আজ পুলিশ, আইন আদালত বা সিভিল সাপ্লাইকে শুধু দোষী করিলে চলিবে না। আমাদিগকে আজ জাতীয় দুর্নীতি পাইয়া বসিয়াছে।... দেশের এমন কোন বিভাগ নাই যেখানে অল্পবিস্তর দুর্নীতি প্রবেশ না করিয়াছে। জাতির মানসিকতা এত বিকৃত হইয়াছে যে পয়সা (ঘুষ) ছাড়া কোন কাজ হয় এ ধারণাও আমাদের মন হইতে উঠিয়া গিয়াছে।... পয়সা কড়ি লেনদেন ছাড়াও দুর্নীতির একসভ্য সংস্করণ আমাদিগকে পাইয়া বসিয়াছে। কর্মচারীদিগকে ভেট বা পুশমাল্য বা পাটি দিয়া দাতা তাহাদের সহিত যে প্রীতি স্থাপন করেন...(তোহাও) দুর্নীতির সংজ্ঞাভুক্ত করিতে অনুরোধ করিতেছি (পাকিস্তান দিবসে) ; অন্যথায় আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিপন্ন হইতে বাধ্য। পদস্থ সরকারি কর্মচারীগণও যেন নিজেদেরকে এসকল অঘাচিত প্রভার হইতে মুক্ত রাখেন।<sup>১৩</sup>

‘লীগ রাজনীতি’ শিরোনামে সম্পাদকীয় লিখে ১৯৫২ সনের জানুয়ারি মাসে ভাষা-আন্দোলনের পূর্বক্ষণে এই পত্রিকা লিখেছিল :

প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বে মুসলিম লীগের জন্ম। কয়েকে আজমের নেতৃত্বে লীগ পাকিস্তানের বুনয়াদ পত্তন করিয়া ইহার গন্তব্যে উপনীত হইয়াছে। এই সাফল্যের পর লীগের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা এ প্রশ্ন একাধিকবার উঠিয়াছে। রাষ্ট্রশাসন-ব্যাপারে দলাদলি থাকিবেই। সুতরাং একটি রাজনৈতিক দল হিসাবে পাকিস্তানের নির্বাচন ব্যাপারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করায় লীগের মর্যাদা ব্যাহত হইবে—এ কথা উঠিলে বলিতে হয়, পাকিস্তানের বুনয়াদ এখনও কাঁচা। সুতরাং লীগের এখনও প্রয়োজন আছে,—এই যুক্তিই প্রাধান্য পাইল। কিন্তু লীগের সংগঠন যতই আগাইতে—আরম্ভ করিয়াছে ততই দলাদলি বাড়িয়া চলিয়াছে।...পাকিস্তানের সকল প্রদেশেই নির্বাচন অনেক দিন আগেই ফরজ হইয়া গিয়াছে। তবু নির্বাচন দিবার ইচ্ছা সরকারের এতদিন হয় নাই কেন? নির্বাচনে লীগ অর্থাৎ সরকারি দল যাহাতে পরাজিত না হইয়া যায় সেইরূপ পরিবেশ করিলে তারপর নির্বাচনের প্রশ্ন উঠিবে...আর যদি কাহারও কথা বন্ধ করিতে চান তবে ১৪৪ ধারা দিয়া মুখ বন্ধ করিতে প্রয়াস পান ; কিন্তু এই ১৪৪ ধারার নীতি বা বিরোধী দলকে নিশ্চিহ্ন করার নীতি মোটেই গণতন্ত্রী আদর্শের সহায়ক নহে।<sup>১৪</sup>

১৯৫২ সনের নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন (আইসেন হাওয়ার নির্বাচিত হন) প্রসঙ্গে দিলরুবা পাকিস্তানের নির্বাচন প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন।

আমাদের নেতৃবর্গ কেন এসম্বন্ধে সজ্ঞান নহেন তাহা ভাবিয়া পাওয়া মুশ্কিল। স্বাধীনতার আজ পাঁচ বছর উত্তীর্ণ হইল কিন্তু এখনও পর্যন্ত নির্বাচনের কোন সাড়া নাই। শাসনতন্ত্রের রূপ এখনও প্রকাশ পাইল না।<sup>১৫</sup>

## তথ্যপঞ্জি

- জনাব আতোয়ার রহমান ১৫.২.১৯৯৪ তারিখে বলেন, তিনি দিলরুবায় গল্প লেখার জন্য ১০ টাকা সম্মানী পেতেন। তবে সকলকে দেয়া হতো না। লেখা প্রকাশের পর পত্রিকার কপি সংগ্রহ করতে গেলে কাদের সাহেব বলেন, আগে বিজ্ঞাপন দাতাদের পত্রিকার কপি দিয়ে নিতে হবে। পরে লেখকদের কপি সরবরাহ করা হবে। আতোয়ার রহমান এতে ক্ষুব্ধ হন। কারণ, শুধু বিজ্ঞাপন দিয়ে পত্রিকা চলে না। আবার শুধু লেখাও প্রকাশ করা যায় না। চাই দুটোর মধ্যে সুসামঞ্জস্যবিধান। কখনও কখনও সম্পাদকেরা অর্থকড়ি বিষয়ের প্রতি বেশি মনোযোগী হয়ে পড়লে লেখকদের প্রতি (বা সাহিত্যের প্রতি) শ্রদ্ধা ক্ষুণ্ণ হয়। এ অবস্থায় সাহিত্যপ্রকাশ সাহিত্যসেবা বা সৎস্কৃতি সাধনার ন্যায় মহৎ দেশের কাজের পরিবর্তে, ‘সাহিত্য বা সৎস্কৃতি ব্যবসায়’ পরিণত হয়। সম্মানী যে সকলকে দেয়া হতো না তার প্রমাণ সম্পাদকীয়তে বারবার বলা হয়েছে লেখকদেরকে সম্মানী দিতে পারেন না বলে পত্রিকার মান ধরে রাখা যাচ্ছে না। দ্রষ্টব্য দিলরুবায় দশম বর্ষ প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়, পৃ. ৫৬।
- সম্পাদকীয়, দিলরুবা, ১ বর্ষ, ১ সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৫৬।
- ‘আমাদের কথা’ (সম্পাদকীয়) পূর্বেক্ত, ৩ বর্ষ, ১ সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৫৮, পৃ. ৫৪।
- পূর্বেক্ত।
- পূর্বেক্ত।
- মোহাম্মদ আবদুল কাইউম, পূর্বপাকিস্তানের সাময়িকপত্র, আমাদের সাহিত্য, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৯, পৃ. ২৪১।
- পূর্বেক্ত, দ্বিতীয় বর্ষ, ৩য়-৪র্থ (আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩৫৭) যুগ্মসংখ্যায় বলা হয় : আগামী ভাদ্র সংখ্যা থেকে মহিলাদের ‘মহিলা মহল’ ও শিশুদের জন্য ‘সবুজ সংঘ’ খোলা হবে। দ্বিতীয় বর্ষ পঞ্চম ভাদ্র ১৩৫৭

সংখ্যা থেকে 'ঘরনী' (মহিলাদের) ও 'সবুজ সংঘ' খোলা হয়। এতে ছোটদের উপযোগী বড়দের রচনা এবং ছোটদের জন্য শিশু কিশোরদের লেখাও প্রকাশ করা হয়। 'ছায়ালোক' খোলা হয় তৃতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যা থেকে।

৮. আহমদ শরীফ, ইসলামে নারীর মর্যাদা, পূর্বোক্ত, ১৩ বর্ষ, ১১ সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৬৮, পৃ. ১৯।
৯. আমাদের কথা, পূর্বোক্ত, ৩ বর্ষ, ১০ সংখ্যা, মাঘ ১৩৫৮, পৃ. ৭৮০।
১০. পূর্বোক্ত, ১৩ বর্ষ, ১১ সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৬৮, পৃ. ৫৬।
১১. পূর্বোক্ত, ৩ বর্ষ, ৪ সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৫৮, পৃ. ৩৩৯-৪০।
১২. পূর্বোক্ত, ৩ বর্ষ, ৩ সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৫৮ পৃ. ২১৩-১৫।
১৩. পূর্বোক্ত, ৩ বর্ষ, ৪ সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৫৮, পৃ. ৩৩৮-৩৯।
১৪. পূর্বোক্ত, ৩ বর্ষ, ৯ সংখ্যা, পৃ. ৬৪১-৪২।
১৫. পূর্বোক্ত, ৪ বর্ষ, ৭ সংখ্যা, কার্তিক ১৩৫৯, পৃ. ৫৩০।

## ৫. নওবাহার

(১৯৪৯-১৯৫৩)

‘তারানা-ই-পাকিস্তান’ (১৯৪৮) প্রণেতা কবি গোলাম মোস্তফা (১৮৯৭-১৯৬৪) তদীয় স্ত্রী মাহফুজা খাতুনের সম্পাদকত্বে নওবাহার প্রকাশ করেছিলেন পাকিস্তানের জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টি ও সাহিত্যের মাধ্যমে জাতীয় আদর্শের বাস্তব প্রতিফলন ঘটাবার উদ্দেশ্যে।

বিজাতীয় আদর্শের প্রভাব বিমোচন, বিদূরণ এবং ব্রাহ্মণ্যবাদ তথা হিন্দুয়ানীর নিন্দা ও প্রতিরোধ—আর রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও মানবিক আচার-আচরণের সমালোচনার দ্বারা মুসলিম-জাতি গঠন তথা পাকিস্তানি আদর্শের উজ্জীবন-প্রচেষ্টায় গোলাম মোস্তফা ‘নওবাহার’কে উৎসর্গ করেছিলেন এবং প্রায় চার বৎসর তা চালু রাখতে পেরেছিলেন।

এই মাসিক পত্রিকা প্রকারান্তরে ৪টি গোলাম মোস্তফার ব্যক্তিগত মতপথ রুচি-অভিরুচিরই একান্ত দর্পণ। হিন্দু-বিদ্বেষ এবং পাকিস্তানের জাতীয় কবি হিসেবে নজরুল ইসলামের সাহিত্যের ক্রটি-নির্দেশ, আর য়াঁরাই গোলাম মোস্তফার ব্যক্তিগত স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করেছেন তাঁদেরই কুৎসা রটনায় নওবাহার তৎপর হয়েছিল। তবে প্রত্যক্ষভাবে পাকিস্তানি তাহজিব-তমদ্দুনকে অস্বীকার করেনি বা নগ্নভাবে প্রচারও করেনি এমন অনেক গল্প-কবিতা-উপন্যাস ও সাধারণ রচনা এতে প্রকাশিত হয়েছে। এবং সেগুলোর অনেকেই বাংলাদেশের সাহিত্যের ইতিহাসে স্থায়িত্ব লাভ করেছে। এ-কারণে নওবাহার-এর কিছু সদর্ধক ভূমিকা ও মর্যাদা স্বীকার করতেই হবে। তা ছাড়া আর যতোরকমের বক্তব্য আছে— তা খুবই প্রতিক্রিয়াশীল আর পশ্চাৎঅভিমুখী। তৎকালীন পূর্বাঙ্গলার সাহিত্যিক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বিতর্কের স্বরূপ জানার জন্য এগুলোর আলোচনা বা পুনর্পাঠের কিছু আবশ্যিকতাও রয়েছে।

সে যাই হোক, গোলাম মোস্তফার কারণেই ‘নওবাহার’ প্রথম শ্রেণীর লেখকদের কিছু ভাল রচনা পেয়েছিল এবং এতে সমাজ রাজনীতি সংস্কৃতি শিক্ষা বিষয়ে যে সমস্ত রচনা প্রকাশ করা হয়েছে, তাতে বলিষ্ঠ ভাষায় আক্রমণ করা হয়েছে সমাজের হোমরা চোমরাদের। ফলে পত্রিকার পাঠক ও প্রচার বেশ জুটেছিল। দৈনিক আজাদ ও মওলানা আকরম খাঁ-গুপের বিরুদ্ধে নওবাহারে ঘেরকম খোলামেলা কুৎসা রটনা করা হয়েছে—তা তখন এবং এখনও বেশ আগ্রহ ও কৌতূকের উদ্দেক করে। ‘অগত্যা’ এবং ঐ ধরণের পত্রিকার তরুণ লেখকেরা কবি গোলাম মোস্তফাকে ‘গোলমাল মোস্তফা’ বলে ক্ষেপাতেন। রাগে, অপমানে ক্ষোভে এঁদের তিনি ‘চাবুক মারার’ পরামর্শ দিয়েছিলেন। আধুনিক পাকিস্তানের জাতীয় কবি হবার যোগ্যতা তাঁর রয়েছে—এইরূপ আত্মপ্রচারে গোলাম মোস্তফা এমনই নির্লজ্জ হয়ে পড়েছিলেন যে, তখনই তা সকলের প্রচণ্ড হাসির খোরাক জুগিয়েছিল।

নজরুল-বিদ্বেষ ও নজরুল-বিরোধিতার কারণে, আর নজরুলের কাব্য-সাহিত্যের হিন্দুয়ানী অংশ বর্জনের এবং মুসলমানিকরণের সেই বিতর্কের ইতিহাসের জন্য এখনও ‘নওবাহার’ এর নাম বিশেষ—বিশেষ আলোচনায় প্রসঙ্গক্রমে চলে আসে। এই পত্রিকার সার্বিক পরিচয় তাই ইতিহাসে মূল্যবান বিবেচিত হবে।

নওবাহার প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা ১৩৫৬ সনের ভাদ্র মাসে প্রকাশিত হয়েছিল। পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, সম্পাদক হিসেবে নাম প্রকাশ পেতো মাহফুজা খাতুন-এর। ‘পরিচালনায় কবি গোলাম মোস্তফা’। ভাদ্র মাস থেকে বর্ষ শুরু হয়ে প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে বের হবার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল। কিন্তু পূর্ব বাঙলার খুব কম পত্রিকাই নিয়মিত যথাসময়ে প্রকাশিত হয়েছে। বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুলসহ ছয় টাকা বারো আনা। প্রতি সংখ্যা আট আনা। নওবাহার মুসলিম বেঙ্গল প্রেস, ৪৬ নং জিন্দাবাহার ফাস্ট লেন থেকে এম. আবদুর রশিদ দ্বারা মুদ্রিত এবং ৯৫ ইসলামপুর রোড, ঢাকা ১ থেকে মহিউদ্দীন আহমদ কর্তৃক প্রকাশিত হতো। চৈত্র ১৩৫৬ থেকে মোহাম্মদ ইসরাইল হোসেন কর্তৃক মুদ্রিত হয়েছিল।

দ্বিতীয় বর্ষ পঞ্চম সংখ্যা (পৌষ ১৩৫৭) থেকে মহিউদ্দীন আহমদ এর নাম পরিবর্তিত হয়ে প্রকাশক হিসেবে ছাপা হয় সৈয়দ মুর্জিবুল হক-এর নাম। তৃতীয় বর্ষ ৬ষ্ঠ-৭ম সংখ্যা থেকে ইসরাইল হোসেন কর্তৃক একাধারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে। দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যায় নওবাহার নিজের সম্পর্কে সম্পাদকীয়তে লেখে :

নওবাহারের প্রকাশ...আমাদের জীবনে আনে কল্যাণ। এক হাতে সে ভাঙে, আর এক হাতে গড়ে। এই ভাঙা-গড়ার মধ্যেই তো জীবন। নওবাহার আসে তরুণের বেশে। প্রাণের প্রাচুর্যে সে শক্তিমান। পুরাতনকে সে ভয় করে না। কারো সাথেই তার দ্বন্দ্ব নেই। যে সর্বজয়ী, তার মনে কোন...কারও প্রতিই বিরাগ থাকেনা। পুরাতনকে কেন সে স্নতস্ত্র মনে করিবে? পুরাতন ও নতুনের মধ্যে সে তাই কোন সীমা রেখা টানে না। যে তরুণ বন্ধকেও তার যাদুস্পর্শে তরুণ করিয়া না লইতে পারে, সে আবার কিসের তরুণ?

সম্পাদক তাঁদের আদর্শ ও লক্ষ্য সম্পর্কে বলেন :

নওবাহারের পশ্চাতে আছে একটা বিশেষ লক্ষ্য ও আদর্শের প্রেরণা। আমরা দিতে চাই একটা cultural drive, গড়িতে চাই একটা আদর্শ তমুদনিক পাকিস্তান। আমাদের কাব্যে ও সাহিত্যে যদি পাকিস্তান না আসে তবে বৃথাই হইবে এই বাহিরের আয়োজন।—আমরা চাই এমন একদল কবি সাহিত্যিককে যারা এই বন্ধুর পথ দিয়া অগ্রসর হইবেন। সাহিত্য ও সাহিত্যিক দুই-ই আমরা গড়িতে চাই। নওবাহারের ইহাই প্রধান লক্ষ্য।

কিন্তু নিত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলিতে হইতেছে : ‘আমাদের কবি সাহিত্যিকদের একটি অংশ এখনও বিভ্রান্ত হইয়া বিপথে ঘুরিতেছেন।

এই সংখ্যায় ড. ময়হারুল ইসলাম লেখেন, ‘ঢাকার সব ভালো মাসিকেই লিখছি : তবু নওবাহারকেই বেশি ভাল লাগে। কেননা যে পথ আমরা খুঁজছি সে পথের নির্দেশ নওবাহার বেশি করে দিচ্ছে। সেটি দেশের ও সমাজের খাঁটি ইসলামি রূপ। আমরা Progress এ বিশ্বাস করি ততটুকু—যতটুকু ইসলাম সমর্থন করে। ইসলাম সর্বদাই Progressive—চির নতুন।’

যারা ইসলামি ভাবধারায় চলেনা,—যৌনতা, নোংরামী এবং কমিউনিজমের ধ্যান-ধারণা প্রকাশ করে, এবং মান্যগণ্য প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের মুখোশ উন্মোচন করে দেয়, মানহানি ঘটায়—বিশেষত অগত্যা-সীমান্ত প্রভৃতি পত্রিকা,—তাদের কার্যক্রমের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে গভীর ক্ষোভ ও দুঃখ-ভারাক্রান্ত কণ্ঠে আবেগাতিশায্যে নওবাহারে সম্পাদকীয় লিখে বলা হয় :

অচিরে এই দুর্নীতি বন্ধ করুন। শুধু কাগজ বন্ধ করিয়া দেওয়াই এহেন অপরাধের উপযুক্ত শাস্তি নয়।—চাবুক মারা উচিত।’

নওবাহারের চার বছরের সকল সংখ্যা নিয়মিত প্রকাশিত হয়নি। কোনও কোনওটা যুগ্ম সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হয়ে ধারা বজায় রেখেছে। কাগজে মোটামুটি ভালো ছাপা গেট আপ ইত্যাদি ছিল। কিন্তু ধরলেই বোঝা যেত এটা কোনো আত্মগর্ভী স্বাতন্ত্র্যঅভিলাষী মাষ্টার সাহেবের বৈঠকখানা—যেখানে বিশুদ্ধ নন্দনতন্ত্র, সৌন্দর্য ও রূপের চর্চা—অনুশীলন হলেও রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে নিজেদের বক্তব্য শ্রেণীস্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকেই উচ্চারণ করা হতো। জনগণের প্রতিনিধিত্ব তাঁরা করতে চাইতেন না।

জনগণের বিবেচনাকে নওবাহারে সবসময় সম্মানও দেখানো হয়নি। তাঁরা এমন সাম্প্রদায়িক ছিলেন যে, হিন্দুদেরকে পাকিস্তানি নাগরিক হিসেবে গণ্যই করতে চাননি। শত্রু হিসেবে দেখেছেন। নিজেদের বা বাঙালির সংখ্যাগরিষ্ঠতা কমিয়ে দেবার জন্য হিন্দুদেরকে বাদ দিয়ে পশ্চিমের সঙ্গে আঁতাতে আস্থাশীল ছিলেন। তিনি বলেন : পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে তুলনায় পূর্ব পাকিস্তান মোট জনসংখ্যা হিসাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ ৫৬% হলেও মুসলমানের হিসাবে পশ্চিম পাকিস্তানিদের দাবীই অগ্রগণ্য। স্বকীয়তা এবং স্বনির্ভরতার মেরুদণ্ড পাকিস্তান ভক্ত কবি গোলাম মোস্তফা গংদের ছিল না। বাঙালি জাতির বৈশিষ্ট্য ব্যক্তিত্ব মর্যাদার বোধকে নওবাহার তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছে :

বাংলাভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করিবার জন্য দেশব্যাপী আন্দোলন চলিতেছে। মাতৃভাষার প্রতি বাঙ্গালী মুসলমানদের অকৃত্রিম অনুরাগেরই ইহা প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এ অনুরাগ অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু আমরা পূর্বেই বলিয়াছি রাষ্ট্র পরিচালনায় আবেগের স্থান নাই। কাজেই 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' শ্লোগান দিলেই চলিবে না। আন্দোলনকারীদেরকে ধীরস্থির ভাবে নিম্নের কথাগুলি ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।—

... বড় যুক্তি—মেজরিটি—কিন্তু এই অস্ত্রকে আমরা খুব কার্যকরী মনে করি না। আদর্শের বিচারে গণভোট চলে না। গণভোট লইতে গেলে পাকিস্তানই পাইতাম না। তবু—বিচার করিয়া দেখি—১৯৫১ সনের সেন্সাস রিপোর্টে পাকিস্তানের লোকসংখ্যা : সর্বমোট = ৭,৫৬,৩৬,০০০

পূর্ব পাকিস্তানে সর্বমোট =	৪,১৯,৩২,০০০
পশ্চিম পাকিস্তানে সর্বমোট =	৩,৩৭,০৪,০০০
পূর্বপাকিস্তানে মুসলমান মোট =	৩,২২,২৭,০০০
পূর্বপাকিস্তানে অমুসলমান মোট =	৯২,৩৯,০০০
পশ্চিম পাকিস্তানে মুসলমান মোট =	৩,২৭,৩২,০০০
পশ্চিম পাকিস্তানে অমুসলমান মোট =	৯,৭২,০০০

এই হিসাবে উর্দু-বাংলার প্রশ্ন যদি পাকিস্তানের মুসলমানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, 'তবে আমরা হারিয়া যাইব'। কারণ মুসলমান হিসাবে সেখানে আমরা মাইনরিটি। 'মেজরিটি হইতে পারি যদি হিন্দুদের সঙ্গে প্যাঙ্ক করি—কিন্তু এই চুক্তির অর্থ ও তাৎপর্য গুরুতর। ইহা রীতিমত বিদ্রোহী হইবার প্রস্তুতি। পাকিস্তানের লক্ষ্য ও আদর্শ পরিপন্থী।

কবি গোলাম মোস্তফার মতে, পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলমানদের ফেলে পূর্ব বাঙলার হিন্দুদের সঙ্গে প্যাঙ্ক এর কি পরিণাম হতে পারে তা অনুমান করা যায়, যদি মনে করি যে হিন্দুরা পাকিস্তান আন্দোলনে বিরোধিতা করেছিলেন।<sup>২</sup>

নওবাহারের নজরুল-চর্চার পরিচয় জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৭ সংখ্যা থেকে কিঞ্চিৎ উদ্ধার করলেই বোঝা যাবে। সৈয়দ আলী আহসান প্রমুখের নজরুল সংক্রান্ত রচনা এই সংখ্যাতে ছাপা হয়েছে। তাছাড়াও মাঝে-মাঝেই নজরুলের ওপর প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ রচনায় নজরুলকে পাকিস্তানি আদর্শের প্রতিকূল বলে প্রচার করা হয়েছে। আষাঢ় ১৩৫৯ সংখ্যার সূত্র ধরে অগ্রসর হলেই ভালো হয়।

‘নজরুল ও আমরা’ শীর্ষক সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে : নজরুল-ভক্তদের মধ্যে প্রকারভেদ আছে—সত্যিকার ভক্তদের সম্বন্ধে আমাদের কোন অশ্রদ্ধা নেই। কিন্তু অন্ধ বা অতি-ভক্তদের আমরা কোন মর্যাদা দেইনা। তারা কিছু না জেনে বুঝেই মতামত দেন। পাছে অজ্ঞ বলে লোকে তাই। একদল আছেন যারা নজরুলের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে নিজকে বড় করতে চান। নজরুল বার্ষিকীতে অনেকেরই প্রয়াস এই রকমের। এদের আত্মপ্রচার পীড়াদায়ক।

আর একদল আরও সাংঘাতিক। ইহারা কমিউনিস্ট দল। কবি নজরুল সেখানে বড় নয়—‘সাম্যবাদী’ সর্বহারাদের নজরুলই সেখানে বড়। অন্য আর একদলের খবরও আমরা রাখি—তঁাহারা এক সংস্কৃতির উদগাতা। পাকিস্তানে থাকিয়াও তঁাহারা চায় হিন্দু-মুসলিম কৃষ্টির হর-গৌরীরূপ। নজরুল-প্রীতি এইরূপে নানাধাতে প্রবাহিত হইতেছে এবং দূষ্ত কবিকে লইয়া অনেকেই অনেক মতলব হাসিল করিয়া লইতেছেন।—অনেকেরই আন্তরিকতা নাই।—নজরুল সম্বন্ধে এই সমস্ত ভিতরকার কথা জানাইয়া দিবার পর এবং ‘নজরুল-কাব্যের অব্যক্তিগত অংশ’ সমূহ দেখাইয়া দিবার পর নজরুল সম্বন্ধে আর কিছু বলিবার নাই।—নজরুল সম্বন্ধে আমাদের কোন বিরাগ নাই—তঁাহার উপর লিখিত কবিতা প্রবন্ধাদি নওবাহারে ছাপাইতে শুরু করিয়াছি—<sup>৩</sup>

নজরুল-প্রীতি সম্পর্কে মওলানা আকরম খাঁ বনাম গোলাম মোস্তফা তথা ‘আজাদ ভার্সেস নওবাহার’ এর লড়াই এর স্বরূপ কেমন ছিল তাও জানা যাক। গোলাম মোস্তফা ও তদনুবাগী সম্প্রদায়ের নজরুলের বিদ্বেষ-মূলক সমালোচনায় ক্ষুব্ধ হয়েছিল ‘আজাদ’। নওবাহারের উক্তি : ‘নজরুল ইসলাম এ যুগের একজন ক্ষণজন্মা প্রতিভা সন্দেহ নাই। অপ্রতিদ্বন্দ্বী সুর-শিল্পী এবং রসস্রষ্টা হিসাবে তিনি চিরদিন আমাদের মধ্যে বাঁচিয়া থাকিবেন। তবে পাকিস্তানের পরিবর্তিত মনোভঙ্গিমায় এবং নতুন পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর কাব্য কতটুকু স্বীকৃতি পাইবে, বলা কঠিন’—এর প্রতিবাদ করেছিল আজাদ এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে। তাঁরা লেখেন : ‘গোলাম মোস্তফা ‘ইসলাম ও পাকিস্তানের আলোকে নজরুলের কাব্যের উপর মন্তব্য করিয়াছেন।’ অতএব এবার গোলাম মোস্তফা আজাদ ও আকরম খাঁর গুমোর ফাঁস করে দিতে উঠে পড়ে লেগেছেন। নওবাহারে ঘোষণা করা হয় ‘নজরুল (ইসলাম ?) অপেক্ষা ইসলাম বড়ো।’ যারা জেনে শুনেন এর বিরুদ্ধতা করেন তাঁরা ‘ইসলাম-দ্রোহী’ এবং ‘রাষ্ট্রদ্রোহী’। গোলাম মোস্তফা আজাদে প্রতিবাদ পাঠালে তা না ছাপার প্রেক্ষিতে নওবাহার বলে গোলাম মোস্তফা মোনাফেক নন। আজাদ তথা আকরম খাঁ এক কালে নজরুলকে ‘কাফের’ ফতোয়া দিয়েছিলেন। পরে তিনিই নজরুলকে সামনে নিয়ে আসেন (পাকিস্তানের জাতীয় কবি বানানোর জন্য ?)। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সময় মওলানা আকরম খাঁ বলেন,

‘বাংলা রাষ্ট্রভাষা না হইলে আমি হইব প্রথম শহীদ। পরে তিনিই তলে তলে করাচি গিয়ে উর্দু ও আরবি হরফে বাংলা সমর্থন করেন। ‘আজাদ-গ্রন্থের মওলানা প্রীতিও এই শ্রেণীর। সওগাত-এ যাহারা দিনের পর দিন

মওলানা সাহেবের কুৎসা ও গালাগালি করিয়াছে, আজাদে তাহারাই এখন অনুগত ভৃত্য—কবি সাহেবের বিরুদ্ধে আজাদ আবও কত কি করিয়াছে—প্রয়োজন হইলে তাহা আমরা ব্যক্ত করিয়া দিব।<sup>৪</sup>

মোস্তফা সাহেব শিক্ষক হিসেবে শিক্ষা বিভাগের যাবতীয় কাজের কৃতিত্বও আশা করতেন। কিন্তু তা থেকে বঞ্চিত হলে ক্ষেপে যেতেন ‘আজাদ’ এর ওপর। ‘আজাদ অফিসে সরকারি মিটিং’ শীর্ষক একটি সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

—এই অনাচার শিক্ষাবিভাগ সংক্রান্ত। অন্য কোন বিভাগে এই ‘মওলানা শ্রীতি’ নাই। যে বিভাগটি অতি দুর্বল, সেইটিরই দোওয়া—তাবিজের প্রয়োজন। রোগ কঠিন, রোগীর ঠাট্টিবার কোন আশা নাই, তাই এখন ঝাঁড়ফুকের বরকতে যদি ঠাটা যায়—শিক্ষা বিভাগ এই চেটায় আছে। ভাষা, শিক্ষা ইত্যাদি ব্যাপারে শিক্ষা বিভাগ মহাপাপী, তাই তাহারা মওলানা সাহেবের কাছে মুরীদ হইয়াছেন—ঠাঁর হাতে আছে ‘এসমে আজাম’-আজাদ। আজাদ চুপত সব চুপ!! কিন্তু আজাদ ও মৌলানার ভিত্তি কেঁপে উঠেছে।<sup>৫</sup>

**ভাষা-চিন্তা :** ‘রাষ্ট্রভাষা আয়বী’ প্রসঙ্গে ১৯৫০ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে নওবাহার ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ প্রমুখ কর্তৃক আরবিবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার ইস্তেহারকে সমর্থন করার জন্য অভিনন্দন জানিয়ে বলেন :

আমরা দেখিয়া খুশি হইলাম যে, যে-গ্রুপ এতদিন বাংলা কালচারকেই বড় করিয়া আসিতেছিলেন এবং যাহার উৎকট মোহে পড়িয়া উর্দুকে পর্যন্ত বরদাস্ত করিতে পারেন নাই, সেই গ্রুপই আজ একথাপ উচুতে উঠিয়া আরবিবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। —এতে বুঝা যায় তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটিয়াছে। —এতদিন তাঁহারা পাকিস্তানের লক্ষ্য ও আদর্শের সন্ধান পাইয়াছেন। উর্দুকে তাঁহারা সমর্থন করুন আর নাই করুন, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা রূপে সমর্থন করিবার মনোবলকে তাঁহারা হারায়াছেন; —স্বীকৃতির স্বাক্ষর আছে। পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতিরূপে—উস্তুর সাহেব যে উৎকট জাতীয়তাবাদের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতে অনেকেই ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন। ‘আগে বাঙালি পরে মুসলমান’ এই নীতি সেদিন তিনি প্রচার করিয়াছিলেন। সুখের বিষয় এই নূতন প্রস্তাব দ্বারা পূর্বের সেই ভ্রান্ত ও বিকৃত মত খণ্ডিত হইয়া গেল। —মুবারকবাদ। এখন সকল মুসলমানের দৃষ্টি ও লক্ষ্য একমুখী।<sup>৬</sup>

**হিন্দু-মুসলমানের প্রসঙ্গে** ১৯৫০ সনের দাঙ্গার প্রেক্ষিতে নওবাহারের দৃষ্টিভঙ্গি আলোচ্য। —ফাল্গুন ১৩৫৬ সংখ্যায় ‘সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা’, ‘কমিউনিষ্ট পার্টি ও বর্তমান দাঙ্গা’ এবং ‘দাঙ্গার প্রকৃত কারণ’ প্রভৃতি শিরোনামে নওবাহার এ লেখা হয় : দাঙ্গা মাত্র তিন ঘণ্টা চলেছিল। সরকার দমন করে ফেলেন দাঙ্গাকে। কখনই উস্কানি দেয়া হয়নি। বরং ইসলামের দৃষ্টিতে দাঙ্গাকে নিন্দনীয় বলা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা ‘ঢাকা চলো’ শ্লোগান দিয়ে দাঙ্গা বাঁধিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের এই কাজ নিন্দনীয়। ঢাকায় এবং কলকাতায় দাঙ্গার সময় হিন্দু ও মুসলমানকে ইংরেজ, শিখ ও মাড়োয়ারিরা রক্ষা করেছেন। বাস্তবত্যাগী পূর্ববঙ্গের হিন্দুরাই আসলে দাঙ্গা বাধায়। তাদেরকে সরকার (ভারতীয়) উস্কানী দেয়। নিজেরাও জায়গা করে নেবার আশায় বাস্তবত্যাগীরা মিথ্যা অত্যাচারের কথা বলে।

ভাষ্যকার যথার্থই লিখেছেন : কমিউনিষ্টরা দাঙ্গার সময় সাম্যবাদী থাকেন না—হিন্দু হয়ে যান। অর্থাৎ প্রকৃত কমিউনিষ্টদের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী অসাম্প্রদায়িক ‘কমরেড’ থাকতে পারেন না। ‘দাঙ্গার প্রকৃত কারণ’ হলো—

দাঙ্গা না বাধাইয়া ভারত গভর্নমেন্টের উপায় ছিল না। ভারতের অভ্যন্তরে যে বিপ্লবান্বিত ধুমায়িত হইয়া উঠিতেছে, প্যাটেল তাহাকে কৌশলে এই সাম্প্রদায়িক ঝাটে বহাইয়া দিলেন।—পূর্ববঙ্গে কোন কিছু না



ঘটিলেও পশ্চিম বঙ্গের দাঙ্গা অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছিল। প্লান করিয়াই বাগেরহাটের কমিউনিস্ট হাঙ্গামা শূন্য করা হইয়াছিল—এই দাঙ্গা সর্দার প্যাটেলের পরিকল্পিত।

ভারতের বেকার সমস্যা, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, মন্দার জন্য বিপ্লবের বন্যায় ভারত ছয়লাব হয়ে যাবে ভয়ে 'সাম্প্রদায়িকতার খাল কেটে এই অগ্নিস্রোতকে পাকিস্তানের দিকে বহাইয়া দিলেন। আরও একটি ব্যাপার—র্যাডক্লিফের রোয়েদাদে দেখা যাইতেছে যে, ভারত ডোমিনিয়নের প্রায় সব সীমান্তেই মুসলমানেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। পশ্চিম ভারতে কাশ্মির, পশ্চিম বাংলায় মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, ২৪ পরগণা, মালদা, ইত্যাদি হিন্দু-ভারতের এটাও একটা আতঙ্কের কারণ। পশ্চিমবঙ্গের নিরাপত্তার জন্য ঐ সমস্ত সীমান্ত হইতে মুসলিম বিতাড়ন তাই সর্দার প্যাটেলের বুদ্ধিতে অপরিহার্য। সরকারি ভাবে করতে গেলে নানা সমস্যা। 'দাঙ্গা চালু রাখ' নীতিই ভারতের কূটনীতি। পূর্ববঙ্গে হিন্দুরা শান্তিতে থাকলেও পশ্চিমবঙ্গে দাঙ্গা চলবে।<sup>১</sup>

১৯৫১ সনের হরিখোলার মাঠের ইতিহাস খ্যাত সাংস্কৃতিক-সম্মেলনের পূর্বে ১৯৫০ সনের ২১ ও ২২ জানুয়ারি চট্টগ্রামে আরও একটি শিল্প প্রদর্শনী হয়েছিল। ওই সম্মেলনের সভাপতিও ছিলেন আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ। তাঁর বক্তব্যকে ব্যঙ্গ করে নওবাহার লিখেছে : 'তিনি সকলকে উপদেশ দিয়াছেন বাংলা সাহিত্যের 'অতীত ঐতিহ্য' ও ধারাবাহিকতাকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য। সাহিত্যবিশারদ বলিতেছেন : "কোন দেশেরই ইতিহাস খণ্ডিত ও বিচ্ছিন্ন নহে। দেশের সাহিত্য, রাজনীতি ও সমাজজীবনের ঐতিহ্য ও তমদ্দন নির্ভর করে এই ধারাবাহিকতার উপর, তার পরিচয় গ্রহণ ও তাকে আত্মস্থ করার শক্তির উপর। জারজ সন্তান নিন্দিত, কারণ সে বিচ্ছিন্ন, সে ভুঁইফোড়, তার কোন অতীত, কোন ধারাবাহিকতা নাই।—পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যসেবী ও সাহিত্যিক উত্তরাধিকারীগণ যদি ভুঁইফোড়ের বিড়ম্বিত ভূমিকায় অভিনয় করিতে না চাহেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে আমাদের সাহিত্যিক ঐতিহ্য ও তার ধারাবাহিক গতি-প্রবাহের সঙ্গে পরিচিত হইতে হইবে, তাকে গ্রহণ করিতে হইবে, হজম করিতে হইবে।'

১৯৪৮ সনের ৩১শে ডিসেম্বর ও ১৯৪৯ সনের পয়লা জানুয়ারিতে ঢাকায় অনুষ্ঠিত সাহিত্য-সম্মেলনের সূত্র টেনে ১৯৫১ সনের চট্টগ্রাম সাংস্কৃতিক সম্মেলন প্রসঙ্গে নওবাহার লিখেছে :

এবার ইসলামাবাদে (চট্টগ্রাম) দ্বিতীয় সম্মেলন হইল। দেখা যাইতেছে, উভয় সম্মেলনের সভাপতির অভিভাষণ একই সুরে বাধা। একজন বলেন মা প্রকৃতি আমাদের বুকে বাঙ্গালিদের যে ছাপ মারিয়া দিয়াছেন, তাহা টুপি-দাড়ি-লুঙ্গি দিয়া ঢাকা যাইবে না। আর একজনত এই টুপি-দাড়ি-লুঙ্গি পরা সাহিত্যিকদিগকে 'জারজ' ও 'বাদর' বলিয়া গালাগালি দিয়া ফেলিয়াছেন। এই শ্রেণীর উদ্ভট পণ্ডিত ও সাহিত্যিকদের বাড়াবাড়ির ফলেইত বাংলা ভাষার প্রতি বাঙালি মুসলমানের বিতৃষ্ণা জাগিতেছে এবং আরবি ও উর্দুর অনুকূলে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে। যে ভাষার সহিত আমার নাড়ীর যোগ রহিবে না, আমার জীবন ও দর্শন যে ভাষায় রূপায়িত হইবে না, সে ভাষা কেমন করিয়া আমার মাতৃভাষা হইবে? বিজাতীয় পরিবেশ ও ধ্যান-ধারণা লইয়া কি করিয়া একটা জাতির সাহিত্য রচনা করা চলে? জাতি ও তার সাহিত্য এক ধর্মাবলম্বী হওয়া চাই।

মাতৃভাষার কাজ হইল জাতির ধর্ম, আদর্শ, ধ্যান ও স্বপ্নকে রূপ দেওয়া। হিন্দুরা তাহা করিয়াছে, মুসলমানদিগকেও তাহা করিতে হইবে। অন্য কোন কারণে নয়, মুসলমানদের জাতীয় জীবনের সংগঠন,

সংরক্ষণ ও পরিপূষ্টির জন্যই ইহার প্রয়োজন।—নজরুল ইসলাম কি করিয়াছেন? দেব-দেবীর বেলায় তিনি আদৌ বিদ্রোহী নন। তিনি বিদ্রোহী শুধু খোদার বেলায়। কাজেই মাইকেল-বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথকে আমরা বুঝি, কিন্তু নজরুল ইসলামকে বুঝি না।—কাজেই সাহিত্যবিশারদের কথা ও উপমার কোন মূল্য নাই।—আমরা জনাব সাহিত্যবিশারদ সাহেবকে সতর্ক করিয়া দিতেছি। তিনি যেন নীরব হইয়া থাকেন। পুথি সাহিত্য লইয়া তিনি যেন বেশী চেষ্টামেচি না করেন। পুথি-সাহিত্যের অধিকাংশই আমাদের কলঙ্কের ও আগোরবের, কাজেই আমরা আর সেখানে ফিরিয়া যাইব না। পুথি সাহিত্যের মধ্যে আমরা কেন প্রেরণা খুঁজিব? আমাদের প্রেরণার অনন্ত উৎস যেখানে আছে, সেখানে নিশ্চয়ই আমরা তাহা গ্রহণ করিব, কিন্তু মুসলমান কবির নাম দেখিলেই আমরা আর উল্লসিত হইব না।—ঐসব কাব্যে আঙ্গকার দিনে আমাদের কোন পাথেয় নাই। কাজেই সাহিত্য বিশারদের পুথির কাম্মায় আমাদের হৃদয় বিগলিত হইবে না। তিনি তার প্রাচীন পুথির সক্ষয়কে সাবধানে রাখিয়া দিন; আমরা পরে সেগুলি যাদুঘরে রাখিয়া দিব।—আমরা আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ এবং তাঁহার মতাবলম্বী পণ্ডিতদিগের এ-হেন বিকৃত আদর্শ ও পথ-নির্দেশের জন্য তীব্র নিন্দা করিতেছি। সাহিত্যের গতি-পথ ও লক্ষ্যের সন্ধান তাঁহারা হইতে পারেন যাহারা স্বাঙ্গিক ও সত্যদ্রষ্ট। পরপদলেনহনকারীদের এ কাজ নয়। পাকিস্তানের আকাশে-বাতাসে আঙ্গ কি সুর ধ্বনিত হইতেছে? মিনারে মিনারে কোন্ আঙ্গান শোনা যাইতেছে, কোন রঙে আঙ্গ আমাদের মন রাঙা হইয়া উঠিয়াছে, এসব খবর যাহারা না রাখেন, তাঁহারা যেন কাব্য-সাহিত্যের লক্ষ্য ও আদর্শ সম্বন্ধে কোন কথা না বলেন।

পুথি-সাহিত্যের ব্যর্থতার কথা প্রমাণ দিতে গিয়ে নওবাহার সৈয়দ আলী আহসানের বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলেন : 'বিকৃত জীবনধারা ও অপরিচিত ঐতিহ্যের কাছে মুসলমান যখন নতি স্বীকার করেছে, তখন সে মুসলমান হিসেবে পরিচিত হবার অধিকারও হারিয়েছে। সে পরাজয়ের কাহিনী আমাদের স্মরণ করবার নয়; ভুলে যাবার। নতুন পরিপ্রেক্ষিতে জীবনের পরিচয় আমরা যে-ভাবে প্রকাশ করব, সেই প্রকাশ রূপের অতীতের ক্রন্দ উদঘাটিত হবে না।'<sup>৮</sup>

সমাজচিন্তায় নওবাহার স্বকীয় উদ্দেশ্য কখনও বিস্মৃত হয়নি। 'বিশ্বনবী'র রচয়িতা পয়গম্বর হজরত ইব্রাহীম (আঃ), ইউসুফ (আঃ), ও হজরত আজরাইল ফিরিশতাসহ আহাম্মদ মোস্তফার (দঃ) ছবি সম্বলিত আবুল মনসুর আহমদ প্রণীত (কলকাতা থেকে প্রকাশিত) 'ছোটদের কাসাসুল আশ্বিয়া' শীর্ষক বইটি সম্পর্কে ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আলেম সমাজ ও পাকিস্তান সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নওবাহার হুমকি দিতে কার্পণ্য করেননি—'বিষয়টি গুরুতর। এরপর যদি কোন অমুসলমান গ্রন্থকার তাঁহাদের পুস্তকে কোন পয়গম্বরের ছবি ছাপেন বা নাট্যমঞ্চে তাঁহাদের অভিনয় দেখান, তাহা হইলে মুসলিম সমাজ বা পাকিস্তান গণভর্মেন্টের কিছু বলিবার থাকিবে কি?'<sup>৯</sup>

পাকিস্তানের রাষ্ট্র-পরিচালনের 'মূলনীতি কমিটির মূলে' এবং 'ইসলামী শাসনতন্ত্র কিরূপ হইবে' আর শিক্ষার নিয়মনীতি, সিলেবাস, ইত্যাদি সম্পর্কে নওবাহার পর্যাপ্ত পরামর্শ দিয়েছিল। ১৯৫০ সনের ডিসেম্বর নাগাদ প্রকাশিত (পৌষ ১৩৫৭) সংখ্যায় নওবাহার ইসলামি গণতন্ত্রের পক্ষে মত দিয়ে বলেন Head of the state এর হাতে সর্বোচ্চ ক্ষমতা থাকবে, কিন্তু খোলাফায়ে রাশেদীনের অনুকরণে ক্ষমতা মজলিশ-ই শুরা-র হাতে দিলেই ভাল হবে। ডিক্টেটরের ক্ষমতা চেক করার জন্য জনসাধারণের হাতে ক্ষমতা দেওয়া উচিত নয়। নওবাহার গণতন্ত্রের বিপক্ষে কথা বলেছে। নওবাহার কর্তৃপক্ষ রাষ্ট্রীয় চিন্তায়ও যে স্বচ্ছ ছিলেন

না, বাঙ্গালিদের এবং বাঙালি জাতি ও তার সংস্কৃতির উপর খড়গ হস্ত ছিলেন—আর মওলানা মওদুদীর প্রতি আনুগত্য (শ্রদ্ধা) পোষণ করতেন তা মোটামুটি স্পষ্টই বোঝা যায়। ইসলামের নামে মুসলমানিদের অজুহাতে তাঁরা সব ব্যাপারে ছিলেন অন্ধ।

অগণতান্ত্রিকতা, স্বজাতির বৃহত্তর স্বার্থ সম্পর্কে উদাসীনতা তাঁদের চিন্তাধারার প্রধান বৈশিষ্ট্য। মূলনীতি কমিটির প্রস্তাবের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানে তুমুল আন্দোলন হয়। ঐ কমিটির রিপোর্টে পূর্ব পাকিস্তানকে ‘জিম্মী’ বানিয়ে ফেলা হয়েছিল। কিন্তু নওবাহার স্পষ্ট করে এর কোন বিরোধিতা করেনি। আকরম খাঁর আজাদ ও মোহাম্মদী পত্রিকায় লেখা হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানিদের আন্দোলন দেখে ভীত পশ্চিম পাকিস্তানি কর্তৃক ‘প্রাদেশিক’ বলে এদেশীয়দের নিন্দা করা ঠিক নয়। তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া আজাদের সূত্র উল্লেখ করে লিখেছিলেন :

ইসলামে সত্যই কোন প্রাদেশিকতা নাই ; মানি, এবং সরুপ মনোভাব যদি আমাদের মধ্যে কাহারও থাকে, তবে তাহাকেও আমরা নিন্দা করি। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানকেও তাহা বুঝা উচিত। পূর্ব পাকিস্তানিদের ন্যায় অধিকার না মানা এবং তাহাদের হাতে বেশি ক্ষমতা দিতে ভয় পাওয়াও কি প্রাদেশিকতা নয় ? একই অন্যায় করাচিত্তে ঘটিলে ইসলামি হয়, আর ঢাকায় ঘটিলে প্রাদেশিক হয়, এ লজিক আমরা বুঝিতে পারি না।<sup>১০</sup>

নওবাহারের লেখক—গোষ্ঠীর সদস্য গল্প উপন্যাস কবিতা অনেক লিখেছেন। এই তালিকায় রয়েছেন—

কবি গোলাম মোস্তফা, ফররুখ আহমদ, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, এ কে এম নুরুল ইসলাম, আবুল ফজল, এম. এ. আজম, মীজানুর রহমান, বেগম সুফিয়া কামাল, শ্রী মনোমোহন বর্মান, শওকত ওসমান, সুস্মিতা আনোয়ার, সৈয়দ এমদাদ আলী, নুরুল ইসলাম, আশরাফউজ্জামান চৌধুরী, আব্বাসউদ্দীন আহমদ, ক্যাপ্টেন মুস্তাফা আনওয়ার, মুফাখখারুল ইসলাম, শ্রী হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার, আবু তাহের, করিমউদ্দিন আহমদ, হামেদ আহমদ, মবিন উদ্দীন আহমদ, ডাঃ মোহাম্মদ হোসেন, হাবীবুর রহমান, রওশন ইজদানী, আমিলা খাতুন, কাজী গোলাম আকবর, আহসান হাবীব, ডাঃ এম. আবদুল কাদের, এস. ওয়াজেদ আলি, এ কে. এম. আতোয়ার রহমান (আতোয়ার রহমান), কে এম. শমসের আলী, সৈয়দ আলী আহসান, জিজুর রহমান সিদ্দিকী, ইব্রাহীম খলীল, আবুল কালাম মুস্তাফা, এ. কে. এস. নূর মোহাম্মদ বিদ্যাবিনোদ, মোহাম্মদ মোবারক আলী আখন্দ, চৌধুরী ওসমান, খলীলুর রহমান চৌধুরী, মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা, রাবেয়া খাতুন, সৈয়দ মুজিবুল হক, আবদুল মওদুদ, মুহাম্মদ হাবীবুল্লাহ বাহার, শ্রীমতী বেলা রায়, সন্তোষ কুমার ভট্টাচার্য, মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম, মোহাম্মদ আতিয়ার রহমান, ফজলুল সালাম, আবু জেহা নূর আহমদ, জাহানারা আরজু, শাহ আজহার আলী, আবুল হাশেম, মোহাম্মদ আবুল খায়ের, কনিকা দে, মুহাফরুল ইসলাম, এইচ. এম. আজিজুর রহমান, এ. এফ এম. আবদুল হক, কুমারী রওশন আরা বেগম, ডঃ সৈয়দ মুজিবুতাবা আলী, মোঃ সিরাজুদ্দীন কাশিমপুরী, ডঃ মুহীযুদ্দীন, ইব্রাহীম খাঁ, ডঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী, শাহ ছহিলউদ্দীন আহমদ, রশীদা বেগম, ডাঃ এ মালেক, শ্রী বিবেকানন্দ পাল প্রমুখ।<sup>১১</sup>

কবি গোলাম মোস্তফা প্রতি সংখ্যাতেই কুরআন মজীদে স্বকৃত বঙ্গানুবাদ ছাপাতেন। নওবাহারের লেখক তালিকায় পূর্ববাঙলার তখনকার প্রধান লেখকদের প্রায় সকলকেই লিখতে দেখা যায়। ধারাবাহিক উপন্যাস লিখেছেন পূর্ব বাঙলার প্রধান কথা-শিল্পীরা। শওকত ওসমানের ‘আরবের বন্ধু’ আবু ইসহাকের ‘সূর্যদীঘল বাড়ী’ আশরাফ সিদ্দিকীর

‘গলির ধারের ছেলটি’ এবং আতোয়ার রহমান, মির্জা আবদুল হাই প্রমুখের অনেক ভালো-ভালো গল্প এ পত্রিকাতেই ছাপা হয়েছিল। আবদুল মওদুদ-এর ওহাবী আন্দোলনের ইতিহাস এই পত্রিকায় ছাপা হয়। তাছাড়া এতে কবি ও দার্শনিক ইকবালের সাহিত্যের ব্যাপক পরিচয় প্রদান ও তাঁর দর্শনের চর্চা করা হয়েছে। ‘বন্ধিম কি শিল্পী?’ শীর্ষক প্রবন্ধে অধ্যাপক জমীর উদ্দীন আহমদ বলেছিলেন তাঁর অনেক বই-ই রসোস্তীর্ণ হয়নি।<sup>১২</sup>

এই ধরনের মন্তব্য এবং নজরুল-সাহিত্যের অশৈল্পিক অরসিক ইসলামিক পাকিস্তানবাদী ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পত্রিকার সাহিত্যাদর্শকে খাটো করেছে সন্দেহ নেই। পত্রিকার সম্পাদকের আদর্শই যে প্রধানত পত্রিকাতে প্রতিফলিত হয়—তার প্রমাণ হলো যে-নওবাহার আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদকে যাচ্ছে তাই নিন্দা ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেছিলো,—সেই পত্রিকার পাতায় আহমদ শরীফ পাকিস্তানি আদর্শের অনুসারি মুসলিম ঐতিহ্য সচেতন দৃষ্টিভঙ্গীতে লিখেছেন প্রবন্ধ—‘পাকিস্তানের সাহিত্যের আদর্শ’ (২/৮) এবং ‘বাংলা সাহিত্যের হিন্দু ইতিহাসকার ও মুসলমান’ (৪/৪)।

আহমদ শরীফের প্রবন্ধের বক্তব্যে এবং প্রেরণায় কালিক ও বাস্তব সত্য যথেষ্ট থাকলেও রচনার প্রেরণা এবং তৎকালিন সামাজিক পরিস্থিতি সার্বিকভাবে মিলিয়ে পড়লে উপলব্ধি করা যায় তিনিও পাকিস্তানের নাগরিক এবং জাতিতে মুসলমান বাঙালি :

—চারদিক থেকে ধ্বনি উঠছে—ইসলামি সাহিত্য চাই। ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে ইসলামি তমদ্দুন-তাহজিব-ঐতিহ্য-আদর্শ প্রতিফলিত করাই হবে আমাদের সাহিত্যকদের ব্রত। কিন্তু (ইসলামি আদর্শ প্রতিফলিত করা বড়) সাধনা সাপেক্ষ—ইসলামের এই আদর্শ ইসলামি-আধারে দেশি পরিবেশে অর্থাৎ ব্যক্ত ও সমাজের সমস্যা অন্য কথায় জগৎ ও জীবনের সমস্যা, কোরআন ও মুসলিম ঐতিহ্যের পরিপ্রেক্ষিতে দেশি পরিবেশে রূপায়িত করতে পারলেই পাকিস্তানে সত্যিকার ইসলামি সাহিত্য—অন্য অর্থে বিশ্বজনীন সাহিত্য সৃষ্টি হবে। তার আগে প্রয়োজন—ইসলামের শিক্ষা ও মর্ম-বাণীকে একান্তভাবে গ্রহণ করা, আত্মস্থ করা, হজম, করা। তাহলে বিনা আয়াসে স্বভাবতই রচনা স্থায়ী হয়ে উঠবে। ইসলামের সৌন্দর্যের তারিফ মুখের বুলিতে নয়—যদি দিলের বুলি দ্বারা করা যায় তবে সাহিত্য আপন-থেকে ইসলামী রঙ্গে রঞ্জিত হয়ে উঠবে। আর ইসলামী হলেই তা হবে সর্বজনীন সাহিত্য। কেননা ইসলামি আদর্শ হচ্ছে দেশকালপাত্র নিরপেক্ষ এবং সাহিত্যের প্রধান উপকরণ হচ্ছে মানুষ—ইসলামের মূলনীতির পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের জীবনের সমস্যা বিচার ও সমাধান প্রচেষ্টার মধ্যেই ইসলামি বা পাকিস্তানি সাহিত্য গড়ে উঠতে পারে। যেমন উপনিষদের মর্মবাণী ফুটেছে রবীন্দ্রকাব্যে আর কোরআনের নির্যাস পাচ্ছি ইকবালের সাহিত্যে।<sup>১৩</sup>

এই দৃষ্টিকোণ থেকেই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের সমালোচনা করে আহমদ শরীফ লিখেছেন :

ড. সুকুমার সেন ও তাঁহার সমগোত্রীয়রা সত্য ও বিচার নিরপেক্ষ নিজস্ব অভিমত গায়ের জ্বোরে আমাদের উপর চাপিয়ে দিয়ে, আমাদের স্বীকৃতি আদায় করে নিচ্ছেন। আমরা এতিম অসহায়ের মত তাঁরা যা বলছেন তাই মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছি। কিন্তু আর কতদিন বাঙলার মুসলমান হিন্দু-অভিভাবকত্বে এতিম হয়ে থাকবে? হিন্দুই বা আর কতদিন মুসলমানদের দাবিয়ে রাখবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকবে? বাঙলার মুসলমান হিন্দুদের সাথে সাথেই বাংলা সাহিত্য সৃষ্টি করে গেছেন।<sup>২৪</sup>

তথ্যপঞ্জি

১. সম্পাদকীয়, নওবাহার, ২ বর্ষ ১ সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৫৭, পৃ. ৪৮।
২. পূর্বোক্ত, ৩ বর্ষ, ১০ সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৫৯, পৃ. ৩৮৮-৩৯১।
৩. পূর্বোক্ত।
৪. পূর্বোক্ত, ১ বর্ষ, ১০ সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৭, পৃ. ৬২৮।
৫. পূর্বোক্ত, ১ বর্ষ, ৯ সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৫৭। সম্পাদকীয় আলোচনা দৃষ্টব্য।
৬. পূর্বোক্ত, ১ বর্ষ, ৭ সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৫৬, পৃ. ৪৪৮।
৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪৫।
৮. সম্পাদকীয়, পূর্বোক্ত, ১ বর্ষ, ৬ সংখ্যা, মাঘ ১৩৫৬, পৃ. ১৯০-৯২।
৯. নওবাহার, ১ বর্ষ, সংখ্যা, পৌষ ১৩৫৬, পৃ. ৩৩৪।
১০. মাহেনও, ২ বর্ষ, ৫ সংখ্যা, পৌষ ১৩৫৭, পৃ. ২৮৭।
১১. লেখক-তালিকা পত্রিকার সূচিপত্র অনুসারে ধারাবাহিকতা রক্ষা করে প্রস্তুত করা হয়েছে তবে পূর্ণাঙ্গ সূচিপত্র বাংলা একাডেমী প্রকাশিত 'পূর্ব বাঙলার সাময়িকপত্র' শীর্ষক গ্রন্থে দেখা যেতে পারে।
১২. অধ্যাপক জমীরউদ্দীন আহমদ, বন্ধিম কি শিল্পী?, নওবাহার ২ বর্ষ, ২ সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৫৭।
১৩. আহমদ শরীফ, পাকিস্তানের সাহিত্যের আদর্শ, পূর্বোক্ত, ২ বর্ষ, ৮ সংখ্যা, চৈত্র ১৩৫৭, পৃ. ৪১৩-১৪।
১৪. পূর্বোক্ত, বাংলাসাহিত্যের হিন্দু ইতিহাসকার ও মুসলমান, পূর্বোক্ত, ৪ বর্ষ, ৪ সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৫৯, পৃ. ১৫৬।

## ৬. তাহজিব

(১৯৫০)

‘তাহজিব’ ‘তমদ্দুন প্রেস’ ৫০ লালবাগ রোড, ঢাকা থেকে ছাপা হতো, আর চিন্তাচেতনায় যুক্তিবাদী-ইসলামি ধারার সন্মিকটবর্তী ছিল। এদিক থেকে, এবং কালিক প্রেক্ষাপটে ‘তাহজিব’ এর বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। কারণ ওহাবী আন্দোলনের রেশপূর্ণ বাঙলার ইসলামি ভাবধারায় পঞ্চাশ দশকের পাকিস্তানের স্থান ও কালগত বিচারে ধর্মভিত্তিক পত্রিকা বন্ধদৃষ্টির পরিচয় না-দেয়ার মধ্যে কিছু অগ্রবর্তিতার মর্যাদা নিহিত আছে। অবশ্য এটা সম্ভব হয়েছিল বাঙলার ইসলামি চিন্তাধারায় পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসী মওলানা মওদুদীর রাজনৈতিক-আদলের ইসলামি-চিন্তাধারার প্রভাব তখন দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল বলে।

পাকিস্তানের রাষ্ট্রনৈতিক কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত হবার কারণে পূর্ব বাঙলায় মওদুদীর সাংগঠনিক ভিত্তি মজবুত হয় এবং সাংস্কৃতিক কার্যক্রম প্রসার লাভ করে। স্বাধীনতার পরে-পরে মওলানা মওদুদী খাঁটি ইসলামি আদর্শের রাষ্ট্রপরিষ্কল্পনা পাকিস্তানে বাস্তবায়িত করার জন্য সাংস্কৃতিক আন্দোলন শুরু করেছিলেন এবং রাষ্ট্রকর্তৃক তাঁকে তখন বেশ ক’বছর কারাগারে আটক থাকতে হয়েছিল। মওলানা মওদুদীর ইসলামি বিপ্লব এর প্রভাব আবিষ্কার করা হয়তো কষ্টকর নয় নওবাহার, দ্যুতি, ইমরোজ, তাহজিব, সাপ্তাহিক সৈনিক ও তমদ্দুন মজলিশ এর কার্যক্রমে। ইসলামি ধারার ইত্যাদি প্রভৃতি পত্রিকার কোনো-কোনো লেখক ও কোনো-কোনো প্রধান রাষ্ট্রীয় ব্যক্তিত্বের চিন্তা-চেতনাতে ওহাবি, মওদুদী এবং শরীয়ত-পন্থার প্রভাব মিশ্র-প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। এর সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতির প্রত্যক্ষ আদর্শিক চাপও স্থির থাকতে দেয়নি চিন্তার কেন্দ্র বিন্দুকে, নানা সময়ে দিক পরিবর্তন করেছে। ফলে চিন্তার মাত্রা বিচারে সূক্ষ্মভাবে কোনো ঐক্য রক্ষিত হয়নি।

মওদুদীর প্রতি তাহজিবের অনুরাগ তাৎপর্যপূর্ণ সন্দেহ নেই। মওলানা মওদুদীর কারা মুক্তির পরে তাহজিবের প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় (মে ১৯৫০, জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৭) সম্পাদকীয় লেখা হয়। তাহজিবের সম্পাদকীতে সরকারের ভুলত্রুটি সংশোধন করা হতো। বিরূপ অথবা বিরোধীদলীয় দৃষ্টিবিন্দুতে কৌতূহলপূর্ণ সমালোচনা করা হতো বিভিন্ন বিষয়ে। মওদুদীর কারা মুক্তির উপর লিখিত সম্পাদকীয় পড়লে তাহজিবকে দৃষ্টিভঙ্গিতে পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামির সমর্থক বলে মনে হয়। পাকিস্তানের রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার নানা প্রসঙ্গের সমালোচনায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের তাবেদারি, অনুকারির বৈশ্ব্যবৃষ্টি বলে বিক্রপাত্মক মন্তব্য হানা হয় এবং খাঁটি ইসলামি রাষ্ট্ররূপে পাকিস্তানকে কায়ম করার লক্ষ্যে করণীয় কি, তা নির্দেশ করা হয়।

মুখে ইসলামি রাষ্ট্রের বুলি আর কাজে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অনুকরণ ও তাহাদের পরিত্যাজ্য শাসনযন্ত্র চালু রাখার চেষ্টা করিয়া জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করা দীর্ঘকাল চলিতে পারে না। বর্তমানে পাকিস্তানে যে সমাজব্যবস্থা চালু রহিয়াছে তাহা ইসলামী নীতির বুনিয়াদে জাতি গঠনের অনুকূল নয়,... পাকিস্তানকে খাঁটি ইসলামি রাষ্ট্রে পরিণত করিতে হইলে বর্তমান সামাজিক কাঠামো আমূল পরিবর্তন করা প্রয়োজন। ইহা অত্যন্ত কঠোর কর্তব্য সন্দেহ নাই। তথাপি উহাতে আমাদের উদাসীন্য প্রদর্শন করিলে চলিবে না। দেশকে সঠিক ভাবে

গঠন করিতে হইলে চাই গণচেতনা। ইহা আনয়ন করিতে প্রয়োজন সুষ্ঠু সাহিত্যের। পাকিস্তানকে ইসলামি রাষ্ট্রে রূপায়িত করিতে হইলে রাষ্ট্রের কর্মচারি ও জনসাধারণের মধ্যে ইসলামি শিক্ষা বিস্তার অপরিহার্য কর্তব্য। ইসলামী শিক্ষা প্রসারের জন্য প্রয়োজন সাহিত্যের। মওদুদী বহু সংখ্যক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন... জামায়াতে ইসলামির মারফতে... প্রচার করিতেছেন। এদিক দিয়া তিনি পাকিস্তানি জনগণের অশেষ ধন্যবাদের পাত্র।... আক্লামার কারামুক্তিতে আমরা আন্তরিক আনন্দ লাভ করিয়াছি। তাহার সুযোগ্য নেতৃত্বে পাকিস্তানকে ইসলামি রাষ্ট্রে রূপায়িত করার আন্দোলন সাফল্য মণ্ডিত হউক।<sup>১</sup>

‘তাহজিব’ এর প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা ১৩৫৭ সনের বৈশাখে প্রকাশিত হয়। নানা রকম নিয়ম কানুন প্রচার করা হয় নিয়মিত মাসিক এর মতো। কিন্তু যেহেতু ৬টি সংখ্যা পরপর প্রকাশিত হয়ে পাঠকের দরবারে আসা হঠাৎ বন্ধ করে দেয়া হয় এবং একটি বছরের ১২টি সংখ্যাও তাহজিবের প্রকাশিত হয়নি, তাই এর বিস্তারিত ফিরিস্তি অনাবশ্যক। বৈশাখ থেকে বর্ষ আরম্ভ হয়ে ....প্রথম সপ্তাহে প্রকাশের আশ্বাস দেয়া হয়েছিল। বার্ষিক মূল্য ধরা হয় সডাক ছয় টাকা। মাসিক তিনটাকা, প্রতি সংখ্যা আট আনা। সম্পাদক ...সৈয়দ আবদুল মান্নান (জন্ম বাখরগঞ্জ ১৯১৪, মৃত্যু ১৯৮০)। ইনি অনেক গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, নিবন্ধ সেকালে লিখেছেন, পরে পাকিস্তান আমলে .... কাজ পেয়েছিলেন, সাংবাদিকগিরি করেও তাঁকে খেতে হয়েছিল। তাহজিব ছাড়াও তিনি ‘সাপ্তাহিক নয়া জামানা’ পত্রিকা সম্পাদনা করেন। ...গুলে বকাওলী (১৯৫৩) মহাকবি ইকবাল, সোনালী যুগের কাহিনী আরও কতিপয় বই তাঁর প্রকাশিত হয়েছিল।<sup>২</sup>

তাহজিবে ‘পৃষ্ঠপোষক’ হিসেবে নাম ছাপা হতো হাকীম মওলবী আবদুল জব্বারের। ‘রূপায়ণ-শিল্পী’ ছিলেন মাহমুদ আলম বেগ। সম্পাদক কর্তৃক তমদ্দুন প্রেস ৫০ লালবাগ রোড ঢাকা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হতো। ‘তাহজিব অফিস’ হিসেবে তমদ্দুন প্রেস এর ঠিকানাই দেয়া হয়েছিল। ১নং আবুল হাসানাৎ রোড (ম্যানেজারের কার্যালয়) এর ঠিকানাও দেয়া হয়েছিল। পৃষ্ঠপোষকের নাম বড় হরফে ছাপা হতো বলে আর্থিক নির্ভরতার বিষয়টি অনুমান করা যায়। প্রথম সংখ্যায় পত্রিকার উদ্দেশ্য সম্পর্কে লেখা হয় ;

পাকিস্তান রাষ্ট্রের সম্মুখে আজ যে সংকট সঙ্কীর্ণের সূচনা হয়েছে তারই ভেতর দিয়ে আজ আমাদের যাত্রা শুরু। আড়াই বছর আগে আমরা জীবন-মরণ সংগ্রামের ভিতর দিয়ে অর্জন করেছি আমাদের আপন-ভূমির আজাদী। পাকিস্তানের ন্যায় পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ রাষ্ট্রের জন্ম বিশ্বের ইতিহাসে অভূতপূর্ব।

তাহজিবের দৃষ্টিতে পাকিস্তান কেমন, কী জিনিস ছিল—তা স্পষ্ট হয় নিম্নোক্ত এই বক্তব্যে : ‘মুসলিম ভারত’ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন প্রথম আত্মপ্রকাশ লাভ করেছিল মুসলিম লীগের মঞ্চ থেকে প্রাচ্যের দার্শনিক কবি ইকবালের অভিভাষণে। ১৯৪০ সালে লাহোর লীগ অধিবেশনে গৃহীত পাকিস্তান প্রস্তাবে সুনির্দিষ্ট রূপ লাভ করলো আক্লামা ইলবালের কল্পনা। তারপর জিন্নাহ দ্বিজাতিতন্ত্রের ভিত্তিতে মুসলিম জাতি গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন—পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়। নবজাত রাষ্ট্রের সামনে সমস্যা বিভিন্ন।

‘তার সমাধানের জন্য জাতির প্রত্যেকটি নাগরিককে সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে। ভিতর ও বাইরে আমাদের রাষ্ট্রের দূশমনের অন্ত নেই।... আমাদের আপাতত কর্তব্য হবে

ভিতরের দুশমন দমন করা। আমাদের কওমী জিন্দেগীতে দুর্নীতির চাইতে বড় দুশমন আর কিছুই নেই। সেই দুর্নীতি ও পরাজিত মনোবৃত্তির মুলোচ্ছেদ করার জন্য আমাদের অবিরাম সংগ্রাম চালাতে হবে। পাকিস্তানের দিকে দিকে এই অভিযান চালাতে হবে অব্যাহত গতিতে। ‘তাহজিব’ আমাদের জাতীয় জীবনের সব গলদ দূর করে সুষ্ঠুভাবে জাতি গঠনের ও সাংস্কৃতিক মান উন্নয়নের চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করবে। আমরা এই নয়া অভিযানে দেশবাসী জনগণকে, কবি-সাহিত্যিক-শিল্পী-চিন্তানায়ক সকলকে আমন্ত্রণ করছি সহযোগিতার জন্য। আল্লাহ আমাদের মনস্কামনা পূর্ণ করুন।...১৩৫৭ বাংলা সনের নওরোজে আমাদের দীর্ঘকালের পরিকল্পিত সাহিত্য পত্রিকা... আত্মপ্রকাশ করিল। আজাদ পাকিস্তান রাষ্ট্রের সংগঠনকার্যে দেশবাসী জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা এই পত্রিকার উদ্দেশ্য।”<sup>৩</sup>

সম্পাদকীয়তে পত্রিকার রাষ্ট্র-ভাবনার স্বরূপ স্পষ্টতই ফুটে উঠেছে ; পাকিস্তান ইসলামি রাষ্ট্র, উহাকে সত্যিকার ইসলামি রাষ্ট্রে রূপায়িত করার কর্তব্য কঠোর হইলেও অপরিহার্য। তাহার জন্য যেমন জাতির অপরিহার্য অঙ্গ ব্যক্তিকে (Person) আত্মসচেতন ও বলিষ্ঠ করিতে হইবে, তেমনই ইসলামি আদর্শ জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করিতে হইবে। এই ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের উপরই আমাদের জাতীয় সংহতি গড়িয়া উঠিবে। প্রত্যেক নাগরিক নিজেকে দেশ ও জাতির গৌরব রক্ষার কঠোর সংগ্রামের সৈনিক বলিয়া মনে করিলে ও বলিষ্ঠ আত্মচেতনার অধিকারী হইলে তবেই আমাদের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর ভিত্তিমূল মজবুত হইবে। আমাদের জাতীয় সাহিত্যের আদর্শ হইবে উহাই। বিলাসের সাহিত্য আমাদের জাতি গঠনের অনুকূল নয়। আমাদের কবি-সাহিত্যিক-দার্শনিক ও চিন্তানায়করাই জাতির পথ নির্দেশ করিবেন।<sup>৪</sup>

‘পাকিস্তানের বেতার’ এ নিম্নমানের অনুষ্ঠান প্রচারের এবং ভিতরে ‘কোন্দল’-‘গোলযোগের’ কঠোর সমালোচনা করে বলা হয় ‘আশা করি’ কর্তৃপক্ষ জাতির প্রেরণা সঞ্চারের অনুকূল কওমী-সংগীত, ইসলামি-নীতিমূলক নাটিকা ও রাষ্ট্র-গঠনমূলক আলোচনার সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া শ্রেমের গান ও সস্তা নাটিকা (অর্থহীন হাস্যরসের) অভিনয় কমাইতে চেষ্টা করিবেন।’

১৯৫০ সনের দাঙ্গার বিষয়ে তৎকালের সকল সাহিত্য-পত্রিকাই মতামত ব্যক্ত করেছে। মোটামুটিভাবে দেখা যায় দাঙ্গা যে এদেশের মানুষ সাধারণভাবে চায় না—তাই-ই ফুটে উঠেছে সমস্ত পত্রিকার ভাষ্যগুলোতে। তাহজিবও দাঙ্গায় উস্কানিদানের জন্য পশ্চিম বাঙলার ভূমিকাকে মন্দ বলেছে। আরও বলা হয়েছে এদেশে দাঙ্গা না হলেও দাঙ্গার কথা যারা বলে বেড়িয়েছে তাদের অধিকাংশই বাস্তবত্যাগী, দুই নৌকায় পা দিয়ে চলে যারা-তারা। তবে ‘ইমরোজ’ এবং ‘তাহজিব’-এর উদ্যোক্তারা এদেশের সুযোগ-সম্মানী কতিপয় দুষ্টলোকের ভূমিকাকে নিন্দা করেছেন। ইকবালের স্মৃতিবার্ষিকী ছাড়াও রমজান, ও ইকবালের সাহিত্য এবং জিন্না ও পাকিস্তানের প্রশাসন, রাজনীতি, সাংস্কৃতিক-অংগন, প্রচার বিভাগ, বেতার, সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি, পাক-ভারত চুক্তি, পূর্ববঙ্গের নতুন গভর্নর, উদ্বাস্ত ও মোহাজের-সমস্যা এবং ‘সাহিত্যে শয়তানী’ বা বৈশ্যবৃত্তি, অবক্ষয়, ‘ব্যক্তি-স্বাধীনতার নমুনা’, বাংলা ভাষার বানান সংস্কার, পূর্ব-পাকিস্তানের শিক্ষাব্যবস্থা, ইসলামি ইতিহাস উপেক্ষিত কেন, পাকিস্তানের মূলনীতি কমিটির রিপোর্ট : পূর্বপাকিস্তানে গণবিক্ষোভ, প্রভৃতি শিরোনামে প্রাসঙ্গিক আলোচনা-সমালোচনার দ্বারা মতামত দিয়ে পূর্ববাঙলার সামাজিক-রাজনৈতিক-



সাংস্কৃতিক স্বার্থ ও বাংলা সাহিত্যের উন্নতি-অগ্রগতির জন্য তাহজিবের প্রচেষ্টা মোটামুটি প্রশংসনীয় ছিল।

মানবেন্দ্রনাথ রায়ের মানবতাবাদী দর্শনে আস্থাশীল লেখকবৃন্দের ‘মুক্তি’ পত্রিকার উচ্চসিত, প্রশংসাত্মক সমালোচনা প্রকাশ করার মধ্য দিয়েও এঁদের উদার-নৈতিক সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গি কিছুটা প্রকাশিত হয়েছে। তরীকুল আলম লিখিত এই সমালোচনা-‘মুক্তি’-র ন্যায় উচ্চ-আদর্শের উন্নত-মানের সাহিত্য পত্রিকাটি কি শেষকালে টিকে থাকবে?—এই সংশয়ে শঙ্কিত হয়ে ব্যক্ত হয়েছে :

আমাদের এই নিতান্ত দুর্ভাগ্য দেশে ভালো সাময়িকপত্রের আয়ু অত্যন্ত ক্ষীণ। এই ক্ষীণ আয়ুর থেকে মুক্তির মুক্তিলাভ সংস্কৃতি-অনুরাগী মাত্রেরই কাম্য। সাহিত্য-ক্ষেত্রের গতানুগতিকতার বেদনাদায়ক অনুভূতি থেকে রেহাই পাবার একটা পথ-সংকেত মুক্তি দিয়েছে।...প্রগতি বিরোধী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের তথাকথিত আওয়াজে মুষড়ে যাওয়া মন ‘মুক্তির’ প্রগতি-অনুসারী আন্দোলনকে অভিনন্দিত করছে। সাহিত্যিক মান নির্ধারণের একটা সুস্পষ্টতা প্রদর্শনে মুক্তির শুভ প্রচেষ্টা আন্তরিক ধন্যবাদার্থ।<sup>৫</sup>

উদারতার কারণেই তাহজিবে মুক্তির মত বামপন্থী পত্রিকার প্রশংসা ছাপা হয়েছে সন্দেহ নেই।

একালের সকল পত্রিকার মতোই তাহজিবও তৎকালের প্রধান কবি ফররুখ আহমদের ‘পাকভুকুমত’ শীর্ষক কবিতা ধারণ করে প্রকাশিত হয়েছিল। তখন হাবীবুর রহমানও প্রায় প্রত্যেক পত্রিকাতেই লিখেছেন। শামসুর রাহমানের লেখাও দেখা যায় অনেক পত্রিকাতে, প্রায় প্রতি সংখ্যাতেই। হায়াত দারাজ খান পশ্চিম পাকিস্তানের কবি। তাঁর লেখাও এদেশের বাংলা পত্রিকায় অনূদিত হতো। তরীকুল আলম, জুহুরুল আলম এবং আনোয়ারা বেগম তিন ভাই-বোন একই সঙ্গে সাহিত্যক্ষেত্রে এসেছিলেন। গল্প কবিতা লিখতেন। তাহজিবে এঁদের সকলের লেখাই ছাপা হয়েছে।

বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীরের গল্প ‘স্বাদ’ (১/১) ; আবুল কালাম শামসুদ্দীনের গল্প ‘পথ জানা নাই’ (১/১) ; এবং ‘কাশবনের কন্যা’ শীর্ষক প্রখ্যাত উপন্যাস তাহজিবেই ধারাবাহিক (প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে—) প্রকাশিত হয়। শাহেদ আলীর বহুল পঠিত ‘একই সমতলে’ (১/৪) ভাঙ্গন (১/২) প্রভৃতি গল্পও এতে ছাপা হয়। কিরণশংকর সেনগুপ্ত তৎকালের পূর্ববঙ্গের সকল শ্রেণীর পত্রিকাতেই লিখতেন, তাহজিবেও লিখেছেন। আশরাফ সিদ্দিকী, মুফাখখারুল ইসলাম, আহসান হাবীব, আতোয়ার রহমান, হাসান জামান, রওশন ইজদানী, আবু রুশদ, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী প্রমুখ শক্তিশালী লেখকেরা যেমন এতে লিখেছেন, তেমনি উর্দু বাতচিহ্নের অনুরাগী মীজানুর রহমানের মতো ‘মাদেবী জবান’-বিরোধী লেখকের রচনাও তাহজিবে ছেপেছে। তখন এই রকম ছিল।

হিন্দু লেখকেরা লিখেছেন : আবার পাকিস্তান, ইসলাম ও উর্দুর ওকালতী করেন— তাঁদেরও লেখা ছেপেছেন পত্রিকার সম্পাদকেরা। বিশেষ দৃঢ় মহৎ কোনো মটোর অভাব এবং পাকিস্তানে সকলের গভীর আস্থা—এটাই ছিল সঙ্গতিহীনতার প্রধান কারণ। শিখার মতো পত্রিকা একালে খুব কম প্রকাশিত হয়েছে। হাসান হাফিজুর রহমান তাহজিবে লিখলেও

একেবারে ভুলে যেতে পারেননি তাঁর স্বকীয়তা। আহমদ শরীফ নওবাহারে লিখলেও তিনি যে কালে আহমদ শরীফ হবেন—তা বোঝা যায়। অর্থাৎ একালের আহমদ শরীফের রচনা—বৈশিষ্ট্য নওবাহারের এবং পঞ্চাশ—বায়ান্নের সময়কালের রচনাতেও হয়েছে প্রকটিত।

তাহজিবের প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যাতে হাসান হাফিজুর রহমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিল, শিরোনাম : ‘পূর্বপাকিস্তানের সাহিত্যের ভূমিকা’। ১৯৫০ সনের বাংলাদেশে এমন গদ্য তখন অনেকেই লিখতে পারতেন না। হাসান হাফিজুর রহমানের (১৯৩২-৮৩) বয়সই বা তখন কতো। কিন্তু চিন্তা ও ভাষার দিক থেকে কে বলবে যে তিনি তখনো ‘টিন এজার’ মাত্র? কাঁচা বয়সের কাঁচা লেখা বলেই হয়তো এর প্রতি কোন গুরুত্ব ছিল না। তবে গবেষণার জন্য লেখাটি গুরুত্বপূর্ণ। সাহিত্যের রীতি, ঐতিহ্য সম্পর্কে প্রচলিত বিতর্ককে সামনে রেখে প্রগতিশীলতাকে সমর্থন করে উপযুক্ত প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন ;

রসের খাতিরে ও প্রয়োজনের তাগিদে যেমন দেশকাল পাত্রের বাদ-বিচার আমরা করিনি, সৃষ্টির বেলাতেও তেমনি একটা মৌলিকতাকে নিরপেক্ষ স্বীকৃতি দিতে হবে। নতুন সাহিত্য গড়ার নামে হাতুড়ী পেটানোর বুকফাটা আহবানেই এই মৌলিকতার জরায়ুর কোষে ঘুমন্ত ক্রম খানখান হয়ে ফেটে পড়বে এ যেমন সহসা আশা করা যায় না, তেমনি নৈরাশ্যের কালো শিরার চাবুক খেয়ে নীল হয়ে যাওয়াকেও ক্ষমা করতে পারিনি। ‘স্বাধীনতা’ যদি নতুন পরিবশের সৃষ্টি করেই থাকে, ‘উত্তীর্ণ’ সাহিত্যে তা ধরা পড়বেই, কেননা জনতার অগ্রগতির সঙ্গে পা মিলিয়ে এর আশা-আকাঙ্ক্ষা সুখ-দুঃখ ও সংগ্রামকে যে চিত্রায়িত করে তুলছে সেইতো সাহিত্য, এগিয়ে চলাই এর মৌলিকতা এবং এ মৌলিকতা নিরপেক্ষ...এ সম্বন্ধে শেষ কথা এই যে কোন উত্তীর্ণ শিল্প কর্ম সমকালীন পরিস্থিতিকে ভাস্কর্য দেবে, কিন্তু এরা হাতিয়ার হতে পারে না। সূচিত ঐতিহ্যের স্বকীয়তা থাকবে কি করে? আজকের সাহিত্য শুধু আজকের জন্যেই নয়—বিপ্লবের পরেও শিল্প-সাহিত্য টেকে এবং টিকবে। কারণ বিপ্লব ঐতিহ্যকে ধ্বংস করেনা, বিকৃতও করে না। এ যেমন সমাজকে নতুন রূপ দেয়, ঐতিহ্যকেও নতুন কাঠামোয় সার্থক করে তোলে।

অপর পক্ষে এই ঐতিহ্যই তো সাহিত্যকে চলার শক্তি যোগায়।... ভাব ও সাহিত্য—সংস্কৃতির ভেতরও এক বিশ্বজনীন অনুভূতির সংযোগ ঘটেছে; আমরা এই যে এক যুগে সাহিত্যের উত্তরাধিকারী বলে যারা ভাবতে চাই তারা যদি সমগ্র বিশ্বসাহিত্যকে নিজেদের সম্পত্তি ধরে নিই তবে ভুল করবো না মোটেই। সেই হিসেবে সংস্কৃতির এই নবতর উত্তরাধিকারী আমরা সবচেয়ে বেশি সমৃদ্ধিশালী।

...রাজনীতি আধিপত্য করছে সমাজের উপর। সাহিত্যও এখন রাজনীতিকে এড়িয়ে চলার খামখেয়ালী কথা ভাবতে পারে না—এবং এতোটা চোখ মেলালেই দেখছি রাজনীতি এখন ঘরের কোণে মাথা ঝুঁকে মরছে না, আর সারা বিশ্বকে নিয়ে ঘর বাধবার জন্য লেগে গেছে।

...ধনিক ও সর্বহারার সংঘর্ষ হচ্ছে; সেটা ভালো, পৃথিবীর সভ্যতাও মুক্তির জন্যে যার প্রয়োজন তার জয় হবেই।...সুতরাং কোন পরিস্থিতিই আমাদের প্রগতিশীল সৃষ্টির কাজের (পথে) অসহযোগ আনতে পারেনা। আমরা যদি পূর্বপাকিস্তানের নতুন সাহিত্য সৃষ্টি করার নামে এর এই স্বাভাবিক ভাবে পরিণতিমুখী ভাষা, ভাব ও রচনারীতিকে সম্পূর্ণরূপে কোন কাঠামোয় ভেঙ্গে-চুরে নতুন প্রচেষ্টা চালাই তবে তাদের প্রতিক্রিয়াশীলতা ছাড়া আর কিছুই বলা যাবে না। জনগণের স্বাভাবিক পরিবর্তন চ্যেতনা ও মননের উৎকর্ষ থেকে ধারা কেটে প্রগতিরই পরিপন্থী হয়ে পড়বে আমরা। এই মুখোশি স্বাধীনতাকেই কায়মি করার উদ্দেশ্য থাকলেই আমাদের বিব্রান্ত ও পঙ্গু করার এই রকম একটা ষড়যন্ত্র উঠতে পারে। জনচেতনাকে ভয় করাতাই এর কারণ আর জনচেতনাকে আচ্ছন্ন করাতাই এর উদ্ভব।

বিভিন্ন জাতির ভেতর সাম্য এবং ঐক্য আনার যে কথা উঠেছে তাকে রূপায়িত করার জন্যে যদি স্বাভাবিক বিবর্তনের উদ্দেশ্যে কোন অঙ্কুহাত থাকে তা ঐ ঐতিহ্যের ভেতর দিয়েই আসতে পারে। জোর দেব আমরা

সেইখানে। জাতীয় অক্ষর সঙ্গে জাতীয় ভাষা ও সংস্কৃতিকে লোপ করার দূর্বৃত্তিসম্মিকে কোন ক্ষমাই নেই। এ হলো হামলা। ধ্বংস করা হবে ঐতিহ্যকে যা তিলেতিলে গড়ে উঠেছে। আজকের মৌলিক ও নতুন সাহিত্য হবে কেবলমাত্র তাই যা এই যুগচেতনাকে চিহ্নিত করে। এই যুগচেতনায় অসন্তোষ, অস্বস্তি, ঘৃণা এবং এরই সঙ্গে পাশাপাশি জাগরী সংগ্রামী পৌরুষ। একদিকে অর্থনৈতিক চাপে সাধারণের ব্যক্তিগত আশ-আকাঙ্ক্ষা বিলোপ অন্য দিকে অপচয়-বিলাস। এর থেকে ধোকা দিয়ে কোন পরিকল্পিত প্রয়াসেরই মুখোমুখি নির্মম আঘাতে একবার মিছমার করে দিই যেন। সাহিত্যকে ভালোবাসলে এযুগটাকে বিকৃত করলে চলবে না ; এই... বলি : প্রত্যেক যুগ-সূচিত অবস্থাই সেই সময়ের ঐতিহ্যের স্বকীয়তায় পূরক। পরে এই বিভিন্নতাই এক সাধারণ রূপ নিচ্ছে। আর সাহিত্য নিরপেক্ষভাবে যুগচিহ্নবহন করে এক অখণ্ড শিল্পকর্মে হচ্ছে সংঘবদ্ধ। সেই জন্যই সাহিত্য একদিকে যেমন কলাসমৃদ্ধ রসসৃষ্টি অন্যদিকে তেমনি একটি প্রয়োজনীয় শিল্পকর্ম যা আমাদের অভিজ্ঞতা, মননের ও রুচির প্রতীক।

এতখানি বলতেই হলো, কেননা আমাদের সাহিত্যের সর্বাঙ্গীন আকাশে কোন শকুনের ছায়া কাঁপতে দেখলে আমরা চঞ্চল হয়ে উঠবোই—আমরা যারা দেশকে ভালবাসি—দেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে যারা আপনার করে জেনেছি। এখানে এরকম সবদলকেই উদ্দেশ্য করছি যারা সাহিত্যকে শুধুই সাময়িক সন্তোহীন হাতিয়ার করতে চায় আর যারা জনজাগ্রত সাহিত্যের একেবারে ধ্বংস চায়। আমরা তো স্বীকার করিই যুগের কামনাকে নিরপেক্ষ বিচার করতে এবং একে ঘোষণা করতে উত্তীর্ণ সাহিত্য কখনও ভুল করে না, আর ভুল করে না দেখেই তো সে ঠেঁকে থাকে।... নিরপেক্ষ বিচার করতে যেয়ে সাহিত্যিক যে নিরপেক্ষই রয়ে যাবেন শেষ পর্যন্ত এতো নয়ই। যুগচেতনার সত্যকে আবিষ্কার করার দায়িত্বে তিনি নিরপেক্ষ—কোন বিভ্রান্তকারী প্রয়োচনাই তাকে টলাবে না। ঠিকঠাক আবিষ্কার করলে সে সত্যকে স্বার্থক করার জন্যে সংগ্রাম হতেই পারেন তিনি। এবং এর জন্যে উচিত ও নির্ভুল পন্থাই তিনি নেবেন এবং ঘোষণাও করবেন সাহিত্যে।

বাংলা সাহিত্যকে দুভাগ করে ফেলছি ; কারণ, বাংলার বুক চিরে দ্বিধাও হয়ে গেছে ; এর সমাজ, রাষ্ট্রচিন্তা এবং বৈদেশিক সংযোগ যখন বিচ্ছিন্ন, এর সাহিত্যও যে আলাদা মোড় নেবে এ এমন কিছু চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখাবার মতো বিষয় নয়। অথচ এর ফলেই বাংলা সাহিত্যের বিশেষ সমৃদ্ধ অংশটাকে আমরা হারিয়ে ফেললাম এরকম ধরে নেয়ারও কোন অজুহাত নেই। এ প্রস্তাবটায় এটুকু নিছক সত্য যে বাংলা সাহিত্য দুভাগ হয়ে গেছে ; দুধারায় এরা বয়ে চলবে এখন, হয়ত ভাষারও বিভিন্নতা আসবে এদের ভেতর ; ব্যস্ ; এরচেয়ে একটুকরো কথাও বেশি নেই এতে। বিশ্ব-সাহিত্য-সংস্কৃতিকে সম্পত্তি বলে ভাবতে পারি, প্রতিবেশী বাংলা সাহিত্যও তেমনি, (এর সঙ্গে আমাদের) সম্পর্ক গভীর নয় এরকম মনে করার কোন কারণ কোনদিন ঘটবে বলে বিশ্বাস রাখিনে। বিশেষ করে ভাষাগত একাধার জন্মেই আমাদের সম্বন্ধ আরও অবিস্ফেদ্য, গূঢ় ও গভীর।

হিন্দু ভাবপ্রধান আওতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিছক বাংলা ভাষাতেই ইসলামি সাহিত্য সৃষ্টি করার প্রচেষ্টাকেই ধরা যাক : বাংলা ভাষাতেই দুটো বিভিন্ন সামাজিক চিত্রাঙ্কন চলছে—তখন দেশ ছিল অখণ্ড ; জনগণের অর্থনৈতিক আকাঙ্ক্ষাও ছিল এক। অথচ জীবনধারণের পদ্ধতির, ঘরকন্যার রুচির, ধর্মগত চিন্তার কি এপিঠ এপিঠ না দেখেছি। কিন্তু এতেই কি বলতে পারি এই দ্বিমুখী সাধনায় বাংলা ভাষার মূলগত ঐতিহ্যিক একা অসংহত হয়ে পড়েছিল ? রচনারীতির বিভিন্নতা ছিল—ভাবধারণেরও বৈচিত্র্যকে অস্বীকার করি না অথচ এর অন্তস্তোত্র ঐতিহ্যিক পরিশীলন কি সমানভাবে পরিপুষ্ট ও বিতরিত হয়নি ? সমান উৎকর্ষ লাভ করেনি ?<sup>৬</sup>

তখনকার সাহিত্য সমাজের অনেক লেখকসদস্য তাহজিবের সূচিপত্র দখল করেছিলেন। পাকিস্তান আমলে বাংলা একাডেমী পুরস্কারপ্রাপ্ত পাকিস্তানবাদী নাট্যকার আশকার ইবনে শাইখের নাটক ‘শাহের জাদী’ তাহজিবের প্রথম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। তাছাড়া লিখেছেন :

মমতাজ বেগম ; মাহমুদ আলম বেগ ; নুরুদ্দিন আহমদ ; আবদুর রশীদ খান ; এ.কে.এস. নূর মোহাম্মদ ; ড. এম আবদুল কাদের ; অধ্যাপক অমূল্য কুমার দাশগুপ্ত ; ডা. মোহাম্মদ হোসেন ; অধ্যাপক আবু তালিব ;

মোহাম্মদ আবদুর রহীম ; আবদুল গফুর ; নাজির আহমদ ; মোহাম্মদ মামুন ; অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল হাই ; আহসান হাবীব ; আবদুর রশীদ খান ; বদরুল হাসান ; সিদ্দিক আহমদ খান ; মোহাম্মদ ফরিদউদ্দীন ; কামরুল ইসলাম ; মাহফুজুল হক ; আবদুল গনি মাহমুদ, অচিন্ত্য চক্রবর্তী, মতিউল ইসলাম ; মুহহারুল ইসলাম ; মোহাম্মদ আমীন খান ; নুরুন্নাহার ; জাহানারা আরজু ; মীর খুরশেদ আলম ; আহমদ ফরিদদ্দীন ; দৌলতনুসা খাতুন ; মোসলেম উদ্দীন ; মোস্তফা কামাল ; শ্রীমম্বথনাথ সরকার, মাহমুদুল হক, সৈয়দ মকসুদ আলী প্রমুখ।

অনেক গল্প, কবিতা এতে রসের যোগান দিয়েছিল। আর নিবৃত্ত করেছিল পাঠকের মানসিক ক্ষুধা-তৃষ্ণা। সমাজের নানা বিষয় আলোচিত হওয়ায় গণ সচেতনতা বৃদ্ধি করেছিল তাহজিব। লেখকদের লিখবার সুযোগ যেখানে যে দেশে এখনও সীমিত—সেখানে সে দেশে তাহজিব এর প্লাটফর্মে শিক্ষানবীশ লেখকেরা লিখে হাত পাকাবার অবকাশ পেয়েছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য, সংস্কৃতি ও দেশের সমাজের মানুষের কথা যেভাবে যা ভেবেছিলেন তা প্রকাশ করতে পেরেছিলেন তাহজিবের মাধ্যমে, এটা কম কথা নয়।

### তথ্যপঞ্জি

১. তাহজিব (সম্পাদকীয়), ১ বর্ষ ২ সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৭।
২. চরিতাভিধান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৫, পৃ. ২৮০।
৩. সম্পাদকীয়, তাহজিব, ১ বর্ষ ১ সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৫৭।
৪. পূর্বোক্ত।
৫. তরীকুল আলম লিখিত মুকতিল সমালোচনা প্রকাশিত হয় তাহজিবের ১ বর্ষ, ৬ সংখ্যা ১৩৫৭-র আশ্বিন এ, পৃ. ৩৯১।
৬. হাসান হাফিজুর রহমান, পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যের ভূমিকা, তাহজিব ১ বর্ষ, ১ সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৫৭, পৃ. ৩৮।

## ৭. দ্যুতি

(প্রথম পর্যায় ১৩৫৬-৫৭ ; দ্বিতীয় পর্যায় ১৩৫৮-৬০)

প্রথমে ‘দ্যুতি’ আবেদ আলীর সম্পাদনায় ভাদ্র ১৩৫৬ (১৯৪৯ সনের আগস্ট) মাসে হামেদ শফিউল ইসলাম কর্তৃক ১১৫ সেগুন বাগান রমনা, ঢাকা ইয়াং পিপলস এসোসিয়েশন ‘এর পক্ষ থেকে প্রকাশিত হয়। ক্লাবের (Y.P.A) পক্ষ থেকে প্রথমে বলা হয়।

‘শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও নৈতিক দিক দিয়া শিশুদিগকে সর্বোত্তমভাবে উন্নত করিবার মহান ব্রত লইয়া প্রতিষ্ঠানটি কলিকাতাস্থ পার্ক সার্কাস নামক অঞ্চলে ১৯৪৫ সনের নভেম্বর মাসে জন্ম লাভ করে। দেশ বিভাগের পর প্রধান শাখা ঢাকায় স্থানান্তরিত হয় এবং প্রতিষ্ঠানটিকে তরুণ ও শিশু উভয়ের জন্য সম্প্রসারিত করা হয়। ক্লাবের তরুণদের জন্য যে শাখা স্থাপিত হয় তাহার নূতন নামকরণ করা হয় ইয়ং পিপলস এসোসিয়েশন এবং ইহারই সাংস্কৃতিক বিভাগ হইতে সমগ্র বাংলার তরুণ সমাজের নিকট সংস্কৃতিমূলক মাসিক ‘দ্যুতি’ প্রকাশিত হইল।’

ঢাকায় ঐরা হাসান শফী স্মৃতি ফুটবল লীগ ও স্যার নাসিম আলী মেমোরিয়াল ফুটবল প্রতিযোগিতা চালু করেন (১৯৪৮)। খেলাগুলিতে প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও রাজনীতিক জনাব হাবিবুল্লাহ বাহার ও তৎকালীন গভর্নর সভাপতিত্ব করেছিলেন। পনেরই আগস্ট ১৯৪৮ এ ‘স্বাধীনতা দিবস’ উদযাপন করা হয় ক্লাবের পক্ষ থেকে। তাছাড়া কয়েকদে আজমের মহাপ্রয়াণে (১১ সেপ্টেম্বর ১৯৪৮) শোক সভা ও নানা সাহিত্য সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড তথা—কবিতা আবৃত্তি, নাটক অভিনয় করানো হয়। ‘দ্যুতি’ প্রকাশের পূর্বে তাঁরা কিছুকাল ‘শিখা’ নামে একটি পাক্ষিক দেয়াল পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। প্রথম দিকের ‘দ্যুতি’ শীর্ষক পত্রিকার ‘কেফিয়ত’ শিরোনামের সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

অনেক মাসিক পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করেছে পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকায় এবং অন্যান্য মফস্বল শহরে, কিন্তু আজ পর্যন্ত আমাদের পর্যায়ভুক্ত ছেলেমেয়েদের জন্য একটিও কাগজ প্রকাশিত হয়নি। আজকের ছাত্র-ছাত্রীসমাজের অবচেতনাত্তে যে বহুমুখী প্রতিভা লুক্কায়িত আছে, তাকে আঁধার থেকে আলাতে আনবার জন্যে আজ ‘দ্যুতি’র প্রয়োজন হইয়াছে।

এতে আরও বলা হয় ; ‘শিশুদের জন্য পত্রিকা দুএকটি প্রকাশিত হয়েছে—কিন্তু তরুণদের জন্য সাহিত্যচর্চার কোন ক্ষেত্র নেই—তরুণরা নানা অলস-চিন্তায় তাদের প্রতিভা বিসর্জন দিচ্ছে এবং নৈতিক আর চারিত্রিক অবনতি ঘটাচ্ছে। মফস্বল শহরের অবস্থা আরও খারাপ। অথচ সাহিত্য মানবজীবনের জন্য অত্যন্ত জরুরী।’ কারণ এর মধ্য দিয়েই মানুষের সমাজের ইতিহাসের পরিবর্তন সাধিত হয়।

তাই আজকে যখন পূর্ব পাকিস্তানে তরুণদল অঙ্কারে তলিয়ে যাবার যোগাড় করেছে অতি দ্রুত তালে তখন প্রায় একাকী আমরা একদল তরুণ এই তীষণ গতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে তাকে রোধ করবার জন্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলাম : জানি না কতদূর সফল হবে আমাদের এই সাধনা। কিন্তু চেষ্টার ত্রুটি করব না আমরা কোনক্রমেই। সাহিত্যই জাতীয় জীবনের অগ্রগতির প্রধান সহায়। যুগে যুগে দেশে দেশে, সাহিত্যই জাতির প্রাণে যুগিয়ে এসেছে শ্রেণ্যের প্রবাহ এবং তার ফলেই জগতের সর্বত্র দেখা গিয়েছে পরিবর্তনের সফলতা। এজন্যেই আমরাও সাহিত্যের মধ্যদিয়েই আমাদের মত তরুণদের সঙ্গে মিতালী পাতিয়ে নিবিড় অন্তরঙ্গতার মধ্যে স্বাধীন দেশের সত্যিকার আদর্শ অধিবাসী হয়ে উঠতে সংকল্প করেছি। আশা করি সকলের কাছ থেকেই যোগ্য সাড়া পাব।’

‘আমাদের কথা’য় পত্রিকাটি স্বকীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করতে গিয়ে যা বলেছে, তাতে তাঁদের সমাজভাবনা এবং তৎকালীন (১৯৪৮-১৯৪৯) পরিবেশের স্বরূপ কিছুটা জানতে সাহায্য করে :

স্বাধীনতার চেয়ে শ্রেষ্ঠবস্তু জগতে আর কিছুই নেই... স্বাধীনতার মধোই প্রাণীর স্বার্থকতা। মানুষ স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, তাই স্বাধীনতাকে সে জীবনের শ্রেষ্ঠতম অবদান বলে গ্রহণ করে; আর পরাধীনতা হতে মুক্তি পাবার জন্য প্রাণ দেয় অকুণ্ঠিতচিত্তে। দ্বিধাহীন চিন্তে অগণিত বীর রক্ত দিয়েছে। তাই পেয়েছি আমরা স্বাধীনতা দুটি বছর আগে। মৃত প্রায় জাতির জীবনে সেদিন উঠেছিল বিরাট আলোড়ন—জনসাধারণের বৃকে জেগেছিল বিপুল সাড়া আশা; আজ তারা মানুষের মত বাঁচবে। কিন্তু আজ দুটি বছর পরে তাদের মনে প্রশ্ন জেগেছে—খাওয়া, পরা, সুখ স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবন যা থেকে তারা দুশো বছর বঞ্চিত, আজও তারা তা পেলো না কেন তাদের জাতীয় সরকারের কাছ থেকে ?

মাঠে খেটে চলেছে চাষী, শ্রমিক কাজ করে চলেছে নানা কলকারখানায়, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় সর্বশক্তি নিয়োগ করে বাঁচিয়ে রেখেছে জাতীয় সরকারকে। এই বহুধা কর্মধারা আজ কোন পথে প্রবাহিত? কে ভোগ করছে তাদের পরিশ্রমের ফল? স্বাধীনতা পাওয়ার আগে রাজশক্তি তাদের এই কর্মফল ভোগ করত কিন্তু আজ তো তারা নেই, তবু কেন তারা বঞ্চিত? কেন বঞ্চিত তারা খাওয়াপরা থেকে? সুখ জীবন থেকে?

এ প্রশ্নের সমাধান নেই—কবু জাগৃত জনতা আজ এ প্রশ্নের সমাধান চায় তাদের জাতীয় সরকারের কাছ থেকে। আমাদের ঐকান্তিক কামনা, যেন জাতীয় সরকার শিশু রাষ্ট্র ও নানা অসুবিধা আপত্তির কথা তুলে...এ প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে না যান—ঠারা যেন নিজেদের সর্বশক্তি নিয়োগ করেন এই প্রশ্নের সুস্থ সমাধানের জন্য। পাকিস্তান জিন্দাবাদ।<sup>২</sup>

‘আমাদের ভবিষ্যত সংস্কৃতি’ শীর্ষক প্রবন্ধে তৎকালীন বিশিষ্ট লেখক, সাংবাদিক মোহাম্মদ মোদাবেবের সংস্কৃতি ও সাহিত্য-জগতে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ছড়ি ঘুরানোকে নিন্দা করেছেন। সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে সংস্কৃতির রূপায়ণ করার পক্ষে মত ব্যক্ত করে তিনি বলেন, সাহিত্যশিল্প শ্রষ্টাদের কল্যাণধর্ম সামনে রেখে সৃষ্টিতে মনোনিবেশ করতে হবে।

মানবতা বোধ হইবে তাহার ভিত্তি। ধর্ম, জাতি, সম্প্রদায় ও শ্রেণীর উর্ধ্বে থাকিয়া যে সমাজকে অবলোকন করিবে, সেই হইবে সত্য দ্রষ্টা, সেই স্রষ্টা। সংস্কৃতির স্বার্থক রূপায়ণ তাহার দ্বারাই সম্ভব।<sup>৩</sup>

‘স্বাধীনতার অর্থ’ শীর্ষক প্রবন্ধে অধ্যাপক অমিয়ভূষণ চক্রবর্তী ব্যাপক জনগণের জীবনের স্বস্তি ও উন্নতিকি স্বাধীনতা বলে বুঝাতে চেয়েছেন এবং উপসংহারে মন্তব্য করেছেন।

সূত্রাৎ আজকের দিনে স্বাধীনতার অর্থ কি এ প্রশ্নের একটা জবাব আমাদের খাড়া করতেই হবে।<sup>৪</sup>

দ্যুতিতে প্রগতিশীল কথা ও চিন্তা অনেক ছিল নিঃসন্দেহে। ‘দ্যুতি’ নামকরণ সার্থক হবারই কথা ছিল। ‘অগত্যা’ (আষাঢ় ১৩৫৬) পত্রিকার সঙ্গে ঐরা আদর্শগত এবং গস্তব্যগত ঐক্য ও সাম্যজ্ঞ লক্ষ্য করেছিলেন বলেই অগত্যাকে ‘সহযোগী’ পত্রিকা বলে উল্লেখ করেছিলেন। অবশ্য পরক্ষণেই আবার সংশোধনী দিয়ে ‘সহযোগী’ কথাটা বাদ দিয়ে পড়ার জন্য পাঠককে অনুরোধ করেছিলেন। জনৈক পাঠিকা চিঠিপত্র (‘যোগাযোগ’ বিভাগে) পত্র লিখেছিলেন :

মাসখানেক আগে ভাল পত্রিকার অভাব দূর করবার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও নেহাৎ যেন বাধ্য হয়েই ‘অগত্যা’ বের হলো। আর তার পরেই আপনারা হঠাৎ চারদিক আলো করে বেরিয়ে পড়ছেন। এখন অগত্যা মহাশয় কি তবে অগত্যা বিদায় নবেন ?

এ—প্রেক্ষিতে ‘দ্যুতি’র বক্তব্য : ‘দেখুন, ‘অগত্যা’ আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠ, সুতরাং তাকে নিয়ে রসিকতা করে বেয়াদপি করতে চাই না। (তবে) ভালো পত্রিকা চালানোর গুরুভার ‘অগত্যার কাঁধে আর সইছিল না। তাই আমরা তা বহন করতে এগিয়ে এসেছি। তবে একেবারেই লাঘব করলে আমাদের উপর বেশি চাপ পড়বে, তাই তাকে বিদায় নিতে আমরা বলব না। তবে নামটা, আমাদেরটা প্রকাশের পর অর্থহীন হয়ে পড়ল কি বলেন ?’

দ্যুতির ‘দেশের সাংস্কৃতিক উন্নতি’...শীর্ষক রচনায় বল হয় : ‘নিজ্জদের বাঁচাতে’ সাংস্কৃতিক উন্নতির দুর্গমপথে নিষ্ঠুর সঙ্গে আলো দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। তবে তা ‘সংকেতের’ মত করবে না আবর্জনা সৃষ্টি। তাঁরা আরও বলেন : ‘দ্যুতি’ পড়লেই আপনার সে আশঙ্কটা দূর হবে, ‘সংকেতের’ মত ‘দ্যুতি’ সাহিত্যে আবর্জনা সৃষ্টি করবে না। বরং সাহিত্যে আবর্জনা সৃষ্টিকারী এইরূপ পত্রিকাগুলোকে নির্মূল করবে। ‘দ্যুতি কেবল খ্যাতিসম্পন্ন লেখকলেখিকাদের লেখা দিয়ে পূর্ণ করবার’ ইচ্ছা পোষণ করেনি। যঁারা নবীন ও অখ্যাত দ্যুতি তাঁদের ‘অসুবিধা’ দূর করতে চায়। ‘লেখা প্রকাশের ব্যাপারে লিখিত বস্তুর উপরই লক্ষ্য রাখি—লেখক বা লেখিকার খ্যাতির উপর নয়। প্রকাশযোগ্য হলে আমরা প্রত্যেকেরই লেখা ছাপাই। তবে আমরা আশা করছি যে তরুণ সমাজেই দ্যুতি বেশী আদৃত হবে।...মাসিক পত্রিকা এবং সাময়িক পত্রিকাজগতে যে অঙ্ককার পরিব্যাপ্ত রয়েছে...‘দ্যুতি’ তাতে আলো দেখাবে—এ—বিশ্বাস আমাদের আছে, আর আছে বলেই তা কার্যকরী করেছে।’

‘দ্যুতি’র প্রথম সংখ্যা কয়েদে আজমের ছবি প্রচ্ছদে ধারণ করে স্বাধীনতা সংখ্যারূপে (আগস্ট ৪৯) প্রকাশিত হয়। একদল যুবকের নাম উৎকীর্ণ ‘দ্যুতি’র সম্পাদকমণ্ডলীতে ছিলেন মতিউর রহমান চৌধুরী। ইহসানুল হক, আজিজুল জলিল, মাহমুদ হাসান, মোসলেহউদ্দীন আহমদ। উপদেষ্টা : হরিপদ দে ; সংগঠন সভাপতি : আবেদ আলী। কর্মপরিষদের সদস্য ছিলেন হামেদ সফিউল ইসলাম (ম্যানোজার) ; কাজী শামসুজ্জামান (প্রচারে ও বিজ্ঞাপনে) ; আহমদ শামসুল ইসলাম (প্রধান উপদেষ্টা)। উদ্দেশ্যাবলীর মধ্যে ছিল।

‘দ্যুতি সাংস্কৃতিক পত্রিকা ; তরুণ লেখক লেখিকাদের উৎসাহ দেওয়াই ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য। ইহা কোন রাজনৈতিক দলীয় পত্রিকা নহে। সাম্প্রদায়িকতার কোন চিহ্নই এখানে নাই। বাংলা ভাষার সেবা ও উন্নতি বিধান ইহার চরম লক্ষ্য।’

নিয়মাবলীতে বলা হয় : বাংলা মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রকাশিত হবে। ভাদ্র থেকে বর্ষ আরম্ভ। বার্ষিক চাঁদা ৬ টাকা। প্রতি সংখ্যা আট আনা। ক্লাবের সদস্যদের জন্য প্রতি সংখ্যা ছয় আনা।

ইয়ং পিপলস এসোসিয়েশন ও চিলড্রেনস ওন ক্লাবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন গভর্নর স্বয়ং ফিরোজ খান নূন। সেজন্যেই গভর্নমেন্টের বিরূপ সমালোচনাকারী অগত্যাতে তাঁরা ‘সহযোগী’

পরিচয় দিয়েও অস্বীকার করতে চেয়েছেন। ক্লাবের প্রধান পৃষ্ঠপোষকরূপে উল্লেখিত হয় গভর্ণর স্যার ফ্রেডারিক চ্যামারস বোর্ণ এর নাম। পৃষ্ঠপোষক : অধ্যক্ষ যোগেশচন্দ্র ঘোষ, জনাব লাবিব উদ্দীনসিদ্দিকী ; সভাপতি : জনাব হাবিবুল্লাহ বাহার। সহ সভাপতি : জনাব এম. এ. জব্বার, জনাব পানাউল্লাহ আহমদ এবং জনাব ওয়াজেদ আলী সরকার। সাধারণ সম্পাদক : জনাব আহমদ শামসুল ইসলাম। নানান পদাধিকারী ছিলেন আরও কতিপয় যেমন ; এম.এ. সামাদ, শামসুজ্জামান, নাজীর আফজাল, আবদুস শুকুর, সুজাউল ইসলাম প্রমুখ।

দ্যুতির প্রথম পর্যায়ে সম্ভবত পাঁচটি সংখ্যা বের হয়েছিল। কিন্তু অনুসন্ধানে দুটি সংখ্যা মাত্র পাওয়া যায়। প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যার পরের দুটি সংখ্যা পাওয়া যায়নি। প্রথম বর্ষ ঈদ সংখ্যা প্রকাশিত হয় আষাঢ় ১৩৫৭ তে। এ সংখ্যার সম্পাদক এ. কিউ. এম. মোসলেহউদ্দীন। অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে প্রকাশক কাজী শামসুজ্জামান। মোঃ আবদুর রহমান কর্তৃক ইস্ট বেঙ্গল প্রেস, ২৬৮ নং নবাবপুর রোড থেকে মুদ্রিত হয়। অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয় বলে পাঠকেরা চিঠিতে অভিযোগও করেছেন, কিন্তু কোনো সদুত্তর দেয়া হয়নি। ক্লাবের ঠিকানা ২৫ নং পল্টন লাইনে স্থানান্তরিত হয় বলে আষাঢ় ১৩৫৭ সংখ্যায় বলা হয়। ১৯৫০-৫১ সনের সভাপতিও ছিলেন মন্ত্রী হাবীবুল্লাহ বাহার। পৃষ্ঠপোষক গভর্ণর ফিরোজ খান নূন। ক্লাবের পক্ষ থেকে খেলাধুলা, ব্যায়াম ইত্যাদি পরিচালিত হতো। নজরুল-রবীন্দ্র-ইকবাল দিবস যথারীতি পালন হতো। রবীন্দ্রনাথের উপর প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা করে পুরস্কার দেয়া হয়েছে উক্ত ক্লাব থেকে। নজরুলের আরোগ্য কামনা করে সরকারকে নানান ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করতো পত্রিকাটি। কবিকে ঢাকায় আনার অনুরোধ তাঁরা করেছিলেন তখন পঞ্চাশের পূর্বে। মোহাজেরদের আর্থিক সাহায্যার্থে বিচিত্রানুষ্ঠানও করা হয়েছিল বলে পত্রিকা পাঠে জানা যায়।

পত্রিকার উদ্দেশ্য ক্লাবের মতই জনকল্যাণকর ছিল। ঢাকা বেতারের কড়া সমালোচনা করে উর্দুর অনুষ্ঠানাদিক্যের জন্য নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়। ১৯৪৮ থেকে পঞ্চাশের দশকের প্রায় সকল বাংলাভাষী পত্রপত্রিকায় নিয়মিতভাবে ঢাকা বেতারে উর্দু-জব্বানী-শ্রোগ্রামের সংখ্যাধিক্যে বিরক্ত হয়ে কঠোর সমালোচনা করা হতো, এটা কি বাংলাভাষী কোনো দেশের অনুষ্ঠান কিনা তাই-ই বোঝার উপায় নেই।—এই ছিল আক্ষেপের মূল কারণ। এটা যেনো উর্দু মাদেরীজবানের কোনো দেশ। মতিউর রহমান চৌধুরীর কটি কথা ‘দ্যুতির আলোচ্য (আষাঢ় ১৩৫৭) সংখ্যা থেকে উদ্ধৃত করলে দৃষ্টিভঙ্গিটা বোঝা যাবে—

পূর্ব পাকিস্তানের এই বেতার প্রতিষ্ঠানটি সত্যিই আমাদের কিনা উহার শ্রোগ্রাম শুনিলে সন্দেহ জাগে। ‘মাশরেকি পাকিস্তান’ ঢাকেকি আওয়াজ শুনিলে শুনিলে কান ঝালাপালা হইয়া উঠিয়াছে। মাগরেবি পাকিস্তানের মাগরেবি ভাষায় শ্রোগ্রাম দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে।... পাকিস্তানের লোকসংখ্যা ৭ কোটি ৬০ লক্ষ... ইহার মধ্যে পূর্বপাকিস্তানে বাস করে ৪ কোটির উপর—পাকিস্তানে মোট ৪টি বেতার কেন্দ্র, রহিয়াছে। আর এই দুর্ভাগা পূর্ববাঙলার ৪ কোটি অপদার্থের জন্য রহিয়াছে মাত্র ১টি।

পশ্চিম পাকিস্তানের কোনো কেন্দ্র হইতেই বাংলার আওয়াজটুকু পর্যন্ত যায় না—আর এখানে বেতারে উর্দুর কার্যসূচির পর কার্যসূচি—তদুপরি আবার উর্দুর সবক। ইহাতে কি আমাদের মনে একটুও দ্বন্দ্ব হয় না? চিরদিনই কি এই ব্যবস্থা চলিবে?...



আশা করিয়াছিলাম পাকিস্তান হাছেল হইবার পর আমাদের ঢাকার বেতার আমাদের বেতার প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে। কিন্তু দেখিয়া আমাদের কি মনে হইতেছে? উর্দু প্রচারের এতগুলি কেন্দ্র থাকিতে কেন আবার মাগরেবি পাকিস্তানের উপরিওয়লা কর্তৃপক্ষীয়া ইহার উপর হাত দিলেন তাহা পূর্ববঙ্গবাসীরা জানিতে চায়।

আমাদের মাতৃভাষা আমরা কোনদিনই নিষ্পেষিত হইতে দিতে পারি না—তা উর্দু অন্যের কাছে যতই শ্রুতিমধুর হউক। আমাদের ভাষা আমাদের কাছে প্রাণের বস্তু। এমনভাবে এ প্রদেশের অধিবাসী ও ভাষার প্রতি অবজ্ঞা দেখাইতে থাকিলে ঢাকা বেতারের ভবিষ্যৎ অন্ধকার সে সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত। এইরূপ প্রচার ভবিষ্যতে বন্ধ করিতে আমরা রেডিও পাকিস্তান কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানাই।

দ্যুতি প্রথম পর্যায়ের সংখ্যাগুলোতে সমাজের স্বার্থে বেশ উচিত কথাই বলতে চেয়েছিল :

সম্প্রতি আবার খবর রটিয়াছে এখানকার সংবাদ বিভাগকে নাকি রাজধানী করাচীতে লইয়া যাওয়া হইতেছে। যাহা আমরা সন্দেহ করিয়াছিলাম তাহাই হইল। পূর্ব বাঙলার খবর আগে যতটুকু প্রকাশ পাইত ২০০০ মাইল দূরের ক্ষীণ আওয়াজে তাহাও আর শুনিব কিনা সন্দেহ। এ বিষয়ে আমাদের জাতীয় সরকারের একটা কর্তব্য ও দায়িত্ব রহিয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। উর্দু প্রোগ্রাম এর এইরূপ ব্যাপক প্রচার যাহাতে বন্ধ হয় তাহার ব্যবস্থা আমাদের জাতীয় সরকারকে অতি সত্বর করিতেই হইবে।<sup>৫</sup>

চিঠিপত্র, প্রশ্নোত্তর, এবং ব্যঙ্গাত্মক রচনায় হাস্য ও ব্যঙ্গরসের মাধ্যমে সমাজ ও সাহিত্যের খবর ও মন্তব্য অনেকটা অগত্যার স্টাইলে ব্যক্ত করা হতো। ‘সংকেত’কে তারা ‘আবজ্ঞান সৃষ্টিকারী’ এবং ‘অগত্যার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে’ বলে মন্তব্য করেছেন। ‘পাকিস্তান জিন্দাবাদ’ ধ্বনি তাঁদেরকে ক্রমে কওমী করে দিয়েছে। ‘দ্যুতি’ প্রথম পর্যায়ের লেখা ও লেখকসূচিতে রয়েছেন :

কবি হাবিবুর রহমান (কবিতা, হাতী) ; মোহাম্মদ মোদাবেবর (প্রবন্ধ, আমাদের ভবিষ্যত সংস্কৃতি) ; মাহমুদ হাসান (গল্প, গান শেখার সখ, পথের দেখা) ; মনোজ রায়চৌধুরী (কবিতা, তারুণ্যের গান) ; অধ্যাপক অমিয়ভূষণ চক্রবর্তী (প্রবন্ধ, স্বাধীনতার অর্থ) ; আবদুল জলীল (গল্প, মোহাজের) ; সাইয়িদ আতীকুল্লাহ (কবিতা, কেন এ জাগৃতি তব) ; এ. কে. এম. আমিনুল হক (গল্প, বিলেতের লপ্তী) ; ডা: হরিনাথ দে (প্রবন্ধ, আমাদের অন্ন সমস্যা) ; মতিউর রহমান চৌধুরী (সমালোচনা, রেডিও পাকিস্তান, ঢাকা) ; মোসলেহউদ্দীন আহমদ (গল্প, হারিয়ে গেছে যারা) ; এস. আহমদ হোসেন (প্রবন্ধ, হজরতের জাতি সংঘ) ; শামসুল ইসলাম (নিবন্ধ, পূর্ব পাকিস্তানের খেলাধুলা) ; আবুজোহা নূর আহমদ (কবিতা, ঈদ ও প্রিয়া) ; গোফরানউদ্দীন (প্রবন্ধ, ধর্মে উদাসীনতা) ; শফিউল ইসলাম (গল্প, এ্যাকসিডেন্ট) ; শফিকুর রহমান (গল্প, গরীব ধনী ও খুনী বনাম ঈদ) ; জহরত আরা খানম (কবিতা, অনশন ধর্মঘট) প্রভৃতি।

### দ্যুতি (নবপর্যায়ে)

‘দ্যুতি’ নবপর্যায়ে ওবায়দ আসকার এর সম্পাদনায় ফাল্গুন ১৩৫৮ সনে কাজী শামসুজ্জামান কর্তৃক ঢাকার ১৯ নং আজিমপুর রোডস্থ ‘আমাদের প্রেস’ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছিল। পরিচালনায় ছিলেন মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম ও আহমদ সিরাজ। বার্ষিক চাঁদা ছিল সাড়ে চার টাকা ; ছমাসে দুটাকা সাত আনা ; প্রতি কপি সাত আনা। বিভিন্ন সংখ্যায় সহ-সম্পাদক হিসেবে নাম ছাপা হয় আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দীন ; সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ; চৌধুরী লুৎফর রহমান ; মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ প্রমুখের। নবপর্যায় প্রথম বর্ষ সপ্তম সংখ্যায় ব্যবস্থাপনায় হাসান ইকবাল এর নাম ছাপা হয়। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর নাম ছাপা হয়

প্রথম বর্ষ নবম সংখ্যা থেকে। আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দীনের নাম একবার ছাপা হয়েই বাদ যায়। এই পর্যায়ের দ্যুতির কোথাও উল্লেখ করা হয়নি পূর্ববর্তী দ্যুতির সঙ্গে এই দ্যুতির কি সম্পর্ক, সাদৃশ্য বৈশাদৃশ্য বা যোগসূত্র।

তবে আজিমপুর এবং সেগুন বাগান খুব দূরে নয় এবং পত্রিকার কোনো অধ্যায়ের রচনাই তুলনায় গৌণ নয়। পরের দ্যুতির পূর্বসূরি প্রথম দ্যুতি হতেই পারে। সেজন্য পরের অধ্যায়কে ‘নবপর্যায়’ বলা হয়েছে। নবপর্যায়ের ‘দ্যুতি’র প্রাথমিক ভাষ্যে বলা হয় ‘ব্যক্তিমালিকানার ছাপ নিয়ে নয়, নিঃস্বার্থ সাহিত্যিকদের সাধারণ সম্পত্তি হিসাবে ‘দ্যুতি’ প্রকাশিত হলে। পত্রপত্রিকার অকালমৃত্যুর বাজারেও এ দুঃসাহসিক উদ্যমের পেছনে রয়েছে আমাদের দুর্জয় ঈমান, নিঃস্বার্থ সাধনার মৃত্যু নেই। পূর্ব পাকিস্তানে প্রথম শ্রেণীর মাসিকের অভাব মোচনের প্রতিশ্রুতি নিয়ে ‘দ্যুতি’র আত্মপ্রকাশ। এ প্রতিশ্রুতির মর্যাদা বিচারের ভার রইল সুধীবৃন্দের ওপর। স্বার্থ নয়, আদর্শই হবে ‘দ্যুতি’র একমাত্র অবলম্বন। পূর্ব পাকিস্তানে আদর্শভিত্তিক বলিষ্ঠ সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলার শপথ নিয়েই দ্যুতির যাত্রা শুরু হল।’

নবপর্যায়ের প্রথম সংখ্যায় একুশে ফেব্রুয়ারির শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়েছিল :

সাদে চারকোটি মানুষের দাবীকে প্রতিষ্ঠা করতে যেয়ে, যেসব বীর শহীদ বুকের তপ্ত লহ ঢেলে রাজপথ রঞ্জিত করে দিয়ে, রাষ্ট্রভাষা বাংলা করার সংগ্রামকে এগিয়ে দিয়ে গেল, তাদের মহান সংগ্রামী ইতিহাস আগামী দিনে চলার পথের দিশারী হোক।

এই পর্যায়ে ‘দ্যুতি’ বছর দুয়েক চলেছিল। প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ফাল্গুন ১৩৫৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ সনে। প্রাপ্ত শেষ, দ্বিতীয় বর্ষ দশম-একাদশ যুগ্ম-সংখ্যা বের হয় অগ্রহায়ণ ১৩৬০ সংখ্যারূপে। ১৯৫৪ সনের পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের (২৩ এপ্রিল থেকে ২৬ এপ্রিল) ঢাকা (কার্জন হলে) সম্মেলনের তারিখ ঘোষণা হবার পর, (হয়ত চুয়ান্ন সনের ফেব্রুয়ারি নাগাদ) দ্বিতীয় বর্ষের পূর্বে প্রথম বর্ষের একাদশ সংখ্যায় (মাঝখানে একটি যুগ্ম সংখ্যা হয়ে যাওয়ায় এটাই প্রথম বর্ষের শেষ সংখ্যা) ‘দ্যুতি’ লিখেছে ;

একদা দ্যুতি সুষ্ঠু সাংস্কৃতিক পরিবেশ গড়ে তুলবার যে প্রতিজ্ঞা নিয়ে এর সমস্যা-সঙ্কুল যাত্রাপথে পা বাড়িয়েছিল, একটি বৎসরের প্রান্তে এসে পুনর্বীর দ্যুতি সে প্রতিজ্ঞাকেই স্মরণ করছে। দ্যুতি কোন ব্যবসায়ী পত্রিকা নয়। পূর্ববাঙলার সাংস্কৃতিক বক্ষ্যাত্মকে খুঁটিয়ে দেবার অঙ্গীকার নিয়ে যারা এগিয়ে এসেছিলেন, দ্যুতি তাঁদেরই মুখপত্র। দ্যুতিকে অনাগতকালের বন্ধুর পথে চালিয়ে নেবার দায়িত্বও তাঁদেরই।—পূর্ববঙ্গের সাহিত্যক্ষেত্রে আজ যে নতুন চেতনার সঞ্চার হয়েছে দ্যুতি তাতে যথাযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করবার জন্য দ্বিতীয় বৎসরেও এগিয়ে যাবে। নতুন লেখক লেখিকাদের জন্য ‘দ্যুতি’র দ্বার সব সময়ে উন্মুক্ত থাকবে।

বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত অনেক রচনায় দ্যুতিকে বলা হয়েছে তমদ্দুন মজলিশের মুখপত্র। কিন্তু তমদ্দুন মজলিশের সঙ্গে সম্পৃক্ততা দ্যুতির লেখকগোষ্ঠীর কারো কারো থাকলেও ; এবং কারো কারো মনের উপরে পরোক্ষভাবে তমদ্দুন মজলিশের ভাবাদর্শগত প্রভাব থেকে থাকলেও তমদ্দুন মজলিশের মুখপত্র এটা ছিল না। তমদ্দুন মজলিশ ইসলামি সংগঠন হলেও এর সদস্যরা উচ্চতর খাঁটি ইসলামি চিন্তায় বিশ্বাসী ছিলেন বলে আজাদীউত্তর

পাকিস্তানের প্রথম সংগঠন হিসেবে পূর্ববাঙলার সাংস্কৃতিক অঙ্গনে সরকারের কার্যাবলির সমালোচনায় সাহস ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

১৯৪৭ সনের ১ সেপ্টেম্বর তমদুন মজলিশ এর আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল জাতীয় আন্দোলন শুরু করার জন্য ; দেশের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটানোর মতো ‘পাকিস্তানী গঙ্ঘ আছে’ এমন একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গড়ার প্রেরণা থেকে। আবুল কাসেম এর ১৯ নং আজিমপুর এর বাসায় তমদুন মজলিশ গঠিত হয়। তাঁর, ‘আমাদের প্রেস’ও ঐ ঠিকানায় ছিল। দ্যুতির কার্যালয়ও ছিল ১৯ নং আজিমপুরে। প্রথম বৈঠকের গঠনতন্ত্রে ইসলাম সম্পর্কে উগ্র মনোভাব বা বন্ধদৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় ছিল না, কেবল আলোচনা ও প্রচারের ভিতর দিয়ে মুক্তিবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত সর্বাঙ্গসুন্দর ধর্মভিত্তিক সাম্যবাদের দিকে মানব সমাজকে এগিয়ে নেওয়ার কাজে সহায়তা করার অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে ধর্ম সম্পর্কে তাঁদের উৎসাহ বৃদ্ধি পেয়েছিল। সমাজ জীবনের বিভিন্ন পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে ইসলামকে আদর্শ ধর্ম বলে বিবেচনা করা হয় এবং একমাত্র ইসলামি পথেই যে দেশের মুক্তি আসতে পারে সে-কথা উল্লেখ করা হয়। ফলে পরের গঠনতন্ত্রে ‘ইসলামি সমাজতন্ত্রবাদ’ কথাটি ব্যবহৃত হয়। প্রথম থেকেই তাঁদের ‘ইসলামি সমাজতন্ত্রবাদের প্রতি...প্রচ্ছন্ন আগ্রহ ছিল।’<sup>৬</sup> তাই ‘দ্যুতির’ রচনাবলিতে ইসলামি সমাজব্যবস্থার প্রতি আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যায়। গল্পগুলোতে ঘুস খাওয়াকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। হাসান জামান ‘ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র ও ইসলাম’ শীর্ষক প্রবন্ধে ইসলামি সমাজতন্ত্রবাদের প্রতিই সকলকে আহ্বান জানান।

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সুদূরপ্রসারী গুরুত্ব ইতিহাসে স্বীকৃত। তমদুন মজলিশের উদ্যোগেই বাংলা ভাষার দাবীতে প্রথম সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়েছিল। এসব কথা মনে করলে পাকিস্তান ভেঙ্গে বাংলাদেশ গঠনের ইতিহাসে তমদুন মজলিশের গুরুদায়িত্ব অস্বীকার করা যায় না। ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েনও এক সাক্ষাৎকারে পাকিস্তান-বিরোধী আন্দোলনের উদ্যোগেই তমদুন মজলিশকে দায়ী করেছিলেন।<sup>৭</sup>

সেজন্য তমদুনপন্থী দ্যুতির বাংলাভাষা ও রাষ্ট্রভাষা-সংক্রান্ত আলোচনার ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে। তাছাড়া খাঁটি ইসলামি রাষ্ট্রও যে পাকিস্তান নয়—তাও দ্যুতির আলোচনায় ফুটে উঠেছিল। কিন্তু তখন পাকিস্তানের প্রতি জনগণের সন্দেহ ঘোরতর ছিল না, বরং মোহ ছিল এবং পাকিস্তানের দীর্ঘ জীবনের জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকারে জনগণ প্রস্তুত ছিলেন। আলোচনার স্বার্থে উল্লেখ প্রয়োজন : মজলিশের নেতা ছিলেন অধ্যাপক আবুল কাসেম। সংযুক্ত ছিলেন শাহেদ আলী, আবদুল গফুর, হাসান ইকবাল, সানাউল্লাহ নূরী, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, নূরুল হক ভূঁইয়া, আবু হেনা মোস্তফা কামাল, বদরুদ্দীন উমর, এনামুল হক, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, আজিজুর রহমান, এ. কে. এম. আহসান প্রমুখ। সৈনিক ও দ্যুতি পত্রিকার সঙ্গে যারা সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তাঁদের অনেকে তমদুন মজলিশের নীতি-আদর্শের সমর্থক ও কর্মী ছিলেন। মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, মোস্তফা কামাল, আনোয়ার উদ্দিন, ফেরদৌসী বেগম, মাহফুজুল হক, তালুকদার মনিরুজ্জামান প্রমুখ ছিলেন এমনি কর্মী। তবে শিক্ষিত যুবসমাজে ও ছাত্রদের মধ্যে মজলিশ-কর্মী সমর্থক থাকলেও ব্যাপক জনপ্রিয়তা

দৃষ্টির ছিল না। নিছক সাহিত্য পত্রিকাই ছিল দৃষ্টি। তবে কোনো সাহিত্যাদোলন গড়ে তোলা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি।<sup>৮</sup>

‘দৃষ্টি’তে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কবিতা লিখেছেন : ফররুখ আহমদ, আবদুর রশীদ খান, আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দীন, আবদুর রশীদ ওয়াসেকপুরী, চৌধুরী লুৎফর রহমান, তরীকুল আলম, কবীরউদ্দীন আহমদ, আবদুল হাই মশরেকী, প্রজ্ঞেশ কুমার রায়, আজীজুল হক, মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, আনোয়ারা বেগম, আজিজুর রহমান, এরশাদ হোসেন, আশরাফ সিদ্দিকী, রওশন ইজদানী, এস. এম. আবদুল জলীল, মোহাম্মদ মামুন, আবু হেনা মোস্তফা কামাল, মফিজউদ্দীন আহমদ, আবু তালিব, মোহাম্মদ আজিজুল হক, নূরুন্নাহার বেগম, খোন্দকার আবদুর রহিম, মুয়হারুল ইসলাম, জহরুল হক, নাজমুল হক, আল মাহমুদ প্রমুখ।

প্রবন্ধ লিখেছিলেন অধ্যাপক মোতাহের হোসেন চৌধুরী (অসুয়া, ১/১ ; নজরুল ইসলাম ও রেনেসাঁস ১/৪); অধ্যাপক আবুল কাসেম (আধুনিক বিজ্ঞানের গতি, ১/১, সাহিত্যের শ্রেণী-বিভাগ, ১/১১); সানাউল্লাহ নূরী আলবার্ট আইনস্টানের প্রবন্ধ অনুবাদ করেছেন (বুদ্ধিজীবীদের প্রতি ১/১); ড. কাজী মোতাহের হোসেন (বিজ্ঞান ১/২); অধ্যাপক হাসান জামান (ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ও ইসলাম ১/২); বদরুদ্দীন উমর (ইসলামীসমাজ ও রাষ্ট্র ১/৩; ব্যক্তিস্বাভিত্ত্য ২/১০-১১); মোস্তফা কামাল (ইকবালের কাব্য কাব্য-সৌন্দর্য ১/৩); মাহফুজুল হক (রবীন্দ্রনাথ ও মানুষ ১/৩); মাহবুবুল আলম (নজরুল জয়ন্তী, ১/৪); আহমদ ফরিদউদ্দীন (আধুনিক মন, ১/৫); আতোয়ার রহমান (তৌহিদবাদ; বাংলা কাব্য ও নজরুল, ১/৫; একটুকরো মন, ২/২); অধ্যাপক মোহাম্মদ আজরফ (ইতিহাসের ধারা, ১/৬; এমুগের দৃষ্টিতে মার্কসবাদ, ২/৭-৮); ভবেশ মুখোপাধ্যায় (বর্নচন্দ্র, ১/৮); আবদুর রশীদ খান (পূর্ব পাকিস্তানের আধুনিক কাব্য-সাহিত্য, ১/৯); আহমদ ফরিদউদ্দীন (সমসাময়িক ইসলামী চিন্তাধারা, ১/৯; আদর্শ ও আদর্শবাদী ২/৯); শাহেদ আলী (আমাদের কথা-সাহিত্য, ১/১০); আতাউল হক (শয়ের চিঠি, অনুবাদ ও আলোচনা, ১/১১); রওশন ইজদানী (গণ-সাহিত্যের ভিত্তি, ১/১১); কামরুল হাসান (জয়নুল আবেদিন, অনুবাদ নূরুল আলম, নিউ ডেলুজ থেকে, ২/২); আল্লামা ইকবাল (ইসলামী আইন ও যুক্তিপ্ৰয়োগ, অনুবাদ, সোলায়মান খান, ২/৪); অনির্বাণ ছদ্মনাম (রবীন্দ্রনাথ, ২/৪); মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ (আধুনিক বাংলা কবিতার সমস্যা, ২/৭-৮); মোজাফফর আহমদ (সভ্যতা, ২/৯); অধ্যাপক সৈয়দ বদরুদ্দীন হুসেন (সাহিত্যের নবজন্ম, ১/৭); প্রমুখ।

দৃষ্টিতে গল্প লিখেছেন : সৈয়দ মকসুদ আলী (সেতার, ১/১; চাবুক, ১/৩; মোনালিসা, ১/৯; চাটী আশ্মা, ২/২); শাহেদ আলী (পাগল, ১/১; ওরা, ২/৭-৮; কোটা, ২/২); কাজী ফজলুর রহমান (কান্না, ১/১); আতোয়ার রহমান (নুন খাই যার, ১/২; কাছাকাছি, ১/৯; যথা সময়, ২/৭-৮); মোপাসাঁ (প্রতিকৃতি, অনুবাদক মোহাম্মদ আজিজুল হক, ১/৪); গোলাম আহমদ (ঝরা গানের কান্না, ১/৪); সৈয়দ আতাউর রহিম (আতংক, ১/৫); আবদুর রহমান (দৃষ্টি, ১/৬); ইব্রাহীম খাঁ (মানুষ, ১/৭); মুয়হারুল ইসলাম (একটি জীবন, ১/৮); মোজাম্মেল সিদ্দিক (অনুরণন, ১/৮); রাবেয়া খাতুন (লেখক, ১/৯); মীর্জা আ. মু. আবদুল হাই (মেহেরজানের মা, ১/১০); আবদুল গাফফার চৌধুরী (অমর্ত, ১/১০); দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ (হেজাজী হাওয়া, ১/১১); দৌদে ফ্রান্সের (লেখক, পরিগাম, অনুবাদক, মোহাম্মদ আজিজুল হক, ২/২); শফিকা হুসেন (সক্কারাতের রূপকথা, ২/৪); সৈয়দ বদরুদ্দীন হুসেন (ওয়েসিস, ২/৪); মীজানুর রহমান (লালশিখা, ২/৪); আবদুর রহমান (ছাই-চাপা, ২/৯); লুৎফর রহমান (ছাতাওয়লা, ২/৯); জাহাঙ্গীর খালেক (শ্রেণী, ২/১০-১১) ইত্যাদি।

প্রখ্যাত নাট্যকার আশকার ইবনে শাইখের ‘বিদ্রোহী পদ্মা’ (১/৭ ও পরবর্তী কয়েক সংখ্যায়) এবং ‘দূরস্ত ডেউ’, (১/৬); এবং ওবায়দে আসকার প্রণীত নাটক ‘কর্ডোভার আগে’ (২/১০-১১); সানাউল্লাহ নূরীর উপন্যাস ‘আন্ধার মানিকের রাজকন্যা’ (১/২) দৃষ্টিতে প্রকাশ পায়।

বদরুদ্দিন মুনির, আশরাফ সিদ্দিকী, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, কাজী ফজলুর রহমান, মফিজউদ্দিন আহমদ, মীর আবুল হোসেন, মোহাম্মদ রিয়াছত আলী, আতোয়ার রহমান, আহমদ ফারুক, সেলিম চৌধুরী, নুরুল আলম, আহমদুর রহমান, লুৎফুল হায়দর চৌধুরী প্রমুখের অনেক পুস্তক-সমালোচনা, সংস্কৃতিসংবাদ এবং ব্যক্তিগত নিবন্ধ প্রভৃতি দ্যুতির বৈচিত্র্য বৃদ্ধি করেছিল।

শাহেদ আলীর 'জিব্রাইলের ডানা' বইয়ের সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীকৃত আলোচনায় মেধার পরিচয় পাওয়া যায়। তখন লেখক টান-এজার। এছাড়াও দ্যুতিতে প্রখ্যাত সাহিত্যিক অন্নদাশংকর রায় বিতর্ক বিভাগে পাকিস্তানের জাতীয় সমস্যা, সাম্প্রদায়িকতা, হিন্দু-মুসলমানের আন্তঃসম্পর্ক এবং ভারতীয় উপমহাদেশের জনচিন্তায় জাতীয়তাবোধের মোড়পরিবর্তন সম্পর্কে মূল্যবান আলোচনার শুরু করেন। এই বিষয়ে পরপর চার-পাঁচটি সংখ্যাতে বিতর্ক জমে ওঠে। অংশ নেন আবদুল গফুর (১/২) ; নুরুল আফহার (১/৩) ; মীর আবুল হোসেন (১/৪) ; ওমর কোরায়শী (১/৫) প্রমুখ।

অন্নদাশংকর রায় কলকাতায় বসে নিয়মিত 'দ্যুতি' পেতেন এবং দ্যুতি-সম্পর্কে তাঁর কিছু কৌতূহল ছিল-কারণ দ্যুতির সময়কালে এমন গুরুত্বপূর্ণ চিন্তা-চর্চা এদেশের খুব কমসংখ্যক সাময়িকপত্রই করত। তিনি একটি চিঠিতে লিখেছেনও যে, প্রবন্ধগুলো 'উচ্চাঙ্গের হচ্ছে আর গল্পগুলো তারিফ করার মতো।'<sup>৬</sup>

তাছাড়া একথা ভুললে চলবে না যে, তমদ্দুন-মজলিশের সঙ্গে ওৎপ্রোতসম্পর্কে বা আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা না-থাকলেও মজলিশের চিন্তাধারার প্রভাব দ্যুতির কর্ণধার এবং লেখকবৃন্দের উপর গভীরভাবে ক্রিয়া করেছিল। দেখাই যাচ্ছে মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ আগাগোড়া ইসলামী ধারার লেখক ও সংস্কৃতি-কর্মী। তিনি ছিলেন এর একজন কর্ণধার এবং তমদ্দুন মজলিশের প্রধান ব্যক্তিত্ব অধ্যাপক আবুল কাসেমের বাড়িতেই ছিল মজলিশের কার্যালয় ও মুদ্রাকর 'আমাদের প্রেস'। আমাদের প্রেসই ছিল দ্যুতির মুদ্রক ও প্রকাশক। অতএব মজলিশের সঙ্গে দ্যুতির যোগসূত্র ছিল।

মজলিশ ছিল তখনকার পূর্ব বাঙলার প্রথম প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক সংগঠন। এর প্রথম দিককার কার্যাবলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। 'বাংলা ভাষার দাবীতে প্রথম সংগ্রাম পরিষদ তাঁদের উদ্যোগেই গঠিত হয়। আন্দোলনের সাংগঠনিক দিকটির প্রতি লক্ষ্য রাখার ফলে ভাষা-আন্দোলনকে সাংস্কৃতিক আলোচনার ক্ষেত্র থেকে রাজনৈতিক আন্দোলনে উত্তীর্ণ করার ব্যাপারেও তাঁদের প্রচেষ্টা ছিল উল্লেখযোগ্য।'

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সময়ে এবং যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের পূর্ববর্তীকালে প্রকাশিত দ্যুতির ভাষা-চিন্তাও প্রগতিশীল ছিল। তবে তাতে ছিল মওলানা মওদুদীর প্রভাব ; আর ইসলামি-সমাজতন্ত্রের প্রতি আস্থা। মার্কসবাদের তাঁরা প্রতিরোধক ছিলেন। লেখকদের তালিকা এবং বিষয়গুলোর শিরোনাম থেকেও বুঝতে পারা যায় এঁদের চিন্তার স্বতন্ত্র প্রকৃতি। মোটামুটি ভাবে বিরুদ্ধমতও তাঁরা বিতর্কের উদ্দেশ্যে হলেও প্রকাশ করতেন। যেমন মনীষী অন্নদাশংকর রায়ের 'নূতন অধ্যায়' এর অনেক বক্তব্য-মন্তব্যের সঙ্গে একমত না হয়েও 'উত্থাপিত

প্রশ্নগুলো সম্বন্ধে ধারাবাহিক প্রবন্ধ মারফৎ দ্যুতিতে শীঘ্রই বিস্তারিত আলোচনা শুরু করার লক্ষ্যে সম্পাদকেরা তা প্রকাশ করেছিলেন।<sup>১০</sup>

লেখকদের তালিকার সঙ্গে রচনার শিরোনাম থেকে একথা পরিষ্কার বোঝা যায় যে, রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁরা কট্টর বর্জনবাদী মনোভাব পোষণ করতেন না। নজরুল ইসলামের সাহিত্য-শিল্প-জীবন এবং তাঁর প্রতি দেশ ও সমাজ-রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। মোতাহের হোসেন চৌধুরীর আলোচনার কথা বিশেষভাবেই স্মরণযোগ্য। তিনি বাট্রাও রাসেল এর দি কনকোয়েস্ট অব হ্যাপীনেস অবলম্বনে অনেক প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন।—যা তাঁর ‘সুখ’ গ্রন্থে সংকলিত হয়। দ্যুতিতে ‘কোন ইংরেজ লেখকের অনুসরণে’ পাদটীকা যুক্ত করে তিনি লিখেছিলেন ‘অসূয়া’ শীর্ষক একটি প্রবন্ধ যার মূলভাগিদ ‘ভালোবাসা’র চর্চায় উদ্বুদ্ধ করা অর্থাৎ দাঙ্গা-বিক্ষুব্ধ সমাজে মানবতাবোধের উন্মেষ ঘটানো।

‘অসূয়া’কেও যে প্রগতির সহায়ক শক্তি ও প্রেরণারূপে দেখা যায়, মোতাহের হোসেন চৌধুরী তা বাঙ্গালির চোখের সামনে তুলে ধরেন। লেখক লিখেছেন, দুঃখের অন্যতম হেতু অসূয়া।... মানুষের গুঢ় প্রবৃত্তিসমূহের মধ্যে এটি অন্যতম। এর মূলে রয়েছে বাঁচা ও বৃদ্ধির প্রেরণা ; তাই এর প্রতি শ্রদ্ধা বিনম্র দৃষ্টিতে না তাকালে অন্যায্য করা হবে। বিদ্বেষ মাত্রই পাপ—একথা স্বীকার করলে প্রগতি অসম্ভব হয়ে পড়ে—সভ্যতা থমকে দাঁড়ায়।’ উপসংহারে তিনি বলেন :

এই দৃষ্টিভঙ্গির দরুন বর্তমান যুগে সুখের উপাদান আদিমসমাজ থেকে হাজার গুণ বেড়ে যাওয়া সত্ত্বেও, মানুষ সুখের মুখ দেখতে পাচ্ছে না—যা হয়েছে তার চেয়ে যা হতে পারতোর প্রতি বেশি নজর দেওয়া হচ্ছে বলে বস্তুবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে কেবলই দুঃখের মাত্রা বাড়িয়ে চলেছে। সুখকে জীবনের লক্ষ্য না করে ইচ্ছত ও প্রতিপত্তিকে লক্ষ্য করার এই শাস্তি।...এই নৈরাশ্যব্যঞ্জক অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার প্রধান উপায় হৃদয়ের সম্প্রসারণ। সভ্য যুগে যেমন বুদ্ধিকে সম্প্রসারিত করা হয়েছে, হৃদয়কেও তেমনি সম্প্রসারিত করা দরকার। নইলে বাঁচার আনন্দ পাওয়া কঠিন। কেননা হৃদয়ই আমাদের জন্য়িত্রী, বুদ্ধি নয়। ভালবাসার শক্তি আয়ত্ত্ব করতে না পারলে আনন্দ চিরদিনের মতো পর থেকে যাবে।

তিনি বলেন,

জীবন বুদ্ধি ও হৃদয় উভয়ের একত্রালি সম্পত্তি। কিন্তু এযুগে বুদ্ধির বড় বাড় বেড়েছে ; হৃদয়কে উপোসী রেখে সে জীবনের সমস্ত রস শূন্যে নিচ্ছে। অথচ রস পানের কায়দাই তার জানা নেই। তাই জীবনের বিকৃতি ঘটেছে। এই বিকৃতি থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র উপায় বুদ্ধির কর্ণধার সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের কর্ণধারকেও মেনে নেয়া।

‘ভালোবাসা’ সম্পর্কে বলেন ;

সুখের হেতু ভালবাসা। তাই ভালবাসা বৃদ্ধির সঙ্গে সুখ বৃদ্ধি হবে, আর সুখ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিদ্বেষ দূর হতে থাকবে। বিদ্বেষকে মন্দ জানা এবং ভালবাসাকে কাম্য মনে করা সুস্থ জীবন বিকাশের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়।...ভালোবাসা স্বর্গীয়, সত্য, ন্যায্য—এধরনের বড় কথা না বলে যদি স্রেফ বলা হত : ভালবাসাই সুখ, ভালবাসাই জীবন—তো পৃথিবীর ভাগ্য হয়তো এত নিদারুণ হতো না।<sup>১১</sup>

ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন বিজ্ঞানের আলোচনা করেছেন ; এবং আইনস্টাইনের ‘Out of my letter years’ গ্রন্থের A Message to the intellectuals প্রবন্ধের (বুদ্ধিজীবীদের প্রতি) অনুবাদ করেছেন সানাউল্লাহ নূরী। বদরুদ্দীন উমর এবং হাসান জামান

‘ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র’ এবং ‘ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ও ইসলাম’ প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করেছেন। এসব প্রবন্ধের মূল বক্তব্য পাকিস্তানকে খাঁটি ইসলামি রাষ্ট্ররূপে প্রতিষ্ঠার নানা অন্তরায়, সমস্যা ও সম্ভাবনার চিত্র অঙ্কন। দেশের বেশিরভাগ মানুষ মুসলমান হলেই যে ইসলামি রাষ্ট্র হয় না তাও ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

পশ্চিম পাকিস্তানের লেখক সৈয়দ মোজাফফরউদ্দীন নদভী Isamic State and Pakistan গ্রন্থের আলোচনার মূলসুরও তাই। নদভী মওদুদী-প্রভাবিত লেখক এবং তিনি ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা দূর করবার জন্যে বইটা লিখেছিলেন। ‘আধুনিক দুনিয়ার চিন্তায় ধর্মের সংজ্ঞার সঙ্গে ইসলামের যে সঙ্গতি নেই তা নদভী সাহেব কোরান-হাদীসের নির্দেশ ও ইবনে খালদুনের লেখা থেকে সপ্রমাণ করেছেন।... মানুষ প্রত্যেকেই এক একজন খলিফা—মানুষের সামনে রয়েছে অনন্ত সম্ভাবনা। ইসলামের গণতান্ত্রিক নীতি, আধুনিক গণতন্ত্রের সঙ্গে ইসলামি খিলাফতের পার্থক্য, প্রকৃত ইসলামি সমাজের সংগঠনের ধারা, সরকারি বিভাগগুলির নিজস্ব অধিকার ও স্বাতন্ত্র্য—এইসবের সংক্ষিপ্ত অথচ মনোজ্ঞ আলোচনা আছে বইখানিতে। গ্রন্থের আলোচক হাসান জামান—এর সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গিটাও লক্ষণীয়।

... অধ্যক্ষ নদভী সাহেব ইংগিত করেছেন যে, ব্যক্তির নেতাকে সবসময়ে কেন্দ্রীয় মসজিদের ইমাম হতেই হবে। আমাদের মতে জাতির নেতা ইমাম না হলেও ইসলামি সমাজ হবে যদি নাকি প্রকৃত ইসলামি নীতির ওপরে সমাজ সংগঠিত হয়। ভাষা-সমস্যা সম্পর্কে আলোচনাটি আরও একটু পরিষ্কার হলে ভালো হত। (দ্যুতি, ১/১, পৃ. ৬৬)।

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের ‘এ যুগের দৃষ্টিতে মার্কসবাদ’, এবং ‘ইতিহাসের ধারা’ এবং আল্লামা ইকবাল এর প্রবন্ধ ‘ইসলামি আইন ও যুক্তি প্রয়োগ’ (অনুবাদক : সোলায়মান খান) ; আহমদ ফরিদউদ্দীনের প্রবন্ধ ‘আধুনিক মন’ ; ‘সাময়িক ইসলামি চিন্তাধারা’ ; ‘আদর্শ ও আদর্শবাদী’ ; ও অধ্যাপক সৈয়দ বদরুদ্দীন হুসেন প্রণীত ‘সাহিত্যের নবজন্ম’ ; কাজী ফজলুর রহমানের ‘আধুনিক সাহিত্য’ শিরোনামের বিতর্ক ; এবং ‘পূর্ব পাকিস্তানের আধুনিক কাব্য-সাহিত্য’ (আবদুর রশীদ খান প্রণীত) ; ‘আমাদের কথা-সাহিত্য’ (শাহেদ আলী) ; ‘গণসাহিত্যের ভিত্তি’ (রওশন ইজদানী) ; ‘সাহিত্যের শ্রেণী বিভাগ’ (অধ্যাপক আবুল কাসেম) ; ‘আধুনিক বাংলা কবিতার সমস্যা’ (মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ) ; ‘সভ্যতা’ (মোজাফফর আহমদ) ; ‘ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য’ (বদরুদ্দিন উমর) প্রভৃতি প্রবন্ধ এবং রবীন্দ্রনাথ ও মানবেন্দ্রনাথ রায়ের চিন্তাধারার পর্যালোচনা দ্বারা নবসৃষ্ট রাষ্ট্র পাকিস্তানের সাহিত্য সঙ্স্কৃতি ও সমাজ-ব্যবস্থা, রাষ্ট্রীয়নীতি প্রভৃতির দিকনির্দেশ দানের প্রচেষ্টা যা প্রকট হয়ে উঠেছে—তাতে গভীর আন্তরিকতায় দেশের হিতের চিন্তা শ্রেণণায় কাতরতার পরিচয় সুপরিষ্কৃত।

কিন্তু যেটা বিরুদ্ধ স্রোত বলে মনে হয়, তা হচ্ছে ইসলামি সমাজব্যবস্থার প্রতি এদেশে ভাসা-ভাসা ধর্মতীক্ষণ মানুষের কোনো গভীর আস্থা সৃষ্টি হয়নি। হয়তো আধুনিক বিশ্বে ধর্মের বাঁধন আর শক্তও হবে না। ‘ধর্ম’ পলিটিশ্বের বিষয় হয়েই থাকবে। সমাজের গতি আধুনিক বুর্জোয়া কিংবা গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার প্রতিই অভিব্যক্ত হচ্ছে দেখা যায়। সেদিক থেকে দ্যুতির প্রয়াস ব্যর্থ বটে, কিন্তু তখনতো সেটাই ছিল প্রধান ধারা এবং ঐদের বক্তব্য তাই

জনগণকে মতামত সংগঠনে উদ্বুদ্ধ করতে বলে দাবী করা যায়। এ দাবী গ্রাহ্য হলে দৃষ্টির সমকালে সামাজিক উপযোগিতা সৃষ্টি হয়েছিল এবং সেই সৃষ্ট উপযোগে দেখা যায় ইসলামি সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রয়াস ব্যতিরেকে অনাধুনিক চিন্তা তাঁদের মধ্যে খুব কম ছিল।

বাংলা ভাষা সম্পর্কে তাঁদের বক্তব্য যা দৃষ্টিতে প্রকাশিত হয়েছে—তার কথাই যদি ধরা হয়, দেখা যাবে ন্যায্যতার বিবেচনায় এই বক্তব্য অত্যন্ত সুবিবেচনা প্রসূত। ১৯৫২ সনের ফাল্গুন সংখ্যা ছিল নবপরিচালিত দৃষ্টির প্রথম সংখ্যা। এটাতে ‘আমাদের রাষ্ট্রভাষা’ শীর্ষক সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করা হয় :

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকেই পাকিস্তানে রাষ্ট্রভাষা নিয়ে বিরাট সমস্যা দেখা দিয়েছে। সরকার উর্দুকেই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা বলে ঘোষণা করেছেন। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনমত অনুযায়ীই সরকার পরিচালিত হয়। পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশের জনসাধারণের প্রাদেশিক ভাষা হলেও তারা উর্দুকেই রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষপাতী। কাজেই পশ্চিম পাকিস্তানে উর্দুই যে সরকারি ভাষা হবে এবং উর্দুই যে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হবে তাতে দ্বিধা প্রকাশ করার কিছুই নেই। ঠিক একই নীতিতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের শতকরা ৫৬ জন বাংলা ভাষাভাষীর মতামতকেও অস্বীকার করার কোন ক্ষমতা কোন গণতান্ত্রিক সরকারের থাকতে পারে না।

উক্ত সূত্রে আরও বলা হয় : বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে বিগত ১৯৪৮ সনে সারা পূর্ব পাকিস্তানে প্রবল আন্দোলন হয়ে গেছে। জনমতের চাপে তদানীন্তন প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন বাংলা ভাষার দাবীকে মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু সরকারি ভাবে সে প্রতিশ্রুতি ও প্রস্তাব কার্যকর করা হয়নি। শুধু তাই নয়, জনাব খাজা নাজিমুদ্দিন পাক প্রধানমন্ত্রী হিসাবে পূর্ববঙ্গে এসে উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার অভিমত প্রকাশ করে গেছেন। তার প্রতিবাদ স্বরূপ গোটা প্রদেশেই তুমুল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। প্রদেশের ছাত্ররা শোভাযাত্রা, ধর্মঘট ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করে বাংলা ভাষার ন্যায্য অধিকার দাবী করছেন। আমরা আশা করি সরকার গণদাবীকে উপেক্ষা করে—সমস্যা প্রপীড়িত পাকিস্তানকে আরো সমস্যা-সংকুল করে তুলবেন না।<sup>১২</sup>

পাশাপাশি ১৯৫২ সনের আসন্ন আন্তর্জাতিক ‘ইসলামী সাংস্কৃতিক সম্মেলন’, ঢাকা-র উপর মন্তব্য করতে গিয়ে দৃষ্টি সমর্থন করেছে তমদ্দুন মজলিশের উদ্যোগকে :

... পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানব্যাপী সম্মেলনের জোর প্রস্তুতি চলছে। পাকিস্তানের চার বছরের ইতিহাসে এ ধরণের প্রচেষ্টা এই প্রথম। সম্মেলনের প্রচারপত্র থেকে যতদূর জানা যায়, বর্তমান দুনিয়ার আদর্শিক দ্বন্দ্বের মধ্যখানে ইসলামী আদর্শের বাস্তবায়নের প্রচেষ্টাই সম্মেলনের প্রধান উদ্দেশ্য। ইসলামি আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করতে হলে ইসলামের জীবন-পদ্ধতি ও সমাজ-ব্যবস্থার যুগোপযোগী কার্যকরী রূপ সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।

অন্যদিকে ইসলামি আন্দোলনকে এগিয়ে নেবার জন্যে ইসলাম-পন্থীদের সংগঠিত ও সংঘবদ্ধ হওয়াও অপরিহার্য। এই দ্বিবিধ মৌলিক প্রয়োজনের তাগিদেই তমদ্দুন মজলিশের কর্মকর্তারা এগিয়ে এসেছেন। তাঁদের প্রচেষ্টা অত্যন্ত শূভ ও প্রশংসনীয়। বর্তমান দুনিয়ার বুদ্ধিজীবীমহলে চিন্তার নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। মনীষীদের চিন্তারাজ্য থেকে মানবজীবনের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নির্বাসিত হয়েছে। ফলে সারা দুনিয়ায় মানুষের জীবনে শান্তি, সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তার পরিবর্তে হানাহানি, রক্তারক্তি ও বিশৃঙ্খলাই স্থায়ী আসন গেড়ে বসেছে। এ বিপর্যয় ও অনিবার্য ধ্বংসের কবল থেকে মুক্তি পেতে হলে বলিষ্ঠ ও বৃহত্তর জীবনাদর্শের প্রয়োজন। এ সম্মেলন এমনি সামগ্রিক ও বলিষ্ঠ জীবনাদর্শের সন্ধান দেবে। এজন্যেই সম্মেলনের উদ্যোগের পূর্ববঙ্গের



সংস্কৃতিবান, বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, সাহিত্যিক, ছাত্র-যুবক ও সমাজ-কর্মীদের সক্রিয় সহযোগিতা ও সমর্থন দাবী করেন।

‘দ্যুতি মনে করে সামাজিক অগ্রগতির জন্য সাংস্কৃতিক আন্দোলন অপরিহার্য। উদ্যোগ্তারা বলেন ; ‘এই সম্মেলন পাকিস্তানে একটা সুস্থ ও সবল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের জন্ম দেবে।’<sup>১৩</sup>

উল্লেখ্য, ১৯৫২ সনের ১৭-২০শে অক্টোবর ঢাকার কার্জন হলে যে ‘ইসলামী সাংস্কৃতিক সম্মেলন’ অনুষ্ঠিত হয়, তা প্রথমে ঐ সনের মার্চ মাসের ১২, ১৩ ও ১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হবার কথা ছিল। দ্যুতিতে এই প্রোগ্রাম-অনুযায়ী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বলেই উপর্যুক্ত পর্যালোচনা লেখা হয়েছিল।

আরও বলা হয়েছিল : ‘সম্মেলনে সাহিত্য, লোককলা, সমাজবিজ্ঞান, ইসলামী আন্দোলন ও মহিলা পাঠটি অধিবেশনের আয়োজন করা হয়েছে। সম্মেলনের প্রত্যেকটি অধিবেশনের জন্যে ভিন্ন ভিন্ন সভাপতিও মনোনীত করা হয়েছে। সম্মেলনে পূর্ববঙ্গের বাইরে পশ্চিম পাকিস্তান, পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতের অন্যান্য জায়গার চিন্তাশীল বুদ্ধিজীবীগণ যোগদান করবেন।’<sup>১৪</sup>

কি কারণে সম্মেলন পিছিয়েছিল তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না বটে তবে নানা গ্রন্থে সম্মেলনের বর্ণনা নানা রকম লেখা হয়েছে।<sup>১৫</sup>

কিন্তু দ্যুতির প্রথম বর্ষ, অষ্টম, কার্তিক ১৩৫৯ সংখ্যায় অনুষ্ঠান-পরবর্তী-বিবরণে লেখা হয় :

গত ১৭-২০শে অক্টোবর (১৯৫২) ঢাকার কার্জন হলে অভূতপূর্ব সাফল্যের মধ্য দিয়ে পাকিস্তান তমদুন মজলিশ কর্তৃক আয়োজিত ‘ইসলামী সাংস্কৃতিক সম্মেলন’ হয়ে গেল। এই সাংস্কৃতিক সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন : সিরিয়ার আহমদ বিন আহমদ, লাহোরের নসরুল্লাহ খান আজিজ, পাকিস্তানের মজহারউদ্দীন সিদ্দিকী, লণ্ডনের ওকিং মসজিদের প্রাক্তন ইমাম জনাব আফতাবুদ্দিন ; এছাড়াও...আহবানে সাড়া দিয়েছেন অসংখ্য শিল্পী, সাহিত্যিক, কর্মী ও চিন্তাবিদ। এই সম্মেলনের চারদিনব্যাপী অধিবেশন শুধু পাকিস্তানের নয়—প্রাচ্যের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় ও অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামী সাংস্কৃতিক সম্মেলন সাংস্কৃতিক জগতে একটি সুদূর-প্রসারী আলোড়নের সৃষ্টি করেছে। যে আদর্শকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানের সৃষ্টি—তার জন্য এমন একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অবশ্যস্বাভাবি হয়ে পড়েছিল। ...চারদিনব্যাপী এতগুলি শাখা, এতগুলি অধিবেশন অন্য কোন সাংস্কৃতিক সম্মেলনে অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। সাহিত্য, লোক-সংস্কৃতি, সমাজ-বিজ্ঞান, ইসলামী আন্দোলন, মহিলা অধিবেশন, প্রকাশ্য সম্মেলন, প্রতিনিধি-সম্মেলন, কর্মী-সম্মেলন, মফঃস্বলের কবি, জারী, বাউল, গাজী প্রভৃতি লোক-সংস্কৃতির অপূর্ব অনুষ্ঠান, প্রায় প্রতিদিন সকাল আটটা থেকে বারোটা পর্যন্ত একই সময়ে একাধিক অধিবেশন—সত্যিই অপূর্ব। এর অভিভাষণগুলিও অপূর্ব ও অসাধারণ। প্রায় চল্লিশটি অভিভাষণের মধ্যে সবকটিই মননশীলতায়, যুক্তিবিজ্ঞানে ও সমস্যা-সমাধানের ইংগিতে সম্পদশালী।...এরকম সুস্থ সুন্দর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যত বেশী হয় ততই আমাদের জন্য মঙ্গল।<sup>১৬</sup>

বলা দরকার, অভিভাষণগুলোর কয়েকটি দ্যুতিতে প্রকাশিত হয়, কিন্তু সব ভাষণ ছাপা হয়নি। তার আগেই পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। পত্রিকার আয়ুবুদ্দিন হলে সম্মেলনের সকল ন—

হলেও অধিকাংশ ভাষণ, প্রবন্ধ এতে ছাপা হতো, এবং তা হতো পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক-আন্দোলনের এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল।

‘আধুনিক মন’ শীর্ষক প্রবন্ধে আহমদ ফরিদউদ্দিন লিখেছিলেন আধুনিক মনকে আজ মুক্ত হতে হবে সব রকমের ‘পূর্ব নির্ধারিত’ ধারণা থেকে ; বিচারের মাপকাঠি হিসেবে নিতে হবে কেবলমাত্র বিজ্ঞানকেই। তবেও আধুনিক মন অতি আধুনিক কুসংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে সত্যিকার ‘আধুনিক’ হতে পারবে। প্রকৃত কল্যাণের সূচনা হবে।<sup>১৭</sup>

একই ধারণা ব্যক্ত হয়েছে ‘সাহিত্যের নবজন্ম’ শীর্ষক প্রবন্ধেও। ১৯৪৭ এর দেশভাগের পর যুক্তিবাদী মন নিয়ে দেশের জন্য কল্যাণকর, প্রকৃত স্বদেশী (গণসাহিত্য?)—সাহিত্য সৃষ্টি করতে হবে বলে মতামত ব্যক্ত করা হয় :...

দেখতে পেয়েছি দেশব্যাপী হিন্দুমুখ্যবিশ্ব সমাজের দেশত্যাগ ...সঙ্গে সঙ্গে নির্বাসিত হয়েছে তারই সৃষ্টি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য। কৃত্রিমতা থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে পূর্ব বাঙলার আগামী সাহিত্য। ...পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে গড়ে তুলতে হবে পূর্ব বাঙলার সাহিত্যের নব কলেবর—অবহেলিত মুসলিম গণজীবনের প্রতিবিশ্ব হিসেবে। ...পারস্যের নন্দনকাননে আর ফোরাতেই উপকূলে এ নতুন সাহিত্যের উপকরণ অন্বেষণ করলে চলবে না। ...মুসলিম বাঙলার আছে নিজস্ব ভৌগলিক রূপ, নিজস্ব ইতিহাস, ভিন্ন জীবন-প্রণালী, আচার-ব্যবহার, তমদ্দূনের ধারা...পূর্ব বাঙলার এ স্বকীয় বিশিষ্ট রূপটিই ধরা পড়বে আগামীদিনের নতুন সাহিত্যে।<sup>১৮</sup>

দ্যুতির সমাজ-ভাবনা ও রাষ্ট্রচিন্তা ফুটে উঠেছে এতে মুদ্রিত রচনাগুলোতে। বাংলাভাষার এবং ইসলামি সমাজব্যবস্থার পক্ষে তাঁরা ছিলেন, তবে অন্যান্য ব্যাপারে উচিত কথা বলতে পারোয়া করেননি। ১৯৫২ সনে পূর্ব বাঙলায় শুধু অসন্তোষ ও পুলিশের গুলি চলেছিল তা ঠিক নয়, পশ্চিম পাকিস্তানেও চরম অসন্তোষ বিরাজ করছিল ; এই শ্রেণিতেই দ্যুতিতে করাচীতে ছাত্রদের উপর গুলিবর্ষণ এর সংবাদ এবং সম্পাদকীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে গণতান্ত্রিকতার প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করতে দেখা যায়। করাচীতে বেতন কমানো, বাসস্থানের ব্যবস্থা, সরকারের শিক্ষা-সংকোচন নীতি প্রত্যাহারের দাবীতে ছাত্র-মিছিলে গুলীবর্ষণ করা হয়েছিল। এর প্রতিবাদ করে দ্যুতি লেখ :

যখনই কোন দাবী তোলা হবে তখনই গুলীবর্ষণের মধ্যদিয়ে তার প্রত্যুত্তর দেওয়া হবে এই যদি আমাদের সরকারের নীতি হয় তবে তার চেয়ে লজ্জা এবং কলঙ্কের বিষয় আর কি হতে পারে ? আমরা করাচীর শহীদদের রুহের মাগফেরাত কামনা করে এবং তাদের দাবীর প্রতি সম্পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে এই নির্মম গুলিবর্ষণের তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং অবিলম্বে সরকারের এই রকম ঘৃণ্য-নীতির পরিবর্তন দাবী করছি।<sup>১৯</sup>

দ্যুতির আকর্ষণীয় আলোচনাগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ‘নতুন অধ্যায়’। উল্লেখ করা হয়েছে যে, মনীষী অন্নদাশংকর রায় এ আলোচনার সূত্রপাত করেছিলেন। তাঁর আলোচনার মূল বক্তব্য ছিল পাকিস্তান হওয়ার পর মুসলমানেরা ক্রমশ জাতীয়তাবাদী হয়ে উঠবেন। তুরস্ক প্রভৃতি দেশের দৃষ্টান্ত টেনে তিনি বলেন ;

একথা বললে সত্যের অপলাপ হবে না যে ভারতরাষ্ট্রে সম্প্রদায়িকতা পরাস্ত হচ্ছে, ধর্মনিরপেক্ষতা জয়ী হচ্ছে। কিন্তু পাকিস্তানেও কি তাই হচ্ছে ? হ্যাঁ, পাকিস্তানেও তাই হতে যাচ্ছে। পাকিস্তান থেকে যারা আন্তর্জাতিক

সভা সমিতিতে যোগ দিচ্ছেন, যারা রাষ্ট্রদূত হয়েছেন, যারা বাণিজ্য উপলক্ষে দেশবিদেশ ঘুরছেন, তাঁরা পরিচয় দিতে অভ্যস্ত হচ্ছেন পাকিস্তানি ন্যাশনাল বলে। ইরানে, ইরাকে, তুর্কীতে, মিশরে তাঁরা মুসলমান বলে পরিচয় দিলে কেউ তাঁদের দিকে ফিরে তাকাবেন না, কারণ কোটি কোটি মুসলমানের মধ্যে তাঁরা এমন কিছু বিশিষ্ট নন। কিন্তু যেই তাঁরা পরিচয় দেন যে তাঁরা পাকিস্তানী অমনি তাঁরা বিশিষ্ট আসন পান। তাঁদের মর্যাদা তাঁদের নেশনের মর্যাদার উপর নির্ভর, তাঁদের ধর্মের মর্যাদার উপর নয়। তাই যদি হলো তবে প্যান-ইসলামের তাৎপর্য রইল কোথায়? প্যান ইসলাম থেকেই পাকিস্তানের জন্ম, কিন্তু পাকিস্তান দিনে দিনে সাবালক হয়ে উঠছে, জননীর কোলে চিরকাল সে থাকবে না, থাকতে পারে না।

‘জিস্মী’ সমস্যাকে পাকিস্তানের প্রধান-সমস্যা অভিহিত করে তিনি বলেন : ভারতীয় মুসলমানের দোটা না এভাবেই (ভারত বিভক্ত হয়ে) মিতল। অথও মুসলমানসমাজ দুভাগ হয়ে গেল। এক ভাগ ভারতীয় মহাসমাজের অঙ্গ। আরেক ভাগ পাকিস্তানি মহাসমাজের অঙ্গ। মহাসমাজ হচ্ছে বহুসমাজের সমষ্টি। একটিমাত্র সমাজের সংকীর্ণ দুর্গ নয়। পাকিস্তান তার জাতীয় পতাকায় অমুসলমানদের জন্যে স্থান রেখেছে। অমুসলমানরাও পাকিস্তানি ন্যাশনাল। কেন যে তাঁদের ‘জিস্মী’ বলা হচ্ছে তার অর্থ আমার কাছে দুর্বোধ্য। প্রত্যেক দেশেই কতক লোক আছে যাদের সংখ্যা বেশি নয়, যারা মাইনরিটি। ইংলণ্ডের ক্যাথলিকরা সংখ্যায় কম, ফ্রান্সের প্রোটেস্ট্যান্টরা সংখ্যায় কম। তা বলে কি কেউ তাদের ‘জিস্মী’ বলে? ভারতের খৃষ্টান, পার্শী, শিখদের যদি ‘জিস্মী’ বা সেই রকম কোনো একটা শব্দে অভিহিত করা হয় তাহলে কি তাঁরা আপত্তি করবেন না? ভারতের মুসলমানরা যে আপত্তি করবেন এ-বিষয়ে কি কোনো সন্দেহ থাকতে পারে? মাইনরিটি হলেই যদি মানুষ ‘জিস্মী’ হয় তাহলে দেশের বনিয়াদে ফাটল ধরে, দেশ কোনো দিন দৃঢ় হয় না। সিরিয়াতে, মিশরে, চিরকাল বহু খ্রীষ্টানের বাস। যখন মুসলমান ছিল না তখনো খ্রীষ্টান ছিল। এরা সেই খ্রীষ্টানের বংশধর। কেউ কি তা বলে এদের ‘জিস্মী’ মনে করে? পাকিস্তানে যেদিন মুসলমান ছিল না সেদিন হিন্দু ছিল। আজ তাদের দেশ পাকিস্তান হয়েছে বলে কি তারা ‘জিস্মী’ হবে?

আর একটু তলিয়ে ভাবা যাক। রাষ্ট্র চলে সর্বসাধারণের ট্যাক্সে। কোনো একটি সম্প্রদায়ের প্রতি তার কোনো বিশেষ দায়িত্ব নেই। পুলিশ রক্ষা করতে বাধ্য প্রত্যেকটি অধিবাসীকে। তাই যদি হয় তবে একদল মানুষ আরেকদল মানুষের ‘জিস্মী’ হতে যাবে কোন দুঃখে। রাষ্ট্রই বা কেন মাইনরিটিকে জিস্মায় রাখবে; মেজরিটিকে জিস্মায় রাখবে না? আমার মনে হয় এসব পুরাতন শব্দ অভিধানের পৃষ্ঠা থেকে আহরণ করে ব্যবহার করা হচ্ছে নতুন অধ্যায়ের মর্ম না বুঝে। এ যুগে কেউ কারো ‘জিস্মী’ নয়। প্রত্যেকের ট্যাক্সে রাজ্য চলে, প্রত্যেকেরই প্রাপ্য যা অপর প্রাপ্য। ইংলণ্ডে আজকাল নিষ্কর্মা বলে কেউ নেই। যার কাজ নেই রাষ্ট্র তাকে কাজ জোগায়। আধুনিক রাষ্ট্রের দায়িত্ব কেবল খুন জন্ম থেকে বাঁচানো নয়, খাইয়ে পরিয়ে লিখিয়ে পড়িয়ে কাজ জুগিয়ে সুখে স্বাচ্ছন্দে রাখা। তেমন আধুনিক নাগরিকের দায়িত্ব রাষ্ট্রের জন্যে সর্বশ্ব দিতে প্রস্তুত থাকা। ‘জিস্মীর কাছ থেকে বড় ত্যাগ কেউ প্রত্যাশা করে কি? ‘জিস্মীর জন্যেই বা কোন রাষ্ট্র কবে এসব করেছে?

পাকিস্তানের প্রধান সমস্যা এই ‘জিস্মী’ সমস্যা। মাইনরিটিকে জিস্মী করে রাখলে কনস্টিটিউশনে সমান অধিকার দেওয়া বৃথা। সমান অধিকার না দিলে বা এক হাতে দিয়ে আরেক হাতে কেড়ে নিলে এ যুগের মাইরিটি চুপ করে থাকবে না, দুনিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। জগতের জনমত মাইনরিটি সমস্যার এ জাতীয় সমাধান আদৌ সমর্থন করবে না। পাকিস্তানে যেসব হিন্দু স্বরূপাতীত কাল থেকে বসবাস করে আসছেন, যারা মোগলের কাছে মানসম্মান পেয়েছে, যারা ইংরাজের সঙ্গে সংগ্রাম করেছেন তাঁরা যদি সেখানে ভারতীয়

ন্যাশনালিষ্ট হিসাবে থাকতে চান তাহলে তাঁদের সমস্যা কেউ মোটাতে পারবে না। কিন্তু তাঁরা যদি সেখানে পাকিস্তানি ন্যাশনালিষ্ট রূপে নিজেদের স্থান করে নিতে রাজী হন তাহলে বিশ্ব তাঁদের সহায়। ইতিহাস তাঁদের সহায়। পাকিস্তানেরই চিত্তশীল মুসলমান তাঁদের সহায়। একদিন পাকিস্তানের কনস্টিটিউশনও তাঁদের সহায় হবে। ‘জিস্মী’ হয়ে থাকতে হবে না তাঁদের।

মুসলমান-সমাজের মধ্যে ‘ন্যাশনালিজম’ এর বিকাশ সম্পর্কে অন্নদাশংকর রায় বলেন : ন্যাশনালিজম মুসলমানের মনে সহজে ঢোকে না। সেইজন্যে পাকিস্তানের প্রয়োজন ছিল। পাকিস্তান হওয়ার ফলে চার কোটি মুসলমান একদিনেই ভারতীয় ন্যাশনালিষ্ট হয়ে গেছেন। নয়তো এঁদের ভারতীয় ন্যাশনালিষ্ট করে তুলতে আমাদের দশ বিশ বছর লাগত। বাকী ছয় কোটি মুসলমান হয়েছেন পাকিস্তানি ন্যাশনালিষ্ট, এটাও ইসলামের ইতিহাসে যুগ পরিবর্তনের সূচনা। এর অনুরূপ ঘটনার জন্যে যেতে হয় ইউরোপের ইতিহাসে, যেদিন প্রোটেষ্ট্যান্ট রিফরমেশন শুরু হয়। এত বড় একটা ব্যাপারের জন্যে কিছু দাম না দিলে কি চলে? দেশ বিভাগ হচ্ছে সেই দাম। তার জন্যে আমাদের মনে ক্ষোভ আছে, এ ব্যথা আমরা এ জীবনে ভুলবনা। কিন্তু ব্যথা কি মুসলমানেরা কম পেলেন? এই যে তাঁদের অখণ্ড সমাজ দ্বিখণ্ড হয়ে গেল এ ব্যথা পাকিস্তানি মুসলমানদের মনে লাগছে না, কিন্তু এখানকার মুসলমানদের মনে লাগছে বৈকি। আমরা স্বভাবত অসংহত। কিন্তু তাঁরা স্বভাবত সুসংহত। তাঁদের সংহতি ভেঙ্গে গেল তাঁদেরই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তে। অনুশোচনার জন্যে তখন সময় পাননি। এবার তার সময় আসবে।

তিনি আরও মন্তব্য করেন ; পাকিস্তান হচ্ছে স্টেলড্ ফ্যাক্ট্, তাকে আনস্টেল করা চলবে না। একবার আমরা স্টেলড্ ফ্যাক্ট্কে আনস্টেল করতে গিয়ে বোকা বনে গেছি। আরেকবার সে ভুল করব না। ভারতের ইতিহাস ও ইসলামের ইতিহাস দুই ইতিহাস পাশাপাশি কাজ করছে। এটা আমাদের মালুম ছিল না। ইসলামের ইতিহাসকে তার যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে হবে। তা যদি করি তাহলে দেখব পাকিস্তানের মাটিতে একদিন কামাল পাশার আবির্ভাব হয়েছে, তাঁর তলোয়ারের খোঁচায় এমন সব সামাজিক পরিবর্তন ঘটেছে যা আমাদের সাহসে কুলোত না। বহুবিবাহ রদ হয়েছে, এক বিবাহ কয়েম হয়েছে, বোরখার বলাই নেই, আরবীতে নামাজ পড়া হয় না, কোরান পড়া হয় বাংলায়, মোল্লারা বোলার হ্যাট পরে, ফেজ মাথায় দিলে পুলিশে ধরে নিয়ে যায়, পীর সাহেবেরা নিরুদ্দেশ। ‘এ নহে কাহিনী এ নহে স্বপন আসিবে সেদিন আসিবে’<sup>২০</sup>

পরবর্তী চার সংখ্যায় উপরের প্রবন্ধের পক্ষে-বিপক্ষে সমালোচনা, তর্ক-বিতর্ক চলে। আবদুল গফুর অন্নদা শংকর রায়ের প্রবন্ধের বক্তব্য খণ্ডন করতে গিয়ে বলেন (দ্যুতি, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা) ভৌগলিক সীমাকে কেন্দ্র করে যে জাতীয়তাবাদ তা মানবসমাজকে সংকীর্ণতা শিক্ষা দিয়েছে। ফল হয়েছে এক জাতি কর্তৃক অন্য জাতির স্বাধীনতা হরণ ও শোষণ। তাঁর মতে একটি আদর্শের ভিত্তিতে মানবসমাজের একত্র হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। ফ্রান্সের কমিউনিস্ট ও ভারতের কমিনিষ্টদের মধ্যে যে আদর্শগত ঐক্যবোধ রয়েছে তাই ভৌগলিক জাতীয়তার মূলে কুঠার হেনেছে।

জনাব গফুর আরও বলেন : প্রকৃত ধর্ম—সে ইসলাম হোক আর হিন্দুধর্মই হোক—তা তথাকথিত সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী। সাম্প্রদায়িকতা রোধ করতে গিয়ে মহাত্মা গান্ধী হিন্দু হয়েও হিন্দুদের হাতেই নিহত হন।

তৃতীয় আলোচক নূরুল আফছার আবদুল গফুরের মতামত পর্যালোচনা করতে গিয়ে বলেন, বিশ্বাসের উপর জাতীয়তা গড়ে উঠতে পারে না, সাধারণ স্বার্থবোধের দ্বারাই তা সম্ভব। তিনি বলেন, সহজ কথায় ইন্দোনেশিয়ান নাগরিক সেখানকার মসজিদে বসে, মিশরীয়রা মিশরে, পাকিস্তানিরা পাকিস্তানেরই কোন মসজিদে বসে আল্লাহর ধ্যান ধারণা করবেন ; এর জন্য সবাইকে মিলে একরাষ্ট্র তৈরী করতে হবে—এমন একটি বিশ্বাস সৃষ্টি কি একান্তই প্রয়োজন বা সম্ভব ?

চতুর্থ আলোচক মীর আবুল হোসেন তাঁর সংক্ষিপ্ত আলোচনায় অধিকতর নিরপেক্ষতার সঙ্গে বক্তব্য উপস্থাপন করেন। পঞ্চম আলোচনায় ওমর কোরায়শী অল্পদা শংকর ও আবদুল গফুরের বক্তব্যের পর্যালোচনা করে বলেন, পাকিস্তান হবার পরে মুসলমানেরা অধিকতর জাতীয়তাবাদী হয়ে পড়বেন—অল্পদাশংকরের এই বক্তব্যে সত্য রয়েছে এবং পাকিস্তানের মুসলমানরাও যে অধিকতর পাকিস্তানি হয়ে পড়বেন তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। তবে একথার অর্থ এই নয় যে পাকিস্তানের মুসলমানরা আদর্শগতভাবে অন্য দেশের মুসলমানদের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করবে না, একথাও ঠিক নয়—এখানেও পাকিস্তানের ইতিহাস ও ইসলামের ইতিহাস পাশাপাশি কাজ করবে। আবদুল গফুর অল্পদাশংকর রায়ের বক্তব্যের ভ্রান্ত বা অন্যতম অথবা ভিন্নতর ব্যাখ্যা করেছেন বলেও উক্ত আলোচক মত ব্যক্ত করেন। জনাব কোরায়শী বলেন, জিম্মী সমস্যাকে পাকিস্তানের মূল সমস্যা বলা ঠিক নয়।<sup>২১</sup>

পাকিস্তানের জন্মক্ষেণে বা শিশু-অবস্থায় ইসলামি রাষ্ট্র ও পাকিস্তানি সাহিত্য সৃষ্টির বন্ধ চিন্তার সন্ধিক্ষণে আইনস্টাইনের এই কথাগুলো অবশ্যই জ্ঞানের উন্নতমাত্রার প্রতি খেয়াল করতে শিখিয়েছিল :

‘গতকালকের মনোভাব ও অবস্থার সহিত আজকের মনোভাব ও অবস্থার তুলনা হয় না। আবার আজকের মনোভাব ও অবস্থা আগামী কালে সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হয়ে পড়ে। এই সত্য ও বৈপুলিক পরিবর্তন সম্পর্কে সমগ্র বিশ্বের মানুষকে সচেতন করার তাগিদ এসেছে আজ বুদ্ধিজীবীদের কাছে। সঙ্গে সঙ্গে বিবদমান ও শ্রান্ত মানবজাতির জন্য একটি বিরাট শান্তির নীড় রচনার ভারও পড়েছে তাঁদের উপর। আর কখনও বুদ্ধিজীবীদের উপর এত বড় সামাজিক কার্যক্রম ও এতবড় গুরু-দায়িত্বের ভার পড়েনি। বিভিন্ন জাতির সংকীর্ণ ও সংস্কারাচ্ছন্ন জাতীয় ঐতিহ্যক বৈপুলিক পর্যায়ে রূপান্তরিত করে তাকে মানুষের সর্বজনীন কল্যাণের ক্ষেত্রে প্রসারিত করতে হবে। এজন্য সর্বাত্মে বুদ্ধিজীবীদের নিজস্ব জাতীয় সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠতে হবে। এই বৃহত্তরের অভিযান চালানোর মত মনোবল ও সাহস কি তাঁদের আছে? এক অসাধারণ কর্মসূচী গ্রহণের প্রয়োজন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। আজ এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলেও, দুদিন পরে অনুরূপ আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবেই। কিন্তু সেদিন আজকের পৃথিবীর বৃহত্তর অংশের ধ্বংসস্তূপের উপরই তার বুনিয়াদ পত্তন হবে। বিশ্বব্যাপী এইরূপ একটা দারুণ সংকট সৃষ্টির বিনিময়ে আমরা বর্তমান আন্তর্জাতিক অরাজকতার অবসান ঘটাতে চাইনে। এ সংকটের পরিণতি এমনি ধ্বংসলীলার সৃষ্টি করবে, যা আজ কেউ কল্পনাও করতে পারে না। এ অমরা আশা করি না—আশা করতে পারি না। কাজেই পূর্বাঙ্কেই আমাদের প্রস্তুত হতে হবে। সময় অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, সত্যিই যদি কাজ করতে হয়—তাহলে এখনই আমাদের নেমে পড়তে হবে।<sup>২২</sup>

১৯৫৯ সনে আইউব খান 'পাকিস্তান লেখক সংঘ' গড়েছিলেন। ১৯৫৩ সনের ডিসেম্বরে 'পূর্ব-বঙ্গ লেখক সংঘ' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল—এবং মফস্বলীয় বিভিন্ন শহরে তার শাখা-প্রশাখাও গড়ে উঠেছিল বলে দ্যুতি পাঠে জানা যায়। কিন্তু এই সংগঠনটির কোনো পরিচয় অন্য কোনো ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ হয়েছে বলে জানা যায় না।

দ্যুতির দ্বিতীয় বর্ষ ১০ম-১১শ যুগ্ম অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩৫৯ সংখ্যায় 'সংস্কৃতি সংবাদ' বিভাগে 'পূর্ববঙ্গ লেখক সংঘ' প্রসঙ্গে বলা হয় :

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ববঙ্গে অনেকগুলো সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়েছে। কিন্তু সংখ্যার দিক থেকে উল্লেখযোগ্য হলেও নগণ্য সংখ্যক প্রতিষ্ঠান ছাড়া বাকীগুলোর কর্মতৎপরতা একেবারেই ক্ষীণ। আবার এমন প্রতিষ্ঠানও আছে যোগুলোর প্রাথমিক সাংগঠনিক পর্যায়ের পর প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা একেবারেই শুকু ও নিঃশেষ্ট হয়ে গেছেন। ফলে প্রতিষ্ঠানে ভাঙন ধরেছে দ্রুতবেগে। এসব প্রতিষ্ঠান টিকে না থাকবারও কারণ একাধিক। সাংগঠনিক, অর্থনৈতিক ও আদর্শগত সমস্যার সংঘাতের ফলেই এসব প্রতিষ্ঠান টিকে থাকেনি বা টিকে থাকলেও অগ্রগতি লাভ করেনি। কাজেই সংখ্যার দিক থেকে নগণ্য না হলেও শূন্য ও কর্মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা পূর্ববঙ্গে এখনো অনুভূত হচ্ছে। এই প্রয়োজনের তাগিদেই পূর্ববঙ্গের তরুণ সাহিত্যিকদের উদ্যোগে সম্প্রতি ঢাকা শহরে 'পূর্ববঙ্গ লেখক সংঘ' নামে একটি সাহিত্য-প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানের বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে এর এলাকা শূন্য ঢাকা শহরেই সীমাবদ্ধ নয়। ইতিমধ্যেই প্রদেশের কয়েকটি মফঃস্বল শহরে এর শাখা গঠিত হয়েছে।<sup>২৩</sup>

'পূর্ব বঙ্গ লেখক সংঘের' উদ্দেশ্য ও আদর্শ সম্পর্কে বলা হয় : এর লক্ষ্য উদারতার মাধ্যমে মানবতা ও ঐতিহ্যকে ভিত্তি করে পূর্ব বাঙলার সাহিত্য-আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করা।

সংঘের প্রধানতম উদ্দেশ্যই প্রদেশের বিভিন্ন স্থানের সাহিত্যিকদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে সাহিত্য আন্দোলনকে ব্যাপকতর করা। এদিক থেকে এই নতুন সংঘের কর্ম-চাঞ্চল্য ইতিমধ্যেই প্রদেশের সাহিত্যিক ও সাহিত্যমোদীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং অনেক তরুণসাহিত্যিক সংঘের সংস্পর্শে এসে গেছেন।... পূর্ববঙ্গ লেখক সংঘের কর্মতৎপরতা অনেক উৎসুকোর সঙ্গে লক্ষ্য করছি। তাই সংঘের কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে আমরা বলতে চাই যে, অতীতে সংস্কৃতিকর্মীর অভাব, অর্থনৈতিক টানা পোড়ন, আদর্শগত সংঘাত ও পারস্পরিক সমঝোতার অভাবে যেসব প্রতিষ্ঠান নষ্ট হয়ে গেছে সেগুলো থেকে তাঁরা সহজেই শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন এবং তাঁদের সংঘকে সুস্থ পরিচালনার মাধ্যমে অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনের বহুবিধ সমস্যা সম্পর্কে তাঁরা সব সময় সজাগ দৃষ্টি রাখবেন—এই আশা করি। (সূত্র ; পূর্ববঙ্গ)

উপর্যুক্ত প্রতিবেদন ছাপা হয় দ্যুতির যে-সংখ্যায়, সেটিই প্রাপ্ত শেষ সংখ্যা। 'ক্রমশঃ' প্রকাশিত হবে বলে ওবায়েদ আশকারের নাটক 'কর্ডোভার আগে' এই সংখ্যায়ই ছাপা হয়েছিল। ১৯৫৪ সনের প্রাদেশিক সাহিত্য-সম্মেলন (ঢাকা কার্জন হলে যেটা অনুষ্ঠিত হয়) এর সিদ্ধান্ত ও উদ্দেশ্য প্রাচরিত হবার পরে দ্যুতিতে 'সংস্কৃতি সংবাদ' কলামে (২/১০-১১) সম্মেলনের সাফল্য কামনা করা হয়েছিল।

কিন্তু এরপর হঠাৎই দ্যুতি বন্ধ হয়ে যায়। অন্যান্য পত্রপত্রিকায়ও 'পূর্ববঙ্গ লেখক সংঘের' কোনো খবর জানা যায়নি। ফলে এর ইতিহাস দ্যুতির পাতাই ধারণ করে আছে। এসব নানা কারণে এবং অনেক মূল্যবান রচনা দ্বারা বাংলাদেশের সাহিত্য সংস্কৃতি ও সমাজের নানা প্রসঙ্গ গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনায় এনে দ্যুতি কালে প্রয়োজনকে যতো সীমিত সামর্থ্যেই হোকনা কেন মোকাবিলার প্রয়াস গ্রহণ করেছিল।

## তথ্যপঞ্জি

১. দ্যূতি ('কৈফিয়ত'), সম্পাদক আরেফ আলী, ১ বর্ষ, ১ সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৫৬, পৃ. ৩৩।
২. পূর্বেক্ত ('আমাদের কথা')।
৩. মোহাম্মদ মোদাবেবর, আমাদের ভবিষ্যত সংস্কৃতি, পূর্বেক্ত, পৃ. ১৭।
৪. অধ্যাপক অমিয়ভূষণ চক্রবর্তী, স্বাধীনতার অর্থ, পূর্বেক্ত, পৃ. ৯।
৫. দ্যূতি, (উপরোক্ত), ১ বর্ষ, ১ সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৫৬, পৃ. ১০।
৬. রেজোয়ান হোসেন সিদ্দিকী, পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক উদ্যোগ, পাণ্ডুলিপি ৫ খণ্ড, ১৩৮২; সম্পাদক আনিসুজ্জামান, বাংলাসাহিত্য সমিতি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ৫৩।
৭. ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়নের সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার কালে জানা যায়।
৮. রেজোয়ান হোসেন সিদ্দিকী, পূর্বেক্ত, পৃ. ৮৯।
৯. অন্নদাশংকর রায় এর পত্র দ্যূতির প্রথম বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা (ভাদ্র ১৩৫৯) প্রকাশিত হয়।
১০. দ্যূতির প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যার 'বিতর্কিকা' বিভাগের শিরোনাম ছিল 'নতুন অধ্যায়'। সম্পাদক বলেন : "দ্যূতির 'বিতর্কিকা' শীর্ষক ফোরামে বিভিন্ন মতের আলোচনা-সমালোচনা পত্রস্থ করা হবে। সেই অনুসারে এবার শীযুক্ত অন্নদাশংকর রায়ের 'নতুন অধ্যায়' প্রকাশ করা যাচ্ছে। বলাবাহুল্য, আমরা এ নিবন্ধে প্রকাশিত অনেক মন্তব্যের সহিত একতম নই। আমরা বিশ্বাস করি, এতে প্রকাশিত অনেক মন্তব্যই ইসলাম ও মুসলিম-মন সম্পর্কে ভ্রান্তধারণা প্রসূত।"
১১. মোতাহের হোসেন চৌধুরী, অসূয়া, দ্যূতি, ১ বর্ষ, ১ সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৫৮, পৃ. ১২-১৩।
১২. দ্যূতি, পূর্বেক্ত, সম্পাদকের দৃষ্টিতে, পৃ. ৬০।
১৩. পূর্বেক্ত, পৃ. ৬১।
১৪. পূর্বেক্ত।
১৫. সাঈদ উর রহমান এর 'পূর্ববাংলার রাজনীতি সংস্কৃতি ও কবিতা' শীর্ষক গ্রন্থে (পৃ. ৩৭-৩৮) বলা হয়েছে : 'সম্মেলনটি সমাজবিজ্ঞান, ইসলামী আন্দোলন, লোক-সংস্কৃতি, সাহিত্য অধিবেশন ও বিচিত্রানুষ্ঠান—এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত ছিল। পাকিস্তানের বিভিন্ন এলাকার কয়েকজন এবং সিরিয়ার একজন প্রতিনিধি এতে অংশ নেন।'
১৬. দ্যূতি, ১ বর্ষ, ৮ সংখ্যা, কার্তিক ১৩৫৯, পৃ ৪২৩ (সম্পাদকের দৃষ্টিতে)।
১৭. আহমদ ফরিদ উদ্দীন, আধুনিক মন(প্র), ১ বর্ষ, ৫ সংখ্যা, (শ্রাবণ ১৩৫৯), পৃ. ২৪৪।
১৮. সৈয়দ বদরুদ্দীন হুসেন, সাহিত্যের নবজন্ম (প্র); দ্যূতি, ১ বর্ষ, ১১ সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৫৯, পৃ. ৩৭১।
১৯. দ্যূতি, ১ বর্ষ, ১১ সংখ্যা, মাঘ ১৩৫৯, সম্পাদকীয়।
২০. অন্নদাশংকর রায়, নতুন অধ্যায়, দ্যূতি, ১ বর্ষ, ১ সংখ্যা, পৃ. ৫৫-৫৯।
২১. আবদুল গফুর, নূরুল আফছার, মীর আবুল হোসেন, ওমর কোরায়শী প্রমুখের আলোচনাগুলো ছাপা হয় ১ বর্ষ ২-৫ সংখ্যায়। সম্পাদক পঞ্চম সংখ্যায় বিতর্ক বন্ধ করে দেন।
২২. আলাবার্ট আইনস্টাইনের Out of my letter years গ্রন্থের A message to the intellectuals শীর্ষক প্রবন্ধের অনুবাদ করেন সানাউল্লাহ নূরী। প্রকাশিত হয় দ্যূতির প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৫৮তে; পৃ. ৩৮।
২৩. দ্যূতি (সংস্কৃতি-সংবাদ), ২ বর্ষ, ১০-১১ সংখ্যা, ১৩৬০ প্রতিবেদনটি লিখেছিলেন নূরুল আলম।

## ৮. পূর্ববী

(১৯৬০)

‘পাকিস্তান রাইটার্স গিল্ড, পূর্ব পাকিস্তান শাখার মুখপত্র’ প্রথমে ‘পূর্ববী’ নামে ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিল নওবাহার সম্পাদক কবি গোলাম মোস্তফা (১৮৯৭-১৯৬৪) এবং মুসলিম ঐতিহ্যের পুনর্জাগরণকামী গবেষক, অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের (১৯১৯-৬৯) যুগ্মসম্পাদনায়। গিল্ডের পূর্বাঞ্চল শাখার অফিস বর্ধমান হাউস (এখন বাংলা একাডেমী), ঢাকা থেকে প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে দীর্ঘ যাত্রার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। কিন্তু, পূর্ববীর একটিমাত্র সংখ্যাই প্রকাশিত হয়েছিল। পরে ‘লেখক সংঘ পত্রিকা’ নামে এক বছর চলে এই পত্রিকা রূপান্তরিত হয় ‘পরিক্রম’-এ। পরিক্রমের ইতিহাস জানার জন্যই ‘পূর্ববী’ ও ‘লেখক সংঘ পত্রিকা’ সম্পর্কে আলাদা ভাবে অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

পূর্ববীর প্রথম সংকলনটি ক্রাউন ৪ এর ১ সাইজে ৪২ পৃষ্ঠার ছিল। দাম এক টাকা। প্রথম রচনা ছিল কবি গোলাম মোস্তফাকৃত ইকবালের ‘শিকওয়া ও জবাবই-শিকওয়া’। এরপর ‘কায়কোবাদ’ সম্পর্কে সৈয়দ মুর্তজা আলীর প্রবন্ধ এবং প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁ লিখিত ‘আমাদের সাহিত্য’; মতিনউদ্দীন আহমদের ব্যঙ্গ-রচনা ‘বর্ষান্তি’; বেগম ইউসুফ জামাল হোসেন-এর আলোচনা ‘আদমজী প্রাইজ’ ইত্যাদি। বেগম ইউসুফের আলোচনায় পাকিস্তানের বিভিন্ন সাহিত্য-পুরস্কার প্রবর্তনের ইতিহাস আছে। এই রচনায় জানা যায় লেখক সংঘ স্থাপিত হওয়ার পর—‘আদমজী পুরস্কার’ সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবর্তিত হবার ফলে সাহিত্যিকদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। বলাবহুল্য এরপর বিভিন্ন ব্যক্তি, কোম্পানী ও প্রতিষ্ঠান সাহিত্য-সংস্কৃতি ও সমাজসেবার জন্য পাকিস্তান আমলে বেশকিছু পুরস্কার প্রদানের রীতির প্রচলন করেন। লেখক সংঘের উদ্যোগে ‘দাউদ পুরস্কার’ প্রবর্তিত হয়। পূর্ববী পত্রিকার সম্পাদক নূরুল ইসলামও অনুপ্রাণিত হয়ে বার্ষিক ‘পূর্ববী পুরস্কার’ (১০০০ টাকার) প্রদানের কথাও ঘোষণা করেন। আইউব খান বিভিন্ন খেতাব ও পুরস্কার দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। ‘রাইটার্স গিল্ডের সংবাদ’ বিভাগে কার্যবিবরণী আর সম্পাদকীয়তে পূর্ববীর উদ্দেশ্য-আদর্শ ব্যক্ত হয়েছিল। সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

পূর্ববীর নামকরণের মধ্যে একটা তাৎপর্য আছে। পূর্ববী বেলা শেষের সূর। অস্তগামী সূর্যের বিদায়-রাগে এসুর অনুরঞ্জিত। এ সূরে বিদায় ও অবসানের করুণ মুচ্ছনা আছে। কিন্তু সত্যই কি এ অস্তগমনের সূর? সত্যই কি সূর্যের কোন উদয়াস্ত আছে? ভৌগোলিক সীমারেখা টানিয়া আমরা আকাশকে খণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছি। আমাদের দৃষ্টিও তাই সংকীর্ণ হইয়াছে। এই সীমা প্রাচীর তুলিয়া দিলে কোথায়ও অস্ত নাই, উদয় নাই, পূর্ব নাই, পশ্চিম নাই। সব তখন একাকার হইয়া যায়। এক মহান ঐক্যের মধ্যে সব খণ্ডতা বিলীন হইয়া যায়। পূর্বাচলকে যখন একান্ত আপনার বলিয়া ভাবি তখনই অস্তাচলকে দেখিয়া দৃষ্ট পাই। কিন্তু এক আকাশের অস্ত ত আর—এক আকাশের উদয়। সূর্য যেখানে ডুবিয়া যায়, সেখান হইতেই ত পশ্চিম-আকাশের উদয়-প্রভাত সূচিত হয়। কাজেই পূর্ব-পশ্চিমকে এক করিয়া দেখিলে কারো মনেই কোন খেদ থাকে না। মুসলমানের স্বদেশ তাই মাটির স্বদেশ নয়; ভৌগোলিক স্বদেশ-প্রেমকে অতিক্রম করিয়া সে করে বৃহত্তর মানব-প্রেমের সাধনা—মনের দিকচক্রবালের সম্প্রসারণের সাধনা। সূর্যের সংগেই একমাত্র তার তুলনা হইতে পারে। কবি ইকবাল তাই সত্যই বলিয়াছেন;



জাহাঁ মেঁ আহলে ইম্মা সুরাতে খুরশীদ জ্বিতে হুঁয়ে  
ইধার ডুবে উধার নিক্লে, উধার ডুবে ইধার নিক্লে।

অর্থাৎ এই দুনিয়ায় সূর্যসম সুরাৎ হল মুমিনদের। এদিক যদি যায় ডুবে ত ওদিক আবার উঠবে ফের।

পুরবীর মর্মবাণীতে এই সুরই ধ্বনিত হইবে। যুগমনের স্বপ্নও তাই। আজ আমরা এক নতুন যুগের প্রবেশ দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। এ যুগ নভো-ভ্রমণের যুগ। চাঁদে-চাঁদে-গ্রহে গ্রহে তারায়-তারায় ফিরিবার যুগ। প্রাচীন পৃথিবীর চৌহদ্দী, রূপ ও গঠন আজ তাই অনেক খানি মূল্যহীন প্রমাণিত হইতেছে। আজ অজ্ঞানকে জানিবার দিন, না-দেখাকে দেখিবার দিন। কাজেই প্রচলিত ভূগোলের আলোকে এই পৃথিবীকে একান্ত করিয়া দেখা আর চলিবে না। আমাদের দৃষ্টিকোণকে খানিকটা পরিবর্তিত করিতেই হইবে। আমাদের হৃদয়-তন্ত্রীতে যে সুর এখনও অনাহত রহিয়াছে, তাহাকে আবার জাগাইতে হইবে। পূর্ববী এই নূতন সুর সাধনায় যথাসাধ্য আত্মনিয়োগ করিবে।

‘পূর্ববী’ পাকিস্তান রাইটার্স গিল্ডের পূর্বাঞ্চল শাখার মুখপত্র হলেও ‘আপাতত ইহা ত্রৈমাসিক রূপে প্রকাশিত হইবে।... মূলত একখানি সাহিত্যপত্রিকাই হইবে। তবে... গিল্ডের যাবতীয় সংবাদ ও তথ্য এই পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে’ বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছিল। পূর্ববী পূর্বপাকিস্তান শাখা গিল্ডের সেক্রেটারি ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছিল এবং ইন্ডেন প্রেস ৪২/এ হাটখোলা রোড, ঢাকা থেকে এ. আর, খান কর্তৃক মুদ্রিত হয়েছিল। বলাবাহুল্য এটা পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থে ও নিয়ন্ত্রণে বি. এন. আর-এর মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছিল। তবে মাহেনও-এর মতো সরকারি কর্মচারীদের ব্যবস্থাপনায় এটি ছিল না। স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কিছু স্বাধীনতা তাঁরা ভোগ করতেন। ভোটাভোটির মাধ্যমে কর্মকর্তা সম্পাদনা পরিষদ ও কার্যকরী পরিষদ গঠিত হতো।

## ৯. লেখক সংঘ পত্রিকা

(১৯৬১-১৯৬২)

লেখক সংঘের বাংলা মুখপত্র ‘পূর্ববী’ নামে একটি সংখ্যা প্রকাশিত হবার পর এটা ‘লেখক সংঘ পত্রিকা’ নামে প্রকাশিত হয়। ‘লেখক সংঘ পত্রিকা’ এগার সংখ্যা প্রকাশিত হয়। প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৮ তে। প্রথম ও দ্বিতীয়-তৃতীয় যুগ্ম সংখ্যায় সম্পাদক হিসেবে কবি গোলাম মোস্তফার নাম এককভাবে মুদ্রিত হয়। মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের সেরে যাবার কারণ কি তা আজ আর স্পষ্ট করে কেউ জানাবেন না। তবে পত্রিকার পাতাতেই আইউবের ছুঁড়ে দেয়া ডালরুটি ভাগাভাগি নিয়ে বিভিন্ন গ্রুপের লেখক বুদ্ধিজীবীদের দলাদলি-কষাকষি-রেষারেষি বা প্রবল প্রতিযোগিতা ছিল বলে জানা যায়। লেখক সংঘ পত্রিকার চতুর্থ সংখ্যা থেকে গোলাম মোস্তফার সঙ্গে কবি বেগম সুফিয়া কামালের নামও ছাপা হয়।

লেখক সংঘ পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় ‘আমাদের কথা’ শীর্ষক সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

পত্রিকা আরো আগেই প্রকাশ করা উচিত ছিল। কিন্তু নিয়মিত মাসিকরূপে পত্রিকা প্রকাশ করতে হলে আনুষঙ্গিক আয়োজন করতে হয় অনেকখানি। পত্রিকার নামকরণ সম্বন্ধেও মতবিরোধ ছিল। তাই সকল মতের সমন্বয় করতে কিছুটা বিলম্ব ঘটেছে।... ‘লেখক সংঘ পত্রিকা’ শেষ সিদ্ধান্তের ফল।

লেখক সংঘ পত্রিকার প্রথম সংখ্যার পৃষ্ঠা ছিল ৮০। পরের যুগ্মসংখ্যার পৃষ্ঠা ছিল ১২০। পরেরটার পৃষ্ঠা ৬৬। মোহাম্মদীর মতো পৃষ্ঠা সংখ্যায় ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হয়েছিল। ৯টি খণ্ডে (একাদশ সংখ্যা) মোট ৬৯০ পৃষ্ঠা ছাপা হয়েছিল। সুফিয়া কামাল লেখক সংঘ পত্রিকার যুগ্মসম্পাদকরূপে শেষ পর্যন্ত ছিলেন। এই পত্রিকা আশরাফউজ্জামান খান কর্তৃক পাকিস্তান লেখক সংঘ, পূর্ব পাকিস্তান শাখার অফিস, বর্ধমান হাউস থেকে প্রকাশিত এবং পূর্ববঙ্গ প্রেস, ২ জিন্দাবাহার ২য় লেন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত হয়েছিল। দাম পঁচাত্তর পয়সা, কখনো এক টাকা ইত্যাদি রাখা হয়েছিল। বৈশাখ থেকে শ্রাবণ পর্যন্ত, ১৩৬৯, ৪ মাস বন্ধ থেকে এই পত্রিকাই পরে ‘পরিক্রম’ নামে প্রকাশিত হয়েছিল। লেখক সংঘের চরিত্র-লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং সীমাবদ্ধতা বোঝার জন্য সহায়ক হবে ‘পাকিস্তান লেখক সংঘের শপথপত্র’র মর্ম অনুধাবন করলে—সংঘের সদস্য হতে হলে এই আগুবাক্যে বিশ্বাস স্থাপন প্রাথমিক শর্ত হিসেবে গণ্য হতো :

দেশের প্রচলিত সকল ভাষার প্রতিনিধি আমরা পাকিস্তানের লেখকগণ আমাদের মাতৃভূমির সর্বস্বীন উন্নতি, মর্যাদা বৃদ্ধি, আন্তর্জাতিক শান্তি এবং মানবজাতির বিকাশের কার্যে আত্মোৎসর্গের শপথ গ্রহণ করছি।

জাতিসংঘ রচিত মানবাধিকারের সনদে আমরা বিশ্বাসী। লেখক হিসাবে স্বাধীনভাবে মতামত জ্ঞাপন ও প্রচারের অধিকার আমাদের একটি মৌলিক অধিকার। এ অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখতে আমরা বদ্ধপরিকর। কারণ এ অধিকারের অভাবে সৃষ্টিধর্মী রচনা অর্থহীন ও উদ্দেশ্যহীন হয়ে পড়ে।

সত্যের যথাযথ রূপায়ণ, দেশাত্মবোধের অনুশীলন আন্তর্জাতিক শূভেচ্ছা ও সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং মানুষের মধ্যে উন্নততর সম্পর্ক স্থাপন করার মহান কর্তব্য সম্বন্ধে আমরা সজাগ, কারণ মানবজাতির মর্যাদা ও সুখসমৃদ্ধ্য পারস্পরিক সহযোগিতা ও উন্নততর সম্পর্কের উপরই নির্ভরশীল।

লেখক হিসেবে আমরা ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে এমন একটি সুখী ও সুষ্ঠু সমাজ গড়ে তোলার দায়িত্ব গ্রহণ করছি যেখানে সকলের জন্য অবাধে সমান সুযোগ সুবিধা থাকবে এবং যার ফলে ঐশ্বর্য ও ক্ষমতা মানবিক গুণাবলী ও আধ্যাত্মিক চিন্তাধারা বিকাশের সহায়ক হবে। কাজেই আমরা বিজ্ঞানের উন্নতিকে পৃথিবীতে শান্তি ও সম্পদ বৃদ্ধির উপায় বলে বিশ্বাস করি।

‘লেখক সংঘ পত্রিকা’র প্রথম পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত এই শপথ বাক্যে পত্রিকার উদ্দেশ্য দুই পাকিস্তান মিলে থাকার সম্প্রীতির আদর্শই বুঝানো হয়েছে। এর রচনাবলি দ্বারা ইসলামি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের চর্চা করা হয়। এর লেখক ও লেখার পরিচয় নেয়া যাক। লেখক সংঘ পত্রিকার কবি ও কবিতা :

সৈয়দ আলী আহসান (একাঙ্কী, ১/১; অনেক ঘনিষ্ঠতায়, ১/৮-৯); আখতার উল আলম (কোহিনুর, ১/১০ ঘুম : ঘুম ১/৪, এই মন এই রৌদ্রের দিন ১/৭, শেলী তুমি, ১/১০); আ. ন. ম. বজলুর রশীদ (নাথিয়া গলি, ১/১; আমার ওতান, ১/৭; মধ্য রাত্রি, ১/৮-৯); আবদুর রশীদ খান (ইকবালের যবুর-ই-আলম থেকে অনুবাদ, ১/১; বিন্দু ১/৭); সুফিয়া কামাল (উদয়ের দেশ, ১/১); জসীম উদ্দীন (দুই ফুল, ১/২-৩); বন্দে আলী মিয়া (লেগু শেষে, ১/২-৩; পৃথিবী ধূসর হলো, ১/১০); প্রজ্জেশ কুমার রায় (সেন্ট, ১/২-৩); জাহানারা আরজু (জিজ্ঞাসা, ১/২-৩; রৌদ্রগান, ১/১১); আবদুল কাদির (ডোবা, ১/৪); মাহবুব তালুকদার (আত্মহত্যার আগে, ১/৪; সম্রাট, ১/৫); রাশিদা জামান (বৃষ্টি, ১/৪); কাদের নওয়াজ (প্রিয়া, ১/৫); তালিম হোসেন (দুটি গান ১/৫; দুটিগান, ১/৮-৯); শামসুল হক কোরায়শী (শরত রাতে, ১/৫; অলস মুহূর্তের কবিতা ১/৮-৯); বেনজীর আহমদ (মুক্তি বিহঙ্গম, ১/৬); মরতুজা (সুকন্যা কঙ্কার স্বপ্ন, ১/৬); হাবিবুর রহমান (দেহের খিমাং, ১/৭; কোথায় থাকি, ১/১১); নূর মুহম্মদ মিঞা (সে ছিল অভিমাত্রী, ১/৭); গোলাম মোস্তফা (আলাওল, ১/৮-৯); আবু সাঈদ জহুরুল হক (যে কথা ভাবছি, ১/৮-৯); আহসান হাবীব (ঈয়ার আলোকে আমি, ১/১০); আজিজুর রহমান (দুটি গান, ১/১০); বদরুন্নেসা আবদুল্লাহ (শতাব্দীর চাঁদ, ১/১১); মওলানা নুরুদ্দীন আহমদ (অনুবাদ, ইকবালের বাল-ই-জিব্রীল থেকে, সাকীনা মা; মসজিদ-ই-কারতোবা ১/৮-৯);

এই পত্রিকা গদ্য-প্রধান ছিল। গল্প লিখেছিলেন শওকত ওসমান (প্রস্তর ফলক; একটি রাগিনী, ১/১; স্কেচ বুক থেকে : জন্তুকথা) হামেদ আহমদ (ঋণ পরিশোধ, ১/১, ১/৫); মতিনউদ্দীন আহমদ (পাগলী, ১/২-৩); সুবোধ দাশগুপ্ত (বস্তামামার গাড়ী, ১/২-৩); আহমদ রফিক (শেষ দেখা, ১/৪); মোহাম্মদ নাসির আলী (আইসক্রীম, ১/৪); রাবেয়া খাতুন (শ্বেতকপোতী, ১/৫); কৃষ্ণ চন্দর (চীনা পাখী, অনুবাদ : কাজী মাসুম, ১/৬); বেগম সুলতানা ইসলাম (মলি, ১/৬); হুমায়ুন খান (প্রথম প্রেম, ১/৬); আবু জাফর শামসুদ্দীন (একজোড়া প্যাট, ১/৭); বুলবুল ওসমান (পংশয়, ১/৭); আহমদ রফিক (বিষমু কোণ, ১/৮-৯; শিকার, ১/১১); কুদরতুল্লাহ শাহাব (শেষ পর্যন্ত, উর্দু থেকে অনু; ফখরুজ্জামান চৌধুরী, ১/১০); শহীদ আফদ (দৃষ্টি, ১/১০); কাজী মোস্তাফিজুর রহমান, (রাত্রির নরক, ১/১১) ইত্যাদি।

তাছাড়া আশরাফউজ্জামানের ধারাবাহিক উপন্যাস ‘ডাকিনী পদ্মা’ প্রথম সংখ্যা থেকেই ধারাবাহিক এতে প্রকাশিত হয়।

প্রবন্ধকার ও রচনার শিরোনাম ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (ফারসীর বাংলা দখল, ১/১; কবি আলাওল, ১/১১); মুহম্মদ আবু তালিব (পঞ্চদশ শতকের কবি শ্রী মুহম্মদ কালা ও তাঁর কাব্য ১/১); আবদুল কাদির (বিষাক্তর কাব্য; শ্রী সৈখ জোহাদ রেহিম প্রণীত), ১/১); আতোয়ার রহমান (বাংলাদেশের গ্রাম্য ছড়া, ১/১; মেয়েলীগানে সমাজচিত্র ১/৮-৯), দেওয়ান আবদুল হামিদ; (কবি সৈয়দ এমদাদ আলী, ১/১); হাসান জামান (মুসলিম চিন্তাধারায় ইকবালের অবদান, ১/২-৩); আশরাফ সিদ্দিকী (লোক-বিজ্ঞান, ১/২-৩); মুজিবুর রহমান খাঁ (ভাষা ও শিক্ষা-সংকটের এক অধ্যায়, ১/২-৩); মোস্তফা কামাল বার-এট-ল (স্থিতিশীল

শাসনতন্ত্রের জন্যে, ১/২-৩) ; হাবিবুর রহমান (আর্নেস্ট হেমিংওয়ে, ১/২-৩) ; আবুল ফজল (নৃত্য শিল্পী বুলবুল চৌধুরী, ১/২-৩) ; রফিকুল ইসলাম (নজরুল ইসলামের গান, ১/২-৩) ;

গোলাম মোস্তফা (আর্থ-থিওরী, ১/৪) ; আধুনিক কবিতা, ১/৮-৯ ; সমালোচনার সমালোচনা, ১/১০) ; মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (যুগমানস ও কবি কায়েকোবাদ, ১/৪) ; আবু যোহা নূর আহমদ (সুদানের রাষ্ট্রনায়ক মেহেদীর, জীবনী, ১/৪) ; মিসরের রাষ্ট্রনেতা যাগলুল, ১/৮-৯) ; রওশন ইজদানী (মোমেনশাহীর পল্লীগীতিনাট্য, ১/৪) ; আ. ন. ম. বজলুর রশীদ (শাহ লতীফ, ১/৫) ; আছহারুল ইসলাম (পারসীসাহিত্যে হিন্দুর দান, ১/৫) ; মাহফুজউল্লাহ (মোহাম্মদ?) (সাহিত্য ও জাতীয়চেতনা, সংলাপের ১/১ সংখ্যা প্রকাশিত ড: সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়নের প্রবন্ধের প্রতিক্রিয়ায়, ১/৫) ;

সৈয়দ মুর্তজা আলী (নবনূর, ১/৬) ; গোলাম রসুল (ইকবাল-নজরুল-রবীন্দ্রনাথের শিল্প ও জীবনবোধ, ১/৭) ; জগলুল হায়দার আফ্রিক (আবুল ফারায় ও কিতাবুল আমানী, ১/৭) ; মুহম্মদ আবদুল হাই (আলাওলের সেকান্দার নামা, ১/৮-৯) ; মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন (সৈয়দ আলাওল, ১/৮-৯) ; গোলাম সাকলায়েন (সেখ জুমনউদ্দীন, ১/৮-৯) ; ড: কাজী মোতাহার হোসেন (আমার সাহিত্যিক জীবনের অভিজ্ঞতা (স্মৃতি), ১/৮-৯) ;

ইব্রাহীম খাঁ (তক্ষশীলার পথে ভ্রমণ, ১/৮-৯) ; জসীমউদ্দীন (করচী-মুলতানে কয়েকদিন ভ্রমণ, ১/১০) ; খোদেজা খাতুন (শত পথ সহস্র পথিক, ১/১০) ; আনোয়ারুল করিম (বাউল কবি লালন শাহ, ১/১০ ও পরবর্তী সংখ্যা) ; শীলা ম্যাকডোনাল্ড (আধুনিক সাহিত্যে ধর্মীয় চেতনা, অনুবাদ : আখতার উল আলম, ১/১১) ; ডা: গিরিশচন্দ্র বড়ুয়া (পালি বৌদ্ধ সাহিত্যে জাতকোপাখ্যান, ১/১১) প্রভৃতি।

উপরের তালিকা থেকে দেখা যায় ইকবালের অনুবাদ, ইসলামি-সাহিত্য, মধ্য ও আধুনিক যুগের মুসলিম লেখক, পাকিস্তান ভ্রমণ ইত্যাদি বিষয়ে পাকিস্তানবাদী লেখকদের স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে রচিত আলোচনাই লেখক সংঘ পত্রিকায় মুখ্য ভাবে জায়গা পেয়েছে। অপরাপর পত্রিকায় প্রকাশিত রচনার বাদ-প্রতিবাদ বা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াও এবং বেশ কিছু বইয়ের আলোচনাও এতে স্থান পায়। সংলাপে ড: সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়নের ‘সাহিত্য ও জাতীয় চেতনা’ শীর্ষক প্রবন্ধের সমালোচনা করেছেন মাহফুজউল্লাহ। ‘কষ্টি পাথর’ ছদ্মনামে সংলাপের (১/১) সমালোচনাও করা হয়েছে কঠোরভাবে। এতে বলা হয় বিএন আর এর মাধ্যমে প্রকাশিত সংলাপে পাকিস্তানি আদর্শ অনুপস্থিত থাকাকাটা দুঃখজনক (১/৪)।

মাহফুজউল্লাহ বলেন, ড: সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়ন ‘সাহিত্য ও জাতীয় চেতনা’ শিরোনামে প্রবন্ধ লিখেছেন, যাতে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে তিনি পাকিস্তানের সাহিত্য ও এতে প্রতিফলিত জাতীয় চেতনার স্বরূপ উদঘাটন করে কোনো সমালোচনা বা মতামত উপস্থাপিত করবেন, কিন্তু তিনি বিভিন্ন দেশের নানান সাহিত্যের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় জাতীয় চেতনার আলোচনা করে অনেকটা চোখ ঠারানোর কাজ করেছেন।<sup>১</sup>

যাহোক, লেখক সংঘ পত্রিকায় দেখা যায়, কানাইয়া লাল কাপুর এর রচনা থেকে ‘কাজ’ নামে একটি নাট্যাংশের অনুবাদ করেছিলেন কাজী মাসুম (১/৮-৯) ; তাছাড়া ড: মুহম্মদ শহীদুল্লাহর ‘ফাসীর বাংলা দখল’ (১/১) শীর্ষক রচনাটিরও প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন মীজানুর রহমান (১/২-৩)। ড: শহীদুল্লাহও তাঁর জবাব দিয়েছিলেন ঐ সংখ্যাতই।

দেয়া হয়েছিল : আল্লামা ইকবালের স্ট্রি রিফ্লেকশন (আলোচক গোলাম মোস্তফা) ; কাজী আকরম হোসেন প্রণীত ‘দেউয়ান-ই-হাফিজ’ (আলোচক : মোহাম্মদ মনসুরউদ্দীন) ;

আ. ন. ম. বজ্রলুর রশীদ প্রণীত 'পথ বেঁধে দিল' (আলোচক মাফরুহা চৌধুরী) ; রশীদ করীম প্রণীত 'উত্তম পুরুষ' (আলোচক ; আহসান হাবীব) ; মো: গোলাম হোসেনের 'কাব্য যুথিকা' (আলোচক ; ড: কাজী মোতাহার হোসেন) ; 'নজরুল রচনা সম্ভার' (আলোচক : আবুল ফজল) ; আবদুর রহমান প্রণীত 'কোরআন ও জীবনদর্শন' (আলোচক ; গোলাম মোস্তফা) ; হরিনারায়ণ নন্দীর কবিতার বই 'আকাশ মাটি মানুষ' (আলোচক : আবদুল কাদির) ; মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনের হারামনি (আলোচক : রফিকুল ইসলাম) ; মওলানা মুহম্মদ আবু বকর প্রণীত 'কাযিদ নামা' (আলোচক : শাহাবুদ্দীন আহমদ) ; কবি হাবীবুর রহমানকৃত কাব্য 'উপাস্ত' (আলোচক কষ্টিপাথর) ; এবং আহমদ রফিক প্রণীত 'শিল্প সংস্কৃতি জীবন' (আলোচক : শাহাবুদ্দীন আহমদ) প্রভৃতি গ্রন্থের পরিচয় মন্তব্যসহ।

এই পত্রিকায় কঠিনশীলশিল্পী ও বিশিষ্ট সংস্কৃতিসেবী আব্বাসউদ্দীন এবং শেরেবাংলার মৃত্যুতে সম্পাদকীয় প্রকাশ করা হয়।

### তথ্যপঞ্জি

১. কষ্টিপাথরকৃত সংলাপের সমালোচনা প্রকাশিত হয় 'লেখক সংঘ পত্রিকা'র ১ম বর্ষ, ৪ সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৬৮ সংখ্যায়। গোলাম মোস্তফা তখন সম্পাদক। তাঁর অনুপ্রেরণা কিংবা নিজস্ব প্ররোচনায় কেউ লিখে থাকবেন এটি। মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহর প্রতিক্রিয়া 'সাহিত্য ও জাতীয় চেতনা' প্রকাশিত হয় ঐ পত্রিকা ১/৫ আশ্বিন ১৩৬৮ সংখ্যায়।

## ১০. সংলাপ

(১৯৬১—১৯৭০)

পাকিস্তান সরকারের আমলা ও কবি, এবং ঝাঁটি পাকিস্তানবাদী বুদ্ধিজীবী আবুল হোসেন (১৯২২) ও সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েনের (১৯২১) যুগ্ম সম্পাদনায় ত্রৈমাসিক সংলাপ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬১ সনের আগস্ট, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে। সংলাপ প্রথম পর্যায়ে বছর দুই নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছিল, তাতেই এ-পত্রিকা পূর্ববাঙলার সাময়িকপত্রের ইতিহাসে স্থায়ী আসন করে নিতে পেরেছিল। কারণ ‘সাহিত্যে বিদ্যা-বেদগ্নের বুনিন্যাদ সুদৃঢ় করার কাজে সংলাপ মনোযোগ দিয়েছিল। সস্তা জনপ্রিয় রচনা তার লক্ষ্য নয়।’<sup>১</sup>

আর সস্তা, নগ্ন পাকিস্তানি ভাব বা জাতীয়তাবাদী চিন্তা এতে প্রচার করা হয়নি বলে লেখক সংঘ পত্রিকার প্রথম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যায় (ভাদ্র ১৩৬৮) ‘কণ্ঠি পাথর’ ছদ্মনামে কোনো খাস-পাকিস্তানবাদী সমালোচক সংলাপের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হবার পর মতামত ব্যক্ত করেছিলেন : ‘সংলাপের একটি বৈশিষ্ট্য আমাদের চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে,—সেটি হচ্ছে তার সমাজ-বিকেন্দ্রিক মনোভাব। সবাই জানেন, পাকিস্তান একটি আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্র।... সে আদর্শ-রাষ্ট্র ও আদর্শ সংস্কৃতি গড়ে (তুলবার)... কাজকে ত্বরান্বিত করার জন্যে (সরকার) Bureau of National Reconstruction (BNR) স্থাপন করেছেন। সেই BNR তথা পাকিস্তান সরকারের পয়সায়, পাকিস্তানের (পূর্ব পাকিস্তান) তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন পাবলিকেশন ও ফিচার বিভাগের প্রধান, অনুগত সরকারি কর্মচারি, কবি আবুল হোসেন এবং পাকিস্তান হাসিলের আগেই যিনি ‘পাকিস্তানবাদী’ লেখক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, সেই প্রখ্যাত ড: সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েনের সম্পাদিত পত্রিকায় কিনা পাকিস্তানের আদর্শ-উদ্দেশ্য কিছুই ব্যক্ত হলো না? পাকিস্তান সরকারের অর্থে প্রকাশিত সহযোগী পত্রিকা সম্পর্কে লেখক সংঘ পত্রিকার এই আক্ষেপ তাই খুবই সংগত ছিল। তাঁরা দেখেছিলেন, সংলাপে ‘গঠনমূলক কোন প্রেরণা’ ‘অনুপস্থিত’।

তবে সংঘের পত্রিকায় অতি বাড়াবাড়ি সমালোচনা হয়েছিল। সংলাপ পাকিস্তানবাদী ধ্যানধারণায় আঘাত করার জন্য অবশ্যই প্রকাশিত হয়নি। পাকিস্তান-বিরোধী কোনো রচনা এর কোনো সংখ্যাতেই নেই। কবি আবুল হোসেন এবং সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন উভয়েই ছিলেন উচ্চশিল্পবোধ সম্পন্ন সাহিত্যসেবক। বিদ্যাবৈদগ্ধ তাঁদের উচ্চকোটিরই ছিল। তাই শিল্পগুণ ক্ষুণ্ণ করে কোনো শ্লোগানধর্মী রচনা সম্পাদকেরা প্রকাশ করতে চাননি। ফলে নিবেদিতপ্রাণ পাকিস্তান-সেবকেরা ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন সংলাপে পাকিস্তানী বাধাগদ বা শ্লোগান নেই বলে।

‘সংলাপ’ বেরিয়েছিল BNR এর মাধ্যমে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থে। আবুল হোসেনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েনের সহযোগে উচ্চস্তরের বুদ্ধিজীবীলেখকদের রচনা নিয়ে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা বের করার জন্য। প্রচার মাধ্যমের সহযোগে পাকিস্তান সরকার পূর্ব ও পশ্চিমকে এক রাখতে চেয়েছিল ; আর দূরে সরিয়ে রাখতে চেয়েছিল বাঙালি-সংস্কৃতির সম্প্রদায়কে। এজন্য মাহেনও শ্রেণীর মাসিক, জেলাপরিষদের পাক্ষিক এবং নানান সাপ্তাহিক ও দৈনিক পত্রিকাসমূহ বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রণের

মাধ্যমে সরকারের পরোক্ষ তত্ত্বাবধানে নিয়ে নেয়া হয়েছিল। তাছাড়া প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন্স অ্যাক্ট খুব সোচ্চার ছিল। লেখক সংঘের মাধ্যমেও সাহিত্যিকদের জড়ো করা হয়েছিল। বিএনআর বই লিখিয়ে লেখকদের অনেক রয়্যালটি দিয়েছিল। সংলাপও লেখকদেরকে টাকা দিত।<sup>২</sup>

‘সংলাপ’-জাতীয় অনেক পত্রিকাই তখন পাকিস্তানের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় বেরিয়েছিল। তবে ১৯৬২ সনে আবুল হোসেন লিয়েনে ব্যাংকক চলে গেলে ওসমান গনি সম্পাদক পরিষদের সদস্য হন। এক পর্যায়ে তাঁর সাতমসজিদ রোডের ঠিকানা থেকে পত্রিকা প্রকাশিত হত। মাঝখানে কয়েক বছর সংলাপ (১৯৬৪-৬৯) বন্ধ ছিল। প্রথম দফায় ৮টি সংখ্যা বেরিয়েছিল বলে জানা যায়। কিন্তু প্রথম পাঁচটির বেশি পাওয়া যায়নি। ১৯৬৯ সনের দিকে সংলাপ নতুন উদ্যোগে বের হয়ে একবছর (অক্টোবর ৬৯ থেকে-সেপ্টেম্বর ১৯৭০) চলেছিল। ১৯৭১ সনের যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে, বিএনআর উঠে যায় বলে বা ইচ্ছা করেই সরকার পত্রিকায় ফাইন্যান্স বন্ধ করে দিলে সংলাপ উঠে যায়। অতএব ৮+৪=১২ টি সংখ্যা সংলাপের বাজারে এসেছিল। তবে সবকটি সংখ্যা এখন আর পাওয়া যাবে না। কারণ সংশ্লিষ্ট অনেকেই এখন পাক-সরকারের অর্থে পত্রিকা প্রকাশের কথা স্বীকার করতে চান না (ড: সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন ব্যতিক্রম) কেউবা বলে বসেন, সাজ্জাদ হোসায়েন সাহেবের সঙ্গে তাঁদের ‘প্রীতির সম্পর্ক’ ছিল না।<sup>৩</sup>

অতএব সংলাপের সব কপির বর্ণনা দেয়া সম্ভব নয়। তবে যাই হোক, কবি আবুল হোসেন এক সাক্ষাৎকারে বলেন ; সরকারি কর্মচারীর সম্পাদক হওয়া সাজে না। লিখিত অনুমতি নিয়ে সরকারের টাকায় চতুরঙ্গের দৃষ্টান্তে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব নিয়ে পূর্ববঙ্গ থেকে একটি ভালো সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশের লক্ষ্যে প্রধানত তাঁরই উদ্যোগে সংলাপ বের হয়েছিল। বস্তুত পূর্ববঙ্গের ত্রৈমাসিক কাগজগুলোর মধ্যে সংলাপ শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে সক্ষম হয়। তবে ‘চতুরঙ্গ’ সাজা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। এই পত্রিকা গর্বের না হয়ে এখন অনেকের কণ্ঠের কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সংলাপ ‘ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্রিকা’ প্রকাশের ঠিকানা দেয়া হয়েছিল ৪২/১ হাটখোলা রোড, ঢাকা ৩। ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত আর ইডেন প্রেস ঢাকা থেকে মুদ্রিত হতো। প্রতি সংখ্যার মূল্য ১ টাকা ২৫ পয়সা। বার্ষিক মূল্য ৫ টাকা। সব সংখ্যায় মূল্য লেখা হতো না। বিনামূল্যেই হয়ত বিতরিত হতো। পৃষ্ঠা ১১২ চারের এক ক্রাউন সাইজ। প্রচ্ছদ ও অঙ্গ সজ্জায় ছিলেন শিল্পী আবদুর রউফ। ‘সংলাপে প্রকাশিত রচনার মতামতের জন্য সংশ্লিষ্ট লেখকরাই দায়ী সম্পাদকীয় কর্তৃপক্ষ নন’, এই ছিল সম্পাদকীয় ঘোষণা। আর ‘গুণবিচারে লেখা নির্বাচিত হত। রাজনৈতিক কারণে কোন লেখা প্রত্যখ্যাত হয়নি।<sup>৪</sup>

বিজ্ঞাপনসম্মত উন্নত মানের কাটিজ কাগজে ছাপা হত। সবকিছু পরিচ্ছন্ন, রুচিসিদ্ধ ছিল। তৎকালে অমন পত্রিকা হঠাৎ হাতে আসতো। প্রথম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যায় (বেশাখ-আষাঢ় ১৩৬৯, জুন ১৯৬২) সম্পাদকীয় ঠিকানা উল্লেখ করা হয় ড: সৈয়দ সাজ্জাদ

হোসায়েনের বাসভবন ১০৯ নাজিমউদ্দীন রোড ও কবি আবুল হোসেনের সরকারি বাসা ২৫৪ ই আজিমপুর স্টেট, ঢাকা। নবপর্যায়ে ১৯৬৯ সনে প্রকাশিত সংখ্যায় (তৃতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা) ‘প্রধান অফিস’ ৭৫৭ ডি সাতমসজিদ রোড, ঢাকা-২ এর অধ্যাপক ওসমান গনির।

প্রাপ্ত সংখ্যাগুলোতে কবিতা লিখেছিলেন : আহসান হাবীব, ফররুখ আহমদ, সানাউল হক, শামসুর রাহমান, আবুল হোসেন, আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ, ফজল শাহাবুদ্দীন, সৈয়দ আলী আহসান, আল মাহমুদ, সেলিম রেজা, শহীদ কাদরী, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, ময়হারুল ইসলাম, আ.ন.ম বজলুর রশীদ, সৈয়দ আলী তকী, মুহম্মদ নূরুল হুদা, আবুল হাসান, সেলিম রেজা প্রমুখ।

#### সংলাপের গল্পকার :

শওকত ওসমান (শিকার, ১/১ ; উদ্ভূত, ১/৪) ; মার্ক টোয়েন (পাউণ্ডের নোটসহ, অনুবাদ : সাহানা হোসেন, ১/১) ; আবু রুশদ (খোরোশভ, ১/২ ; প্রত্য্যখ্যান, ৩/৩) ; সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (কেরায়া, ১/২) ; সৈয়দ শামসুলহক (মিলিত মুখ, ১/৩) ; এঙ্গার উইলসন (অতিথি, ১/৩) ; আলবার্টো মোরাভিয়া (গরমের দিনে, অনুবাদ : কবীর চৌধুরী, ১/৪) ; আবদুর রহমান (উত্তরণ, ৩/১) ; জীবন দর্শন, ৩য় বর্ষ, জুন সংখ্যা ১৯৭০) ; সৈয়দ আলী নকী (দুটি কবুতর, পূর্বোক্ত, বেলাএত, ৩/৩) ; প্রমুখ।

#### প্রবন্ধকার :

সৈয়দ সাহাবাদ হোসায়েন—সাহিত্য ও জাতীয় চেতনা, ১/১ ; সাম্প্রতিক নাটক, ১/৪ ; ইংরেজীর কথা, ২/১ ; সাম্প্রতিক সাহিত্যে বিরোধবাদ, ৩/১ ; নূতন বিশ্ববিদ্যালয় পরিকল্পনা, ৩/৩ ; সমাবর্তন বক্তৃতা (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে, তৃতীয় বর্ষ জুন ১৯৭০)। আসকীণ বি চাইল্ড—আরব মোহাজের সমস্যা, ১/১। রশীদ করীম—লেডী চ্যাটারলিঙ্ক লাভার, ১/১। গ্যারীকুপার ; ১/১। নূরুল ইসলাম—পাকিস্তানের অর্থনীতিতে রাষ্ট্রীয় ভূমিকা, ১/২ ; সমকালীন কথা সাহিত্যের আঙ্গিক, ১/৩। নজরুল ইসলামের গদ্য ৩/১। মুহম্মদ ওসমান গনি—জ্ঞান, বুদ্ধি ও পরিবেশ, জুন ১৯৭০ সংখ্যা। আবুল হোসেন—যে ঐতিহ্য নজরুল ইসলাম, ৩/১ ; রাশীদুল হাসান—প্রথম মহাসমরে ইংরেজী কবিতা, ৩/১। ঔপন্যাসিক ফরস্টারের ধ্যানধারণা, জুন ১৯৭০ সংখ্যা। কাজী দীন মুহম্মদ—বাংলা ভাষায় ‘না’, ৩/১ ; ‘সাদৃশ্য’, ৩/৩। শাহাবুদ্দীন আহমদ—গদ্যে উপমা, ৩/৩। গোলাম সাকলায়েন—আমাদের সাহিত্যপত্রিকা ও সাহিত্যিকগোষ্ঠী, ৩/২। মুহম্মদ সিদ্দিক খান—ম্যাকলুহানের আস্থান, জুন ১৯৭০ সংখ্যা।

সংলাপ অনেক ভালো ভালো কবিতা, গল্প ও উপন্যাস প্রকাশের কৃতিত্বের দাবিদার। রশীদ করীম প্রণীত উপন্যাস ‘প্রসন্ন পাযান’ (১/১) ; এবং সৈয়দ শামসুল হক বিরচিত ‘রক্ত গোলাপ’ (২/১) ; উপন্যাস এতে প্রকাশিত হয়। মুনীর চৌধুরীর ‘দগুধর’ (১/২) ; সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর ‘একটি বিচারকের কাহিনী’ (১/৩) শীর্ষক নাটকও এতেই ছাপা হয়। পুস্তক সমালোচনার বিভাগ খুবই সমৃদ্ধ ছিল। অনেক বইয়ের দীর্ঘ আলোচনা প্রবন্ধাকারে লিখেছেন সাহিত্যসমাজের সুপ্রতিষ্ঠিত সমালোচকগণ। আলোচিত গ্রন্থাবলিও এদেশের প্রধান লেখকদের নির্বাচিত কবিতা, গল্প বা প্রবন্ধ কিংবা সমালোচনামূলক বই এর। সাহিত্যপত্রিকা চতুরঙ্গর অনুসূতিই হোক, অথবা একালের পাকিস্তানি সাহিত্যপত্রিকার নতুন দায়িত্বই বলি—নবগঠিত পূর্ববঙ্গীয় সাহিত্যসমাজের চিত্র এই আলোচনাগুলোর সমাবেশ ঘটালে পাওয়া সম্ভব হবে। গ্রন্থপ্রকাশের সমকালে কিভাবে তাকে গ্রহণ করা হয়েছিল—তা এবং সাহিত্য সমাজের গতি সমালোচকেরা কিভাবে নির্দেশ করছেন, সেসব জানার জন্য এসবের কি গুরুত্ব কম ?



সংলাপে আলোচিত গ্রন্থসমূহ এবং সমালোচকদের নাম নিচে উল্লেখ করা হলো,

—এ ডেসক্রিপটিভ ক্যাটালগ অব বেঙ্গলী ম্যানাসক্রীপ্ট—মুহম্মদ এনামুল হক। শওকত ওসমানের জননী—আবু রুশদ। রশীদ করীমের উত্তমপুরুষ—সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। কলিনউইলসনস রিচুয়াল ইনদি ডাক—সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন (১/১)। আবদুর রাজ্জাকের কন্যাকুমারী—কবীর চৌধুরী।

মোতাহের হোসেন চৌধুরীর ‘সংস্কৃতি কথা’—বোরহান উদ্দীন খান জাহাঙ্গীর। গ্রাহাম গ্রীনের উপন্যাস বার্নট আউট কেস—সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন (১/২)। আবদুল গাফফার চৌধুরীর ‘চন্দ্রদীপের উপাখ্যান’—আনিসুজ্জামান। সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েনের মিল্লড গিল—আবু রুশদ। সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন সম্পাদিত প্রোভেটিং পাকিস্তানী পোয়েট্রি—ঐ। সি. পি. স্নোর দি কনসকুয়েনস অব দি রিচ—সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন। আবদুল গাফফার চৌধুরীর শেষ রজনীর চাঁদ—কবীর চৌধুরী (১/৩)। আহসান হাবীব প্রণীত আরণ্য নীলিমা—রশীদ করীম। কালচার এণ্ড সোসাইটি—সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী।

আহসান হাবীব প্রণীত ছায়া হরিণ; সৈয়দ আলী আহসান প্রণীত একক সন্ধ্যা বসন্ত; আলাউদ্দীন আল আজাদ প্রণীত মানচিত্র; সৈয়দ শামসুল হক প্রণীত একদা এক রাজ্যে; ওমর আলী প্রণীত এদেশে শ্যামল রঙ রমণীর সুনাম শুনছি; তালিম হোসেন প্রণীত শাহীন এবং হাবীবুর রহমান প্রণীত উপান্তর আলোচনা করেন আবু রুশদ। মুনীর চৌধুরী, আশকার ইবনে শাইখ ও নুফল মোমেন প্রণীত নাটক যথাক্রমে রক্তাক্ত প্রান্তর; রক্তপানু ও নয়া খন্দান—ইবনে ইনশা ছদ্বানামে কেউ আলোচনা করেন (১/৪)। আলাউদ্দীন আল আজাদের ‘কর্ণফুলী’; আবদুল গাফফার চৌধুরীর ‘নাম নাজনা ভোর’; সৈয়দ শামসুল হকের ‘অনুপম দিন’; শওকত ওসমানের ‘ক্রীতদাসের হাসি’—কবীর চৌধুরী আলোচক।

আশকার ইবনে শাইখ সম্পাদিত নবজীবনের গান ও আবদুল আহাদ সুরারোপিত (লায়লা আর্জুমান্দকৃত স্বরলিপিসহ) ‘নবদিগন্তের গান’ আলোচনা করেন আবু হেনা মোস্তফা কামাল (২/১)। আবু রুশদ প্রণীত উপন্যাস ‘অনিশ্চিত রাগিনী’ আলোচনা করেন আনোয়ার পাশা। খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস প্রণীত ‘কতো ছবি কতো গান’—গোলাম সাকলায়েন। আনোয়ার পাশা প্রণীত ‘নীড়-সন্ধানী’ ও ‘নিশুতিরাতের গাথা’ আলোচনা করেন মুহম্মদ নুফল ছদা (৩/১)। টি. এস. ইলিয়ট এর ফ্রু পাকিস্তানী আইস বই সৈয়দ আলী আশরাফ কর্তৃক সম্পাদিত হলে আলোচনা করেন সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীরের গল্পগ্রন্থ ‘দূর দুরান্ত’ ও ‘বিশাল ক্রোধ’ আলোচনা করেন সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, পূর্বোক্ত। বিচারপতি আবদুল মওদুদ প্রণীত মধ্যবিত্ত সমাজের ক্রমবিকাশ ও সংস্কৃতির রূপান্তর এর ওপর লেখেন কাজী আবদুল মান্নান। ইত্যাদি।

সমকাল, পূর্বমেঘ, নাগরিক, পরিক্রম, সংলাপ এর পুস্তক সমালোচনা বিভাগ সত্যিই উন্নত ছিল। ঐ কালের পত্রিকায় এমন আর সচরাচর দেখা যায় না।

সাক্ষাৎকার কালে (আগস্ট ১৯৯১) ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন সমাজের উন্নতির জন্য ইংরেজির প্রাধান্য প্রসঙ্গে বলেন, পাকিস্তানের উন্নতির জন্য ইংরেজির মূল্যে আমি বিশ্বাস করতাম। যেহেতু আমরা পাকিস্তানে বিশ্বাসী ছিলাম, সেহেতু পাকিস্তানের স্বাধিক্তের জন্য আমাদের ইংরেজিকে রাখা উচিত ছিল। কিন্তু তখন আমরা এই রাষ্ট্রভাষার বিভেদ সৃষ্টি করে... দেশটাকে দুভাগ করেছি। এটা ইণ্ডিয়া করেনি।

এখনও আমি বিশ্বাস করি উচ্চশিক্ষার বাহন একমাত্র ইংরেজিই হওয়া উচিত। ইংরেজি না থাকার ফলে যা হয়েছে বা হচ্ছে, তাহলো এম. এ. পাশ করার পরও থেকে যাচ্ছে অশিক্ষিত। ইণ্ডিয়ার উচ্চশিক্ষার মাধ্যম ইংরেজী, কিন্তু রাষ্ট্রভাষা হিন্দী। ফলে তাঁরা অনেক

উন্নত হয়েছে। ভাষা আন্দোলনের সময়ে তিনি মত পোষণ করতেন বাংলা থাকার পরও বাঙালির উর্দু শেখা উচিত। এই দৃষ্টিভঙ্গি হলো সম্পাদকের। অতএব সংলাপের ভাষা ও সাহিত্যচিন্তা সম্পর্কে সংক্ষেপেই পরিষ্কার অনুমান করা যায়।

উচ্চস্তরের বুদ্ধিজীবী লেখক সাহিত্যিকদের যুক্তি ও মতের উপর প্রভাব বিস্তার করার জন্য সংলাপে দেখা যায় প্রথম শ্রেণীর লেখক ও লেখা নিয়েই এঁদের সকল ভাবনা-চিন্তা কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়েছে। এতে দ্বিতীয় শ্রেণীর কোনো সাহিত্যপ্রয়াসের স্থান সজ্ঞানে দেয়া হয়নি। উচ্চস্তরের পাঠকশ্রেণীর সামনে ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন ইংরেজির রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি বিষয়ে ওকালতি করেছিলেন। এই বিষয়ে সংলাপে (২/১) ‘ইংরেজীর কথা’ প্রবন্ধ লিখে উর্দু-বাংলার বিতর্ক মীমাংসা করতে চেয়েছিলেন পাকিস্তানের ভবিষ্যত স্থায়ীত্বের কথা চিন্তা করে। উর্দু ও বাংলার সমান মর্যাদা প্রাদেশিক ভাবে নির্ণয় করে ইংরেজির শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নিলে বাঙালি জাতীয়তাবোধে এত তীব্র আঘাত লাগতো না ; আর জাগতো না ঘুমন্ত সিংহের জেগে ওঠার ন্যায়। ফলে পাকিস্তান আরও দীর্ঘস্থায়ী হতো। এই বোধ থেকেই ‘ইংরেজির কথা’ তিনি ভেবেছিলেন। ১৯৬৩ সনের জুনে (বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭০) প্রকাশিত সংলাপে (২/১) তিনি উল্লেখ করেন :

পত্র-প্রক্রিয়া একথা মাঝে মাঝে বলা হয় যে, ইংরেজী মাতৃভাষার উৎকর্ষের পথে বিঘ্ন স্বরূপ। অভিযোগটির অর্থ এই যে ইংরেজীর দৌরাত্ম্যে মাতৃভাষার চর্চা করতে আমরা অপারগ বা অনিচ্ছুক এবং ইংরেজী আমাদের প্রাপ্ত থেকে অপসৃত হলে মাতৃভাষা আরও দ্রুত অগ্রসর হত।

এ অভিযোগেও যুক্তির চেয়ে আবেগ রয়েছে বেশি। শুধু তাই নয় সত্যেরও এ ঘোরতর অপলাপ। প্রথমত : ইংরেজি হাতে পেয়ে এদেশের লোক বিদেশি ভাষায় সাহিত্য চর্চায় মেতে উঠেছিল এর কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। প্রমাণ যেটুকু রয়েছে তাতে একথাই স্পষ্ট হয়ে উঠে যে ইংরেজী প্রবর্তনের পূর্বে বাংলা উর্দু ও হিন্দীতে গদ্যসাহিত্য বলে কিছু ছিলনা। এবং ইংরেজ আমলে যে নতুন যুগের সূচনা হল এই সাহিত্যগুলির ইতিহাসে সেটা প্রধানত ইংরেজি ভাষা শিক্ষারই প্রতিক্রিয়া।...এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা কর্তব্য যে পাকিস্তান এবং ভারতবর্ষে যে রাষ্ট্রীয় কাঠামো ১৯৪৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়, ইংরেজি ভাষাকে বাদ দিয়ে তার কল্পনা করা কঠিন। পাকিস্তান এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের যে ভাষাগত ও তমদ্দুনিক দুরত্ব ও ব্যবধান রয়েছে, ইউরোপে অনুরূপ দূরত্ব এবং ব্যবধানের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে।

যে জাতীয় চেতনার অভিব্যক্তি বর্তমান পাকিস্তান ও ভারতবর্ষ, ইংরেজির অবর্তমানে সেটা সম্ভব হত কিনা সন্দেহ। অতএর বিদেশি ভাষা হলেও ইংরেজি আমাদের জাতীয় জীবনের সাথে এমন নিবিড়ভাবে অঙ্গীভূত হয়ে গেছে যে একে এখন পরিহার করতে গেলে আমাদের জাতীয় চেতনার মূলেই আঘাত করতে হবে। ইংরেজিকে আমরা বিদেশি ভাষা বলতে অভ্যস্ত। কিন্তু বহু বৎসরের প্রয়োগ ও ব্যবহারের ফলে এটা যে চলতি অর্থে বিদেশী ভাষা আর নেই, একথা স্বীকার করতে কৃষ্ণিত হব কেন? মানুষের ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত জীবনে ভাষার গুরুত্ব অপরিমিত। এজন্যই শুধু আবেগ প্রণোদিত হয়ে এ সম্বন্ধে কোন কিছু করতে যাওয়ার অর্থ বিপদের ঝুঁকি গ্রহণ করা।

স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মধ্যে নতুন আত্মমর্যাদাবোধ এসেছে, সুতরাং আমরা মাতৃভাষাকে জীবনের প্রতিক্ষেপে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চাইব এই তো স্বাভাবিক। কিন্তু কোন প্রস্তুতি ব্যতিরেকে হঠাৎ পরিবর্তনের মোহে যদি আমরা মেতে উঠি তাতে শুধু বিপর্যয়ই ডেকে আনা হবে। শাসন ব্যবস্থার যেসব ক্ষেত্রে এখনও ইংরেজি ব্যবহৃত হয় বাংলা বা উর্দু সেখানে প্রয়োগ করতে গেলে অদূর ভবিষ্যতে কোন কল্যাণের আশা নেই। বরঞ্চ এই পরিবর্তনের ফলে অবশ্যজ্ঞাবী রূপে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থায় বিস্তার অসুবিধা ঘটবে, জাতীয়

সংহতির ভিত্তিও হবে দুর্বল। এবং বিনিময়ে দেশের জনগণের কোন আর্থিক মঙ্গলের প্রতিশ্রুতিও কেউ দিতে পারবেনা।<sup>৫</sup>

শিক্ষাব্যবস্থায় ইংরেজির অপরিহার্যতা প্রসঙ্গে আলোচনায় তিনি বলেন, আদর্শের দিক দিয়ে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে আমরা বাংলা এবং উর্দুর ব্যবহারের কথা ভাবতে পারি কিন্তু সেজন্য প্রয়োজন দীর্ঘ প্রস্তুতির। ভারতীয় হায়দ্রাবাদে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে যে স্বদেশি ভাষায় উচ্চশিক্ষা দানের প্রস্তাব যতটা সহজ শোনায কার্যত সেটা ততটা সহজ এবং ফলপ্রসূ নয়। হায়দ্রাবাদ আবার ইংরেজিতে ফিরে গেছে। সেখানে যারা লেখাপড়া করেছেন তাঁদের মধ্যে কেউ কলা বা বিজ্ঞানে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি বা নৈপুণ্যের পরিচয় দিতে পারেননি।

সুতরাং পাকিস্তানে পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়ে অগ্রসর হওয়াই বোধ হয় শ্রেয়। করাচীর উর্দু কলেজে এবং পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা কলেজে আধুনিক শিক্ষার উচ্চস্তরে দেশীয়ভাষা ব্যবহারের যে চেষ্টা চলেছে তার ফলাফলের অপেক্ষা করা বাঞ্ছনীয়। প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্তরে পৌনপুনিক পরিবর্তনের ফলে যে অবস্থা বিরাজমান তা অরাজকতার নামাস্তর মাত্র। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়েও নানা কারণে শিক্ষার মানের অবনতি ঘটেছে। এ অবস্থায় অনতিবিলম্বে শিক্ষার মাধ্যম পরিবর্তন করতে গেলে সমূহ অমঙ্গলের আশঙ্কা।<sup>৬</sup>

সংলাপ সে কালে উচ্চস্তরের সাহিত্যপত্রিকা হিসেবে সমকালীন অপরাপর সাহিত্যপত্রতে আলোচিত সমালোচিত হয়েছিল। এর রচনাবলিও প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হয়েছে। বিশেষ করে সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়নের বিভিন্ন প্রবন্ধ বা সমালোচনা পাঠক-সমালোচকদের পুনরায় কলম ধরতে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

‘সাহিত্য ও জাতীয় চেতনা’ শীর্ষক রচনার প্রতিক্রিয়া লিখেছিলেন মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ লেখক সংঘ পত্রিকার প্রথম বর্ষ পঞ্চম সংখ্যায়। (‘ইংরেজীর কথা’) রচনার প্রেক্ষিতে ‘পূবালী’তে অন্তত দুটি রচনা প্রকাশিত হয়। নূরুল ইসলাম খান (‘ইংরেজীর কথা’) ও আবুল কাসেম ফজলুল হক (‘ইংরেজীর কথা ও বাংলা প্রচলনের সমস্যা’) এগুলোর রচয়িতা। পত্রিকার প্রভাব ছিল যে এই সব রচনাই তার উজ্জল প্রমাণ।<sup>৭</sup>

## তথ্যপঞ্জি

১. গোলাম সাকলায়েন, আমাদের সাহিত্যপত্রিকা ও সাহিত্যিক গোষ্ঠী, সংলাপ ৩ বর্ষ, জুন সংখ্যা, ১৯৭০, পৃ. ৮২।
২. ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়ন ০৩.০৮.১৯৯১ তারিখের সাক্ষাৎকারে বর্তমান অনুসন্ধানকারীকে জানান।
৩. ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়ন নিজেকে ‘পাকিস্তানবাদী’ চিন্তক বা ভাবুক বলে পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করেন না। তিনি মনে করেন পাকিস্তান ভাঙ্গা ঠিক হয়নি। এজন্য তিনি মনে প্রাণে কষ্টবোধ করেন। কবি আবুল হোসেন ০৭-০৭-১৯৯১ তারিখের সাক্ষাৎকারে বলেন, সাজ্জাদ সাহেবের সঙ্গে আমার প্রীতির সম্পর্ক ছিল না। কলকাতা থেকেও না, এখানে এসেও না। তবে পত্রিকার যৌথ সম্পাদনার ঐতিহাসিক সত্যতা অস্বীকার করতে পারেন না বলেই আবার বলেন, ইংরেজি বিভাগের কনফারেন্সের

প্রধান উদ্যোক্তা অধ্যক্ষ প্রফেসর সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়নের আমন্ত্রণের প্রেক্ষিতে অংশগ্রহণ করার পর থেকে 'হৃদয়তা বাড়ে।'

৪. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়ন ১১-০৮-১৯৯১ তারিখের সাক্ষাৎকারে বলেন।
৫. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়ন, ইংরেজীর কথা, সংলাপ, ২ বর্ষ, ১ সংখ্যা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭০, পৃ. ৮৯-৯০।
৬. পূর্বোক্ত।
৭. নূরুল ইসলাম খানের রচনা পূবালীর ৫ বর্ষ, ৩ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৭০ ও আবুল কাসেম ফজলুল হকের রচনা পূবালীর ৫ বর্ষ, ১২ সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৭২ সনে প্রকাশিত হয়।

## ১১. উত্তর-অনুেষা (১৯৬৭-৭১)

‘উত্তর-অনুেষা’ ত্রৈমাসিক পত্রিকাগুলোর মধ্যে বিশিষ্ট আসন দাবি করে। এর প্রাণ-পুরুষ ছিলেন ডক্টর ময়হারুল ইসলাম (১৯২৮-২০০৩)। পাকিস্তান-সরকারের আর্থিক সহযোগিতায় পরিচালিত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের লোকলোর গবেষণা কেন্দ্রেরও তিনি তখন সর্বাধিকারী। সম্পাদনা এবং অর্থযোজনার অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি ১৯৬৭ সনে ‘উত্তর-অনুেষা’ প্রকাশে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। স্টাবলিশমেন্টের সকল সুযোগ-সুবিধা এই পত্রিকাতে তিনি প্রয়োগ করার অপূর্ব ক্ষমতাও পেয়েছিলেন। ফলে ১৯৬৭ থেকে ১৯৭০ সন পর্যন্ত পুরো তিন বছর, নিয়মিত ভাবে উত্তম কাগজে উত্তর-অনুেষা প্রকাশ করেছিলেন।

‘সুনিকেত মল্লার’ পত্রিকার সম্পাদক এবং বাংলা বিভাগের তৎকালীন ছাত্র মোহসিন রেজা ছিলেন এর প্রকাশক। মুদ্রক মোহাম্মদ আবদুর রশীদ খান। প্রচ্ছদশিল্পী : কাইয়ুম চৌধুরী। প্রেস ; আইডিয়াল প্রিন্টিং ওয়ার্কস, গ্রেটার রোড, কাজীরগঞ্জ, রাজশাহী। মূল্য এক টাকা। ১২১, ১০৯, ১১৭, ১০৮, ৭০, ৭৮ ইত্যাদি হলো এই পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যার পৃষ্ঠা।

যাইহোক কোনো সন্দেহ নেই, উত্তর-অনুেষা যোগ্য প্রাজ্ঞ মনের ফসল। সাইজ, কাগজ, প্রচ্ছদ, মানের দিক থেকে সুরুচির পরিচয় দিত। অবশ্য একটি গবেষণা পত্রিকার সম্পাদক এবং শিক্ষকের ‘চারিত্র’ এই সৃজনশীল পত্রিকায়ও ফটে উঠেছিল। বিজ্ঞাপন ভালো পাওয়া যেতো। তবে নিজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের যে সকল বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছে, তাতে ‘ডক্টর’, ‘প্রফেসর’ ও ‘অধ্যক্ষ ময়হারুল ইসলাম’ যতোটা মুখ্য হয়ে উঠেছিলেন, ততোটা হননি সম্পাদক ও কবি, সমালোচক বা সাহিত্যিক ময়হারুল ইসলাম। তারপরও কথা থেকে যায়। ছয় দফা আন্দোলন শুরু হয়ে যাবার পরও রাজনীতি ও সংস্কৃতি বিষয়ে ঐদের সমাজ গঠনমূলক কোনো দায়িত্বশীল বক্তব্য ছিল না। নিবীৰ্ষ নিরপেক্ষ গবেষণা পত্রিকা ‘সাহিত্যিকী’র সহোদরই যেন উত্তর-অনুেষা।

অবশ্য ছাত্ররাজনীতি ও সমকালীন সাংস্কৃতিক পরিস্থিতির শ্রেণিতে করণীয় সম্পর্কে লিখিত বদরুদ্দীন উমরের স্পষ্ট মতামতের একটি রচনা ময়হারুল ইসলামের এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেই ছাপা হয়েছিল বলে কেউ কেউ এর ভূমিকাকে অন্যরূপেও বিশ্লেষণের প্রয়াস পেতে পারেন। কিন্তু বদরুদ্দীন উমরের প্রবন্ধের শ্রেণিতে সম্পাদক পরবর্তী সংখ্যায় যে বক্তব্য দেন এবং প্রতিক্রিয়া প্রকাশের যে ব্যবস্থা করেন, তাতেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, উত্তর-অনুেষা পূর্ববঙ্গের ব্যাপক সাধারণ জনগণের স্বার্থের অনুকূলপক্ষীয় রাজনীতি-সংস্কৃতির প্রচারক হতে চায়নি। এবং যারা এই ধরনের বক্তব্য প্রচার করতে যান তাঁদেরকে উত্তর-অনুেষা আক্রমণ করতে চায়।

যেমন ইবনে আদম ছদ্মনামে বদরুদ্দীন উমরকে আক্রমণ করেছেন ময়হারুল ইসলাম বা তাঁর অনুরাগী কোনো গবেষক, পণ্ডিত, অধ্যাপক, বুদ্ধিজীবী বা দেশপ্রেমিক নাগরিক। অবশ্য ১৯৬৯ এর গণ-অভ্যুত্থানের পরে আইউব খানের বিদায়ের শ্রেণিতে সৃষ্ট নতুন রাজনৈতিক-সামাজিক পরিস্থিতিতে উত্তর-অনুেষার ভূমিকা ও চরিত্র ও পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও সঙ্গীত বর্জন সম্পর্কে প্রবন্ধ ছেপে আর একুশে ফেব্রুয়ারি তথা বায়ান্ন সনের ঘটনার উপর দুচারটে রচনা প্রকাশ করে তাঁরা বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে এক কাতারে সামিল হয়েছিলেন।

তবে উনসত্তর পূর্ববর্তী সংখ্যাগুলোতে রবীন্দ্রসাহিত্য বিষয়ক বা একুশের চেতনার সম্পূর্ণক কোন রচনা প্রকাশিত এতে হয়নি। ফলে পত্রিকার ভূমিকা মহিয়ান হয়ে ওঠেনি। ঐরা বক্তব্য প্রকাশ করেছেন ঘটনা-উত্তর পরিস্থিতির তাতে ভাল মিলিয়ে সুযোগ সন্ধানীর চারিত্র নিয়ে। জাতীয় সংকট কালে কোনো দিকদর্শন দিতে উত্তর-অন্থেষা বার্থতার পরিচয় দিয়েছিল। বাঙালিদের ঘোর দুর্দিনে, বায়ান্ন, চুয়ান্ন, একষট্টি-ছেষট্টি, আটষট্টিতে উত্তর-অন্থেষার সম্পাদকের সাহিত্যিক সাংস্কৃতিক সামাজিক অবস্থান ছিল অবাঙালিদের স্বার্থের অনুকূলে। পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থানুকূলে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের লোকলোর গবেষণার নামে অভিসন্দর্ভ লিখেছিলেন 'The Pulse of the (Bengalee) People' সম্পর্কে। এই বইয়ের চিন্তা ও তথ্য বাঙলা ও বাঙালির বিরুদ্ধ, শত্রুপক্ষীয়দের কাজে লেগেছিল।

উত্তর-অন্থেষার প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৪, এপ্রিল-জুন ১৯৬৭তে; আর তৃতীয় বর্ষ তৃতীয় ও চতুর্থ যুগ্ম সংখ্যা কার্তিক-চৈত্র ১৩৭৬ এ (১৯৭০ এর মার্চ-এপ্রিল নাগাদ, জুনেও হতে পারে) প্রকাশিত হয়েছিল। এই পত্রিকায় কোনো সম্পাদকীয় বা উদ্দেশ্য, আদর্শ, লক্ষ্য, ভূমিকা ইত্যাদি সম্পর্কে কোনো বক্তব্য দেয়া হত না। একগুচ্ছ কবিতা, গল্প, আর কয়েকটি প্রবন্ধের একত্রে সংকলনই মাত্র করা হয়েছে। সংকলিত রচনাবলির মধ্য থেকে পত্রিকার চরিত্র-লক্ষণ বা স্বভাব কিংবা Pulse of the Magazine অনুসন্ধান করতে হবে। সমকাল, নাগরিক, কণ্ঠস্বর প্রভৃতি পত্রিকার মতো আধুনিক কবিতা অধিক মাত্রায় মুদ্রিত হয়েছিল উত্তর-অন্থেষায়। খুব যত্নে অনেক বইয়ের সমালোচনাও এতে প্রকাশিত হয়। এই কালের মুসলিম-সম্পাদিত পত্রপত্রিকায় পূর্ববর্তী যুগের তুলনায় বহুল পরিমাণে পুস্তক-পরিচিতি প্রকাশের রেওয়াজ দেখা যায়। এতে বাংলাদেশের মুসলিম লেখক প্রধান সাহিত্যসমাজ গড়ে উঠছে প্রতীয়মান হয়। আর অনেক লেখকের ভালো ভালো বই প্রকাশের ট্রেডিশনও গড়ে উঠছে দেখা যায়।

উত্তর-অন্থেষায় বহুসংখ্যক কবির প্রচুর কবিতা নয়, মুষ্টিমেয় কবির গুচ্ছ-গুচ্ছ কবিতা ছাপা হয়েছে। আবার এর মধ্যে সিংহভাগই কবি-সম্পাদক ময়হারুল ইসলামের। তিনি ব্যতীত আর যাঁরা কবিতা লিখেছেন, তাঁরা হলেন,

সিকান্দার আবু জাফর, আতাউর রহমান, চৌধুরী ওসমান, আবু বকর সিদ্দিক, হেমায়েত হোসেন, হায়াৎ মামুদ, দিলওয়ার হোসেন, মোহসিন রেজা, আবুল হাসান, মহাদেব সাহা, আবু তাহের, এম. আমিনুল ইসলাম, শহীদুল ইসলাম, এবনে গোলাম সামাদ, আলফাতুন নিসা, আল মাহমুদ, হায়াৎ সাইফ, আহসান হাবীব, সৈয়ফ আলী আহসান, শামসুর রাহমান, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, শাহনুর খান, আবদার রশীদ, অ্যাডাম ভাসিক (প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য, অনুবাদ আলী আনোয়ার), ফররুখ আহমদ, রেজাউল হক, মুস্তাফিজ, জুলফিকার মতিন, কাজী রব, শেখ আতাউর রহমান, মুহম্মদ নূরুল হুদা, বজলুল করিম বাহার, হুমায়ুন কবির, মুহম্মদ রফিকুজ্জামান, আবদুর রশিদ খান, জুলফিকার মতিন, বিষ্ণু দে, জিয়া হায়দার, ফজলুল হক

সরকার, জাহিদ হোসেন, আফজাল চৌধুরী, আবদুল গনি হাজারী, হাসান হাফিজুর রহমান, ফজল শাহাবুদ্দীন, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, ফজল-এ-খোদা প্রমুখ।

### গল্প লিখেছিলেন

আবদুস শাকুর (নেসর্গিক, ১/১) ; আবদার রশীদ (দ্বিতীয় বিধাতা; রূপান্তর, ১/১, ১/২; কুসমাদপি, ১/৩; ত্রিধা, ১/৪) ; সেলিনা হোসেন (গোলাপ ফেটা সকাল, ১/১; শেষ প্রলাপ; রক্তের গভীরে, ১/৪) ; মুস্তাফিজ (পথ খোঁজে পথ, ১/১) ; জুলফিকার মতিন (মায়া-কাঞ্চন, ১/২; পথের মেলার কাঠের পুতুল, ৩/২) ; মুহম্মদ ফজলুল হক, (শেষ যন্ত্রণা, ১/৩) ; আলফাতুন নিসা (ম্যাকিবাবা ১/২; রক্ত-মূল্য ১/৩; দ্বিতীয় প্রেম ১/৪) ; সিরাজুদ্দীন আহমেদ (খুনী, ১/৪; রাত নামে, ৩/১) ; রিওনোসুকো আকু তাগাওয়া (উনোসুকে : একটি পুরুষ; অনুবাদ; সাইদুর রহমান, ৩/১) ; অসিতরায় চৌধুরী (বিপন্ন যখন, ৩/২) ; আজিজুল হক (আত্মহনন এবং যত্নের মতো, ৩/৩-৪) ; মোহসিন রেজা (সীমানা পেরিয়ে, ৩/৩-৪) প্রমুখ।

### এতে প্রবন্ধ লিখেছিলেন

হায়াৎ সাইফ (সাম্প্রতিক উন্মীলনসমূহ, ১/১) ; মামুদ শামস (জীবনানন্দ দাশ : বাধের কবি, ১/১) ; আবদুল হাফিজ (ইয়ুগ প্রসঙ্গে, ১/১) ; এবনে গোলাম সামাদ-(সোরেন কিয়ের্গার্ড, ১/২) ; বনিসুল ক্যাম্পার ম্যালিনোওপিক (তাঁর Sex, Culture and মাটা শীর্ষক গ্রন্থের অন্তর্গত 'বিজ্ঞান ও ধর্ম' প্রবন্ধের অনুবাদক আবদুল হাফিজ, ১/৩) ; ডক্টর কাজী আবদুল মান্নান ('আমাদের গল্প সাহিত্য', ১/৩), আবুবকর সিদ্দিক ('এক বিনষ্ট কুমারের উৎসর্গ', ১/৩) ; সারোয়ার জাহান (বাংলাগীতির রূপান্তর, ১/৩ থেকে ক্রমশ) ; খন্দকার সিরাজুল হক (কথা সাহিত্যিক কাজী ইমদাদুল হক, ১/৪) ; আবদুল মালেক খান (শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে লোক-সঙ্গীতের প্রভাব, ১/৪, বাংলা গানের রূপরেখা, ৩/৩-৪) ; শেখ আতাউর রহমান (বেড়ে গোলাম আলী খাঁ, ১/৪) ; আবু সাইয়িদ (বাংলাকাব্যে গণচেতনা : উৎস থেকে ৩/২; ভাষা আন্দোলন : পটভূমি, ৩/৩-৪) ; আলী আনোয়ার (কবিতা প্রসঙ্গ সাম্প্রতিক ভাবনা, ৩/২) ; সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায় (সে আগুন ছড়িয়ে গেলো সবখানে, ৩/৩-৪) ; জুলফিকার মতিন (বিভ্রান্ত আরম্ভ, ৩/৩-৪) প্রমুখ।

উত্তর-আন্বেষার সমগ্র লেখার গড় মান মোটামুটি ভালো। এরমধ্যে দেশ-বিদেশের জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শন-ইতিহাসের চর্চা হয়েছে। সমকালীন প্রেক্ষাপটে সরাসরি রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বক্তব্যপ্রধান স্পর্শকাতর প্রবন্ধ না-থাকলেও মুদ্রিত রচনা মোটামুটি পঠনোপযোগী ছিল। হতে পারে তা কাগজ ও পরিচ্ছন্ন ছাপার গুণে। কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, সমালোচনার একটা মূল্য তাই অবশ্যই আছে। এই পত্রিকায় গ্রন্থ সমালোচনা প্রকাশিত হলে গ্রন্থকারগণ কিঞ্চিৎ হলেও গর্ববোধ করতেন, যেমন করতেন 'সংলাপে' আলোচিত গ্রন্থের রচয়িতারা। কারণ এই সকল পত্রিকার সম্পাদক-কর্ণধারগণ সাহিত্য তথা শিক্ষিত সমাজের পুরোহিত শ্রেণীর লোক। তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক একটা বিভাগের জাঁদরেল অধ্যাপক, অধ্যক্ষ এবং অথবা উপাচার্যও ছিলেন।

### এই পত্রিকায় আলোচিত গ্রন্থাবলির মধ্যে রয়েছে—

হামিদা রহমান প্রণীত স্বাতী (কবিতা) ; জাহানআরা বেগম প্রণীত ইচ্ছার অরণ্যে (কবিতা, ১/১, আলোচক ময়হারুল ইসলাম) ; মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ প্রণীত অন্ধকারে একা (কবিতা, ১/১, আলোচক : খন্দকার সিরাজুল হক) ; সাদত আলী আশুদ প্রণীত তেরো নম্বরে পাঁচ বছর (স্মৃতিকথা, ১/১, আলোচক ; আবদুল হাফিজ) ; আবদুল হাফিজ প্রণীত লোক কাহিনীর দিক-দিগন্ত (প্রবন্ধ, ১/৩, আলোচক ; আবদুর রহীম খন্দকার) ; হাসান আজিজুল হক প্রণীত আত্মজা ও একটি করবী গাছ (গল্প, ১/৩, আলোচক : মোহসিন রেজা) ; মুহম্মদ আবু তালিব প্রণীত লালন শাহ ও লালন গীতিকা ১ম খণ্ড (প্রবন্ধ, ১/৪, আলোচক, মুহম্মদ

আবদুল হাফিজ); আতাউর রহমান প্রণীত কবি নজরুল ১ম খণ্ড (প্রবন্ধ, ১/৪; আলোচক : খেদকার সিরাজুল হক); আইনুদ্দীন আহমেদ প্রণীত এবং মুহম্মদ আবদুল হাফিজ সম্পাদিত অন্য দিন অন্য কবিতা (কবিতা, ৩/১, আলোচক : আফজাল চৌধুরী); বিজয়া দাশগুপ্তা (কলকাতা) প্রণীত আমার প্রভুর জন্য (কবিতা, ৩/১, আলোচক : মুহম্মদ আবদুল হাফিজ); মোহাম্মদ নাসির আলী প্রণীত যোগাযোগ (গল্প, ৩/১); এবাদত হোসেন প্রণীত পদাবলী সমীক্ষা (সমালোচনা, ৩/১, আলোচক : মোহসিন রেজা); মোহাম্মদ নাসির আলী প্রণীত লেবু মামার সপ্তকাণ্ড (গল্প, ৩/১ আলোচক : নুরুন্নাহার হাফিজ); নাজিম মাহমুদ ও সাধন সরকার প্রণীত চেতনার সৈকতে (কবিতা, ৩/২; আলোচক : শেখ আতাউর রহমান); আবদুর রশিদ খান প্রণীত নিরন্তর স্বর কবিতা, ৩/২ ইত্যাদি।

মুহম্মদ আবদুল খালেক পাকিস্তানের সঙ্গে চীনের সুসম্পর্ক স্থাপন ও সাংস্কৃতিক চুক্তি হওয়ার পর চীনের বৃত্তি নিয়ে পিকিং ভাষা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে গিয়েছিলেন। চীনে গিয়েই তিনি ভ্রমণ কাহিনী লিখে পাঠাচ্ছিলেন অগ্রজকে; উত্তর-অন্বেষায় এই বিস্তারিত, খুঁটিনাটি ভ্রমণকাহিনী বা দিনপঞ্জী ‘পদ্মা থেকে ইয়াংসি’ শিরোনামে ছাপা হয়েছিল ধারাবাহিকভাবে প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা (শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৪) থেকে। মোহসিন রেজার নাটিকা ‘বিষণ্ন প্রেক্ষিত’ ছাপা হয়েছিল উপর্যুক্ত (১/২) সংখ্যাতেই। ম্যাক্সিম গোর্কির নাটক ইয়েগর বুলিকভ ও অন্যান্য ছাপা হয়েছিল তৃতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যায় (বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৬)।

শুধু উত্তর-অন্বেষার নয়, ঐকালের কবিতা বিষয়ক সকল আলোচনা শুরু হতো টি এস. এলিয়াট থেকে। প্রবন্ধ বা পুস্তক সমালোচনার সর্বত্র প্রায় কমন এই রেওয়াজ। তৃতীয় বর্ষে গিয়ে উত্তর-অন্বেষার সূচিপত্র কণ্ঠস্বরের অনুকরণে গদ্যের স্তবকের মতো সাজিয়ে দেয়া হতো। এর আগে সূচিপত্র ছিল গবেষণা পত্রিকার মতো। পরলোকগত অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের মৃত্যুতে উত্তর-অন্বেষা গভীর শোক প্রকাশ করে।

প্রবন্ধগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ‘ইয়ুঙ প্রসঙ্গে’। ফ্রেড ও ইয়ুঙের চিন্তাধারা সম্পর্কে মনোজ্ঞ আলোচনা দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নৃতাত্ত্বিক ব্রিন্সল ক্যাম্পার ম্যালিনোওস্কির রচনা থেকে অনুবাদটি বিবিসি থেকে প্রচারিত হয়েছিল এবং ১৯৩০ সনে The Listener পত্রিকায় ২৯ অক্টোবর প্রকাশিত হয়েছিল। পরে এটি ম্যালিনোওস্কির Sex, Culture and myth শীর্ষক গ্রন্থে মুদ্রিত হয়। মূল বিষয় আদিম সমাজের ধর্ম ও বিজ্ঞান বিষয়ক চিন্তা ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতির চিত্র বিশ্লেষণ। ময়হারুল ইসলাম মহিলাদের কবিতার বই আলোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন যে (১৯৬৭) পোষাক-আষাক, চলনে-বলনে-দর্শনে মহিলারা মডার্ন বা সম্মুখ অভিসারী হলেও, চিন্তার দিক থেকে তাঁরা পশ্চাৎগামীই বটেন।<sup>২</sup>

উত্তর-অন্বেষার তিন বছরের সূচির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : বদরুদ্দীন উমর প্রণীত ‘ছাত্র রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন’ শীর্ষক প্রবন্ধ—যেটি প্রথম সংখ্যাতেই প্রকাশিত হয়। উক্ত প্রবন্ধে তিনি বলেন, ছাত্র রাজনীতি সব ক্ষেত্রেই দেশের সাধারণ রাজনৈতিক অবস্থার সাথে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত। পূর্ব পাকিস্তান সেদিক থেকে ব্যতিক্রম নয়।...একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে ছাত্র রাজনীতি যে দেশে যত বেশি প্রবল ও প্রতাপশালী সেদেশে সাধারণ রাজনৈতিক দলগুলোর প্রভাব ও সংগঠন ততখানি দুর্বল। এর কারণ সেদেশের বিবিধ সমস্যার সমাধান সম্পর্কে বৃহত্তর রাজনৈতিক জীবনক্ষেত্রে যদি গঠনমূলক চিন্তা এবং



সাংগঠনিক প্রচেষ্টা না থাকে তা হলে সমাজের মধ্যে শিক্ষা এবং আদর্শবাদিতার দ্বারা উদ্বুদ্ধ ছাত্র সম্প্রদায়ই সেখানে আবির্ভূত হয় রাজনৈতিক শক্তির ভূমিকায়।... দেশের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ যদি যথার্থভাবে বিভিন্ন সমস্যা দূরীকরণের প্রতি তাদের প্রচেষ্টাকে পরিচালিত করে তাহলে ছাত্র রাজনীতি সাধারণভাবে খুব বেশি প্রভাবশালী হতে পারে না। কিন্তু এর অন্যথা হলে সেটা সহজেই সম্ভব হয়। এমনকি অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় যে কোন দেশে বৃহৎ এবং সুসংগঠিত রাজনৈতিক দলসমূহ সুষ্ঠুভাবে নানা ক্রিয়াকর্ম পরিচালনা করা সত্ত্বেও কোন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাকে উপেক্ষা করলে সেই বিশেষ ক্ষেত্রে ছাত্র রাজনীতির প্রভাব সে দেশে নিশ্চিত ভাবে বৃদ্ধি লাভ করে। এটাই প্রধান কারণ যার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েনাম যুদ্ধকে উপলক্ষ করে সেখানকার ছাত্রসম্প্রদায় আজ রাজনৈতিক জীবনক্ষেত্রে অনেকখানি সক্রিয়।

আলোচক আরও বলেন, তবে... 'পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র রাজনীতিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে তার মধ্যে আজ যথেষ্ট সুবিধাবাদ, নৈরাজ্য এবং বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছে। এর জন্য ছাত্রদের নিজেদের দেশের সামগ্রিক অবস্থাই অনেক বেশি দায়ী।'...

ছাত্র রাজনীতির আচ্ছন্নতার কারণ বিশ্লেষণ করে লেখক বলেন, এ দেশের মধ্যবিত্তের মধ্যে সুবিধাবাদের আধিপত্য উৎকটভাবে বৃদ্ধিলাভ করেছে এবং তার দ্বারা ছাত্র সম্প্রদায়ও এখন দারুণ ভাবে আচ্ছন্ন... এখনকার ছাত্রেরা (তাই) আগের থেকে রাজনীতি ক্ষেত্রে অনেক বেশি সক্রিয় হলেও তাদের মধ্যে যথার্থ আত্মত্যাগ এবং স্বাথহীনতার উদাহরণ খুব উল্লেখযোগ্য নয়। যারা ছাত্ররূপে রাজনীতিতে অংশ নেয় এবং দেশের কল্যাণ কামনা করে এ বিষয়ে তাদের সচেতন হওয়া প্রয়োজন। আশু সুবিধার কথা চিন্তা না করে সমাজের সামগ্রিক মঙ্গলের পরিপ্রেক্ষিতে যদি তারা তাদের কর্মপন্থা নির্ধারণ করে তাহলেই এ দুর্বলতা তারা অনেকাংশে উত্তীর্ণ হতে সক্ষম হবে।

শুধু তাই নয়, সে অবস্থায় তাদের চিন্তা এবং কর্মের মধ্যে নৈরাজ্য, বিশৃঙ্খলা এবং মধ্যবিত্তসুলভ সুবিধাবাদের পরিবর্তে দেখা দেবে সুস্থ সমাজ চেতনা এবং সুশৃঙ্খলাবদ্ধ চিন্তা। একমাত্র তখনই তারা সক্ষম হবে বিভিন্ন সমস্যা ও ঘটনার প্রতিক্রিয়াশীল ও প্রগতিশীল চরিত্র এবং শত্রু-মিত্রের ভেদাভেদ নির্ণয় করতে। অন্যথায় শত্রুকে মিত্র ও মিত্রকে শত্রু জ্ঞান করে এবং নানান সমস্যার যথার্থ চরিত্র নির্ণয়ে ব্যর্থ হয়ে তারা নিজেদের চিন্তা ও কর্মের মধ্যে সৃষ্টি করবে নৈরাজ্য যার ফলে দেশের প্রগতিশীল শক্তির পরিবর্তে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসমূহই হবে অধিকতর সমৃদ্ধ ও শক্তিসম্পন্ন।

ছাত্রদের রাজনীতি করা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ছাত্র রাজনীতির ভিতর থেকে মধ্যবিত্তসুলভ সুবিধাবাদী চিন্তাধারার বিলুপ্তি সম্ভব না হলেও বর্তমান অবস্থায় ছাত্রদের পক্ষে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ না-করে 'বিরত হওয়া অসম্ভব। কারণ রাজনীতিক্ষেত্রে ছাত্রদের প্রভাব স্বাভাবিক না হলেও সেটা দেশের সামগ্রিক দূরবস্থার অন্যতম উপসর্গ। দেশের বর্তমান আর্থিক ও রাজনৈতিক দূরবস্থার অবসান না ঘটলে ছাত্র রাজনীতির এ প্রভাবের অবসনাও কিছুতেই ঘটবে না। কাজেই ছাত্রেরা রাজনীতির করবে।' এবং এই প্রশ্নের বিচার সব দিক

থেকে গুরুত্বপূর্ণ যে 'নানা অসুবিধাজনক অবস্থার মধ্যে এ রাজনীতি কিভাবে দেশের কল্যাণ সাধন করতে পারে।'

রাজনীতির সঙ্গে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সম্পর্ক নির্ণয় করে বদরুদ্দীন উমর বলেন, প্রগতিশীল রাজনৈতিক আন্দোলনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো সুস্থ সাংস্কৃতিক জীবন গঠনের আন্দোলন। দেখা গেছে, কোন কোন ক্ষেত্রে 'সুস্থ সাংস্কৃতিক আন্দোলন, দেখা গেছে, কোন কোন ক্ষেত্রে 'সুস্থ সাংস্কৃতিক আন্দোলন ব্যতীত কোন সুস্থ রাজনৈতিক আন্দোলন সম্পূর্ণ অসম্ভব। পূর্ব পাকিস্তানের বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে একথা বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য।'

পূর্ব পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক জীবন সম্পর্কে ঐ প্রবন্ধের শেষাংশে লেখক বলেন : পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা এবং সাংস্কৃতিক জীবন আজ পক্ষাঘাতগ্রস্ত। প্রাথমিক থেকে শুরু করে উচ্চতম পর্যায় পর্যন্ত প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থাই এই সংকটের প্রধান কারণ। পাকিস্তান আদর্শবাদী এবং ইসলামী রাষ্ট্র এই অজুহাতে ইচ্ছাকৃতভাবে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে, বিশেষত নিম্নপর্যায়ের শিক্ষাব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে। এর ফলে বাংলাদেশের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের সাথে পূর্ব পাকিস্তানি ছাত্রদের যোগাযোগ সব দিক থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার উপক্রম হয়েছে। বাংলা ভাষার রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা লাভ হয়ে দাঁড়িয়েছে নিতান্তই মৌখিক ব্যাপার। কারণ বাংলা ভাষা যে সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের বাহন সেই সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য থেকে বাংলা ভাষাকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্রে এক শ্রেণীর লোক আজ দারুণ সচেষ্ট।

এ প্রচেষ্টা যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যমূলক তাতে সন্দেহ নেই। পূর্ব পাকিস্তানের সংস্কৃতিকে পঙ্গু করে তার সমগ্র চিন্তাভাবনার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার জাল বিস্তার করতে সক্ষম হলে সত্য অর্থে এদেশের লোকের পক্ষে কোন প্রগতিশীল আন্দোলনের সূত্রপাত পর্যন্ত করা সম্ভব হবেনা একথা খুব সহজবোধ্য। সাম্প্রদায়িকতাকে সহস্র উপায়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্যবহার করার প্রচেষ্টা পাকিস্তানে অত্যন্ত সক্রিয় এবং যথেষ্ট কার্যকরী।

এই প্রচেষ্টার মাধ্যমেই বাংলাকে রাষ্ট্রভাষারূপে স্বীকৃতি দান করলেও সাম্প্রদায়িক সংস্কৃতির প্রভাব সৃষ্টি দ্বারা তারা বাংলা ভাষার সত্যিকার চর্চা এদেশে আজ বন্ধ করতে উদ্যত। সাংস্কৃতিক জীবনে এই সূক্ষ্ম রাজনৈতিক চাল পূর্ব পাকিস্তানে অনেকাংশে সফল হয়েছে। এজন্যই পশ্চিম পাকিস্তানে ছাত্রেরা নিজেদের ক্ষতিসাধন না করে রমজানের সময় ইন্সকুল কলেজ করলেও পূর্ব পাকিস্তানে রমজানের ছুটি 'ধর্মীয় কারণে' অবশ্যই হতে হয়। এবং সেটা হয় প্রধানতঃ ছাত্রদের দাবীর জোরে।

এজন্যই পশ্চিম পাকিস্তানে রবিবার ইন্সকুল কলেজ বন্ধ থাকলেও পূর্ব পাকিস্তানে শুব্বার হলো সাপ্তাহিক ছুটির দিন। এই জন্য আমরা আরবি ফারসিবদ্ধ উদ্ভট বাংলাতে লেখা যে কোন বইকে ইসলামি সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ মনে করে আত্মহারা হই এবং সংস্কৃত সম্বলিত বাংলাতে লেখা সাহিত্যকে বিজাতীয় এবং বিধর্মী জ্ঞানে বর্জন করার আওয়াজ তুলি। এই সাম্প্রদায়িক প্রভাবের জন্যই আমরা প্রতিবছর একশুে

ফেব্রুয়ারিতে মাতৃভাষার জন্য অশ্রুপাত করলেও নানাভাবে সেই মাতৃভাষার চর্চা এবং প্রগতিকে বন্ধ এবং রুদ্ধ করার প্রচেষ্টায় সহায়তা করতে দ্বিধাবোধ করি না।

পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রসম্প্রদায় সমাজতান্ত্রিক কারণে রাজনীতি করবে। কিন্তু ছাত্রেরা যদি তাদের এবং সমগ্র দেশের রাজনীতিকে সুস্থ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে বর্তমানের কলুষিত রাজনৈতিক আবহাওয়াকে পরিচ্ছন্ন করতে চায় তাহলে তাদেরকে আজ সাংস্কৃতিক জীবনের গুরুত্ব উপলব্ধি করে... জীবনকে পঙ্গু করার জন্য কোন শক্তি কত বিভিন্ন উপায়ে এখন সক্রিয় এবং এ শক্তি সমূহকে বিনাশ করার উপায় কি?\*

এই প্রবন্ধের প্রতিক্রিয়া বা প্রতিবাদ ছাপা হয় উত্তর-অনুেষার প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা। লেখক ইবনে আদাম (ছদ্মনাম?)। রচনার শীর্ষে সম্পাদকীয় নোটে লেখা হয়; ‘বদরুদ্দীন উমরের প্রবন্ধের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে সম্পাদক একমত ছিলেন না।’ ইবনে আদামের লেখা প্রসঙ্গেও সম্পাদক বলেন: ‘বলাবাহুল্য এই লেখাটির বক্তব্যের সঙ্গেও সম্পাদক একমত নন। তথাপি মূলত... সমস্যাটি জটিল এবং বিতর্কমূলক বলেই... অবগতির জন্য প্রকাশ করলাম।’

এই কথা সম্পাদক নোটে লিখলেও ভাষাগত তাৎপর্য পরীক্ষা করলে ময়হারুল ইসলাম কাউকে দিয়ে যে এই প্রবন্ধ লিখিয়েছেন তা বোঝা যায়। ইবনে আদাম বদরুদ্দীন উমরকে সরাসরি আক্রমণ করে উপদেশাত্মকভঙ্গিতে বলেন,

ছাত্রদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করা উচিত কিনা এ প্রশ্নটি একটি বিস্ফোরক বিষয়... কোন জটিল সমস্যা সম্পর্কিত আলোচনায় বা গবেষণামূলক নিবন্ধে পণ্ডিত ব্যক্তির সাধারণত চূড়ান্ত রায় দেয়া বা শেষ কথা বলা থেকে বিরত থাকেন। জ্ঞানের রাজ্যে শেষ কথা বলে কিছু নেই। কিন্তু উমর... শেষ রায় দিয়েছেন।... প্রয়োজন সমাজকে সমস্ত দিক থেকে ব্যাপকভাবে নিষ্ঠাসহ জ্ঞানবার এবং সমাজ সম্পর্কে বিস্তৃত ও গভীর গবেষণার। উমর সাহেবের প্রবন্ধে সেই নিষ্ঠা ও গবেষণার একান্ত অভাব... তিনি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান এই দুইটি সিম্মিলিত বিভাগের অধ্যক্ষ। প্রবন্ধটিতে এমন কতগুলো ফাঁক রয়েছে যাতে করে মনে হতে পারে প্রবন্ধ লেখকের না-রাষ্ট্রবিজ্ঞানে না সমাজবিজ্ঞানে উচ্চতর বৈজ্ঞানিক শিক্ষালাভের সুযোগ ঘটেছে (বা) সমাজ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে যথার্থ গবেষণারীতির সাথে অন্তরঙ্গতা জন্মেছে।

আমার এই উক্তি শুধু যে বাস্তব সত্যের ওপর ভিত্তি করেই নির্মিত তা নয়, উমর সাহেব তাঁর প্রবন্ধেও নিজেই এমনিভাবেই অনাবৃত করেছেন। তাঁর কয়েকটি উক্তি থেকে একথার প্রমাণ মিলবে।... আসলে যদি অধ্যক্ষ উমর সমাজবিজ্ঞানে বা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সঙ্গে অন্তরঙ্গ ভাবে পরিচিত হতেন, তবে তিনি বোধ করি দেশের প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সূত্রপাতের জন্য ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে তার চূড়ান্ত যোগাযোগ স্থাপন করে একটি অপূর্ব থিওরী দাঁড় করাতেন না... সমাজবিজ্ঞানের সাথে ইতিহাসবিজ্ঞানের যে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, বদরুদ্দীন উমরের আলোচনায় তার কোন প্রমাণ নেই। অথচ তিনি তা না করে ‘পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন রাজনৈতিক সমস্যা এবং আন্দোলনসমূহকে বিশ্লেষণ করে ‘মধ্যবিত্ত কেন্দ্রিক রাজনীতির অর্থ’ আবিষ্কারের প্রচেষ্টায় গলদঘর্ম হয়েছেন।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন রাজনৈতিক সমস্যা এবং আন্দোলন সমূহকে বিশ্লেষণ করতে হলে ইতিহাসের আশ্রয় অপরিহার্য। পূর্ব-পাকিস্তানের রাজনৈতিক সমস্যা হঠাৎ মাটি ভেদ করে গজায়নি... সাম্প্রতিক সমস্যার মূল নিহিত রয়েছে প্রাক্তন কালের কঙ্কর বহুল অবয়বে।

সুতরাং এই সমস্যার বিশ্লেষণ পশ্চাতের ধারাকে স্মরণ না করলে বিশ্লেষণ অসম্পূর্ণ এবং অবৈজ্ঞানিক হতে বাধ্য। অধ্যক্ষ উমরের উক্তিসমূহ তার নগ্ন প্রমাণে সমৃদ্ধ।... তাঁর সমগ্র বক্তব্যে সাধনার স্বাক্ষর নিদারুণভাবে অনুপস্থিত।... বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই দুইটি বিভাগের একক অধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত থেকেও বদরুদ্দীন উমর ছাত্র-ছাত্রীদের সাক্ষাৎ রাজনীতি সমর্থন করেছেন”

বলেও ইবনে আদম বদরুদ্দীন উমরকে সমালোচনার তীব্র তীক্ষ্ণ বাণে জর্জরিত করেছেন।

ইবনে আদম আরও লিখেছেন :

অধ্যক্ষ উমর যে উপদেশ দিয়েছেন, ছাত্র-ছাত্রীদের যদি সে উপদেশ যথাযথ ভাবে পালন করতে হয়, তবে বোধকরি তাদের রাজনৈতিক সংগঠন, আন্দোলন ও কার্যকলাপ ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না। অর্থাৎ ছাত্র-ছাত্রী হিসেবে নির্ধারিত পাঠ্য তালিকা অনুসারে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে জ্ঞানার্জন করবার এবং জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে নিজেদেরকে গড়ে তুলবার যে প্রাথমিক দায়িত্ব তা আর তাদের পক্ষে পালন করা সম্ভব হয়ে উঠবে না। তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের রাজনীতি ক্ষেত্রে কর্মপন্থা নির্ধারণের যে উপদেশ দিয়েছেন তা যদি বাস্তবায়িত করতে হয়, তবে বোধকরি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত বিভাগ, এমনকি রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ পর্যন্ত তুলে দিয়ে একটি মাত্র বিভাগই খোলা রাখতে হয়... সে হোল রাজনীতি শিক্ষা বিভাগ। অবশিষ্ট অধ্যক্ষ উমর যে ছাত্র-ছাত্রীদের রাজনৈতিক সংগঠন মজবুত করে কর্মপন্থা নির্ধারণের উপদেশ দিয়েই ক্ষান্ত হয়েছেন এমন নয়... ছাত্রছাত্রীরা যদি “জীবনকে পঙ্গুকারী সক্রিয় শক্তিসমূহকে বিনাশের” আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তবে শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে তাদের জীবন গঠনের কার্যকলাপ কতটুকু স্বার্থকভাবে সম্পন্ন করতে তারা সমর্থ হবে সে কথা অধ্যক্ষ উমরের চিন্তার বিষয় হওয়া উচিত ছিল, এমন দাবী নিশ্চয়ই ছাত্রছাত্রীদের পিতামাতা... করতে পারেন।...এমনি অনেকগুলো অসাধারণ এবং অসংলগ্ন উক্তিতে গড়ে উঠেছে অধ্যক্ষ উমরের আলোচ্য প্রবন্ধটি।... তাঁর অসাধারণ সিদ্ধান্তগুলো সম্বন্ধে অনেক কথাই বলা আছে, অবকাশ আছে তীব্র সমালোচনার। কিন্তু তাতে অযথা প্রবন্ধটির এবং সঙ্গে প্রবন্ধ লেখকের উপর অস্বাভাবিক গুরুত্ব দেয়া হবে বিবেচনায় এখানেই শেষ করছি।<sup>৪</sup>

এই রচনায় চলতি গণতান্ত্রিক আন্দোলন থেকে মুখ ফিরিয়ে অগণতান্ত্রিকতাকে সমর্থন করা হয়েছে। কিন্তু উনসন্তেরের গণঅভ্যুত্থানের পর উত্তর-অনুেষা বিপ্লবী হয় এবং সুর পাস্টে রবীন্দ্রসাহিত্যের মাহাত্ম্যকীর্তনে ব্যাকুল হয়ে পড়ে। পত্রিকার মুখপাত্র আবদুল হাফিজ লিখেছেন :

সাম্প্রতিক কালে রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানে অহেতুক একটি বিরোধিতার সৃষ্টি হয়েছিল, বেতারে রবীন্দ্র সঙ্গীত নিষিদ্ধ ঘোষণার দাবী উত্থাপিত হয়েছিল এবং প্রকৃতপক্ষে নিষিদ্ধ না হলেও রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রচারের হার নিদারুণভাবে কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এর পক্ষে—বিপক্ষে দুদল লোক লড়াইয়ের ময়দানে নেমেছিলেন; বিরোধীপক্ষের বক্তব্য ছিল এই যে রবীন্দ্রনাথ পাকিস্তানি সংস্কৃতির কোনো স্বাক্ষর বহন করেন না। রবীন্দ্রনাথের জন্ম ও মৃত্যু দুই-ই ঘটে পরাধীন ভারতে। কাজেই তাঁর পক্ষে পাকিস্তানি সংস্কৃতির বিরোধীতা করবার কোনো প্রশ্ন ওঠেনা। রবীন্দ্রনাথ পাক-ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার, কিন্তু একথার মাধ্যমে এ-ও বোঝায় না যে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বজনীন নন। আজকের যুগে রবীন্দ্রনাথের বাণী সত্যিকার অর্থেই বিশ্ববাণী। সামগ্রিকভাবে রবীন্দ্র-সাহিত্য বিশ্বমানুষের সাহিত্য; তাই বলে তাঁর সাহিত্যে কি বিশেষ দেশ-কালের কথা নেই?

শেখস্পীয়ার যে-অর্থে ইংল্যান্ডবাসী, রবীন্দ্রনাথ সে-অর্থেই পাক-ভারত উপমহাদেশের অধিবাসী। শেখস্পীয়ার যে-অর্থে বিশ্বের, রবীন্দ্রনাথও সেই অর্থেই বিশ্বের। শেখস্পীয়ারকে খ্রিষ্টান কবি বা খ্রিষ্টান নাট্যকার বললে যে দোষ দৃষ্টতা হয়, রবীন্দ্রনাথকে হিন্দুকবি বা ব্রাহ্ম কবি বললে সেই দোষদৃষ্টতার সৃষ্টি হয়। রবীন্দ্রনাথ বাঙালি বটে (ন)। কিন্তু তাঁকে শুধুমাত্র বাঙালার কবি বলা যায় না। অন্যদিকে আমাদের সংস্কৃতি ও মননের তিনিই বিশ্বপ্রতিনিধি। রবীন্দ্রনাথকে যদি পাকিস্তানি সংস্কৃতির বিরোধী আখ্যা দিই, তাহলে নজরুলই বা কোন গুণে আমাদের জাতীয় কবি হন?

সুখের কথা, ইতিমধ্যেই রবীন্দ্রবিরোধিতার উত্তেজনা হ্রাস পেয়েছে, রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রসঙ্গে যে কুসংস্কারের সৃষ্টি হয়েছিল, তাও কেটে গেছে এবং শুবুন্ধির জয়লাভ ঘটেছে। এক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথের খণ্ডিত বিচার করে

আমরা আর একটি নজির স্থাপন করেছি।...রবীন্দ্রবিরোধিতার মূলসূত্রগুলো এত হাল্কা কাঠামোর ওপর প্রতিষ্ঠিত যে সামান্য আঘাতেই তা ভেঙ্গে পড়বার কথা।...বাঙালির গর্ব শুধু এতটুকু যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিল্পসাধনা বাঙলা ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছিলেন।...যুগে যুগে প্রতিভাবান মানুষ (তাঁর প্রতি) ঈর্ষান্বিত বোধ করবেন, বারে বারেই হয়তো সৃষ্টি হবে নতুন বিরোধিতা, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ চিরকাল নানা জাতির শেষ শিল্পী হিসেবে বেঁচে থাকবেন, আমরা যদি তাঁর অমর শিল্প-সাধনাকে রক্ষা না করি, সেভার গৃহণ করবে সমগ্র বিশ্ব।<sup>৫</sup>

লেখক প্রসঙ্গত রবীন্দ্রবিরোধিতার প্রাক্তন ইতিহাস স্মরণ করে ডি-এল রায়, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি প্রমুখ গৌড়াদ্বীপের সমালোচক এবং কমিউনিস্টদের বুর্জোয়া বলে প্রত্যাখ্যান করার প্রস্তাবকে আর শিবনারায়ণ রায়, নিরোদচন্দ্র চৌধুরী ও তরুণতরদের রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিজীবনের বিষয় ও ঘটনা নিয়ে ‘তথ্যানুসন্ধানের’ প্রবণতার সমালোচনা করে বলেন :

‘পাকিস্তানের কিছু কিছু লোকও সবশেষে রবীন্দ্রবিরোধিতার ক্ষেত্রে এক গৌড়া সাম্প্রদায়িকতার পত্তন করেছেন। বলা বাহুল্য এতসব চক্রান্ত ও আঘাত সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ বেঁচে আছেন এবং কারো পরোয়া না করেই।’<sup>৬</sup>

আবদুল হাফিজ আরো বলেন :

...সোভিয়েত রাশিয়ায় রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীর সমাদর প্রমাণ করে যে রবীন্দ্রনাথের লেখায় প্রগতিশীল মানবতাবাদী প্রেরণা এত অটল যে তার ছুড়ি মেলা ভার। মার্কসবাদীদের সেই বিশেষ চক্রটি আজ আর নেই, কিন্তু সেকালে রবীন্দ্র-বিরোধিতার ক্ষেত্রে এরা একটি পটু প্রচারণার ঢালাও ব্যবস্থা করেছিলেন। একারণেই রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীর বিচারে নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গী অপরিহার্য—অপরিহার্য তাঁর লেখার সামগ্রিক অধ্যয়ন ও নিরন্তর চর্চা।<sup>৭</sup>

তৃতীয় বর্ষ তৃতীয়-চতুর্থ, কার্তিক-চৈত্র ১৩৭৬ সংখ্যায় ‘একুশের স্মৃতি’ কথাটা লাল কালিতে, আর সূচিপত্রের পাতায় শীর্ষে ‘মোদের গরব মোদের আশা আ মরি বাঙলা ভাষা’ উক্তিটি উদ্ধৃত করে মোহাম্মদীর মতোই অনেকটা রূপান্তরের মুখে যে সমাজ ও সাহিত্য—তার স্বীকার করে নিয়েছিল উত্তর-অনুেষা। সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় ‘সে আগুন ছড়িয়ে গেলো সবখানে’ তে বায়ামোর ঘটনা বর্ণনা করেছেন স্মৃতিচারণের ভঙ্গিতে। তবে এসবই বহু পরে স্বাধীনতার লাল সূর্য উদয়ের সঙ্কীর্ণগে।

উত্তর-অনুেষা সমাজ সাহিত্য ও সংস্কৃতির রূপান্তরের প্রক্রিয়ায় সৃজনশীল অবদান রাখতে এবং মুক্তি সংগ্রামে সামিল হতে ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। যদিও সমাজের ব্যাপক ভাঙাচোরা, উত্থান-পতন ও বিপর্যয়-বিক্ষোভের পর আলোকময় পরিস্থিতিতে উত্তোরণের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেলেই এটি প্রকাশিত হয়েছিল।

## তথ্যপঞ্জি

১. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রফেসর ও ‘যাত্রী’-সম্পাদক ড. খন্দকার সিরাজুল হক ০৬-০৭-১৯৯১ তারিখের পত্রে বর্তমান গবেষককে জানান, ন্যাপ থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য আবদুল হাফিজ এবং তিনি উত্তর-অনুেষা প্রকাশের ব্যাপারে সহযোগিতা করতেন। আরো অনেকেই করতেন, যেমন মোহসিন রেজা।

২. ড. ময়হারুল ইসলাম, হামিদা রহমান ও জাহানারা বেগমের সদ্য প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ সমালোচনাকালে উল্লেখ করেন। দ্র. উত্তর-অন্বেষা, ১ বর্ষ, ১ সংখ্যা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৪, পৃ. ১০৭।
৩. বরুদ্দীন উমর, ছাত্র রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন, উত্তর-অন্বেষা, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা পৃ. ১৫।
৪. ইবনে আদম, 'ছাত্ররাজনীতি ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন' প্রসঙ্গে, পূর্বোক্ত, ১ বর্ষ, ২ সংখ্যা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৪, পৃ. ৭০।
৫. আবদুল হাফিজ, রবীন্দ্র বিরোধিতা, একটি ভূমিকা, পূর্বোক্ত, ৩ বর্ষ, ১ সংখ্যা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৪, পৃ. ১৯-২৭।
৬. পূর্বোক্ত. পৃ. ১৯।
৭. পূর্বোক্ত।

## পাকিস্তানপন্থী, ইসলামী পুনর্জাগরণবাদী ধারার কতিপয় অপ্রধান পত্রিকা

[১. নওরোজ (১৯৪২-৭১) ২. জাগরী (১৯৫৬); ৩. অস্ত্রাব (১৯৬০);  
৪. প্রবাহ (১৯৬১); ৫. দিগন্ত (১৯৬৬); ৬. অভিযান (১৯৫৪-৬৪) ]

### ১. নওরোজ (১৯৪২-৭১)

কলকাতা থেকে ১৯২৭ সনে আফজাল-উল হকের সম্পাদনায় 'নওরোজ' নামে মাসিক সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশের পরও কেনো একই নামে ১৯৪২ সনে আবার দিনাজপুর থেকে 'নওরোজ' বের হলো, তার অনেক কারণ অনুমান করা যায়; কিন্তু অনুমানভিত্তিক কথা কি মূল্য? কেবল এই মাত্র বলা চলে যে, কলকাতার নওরোজের সঙ্গে আফজাল উল হক ছাড়াও মোসলেমউদ্দিন শেখ প্রমুখ সংশ্লিষ্ট ছিলেন। প্রাপ্তব্য কলকাতাই শেষ সংখ্যা নওরোজের মুদ্রক ও প্রকাশক ছিলেন মোসলেমউদ্দিন শেখ। এঁদের কারো ঘনিষ্ঠ, অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তি দিনাজপুরী-নওরোজের উদ্যোক্তা হলে সূত্র সবই পাওয়া যায়।

দিনাজপুর থেকে সাতচল্লিশের আগে ১৯৪২ সনের ফেব্রুয়ারিতে নওরোজ প্রকাশিত হয় উনত্রিশ-ত্রিশ সনের দিকে প্রতিষ্ঠিত দিনাজপুর-এর স্যার নাজিমউদ্দিন মুসলিম হল এবং লাইব্রেরির মুখপত্ররূপে। পরের বছর (বৈশাখ ১৩৫০) থেকে নওরোজকে দিনাজপুরের ইকবাল সোসাইটিরও মুখপত্র (যুগ্মভাবে) রূপে গণ্য করা হয়। পত্রিকার একটি উক্তি :

মহাকবি, মহাদার্শনিক এবং মহামনীষী আল্লামা ইকবালের প্রাণচঞ্চল বাণী প্রচারে নওরোজ যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে।

বিভাগ পূর্ববর্তী কালের প্রথম ভাগের নওরোজের সম্পাদক হিসেবে নাম মুদ্রিত হতো মোহাম্মদ দেলওয়ার হোসেন বি. এল-এর। পাকিস্তান আমলের নওরোজের সম্পাদক হিসেবে মোঃ হেমায়েত আলীর নাম মুদ্রিত হয়। নওরোজ আর্ট প্রিন্টিং লি. দিনাজপুর, পূর্ব পাকিস্তান থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হতো। 'চীফ এডিটর' ছিলেন হাসান আলী আহমেদ এম. এ. বি. এল।

পত্রিকার মান বিবেচনায় প্রথম দিককার (১৯৪২-৪৭) নওরোজকে মাসিক সাহিত্য-পত্রিকার গুরুত্ব দেয়া গেলেও কোনো অবস্থাতেই প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর মাসিক এটা হতে পারেনি। তৃতীয় শ্রেণীর সাহিত্যপত্রিকা হিসেবেই এর অবস্থান ছিল। অনুন্নত পশ্চাৎপদ

বিজলী বাতিবিহীন দিনাজপুর থেকে গৃহীত এই সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক উদ্যোগের অপরিসীম গুরুত্ব তবু কিছু স্বীকার করতে হবে। কলকাতা বা ঢাকা থেকে বহু দূরবর্তী অশিক্ষায় জর্জরিত এবং অর্থে বিস্তে সংস্কৃতির দিক থেকে অনগ্রসর এলাকার মানুষদের মধ্যে শিল্পসাহিত্য সৃষ্টির একটা তাগিদ বা প্রেরণা, কিংবা চাঞ্চল্য ও আগ্রহ নওরোজ সৃষ্টি করেছিল এবং এই প্রাণ-চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছিল নাজিমউদ্দীন হককে কেন্দ্র করে।

সেখানকার সংস্কৃতিবান মানুষদের মনের মুক্তি এবং সাহিত্য-শিল্প অনুশীলনের কেন্দ্র হিসেবে ‘ইকবাল সোসাইটি’ এবং ‘স্যার নাজিম উদ্দীন মুসলিম হল এণ্ড লাইব্রেরীর ভূমিকা সাগরের মধ্যে ভরসার দ্বীপের মত অনেকটা। একারণেই আইউব খান সমাজসেবায় নাজিম-উদ্দীন হলের গুরুত্ব স্বীকার করে নওরোজের সম্পাদক হেমায়েত আলীকে তথমা-ই-খিদমত উপাধি দান করেছিলেন।

উল্লেখ্য, হেমায়েত আলী নাজিমউদ্দীন হলের সেক্রেটারি ছিলেন। পরে তিনি পত্রিকারও সম্পাদক হন। সামাজিক সাংস্কৃতিকভাবে তাঁরা দেশের কল্যাণ কামনা করতেন এবং কিছু কিছু কাজও করেছিলেন। তাঁরই স্বীকৃতিস্বরূপ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ঐ পুরস্কার দেন। ইতিহাসে নাজিমউদ্দীন হলের কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ বলে স্বীকৃত হবে সন্দেহ নাই। বিভাগ পূর্ববর্তী কালের নওরোজ ছিল হিন্দু-মুসলমানের মিলিত অসাম্প্রদায়িক প্রয়াস। তখন সরকারি সাহায্য পাওয়া যেতো ; আর সরকারি অফিসার ছিলেন অধিকাংশ হিন্দু। সাতচল্লিশের পরে এঁদের (নওরোজের) প্রধান উদ্দেশ্য হয় পাকিস্তানের আদর্শকে রূপায়িত করা। তবে কখনও কখনও তাঁরা কিছু ভালো লেখাও দেশের স্বীকৃত সাহিত্যিক লেখকদের নিকট থেকে নিয়ে, পেয়ে ছাপাতেন। এঁদের তালিকায় ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ থেকে কবি মুফাখারুল ইসলাম, লায়লা সামাদ প্রমুখ রয়েছেন। তবে অধিকাংশ লেখকই আল-ইসলাহর লেখক যেমন সিলেট কেন্দ্রিক, তেমনি নওরোজের লেখকগোষ্ঠীর সদস্য দিনাজপুর এলাকার। এদিক থেকে নওরোজ একটি আঞ্চলিক সাহিত্যপত্রিকার বেশি অগ্রসর হতে পারেনি। এঁরা সব সময় সরকারের প্রশ্রয় ও দানের প্রত্যাশী থাকলেও (বাংলা একাডেমী, বিএনআর প্রভৃতির আর্থিক সাহায্যও তাঁরা পেতেন) ১৯৫২ ও ১৯৫৪ সনের ভাষা আন্দোলনের ন্যায় গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং সর্বদলীয় সাহিত্য সম্মেলন (ঢাকা) কে সমর্থন করেছিলেন। দিনাজপুরেও তাঁরা বিভিন্ন স্থানের লেখক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, কবি, সম্পাদকদের দাওয়াত করে বিভিন্ন সময় সাহিত্যিক সাংস্কৃতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত করেছেন। এখানে পঠিত প্রবন্ধগুলো তাঁদের পত্রিকায় ছাপা হয়েছে।

বলা প্রয়োজন নওরোজ ছাপা হত নিউজপ্রেস্টের কাগজে। আর ১৬, ১৮, ২০, ২২, ২৬, ২৮, ৩২, ও ৪০ পৃষ্ঠার সংখ্যাই বেশি। পত্রিকা খুবই অনিয়মিত ; অতি সাধারণ মানের ছাপা হওয়ায় ঠিক পঠনীয় সামগ্রী বা সাময়িক রূপে দৃষ্টি আকর্ষণ করতো না। তবু ১৯৪২ থেকে ১৯৭০-৭১ সন পর্যন্ত একটি কেন্দ্র থেকে একটি পত্রিকা একদল সাহিত্য-সংস্কৃতি-কর্মীর দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে। একটি এলাকার মানুষের সুখ-দুঃখের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা তুলে ধরে পাকিস্তান আমলের মাসিক ‘নওরোজ’ যে-সামাজিক, সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ভূমিকা পালন করেছে তার ঐতিহাসিক, সামাজিক, সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যগুরুত্ব একেবারে ফেলে দেবার মতো নয়।



## ২. জাগরী (১৯৫৬)

নারায়ণগঞ্জ থেকে 'জাগরী' বের হয়েছিল বহুলোকের নাম বুকে ধারণ করে, কিন্তু বেশিদিন চলেনি। ১৯৫৬ থেকে ৬০ পর্যন্ত দেশে অস্বাভাবিক অস্থিরতা বিরাজ করছিলো। বিশেষ করে মুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে যাবার পর প্রায় দু'বছর রাজনৈতিক নেতাদের দলত্যাগ, স্বার্থ নিয়ে হানাহানি, কেন্দ্রীয় সরকারের ষড়যন্ত্র, সামরিক শাসন জারী ইত্যাদি ঘটনা এই সময়ে ঘটেছিল। প্রকৃত পক্ষে তখন 'মোহাম্মদী' ছাড়া আর কোন সাহিত্যপত্রিকাই এদেশ থেকে প্রকাশিত হচ্ছিল না। সওগাত ১৯৫২ থেকে প্রকাশ আরম্ভ করলেও খুবই অনিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। ১৩৬৫ থেকে সওগাত নিয়মিত প্রকাশের প্রতিশ্রুতি দিতে পেরেছিল, এবং তার ৪ মাস আগে (ভাদ্র ১৩৬৪) থেকে সমকাল বের হতে থাকে। ফলে 'জাগরী' স্থায়ী হতে পারেনি। কিন্তু পরে এই পত্রিকার সম্পাদক হেমায়েত হোসেন 'সাহিত্য' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। কিছু দিন ধরে বেশকিটি সংখ্যা তার বের হয়েছিল। অর্থাৎ কিছুটা স্থায়িত্ব সেটির কপালে জুটেছিল। সম্পাদক 'জাগরী' থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতা নিয়ে 'সাহিত্য' সম্পাদনায় হাত দিয়েছিলেন বলেই হয়তো তাঁর দ্বিতীয় উদ্যোগ তুলনামূলকভাবে বেশি মূল্যের হতে পেরেছিল।

'জাগরী' 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক মাসিক' ছিল। এর একটি বড়, দীর্ঘ সম্পাদনা পরিষদ গঠিত হয়েছিল। এটি সম্ভবত কোনো সাংস্কৃতিক সংস্থার মুখপত্র ছিল। কিন্তু পত্রিকায় সেকথা বলা হয়নি। 'জাগরী' নামের সংস্কৃতি ও সাহিত্যিক সংগঠনের 'কমিটি' ধরে নিলে এই বড় 'পরিষদ' এর তাৎপর্য খুঁজে পেতে সহজ হয়।

সম্পাদনা পরিষদের সদস্য ছিলেন—বেগম শেফালী আহমদ, সিরাজুল হক, গজনফর আলী, মধুসূদন মিত্র ; প্রধান সম্পাদক : হেমায়েত হোসেন ; কর্ম পরিষদ : সভাপতি—জনাব আবদুর রহমান এম.এ. ; সহ-সভাপতি—জনাব আবদুল জব্বার, বি.এ. বিটি, ডিপ-ইন-এড (এডিনবরা) ; মিস সাফিয়া খান এম.এ. ; সহ-সম্পাদক : জনাব শামসুল হুদা এম.এ. ; জনাব আবদুল আলীম বি.এ. ; প্রচার সম্পাদক : জনাব রেজাউর রহমান ; কার্যালয় সম্পাদক : জনাব নূরুদ্দিন আহমদ বি.এ. ; সদস্য : বাবু খগেন্দ্রনাথ ভৌমিক বি.এ. বিটি ; আবদুল আউয়াল এম.এম. সি. ; ফিরোজ আল মুজাহিদ এম.এ. ; কাজী তাজুদ্দিন আহমদ এম.এ. ; বেগম রোকাইয়া খাতুন বি.এ. বিটি ; জনাব সুলতান আহমদ মল্লিক ; খাদেমুজ্জামান ; কাজী নূরুল ইসলাম ; আজিজুল হক ; মোস্তফা সারওয়ার ; সুলতান মাহমুদ ; মিস লুৎফুল্লাহার বেগম প্রমুখ।

পত্রিকার শীর্ষে মটো হিসেবে হাদীসের এই বাণী উদ্ধৃত হয়েছিল : 'বিদ্বানের দোয়াতেও কালি শহীদদের লোহুর চেয়েও পবিত্র।' লেখকদের জন্য বলা হয়েছিল : 'সুচিন্তিত, মৌলিক, মানসম্পন্ন লেখার গুরুত্ব দেয়া হয়। বিতর্কমূলক রচনা প্রকাশেও পরিষদের আপত্তি থাকবে না।' কভারে রেজিস্ট্রেশন নম্বর এর জায়গা খালি ছিল, কিন্তু নম্বর হয়তো পাওয়া যায়নি শেষ পর্যন্ত। পত্রিকাটি হেমায়েত হোসেন কর্তৃক জিনাত প্রেস, নারায়ণগঞ্জ থেকে মুদ্রিত ; এবং এমাজউদ্দিন আহমদ কর্তৃক দেওভোগ পাকা রোড নারায়ণগঞ্জ থেকে প্রকাশিত হতো ; মূল্য ছিল আট আনা।

পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় কবিতা লিখেছিলেন : ফররুখ আহমদ (ঝড়ের ইশারা ওরা জানে) ; আশরাফ সিদ্দিকী (হেমন্ত) ; লতিফা রশীদ (উত্তর ফাল্গুনী) ; খোন্দকার আবদুর রহীম (এপারের ভোর) ; হেমায়েত হোসেন (প্রেম : পৃথিবী : অনুভব) ; কবিয়াল আকিলউদ্দিন (একটি মারফতী গান) ; কাজী নূরুল ইসলাম (আমার যন্ত্রণা কে!) ; বেগম শেফালী আহমদ (কাক জোৎস্নায়) ।

প্রবন্ধ লিখেছিলেন : আহসান হাবীব (পূর্ব বাংলার কাব্য সাহিত্য) ; সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় (লোকশিল্পের ভবিষ্যত) ; ড: কাজী মোতাহার হোসেন (বাংলাসাহিত্যে মুসলমানদের দান) ; ঢাকায় অনুষ্ঠিত ইসলামী সাংস্কৃতিক সম্মেলনে পঠিত) ।

‘সংবুদ্ধ’ নামের একজন লেখকের ‘পূর্ববঙ্গের কথাসাহিত্য’ শীর্ষক একটি লেখা ক্রমশ: প্রকাশিত হবে মর্মেও বলা হয় এবং প্রথম সংখ্যায় এক কিস্তি প্রকাশিত হয় ।

গল্প লিখেছিলেন : মিন্নাত আলী (চেনা ও জানা) ; মোপাসাঁ (শাদীর সওগাত, অনুবাদক আবদুর রহমান) ; গজনফর আলী (অনিরুদ্ধ) ; সিরাজুল হক (আধুনিক মন) ।

সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

সাহিত্য শাস্ত্র জীবনেরই অনুরণন। ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে সমষ্টিজীবন পর্যন্ত তার পরিব্যাপ্তি। পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে তার প্রকার ভেদ। রাষ্ট্রীয় পারিপার্শ্বিকতার ছাপও তাই সেখানে সুস্পষ্ট হতে বাধ্য। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় আঙ্ক আমরা আজাদ। কিন্তু যে বিপুল প্রাণবন্যার জন্যে রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় এই বৈপ্লবিক পরিবর্তন সম্ভব হয়েছিল—স্বভাবতই আশা করা গিয়েছিল তার দুকূলপ্লাবী ঢেউ এসে লাগবে আমাদের সমাজ জীবনে, ভাষাধারায়, সাহিত্যসাধনায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমরা নিরাশ হয়েছি। উন্নত জীবন যাপনে যেমন হয়েছি ব্যর্থ, সাহিত্যেও তেমনি হয়েছি অবহেলিত। তার কারণ নানাবিধ।...মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, মুখের ভাষার প্রতি যে গভীর প্রেম থাকলে, অকাতরে জীবন বিলিয়ে দেওয়া যায় বুলেটের সামনে, যে তাকুণ্য, যে উন্মাদনা থাকলে লাখে-লাখে নিরন্ন-নিরক্ষর লোককে জাগিয়ে দেওয়া যায়, যে দুর্বীর তেজ থাকলে প্রাণে-প্রাণে আনা যায় গভীর উত্তেজনা—সে তাকুণ্যের ছাপ, সে উন্মাদনা, সে সতেজ প্রাণের উর্মিদোলা আমাদের সাহিত্যে আসেনি, সে প্রবল গণচেতনা প্রতিফলিত হয়নি আমাদের সাহিত্যে, দুকূলপ্লাবি সে জোয়ারের গতিবেগ, আমাদের কবি সাহিত্যকদের কলমে আসতে পারেনি।...

কিন্তু এখনো এমন কিছুসংখ্যক তরুণ লেখকদের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে যে আমাদের সাহিত্যের ভবিষ্যত সম্বন্ধে আশাবিত্ত হবার যথেষ্ট কারণ আছে।...এখন শুধু পরিস্থিতি সৃষ্টির অপেক্ষা। আঙ্কের এই বাস্তববাদী সাহিত্যে বিশ্বের নিপীড়িত জনগণের মুক বেদনা রূপ পাচ্ছে। জনগণের বঁচে থাকার দাবী নিয়ে রচিত হচ্ছে সাহিত্য। অনেকেই ইতিমধ্যে তাঁদের লেখায় সে দাবীকে তুলে ধরেছেন। তাঁরা স্বীকার করতে পেরেছেন, বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের...এই পৃথিবীতে বেদনার সমুদ্র পার হয়ে... আসতে হবে। ভয় করোনা কোন আঘাতকে ... মৃত্যুকে ... এই পরিত্রেক্ষিতে অনেক আশা অনেক স্বপ্ন নিয়ে ‘জাগরীর যাত্রা’ শুরু হলো।

জানি, এর সামনে দাঁড়াতে বাধার প্রাচীর, দীর্ঘ পথ হবে বন্ধুর দুর্গম, মানবতার শত্রুদের বিষাক্ত নিশ্বাসে এর স্বাভাবিক বাঁচবার দাবী হবে ক্ষুণ্ণ, ঝাঁকে ঝাঁকে কালবৈশাখী দিবে হানা, রাত্রি আনবে অঙ্ককার, তবু আমাদের প্রতিজ্ঞা, আমাদের উদ্যম আমাদের আশা একদিন জয়যুক্ত করবেই আমাদের প্রচেষ্টাকে।

জাগরীর বিশ্বাস ছিল : ‘সমস্ত আঁধার ছিন্ন করে অমরাত্রির নিচ্ছেদ্য সমস্ত তিমির ভেদ করে পূর্বাশার নবীন দ্যুতি উঁকি দিবেই। রাত্রি শেষে রাঙাপ্রভাত এক উজ্জ্বল দিন আসবেই।

সূর্য উঠবে—সাহিত্যের পথে সামগ্রিক ভাবে মানবতার কল্যাণ-সাধনের পথে আমরা এগিয়ে চলবই।<sup>২</sup>

নারায়নগঞ্জ থেকে এর আগে ‘কৃষ্টি’ বেরিয়েছিল, কিন্তু সেটার পরিণামও জাগরীর মতোই হয়েছিল। জাগরীর একাধিক সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল কিনা জানা যায়নি। তবে জাগরীর কর্মকর্তাদের দাবী ছিল নারায়নগঞ্জ থেকে তাঁরাই প্রথম মাসিক পত্রিকা প্রকাশের এইরকম একটি উদ্যোগ নিয়েছেন। কথাটি যে ঠিক নয়—কৃষ্টি তার প্রমাণ। দ্বিতীয়বারেও সাময়িকপত্র-সাধনায় নারায়নগঞ্জ তেমন স্থায়ী স্বাক্ষর রাখতে পারেনি। তবে তৃতীয় বারে গুরুত্বপূর্ণ না হলেও মোটামুটিভাবে উল্লেখ করার মতো একটি সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশিত হতে পেরেছিল—জাগরীর ব্যর্থতার কথা বর্ণনা কালে এটুকুই সাক্ষ্য।

### তথ্যপঞ্জি

১. হেমায়েত হোসেন সম্পাদিত দুটি পত্রিকা জাগরী ও সাহিত্য দুই অধ্যায়ে বিন্যস্ত করার কারণ হলো, জাগরীতে তুলনামূলকভাবে মৌলিকত্ব কম। আর মোহাম্মদী-মাহেনও ইত্যাদির প্রভাব এতে বেশী।
২. সম্পাদকীয়, জাগরী, ১ বর্ষ, ১ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৬০, পৃ. ৪২-৪৩।

### ৩. অতএব (১৯৬০-৬২)

আঞ্চলিক পত্রিকা হিসেবে বাংলা সাহিত্য ও সাময়িকপত্রিকার ইতিহাসে অতএব এর গুরুত্বও কিছু স্বীকার করা দরকার। কারণ এতে সাহিত্যচর্চার একটি আন্তরিক পরিচয় পাওয়া যায়। তবে এটি সাধারণ একটি মফস্বলীয় সাহিত্য পত্রিকাই; এর বেশি মর্যাদা সে লাভ করতে পারেনি। উদ্যোগের মধ্যে উচ্চমানের পত্রিকার পরিকল্পনা বা চিন্তাধারা ছিল বলে মনে হয় না। সম্পাদকের সরুপ যোগ্যতাও ছিল না। তবে এটি ঠিক—ঐকালে ঢাকা থেকেই যেখানে উন্নত মানের পত্রিকা প্রকাশ করা খুব কঠিন কাজ ছিল, সেখানে বগুড়ার মত একটি মফস্বল জিলা শহর থেকে প্রথম শ্রেণীর কোন সাহিত্যপত্রিকা প্রকাশিত হবে—এরূপ কল্পনাও করা হতো না। সম্ভবও ছিল না। আজও এদেশের প্রধান লেখকেরা ঢাকাবাসী। বগুড়ায় তখন কবি আতাউর রহমান, লুৎফর রহমান সরকার এরকম দু'একজন তরুণ কবিসাহিত্যিক কর্মোপলক্ষে বসবাস করতেন—এর থেকে বেশি সুযোগ-সুবিধা ভালো লেখা পাওয়ার ক্ষেত্রে ছিল না। এই অবস্থায় রাজশাহী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক আর রাজধানীতে বসবাসকারী কবি-সাহিত্যিকদের কাছ থেকে ডাকে বা অন্যকোন উপায়ে কিছু কিছু ভালো লেখা সংগ্রহ করে বগুড়ার আজিজুল হক কলেজের বাংলার শিক্ষক মহসীন আলী দেওয়ান (১৯৩৯-৭১) প্রকাশ করেছিলেন 'অতএব' নামে একটি 'মাসিক সাহিত্য' পত্রিকা। জন্ম তারিখ থেকেই বোঝা যায় ১৯৬০ সনে সম্পাদক খুবই তরুণ ছিলেন। অবশ্য সার্টিফিকেটের বয়স অনুসারে জন্ম ১৯৩৯ হলেও প্রকৃত বয়স এর থেকে দু-চার বৎসর বেশি হওয়াই স্বাভাবিক। সে হিসেবেও যা আসে, তাতে ফজলে লোহানীদের 'অগত্যা'র প্রভাব 'অতএব'এ কল্পনা করা সহজ হয়।

তাছাড়া নানান চট্টকীজাতীয় প্রশ্নোত্তর, আলোচনা ইত্যাদি থেকে 'অগত্যা'র অনুকরণের স্পষ্ট লক্ষণ অতএব-এ আছে। বলাবাহুল্য 'অগত্যা' আর 'অতএব' এর নামকরণের মধ্যেও একটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। তবে চিন্তাধারায় ঐরা পাকিস্তানবাদী, ইসলামী তমুদ্দুনের পক্ষপাতী ছিলেন। ড. ময়হারুল ইসলামের 'সাহিত্যপথে' শীর্ষক বইয়ের আলোচনাকালে তা স্পষ্ট করেই ধরা পড়েছে—

...এখনও পূর্ব পাকিস্তানে পরীক্ষা-নিরীক্ষার শেষ হয় নাই। এই কুহেলিকার যুগে যেকোন মত ও পথের নির্দেশিকার বিশেষ মূল্য আছে। ডক্টর ময়হারুল ইসলাম মনে-প্রাণে ইসলামী সংস্কৃতি ও জীবনধারায় বিশ্বাসী। মতামত প্রকাশে তাঁহার সিনসিয়ারিটি নবীরহীন... গ্রন্থকার যে সকল মন্তব্য করিয়াছেন তাহা আমাদের নূতন চিন্তার পথ করিয়া দিয়াছে।... সমকালীন সুনাম-কাঙাল সাহিত্যসেবীরা ডক্টর ময়হারুল ইসলামের উপর খড়গহস্ত হইবেন... ইহাতে লেখক ধৈর্যধারণ করিলে সমাজের উপকার করিবেন।'

'অতএব' এর প্রথম সংখ্যা আগস্ট ১৯৬০ সনে প্রকাশিত হয়। দুই বছর নিয়মিত চলেছিল। কিন্তু এর মান খুবই সাধারণ; বলা চলে কলেজ বা স্কুলের বার্ষিকী কিংবা কোনো সোসাইটি সমিতির মুখপত্রের ন্যায়। কোনো উন্নত চিন্তা ও সাহিত্যরুচি এইসব সাময়িকী ইত্যাদিতে থাকে না। তবে নওরোজের মতই এই পত্রিকাও বাংলা একাডেমী ইত্যাদির আর্থিক

সহযোগিতা প্রত্যাশী ছিল। উদ্যোক্তারা নানা ভাবে সরকারের করুণা প্রার্থনা করেছেন এবং সর্বত্র বঞ্চিত হননি।

প্রথম বর্ষে ১২টি সংখ্যা প্রকাশিত হলেও অনেক সংখ্যার গায়ে কোনো তারিখ দেয়া থাকতো না। অনিয়মিত বের হতো বলে এইরকম হতো। অনুদান এর হিসাবে বা ইউটিলাইজেশন দেখাবার জন্যে নামেমাত্র সংখ্যা করা হতো বলেই অনুমান। তাই সাইজ ও পৃষ্ঠাসংখ্যা সবসময় এক থাকেনি। বিচিত্র হয়েছে। সম্পাদকের নিজের নোট বইয়ের ও অন্যান্য বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনে কিছুটা বৈচিত্র্য সৃষ্টি হতো অবশ্য। একটি নিয়মিত বিভাগ ‘সোনালী আসর’ এ ছোটদের লেখা প্রকাশ করা হতো। ধরনধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল ‘কচি কাঁচার আসর’ এর মতো। ‘বগুড়া কচিকাঁচা’ মেলার সাহিত্যবিভাগ হিসেবে এটি প্রকাশিত হতো এবং পরিচালনা করতেন সাদিক আনওয়ার ও (শুধুমাত্র) আনওয়ার। এই বিভাগে চিঠিপত্র লেখা হতো দাদাভাই এর কচিকাঁচার আসর এর মতো। ছোটদেরকে উৎসাহিত বা পৃষ্ঠাপোষকতাদান মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। তবে পত্রিকার উদ্দেশ্যও ছিল ‘নতুন লেখকদের উৎসাহ দেওয়া।’ ‘আপনাদের প্রশ্নের জবাবে’ বিভাগে ‘কয়াল’ নামে ‘অগত্যার’ মতো কৌতুক ও সাহিত্যরসসহ জবাব দেয়া হতো। তবে কোনো বিদ্রূপ ও খোঁচা তাতে তেমন থাকতো না, কারণ সেই দুঃসাহস দেখালে সরকারি ও সামাজিক শূভানুধ্যায়ীদের সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হতে হতো। সত্য কথা বললে বহু লোকে শত্রু হয়। যাই হোক, এসবের মধ্যে সমকালীন তথ্যচিত্র কিছু পাওয়া যায় বটে, তবে প্রশ্নোত্তরে তাঁদের বৈদগ্ধ ছিল না।

‘অতএব সাহিত্য সমিতি’ ছিল বেশ সক্রিয়। বিভিন্ন জেলা শহরে, বিশেষত, বগুড়া, ঢাকা, খুলনা ও রাজশাহীতে এর অনেক শাখা ছিল। সমিতির সভাপতি, সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ থাকতেন বিভিন্ন কলেজের শিক্ষকেরা। পত্রিকার মাধ্যমে সমিতি গঠন ও তার পরিচয় প্রদান করা হতো। যেমন ‘বই’ পত্রিকায় ‘গ্রন্থ সুহাদ সমিতি’ গঠনের সংবাদ ও সভ্যদের নাম ঠিকানা ছাপা হয়। মহসীন আলী দেওয়ানের সঙ্গে সহকারী সম্পাদক হিসেবে বিভিন্ন সময় নাম ছাপা হয়েছে—

সাদিক আনওয়ার, আনওয়ার ও রহীম চৌধুরীর। প্রচ্ছদ আঁকতেন শওকত কামাল, মোহাম্মদ হোসেন প্রমুখ। আর্ট এণ্ড পাবলিসিটি বগুড়া থেকে মহসীন দেওয়ান কর্তৃক প্রকাশিত হতো এবং বগুড়া লিথোগ্রাফিক প্রিন্টিং ওয়ার্কস লিমিটেড থেকে খোলদাকার আবু নাছের কর্তৃক ১ থেকে ৬ সংখ্যা পর্যন্ত মুদ্রিত হয়েছে। ৭ম সংখ্যা বগুড়া সাধনা প্রেস থেকে মো: নূরুল আলম কর্তৃক মুদ্রিত হয়। সমিতির পরিচালক ছিলেন আমানুল্লাহ খান। সভ্য হবার ফরম ছিল পত্রিকার মধ্যে। এসব পত্রিকার বিক্রি বা কাটতি বাড়াবার কৌশল বলেই মনে হয়। পরের দিকে ছবিসহ সিনেমার খবরও দেয়া হতো। ১ম বর্ষ ১০ সংখ্যায় বলা হয় ;

“সিনেমা পত্রিকার চল বেশি, এই বিবেচনায় অতএবকে ধর্মান্তরিত করবার প্রস্তাব এসেছে ঢের। আমাদের শূভানুধ্যায়ীদের প্রস্তাব আমরা বিবেচনা করে ঢাকায় আমাদের প্রতিনিধি মনোনীত করেছি সিনেমাংসংবাদ পরিবেশনের জন্য। এবার থেকে বরাবর সিনেমা

সংবাদ, সিনেমা সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তর ইত্যাদি বিভাগ চালানো হবে। অবশ্যি আমরা এ ব্যাপারে ঢাকাস্থ স্টুডিও ও চিত্রপরিবেশনকারীদের সহযোগিতা কামনা করছি।<sup>১২</sup>

১০ম সংখ্যায় (১ম বর্ষ) ‘সাহিত্যিক পরিচিতি’ শিরোনামের নিচে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর সংক্ষিপ্ত জীবনী ছাপা হয় এবং বলা হয় এরপর থেকে ‘পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যিকদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাতের সংবাদ বা জীবনী ও সাহিত্যকর্ম বের হতে থাকবে।’<sup>১৩</sup> ‘অতএব সাহিত্য সমিতি’ গঠনের নিয়মাবলিতে বলা হয় : ‘যে কোন শিক্ষক, বাংলা একাডেমীর সদস্য, লেখক সংঘের সদস্য, নজরুল-ইকবাল একাডেমীর সদস্যকে সভাপতি/ কোষাধ্যক্ষ মনোনীত করে যে কোন সংখ্যক সাহিত্যমোদীকে নিয়ে অতএব সাহিত্যসমিতি গঠন করা যায়। সমিতির সভায় পঠিত বা মনোনীত লেখা অতএব-এ ছাপা হবে। নতুনকে উৎসাহ দেবার জন্য এ ব্যবস্থা করা হয়েছে। যতজন সদস্যকে নিয়ে ‘অতএব সমিতি’ গঠিত হবে ততোকপি অতএব পত্রিকা অর্ধেক মূল্যে পাঠানো হবে।’

অতএব-এ যাঁরা লিখেছিলেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন অধ্যাপক নীলরতন সেন, সাদিক আনওয়ার, শাহ আনিসুর রহমান, এ.কে. মকবুল আহমদ, সিদ্দিক হোসেন, খাজা জহরুল হক, সৈয়দ আফতাব হোসেন, রহীম চৌধুরী, আনওয়ার, এস. কে. রোস্তুম আলী, ফেরদৌসী নাজির, আমানউল্লাহ খান, আতাউর রহমান, ম্যাথু আরনল্ড (অনুবাদ), কে. জি. মোস্তফা, আহমদ সাত্তার, মোঃ তবারক হোসেন, অধ্যাপক গোলাম রসুল, রায়হেনা রহমান, জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত, ড. ময়হারুল ইসলাম, মনজুর আলম, মতিয়ার রহমান, ক্ষিতীন্দ্রনাথ রায়, অধ্যাপক মোয়াজ্জম হোসেন চৌধুরী, মোবায়্যেদুর রহমান, শামসুজ্জামান চৌধুরী, কে. এম. শমসের আলী, শেখ আমজাদ হোসেন, কে.এম. সালাহউদ্দীন, ইব্রাহীম খাঁ, আ.কা.শ. নূর মোহাম্মদ, অধ্যাপক তরিকুল আলম, সন্তোষ কুমার দেব, লুৎফর রহমান (সরকার), শুল্ভেন্দু মিত্র, ডা: মো: হাবিবুর রহমান, অধ্যাপক মুহম্মদ আবু তালিব, অধ্যাপক জিল্লুর রহমান, আহমেদ ফারুক প্রুমখ। ডক্টর ময়হারুল ইসলাম কবিতা লিখেছিলেন ‘অতএব’ শিরোনামেই

‘অতএব তোমাদের হাতে হাত রেখে পথ চলা হোল না  
এ দেশে বসত করে তোমরা তাকিয়ে থাকো আরেক জগতে  
তোমাদের মন-বুদ্ধি সকল রেখেছ বেঁধে।  
বহুদূর হতে আরেক আকাশ;  
আরেক বাতাস...  
অতএব আজ বলি খোলসা জ্বান...  
এবার দাঁড়াতে হবে অটল বিশ্বাস বুকে লয়ে  
এই মাটি আমাদের মদিনার সুমহান আলো  
যুগে যুগে কালে কালে এদেশ রাঙালো  
সে আলোতে প্রাণ ভরে এমাটিকে ভালোবেসে আর  
মস্তক উন্নত করে দৃপ্ত পায়ে পথ চলবার  
এসেছে সময়  
অতএব আর নয় বৃথা কালক্ষয়

এসো এসো যারা দেশ-হিত-ব্রতে বিশ্বাসী  
এই হীন আয়োজন সমূলে বিনাশী।<sup>৪</sup>

ইসলামি জীবনাদর্শে পাকিস্তানকে ভালোবাসার উদাস্ত আহ্বান জানিয়েছেন কবি। কিন্তু ‘সাহিত্যে যৌনবোধ’ কতোটা থাকা উচিত সেসব আলোচনাও অতএবে হয়েছে।<sup>৫</sup> এবং জ্যোতিপ্রকাশ দত্তের ন্যায় প্রথম সারির কথাশিল্পীর লেখা গল্পও অতএবএ ছাপা হয়েছে। মোটামুটি ভাবে কিছু পঠিতব্য বিষয় পত্রিকাটিতে ছিল কিন্তু পত্রিকাকে উন্নত এবং নিয়মিত করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। তবু এই প্রয়াসের কিছু মূল্য না দিলে জাতির প্রতি পালিত তাঁদের কর্তব্যের ঋণ অস্বীকার করা হয়।

### তথ্যপঞ্জি

১. এম. এ. দেওয়ান, সমকালীন সাহিত্য প্রসঙ্গে, অতএব, ১ বর্ষ, ৭ সংখ্যা, (তারিখবিহীন) পৃ. ১৮৩।
২. সম্পাদকীয়, অতএব, ১ বর্ষ, ১০ সংখ্যা।
৩. ‘সাহিত্যিক পরিচিতি’, পূর্বোক্ত।
৪. ড. ময়হারুল ইসলাম, অতএব (কবিতা), পূর্বোক্ত, ৪ সংখ্যা, পৃ. ৭৬।
৫. অধ্যাপক নীলরতন সেন, সাহিত্য ও যৌনবোধ, পূর্বোক্ত, ২য় সংখ্যা, পৃ. ১৬-১৯।

## ৪. প্রবাহ

(১৯৬১)

‘ছাত্র-ছাত্রীদের সাহিত্য-মাসিক’ হলেও প্রবাহ সাধারণ সাহিত্য-মাসিকের মতোই হয়েছিল। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, কবি জসীমউদ্দীন, অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাই, আবদুর রহমান খাঁ, কবি মঈনুদ্দীন প্রমুখের আশীর্বাণী নিয়ে এস. এম. রহমানের সম্পাদনায় (এবং প্রকাশনায়) ১৭৫ ফকিরাপুল, ঢাকা থেকে প্রকাশিত ও তাঁর দ্বারাই লিবার্টি প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৪৭/১, টয়েনবি সার্কুলার রোড, ঢাকা-৩ থেকে মুদ্রিত হয়ে নিউজপ্রিন্ট কাগজে একের আট সাইজের ৫২ পৃষ্ঠায় পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল। সহকারী সম্পাদক ছিলেন কাজী নাসির উদ্দিন আহমদ ও শরফুল আজিজ। পত্রিকায় লিখেছিলেন একালের একজন বিশিষ্ট কলামিস্ট, সম্পাদক ও রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও শ্রম-সমস্যা বিষয়ের লেখক শাহ আবদুল হালিম (১৯৩৫-৮৯ ; ‘ধর্ম, সংস্কৃতি ও সাহিত্য’) ; এবং শামসুল হুদা (গল্প, কষ্টিপাথর) ; সুব্রত চৌধুরী (গল্প, স্মরণী) এবং জহিরুল হক, কাজী মাসুম, হানিফ খান, কে. এম. সালাহউদ্দীন, দিলারা আহমদ, দেওয়ান মুস্তাফিজুর রহমান প্রমুখ।

সম্পাদকীয় উদ্দেশ্য ছিল : পত্রিকার মাধ্যমে প্রতিভাবান তরুণস্রষ্টা শিল্পীলেখকদের প্রতিভা বিকাশের প্রচেষ্টা চালানো। ছাপার ভুল আছে। শিক্ষানবীশীর কাঁচা ছাপও আছে এর রচনাবলীতে। তবে ভাষায় ধর্মীয়ভাব আনার বা সহজ বাংলা করার কোন কোশেশ নেই। কিছু ভালো লেখাও তাতে স্থান পেয়েছে। শাহ আবদুল হালিম, (তখন ছাত্র তরুণ) এর রচনায় পাকিস্তানকে ভালোবাসার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের পাকিস্তানী তমদুনের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছে—

আমাদের সজ্ঞান দৃষ্টি রাখতে হবে যাতে করে নবসৃষ্টির উদ্ভাদনায় বা কারও অপচেষ্টায় গণজীবন ও জাতীয় ভাবাদর্শের বিরুদ্ধে আমাদের সৃষ্ট সাহিত্য ধ্বংসাত্মক ভূমিকা গ্রহণ না-করে।... আমাদের জীবনে শিক্ষা, আদর্শ, পরিবেশ, পারিপার্শ্বিকতার যে প্রভাব, জীবন সম্পর্কে আমাদের যে ধারণা, এবং জীবনে দেশ ও কালের প্রভাবের বাস্তব প্রতিফলন হল আমাদের সংস্কৃতির উৎস। তাই সংস্কৃতি আমাদের পূর্ণ জীবনের সাক্ষ্য বহন করে আমাদের দেশকাল, জাতি ও জীবন সম্বন্ধে আমাদের ধারণা, বিশ্বাস এবং অবিশ্বাসের। তাই আমরা যে গান গাই, যে কবিতা লিখি, যে নাটক মঞ্চস্থ করি, যে বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করি—সেসবই হল আমাদের সংস্কৃতিবোধের বাস্তবায়ন। তাই এইগুলিকে এই প্রকাশের বা বাস্তবায়নের মাধ্যমকে সংস্কৃতি বলে অভিহিত করতে চাইলে ভুল করা হবে।

কাজেই অনেক সময় দেখা যায় যে, আমাদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড... আমাদের দেশকাল, পারিপার্শ্বিকতা, বিশ্বাস, অনুভূতি, ধ্যানধারণা ও আদর্শবাদের কোন ছাপই বহন করেনা। এগুলো বিশেষ অবস্থায় অনেক ক্ষেত্রে মড়যন্ত্রমূলক। আমাদের সৃষ্ট সাহিত্য ও শিল্পকলায় ‘দারিদ্র্যের দোহাই দিয়ে’ একভাষাভাষী ও অখণ্ড বঙ্গসংস্কৃতি বা যা কিছু ভাল তাই গ্রহিতব্য বলে আমাদের দেশের সৃষ্ট সাংস্কৃতিক বোধকে পঙ্গু করে ফেলার মাধ্যমে আমাদের মানসিকতা ও জাতীয়তাবোধকে দুর্বল করে দেওয়া হয়।

এই দুর্বলতা থেকেই হীনমন্যতা বোধের অগ্রগতি, শিল্প ও সাহিত্য সৃষ্টিপথে মহা অন্তরায়। আর এই সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এই পরমুখাপেক্ষিতা ও হীনমন্যতাবোধের মধ্যে জাতীয় উন্নতির আশা-আকাঙ্ক্ষা বিনষ্ট ও



আজাদী বিপন্ন হওয়ার বীজ নিহিত রয়েছে। চিন্তাশক্তির ঔদার্য ও স্বকীয়তা জাতীয় আজাদীর প্রাণস্পন্দন স্বরূপ। একে বন্ধ করে দেওয়ার জন্য যে গভীর ষড়যন্ত্রজাল বিস্তার করা হয়েছে চারদিকে তাকে ছিন্ন করতেই হবে।<sup>১</sup>

হেমায়েত হোসেন সম্পাদিত 'সাহিত্য' পত্রিকায় 'প্রবাহের' বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছে। তাতে পত্রিকাটি কিছুকাল নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছে বলে প্রমাণ হয়, কিন্তু সংরক্ষণের অভাবে আজ তার ইতিহাস হারিয়ে গেছে।

### তথ্যপঞ্জি

১. শাহ আবদুল হালিম, ধর্ম সংস্কৃতি ও সাহিত্য, প্রবাহ ১ বর্ষ, ১ সংখ্যা, এপ্রিল ১৯৬১, পৃ. ১৩।

## ৫. দিগন্ত

(১৯৬৬)

আজাদ পাকিস্তানের পশ্চিমাঞ্চলে প্রবাসী ব্যবসায়ী চাকরীজীবীদের দ্বারা একটি সাহিত্যিক-সাম্প্রতিক পরিবেশ গড়ে উঠেছিল। তাঁরা রাজনীতি করতেন না ; কিন্তু ক্রমে তাঁরা নিজেদের হীনদশা উপলব্ধি করে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু সেটা ষাটের পরের দশকের ঘটনা।

১৯৫৩-৫৮ সনে বেগম এম. ই. খান কর্তৃক মহসিন আর্ট প্রেস, ৯৯২ পিআইবি কলোনী, করাচী থেকে মুদ্রিত হয়ে ২৯ বন্দর রোড, করাচী থেকে যখন ‘দিগন্ত’ বাংলা মাসিক সাহিত্যপত্রিকা সম্পাদিত ও প্রকাশিত হতো—তখন পশ্চিম পাকিস্তানের বাঙালিরা স্বাতন্ত্র্যবাদী হননি, বরং পাকিস্তানের সুবাদে দেশ থেকে বহুদূর লাহোর, করাচী, পাঞ্জাব, রাওয়ালপিণ্ডিতে অবস্থানের সুযোগ পেয়ে তাঁদের অনেকেই আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েছিলেন। সেজন্য পাকিস্তানের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও আনুগত্যের সীমা ছিল না।

আর তাঁরা যেন মনে করতেন,—পাকিস্তান মানে হলো পশ্চিম পাকিস্তান। তাঁদের দেশ পূর্ব বাংলা একটা উপপাকিস্তান অথবা মূল পাকিস্তানের লেজুড মাত্র। সেজন্য তাঁদের কাছে কায়েদে আজম, লিয়াকত আলী খান এবং পাকিস্তানের অবাঙালি রথী-মহারথীরা প্রতিভাত হতেন ‘মহান’ হিসেবে। পশ্চিম পাকিস্তানি দিগন্তের পাতা পঠন-পাঠনের পর তাই-ই মনে হয়। সদর্থক ভূমিকায় দেখতে গেলে বাংলা রচনা বহু তাঁরা মুদ্রিত করেছেন, বাংলাভাষা ও সাহিত্যচর্চার একটি ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন—এটাই বড় কথা।

যাইহোক, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে যে ‘দিগন্ত’ প্রকাশিত হতো—তাতে জিন্নুর রহমান সিদ্দিকী, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান প্রমুখের ন্যায় তরুণ কবি সাহিত্যিকেরা বেশ লিখেছিলেন। ইবরাহীম খাঁদের মতো প্রবীণেরাও লিখেছেন। পত্রিকার সার্কুলেশন কম ছিল না। তার খ্যাতি সিলেট পৌছাবার কথাই। কিন্তু তারপরও সিলেটের মৌলভীবাজার থেকে কেনো আবার ‘দিগন্ত’ নামে পত্রিকা বের হলো বুঝা মুশকিল। তবে করাচী থেকে বেগম এম. ই. খান কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত দিগন্ত তখন (১৯৬৬) চালু ছিল না। আর পূর্ব বঙ্গের একটি প্রান্ত হিসেবে সিলেটের মৌলভী বাজার থেকে ‘দিগন্ত’ নাম দিয়ে পত্রিকা প্রকাশের জন্য এই নামকরণের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ছিল বুঝিবা এই যে, দিগন্তবাসীরাও পাকিস্তানে নিশ্চুপ হয়ে বসে নেই। তাঁরাও সাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চার মাধ্যমে দেশের ও দশের খেদমত করতে চান। তাই তাঁদের আন্তরিকতার মূল্য আছে। আর একটি ঐতিহাসিকতাও এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে আছে—সেজন্যই পাকিস্তান আমলের বাংলা সাহিত্যপত্রিকার আলোচনাকালে ‘দিগন্ত’র উল্লেখ প্রাসঙ্গিকতার দাবী করতে পারে। সিলেটের দিগন্তকর্তৃপক্ষের বা ঐদের লেখক-শুভানুধ্যায়ীদের দাবী ছিল যে মৌলভীবাজার থেকে সাহিত্যপত্রিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে এটাই তাঁদের প্রথম পদক্ষেপ।

মৌলভী বাজার শহর, তথা মহকুমা হইতে আজ পর্যন্ত কোনো সাহিত্য পত্রিকা বাহির হয় নাই।... (তবে) প্রায় বৎসর ত্রিশেক পূর্বে মৌলভীবাজার শহর হতেই মৌলভীবাজারবাসী দ্বিজেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত মহাশয় 'অভিযান' নামে (১৯৩৫ হবে, কারণ ১৯৬৫ সনে বলা হচ্ছে ত্রিশ বৎসর পূর্বে) একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত করেন। উহা বেশ কয়েক বৎসর চলিয়াছিল। কিছু কিছু সাহিত্য বিষয়ে আলোচনাও অভিযানে থাকিত। বিশেষত শারদীয় সংখ্যাগুলি সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ, গল্প ও কবিতায় ভরপুর থাকিত।... অতপর আর কোন সাহিত্যিক প্রচেষ্টা হয় নাই—তবে কুলাউড়া হইতে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা কিছুদিনের জন্য প্রকাশিত হয়—কিন্তু তাহার আয়ুও ক্ষীণ ছিল। পাঁচ বৎসর পূর্বে (১৯৬০?) মৌলভীবাজার শহরে সাপ্তাহিক 'অগ্রদূতের' আবির্ভাব হয়—এই পত্রিকায় সাহিত্যবিষয়ক অনেক প্রবন্ধ, গল্প ও কবিতা প্রকাশিত হয়।... বর্তমানে বন্ধ হইয়া গিয়াছে।... তরুণগণ আজ যে বাষিকী (মৌলভী বাজার থেকে দিগন্ত) প্রকাশের চেষ্টা করিতেছেন—তাঁহাদের সে চেষ্টা সফল হউক।<sup>২</sup>

'দিগন্ত'র দাবী বা উপর্যুক্ত বক্তব্য যথার্থ নয়। মহকুমা পর্যায় থেকেই কেবল নয়, নাটোরের গুরুদাসপুর থানার মত একটি মফস্বল এলাকা থেকেও (বাষিকী হলেও) সাহিত্যপত্রিকা নিয়মিত একদশক বা যুগেরও অধিক কাল ধরে প্রকাশিত হয়েছে। যাই হোক, মৌলভীবাজার, নাটোর, দিনাজপুর, বগুড়া প্রভৃতি অঞ্চল থেকে ব্যক্তিগত বা বেসরকারি উদ্যোগের অসংখ্য সাময়িক-সাহিত্য যে প্রকাশের প্রবণতা সৃষ্টি হয়েছিল—তার মূলে ছিল একটি নতুন দেশ, বা রাষ্ট্র পাওয়ার আনন্দানুভূতি।

দিগন্তে একান্তরে শহীদ, শহীদুল্লাহ কায়সার (১৯২৭-৭১) আশীর্বাণী পাঠিয়েছিলেন।  
০৩. ০২. ১৯৬৬ তারিখে স্বাক্ষরিত বাণীতে তিনি লেখেন :

দিগন্তে আজ নতুন দিগন্তের হাতছানি ; অনেক তারার মেলা। তার সাথে যোগ দিল আর একটি তারা 'দিগন্ত'। দিগন্ত তাই ছুটে চলুক নতুন সূর্যের পানে।

দিগন্তের সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছিল :

মানব সভ্যতার ধারক এবং বাহক হচ্ছে তার সংস্কৃতি, আর তা হচ্ছে মানুষের বিভিন্নমুখী চিন্তাধারা, আচারআচরণ ও বিশ্বাসেরই প্রতিফলন। শুধু তাই নয়, সংস্কৃতি দেশীয় এবং জাতীয় চিন্তাধারার অভিব্যক্তিও বটে। এই মতে আস্থাবান থেকেই এই ক্ষুদ্র সাহিত্য-সংকলনটি প্রকাশ করতে প্রয়াস পেয়েছি।... দিগন্তের নিয়মিত প্রকাশনার জন্য 'তরুণ সংঘ' নামক একটি সাংস্কৃতিক সংস্থা গঠন করা হয়েছে। দেশবাসীর কাছ থেকে সর্ব প্রকার সাহায্য পাবো বলেই দৃঢ় বিশ্বাস, বছর বছর যথাকালে এ পত্রিকা প্রকাশের দায়িত্ব এতদঞ্চলের গুণীজ্ঞানীদের এবং বিশেষ করে তরুণসম্প্রদায়েরই। আশা করি তাঁরা তাঁদের ভবিষ্যত দায়িত্ব নিয়মিত এবং যথাযথভাবেই পালন করে যাবেন। আমাদের এ প্রচেষ্টার ফলে এ দেশের স্থানীয় সাহিত্যিকগণ এবং অন্যান্যরা যদি কিছুমাত্র লাভবান হন, তবেই আমাদের শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো।

পত্রিকাটি প্রকাশের নেপথ্যে সাহায্য করেছিলেন একজন বিশিষ্ট স্কুল-শিক্ষক আবদুল ওয়াহাব চৌধুরী এবং প্রখ্যাত কবি দিলওয়ার। দিলওয়ার 'দিগন্তবাণী' শিরোনামে একটি কবিতাও লিখেছিলেন :

দূর দিগন্ত কোন্ কথ্য কয় শোনো

সুদূর প্রসারী মনের চিবুক ছুঁয়ে

হে সাথী, তোমরা রশ্মির জ্বল বোনো, ধূসর বেদনা উষর মরুতে খুঁয়ে।

দিগন্তে আনে হৃদয়ের বিস্তার :

ভোবা চেতনায় ছড়ায় সিন্ধুসাধ ; চলে বৃষ্টি তাই সি-গাল এর অভিসার,  
যোচে সীমালীন প্রজ্ঞার অপবাদ।<sup>৩</sup>

পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন আবদুল কাদির মাহমুদ। সহ-সম্পাদক ছিলেন নজরুল ইসলাম। উপদেষ্টা পরিষদে ছিলেন : সৈয়দ মোস্তফা আলী (অবৈতনিক হাকিম) ; আবদুল ওয়াহাব চৌধুরী বি.এ. বিটি ; শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ অর্জুন (শিক্ষক) ; বোরহানউদ্দীন খান (কার্যকরী সম্পাদক মৌলভীবাজার পাবলিক লাইব্রেরী) ; বিভাগীয় সম্পাদনা পরিষদ ; এন আই আজিজুল হক ইকবাল (গল্প) ; সৈয়দ এ. কে. রিয়াজুদ্দীন আলী (প্রবন্ধ) ; এস. এম. জামান ; গাজী গোলাম সরওয়ার হাদি (কবিতা) ; দেওয়ান সুয়েল আফজাল, সৈয়দ নেছার আহমদ ও সফিকুল হক (চৌধুরী বিবিধ) প্রমুখ। দিগন্ত সুরমা প্রিন্টার্স, জিন্দাবাজার, সিলেট থেকে মুদ্রিত হতো। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৬। মূল্য এবং প্রচ্ছদ শিল্পীর নামোল্লেখ নেই। পত্রিকাটি কতোদিন বেরিয়েছিল অনুসন্ধানে জানা যায়নি।

### তথ্যপঞ্জি

১. সম্পাদকীয়, দিগন্ত, বার্ষিকী, ১৯৬৬ মৌলভী বাজার।
২. সৈয়দ মোস্তফা আলী, মৌলভী বাজারের সাহিত্যপত্রিকা, পূর্বোক্ত।
৩. দিলওয়ার, দিগন্তবাণী (কবিতা), পূর্বোক্ত।

## ৬. অভিযান

(১৯৫৪-৬৪)

তৎকালীন নাটোর মহাকুমার অন্তর্গত গুরুদাসপুর থানা থেকে নিয়মিত প্রায় একযুগ ধরে প্রকাশিত হয়েছিল বার্ষিক 'অভিযান'। পত্রিকাটির সাহিত্যকৌশলিক স্টাণ্ডার্ড খুব উন্নত না-হলেও উদ্যোগের বলিষ্ঠতা এবং আন্তরিকতার মহানুভবতায় এটির মূল্য যেমন আছে, তেমনি একটি সামাজিক ও ঐতিহাসিক মূল্যগুরুত্ব আছে। কারণ থানা থেকে প্রকাশিত পত্রিকার নমুনা ঐকালে পাওয়া ভার। সামাজিক দিক থেকে এঁরা সরকারি প্রশ্রয়পুষ্ট ছিলেন বলে প্রগতিশীল ব্যতিক্রমী চিন্তাধারার পরিচয় এতে পাওয়া যাবে না। কারণ তাঁরা নিজেরাই বলেছেন : গুরুদাসপুর থানা শিক্ষা-সংঘ 'রাজনীতির সহিত সম্পর্ক বিহীন একটি শিক্ষা, কৃষ্টি ও সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠান।'

সরকারের কর্মকর্তাদের আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ধ্যান-ধারণা তথা ইসলামি প্রজাতন্ত্রের মুসলিমতমদ্বন্দ্ব প্রচারের ব্রত নিয়ে এটি সংগঠিত হয়। তাঁদের ঘোষণা ছিল :

এলাকার শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ, যুবক, ছাত্র ও বিদ্যোৎসাহী সমাজকর্মীদের সমবায়ে ১৯৫৪ সনের ২৮ মে এই সংঘ (গুরুদাসপুর থানা শিক্ষা সংঘ) গঠিত হয়। বর্তমানে রাজশাহী পাবনা চলনবিল এলাকার বিভিন্ন থানার অনেকেই এই সংঘের সদস্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। হিন্দু-মুসলিম জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে যে কোন স্থানের যে কোন ব্যক্তি এই সংঘের সদস্য হইতে পারেন।

উপর্যুক্ত সংঘের মুখপত্ররূপে 'অভিযানের' প্রথম বার্ষিক সংকলন প্রকাশিত হয় ১৯৫৪ সনে। পত্রিকার 'পরিচিতি'তে বলা হয় :

অভিযান...সংঘের বার্ষিক পত্রিকা।...সংঘের সদস্য, পৃষ্ঠপোষক, হিতাকাঙ্ক্ষী ও অভিযাত্রীর শিবিরের ভাইবোনদের লেখা অভিযানে গৃহীত হয়।...সমাজসেবার মহানব্রত নিয়ে অভিযানের পদক্ষেপ। দেশের অশিক্ষা, কুশিক্ষা, অজ্ঞতা, দারিদ্র্য ; দুর্নীতি প্রভৃতি বিদূরিত করিয়া কালিমামুক্ত আদর্শসমাজব্যবস্থা প্রবর্তন করাই অভিযানের উদ্দেশ্য। অভিযান বিক্রয়-লব্ধ অর্থদ্বারা অভাবগ্রস্ত ছাত্রদের সাহায্য তহবিলই পুষ্ট হয়।...এতদ্ব্যতীত নেশাবিদ্যালয়, দাতব্যচিকিৎসালয়, পাঠাগার পরিচালনা এবং অন্যান্য সমাজসেবামূলক কাজে সংঘ সাধ্যমত চেষ্টিত আছে। সংঘের কাজে মুগ্ধ হইয়াই দেশ-বিদেশের অনেক মহাপ্রাণবিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি স্বেচ্ছায় অনেক সাহায্য করিয়াছেন।

অভিযানের সম্পাদক ছিলেন মোঃ আকবর হোসেন বিএ ; এম. আর পোদ্দার কর্তৃক মুদ্রিত হতো নাটোর টাউন প্রেস রাজশাহী থেকে। প্রকাশক : এম. এ. হামিদ। মূল্য ১ টাকা। অভিযানের শীর্ষে লেখা ছিল 'পাকিস্তানে নবযুগ প্রবর্তনে'। অভিযানের লেখকসূচিতে তাই বলে ভালো ভালো লেখকদের নামও দেখা যায়। বিষয়বস্তু ও চিন্তাধারায় সমাজের সমকালীন চাহিদা ও আশা-আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছে। মুফাখ্খারুল ইসলাম, আ.ক.শ. নূর মোহাম্মদ, আবু হেনা মোস্তফা কামাল, আখতার উল আলম, ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, গোলাম সাকলায়েন, সৈয়দ মোর্তজা আলী প্রমুখ লেখকদের রচনাও এতে থাকতো।

সংক্ষেপে অভিযানের ওপর মন্তব্য হলো—পরিচ্ছন্ন ছাপায় উত্তরবঙ্গের ঐ এলাকায় কিশোর, তরুণ, শিক্ষা ও সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতি-অনুরাগীদের রচনায় সাদা কাগজে, প্রায় দেড়শ পৃষ্ঠার আকারে অভিযান প্রতিবছর প্রকাশিত হয়ে দীর্ঘ ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছিল। আজও তুলনামূলকভাবে উন্নত সমাজব্যবস্থায় বাংলাদেশের কোন অঞ্চল বা প্রতিষ্ঠান থেকে দীর্ঘ একদশক বা যুগব্যাপী একটি সাহিত্য পত্রিকার প্রকাশের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা যেখানে কষ্টকর এবং অনেক সময়ই অসম্ভব হয়ে দেখা দেয়—সেখানে ৫০ বৎসর পূর্বে গুরুদাসপুর এর ন্যায় একটি অজপাড়ারগাঁ থেকে যে তা সম্ভব করে তুলেছিলেন কতিপয় সংস্কৃতিপ্রেমী—পাকিস্তানবাদী ধ্যানধারণার অনুকূলে চিন্তা করলেও তার অসাধারণ মূল্য আছে।

### তথ্যপঞ্জি

১. সম্পাদকীয়, বার্ষিক অভিযান (গুরুদাসপুর, নাটোর)।

## চতুর্থ অধ্যায় মানবতাবাদী ও বাঙালি জাতীয়তাবাদী ধারার সাহিত্যপত্রিকা

### প্রস্তাবনা

বিশ ও ত্রিশের দশকে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্যপত্রিকা (১৯১৮) ; সওগাত (১৯১৮) ; ধুমকেতু (১৯২২) ; সাম্যবাদী (১৯২৩) ; শিখা (১৯২৭) ; নওরোজ (১৯২৭) ; জাগরণ (১৯২৮) ; সঞ্চয় (১৯২৮) ; মোয়জ্জিন (১৯২৮) ; জয়তী (১৯৩০) ; বুলবুল (১৯৩৩) প্রভৃতি মুসলিম সম্পাদিত ও প্রকাশিত সাহিত্যপত্রিকা প্রগতিশীল মানবতাবাদী ধারার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখলেও ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে স্বাতন্ত্র্যবাদী, পাকিস্তানি আদর্শে বিশ্বাসী, ইসলামী পুনর্জাগরণবাদী ধারাই প্রবল হয়ে ওঠে এবং এমনকি সওগাত ও অন্যান্য প্রগতিশীল পত্রপত্রিকার লেখকেরা পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত তো বটেই, ষাটের দশকেও বলা চলে, পাকিস্তানী আদর্শে বিশ্বাসী মনোভাবের পৃষ্ঠপোষকতা করে আসছিলেন। তবু এই মানবতাবাদী ধারাটি কখনই একেবারে শূন্য হয়ে যায়নি।

প্রগতিবাদের প্রতি অনুরাগী কতিপয় সাহিত্যপত্রিকা ১৯৪৭ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত সময়ে মাঝে মাঝে আবির্ভূত হয়ে দুচার পাঁচ সংখ্যা কিংবা কখনও দুচার বছর অনিয়মিতভাবে বেরিয়েই বন্ধ হয়ে গিয়েছে বটে, কিন্তু তাতে অসাম্প্রদায়িক মানবতাবাদিতার প্রতি সহানুভূতিশীল বা উদারপন্থী চিন্তাধারার পরিচয় দুর্লভ নয়। (পঞ্চম অধ্যায়ে এসকল পত্রিকার পরিচয় আছে)। তবে ইসলামী পুনর্জাগরণবাদী, পাকিস্তানী আদর্শে বিশ্বাসী মাহেনও মোহাম্মদীর সঙ্গে একগোত্র্যে বিবেচনা করা চলে না, আবার মার্কসবাদ বা সমাজতন্ত্রের উগ্র প্রবর্তক কিংবা সমর্থকও নয়,

পঞ্চাশের পাকিস্তানকে অস্বীকার না করে জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিক আকৃতি নিয়ে যে কতিপয় পত্রিকা সাতচল্লিশের পরে পূর্ববাঙলা থেকে প্রকাশিত হয়েছে,—সেগুলোর সংখ্যা খুব বেশি নয়। পাকিস্তান আমলে বাংলাভাষায় প্রকাশিত সাহিত্য কিংবা সাহিত্যবিষয়ক পত্রপত্রিকা যতো বেরিয়েছিল—তার মধ্যে এগুলোর সংখ্যানুপাত নগণ্য। প্রকাশের সময়ও প্রায় ষাটের দশক ; সাতচল্লিশ থেকে ‘ইমরোজ’ এবং নবপর্যায়ে ‘সওগাত’ ছাড়া সাতাল্লিশ সনে ‘সমকাল’ প্রকাশের আগে পর্যন্ত বাঙালি জাতীয়তাবাদী ধারার পত্রিকার সংখ্যা এতই কম ছিল যে ‘সমকাল’ ‘পূর্বমেঘ’ পূর্বালী, প্রকাশিত না—হলে এই ধারার পত্রিকার তেমন গুরুত্ব স্বীকার না করলেও চলতো।

সমকালের আগে প্রকাশিত পঞ্চম অধ্যায়ের আলোচ্য কতিপয় পত্রিকা—সীমান্ত, কৃষ্টি, সংকেত, অগত্যা, মুক্তি, পরিচিতি, যাত্রিক, স্পন্দন এবং অন্ন চাই আলো চাই, দিশারী, প্রাচী, মেঘনা ইত্যাদি ছাড়া মানবতাবাদী ও বাঙালি জাতীয়তাবাদী ধারার কোনো উল্লেখযোগ্য পত্রিকা নেই। ‘মার্কসীয় মতবাদ প্রভাবিত কতিপয় সাহিত্যপত্রিকা’ যদি আলাদাভাবে আলোচনা না—করা হতো, তাহলে সমকাল পর্যন্ত এই ধারাটি গড়ে উঠতো কৃষ্টি-সীমান্ত-সংকেত-অগত্যা-অন্ন চাই আলো চাই-দিশারী-মুক্তি-ইমরোজ পরিচিতি সওগাত যাত্রিক স্পন্দন মেঘনা প্রাচী ইত্যাদি পত্রিকা নিয়ে।

সমকাল বের হবার পরে এর প্রভাবে কতিপয় সাহিত্যপত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল এবং তারা সমকালকে অনুকরণ অনুসরণ করতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। এই সকল পত্রিকার মধ্যে উল্লেখ্য উত্তরণ পূর্বানী পূর্বমেঘ কণ্ঠস্বর পলিমাটি নাগরিক সাহিত্য যাত্রী সুন্দরম স্বাক্ষর স্বদেশ পূর্বলেখ মেঘনা; এবং বিবর্তন পরিচয় বর্তমান বিচিত্রিতা বনানী সুনিকেত মল্লার একান্ত ছোটগল্প সুরভি কিছুধ্বনি পূর্বাশা সাম্প্রতিক বালার্ক ইত্যাদি।

কিন্তু একটু উচ্চগ্রামে মার্কসীয় মতবাদী ধ্যান-ধারণা রয়েছে, এমন পত্রিকাগুলোকে আলাদা করে নেয়ার ফলে পূর্ববঙ্গের সাহিত্যপত্রিকার মধ্যে মানবতাবাদী ও বাঙালি জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার প্রচারকদল গঠিত হয়েছে ইমরোজ, সওগাত, সমকাল, পূর্বানী, পূর্বমেঘ, পরিক্রম, কণ্ঠস্বর এবং অন্নচাই আলোচাই, দিশারী, প্রাচী, পরিচিতি, বিবর্তন, পরিচয়, বই বিচিত্রা, যুববাণী, বর্তমান, বিচিত্রিতা, গণমন, সৈকত, মৌসুম, বর্ণালী, বই, বনানী, সুনিকেত মল্লার, একান্ত, ছোটগল্প, সুরভি, কিছুধ্বনি, পূর্বাশা, সাম্প্রতিক, বালার্ক প্রভৃতি পত্রিকা নিয়ে।

এগুলোর কোনোটা খুবই সাধারণ আবার এগুলোর বাইরেও কিঞ্চিৎ মূল্যের সাহিত্যপত্রিকাও হয়ত কিছু আছে এবং সেগুলো মানবতাবাদ বা বাঙালি জাতীয়তাবাদ উভয়ই সমান গুরুত্ব অথবা কোনটার প্রতি বেশি বা কম মনোযোগ দিয়ে হয়তো রচনা প্রকাশ করেছে।

কিন্তু প্রধান পত্রিকা সওগাত, ইমরোজ, সমকাল, পূর্বানী, পূর্বমেঘ, পরিক্রম, কণ্ঠস্বর-ই। এর বাইরে আর যেসকল সাহিত্যপত্রিকাকে সমকালের ধারায় ফেলা চলে তার মধ্যেও যেগুলো প্রধান এবং কিছুটাও অন্তত স্থায়ী মূল্য লাভ করেছিলো—সেগুলোকেও ‘এ ধারার কতিপয় অপ্রধান পত্রিকা’ এবং ‘এ ধারার কিছু পত্রিকাপ্রয়াস’ শিরোনামের উপ-অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

‘অপ্রধান পত্রিকার মধ্যে বিবেচনা করা হয়েছে মেঘনা (১৯৫৭); সাহিত্য (১৯৬০-৬৩); যাত্রী (১৯৬০-৬২); সুন্দরম (১৯৬৩); স্বাক্ষর (১৯৬৩-৬৬); স্বদেশ (১৯৬৩-৭০); পূর্বলেখ (১৯৬৬-৬৭); এবং মেঘনা (চট্টগ্রাম ১৯৬৭-৭০)কে।

‘এ ধারার কিছু পত্রিকাপ্রয়াস-এর মধ্যে বিবেচনা করা হয়েছে অন্নচাই আলোচাই (১৯৪৯); দিশারী (১৯৫০); প্রাচী (১৯৫৭); পরিচিতি (১৯৫৯); বিবর্তন (১৯৬০); পরিচয় (১৯৬০); বইবিচিত্রা (১৯৬০); যুববাণী (১৯৬০); বর্তমান (১৯৬২); বিচিত্রিতা (১৯৬২); গণমন (১৯৬৩); সৈকত (১৯৬৩); সাম্প্রতিক (১৯৬৩-৭০); মৌসুম (১৯৬৪); বর্ণালী (১৯৬৪); বই (১৯৬৫); বনানী (১৯৬৬-৬৯); সুনিকেত মল্লার (১৯৬৭-৭০); একান্ত (১৯৬৭); ছোটগল্প (১৯৬৭-৬৮); সুরভি (১৯৬৮); কিছুধ্বনি (১৯৭০); পূর্বাশা (১৯৭০) এবং বালার্ক (১৯৭০) ইত্যাদি।

বলা আবশ্যিক যে, সওগাত ১৯৪৭-৭১ পর্বের যেকালে (১৯৫২) ঢাকা থেকে পুনরায় প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে, সেই হিসেবে ‘ইমরোজ’ (১৯৪৯-৫৪)কে প্রথমে উল্লেখ করার দরকার হয়। কিন্তু সওগাতের শিকড় প্রোথিত ইতিহাসের গভীরে। ১৯১৮ সনে এর প্রকাশনার যাত্রারম্ভ—সেই বিবেচনায় মোহাম্মদীর ন্যায় ঐতিহ্যবাহী সওগাতকে তার ধারার প্রথম পত্রিকা হিসেবে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

আল-ইসলাহ, মাহেনও, দিলকুবার হিসাব অন্যভাবে করলেও মোহাম্মদীর ক্রমিক অন্যরকম (৭) হতো। কিন্তু প্রথম প্রকাশের কাল ধরে তৃতীয় অধ্যায়েও মোহাম্মদী ও আল-ইসলাহর স্থান পূর্ববাঙলা থেকে সাতচল্লিশের পরে প্রকাশের বিবেচনায় ঐ ধারায় মাহেনও এবং এই ধারায় ইমরোজ প্রথম হয়।

‘মানবতাবাদী ও বাঙালি জাতীয়তাবাদী ধারার প্রধান পত্রিকা সওগাত (১৯১৮-৮০); ইমরোজ (১৯৪৯-৫৪); সমকাল (১৯৫৭-৭৭); পূর্বানী (১৯৬০-৬৭); পূর্বমেঘ (১৯৬০-৭০); পরিক্রম (১৯৩২-৭০); এবং কণ্ঠস্বর (১৯৬৫-৮৬)—এগুলোই তাই প্রথমে আলোচনার জন্য বেছে নেয়া হয়েছে।



## ১. সওগাত (১৯১৮-৮০)

### ভূমিকা

ক. ১৯১৮, ১৩২৫ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে মুসলিম বাঙলার প্রগতিশীল ধারার সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যপত্রিকা সওগাত আত্মপ্রকাশ করেছিল যখন ; তখনকার মুসলিম সমাজকে এক কথায় অধপতিত বলা চলে। সেই সমাজকে আলোর মুখ, মুক্তির দিশা দেখাবার সামাজিক দায়িত্ববোধ থেকেই সওগাত বের হয়েছিল এবং সফল হয়েছিল। সমাজ, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের অগ্রগতিতে সওগাতের সাধনা সকল মহলই একবাক্যে উচ্চমূল্যে স্বীকার করে থাকেন।

কিন্তু মোহাম্মদীর ন্যায় সওগাতের স্বাধীনতা-পরবর্তীকালের (সাতচল্লিশ পরবর্তী) ভূমিকাও প্রথম অধ্যায়ের তুলনায় হীন। মুসলিম সমাজে যখন 'আধুনিক' ভাবনা-চিন্তার নিত্য অভাব, তখন এই পত্রিকাই ছিল সর্বাধুনিক সাহিত্য সংস্কৃতি ও সমাজ-ভাবনার প্রধান অবলম্বন। সওগাত এর সার্বিক ভূমিকা সংক্ষেপে তাই 'বিপ্লবী' ছিল এবং 'শিখার' অনুপ্রেরক সওগাতের সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীনও (১৮৮৯-১৯৯৪) 'শিখা' বা 'মুসলিম সাহিত্যসমাজ' এর কর্তাব্যক্তির ন্যায় 'সওগাত' বের করার ফলে শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন।

সাহিত্য সংস্কৃতি ও সমাজের রক্ষণশীল গৌড়াদের প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন যে সওগাতকে হতে হয়েছিল, সে কাহিনী আজ ইতিহাসের অন্তর্গত।

নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে ১৩৫৯ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে পঁয়ত্রিশতম বর্ষ প্রথম সংখ্যা প্রকাশের পূর্বে নানা কারণে সওগাতের প্রকাশনা স্থগিত থেকেছে কিংবা অনিয়মিত হয়েছে। ১৯১৮ সনে সওগাত বের হলেও প্রকৃত যাত্রারস্ত তার ১৯২৬ সন থেকে। নভেম্বর ১৯৪৯ বা অগ্রহায়ণ ১৩৫৬ পর্যন্ত মোটামুটিভাবে ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রেখে এর প্রকাশনা অব্যাহত থাকে। অগ্রহায়ণ ১৩৫৬ তে ৩৩ বর্ষ ১ম সংখ্যা কলকাতা থেকেই বের হয়। এরপর পত্রিকাসহ সওগাত-এর মালিক সম্পাদক-প্রকাশক-মুদ্রক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন ঢাকায় স্থানান্তরিত হন। হাসান হাফিজুর রহমানের প্রেরণায় সওগাত ঢাকা থেকে পুনরায় প্রকাশিত হয়। কিন্তু এবারও পূর্ব বাঙলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে সওগাত-সম্পাদক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল ১৯৫২ সনে ঢাকার প্রগতিশীল লেখকদের সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন 'পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ' গঠন। এই সংগঠনটি প্রকৃত প্রস্তাবে নাসিরউদ্দীন সাহেবের আনুকূল্যে কাজ করার প্রাথমিক পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলো। মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন লিখেছেন :

দেশ বিভাগের পর ১৯৫০ সালে যে মাসে সওগাত কার্যালয় ও সওগাত প্রেস কলকাতা থেকে ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। এখানে এসে তিনি এক সমস্যাসংকুল পরিস্থিতির সম্মুখীন হন। ...বাংলা হরফ আর চলাবে না...একপ অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে সওগাত আর বের করবেন কিনা তিনি ভাবছিলেন, ...সে-সময়ে পূর্ব পাকিস্তানে 'কোনো সক্রিয় সাহিত্য প্রতিষ্ঠান ছিল না।'

এমন দুর্দিনে ১৯৫৩ সালের গোড়ার দিকে হাসান হাফিজুর রহমান কয়েকজন তরুণসহ ৬৬ নং লম্বাল স্ট্রীটস্থ সওগাত কার্যালয়ে মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে 'সওগাত সাহিত্য মজলিস' এর অনুরূপ প্রতিষ্ঠান গড়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অনুরোধ জানান। সওগাত কার্যালয়-সংলগ্ন একটি প্রশস্ত ঘর ও সম্মুখে খোলা জায়গা ছিল। ওখানেই... তাদের নবপ্রতিষ্ঠিত 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ' এর কাজ আরম্ভ হলো।

হাসান হাফিজুর রহমানের প্রস্তাবে কলকাতার সওগাতের ভূমিকার পুনরুজ্জীবনে আনন্দিত হয়ে তাঁরই 'পূর্ণসহযোগিতায় নাসিরউদ্দীন পুনরায় শুরু করেন সওগাতের প্রকাশনা। 'হাসান হাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে ঢাকার কবি-সাহিত্যিক, সাংবাদিক দলে দলে এসে ভীড় জমালেন... তরুণদের উৎসাহ উদ্যম দেখে আমি বিস্মিত হয়েছিলাম। সাহিত্যিক ও সাহিত্যসৃষ্টির যে আনন্দ আমাকে সারাজীবন অভিজ্ঞ করে রেখেছে, বৃদ্ধ বয়সে আবার তা করার সৌভাগ্য হলো এদের সংস্পর্শ লাভ করে।

এখানে হাসান নিজে লিখেছেন এবং কবি সাহিত্যিকদের ধরে ধরে লিখিয়েছেন। ফলে অতিক্রম সৃষ্টি হয়েছিল এক প্রগতিশীল ও শক্তিশালী সাহিত্যিক গোষ্ঠীর। হাসানের সহযোগিতায় ক্রমান্বয়ে কয়েক বছর সওগাত বের হয়েছিল। যে লেখক গোষ্ঠীকে তিনি সংঘবদ্ধ করেছিলেন তাদের মধ্যে অনেকেই কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক বা সংস্কৃতিসেবীরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন।

### হাসান হাফিজুর রহমান লিখেছেন :

আমরা ধুমকেতুর মত তেজে প্রখর, কিন্তু নিরাবলম্ব। ঠাই ছিল না, তাই আমরা সংগঠিত ছিলাম না। অসংগঠিত আমরা প্রবল উত্তেজনায় অস্থির... কিন্তু সংহত নই বলে শক্তি ও তাৎপর্যকে অপরের অনুভবে তীব্র করে তুলতে পারছিলাম না। সেই সময় 'প্রগতি লেখক সংঘ' ভেঙে গেছে। তরুণ সাহিত্যিকদের নতুন চেতনা নতুন বক্তব্যের সংগঠিত মাধ্যমের খোঁজে আমরা ছটফট করছি। সময়টা ১৯৫২ ভাষা আন্দোলনের তুলু মুহূর্ত। সেই সময়ে (ইউনিভার্সিটির ছাত্র) আমি হঠাৎ সওগাত প্রকাশনালয়ের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ি। (আগে তিনি সওগাতে গল্প-কবিতা দু'একটি লিখেছেন)... সওগাতে আসার বসার জায়গা মিললো... সেই সুযোগে তরুণ সাহিত্যিকমীদের ভীড় জমতে লাগলো সওগাতকে কেন্দ্র করে; আমরা কতিপয় ক্ষুধার্ত সাহিত্যিক নাসিরউদ্দীন সাহেবের আতিথেয়তার উপর অনবরতই হামলা করতে শুরু করলাম। সওগাতে তরুণদের যাতায়াত নিয়মিত হয়ে উঠল। ভিড়ও বাড়তে লাগলো। ... নাসিরউদ্দীন সাহেবকে কেন্দ্র করে প্রগতিশীল সাহিত্যিকেরা সওগাতের প্লাটফর্ম একত্র হয়েছিল। এটা বড় কথা। নাসিরউদ্দীন সাহেবের সঙ্গে আমাদের এই যোগাযোগ প্রগতিশীল সাহিত্য আন্দোলনের এক স্বর্ণপ্রস্থ ভবিষ্যতের দ্বার খুলে দিল। আমরা 'পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ' গড়ে তুললাম সেই ১৯৫২ সনেই। প্রগতিশীল সাহিত্যিকদের প্রথম সংগঠন নাসিরউদ্দীন সাহেবের পৃষ্ঠপোষকতায় সংগঠিত হলো। (তাঁর) কাছে এদেশের সাহিত্য সংস্কৃতির ইতিহাস অশেষ ঋণী। ... পাকিস্তানের আগেও যেমন, তেমন পাকিস্তানের পরেও, সওগাতই এই দেশের প্রথম প্রগতিশীল সাহিত্য সংস্কৃতির মুখপত্র হয়ে উঠেছিল।

ঢাকা থেকে প্রকাশিত সওগাতের 'সাময়িকী' বিভাগে সম্পাদকীয় ঘোষণায় বলা হয় :

সওগাত তার জীবনের সুদীর্ঘ সময় কলিকাতায় কাটাইয়া আজ আল্লাহর অসীম অনুগ্রহে পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী হইতে নবপর্যায়ে আত্মপ্রকাশ করিল। কোনো নতুন সাময়িকপত্র বাহির করিতে হইলে তার লক্ষ্য, নীতি ও আদর্শ প্রথম হইতেই পাঠক-সমাজকে জানাইয়া দেওয়ার রেওয়াজ আছে। কিন্তু সওগাতের ন্যায় একখানি পুরাতন পত্রিকা পুনঃপ্রকাশের বেলায় তার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না, কেননা এর দীর্ঘ জীবনের মত ও পথের পরিচয় বাংলা সাহিত্য্যামোদী পাঠকসমাজে সুপরিষ্কার। তথাপি অপেক্ষাকৃত নবীন পাঠকদের জন্য আমরা সংক্ষেপে এইটুকু বলিয়া রাখি যে, ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য, রাজনীতি ও চিন্তা-চর্চার ক্ষেত্রে 'সওগাত' চিরদিনই গৌড়াঙ্গী ও সংকীর্ণতার উর্ধে থাকিয়া উদার মত ও পথের অনুসরণ করিয়া আসিয়াছে এবং আল্লাহর ইচ্ছা হইলে এখনও তাহাই করিতে থাকিবে।

বস্তুত আমাদের বিশ্বাস, নিযুক্ত চিন্তা ও উদার মানবতার পরমাশ্রয় ত্যাগ করিয়া কোনো প্রকৃত সাহিত্যধর্মী সৃষ্টি সম্ভব নয়। গর্ব না করিয়া অতীতের পানে চাহিয়া আমরা কিছুটা তৃপ্তির সহিত স্মরণ করিতে পারি যে, বাংলাভাষী মুসলিম সাহিত্যিক ও সাহিত্য্যমোদী সমাজে আজ যতোটুকু মুক্ত বুদ্ধি ও উদার চিন্তা প্রসার লাভ করিয়াছে, তার জন্য কৃতিত্বের একটা বড়ো অংশ সওগাতের প্রাপ্য।

আমরা আশা করি, উদারপন্থীদের মধ্যে আজ যাহারা অপেক্ষাকৃত প্রবীণ কবি ও সাহিত্যিকের স্তরে উন্নীত হইয়া সকলের শ্রদ্ধা পাইতেছেন, তাঁহাদের অধিকংশই একথা স্বীকার করিবেন যে, তাঁহারা যেমন সওগাতকে শক্তি ও সম্পদ দান করিয়াছেন, তেমনি সওগাতও অকুতোভয়ে ঝঞ্ঝার প্রচণ্ড তাণ্ডব সহিয়াও তাঁহাদের জন্য একটা নিশ্চিত নীড় রচনা করিয়াছেন; তাঁহাদের মুক্তকণ্ঠের কল-কাকলী শুদ্ধ হইতে দেয় নাই। এর বেশি গৌরব আমরা দাবি করিনা এবং কেহ এইটুকু সন্দেহ না হইতে আমাদের বঞ্চিত করিতে চাহিলে তাঁহার সে অধিকারও আমরা স্বীকার করি না।

আরও বলা হয় :

দেশ ও সমাজের খেদমৎ এক সুকঠিন ব্রত। উপরে আল্লাহর করুণা এবং নিম্নে আল্লাহর দরদী বান্দাদের সাহায্য-সহানুভূতি অনুক্ষণ 'আশা করিয়া' এই কঠোর ব্রত উদ্যাপনই 'আমাদের সাধনার পরম লক্ষ্য হইয়া রহিল।<sup>৩</sup>

১৩৫৯ সনের অগ্রহায়ণ মাসে সওগাত পুনপ্রকাশিত হলেও ১৩৬৫ বা ১৯৫৮ সন পর্যন্ত নিয়মিত প্রকাশিত হতে পারেনি। অগ্রহায়ণ (১৩৬৫) সংখ্যার 'সাময়িকী'তে বলা হয় :

তবু স্বীকার করিতেই হইবে যে, এদেশের সাময়িকপত্রিকার যে সাধারণ ভাগ্য, সওগাতও তাহার কবল হইতে নিষ্কৃতি পায় নাই। প্রেস, কাগজ, কালি, ছাপার যাবতীয় সরঞ্জামের দুশ্চাপ্যতার অসুবিধাতো আছেই; উপরন্তু লেখার অভাবটাও কম নয়। আমাদের লেখকগণ জীবিকার সংগ্রামে এতই ব্যস্ত, অনেকেরই লেখাটাকে সার্বক্ষণিক সাধনা হিসাবে গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না; অথচ সার্বক্ষণিক সাধনা ব্যতীত কোন দেশের সাহিত্যই ঐশ্বর্যমণ্ডিত হইয়া উঠিতে পারে না। গত দশ-এগারো বৎসরে পূর্ব-পাকিস্তানের সাহিত্য যে আশানুরূপভাবে অগ্রসর হইতে পারে নাই, ইহাই হইল তাহার একটা প্রধান কারণ। তবু নানারকম অসুবিধা সত্ত্বেও গভীর উদ্যমে বুক বাঁধিয়া আমরা আবার নতুনভাবে সওগাত প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এখন হইতে সওগাত প্রত্যেক বাংলা মাসের প্রথম সপ্তাহে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইবে। আমাদের আনুষঙ্গিক বাধা-বিপত্তিগুলি অনেকটা কাটাইয়া উঠিতে পারিয়াছি বলিয়াই এই আশ্বাস যথার্থ। কাজেই আমরা আশা করি, সওগাত আমাদের সুধী লেখক ও পাঠকবর্গের শূভেচ্ছা, প্রীতি ও সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইবে না।<sup>৪</sup>

সওগাত-কর্তৃপক্ষের এই আশ্বাস প্রকৃতপক্ষেই 'যথার্থ' হয়েছিল। ১৯৭০ সন পর্যন্ত সওগাত নিয়মিতই প্রকাশিত হয়েছিল, এবং এমনকি ১৯৭১ সনেও সওগাত প্রকাশিত হয়। তবে একান্তর সনের মার্চ থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পত্রিকা বন্ধ থাকে। মাঘ-ফাল্গুন ১৩৭৭ সংখ্যায় 'একুশে ফেব্রুয়ারি স্মরণে' শীর্ষক আলোচনায় লেখা হয় : ... একুশে ফেব্রুয়ারি আজ আর বছরের ক্যালেন্ডারের বারবার ফিরে আসা একটি দিন নয়—এ আমাদের ঐতিহ্যের অন্তর্গত জীবনে শ্রবতারার মত নিশ্চিত একটি সত্য। এ দিনটিতে তাই বারবার আমরা ফিরে আসি নিজের কাছে। আত্মসমালোচনার কণ্ঠিপাথরে যাচাই করতে চাই নিজের বিবেক ও সাধনাকে।<sup>৫</sup>

এরপর পত্রিকা বন্ধ হয়ে আশ্বিন ১৩৭৮-এ যুদ্ধের মধ্যে অর্থাৎ অক্টোবর-নভেম্বর ১৯৭১ এ, '৫৩ বর্ষ আশ্বিন ১৩৭৮' চিহ্নিত হয়ে সংখ্যা নম্বর ছাড়াই বের হয়। তবে এতে নতুন

লেখা তেমন ছিল না, অধিকাংশই পুনর্মুদ্রণ এবং সম্পাদকীয় দপ্তরে জমাকৃত ৭১-পূর্ববর্তী রচনা। '৫৩ বর্ষ কার্তিক ১৩৭৮' সংখ্যা বের হয় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর মৃত্যুর পর 'ওয়ালীউল্লাহ সংখ্যা'রূপে। সওগাতের সঙ্গে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর সম্পর্ক ও তাঁর লেখা গল্পসমূহ সংকলন করাই ছিল ঐ সংখ্যার উদ্দেশ্য বা বিষয়বস্তু। বাংলাদেশ আমলে ৫৪ বর্ষ চলেছে, অনিয়মিত হয় বলে সংখ্যা উল্লেখ না করে তখন মাসের নাম উল্লেখ করা হতো। ১৩৭৯ সনে শ্রাবণ ভাদ্র ও আশ্বিন সংখ্যা বের হয়েছিল '৫৪ বর্ষের হিসেবে। অনিয়মিতভাবে ১৯৭৫ পর্যন্ত, তারপর বিশেষ বিশেষ সময়ে সওগাত বের হতো ; অধিকাংশই যুক্ত সংখ্যা ; নতুন বাংলাদেশ-আমলের প্রাণস্পন্দনহীন এই সংখ্যাগুলো কখন বের হতো অনেকেই খবর রাখতেন না, রাখার প্রয়োজনও ছিল না। অবশ্য ১৯৬৮তে যখন এর পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হয়, তখন বা তার কিছু পূর্ব থেকেই তার এই জীর্ণদশা। হাসান হাফিজুর রহমান 'সওগাতের অর্ধশতাব্দী' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন :

মাসিক পত্রিকা 'সওগাত' পঞ্চাশ বছরে পদার্পণ করেছে। আমরা এখন এমন এক সময়ের উত্তরণে অবস্থান করছি যখন 'সওগাত'-এর পঞ্চাশ বছর বয়সে পদার্পণ কিংবা 'সওগাতের' প্রথম প্রকাশ কোনো কিছুই আমাদের কাছে বিশেষ অর্থে চাঞ্চল্যকর নয়। 'সওগাত' আজকাল বেরোয় কিনা, এও হয়তো আমরা খোঁজ রাখার আদৌ তাড়া অনুভব করি না। বিশেষত তরুণদের কাছেতো 'সওগাত' নামের কোনো তাৎপর্যই নেই। এ এক নির্বাণ সত্য। আমার মনে হয় এ নিয়ে মন খারাপ করার কিছু নেই। প্রত্যেকেরই নিজস্ব ভূমিকা থাকে। একদিন না একদিন সে ভূমিকারও অবসান ঘটে। তখন তা চলে যায় বাতিলের দলে। আজকের পঞ্চাশ বছরের বৃদ্ধ সওগাতও হয়তো তেমনি বাতিলের দলে নির্বাসিত হয়েছে, এযুগের নতুন মনের লোকের কাছে, নবীন সাহিত্যরসিকের কাছে।<sup>৬</sup>

তবে তিনি এও লিখেছেন—'কিন্তু কিছু ঘটনা আছে, কিছু ভূমিকা আছে যার বর্তমান ফুরিয়ে যায় বটে, কিন্তু অতীত হিসেবে, ঐতিহ্য হিসেবে তা কোনদিনই ফুরায় না।' 'সওগাতের আত্মপ্রকাশ তেমনি এক বিরল ঘটনা।' আলোচক এখানে সওগাতের অতীত ঐতিহ্যের গুরুত্বে জোর দিলেও অন্যত্র বিভাগ পরবর্তীকালের উজ্জ্বল ভূমিকাও স্মরণ করেছেন। অতএব সমকাল প্রকাশের আগে, অন্তত পূর্ববর্তী-পূর্বমেষ প্রকাশের পূর্বপর্যন্ত—অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত হলেও আলোচ্যকালের প্রথম পর্বেও সওগাতের একটি উজ্জ্বল ভূমিকা ছিল। বাংলাদেশের সাহিত্য সংস্কৃতি ও সমাজের অগ্রগতিতে অনন্যসাধারণ ভূমিকা রাখার অভিপ্রায়ও তার ছিল, কিন্তু সম্পাদকের মতোই সওগাতেরও তখন বয়স হয়েছিল। আর প্রবীণের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব জড়ত্ব এনে দেয় সকল কাজে ; সওগাতকেও তাই নানান ব্যাপারে কম-বাক্, দ্বিধান্বিত, কম সোচ্চার দেখতে পাওয়া যায়। যেমন রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে বাংলাই যে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে, না হওয়া উচিত একথা তাঁরা বলতে কুণ্ঠিত ছিলেন, বরং উর্দুর প্রাধান্য স্বীকার করতেই প্রস্তুত ছিলেন।

কিন্তু এরপর তাদের জড়ত্ব খানিক কেটে যায়। তবে ১৯৫৮-র পর সওগাত যখন নিয়মিত বের হয় একনাগাড়ে প্রায় একযুগ (১৩৬৫ থেকে ৭৭) তখন তাঁরা উগ্রতার পরিচয় দেননি। আইউব খানের বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণের সচিত্র বিবরণ ছাপা হতো সাময়িকী বিভাগে। 'চলতি দুনিয়া'তেও মুসলিম বিশ্বের এবং অন্যান্য দেশসমূহের (তবে অধিকাংশই

প্রাচ্যের) ঘটনাবলী সচিত্র প্রকাশ করা হতো অনেকটা বিভাগ-পূর্ববর্তীকালের স্টাইলে। পাকিস্তান সরকার বিরাগ হয় এমন বক্তব্য তাতে আসতো না। উপরন্তু এই সময়ে তাঁদের প্রকাশিত রচনাবলীতে ‘পূবালী’র ন্যায় জীবন ও সমাজ দৃষ্টির ক্ষেত্রে মিশ্র ভূমিকার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁরা ইসলাম, মুসলমান, মুসলিম বিশ্ব, পাকিস্তানের স্বার্থ, ভারতের শত্রুতা ইত্যাদি যেমন তুলে ধরেছেন, তেমনি আবুল ফজল, আবদুল হক প্রমুখের মুক্তবুদ্ধির আলোচনাও সওগাতে ছেপেছেন। কিছু ভালো স্মৃতিকথা যেমন আবুল ফজলের ‘রেখাচিত্র’, ‘লেখকের রোজনাচা’, গাজী শামছুর রহমানের ‘আইনের চোখে’ এবং আবুল হাসানাতের ‘ফসলের ঘাণ’, হুমায়ুন কাদিরের ‘দূরের আকাশ’, জাহাঙ্গীর শাহনওয়াজের ‘মনমাঝি’ এবং আবদুর রহমানের ‘বাস-কণ্ঠস্বর’, নূরুল ইসলাম খানের ‘এক আকাশ লক্ষ তারা’ ; রশীদ আল ফারুকীর ‘কেন্দ্রবিন্দুতে প্রত্যাবর্তন’ প্রভৃতি উপন্যাস আর অনূদিত একগুচ্ছ রচনা—নাটক, কবিতা, উপন্যাস, গল্প সওগাত প্রকাশ করেছে।

এসবের দৃষ্টিভঙ্গি আধুনিক এবং আধুনিক বিশ্বসাহিত্যের সম্পদ সেগুলো। এইসব বিবেচনায় সওগাতের অবদানকে একেবারে খাটো করে দেখা ঠিক হবে না, কারণ নিয়মিত মাসে মাসে প্রকাশিত এদেশের পত্রিকার সংখ্যা খুব বেশি নয়। সেখানে ‘সওগাত’ মাসে মাসে প্রকাশিত হয়েছে, মাঝারি, সাধারণ লেখকদের রচনা প্রকাশের বিরাট-ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে।

অতএব সার্বিক বিবেচনায় এর গুরুত্ব অপরিসীমাই বটে। তাছাড়া এদেশে ভালো লেখকদের সংখ্যানুপাতও নগণ্য, নিয়মিত মাসিক পত্রিকার সকল লেখাই ‘ভালো’ দিয়ে ভরা যায় না। নিয়মিত নির্দিষ্ট দিনে বের করার জন্য তাকে কিছু ভর্তুকি রচনা দিয়ে পত্রিকার সাইজ ঠিক রাখতেই হয়েছে। তবু মুনীর চৌধুরী, আসকার ইবনে শাইখ প্রমুখের অনুবাদ এবং সওগাতের পুরাতন ফাইলের প্রধান একাংশ বিভাগ পরবর্তীকালের সওগাতে পুরনো বা অতীতের কথা হিসেবে ছেপে সাহিত্যসমাজে অগ্রগতির সহায়ক ভূমিকাই রেখেছে সওগাত।

তাছাড়া ১৯৫২ সনের পরে, ১৯৫৪-র নির্বাচনের সময়ে, কাগমারী সম্মেলনের কালে সওগাতের বক্তব্য প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের বক্তব্যই ছিল। এই সময়ে সওগাত ‘পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ’ এবং ‘সমকালের’ লেখকদেরও রচনা প্রকাশের ‘প্লাটফর্ম’রূপে কাজ করেছে, পরে সমকাল, পূর্বমেঘ, পূবালী পরিক্রম, সংলাপ, কণ্ঠস্বর ইত্যাদি সাহিত্যপত্রিকা বের হতে আরম্ভ করলে অত্যাধুনিক তরুণদের নিকট ওগুলোর প্রতি আকর্ষণ বেড়ে যায় ; অনুসরণ অনুকরণের বিষয়বস্তুও সেগুলোতেই থাকতো। তবু সওগাতের লেখার তালিকা প্রস্তুত করলে নিতান্ত নগণ্য-মূল্যের পত্রিকা হিসেবে গণ্য হয় বলে মনে হয় না।

খ. সওগাত ১৯১৮ সনে যাত্রারম্ভ করে বলে রবীন্দ্রনাথ থেকে আরম্ভ করে আধুনিক কালের অনেক লেখককেই সওগাতের জন্য লিখবার অনুরোধ করা হয়েছিল। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লেখকেরাই এতে লিখেছেন—এবং দীর্ঘ জীবনে সওগাত পুরনো সংখ্যা থেকে অনেক রচনাই পুনর্মুদ্রিত করেছে। একথা মনে রেখে লেখক তালিকা অনুমান করতে

হয়। কবিতা লিখেছেন বা সংকলিত করা হয়েছে ঘাঁদের কবিতা তাঁরা হলেন, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলাম, ফররুখ আহমদ, শামসুর রাহমান, আবুল হোসেন, আবু জাফর ওবদুল্লাহ, সাইয়িদ আতীকুল্লাহ, ফয়েজ আহমদ, আশরাফ সিদ্দিকী, হাসান হাফিজুর রহমান, রথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী, ইমামুর রশীদ, শ্রী মনোমোহন বর্মণ, সুফী মোতাহার হোসেন, মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, অশনি মজুমদার, সালেহ আহমদ, সৈয়দ শামসুল হক, শহীদ কাদরী, মুস্তফা জামাল, আবুল ফজল, শাহাবুদ্দীন, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, আল মাহমুদ, জামালউদ্দীন মোল্লা, আহসান হাবীব, ওমর আলী, আলাউদ্দীন আল আজাদ, আবু বকর সিদ্দিক, নুরুল ইসলাম সন্ত, ফারুক মাহমুদ, হাবিব আকরব, হুমায়ুন কাদির, মীর আবুল খায়ের, আশুতোষ পাল, রমেশ দেবনাথ, আতাউর রহমান, মুস্তফা মাহমুদ, মোতাহের হোসেন চৌধুরী, আবুল হাসান, মনিরুজ্জামান, ইউসুফ সাদেক, সুব্রত বড়ুয়া, দাউদ হায়দার প্রমুখ।

সওগাতের কবিরা এতে গল্পও লিখেছেন। বিভিন্ন লেখার তালিকা থেকে দেখা যায়, প্রবন্ধ, আলোচনাও তাঁরা লিখেছেন। গল্প লিখেছেন অগাল্পিকেরাও, যেমন অকবিদের কবিতাও আছে। কয়েকজন গাল্পিকের নাম : শওকত ওসমান, আলাউদ্দিন আল আজাদ, সিরাজুল ইসলাম, মোহাম্মদ কাসেম, সৈয়দ শামসুল হক, মিন্নাত আলী, আবু মোহাম্মদ, শেখ শাহরিয়ার মুরশিদ, আতাউল হক, আবদুল গাফফার চৌধুরী, সাইয়িদ আতীকুল্লাহ, সরদার আবদুর রাজ্জাক, জহির রায়হান, শহীদ সাবের, কাজী নুরুল ইসলাম, সৈয়দ আবদুস সুলতান, হুমায়ুন কাদির, মুরতজা আলী, হাসনাত আবদুল হাই, গোলাম কাদির, আবুল হাসানাত, হোসেন মীর মোশাররফ, আল ফারুক, সাজ্জাদুল করিম, রাবেয়া খাতুন, ইয়ার মোহাম্মদ, ওমর আলী, আবদুন নূর, আবু শাহরিয়ার, শ্রীবামা ঠাকুর, মনিরুজ্জামান, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (মৃত্যু উপলক্ষে গল্পগুচ্ছ, কার্তিক ১৩৭৮) প্রমুখ।

সওগাতে সাতচল্লিশ পরবর্তীকালের প্রধান কথাশিল্পীদের কিংবা নাট্যকারদের রচনা তেমন প্রকাশিত হয়নি। অতি-আধুনিকমনস্করা সদ্যপ্রকাশিত পত্রিকার ঔজ্জ্বল্যে বেশি আকৃষ্ট হয়েছেন। এতে কমশক্তিধরেরাই মোহাম্মদীর মতো ভীড় করেছেন। প্রকাশিত ধারাবাহিক রচনাগুলো হচ্ছে :

আবুল ফজল—রেখাচিত্র (৪৬/৯ সংখ্যায় আরম্ভ। ৩৯/৮ এ বন্ধ)। ‘লেখকের রোজ নামচা’ (৪৯ক/৯ থেকে) আবুল হাসানাত—ফসলের ঘ্রাণ (ধারাবাহিক উপন্যাস, ৫০/৬) ; আবদুর রহমান—বাস কণ্ঠের (ধারাবাহিক উপন্যাস, ৫১/৪) ; ইত্যাদি।

নাটক, নাটিকা, একাঙ্কিকা, গীতি-নাট্য, কাব্য-নাট্য ইত্যাদি পাকিস্তানী-সওগাতে ছাপা হয়েছে। যেমন : আসকার ইবনে শাইখ—মৃত্যুক্ষুধা (কাজী নজরুলের উপন্যাসের নাট্যরূপ, ৪১/১) ; পরিবার (একাঙ্কিকা, ৫০/১১) ; আবদুল হক—ফেরদৌসী (৪৫/১ থেকে ধারাবাহিক) ; আলাউদ্দীন আল আজাদ—ইহুদীদের মেয়ে (কাব্যনাটক, ৪৫/৩) ; আবু

আল সাইদ—আকাশে অনেক রঙ (নাটিকা, ৪৯ক/১) ; ত্রিভুজ (নাটিকা, ৫০/৩) ; আবদুর রহমান—লেখক ও নেপোলিয়ন (নাটক, ৫১/১ থেকে) ; ইবরাহীম খাঁ—মর্মর স্বপ্ন (পু.মু. ৫১/৪) ;

দুটো রম্য রচনা চোখে পড়েছে তার একটির লেখক ভ্রমর—মধু হল মোম (৪১/১) ; এবং মতিনউদ্দীন আহমদ এর ‘চোখ’ (৪১/১) ।

(সওগাতের বিস্তারিত সৃষ্টিপত্র বর্তমান লেখকের ‘পূর্ববাঙলার সাময়িকপত্র : প্রগতিশীল ধারা (১৯৪৭-৭১)’তে দেখা যেতে পারে। এখানে সব তথ্য বলার সুযোগ নেই।

## ১. সওগাতের সাহিত্যচিন্তা

সওগাতের পাকিস্তান আমলের ভূমিকাও প্রগতিশীলই ছিল। আবুল ফজল, আবদুল কাদের, আবুল হুসেন, কাজী মোতাহার হোসেন, আবদুল হক, আহমদ শরীফ, আতোয়ার রহমান, আবদুল গনি হাজারী, আনিসুজ্জামান, আবদুল্লাহ আল মুতী, আলাউদ্দিন আল আজাদ, আবুল হাসানাত, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, আশরাফ সিদ্দিকী, আবদুল কাদির খান, আবদুল মওদুদ, আবদুল আহাদ, আতাউর রহমান, ওবায়দুল হক সরকার, কামরুল হাসান, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, মোহাম্মদ আজরফ, মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ, মোহাম্মদ মোর্তজা, ময়হারুল ইসলাম, মতিনউদ্দীন আহমদ, মহিউদ্দিন, মনিরুজ্জামান, মুহম্মদ আবদুল হাই, মুহম্মদ মনসুরউদ্দিন, মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, মোহাম্মদ ইদরিস, মুফাখখারুল ইসলাম, রনেশদাশ গুপ্ত, রফিকুল ইসলাম, রফিক আজাদ, রশিদ আল-ফারুকী, শামসুর রাহমান, শাহেদ আলী, শামসুল হক, সেলিম আলদীন, সরদার ফজলুল করিম, সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়, সুফী মোতাহার হোসেন, সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, হাসান হাফিজুর রহমান, হাসান জামান প্রমুখ পূর্ববাঙলার তৎকালীন সমাজের প্রেক্ষাপটে সাহিত্যের নানা সমস্যা ও সংকট এবং তার সমাধান নিয়ে আলোচনা করেছেন।

স্পষ্টতই আধুনিক কালের বিশ্বসাহিত্যের মানদণ্ড তাঁদের সামনে থাকলেও পাকিস্তানি বাংলা সাহিত্যের স্বরূপ কি হবে তা নিয়ে যে প্রধান বিতর্ক তৎকালে প্রচলিত ছিল,—সে বিষয়ও তাঁরা এড়িয়ে যেতে পারেননি বলে এতে কালিক প্রতিফলন ঘটেছে। তবে অন্যায়ের তুলনায় কালের বিবেচনায় সওগাতের আদর্শ মোটামুটিভাবে প্রগতিশীল ছিল। সওগাতের প্রধান লেখকেরা সাম্প্রদায়িক কূপমগ্নকতা দ্বারা আচ্ছন্ন ছিলেন না। এঁদের মধ্যে যারা তরুণতর ছিলেন, তাঁরা পাকিস্তানি বাংলা সৃষ্টির পদক্ষেপকে একদম সমর্থন করতে পারেননি। ভাষা ও সাহিত্যের আদর্শ খুঁজতে গিয়ে বাংলা সাহিত্যের মূলধারা থেকেও তাঁরা বিচ্যুত হননি। নতুন দেশে বাংলা সাহিত্য যে নতুন রূপের সন্ধান করবে এ বিষয়ে তাঁরা মোটামুটিভাবে নিসন্দ্বিগ্ন ছিলেন বলে ‘ইসলামি’ বা ‘পাকিস্তানি’ সাহিত্যচর্চার প্রয়াসকে সমালোচনা করে সমগ্র বাঙলার সাহিত্যাদর্শ ও ঐতিহ্যকে অস্বীকার করা যে কল্যাণকর হবে না—তাও ১৯৫২ সনে প্রকাশিত এর প্রথম সংখ্যার ‘সাময়িকী’তে স্পষ্ট করেই বলা হয়েছিল।

এতে আরও বলা হয় আজাদ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অভূতপূর্ব ঘটনায় মুসলমানদের মন নতুন আশা-আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেল হয়ে উঠবে, এতে বিস্ময়ের কিছু নেই, ‘কিন্তু... এই স্বাভাবিক আলোড়নের মধ্যেও সাহিত্যিক চিন্তকে অচঞ্চল রাখিতে না পারিলে সাহিত্যের বিশৃঙ্খলিত ধর্ম হইতে স্থলন ঘটবার আশংকা প্রবল হইয়া দেখা দিবে। ... হিন্দু-সাহিত্য, মুসলিম সাহিত্য, খৃস্টান সাহিত্য নাম দিয়া সাহিত্যকে বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে বিভক্ত করা চলে না। সকল দেশ, সকল জাতি ও সকল ধর্মের উর্ধ্ব মানুষের-সাহিত্য সাধনার প্রশস্ত ক্ষেত্র বিরাজমান। এই ক্ষেত্র যিনি কর্ষণ করিতে ব্রতী হইবেন, প্রকৃত সাহিত্যিকের আসন তাঁহারই প্রাপ্য।’ অবশ্য ইসলামী আদর্শকে আগের মতোই বর্জনীয় মনে করা হয় না—

তবে এও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, চিন্তার ক্ষেত্রে মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণকে রূপ দেওয়া এবং সেই কল্যাণের দিকে মানব-মনে একটা বলিষ্ঠ প্রবণতা জাগাইয়া তোলার সাধনায় ইসলাম সাহিত্যকে যথেষ্ট শক্তি দান করিতে পারে—যদি তিনি দীর্ঘ যুগ সঞ্চিত অঙ্কতা ও কুসংস্কারের জঞ্জাল সরাইয়া তার প্রাণের মণি-কোঠায় প্রবেশ করিতে পারেন। এ বড় কঠিন কাজ। অতীতে মুসলিম নামধারীরাই ইসলামের গতিশীলতা অবুদ্ধি ও কুবুদ্ধির প্ররোচনায় স্তব্ধ করিয়া দিয়াছেন। তাই সে মানবধর্ম বা মানবের স্বাভাবিক ফিতরে নামে অভিহিত হইয়াও মানবীয় জগতের প্রকৃতিগত চলিষ্ণুতার সহিত তাল রক্ষা করিয়া অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। তাই আজ অসহায় মুসলিম গতিধর্মী ইসলামের পশুকৃত রূপকে নিরুপায় ভালবাসা দিয়া গতির সবটুকুকে দুর্গতি নামে গালি পাড়িতেছে।

এজন্যই সওগাতের আশঙ্কা : ‘এই মনোভাব কোনো সাহিত্যিককে তাঁর ব্যক্তিগত কল্যাণ বুদ্ধিকে বিশ্ব-মানবতার দিকে প্রসারিত করিতে সাহায্য করিবে বলিয়া আমাদের ধারণা হয় না।’ সুতরাং ‘পাকিস্তানে ইসলামীয়ানায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া সাহিত্য সৃষ্টি করিতে হইবে,—এই ধর্মের অর্থ, ব্যঞ্জনা ও তাৎপর্য প্রকৃত সাহিত্যিকচিন্তের অধিকারীদের অত্যন্ত সতর্কতার সহিত বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইবে। স্থূল ধর্মীয় প্রচারণা আর সাহিত্য এক জিনিস নয়। সাহিত্য যে কল্যাণের আশ্রয়, ধর্মের অনাবিল মৌলিক প্রবণতা তার চর্চায় সাহিত্যিক মন ও দৃষ্টিতে সূক্ষ্মভাবে একটা বিশিষ্ট ভঙ্গিমা আনিয়া দিতে পারে মাত্র। পাকিস্তানে সাহিত্যের নতুন ধারা বলিয়া যাহা বুঝানোর চেষ্টা করা হইতেছে, খাঁটি সাহিত্যিকের কাছে তার মতলব এর চেয়ে বেশি বা এর থেকে অন্য কিছু নয়।’

উপরের বক্তব্য থেকে বোঝা যায় বাংলা সাহিত্যের ভাষার, শব্দের ও রীতির স্বাভাবিকতাকে পূর্ববাঙলার সাহিত্যেরও বৈশিষ্ট্যরূপে মনে নিয়ে অখণ্ড বাংলা সাহিত্যের নবপর্যায়ের আন্দোলনকারী, বাঙালি জাতীয়তাবাদী ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের যাত্রাপথের সহযাত্রী ‘সওগাত’ হয়েছিল। তবে এও সত্য যে সাহিত্যক্ষেত্রে মতপথের ও আদর্শের বিভাজনকে সওগাত দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করতে পারে নি। সংকরভূমিকার জনাই ইসলামী বা পাকিস্তানী বাংলা সাহিত্যের সমর্থকদের রচনাও সওগাতে ছাপা হয়েছে। এ কারণে পূর্ববাঙলার সাহিত্যের নবযাত্রায় ‘সওগাতের’ স্ববিরোধিতা লক্ষণীয়।

বাংলা ভাষার রাষ্ট্রীয় আদর্শের ও মর্যাদার প্রশ্নেও সওগাত প্রথমদিকে মোটেই দূরদৃষ্টির পরিচয় দেয়নি। বাংলাভাষার রূপের প্রশ্নে যেমন দেয়া হয়েছিল। রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলনের পর বাংলাকে ‘প্রাদেশিক ভাষার মর্যাদায় স্বীকার করে আরবিতে রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসেবে মেনে নেয়ার



জন্য জোর সুপারিশ করা হয়েছিল। সাহিত্যের 'রূপের' প্রশ্নে তাঁদের যে ভাষাগত সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়, বাংলা ভাষার রাষ্ট্রীয় মর্যাদার প্রশ্নে তা অনুপস্থিত।

পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রের ন্যায় রাষ্ট্রভাষা নির্ধারণের ব্যাপারটাও অথবা বিলম্বিত হইয়াছে। তবে এ দুটা ব্যাপারে একটা পার্থক্য দেখা যাইতেছে। শাসনতন্ত্র প্রস্তুত না-হওয়ায় তা এখনও চালু হয় নাই; কিন্তু রাষ্ট্রভাষা নির্ধারিত না-হইলেও উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা ধরিয়া তা পূর্ববঙ্গে শিক্ষার প্রাথমিক স্তর হইতে বাধ্যতামূলক করার আদেশ জারি হইয়াছে। এরূপ আদেশের যৌক্তিকতা বা কারণ পরস্পরা আমরা অবগত নই। তবে এর ফলে বিশেষত পাকিস্তানের উচ্চতম কর্তৃপক্ষীয় মহলের কাহারও কাহারও চিন্তাহীন উক্তির প্রতিক্রিয়ায় বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে এই প্রদেশে এক প্রবল আন্দোলন চলিয়াছে এবং তার একটা দুঃখজনক পরিণতিও ঘটিয়া গিয়াছে। আমরা জানি, জনমতের চাপে আমাদের প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমিন বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গ্রহণের জন্য সুপারিশ করিয়া এখনকার ব্যবস্থা পরিষদে একটা সর্বসম্মত প্রস্তাব পাশ করা হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, গণপরিষদে পাক-প্রধানমন্ত্রী জনাব খান্দা নাজিমউদ্দীন তার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। রাষ্ট্রভাষা নির্ধারণের সময় এ সম্বন্ধে বিবেচনা করা হইবে বলিয়া তিনি ব্যাপারটা একরূপ ধাম-চাপা দিয়াছিলেন। এখনও তা সেই অবস্থায়ই পড়িয়া আছে, অথচ, সংবাদে প্রকাশ, পাক শাসনতন্ত্র রচনায় আর বিলম্ব করা হইবে না। শাসনতন্ত্র রচনার সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রভাষাও নির্ধারিত হইয়া যাইবে, এরূপ ধারণা স্বাভাবিক। তাই সংবাদপত্রে দেখা যাইতেছে, এই প্রদেশের স্থানে-স্থানে বিভিন্ন সভাসমিতিতে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবী আবার উত্থাপিত হইতেছে। সুতরাং আমাদের উচ্চতম রাষ্ট্রনেতাদের পক্ষে বাংলা ভাষার দাবী সম্পর্কে সুবিবেচনার পরিচয় দেওয়া উচিত হইবে বলিয়া আমরা মনে করি।

এতোসব ভালো কথা বলার পর পত্রিকাটির যুক্তি :

গোটা পাকিস্তানের লোকসংখ্যা কিঞ্চিদায়িক সাড়ে সাত কোটি। তন্মধ্যে পূর্ববঙ্গেই প্রায় সোয়া চার কোটি লোকের বাস। এরূপ বিপুল জনসংখ্যার অধিকারী একটি প্রদেশের জনমতের দাবী উপেক্ষা করা রাজনীতিকোচিত কার্য হইবে, কেহই এমন কথা বলিবেন না। বিশেষতঃ যে জনমতের পশ্চাতে আমাদের ভবিষ্যত আশা-ভরসার স্থল তরুণ-তরুণীদের সংকল্পবদ্ধ মনোভাব বিদ্যমান, তা কখনই অবহেলার বস্তু নয়। সম্ভূত পূর্ববঙ্গই পাকিস্তানের শক্তির কারণ হইবে। অসম্ভূত বা বিস্কুন্দ পূর্ববঙ্গ নয়। এটা এত সহজ কথা যে, পাক-প্রধানমন্ত্রী ও পশ্চিম পাকিস্তানে আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ ও ব্রাহ্মস্থানীয় নেতৃবৃন্দের তা না বুঝিবার কারণ দেখা যায় না। অবশ্য শুধু উর্দুকে কিংবা একসঙ্গে উর্দু ও বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করিলে তাতে পাকিস্তানের সবগুলি প্রদেশে শিক্ষার ক্ষেত্রে ভাষা-সমস্যার জটিলতার বৃদ্ধি পাইবে কিনা এবং তাতে পাকিস্তানের জাতীয় মনীষা ও মনস্বিতার পূর্ণ বিকাশের পথে মারাত্মক বাধা সৃষ্টি হইবে কিনা, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের কোনো চিন্তাশীল ব্যক্তি এই গুরুতর প্রশ্নেরও সম্মুখীন হইয়াছেন। ধর্মভাষা হিসাবে আরবি পাকিস্তানের সর্বত্র অবশ্য শিক্ষণীয় বিষয় গণ্য হওয়ায় তাঁহারা মনে করিতেছেন, বাংলা ও উর্দুকে যথোচিত প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া ধর্মভাষা আরবি-কেই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করা সঙ্গত হইবে। এই অভিমতের সমর্থনে তাঁহারা যে যুক্তি-জাল বিস্তার করিয়াছেন, তা ছেদন করা অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। ...যাহোক, আমরা আশা করি, পাক গণপরিষদের সদস্যবৃন্দ, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ এবং নেতৃস্থানীয় তরুণ-দল শুধু এক একটা ভাবাবেগের দ্বারা পরিচালিত না-হইয়া শাস্তিচিন্তা ও উদার দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া জাতীয় জীবনের পক্ষে অতীব গুরুত্বপূর্ণ এই প্রশ্নটির সমাধান করিতে অগ্রসর হইবেন। নতুবা নানা দিক দিয়া ভবিষ্যতে আমাদের সকলেরই প্রিয় রাষ্ট্র পাকিস্তানের ভীষণ ক্ষতি হইতে পারে।<sup>৯</sup>

বিভাগ পরবর্তীকালের সাহিত্যিক এবং লেখকদের মধ্যে ভাবনার বিবর্তনের পরিচয় পাওয়া যায় সাহিত্যের প্রকৃতি নিয়ে বিতর্কে। ধর্মনিরপেক্ষ প্রগতিশীলদের ইতিহাসের বিবর্তন ধারার প্রেক্ষিতে মানুষের জীবন-ধারণ ব্যবস্থার বিকাশের ধারাকে অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে যা

কিছু এর প্রতিবাদী তাকে উচ্ছেদ করার পক্ষপাতী ছিলেন। যে মূল উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যে সমাজের উত্থান-পতনের সম্ভাবনা নিহিত, তাকে সমাজের অস্তিত্ব এবং বিকাশের স্বার্থে অধিকতর বলিষ্ঠ করার লক্ষ্যে ব্যাপৃত হতে হবে বলে তাঁদের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হলো—ধনতন্ত্রবাদের উচ্ছেদ চাই ; এবং সমাজতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার বিকাশ প্রয়োজন। এজন্যে পূর্ববাঙলার সাহিত্যের ভবিষ্যত রূপ সম্পর্কেও দুইদলের বক্তব্য ও মতাদর্শে দুটি পৃথক ধারায় স্বাতন্ত্র্য লাভ করলো। একদলে ইসলামী বা ধর্মীয় আদর্শে পুষ্ট পূর্ববাঙলার সাহিত্যকে মানুষের জীবনধারণ ব্যবস্থা ও মানস গঠন কর্মের মূল দর্শনরূপে প্রয়োগের পক্ষে মত দিয়েছিলেন।

দ্বিতীয় দলের লেখকচিন্তকেরা মনে করলেন পূর্ববাঙলার মানুষের জীবনধারণ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ নতুনতম আদর্শে নিয়ন্ত্রিত হতে বাধ্য। তাঁরা পূর্ববাঙলার সাহিত্যকে পৃথিবীর ধর্মনিরপেক্ষ প্রগতিশীল দেশগুলির আদর্শে মানুষের জীবনব্যবস্থাকে সুপারিকল্পিত ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে পরম মুক্তির পথ শ্রেণীহীন সমাজের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অস্বরূপে প্রয়োগ করার পক্ষপাতি ছিলেন। তবে ‘ধর্ম নিরপেক্ষ প্রগতিশীল...সাহিত্যিকদের মধ্যে... দুটো বিভাগ লক্ষ্য করা যায়। কিছুসংখ্যক...‘ব্যক্তি’ই থেকে যেতে চান, বাকী অন্যান্য লেখকেরা মূল সামাজিক দৃষ্টির সমগ্রতা নিজেদের চোখে আরোপ করতে প্রয়াসী হন ; অর্থাৎ নিছক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার চাইতে তাঁরা সামাজিক মানুষের ব্যাপক অভিজ্ঞতা থেকেই সাহিত্যের উপাদান আহরণের চেষ্টা করেন। এর ফলে বড় রকমের ভুল করার সম্ভাবনা একেবারেই থাকে না, এবং কোন দায়িত্ব একলা করে নিজের ঘাড়ে নিতে হয় না।’

সাংস্কৃতিক সমস্যার সমাধানের জন্য অবিভক্ত ভৌগোলিক বাঙলার সামগ্রিকতার প্রভাব এড়িয়ে ‘সতিসত্যি কোন নতুন চিন্তা প্রবর্তন করার যুক্তিসহ প্রয়োজন আছে কিনা’ সে সম্পর্কে অনেকে সন্দেহ পোষণ করেছেন এবং তর্কের বিষয় বলে মনে করেছেন। তাঁরা প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন :

এই প্রশ্নেরই অন্যতম প্রধান শাখা হিসাবে পূর্ববাঙলার বর্তমান কালের বাংলাদেশের ভৌগোলিক এবং জাতিগত সামগ্রিকতাকে অগ্রাহ্য করে নতুনতর কোন সাহিত্য পূর্ববাঙলার সাহিত্য নামে নবতর পদ্ধতিতে রচিত হবে কিনা সে কথা বিচার করে দেখতে হবে। কারণ পূর্ববাঙলার বর্তমান শাসক সম্প্রদায়ের বিভাগপূর্বকালীন সাধনা ছিল রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করা ; রাষ্ট্রনীতি-সম্পৃক্ত সাংস্কৃতিক জীবনকে নতুন কোন ছাঁদে পুনর্গঠন করার কোন পরিকল্পনা তাঁদের ছিল না। বিভাগোত্তর পূর্ববাঙলায় পাকিস্তানীরাপ দানের প্রয়াস নতুন করে গৃহীত হলো। কেউ পাকিস্তানী চরিত্র দিয়ে অর্থাৎ ধর্মীয় দৃষ্টিকোণে বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতিকে সৃষ্টি করতে রাজী হলেন, কেউ হলেন না।<sup>১০</sup>

কিন্তু একথা ঠিক যে দেশ বিভাগের পর কয়েক বছরের মধ্যেই বাংলা সাহিত্য ‘ভাষা ও ভাবের দিক দিয়ে পশ্চিম বাঙলার সাহিত্যের থেকে কিছু স্বাতন্ত্র্য’ অর্জন করে ফেলে। ড: কাজী মোতাহার হোসেন আশা করেছেন : ‘এই স্বাতন্ত্র্য ক্রমে আরও দানা বাঁধবে। অনেক নতুন সাহিত্যিকের মধ্যে উদ্দীপনা আর প্রতিশ্রুতি দেখা যাচ্ছে।’

‘পূর্ববাঙলার সাহিত্য’ শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি সরকারকে বাংলাভাষার বিরুদ্ধাচরণের জন্য সমালোচনা করতে কুণ্ঠিত হন না। কিন্তু ইসলাম ধর্মের প্রতি আনুগত্য থেকে তিনি

ইসলামিভাববর্জিত পাকিস্তানী আদর্শ-বিচ্যুত সাহিত্যকেও পছন্দ করেননি। উপরোক্ত প্রবন্ধটি ঢাকায় অনুষ্ঠিত ইসলামি সাংস্কৃতিক সম্মেলনের সাহিত্য অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ রূপে তিনি পাঠ করেছিলেন। মধ্যযুগের সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলিম শাসক অমাত্যদের অবদানের উল্লেখ করে বর্তমান শাসকগোষ্ঠীর হীনমন্যতার অভিযোগ উত্থাপন করে তিনি বলেন : বর্তমান বিদ্বিষ্ট পরিবেশের ভিতর থেকে এই ব্যাপার লক্ষ্য করলে সত্যিই আমাদের পূর্ববর্তীদের ঔদার্যের প্রশংসা না করে পারা যায় না।

তবে লেখক সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা আক্রান্ত ছিলেন না বলে বলতে দ্বিধান্বিত হননি : ‘বিশেষ করে বাংলাদেশে শতকরা বিশজন অমুসলমানকে অগ্রাহ্য করে আমরা সাহিত্য বা সমাজ কিছুই পরিপূর্ণভাবে গড়ে তুলতে পারব না। এই দিক দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় পূর্ববাঙলার সমস্যা ভিন্ন ধরনের, এবং দায়িত্বও অনেক বেশি।’

বাংলা গদ্য সম্পর্কেও তিনি যুক্তিশীলতার পরিচয় দেন। গদ্য-সাহিত্য হিন্দু-লেখক-সাহিত্যিকদের দ্বারা পুষ্ট হয়েছে বলে হিন্দু-সভ্যতার পরিচয় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তাতে ; কিন্তু এ থেকে ‘একথা কিছুতেই প্রমাণিত হয় না যে, বাংলা গদ্যসাহিত্য কেবল হিন্দু সভ্যতার বাহন হবারই উপযুক্ত—মুসলিম তমদ্দুন বহন করবার যোগ্যতা এর নেই। ভাষা মানুষ সৃষ্টি করে, এতে যে বোল বলান যায় সেই বোলই বলে।’

তিনি আরও মন্তব্য করেন : ‘দুঃখের বিষয় কেন্দ্রীয় সরকার লক্ষ টাকা উর্দু-সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্য ব্যয় করছেন অথচ, বাংলা ভাষার সাহায্যে ইসলামী তমদ্দুন প্রচার করা—যার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি—তারজন্য উল্লেখযোগ্য কিছুই করছেন না। এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের চৈতন্যোদয় না হলে পূর্ববাঙলা আত্মনির্ভরশীল হতে পারবে না... অদূর ভবিষ্যতে আমাদের নবযুগের সাহিত্যিকদের কল্যাণে আপনা হতেই মুসলমানের চিন্তাভাবনা ও জাতীয় আদর্শ পর্যাপ্ত পরিমাণে এ ভাষায় এসে পড়বে এবং তার ফলে ভাষার রূপও ক্রমে ক্রমে স্বাভাবিকভাবেই বদলে যাবে। এরজন্য বাংলা বর্জন নয় এর বহুল চর্চাই আবশ্যিক।’

তিনি আরও বলেন, ধর্মপ্রাণ সাহিত্য চাই-ধর্মাক্ষ নয়। গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, চিত্র, প্রভৃতির মারফত আমাদের সাহিত্যিকরা দেশের লোকের চোখ ফুটিয়ে দিবেন। মোট কথা, জীবনের সব দিকেই সাহিত্যিকদের সত্যদৃষ্টির সন্ধানী আলোক ফেলতে হবে। ...সাহিত্যে কেউ উপেক্ষিত হবেনা। সুপুষ্ট সাহিত্যে যেমন যুবক-যুবতীর প্রেম কাহিনী বা মনস্তত্ত্ব থাকবে তেমনি শিশুর রঙীন স্বপ্ন, কর্মীর কর্মচাক্ষুর্ষ্য, আর বৃদ্ধের অভিজ্ঞতাও স্থান পাবে।<sup>১২</sup>

‘সাহিত্যে বিপ্লববাদ’ শীর্ষক আলোচনায় আবদুল গনি হাজারী যে আলোচনা করেন, তা মোহাম্মদীর প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হয়। বলাবাহুল্য, কাজী মোতাহার হোসেনের উপর্যুক্ত প্রবন্ধকেও মোহাম্মদী কটাক্ষ করতে ছাড়েনি। আবদুল গনি হাজারী বলেন :

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পাঁচ বছর চলে গেছে। এর মধ্যে পুরাতন সাহিত্যিকদের অধিকাংশই সেরজমীন থেকে সরে পড়েছিলেন। কিছু সংখ্যক নতুন লেখকই বরং আমাদের গত পাঁচ বৎসরের অতঃপর সম্ভাব্য-লঙ্কার সাংস্কৃতিক বন্ধ্যাত্ব থেকে রক্ষা করেছেন। এজন্য তাঁদের আমি আজ একবার জোর গলায় অভিনন্দন জানাতে চাই! আজ যারা সাহিত্যে শাসনের খাড়া তুলে এগিয়ে এসেছেন গত পাঁচ বছর ধরে তাঁরা নিজেদের মধ্যে স্বার্থের কোন্দলে ব্যস্ত ছিলেন। আজ তাঁদের অনেকে মোটা মোটা গদীতে আসীন, এখন তাঁদের নজর পড়েছে

অনেক-আগেকার-চষে আসা ক্ষেতের দিকে। সেখানে আজ নতুনেরা আসর জমিয়েছে। কিন্তু সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে রাজত্ব করবার একটা দাঁও এভাবে ফসকে যেতে দেওয়া যায় না। তাই নতুনেরা যে সাহিত্যই সৃষ্টি করুক, যে সভাই করুক, যে সংগঠনই করুক তার পেছনে যুক্তবঙ্গ আন্দোলন ও পররাষ্ট্রানুগত্যের নিদর্শন দেখতে হবেই।

সৈয়দ আলী আহসানের ন্যায় ইসলামী সংস্কৃতির প্রবর্তক ও অনুসারীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন :

ঠারা তাঁদের এই রাজত্বের দাবীর পোষকতার জন্য ইসলামকে অন্যায়ভাবে ব্যবহার করছেন। কিন্তু আমরা-ত জানি তাঁদের কে কতখানি ইসলামী আদর্শে ব্যক্তিগত জীবন পরিচালনা করেন। কথায় ও কাজে-কর্ম স্ববিরোধী হওয়াও বর্তমান সমাজের একশ্রেণীর লোকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

আবদুল গনি হাজারী সৈয়দ আলী আহসানের একটি আলোচনার মূল বক্তব্য উদ্ধৃত করে আহসান শ্রেণীর লেখক সাহিত্যিকদের ‘বিপ্লব’বাদের জবাব দিতে গিয়ে বলেন : ‘পূর্ব বাঙলার সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একশ্রেণীর সাহিত্যবাজ যে বিপ্লববাদের ধূয়া তুলেছেন তা এখন আর কোন সৎবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে উপেক্ষা করা সমীচীন হবে না। এই শ্রেণীর লোকেরা চিরকালই তাঁদের কায়েমী স্বার্থে ব্যাঘাত ঘটবার সম্ভাবনা দেখলে কোন না কোন কিছু বিপ্লব হয়েছে বলে হেঁচকি করে লোকসাধারণের দৃষ্টি বিভ্রান্ত করবার চেষ্টা করেছেন সর্বদেশে। কাজেই এঁদের সম্বন্ধে আমাদের পূর্বাঙ্কেই সম্পূর্ণরূপে ওয়াকিবহাল হওয়া প্রয়োজন।’

আলী আহসানের কথিত প্রবন্ধে পূর্ববাঙলার সংস্কৃতিকে বিপ্লব করে তোলার অভিযোগে প্রগতিশীল ও নতুন শিল্পী-সাহিত্যিকদের নানান অন্যায় ও কুৎসিৎ ভাষায় গালাগালি করা হয়েছিল :

পূর্ব-পাকিস্তানের চিন্তাক্ষেত্রে আজ চরম নৈরাজ্য চলছে—ধর্মবোধের ক্ষেত্রে এক সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলছে যার একমাত্র উদ্দেশ্য মানবমনের ধর্মগত বিশ্বাসের উচ্ছেদ। সংস্কৃতি অর্থ এদের কাছে মানুষের এক বিশেষ ধরনের পরিপূর্ণতা যা মানুষে মানুষে সমন্বয়বোধকে এবং সর্বক্ষেত্রের সর্বপ্রকার চিন্তাকে অবলম্বন করেই বিকশিত। বর্তমানে এর অর্থ আমাদের দেশে দাঁড়িয়েছে—পূর্বতন সম্পূর্ণ বাঙলার সমন্বয়গত চিন্তাধারাকে অনুসরণ করা এবং পূর্ব ও পশ্চিম বাঙলার সংস্কৃতির মধ্যে এক প্রকার ঐক্যতত্ত্ব নির্ণয় করে শাশ্বতবঙ্গের প্রতিষ্ঠা করা।

এর জবাবে আবদুল গনি হাজারী সওগাতে লিখেছিলেন—‘জনাব আহসান যে ভয়ের কথা উচ্চারণ করেছেন সেগুলো অমূলক’ এবং বিশেষ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত। তবু তাঁদের মনে যখন এই নৈরাজ্যের বোঝা একবার চেপেছে তখন এ থেকে মুক্তি পাওয়াও তাঁদের পক্ষে স্বাভাবিক। এ মুক্তি তখনই আসবে যখন আমরা নিছক নির্দেশ নয়, আমাদের আদর্শ-সমন্বিত যথার্থ সাহিত্যরস পরিবেশন করতে পারবো।

এই সাহিত্য-রস পরিবেশনের উপায় উদ্ভাবন সম্পর্কেও সৈয়দ আলী আহসান এক ফিরিস্তি দিয়েছিলেন :

১. পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য পূর্বতন সম্পূর্ণ বাঙলার সাহিত্য থেকে বিচ্ছিন্ন হবে। পূর্বতন ধারার পোষকতা না করে নতুন ধারার সৃষ্টি করতে হবে।

২. আমাদের নতুন সাহিত্য মুসলমানদের ব্যক্তিগত ও সমাজগত জীবনকে অবলম্বন করে গড়ে উঠবে।
৩. ইসলামের নিষ্কিন্ত একত্ববাদ, নিত্যক্রিয়াকর্ম-পদ্ধতি এবং ধর্মীয় আদর্শ আমাদের নতুন সাহিত্যে স্ফূর্তি পাবে।
৪. ইসলামের প্রবহমান ঐতিহ্যকে অবলম্বন করে আমাদের সাহিত্যকে পরিপুষ্ট করবো।
৫. পূর্ব বাঙলার পল্লীজীবনকে জাগ্রত রাখতে হবে আমাদের কল্পনায়।
৬. পৃথি সাহিত্যকে অবলম্বন করবো নতুন সাহিত্যের উপাদান হিসেবে।
৭. কলকাতাকেন্দ্রিক সাহিত্যের উত্তরাধিকারকে অস্বীকার করে পূর্ববাঙলার পরিবেশ এবং জীবনকে ক্রমান্বয়ে আমাদের সাহিত্যে রূপ দিতে হবে।
৮. আমাদের সাহিত্যের ভাষার পরিবর্তন হতে বাধ্য।
৯. সর্বোপরি বিশ্বের সমস্ত শোভন এবং কল্যাণপ্রদ বস্তুকে আমাদের উত্তরাধিকার বলে গ্রহণ করতে পারি। হাদিসের উক্তি স্মরণ রাখতে হবে—সমস্ত কল্যাণপ্রদ বস্তুই মোমেনের মীরাশ।

আবদুল গনি হাজারী সুশংখলভাবে একে একে আলী আহসানের বক্তব্যের একদেশদর্শী চিন্তার অসারতার পরিচয় তুলে ধরেছেন। আসলে এইসব আলোচনায় সৈয়দ আলী আহসানের নানান কপট উক্তির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। তিনি ভাষার কোন পরিবর্তন নিজের সাহিত্যে আনেননি অথচ ভাষার পরিবর্তন কামনা করেন এবং অবশ্যগতাবী বলে মন্তব্য করে রাজনৈতিক স্বার্থে পরিবর্তনকারীদেরকে উদ্বুদ্ধ করেন, উসকানী দেন, অথবা তাঁদের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেন বা হক ভাষায় ‘দালালী’ করেন। আলোচক আবদুল গনি হাজারী মন্তব্য :

‘এই ‘বাতুল’ প্রস্তাব কখনো অনুসরণ করা সম্ভব নয়। নজরুল সাহিত্যও ‘পূর্বতন সম্পূর্ণ বাঙলার সাহিত্য। আলী আহসানের সৃষ্টিতে সর্বোতভাবে রাবিন্দ্রিক।’

বাংলা সাহিত্যকে বিচ্ছিন্ন করার বক্তব্য অত্যন্ত অযৌক্তিক এবং সাম্প্রদায়িক চেতনাজাত। শুধু মুসলমানদের ব্যক্তিগত ও সমাজগত জীবনভাবনা সাহিত্যের অঙ্গীভূত হবে—এই বক্তব্যে, হিন্দু, বৌদ্ধ, চাকমা, হাজং, নানকার সকলেরই ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাজনৈতিক, রাষ্ট্রিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হয়েছে। ‘সম্পূর্ণ বাঙলার’ হিন্দু সাহিত্যিকদেরকে তাঁরা এককালে যেকারণে মুসলিমবর্জিত এবং মুসলিমদেরকে হেয় করা হয়েছে বলে গালাগালি করতেন, আজ রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফলে তাঁরা নিজেরাই কায়মী স্বার্থী হিসেবে সেইসব সাহিত্যিকের আসনে জাঁকিয়ে বসেছেন। ‘নীতিবোধের দিক দিয়ে এখন আর তাই তাঁদের ঠেকবে না। আবদুল গনি হাজারী সৈয়দ আলী আহসানের বক্তব্যে দৃষ্টিভঙ্গির সংকীর্ণতা এবং ‘চিন্তার অপরিচ্ছন্নতা’ লক্ষ্য করে মন্তব্য করেন :

...সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁরা আদর্শই এ পর্যন্ত কিছু করেননি, একথা সকলেরই জানা। যখন তাঁরা কিছু করতে যান অন্তর্দ্বন্দ্বের তাঁদের আয়োজন ভেঙে পড়ে। অথচ এদিকে নতুন শিল্পী-সাহিত্যিক বলিষ্ঠ পদক্ষেপে ক্রমেই এগিয়ে চলেছেন, অসারেরা তাই এখন তর্জন-গর্জন শুরু করেছেন, নতুনদের অভিসম্পাত দিচ্ছেন, তাদের বিরুদ্ধে অবিশ্বাসের ধোঁয়া ছড়াবার চেষ্টা করছেন। ঐরা নতুন সাহিত্যিকগণকে ঈর্ষার চোখে দেখেন এবং সেই জনাই এই অবিশ্বাসের জন্ম। কিন্তু আজ পাঁচ বৎসর ধরে ঢাকায়, চট্টগ্রামে, কুমিল্লায়,

সিলেটে সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে যদি কেউ কিছু করে থাকেন—তো নতুন শিল্পী ও সাহিত্যিকেরাই তা করেছেন। আমি তাঁদেরকে আন্তরিক যোবারকবাদ জানাই। আর জানাই সেইসব প্রবীণ সাহিত্যিকগণকে খাঁরা সাহিত্যবান্ধদের দলে ভীড়ে সাহিত্যের অবমাননা করেননি, নতুনকে আহ্বান করেছেন। তাঁরা হচ্ছেন—জনাব মাহবুবউল আলম, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন, মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, আবদুল করিম সাহিত্যবিহারদ, আবুল ফজল, সুফিয়া কামাল প্রমুখ সাহিত্যরথীগণ।<sup>১২</sup>

সাহিত্যের উদ্দেশ্য কি, সাহিত্যের আঙ্গিকই লক্ষণীয়, নাকি বিষয়বস্তু বিবেচ্য; প্রধানত এই বিষয়ে আনিসুজ্জামানের একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা ছাপা হয় ‘প্রগতি সাহিত্য প্রসঙ্গে’।

মনীষী হাডসন এর বিখ্যাত উক্তি : It is an expression of life through the medium of language—এর মূল উপজীব্য অনুসরণে জীবনের অভিব্যক্তি বা প্রাণের প্রকাশকেই সাহিত্যের প্রধান উদ্দেশ্য বলে প্রগতি সাহিত্যিকেরা মানেন। গণসাহিত্যের আতঙ্কে তবে Art for arts sake শিল্প শিল্পের জন্য অর্থাৎ সৌন্দর্যবোধ ও সৌন্দর্য সৃষ্টিই সাহিত্য বা শিল্পের একমাত্র করণীয়,—এই মতবাদের তারা প্রবর্তন করেন। তবে তা সং সাহিত্যিকেরা মেনে নিতে পারেননি। উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন না থেকে আপন বিবেক ও সৌন্দর্যবোধ দ্বারা চালিত হয়ে সং সাহিত্যিক যে সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন, তাতেও কিন্তু জীবনকে বা প্রাণের স্ফূর্তিকে কেউ অস্বীকার করতে পারেননি। যাঁরা এর বাইরে উদ্দেশ্যমায়িক গণজীবনকে অস্বীকার করে সাহিত্য রচনা করেন, তাঁরা অসং সাহিত্যিক বা শিল্পী এবং বিশেষ রাজনৈতিক দলের মুখপাত্র হিসেবে চিহ্নিত হবেন, সন্দেহ নেই। ‘সর্বভারতীয় প্রগতি লেখক সংঘের’ ইশতেহার এর মূল বক্তব্য : সাহিত্য হবে প্রাত্যহিক জীবনের চিত্র এবং তাতে জনসাধারণের জীবনের সঙ্গে সর্ববিধ কলার নিবিড় সংযোগ থাকবে; যা কিছু আমাদের বিচারবুদ্ধিকে উদ্ভুদ্ধ করে, সমাজব্যবস্থা ও রীতিনীতিতে মুক্তিঙ্গত পরীক্ষা করে আমাদের কর্মিষ্ঠ, শৃংখলাপটু, সমাজের রূপান্তরক্ষম করে, তাকে আমরা প্রগতিশীল বলে গ্রহণ করবো।

এই উক্তি উদ্ধৃত করে প্রগতিশীল লেখক-শিল্পীদের সাহিত্য-চিন্তার বিস্তৃত ব্যাখ্যা করে লেখক বলেন, ইশতেহারের মূলবক্তব্যের সঙ্গে সং-সাহিত্যিক মাত্রই একমত হলেও কোনো কোনো বিষয়ে তাঁদের মধ্যে মতভেদ আছে। যেমন আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর সমন্বয় বা স্বাতন্ত্র্যের প্রাধান্য। পূর্ববঙ্গের প্রগতিশীল শিল্পী-সাহিত্যিক মহলেও বিষয়বস্তুর প্রাধান্য নিয়ে মতভেদ দেখা দিয়েছে। আঙ্গিক ও বক্তব্যকে একেবারেই তাঁরা পাত্তা দিতে চাননি। তাই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার দাবী সমকালীন সাহিত্যের প্রধান চাহিদা হিসেবে দেখা দিয়েছিল। এই প্রেক্ষিতে উক্ত আলোচনা সাহিত্যস্রষ্টাদের চিন্তার পরিমার্জনে এবং সাহিত্যকর্মীদের কর্মপন্থা নির্ধারণে দিকনির্দেশের কাজ করেছে, আর পূর্ব বাঙলার সংসাহিত্যিকদের স্ফূর্তিতে ও উত্তম সাহিত্যের বিকাশে কার্যকর ভূমিকা রেখেছে। আনিসুজ্জামান লিখেছেন :

মানুষের জন্যে লেখাটাকে যখন কর্তব্য বলে মনে করা হয়, সেক্ষেত্রে আঙ্গিকের আগে বিষয়বস্তুর প্রতি অবশ্যই লক্ষ্য দিতে হবে। কিন্তু যে কোন মতেই আঙ্গিককে অবহেলা করা যায় না। তাই প্রথমে বিষয়বস্তু, তারপরে আঙ্গিক।... আমরা নিশ্চয়ই এই চাই না যে, আমরা স্থানীয় দৈনিকে রবিবারে বা দুএকটি মাসিকপত্রে নিভৃত প্রগতি সাহিত্য সৃষ্টি করি, আর বিশ্বসাহিত্যের দরবারে দেশের প্রতিক্রিয়াশীল সাহিত্যগুলো সম্মান পাক। তাই বহির্বিশ্বে প্রগতিশীল সাহিত্য যাতে আদৃত হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হলে, সাহিত্যে আঙ্গিকগত শ্রেষ্ঠত্বের

দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। নইলে, দেশগত হিসেবে, আমাদের সাহিত্যের মান নীচু, এ ধারণা হওয়া বিচিত্র নয়।

আনিসুজ্জামান অবশ্য আঙ্গিকের প্রতি লক্ষ্য রাখার অর্থে আঙ্গিক-সর্বস্বতাকে বোঝান নি। বরং পূর্ব বাঙলায় বিষয়বস্তুর চেয়ে আঙ্গিকই যে বেশী অনুসৃত হচ্ছে সেই প্রবণতাও লক্ষণীয় বলে ‘এটা কিন্তু খুবই খারাপ’ মন্তব্য করেছেন। পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন (১৯৫২)-এ ডা. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম এই রকম একটি অভিযোই উত্থাপন করেছিলেন :

পূর্ববঙ্গের সমাজ সচেতন সাহিত্যিকেরা যথেষ্ট সচেতন নন এবং পূর্ববঙ্গের অনেক লেখকই বিষয়বস্তুর চেয়ে আঙ্গিকের দিকে নজর দিচ্ছেন বেশী।

উপরোক্ত পরিস্থিতিতে চীনের বিখ্যাত লেখক চাউ ইয়াং এর একটি উক্তি-‘আঙ্গিক কৌশল অবশ্যই আয়ত্ত্ব করতে হবে, কিন্তু আঙ্গিকসর্বস্বতা এড়াতে হবে’ উল্লেখ করে বলেন : বিষয় ও আঙ্গিককে বিচ্ছিন্ন করা চাউ ইয়াং এর মতে ভুল। ‘আমাদের প্রগতি সাহিত্যিকদেরও উচিত তাঁর সাথে একমত হওয়া।’

পূর্ব বাঙলায় প্রগতি সাহিত্যিকদের মধ্যে সর্বজনগ্রাহ্যতার ব্যাপারে দ্বিমত ছিল, এখনও আছে, বিশেষ করে কবিতার দুর্বোধ্যতা বা অসহজবোধ্যতার বিষয়টি এখানে দীর্ঘদিনের আলোচ্য বিষয় :

ঐরা নবইজনের জন্যে লেখেন, অথচ নিরাববই জন ঐদের লেখা বুঝতে পারেন না।... আমাদের প্রগতি কবিরা, যারা এই ধাঁচে লেখেন, ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করে যদি কাব্যসাহিত্যকে আরেকটু সহজ করে তোলেন, সেটাই বাঞ্ছনীয় হবে।

অভিবাম কবিতার ‘রীতিমতো ইশতেহার’-প্রবণতা কবিতাকে অকবিতা করে তুলেছে। প্রগতিশীল ভাবধারা থাকা সত্ত্বেও ঐদের রচনা যেসব দোষে দুষ্ট, প্রগতি সাহিত্যিকদের উচিত, সেগুলো নির্দিষ্ট করে তাঁদের লেখাগুলোকে সাহিত্যের পর্যায়ে টেনে আনা।’

বিগতকালের সাহিত্যকে ঐতিহ্যরূপে গ্রহণ ও বিবেচনাকালে স্বকালের প্রেক্ষিতে বিবেচনার নীতি গ্রহণ করাই সঙ্গত। ‘শেক্সপীয়রের রচনায় সাধারণের জীবন চিত্রিত হয়নি বলে শেক্সপীয়রকে বাদ দেওয়ার প্রস্তাবও হাস্যকর।’ বঙ্কিম সাম্প্রদায়িক ছিলেন এবং তাঁর সাহিত্য সাম্প্রদায়িকতা স্পষ্ট। অতএব ‘বঙ্কিম অপাত্তেয়’। অথও বাঙলার মুসলিম সাহিত্যিকদের এই কমন অভিযোগের ডেউ পূর্ববাঙলায় বিভাগ পরবর্তীকালেও প্রচণ্ড জোয়ার সৃষ্টি করেছিল—এখনও যার জের বিদ্যমান।

একথা বললে সত্যিই ভুল করা হবে। আমাদেরকে দেখতে হবে কোন পরিপ্রেক্ষিতে বা কোন পটভূমিকার মধ্যে এবং কেন শেক্সপীয়র সাধারণ জীবন নিয়ে লেখেননি বা বঙ্কিম-সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতা স্থান পেল। এবং এই বিচারকে জনশ্রিয় করে তোলাও প্রগতি সাহিত্যিকদের কর্তব্য। আবার রবীন্দ্রনাথের কেবল প্রশ্ন, ঐকতান, রাশিয়ার চিঠি, আর হিজলী-জালিয়ানওয়ালাবাগের অত্যাচারের প্রতিবাদকেই আমরা গ্রহণ করব, বাকী অংশ নয়, এটাও ঠিক নয়। অবশ্য ঐদের রচনায় সাধারণ মানুষের প্রতি এবং চলতি সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ বা যা কিছু প্রগতি সাহিত্যের চরিত্রের আওতার মধ্যে পড়ে, তার ওপরেই প্রগতি লেখকদেরকে জোর দিতে হবে।<sup>১৩</sup>

অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য শ্রেণীর সঙ্গে বসবাস করার নীতিও গ্রহণযোগ্য।

১৯৫৮ সনে রোমান হরফে বাংলা প্রবর্তনের ষড়যন্ত্রের কালে সওগাত এর ভূমিকা ছিল এরূপ : ‘ভাষার মত প্রত্যেক প্রকারের হরফেরও নিজস্ব চরিত্র আছে, আছে বৈশিষ্ট্য ও সৌকর্য ; সুতরাং ভূয়ো আন্তর্জাতিকতার মোহে তাহার প্রতি অবহেলা প্রদর্শন জাতীয় বিকাশের পক্ষে ক্ষতিকরই হইবে। বাংলাভাষা রোমান হরফে লিখিত হইলে দুনিয়ার উন্নত ভাষাসমূহের সঙ্গে ইহার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হইবে, এ ধারণা ভুল ; কারণ, ইউরোপ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়ার বহু ভাষাই রোমান হরফে লিখিত, কিন্তু তাই বলিয়া অনুশীলন ব্যতীত এক ভাষার লোক অন্য ভাষায় তার ভাব প্রকাশ করিতে পারে না, এমনকি বাইরের চেহারা এক রকম হওয়া সত্ত্বেও যথার্থ উচ্চারণের সহিত পাঠও করিতে অক্ষম। তাহা ছাড়া, বাংলাদেশের এখন সবচেয়ে বড় সমস্যা হইল নিরক্ষরতা। যেদেশে শতকরা পঁচাশি জন মানুষ লিখিতে পড়িতে জানে না, তাহার সম্মুখে হরফ পাষ্টানোর পরিকল্পনা উপস্থিত হওয়া হাস্যকর। আগে লোক শিক্ষিত হোক, যদি আদৌ প্রয়োজন হয়, অক্ষর সংস্কারের প্রশ্ন তখনই উঠিবে।’<sup>১৪</sup>

মোহাম্মদ মোর্তজা ‘ভাষার রূপ’ শীর্ষক প্রবন্ধেও ঐ সময়ে (১৯৫৮) লিখেছিলেন। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা ভাষার রূপ কি হবে সে বিষয়ে নানা রকম তর্ক হয়েছিল। হিন্দুর বাংলা না মুসলমানের বাংলায় এদেশের লোকেরা ভাব প্রকাশ করবে, কিংবা প্রযুক্তিবিদ্যা ও সাহিত্যসৃষ্টির জন্য কোন ধরণের বাংলা ভাষা ব্যবহার করা আবশ্যিক?—এই প্রশ্নের জবাবে লেখক বলেন, প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে ধর্মীয়, পশ্চিম বা পূর্ববাংলার ভাষা বিভাগের প্রশ্ন অর্থহীন, তকটা আসলে সাহিত্যের ভাষার রূপ নিয়ে। তাঁর মতে কোন লেখকের হৃদয়ের অনুভূতি প্রকাশের আগ্রহের আধিক্য এবং বলবার বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা থাকলে ভাষা কোন সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় না। ভাষাটা তখন হয়ে যায় স্বতস্ফূর্ত। লেখক তাঁর সৃষ্টির সঙ্গে সমন্বয় সাধন করেই ভাষাকে রূপদান করেন। ভাষার সমস্যা সাহিত্যিকের নিজস্ব সমস্যা, বিষয়বস্তুর প্রয়োজনে যেকোন ভাষা ব্যবহার করা যেতে পারে ; আপত্তি শুধু অপ্রয়োজনে। ভবিষ্যতে একদিন বাংলা সাহিত্যের ভাষা তার নিজের গতিপথ স্থির করে নেবে, মোটকথা

...ইহাকে সার্থক করিয়া তুলিতে পারিলে বাঁচিয়া থাকিবেন নচেৎ মৃত্যু অনিবার্য। প্রচারণার জোরে মারিয়া ফেলিবার অথবা বাঁচাইয়া রাখিবার প্রচেষ্টা বাতুলতা মাত্র। যাহারা এই বিতর্ক তুলিয়া সময় ও শক্তি ব্যয় করিতেছেন, তাঁহারা নিরস্ত হউন। ইহাতে কোন মঙ্গলতো হইতেছেই না বরং অমঙ্গল হইতে পারে। এমন অনেকে আছেন, যাহারা নিরাসক্ত মন লইয়া কাজ করিলে দ্রুত অগ্রসর হইতে পারিতেন। কিন্তু ইহা দ্বারা প্রভাবিত হইবার ফলে স্তিমিত হইয়া আসিতেছেন। কেননা, আজ হটক, কাল হটক—এই বিতর্ক সত্ত্বে ইইয়া যাইবেই এবং প্রকৃত সাহিত্য তাহার নিজস্ব ধারায় আপনার ভবিষ্যৎ গতিপথ স্থির করিয়া লইবে।<sup>১৫</sup>

মোহাম্মদ মোর্তজা ‘সাহিত্য সম্পর্কে’ আলোচনায় জাতির অগ্রগতিতে সাহিত্য তথা সাহিত্য পত্রিকার ভূমিকা বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে অন্য এক সংখ্যায় লিখেছেন :

কোন এক মানবগোষ্ঠীতে (সমাজ বা জাতি অর্থে) সভ্যতা কতখানি উৎকর্ষ লাভ করিতে পারিয়াছে তাহার পরিমাপ কি? নানাভাবে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইয়া থাকে।...উত্তরের মধ্যে সর্বপ্রধান হইতেছে, সংশ্লিষ্টগোষ্ঠীতে সমসময়ে কতগুলি সাহিত্যপত্রিকা চালু থাকে তাহার তুলনামূলক হিসাবই হইতেছে সেই



গোষ্ঠীর সভ্যতার বিবর্তনিক পর্যায়ের পরিমাপ। সহজ কথায় বলা চলে, সাহিত্যপত্রিকার সংখ্যা সামাজিক অবস্থার প্রত্যক্ষ প্রাত্যফলন। আপনি যদি কোন রাজধানীতে গিয়া তথায় প্রকাশিত সাহিত্যপত্রিকাগুলির একটা হিসাব সংগ্রহ করতে পারেন, তবে সেই দেশের সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে একটা ধারণা আপনার হইয়া যাইবে। পুস্তকাকারে প্রকাশিত স্থায়ী বা দীর্ঘস্থায়ী সাহিত্যও এই হিসাবের মধ্যে ধরিতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে ইহারা একে অপরের সহিত কাঁধ মিলাইয়া অগ্রসর হয়।

সাহিত্যপত্রিকা অর্থাৎ সাহিত্যের এত গুরুত্ব কেন? কারণ, সাহিত্যে মানুষের জীবন-আলেখ্য প্রকাশ পায়। ‘যেখানে সভ্যতা যত উচ্চস্তরে উঠতে পারিয়াছে, সেখানে জীবন ততই কর্মচঞ্চল; ততই ব্যাপক ও গভীরভাবে সে তাহার পরিধি বিস্তারিত করিয়া দিয়াছে। তাহার প্রকাশও সেইজন্য ব্যাপক হইয়া উঠিতে বাধ্য। পরবর্তী প্রশ্ন হইতেছে, এই জীবনালেখ্য বলিতে কি বুঝায়—এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে জীবনের অপরিহার্য প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা থাকা দরকার। জীবনের অবশ্যস্বাবী প্রকৃতি হইতেছে গতি; জনপ্রিয় ভাষায় বলা হয় প্রগতি। অর্থাৎ স্থিতির সহিত জীবনের কোন সম্পর্ক নাই। কেননা, জীবনে স্থিতির অর্থ জীবনের ক্ষয়, পরে পরিসমাপ্তি... মৃত্যু। সেইজন্য গতি ব্যতীত জীবনের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। জীবন-আলেখ্য হইতেছে এর গতির অভিপ্রকাশ। সাহিত্যে তাহাই প্রতিফলিত হয়।... কিন্তু এসবের মধ্যে সাহিত্যের একটা সত্য প্রকাশ পায় যাহা সর্বক্ষেত্রে সমান। তাহা হইতেছে মানুষকে পরিবর্তিত করিয়া দিবার ক্ষমতা। বস্তুত কোন সাহিত্যিককে যদি মর্যাদা পাইতে হয় তবে পাঠক-পাঠিকাকে পরিবর্তিত করিবার ক্ষমতা তাঁহার থাকা চাই। এই পরিবর্তন যৎসামান্য হইতে পারে, কিংবা ব্যাপকও হইতে পারে। এই পরিবর্তনের ফলে পাঠক (বা পাঠিকা) লেখকের (বা লেখিকার) শত্রুতে পরিণত হইতে পারে কিংবা মিত্রও হইতে পারে। কিন্তু তাহাকে পরিবর্তিত হইতেই হইবে। তা সে পরিবর্তন যে কোন প্রকৃতির এবং যে কোন ধরণের হউক না কেন। নচেৎ মানের ক্ষেত্রে সে সাহিত্যের মান উচ্চ নহে। পড়িবার পূর্বে ও পরে যদি পাঠক একই ব্যক্তি রহিয়া যায়, তবে সে সাহিত্য অনেকখানি অর্থহীন।’<sup>১৬</sup>

ফজলুর রহমান ঝা ‘ভাষা ও বর্ণমালা’ প্রসঙ্গে প্রাচীন যুগের বিভিন্ন জাতি ও জনগোষ্ঠীর ভাষা ও বর্ণমালার আলোচনা শেষে মন্তব্য করেন : ‘আজকাল (১৯৬১) একদল লোক বেশীসংখ্যক লোকের ভাষাকে বা বর্ণমালাকে দেশে চালু করার কথা বলে থাকেন। কিন্তু প্রত্যেক দেশ ও ভাষায় সবচেয়ে আদিম যে জিনিস তা হচ্ছে ধ্বনি। প্রকৃতিজাত ধ্বনিকে বজায় রেখে সমাজে বর্ণমালার পরিবর্তন খুবই দুরূহ ব্যাপার। অন্তত রোমান অক্ষর চালু হওয়ায় তুরস্ক তা সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। তুরস্কে রোমান হরফ চালু হওয়ার সময়, সাময়িকভাবে আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছিল সত্য, কিন্তু পরবর্তী সময়ে তা কতকগুলি গুরুতর অসুবিধারও সূচনা করেছে। আর মুসলিম জাহান বিশেষ করে আরব দেশগুলির যে তুরস্ক মাত্র ২৫ বছর পূর্বেও ছিল শাসকের জাতি, তারা এখন শত্রুরূপে পরিগণিত হয়। তুর্কী নেতাদের ‘দেশী’ আরবী অক্ষরের বদলে বিদেশী রোমান হরফ গ্রহণই এই ব্যবধানকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে।’<sup>১৭</sup>

‘পূর্বপাকিস্তানী সাহিত্য : সতর্কতাচর্চা প্রসঙ্গে’ জর্নৈক আজীজুল হক মনে করেন ‘পশ্চিম বাঙলার আধুনিক সাহিত্যের চেয়ে পূর্ববাঙলার সাহিত্য অতিশয় হীন এবং পূর্ববাঙলার সাহিত্যের মর্যাদা পশ্চিম বাঙলার সাহিত্যিকদের প্রশংসা ও নিন্দার ওপর নির্ভরশীল—এমন সরাসরি হীনমন্য ধারণা আমরা এখন পোষণ করছি। একথা আজ সবাই বিশ্বাস করেন যে, বাংলাভাষা ও সাহিত্যের লালন-পালন বৃদ্ধি ও পরিণতি সাধনের ভার পূর্ববাঙলার ওপরই রয়েছে এবং আমাদের সাহিত্যের সার্থকতা ও ব্যর্থতা বিচার করতে এখন নির্ভরযোগ্য নবীন ও প্রবীণ সমালোচক আমাদের দেশেই রয়েছেন।... আমরা বিশ্বসাহিত্যের দরবারে উপযুক্ত মর্যাদা লাভের দৃঢ় আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করছি... এ প্রসঙ্গে একটা কথা অবশ্যই আমাদের ভেবে দেখবার প্রয়োজন আছে। বাংলাভাষা পশ্চিম বাঙলায়ও প্রচলিত। সেখানেও উন্নত সাহিত্য অনেক রচিত হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। পশ্চিম বাঙলা বিদেশে যতখানি নিজের প্রচার করে আমরা তা করি কি? পশ্চিম বাঙলার সাধনায় ও প্রসারে অর্জিত বিশ্বসাহিত্যের মর্যাদার ভাগে আমাদের কতখানি অধিকার আছে? যখনই আমরা ‘বিশ্বসাহিত্য’ উচ্চারণ করি তখনই দেশ থেকে বিদেশ পর্যন্ত আমাদের দায়িত্বক্ষেত্র বিস্তৃত হয়ে পড়ে।... বিদেশেও নিজমর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেই বিশ্বগৌরবের অধিকারী হব।<sup>১৮</sup>

সাহিত্য ও জাতীয় চেতনা শীর্ষক প্রবন্ধে মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম বলেন :

সাহিত্যিকগণ সামাজিক। তাই সমাজের অগ্রগতির তাগিদে তাদের নিজস্ব রচনায় নিজের জ্ঞানবিশ্বাসমতে একটা মতবাদ হওয়া স্বাভাবিক। সাহিত্যিক তাঁর নিজস্ব সৃষ্টি থেকে সুন্দরের যে রূপ দেখতে পান তাকেই প্রতিফলিত করতে চান সাহিত্যে। কেননা ‘হৃদয়বস্তির রাজ্যে অবগাহন’ করে বাস্তব নিরপেক্ষ সাহিত্য রচনার দিন আজ যে অতিক্রান্ত। একথা অস্বীকার করা যুগধর্মকে অস্বীকার করারই সমিল।... আজ আমরা আজাদ জীবনে অসংখ্য কর্তব্যের মোকাবিলা করে আমাদেরকে চেতনার পথে এগিয়ে যেতে হবে। আমাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিপুলে সাহিত্য এক বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। এদিকে সাহিত্যের নির্মল আনন্দধারায় অসুন্দরের ক্রন্দ মুছে দিয়ে নতুনপ্রাণের সঞ্চারণ করতে হবে, অন্যদিকে বাস্তবকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে আর্টের শ্রেষ্ঠত্ব দিতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে সাহিত্যসৃষ্টির মাধ্যমেই আমাদের জাতীয় চেতনার পথ সুগম হতে পারে। কেননা, সাহিত্যই আমাদের ভুলত্রুটি শুধরিয়ে চলার পথে নির্দেশ দিবে।<sup>১৯</sup>

আবদুল হক ১৯৬৮ সনে পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশ হবার যুগ সঙ্কীর্ণে ‘সংগাত’ এর পাতায় লিখেছিলেন ‘সাহিত্য উপভোগ ও সংস্কৃতি’ শীর্ষক একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ। ‘যাঁদের চিন্তায় ও অনুভবে নীতিবাদ অথবা নানারকমের গাঁড়া রাজনৈতিক আদর্শের ঐকান্ত এবং সার্বভৌম আধিপত্য এবং যাঁরা এইসব ‘বাদ’ এর অথবা রাজনৈতিক আদর্শের গজকাঠিতে সাহিত্যের দৈর্ঘ্য প্রস্থ মাপতে উৎসাহী তাঁরা সাহিত্যের পাঠক নন। কয়েকটি প্রাথমিক শর্ত পালন না করলে যেমন কেউ নিজেকে প্রকৃত নীতিবাদী অথবা ধর্মবাদী অথবা রাজনৈতিক আদর্শবাদী বলে দাবি করতে পারেন না, তেমনি কয়েকটি প্রাথমিক শর্ত পালন না করলে কেউ প্রকৃত রসজ্ঞ সাহিত্য পাঠক হতে পারেন না। সাহিত্য উপভোগের একটি প্রাথমিক শর্ত এই যে, সাহিত্যকে সাহিত্য হিসাবে নিতে হবে। শুধু এভাবেই সাহিত্য উপভোগ করা সম্ভব। এভাবে নিতে না পারলে সাহিত্য উপভোগ করা সুকঠিন এবং সাহিত্যের প্রকৃত রসজ্ঞ

পাঠক হওয়া প্রায় অসম্ভব, কেননা পৃথিবীতে, এমনকি যে কোন দেশে ও সমাজে নৈতিক, ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক আদর্শ এক নয়, বহু এবং অনেক ক্ষেত্রেই পরস্পর বিরুদ্ধ।<sup>১০</sup>

## ২. সওগাতের সমাজ-চিন্তা

সমাজের সকল ব্যাপারেই সওগাতের মতমত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ‘সাহিত্য সংঘ’ বা সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান সমাজের কল্যাণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ,—সে চিন্তা থেকে বিভাগ পরবর্তীকালের পূর্ব পাকিস্তানে নতুন সমাজের উন্নতির জন্য সওগাতের বক্তব্য গঠনমূলক কল্যাণাদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ভাষা পেয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসের তথ্যও বিবৃত করেছে সওগাত। ১৯৫২ সন পর্যন্ত জাতীয় সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান এদেশে গড়ে ওঠেনি এবং আমাদের সমাজের চিন্তাশীল বুদ্ধিজীবীরা সে বিষয়ে তেমন করে তৎপরও হননি। অথও বাঙলার হিন্দু মুসলমানে অথবা অথও বাঙালি সমাজের কল্যাণ কামনায় জাতীয় প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়েছিল সাহিত্যিক সংস্কৃতিকর্মীদের নেতৃত্বে—যেমন মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ইত্যাদি। তেমনি প্রতিষ্ঠান পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় সাহিত্য তথা পূর্বপাকিস্তানি জাতির কল্যাণের জন্যও যে অত্যাবশ্যক সে কথা ‘সওগাত’ উচ্চারণ করেছে সাহিত্য সমাজের সার্বিক উন্নতির তাগিদে।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পাঁচ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আমরা দুঃখ ও বিস্ময়ের সহিত লক্ষ্য করিতেছি যে, ঢাকায় সমবেত সাহিত্যিকবৃন্দ এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যেও কোনো সাহিত্য প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে পারেন নাই। পূর্ববঙ্গে প্রাচীন বাংলা সাহিত্য, লোক সাহিত্য, গ্রাম্য সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনার ও গবেষণার অবসর প্রচুর। কিন্তু কলিকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ন্যায় একটা শক্তিশালী সাহিত্য প্রতিষ্ঠান ঢাকায় গড়িয়া না উঠিলে একাজ কখনই সম্পন্ন হইতে পারে না।

যদি স্মরণ রাখা যায় যে সাহিত্যই জাতীয় জীবনের মূল উৎস, তাহা হইলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, এরূপ একটা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে আর আদৌ বিলম্ব করা উচিত নয়। আমাদের বিশ্বাস, ঢাকান্ত্র প্রবীণ ও শক্তিমান প্রভাবশালী সাহিত্যিকবৃন্দ যদি একটা কমিটি গঠন করিয়া এই শূভ কার্যে আন্তরিকতার সহিত হস্তক্ষেপ করেন, সারা পূর্ববঙ্গের সমর্থ সাহিত্যমোদী ব্যক্তির তাতে তো সাহায্য করিবেনই, প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় গবর্নমেন্টদ্বয়ও সেকাজে এককালীন ও পৌনপুনিক সাহায্য যথেষ্ট পরিমাণে দান করিতে উদ্বুদ্ধ হইবেন। আমাদের আরও বিশ্বাস, মত ও পথ নির্বিশেষে সকল সাহিত্যিক ও সাহিত্যমোদী ভ্রাতাই অকুণ্ঠভাবে সহযোগিতা করিতে অগ্রসর হইবেন।

এই আলোচনায় প্রসঙ্গত: কবি সাহিত্যিকদের গোত্রীয় বা শ্রেণীগত এবং ব্যক্তিগত সম্পর্কের একটি চিত্রও ফুটে উঠেছে :

আমরা অত্যন্ত দুঃখ ও লজ্জার সহিত শুনিয়াছি যে, পূর্ববঙ্গের বিশেষত: ঢাকায় সমবেত সাহিত্যিকগণের মধ্যে ব্যক্তিগত ও দলগত রেষারেষি অত্যন্ত প্রবল। এজন্য রাজধানীতে এ পর্যন্ত কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাহিত্য সভা গঠিত হইলেও কোনো বৃহৎ, শক্তিশালী ও সার্বজনীন সমিতি বা পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিতেছে না। এ সংবাদ সত্য হইলে এর চেয়ে পরিতাপের বিষয় আর কী হইতে পারে? যাহারা জাতির স্রষ্টা, তাহাদের মন যদি কোনো প্রশস্ত ক্ষেত্রে মিলিত হইতে না পারে, তাহা হইলে আর আমাদের আশা কোথায়? যাহোক, আমরা আশা করি, সুদী সাহিত্যিক ও সাহিত্যমোদী ভ্রাতৃবৃন্দ আমাদের এই প্রস্তাবটি যথাচিত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন এবং সঙ্গত বুলিলে অবিলম্বে এসম্পর্কে একটা সুস্থ কর্মসূচী গ্রহণ করিতে আগাইয়া আসিবেন।<sup>১১</sup>

রাজনৈতিক ব্যাপারেও সওগাত মতামত ব্যক্ত করেছে। মুসলিম লীগের সমালোচনায় সওগাত :

মুসলিম লীগ যেভাবে সংগ্রাম চালাইয়া পাকিস্তান অর্জন করিয়াছিল, ইতিহাসে তার তুলনা বিরল। এই অসামান্য কৃতিত্বের জন্য পাকিস্তানীরা লীগ প্রতিষ্ঠানকে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু পরিভাপের বিষয়, পাকিস্তান অর্জিত হওয়ার পর হইতে একাধিক কারণে মুসলিম লীগ জনসাধারণের শ্রদ্ধা ও সংস্পর্শ হইতে ক্রমশ দূরে সরিয়া পড়িয়াছে। আমাদের ধারণা এই যে, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক রাষ্ট্র সচিবদের হাতে লীগের কর্ম কর্তৃত্ব তুলিয়া দিলেই পরিস্থিতি বদলাইয়া যাইবে না। যখন কোনো রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান দেশবাসীর সন্মুখে আশা আকাঙ্ক্ষায় দীপ্তিমান কোনো মোহনীয় রাজনৈতিক লক্ষ্য মশালের মতো জ্বলাইয়া রাখে, জনসাধারণ অন্যসব কিছু ভুলিয়া পতঙ্গের মতো তাহার পানে ছুটিয়া চলে। কিন্তু সেই রাজনৈতিক অভীষ্ট সিদ্ধ হওয়ার পর জনগণ জীবনের স্বাভাবিক অবস্থানে ফিরিয়া আসে এবং সেই প্রতিষ্ঠানের কাছে বিবিধ জীবন সমস্যার সমাধান আশা করিতে থাকে। এই আশা পূর্ণ না হইলে তাহার প্রতিষ্ঠানের পূর্বেকার রাজনৈতিক কৃতিত্ব বিস্মৃত হয় এবং তার প্রতি বিরক্ত ও বিতৃষ্ণ হইয়া পড়ে। মন্ত্রীদের হাতে কর্ম কর্তৃত্ব অর্পণ করিয়াই জনমানসিকতার এই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া রোধ করা যায় না। তার জন্য চাই জনগণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণ। মুসলিম লীগের বর্তমান নেতারা যদি তা করিতে অগ্রসর না হন, ইসলাম বা পূর্ববর্তী মহান নেতাদের নামে শুধু ঐক্য, বিশ্বাস ও শৃঙ্খলার আহ্বান উচ্চারণ করিয়া বিশেষ ফল লাভ হইবে বলিয়া আমাদের আশা হয়না, কেননা ঐ আহ্বান সংগ্রামকালের উপযোগী, কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট তারিখেই সমাপ্ত হইয়াছে। লীগকে আজ অসময়োপযোগী আহ্বান জানাইয়া নয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়া স্বস্তিকর কর্ম তালিকা গ্রহণ পূর্বক তা কার্যে পরিণত করিতে অবিরাম চেষ্টা চালাইয়াই জনমন আকর্ষণ করিতে হইবে। কিন্তু এ করিতে গেলেই অর্থনৈতিক শ্রেণী স্বার্থের সংঘর্ষ স্বাভাবিক ভাবে দেখা দিবে। একথা সত্য যে, বণিক, জমিদার, জায়গীরদার প্রভৃতি শ্রেণীর লোকদের সাধারণত জনগণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থের পরিপন্থী হইতে দেখা যায়। লীগ ও জনগণের স্বার্থ এক, শুধু মুখে মুখে এই কথা বলিয়া তাঁহাদের মন ভিজাইবার চেষ্টা করিলে তা ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা প্রচুর।

জনসাধারণের আর্থিক ও সামাজিক মুক্তির পক্ষে সওগাত কথা বলেছে এবং লীগের জনগণের স্বার্থবিরুদ্ধ অর্থনৈতিক ও সামাজিক নীতির সমর্থন করা হয়নি ; বরং মুসলিমলিগারদের প্রয়াস যে বেশীদিন স্থায়ী হবার নয়, সাবধানতা অবলম্বনের পরামর্শ দিয়ে সেকথাও বলা হয়েছে।

দেশের কৃষি অর্থনীতি শিক্ষা সকল ব্যাপারেই সওগাত সমালোচনা করেছে, যেমন পাট সংকট। পাটের মূল্য না পাবার জন্য কৃষকদের দুর্ভোগের কারণ অনুসন্ধান করে তা থেকে মুক্তির উপায় উদ্ভাবনের জন্য সওগাত সুশৃঙ্খল সুযৌক্তিক মতামত পেশ করেছে। সমাজের কল্যাণের সঙ্গে কৃষক সম্প্রদায়ের কল্যাণও জড়িত। সওগাতের সমাজচিত্তায় পাট সংকটকে কেন্দ্র করে 'পাটের কথা' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে :

পাটের ব্যাপারে আজ যে সংকট সৃষ্টি হয়েছে, এর জন্য প্রধানত তিনটি পক্ষকে আমরা দায়ী মনে করি। প্রথম পক্ষ পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় বাণিজ্য বিভাগ। এই বিভাগের কর্তারা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের হালচাল বা গতি প্রকৃতি সম্বন্ধে এখনও যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে পারেন না। পারিলে পাটের সংকট সম্বন্ধে তাঁহারা পূর্বাঙ্কই সতর্ক হইতেন। দ্বিতীয় পক্ষ খোদ পাট চাষীরা ও দুর্নীতিপরায়ণ পাট চাষ নিয়ন্ত্রণকারীরা। পল্লীগাম সম্পর্কে তথ্যাভিজ্ঞ ব্যক্তির জ্ঞানেন, অসংখ্য চাষী লাইসেন্স রিনিউ না করিয়া এবং সম্পূর্ণ বিনা লাইসেন্সে প্রভূত পরিমাণ জমিতে পাট চাষ করিয়াছে। কিন্তু দুর্নীতিপরায়ণ নিয়ন্ত্রণকারীরা সে সংবাদ সরকারকে জানান না। ফলে সরকারী হিসাবের অতিরিক্ত হাজার হাজার মণ পাট বাজার নিম্নাভিমুখী করিতে সাহায্য করিয়াছে ; তৃতীয় পক্ষ হীন স্বার্থপর ব্যাপারী ও ব্যবসায়ীর দল। সরকার নিয়োজিত বহু এজেন্টও এই দলভুক্ত। তাহারা

চাষীদের দারিদ্র্যজনিত অসহায় অবস্থার সুযোগ লইয়া সরকার নির্ধারিত মূল্য দিতে অস্বীকার করে কিংবা পাট ওজন করার সময় দাঁড়িপাল্লার কারসাজির সাহায্যে এক মণ পাট পঁচিশ-ত্রিশ সের বানাওয়ায় লয় এবং চাষী এতে আপত্তি করিলে তাহার পাট কিনিয়া লইতে অসম্মত হয়।

আবার সরকারি এজেন্টরা সাধারণত মহকুমা-সদরে বসিয়াই পাট কিনিয়া থাকেন, পল্লীগ্ৰামে পদধূলি দেন না। এই সুযোগে ব্যাপারীরা অভাবের তাড়নায় উন্মত্ত চাষীদের নিকট হইতে যথেষ্ট মূল্যে পাট খরিদ করে। শূন্যিাছি, পূর্ববঙ্গের প্রায় প্রতিটি ইউনিয়নে মালটিপারপাস সোসাইটি গঠিত হইয়াছে। কিন্তু এটা সবাই জানেন যে, ইউনিয়ন প্রেসিডেন্টদের শতকরা প্রায় নিরানব্বইজনই ধড়িবাজ, শয়তান ও নররাক্ষসবিশেষ। কাজেই মালটিপারপাস সোসাইটিগুলির কতক কতক পাট কিনিতে নামিলেও সেখানে চাষীদের জবাই করার ব্যবস্থাই হইয়া থাকে। লাইসেন্স বহির্ভূত জমিতে উৎপন্ন পাট সম্পর্কে এব্যাপার আরও সহজ। এইভাবেই আজ এদেশে পাটের বাজারে ঘোরতর সংকট দেখা দিয়াছে। সুতরাং যাহারা পাট সম্পর্কে মাথা ঘামাইতেছেন, তাঁহাদের আগাগোড়া সমস্ত কথাই ভাবিয়া দেখিতে হইবে; শূন্য সরকারের কাছে দাবী উত্থাপন করিলে কিংবা এর দোষ ওর দোষ বলিয়া কষ্ট বিদীর্ণ করিলে ফললাভ হইবে না। পাট সংকটের প্রতিকার সর্বাত্মকভাবে করিতে পারিলেই তা সুসম্পন্ন হইবে; শূন্য একদিকে ঠেলা দিলে অন্যদিকে তা স্ফোটকের আকারে আত্মপ্রকাশ করিবে, ইহা নিশ্চিত।<sup>২২</sup>

মুসলিম লীগের বা সরকারের এমন কঠোর, কার্যকর সমালোচনা তৎকালের খুব কম পত্রিকাতেই পাওয়া যায়। স্মরণীয়, সওগাতের এই পর্যায়ে পাকিস্তান সাহিত্য সংসদসংশ্লিষ্ট প্রগতিশীল তরুণ সাহিত্যকর্মীগণ কাজ করতেন। মেধাবী আলোচনায় তাই তাঁরা উপযুক্ত ক্ষেত্রে যথার্থ আঘাত করতে পারতেন। মুসলিম লীগের কোনো খাতির করা আলোচনা তাঁরা ছাপেননি। কারণ লীগ বিরোধী রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রভাব সওগাতে বেশী ছিল বিভাগ পূর্ববর্তীকালের ন্যায় পাকিস্তান আমলের প্রথমার্ধেও। ১৯৫৪র সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল সমালোচনা করতে গিয়ে সওগাত সম্পাদকীয়তে উচ্ছ্বসিত বক্তব্য রাখে—তাতেই তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট হয়ে ওঠে—

...মুসলিম লীগের চূড়ান্ত পরাজয় ঘটিয়াছে এবং যুক্তফ্রন্ট আশাতীত রূপ সাফল্য লাভ করিয়াছে। প্রথমেই আমরা জনমতের এই বিপুল বিজয়কে আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি। একথা আজ নিঃসন্দেহে ও নির্বিবাদে বলা যাইতে পারে যে, পূর্ববঙ্গবাসীদের প্রতিনিধিত্ব করার কোন অধিকারই আর মুসলিমলীগের নাই।... দেশের রাজনৈতিক স্বাস্থ্যের দিক দিয়া বিবেচনা করিলে ইহাতে উল্লসিত ন! হইয়া পারা যায় না। আমাদের যতোদূর জানা আছে, দেশবাসীর বিরাগভাজন কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষে—বিশেষতঃ ক্ষমতাসীন দলের পক্ষে, নির্বাচনে এতোখানি ভীষণভাবে পরাজিত হওয়ার দৃষ্টান্ত আধুনিক গণতন্ত্রের ইতিহাসে বিরল। প্রাদেশিক লীগ সভাপতি এবং প্রধানমন্ত্রী তাঁহার সমস্ত মন্ত্রীসভাসহ নির্বাচনে পরাজিত হইয়াছেন। তাঁহাদের কাহারো কাহারো এবং অন্যান্য বহুলীণ প্রার্থীর জ্ঞানমতের টাকা পর্যন্ত ব্যাজেয়াপ্ত হইয়াছে। সুতরাং এই নির্বাচনকে 'বিনা রক্তপাতে বিপ্লব' বলিলেও আজ অত্যুক্তি হয় না।

মুসলিম লীগের এই শোচনীয় পরাজয়ের কারণ কি? প্রত্যেকটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আজ এই প্রশ্ন আলোচিত হইতেছে। মুসলিম লীগ নির্বাচনে জয়লাভের জন্য বৈধ অবৈধ কোন উপায় অবলম্বনেই ক্রটি করে নাই।...অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্ররিক্ষিতেই মন্ত্রীসভা ভাঙ্গিয়া দিবার প্রবল গণদাবী উপেক্ষা করিয়া নূরুল আমিন সরকার জোরপূর্বক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। সরকারী তহবিল ও শাসন যন্ত্রের সাহায্যে প্রদেশব্যাপী বিপুল অর্থব্যয়ে নির্বাচনী সফর ও প্রচারকার্য চালাইয়াছেন। কাইউম খাঁ, সর্দর নিশতার হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিম পাকিস্তানের ছোটবড় সকল লীগ নেতা, মায় মিস জিন্নাহ পর্যন্ত বৃদ্ধা বয়সে লীগের পক্ষে ওকালতির জন্য পূর্ববাঙলায় আসিয়াছেন। ইহা ছাড়া বিনা অজুহাতে ও বিনা বিচারে প্রদেশব্যাপী বিরোধীদের হাজার হাজার কর্মী, এমনকি নির্বাচন-প্রার্থীদের পর্যন্ত গ্রেফতার এবং সবশেষে ভাড়াটীয়া সৎবাদপত্রের সাহায্যে

যুক্তফ্রন্টের নেতাদের বিরুদ্ধে ভারত হইতে অর্থ সাহায্য গ্রহণ, ইসলাম-বিরোধিতা ও দেশদ্রোহিতার প্রচার চলাইয়া জনমতকে বিভ্রান্ত করারও কম চেষ্টা হয় নাই। কিন্তু এত সব সত্ত্বেও লীগের অবধারিত পরাজয় ঘোষণা যায় নাই। দীর্ঘ সাত বছর পর লীগ চক্রের শোষণ ও শাসনে রিজ, অতিষ্ঠ পূর্ববাঙলার সাড়ে চার কোটি মানুষ আশুস্ত হইয়া শুনিয়াছে স্বৈরাচারী শাসক লীগের অপমৃত্যু হইয়াছে। একুশ দফার ভিত্তিতে জনসাধারণের সার্বিক উন্নতি সাধনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যুক্তফ্রন্ট দল প্রদেশের শাসন ভার গ্রহণ করিতে যাইতেছেন। প্রদেশে মুসলিম লীগের এই পরাজয় শুধু পূর্ববংগের পক্ষেই নয়, গোটা পাকিস্তানের পক্ষেই অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও গভীর অর্থবল্লক। ইহার মধ্যে বিজয়ী দলের পক্ষেও যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বনের ইংগিত নিহিত রহিয়াছে।

‘পরাজয়ের কারণ কি?’ শীর্ষক আলোচনায় বলা হয় : পূর্ববাঙলার সাধারণ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের আশতীত সাফল্যে শুধুমাত্র পাকিস্তানের রাজনীতি ক্ষেত্রেই নয়, বিশ্বের ছোটবড় সকল রাষ্ট্রেই বিস্ময় ও আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। বৃটিশ মহল একে পূর্ববাঙলার গণতান্ত্রিক চেতনাবোধের আশাপ্রদ বিকাশ বলে অভিহিত করেছে। দেশের মানুষ যে তাদের অধিকার সম্পক্ষে সচেতন, প্রদেশের সাম্প্রতিক নির্বাচনই তার প্রমাণ। ... নির্বাচনী ফলাফল সম্পর্কে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মন্তব্য, ‘পূর্ববাঙলার জনসাধারণ মুসলিম লীগের তথাকথিত ধর্ম-স্বর্ষ আবেদন প্রত্যখ্যান করিয়া যুক্তফ্রন্টের গণতান্ত্রিক আবেদনে সাড়া দিয়াছে।’ আমাদের মনে হয় উক্ত মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করলেই মুসলিম লীগের প্রতি জনগণের অনাস্থা ও ‘উহার কারণ বোঝা যাইবে’। পাকিস্তান আন্দোলন সৃষ্টির যতই ধর্মভিত্তিক ব্যাখ্যাই দেওয়া হউক না কেন, একথা আজ প্রমাণিত যে অবিভক্ত ভারতের অনুন্নত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে সুস্থ, স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠালাভ এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশী ও বিদেশী শোষণ সম্প্রদায়ের শাসন হইতে আত্মরক্ষার জন্য নিজেদের হোমল্যাণ্ডের দাবী তুলিয়াছিল। গত সাত বছরে মুসলিম লীগ শাসনে তাহাদের এই আশা পূর্ণ হয় নাই। উপরন্তু অযোগ্য লীগ শাসনে দেশের যে চরম দুরবস্থা দেখা দিয়াছে, উহার ফলে আপামর জনসাধারণের জীবন ধারণের সামান্য ক্ষমতাও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। দেশের এই ভয়াবহ সংকট এতবেশী আলোচিত হইয়াছে যে, এ সম্পর্কে নূতন করিয়া আলোচনা অবাস্তর।’

দেশের সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁরা মন্তব্য করেন—‘দেশের কৃষিজাত প্রতিটি পণ্যের মূল্য হ্রাস, নিতানৈমিত্তিক দ্রব্যের অসম্ভব দাম, কর বৃদ্ধি, শিক্ষা সংকোচন, মহামারী, দুর্ভিক্ষ, কাপড়, কাগজ ও ঔষধের অভাব প্রভৃতি সমস্যা আজ দেশকে এমন অবস্থায় আনিয়া ফেলিয়াছে যে, কোনো সভ্যদেশে এ অবস্থা কল্পনা করাও অসম্ভব। কোন রকমে বাঁচিয়া থাকিবার এই ক্রেশকর পরিস্থিতিতে দেশের দূরবর্তী পল্লীর অস্ত, সরলমতি, মানুষও সচেতন না হইয়া পারে নাই। কিন্তু মানুষ যত সচেতন হইয়াছে, ক্ষমতাসীন লীগ চক্র ততই কঠোর দমননীতি মারফৎ গণবিক্ষোভ রোধ করার চেষ্টা করিয়াছেন। দেশের সমস্যা সমাধানে অক্ষম সরকার উপযুক্ত ব্যক্তিদের হাতে শাসনক্ষমতা তুলিয়া দিবার গণতান্ত্রিক নীতি গ্রহণ না করিয়া পুলিশী শক্তিতে দেশ শাসনের যে ব্রিটিশ নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন, জনমতকে উহা আরও বিক্ষুব্ধ ও শক্তিশালী করিয়াছে। শুধুমাত্র সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে নহে, পূর্ববাঙলার নূনতম স্বার্থের প্রতিও লীগ নেতৃবৃন্দের নির্লজ্জ বিশ্বাসঘাতকতাই জনসাধারণকে তাহাদের প্রতি ক্ষমাহীন করিয়া তুলিয়াছিল। বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার সর্বজনীন দাবী

দমনকল্পে নূরুল আমীন সরকারের হত্যাকাণ্ড প্রদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত করিয়াছে। শাসনতন্ত্র প্রণয়নে বিলম্ব, মূলনীতি রিপোর্টে বারবার পূর্ববাংলার স্বার্থ উপেক্ষা, গত সাত বৎসরে এই সকল অবিস্মরণীয় কীর্তিই লীগ সরকারের পরাজয়ের কারণ। তাই এবার ধর্ম ও ইসলামের নামে মুসলিম লীগের সকল প্রচারণার জবাবে উন্নত ও সমৃদ্ধ জীবন গঠনের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষায় পূর্ববাংলার মানুষ যুক্তফ্রন্টকে জয়যুক্ত করিয়াছে।'

### ‘নীতি ও নেতৃত্ব’ সম্পর্কে

...এই সংকটময় মুহূর্তে সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনকে পুনর্গঠনের জন্য কঠোর বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন যোগ্য নেতৃত্বের প্রয়োজন। প্রদেশবাসীর কাছে যুক্তফ্রন্ট নেতৃবৃন্দ তাহাদের যে সাংগঠনিক একুশ দফা কর্মসূচী পেশ করিয়াছিলেন, নির্বাচন অস্ত্রে উহা কার্যকরী করার জন্য আজ তাহাদিগকে তাহাদের নীতিনিষ্ঠা ও সততার পরীক্ষা দিতে হইবে। যদি নেতৃবৃন্দ এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, তাহা হইলে আমরা জ্বরের সহিত বলিতে পারি পূর্ববাংলার জীবনে নবযুগের সূচনা হইবে; জনসাধারণের গণতান্ত্রিক চেতনাবোধের পূর্ণ বিকাশ লাভ ঘটায় রাষ্ট্রীয় জীবনে সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ আলোকপাত করিবে। কিন্তু শুধুমাত্র প্রতিশ্রুতি দ্বারা জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করিয়া কেহ যদি ক্ষমতালভ করিতেই চাহিয়া থাকেন, তাহা হইলে উহার মারাত্মক পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করার প্রয়োজন রহিয়াছে।... জনগণ এই আস্থা নির্বাচনে ব্যক্তি বিশেষ বা দল বিশেষকে ভোট দেয় নাই—সাত বছরের পুঞ্জিভূত অসন্তোষ, বিক্ষোভ, হতাশা ও দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে তাহারা ঐক্যবদ্ধভাবে ভোট দিয়াছে। কিন্তু তাহাদের এই আস্থা ব্যর্থ হইলে প্রদেশব্যাপী এই গণচেতনা আবার রুখিয়া উঠিবে। লীগ চক্রের শোচনীয় পরিশাম সামনে রাখিয়া এই সত্য কাহারো পক্ষে বিস্মৃত হওয়া সম্ভব নহে।<sup>২০</sup>

আন্তর্জাতিক রাজনীতি অর্থনীতি এবং পররাষ্ট্রীয় নীতি সম্পর্কে সওগাত ‘চলতি দুনিয়া’য় নিয়মিত আলোচনা করেছে। ‘সাময়িকী’ বিভাগেও তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করতেন। ‘কাশ্মীর সমস্যা’ বিষয়ে একটি সম্পাদকীয়তে সওগাত লিখেছে :

ভারত বিভাগের পর কাশ্মীর নিয়ে কোনো সমস্যা সৃষ্টি হতো না যদি ভৌগলিক ও কৃষ্টিগত ভাবে সামঞ্জস্য ও ঐক্যবিবেচনায় পাকিস্তানের সঙ্গে কাশ্মীরকে দিয়ে দেয়া হতো; কিংবা বঙ্গ যদি বিভাগ না করা হতো তাহলে বাঙলা ও বাঙালি সংস্কৃতি ও বাঙালি জাতিকে চিরস্থায়ী দ্বন্দ্ব বিরোধ ও সরকারী বিভেদাত্মক সন্দেহপ্রবণ নীতির যাতাকলে পিষ্টও হতো হতো না। কিন্তু ইংরেজ কর্মকর্তা মেনন ও মাউন্টব্যাটেন এর ষড়যন্ত্র ও স্বশ্রেণীর স্বার্থের প্রেষণে এই দুটি স্থায়ী সমস্যা ভারত বিভাগের কালে সৃষ্টি করে দেয়া হয় সাম্রাজ্যবাদী কূটচক্রে। তাতে সহায়তা করেন ভারতীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ—হিন্দু, মুসলমান উভয়সম্প্রদায়। অবশ্য পূর্ববাংলার কোনো প্রতিনিধি ভারত বিভাগকালে সক্রিয় ভূমিকা যেমন রাখতে পারেননি, তেমনি কাশ্মীরী কোনো নেতাও ছিলেন না। ফলে কাশ্মীরের হিন্দু রাজার সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির কারণে কাশ্মীর ভারত এর ভাগে পড়ে যায়। লর্ড মাউন্টব্যাটেনের পরিকল্পনা ছিল তিনি ভারত ও পাকিস্তানের বড় লাট একসঙ্গে হবেন। কিন্তু জিন্নাহর কারণে তা না হওয়ায় তিনি অপমানিত বোধ করে চক্রান্তপূর্বক কাশ্মীরকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পাক ভারতে এ বিষয়ে বিরোধ দেখা দিলে মহাত্মা গান্ধীর পরামর্শে ভারত জাতিসংঘে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে নালিশ দায়ের করে।—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটিশ

কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে অতঃপর কূটনৈতিক খেলা জুড়ে দেয়। সে খেলা এখনও চলছে— ভারত প্রথমবারি জাতিসংঘের গণভোট সংক্রান্ত প্রস্তাব নানা ছল-ছুতায় অস্বীকার করে। জাতিসংঘ কাশ্মীর নিয়ে ভারত-পাকিস্তান দ্বন্দ্বের পরিণতিতে কাশ্মীরের ভাগ্য নিয়ে চিন্তিত নয় কখনই—কারণ তাঁরা তখন চেয়েছিল যেমন এখনও চায় যাতে রাশিয়ার প্রভাবে এ অঞ্চলে কমিউনিজমের প্রভাব বিস্তারিত না হয়।...

এই সম্ভাবনায় যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে সদলে রাখিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টায় মাতিয়া উঠিয়াছে—তাই আজ কাশ্মীর-বিরোধে পাকিস্তান ও কাশ্মীরের প্রতি সুবিচারের কোনো গুরুত্বই যুক্তরাষ্ট্রের কাছে নাই। বরং পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে যে জাতিসংঘের অস্থায়ী তর্ক-বিতর্কের অবসরে কাশ্মীর গ্রাস করিতে দিয়াও যদি ভারতকে সদলে টানিতে পারা যায়, তাতেও তার আপত্তি হইবে না। কাশ্মীর সম্পর্কে জাতিসংঘে তথা যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা আজ ইহাই। ইহা বুঝিয়াই আজ পাকিস্তানকে তার কর্তব্য নির্ধারণ করিতে হইবে।<sup>১৪</sup>

বিশ্বপরিস্থিতিও সওগাত খুব সূক্ষ্মদৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করেছে এবং যৌক্তিক ভাবে সমালোচনা করে জনমতকে সাম্রাজ্যবাদীদের বিপক্ষে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। আন্তর্জাতিক শান্তি-যুদ্ধের সম্ভাব্যতা এবং সাম্রাজ্যবাদীদের উদ্দেশ্য ফলাফল নিয়ে আলোচনা করে ‘আন্তর্জাতিক শান্তি’ শীর্ষক সম্পাদকীয় মন্তব্যে স্পষ্টতই বলা হয় যে, যুদ্ধের পরিবর্তে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার সংকল্প বিশ্বের সকল শক্তিশালী রাষ্ট্রনেতারা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করছেন, আবার সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের জন্য সামগ্রিক প্রস্তুতিও চালিয়ে যাচ্ছেন। আন্তর্জাতিক দুনিয়ার এটাই বৈশিষ্ট্য। পৃথিবী আজ স্পষ্টত দুটি ব্লকে বিভক্ত—প্রথমত পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী যুক্তরাষ্ট্র ও তার লেজুড ব্রিটেন ও ফ্রান্স। দ্বিতীয়ত সমাজতান্ত্রিক ও সম্প্রসারণবাদী ব্লক—রাশিয়া এবং তাঁর লেজুড এশিয়ার চীন ও পূর্ব ইউরোপের কতকগুলি রাষ্ট্র। দুই দলের একে অপরকে শান্তির শত্রু ও সম্ভাব্য আক্রমণকারী আখ্যা দিয়ে স্ব স্ব যুদ্ধ প্রস্তুতির যৌক্তিকতা সপ্রমাণ করতে চায় এবং পরস্পরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও আতঙ্ক ছড়িয়ে চলেছে। ফলে বিশ্ব শান্তি বিপন্নই থেকে যাচ্ছে। সওগাত এই পরিস্থিতিতে মন্তব্য করেছে :

বস্তুত জগতে পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের শেষ চিহ্ন মুছিয়া না যাওয়া পর্যন্ত যুদ্ধবিগ্রহ অবশ্যম্ভাবী বলিয়া মনে করার যথেষ্ট ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক কারণ দেখিতে পাওয়া যায়। মালয়, ইন্দোনেশিয়া, মরক্কো, তিউনিসিয়া, আলজিরিয়া, মিসর, সুদান, ইরান প্রভৃতি দেশের অতীত ও সাম্প্রতিক ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করিলে এটা নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারা যায় যে, শান্তির বিপরীত পথে চলিয়াই পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যস্বার্থীরা শান্তির ফাঁকা বুলি আওড়াইতেছেন। জগতের প্রত্যেক জাতির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নির্বিবাদে ভোগ করার অধিকার আছে। কিন্তু পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদীরা নানারূপ ভূঁয়া অজুহাতে (এবং প্রকৃত প্রস্তাবে পশুশক্তি বলে) উপরোক্ত দেশসমূহে নিজেদের শাসন ও শোষণের অবাধ সুযোগ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। ফলে শান্তি তরবারির ঘায়ে আহত হইয়া আতনাদ করিতেছে। পক্ষান্তরে সমুহবাদীরা মনে করিতে পারেন যে, যুদ্ধে মানুষের যে অবর্ণনীয় দুঃখ দুর্গতি ঘটে সেটা সমুহবাদের সম্প্রসারণের সম্পূর্ণ অনুকূল। এইজন্য যুদ্ধ হয়ত তাদেরও অকাম্য নয়। বিশেষত পুঁজিবাদ যখন সমুহবাদের মূলেচ্ছেদ করিতে সততই সমুৎসুক, সে অবস্থায় সামরিক সংঘর্ষ হয়তো শেষপর্যন্ত পরিহার করা যাইবে না। তবে একটা কথা এই যে যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়াই পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যস্বার্থীদের শোষণ মানুষের অশেষ দুর্গতি টানিয়া আনে। সেও সমুহবাদের প্রসার বৃদ্ধির অনুকূলে আস্থা সৃষ্টি করে। সুতরাং আক্রান্ত না হইলে সমুহবাদী ব্লক সমরে অবতীর্ণ হওয়ার প্রয়োজন অপরিহার্য নাও ভাবিতে পারে। কিন্তু পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যস্বার্থী ব্লক রাজনৈতিক স্বাধীনতাকামী জাতিগুলিকে দাবাইয়া রাখিতে চাহিবেই। সুতরাং যুদ্ধকে তাঁহারা কোনক্রমেই পরিহার্য ভাবিতে পারে না। এই দিক দিয়া বিচার করিলে সমুহবাদীদের তুলনায় পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যস্বার্থীদের শান্তি বাণী কৃত্রিম বলিয়া মনে হয়।



তবে এও নিশ্চিত যে সমূহবাদীরা যুদ্ধের জন্য অপ্রস্তুত থাকিবে না। সুতরাং আন্তর্জাতিক শান্তি আজ নির্ভরযোগ্য কোনো ব্যাপার নয়।<sup>২৫</sup>

পাক-মার্কিন সম্পর্কের পর্যালোচনা করে ১৯৫৪তে সওগাত তখনকার নানা চুক্তির মাধ্যমে পাকিস্তানকে আমেরিকার তাবেদার বানানোর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়—

যাহোক একথা হয়তো সত্য যে, আমাদের বর্তমান অবস্থায় ইং-মার্কিন অথবা তার বিপরীত সমূহবাদী ব্লকের দ্বারস্থ না হইয়া উপায়ান্তর নাই। কিন্তু আমাদের নেতারা সমূহবাদীদের সহিত ঘনিষ্ঠতা স্থাপন নানা কারণে পছন্দ করেন না ; এবং এও সত্য যে সমূহবাদী ব্লকের নিকট হইতে আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী সকল রকমের সাহায্য-সহযোগিতা পাওয়ার আশাও হয়তো করা যায়না। এই পরিস্থিতিতে অন্য কোন তৃতীয় বিকল্প সম্ভবপর বিবেচিত না হওয়াতেই পাকিস্তান বাধা হইয়া যুক্তরাষ্ট্রের সমীপস্থ হইয়াছে। ঋহারা নিরপেক্ষ থাকার নীতি উত্তম মনে করেন, তাঁহাদের বক্তব্য অশুদ্ধেয় না হইলেও এরূপ নীতির ফলে এদেশের অভাব ও দুর্বলতা দ্রুত কাটাইয়া ওঠার পথ দেখা যায় না। অথচ প্রবল প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের মনোভাব এমন অস্বস্তিকর যে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার দ্রুত বর্ধমান শক্তির পাশাপাশি দাঁড়াইয়া শক্তি অর্জনের সাধনায় ধীরগতি অবলম্বন করার ফল পাকিস্তানের পক্ষে বিপজ্জনক হইতে পারে। তুরস্কও এই অবস্থায় পড়িয়া যুক্তরাষ্ট্রের দ্বারস্থ হইয়াছে। যাহোক এও একেবারে মিথ্যা নয় যে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রয়োগের ক্ষেত্র সংকুচিত হইয়া পড়িবে। কিন্তু আমরা এও দেখিতেছি যে, ভারত নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করিয়াছে বলিয়া প্রচার করিলেও ক্রমশ রুশ-চীন ব্লকের নিকটবর্তী হইতেছে। অর্থাৎ নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন সম্ভবত আর বাস্তব রাজনীতির কথা থাকিতেছে না। এক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের দ্বারস্থ হইয়াও তার ‘উপনিবেশে’ পরিণত না হওয়ার চেষ্টা যথাসাধ্য চালাইয়া যাওয়া ছাড়া আমাদের উপায়ান্তর কি, জনাব ফজলুর রহমান বা বিরোধী দলের নেতারা তা বুঝাইয়া বলিলে দেশবাসীর কাছে ব্যাপারটা একটু পরিষ্কার হইয়া যাইত। যাহোক, একথা বলা আবশ্যিক যে, আমরা মার্কিন-ভক্ত মোটেই নয় ; কিংবা ভক্তির প্রাবল্যেই এইসব মন্তব্য করিতেছি না। এদেশের স্বার্থে স্বাধীনভাবে যাহা বৃথিতেছি, তাহাই বলিলাম মাত্র।<sup>২৬</sup>

বলা হয়েছে যে সমাজের ও সাংস্কৃতিক বিকাশের প্রতিটি প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে সওগাত পারতপক্ষে মতামত ব্যক্ত করেছে। ১৯৫৪ সনে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের সমর্থক ছিল বলে ‘ইন্ডেফাক’ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়। তখন সওগাত দীর্ঘ সম্পাদকীয়তে প্রকারান্তরে গভীর ধিক্কার জানায় এই অপসিদ্ধান্তকে। প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়—‘ইহা কিরূপ গণতন্ত্র?—এ জিজ্ঞাসার উত্তর কে দিবে?...৯২ (ক) ধারাকে অযথা রুঢ় করিয়া তোলার প্রয়োজন কি?’ ‘সাংবাদিকতার আদর্শ’ শীর্ষক সম্পাদকীয়তে বলা হয় : ‘সরকারী হামলা হইতে বিভিন্ন সংবাদপত্রের নিজস্ব মতামত প্রকাশের অধিকার অনাহত রাখার ব্যাপারে তাঁহাদের ঐক্যবদ্ধ আওয়াজ তোলার প্রথা খুবই ন্যায্যসঙ্গত।<sup>২৭</sup>

তাঁদের আক্ষেপ ছিল ‘আজিও সমাজ-মানস নির্বিঘ্নে সাহিত্যসৃষ্টির অনুকূল হয় নাই’<sup>২৮</sup> তাই দুনীতির প্রশ্নে ‘সিভিল সাপ্লাই বিভাগের বন্ধ ঘোষণার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে বলা হয় : ‘সিভিল সাপ্লাইয়ের কল্যাণে সমাজ-জীবনে দুনীতি অভূতপূর্ব আকারে দেখা দেয়। দুর্ভিক্ষের সময় এই বিভাগের কর্মকর্তারা মানুষের চরম বিপদের সূযোগে যেরূপ অসং উপায়ে অর্থ উপার্জন করিয়াছে, তাহার তুলনা খুঁজিয়া পাওয়া মুশকিল।’ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকে এই বিভাগটি সমাজে দুনীতির পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করে বলে এর বিলুপ্তি কামনা করলেও সওগাত এর ১০ হাজার কর্মকর্ত-কর্মচারীর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নিতেও পরামর্শ দেয়। তবে তাঁদের শেষ বক্তব্য “পূর্বঙ্গ সরকার সিভিল সাপ্লাই বিভাগ তুলিয়া দিবার সিদ্ধান্ত

গ্রহণ করিয়াছেন। দেৱীতে হইলেও এই সিদ্ধান্তটি অভিনন্দনযোগ্য সন্দেহ নাই। ‘কালো বাজার’ শব্দটি যুদ্ধপূর্ব সময়ে এদেশে একেবারেই অপরিচিত ছিল। ১৯৫৫ সনের বন্যার জন্যও সরকারকে দায়ী করে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বলা হয়।<sup>১৯</sup>

রবীন্দ্রনাথ ও পঁচিশে বৈশাখ সম্পর্কে সওগাতের দৃষ্টিভঙ্গি সাময়িক শাসনের মধ্যে প্রকাশিত সংখ্যাতে প্রকাশিত হয়েছে—‘আমাদের এখানকার একশ্রেণীর একদেশদর্শী লোকের মনে এরূপ ভ্রান্ত ধারণা (অথবা উদ্দেশ্য) রহিয়াছে যে, পূর্ববঙ্গবাসীদের পক্ষে রবীন্দ্রনাথের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য লইয়া গর্ব করিবার কিছু নাই। এইরূপ ধারণা সর্বজনীন প্রতিভাকে দেশকালপাত্রের ক্ষুদ্রগণ্ডিতে আবদ্ধ করিয়া ক্ষুদ্র চোক্ষে দেখিবার অভ্যাসমাত্র। ইহার মূলে কোন সততা বা নৈতিকতাবোধ নাই।...এখানে বসিয়াও যঁাহারা পশ্চিমবঙ্গের সাংস্কৃতিক প্রভাবের কল্পিত-জুঁজুর ভয়ে কাঁপেন, তাঁহারা আসলে হীনমন্যতারোগে ভুগিতেছেন এবং তাঁহাদের আত্মবিশ্বাসের মেরুদণ্ড বলিতে কিছু নাই। ইহাদের কাছে আমাদের একমাত্র জিজ্ঞাসা, বিপুল ও বিচিত্র বাংলা সাহিত্যের গত এক শতাব্দীর ঐতিহ্য আমাদের ন্যায্য পাওনা, ত্যাগ করিব আমরা কোন যুক্তিতে?’<sup>২০</sup>

উল্লেখ রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে সওগাত আগাগোড়াই বাস্তবসম্মত উদারদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছে। প্রথম দিককার সওগাতে তাঁর কবিতা ছাপা হয়েছে। মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছে এবং পরেও তাঁর এবং তাঁর সাহিত্যের ওপর লেখা প্রকাশ করেছে।

আইউব খানের প্রচেষ্টায় ‘লেখক সংঘ’ প্রতিষ্ঠিত হলে সওগাত সমর্থন করেছিল। ‘বর্তমান কেন্দ্রীয় শাসন কর্তৃপক্ষের আগ্রহ দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। প্রেসিডেন্ট আইউব খান সাহিত্যের জন্য ইতিমধ্যেই একটি ফান্ড খুলিয়াছেন। ইহাতে দেশের দুঃস্থ লেখকদের কিছু উপকার হইবে।’ তবে বি. এন. আর এর সহযোগিতায় বৈদেশিক (সাম্রাজ্যবাদী সংস্থার) অর্থ সাহায্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের অধ্যক্ষ ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন যে সাহিত্য-সেমিনারের আয়োজন করেন. তার সমালোচনায় সওগাত লিখেছে : ‘সেমিনারে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন একটি বিদেশী প্রতিষ্ঠান, ইহার কারণ কি? এদেশের সমকালীন সাহিত্যের ধারা হইতে তাঁহারা কোনো নিদিষ্ট তথ্য আহরণ করিতে চান কিনা তাহা আমরা জানি না।’<sup>২১</sup>

‘অর্থনৈতিক পুনর্বিদ্যায়’ শীর্ষক সম্পাদকীয়তে দেশের অর্থনৈতিক বাস্তবতা নিয়ে ভাবনার পরিচয় রয়েছে—

দেশের অর্থনৈতিক পুনর্বিদ্যায়ের প্রশ্নে আমাদের বক্তব্য হইল, বর্তমান অবস্থায় দুইটি দিকের প্রতি সমধিক গুরুত্ব আরোপ করা উচিত। এক হইল ভূমিসংস্কার এবং অন্য হইল, ভারী শিল্পের চেয়ে নিত্যব্যবহার্য শিল্পদ্রব্য উৎপাদনের উপর মনোযোগ দেওয়া। ভূমি সংস্কারের ব্যাপারে বলা যায়, কৃষকদের স্বার্থরক্ষাই হইবে ইহার মৌলিক লক্ষ্য। প্রয়োজন হইলে অসমতল ভূমি, বন, জঙ্গল, জলা আবাদের উপযুক্ত করিয়া কৃষকদের মধ্যে বন্টন করিতে হইবে এবং কৃষি উৎপাদনের মধ্যে আধুনিক কৃষি-পদ্ধতি ও যন্ত্রপাতির প্রচলন করিতে হইবে। এদেশের শতকরা আশি জনই কৃষক, সুতরাং কৃষকদের মঙ্গল সমগ্র দেশের মঙ্গল। আর নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের চাহিদা মিটাইবার জন্য এদেশের মহান কৃষ্টির শিল্পের ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধার করা প্রয়োজন।<sup>২২</sup>

আবুল ফজল প্রমুখের রচনায় সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে। তাঁর ‘রেখাচিত্রের’ একাংশে তিনি আক্ষেপের সঙ্গে বলেন, এদেশে সাম্প্রদায়িকতার ইতিহাস দীর্ঘ ও বহু ব্যাপক। আর দেশের পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠায় পাওয়া যাবে তার সংখ্যাতিত দলিল।<sup>৩৩</sup>

শিক্ষা-সংস্কার প্রয়াসের সমালোচনা করেছে সওগাত :

আমাদের দেশে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার যে প্রয়োজন, এ বিষয়ে দ্বিমত নাই। কিন্তু ঠিক কিভাবে সংস্কারকার্যে অগ্রসর হওয়া উচিত, এ সম্বন্ধে সরকারী ও বেসরকারী উভয় মহলেই চিন্তার অস্পষ্টতা ও অসামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়। সম্প্রতি এক সংবাদে প্রকাশ, পূর্ববঙ্গ সরকার শিক্ষা বিভাগীয় কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর পরামর্শক্রমে শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপক সংস্কারে উদ্যোগী হইতেছেন। প্রকাশ, ক্রমে ক্রমে সমস্ত উচ্চবিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষা প্রবর্তন করা হইবে এবং প্রত্যেক বিদ্যালয়ে কৃষি, পশু পালন, জনস্বাস্থ্য ও কারিগরী বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইবে। এজন্য পাঠ্যতালিকা পরিবর্তন করার প্রয়োজন হইবে। তবে সেই সঙ্গে যাতে শিক্ষার্থীদের উপর শিক্ষণীয় বিষয়ের মাত্রাতিরিক্ত চাপ না পড়ে, সেদিকেও নজর রাখা হইবে। কলেজীয় স্তরের শিক্ষাতেও কারিগরী শিক্ষার ওপর নজর দেওয়া হইবে। এই সরকারী পরিকল্পনা সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ না পাওয়া পর্যন্ত সুস্থ মতামত প্রকাশ করা চলে না। তবে একথা সাধারণ ভাবে সত্য যে, এযুগে কোন জাতি শুধু কলা ও সাহিত্যের সম্বল লইয়া ঐচ্ছিতে পারেনা। যাহোক,... আশাকরি... সরকার শিক্ষার স্তর ও ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যক্তিগত যোগ্যতা বা প্রবণতা বিচার না করিয়া একধার হইতে সকল স্তরে—সকল পাঠার্থীকে বিজ্ঞান ও কারিগরীর দিকে ঠেলিয়া দিতে চেষ্টা করিবেন না। তার ফল ভালো হওয়ার কথা নয়। অন্যান্য প্রগতিশীল দেশের প্রাথমিক, মধ্য ও মাধ্যমিক স্তরে সাধারণ শিক্ষার জন্য কতোটুকু স্থান রাখা হইয়াছে এবং কলেজীয় স্তরেই বা কিভাবে বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে; ... তাছাড়া কারিগরী দক্ষতার জন্য কতোখানি স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করা উচিত।<sup>৩৪</sup> মাতৃভাষায় উচ্চ শিক্ষার ব্যাপারে<sup>৩৫</sup> সমকালীন সংস্কার প্রয়াসকে এবং শিক্ষা-বিভাগের নানা কার্যক্রমকে সওগাতে সমালোচনা করা হয়েছে, আর নারীশিক্ষা ও নারীর অধিকার বিষয়ে অনুপ্রেরণামূলক রচনাও ছাপা হয়েছে।

সংস্কৃতির অর্থ যদি হয় সার্বিকভাবে একটি জাতির জীবন ও মননসাধনার বিভিন্নরূপের প্রকাশ—তাহলে সওগাতের ইতিহাস, দর্শন, কলা, শিল্প, নৃতন্ত্র সকল বিষয়ের আলোচনার দ্বারা একথাই প্রতীয়মান হয় যে, বাঙালির জাতীয় চারিত্র গঠন, পরিষ্কৃটন এবং বিকাশের লক্ষ্যে সওগাতে মূল্যবান আলোচনা অনেক হয়েছে।

বাঙলাভাষার বিশেষ করে মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রধান লেখক চিন্তকদের আলোচনা, বিশ্লেষণ এবং চিন্তার প্রক্ষেপণ প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়ে সওগাত বাংলাদেশের মননসাধনায় অসাধারণ ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে। অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি তার ছিল। এবং তৎসঙ্গে বাঙালি মুসলিম জাতি গঠনের লক্ষ্য তাঁদের মুখ্য হয়েছিল। সাহিত্যপ্রয়াসেও উপন্যাস, গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, আলোচনা, পুস্তক সমালোচনা, বিশ্ব সাহিত্যের অনুবাদ ছেপে এবং মুসলিম বিশ্বের চিন্তানায়কদের সাহিত্য শিল্প ও দর্শনের, আর ইসলামী ধ্যান ধারণাসহ এশিয়ার মুসলমানদের (পশ্চিম পাকিস্তানসহ) জাতীয় বিকাশের ধারার সঙ্গে পরিচয়ের মাধ্যমে সওগাত বাংলাদেশের মন, মনন ও চিন্তার খোরাক জুগিয়েছে। এই মূল্যবান অবদানের জন্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ‘সওগাত’ স্থায়ী মূল্য লাভ করেছে।

## তথ্যপঞ্জি

১. হাসান হাফিজুর রহমান ; খালেদ খালেদুর রহমান সম্পাদিত, জুন ১৯৮৩, পৃ. ১৮-১৯।
২. পূর্বোক্ত, পৃ. ২১।
৩. সম্পাদকীয়, সওগাত ৩৫ বর্ষ, ১ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৫৯।
৪. সওগাত ৪১ বর্ষ, ১ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৬৫, পৃ. ৫৭।
৫. একুশে ফেব্রুয়ারী স্মরণে, পূর্বোক্ত, ৫৩ বর্ষ, ৩-৪ সংখ্যা, মাঘ-ফাল্গুন ১৩৭৭।
৬. হাসান হাফিজুর রহমান, 'সওগাতের অর্ধশতাব্দী', আলোকিত গহবর, ঢাকা ১৯৭৭, পৃ. ৫৯।
৭. বিস্তারিত সূচীপত্র মৎপ্রণীত 'পূর্ব বাঙলার সাময়িকপত্র : প্রগতিশীল ধারায় দ্রষ্টব্য।
৮. সওগাত, সাময়িকী, ৩৫ বর্ষ, ১ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৫৯, পৃ. ৫৮।
৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯।
১০. খালেকদাদ চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৮।
১১. ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন, পূর্ববাঙলার সাহিত্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ১-৯।
১২. আবদুল গনি হাজ্জারী, 'সাহিত্যে বিপ্লববাদ' পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১।
১৩. আনিসুজ্জামান, 'প্রগতি সাহিত্য প্রসঙ্গে', পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২-৫৪।
১৪. সম্পাদকীয়, সওগাত, ৪১ বর্ষ, ১ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৬৫, পৃ. ৫৯।
১৫. মোহাম্মদ মোর্তজা, ভাষার রূপ, পূর্বোক্ত, ৪১ বর্ষ, ৬ সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৬৬, পৃ. ৪৬-৪৭।
১৬. পূর্বোক্ত, সাহিত্য সম্পর্কে, পূর্বোক্ত, ৪১ বর্ষ, ৮ সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৬৬, পৃ. ৯-১১।
১৭. ফজলুর রহমান খাঁ, ভাষা ও বর্ণমালা, পূর্বোক্ত, ৪২ বর্ষ, ৯ সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৬৮, পৃ. ৪৫৪।
১৮. আজীজুল হক, পূর্বপাকিস্তানী সাহিত্য : সতর্কতাচর্চা প্রসঙ্গে, সওগাত ৪৭ বর্ষ, ৬ সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৭১, পৃ. ৩৮০-৮১।
১৯. মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম, সাহিত্য ও জাতীয় চেতনা, সওগাত ৪৭ বর্ষ, ১১ সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৭১, পৃ. ৮৬৩।
২০. আবদুল হক, সাহিত্য-উপভোগ ও সংস্কৃতি, সওগাত ৫০ বর্ষ, ৩ সংখ্যা, মাঘ ১৩৭৪ পৃ. ১৫৩-৫৫।
২১. সাময়িকী, সওগাত, ৩৫ বর্ষ, ১ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৫৯।
২২. পাটের কথা, পূর্বোক্ত।
২৩. সাময়িকী, সওগাত, ৩৬ বর্ষ, ৫ সংখ্যা, চৈত্র ১৩৬০, পৃ. ৩১৬।
২৪. সাময়িকী, সওগাত, ৩৫ বর্ষ, ১ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৫৯, পৃ. ৬০।
২৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৩।
২৬. সাময়িকী, (পাক-মার্কিন সম্পর্ক), পূর্বোক্ত, ৩৬ বর্ষ, ১২ সংখ্যা, কার্তিক ১৩৬১, পৃ. ৬৯৩।
২৭. সাময়িকী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৮৯।
২৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৮৮।
২৯. সাময়িকী, পূর্বোক্ত, ৩৭ বর্ষ, ৪-৫ সংখ্যা, ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৬১, পৃ. ২৩৫-৩৬।
৩০. 'পঁচিশে বৈশাখ' (সাময়িকী), পূর্বোক্ত, ৪১ বর্ষ, ৬ সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৬৬ পৃ. ৫৯।
৩১. সাময়িকী, সওগাত, ৪১ বর্ষ, ২ সংখ্যা, পৌষ ১৩৬৫, পৃ. ৬১-৬২।
৩২. পূর্বোক্ত, ৪১ বর্ষ, ১ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৬৫, পৃ. ৫৮।
৩৩. আবুল ফজল, রেখাচিত্র, পূর্বোক্ত, ৪৭ বর্ষ, ১১ সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৭১, পৃ. ৯১১।
৩৪. শিক্ষা-সংস্কার, সাময়িকী, পূর্বোক্ত, ৩৬ বর্ষ, ১২ সংখ্যা, কার্তিক ১৩৬১।
৩৫. সওগাত, ৪৫ বর্ষ, ৪ সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৯, পৃ. ৪০৬।

## ২. ইমরোজ (১৯৪৯-৫৪)

পূর্ববঙ্গ থেকে প্রকাশিত সাহিত্যপত্রগুলোর মধ্যে ‘ইমরোজ’ এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করবার যোগ্যতা রাখলেও, পত্রিকাটি এখনও অপমূল্যায়িত বা অপরিষ্কৃত। কেবলমাত্র এই জানা ছিল যে : ‘ইমরোজ প্রায় পাঁচ বৎসর নিয়মিত প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি খ্যাতনামা লেখক-লেখিকাদের রচনায় সমৃদ্ধ ছিল। সম্ভবত আবু ইসহাকের ‘সূর্যদীঘল বাড়ী’ এই পত্রিকায়ই প্রথম প্রকাশিত হয়।’

গোলাম সাকলায়েন লিখেছেন : ‘ইমরোজের সম্পাদক ছিলেন কবি খান মুহম্মদ মঈনুদ্দীন...যে কবছর ...চালু ছিল ... নিউজপ্ৰিন্টেই বেরুতো। হাতে নিলে পাঠকের মন ভরতো না, তবে পাঠক-চিহ্নকে পরিতৃপ্ত করবার মতো রচনা যথেষ্টই থাকতো।... ইমরোজের...লেখক নিয়মিত...অন্যান্য সাহিত্যপত্রিকাতেও লিখতেন...পশ্চিম বাঙলার নামকরা লেখক (রাও) ...লিখতেন... ইমরোজকে কেন্দ্র করে তাই বলে কোন সাহিত্যিকগোষ্ঠী সৃষ্টি হয়নি। বিশেষ কোন মটো তার ছিল না।’

উপর্যুক্ত বক্তব্য অনেকটা মনগড়া। উন্নত মানের রচনায় ভরা থাকতো বটে, তবে ‘সূর্যদীঘল বাড়ী’ ইমরোজে নয়—নওবাহারে ছাপা হয়েছিল। ইমরোজের পাঁচ বছরের আয়ুষ্কালের পঞ্চম বর্ষে মাত্র সম্পাদকরূপে কবি মঈনুদ্দীনের নাম ছাপা হয়েছিল। প্রথম দুবছর সাত মাস মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ ; তৃতীয় বর্ষের অষ্টম-নবম সংখ্যা, আশাট-শ্রাবণ ১৩৫৯ থেকে চতুর্থ বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা, কার্তিক ১৩৬০ পর্যন্ত শেখ আবদুল হাকিম এবং পঞ্চম বর্ষ প্রথম, অগ্রহায়ণ ১৩৬০ সংখ্যা থেকে মঈনুদ্দীন এর নাম সম্পাদক হিসেবে ছাপা হয়।

পত্রিকাটির প্রথম চার বছরের কাগজ ভালো (সাদা, পাকশি) ছিল। সাইজ ছিল ডাবল ডিমাই ১/৮। পৃষ্ঠা ৬৪ এবং মাঝেমধ্যে বেশী বা কম। ‘পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য ও সংস্কৃতিমূলক শ্রেষ্ঠ মাসিক’ কথাটা তাঁরা পত্রিকার ইনারে ব্যবহার করতেন।

নিয়মাবলীতে বলা হয় : ‘রচনা প্রকাশনা বিষয়ে সম্পাদকীয় উপদেষ্টামণ্ডলীর মতামতই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে। পত্রিকা প্রতিমাসের তৃতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। ইমরোজের কার্যাধ্যক্ষের ঠিকানা ছিল ৩৭ বাংলাবাজার ঢাকা। মোহাম্মদ আবদুল খালেক কর্তৃক ঢাকা বাংলাবাজার প্রেসিডেন্সী প্রিন্টিং ওয়ার্কস থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হতো।’

অনুসন্ধানে জানা যায় পত্রিকাটি পরিচালনা করতেন প্রকৃতপক্ষে প্রখ্যাত পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরীর স্বত্বাধিকারী শ্রী অনিল চন্দ্র ঘোষ এম. এ.।<sup>৩</sup> তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির ছাত্র ছিলেন। তবে সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধ ও গ্রন্থও তিনি লিখেছেন। প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত বইয়ের বিজ্ঞাপনে দেখা যাচ্ছে তাঁর নামের আগে ‘সুসাহিত্যিক’ বিশেষণ প্রয়োগপূর্বক বীরত্রে বাঙ্গালী, ব্যায়ামে বাঙ্গালী, বিজ্ঞানে বাঙ্গালী, যুগের মানুষ, যুগের আলো, বৈজ্ঞানিক জগদীশ, কপালকুণ্ডলা (সংক্ষিপ্ত), আনন্দমঠ (সংক্ষিপ্ত) রবীন্দ্রনাথ, কেনারাম প্রভৃতি বইয়ের রচয়িতা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইমরোজের পাতাতেই এইসব বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছে। ‘রবীন্দ্রনাথ’ শীর্ষক একটি বই অনিলচন্দ্র ঘোষ ১৯৬১ সনে রবীন্দ্রজন্মশত বার্ষিকীতে প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী থেকে স্বনামে প্রকাশ করেছিলেন। কাজী আবদুল ওদুদকৃত ‘ব্যবহারিক শব্দকোষ’ গ্রন্থেও অনিল ঘোষের নাম পাওয়া যাচ্ছে বলে সম্প্রতি গবেষকদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে। তা হবারই কথা। কারণ ১৯৫০-৫২ সনের দিকে ‘ব্যবহারিক শব্দকোষ’র গায়ে কেবলমাত্র কাজী আবদুল ওদুদের নামই ছিল। অথচ পরবর্তীতে কাজী আবদুল ওদুদ ও অনিল চন্দ্র ঘোষ-এর নাম মুদ্রিত হয়েছে। ফলে এই কাজের কৃতিত্ব নিয়ে জল্পনা-কল্পনার সূত্রপাত হয়েছে। তবে অনিল ঘোষের প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরীর সাহিত্যপত্রিকা ইমরোজের বহু সংখ্যায় নিম্নোক্ত বিজ্ঞাপনটি ছাপা হয়েছে :

পূর্বপাকিস্তানের প্রথম অভিধান। খ্যাতনামা সাহিত্যিক কাজী আবদুল ওদুদ এম. এ. প্রণীত ব্যবহারিক শব্দকোষ। পূর্বপাকিস্তানের উপযোগী নতুন বাংলা অভিধান। গ্রন্থকারের দীর্ঘ একনিষ্ঠ পরিশ্রমের ফল। বহু নতুন আরবী, ফারসী, উর্দু শব্দের মূল উচ্চারণসহ বিশদ ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ। হাজার পৃষ্ঠার উপর। শুদ্ধ ছাপা ও সুন্দর বাধাই। এখন পূর্বপাকিস্তানে ইহা না হইলে চলিবে না। পুরাতন কোন অভিধানেই নবীন পাকিস্তানের ভাষা-সম্পদের পরিচয় মিলিবে না। এই অভিধান না দেখিয়া এবার অন্য বই কিনিবেন না।

তাছাড়া এই পত্রিকায় ‘ব্যবহারিক শব্দকোষ’ এর আলোচনাও আছে (৪র্থ বর্ষ ১১ সংখ্যা)।

অনুসন্धानে আরও জানা যায়, অনিলচন্দ্র ঘোষ নিজে লিখতেন না। তিনি অর্থের বিনিময়ে পাণ্ডুলিপি তৈরি করিয়ে নিতেন। সৌখিন ব্যবসায়ী ছিলেন। বয়সের দিক থেকে তিনি কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) অথবা আবুল ফজল (১৯০৩-৮৩)-এঁদের সমবয়সী ছিলেন। ১৯৬৬-৬৭ নাগাদ তিনি পাকিস্তান ছেড়ে সম্ভবত ভারতে চলে যান। এই সময়ের পর আর তিনি ঢাকায় ছিলেন না।<sup>৪</sup>

উল্লেখ্য, প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরীর শাখা কলকাতাতেও ছিল। ইমরোজে কলকাতা থেকে প্রকাশিত ‘মুকুল’ পত্রিকার সমালোচনা প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার সম্পাদক এর নাম অনিলচন্দ্র ঘোষ। একথা স্পষ্টতোই ধারণা করা চলে যে, অনিলঘোষ ব্যবসায়ী হলেও সাহিত্য সংস্কৃতি ও সমাজসেবার প্রতি তাঁর খেয়াল ছিল। সদ্য প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানের ভাষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংকটের কালে তিনি একটি প্রথমশ্রেণীর সাহিত্যপত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে সামাজিক সংকট প্রতিরোধে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছিলেন।

পত্রিকার দ্বারা তিনি হয়তো ক্ষতিগ্রস্ত হননি। তবে সাহিত্যপত্রিকা প্রকাশের ব্যাপারটাকে সদর্খক একটা কর্ম মনে করলে ; বিশেষ করে সেই ১৯৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩ ও ৫৪ সনের মতো অসৃষ্টিশীল, বন্ধ্য সাংস্কৃতিক পরিস্থিতিতে যখন অসাম্প্রদায়িক, বাংলা ভাষার সপক্ষে সুপারিশকারী নিয়মিত কোনো বলিষ্ঠ পত্রিকা ছিল না, মাঝে-মাঝে প্রকাশিত হচ্ছিল সীমান্ত, অগত্যা, মুক্তি, যাত্রিক, স্পন্দন— কিন্তু এঁদের শক্তি তেমন জোরদার ছিল না? এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কমজোর প্রয়াসের সঙ্গে মিলেছিল শক্তিশালী সুসংগঠিত ব্যবস্থাপনার ‘ইমরোজ’। ফলে দলে ভারী নাহলেও শক্তি জুগিয়েছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদী আর বায়ামোর

একুশে ফেব্রুয়ারির সংগ্রামীদের। যদিও এঁদের বিপক্ষে ছিল একঝাঁক শক্তিশালী নিয়মিত ও অনিয়মিত পত্রিকা।

সওগাত প্রকৃতপক্ষে ১৯৫৩তে প্রকাশিত হলেও ১৯৫৮ সন পর্যন্ত অনিয়মিত ছিল। আর সাময়িক শাসনের সময়ে বৃদ্ধ সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন ততোটা বিপ্লবীও হতে পারেননি। তাছাড়া সওগাত ১৯৪৯ সনে কলকাতার জীবন শেষ করে ঢাকা এসে যখন বের হয়নি, বন্ধ—তখন এখান থেকে নিয়মিত মাসিকের আকারে প্রকারে ও সামর্থ্যে প্রকাশিত হচ্ছিল ইমরোজ এবং এতে বাঙালির জীবনভাবনা অকপটে রূপ পাচ্ছিলো। তাই নানান ঐতিহাসিক সামাজিক কারণের সমন্বয়ে ইমরোজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী একটি মাসিক সাহিত্যপত্রিকা ছিল, তা বলতেই হবে।

মোহাম্মদী, মাহেনও, আল-ইসলাহ, নওবাহার, দ্যুতি, তাহজিবের সাধনা ছিল যেখানে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার, সেখানে অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক আধুনিক রাষ্ট্র ও মাতৃভাষার নির্বাধ নিঃশঙ্কচর্চার উপযোগী সাহিত্যপরিবেশ সৃষ্টিতে ইমরোজ সুদৃঢ় অবস্থান নিয়েছিল। সমকালীন যুগের দাবী মেটানোর বিচারে এর মূল্য তাই অপরিমিত।

‘ইমরোজ’ কথার মানে ‘আজকে’ টুডে অতএব এর সুস্পষ্ট বা ‘বিশেষ কোনো মটো ছিলনা’ কথাটা ঠিক বলে মনে হয় না। গোষ্ঠী তৈরীতে সফল না হলেও ইমরোজ এদেশের প্রধান লেখক চিন্তাবিদ, বুদ্ধিজীবীদের রচনার সঙ্গে স্বকীয় সম্পাদকীয় বক্তব্য দ্বারা যোদ্ধার মনোভাব নিয়ে তৎকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক সংকট মোকাবিলা করতে চেয়েছিল,— তাঁদের ‘মটো’ ছিল বাংলা ভাষার প্রতিষ্ঠা, বাঙালির স্বার্থ রক্ষা করা। অবশ্য একথাও স্মরণ রাখতে হবে যে তৎকালে বাঙালিপনা বিশেষ ভীতির বিষয় ছিল। কমিউনিস্টরা নিগূহীত হচ্ছিলেন। সাধারণ মানবতাবাদী লেখকচিন্তকেরাও উচিত কথা বলতে পারতেন না। পাকিস্তানের ভণ্ড সরকারের দূরভিসন্ধি প্রকাশ হয়ে পড়ে এমন যুক্তিসিদ্ধ কথা বললে ‘ভারতের দালাল’; ‘বিচ্ছিন্নতাবাদী’; ‘দুই বাংলার আঁতাতকারী’; কমিউনিস্ট বলে চিহ্নিত হতে হতো। তখন কমিউনিস্টরা পাকিস্তানবাদীদের শত্রুরূপে গণ্য হতেন। ‘বাঙালি’রাও বটে। আর হিন্দু হলেতো কথাই নেই। বিশেষ সন্দেহের পাত্র তাঁরা।

ফলে মুসলমান সমাজের কাছে বক্তব্য গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য অনিল চন্দ্র ঘোষ মুসলমান সম্পাদক নিয়োগ করে মুসলমান কর্মচারীর দ্বারা প্রকাশ করেছিলেন নামে ধামে চেহারায় প্রচ্ছদে ইত্যাদিতে মুসলমানদের পত্রিকা বলে মনে হয় এমন একটি পত্রিকা। মাহেনও, নওবাহার, নওরোজ প্রভৃতির মতোই শুনতে ‘ইমরোজ’। অনেকেই তাই নাম শুনে এটাকে ঐ ধারার পত্রিকা বলে ভুল করতেন বা করছেন।

যাহোক, ইমরোজের প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়ভাষ্যে পত্রিকার উদ্দেশ্য আদর্শ লক্ষ্য এবং বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁদের যে চিন্তাধারা উপস্থাপিত করেছেন, তাতেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এই পত্রিকা কি ভূমিকা পালন করতে চায় :

ইমরোজ প্রকাশিত হচ্ছে। ইংতাপূর্বে পূর্বপাকিস্তানের রাজধানী ঢাকা থেকে আরও কয়েকখানি বাংলা মাসিক বেরিয়েছে। আজ চলার পথে অগ্রজদের অভিনন্দন জানাচ্ছি।

ইমরোজ কোন দল বা ব্যক্তিবিশেষের পত্রিকা নয়। এর উদ্দেশ্য হবে সত্যিকার সাহিত্য প্রচার। নূতনত্বের সত্তাবনাপূর্ণ মৌলিক রচনা পরিবেশনের দিকেই ইমরোজ বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখবে। উচ্চরচিত গল্প, কবিতা, উপন্যাস, নাটক, রস-রচনা, প্রবন্ধ ও ইসলামীয় দৃষ্টি ও সংস্কৃতিমূলক আলোচনা ইমরোজ-এ নিয়মিত প্রকাশিত হবে। বিভিন্ন দেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে বাঙালী পাঠকের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশের অনুবাদ সাহিত্যও এর অংগীভূত থাকবে। আমাদের চলার পথে আজ সকলের সহানুভূতি আমাদের পাথেয়।

স্বাধীনতা অর্জিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতি-চর্চার ক্ষেত্র আজ সীমাবদ্ধ। বর্তমানে হটগোলের পরিবর্তে গঠনমূলক কর্মপন্থা অনুসরণের প্রয়োজনীয়তাই বেশি। আমাদের নতুন রাষ্ট্রকে সকল দিক দিয়ে সমৃদ্ধ করে তুলবার কাজে আমাদের আত্মনিয়োগ করতে হবে। সাহিত্য, শিল্প ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনের উপরই রাষ্ট্রের আসল উন্নতি নির্ভর করে। রাষ্ট্রগঠনে ও রূপায়ণে ভাষা ও সাহিত্যের স্থান প্রথম। নতুন রাষ্ট্রে, নতুনতম পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের চর্চা আমরা একটি প্রধান জাতীয় কর্তব্য বলেই মনে করি। সাহিত্যের মধ্য দিয়েই স্বাধীন পাকিস্তানের জনগণের ভাষা ও আশা আত্মপ্রকাশ করবে; নতুন সাহিত্য দানা বাঁধবে, দেখা দেবে নিত্যানবনব চিন্তাধারা, বলিষ্ঠতর কম্পনা।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যে নবযুগের সূচনা হয়েছে। এতোকাল এ সাহিত্য ছিল কলিকাতাকেন্দ্রিক। সেখানকার জীবন যাত্রার সুস্পষ্ট ছাপ ছিলো বাংলা সাহিত্যের সর্বক্ষেত্রে। এ নামাবলী ছাড়া অন্যকিছুর সাহিত্য বলে পরিচিত হবার অধিকার ছিলো না। পূর্ববঙ্গের বহু প্রতিভাশালী লেখককে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বিসর্জন দিয়ে কৃত্রিমতার অনুসরণ করতে হয়েছে। 'ঢাকার বাঙ্গাল কলকাতাইয়া বনিয়া গিয়াছেন।' ফলে পূর্ববঙ্গের জনগণের ভাবধারা, বাংলা সাহিত্যে স্থান করে নিতে পারে নাই। যে বাংলা সাহিত্যের হওয়া উচিত ছিলো বাংলার সমগ্র জনগণের সাহিত্য সে তা না হয়ে হয়েছে বাংলার অংশ বিশেষের ও বিশেষ করে সম্প্রদায় বিশেষের সাহিত্য। পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা হওয়াতে এ অস্বাভাবিক অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। বাংলা সাহিত্য সত্যিকার জনগণের সাহিত্য হওয়ার সুযোগ এসেছে।

আজ রাষ্ট্রীয় পরিবর্তন যে শুভ সুযোগ এনেছে তার সদ্যবহার করতে হবে। এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, রাষ্ট্রের উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতকে লক্ষ্য করে সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে তুলতে হবে। একাজ চাঁচামেচি অথবা বিতর্কের নয়—মুখ্যত এ দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে শক্তিশালী লেখক ও চিন্তা-নায়কদের যারা দ্রষ্টা ও স্রষ্টা হিসেবে স্বাধীন পূর্বপাকিস্তানের বাংলা সাহিত্যকে রূপদান করবেন।

পূর্ববঙ্গে সাহিত্যের উপাদান প্রচুর। পল্লীগীতি, বাউল গান, গ্রাম্য ছড়া মেয়েলী গান ইত্যাদি লোক-সাহিত্যের মূল্য যথেষ্ট। এগুলো পূর্ববঙ্গের নিজস্ব সম্পদ এবং গর্বের জিনিস। বিভিন্ন সংঘাতের মধ্যেও এগুলো বেঁচে রয়েছে। একে আজ নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে রূপায়িত করতে হবে; যাতে এ নতুন পরিবেষ্টনীতে নতুন রাষ্ট্রের সহায়ক হয়ে উঠে, এ রাষ্ট্রের কল্যাণকর কাজের জন্যে জনগণকে উজ্জীবিত করে তুলতে পারে।

পূর্ববঙ্গে সাহিত্যক্ষেত্রে একটি শূন্য লক্ষণ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। আমূল পরিবর্তনের মাঝখানে এখানকার সাহিত্যে এখনো কোন সন্ধ্যা বা ডিস্টেন্ট এর অভ্যুদয় সম্ভবপর হয়নি। অবশ্য পূর্বপাকিস্তানের নতুন সাহিত্যের শৈশবাবস্থায় কারো কারো মনে সে মসনদ প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা ছিলো না একথা জোর করে বলা চলে না। হয়তো দু'একজনের মনে অভিযুক্ত হওয়ার গুণ্ড বাসনা ছিলো। কিন্তু আজ দেশের চেহারা বদলে গেছে, আজকের দিনে তা আর সম্ভব নয়। আজকের দিনে পূর্ববঙ্গের সাহিত্য হবে সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই নব সূচনার প্রারম্ভে দেখা দিয়েছে কতগুলো অন্তরায়। যে শক্তিময় অংশ এতদিন একে পোষণ করে আসছিলেন তাঁরা আজ রাজনীতির খাতিরের উদার মানসিকতাকে বিসর্জন দিয়ে সংকীর্ণ সীমাবদ্ধ গণ্ডীর দিকে মুখ ফিরিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গে তার পূর্ব ঐতিহ্যকে অনুসরণ করেই সিংহাসনের অধিকারীকে পূজা করতে অগ্রসর হচ্ছে—সংস্কৃত ও হিন্দীই আজ তার লক্ষ্য। নিঃস্বার্থভাবে গড়ে উঠলেই সত্যিকার সাহিত্য গড়ে উঠে—অন্যের মন যুগিয়ে চলতে শুরু করলেই সাহিত্যের ঘটে অবনতি। পশ্চিমবঙ্গের



সাহিত্যে এই অবনতির সূচনা দেখা দিয়েছে—তার সাহিত্যের স্থানে জায়গা পাচ্ছে অঙ্ক কুসল্কারাচ্ছন্ন মানসিকতা; বাঙলার সাহিত্য এখন সত্যিকার সাহিত্য হিসেবে বেঁচে থাকতে পারে একমাত্র পূর্বপাকিস্তানে।

পূর্ববঙ্গের বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধ সত্তাবনার সম্মুখে দেখা দিয়েছে ক্ষুদ্র একটা কালো মেঘ। উর্দু পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে এই আওয়াজ শুনাই কোন কোন মহল থেকে ধর্মের ধূয়া ধরে বাংলা ভাষাকে নস্যৎ করবার প্রয়াস দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। নিজেদের সাময়িক সুবিধা বা স্বার্থসিদ্ধির খাতিরে তাঁরা যে ইসলামদ্রোহিতাই করছেন তা উপলব্ধি করার ক্ষমতাও তাঁরা হারিয়ে ফেলেছেন। তাঁরা ভুলে বসে আছেন যে ইসলাম কোন ভাষা বিশেষের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। যে ধর্ম বিশ্বপ্লাবী, মহান, পবিত্র ও শক্তিশালী তাকে কোনো একটা ভাষার মধ্যে আবদ্ধ রাখার কল্পনা সেই ধর্ম-দ্রোহীতাই সামিল। এর সর্বত্র বিস্তার করার জন্যে দরকার সর্বভাষায় এ ধর্মের চর্চা ও অনুশীলন।

চার কোটি মুসলমানের মাতৃভাষা হয়েও যদি বাংলা সাহিত্য ও ভাষার মধ্যে ইসলামিক আদর্শ যথাযোগ্য স্থান না পেয়ে থাকে, ভাষা ও সাহিত্য তার জন্যে দায়ী হতে পারে না। ইসলাম প্রবর্তনের পূর্বকার আরবী ভাষায় কোন ইসলামিক আদর্শ ছিল না। অনৈসলামিক আরবীভাষার রূপ না বদলিয়েই ইসলামিক ভাষায় পরিণত হয়েছিল, বাংলা ভাষারও তেমন না হওয়ার কোন কারণই থাকতে পারে না। কোন ভাবধারা ভাষা ও সাহিত্যে স্থান পাবে তা নির্ভর করে সেই ভাষাভাষী চিন্তনায়কদের উপর। বাংলা ভাষার ইসলামিক আদর্শের অভাবের জন্যে দায়ী এই চার কোটি লোকের নেতা বলে পরিচয় দিয়েও এতদিন যারা অভিজ্ঞাত্যের উচ্চ শিখরে বসে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য ছেড়ে অন্য ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা করেছেন।

এই অস্বাভাবিক ও অবাপ্তিত অবস্থার পরিবর্তন করে পূর্ব পাকিস্তানকে সচেতন করে তুলতে হবে। তার ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে ইসলামিক আদর্শ ও ভাবধারা ফুটিয়ে তুলতে হবে। তবেই এ ভাষা ও সাহিত্য পূর্ণাঙ্গ ও সর্বসুন্দর হতে পারবে। ইমরোজ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে এই সর্বসুন্দর করবার উদ্দেশ্য নিয়েই আত্মপ্রকাশ করেছে। এই উদ্দেশ্য সফল করতেই আত্মনিয়োগ করবে।<sup>৫</sup>

ইমরোজে কবিতা লিখেছিলেন : কাজী নজরুল ইসলাম, কিরণশংকর সেনগুপ্ত, প্রজেশ কুমার রায়, জসীমউদ্দীন, শাহাদৎ হোসেন, এ. এন. এম. বজলুর রশীদ, খোন্দকার মাসুদার রহমান, আবদুল হাফিজ (অনুবাদ, হাফিজের দীওয়ান থেকে), বেগম সুফিয়া কামাল, শ্রী সুবোধকুমার রায়, আবদুল কাদির, ওহীদুল আলম, শামসুদ্দীন, মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা, মনোজরায় চৌধুরী, আবুল হাশেম, শ্রী করুণাময়ী হালদার, সিরাজুল হক, দেওয়ান গোলাম মরতুজা, এ. কে. এম. নূর মোহাম্মদ বিদ্যাবিনোদ, এম. এ. হাকিম, আবদুর রউফ, ছদরুদ্দীন, বেনজীর আহমদ, শেখ আবদুল হাকিম প্রমুখ।

গল্প লিখেছিলেন : সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (চুল, ১/১) ; নেশাদ বানু, স্টিফেন জিক (অনুবাদ : মাহবুব জামাল জাহেদী, 'ইনভিজিবল কালেকসন', ১/১) ; হামেদ আহমদ (নতুন বৌ, ২/২ ইত্যাদি) ; মবিনউদ্দীন আহমদ (পাগলা বাবা, ১/২ ; ১/৮ পাজ) ; আশরাফউজ্জামান (নতুন দিগন্ত, ১/২ ; কলঙ্ক ১/৯) ; আহমদ পারেছউদ্দিন (লেখক, ১/৩; প্রায়শ্চিত্ত, ১/৫ ; আজরাইলের সহিত কয়েক মুহূর্ত, ১/৬-৭ ইত্যাদি)।

ইমরোজে কবিতার চেয়ে গল্প উপন্যাস নাটক বেশি ছাপা হয়েছে। সে তুলনায় প্রবন্ধ গৌণ নয়। আর দীর্ঘ সম্পাদকীয় লেখা হয়েছে প্রায় প্রতি সংখ্যায়। বক্তব্যপ্রধান পত্রিকা এটি নিঃসন্দেহে। উপন্যাস কিংবা উপন্যাসধর্মী রচনা এতে লিখেছেন যারা তাঁরা হচ্ছেন : নওশাবা (আন্দর ও বাহির, ১/১ থেকে) ; হামেদ আহমদ (ত্রন্দসী, ১/১ থেকে) ; খলিলুর রহমান

চৌধুরী (প্রত্যাখ্যান, ১/৮ থেকে) ; আহমদ পারেছ উদ্দিন (নতুন যুগের মানুষ, ১/১২ থেকে, বাঙ্গালী, ২/৩ থেকে, মুক্তি, ৩/৪ থেকে) ; মবিনউদ্দীন আহমদ (খোলস, ২/১ থেকে) ; শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (কয়লাকুঠির দেশ, ৩/১ থেকে) ; কাজী আফসার উদ্দিন আহমদ (নোনা পানির ঢেউ, ৪/১ থেকে) ; আলাউদ্দিন খান (মুসাফির, ৪/১) ; শ্রীসুশান্ত কুমার রায় (অনুবাদ করেছিলেন কোনাল ডায়ারের উপন্যাস 'নৌসঙ্কি রহস্য' ৪/৪ থেকে) ।

এক বা একাধিক অঙ্কের নাটক বা নাটিকাও কম প্রকাশিত হয়নি এতে। এ তালিকায় আছেন আবুল ফজল। তাঁর 'কায়েদে আজম' শীর্ষক নাটকের অপ্রকাশিত দৃশ্য প্রকাশিত হয় প্রথম বর্ষ পঞ্চম সংখ্যায়। তাঁর 'পাকিস্তান' শীর্ষক নাটিকা প্রকাশিত হয় প্রথম বর্ষ ষষ্ঠ-সপ্তম সংখ্যায়। বেগম সুফিয়া আহমদ এর নাটিকা 'ঘুঘু' প্রকাশিত হয় দ্বিতীয় বর্ষ অষ্টম সংখ্যায়। মির্জা আ. মু. আবদুল হাইয়ের 'পণ্য' প্রকাশিত হয় দ্বিতীয় বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা থেকে ; দৌলতননেছা খাতুনের একাঙ্ক নাটক 'বৈজ্ঞানিক' প্রকাশিত হয় প্রথম বর্ষ নবম সংখ্যা থেকে এবং 'স্লেচ্ছ মালাউন' দ্বিতীয় বর্ষ চতুর্থ-পঞ্চম সংখ্যা থেকে। আহমদ পারেছউদ্দীনও লিখেছেন একাঙ্ক নাটক 'ঝড়ের রাতে' তৃতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যা থেকে ; শ্রী প্রবোধ কুমার বসু 'মাধব-মালধ' তৃতীয় বর্ষ দ্বাদশ সংখ্যায় ; মবিনউদ্দিন আহমদ 'নাক' চতুর্থ বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যায় ; ডাক্তার মোহাম্মদ হোসেন চতুর্থ বর্ষ নবম-দশম সংখ্যা থেকে ক্রমশ লেখেন 'তিনবন্ধু'। হেনা প্রথম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যায় রূপক নাটিকা লিখেছিলেন 'সবুজের স্বপ্ন' ; ওহীদুল আলম কাজী নজরুল ইসলামকে নিয়ে লিখেছিলেন 'বিদ্রোহী কবি' পঞ্চম বর্ষ পঞ্চম সংখ্যায়। তাছাড়া মাহবুবুল আলম নব্বা লেখেন 'পাড়াগাঁয়ের ধাঁধা' (৩/৬)। আপটন সিন ফ্লেয়ারের তিন অঙ্কের নাটক Giants struggle এর অনুবাদ করেন আবদুল হাফিজ (২/১০-১১)।

ইমরোজের লেখক ও বিষয়বস্তুতে প্রতীয়মান হয় হিন্দু-মুসলমান উভয়েই সকল সম্প্রদায়ের স্বার্থে বা কল্যাণে এর পাতায় জ্ঞানের চর্চায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। অসাম্প্রদায়িক মানবিক চেতনা এর প্রতিটি রচনার মূল প্রেরণা। বাংলাভাষা ও বাংলাদেশকে তাঁরা আলোচনার মুখ্য কেন্দ্র ধরে অগ্রসর হয়েছেন। তবে তাতে রাষ্ট্রদ্রোহিতা ছিল না। নিজ স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে কেউ অসন্তুষ্ট হলেও তাতে কিছু এসে যায় না এমনই ছিল মনোভাব।

ইমরোজের কাগজ অধিকাংশ সংখ্যাতে সাদা ভালো মানের ছিল। প্রচ্ছদ ও আনুষঙ্গিক অঙ্গসৌষ্ঠবে মোহাম্মদী—সওগাতের ব্রিটিশ-আমলের মান বজায় রেখেছিল। ডাবল ডিমায়ে ১/৮ সাইজের আট ফরমা তাঁদের পরিসর ছিল। কিরণশংকর সেনগুপ্তের 'স্মরণী' শীর্ষক কবিতা বিশেষ কাগজে সর্বপ্রথমে কায়েদে আজমের ছবির উপরে ছাপা হয়েছিল। কবিতার মূল প্রেরণা কায়েদে আজমের মরণে শোকজ্ঞাপন বা তাঁকে শ্রদ্ধা জানানো। শেষ দুটি লাইন :

'শোষণের পীড়নের চক্র থেকে মুক্তি শুধু আজ/হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষিত, জনতাই তুলেছে  
আওয়াজ।'

তাছাড়া কাজী নজরুলের 'আশীর্বাদ' শীর্ষক কবিতাটি [শ্রীহট্টের শ্রীযুক্তা লীলাবতী মজুমদারকে লিখিত। তাঁর অনুমতিক্রমে অধ্যাপক মুহাম্মদ মনসুরউদ্দীনের সৌজন্যে] এতে ছাপা হয়েছিল—“তোমার কণ্ঠে বাঁধিয়াছে নিড় সুরের দেশের পাখী/সুরেশ্বরের হস্তে বাঁধুক,

তোমার সুরের রাখী।' দশ লাইনের কবিতার শেষ দুচরণ ছিল এরূপ : "তুমি আনিয়াছ সুবধনী ছানি যে সুরের রূপলীলা/তারি রঙে তুমি অশ্রুর মেঘে কর নিশি রঞ্জিলা।"৬

এছাড়া রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠিও এতে ছাপা হয়েছিল। সিলেটের উপেন্দ্রনাথ কর গীতাঞ্জলির বিরূপ সমালোচনার প্রতিবাদ লিখেছিলেন। এরই ('গীতাঞ্জলি-সমালোচনার প্রতিবাদ') প্রাপ্তি স্বীকার করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১০ই আশ্বিন ১৩২১ সনে এই চিঠি শীকরকে লিখেছিলেন। এটিও মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনের সৌজন্যে ছাপা হয় (১/৫)। মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীকে লিখিত প্রবোধচন্দ্র সেনের পত্রও ইমরোজ ছেপেছে। বেশ কিছু পুস্তক সমালোচনা হয়েছে। তারমধ্যে উল্লেখ্য অধ্যাপক আলী আহমদ-এর 'বাংলা কলমী পুঁথির বিবরণ' ;

'পাকজীবন'। শেষোক্ত বইয়ের লেখক মুহম্মদ হবীবুল্লাহ বাহার ও শ্রী অনিলচন্দ্র ঘোষ। অনিলচন্দ্র ঘোষ শখু কাজী আবদুল ওদুদের সঙ্গে শব্দকোষই প্রণয়ন করেননি, হবীবুল্লাহ বাহারের যুগ্ম লেখকও হয়েছিলেন। প্রথম বর্ষ পঞ্চম সংখ্যা থেকে মোহাম্মদ আবিদ আলী বোখারী শরীফ থেকে অনুবাদ প্রকাশ করতে পাকেন। অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন সংগৃহীত পল্লীসংগীতও এতে ধারাবাহিক ছাপা হয়েছে।

বলাবাহুল্য রবীন্দ্রনাথ, হিন্দুসাহিত্যিক ও হিন্দুরচিত সাহিত্য এতে ছাপা হয়েছে, পাশাপাশি পাকিস্তানের প্রতি অনুগত ইসলামী বিষয়ও প্রচুর ছাপা হয়েছে। এম. এ. জব্বার ও এম. আকবর আলী অথবা অন্য কোনো মুসলমান লেখকের মুসলিম ঐতিহ্য বিষয়ে লেখা প্রবন্ধও ছাপা হয়েছে প্রায় প্রতি সংখ্যায়। তৃতীয় বর্ষ থেকে ছোটদের আসর এবং মহিলা মহল চালু হয়। এতে যারা লিখতেন তাঁদের মধ্যে ফয়েজ আহমদ, ওমর আলী, ফরিদা বেগম, বেগম জেবু আহমদ, নীলিমা বসু, ক্ষিতীশচন্দ্র রায় প্রমুখের কথা উল্লেখনীয়।

'ইমরোজ' বাংলাভাষা, বাংলাদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতি তথা জাতীয় উন্নতি—অগ্রগতির জন্যে চেষ্টিত ছিল। স্বাধীনতার পরও দুই সম্প্রদায়ের মনের বিদ্বেষবিষ দূর হয়নি, সাহিত্যেও তা পূর্বের ন্যায় ক্রিয়া করেই চলছিল। এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়ের প্রায় শত্রুরূপে চিহ্নিত হচ্ছিল। তখন ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর নিকট থেকে এঁরা সংগ্রহ করেছিলেন 'সাহিত্যে সম্প্রদায়িকতা' শীর্ষক প্রবন্ধ।

১৯৫০ সনের দাঙ্গার কালে তাঁরা স্পষ্ট করেই মতামত জানিয়েছিলেন এই দাঙ্গার জন্যে তাঁরা 'দুঃখিত ও লজ্জিত'। দাঙ্গাকারীদের উদ্দেশ্যে বলা হয়, এর ইতিহাস আছে, 'তাদের জানা উচিত হিন্দুস্থানের মুসলমানদের উপর যে অত্যাচার হচ্ছে তার জন্যে পাকিস্তানী অমুসলিমদের দায়ী করা ন্যায় সঙ্গত নয়। তাছাড়া এখানে অমুসলিমদের উপর কোন অত্যাচার করার অর্থই ভারতীয় মুসলমানদের উপর অত্যাচারের মাত্রা বাড়ান। যাহোক, এই দুঃখের মধ্যেও আমাদের আনন্দ ও গর্ববোধ হচ্ছে... দুচারজন ছাড়া মুসলিম মাত্রেই এই উন্নত্তায় বাধা দিয়েছেন। অনেকেই নিজের প্রাণ বিপন্ন করেও অমুসলিমদের সর্বোতোভাবে রক্ষা করেছেন।'

ইমরোজ অর্থনৈতিক উন্নতির জন্যে সম্পাদকীয়-বক্তব্যে পাকিস্তানের বাজেটের সমালোচনা করে বলেছে—'এখানকার মন্ত্রী সাহেবদের মন্ত্রীত্বের চিন্তাই মুখ্য দেশের চিন্তা গোঁণ বলে বাজেট-এ কি হলো আর না হলো তা দেখার বা ভাবার সময় তাঁরা পান না।'

কর্মচারী ছাঁটাইনীতির সমালোচনা করে ইমরোজ লিখেছে : ‘অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানকল্পে সরকারি ও বেসরকারি দপ্তরগুলিতে কর্মচারী ছাঁটাইয়ের নীতি অনুসৃত হচ্ছে বা হতে চলেছে। প্রকাশ যে স্বল্পবেতনভুক কর্মচারীদের দিকেই ছাঁটাইয়ের কাঁচি সমুদ্র্যত। নীতি হিসাবে এ মোটেই সমর্থনযোগ্য নয়। অধিক বেতনভোগীদের বেতন সাময়িকভাবে হ্রাস করে দিয়ে এ সমস্যার সমাধান সম্ভবপর করে তোলা উচিত বলে আমরা মনে করি। ব্যাপক ছাঁটাইয়ের ফলে বেকার সমস্যা দেখা দিবে, তার ভয়াবহ রূপ কল্পনা করা কি খুব কঠিন বলে মনে হয়?’<sup>৯</sup>

স্কুল, কলেজ তথা শিক্ষাব্যবস্থার ভয়াবহ অধোগতি দেখে শঙ্কিত ‘ইমরোজ’ লিখেছে : পূর্বপাকিস্তানের শিক্ষার গতি সম্বন্ধে আমরা ‘দৈনন্দিনই হতাশ হয়ে পড়ছি। ছেলেমেয়েদের class IV থেকেই উর্দুভাষা চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া বাংলার মাধ্যমে বিজ্ঞান প্রভৃতির বয়সের অনুপযোগী বিষয় শিখতে বাধ্য করে শিশু মস্তিষ্কের উপর যে অযথা চাপ দেওয়া হচ্ছে তাতে সাধারণভাবে পূর্ণাঙ্গ মননশীল ব্যক্তিত্বের গড়ে ওঠা আশা করা যায় না। এর উপর class VI থেকে ইংরেজি ও class VII হতে আরবি চাপান হয়েছে। এই মানসিক চাপের উপর জুটেছে স্কুলের অভাব অনটন। প্রাইভেট স্কুলের শিক্ষকের অভাব এখনও ঘুচে নাই, অনেক স্কুলই পাতোনেমুখ। সরকারি স্কুলগুলির অবস্থা সর্বত্রই ভাল বলা চলে না। এই ঢাকা শহরের বুকের উপরে অবস্থিত বাংলাবাজার গার্লস স্কুলের কয়েকটি শ্রেণী বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে স্কুল দালানের অবস্থা অতি শোচনীয় বলে। কলেজিয়েট স্কুলের দালানটির অবস্থাও তথৈবচ। শূধু স্কুলের নয়, কলেজের অবস্থাও তেমনি শোচনীয়। এই ঢাকা শহরের বুক শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষা বিভাগের চোখের উপর ঢাকা কলেজ বসছে কতকগুলি অপরিসর রুমের মধ্যে। ইউএন কলেজের মেয়েদের নিজদের কলেজে Science পড়বার কোন ব্যবস্থা নেই। অনেক মেয়েকে বাধ্য হয়ে Science পড়া থেকে নিরস্ত থাকতে হয়। এ সমস্ত দেখে কেউ যদি শিক্ষা বিভাগের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব পোষণ না করে তাকে দোষ দেওয়া যায় কি?’<sup>১০</sup>

মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড গণিতের একটি পরিভাষা করে প্রচার করেছিল। ইমরোজেও তা মুদ্রিত হয়। কিন্তু আর কোনো বিষয়ের পরিভাষা নাহলে চলবে কি করে? শিক্ষার কোনো পরিবেশ পরিস্থিতি নেই বলে তাদের আক্ষেপের অন্ত নেই। শূধু শিক্ষার নয়। খাদ্য সমস্যা নিয়েও তাঁরা দীর্ঘ প্রবন্ধ ছেপেছেন। দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার থেকেছেন। স্বাধীন স্বনির্ভর জাতি গঠনের প্রতি ব্যাকুলতা প্রকাশ করেছেন।

নারী সমাজের কিছু আশা আকাঙ্ক্ষার স্বরূপও ইমরোজ ধারণ করে আছে। রাহেলা বেগম ১৯৫২ সনের ইসলামী সাংস্কৃতিক সম্মেলনের মহিলা অধিবেশনে ‘নারী প্রগতি ও তার মর্যাদা’ বিষয়ে বক্তব্য রেখেছিলেন। তাঁর এই অভিভাষণটি ইমরোজ গুরুত্ব প্রদান করে ছেপেছিল (৩/১২)। ‘অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে নারীর স্থান’ নিয়েও পত্রিকাটি ভেবেছিল দেখা যায় (রেবেকা সুলতানা, ৫/২)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি.সি কেন বিদেশী বিভাগী হবেন স্বাধীনতার পরেও? এই স্বাদেশিক চিন্তার প্রকাশ রয়েছে ইমরোজে :

বিদেশী অধ্যাপক ডক্টর ডব্লিউ এ জেকিনসনকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর নিয়োগ করা হয়েছে। এ পদের জন্যে পাকিস্তানে যোগ্য লোকের অভাব ঘটেছে বলে আমরা মনে করি না। স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এ দায়িত্বের জন্য লোক বাছাই করলে আমাদের পূর্ববাঙলায়ও হয়তো উপযুক্ত লোক পাওয়া সম্ভবপর হতো। শিক্ষার মান উন্নয়ন একান্ত আবশ্যিক।<sup>১১</sup>

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ—এর মৃত্যু প্রসঙ্গেও তাঁরা বক্তব্য উপস্থিত করেছেন এবং নতুন দেশের আইনসভার ভোটার তালিকা পাকিস্তানে এই প্রথম ছাপা হলো ; কিন্তু মুদ্রণক্রটি এবং ভোটার তালিকা থেকে পাকিস্তানের 'অনেক প্রাপ্তবয়স্ক লোকের নাম বাদ পড়ায় তাঁদের নাগরিক অধিকারও ক্ষুণ্ণ হয়েছে' বলে বিরূপ মন্তব্য করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবার জন্যও প্রস্তাব করা হয়েছে।<sup>১২</sup>

বি.এ. পাশের আগে ছাত্ররাজনীতি না করার ব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপের প্রশংসা করেনি ইমরোজ, তাঁরা বলেন, এ সম্বন্ধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক-বঙ্গবিভাগের কার্যকলাপ অনুসরণযোগ্য : ...ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষেরও মনে রাখা উচিত যে বিশ্ববিদ্যালয় গভর্নমেন্টের অফিস নয় ; এটা স্বতন্ত্র জগত যা গভর্নমেন্টের খেলায় খুশির বাইরে শুধু সংস্কৃতি নিয়ে কাল কাটাতে হবে।<sup>১৩</sup>

বাংলাভাষা ও সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ লেখক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম,—রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ প্রমুখের জন্ম মৃত্যু উপলক্ষে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেই তাঁরা ক্ষান্ত হননি,—১৯৫২ সনের একুশে ফেব্রুয়ারির শহীদদের রক্ত দেখেও তাঁরা বিচলিত, অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছেন ; 'বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদা দানের জন্য যে সমস্ত তরুণ বীর শহীদ হয়েছেন আমরা তাঁদের উদ্দেশ্যে সশ্রদ্ধ তসলিম জানিয়ে এই কথাই শুধু বলব, তাঁদের এই আত্মোৎসর্গ ব্যর্থ হয় নাই, ব্যর্থ হবার নয়। যতদিন দুনিয়ার বুকে বাংলাভাষা জীবিত থাকবে ততদিন পর্যন্ত তাঁদের এ কোরবানীর কথা মেঘ-গস্তীর শোকবিস্মল ভাষায় বিঘোষিত হবে।'<sup>১৪</sup>

ইমরোজ পাকিস্তান অর্জনের অব্যবহিত কালের পত্রিকা। তৎকালে বাংলাভাষা ও সংস্কৃতি ধ্বংসের যে পায়তারা চলে তার বিরুদ্ধে প্রতিমাসে তাঁরা সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন। বাংলাভাষাপ্রেমিক জনগণকে তাঁরা নৈতিকশক্তি, সাহস ও যুক্তিবুদ্ধি অনুপ্রেরণা যুগিয়ে কালের দাবি মিটিয়েছেন। ফলে এটি বাংলাভাষা ও সাহিত্য সংস্কৃতি এবং পূর্ববঙ্গের জনগণের চেতনার ধারক ও স্মারকরূপেই বিবেচিত হতো। বুকের ব্যথা ভাষা অভিব্যক্তি পেয়েছিল এই মুখপত্রে।

বিভাগ পূর্ববর্তীকালের মুসলমান লেখকের সাহিত্যে ইসলামী ভাবধারা নেই বলে 'পূর্বপাকিস্তানের সাহিত্যের ইতিহাস থেকে তাঁদের নাম ছেটে ফেলে দিতে হবে, এমন মনোভাবকে নিশ্চয়ই সাহিত্যিক মনোভাব বলা চলেনা, ঐতিহাসিক মনোভাব তো এ নয়ই। মুসলিম ভাবধারা প্রচলনকারী হিসেবে গৌরব করবার দাবি বিগত যুগের সাহিত্যিক কেন—প্রবল প্রতাপশালী বাদশাহদেরই কার কতখানি সে বিচার করতে বসলে নিশ্চয়ই হতাশ হতে হবে।' ... (তখন) মুসলিমরাও যে অমুসলিমদের চেয়ে জ্ঞানে বিজ্ঞানে কম নয় নিজেদের সাধ্যমত তারই প্রমাণ দেবার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের সেই প্রচেষ্টাকে অগৌরবের বলা সুষ্ঠু নিরপেক্ষ মনোভাবের পরিচয় নয়।

তাঁরা আরও বলেন, 'ধর্মের নামে ভাষার নাম কোথাও প্রচলিত আছে কিনা জানি না, ... কিন্তু আসলে দেখা যাচ্ছে কেউ কেউ সাহিত্যে অপাৎজ্ঞেয় বাংলা লেখার মধ্য, স্থানে

অস্থানে দুর্বোধ্য আরবি, ফারসি, উর্দু ছড়িয়ে দিয়ে তাকেই মুসলমানী বাংলা বলে চালাতে চেষ্টা করেছেন। কোন সাহিত্যরসিকই একে বাঙ্কনীয় মনে করবেন না।’ ...নজরুল কাব্যে পাকিস্তানী ভাবধারা নেই বলে যাঁরা বীতরাগ দেখাচ্ছেন তাঁরা একটা কথা মনে রাখলে ভাল করবেন। প্রকৃত সাহিত্য সর্বযুগের সর্বদেশের জন্য! কোন এক স্থানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। ‘...শেখপীর...মুসলমান অধিবাসীদের জন্য ভাবেন নি। কিন্তু বাংলার মুসলমানেরাও তাঁর নাটক পড়ে আনন্দ পায় এবং প্রশংসাও করে। মুসলমানী নয় বলে ছুঁড়ে ফেলে দিবার ব্যবস্থা করে না।’ নজরুল জন্ম বার্ষিকীতে—‘দুই একজন সাহিত্যিকের এই মনোভাবের পরিচয় পেয়ে আমরা সত্যিই দুঃখিত।’ বাঙ্গালী মুসলমানদের দুর্ভাগ্যের জন্য বাঙ্গালী মুসলমানই দায়ী—নিজেদের গৌরব ক্ষুণ্ণ করতে তাঁরা তৎপর হয়ে উঠেছেন। পত্রিকায় আরও বলা হয়—

পূর্বপাকিস্তানে বাংলা ভাষার ভবিষ্যত অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা সন্ধিহন হয়ে উঠেছি। শুধু ভাষাই নয় এখানকার শিক্ষা সম্বন্ধেও আমরা সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছি। কেন্দ্রীয় পাকিস্তান শিক্ষা দপ্তরের কার্যকলাপে মনে হয় পূর্বপাকিস্তানের শিক্ষা অগ্রসর হোক এ তাঁরা চাননা।<sup>১৫</sup>

শিক্ষা-ব্যবস্থা নিয়েও তাঁরা চিন্তিত ছিলেন। বারে বারে এ বিষয়ে আলোচনা থেকে একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

‘পাকিস্তানে বাংলা সাহিত্য কি ধরনের হবে এ নিয়ে আজকাল দুই-চারটি লেখা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে’ ... কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে মুক্ত মন ও মুক্তবুদ্ধির পরিচয় এতে কমই পাওয়া যাচ্ছে। গতানুগতিক... পূর্বের...কথা ইনিই বিনিয়োগ আওড়ান অথবা কোন রাজনৈতিক মতবাদের সমর্থন বা কোন রাজনীতিকের মনস্তত্ত্বের জন্য কোন কিছু বলাই, এতে রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাহিত্য সংস্কৃতি ও রাজনীতি এক জিনিস নয়। একথাটা তাঁরা ভুলে যান বলেই এই সমস্ত গুলিয়ে ফেলেন...‘সাহিত্য ও সংস্কৃতি জগতে নতুনের আবির্ভাব কোন সময়েই পুরাতনের আনন্দদায়ক নয়। এখানে ও নতুন আসে পুরাতনের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে। ...পূর্ব পাকিস্তানী সাহিত্যিকদের মধ্যে নতুন ভাবও নতুন ব্যঞ্জনা দেখা দিয়েছে, পুরাতনপন্থীরা তার জন্য চোঁচামেচিও লাগিয়ে দিয়েছেন। আমাদের মতে এ চোঁচামেচিও নিরর্থক। নতুন সব সময়েই আসবে আর তার মধ্যে যদি বাঁচবার ও বেড়ে ওঠবার জীবনীশক্তি থাকে, তাহলে সে বাঁচবে ও বেড়ে উঠবে, কেউ তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। অন্যথায় সে এমনি বারে পড়ে যাবে।’

‘পূর্বপাকিস্তানের তামুদ্দনিক সংকট দেখা দিয়েছে’ বলে যাঁরা আশঙ্কা প্রকাশ করছিলেন তাঁদের প্রজ্ঞার প্রতি ইমরোজ শঙ্কাপোষণ করলেও বলেন, শক্তিজনেরা ‘যুক্তিধারা বুঝে উঠতে পারেনি।’ ‘পাকিস্তান সবেমাত্র গড়ে উঠেছে। পাকিস্তানী তমুদ্দনও গড়ে উঠবে। এর তমুদ্দনের মধ্যে সংকট দেখা দেওয়ার কোন কথাই ওঠে না। সমস্ত তমুদ্দনের শ্রেষ্ঠ ভাবধারা নিয়েই এ গড়ে উঠবে। এই গড়ে ওঠার পথে নানা তমুদ্দন, নানা ভাবধারা এসে দেখা দিবে, হানা দেবে এবং এই সমস্তের সংঘর্ষের ও সহযোগিতার ফলেই হবে নতুন তমুদ্দনের উদ্ভব।

এই দেখে ভয় খেয়ে গেলে সমস্ত নতুনের আবির্ভাবকেই ভয়াবহ বলতে হয় এবং নতুন কিছু করবার প্রচেষ্টা ছেড়ে দিয়ে স্থানু হয়ে বসে থাকা ছাড়া আর কোনও উপায়ও থাকে না।'

পূর্বপাকিস্তানের তামুদ্দনিক সংকট এসেছে মনে করে য়ারা অতিমাত্রায় বিচলিত হয়ে পড়েছেন, তাঁদের উদ্দেশ্যে ইমরোজের বক্তব্য : 'তাঁদের দু'একজনের চিন্তাধারা অত্যন্ত হাস্যোদ্দীপক'। 'অতিসাধারণ প্রচলিত বাংলা শব্দকে উর্দু বা হিন্দী করে না বললে পাকিস্তানের তামুদ্দন নষ্ট হয়ে যাবে বলে যারা মনে করেন আমরা তাদের দলে নই। আকাশকে আকাশ না লিখে পারসী শব্দ আসমান লিখলে, পৃথিবীকে জমিন বলে লিখলে পাকিস্তানের তামুদ্দন ঠিক থাকবে বলে যারা মনে করেন বা প্রচার করেন তাঁরা যত বড় ডিগ্রি ও পদধারীই হোন না কেন, তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির কোন প্রশংসাই আমরা করতে পারি না। আমাদের মনে হয় এ তাদের inferiority complex এবং দুনিয়ার cultural History-র সঙ্গে অতিমাত্রায় অপরিচয়ের ফল।... পানি শব্দটির মধ্যে মুসলমানিত্ব কিছুই নেই...হিন্দুরা (ভারতে) পানি বলার জন্যে...নাপাক ও হয়ে যায় নাই...পানিকে জল বললেই তাদের পানি নাপাক হয়ে যাবে, বা তাদের মুসলমানিত্ব বরবাদ হবে এবং তারা হিন্দু সংস্কৃতি প্রভাবান্বিত হয়ে পড়বে এ আমরা বিশ্বাস করি না ; হয়ত কেউ করে না কিন্তু তবু পাঠ্যপুস্তকের জল সম্বন্ধীয় সমস্ত শব্দকে পানিতে পরিণত করতে হবে, জলীয় বাষ্পকে পানীয় বাষ্প করতে হবে এমনি নির্দেশের মধ্যে আর যাই হোক বিজ্ঞতা নেই, ইসলামিত্ব তো নেইই!'<sup>১৬</sup>

'সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতা' শীর্ষক প্রবন্ধে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ লিখেছেন সমকালীন সমাজের দিকে তাকিয়ে :

সাহিত্যিক বিশ্বমানবের স্বজাতি। কাজেই তিনি অসাম্প্রদায়িক। ...মোটকথা বাংলা ভাষায় জ্বরদস্তি করে যেমন অপ্রচলিত অনাবশ্যক আরবী পারসী শব্দের ব্যবহার অসঙ্গত, তেমনি অপ্রচলিত অনাবশ্যক সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার করাও অসঙ্গত। বে-দরকারে ইংরেজির মিকচার করাও তেমনি আমার অসহ্য। আমি এসব নিন্দা করি ; কিন্তু যা বাংলায় এসে গেছে, যা বাংলার হাড়ে মাসে ঢুকে গেছে, তা আরবী, পারসী, তুর্কি, পস্তগীজ, ডচ, ফরাসী, ইংরেজি, আর্ধ্য বা অনার্য্য যাহোক, তাতে আমি আপত্তি করি না। আমি বাংলা ভাষাকেই চাই, তাকে শুদ্ধি বা স্বতন্ত্র করবার পক্ষপাতী নই।

সে যাই হোক সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতা বলতে আমি বুঝি সাহিত্যের ভিতর দিয়ে অন্য সাম্প্রদায় বা ধর্ম বিশেষের বিরুদ্ধে প্রোগাণ্ডা চালান, কোন জাতির ঐতিহাসিক চরিত্রকে বা কোন ধর্মাবলম্বীর সম্মানিত পুরুষদের হীন বা বিকৃত করা। দেশের সাম্প্রদায়িক বিবাদের মূলে এই সাম্প্রদায়িক সাহিত্য।

দুঃখের সঙ্গে আমি বলতে বাধ্য যে বাংলার হিন্দু লেখকেরা এর সূত্রপাত করেন। তারপর মুসলমান লেখকেরা গালির বদলে গালি শুরু করেন। এর জন্য অবশ্য ব্রিটিশের ভেদনীতি ছিল অনেকটা দায়ী। আমরা পূর্ব পাকিস্তানে সাম্প্রদায়িকতা বিষয়বর্জিত 'পাকসাফ' সাহিত্য চাই দেশের মঙ্গলের জন্য, দেশের মঙ্গলের জন্য। সাহিত্য যদি সত্য ও শিব হয়, তবে তা সুন্দর হবেই। নয়ত সে সাহিত্যই হবে না, হবে একটা অপসাহিত্য। আমরা যদি বাংলাভাষা থেকে এই অপসাহিত্য দূর করতে পারি, তবে প্রকৃত সাহিত্যের সেবা হবে, সত্য-শিব-সুন্দরের অর্চনা হবে, পাকিস্তানের মঙ্গল হবে।<sup>১৭</sup>

## তথ্যপঞ্জি

১. মোহাম্মদ আবদুল কাইয়ুম, 'পূর্বপাকিস্তানের সাময়িকপত্র', আমাদের সাহিত্য, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৬৯, পৃ. ২৪১।
২. গোলাম সাকলায়েন, 'আমাদের সাহিত্যপত্রিকা ও সাহিত্যিক গোষ্ঠী', সংলাপ, জুন ১৯৭০, পৃ. ৭৯।
৩. ডক্টর কাজী দীন মুহাম্মদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার। ২৬-১-১৯৯৩ তারিখে।
৪. সৈয়দ আবুল মকসুদ এর সঙ্গে কথোপকথন ২২-৫-১৯৯৩ তারিখে।
৫. ইমরোজ (সম্পাদকীয়), ১ বর্ষ, ১ সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৫৬।
৬. কিরণশংকর সেনগুপ্ত ও কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা ইমরোজের ১ বর্ষ, ১ সংখ্যা আশ্বিন ১৩৫৬তে ছাপা হয়। নজরুল রচনাবলীতে (৫ম খণ্ড) 'আশীর্বাদ' শীর্ষক কবিতাটি ছাপা হয়েছে 'সুর-রাশী' শিরোনামে।
৭. সম্পাদকীয় ১ বর্ষ, ৫ সংখ্যা, মাঘ ১৩৫৬, পৃ. ৩২৮।
৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৫।
৯. সম্পাদকীয়, ৪ বর্ষ, ৬ সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৬০, পৃ. ২০৪।
১০. পূর্বোক্ত, ৩ বর্ষ, ৫ সংখ্যা, চৈত্র ১৩৫৮, পৃ. ২৯২।
১১. পূর্বোক্ত, ৪ বর্ষ, ১১ সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৬০, পৃ. ৪১০।
১২. পূর্বোক্ত।
১৩. সম্পাদকীয়, ২ বর্ষ, ৩ সংখ্যা, পৌষ ১৩৫৭।
১৪. পূর্বোক্ত, ৩ বর্ষ, ২-৩ সংখ্যা, পৌষ-মাঘ ১৩৫৮ পৃ. ১৩৪।
১৫. সম্পাদকীয়, ১ বর্ষ, ৯ সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৭, পৃ. ৫০৭-১০।
১৬. সম্পাদকীয়, ৪ বর্ষ, ১ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৫৯, পৃ. ৫৫-৫৬।
১৭. ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতা, ইমরোজ, ১ বর্ষ, ১ সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৫৬, পৃ. ৪।



### ৩. সমকাল

(১৯৫৭-৭৭)

ক. ‘সমাচারদর্পণ’ থেকে আজকের ‘সুন্দরম’ কিংবা ‘লোকায়ত’ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় প্রকাশিত সাহিত্যপত্রিকাসমূহের মধ্যে ‘সমকাল’ নিঃসন্দেহে প্রধানতম গুটিকয়েকের একটি। তারপর মুসলিম সম্পাদিত সাময়িকপত্রের অথবা পূর্বপাকিস্তান থেকে প্রকাশিত সাহিত্য পত্রিকার ইতিহাসে, চার-পাঁচটি পত্রিকার নাম যদি মর্যাদা বা গুরুত্বের বিবেচনায় আগে উল্লেখ করতে হয়—তার মধ্যেও সমকালের স্থান প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় কি চতুর্থ হওয়া উচিত—এনিয়ে বিতর্ক হবে। কেউ বলবেন ‘সওগাত’, ‘শিখা’, ‘মোহাম্মদী’ এবং তারপরই সমকাল হবে, কেউ অন্যভাবে সাজাবেন। তবে বিভাগপূর্ব কালের এবং সমগ্র বাংলা সাহিত্যের বিবেচনায় স্থান নির্ণয় প্রয়াস আপাতত স্থগিত রাখলে যেহেতু চলছে,—সেহেতু সাতচল্লিশ-একাত্তর পর্বে পূর্ববাঙলা থেকে প্রকাশিত সাহিত্যপত্রিকার গণ্ডিতেই এর বিচার করা সঙ্গত।

পূর্ববাঙলার পত্রপত্রিকা সম্পর্কে এদেশের প্রধান লেখক-গবেষকদের মধ্যে যে কেউ-ই মন্তব্য করতে গিয়েছেন, তিনিই একে সর্বপ্রধান, সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বাধিক গুরুত্ব ও তাৎপর্যপূর্ণ সাহিত্যপত্রিকা হিসেবে মূল্যায়ন করেছেন। গোলাম সাকলায়েন সরল বাংলা ভাষায় লিখেছেন : ‘সমকাল পূর্বপাকিস্তানের সেরা মাসিক পত্রিকা’

মোহাম্মদ আবদুল কাইউম লিখেছেন : ‘পূর্ব পাকিস্তানের সাময়িকপত্রের ইতিহাসে এই পত্রিকাটির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।’

সওগাত ও সমকালের এককালীন সহকারী এবং সহযোগী সম্পাদক এবং বাংলাদেশ আমলের ‘সমকালের’ সম্পাদক ; বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম-এর দলিলপত্রের, একুশে ফেব্রুয়ারির প্রথম সংকলন এবং আরও অসংখ্য ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্ম এবং সংগঠন ও পত্রপত্রিকার সংগঠক, সম্পাদক, কবি, সমালোচক হাসান হাফিজুর রহমান ‘সওগাত থেকে সমকাল’ শীর্ষক এক প্রবন্ধে লিখেছেন : ‘সওগাতকে তৎকালীন প্রগতিশীল বাস্তবতার মানসপুত্র বলে অভিহিত করা’ গেলেও পাকিস্তান আন্দোলনকে সওগাত সমর্থন করে। অসাম্প্রদায়িক, যুক্তিনিষ্ঠ মুক্ত-বুদ্ধির চর্চাকারী হিসেবে ‘শিখার’ মত... মুক্তবুদ্ধি ও প্রগতিবাদের অকৃত্রিম চারিত্র্য সওগাত ও এর সম্পাদকের ছিল।

‘মুসলিম সাহিত্যসমাজে’র মতোই... প্রতিষ্ঠিত হলো অসাম্প্রদায়িক মানবিক অসাম্যবিরোধী এবং স্বাধীন ও মুক্তচিন্তার সংগামে উৎসর্গিত সাহিত্যপ্রতিষ্ঠান ‘পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ’। ‘শিখারই অন্যতম সম্পাদক কাজী মোতাহের হোসেন এর সভাপতি, ...ঢাকা থেকে নতুন করে প্রকাশিত সওগাতেরই কার্যালয়ে। এরই কিছুকাল পরে ১৯৫৭ সনে ‘সিকান্দার আবু জাফর’ ‘সমকাল’ প্রকাশ করতে শুরু করেন। আশ্চর্য যোগাযোগ বলতে হবে। ‘পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ’ এবং ‘সমকাল’ বস্তুত মুসলিম সাহিত্যসমাজ, শিখা এবং সওগাতেরই উত্তরসূরি, ঐতিহ্যধারায় পুষ্ট ; পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরে এই তরুণ দল এবং নবীন পত্রিকার যাত্রা শুরুও হলো শিখা আর সওগাতের সম্পাদকদ্বয়ের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার সমন্বয়ী হাত ধরে। যে মানবিক মূল্যবোধ সওগাতে ভিত্তি পেয়েছিল, চল্লিশ বছর পরে

সমকালে তা নতুন উদ্ভাবনা খুঁজে পেল। সওগাতের নেতৃত্বের অবসান ঘটেছিল, সমকালের নেতৃত্ব শুরু হলো।'

সমকাল সম্পর্কে হাসান হাফিজুর রহমান আরও লিখেছেন : সমকাল সবদিক দিয়েই একটি আধুনিক পত্রিকা। সওগাত এবং শিখা যে আধুনিকতার জন্যে সংগ্রাম করেছে তারই পরিপূর্ণ ফসল একে বলা যায়। শিখা-গোষ্ঠীর যে চিন্তাধারা পত্রস্থ না করতে পারার অভিযোগে সওগাতকে ধিক্কারের ভাষা শুনতে হয়েছে, সমকালকে সে সংকটের মুখোমুখি হতে হয়নি। সে স্তর জাতিগতভাবে আমরা পেরিয়ে এসেছিলাম। সমকাল শুধু অসাম্প্রদায়িক নয়, ধর্মনিরপেক্ষও। সমকাল বিষয়বস্তুর পরিবেশনে স্বেচ্ছাধর্মী এবং অগ্রসর জীবন চেতনা ও সংগ্রামের মুখপত্র হয়ে উঠতেও দ্বিধাগ্রস্ত হয়নি। এ-ক্ষেত্রে জাতিগত বিমূর্ত মূল্যবোধের অগ্রসরতার সঙ্গেই যোগস্থাপন সে করেছে। কিন্তু একটি মৌলিক প্রশ্নে সওগাতের মত তাকেও গোড়া-ঠেঁষা সংকটে ব্যতিব্যস্ত হতে হয়েছে। এবং তা হলো জাতীয়তার প্রশ্ন।

পাকিস্তানের আগে বাঙালি মুসলমান স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠায় উত্তেজিত ছিল। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরে-পরেই দেখা গেল স্বাতন্ত্র্যই মুক্তি নয়। দুর্বল বাঙালি ন্যাশনালিটি প্রবল পাঞ্জাবি ন্যাশনালিটির বন্ধনে বাঁধা পড়েছে। স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার জায়গায় নতুনভাবে দেখা দিল আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রশ্ন। সমকাল এ প্রশ্নে নিজে একাধিকবার বিপদ বরণ করেও সাহসিক এবং উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। এ প্রশ্নের সমাধানে স্বাধীন বাঙালি জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভব। এ-উদ্ভবে সমকালও তার কৃতিত্ব-চিহ্ন রাখতে সক্ষম হয়েছে, এ শিরোপা সমকালকে দিতে হবে।

কিন্তু তৎসঙ্গেও একথা সত্য যে, 'সমকাল-ও ছাপতে পারে না, তা দেখা দিয়েছিল। তাই প্রশ্ন করতে হচ্ছে হয়, সকল লেখাই ছাপা যাবে, তেমন স্বাভাবিক যুগ কবে আসবে, তেমন কাগজের অবাধ প্রকাশ কবে সম্ভব হবে?' সমকালের সাহিত্যিক অবদান সম্পর্কে হাসান হাফিজুর রহমান মন্তব্য করেন :

বাংলাদেশের আধুনিক সাহিত্যকে সংগঠিত ও দৃঢ়ভিত্তিক করার ব্যাপারেও সমকালের অবদান পুরোধার মর্যাদা দাবি করতে পারে। সমকাল এ প্রচেষ্টায় সফল না হলে উত্তরণ এবং কষ্টস্বর এর মতো সাহিত্যনির্ভর এবং শিল্পসজ্জান সাময়িকীর প্রকাশ এবং স্বাক্ষর সূন্যতেক মল্লার এর মতো অজ্ঞ প্রাধিকার প্রমত্ত লিটলম্যাগাজিনের অবাধ বিচরণ সম্ভব হতো কিনা সন্দেহ।<sup>৩</sup>

হায়াৎ মামুদ, 'সিকন্দার আবু জাফর' শীর্ষক পুস্তকের 'সমকাল পত্রিকা ও আনুষ্টিক' অধ্যায়ে লিখেছেন, তাঁর অক্ষয় কীর্তি 'সমকাল' নামে একটি মাসিক সাহিত্যপত্র সম্পাদনা ও পত্রিকাটিকে ঘিরে সমকালীন সাহিত্য ও সংস্কৃতি জগৎ পরিচালনা। সমকালের 'জন্ম ইতিহাস' বলতে গিয়ে তিনি লিখেছেন : কবি হাসান হাফিজুর রহমান পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি অনেকদিন ধরেই একটি সাহিত্যপত্র প্রকাশের কথা ভাবছিলেন, কিন্তু অর্থের অভাবে তাঁর ইচ্ছা ফলবতী হবার কোনো উপায় ছিল না। এ-সময়ে তাঁর সঙ্গে সিকান্দার আবু জাফরের আলাপ ঘটিয়ে দেন শিল্পী দেবদাস চক্রবর্তী। ঠিক হয়, পত্রিকা বেরুবে, যাবতীয় আর্থিক ঝঞ্ঝাট সিকান্দার আবু জাফর বহন করবেন, সম্পাদনার প্রত্যক্ষ দায়-

দায়িত্ব হাসান হাফিজুর রহমানের, তবে সম্পাদক হিসেবে নাম যাবে তাঁর, হাসান থাকবেন সহযোগী সম্পাদক। হাসান তা সানন্দে মেনে নিয়েছিলেন। এভাবেই পত্রিকাটি বেরিয়েছিল।<sup>১৪</sup> কিন্তু সিকান্দার আবু জাফরের (১৯১৮-৭৫) ঘনিষ্ঠ বন্ধু, সমবয়সী, প্রখ্যাত লেখক চিন্তক, আবদুল হক (১৯১৮-১৯৯৭) লিখেছেন :

আমি যতদূর জানি, সিকান্দার আবু জাফর 'সমকাল' প্রকাশের কথা ভাবছিলেন ১৯৪৭ সালের গোড়া থেকে। একথা তিনিই আমাকে বলেছিলেন ঐ সময়ে। তাঁর সঙ্গে তখনো পরিচয় হয়নি, চাকুস দেখা-সাক্ষাৎ পর্যন্ত না, তবু তিনি একদিন আমাকে জানিয়েছিলেন তাঁর ঐ ইচ্ছার কথা। আমি সেই সময়ে তাঁর উপন্যাস 'নতুন সকাল'-এর সমালোচনা লিখেছিলাম 'সওগাত'-এ, উপন্যাসটি যে ভালো হয়নি এই ছিল আমার কথা। একদিন হঠাৎ তিনি ফোন করলেন 'সওগাত' অফিসে (আমি তখন 'সওগাত-এ কাজ করছি'); কিন্তু ঐ বিরাপ সমালোচনার জন্য কোনো অভিযোগই করলেন না। খানিকক্ষণ আলাপ হলো, আমার কিছু ব্যক্তিগত তথ্য জানতে চাইলেন, তারপর তাঁর অপ্রকাশিত পত্রিকায় লেখার জন্য আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে রাখলেন। সেই তাঁর সঙ্গে প্রথম পরিচয়।

আবদুল হক লিখেছেন আরো :

আমার ধারণা, 'সমকাল' নামটি জাফর সাহেবের মনে এসেছিল ঐ সময়ে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ-সম্পাদিত একটি ইংরেজি সাহিত্যপত্রিকার নাম থেকে। পত্রিকাটির নাম ছিল 'কনটেমপোরারি'। ১৯৪৭ সালের অথবা হয়তো আরো আগেকার পরিকল্পনা : ১৯৫৭ সালের আগস্টে, বাংলা ১৩৬৪ সনের ভাদ্র মাসে 'সমকাল' এর প্রথম সংখ্যার আবির্ভাব। প্রথম কয়েক বছরে সহযোগী-সম্পাদক ছিলেন হাসান হাফিজুর রহমান, গ্রন্থ দেখতে সহায়তা করতেন কবি আল মাহমুদ। পরের কয়েক বছর সহযোগী সম্পাদক ছিলেন ইসমাইল মোহাম্মদ। শেষের দিকে জাফর সাহেব একাই সব কিছু করতেন। 'সমকাল'-এর মান উন্নত রাখতে সহযোগীদের অবদান কম ছিল না, তাঁদের পরিচ্ছন্ন দৃষ্টির পরিচয় ঐ পত্রিকায় লেখার আয়োজনে ছড়িয়ে আছে, কিন্তু সব কিছুকে ব্যাপ্ত করে আছে যার উল্লেখ্য ব্যক্তিত্ব তিনি সিকান্দার আবু জাফর।

সমকাল এর একটা বৈশিষ্ট্য ছিল প্রতি সংখ্যার জন্য নতুন প্রচ্ছদ চাই; আরেকটি বৈশিষ্ট্য কাটিজ কাগজে ছাপতে হবে। মুদ্রণের অসুবিধা ছিল, প্রথম কয়েক বছরে অপারের প্রেসে, পরে নিজস্ব মুদ্রায়ণে পত্রিকা ছাপা হতো, তবু পত্রিকার প্রকাশনা প্রায়ই বিলম্বিত হয়েছে, নতুন প্রচ্ছদ অঙ্কন এবং কাটিজ কাগজ সঞ্চারে বিলম্বের জন্য। 'সমকাল'-এর তের বছর জীবনের এই একটা কাহিনী। প্রথমদিকে কিছু সংখ্যা নিউজপ্రిন্টে ছাপা হয়েছিল, তারপর কাগজ ও প্রচ্ছদের ব্যাপারে তিনি সহজে আপোষ করতে চাইতেন না। এই ছিল পত্রিকার অনিয়মিত প্রকাশনার একটা কারণ। তবে অন্যান্য কারণও ছিল। তার মধ্যে একটি হচ্ছে এক্রুপ পত্রিকাকে ধারণ করতে পারে এমন একটা বিস্তীর্ণ সংস্কৃতিবান সমাজের অভাব।

... তবু 'সমকাল' এর প্রতিটি সংখ্যার জন্য আমরা পথ চেয়ে থেকেছি—পাঠক হিসাবে এবং লেখক হিসাবে। সমকাল-এ এমন অনেক কিছু লিখেছি যা ঐ পত্রিকা প্রকাশিত না হলে হয়তো কখনো লিখতাম না। আর কোনো পত্রিকাই সেসব লেখা কখনো ছাপতো না। আমার মতো আরও অনেক লেখক এই কথাই বলবেন। কোনো কোনো মানুষকে বিশ্বাস করে মন খুলে সব কথা বলা যায়; 'সমকাল' ছিল সেই রকম পত্রিকা। সেই দুর্দিনে ওখানে মন খুলে যা-কিছু বলবার তা বলা যেত। জানা ছিল এজন্য ঝড়-ঝাপটা যা-ই আসুক তিনি কারো পরোয়া করবেন না। এই অন্তরঙ্গ চিন্তাপ্রকাশের মূল্য 'সমকাল'কে দিতে হয়েছে। তেরো বছরের জীবনে 'সমকাল' এর দুটি সংখ্যা (অন্তত চারটি?) বাজেয়াফত হয়। ১৯৬৬ সালের আরো একটি সংখ্যা বাজেয়াফত হতে হতেও হয়নি। এই সংখ্যাটির জন্যই জাফর সাহেবের নিরাপত্তা এবং 'সমকাল' এর অস্তিত্ব সবচেয়ে বেশি বিপন্ন হয়েছিল।

বেনামীতে আমার যে দুটি প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য তিনি পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষের জুঙ্ক-দৃষ্টিতে পড়েছিলেন, তা আমার 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। প্রকৃত লেখকের নাম প্রকাশ করতে তিনি অসম্মত হওয়ায় কর্তৃপক্ষ তাঁকে যে হয়রানি করেছিল তার বিবরণ ঐ গ্রন্থের ভূমিকায় দেওয়া হয়েছে, এবং সম্প্রতি এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় কয়েকজন লেখক লিখেছেন।<sup>৫</sup>

সম্পাদকের চারিত্র্যের উপর পত্রিকার ভূমিকা এবং বৈশিষ্ট্যের মাত্রা নির্ধারিত হয়। উনিশ শতকে এমন কতিপয় মহান সম্পাদক আবির্ভূত হয়েছিলেন বলেই বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি দ্রুত বিকশিত হয়ে উন্নততর স্তরে পৌঁছতে পেরেছিল। 'সংবাদ প্রভাকর', 'তত্ত্ববোধিনী', 'বঙ্গদর্শন' এবং বিশ শতকের 'সবুজপত্র', 'সংগীত', 'শিখা', 'কল্লোল', 'বুলবুল', 'চতুরঙ্গ', 'পরিচয়', 'কবিতা', 'মোহাম্মদী', 'সমকাল' প্রভৃতি পত্রিকার বৈশিষ্ট্য প্রকৃত প্রস্তাবে সম্পাদকদের ব্যক্তিত্বের কারণেই সৃষ্টি হয়েছিল।

সিকান্দার আবু জাফরের মৌলিক সৃজনশীল কালজয়ী সাহিত্যপ্রতিভা এবং জাতসম্পাদকের প্রায় নজীরবিহীন বৈশিষ্ট্যই সমকালকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার তথা সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কৃতিত্বের ভাগিদার করে রেখেছে। সিকান্দার আবু জাফরের সম্পাদক চারিত্র্যের একটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে আবদুল হক লিখেছেন :

সাতষট্টির গোড়ার দিকে, আই বি র লোক যখন আমার বাসায় এবং অফিসে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলো, তখন একদিন শওকত ওসমান সাহেবকে সে-কথা জানালাম, এবং বললাম, জাফর সাহেবকে এখন অনুরোধ করা উচিত তিনি যেন আমার হাতে-লেখা পাণ্ডুলিপি নষ্ট করে ফেলেন। আমার ধারণা ছিল, যে-লেখাটা নিয়ে এত কানামুখা চলছে তার লেখকের নাম শওকত ওসমান জানেন, কিন্তু দেখলাম তিনি জানেন না, বরং আমিই যে সেই দাগী ব্যক্তি তা জেনে খানিকটা বিস্মিত হলেন। আমার বলার কথা এই যে, তাঁর মতো ঘনিষ্ঠ বন্ধুর কাছেও জাফর সাহেব সেই দাগী লেখকের নাম ফাঁস করেননি।<sup>৬</sup>

আবুল ফজল লিখেছিলেন :

আজ আমরা সবাই অসম্ভব ভীকৃতার শিকার। ঐ ভীকৃতার প্রধান শিকার সম্পাদকরাই। সিকান্দার আবু জাফরের মতো তাঁরা যদি একটু সাহসী হতে পারতেন, সাহসিক ভূমিকা পালনে এগিয়ে আসতেন তাহলে আমাদের সাহিত্যের এ দুর্দশা কিছুতেই ঘটতো না। দেখেছি, লেখকেরা সাহসী হতে পারলেও, সম্পাদক আর পত্রিকা-মালিকরা তা সাহস করে ছাপতে পারেন না, অর্থাৎ ছাপতে সাহস করেন না। ফলে আমাদের সাহিত্য এক অচলায়তনের সম্মুখীন।

লেখা ছাপা না হলে কোন প্রতিভাবান লেখকই নতুন লেখার প্রেরণা পেতে পারেন না। ছাপা না-ছাপার কথা না-ভেবে, তোয়াক্কা না করে তিনি শুধু লিখে যাবেন, এ স্রেফ এক অস্বাভাবিক ও অসম্ভব প্রত্যাশা। সাহিত্যপত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব যেমন সং ও উচ্চমানের লেখা প্রকাশ করা, তেমনই নতুন লেখক সৃষ্টিও। বলাবাহুল্য, প্রকাশের পথেই নতুন লেখক জন্মে থাকেন। সিকান্দার আবু জাফরের 'সমকাল' বহু নতুন লেখকের জন্ম দিয়েছে।<sup>৭</sup>

উল্লেখ্য, আবদুল হক স্বনামে অনেক লিখেছেন, আবার 'আবু রায়হান' এবং 'আবু আহসান' নামেও বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনাধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে লিখেছিলেন বেশকিছু সময়োপযোগী লেখা। আরও অনেক লেখার মতো এইসব লেখায় বাঙালি সমাজকে জাগিয়ে দেয়া হচ্ছিল, প্রতিবাদ ধ্বনিত হচ্ছিল পশ্চিম পাকিস্তানিদের শোষণ ও বৈষম্য-অবিশ্বাসের বিরুদ্ধে এবং বাঙালির জাতীয় স্বার্থ সম্পর্কে উচ্চারণ করা হচ্ছিল সাবধানতামূলক শাশ্বত

সেই সত্যভাষণ, যেনো জাতির বিবেক কথা বলে চলেছেন আত্মবিম্বিত দেশবাসীর কানের কাছে গিয়ে। এসব কারণেই পত্রিকা সরকারি রোষের কবলে পড়ে। জাতির উচ্চকণ্ঠ বিবেক, চিন্তাবিদ আবুল ফজল ষাটের দশকে, সামরিক শাসনের সেই ভয়ঙ্কর দুদিনে লেখক-শিল্পীর স্বাধীনতা এবং বাঙালির সাংস্কৃতিক-সাহিত্যিক অবরুদ্ধ অবস্থার বিরুদ্ধে লিখেছিলেন কালের দাবি মিটিয়ে দুর্দান্ত সব অনল-বর্ষী স্পষ্টতই বিপ্লবাত্মক সকল প্রবন্ধ। আবুল ফজল ‘সাহিত্যের সংকট’ শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছিলেন :

এ যুগের সাহিত্যিক শিল্পীরা কালের ও রাষ্ট্রের যুগকাণ্ডে এক রকম বলি বললেই চলে। শহীদ তাঁরা নন, তাঁরা আজ হাড়ি কাঠের বলি। স্বাধীনতার পর দেশের যা অবস্থা হয়েছে, সেই অবস্থার যুগকাণ্ডে সাহিত্যিক শিল্পীরাই হচ্ছেন নির্ভেজাল বলি। স্বাধীনতার পর থেকেই ভাষার ওপর চলেছে এক উৎপাত—যে ভাষা হচ্ছে সাহিত্যিকদের আত্মপ্রকাশের প্রথম ও প্রধান হাতিয়ার। যে আবেগ ও প্রেরণা মহৎ রচনার প্রাণ, যা সাহিত্য শিল্পীকে রচনায় করে তোলে উদ্বুদ্ধ, যা নিয়ে আসে এক অনির্বচনীয় তন্ময়তা তা আজ অনুপস্থিত—দেশের জন্ম ও দেশের মানুষের জন্য সেই আবেগ ও প্রেরণা আজ রুদ্ধগতি। দেশ বা জাতির কোন চেহুরাই আজ আমাদের মানসপটে ফুটে ওঠে না। আবেগ ও প্রেরণার দেশগত ও জাতিগত ঐক্যবোধ আজ নিশ্চিহ্ন। ফলে আমাদের বাহিরে ও ভিতরে সর্বত্র এক নৈরাজ্য। এ অবস্থা সাহিত্য-শিল্পের অনুকূল অবস্থা মোটেও নয়—না সাহিত্য-সৃষ্টির না সাহিত্য উপভোগের।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে ঐতিহ্যের ভূমিকা আলোচনা করতে গিয়ে বিখ্যাত আইরিস কবি W.B. Yeats—‘Popular memory’ ও ‘Ancient Imagination’—এর প্রয়োজনের কথা বলেছেন। ... আজ আমাদের Popular Memory ও Ancient Imagination খণ্ডিত, শিল্পীর মন-মানস বিপর্যস্ত, ছিন্নমূল ও নোঙরহীন। এ অবস্থায় উচ্চাঙ্গের সাহিত্য হতে পারে কিনা জিজ্ঞাস্য। আবুল ফজল বলেন, আমাদের যা কিছু উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি বা রচনা সবই আমরা যখন বাঙালি ছিলাম তখনকার... গত এগার বছরে আমাদের প্রবীণরা যেমন কিছু সৃষ্টি করতে পারেননি, তেমনি পারেননি তরুণরাও। এমনকি জয়নুল আবেদিনেরও যা কিছু উল্লেখযোগ্য ছবি তাও সব স্বাধীনতার আগেই আঁকা। সাহিত্য যতখানি জীবনের সঙ্গে, পরিবেশের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছবি ততখানি নয়। ‘ব্যক্তির’ প্রাধান্য ছবিতে অনেক বেশি। তাই মনে হয় বর্তমান পরিবেশে ছবির ভবিষ্যৎ কিছুটা উজ্জ্বল হলেও সাহিত্যের মোটেও নয়। জাতির পুরনো ঐতিহ্য, প্রবহমান স্মৃতি ও কল্পনা ছবির ক্ষেত্রেও যে কতখানি প্রেরণার উৎস হতে পারে অবনীন্দ্রনাথ, নন্দনাল প্রভৃতি শিল্পীর বহু নামকরা ছবিই তার দৃষ্টান্ত। পুরনো স্মৃতি ও কল্পনা অবলম্বন করে আবদুর রহমান চাঘতাই বহু স্মরণীয় ছবি এঁকেছেন। কিন্তু চাঘতাইর জন্য যা স্বাভাবিক জয়নুল আবেদিনের জন্য তা স্বাভাবিক না—ও হতে পারে। উভয়ের ‘স্মৃতি’ ও ‘কল্পনার’ ঐতিহ্য এক নয়, তার উপর নন উভয়ে এক ‘স্কুলের’ শিল্পী—দুইয়ের মন-মানস ও ধ্যান-ধারণার পটভূমিও ভিন্নতর। তাই উভয়ের ছবি সম্পূর্ণ আলাদা জাতের ও আলাদা জগতের।

তিনি বলেন, আমরা কি লিখলে, কেমন করে লিখলে শাসকদের বিষনজরে পড়বনা তাও আমাদের এক দুশ্চিন্তা। ফলে ইচ্ছায়-অনিচ্ছায়, বিনা আবেগ ও বিনা প্রেরণায় আমরা সাহিত্যিকরাও বহু শ্লোগান আউড়িয়েছি এই এগার বছর ধরে। তা সত্ত্বেও সাহিত্যের অগ্রগতির চেয়ে পশ্চাদগতিই হয়েছে বেশি।

বরং যারা এসব বেশি করে আউড়িয়েছেন তাঁদের পদক্ষেপ সামনের চেয়ে পেছনের দিকেই হয়েছে দ্রুততর। কারণ পেশাগত তথা অর্থকরী আবেগ ও প্রেরণা ছাড়া এ সবার পেছনে আন্তরিকতার লেশমাত্রও ছিল না। যে আন্তরিকতা হচ্ছে সাহিত্য-শিল্পের প্রাথমিক শর্ত। দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অন্ধশূন্যতা আমাদের মনের আন্তরিকতাকে শুধু যে অন্ধুরিত হতে দেয়নি তা নয়, যা ছিল সহজাত তাকেও অনেকখানি বিনষ্ট করে ছেড়েছে। আর বলেছি আমাদের নতুন 'স্মৃতি' ও 'কল্পনা' ঐতিহ্যে পরিণত হয়ে, আবেগ ও প্রেরণায় অনুরঞ্জিত হয়ে, সাহিত্যের উপকরণ হয়ে উঠতে বেশ সুদীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। জাতির মন-মানস স্থিরতা পেতে ও স্থির হয়ে যা আত্মস্থ করার তা আত্মস্থ করতে, যা বর্জন করার তা বর্জন করতে বেশ সময় নিয়ে থাকে। এই ভাবে 'গ্রহণ' ও 'বর্জনের' ফলে জাতীয় 'স্মৃতি' ও 'কল্পনা' স্থিতি লাভ করে। দেশ যেমন আমাদের ছোট হয়ে গেছে, আমাদের আবেগ, প্রেরণা ও উপকরণের ক্ষেত্রও হয়ে পড়েছে ক্ষুদ্র, এমনকি পাঠকও হয়ে পড়েছে শোচনীয় রূপে সীমিত। ভাল ছাত্র ও বড় ক্লাস যেমন অধ্যাপককে ভাল অধ্যাপক হওয়ার ও পঠনীয় বিষয় সম্বন্ধে সর্বাঙ্গীণ প্রস্তুতির তাগিদ দিয়ে থাকে, তেমনি ভাল তথ্য, সমজদার পাঠক ও বহু পাঠক সাহিত্যিককে রচনার মান উন্নয়নের প্রেরণা জুগিয়ে থাকে। ইংরেজি সাহিত্য এর এক বড় দৃষ্টান্ত। আমাদের মনের সামনে, চোখের সামনে পাকিস্তান বলে কোন দেশ নেই, আছে পূর্ব পাকিস্তান আর পশ্চিম পাকিস্তান। সমগ্র পাকিস্তানের পটভূমিতে, তার ঐতিহ্য ও মানুষের জীবন নিয়ে কিছু লেখা আজ কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। মন মানসে আমরা আজ হয় পূর্ব পাকিস্তানী না হয় পশ্চিম পাকিস্তানী, এ সত্যকে অস্বীকার করা রাজনৈতিক সুবিধাবাদ হতে পারে কিন্তু বাস্তববোধের পরিচায়ক নয়। আমরা হয় পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যিক, না হয় পশ্চিম পাকিস্তানের সাহিত্যিক। সামগ্রিকভাবে পাকিস্তানের সাহিত্যিক আমরা কেউই নই। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সাহিত্যের শুধু যে ভাষা পৃথক তা নয়—তার মন-মেজাজ, জীবন-জিজ্ঞাসা, এমনকি দৃষ্টিভঙ্গি আর শিল্পরূপ পৃথক। পাকিস্তানের দুই অংশের ইতিহাস ভূগোল ও ঐতিহ্য সম্পূর্ণ আলাদা। দুই অংশের মধ্যে ভৌগোলিক দূরত্ব এত দূস্তর যে কল্পনায়ও সাধারণ নাগরিক একটার সঙ্গে আর একটার যোগসাজস করতে অক্ষম। এই দূরত্ব প্রাকৃতিক বলেই আরো দুলভ্য। ইংরেজের সঙ্গে আমেরিকাবাসীর যতখানি মিল আমাদের ততখানি মিলও নেই। ওদের বংশ এক, ধর্ম এক, ভাষা এক, আচার-বিচার, পোশাক-পরিচ্ছদ পর্যন্ত প্রায় এক। তবু ওরা এক রাষ্ট্র বা এক জাতি হতে পারেনি। আমাদের ত এক ধর্ম ছাড়া সব ব্যাপারেই গরমিল। একমাত্র ধর্মই যদি রাষ্ট্র বা জাতির মূল ভিত্তি হয় তা হলে আফগানিস্তান আর পাকিস্তান এক রাষ্ট্র বা এক জাতি নয় কেন? ইংরেজ আর ফরাসীই বা নয় কেন? অথচ ইংলও আর ফ্রান্সের মাঝখানে একটি মাত্র খালের ব্যবধান, যে খাল পূর্ব পাকিস্তানের ব্রজেন দাসও সাঁতরে পার হতে পারে।

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে শুধু ইতিহাস ভূগোলের যে পার্থক্য তা নয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চেতনা এবং ধ্যান-ধারণায়ও রয়েছে আসমান-জমিন ফরখ। পশ্চিম পাকিস্তান পুরোপুরিই সামন্ততান্ত্রিক—পূর্বপাকিস্তান তার ঠিক উল্টো, একদম সাধারণ

মানুষের দেশ এটা। সামন্ততান্ত্রিক অবস্থার প্রধান গলদ তা মর্মান্তিকভাবেই ব্যক্তিগত স্বার্থকেন্দ্রিক।

এত সব বৈষম্য রয়েছে বলেই ত পাকিস্তানের রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে কিছুতেই স্থিতিশীলতা আসছে না। কেন্দ্রে রাজনৈতিক ব্যারোমিটারের ওঠানামার সঙ্গে সঙ্গে প্রদেশের রাজনৈতিক ব্যারোমিটারও বিনা কারণে ওঠানামা করে, করতে বাধ্য হয়। ফলে কোথাও স্থিতিশীলতা ও আর্থিক নিরাপত্তার চেহারা দেখা যাচ্ছে না। সাহিত্যিক-শিল্পীদের সামনে এই ত আজ দেশের রাষ্ট্র-রূপ। এই রূপ সাহিত্য রচনার অনুকূল কিছুতেই নয়।

লেখকের মতে, ব্যক্তিগত প্রতিভার বিচ্ছিন্ন ও খুচরো কিছু কিছু ফসল যে এ অবস্থায় ফলে না তা নয়। কিছু ভাল গল্প-কবিতা এখানে ওখানে হয়ত লেখা হতে পারে, হচ্ছেও। কিন্তু বৃহত্তর পরিধিতে ব্যাপকতর হবে মহত্তর সাহিত্য—যে সাহিত্যে দেশ ও জাতির জীবন-জিজ্ঞাসা ও আত্মোপলব্ধি রূপায়িত হয়ে ওঠে, জাতীয় মন-মানস ও আত্মা প্রতিফলিত হয় তা কিছুতেই সম্ভব নয়। যে কোন বড় সৃষ্টির জন্য আর তার সমঝদারি তথা Appreciation এর জন্য যে অনুকূল পরিবেশ দরকার তা আজ কোথায়? গুণগ্রাহিতার কোন লক্ষণ আজ কোথাও পরিলক্ষিত হচ্ছে কি? ‘প্রেসিডেন্টের পুরস্কার বড়, বয়স্ক ও veteran দের জন্য তোলা থাক। আমি সাধারণ, মাঝারি ও তরুণ লেখকদের কথা বলছি—এঁদের জন্য অনুকূল পরিবেশ চাই। প্রকাশক, ক্রেতা ও সাধারণ পাঠকের আনুকূল্য ছাড়া এসব লেখক—লেখক হিসেবে বাঁচতে পারেন না। এঁদের লেখায় আসতে পারে না ক্রমোন্নতি।’ বলাবাহুল্য, বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিভিন্ন বিষয়ে এঁরাই একাগ্র সাধনায় সাহিত্যের সমৃদ্ধি ও প্রসার বাড়িয়ে থাকেন। শেঞ্জুপিয়ার বা রবীন্দ্রনাথ আর কয়টা? —সংখ্যাগত মাঝারি লেখকরাই পৃথিবীব্যাপী সাহিত্যকে গড়ে তুলেছেন ও দিয়েছেন বৈচিত্র্য। আমাদেরও এই মাঝারিদের সাধনা-নিষ্ঠার উপর নির্ভর করতে হবে। জীবন ও জীবনের সমস্যা সম্বন্ধে যে যে-মতই পোষণ করুক অথবা রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণা যার যেমনই হোক—দল মত নির্বিশেষে সব লেখককে লেখার স্বাধীনতা দিতে হবে। এখন রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার জন্য বিশেষ করে পাকিস্তানের দুই অংশে দৃষ্টিভঙ্গির যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে, তার ফলে পূর্ব পাকিস্তানের লেখকরা কিছুতেই দ্বিধামুক্ত হতে পারছে না। এমন কি দক্ষিণপন্থী মন্ত্রীসভা কায়ম হলে বামপন্থী লেখকদের বুক দুর্ক দুর্ক করতে থাকে। আবার বামপন্থী মন্ত্রীসভা গঠিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে দক্ষিণ-পন্থী লেখকদের মুখ কালো হয়ে যায়।

‘সাহিত্যের সংকট’ প্রবন্ধে আবুল ফজল আরো বলেন, সাহিত্যের মূল্য ও ভূমিকা বুঝতে হলে সাহিত্যকে সাহিত্য হিসেবে দেখার একটা নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি অত্যাবশ্যক। রাজনৈতিক দল ও সুবিধাসন্ধানীরা এই দৃষ্টিভঙ্গি আয়ত্ত করতে পারছে না বলে আজ সাহিত্যিক, সাহিত্য প্রতিষ্ঠান ও সাহিত্য সম্পর্কিত অনুষ্ঠানাদি এক অবাঞ্ছিত শিকারের লক্ষ্যবস্তু হয়ে পড়েছে। ফলে জাত লেখক ও সাহিত্যসেবীরা আজ অনেকটা দিশেহারা। সব দেশের মত আমাদের দেশের ও সাহিত্যের ভবিষ্যৎ দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও জাতীয়তার সুষ্ঠু রূপ গ্রহণের উপর নির্ভরশীল। এ যতদিন না হচ্ছে ততদিন সাহিত্য ও

সাহিত্যিকের দুর্গতির অবসান ঘটবে না। বর্তমানে যারা প্রগতিশীল বলে পরিচিত ও যারা লেখায় কিছুটা তেল-নুন-লাকড়ীর কথা বলেন, তাঁদের পক্ষে কোন সাহিত্যানুষ্ঠানে যোগ দেওয়া পর্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে পড়েছে।

চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, ঢাকা, কাগমারী—যে কয়টা বড় আকারের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়েছে, যদিও এর কোনটাই নিছক বামপন্থীদের অনুষ্ঠান ছিল না, তবুও এর প্রত্যেকটির বিরুদ্ধে পাকিস্তান বিরোধিতার ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ তোলা হয়েছে। প্রতিটি অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে ঢাকার কোন কোন দৈনিক প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে। তারপর দিনের পর দিন চলতে থাকে নিন্দার খেউড়। এ হচ্ছে এই অভিযোগের প্যটার্ন। এঁদের চোখে নিন্দা হচ্ছে ‘ওরা কমিউনিস্ট ভারতের দালাল অথবা যুক্তবঙ্গের সমর্থক’। কোন যুক্তি নেই, কোন প্রমাণ নেই—একটা Rational উক্তি পর্যন্ত নেই। শুধু কটুক্তি। এঁদের মনে এ প্রশ্ন উদয় হয় না যে—আমাদের অত বড় গোয়েন্দা বিভাগ কি করতে আছে? এ সব ত তাঁদের কাজ। অতগুলি ভারতের দালাল আর কমিউনিস্ট এখানে অত বড় বড় সভা করে বেড়াচ্ছেন আর তাঁরা নাকে তেল দিয়ে ঘুমুচ্ছেন, এটা তাঁদের পক্ষে কিছুমাত্র প্রশংসার কথা নয়। আশ্চর্যের বিষয়—‘যুক্তবঙ্গের ধূয়া আজ পূর্ব পাকিস্তানের দক্ষিণ-পন্থীদের হাতে একটা মোটা লাঠি হয়ে দাঁড়িয়েছে, যা সুযোগ সুবিধামত তাঁরা বামপন্থী লেখক ও রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের মাথায় ভাঙতে কিছুমাত্র দ্বিধা করেন না। স্বয়ং শহীদ সোহারাওয়াদীও এই লাঠির ঘা থেকে বাঁচতে পারেননি। অথচ বামপন্থী রাজনৈতিক মতবাদের তাঁর চেয়ে বড় দূশমন বোধ করি আর দ্বিতীয়টি নেই।

মুস্কিল হচ্ছে সুবিধাবাদী রাজনীতি ন্যায় সত্য ধর্ম কিছুই তোয়াক্কা করে না। ফলে ‘ইসলাম’ ও ‘পাকিস্তান’ শব্দ দুটিও আজ এঁদের সুবিধা হাসিলের হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। ...এরা নিজস্ব লজিক দিয়েই ম্যাজিক দেখান—কেউ মেমশাবককে? কেউ আমাদের মত বাঙালকে। ‘ইসলাম’ ও ‘পাকিস্তান’ আজ এইভাবে এঁদের মুখে ম্যাজিক-বুলিতে পরিণত হয়েছে। তাই এ—দুটি শব্দকে নিজেদের ব্যক্তিগত সুযোগ-সুবিধার দিকে চোখ রেখে ইচ্ছামতো বাঁকানো হচ্ছে, মোচড়ানো হচ্ছে, ব্যবহার করা হচ্ছে।

পাকিস্তানে বাংলা সাহিত্যের সংকট ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি যথার্থই বলেন, দেশের রাষ্ট্ররূপ স্থিতিশীল ও সুস্থভাবে গড়ে উঠছে না বলে সাহিত্যিকরাও আজ সাহিত্যসৃষ্টির অনুকূল পরিবেশ থেকে বঞ্চিত। নিকট ভবিষ্যতেও অনুকূল পরিবেশের কোন রকম আভাস দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না বলে সর্বাঙ্গীণ হতাশার মধ্যে জীবন্মৃত অবস্থায় কোন রকমে তাঁরা বেঁচে আছেন। ‘সাহিত্যকে পেশা হিসেবে নেওয়ার আশা আজ পাকিস্তানে রীতিমত দুর্শাশাই।’ ফলে প্রবীণেরা হয়ে পড়েছেন হতাশাগ্রস্ত ‘দিশেহারা’। সকলেরই প্রশ্ন কেন লিখবো, কার জন্য লিখবো, কে ছাপবে, কে পড়ছে? বাঙালির সামনে কোনো রাষ্ট্রদর্শ নেই বলেই সাহিত্যদর্শ কিংবা সাহিত্যসৃষ্টির পরিবেশ গড়ে ওঠেনি। লক্ষণীয়, ‘পাকিস্তান আন্দোলন ও তার সাফল্য প্রতিভাবান শিল্পী-সাহিত্যিকদের মন-মানসে কোন নতুন জোয়ার আনতে পারেনি, অন্তরের অন্তস্থলকে গভীরভাবে নাড়া দেয়নি কারো, খুলে যায়নি তাদের চোখের সামনে সাহিত্য-



শিল্পের কোন নতুন দিগন্ত-রেখা। স্বাধীনতার অরুণোদয়ে কারো মন-মানস হয়নি মুখর—নতুন আবেগে কারো উদাত্ত কণ্ঠ হয়ে ওঠেনি উচ্ছ্বসিত। কবি চিত্তের উল্লাস কতখানি উচ্ছ্বসিত ও কলমুখর হতে পারে তার নিদর্শন নজরুলের ‘প্রলয়োল্লাস’। ... আমাদের রাষ্ট্র, সমাজ ও সাহিত্যের বর্তমান অবস্থা ও পরিবেশের...যে কোন Great moment হারিয়ে যাওয়ারই কথা। জীবিকার প্রাথমিক স্বাধীনতাটুকুও যদি না থাকে শিল্পী আত্মস্থ হবেন কি করে, কি করে হবেন বেপরওয়া? ...বেপরওয়া মনোভাবের উত্তরাধিকারী ছাড়া বড় সাহিত্য, মহৎ সাহিত্য রচিত হতে পারে কিনা এ বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। বলাবাহুল্য অনুকূল পরিবেশই তেমন মনোভাবের জন্ম দিতে পারে।<sup>৮</sup>

সাংস্কৃতিক সংকটের এবং ‘সংস্কৃতি’ নিয়ে বিতর্কের কালে অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ-চিত্তেই তিনি লিখেছিলেন অখণ্ড পাকিস্তানি সংস্কৃতির বিরুদ্ধে—

আমাদের কথাটি বিষয়টিকে করে তুলেছে আরো জটিলতর। আমাদের সংজ্ঞা কি? আমরা কারা? কাদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারী? আমাদের অনেক পরিচয়—আমরা পাকিস্তানী, আমরা পূর্ব পাকিস্তানী, আমরা মুসলমান, সবার উপরে আমরা আধুনিক মানুষ অর্থাৎ সামগ্রিক অর্থে আমরা আধুনিক বিশ্বের বাসিন্দা। এই ‘আমরা’র সঙ্গে ‘অন্য আমরা’র মিল যতখানি বিরোধ তার চেয়ে অনেক বেশী। সংস্কৃতির যদি কোন বহিঃস্থ থাকে, যদি থাকে বাইরের চেহারা, তাহলে তাতে এ বিরোধ অধিকতর প্রকট। বরং শেষোক্ত আমাদের মধ্যে অর্থাৎ আমরা যেখানে আধুনিক মানুষ সেখানে আমাদের পরস্পরের মিল অনেক বেশী—বাইরের যেমন ভিতরেও এ মিল অনেক বেশী লক্ষ্যগোচর।

...সেকেলে বাপের সংস্কৃতি আর একেলে পুত্রের সংস্কৃতি কিংবা সেকেলে শাশুড়ী আর একেলে পুত্রবধূর সংস্কৃতিও সম্পূর্ণ আলাদা—বহিঃস্থে যেমন অন্তরঙ্গও তেমনি আলাদা। বলা বাহুল্য সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শব্দের ও অর্থ বদলায়, শব্দও বহুমান নদীর মত। জীবন আর সামাজিক ধারণার রদবদলেরও সঙ্গে সঙ্গে শব্দের তথা তার অর্থের বদলও অনিবার্য। জীবনের প্রয়োজন আর চাহিদা যেমন আজ অসম্ভব বেড়ে গেছে তেমনি মনের দিগন্তও বেড়েছে অবিশ্বাস্যরূপে।

উত্তরাধিকার কথাটারও সীমা আজ তাই আর আগের মত সীমিত হয়ে নেই, নেই আগের মত গোষ্ঠী, সম্প্রদায় বা ভূগোলে আবদ্ধ হয়ে। কোন উত্তরাধিকারকেই আর আজ ওভাবে বেঁধে রাখা যাবে না। বেঁধে রাখতে গেলে কূপমণ্ডুকতাই হবে পরিণতি। আধুনিক যুগে, আধুনিক বিশ্বে, কূপমণ্ডুকের স্থান নেই। কূপমণ্ডুকতা মনে নিজের হাতে নিজের কবর খোঁড়া।

আজকের দিনে সংস্কৃতি ক্ষেত্রে আমার বা আমাদের কথাটার বিশেষ মূল্য আছে বলে মনে হয়না। কারণ, আগের দিনের মত আজ আর কিছুই স্থিতিশীল নয়, বিশেষ করে সদ্য স্বাধীনতা-প্রাপ্ত, নতুন করে জেগে ওঠা নিম্নীয়মান দেশগুলিতে। এসব দেশের শাসক আর সচেতন শ্রেণী তাকিয়ে আছে অগ্রসর ও উন্নত দেশগুলির দিকে এবং তারই অনুকরণ করছে নানাভাবে। ...মনে হয় সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার কথাটা আজ অনেকখানি অর্থহীন হয়ে পড়েছে। ‘আমাদের’ কথাটার যেমন ব্যাখ্যা প্রয়োজন তেমনি ‘সংস্কৃতি’ কথাটারও নতুন ব্যাখ্যা আবশ্যিক।<sup>৯</sup>

আবুল ফজলের এই ‘বেপরওয়া’ রচনার ন্যায় বহু রচনাই ‘সমকাল’ প্রকাশ করেছিল। ‘শিল্পীর প্রতি সমাজের কর্তব্য’, ‘লেখকের স্বাধীনতা ও সামাজিক দায়িত্ব’, ‘আমাদের সাহিত্যের ঐতিহ্য’, ‘ধর্ম ও রাষ্ট্র’, ‘মুসলিম স্বাতন্ত্র্যের পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ’, ‘মানবতন্ত্র’, ‘আমাদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার’ প্রভৃতি প্রসঙ্গে বহু জিজ্ঞাসা, তাড়না ও জাগরণমূলক নানা লেখায় তিনি পাকিস্তানের অস্তিত্বের মূলে অনবরত আঘাত হেনে চলেছিলেন।

আবদুল হকও স্বনামে এবং ‘আবু রায়হান’, ‘আবু আহসান’ ছদ্মনামে লিখেছিলেন সমগ্র সমকালের চিন্তামূলক রচনার এক বৃহদাংশ। বিস্তারিত তালিকায় দেখা যায় সাহিত্য সংস্কৃতি সমাজ দেশ ও রাষ্ট্র বিষয়ে তিনিও যে সমস্ত প্রবন্ধ লিখেছিলেন এবং সমকালে ছাপা হয়েছিল, তাতে পূর্বের সঙ্গে তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্য চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছিল এবং জাতীয়তার প্রশ্নে ঘুমন্ত বাঙালিকে প্রস্ফুট করে জাগ্রিত করে তোলা হচ্ছিলো। আবদুল হক—‘রাজনীতি সাহিত্য ও সংস্কৃতি’, ‘সাহিত্যিক মূল্যবোধ’, ‘ভাষা স্বদেশ সত্তা’, ‘নেতৃত্ব ও গণচেতনা’, ‘বাঙালি মুসলমান : ভূমিকা ও নিয়তি’, ‘পূর্বপাকিস্তান : বাংলাদেশ’, ‘শিক্ষায়োজন : বৈষম্য ও সংস্কৃতি’, ‘যুদ্ধ ও সাম্প্রদায়িকতা’ প্রভৃতি বিষয়ে লিখেছিলেন যা, তাও পাকিস্তান সরকারকে ভাঙনের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। বাধ্য হয়েই কয়েকটি সংখ্যা (অন্তত ৪টি) তাই পাকিস্তান সরকার বাজেয়াপ্ত করতে বাধ্য হয়েছিল।

আবদুল হক ‘রাজনীতি সাহিত্য ও সংস্কৃতি’ শীর্ষক আলোচনায় বলেন : ‘রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব শিল্পী-সাহিত্যিক সাংস্কৃতিক কর্মীদের হাতে ন্যস্ত হওয়া উচিত। মনে পড়ছে, প্লেটো রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্ব দিতে চেয়েছিলেন দার্শনিকের হাতে। আমার বক্তব্য অবশ্য অতখানি অবাস্তব নয়। আমার বক্তব্য শুধু এইটুকু যে, জাতি ও রাষ্ট্র পরিচালনের গুরুভার যাদের স্কন্ধে ন্যস্ত শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চা তাঁদের জন্য একান্ত বাঞ্ছনীয়। এসব ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত অবদান দিয়ে বহু শতাব্দীতে বহু দেশে অনেকেই জাতির ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করেছেন, তেমন যদি হয় তবে ভালই, যদি অতটা না হয় তবু এ চর্চার সুফল এই যে, এতে দেশ জাতি ও সমাজ শ্রীমণ্ডিত হয়। এ চর্চা রাজনীতির অনেক ভীষণতাকেও কোমলতায় মণ্ডিত করতে পারে বলে মনে হয়। ...যে ব্যক্তি গান ভালবাসে না সে মানুষ খুন করতেও পারে। আমাদের প্রাক্তন নেতৃসমাজ শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন এবং এই কারণে সুকুমার মনোভঙ্গি এবং দৃষ্টিভঙ্গির অভাব ছিল তাঁদের মধ্যে বড় বেশি। তাঁরা ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা, অথবা অন্যান্য মহৎনীতির কথা বলতেন এবং একটু বেশি করেই বলতেন, কিন্তু আসলে তাঁরা ছিলেন—ব্যতিক্রম অবশ্যই ছিল—অবিশ্বাস্য রকমে বস্তৃতাত্ত্বিক।

শুধু আধ্যাত্মিকতার বিপরীত অর্থেই বস্তৃতাত্ত্বিক কথাটা ব্যবহার করছি না। সূক্ষ্মচেতনা, চিন্তা ও মূল্যবোধ তাঁদের জগতে ছিল একান্তই বিরল। রাজনৈতিক কূটচালের উল্লেখ আমি করব না, সকলেই জানেন এই কূটচালের মধ্যেও সূক্ষ্মতা থাকত না। রাজনীতির বাইরেও সামাজিক, সাংস্কৃতিক বা নৈতিক সবক্ষেত্রেই তাঁদের চিন্তা ছিল স্থূল এবং বক্তব্য ছিল আরও স্থূল। অতএব স্বভাবতই তাঁরা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ধারে-কাছে ঘেঁষতেন না এবং দেশের মনন জগতের অগ্রগতি ও সমৃদ্ধিতে তাঁদের অবদানও অতি নগণ্য। জাতি এক্ষেত্রে তাদের কাছে কোন প্রেরণাও পায়নি, পেয়েছে বরং মূল্যবোধের বিপর্যয়। এই পরিস্থিতিতে সমাজের দিকে তাকিয়ে লেখকের মন্তব্য :

“ভুল করে হোক আর ঠিক করেই হোক সাধারণ মানুষ জনসমাজের শিক্ষিত অংশেরই সাধারণ মানুষ—দেশের নেতৃবৃন্দের জীবনধারা অনুসরণ করে থাকে। তাঁদের অনুগ্রহেরও প্রত্যাশী তাঁরা। অতএব যে দেশের নেতৃসমাজ

নিছক স্বার্থের প্রেরণায় বহু রূপের উপাসক (বিপ্লবপূর্ব কালের রাজনীতিকদের অনেক দোষের মধ্যে এই একটি দোষ বড় ছিল যে, তাঁরা এমন ভাল কথা নেই যা বলতেন না, এবং এমন ভাল কথা বলতেন না যা হাওয়ার গতি বুঝে অম্মানবদনে পাল্টে না দিতেন), অধিকন্তু শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্কহীন,—সে দেশের সমাজের মানসিক অধোগতির সীমা থাকে না এবং মানসিক অধোগতি যখন হয় তখন অন্য অধোগতিই বা ঠেকায় কে? অবশ্য প্যারাডক্সও আছে—নেতৃসমাজের প্রভাব জাতির ওপর পড়ে ঠিকই কিন্তু জাতি সেই রকম নেতাই চেয়ে থাকে যার সে উপযুক্ত। ... মূল্যবোধের ক্ষেত্রে সমাজ যতদিন নিজের অপচয় ও অবক্ষয় রোধ করতে না পারবে এবং নিজেকে সৃষ্টিমুখর করতে না পারবে ততদিন উত্তম নেতৃসমাজ সে সৃষ্টি করতে পারবে না; অপকৃষ্ট নেতৃত্বই হবে তার নিয়তি। মূল্যবোধের বাহন শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে মনে প্রাণে নিতে না-পারলে এবং মননধারা ও মূল্যবোধের উত্তম ঐতিহ্য সৃষ্টি করতে না পারলে কোনো সমাজেরই ভবিষ্যৎ নেই।<sup>১০</sup>

আবু রায়হান ছদানামে আবদুল হক সমকালের অগ্রহায়ণ ১৩৭১ সংখ্যায় (হয়তো ২/৩ মাস পরে ফাল্গুনেই প্রকাশিত হবে, নচেৎ ১৯৬৫র জানুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের সমালোচনা ছাপা হয় কি করে?) পয়ষট্টির ২ জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফলাফলে মিস জিন্নাহর পরাজয়ের প্রেক্ষিতে পূর্বপাকিস্তানের স্বার্থ সমুন্নত রাখার ব্যাপারে বক্তব্য রাখতে গিয়ে স্পষ্টতই উচ্চারণ করেন : সম্মিলিত বিরোধীদল 'পরিতাপের বিষয়, পূর্বপাকিস্তানের নিজস্ব সুবিদিত অভিযোগগুলির প্রশ্নে তার প্রতি অবিচারগুলির প্রশ্নে এবং প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে নির্বাচনী অভিযোগকালে সম্মিলিত বিরোধীদলের নেতৃত্বন্দ সম্পূর্ণই নীবর ছিলেন।'

এই দলের নিখিল পাকিস্তান ঐক্যের খাতিরে এবং প্রতিপক্ষের ভয়ে এসব প্রশ্নের ওপর বেশি জোর দেওয়া সঙ্গত ছিল না—এই বলবেন অনেকে। কিন্তু এখানে এবং এখন, স্পষ্ট চিন্তার প্রয়োজন আছে। পাকিস্তান ঐতিহাসিক কারণ পরস্পরায় এক রাষ্ট্র হলেও, চোখ বুঁজে বাস্তবকে অস্বীকার না-করলে একথা মানতেই হবে যে, রাষ্ট্রের দুই অংশ আসলে সহস্রাধিক মাইল দ্বারা বিভক্ত দুটি স্বতন্ত্র দেশ এবং এই দুইদেশের অধিবাসীরাও স্বতন্ত্র মানবগোষ্ঠী। এদের প্রাকৃতিক পরিবেশ স্বতন্ত্র, সমস্যা স্বতন্ত্র, প্রগতির ধারা স্বতন্ত্র, এদের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অন্যবিধ সুযোগ-সুবিধারও বিপুল বৈষম্য বর্তমান। এই সব কারণে তাদের স্বার্থ একরকম হতে পারে না। এই মৌলিক কথাটা উপলব্ধি না করলে পূর্বপাকিস্তানীদের দুঃখ কোনো কালে ঘুচবে না।

সর্বজনীন ভোটাধিকারের অর্থ পূর্বপাকিস্তানে ভোটের সংখ্যা বেশি হওয়া এবং প্রত্যক্ষ ভোটে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের অর্থ আজ হোক কাল হোক, কোনো পূর্বপাকিস্তানী প্রার্থীর নির্বাচিত হওয়া এবং শেষ পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তানের প্রাধান্য বর্তমান অপেক্ষা অনেক খর্ব হয়ে যাওয়া, অতএব ওখানে কিছু গণতন্ত্রমণা লোক থাকলেও অধিকাংশ লোক সর্বজনীন ভোটাধিকার ও প্রত্যক্ষ নির্বাচন চাইতে পারে না। এই বাস্তব পরিস্থিতিকে উপেক্ষা করে নিখিল পাকিস্তান ভিত্তিতে নির্বাচনী ঐক্য গড়তে গিয়ে পূর্বপাকিস্তানের মৌলস্বার্থকে চাপা দেওয়া হয়েছে এবং তার ফল এখন এই প্রদেশের জনসাধারণকেই ভুগতে হবে।

বস্তুত এযাবৎ লব্ধ আমাদের রাজনৈতিক ও অন্যবিধ অভিজ্ঞতা একথাই বলে যে, একান্তভাবে পূর্বপাকিস্তানের অভিযোগগুলো এবং তার প্রতিকারস্বরূপ স্বায়ত্তশাসনের দাবীকে

সর্বাঙ্গগণ্য করে এবং তার সঙ্গে সাম্প্রতিক নির্বাচনের অন্যান্য লক্ষ্য সংযুক্ত করে এ প্রদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর একত্র গঠন করা উচিত ছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষ কতোটা তা মানতো না মানতো তা বড় প্রশ্ন ছিল না (প্রাদেশিক দাবী দূরে থাক, সর্বজনীন দাবীগুলির প্রতিও তারা সাম্প্রতিক নির্বাচনে ব্যাপক সমর্থন জানায়নি)। পূর্ব পাকিস্তানের নিজস্ব কর্মসূচি নিয়ে এ প্রদেশের দলগুলির নির্বাচনে নামা উচিত ছিল। এতে অবিলম্বে সাফল্য আসুক বা না আসুক, পূর্বপাকিস্তানের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠারও পথ সুগম হতো। এর একটা অনুসঙ্গ হতো পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক তৎপরতার স্নায়ুকেন্দ্র এ প্রদেশেই স্থাপন করা এবং পশ্চিমপাকিস্তানে তার তৎপরতা প্রসারিত করা মাত্র। সম্মিলিত বিরোধীদল বস্তুত পূর্বপাকিস্তানেই গঠিত হয়েছিল। কিন্তু পরে তার নেতৃত্ব করাচীতে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল পশ্চিমপাকিস্তানের ভোটের আশায়।

অবশ্যই এর আরেকটি অপরিহার্য অনুসঙ্গ হতো প্রেসিডেন্ট পদের জন্য একজন যোগ্য পূর্বপাকিস্তানি প্রার্থী দাঁড় করানো। পূর্বপাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ একটি অবাস্তব কাজ করেছেন এই যে, তাঁরা সম্মিলিত হয়ে একজন যোগ্য পূর্বপাকিস্তানিকে প্রার্থী হিসেবে দাঁড় করাননি। এ প্রদেশে যোগ্য লোক কেউ ছিলেন না একথা শুধু বহুধাভিত্তক রাজনৈতিক দলগুলির ঈর্ষাপরায়ণ এবং হীনমন্যতায় আচ্ছন্ন নেতৃবৃন্দই বলতে পারেন। সাম্প্রতিক নির্বাচনের তাৎপর্য পর্যালোচনার সঙ্গে সঙ্গে এই কথাটা বিবেচনা করা এবং আত্মজিজ্ঞাসায় নিয়োজিত হওয়া এখন তাঁদের প্রধান কর্তব্য। এবড়োকৃত নেতাদের বাইরেও প্রেসিডেন্ট পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতার যোগ্য লোক প্রদেশে একাধিক ছিলেন। দলীয় সংস্কার ও দলীয় স্বার্থবোধ থেকে মুক্ত অনেক রাজনীতি-সচেতন ব্যক্তিকেই তাঁদের নাম বলতে পারবেন।

...অতএব, সাম্প্রতিক এবং অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যতের জন্য এখন থেকেই প্রস্তুত হওয়া দায়িত্ব-সচেতন ব্যক্তিদের কর্তব্য। কালপ্রবাহ স্তম্ভিত হয়ে নেই। শত ব্যর্থতা সত্ত্বেও অবারণগতি ঠিকই এগিয়ে চলছে। একথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, উভয় পাকিস্তানে গৃহীতব্য এরূপ ব্যক্তিত্বের সংখ্যা ক্রমেই কমে আসছে। কায়েদে আজম ও লিয়াকত আলী, খাজা নাজিমুদ্দীন ও সোহরাওয়ার্দী, চৌধুরী মোহাম্মদ আলী, চুদ্দ্রিগড় ও ফিরোজ খান নূন, এঁদের কেউ দেশপ্রেম, সততা, ব্যক্তিত্ব ও যোগ্যতাবলে, কেউ প্রথমোক্তদের সাহচর্যের স্মৃতিবশত কেউ কূটকৌশল ও ক্ষমতা বলে এবং কেউবা নিছক রাজনৈতিক ঘটনাচক্রে পাকিস্তানের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হয়েছেন।

কিন্তু লক্ষণীয় যে দু'একজন ছাড়া এঁদের কেউ পূর্ব পাকিস্তানি নন, এবং যাঁরা পূর্ব পাকিস্তানি তাঁরাও বাঙালি নন। এঁদের অন্তত অর্ধেক বাঙালি হওয়া উচিত ছিল : কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। এমনকি এযাবৎ পূর্ব পাকিস্তানে নিযুক্ত গভর্নরদের এক তৃতীয়াংশও বাঙালি নন। এটা এ রাষ্ট্রের শতকরা ৫৫ জনের পক্ষে আদৌ গৌরবের কথা নয়। এর পেছনে নানা রকম কূট কৌশলের ব্যাপার আছে, কিন্তু এটা বাঙালির অতি-সাফল্যের অন্তর্দ্বন্দ্বের এবং রাষ্ট্রীয় অভিভাবকের জন্যে সর্বদা পশ্চিমের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকারও প্রমাণ। কিন্তু এমন আর কতদিন চলবে? ...ভবিষ্যতের কথা মনে রেখে পূর্বপাকিস্তানে যোগ্য নেতৃত্বের অনুশীলন ও বিকাশের সাধনা ব্যতীত গত্যস্তর নেই।<sup>১১</sup>

১৩ বর্ষ ১ ভাদ্র ১৩৭৬ সংখ্যায় উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ঘটে যাবার পরে সঠিক দিগন্তের পথে জাতির সংগ্রামের সময় 'নেতৃত্ব ও গণচেতনা' শীর্ষক এক প্রবন্ধে আবদুল হক বিশ্লেষণ করেছিলেন জনগণের ভূমিকা কি হওয়া উচিত। তিনি বলেছিলেন, জনগণ যেমন নেতৃত্ব কামনা করে বা জনগণ যেমন নেতৃত্ব সৃষ্টিতে সক্ষম, তেমন নেতৃত্বই সাধারণত লাভ করে থাকে। তবু কখনও কখনও অসাধারণ ব্যক্তির জন্মলাভ হলে তাঁর দ্বারাও জনগণ সঠিকতা অর্জনের লক্ষ্যে সংগঠিত হয়ে থাকে।

তবে 'জাতির কল্যাণকামী অসাধারণ ব্যক্তির আবির্ভাব জাতির জন্য সৌভাগ্য ; ঠিক প্রয়োজনের সময় আবির্ভাব আরও সৌভাগ্য। কিন্তু এইরূপ সৌভাগ্য সচরাচর ঘটে না বলেই জাতিকে শেষ পর্যন্ত তার অন্তর্নিহিত শক্তির উপরেই নির্ভর করতে হয় ; এবং এছাড়া গত্যস্তর থাকে না। কোনো জাতি যদি জনসংখ্যায় যথেষ্ট হয়, যদি তার বিশেষ সত্তা এবং সত্তা-চেতনা, বিশেষ ঐতিহ্য ও ঐতিহ্য-চেতনা এবং অস্তিত্ব রক্ষার সংকল্প থাকে, তার জীবনদর্শন ও সামাজিক প্রথা আত্মঘাতী না হয়, যুগপৎ পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জ্য বিধান এবং তার নিজের প্রয়োজনানুযায়ী পরিবর্তনের ক্ষমতা যদি তার থাকে তবে সে বেঁচে থাকতে পারে। তার একটি বিশেষ ভূগোলও থাকা অত্যাবশ্যক, তবে বিশেষ ভূভাগ না থাকলেও উল্লিখিত চরিত্র লক্ষণগুলি থাকলে সে বেঁচে থাকতে পারে এবং কোনো কোনো সময় পুনঃপ্রতিষ্ঠিতও হতে পারে, যেমন ইহুদীরা হতে পেরেছে।

এসব শর্তপূরণ না হলে পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে যেতে হয় অথবা কোনো প্রাগৈতিহাসিক জাতির ধ্বংসাবশেষের নিদর্শন রূপে বেঁচে থাকতে হয়। স্বাধীন জাতি অপেক্ষা পরাধীন জাতির বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশী, বিশেষত যদি সে জাতির নিজস্ব একটা উন্নত ভাষা, সংস্কৃতি এবং নিয়তি-চেতনা না থাকে। শাসক-জাতির একটা স্বভাব হচ্ছে তার অধীন জাতির আত্মচেতনায় এবং সংস্কৃতিতে বিপর্যয় সৃষ্টি করা এবং তাকে নিজস্ব সংস্কৃতির আচ্ছাদন দাস করার প্রয়াস পাওয়া।

অন্যদিকে জাতি যখন রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন তখনও ক্ষমতারূঢ় বিশেষ শাসক-সম্প্রদায় বা ব্যক্তি নানারূপ কটকৌশলে জাতিকে আচ্ছাদিত করলে গর্দভরূপে ব্যবহার করার প্রয়াস পায়। নির্জিত মানব গোষ্ঠী তখনও সংহত বোধ করতে পারে অবিচল নিয়তি-চেতনায়, প্রার্থিত স্থির লক্ষ্যে আর ঐ গিরিশীর্ষে উপনীত হওয়ার নিরন্তর স্তবে। একেক রকম পরিস্থিতিতে জাতীয় লক্ষ্য একেক রকম হতে পারে ; স্বাধীনতা, অথবা নিছক আত্মরক্ষা, অথবা জাতি যখন স্বাধীন তখন শাসক সম্প্রদায় বা ক্ষমতারূঢ় ব্যক্তির সৃষ্টি অবরুদ্ধ পরিবেশ থেকে মুক্তি, সৃষ্টিধর্মী অবাধ মানবীয় সম্ভাবনায় উত্তরণ, বিশিষ্ট মানবগোষ্ঠীরূপে আত্মপ্রতিষ্ঠা, জাতির বৈপ্লবিক রূপান্তর।

এরূপ ক্ষেত্রে অসাধারণ ব্যক্তির নেতৃত্ব লাভ প্রার্থিত লক্ষ্যের সম্পূর্ণ নিশ্চিত ও দ্রুত করতে পারে, কিন্তু যথেষ্ট সংখ্যক মানুষ সচেতন নিষ্ঠাবান এবং কর্মিষ্ঠ হলে সেরূপ নেতৃত্বের অভাব সত্ত্বেও জাতি তার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত রাখতে পারে এবং প্রার্থিত লক্ষ্যের অন্তত আংশিক সম্পূর্ণ আশা করতে পারে।<sup>১২</sup>

ঋ. উপর্যুক্ত আলোচনা থেকেই উপলব্ধি করা যায় যে পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক আমলের অপরূদ্ধ সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক এবং সাহিত্যিক অবস্থা থেকে মুক্তি বা উত্তরণের সামাজিক দায়িত্ববোধ থেকেই সিকানদার আবু জাফর স্বদেশপ্রেমিক, কালজয়ী-সাহিত্যিক প্রতিভা নিয়ে সমকালের ন্যায় একটি সাহিত্যপত্রিকা প্রকাশে তাগিদ বোধ করেছিলেন। এই তাগিদ তাঁর রাজনৈতিক সচেতনসত্তার সঙ্গে ওৎপ্রোতভাবে সংমিশ্রিত ছিল বলেই সমকাল বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি মস্তবড় হত্যিয়ার রূপে বাঙালির জীবনে প্রাণরস সজীব রাখতে সচেষ্ট ও সফল হয়েছিল।

বলা আবশ্যিক তাতে সাহিত্যপত্রিকা হিসেবে তৎকালের অপরাপর পত্রিকার তুলনায় সমকালের ভূমিকা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়েছে। পত্রিকা প্রকাশের লক্ষ্য ও আদর্শ বিকৃতির কালেও সম্পাদকের সেই সচেতনতা খুবই লক্ষ্যযোগ্য : তিনি প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয় কলামে লিখেছেন :

ঢাকা থেকে নতুন সাময়িকপত্রিকা হরদম বার হচ্ছে। কাজেই আমাদের চোঁয়ায় 'সমকাল' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করা এমন কিছু বিস্ময়কর সংবাদ নয়। অন্যান্য কাগজের মত 'সমকাল'ও কয়েক মাস পরে বন্ধ হয়ে যাবে না এমন প্রতিশ্রুতি দিয়েও কোনো লাভ নেই। কারণ তা কেউ বিশ্বাস করবে না। আসলে বিশ্বাস করে বারবার কেউ ঠকতে চায় না। আর ইতিমধ্যেই বন্ধু-বান্ধব শূভানুধ্যায়ী প্রায় সকলেই একবাক্যে রায় দিয়েছেন যে, 'সমকাল' চলতেই পারে না। পাঠক নেই, বিজ্ঞাপন পাওয়া যাবে না। অতএব টেনেটুনে বড় জোর তিনমাস। তারপর বিলুপ্ত পত্রিকার তালিকায় আর একটি সংখ্যা যোগ হবে।

সম্পাদক বলেন : পূর্ব পাকিস্তানে একটি সুরূচিপূর্ণ সাহিত্যপত্রিকার একান্ত অভাব। শুমু পাঠকদের পড়া এবং চিন্তার খোরাক জোগাবার জন্যেই নয়, কবি সাহিত্যিকদের দিয়ে লেখাবার তাগিদের জন্যেও একাধিক সাহিত্যপত্রিকার প্রয়োজন। আংশিক ভাবে হলেও সেই প্রয়োজন মেটাবার দুঃসাহস নিয়ে নয়, সেই প্রয়োজনের কথা স্মরণে রেখেই আমরা 'সমকাল' প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছি। সমকাল যাতে করে ব্যাপক সংখ্যক পাঠকের সাংস্কৃতিক মানসের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে সেদিকটায় আমরা বিশেষ লক্ষ্য রাখতে পারব বলেই আশা করি। আমাদের কোনো 'দল' নেই। কাজেই আমাদের প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ দল-নিরপেক্ষ হবে। তবে মত-নিরপেক্ষ হবে কিনা সে-কথা বলা কঠিন। কারণ 'ঘন ঘন মতাস্তরের রাজত্বে' বসে মতামত সম্বন্ধে দৃঢ় মত পোষণ করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নয়। কিন্তু আমাদের এই উদ্যোগে আমরা দলমত নির্বিশেষে সকলের সর্বপ্রকার সহযোগিতা কামনা করব।

সম্পাদকের কথায় : 'মতাস্তরের রাজত্ব' সম্বন্ধে যে ইঙ্গিত করেছি তার সত্যতা কোনো প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। আমাদের আশে-পাশে নিত্যই ঘন ঘন মতাস্তর ঘটছে। দলীয় মত অনুসরণ করতে না-পেরে দল গ্রুপে ভাগ হয়ে যাচ্ছে। (রাজনৈতিক দলের কথাই বলছি বিশেষ ভাবে। কারণ রাজনীতির সঙ্গে সমাজীবনের প্রত্যেকটি স্তরের সম্পর্ক নিতান্ত ঘনিষ্ঠ হওয়ায় রাজনীতিই সবক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করে।) গ্রুপ আবার তস্য গ্রুপ হয়ে অপর দলের অন্য গ্রুপের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নতুন দলের সৃষ্টি করছে। বলাবাহুল্য মতের চেহারাও পাট্টাচ্ছে সেইসঙ্গে। দেশবাসী সাধারণ মানুষের মতামতও মতাস্তরের ঘূর্ণিতে

পড়ে বেদম মার খাচ্ছে। এর ভেতরে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিহাস হলো এই যে, মতান্তর যতই হোক ‘দোহাই’ কিন্তু একই : রাষ্ট্রের অখণ্ডতা, দেশবাসীর বৃহত্তর স্বার্থ, দেশের সমৃদ্ধি এবং অগ্রগতি। কিন্তু কার দেশ? কিসে তার সমৃদ্ধি? দেশবাসীর বৃহত্তর স্বার্থের মন্ত্র কোথায় নিহিত? এই ‘দোহাই দর্শন’ অন্ধের ‘হস্তীদর্শন’ ছাড়া আর কিছু কি না তা বলা কঠিন। এই জন্যেই অসহিষ্ণু কণ্ঠে কেউ বলে উঠছেন :

তাল গাছে ধান ফলবে না  
ধানগাছে ধান ফলাতেই হবে  
অন্য চেষ্টা চলবে না।  
আর যাই হোক আশ্বাস খেয়ে  
একটিও প্রাণ বাঁচবে না।  
স্বদেশপ্রেমের শিঙে ফুঁকলেও  
আশ্বাসবাণী তালপ্রাংশু  
হতে পারে উঁচু তার চেয়ে,  
তবু এটা ঠিক জীবন বাঁচবে  
রোজ কয়মুঠো ভাত খেয়ে।  
কবরের লাশ নাচবে না।  
দেশ যদি থাকে—মানুষ থাকবে  
তবে আর কেন পথ খোঁজা?  
পথ খোলা আছে সবার সামনে  
আছে শুধু আজো চোখ-বাঁজা।<sup>১৩</sup>

মোহাম্মদ ওয়ালীউল্লাহ, এ. কে. নাজমুল করিম, শামসুর রাহমান, আবুল হোসেন, শওকত ওসমান, আলাউদ্দীন আল আজাদ, কাজী দীন মুহাম্মদ, আনিসুজ্জামান, কামরুল হাসান, আবদুল্লাহ আলমুতী, কাজী মোতাহার হোসেন, আবদুল গনি হাজারী, আহমদ হাসান দানী প্রমুখের প্রবন্ধ কবিতা ইত্যাদি লেখা নিয়ে সমকালের প্রথম সংখ্যা প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গেই পাঠকসমাজ এমন একটি পরিচ্ছন্ন-রুচির, শিল্পসম্মত সাহিত্যপত্রিকা লুফে নিয়েছিলেন। কিন্তু ‘রঙবাজ’ বুদ্ধিজীবীসমাজ বিরূপ সমালোচনা করতে ছাড়লেন না। প্রগতিশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল অর্থাৎ বাঙালি জাতীয়তাবাদী ও পাকিস্তানবাদী লেখকদের একত্র সমাবেশ কেন ঘটানো হলো এই বলে। এর জবাবে সম্পাদক দ্বিতীয় সংখ্যায় যে বক্তব্য উপস্থাপন করেন—দল-বিভক্ত অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সমকালের দৃষ্টিকোণ বুঝতে তা সহায়তা করে :

প্রথম সংখ্যা সমকাল বিভিন্ন অঞ্চলের পাঠকেরা মোটামুটি প্রশংসার সঙ্গেই গ্রহণ করেছেন। অন্ততঃ একথা কেউ বলেন নি যে কাগজটা একেবারে অচল। তবে কাগজে প্রকাশিত বিভিন্ন লেখা সম্বন্ধে অনেকেই অনেক রকম আলোচনা করেছেন। কোনো লেখা যে, তেমন উচুদরের হয়নি একথা কোনো-কোনো পাঠক একরকম খোলাখুলিই আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন। পাঠকদের মতামতের সঙ্গে আমাদের মতের মিল অমিল দুইই আছে, কিন্তু তা নিয়ে এখানে কোনো তর্ক তুলবো না। কারণ, আমরা জানি, প্রতি মাসের কাগজ সবগুলো প্রথম শ্রেণীর লেখা দিয়ে সমৃদ্ধ করা সময়-সাপেক্ষ। অবশ্য তার জন্যে আমাদের চেষ্টার অন্ত নেই।

যাঁরা জানেন এবং লেখেন তাঁদের কাছে আমরা নিয়মিত ধর্না দিচ্ছি। যাঁরা জানেন, কিন্তু লিখবার উৎসাহ পান না, তাঁদের মনে লেখার আবেগ জাগাবার জন্যে আমরা উৎসাহ জোগাচ্ছি। যাঁরা জানার এবং লেখার রাজ্জে;

নবাগত তাঁদেরকেও আমরা তাগিদ দিচ্ছি অনেক জ্ঞানায় সমৃদ্ধিশালী হয়ে, অনেক লেখা দিয়ে আমাদের সাহিত্যভাণ্ডার সমৃদ্ধ করে তুলতে। অর্থাৎ স্থায়ী স্বাক্ষর রাখতে পারবেন এমন লেখক খুঁজে বার করবার দায়িত্বও সমকাল কিছুটা নিয়েছে। এ—কাজ অবশ্য কঠিন কিন্তু আমাদের সংকল্পও তেমন শিথিল নয়। তাছাড়া আমরা বিশ্বাস করি যে, আমাদের দেশে সত্যিকার সূস্থ সাহিত্য পরিবেশ গড়ে তোলার জন্যে সাহিত্যমোদী পাঠকদের অকুণ্ঠ সমর্থন আমরা পাবো।

সমকালের লেখকগোষ্ঠী সম্বন্ধে কোনো মহলের আলাপ-আলোচনা আমাদের কানে এসেছে। এই আলোচনা প্রধানত 'রঙ-নির্ণয়' সম্বন্ধে। অর্থাৎ অমুক লেখক 'লাল', অমুক লেখক 'সবুজ', অমুক 'ঈষৎ লাল' ইত্যাদি। বর্ণ নির্ণয় যাদের সমালোচনার মাপকাঠি তাঁরা নিজেরা 'বর্ণচোরা' না হলে পুরোপুরি 'লাল' হয়ে যেতেন। কারণ 'পাকামীর' পরিণতি ত লালই। অর্থাৎ পেকেই ত লাল হয় ; অবশ্য 'ইচড়ে-পাকা' না হলে। বর্ণঙ্ক নন—এঁরা আসলে 'বর্ণ-বিলাসী' (বর্ণসংকরও হতে পারেন)। বর্ণজ্ঞানের কিঞ্চিৎ অভাব থাকায় বর্ণ সংকটে পড়ে মাঝে মাঝে এঁদের বর্ণাতঙ্ক উপস্থিত হয়। সে অবস্থায় এঁরা বর্ণিনী কলালক্ষ্মীর বরস্পর্শে বৃষ্টিকালী সংশ্লেষের প্রবল কণ্ঠয়ণ অনুভব করেন। এঁদের চোখ ফুটে ওঠে 'সাতরঙ' নয় 'একরঙের' রঙধনু। এই বর্ণনাভীত ব্যাপারে আমাদের কোনো কৌতূহল নেই। বর্ণ-বেষম্যের ভিত্তিতে কিছু-সংখ্যক লেখক নিয়ে গোষ্ঠী তৈরীও আমাদের উদ্দেশ্য নয়। সমকালের পাতায় আমরা তাঁদের নিয়েই আসর জমাবো ঝাঁরা বর্ণের বারবরদার নন; সত্যিকার বাণিক।<sup>১৪</sup>

উপর্যুক্ত দৃষ্টিভঙ্গিতে সম্পাদক সমকালের রচনা নির্বাচন করেছেন। বলা চলে লেখক নির্বাচন করে বিষয় দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছেন, বন্ধিমচন্দ্র যেমন করতেন বঙ্গদর্শনে। বিষয় ও লেখক সূত্রী দিকে তাকালেই সমকালের চরিত্র অনেকটা সহজে উপলব্ধি করা যায়।

সমকালে যাদের কবিতা ছাপা হয়েছে, তাঁরা হলেন :

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলাম (পুনর্মুদ্রণ) ; শামসুর রাহমান, আবুল হোসেন, সিকান্দার আবু জাফর, হাসান হাফিজুর রহমান, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, বিমলচন্দ্র ঘোষ, ইমামুর রশীদ, আল মাহমুদ, আবু বকর সিদ্দিক, আলী আশরাফ, ফজলে লোহানী, আলাউদ্দীন আল আজাদ, সৈয়দ শাসসুল হক, মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর, সেবাব্রত চৌধুরী, সালেহ আহমদ, সানাউল হক, শহীদ কাদরী, আবুল কাসেম রহিমউদ্দীন, মীর আবুল খায়ের, আহসান হাবীব, জিয়া হায়দার, বেগম সুফিয়া কামাল, অরুণিমা স্যামাল, ওমর আলী, আমজাদ হোসেন, হামিদুজ্জামান খান চৌধুরী, কমলেশ সেন, শওকত আলী, মুহম্মদ আখতার, সৈয়দ আলী আহসান, আজিজুল হক, ফররুখ আহমদ, আল আজাদ, ইমরুল চৌধুরী, বেনজীর আহমদ, সজল বন্দ্যোপাধ্যায়, কুসুম কর, আবদুল গনি হাজারী, শামসুল্লাহার, হাসান আবদুল গোফরান, দেবব্রত দত্ত, তবিবর রহমান, আবদুস সাত্তার, প্রশান্ত ঘোষাল, রওশন আরা জামান, জাহানারা হাকিম, আবু জাফর শামসুদ্দীন, মনিরুজ্জামান, হায়াৎ সাইফ, হায়াৎ মামুদ, আসফউদদৌলা, এনাযুল হক, নচিকেতা ভরদ্বাজ, সৈয়দ মোতাহার হোসেন চৌধুরী, আবদুল কাদির, ইমাউল হক, মহফারুল ইসলাম, আ. ন. ম. বজলুর রশীদ, আতাউর রহমান, ফজল শাহাবুদ্দীন, মাহবুব তালুকদার, মাসুদ আহমেদ, রফিক আজাদ, আবদুল মন্নান সৈয়দ, আসাদ চৌধুরী, মফিজুল আলম, শাহজাহান হাফিজ, আফজাল চৌধুরী, মোহাম্মদ রফিক, ফারুক আলমগীর, সৈয়দ নুরুদ্দিন, হেমায়েত হোসেন, সব্রত বড়ুয়া, সৈয়দ আলী আশরাফ, আবদুর রশীদ খান, মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা, লতিফা হিলালী, জাহানারা আরজু, বেলাল মোহাম্মদ, জিনাত আরা মালিক, মনজুরে মওলা, মাহমুদ শাহ কোরেশী, এহসান চৌধুরী, সৃগাংশু দেবনাথ, সুবাইয়া কামাল, নির্মলেন্দু গুণ, মোহাম্মদ রফিক, ইবনে রউফ, আবুল হাসান, সিরাজউদদৌলা চৌধুরী, কায়সুল হক, জিল্লুর রহমান, ফরহাদ মজহার, হেনা হাসানাৎ, আখতার হুসেন, মহাদেব সাহা, রাজিয়া খান, হোসেন উদ্দিন হোসেন, আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ প্রমুখ।



সমকালে যারা গল্প লিখেছেন :

শওকত ওসমান, আলাউদ্দিন আল আজাদ, আহমদ কর্নির, গোপাল বিশ্বাস, বনমালী গোস্বামী, শামসুদ্দীন আবুল কালাম, হুমায়ুন কাদির, বোরাহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, জহির রায়হান, সত্যেন সেন, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, আনিসুজ্জামান, সিরাজুল ইসলাম, আবু ইসহাক, সাইয়িদ আতীকুল্লাহ, সরদার জয়েনউদ্দিন, টিপু সুলতান, আবু বকর সিদ্দিক, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, আবু রুশদ, ফজলুল হাসান ইউসুফ, শওকত আলী, আবদুল হক, ফজল শাহাবুদ্দীন, আনিসুল ইসলাম, আফলাতুন, মাহবুবুর রহমান তালুকদার, আবদুল গাফফার চৌধুরী, তপন ভট্টাচার্য, আবদুল জব্বার, জিয়াউল হক, আবু জাহাঙ্গীর, মফিজউদ্দিন আহমদ, সৈয়দ আবদুস সুলতান, রাবেয়া খাতুন, জ্যোৎস্নেন্দু চক্রবর্তী, অশোক বড়ুয়া, হাসান আজিজুল হক, মাহবুব হোসেন, মাসুদ আহমেদ, সাইফুল ইসলাম, গোলাম মোস্তফা রহমান, আশীষ কুমার লোহ, আবদুস সান্তার, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, আবদুল রাজ্জাক, শহিদুর রহমান, মুহম্মদ আযীয, দিব্যেন্দু দাশগুপ্ত, জাহানারা হাকিম, সিকান্দার আবু জাফর, মমতাজউদ্দিন আহমদ, জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত, হাসান হাফিজুর রহমান, আবুল হাসানাত, ইসমাইল মোহাম্মদ, মম্বথ নন্দী, শাহেদ আলী, আহমেদুর রহমান, জিয়া হায়দার, বুলবুল ওসমান, রাইসুল জুহানা, নীলু দাস, মুর্তজা বশীর, আবদুল মান্নান সৈয়দ, ইমরুল চৌধুরী, সৈয়দ আবদুস সামাদ, বশীর আল হেলাল, সুরত বড়ুয়া, অরুণ তালুকদার, সারওয়ার আলতাফ, সিরাজউদ্দিন আহমদ, মুহম্মদ সিরাজ, শামসুল আলম, আবুল মোমেন, নির্মলেন্দু গুণ, শামসুল আলম সাদ্দিক ;

উপন্যাস লিখেছিলেন :

রশীদ করীম (উত্তমপুরুষ ৩/৬ থেকে ক্রমশ) ; শওকত ওসমান (সমাগম, ৪/২ থেকে ক্রমশ) ; আবদুর রাজ্জাক (কাঁচাপোকা ও তেলাপোকা, ৬/১ থেকে ক্রমশ) ; সৈয়দ শামসুল হক (জেসমিন রোড, ১১/১-৩ থেকে ক্রমশ, উপন্যাসটি অসম্পূর্ণ থাকে, কারণ লেখক পরের অংশ ঠিকমতো সরবরাহ করেননি) ; ইত্যাদি। কাজী মাসুম উর্দু সাহিত্যের বিখ্যাত উন্যাস অনুবাদ করেন 'উমরাওজানআদা' (মূল লেখক মিজা মুহম্মদ হাদী রসূদা, ইংরেজী অনুবাদ থেকে বাংলায় করা হয়, ৮/৩ থেকে ধারাবাহিক) শিরোনামে এবং আবদুল মান্নান সৈয়দ আরব্য উপন্যাসের একটি গল্পের ধীম নিয়ে ছোট উপন্যাস লিখেছিলেন ধারাবাহিকভাবে ১১/৪-৬ থেকে 'পরিত্রেকিতের দাস-দাসী' শিরোনামে। শওকত ওসমান, আবদুল হক, আনিস চৌধুরী, সিকান্দার আবু জাফর, সৈয়দ আলী আহসান, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, মোব্বাশের আলী, বুলবুল ওসমান, আবদুল মান্নান সৈয়দ প্রমুখ কতিপয় খ্যাতনামা নাটকের অনুবাদ, অনুসরণ অথবা প্রণয়ণ করেছিলেন। আনাতোল ফ্রঁস অবলম্বনে শওকত ওসমান লিখেছিলেন 'কর্ণচূর্ণ' (১/৪) ; তিনি আন্তন চেকভের 'দি বিয়ার' অনুসরণে লিখেছিলেন 'ইস্কাটনের বিবি' (১/৯)। তাঁর ধারাবাহিক প্রহসনের নাম 'দেশের ঠিকানা' (১১/৭-৯ থেকে)। আবদুল হক হেনরিক ইবসেনের An Enemy of the people এর অনুবাদ করেন 'গণশত্রু' শিরোনামে (৫/৬-৮)। আনিস চৌধুরীর 'এ্যালবাম' ও 'মানচিত্র', সমকালেই প্রকাশিত হয় (২/৭ ও অন্যান্য)। সিকান্দার আবু জাফর এর একাঙ্ক নাটিকা 'মাকড়সা' (৩/৮) ; রূপক নাটক 'শকুন্ত উপাখ্যান' (৫/৩-৫) ; এবং জন্ এম. সীন্জ প্রণীত নাটকের অনুবাদ 'পশ্চিমের পারাবাত' (৬/৯ থেকে ক্রমশ) এতে প্রকাশিত হয়। সৈয়দ আলী আহসান সফোক্লিসের 'ইডিপাস' অনুবাদ করেছিলেন (ভূমিকাসহ) ৫/৩-৫ থেকে। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর একাঙ্কিকা 'উজানে মৃত্যু' প্রকাশিত হয় ৬ বর্ষ ১০ সংখ্যায়। সফোক্লিসের অন্যতম নাটক 'এটিগোনী' অনুবাদ করেন (ভূমিকাসহ) মোব্বাশের আলী (১২-১০-১২ থেকে) এবং জন্ এম. সীন্জ এর অন্য একটি একাঙ্ক নাটক অনুবাদ করেন সম্ভবত সিকান্দার আবু জাফর 'সমুদ্রের ডাক' শিরোনামে (৬/৮) ! তরুণতর লেখক বুলবুল ওসমান 'সমাস্তারল' (৮/১) এবং আবদুল মান্নান সৈয়দ 'এসো অসম্ভব এসো' (একাঙ্ক, ১০/৬-৮) ; 'বিশ্বাসের তরু' (কাব্যনাট্য, ১২/৭-৯) ; 'না ফেরেশতা, না শয়তান' (১৩/১ থেকে ক্রমশ) ইত্যাদি নাটকও সমাকালের জন্যই লিখেছিলেন।

'বিতর্ক' শিরোনাম দিয়ে কয়েকটি মূল্যবান আলোচনা প্রকাশ করা হয়। ৩ বর্ষ ৫ সংখ্যায় তপন ভট্টাচার্যের 'ইতিহাস' শীর্ষক গল্প সম্পর্কে লেখেন এ. বি. খীসা। সৈয়দ আলতাফ হোসেন 'সমাজ ও সংস্কৃতি' শিরোনাম দিয়ে কাজী আবদুল ওদুদ ও আবুল কালাম

শামসুদ্দীনের চিঠিপত্র উদ্ধৃত করে বিশশতকের বাংলা সাহিত্য ও সাময়িকপত্রে বিধৃত সমাজচিন্তার পরিচয়, আলোচনা ও বিশ্লেষণ করেছিলেন ২ বর্ষ ৬ সংখ্যায়।

পাকিস্তানের সংস্কৃতি তথা মূলগত ঐক্য প্রসঙ্গে ‘ডন’ পত্রিকায় গোলাম মোস্তফা প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এ. বি. রাজপুত এবং আতিয়ার রহমান ও মোহাম্মদ সিরাজউদ্দীন ‘ডন’ পত্রিকাতেই গোলাম মোস্তফার বক্তব্যের প্রতিবাদ করেছিলেন। এসব তর্ক বিতর্ক বাংলা ভাষায় ছাপা হয় সমকালে (২/৮, ১০)। মঈদুল হাসান ও শামসুল হুদা আলকাজী অর্থনীতির বিষয়ে লিখেছিলেন : ‘অনুন্নত দেশে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সাহায্য পরিকল্পনা’ (১/৫-৬) সবৎ ‘মজুরী নিয়ন্ত্রণ’ শিরোনামে। তাছাড়া প্রায় সকল প্রবন্ধে নিবন্ধে রাজনীতি অর্থনীতি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রতিবার আলোচিত হয়েছে। প্রবন্ধ নিবন্ধও আলোচনা লিখেছিলেন যারা, তাঁরা সব ঐকালের প্রধান লেখক।

গ. সমকাল নিয়মিত প্রকাশিত হয়নি, খুব দীর্ঘসময় ধরেও চলেনি। আগস্ট ১৯৫৭ (ভাদ্র ১৩৬৪) তে প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা এবং ত্রয়োদশ বর্ষ দ্বাদশ সংখ্যা শ্রাবণ ১৩৭৭ এ প্রকাশিত হয়। এই সংখ্যা প্রকাশের কথা ছিল ১৯৭০ সনের আগস্ট মাসে। কিন্তু চিরাচরিত অনিয়মের নিয়মে ১৯৭১ সনের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হবার কিছু পূর্বে এটি বের হয়। এরপরে চতুর্দশ বর্ষ প্রথম সংখ্যা যন্ত্রস্থ অবস্থায় সিকান্দার আবু জাফর প্রাণ ভয়ে ভারত গমন করলে সমকাল আর প্রকাশিত হয়নি। এই অপ্রকাশিত সংখ্যা সম্পর্কে আবদুল হক লিখেছেন : বেনামীতে লেখার পরামর্শ পেয়ে বছর তিনেক ছেড়ে দিয়েছিলাম—‘কিন্তু সন্তর সালে রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল অন্যরকম।... তাই সাতষট্টির সেই হয়রানী সত্ত্বেও জাফর সাহেব সন্তরের শেষ প্রান্তে আমার আরেকটি বেনামী প্রবন্ধ ছাপতে সম্মত হয়েছিলেন। সেটি মুদ্রিত হয়েও প্রকাশিত হলো না, ‘সমকাল’—এর সেই অপ্রকাশিত সংখ্যার কথা না লিখলে কাহিনী অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

অপ্রকাশিত সংখ্যাটি হচ্ছে ‘চতুর্দশ বর্ষ ১ম-৭ম সংখ্যা, ১৩৭৭’। অর্থাৎ যথারীতি সেই অনিয়ম, তার ফলে যুক্ত সংখ্যা। প্রথম ৩২ পৃষ্ঠা মুদ্রিত হয়েছিল, ৩৩-৩৪ পৃষ্ঠা ছিল কম্পোজ-কৃত অবস্থায়। ১ থেকে ৩৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত একটি মাত্র প্রবন্ধ শিরোনাম ‘ইসলামী রাষ্ট্র : কল্পনা ও বাস্তব’। পরবর্তী দু’ পৃষ্ঠায় ‘স্বীকারোক্তি’ নামে একটি ছোট লেখা।... সুদীর্ঘ প্রথম প্রবন্ধটি তিনচার কিস্তিতে ছাপানো যেত, তবু জাফর সাহেব একটিমাত্র সংখ্যায় প্রকাশ করতে সম্মত হয়েছিলেন, তার ইতিহাসটি এই : তাঁকে বলেছিলাম প্রথম কিস্তি মুদ্রিত হওয়ার পরেই পত্রিকা নিষিদ্ধ হয়ে যেতে পারে, অথবা অন্য রকম হয়রানি শুরু হতে পারে, তাহলে অনেক কথাই অকথিত থেকে যাবে। যদি তাই হয়, তাহলে একটিমাত্র সংখ্যায় সম্পূর্ণ প্রবন্ধটি প্রকাশিত হওয়া ভালো। তারপর যাই ঘটুক, প্রবন্ধটি অন্তত পাঠকদের কাছে গিয়ে পৌঁছাবে। তিনি এই যুক্তি মেনে নিয়েছিলেন। গোটা প্রবন্ধটাই একটি মাত্র সংখ্যায় ছেপেছিলেন। একান্তরের পঁচিশে মার্চে খবর পেলাম এটি ছাপা শেষ হয়েছে। সংখ্যাটি যদি তার আগেই বেরিয়ে যেত তাহলে একান্তরে কি কি ঘটতে পারতো তা শুধু অনুমান করা যেতে পারে। কিন্তু বেরোয়নি। তারপর সেই রক্তাক্ত নয় মাস। জাফর সাহেব কোলকাতা চলে গিয়েছিলেন ; ... তারপর বাহান্তরের মাঝামাঝিতে অকস্মাৎ সাক্ষাৎ। তখন পাকিস্তান নেই,

তার রাষ্ট্রনীতিও নেই, প্রবন্ধটি অতএব অবাস্তব। তবু ঐ প্রবন্ধ নিয়েই তিনি ‘সমকাল’ প্রকাশের ইচ্ছা জ্ঞাপন করলেন, কেননা তার একটি ঐতিহাসিক মূল্য আছে। প্রবন্ধটি আবু রায়হান ছদ্মনামে মুদ্রিত হয়েছিল ...কিন্তু পত্রিকা আর বেরোলোনা। দেড় বছর পর তিয়াস্তরের নভেম্বরে একদিন ছাপানো এবং কম্পোজ করা পৃষ্ঠাগুলি নিয়ে এসেছিলাম। ‘সমকাল’ পুনরায় প্রকাশের সম্ভাবনা তখন সামান্য। ...সেদিন তিনি অবশ্য চুয়াস্তরের মার্চের দিকে পত্রিকা পুনঃপ্রকাশের একটা ব্যবস্থার কথা বলেছিলেন। ‘সমকাল’ আর বেরোবে না, একথা তিনি ভারতে পারছিলেন না। বাংলাদেশের তৎকালীন পরিস্থিতিতে ‘সমকাল’-এ কি ধরনের লেখা প্রকাশিত হওয়া উচিত তাই নিয়ে কিছু আলোচনা হয়েছিল। এর কিছুদিন আগে একটা চিঠিতে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ‘সমকাল’-এ না লিখতে পারি, ‘সমকাল’কে নিয়ে তো লিখতে পারি? কিন্তু এ ব্যাপারে বোধ হয় তাঁর কোনো সংশয় ছিল না। তিনি পুনরায় পত্রিকা প্রকাশের সংকল্প জ্ঞাপন করে ৫ই অক্টোবর (‘৭৪) একটা ছাপানো চিঠি বিলি করেছিলেন এবং এ সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনার জন্য ১০ই অক্টোবর পাবলিক লাইব্রেরী মিনায়তনে লেখক ও শিল্পীদের একটা সম্মেলনেরও আয়োজন করেছিলেন। ঐ সম্মেলনে আমি যেতে পারিনি। ভরসা ছিল হয়তো আবার পত্রিকা প্রকাশিত হবে। কিন্তু তা আর হয়নি। ‘সমকাল’এ লেখার দিন সমাপ্ত : এখন ‘সমকাল’-কে নিয়েই আমরা লিখছি, কেননা ‘সমকাল’ আজ ইতিহাস, এবং ‘সমকাল’-এর স্রষ্টাও তাই।<sup>১৫</sup>

পূর্বমেঘের অন্যতর সম্পাদক প্রফেসর মুস্তফা নূরউল ইসলাম লিখেছেন : উনিশ শো বাহাস্তরের দিকে, ...সন্ধ্যের সময় ‘সমকাল’ অফিসে গিয়েছি। দেখি, ম্লান আলোকিত ঘরে জাফর ভাই একা বসে রয়েছেন। চাদ্দিকে তাকিয়ে হঠাৎ মনে হল, এ একটা নির্বাসিত এলাকা। আসবাবপত্র জীর্ণ প্রেসের যন্ত্রপাতি নীরব, কেমন নির্জনতা, এখানকার সবকিছু যেন চুরি হয়ে গিয়েছে। বিষণ্ণভাবে হাসলেন জাফর ভাই। ক্লান্ত কণ্ঠে বললেন, আয়। তারপর ঝালমুড়ি আনালেন, চা-পান আনালেন। আমরা ‘সমকাল’ নিয়ে আলাপ করলাম। বললাম, আবার ‘সমকাল’ বার করুন। আমরা রয়েছি, খেটে দেব। তিনি বললেন, না, ও আর হয়না। দ্বিতীয়বার হয় না।<sup>১৬</sup>

সমকাল প্রথমে বের হয় ১৩ অভয় দাস লেন থেকে ; মুদ্রণালয় : আল হেলাল প্রেস। প্রকাশক, মুদ্রক ও সম্পাদক সিকানদার আবু জাফর। চার সংখ্যা আল হেলাল প্রেস থেকে ছাপা হয়। ‘সমকাল প্রকাশনী’ থেকে প্রকাশের কথা লেখা হয়েছে ১ বর্ষ ৩ সংখ্যা থেকে। ১ বর্ষ ৫-৬ (যুগ্ম, পৌষ-মাঘ ১৩৬৪) সংখ্যা থেকে আল হেলাল প্রেস পাণ্টে যায়। দি বেঙ্গল প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৩/৪ পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত। ২ বর্ষ ১ সংখ্যা থেকে ৩য়—ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক ১৩৬৫ সংখ্যা ছাপা হয়েছে ২ রমাকান্ত নন্দী লেনস্থ পাইওনিয়ার প্রেস থেকে। ‘সমকাল মুদ্রায়ণ’ থেকে মুদ্রিত হতে শুরু করে ২ বর্ষ ৪ সংখ্যা অগ্রহায়ণ ১৩৬৫ থেকে। ঠিকানা ১৩ অভয় দাস লেন। ৩ বর্ষ ৭ সংখ্যা ফাল্গুন ১৩৬৬ থেকে সমকাল মুদ্রায়ণের ঠিকানা পাণ্টে মতিঝিল রোড, ঢাকা-২ হয়। ১৯৬২-র ফেব্রুয়ারি-এপ্রিল, ১৩৬৮-র মাঘ-চৈত্র ; ৫ বর্ষ ৬-৮ সংখ্যায় সমকালে ঠিকানা পরিবর্তনের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়।

পরিবর্তিত ঠিকানা ৩৬ এ টয়েনবি সার্কুলার রোড, ঢাকা-২। এই ঠিকানাই পরে পাল্টে এখনকার ৭, ডি.আই.টি এভিনিউ হয়। ১৯৭৫ পর্যন্ত সমকাল মুদ্রায়ণ ওখানেই ছিল। এটি ছিল, সমকালের জন্য সরকার থেকে কেনা জমিতে স্থাপিত প্রকাশনালয়। যা হোক, হাসান হাফিজুর রহমানের নাম সহযোগী সম্পাদক হিসেবে ১ বর্ষ ১ সংখ্যা থেকে ৩ বর্ষ, ১ সংখ্যা পর্যন্ত ছাপা হয়। ১৯৭৭ সনে নব পর্যায়ে 'সমকাল' এর প্রথমার্ধে তাঁর নাম সম্পাদক হিসেবে ছাপা হয়। আত্মিক সম্পর্ক সমকালের সঙ্গে তাঁর আগেগোড়া ছিল একথা নিশ্চিত করেই তাই বলা যায়।

সমকাল সিকানদার আবু জাফরের সম্পদনায় ১৩ বছরে মোট ৯১টি পুস্তিকা বের হয়েছিল। প্রথম বর্ষে ৯টি (১ বর্ষ ৫-৬, ৭-৮, ১১-১২ যুগ্ম) + দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ বৎসরে ১২টি করে নিয়মিত ৩৬ + পঞ্চম বৎসরে ৬টি (৫ বর্ষ.৩-৫; ৬-৮, ৯-১১ যুগ্ম) + ষষ্ঠ বর্ষে ১০টি (৬ বর্ষ ৫-৭ যুগ্ম) + অষ্টম বর্ষে ৬টি (এই বছরে ১ থেকে ৪ সংখ্যা নিয়মিত বের হয়, এ বছরই 'কবিতা সংখ্যা ১৩৭১-৭২' প্রকাশিত হয়, ৫, ৬, ৭ ও ৮ সংখ্যা একত্রে গণ্য করে। এরপর ৯-১২ সংখ্যা বৈশাখ-শ্রাবণ ৪ মাস কভার করে প্রকাশিত হয়। এখানে অসংগতি হচ্ছে ১৩৭২ সনের বৈশাখ মাসের হিসাব কবিতা সংখ্যায় ধরা হয়, কিন্তু বৈশাখ-শ্রাবণ ১৩৭২ সংখ্যা বের হয়। হয়তো ধারণা ছিল ৭২ সনের কিয়দংশ এতে চলে যাবে) + নবম বর্ষে ৩টি (৯ বর্ষ ১-৪; ৫-৮; ৯-১২ যুগ্ম) + দশম বর্ষে ৪টি (১০ বর্ষ ১-২; ৩-৫; ৬-৮; ৯-১২ যুগ্ম) + একাদশ বর্ষে ৪টি (১১ বর্ষ ১-৩; ৪-৬; ১০-১২ যুগ্ম) + দ্বাদশ বর্ষে ৪টি (১২ বর্ষ ১-৩; ৪-৬; ৭-৯; ১০-১২ যুগ্ম) + ত্রয়োদশ বর্ষে ৩টি (১৩ বর্ষ ৩-১২ যুগ্ম; ১ ও ২ সংখ্যা নিয়মিত বের হয়) = মোট ৯১টি। সমকাল ১৮ বর্ষ নবপর্যায়ের প্রথম সংখ্যা প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদকের মৃত্যুর পর (১৯৭৫ এর পর) মাঘ ১৩৮২ তে প্রকাশিত হলে প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে সিকানদার আবু জাফরের নাম শীর্ষে মুদ্রিত হয়। সম্পাদক হাসান হাফিজুর রহমান জানান ডিক্লিয়ারেশন সংক্রান্ত জটিলতার কারণে ঘোষণা অনুযায়ী সমকাল বের হয়নি। পৌষ ১৩৮৩ পর্যন্ত তাঁর সম্পাদনায় ১২টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। তাঁর সম্পাদনায় ১৯শ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা আষাঢ় ১৩৮৪ পর্যন্ত নিয়মিত বের হয়। অতপর 'বিশেষ সংখ্যা' বের হয় শ্রাবণ ১৩৮৪-তে। এই সংখ্যায় প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক সিকানদার আবু জাফর, সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি আবু জাফর শামসুদ্দীন এবং সম্পাদক হিসেবে ইসমাইল মোহাম্মদ এর নাম ছাপা হয়। এভাবে ১৯ বর্ষ ১২ সংখ্যা পৌষ ১৩৮৪তে বের হয়। তখন এর দাম ছিল তিনটাকা, সাদা কাগজ। প্রথমে এর দাম ছিল আট আনা, পরে দশআনা এবং তারও পরে একটাকা হয়েছিল। দ্বিতীয় বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যায় 'সমকাল সম্পর্কে জ্ঞাতব্যতে বলা হয়—'সমকাল প্রতি ইংরেজী মাসের ২ তারিখে প্রকাশিত হয়। এজেন্ট এবং গ্রাহকদের কাগজ পাঠানো হয় ২ থেকে ৫ তারিখের ভেতর। এই হিসাবে নির্ধারিত সময়ে কাগজ না পেলে ডাক-বিভাগ এবং আমাদের কাছে অভিযোগ জানানো দরকার। বার্ষিক চাঁদার হার ছয় টাকা। ষান্মাসিক সাড়ে তিন টাকা। যে কোন মাস থেকে গ্রাহক হওয়া চলে। ডাক-ব্যয় লাগে না। কিন্তু ভি. পি. খরচ গ্রাহকদের দিতে হয়। কাজেই চাঁদার টাকা মনিঅর্ডারে অগ্রিম পাঠানো ভালো। নমুনা সংখ্যার জন্যে দশ আনার

ডাক টিকেট পাঠাতে হবে। পশ্চিম পাকিস্তানের গ্রাহকদের জন্য সমকালের চাঁদার হার বার্ষিক আট টাকা। ...নমুনা সংখ্যা পাঠানো হয় না। ডাকটিকিট থাকলে যে কোন লেখা সম্বন্ধে সম্পাদকীয় মতামত জানানো হয়। লেখা পাবার তিন সপ্তাহের ভেতর ডাকটিকিট না পেলে অমনোনীত লেখা দু মাস পরে নষ্ট করে ফেলা হয়।' সমকালের প্রতি সংখ্যা নতুন নতুন প্রচ্ছদে শোভিত হতো। শিল্পী ছিলেন দেবদাস চক্রবর্তী, এ. মুকতাदির, কাইউম চৌধুরী, সৈয়দ জাহাঙ্গীর, রশীদ চৌধুরী, মুর্তজা বশীর, আবদুল বাসেত এবং আমিনুল ইসলাম, কামরুল হাসান, সৈয়দ জাহাঙ্গীর প্রমুখ।

ঘ. সমকালের বিষয়বৈচিত্র্য লক্ষণীয়, এবং এই পত্রিকাটি সামনে রেখেই উচ্চারণ করা যায় :

...জীবন জগতের সকল বিষয়ই সাহিত্যের বিষয়বস্তু হতে পারে। একটি জাতির সাহিত্যের সুস্থ বিকাশ ও পূর্ণ স্ফূর্তির অপরিহার্য শর্ত হিসাবে দরকার সেই জাতির সার্বিক জীবনানুশীলনের অভিজ্ঞতা, এবং সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি সর্বমুখী জ্ঞানের গভীরতর অনুশীলন।<sup>১</sup>

প্রচ্ছদের ব্যাপারে তাঁরা এতই সচেতন ছিলেন যে সমকালের প্রচ্ছদ নিয়েও সমকালে আলোচনা প্রকাশ পেয়েছে। উদ্ধৃতি ব্যবহার কলা, গোয়েন্দা বিভাগের লোকদের জন্য মাননীয় অনুজ্ঞা, যৌনবিজ্ঞান, স্থাপত্য, শিল্পকলা, সিনেমা, নাটক, সঙ্গীত, সমাজতত্ত্ব, রাষ্ট্রাদর্শ, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, রাজনীতি, সাহিত্য ও চিন্তাধারার ঐতিহ্য বা বিবর্তনের ইতিহাস—এক কথায় জাতি গঠনের জন্য আবশ্যকীয় সকল বিষয়ই সিকানদার আবু জাফর সমকালে প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন।

আবদুল হকও মন্তব্য করেছেন : 'এটা কোনক্রমেই দক্ষিণপন্থী পত্রিকা ছিল না', আবার 'বামপন্থী সাহিত্যপত্রও তাকে বলা চলে না। ...অবরুদ্ধ মানসিকতা মুক্ত লেখক ও পাঠকসমাজের পত্রিকা ছিল... বিশুদ্ধ সাহিত্য ও সংস্কৃতিমূলক পত্রিকা করার ইচ্ছা...ছিল না, বাংলাদেশীয় মানসের সামগ্রিক স্ফূরণ ছিল তাঁর লক্ষ্য। সমাজজীবনের বহু বিস্তীর্ণ দিগন্তকে তিনি এর সীমারেখার অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিলেন।'

প্রথম বর্ষের একাদশ দ্বাদশ সংখ্যার সম্পাদকীয় নিবন্ধে এই বিস্তৃত দৃষ্টিপাতের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছিল। 'সাহিত্যের মাধ্যমে গৃহ এবং রাস্তানির্মাণ, শহর পরিকল্পনা, নদী সম্পদ, বিদ্যুৎশক্তি, জনস্বাস্থ্য এবং এই ধরনের আরও বহু বিষয়ে লেখা জোগাড় করার চেষ্টা তিনি করেছিলেন।

ইঞ্জিনিয়ার, আর্কিটেক্ট, চিকিৎসক, বৈজ্ঞানিক এবং অন্যান্য বিষয়ে জ্ঞানবান ব্যক্তিবর্গ বাংলায় যদি লিখতে না-ই পারেন, তবু তাঁরা অন্ততঃ ইংরেজীতে লিখুন, 'ভাষান্তরিত করব আমরা' : এমনি ব্যাপক উদ্যোগ ছিল সম্পাদকের। বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনের সূচনা, সম্পাদকীয়-বক্তব্য স্মরণে চলে আসে। কিন্তু কালের চাহিদা মেটাতে সমকালের নিতান্তই মৌলিক চিন্তা ও কর্ম ছিল। বিষয় সম্পর্কে চিন্তা করলে বলতে হয়, কিছু বিস্তৃত অর্থে সামাজিক প্রয়োজনের সকল দিকই সংস্কৃতি প্রয়াসের অঙ্গ। কিন্তু এ উদ্যোগ পুরোমাত্রায় সফল হয়নি। 'প্রতিশ্রুতি দিয়েও প্রায়শ : কেউ কথা রাখেননি'। এই জ্ঞানী ব্যক্তিবন্দ

‘কতকগুলি উচ্চকণ্ঠ বাক্যমাত্র’—এই মন্তব্য ঐ সম্পাদকীয় নিবন্ধে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। সঙ্গীত এবং শিল্পকলা সম্পর্কিত কোনো পত্রিকা তখন ছিল না, এখনও নেই, এই দুটি বিষয়েও নিয়মিত আলোচনা তিনি ছাপতে পেরেছিলেন, কিন্তু এক্ষেত্রে যথেষ্ট সাড়া পাননি।

‘সমকাল এর ভূমিকা’ শীর্ষক প্রবন্ধে মন্তব্য করা হয় : বিশুদ্ধ সাহিত্য শিল্প সংস্কৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে বাংলা ভাষার প্রকাশ ও ধারণ ক্ষমতাকে তিনি সমাজের যাবতীয় মৌলিক দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় বিদ্যা অবধি ব্যাপ্ত করতে চেয়েছিলেন। এক্ষেত্রে সাফল্য আসেনি, তবে ‘সমকাল’-এর মূল ভূমিকা—এদেশে কবিতা প্রবন্ধ কথাসাহিত্য সমালোচনার অপরিমেয় সম্ভাবনা আবিষ্কার—এতটা আর কোন পত্রিকা করেনি। সাহিত্যের এই সব বিভাগের কথা সাহিত্য হিসাবেই লেখা হবে, তবে পত্রিকা হিসাবে সমকাল এর একটি ভূমিকা এখানে উল্লেখ করা উচিত—সেটি হচ্ছে সমালোচনা। ‘প্রবাসী’, ‘সংগত’ এবং আরো অনেক পুরনো দিনের ঐতিহাসিক পত্রিকা এক্ষেত্রে যা দিয়েছে তা হচ্ছে শুধু গ্রন্থ-পরিচয়। ‘পরিচয়’ (পঞ্চাশের কিছু অংশ অবধি), ‘কবিতা’ এবং ‘চতুরঙ্গ’ দিয়েছে গ্রন্থ-সমালোচনা, যা-সাহিত্য সমালোচনারই অন্তর্গত।

ইংলণ্ডে টি.এস. এলিয়টের সম্পাদনায় ‘ক্রাইটেরিয়ান’, এফ, আর লিভিসের সম্পাদনায় ‘স্ক্রুটিনি’ এবং ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় আরও অনেক অভিজাত সাহিত্যপত্রিকা অনেক বছর আগেই এরূপ সমালোচনা দিয়েছে (এবং এখনও দিয়ে যাচ্ছে) যা মৌলিক প্রবন্ধের মতোই সাহিত্য হয়ে উঠেছে। এরূপ সমালোচনা ঠিক সমালোচিত লেখক ও গ্রন্থের পরিচয় দেয় না। ঐ লেখক এবং গ্রন্থের মূল্যায়নকে উপলক্ষ করে নিজেই স্বতন্ত্র সাহিত্য হয়ে ওঠে।

‘সমকাল’ গ্রন্থ-সমালোচনাকে ঐসব বিদেশী পত্রিকার সমপর্যায়ে উন্নীত করতে পেরেছে বলা যায়না ; কোনো সাহিত্যের সমালোচনা বিভাগ কতোটা উন্নত হবে তা নির্ভর করে সেই সাহিত্য নিজে সমগ্রভাবে কতোটা উন্নত তার উপর। বাংলাদেশের সাহিত্য পরিমাণ এবং গুণগত ভাবে এখনো দ্বিতীয় পর্যায়েই উন্নীত হতে পারেনি। অতএব এদেশের সমালোচনা সাহিত্যের খুব উল্লেখনীয়ভাবে উন্নত হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু এই সমালোচনা সাহিত্যের গ্রন্থ পরিচয় অপেক্ষা উন্নততর পর্যায়ে উন্নীত করার প্রথম কৃতিত্ব ‘সমকাল’ এর।

যেমন সাহিত্য, তেমনই সংস্কৃতিচিন্তার মধ্যযুগীয় মানসিকতা অতিক্রম করে আধুনিকতা এবং ভবিষ্যৎমুখিনতার উন্মীলনে ‘সমকাল’ সহায়তা করেছে। এদেশের রাজনৈতিক চিন্তায়ও তার ভূমিকা এই রকম : বিশেষ করে, রাষ্ট্রচিন্তায় বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষে, ‘সমকাল’ এর ভূমিকা উল্লেখনীয় ছিল।

সাহিত্য সংস্কৃতি অথবা অন্য যে-কোনো প্রসঙ্গে সর্বাধুনিক অভিমত এবং অন্তরঙ্গ চিন্তার নির্ভয়ে প্রকাশ করতে হলে ‘সমকাল’-এ লিখতে হবে, এই আমরা লেখক-সম্প্রদায় ধরে নিয়েছিলাম। এদেশের সাহিত্যে আধুনিকতাকে আরও অগ্রসর করে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্বে আরও কোনো কোনো পত্রিকা কাজ করেছে ; বিশেষ করে ‘কণ্ঠস্বর’-এর নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতেই হবে ; কিন্তু সন্তরের পূর্ব অবধি এদেশের সাহিত্যে যাঁরা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন, তাঁদের কৃতিত্ব নির্মাণে ‘সমকাল’ এর ভূমিকাই ছিল সর্বপ্রধান।<sup>১৮</sup>

ঙ. সমকালের শিল্পসাহিত্য চিন্তা তথা রচনার পরিচয় দেবার সময়ে একটা কথা স্মরণ করতে হয়, যে বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলন বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বীজ বপন করেছিল, সে বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারি আন্দোলনের চেতনা সমকালের মূল প্রেরণা ছিল বলে বাংলাদেশের আধুনিক সাহিত্যসৃষ্টিতে সমকালের ভূমিকা সর্বশ্রেষ্ঠ হয়েছিল। পঞ্চাশের দশকের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক-প্রতিভা এবং চল্লিশের দশকের প্রগতিশীল লেখকবৃন্দ ; আর ষাটের দশকের তরুণেরা ছিলেন সমকালের লেখক। ঐদেরই কণ্ঠ থেকে নিসৃত হয়েছে ‘বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা’ এবং ‘সংগ্রাম চলবেই’ ইত্যাদি কবিতা ও গান। অসংখ্য কালজয়ী কবিতার মতো এগুলোও সমকালেই ছাপা হয়েছিলো—“নক্ষত্রপুঞ্জের মতো জ্বলজ্বলে পতাকা উড়িয়ে আছো আমার সন্তায়/মমতা নামের পুত প্রদেশের শ্যামলিমা তোমাকে নিবিড়/ঘিরে রয় সর্বদাই। কালো রাত পোহানোর পরের প্রহরে/শিউলী শৈশবে ‘পাখী সব করে রব’ বলে মদনমোহন/তর্কালঙ্কার কী ধীরোদান্ত স্বরে প্রত্যহ দিতেন ডাক। তুমি আর আমি,/অবিচ্ছিন্ন ; পরস্পর মমতায় লীন,/ঘুরেছি কাননে তাঁর নেচে নেচে, যেখানে কুসুম-কলি সবই/ফোটে, জোটে অলি ঋতুর সংকেতে। \* \* \* \*

তোমাকে উপড়ে নিলে, বলা তবে, কী থাকে আমার ?  
উনিশ শো বায়ান্নোর দারুণ রক্তিম পুষ্পাঞ্জলি  
বুকে নিয়ে আছো সগৌরবে মহিযসী।  
সে-ফুলের একটি পাপড়িও ছিন্ন হলে আমার সত্তার দিকে  
কত নোংরা হাতের হিংস্রতা খেয়ে আসে।  
এখন তোমাকে নিয়ে যেঙরার নোংরামি,  
এখন তোমাকে ঘিরে খিস্তি-খেউড়ের পৌষ-মাস।  
তোমার মুখের দিকে আজ আর যায়না তাকানো  
বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা।<sup>১৯</sup>

১৯৬১ সনে ‘রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী’ পালন, তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানি বাঙালিদের সামনে এক চ্যালেঞ্জরূপে দেখা দিয়েছিল। সমকাল ‘রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী সংখ্যায়’ (৪ বর্ষ ৯ সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৬৮) শতবার্ষিকী পালন উপলক্ষে গঠিত কেন্দ্রীয় কমিটির অনুষ্ঠানের সভাপতি বিচারপতি এস. এম. মুর্শেদের ভাষণ, ঐ অনুষ্ঠানে পঠিত অপরাপর কতিপয় প্রবন্ধ এবং কবিতাসহ প্রকাশ করা হয়। এই সংখ্যায় যে সকল লেখকের রচনা প্রকাশ পায়, তাঁদের মধ্যে উল্লেখ্য ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, আবুল ফজল, শওকত ওসমান, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, এস. এন. কিউ. জুলফিকার আলী, আবু রুশদ, হাসান হাফিজুর রহমান, ডক্টর সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, ড. মুহম্মদ কুদরত-ই-খুদা, আখতার হামিদ খান, সৈয়দ আলী আহসান, শামসুর রাহমান প্রমুখ। এই সংখ্যায় পাকিস্তানবাদী চিন্তক-লেখক সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েনও লিখেছিলেন :

‘পাকিস্তানবাসী হিসেবে আমরা একটা আলাদা জাতি। আমাদের সংস্কৃতিগত বৈশিষ্ট্য আছে—এ অনস্বীকার্য। কিন্তু ভাষার দিক থেকে অন্য কোন জাতির সঙ্গে আমাদের মিল রয়েছে বলেই আমাদের জাতীয়তাবোধ ক্ষুণ্ণ হতে পারে, একথাটা সহজে গ্রহণ করা মশকিল। আমাদের মনে যদি নিজেদের বৈশিষ্ট্য এবং স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে কোন সংশয় না থাকে তবে রবীন্দ্রনাথ বা অন্য কোন ভারতীয় কবি বা সাহিত্যিকের রচনা সাহিত্য হিসেবে গ্রহণ করতে আমাদের আপত্তি থাকবে কেন?... যে বাংলা ভাষা নিয়ে আমরা গর্ব করি, রবীন্দ্রনাথের কাছে তার ঋণ

অপরিসীম, এ সত্যটি যেন কখনই ভুলে না যাই। বাংলা ভাষাকে তিনি তাঁর নিজের সাধনার দ্বারা মধ্যযুগ থেকে বিংশ শতাব্দীতে পৌঁছিয়ে দিয়ে গেছেন, যার ফলে আধুনিক সাহিত্যের মধ্যে বাংলা স্থান পেয়েছে।—এর নজীর পাক-ভারত উপমহাদেশের আর কোন সাহিত্যে নেই, হিন্দী-মারাঠী-তালিম-তেলেগু কোন ভাষায়ই নেই। রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে বাংলা সাহিত্যের যা অবশিষ্ট থাকে তা নিয়ে ঘরের নিভৃত হয়ত আলোচনা করা যায়, কিন্তু দুনিয়ায় জাহির করবার মত কিছু থাকে না।<sup>২০</sup>

সৈয়দ আলী আহসান কবিতা লিখেছিলেন : ‘রবীন্দ্রনাথকে’ শিরোনামে—

কোন আগামীকালে  
বৃহত্তর সূর্য অথবা উজ্জ্বলতর আলো  
আমার দৃষ্টিকে স্বচ্ছ করবে কি করবে না?  
পরিচিত ফুল, সমুদ্র এবং পাহাড়  
ভবিষ্যতে নতুন পৃথিবী হবে কি হবে না?  
সূর্য হয়তো বরফ হবে  
যখন আমি অন্ধকারের বিস্তার—  
পৃথিবীতে অনেক পানি  
যখন আমি অনেক কবিতায়  
আকাশ দেখলাম  
পৃথিবীর মলিনতায় অশ্রুবিন্দুতে  
এবং তুমি হে আকাশ  
সব মুহূর্তেই হৃদয়ের নীলাম্বর।<sup>২১</sup>

স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেরণাদায়ক ‘সংগ্রাম চলবেই’ কবিতা-গানটি সিকান্দার আবু জাফরের এবং সমকালের—

জনতার সংগ্রাম চলবেই।  
আমাদের সংগ্রাম চলবেই॥  
হতমানে অপমানে নয়, সুখ সম্মানে  
বাঁচবার অধিকার কাড়তে  
দাস্যের নির্মোকে ছাড়তে  
অগণিত মানুষের প্রাণপণ যুদ্ধ  
চলবেই চলবেই,  
আমাদের সংগ্রাম চলবেই।  
প্রতারণা প্রলোভন প্রলোপে  
হ'কনা আঁধার নিশ্চিত  
আমরা ত সময়ের সারথী  
নিশিদিন কাটাবো বিন্দ্র  
দিয়েছি ত, শান্তি আরও দেবো স্বস্তি  
দিয়েছি ত, সম্প্রদ-আরও দেবো অস্তি  
প্রয়োজন হলে দেবো একনদী রক্ত।  
হ'ক না পাথের বাধা প্রস্তর শক্ত,  
অবিরাম যাত্রার চির সঞ্ঘর্ষে  
একদিন সে পাহাড় টলাবেই।  
চলবেই চলবেই  
আমাদের সংগ্রাম চলবেই।<sup>২২</sup>



‘সমকালে’ অনেক বিতর্ক হয়েছে বিভিন্ন বিষয়ে। লেখক এবং পাঠকদের মতামত খোলামেলা প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয় সমকালের শেষার্ধ্বে, কিন্তু প্রথম সংখ্যা থেকেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিরোধী মতের লেখকদের রচনাও স্থান দেওয়া হয়েছে তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে সত্য্যন্বেষণের অথবা পাঠকদের চিন্তার সীমাবর্ধনের অভিপ্রায়ে। পাকিস্তানের আদর্শে বিশ্বাসী চিন্তক-লেখক-সমালোচক ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদের নিকট থেকে সম্পাদক প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যার জন্যেই লেখা নিয়েছিলেন ‘পূর্ববাংলার সংস্কৃতি’ শিরোনামে। এই প্রবন্ধে কাজী দীন মুহম্মদ বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীর উৎপত্তি এবং বিকাশের ধারা বর্ণনা করে কার্ল মার্কসের সামাজিক বিপ্লবের দর্শন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। শেষাংশে পূর্বপাকিস্তানের সংস্কৃতি সম্পর্কে বলেন :

আমাদের পক্ষে সুবিধা এই যে, ইসলাম আমাদের কালচরকে সমগ্রভাবে নিয়ন্ত্রিত করে। আর নিয়ন্ত্রিত করে বলেই এর প্রভাব আমাদের জীবনে এত বেশী যে, আমাদের কালচরের বিকাশ-ক্ষেত্রে আমরা পদে পদে এর কাছে ঋণী। আমাদের জগৎ ও জীবনবোধ হল আমাদের ইডিওলজি। সৃষ্টা ও সৃষ্টি সম্বন্ধে আমাদের মনে যে জিজ্ঞাসা জাগে—শুধু তারই নাম রিলিজিয়ন নয়। এর খানিকটা ইডিওলজির অন্তর্গত আর খানিকটা আচারগত—একথা যতদূর সত্য, তার চাইতে বেশী সত্য আমাদের জীবনবোধের সামগ্রিক ধারণা ও কর্মজগতে তার প্রকাশের ব্যাপ্তি ও বাস্তবায়নে এর মোটামুটি প্রভাব। এখানে পাশ্চাত্য মনীষী টি. এস. এলিয়টের একটা কথা স্মরণ করতে হয়। তিনি বলেছেন যে; ক্যাথলিক সংস্কৃতিই বর্তমান পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রাণ। আমরাও তাঁর প্রতিধ্বনি করে বলতে পারি, মুসলিম সংস্কৃতির প্রাণ সেই ইসলামী আরবীয় কালচর, আর আমাদের সংস্কৃতির উৎস মুসলিম সংস্কৃতির ঐতিহাসিক ধারা থেকেই উজ্জীবিত হবে। কিন্তু একথাও যে সর্বৈব প্রযোজ্য নয়, সমাজতত্ত্ববিদ ও নৃতত্ত্ববিদ তা নিশ্চয়ই অস্বীকার করবেন না। তাই দেখি চীন, জাভা, মালয়, ভারত, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ইরাক, ইরান, ও তুরস্কের সকল মুসলিম ধর্মত এক হওয়া সত্ত্বেও প্রাত্যহিক বাস্তব জীবনযাত্রা ও সৃষ্টিধারায় তাঁদের বিকাশ পরিবর্তমানই নয় শুধু—যথেষ্ট পৃথকও। কিন্তু আমরা আগে বাঙালি পরে মুসলমান, না আগে মুসলমান পরে বাঙালি এ কথা জোর করে বলার চাইতে বরং একথা মেনে নেয়া সহজ যে, আমরা মুসলমানও বাঙালিও। আমরা মুসলমান কাজেই কোন বিশেষ দেশ বা কালের বিশেষ গণ্ডির তাছিরের তুলনায় ইসলামী তাছির আমাদের ভিতর বাহির, চিন্তা ও কর্ম আমাদের ইডিওলজি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিপুষ্ট; তবে ভৌগোলিক অবস্থান ও আবহাওয়া আমাদের মধ্যে যে পরিবর্তন এনে দেয় তা মৌলিক পরিবর্তন নয় নিশ্চয়ই। বাইরের দিক থেকে আমাদের বস্ত্র-সস্তার মধ্যে তার তাছির কাজ করে। তাই আমাদের কালচরকে আমরা নিঃসন্দেহে একটা ছককাটা কোঠায় ফেলতে পারি না, সেকথা বলাই বাহুল্য। একথা আমাদের স্বীকার করে নিতে আপত্তিও থাকতে পারে না যে, রিলিজিয়ন ও কালচরের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব আছে; আর ‘রিলিজিয়ন অপরিবর্তনীয় এবং কালচর বিকাশশীল’। তবুও রিলিজিয়ন দিয়ে যে কালচরের নামকরণ চলে না বা ঠিক বিজ্ঞানসম্মত নয় একথা সর্বতোভাবে মেনে নেওয়া যায় না। এখানেই ভাবনার দিক থেকে আমাদের মানসিকতার বিরোধ।

আমাদের দেশের ও জীবনের উপর দিয়ে কয়েকটি কালচরের প্লাবন এসে গিয়েছে এবং তাতে করে সমাজের মূল কাঠামোতে, সংস্কৃতি এবং সভ্যতায়ও সংস্কার এসেছে, একথা ঐতিহাসিক সত্য। এদেশে ব্রাহ্মণধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের প্রভুত্বের কালেই ইসলাম ধর্মের আগমন। মুসলিম বিজয়ী বেশে এদেশে এলেও বিজয়ী ব্যক্তির সংখ্যা খুব বেশি ছিল না। তাই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় যে, 'আসলে বেশির ভাগ বাঙালী মুসলমান বাংলাদেশেরই মানুষ ; যারা মুসলমান ধর্মগ্রহণ করেন তাদের সন্তান সন্ততি এবং সেজন্যই এদেশীয় রূপটি ভুলতে পারা সহজ হয়নি। বিশেষ করে ইসলাম সাম্যবাদের পক্ষপাতি বলে আর বিদ্যমান হিন্দুধর্ম বৈষম্য ও অধিকারভেদের উপর গঠিত বলে বিজিত জনগণ নবাগত উদার ধর্মের দিকে আকর্ষণ অনুভব করে আসবেন—এতে বিচিত্র কি? বিজয়ী রাজধর্ম ইসলামের আওতায় অভিজাত এবং অনভিজাত দুই শ্রেণীই ভীড় করে থাকবে। কিন্তু যেহেতু আগে থেকেই সমাজের তালানির শ্রেণীই ছিল সংখ্যায় বেশি, সেজন্য পরেও বেশিরভাগই নিচে পড়ে রইল। ধর্মের ক্ষেত্রে বিভেদ না থাকা সত্ত্বেও বৈষয়িক ব্যাপারে দরিদ্র মুসলমান একদিনেই সমান হয়ে উঠতে পারল না। আরও একটা ব্যাপার লক্ষ্য করা যেতে পারে ; এতদিন রাজত্ব করে এবং সমাজ ও ব্যক্তিজীবনে এতটা প্রভাব বিস্তার করেও কর্মজীবনেও সমতা ও সুষ্ঠু বাস্তব সমাজব্যবস্থায় পুরোপুরি সার্থকতা আনতে পারেননি মুসলমান নৃপতিগণ। আর এতে অভিজাত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রাধান্যের ছাপও পড়েনি ততটা। মুষ্টিমেয় মুসলমান—অভিজাত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর, আর বাদবাকী সব তথাকথিত জনগণ। আজও এর খুব বেশি পরিবর্তন হয়েছে মনে করা যেতে পারে না।

পশ্চিম পাকিস্তানে বিভাগপূর্ব সমাজব্যবস্থায় যে কারণে দুটো শ্রেণী রয়েছে, অভিজাত ও নিম্ন (মজদুর) শ্রেণী—সে স্বাভাবিক কারণেই এখানে বাংলায়ও দুটি মাত্র শ্রেণীর উদ্ভবই ইসলামের আওতায় সহজ হয়ে উঠেছিল। মাঝখানের মধ্যবিত্ত সমাজ গড়ে উঠলেও তার মেরুদণ্ড খুব শক্ত ছিল না। ওয়ারেশি আইন ও মুসলমানি জীবনযাত্রা-পদ্ধতি : আয়েসি মনোভাব ও অভ্যাস সহজেই অবস্থাপন্ন মুসলমানকেও মধ্যবিত্ত অবস্থা থেকে নিচে নামিয়ে আনত। আমাদের সমাজের এই আর্থিক কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে উৎপাদক হিসেবে শ্রমসাধ্য অনেক কাজেই মুসলমান অগ্রণী ছিল, এখনও আছে। পরিশ্রমী সাধারণ মুসলমানই নিজেদের শ্রম ও দক্ষতার পরিচয় তখনও দিত, এখনও দিচ্ছে—সন্দেহ নাই। সূক্ষ্ম বয়নশিল্প, সেলাই, সুচীশিল্প, স্থাপত্যশিল্প ও নানাবিধ কুটির ও নৌশিল্প এসবের মধ্যেই তাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও কর্মক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। বাস্তব ধনসৃষ্টির ক্ষেত্রে, কৃষি ও কারুশিল্পে, শ্রমসাধ্য কর্মে মুসলমান জনগণ এখনও আমাদের জীবনে মুখ্য স্থান জুড়ে আছে।

আর মানস-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে, সাহিত্য ও চারুশিল্পেও কি মুসলমান পিছিয়ে রয়েছে? প্রাধান্য অর্জন করতে না পারলেও মধ্যযুগের মুসলমান এ ব্যাপারে কম অগ্রসর ছিলেন এমন কথা বলা চলে না। আরবি ফারসি চর্চা ছাড়াও এদেশীয় কাব্যসাহিত্যে তাঁদের দান কম নয়। কাজী দৌলত, আলাওয়াল, সৈয়দ সুলতান, জয়নুদ্দীন, মোহাম্মদ খান, শাহ মুহম্মদ সগীর

এসব কবিদের ছাড়াও ভাবনার ক্ষেত্রে চিন্তাশীল মনীষীর অভাব ছিল না। সাধারণ ‘লোক’-উৎপাদক শ্রেণীরও দান এ বিভাগে নগণ্য নয়। লৌকিকগান, কবিতা, ছড়া, গাথা, গীতিকা, সারি, জারি, ভাটিয়ালী এসব রচনার ক্ষেত্রে মুসলমানই ছিল অগ্রণী। মুসলিম কেবল সংখ্যায় বেশি নয় বাস্তব কর্মক্ষেত্রে থেকে আরম্ভ করে চিন্তার জগৎ পর্যন্ত সর্বত্র মুসলমান ছিল পথিকৃৎ। এ লোক-সঙ্গীত, লোক-সংস্কৃতি ও লোককাব্য ক্ষেত্রে তাদেরই হাত থাকত বেশি—‘এখনো তা আছে অনেক খানে—অনেক দিকে’।

আধুনিক যুগে ইংরেজ-কৃষ্টি ও সভ্যতা নাড়া দিয়েছে আমাদের মন-ভিত্তিকে। তবু আমরা ধর্মনিরপেক্ষ ঐতিহ্যবোধের খন্ডের ততটা পড়ে যাইনি। কিন্তু আমরা হয়তো অতীতের ইতিহাস কাজে লাগিয়ে, সত্যিকার শিক্ষার মর্যাদা বুঝতে পারি, আর জানতে পারি আমাদের জাতীয় অমর্যাদার স্বরূপ। কিন্তু বেশিরভাগই যে বাস্তব জীবন সংগ্রামে ঘর্মান্ত ক্লান্ত জনগণ তাদের কাছে—রেশন, সিভিল সাপ্লাই, মিল—এসব ছাড়া পাশ্চাত্যপ্রভাবের যা অর্থ তা হচ্ছে নিঃশেষ হওয়া, নাফরমান হওয়া। বাস্তব তহবিলের দিকে শূন্য আর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের দিক দিয়ে ঈমানের অবিশ্বস্ততা ছাড়া তাদের কাছে—এর অন্য অর্থ নেই। তাদের সম্যক শিক্ষার প্রকৃত অর্থ এখনো বুঝানো হয়নি—বুঝানো হয়নি সত্যিকার ধর্মের শাস্ত স্বরূপ। অতএব তাদের মধ্য থেকে উদ্ধৃত কতিপয় অভিজ্ঞত যদি শিক্ষা ও সংস্কৃতির অবমাননা করে, তবে তার থেকে স্বভাবতই তারা তার অর্থ বের করে নেয় এভাবে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, এরা নিজেদের সংস্কৃতি ও মানস স্ফূর্তির ব্যাপারে আত্ম এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যে তারা স্থির করতে পারছেননা তাদের পথ কি। সুবিধা অসুবিধা যাই হোক, তাদের হল চালনা, এবং ঝাঁশের বেতের কাঁচের মাটির সূতার নানা শিল্পকর্ম এগিয়ে চলেছে আগেরই মত—কেবল কিঞ্চিৎ পরিবর্তিতরূপে।

কিন্তু তাদের সে শান্তি সুখের দিন চলে গিয়েছে—যখন তারা আপন মনের সুখে যাত্রা, ভাসান, ও পুঁথি পড়ার আসর জমিয়ে আনন্দে বিভোর হয়ে জীবন চালাত, যখন তারা বাপমায়ের নামে ফাতেহা করতে দুদশগ্রামের ছেলে বুড়ো সবাইকে দাওয়াত দিয়ে আত্মতৃপ্তি লাভ করত, যখন তারা ওয়াজের মহফেল করে জৌনপুর অমৃতসর-ফেরৎ মৌলানা বা পীর মোর্শেদের মুখে আরব, ইরান-তুরানের ইতিকথা কেছা শুনতে শুনতে রাত ভোর করে দিয়ে ছওয়াব হাসিলের ফায়দা উঠাত—সেদিন আর নাই। সে পুরোনো সমাজ নাই। সে শান্তি-সমৃদ্ধিও আর নাই। এখন মানুষ শহরমুখে ভূমিহীন কৃষক যারা পরের বাড়িতে কৃষণ খেটে দিনগুজরান করতো তাদের ধরতে হচ্ছে রিকশা, অথবা মিল বা ওয়ার্কসপের মজুরের কাজ। কর্মগতিকে কাজেই ধর্ম বিকাশের ক্ষতি না হলেও, ধর্মকর্মের আচার-অনুষ্ঠানে এসেছে শৈথিল্য। ছেলে বা মেয়ের বিয়েতে যেখানে গ্রামে জেয়াফৎ না দিলে লোকের মুখ থাকত না, এখন সেখানে গোপনে শুধুমাত্র ছেলোটিকে ডেকে মোল্লাজিকে একটা টাকা দিয়ে শরা পড়িয়ে কাজ চালানো হয়। নৌকা বাইচে, হাড়ুড়ু খেলায়, ঈদে এবং অপরাপর উৎসবে অনুষ্ঠানে নেই আগের সেই প্রাণস্পন্দন, নেই উৎসাহ কোলাহল। ইংরেজের ফেলে যাওয়া রসহীন আঁখের ‘ছোবরা’ টির যেখানে যেটুকু রসের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে—তাতেই নব্যশিক্ষিতরা (আনকলচরড় নয়) ভাগ বসচ্ছে—তাদের স্বাত্ম্য শূন্য পড়ছে। এই যে অবস্থা এইত হল আজকার দিনের সাধারণ উৎপাদকের জীবন ও জগতের প্রতি-দৃষ্টিভঙ্গি। এসকল অবস্থার পেছনে কোন বিপ্লবের বারুদ জমা হয়ে হয়ে পুঞ্জীভূত ধোয়া ঘনিয়ে আসছে এবং কোন পথেই বা এর আত্মস্ফূর্তি সেকথা ভাববার দিন এসেছে—নয় কি ?<sup>২৩</sup>

এই লেখার প্রতিক্রিয়ায় দ্বিজেন শর্মা লেখা পাঠান। পরের সংখ্যাতে ‘বিতর্ক’ শিরোনামে তাঁর লেখাটি ছাপা হয়। লেখক বলেন :

কাজী দীন মুহম্মদের ‘আলোচনা স্পষ্টতই বিজ্ঞান সম্মত নয়, একান্ত নিজেরই কল্পনাপ্রসূত। ... বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও গভীর আলোচনার মধ্যে যে প্রবন্ধের শুরু তার এই

পরিণতি লেখকের মুক্তবুদ্ধি সম্পর্কে স্বভাবতই আমাদেরও সন্দেহ সৃষ্টি করে।’ লেখক বলেন মধ্যযুগ ধর্মসংস্কৃতির যুগ। ... শিল্প-বিপ্লবোত্তর ইউরোপকে এলিয়টা দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিচার আজ যেমন ভ্রান্তিপুষ্ট তেমনি পূর্বপাকিস্তানের কালচারের বিচারও ইসলামের মানদণ্ডে নির্ভুল হতে পারে না। ইউরোপে ধর্ম-সংস্কৃতির যুগ উত্তীর্ণ হয়েছে। তার সংস্কৃতির পরিচয় আজ ধর্মের মানদণ্ডে বিচার্য নয়। আমাদের দেশেও ধর্ম-সংস্কৃতি আজ কালান্তরের পর্বে। তাই এখানেও ধর্ম আজ সংস্কৃতির পূর্ণ অর্থ বহন করতে অক্ষম। ধর্ম আজ সংস্কৃতির সমগ্র রূপ নয়—তার অংশ মাত্র। এর স্বীকৃতি আমাদের কর্মে ও চিন্তায় সর্বত্র প্রতিফলিত। লেখক অবশ্য একে পাশ্চাত্যের অনুকৃতি বলে নিন্দা করেছেন। কিন্তু সর্বত্র তা সত্য নয়। এর সৃষ্টিশীল অবদানগুলি বিচ্যুতি নয়, আসলে প্রয়োজনের নতুন তাগিদেই স্বীকৃতি। ‘ধর্মনিরপেক্ষ ঐতিহ্যবোধের খপ্পরে ততটা যে আমরা পড়ে যাইনি’—এতে গর্ব ও গৌরবের কতটুকু কারণ আছে তা নিয়ে অবশ্যই বিতর্ক চলতে পারে। কিন্তু আসলে এই ঐতিহ্যবোধের সঙ্গে যে আমাদের পশ্চাৎপদ কৃষি অর্থনীতি আর আনুষঙ্গিক ব্যাপ্তি-সমৃদ্ধি-উল্লাস-বিক্ষোভহীন শান্তিশিষ্ট ভদ্র জীবন জড়িয়ে আছে, এ সত্য অস্বীকার করা কঠিন। এ যদি গৌরবের বিষয় হয় তবে এখানেই আমাদের দুর্বলতা নিহিত।

বাংলা সংস্কৃতির মৌলিক দুর্বলতা তার ফিউডাল উৎপাদন পদ্ধতি, তার স্ববির গ্রাম্য সমাজ, দুর্নিবার ব্যাপ্তি ও বিশাল জীবন চেতনার অভাব। এ বৈশিষ্ট্য হিন্দু শাসন থেকে মুসলমান রাজত্ব অবধি অক্ষুণ্ণ রয়েছে। ইংরেজ শাসনে এদেশের সাবিকি অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়ে। ধনতন্ত্রের প্রচণ্ড শোষণ গ্রামবাংলা তথা তার সংস্কৃতির চরম লাঞ্ছনা ঘটে। অথচ নতুন তার স্থান গ্রহণ করেনি। তাই গভীর তিস্ততা ও বিদ্বেষের মধ্যদিয়েই পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সঙ্গে আমাদের পরিচয়। যে সংস্কৃতি ফিউডাল ইউরোপকে ধর্মীয় দ্বন্দ্ব ও চরম দারিদ্র্য থেকে মুক্তি দিয়েছে তাঁকে আমরা তাই যথাযথ মূল্যে গ্রহণ করতে পারিনি। আমাদের দেশবাসীর স্মৃতিতে সাম্রাজ্যবাদী লুঠন আর বর্বর অত্যাচার যে গভীর রেখাপাত করেছে, ইউরোপের কোন কাব্য, সাহিত্য, বিজ্ঞান তা ঢেকে দেবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। তাই লেখক যখন ইউরোপীয় সংস্কৃতির আলোচনা করেন, ‘পাশ্চাত্য প্রভাবের যা অর্থ তা হচ্ছে, নিঃশেষ’ হওয়া ‘নাফরমান হওয়া’, তখন তিনি নিঃশেষে আমাদের জাতীয় সেন্টিমেন্টের প্রতিধ্বনি করেন। ... আমাদের ফিউডাল সংস্কৃতির কাল বহু পূর্বেই উত্তীর্ণ হয়েছে। যে সংস্কৃতির ধারা আমরা আজ বহন করছি তার সঠিক গোত্র নির্ণয় অসম্ভব। ঔপনিবেশিক প্রয়োজনেই এর সৃষ্টি। কর্নওয়ালিসী ভূমি-ব্যবস্থা, গ্রামবাংলার নির্বিশেষ ধ্বংস, শিল্পের স্বল্প পরীক্ষিত বিকাশ, মধ্যবিত্ত ও জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর সৃষ্টি, জাতীয়তাবাদ, স্বাধীনতা আন্দোলন, আধুনিক বাংলা সাহিত্য, এমনি ভালমন্দের জটিল সমাবেশই বাংলার আধুনিক সংস্কৃতি। স্ববিরোধিতা এবং সীমাবদ্ধতাই এর দুর্বলতা। তাই আজকে স্বাধীনতা লাভের পর এ সংস্কৃতির পরিবর্তনের প্রশ্ন অনিবার্যভাবেই আসে। প্রবন্ধকার শুধুমাত্র এর ইঙ্গিতই দিয়েছেন। কিন্তু সমস্যা যেখানে জাতীয় জীবনের সঙ্গে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত সেখানে ইঙ্গিত যথেষ্ট নয়। এ কথা সত্য যে, সংস্কৃতি ফরমাইসমাফিক তৈরি করা যায় না। তার নৈর্ব্যক্তিক

উপাদানগুলি অনেকাংশেই নিয়ন্ত্রণাতীত। শুধুমাত্র ব্যক্তিক প্রচেষ্টা নির্ভর দিকগুলিকে আমরা বুদ্ধি ও দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করতে পারি। আয়ত্বাধীন ক্ষমতার সবচেয়ে বৈজ্ঞানিক ব্যবহারের মধ্যেই আমাদের সাফল্য নিহিত। আগামী দিনে আমাদের সংস্কৃতির রূপ কি হবে এ নিয়ে এখনই চুলচেরা বিচার বিশ্লেষণ তাই অনর্থক। এই মুহূর্তে আমাদের কর্তব্য নির্ধারণই এই ক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রধান প্রশ্ন।

লেখকের মতে, ইউরোপীয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। কিন্তু তার দুর্বলতাও আজ লুকানো নেই। ...সে সংস্কৃতির দুর্বলতা আজ বিশ্বমানবের কাছে স্পষ্ট। তাকে গ্রহণের মধ্যে কোন কল্যাণ থাকতে পারে না।

সদ্যমুক্ত এশিয়া আফ্রিকার জাতিগুলির সামনে এ সংকট আজ প্রকট। মানুষ প্রকৃতির নিয়ম থেকে আবিষ্কারের মধ্যেই তার দাসত্ব থেকে মুক্তির পথ খুঁজছে। ইতিহাসের গভীর অধ্যয়নের মধ্যেই আজ তেমনি নতুনতর সত্যের আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে, যে জন্য সামন্ততন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ ধনতন্ত্রের অঙ্ককার গলি না মাড়িয়েও সম্ভব।

সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের বিকাশের মধ্যে জাতীয় অর্থনীতির পুনর্গঠন সর্বপ্রকার সাম্রাজ্যবাদী শোষণের অবসান, রাষ্ট্রকাঠামোর গণতন্ত্রীকরণ, কুশিক্ষা ও মুখতার বিলুপ্তিসাধন, সৃজনশক্তির অবাধ স্ফুরণের মধ্যে দিয়েই আমরা শান্তিপূর্ণভাবে নতুন সংস্কৃতি গড়ে তুলতে পারি। তিনি আরও বলেন :

‘যে অবস্থায় আমাদের দেশ আজ এসে পৌছেছে সেখানে সংস্কৃতির সুস্থ বিকাশ সম্ভব নয়। তাই সামন্তমুখিতা ও ভীকৃত্য পিছনে ফেলে আজ দেশের অগ্রগামী সৈনিকদের সাথে সংস্কৃতিকর্মীকেও কাঁধ মিলাতে হবে। এ সংকট আমরা সমবেত প্রচেষ্টাতেই শূন্য উত্তীর্ণ হতে পারি। রাজনীতিক, সমাজকর্মী, শিল্পী, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী সবাই ব্যাপক অর্থে সংস্কৃতিকর্মী। সংস্কৃতির সর্বব্যাপ্ত সংকট অবসানের মধ্যেই আমাদের কর্ম ও উদ্যোগের অকল্পিত দিগন্ত উন্মোচনের সম্ভাবনা নিহিত। সেই ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করতেই আমাদের আজ এগিয়ে আসতে হবে।’<sup>২৪</sup>

আবদুল গনি হাজারী ‘সংস্কৃতি-চিন্তা’ শীর্ষক দীর্ঘ প্রবন্ধের (ধারাবাহিকভাবে কয়েক সংখ্যায়) ‘পটভূমি’ বর্ণনা করতে গিয়ে ‘সংস্কৃতি’র প্রসঙ্গটি যে বিশ্লেষণ করেছেন তার মধ্যদিয়ে একটি দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পেয়েছে : ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বাংলাদেশে সর্বপ্রথম যখন মুসলিম রাষ্ট্রশক্তির প্রতিষ্ঠা হয়, পৃথিবীর এই অঞ্চলের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে তা এক নতুন অধ্যায়ের উদ্বোধন করে যায়। তখনও একবার ‘অনেকে বাস্তব্যাগী হইয়া পৃথিবীপত্র ধনজন লইয়া নেপাল ও বঙ্গে আশ্রয় লয়।’ তখনও সমাজব্যবস্থা এর ফলে ভেঙ্গে পড়েছিল, বহুকাল ধরে শিল্প সাহিত্য মূর্ছিত হয়েছিল। কিন্তু তারপর ক্রমশ যে নতুন জীবন-বোধ জন্ম নিয়েছিল তা আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে স্বর্ণযুগের পত্তন করে গেল।

এর সাতশ বছর পর বাংলাদেশ যখন আর একবার মুসলিম রাষ্ট্রশক্তির হাতে এলো, তখন আমরা বিশ শতকের মধ্যাহ্নে। স্থান ও কাল তখন মানুষের কর্তৃত্বের অধীন। মানুষ এগিয়ে চলেছে অবিশ্বাস্য গতিতে। এই গতির উত্তরাধিকার নিয়ে আমরা স্বাধীন হলাম, পৃথিবীর পঞ্চম বৃহত্তর রাষ্ট্রের নিয়ন্তা হলাম।

বক্তায়ার শাহ, কি ইলিয়াস শাহ কিংবা হুসেন শাহের যুগের তুলনায় আমরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের অলৌকিক ক্ষমতার অধিকার রাখি। তাই রাষ্ট্রের নিয়ন্তা যখন আমরা হলাম নানা সম্ভাবনার স্বপ্নে আমরা তখন

স্বাধীনতা। আমরা এক অমোঘ গণতান্ত্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ। স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার ইতিহাস—সুষ্ঠা আমরা পাক-ভারত উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জনসমাজের—অর্থাৎ বাঙালি জাতির বৃহত্তর অংশ। জাতিভেদ, শ্রেণীভেদহীন, শোষণ-পীড়নহীন এই স্বর্ণবিপ্লব সাধনের প্রতিশ্রুতি ছিল আমাদের : আমরা এক নতুন দেশ, নতুন জাতি, নতুন সমাজ ও সংস্কৃতির জন্ম দেব।

এর সঙ্গে তুলনা করলে সুলতানি যুগের মুসলিম শাসক সম্প্রদায়কে দেখি : একের পর এক যুদ্ধ-বিগ্রহে সর্বদালিপ্ত, ভবিষ্যৎ সমাজ বা সংস্কৃতি সম্পর্কে পরিকল্পনাহীন, স্থানীয় হিন্দু ভৌমিক শক্তির ওপর অর্থনৈতিক দিক দিয়ে নির্ভরশীল। তবু সেই শ্লাথগতির দিনে শাসকের এমন অস্থিরতা সত্ত্বেও কি করে সকালে এমন সহস্রাযু সমাজব্যবস্থা এবং সংস্কৃতির জন্ম হলো? অথচ আমরা কেন এই জ্ঞান বিজ্ঞানের যুগে সকল ক্ষমতা হাতে পেয়েও এত কল্পনা ও পরিকল্পনা সত্ত্বেও গত সতের বছর ধরে কোন কৃতির ক্ষেত্রেই সার্থক পদক্ষেপ করতে পারিনি? সর্বশেষ বিশ্লেষণে দেখা যায় আমরা সত্যিকারভাবে আমাদের সমাজব্যবস্থায়, আমাদের জীবন-যাত্রার পদ্ধতিতে উদ্ভিষ্ট পরিবর্তন করতে ব্যর্থ হয়েছি বলেই এমন হয়েছে।

‘সংস্কৃতির’ ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি বলেন : ‘সংস্কৃতি’ কথাটাকে এখানে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এবং সংস্কৃতির আলোচনা অর্থপূর্ণ হতে পারে শুধু যদি একে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করা হয়।

এই অর্থে সংস্কৃতি হচ্ছে মানুষের কৃতি বা কর্মের নিদর্শন। আমরা যখন প্রাচীনকালের মানুষের সংস্কৃতি অধ্যয়ন করি তখন কোন যুগের মানুষের সমাজব্যবস্থা, জীবিকার উপকরণ ও মানব সম্পদকে বিবেচনার মধ্যে গ্রহণ করি। সংস্কৃতি তাই সভ্যতার চাইতে প্রাচীন। সমাজ যখন গড়ে ওঠে, অর্থাৎ সভ্যতার গোড়াপত্তন হয়নি তখনও মানুষকে জীবিকার চেষ্টা করতে হয়েছে। নানাভাবে তার নিদর্শন রেখে গিয়েছে সে, যেমন আদিম মানুষের ইতিকথার গৃহচিত্র এক সাংস্কৃতিক উল্লেখ। এই অর্থেই এখানে আমরা গত সতের বছরের সংস্কৃতির কথা আলোচনা করব। এবং সেজন্যে আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের দিকে এক নজর তাকানো প্রয়োজন।<sup>২৫</sup>

বুলবুল ওসমান ‘ধর্মের সমাজতত্ত্ব’ শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছিলেন : ‘ধর্ম ও বিজ্ঞান সহাবস্থান করতে পারে কিনা এ সম্বন্ধে বলা যায় একই লোক বৈজ্ঞানিক আবার ধর্মীয় রীতিনীতিও মেনে চলে।’ এই একটি উদাহরণ থেকেই বলা চলে ধর্ম ও বিজ্ঞান সহাবস্থান করতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এরকম কতদিন চলবে?

সমাজতত্ত্বী দেশগুলো ধর্মীয় রীতিনীতি না মেনেই বেশ সুখে-স্বাস্থ্যে বাস করছে। তাছাড়া অসমাজতত্ত্বী দেশেও বহুলোক কোনরকম ধর্মীয় বিশ্বাস ছাড়াই জীবন যাপন করে। এ সব দেখে মনে হচ্ছে ধর্ম এক সময় বিজ্ঞানের কাছে সম্পূর্ণভাবেই মাথা নত করে দেবে। তবে প্রথা বা সংস্কৃতির অঙ্গ হিসেবে ধর্ম টিকে থাকলেও তা মোড় নেবে উৎসব ও অনুষ্ঠানে। পূর্বের সেই প্রার্থনার ভঙ্গী আর থাকতে পারে না। যাদু বিশ্বাস ও ধর্ম তখনি এসেছে যখন মানুষ প্রকৃতির বহু কিছু জানতে পারছে না এবং নিজেকে বড় অসহায় মনে করছে। কিন্তু বিজ্ঞান মানুষকে পৃথিবীর জাগতিক নিয়ম-কানুন সম্বন্ধে সৃষ্টি ধারণা দিয়ে আসছে। এখন মানুষ আর আগের মত শিশু নয়, ধর্ম যেন তাকে করে রেখেছিল দরজায় দাঁড়ানো ভিখিরীর মত। ভিখিরী তার কাছেই ভিক্ষা চায় সে যা চাচ্ছে যার কাছে তা আছে। কিন্তু সব মানুষের কাছে যখন আহাৰ্য বস্তু থাকবে তখন যেমন ভিখিরী ঝুঞ্জে পাওয়া যাবে না, বিজ্ঞানও যখন সবকিছুই মানুষকে দিতে পারবে তখন ধর্মের প্রয়োজনটা কোথায় থাকবে? বিজ্ঞানের পূর্ণতা প্রাপ্তির পরও মানুষের যদি কোন মানসিক শূন্যতাবোধ দেখা দেয় তা দাঁড়াতে দার্শনিক যোগে বা বিশ্বাসে। কারণ ধর্ম সৃষ্টির সময় মানুষ যে পর্যায়ে ছিল বিজ্ঞানের পূর্ণতাপ্রাপ্তির পর মানুষের সেই মনোভাব আশা করা বাতুলতা।<sup>২৬</sup>

প্রতিটি পৃষ্ঠা পঠনোপযোগী এবং আলোচনায়োগ্য রচনায়ত্তর সমকালের মত কোন সাহিত্য পত্রিকার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দিতে গেলে পর্যাপ্ত পরিসর প্রয়োজন। কিন্তু এখানে সে

সুযোগ নেই। তবে উদ্ধৃত রচনাংশ থেকে স্পষ্টতই সমকালকে উপলব্ধি বা বিচার করা সহজ হবে বলে ভাবতে কোনো দ্বিধা থাকা উচিত নয়। এসবে একথা নির্বিশেষ বলা যায় যে, সমকাল বাংলাদেশের সাহিত্য, জীবনদর্শন, কৃষ্টি ও চিন্তাধারার সমন্বয় সাধন করে একত্রে সব কিছুর নির্বিরোধ সংযোজন ঘটিয়েছে। সমকালের পাতাতেই ‘খাম্বুরাকি’ ছদ্মনামে জনৈক লিখেছিলেন :

সমকালই একমাত্র কাগজ যাকে ঘিরে এই হতাশাপ্লাবিত, ক্লান্তিভরা, উদ্দেশ্যবিহীন দেশে চলেছে কিছু সাহিত্যচর্চা। এছাড়া সমকাল এর পাতায় সম্প্রতি আমরা দেখতে পাচ্ছি, আমাদের জাতীয় ইতিহাসকে, সমাজসংগঠন ও রাজনীতির ধারাকে বুঝে দেখবার, বিষয়গতভাবে আলোচনা করবার একটা প্রচেষ্টা। এটা সৃজনী সাহিত্য না হলেও এর প্রয়োজন আজ অপরিণীম। কারণ এই পথেই ঘটতে পারে আমাদের আত্মজ্ঞান।<sup>২৭</sup>

বস্তুত এ উক্তিই অতিরঞ্জন কতোটুকু আছে তা অনুসন্ধানসাপেক্ষ।

### তথ্যপঞ্জি

১. গোলাম সাকলায়েন, আমাদের সাহিত্যপত্রিকা ও সাহিত্যিকগোষ্ঠী, সলোপ, জুন ১৯৭০, পৃ. ৭৮।
২. মোহাম্মদ আবদুল কাইউম, ‘পূর্ব পাকিস্তানের সাময়িকপত্র’, আমাদের সাহিত্য, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৬৯, পৃ. ২৪২-৪৩।
৩. হাসান হাফিজুর রহমান, ‘সংগত থেকে সমকাল’, আলোকিত গহ্বর, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭, পৃ. ৩৩-৩৫।
৪. হায়াৎ মামুদ, সিকানদার আবু জাফর, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮, পৃ. ৪৮-৪৯।
৫. আবদুল হক, ‘তিনি আজ ইতিহাস’, নিঃসঙ্গ চেতনা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৪, পৃ. ৯৬-৯৭।
৬. পূর্বোক্ত।
৭. আবুল ফজল, উত্তরাধিকার, সমকাল, ১৯ বর্ষ, ৭ সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৮৪।
৮. পূর্বোক্ত, সাহিত্যের সংকট, সমকাল ২ বর্ষ, ৬ সংখ্যা, মাঘ ১৩৬৫, পৃ. ৩৩২-৩৮।
৯. পূর্বোক্ত, ‘আমাদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার : একটি জিজ্ঞাসা’, পূর্বোক্ত, ৮ বর্ষ, ৩ সংখ্যা, কার্তিক ১৩৭১, পৃ. ২৪৯-৫১।
১০. আবদুল হক, রাজনীতি সাহিত্য ও সংস্কৃতি, সমকাল, ২ বর্ষ, ৯ সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩৬৬, পৃ. ৫৮২।
১১. আবু বায়তান, নির্বাচন চিন্তা : একটি দৃষ্টিকোণ, পূর্বোক্ত, ৮ বর্ষ, ৪ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৭১, পৃ. ৩২০-২২।
১২. আবদুল হক, নেতৃত্ব ও গণচেতনা, সমকাল ১৩ বর্ষ, ১ সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৭৬, পৃ. ১-৪।
১৩. সম্পাদকীয়, সমকাল, ১ বর্ষ, ১ সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৬৪, পৃ. ৬৯-৭২।
১৪. পূর্বোক্ত, ১ বর্ষ, ২ সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৬৪, পৃ. ১৫১।
১৫. আবদুল হক, তিনি আজ ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৮-৯৯।
১৬. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, জাফর ভাই, সমকাল ১৮ বর্ষ, নবপর্যায় ১ম সংখ্যা, মাঘ ১৩৮২, পৃ. ১৭।
১৭. আবুল কাসেম ফজলুল হক, বাংলাদেশের প্রবন্ধ সাহিত্য, ঢাকা ১৯৮৯, পৃ. ১৭।
১৮. আবদুল হক, ‘সমকাল এর ভূমিকা’, নিঃসঙ্গ চেতনা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, পৃ. ১০২-১০৪।

১৯. শামসুর রাহমান, 'বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা', সমকাল, ১১ বর্ষ, ১০-১২ সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ ১৩৭৫।
২০. ড. সৈয়দ সাঈদ হোসাইন, রবীন্দ্রনাথ ও পূর্বপাকিস্তান, সমকাল ৪ বর্ষ, ৯ সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৬৮, পৃ. ৬৭৫-৭৭।
২১. সৈয়দ আলী আহসান, 'বরীন্দ্রনাথকে', পূর্বোক্ত, পৃ. ৭১৭।
২২. সিকানদার আবু জাফর, 'সংগ্রাম চলবেই', সমকাল, ৮ বর্ষ, ৪ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৭১, পৃ. ২৭৬।
২৩. ড. কাজী দীন মুহম্মদ, পূর্ববাংলার সংস্কৃতি, সমকাল ১ বর্ষ, ১ সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৬৪, পৃ. ৩৫-৪১।
২৪. দ্বিজেন শর্মা, 'পূর্ববাংলার সংস্কৃতি' (বিতর্ক), সমকাল, ১ বর্ষ, ২ সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৬৪, পৃ. ১৩৭-৪১।
২৫. আবদুল গনি হাজারী, 'সংস্কৃতি চিন্তা', সমকাল, ৮ বর্ষ ৩ সংখ্যা, কার্তিক ১৩৭১, পৃ. ১৮৩-৮৪।
২৬. বুলবুল ওসমান, ধর্মের সমাজতত্ত্ব, সমকাল, ১০ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা, ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৭৩, পৃ. ৬১।
২৭. খানসুরাবি, সমকাল ৯ বর্ষ, ৯-১২ সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ ১৩৭৩, পৃ. ২৩০।



## ৪. পূবালী (১৯৬০-৬৭)

সাতচল্লিশ-একাত্তর পর্বে পূর্ববাঙলা থেকে প্রকাশিত সাহিত্য পত্রিকাগুলোর মধ্যে ‘পূবালী’ নাম করেছিল এবং সকল শ্রেণীর সাহিত্যিকর্মীর নিকটই আদৃত ছিল। বস্তুত প্রকাশের অব্যবহিত পরেই এই পত্রিকা জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছিল। এতে মিশেছিল দুটো বা তিনটে ধারা,—কারণ এর মালিক-প্রকাশক-সম্পাদক ছিলেন মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম, যিনি ওসমানিয়া বুক ডিপো (১৬/১৮ বাবুাজার ঢাকা ১)-র স্বত্বাধিকারী এবং পাকিস্তানের রাজনৈতিক অঙ্গনের প্রগতিশীল ধারার একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর চিন্তা ও কর্মে গৌড়ামী তথা পাকিস্তানী সংস্কৃতির পক্ষে অন্ধ সমর্থনদানের প্রবণতা ছিল না।

তবে এর বেতনভুক সহযোগী বা নির্বাহী-সম্পাদক ছিলেন কবি মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ। তিনি মাহেনও এর ও কর্মচারী এবং তমদ্দুন মজলিশ-দ্যুতি-সৈনিক প্রভৃতি সংগঠন ও সাময়িক পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ইসলামী, পাকিস্তানবাদী চিন্তানায়কদের সঙ্গে তাঁর আত্মিক সম্পর্ক ছিল। নিজস্ব বিচারে তিনি পূর্বপাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটির চিন্তা ও কর্মের সমর্থক ও অন্যতম প্রচারক ছিলেন।

ফলে পূবালীর সাহিত্য সংস্কৃতি ও সামাজিক চিন্তায় মিশ্রণ ঘটেছিল মানবতাবাদী প্রগতিশীল ধারার সঙ্গে ইসলামি পুনর্জাগরণবাদী চিন্তাধারার। পূর্ববাঙলার প্রধান লেখকদের রচনা এতে প্রকাশিত হয়েছিল, যাঁরা মতপথে বিভিন্ন ধারা ও দর্শনের সমর্থক ছিলেন। পত্রিকার মালিকের সুব্যবস্থিত প্রকাশনা-সংস্থা ছিল। তদুপরি লেখার জন্য পয়সা দেয়া হতো। অতএব বড় ও প্রতিষ্ঠিত লেখকদের পক্ষে বাস্তব কারণেই পূবালীর আমন্ত্রণ পরিহার করা সম্ভবপর ছিল না। কাজে-কাজেই দলমত নির্বিশেষে ভালোরচনার আধার হয়ে পূবালী মানবতাবাদী ধারার একটি পত্রিকার আসন করে নিতে সক্ষম হয়েছিল। সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির পত্রিকা এটি হয়নি।

সমকালও কোনো বিশেষ ‘রঙের’ প্রচারক হতে চায়নি। কোনো কোনো সমালোচক এটিকে সমকালের সঙ্গে প্রায় সমান মর্যাদার পত্রিকা হিসেবেও সেজন্মে উল্লেখ করেছেন।<sup>১</sup>

ডক্টর মুস্তাফা নূরউল ইসলাম এক সাক্ষাৎকারে বলেন : মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম চিন্তাচেতনায় উদারপন্থী ছিলেন। সত্তরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের এম.পি. হয়েছিলেন। অতএব অনুদারপন্থী ছিলেন না। যাঁরা হযরতের জীবনী ছাপেন, তাঁরা ‘পূবালী’ নামের পত্রিকা প্রকাশ করেন, বিষয়টি বুঝতে হবে ; চিন্তাটা দেশপ্রেমী।<sup>২</sup>

সাংবাদিক সিরাজউদ্দিন হোসেন, হাসান হাফিজুর রহমান, আবদুল গাফফার চৌধুরী, আবুল ফজল, আবদুল কাদির, আহমদ শরীফ, আবদুল গনি হাজারী, সরদার জয়েনউদ্দিন, শওকত আলী, মুনীর চৌধুরী, আনোয়ার পাশা, মুহাম্মদ এনামুল হক, শওকত ওসমান, ফররুখ আহমদ, জসীমউদ্দীন, মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ সকলেই পূবালীতে লিখেছেন।

পূর্ববাঙলায় প্রায় সাতটি বছর মাসিক হিসেবে নিয়মিত প্রকাশের পত্রিকার সংখ্যা খুব বেশি নেই। হাতে গোণাই বলতে হবে। এই হাতে গোণা পত্রিকার মধ্যে পূবালী অন্যতম। যুগ্ম

সংখ্যা মাঝে মাঝে প্রকাশিত হলেও প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা থেকে সপ্তমবর্ষ, সপ্তম সংখ্যা পর্যন্ত ধারাবাহিকতা বজায় রেখে পূবালী প্রকাশিত হয়েছিল। তন্মধ্যে প্রথম পাঁচটি বছরে অনিয়মিত হয়নি বলেই চলে। দুটি সংখ্যা (৪/৫-৬ ও ৫/৫-৬) মাত্র যুগু বের হয়। ফলে ৫ × ১২ = ৬০ - ২ = ৫৮টি পুস্তিকা বেরিয়েছিল পাঁচ বছরে। ষষ্ঠবর্ষে ৮টি পুস্তিকায় বর্ষ শেষ হয়েছে। সপ্তম বর্ষে ৪টি পুস্তিকায় সপ্তম সংখ্যা পর্যন্ত বেরিয়েছিল বলে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়। চৈত্র ১৩৭৩ পর্যন্ত বের হয়েই এর আয়ু শেষ হয় অর্থাৎ ১৯৬৭ সনের মার্চ-এপ্রিল নাগাদ দেশে গণতান্ত্রিক আন্দোলন আরম্ভ হয়ে গেলে ধীরে ধীরে সম্ভবত মালিক জনাব নূরুল ইসলামের সঙ্গে মতান্তর হয়ে থাকবে কবি মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ। কারণ দুজনের রাজনৈতিক বিশ্বাস দুধরনের হলেও রাজনৈতিক চর্চা দেশে আগে ছিল না বলে এক সঙ্গে কাজ করা সম্ভব হয়েছিল। পরে দেশে রাজনৈতিক কাজকর্ম পুনরুজ্জীবন লাভ করে। নূরুল ইসলাম হয়তো অন্য কাজেও ব্যস্ত বেশি হয়ে থাকবেন, ফলে পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায়। এইরকম একটা ধারণা সাহিত্যসমাজে চালু আছে যে, পূবালী ১৯৭০—৭১ পর্যন্ত চলেছিল, কিন্তু তা ঠিক নয়। সমকালের ১৩ বর্ষের শেষ সংখ্যায় একটি আলোচনায় পূবালী কে ‘অধুনালুপ্ত’ (২৫৭ পৃ. দৃষ্টব্য) পত্রিকা বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

সে যাই হোক ‘পূবালী’ নামের পত্রিকাটি বাঙালি জাতীয়তাবাদী ভাবধারার ছিল নামেই প্রমাণ। পূর্বীপূর্বী একটা ভাব পূবালী নামের মধ্যে অবশ্যই ছিল। উদ্দেশ্য ও প্রচেষ্টার মধ্যেও সাহিত্য ও সমাজসেবার খাঁটি একটা প্রেরণা ছিল, দেশের সমাজ সংস্কৃতি ও সাহিত্যিক পরিস্থিতির পরিবর্তন করে নতুন অবস্থায় উন্নতকরণের প্রেরণা এর সর্বত্রই লক্ষণীয়।

আশ্বিন ১৩৬৭ সেপ্টেম্বর ১৯৬০ সনে প্রকাশিত পূবালীর প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়ে তাঁদের এই উদ্দেশ্য অভিব্যক্তও হয়েছে। কিন্তু একটি মাসিক পত্রিকা নিয়মিত বের করা কি খুবই সহজ কথা? বিশেষ করে উর্দু ভাষার পত্রিকাগুলোকে সরকার যেখানে অযাচিত পৃষ্ঠপোষকতা দান করতে চায়, আর বাংলা ভাষার পত্রিকাগুলোর কঠোরোধ করার প্রচেষ্টায় যেখানে কোন গাফিলতি নেই, সেখান থেকে বাংলা মাসিক সাহিত্যপত্রিকা প্রকাশ করা এবং তাতে স্বাধীন সাংবাদিকবৃন্দের চরিতার্থতা সৃষ্টি এবং শিল্পস্রষ্টার নিরপেক্ষ উচ্চারণের অভিলাষ-অভিপ্রায় বাধাগ্রস্ত হবে সেটাই স্বাভাবিক। এই বেদনাঘন অনুভব পূবালীর দ্বিতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যায় প্রকাশকের নিবেদন-এও মূর্ত হয়েছে।

...‘গত এক বছর অদম্য প্রেরণা ও সাংস্কৃতিক স্পৃহা নিয়ে পূবালীকে সর্বাসীন বাধাবিপত্তি ও প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম করে পথ কেটে এগিয়ে আসতে হয়েছে। পূর্ব-পাকিস্তানের সৃজ্যমান সাহিত্য-সংস্কৃতির অগ্রগতির পথ রচনা এবং তার সুষ্ঠু বিকাশের ক্ষেত্র অবারিত করার দায়িত্ব নিয়েই পূবালী-র আত্মপ্রকাশ। গত এক বছর এ দায়িত্ব প্রতিপালনে পূবালী যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালিয়ে এসেছে। তার এ সংগ্রাম পূর্ব-পাকিস্তানের সাহিত্যিক, সংস্কৃতিসেবী ও সাহিত্যমনা পাঠকবৃন্দ অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতা দিয়ে এগিয়ে নিয়ে এসেছে। তাদের এ সমর্থনই পূবালীকে সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ ও পরিণামে সাফল্যমণ্ডিত করেছে। গত এক বছর ‘পূবালী’কে নানা ফ্রন্টে সংগ্রাম চালাতে হয়েছে। পূর্বপাকিস্তানের

সাহিত্যক্ষেত্রে রম্যতাপ্রয়াসী প্রচেষ্টা এবং হালকা সিনেমা পত্রিকার অব্যবহিত আত্মপ্রকাশের ফলে সুষ্ঠু সাহিত্য-সংস্কৃতিমূলক পত্রিকার অকালমৃত্যু প্রায় বিধিলিপি হয়ে দাঁড়িয়েছে। সিনেমা ও রম্যপত্রিকার রাজত্ব যেখানে একচ্ছত্র ও অব্যবহিত, সেখানে সাহিত্য-সংস্কৃতিমূলক পত্রিকার ক্ষীণপ্রাণতা কোন অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। কিন্তু পাঠক-রুচির নিম্নগামিতা বোধ করে তাকে সুষ্ঠু সাহিত্যের রসাস্বাদনে অভ্যস্ত করে তোলার দায়িত্ব দেশের সাহিত্যিক ও সুধীবৃন্দের।

প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

সাহিত্য সংস্কৃতির উপাদান হলেও সংস্কৃতির পরিপূরক ও পরিপোষক হিসেবে সাহিত্যের স্থান সর্বাপেক্ষে। ...তাহাড়া বুদ্ধিবৃত্তির সাথে এর অতি ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকায় মননশীলতার ক্রমবিকাশে সাহিত্য একান্তই অপরিহার্য। তবে প্রত্যেক দেশেই সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে সাহিত্যসৃষ্টি সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। তার উপর আবার রয়েছে ভৌগোলিক ও সামাজিক পরিবেশের প্রভাব; পারিপার্শ্বিক পরিবেশের প্রভাবকে উপেক্ষা করে সাহিত্য কোনখানেই গড়ে ওঠেনি বা গড়ে উঠতে পারে না। এর জন্ম ও পুষ্টি সবখানেই পরিবেশের নিয়ন্ত্রণাধীন। তাই সাহিত্য সৃষ্টির পরিবেশ যে এখনো আশানুরূপ অনুকূল হয়ে ওঠেনি, তা বলা নিশ্চয়ই অতিশয়োক্তি হবে না।

আমাদের পত্রিকাকে অবলম্বন করে সাহিত্যের ধারা প্রবাহিত হয় ও সাহিত্য বিকাশ লাভ করে। সাহিত্যের ধারাকে ঠিক পথে পরিচালিত করার দায়িত্ব সাময়িক পত্রপত্রিকাগুলোরই। আজাদী লাভের পর বহু পত্রপত্রিকা এখনো আত্মপ্রকাশ করেছে। এদের মধ্যে সবগুলোই যে ঠিকমতো টিকে আছে বা টিকে গেছে, তা নয়। কিন্তু একথা ঠিক যে এগুলির বর্তমান সংখ্যা প্রয়োজনানুপাতে নৈরাশ্যজনক নয়। এর উপর নতুন নতুন মাসিক, দ্বিমাসিক, পত্রিকা একটি দুটি করে ক্রমশ চালু হচ্ছে। তবে একথাও ঠিক যে যথাযোগ্যভাবে নিজে নিজে ভূমিকা-পালনের ব্যাপারে অনেক পত্রপত্রিকার ক্ষেত্রেই অভিযোগ ও পাশ্টা অভিযোগ শোনা যায়। এসবই অবশ্য কোন বিশেষ মতামতকে কেন্দ্র করে থাকার কারণে।

সাহিত্য সৃষ্টিতে কোন বিশেষ মতামতকে প্রশ্রয় ও প্রাধান্য দেওয়া উচিত কিনা, তা নিয়ে এক বিরাট মতভেদ রয়েছে। এ মতভেদের কোনদিন অবসান হবে কিনা, তা নিশ্চয় করে কেউই বলতে পারে না। কিন্তু এটা অনস্বীকার্য যে কোন পত্র-পত্রিকার পরিচালকদের মধ্যে আন্তরিকতার অভাব নেই। অভিযোগ যা শোনা যায় তা রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে। এখানে একদিকে যেমন অভিযোগ আছে, তেমনি আর একদিকে পাশ্টা অভিযোগও আছে। নিজে নিজে স্বাধীন মত প্রকাশে ও নিজে নিজে মত অনুযায়ী কোন বিশেষ ধারাকে অবলম্বন করার ব্যাপারে অন্ততঃ সাহিত্যক্ষেত্রে কোন প্রশ্ন না তোলাই আমরা যুক্তিযুক্ত মনে করি। কারণ, সাধারণ নীতিবোধ প্রত্যেকটি পত্রপত্রিকার কাছ থেকেই দেশবাসী আশা করে।

সাহিত্যক্ষেত্রে কোন বিশেষ দল বা গোষ্ঠীর অস্তিত্বের প্রতি গুরুত্ব না দেবার নীতি গ্রহণ করেই 'পূবালী'র আত্মপ্রকাশ। অন্যান্য সাময়িকীগুলোর সাথে মিলিতভাবে কাজ করে যাওয়াই আমাদের আন্তরিক বাসনা। তবে আমাদের আন্তরিকতা যতই থাকনা কেন, পত্রিকা হিসাবে পূবালীর সাফল্য নির্ভর করে আমাদের লেখক-লেখিকা ও পাঠকসমাজের সহানুভূতি ও সহযোগিতার উপর। আমাদের লেখক-লেখিকাদের কাছ থেকে সহানুভূতি ও সহযোগিতা পাবে এই আশা নিয়েই আমরা সাহিত্যসেবার ক্ষেত্রে অন্যান্য সাময়িকীগুলোর সাথে শরীক হবার সাহস করেছি।

সম্পাদকীয়তে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয় কতিপয় প্রতিষ্ঠানকে। এ থেকে কিছু লেখার উৎস সম্পর্কে জানা যায় : আমাদের এই প্রথম সংখ্যায় যঁারা লেখা দিয়ে আমাদের সাহায্য করেছেন, তাঁদের আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আমাদের ঢাকা বেতার কেন্দ্রের

কর্তৃপক্ষকেও আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ না জানিয়ে পারি না। মোহাম্মদ বরকতুল্লাহর 'বাংলা সাহিত্যে নজরুলের দান', আশকার ইবনে শাইখের 'কাব্যনাটকের সম্ভাবনা', আহমদ শরীফের 'লালনশাহ' ও সৈয়দা সুলতানা আরার 'জাতি গঠনের নারী' এই চারটি প্রবন্ধ প্রকাশের অনুমতি দেয়ায় আমরা সত্যি ঢাকা বেতার কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষের কাছে বিশেষভাবে ঋণী।<sup>৩</sup>

বলাবাহুল্য, ঐ চারটি প্রবন্ধ রেডিও কথিকা হিসেবে প্রচারিত হলেও সাহিত্যগুণ সম্পন্ন।

বলা হয়েছে পূবালী প্রকাশের পরে পরেই জনপ্রিয়তা লাভে ধন্য হয়েছিল। পত্রিকার পাতাতে এর পরিচয় আছে। প্রথম বর্ষ দশম সংখ্যার 'প্রকাশকের কথা'য় বলা হয় :

পূবালী বিদগ্ধজনের প্রশংসা ও অভিনন্দন লাভ করায় এও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, দলীয় গোষ্ঠী বা সংকীর্ণ শ্রেণীগত দৃষ্টিকোণ থেকে সাহিত্যপত্রিকার প্রকাশ অপেক্ষা সুস্থ জাতীয় মানসিকতা এবং সাহিত্যিক মূল্যমানের ভিত্তিতে সাহিত্যপত্রিকার প্রকাশই সকলের কাম্য। ... পাঠক পাঠিকাদের সুবিধার জন্য আমরা একটি বিশেষ কনসেশনের ব্যবস্থা করেছি। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী ১৮ টাকার স্থলে মাত্র ১৩.৫০ টাকায় তিন বৎসরের এককালীন গ্রাহক করা হবে। দেশে সুস্থ সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক মানসিকতা ও নতুন নতুন পাঠক সৃষ্টি করে বৃহত্তর সাহিত্য পরিমণ্ডল গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে এই ব্রত গ্রহণ করতে হয়েছে। দেশে সাহিত্যের অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলার জন্যই এই বৃহত্তর পাঠক পরিমণ্ডল গড়ে তোলা অপরিহার্য। এটাকে আমরা একটা জাতীয় দায়িত্ব বলেই মনে করি।<sup>৪</sup>

সাহিত্য সংস্কৃতি ও সমাজের অগ্রগতিতে 'পূবালী' বেসরকারি পর্যায়ে 'সাহিত্য-পুরস্কার'ও প্রবর্তন করে। 'লেখক সংঘ পত্রিকার কার্তিক ১৩৬৮ সংখ্যার সম্পাদকীয় থেকে জানা যায় :

পূবালী পত্রিকার সম্পাদক জনাব নূরুল ইসলাম সাহিত্যের উন্নতিকল্পে ~~বাৎসরিক~~ ১০০০ (এক হাজার) টাকার একটি পুরস্কার ঘোষণা করেছেন... এই শ্রেণীর বেসরকারি পুরস্কার পূর্বপাকিস্তানে এই-ই প্রথম। 'লেখক সংঘ পত্রিকার সম্পাদকীয় নিবন্ধে পূবালী কর্তৃপক্ষের এই নয়াব্যবস্থাকে স্বাগত জানিয়ে বলা হয় : পাকিস্তানে এতদিন এ ধরনের কোন পুরস্কার ছিল না। লীগ গভর্নমেন্ট কবি সাহিত্যিক বা শিল্পীদের প্রতি কোন দৃষ্টি দেবার প্রয়োজন বোধ করেনি। বর্তমান গভর্নমেন্টের (আইউব খাঁর) আমলেই লেখক ও শিল্পীর স্বীকৃতি পাওয়া শুরু করেছেন।' গুলীজনদিগকে খেতাব ও পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে। প্রেসিডেন্টস মেডেল ফর প্রাইড অফ পারফরমেন্স একটি উল্লেখযোগ্য সরকারি পদক। এই পদকের সঙ্গে পুরস্কার মিজব্বী শিল্পী বা সাহিত্যিককে প্রেসিডেন্ট ৫০০০ (পাঁচ হাজার) থেকে ২০,০০০ (বিশ হাজার) পর্যন্ত অর্থ-পুরস্কারও দান করেন।

সমগ্র পাকিস্তান রাইটার্স গিল্ডের চেম্বার 'আদমজী প্রাইজ' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। উর্দু ও বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার জন্য আদমজী হাউস প্রতি বৎসর ২০,০০০ (বিশ হাজার) টাকা পুরস্কার দান করছেন। সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে এতবড় মর্যাদাসম্পন্ন পুরস্কার আর নাই।

বলা বাহুল্য এই পুরস্কার দ্বারা লেখকদের মর্যাদা, শক্তি ও সম্ভাবনা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। এজন্য আদমজী পুরস্কারের কর্তৃপক্ষ নিঃসন্দেহে দেশবাসীর কৃতজ্ঞতার পাত্র। পাকিস্তান রাইটার্স গিল্ডের তরফ থেকেও প্রতি বছর এক হাজার টাকা মূল্যের পাঁচটি পুরস্কার দেবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।<sup>৫</sup>

বলা প্রয়োজন যাটের দশক সাহিত্য-পুরস্কার নিয়ে দলাদলি হানাহানি গালাগালি এবং তীব্র প্রতিযোগিতার যুগ ছিল। আইউব খানের মাথায় এটি আগে এসেছিল, নাকি তাঁর পশ্চিম-পাকিস্তানি সচিবদের মনে কথাটি বস্কে খুশি করার জন্যে তৈরি হয়েছিল তা আজ

আর জানার উপায় নেই। তবে এই অদ্ভুত কৌশলটি আইউব খান এর আমলে উদ্ভব ও ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে। পাকিস্তানবাদী লেখকচিত্তাবিদগণ সাহিত্যের উন্নতির জন্য ‘রাষ্ট্রীয় সাহায্য’ বিষয়টিকে শ্রদ্ধেয় ও সমাজের জন্য কল্যাণকর রূপে প্রচারের ব্রত গ্রহণ করেছিলেন।

পূর্বালীতে ‘পুরস্কার’ বিষয়ে অনেক লেখালেখি হয়েছে। পূর্বালী অবশ্য চেয়েছে আন্তরিকভাবে পুরস্কার-পৃষ্ঠপোষকতা-উৎসাহ দিয়ে শিল্পী সাহিত্যিকদের সৃষ্টিশীলতাকে লালন করতে অথবা পুষ্টি জোগাতে। আহমদ ফারুক, আনোয়ার আহমদ, ডক্টর সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন প্রমুখ ঐকালের সাহিত্য-পুরস্কারের নিয়ম-রীতি-দুনীতির সমালোচনা করে একটি সুস্থ সুন্দর নিয়ম প্রবর্তনের পক্ষপাতিত্ব করেছেন। এতে করে পূর্বালীর অভিপ্রায়টা বুঝা যায়। আর সেই কারণে ‘পূর্বালী’ও পাকিস্তান সরকার কর্তৃক পুরস্কৃত হয়েছিল। তৃতীয় বর্ষ দশম সংখ্যা (আষাঢ় ১৩৭০) ‘পূর্বালী’তেই জানা যায়।

পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য ও সংস্কৃতির উন্নয়ন এবং অগ্রগতিতে ‘পূর্বালীর বিশিষ্ট ভূমিকা ও অবদানের স্বীকৃতিরূপে সম্প্রতি পূর্বপাকিস্তান সরকারের জাতীয় পুনর্গঠন ব্যুরো ‘পূর্বালী’কে এক হাজার টাকার একটি পুরস্কার প্রদান করেছেন।

ডক্টর সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন ‘সাহিত্যে রাষ্ট্রীয় সাহায্য’ শীর্ষক প্রবন্ধে বলেন, এ বিষয়ে গত কয়েক বৎসর ধরে অনেক আলোচনা হলেও এ নিয়ে পৌনপুনিক আলোচনার প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না। ‘রাষ্ট্রীয় সাহায্য সম্পর্কে আজ যারা সন্দিহান তাঁদের প্রধান আপত্তি সাহায্যে নয়, সাহায্যের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্র যে নিয়ন্ত্রণাধিকার দাবী করে বসে সেটাতে। ... অনুন্নত দেশে যেখানে পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে শিল্পের অপমৃত্যু ঘটবার আশংকা রয়েছে। সেখানে রাষ্ট্রীয় সাহায্যের যৌক্তিকতা স্বীকার করে নেওয়া ছাড়া উপায়ে নেই। সমগ্র এশিয়া ও আফ্রিকায় আমরা এমনই একটা সংকটে পড়েছি। শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখবার আকাঙ্ক্ষা আমাদের অদম্য কিন্তু আমরা জানি কোন প্রকার রাষ্ট্রীয় সাহায্য না হলে শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখা মুশ্কিল হবে। এ সমস্যার কোন সর্বগ্রাহ্য সমাধান আছে কিনা সন্দেহ। তিনি বলেন,

আজকাল অনেক দেশে নানাভাবে শিল্পী ও সাহিত্যিকদের পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কোথাও কোথাও প্রতিশ্রুতিশীল লেখকদের ভাতা ইত্যাদি দিয়ে উৎসাহিত করার চেষ্টা হচ্ছে। এতে সাহিত্যের অকল্যাণ ঘটবার কোন সম্ভাবনা আমি দেখি না, যদি ঋণ এ সাহায্য বিতরণ করেন তাঁদের মধ্যে সাহিত্য ও শিল্পের প্রতি সত্যিকারের আনুগত্য থাকে। রাষ্ট্র প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে লেখকের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে পারে বলেই হস্তক্ষেপ করাটাকে রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে মেনে নিতে হবে এমন কোন কথা নেই।

...অপরপক্ষে রাষ্ট্রীয় সাহায্যে সাহিত্যের অবনতি ঘটবে বলে যে ধারণা সেটা কতদূর সত্য তা নির্ভর করে সাহিত্যিকের উপর। যে ব্যক্তি সরকারের সাহায্য লাভের প্রত্যাশায় শুধু প্রচার কার্য করেন তাকে সাহিত্যিক বলা যায় কিনা সন্দেহ। সাহিত্যের পবিত্রতা রক্ষা করার দায়িত্ব সাহিত্যিকেরই। আমরা সাধারণত আশা করি যে বিবেক বলে একটা বস্তু তার থাকবে। যদি তা না থাকে সেটা চরম দুর্ভাগ্যের বিষয়। তবে সেজন্য সম্পূর্ণ দোষ রাষ্ট্রের উপর চাপিয়ে দেওয়া কোনক্রমেই সমীচীন হতে পারে না।

...যে রাষ্ট্রীয় সাহায্যের যৌক্তিকতা সম্পর্কে যাদের উল্লাসিকতার অন্ত নেই তাঁরাই ব্যক্তিগতভাবে ও দলগত স্বার্থের খতিয়ে অথবা কখন কোন ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে সাহিত্যের কঠোরোখ করবার পক্ষপাতী। শিল্পী ও সাহিত্যিক নিজেরা যদি পরমত সহিস্কৃত্য বিশ্বাসী না হন তবে সে সমাজে শিল্পের অগ্রগতি ব্যাহত হবেই।

লেখকের অভিমত : আজ আমাদের সমস্যা রাষ্ট্রের সাহায্যের সত্তাব্য পরিণাম কি হতে পারে তা নয় ; কারণ এর কুফল কি হতে পারে বিশ্বের অনেক স্থানে আমরা দেখেছি, এ সম্বন্ধে কোন মতবিরোধের অবকাশ নেই। কিন্তু আমরা নিজেরা যদি সাহিত্য ও শিল্পের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি, তবে এই পরিণাম কখনও বাস্তব হয়ে উঠবে না। কারণ রাষ্ট্র সমাজে প্রবহমান চিন্তাধারার উপর ভিত্তি করে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার নীতি নির্ধারিত করেন। সাময়িকভাবে কোন কোন দেশে এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটলেও শিল্পের সাধনা সম্পর্কে এটাই হল শেষ কথা। পাকিস্তানে সাহিত্যে রাষ্ট্রীয় সাহায্য প্রয়োজন আছে। কিন্তু সাহিত্য যদি উন্মুক্ত ক্ষেত্রে এবং সজাগচিন্তে এই সাহায্য গ্রহণ করতে পারে, তাহলে আশংকার কোন কারণ নেই।<sup>১৬</sup>

পাকিস্তান আমলে সাহিত্য-পুরস্কারগুলো নিয়ন্ত্রিত হতো সরকারের্ষমা প্রবীণদের দ্বারা ; আর অধিকাংশ পুরস্কার প্রবর্তক ছিলেন কায়েমী স্বার্থের সপক্ষশক্তি। এখানে তাই অনিয়ম ছিল। এসবের সমলোচনা করে আহমদ ফারুক লিখেছেন :

‘সাহিত্য বিচারের ক্ষেত্রে বিভ্রান্তির ফলে যে মারাত্মক পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তার সুদূর প্রসারী প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে গোপালকৃষ্ণ আদিগার এর বরাতে বলেন, সরকারি উদ্যোগে একটি মাঝারি ধরনের বইকে শ্রেষ্ঠ বইয়ের সম্মান দেওয়ার অর্থ হল অকিঞ্চিৎকর জিনিসকে অসামান্য করে তুলে ধরা। এতে শুধু সাহিত্যশিল্পের ক্ষেত্রে যে এক ধরনের ভ্রান্তমানের সৃষ্টি হয়, তাই নয়, মূল্যবোধেরও চূড়ান্ত বিপর্যয় ঘটে। ফলে সাধারণ পাঠকের মনে একটি বই সম্পর্কে ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়। এ ধরনের বিভ্রান্তি ক্রমান্বয়ে ঘটতে থাকলে অবশেষে তা নিরোধ করা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে।

অবশ্য বর্তমানে আমাদের জন্যে সান্ধ্বনার কথা এই যে, কোন কোন ক্ষেত্রে সত্যিকার ক্ষমতাশীল ও প্রতিষ্ঠাবান সাহিত্যিককেও সাহিত্য পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রবীণদের তালিকা ফুরিয়ে গেলে স্বভাবতই অপেক্ষাকৃত তরুণ সাহিত্যিকদের পুরস্কার দানের পালা আসবে ; কিন্তু পুরস্কার প্রদানের ক্ষেত্রে বর্তমানে যে ঐতিহ্যের সৃষ্টি হয়েছে তাতে ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, তরুণ সাহিত্যিকেরা ভবিষ্যতে পুরস্কার লাভের আশায় যে কোন প্রচেষ্টা ও পন্থা অবলম্বন করতে দ্বিধাবোধ করবেন না, ফলে তাঁদের সামনে পুরস্কারের লোভটি বড় হয়ে দেখা দেবে, সৃজনশীল সাহিত্য প্রয়াস গৌণ হয়ে যাবে। কারণ, প্রবীণেরা যে পরিবেশে সাহিত্য-সাধনা করেছেন সেখানে সাহিত্যপুরস্কারের কোন লোভ ছিল না, তাঁরা প্রতিকূল পরিবেশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেই সাহিত্য সাধনা করেছেন।

কিন্তু বর্তমানের তরুণদের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ ধারণ করেছে। তাঁরা সাহিত্য-পুরস্কার প্রাপ্তির দিকেই তাঁদের সকল শিল্প-প্রয়াস নিয়োজিত রাখছেন। ... পুরস্কার পাওয়ার বিপদের চেয়েও আশঙ্কার বড় কারণ এই যে, একজন সত্যিকার সৃজনশীল লেখকও হয়তো পুরস্কারের লোভে যে কোন ধরনের রচনায় উদ্যোগী হয়ে উঠবে। ফলে তাঁর সত্যিকার অনুপ্রেরণার সৃষ্টির বদলে তিনি পণ্যব্যাশ্রয়ী রচনায় আত্মনিয়োগ করবেন এবং তখনই সাহিত্য পণ্যব্যাশ্রয়ী পরিণত হবে।<sup>১৭</sup>

ঋ. পত্রিকার নিয়মাবলীতে বলা হয় : প্রত্যেক বাংলা মাসের ৫ তারিখে পূবালী নিয়মিত প্রকাশিত হয়। চাঁদার হার বার্ষিক ছয় টাকা, ষান্মাসিক তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা। প্রতি সংখ্যা পঞ্চাশ পয়সা। 'পূবালী'র কার্যালয় ছিল, ৬৮ বেচারাম দেউড়ী, ঢাকা ১। সম্পাদক মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম কর্তৃক কালচারাল প্রেস ১৪-১৫ বাবু বাজার ঢাকা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হতো। নিজেউপ্রিন্ট কাগজে, পৌনে এগার ইঞ্চি x সোয়া আট ইঞ্চি সাইজে ৬৪, ৬৬, ৭০, ৭২ কিংবা ৮০ এবং বিশেষ সংখ্যায় ততোধিক পৃষ্ঠা থাকতো। 'প্রচ্ছদ' নিত্যনতুন উন্নত তবে পাতলা কাগজে ছাপা হতো। পরিচ্ছন্ন রুচিশীল পত্রিকা হিসেবেই 'পূবালী' প্রকাশিত হতো। এর প্রচ্ছদ শিল্পী ছিলেন পূর্ববাংলার প্রধান শিল্পীবন্দ। 'অঙ্গসজ্জা' বা 'অভ্যন্তরীণ অঙ্গসজ্জায়' ছিলেন বিভিন্ন সংখ্যায় আবদুর রউফ, আবদুস সবুর, মোহাম্মদ ইদ্রিস, দীপেন বসু, হাশেম খান, কাইয়ুম চৌধুরী, মোহাম্মদ আলী, আহমদ ফজলুল করীম, কালাম মাহমুদ, কাজী আবুল কাসেম, আশীষ চৌধুরী প্রমুখ এবং স্টুডিও পাশা। বিজ্ঞাপন তারা মোটামুটি ভালোই পেতেন। তাছাড়া নিজেদের প্রকাশিত বইয়ের বিজ্ঞাপন প্রকাশের একটা গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হয়েছিল এর প্রকাশক-মালিক সম্পাদকদের।

পূবালীর পৃষ্ঠায় বাংলাদেশের কবি সাহিত্যিক প্রাবন্ধিকদের অনেক রচনা প্রকাশিত হয়েছে। তৎকালে মোহাম্মদী-মাহেনও-দিলরুবা এবং সওগাত সমকাল কটিমাত্র মাসিক কাগজ ছিলো। 'নবগঠিত দেশের সৃজ্যমান সাহিত্য' গড়ে তোলার কাজে এগুলো পর্যাপ্ত ছিলো তা বলা চলে না। তাই পূবালীর পৃষ্ঠাতে লেখকদের আত্ম-প্রকাশের সুযোগ সৃষ্টির অবকাশ ছিলো এবং কালের, যুগের, দেশের দাবী ছিলো সাহিত্যসেবার জন্য এগিয়ে আসবেন দেশপ্রেমিক কর্মীবন্দ। বস্তুত পূবালী সেই দাবী মিটিয়ে ছিল। অনেক স্থায়ী মূল্যের কাব্য, কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটিকা, একাঙ্কিকা, কথিকা, আলোচনা, অনুবাদ-সাহিত্য এতে ছাপা হয়েছিল।

প্রতিমাসে প্রকাশিত সাহিত্যপত্রিকায় নানা শিরোনামে ছোটবড় যতো রচনা প্রকাশিত হয়েছিল, সেসবের বিবরণ বা পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। বিভিন্ন শ্রেণীতে বিন্যস্ত করে লেখক ও লেখার পরিচয় দিলে পত্রিকাটির ভূমিকা সম্পর্কে মোটামুটিভাবে সাধারণ একটি ধারণা গড়ে ওঠা সম্ভব। সেই বিবেচনাতে নিম্নে শ্রেণীবিন্যাসিত তথ্যাবলী উল্লেখ করা হলো। এতে দেখা যাবে অনেক লেখকই সকল শাখাতে বিচরণ করেছেন। মুক্ত হস্তে তাঁরা কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক লিখেছেন; পুস্তক-পরিচয় দিয়েছেন, বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনায় এবং অনুবাদকর্মে আত্মনিয়োগ করেছেন।

পূবালীতে কবিতা লিখেছিলেন :

বেগম সুফিয়া কামাল, আবদুল কাদির, শামসুর রাহমান, ফররুখ আহমদ, আহসান হাবীব, তালিম হোসেন, আবদুল হাই মার্শেরকী, মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, হাসান হাফিজুর রহমান, ফজল শাহাবুদ্দিন, এনামুল হক, আবদুর রশীদ খান, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, আবদুর রশীদ ওয়াসেকপুরী, ওমর আলী, দিলওয়ার, প্রজেক্টকুমার রায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আবদুল গাফফার চৌধুরী, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য, ইমরুল চৌধুরী, আতাউর রহমান, অতুল রঞ্জন দে, সাদিকীন, কে, জি, মোস্তফা, আসাদুল্লাহ খান গালিব, আহমদ সান্তার, মোহাম্মদ মামুন, জিয়া হায়দার, আল মাহমুদ, হাবীবুর রহমান, আবদুল মজিদ, আ.

ন. ম. বজলুল রশীদ, শহীদ কাদরী, মুস্তফা জামাল, হেমায়েত হোসেন, গোলাম রহমান, আলাউদ্দিন আল আজাদ, আবদুস সাত্তার, আনোয়ার পাশা, মোহাম্মদ মামুন, সুশীল কুমার গুপ্ত, আবু শাহরিয়ার, লতিফা হিলানী, আবু কায়সার, কায়সুল হক, শাহেদ আলী, সন্তোষ গুপ্ত, সৈয়দ শামসুল হক, আবু হেনা মোস্তফা কামাল, হামিদুজ্জামান খান চৌধুরী, বে-নজীর আহমদ, মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা, ময়হারুল ইসলাম, সঞ্জয় বড়ুয়া, নচিকেতা ভরদ্বাজ, আজহারুল ইসলাম, তরীকুল আলম, ওমর আবু রীশা, হায়াৎ মামুদ, আনোয়ার পাশা, রফিক আজাদ, জসীমউদ্দীন, ফতেহ লোহানী, সৈয়দ আলী আহসান, প্রশান্ত ঘোষাল, সেলিম সারওয়ার, আখতার হুসেন, রফিক আজাদ, শশাংক পাল, শহীদুর রহমান, ফারুক মাহমুদ, আবদুল কাদের, আখতারুল আলম প্রমুখ।<sup>৮</sup>

### গল্প লিখেছিলেন :

নাজমুল আলম, আশরাফউজ্জামান, মকবুলা ইউসুফ, আবদুল গাফফার চৌধুরী, খোরশেদ আনোয়ার জিলানী, সাদিকা সাইদ, শওকত ওসমান, মোয়াজ্জেম হোসেন, সরদার জয়েনউদ্দীন, আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, মীর আবুল হোসেন, আবদুস সাত্তার, মোহাম্মদ আজিজুল হক, সোফিয়া মিরজা, জ্যোৎস্নেন্দু চক্রবর্তী, ফজল শাহাবুদ্দিন, আবু ইসহাক, রাজেন্দর সিংবেদী, বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর, বুলদুল ওসমান, হামেদ আহমদ, সুধীর চৌধুরী, কাজী আবুল হোসেন, আবদুল হক, আবদুস সালাম, নূরুল ইসলাম খান, হুমায়ুন খান, আনিসুল ইসলাম, শওকত আলী, আশীষ কুমার লোহ, জিয়াউদ্দীন আহমদ, মমতাজ শিরীন, কলিম আনোয়ার, ইসহাক চাখারী, মনিরউদ্দিন ইউসুফ, নিত্যচক্রবর্তী, আহমদ রফিক, এ.টি. এম. আনিসুজ্জামান, আজিজুল হক, কাজী মুস্তাফিজুর রহমান, আতোয়ার রহমান, সিকানদার দারা শিকোহ, নির্মল চট্টোপাধ্যায়, এ. বাসির, এরশাদ হোসেন, কামাল বিন মাহতাব, হুমায়ুন কাদির, আমিনুজ্জামান, নূরউল আলম, আবদুল মান্নান খান, মবিনউদ্দিন আহমদ, মুস্তফা জামসীদ আহমদ, শাহেদ আলী, আশরাফ আলম, আমিনুল ইসলাম, অমৃত প্রীতম, মিরজা আ.মু. আবদুল হাই, মোজাম্মেল সিদ্দিক, সেলিমউদ্দিন আহমদ, আতাউর রহমান, ওমর আলী, দিলওয়ার, আবদুল হাই মালেরকী, মুহাম্মদ আজিজ, আবু শাহরিয়ার, হাসান আজিজুল হক, আবদুল মওদুদ, মীর নূরুল ইসলাম, কলিম আনোয়ার, লুৎফর রহমান, রাহাত খান, আবদুল আজিজ আল নোমান, গোলাম রব্বানী খান, কাজী আবদুল আলীম, রাবেয়া খাতুন, জ্যোতিষপ্রকাশ দত্ত, মাহবুব তালুকদার, টিপু সুলতান, আবদার রশীদ, রশীদ হায়দার, মুহাম্মদ সফিকুল্লাহ, সৈয়দ শামসুল হক, মানিক চৌধুরী, আফাজউদ্দিন আহমদ, গোলাম আব্বাস, মাহবুবুল আলম, মসিহউদ্দিন শাকের, আকান্দাস সিরাজুল ইসলাম, মোনাজাতউদ্দিন, সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ, দিলারা হাশেম, আবদুল মান্নান সৈয়দ, মীজানুর রহমান, হেমায়েত হোসেন, হুমায়ুন আজাদ, আহমদ হুফা, আবুল এহসান, মোহাম্মদ আলী, লায়লা সামাদ, আবুল হাসানাত, কামরুল আহসান, আবু আল সাদ্দী, আবুল হাসান শামসুদ্দীন, উঁইয়া বজলুর রহমান, সৈয়দ মুর্তাজা আলী, সৈয়দ আলী নকী, জাফর আলমগীর, আশকার ইবনে শাইখ, আ.ন.ম বজলুর রশীদ, আজিজুল হক, বেগম মুসলিমা সালাম প্রমুখ।<sup>৯</sup>

পূর্বালীতে অনেক গল্প ছাপাহয়। গল্প প্রবন্ধ ও গদ্য তাঁরা যত্ন করে ছাপাতেন। ফলে গদ্য সাহিত্য বিকাশে পূর্বালীর প্রশংসা না করে উপায় থাকে না। এতে যঁারা প্রবন্ধ লেখেন, তাঁরা হলেন :

- \* অরুণকুমার সরকার—কবি নজরুল (পুনর্মুদ্রণ চতুরঙ্গ থেকে, ৬/৮) ;
- \* অমিয় চক্রবর্তী—কবিতার চরিত্র (২/৬) ;
- \* আবুল ফজল—ব্যক্তিগত (৪/৫-৬) ;
- \* আবদুল কাদির—কোহিনূর (২/৪) ; অনুবাদক নজরুল (২/৩) ; মোজাম্মেল হকের কাব্যে স্বজাতিপ্রেম (৪/৯) ; ফররুখ আহমদের কাব্যনাটিকা ও সনেট কাব্য (৪/১০) ; পৃথিসাহিত্যে মানবতা (৬/৪) ; হাজী শরীয়তুল্লাহ (৫/৭) ; সাহিত্যে প্রগতি (অভিভাষণ, ৫/৮) ; বাংলা



- সাহিত্যে মুসলিম চিত্র (৬/১-২) ; সাহিত্য সাময়িকীপ্রসঙ্গে (৪/৪) ; একটি জটিল ও মহৎ চরিত্র (৪/৯) ;
- \* আবুল কালাম শামসুদ্দীন—জননেতা ফজলুল হক (২/৯) ; আলীগড় আন্দোলন (৩/১১) ; সাহিত্যপরিক্রমা (৪/১০) ; মোজাম্মেল হক (৫/৯) ; আমাদের নাট্যসাহিত্য (৫/১০) ; সংস্কৃতির পুনর্গঠন (৬/৩) , কংগ্রেস ও ভারতীয় মুসলমান (৬/৪) , আমাদের উপন্যাসে জীবনবোধ (৬/৬) , 'হাতেম তায়ী' (৬/৮) , বাংলাভাষায় নয়া শব্দ (৭/১) , পাকবাংলার মনন (১৩৫১ সনের অভিজ্ঞতা, ৭/২-৩) ;
  - \* আহমদ শরীফ—লালন শাহ (১/১) ; বাংলা সাহিত্যে আধার যুগের ইতিকথা (১/৬) ; রূপবান-রূপবতী উপাখ্যান (২/৬) ;
  - \* আসকার ইবনে শাইখ—কাব্যনাটকের সম্ভাবনা (১/১) ; ভুল মুহূর্ত (২/১১)
  - \* আবদুল মওদুদ—ইসলামী জীবনাদর্শ ও মুসলিম রাষ্ট্র (১/২) ; মুসলিম বিজ্ঞান চর্চার নবমূল্যায়ন (১/৩) ; গালিব ও আঠারশ সাতান্ন (১/৫) , ইত্যাদি।

অনুবাদেও ছিল পূর্বালী বিশিষ্ট। কিছু অনূদিত রচনার খবর দিই :

- \* মিউ হসী—প্রাচীন চীনা কবিতা (অনুবাদক আহমদ শামীম, ৬/৬) ;
- \* মিকাইল যোশিংকো—গায়ের কুটুম্ব (গল্প, অনুবাদক মোহাম্মদ নাসির আলী, ৪/৭) ; নারী চরিত্র (অনুবাদকের নাম নেই, ৪/১২) ;
- \* রাজেন্দ্র সিংবেদী—ভোলা (গল্প, অনুবাদক আমিনুল ইসলাম, ১/৬) ;
- \* রেনে ফ্রেয়ার—চলচ্চিত্রের গোড়ার কথা (প্রবন্ধ, অনুবাদক ফজলুল করীম, ১/১২) ;
- \* রবার্ট ফ্রস্ট—কাস্তে : অশ্বটুভাষা (কবিতা, অনুবাদক আহমদ ফারুক, ৩/১২) ; আরও কবিতা (হেমায়েত হোসেন অনূদিত, ৪/১১ ও অন্যান্য) ;
- \* রাজা নবাব আলী খান—মারিফুমাগমাত (প্রবন্ধ, অনুবাদক মকসুদুর রহমান হিলানী, ৪/২ থেকে ধারাবাহিক) ;
- \* লরেন্স সাজেক্ট হল—ডোবা পাহাড় (গল্প, অনুবাদক আতোয়ার রহমান, ১/৩) ;
- \* লেসলি পল—টি.এস. এলিয়ট : একটি সাক্ষাৎকার (প্রবন্ধ, অনুবাদক আফজল চৌধুরী, ৫/১১) ;
- \* শেঞ্জপীয়র—কবিতা (অনুবাদক সন্তোষগুপ্ত, ৫/৩) ;
- \* শেন সুও ওয়েন—বন্দর (গল্প, অনুবাদকের নাম নেই, ৪/১) ;
- \* সুধীন এন ঘোষ—রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর চিত্রকলা (অনুবাদক হায়াৎ মামুদ, ৬/৭) ;
- \* সাদত হাসান মাস্টো—আইনের রক্ষাকবচ (নাটিকা, অনুবাদকের নাম নেই, ৩/৯) ; কালো নেকাব (গল্প, অনুবাদক মোহাম্মদ আজিজুল হক, ৪/৮) ;
- \* স্টানলি ম্যারন—ঐতিহ্যের গুরুত্ব (প্রবন্ধ, অনুবাদকের নাম নেই, ২/৪) ;
- \* স্টিফেন ক্রোন—কবিতা (সেলিম সারওয়ার অনূদিত, ৬/৪) ;
- \* সাজেইভাসেনৎ সেভ—উপকথা (অনুবাদকের নাম নেই, ১/১০) ;
- \* সার্জি এনতোনভ—আদেবন (গল্প, ফাউজুল কামাল অনূদিত, ৪/৩) ;
- \* হাল (রুবাইয়াৎ-ই-হাল) —কবিতা (অনুবাদক আবুল ফজল, ১/১২ ও অন্যান্য) ;
- \* হায়াৎ দারাজ খান পাকিস্তানী—কবিতা (অনুবাদকের নাম নেই, ৩/১১) ;
- \* হার্বার্ট রীড—১৯৪০ এর একজন সৈনিকের প্রতি (কবিতা, অনুবাদক আহমদ শামীম, ৩/৮) ;
- \* হাফিজ (রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ)—কবিতা (আবদুল হাফিজ অনূদিত, ৬/৮ থেকে ক্রমশ) ;
- \* হাজেরা মাসরুর—ছাই (গল্প, অনুবাদক মোহাম্মদ আজিজুল হক, ৩/১০)
- \* হায়াশি ফুমিকো—আশয় (গল্প, অনুবাদক আতোয়ার রহমান, ৪/২) ;

- \* হুসান আল খতিব—আধুনিক আরবী সাহিত্য : প্যালেস্টাইন ট্রাজেডি (প্রবন্ধ, অনুবাদক মীজানুর রহমান, ৫/৮) ;

‘পুস্তক পরিচয়’ এর তালিকার দিকে তাকালে দেখা যায় তৎকালে প্রকাশিত প্রধান পুস্তকাবলীর পরিচয় পূর্বালীতে তুলে ধরা হয়েছিল। সমালোচনা করেন দেশের তৎকালীন প্রধান লেখকগণ। তবে সমকালের ন্যায় এর মান সব সময় উন্নত নয়। যেখানে শক্তিশীল সৃজনশীল লেখক সমালোচনা করেছেন, সেখানেই কেবল আলোচনা ‘সাহিত্য’ হয়ে উঠেছে। কিন্তু অনেকাংশই এর কেবল ‘পুস্তক-সমালোচনা’ বা ‘পুস্তক-পরিচয়’। ‘সমালোচনা সাহিত্য’ও কুচিৎ মেলে। যাই হোক তালিকাটা নিম্নরূপ :

- \* আবদুল কাদির—‘শিবির জীবনের দিনগুলি’ আজহারুল হক প্রণীত ; ‘জর্জ ওয়াশিংটন’ কার্ডার এ্যানাটেরী হোয়াইট রচিত আবু হেনা মোস্তাফা কামাল অনুদিত ফ্রান্সলিন পাবলিকেশনস্ এর সহযোগিতায় বুক সোসাইটি প্রকাশিত (৪/১১) ;
- \* আবুল ফজল—‘গালিভারের সফরনামা’ আবুল মনসুর আহমদ সম্পাদিত (১/২) ; মতিয়র রহমান খান গ্রন্থাবলী (১/৪) ;
- \* আবদুল মান্নান—‘নজরুল সাহিত্য’ মীর আবুল হোসেন সম্পাদিত (১/১) ;
- \* আহমদ জাফর—‘জীয়ন কাঠি খলিল চৌধুরী প্রণীত (১/২) ;
- \* আবদুল মোমেন—‘আফ্রিকার হৃদয়ে সূর্যোদয়’ আজাদ সুলতানা সম্পাদিত (১/১০)
- \* আলম কোরায়শী—‘নৌফেল ও হাতেম’ (২/৪) ;
- \* আবুল কালাম শামসুদ্দীন—‘অনুরাগ’ ইমাউল হক প্রণীত (৩/২), ‘ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান’ আবু জাফর শামসুদ্দীন প্রণীত (৪/৩) ;
- \* আবু হেনা মোস্তাফা কামাল—‘ছায়া হরিণ’ আহসান হাবীব প্রণীত (৩/২) ; ‘চন্দ্রধীপের উপাখ্যান’ আবদুল গাফফার চৌধুরী প্রণীত (৩/৩) ; ‘এক আকাশে অনেক তারা’ লতিফা হিলালী প্রণীত (৩/৪) ;
- \* আবদুল মওদুদ—‘মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরীর পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনাবলী’ (৪/১১) ; ‘মেঘবরণ কেশ’ ইসহাক চাখারী প্রণীত (৩/৩) ; A short History of Islam by Syeed Fayyaze Mahmud (২/৩) ;
- \* আবদুল হক—‘মনু বর্ণালী’ জহরুল হক প্রণীত (৪/১২) ; ‘দুর্গম গিরি কান্তার মরু’ ও ‘মানুষের নামে’ (৫/১) ;
- \* আবু জাফর—‘অগ্নিদিনের বর্মা’ জিতেন ঘোষ প্রণীত (৫/১২) ;
- \* আবদুর রফিক সন্যামত—‘তালাক’ আবুল কাসেম প্রণীত (৫/২) ; ‘সীমান্তের চিঠি’ ইব্রাহীম খলীল প্রণীত (৫/৪) ; প্রভৃতি।

পূর্বালীতে ফররুখ আহমদের পুরস্কারপ্রাপ্ত কাব্য ‘হাতেমতায়ী’ (১/২) এবং কয়েকটি নাকট যেমন— : মুনীর চৌধুরীর ‘চিঠি’ (৩/৭ থেকে ক্রমশ) ; আবদার রশীদের ‘দরবেশ’ (মলিয়রের অনুসরণে, ৩/১১ থেকে) ; আবুল ফজলের ‘স্বয়ম্বর’ (৪/২ থেকে ক্রমশ) ; জিয়া হায়দার প্রণীত ‘শুরু নেই শেষ নেই’ (৫/১১) ; জ্যোতিপ্রকাশ দস্তের ‘যেখানে যেতে চাই’ (৬/৬) ; সৈয়দ আবদুস সুলতানের ‘যেখানে যেতে চাই’ (৬/৬) ; আবদুল মান্নান সৈয়দের একাধিক ‘একটি ভীষণ খেলা’ ; ইব্রাহীম খাঁর ‘মায়ের বুলি’ (৭/৬-৭) ; মাহবুব

তালুকদারের কাব্যনাটক ‘দুই হাতে দুই’ (৬/৩) ; নজরুল হকের ‘ইয়ারমুকের যুদ্ধ’ (৬/৯-১২) ; হেনরিক ইবসেনের অনুবাদে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর ‘বুনো হাঁস’ (৪/৫-৬) ; আফাজউদ্দিন আহমদ প্রণীত ‘উপবন’ (৪/৯ থেকে) এবং বিশ্বসাহিত্য থেকে আরও কতিপয় নাট্য-সাহিত্য অনুবাদ করে পূবালীতে ছাপা হয়েছে।

লুৎফর রহমান প্রণীত কিংবদন্তী ‘তিতাস বাঁকের উপাখ্যান’ (৪/১ থেকে) ছাপা হয়েছে। বেগম সুফিয়া কামালের স্মৃতিকথা ‘একালে আমাদের কাল’ (৫/১ থেকে ক্রমশ) এবং সাদত আলী আখন্দের ‘যখন দারোগা ছিলাম’ (৫/১ থেকে ক্রমশ) ছাপা হয়। ভ্রমণ কাহিনীগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য শামসুল আলমের ‘পথে প্রান্তরে’ (৫/৭ থেকে) ; আবদুল ময়্যানের ‘আমার দেখা গণচীন’ (৬/৫ থেকে) ; আনিসুল ইসলামের ‘উপন্যাসের রেঙ্গুন’ (৪/৫-৬ থেকে) ; ‘শ্বেতহস্তীর দেশে’ (৪/৮ থেকে) ; সৈয়দ আবদুস সুলতানের ‘সুদরের চিঠি’ (৪/৫-৬ থেকে) ; মতিনউদ্দিন আহমদের ‘হৃদয় দিয়ে দেখা’ (৪/১) ; বিশ্বেশ্বর চৌধুরীর ‘জীবন নদীর বাঁকে’ (৭/১) পূবালী প্রকাশ করে।

আশরাফউজ্জামান রচিত ‘বিভাস্ত’ (১/১ থেকে ক্রমশ) ; আবু জাফর শামসুদ্দীনের ‘ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান’ (১/৮ থেকে ক্রমশ) ; আবদুর রাজ্জাককৃত ‘কালান্তর’ (১/১০ থেকে) ; শওকত আলীর ‘পিঙ্গল আকাশ’ (২/৭) ; শামসুদ্দীন আবুল কালাম প্রণীত ‘জীবন-যৌবন’ (৩/২ থেকে) ; কলিম আনওয়ারের ‘বহি সীমাস্ত’ (৩/২ থেকে ক্রমশ) ; নির্মল চট্টোপাধ্যায় এর ‘হায়েনার হাসি’ (রহস্যোপন্যাস, ৩/৯ থেকে ক্রমশ) ; আবু শাহরিয়ার এর ‘মুখরিত প্রাঙ্গণ’ (৪/৫-৬) ; হুমায়ুন কাদিরের ‘নির্জন মেঘ’ (৩/৬) ; মীর আবুল হোসেনের ‘বিসর্পিল মন’ (৬/৪ থেকে ক্রমশ) ; ‘বিপনীমন’ (৬/৬ থেকে) ; ‘পথ আঁকা বাঁকা’ (৫/৫-৬) ; এবং আনোয়ার পাশার ‘নীড় সন্ধানী’ (৬/১-২ থেকে ক্রমশ) ; মোহাম্মদ আবদুল আজিজ এর ‘গায়ের নাম পলাশপুর’ (৫/৮ থেকে ক্রমশ) ; মাহবুব উল আলমের ‘মোমেনের জবানবন্দী’ (৫/১০ থেকে ক্রমশ) ইত্যাদি উপন্যাসেও পূবালীতেই ছাপা হয়েছিল।

বিভিন্ন বিভাগীয় আলোচনা নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছে ; তাতে সম্পাদকীয় কর্মীরা অথবা নিয়মিত কলামিস্টগণ বিভিন্ন ছদ্মনামে লিখেছেন নানাধরনের বিষয় নিয়ে। সমসাময়িক কালকে এবং সমকালের আলোচিত বিষয়গুলোকেই তাঁরা প্রকারান্তরে এসকল আলোচনার মাধ্যমে নথিভুক্ত করেছেন। ফলে এগুলোতে সমাজের চিন্তাচর্চার পরিচয় পাওয়া যায়। সমকালের ঢাকা শহর এবং বাংলাদেশের তৎকালীন সংস্কৃতি চর্চার খবরাখবরও তাই এতে পাওয়া যায়। চলচ্চিত্র, নাটক, সভা-সমিতির বিবরণসহ এ সকল আলোচনা ঐতিহাসিক মূল্য লাভ করেছে।

নিয়মিত বিভাগের মধ্যে ছিল চিকিৎসা বিজ্ঞান, খোলা জানালা, কথা প্রসঙ্গে, চিত্রকলা প্রসঙ্গে, ঢাকায় থাকি, আলোচনা, বেতার জগৎ, বিশ্বপরিভ্রমণ, রঙ্গরূপ, সংস্কৃতি সংবাদ, মাঠে ময়দানে বিজ্ঞান বিচিত্রা ইত্যাদি। এগুলোর লেখকের ছদ্মনাম ছিল ‘চিকিৎসক’,

‘দৃষ্টিবান’, ‘মল্লিনাথ’, ‘রূপকার’, ‘নাগরিক’, ‘বহুব্রীহি’, ‘পরিব্রাজক’, ‘বহুরূপী’, ‘দর্শক’, ‘ইবনে সিনা’ ইত্যাদি। এসব বিভাগে স্বনামেও লিখেছেন অনেকে। ঐদের মধ্যে উল্লেখ্য :

মকসুদ চৌধুরী, মকসুদ জামিল, ফখরুজ্জামান চৌধুরী, সেলিম চৌধুরী, কাজী লুৎফর রহমান, কাজী আফসারউদ্দীন আহমদ, শফিকুর রহমান, আহমদ ফারুক, আহমদুজ্জামান, আখতারুজ্জামান, মুহম্মদ আবু তাহের, আবদুল মওদুদ, বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর, আলম কোরাযীশী, আমিনুর রহমান, বুলবুল ওসমান, শামসুল আবেদীন, সৈয়দ শাহ জাহান, মুস্তাক আহমদ, মোশারফ হোসেন, অনিল কুমার রায়, আনোয়ার এনায়েতুল্লাহ, ফওজুল করীম, শাহবুদ্দীন আহমদ, আজিজুল করীম, মাহমুদ আলম বেগ, শওকত আলী, ইবনে জামান, মীর আবুল হোসেন, মোহাম্মদ আজরফ, এস. এম. হাবীবুর রহমান, আফসারুল্লাহ, ফজলুল করীম, জয়নাল আবেদীন, মকসুদুর রহমান হিলালী, মোরশেদা হক, আবুল কালাম মোস্তফা, এস.সি. ভৌমিক, আহমদ জামাল, মাকিদ হায়দার, রশীদ হায়দার, আমিনুল ইসলাম, সিদ্দিক জামাল, সৈয়দ রেদওয়ানুর রহমান, বেবী আনওয়ার, আবু কায়সার, অধ্যক্ষ আবুল কাসেম, জাবিদ জামাল, মেত্রেয়ী দেবী (ভারতের সাম্প্রদায়িকতা প্রসঙ্গে পু. মু.) খোন্দকার আলী আশরাফ, মুনীর চৌধুরী, নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান, মোহাম্মদ মাহফুজুল্লাহ, হোসেন মনসুর, মীজানুর রহমান, এ.টি.এম. শামসুদ্দীন, হায়াৎ মামুদ, আবদুল কাদির প্রমুখ।

সাহিত্যের উন্নতির লক্ষ্যে পূবালী কেবল অসংখ্য কবিতা, গল্প, উপন্যাস প্রকাশ করেছে কেবল তাই নয়, সমাজের বহুবিধ সমস্যা নিয়েও গুরুতর আলোচনা ছেপে পরিস্থিতি-পরিবর্তনের চেষ্টা করেছে। ভারতীয় বইয়ের পুনর্মুদ্রণের হিড়িক দেশ বিভাগের পর পূর্ববাংলার সৃজ্যমান সাহিত্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করছিলো এবং এদেশের লেখকদের সাহিত্য প্রয়াসকে কোনরূপেই উৎসাহিত করা হচ্ছিলো না। নিতান্তই গাঁটের পয়সা খরচ করে, ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর মতো অবস্থায় কিছু কিছু লেখক সাহিত্য সৃষ্টির ধারাকে সচল রেখেছিলেন বলেই পূর্ববাংলার সাহিত্যসৃষ্টির প্রয়াস স্তব্ধ হয়ে যায়নি।

প্রকাশক-পাঠকদের সক্রিয় সচেতন প্রয়াসে পৃষ্ঠপোষকতায় লেখকগোষ্ঠী পূর্ণ মর্যাদা বা মূল্যের বিনিময়ে সন্তুষ্টি বা আত্মতৃপ্তি নিয়ে এদেশের সাহিত্য স্রষ্টাদের সাধনার পরিচয় খুব কমই পাওয়া গেছে, সেকারণে কালজয়ী সাহিত্য ও সৃষ্টি হয়েছে খুবই কম। এই বিষয়ে তখনকার সাহিত্যসমাজে সচেতনতা জাগলেও কোনো কার্যকর পরিবর্তন ঘটেনি। তবু তাঁরা যে এগিয়ে এসেছিলেন সমস্যা সমাধানের জন্য, তার মূল্য অপরিসীম।

ভারতীয় বা বিদেশী পুস্তকের আমদানী বা পুনর্মুদ্রণকে ঝাঁরা সমর্থন করেন, তাঁরা যে সাহিত্য সংস্কৃতির প্রকৃত উন্নতির কথা স্মরণে রেখেই বলেন, তা নয়—নানা স্বার্থতাড়িত হয়েও তাঁরা কথা বলে থাকেন। পক্ষান্তরে বিদেশী বই আমদানীকে যে-কোনো কারণে বন্ধ করলেই যে সাহিত্যপরিস্থিতির অগ্রগতি ঘটবে এটাও ঠিক নয়। সাম্প্রদায়িকতা তাড়িত হয়েও অনেকে বিদেশী তথা ভারতীয় বই আমদানীর বিপক্ষে বলে থাকেন। এটাও সমর্থনযোগ্য নয়। প্রকৃতপক্ষে দেশের সাহিত্যপরিস্থিতির উন্নতি কিসে ঘটবে—সে বিষয়ে গভীর আন্তরিক আলোচনা-গবেষণা ও কর্মপন্থাই কাম্য।

এ বিষয়ে পূবালীতে কিছু আলোচনাও হয়েছে, কাজী দীন মুহম্মদ এবং সিরাজুদ্দীন হোসেনের ‘কালকাতার বইয়ের পুনর্মুদ্রণ’ এবং ‘বিদেশী পুস্তকের অবাধ আমদানী ও পুনর্মুদ্রণে আমাদের সাংস্কৃতিক প্রতিক্রিয়া’ বিষয়ের আলোচনা এখানে উদ্ধৃতি যোগ্য।

পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিশের উদ্যোগে বাংলা একাডেমীতে ১৯৬৩ সনে এ বিষয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করা হলে তাতে ঐরা এগুলো পড়েছিলেন। সিরাজুদ্দীন হোসেন পাকিস্তানে বাংলা সাহিত্যের গৃহ প্রকাশের অধোগতির কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেন—‘এর কারণ কি?’ জবাবে লেখক নিজেই বলেন,

কারণ খুবই সহজবোধ্য। খ্যাত-অখ্যাত নির্বিশেষে কোলকাতীয় লেখকদের পুনর্মুদ্রিত সংস্করণে বাজার ছেয়ে যাবার পাশাপাশি দেশী লেখকদের বইর প্রকাশকের অভাব।

কবিতার বইর কলেবর ছোট হওয়ায় কবি কষ্টে সৃষ্টে ধার-কর্জ করে হলেও নিজের বই নিজে ছেপে বের করে কবিতার বইর তালিকা ঠিক রেখেছেন, কিন্তু গল্প-উপন্যাসের বেলায় লেখক তা পারেননি, বা পারছেন না। বছর দুতিন আগে নামমাত্র মূল্যে পাণ্ডুলিপি দিয়ে মাত্র দুচারজন প্রকাশক মিলত, তাঁরও আজ হাত গুটিয়েছেন বা গুটাবার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। আজ কপিরাইট সমেত পাণ্ডুলিপি বিক্রয় করতে গেলেও দেশী লেখকের পক্ষে প্রকাশক পাওয়া দুসাহ্য। কেননা, পুনর্মুদ্রিত কোলকাতার বই দিয়ে একশ্রেণীর প্রকাশক যেভাবে বাজার ছেয়ে ফেলেছেন, তাতে সংস্কৃতি সচেতন, অপেক্ষাকৃত স্বল্পবিত্ত প্রকাশকের পক্ষে কতখানি আর ঝুঁকি নেয়া সম্ভব।

স্বভাবতই তাঁদের কেউ কেউ প্রকাশনা ক্ষেত্র থেকে হাত গুটিয়েছেন। কেউ বা কেবল পুস্তক-বিজ্ঞেতার ভূমিকা নিয়েছেন, আবার কেউ কেউ অবাধ বিস্ময়ে বাজারের ভাবগতি দেখছেন। আর লেখকসমাজ! প্রয়োজনীয় অর্থানুকূলের অভাবে প্রকাশকের কারচুপিতে স্ত্রী-পুত্র পরিজনের ইহ ও পারলৌকিক উভয়বিধ কল্যাণের খাতিরে সাহিত্য-সাধনার মোহ বিসর্জন দিয়ে কেউ খবরের কাগজে, কেউ কোন সেরেস্তায় আবার কেউবা মাষ্টারীর খাতায়, আর নয়তো নিদেনপক্ষে বিদেশী কোন কোম্পানিতে নাম লিখিয়ে মোটা কাপড়, মোটা ভাত ও মরণের পর কাফনের কাপড়টুকু সংস্থানের নিশ্চয়তা বিধান করছেন।’

পুনর্মুদ্রণের সপক্ষ লোকেরা বলে থাকেন, ‘বইয়ের গুণাগুণ বিচারের ভার যখন পাঠকেরই ওপরে এবং এদেশের পাঠকরা যখন কোলকাতার লেখকদের বই-ই পছন্দ করেন, তখন সে বইর পুনর্মুদ্রণে আপত্তি কি? তাঁরা এমনও বলেন, আমাদের দেশে যখন নামকরা লেখক কেউ নেই বা কেউ লিখতেই জানে না, তখন যে ভাষায় আমরা কথা বলি, সেই ভাষার সাহিত্য যখন হাত বাড়ালেই পাওয়া যায়, তা নিতে দোষ কি?’

এ প্রশ্নের জবাবে সিরাজুদ্দীন হোসেন বলেন প্রকৃত প্রস্তাবে অসৎ উপায়ে ব্যবসায়ীরা যা করেন,—তা ‘না বলিয়া লইলে চুরি করা হয়।’ কপি রাইট আইনের বালাই না থাকায় নজরুল ইসলামও কি কম চুরি অর্থাৎ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন? তাছাড়া

‘অনুমতি যদি পেয়েই থাকেন, পেলেন কিভাবে? বিনামূল্যে শত শত বইর স্বত্ত্ব পাওয়ার ব্যাপারটি কি সত্যিই বিশ্বাসযোগ্য? যদি বিনামূল্যেই তা পেয়ে থাকেন, তবে তার মাজেজা কি? একটি স্বাধীন দেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে এভাবে অবাধ অনুপ্রবেশ কি একেবারেই অর্থহীন? ঢাকার যে কটি প্রকাশক... রাতারাতি মুনাফার পাহাড় গড়ছেন, জাতীয় সাহিত্য ও জাতীয় সংস্কৃতির তাৎপর্য বুঝবার মত চেতনা তাঁদের আছে কি? ... আজ হোক কাল হোক তাঁরা তার... মাসুল আদায় দিতে গিয়ে আকষ্ট বন্ধক দিয়েও পাকিস্তান কি ত্রাণ পাবে?’

ব্যবসায়ীদের বক্তব্য উদ্ধৃত করে লেখক বলেন, তাদের আর এক কথা—‘মুসলমানের ঘরে আবার লেখক পয়দা হয় নাকি? পয়দা হয় না ঠিকই, তবে... মুসলমান প্রকাশকদের নিজ সন্তান ছেড়ে অন্যের সন্তানকে কোলে টেনে নেয়ার বদ অভ্যাস

... তাঁরা ভুলে গিয়েছেন যে, বিভাগ-পূর্ব যুগে ভারতীয় সাহিত্যিকদের মধ্যে কম-বেশি একই ক্রাতারে দাঁড়িয়ে অনেক মুসলমান কবি ও সাহিত্যিক তদানীন্তন ভারতের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হয়ে বিরাজ করেছেন। আজও তাঁদের মধ্যে যে কজন সৃষ্টিধর্মী কবি সাহিত্যিককে প্রতিনিয়ত চোখের সামনে দেখি, তাঁদের কথা তুলেই বলতে চাই, সৈয়দ মুজতবা আলী, আবু সয়ীদ আইউব, হুমায়ূন কবির, আবুল মনসুর আহমদ, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, কবি গোলাম মোস্তফা, জসীমউদ্দীন, ফররুখ আহমদ, আহসান হাবীব, শওকত ওসমান, আবুল ফজল আজও বেঁচে আছেন। এঁদের সবাই মুসলমান ঘরের সন্তান। সাহিত্য ক্ষেত্রে এঁরা সবাই কম-বেশি সমসাময়িক। কিন্তু দেশ বিভাগের পর এঁরা কে কোথায়? সৈয়দ মুজতবা আলী আজ ভারতের জাতীয় অধ্যাপক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত; আবু সয়ীদ আইউব আজ ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় প্রকাশনা দফতরের অধিকর্তা, হুমায়ূন কবির ভারত সরকারের সংস্কৃতি ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা দফতরের মন্ত্রী। অর্থাৎ, ভারতের রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রেই বলুন, আজও সর্বত্র বরণ্যে, সর্বমহলে শ্রেণ্যে। আর এদিকে? যে কজন কবি ও সাহিত্যিকের নাম করেছি, সরকারি মহলে তাঁরা করুণার পাত্র। প্রকাশকের দরবারের উপেক্ষিত, সমাজ-জীবনে একরূপ অপরিচিত, অনাদর ও উপেক্ষায় আজ তাঁরা বলতে গেলে সাহিত্যসমাজ থেকে নির্বাসিত। সরকারি অঙ্গনতো দূরের কথা, এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূত্রি অঙ্গনে প্রবেশের অধিকারও এঁদের নেই। এক যাত্রায় দুই ফল—এর কারণ কি? কারণ আমাদের প্রকাশক মহল, কারণ আমাদের সরকার, কারণ আমাদের সমাজ।

সিরাজুদ্দীন হোসেনের আলোচনায় সমাজ ভাবনার এবং সমাজের একটি চিত্র আছে বলেই কথাগুলো উদ্ধৃত করা হলো। তিনি লিখেছেন :

বস্তুত বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীই আজ আমাদের প্রতিভার মাপকাঠি। তাই রাষ্ট্রীয় জীবনে সাহিত্যিকদের আজ স্থান নেই। অর্থনৈতিক জীবনে অ-প্রতিষ্ঠিত বলে প্রকাশক মহলে আজ তাঁরা উপেক্ষিত, করুণার পাত্র। তাই যখন দেখি, এদেশেরই কোন লেখক সাংসারিক দায় নির্বাহের জন্য নগদমূল্যে বিক্রির জন্য পাণ্ডুলিপি হাতে প্রকাশকের দ্বারে দ্বারে ঘুরছেন, আর ছমাস বা এক বছরের পরিশ্রমের মূল্য প্রকাশক সাহেব দেড় থেকে দুশো টাকার ওপরে দিতে রাজী নন, তখন বেদনায় কার না মন মুষড়ে?... আসলে... যে কোন জাতির জীবনে কবি সাহিত্যিকদের আসন সর্বোচ্চ। একমাত্র এঁরাই সর্বমহলে শ্রদ্ধার পাত্র।

আর আমাদের দেশে? অশ্রদ্ধা, অবজ্ঞার পাত্র যদি কেউ থাকেন, তা এঁরাই—এদেশের কবি সাহিত্যিকরা। ভুললে চলবে না যে, জীবনের সর্বক্ষেত্রে এবং বিশেষ করে সাহিত্য সাধনার ক্ষেত্রে অনুশীলন, উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতাই সবচেয়ে বড় কথা। শিশু যেমন জন্মেই হাঁটতে শিখেনা, হাতে খড়ির আগে সে যেমন লিখতে বা পড়তে পারে না, অন্য্যন্য সকল ক্ষেত্রেও তেমনি, অনুশীলন ছাড়া কোন ক্ষেত্রেই কারও প্রতিষ্ঠা পাওয়া সম্ভব নয়। আর সে অনুশীলনের ব্যাপারে চাই উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতা। বিভাগপূর্ব আমলে শুনতাম মুসলমানরা আবার দেশ শাসন করবে কি? মুসলমানরা শিল্প-বাণিজ্যেরই বা বুঝে কি? দৈনিক আজাদ? — সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে ওতো একটা দুর্ঘটনা মাত্র। সেদিনকার সে চিন্তাধারা, সে যুক্তিজাল সত্ত্বেও বিভাগোত্তর জীবনে দেখা গেল, মুসলমানরাও রাষ্ট্র পরিচালনা করছে, শিল্প-বাণিজ্যেও তারা প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে।

দৈনিক আজাদের পাশে আরও কত কত দৈনিক আজ প্রথমশ্রেণীর সাংবাদিকতায় নজীর প্রতিষ্ঠা করেছে। অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, বিভাগোত্তরকালে জীবনের সর্বক্ষেত্রে এদেশের মানুষকে প্রতিষ্ঠিত করতে সরকার নানাভাবে উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতা যুগিয়েছেন... স্বীকার করতে শেষ নেই... এদেশের প্রকাশনা শিল্প কোনদিনই সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা পায়নি। অথচ, প্রকাশনা শিল্পই জাতীয় জীবনের একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ বলে দেশে দেশে পরিগণিত... আর আমাদের দেশে প্রচার বিভাগেরই এককোণে চলচিত্র ও প্রকাশনা বিভাগ নামে নামমাত্র একটা বিভাগ রয়েছে। এঁরা কি প্রকাশ করেন বা করেছেন; জানা নেই!..

দায়িত্ব তাঁদের মন্ত্রীদের পিছু পিছু দৌড়ান আর সময়ে অসময়ে তাঁদের ছবি ছাপা। আর কি তাঁদের কাজ, কি তাঁদের দায়িত্ব, তা কেবল সরকারই জানেন।... সরকারের পৃষ্ঠপোষকতার অভাবেই এদেশের প্রকাশনা-শিল্প মার খেয়েছে... পুস্তক প্রকাশনা ক্ষেত্রের এই অনাচার সম্পর্কে নিজ উদ্যমে আইন প্রণয়ণের তাগিদবোধের কোন কারণ তাঁদের আছে বলে মনে হয়না। তাই বলে দেশের জনমত বলতে কি কিছুই নেই?

আলোচক জাতীয় স্বার্থে পরিশেষে, এদেশের প্রকাশকরা যাতে জাতীয়-সংস্কৃতি চেতনায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার তাগিদ বোধ করে, এদেশের ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকীদের শেষজীবনে যাতে পত্রিকার মাধ্যমে খয়রাতি তহবিল খুলতে না হয়, এদেশের কবি শাহাদাৎ হোসেনদের যাতে চাকুরীর আশায় দ্বারে দ্বারে ঘুরে শেষ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে গিয়ে শোচনীয় দারিদ্র্যের মধ্যে না মরতে হয়, মৃত্যুর আগে ঔষধের পয়সা যোগাড় করতে এদেশের মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীদেবর যাতে মাত্র ১০ টাকায় প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি বিক্রয়ের আশায় পত্রিকা অফিসের দ্বারে দ্বারে ধনা দিতে না হয়, এদেশের রমেশশীলদের জন্য পত্রিকার পৃষ্ঠায় যাতে সাহায্যের আবেদন জানাতে না হয়, এদেশের শহীদ সাবেরদের যাতে বিনা চিকিৎসায় উন্মাদ হয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ডাষ্টবিন থেকে কুঁড়িয়ে খেতে না হয়, তার জন্য অবিলম্বে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাগুলো গ্রহণের সুপারিশ করেন ;

### প্রস্তাবাবলি

- ক. জাতীয় সাহিত্য গড়ে তুলবার নিশ্চয়তা বিধানের জন্য অবিলম্বে আইন করে অননুমোদিত ও প্রভাৱণাপূর্ণপন্থায় বিদেশী বইয়ের পুনর্মুদ্রণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করতে হবে।
- খ. সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবকাশ সৃষ্টির জন্য বিদেশীপুস্তক আমদানী-নীতি প্রয়োজন হলে আরও কিছুটা শিথিল করে সাহিত্যপুস্তক আমদানীর কোটা কিছুটা বাড়তে হবে। আর কুরূচিপূর্ণ হালকা পত্রপত্রিকা আমদানী বন্ধ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন মত পাঠ্যপুস্তক আমদানীর নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। বলা বাহুল্য, আমদানী-নীতি বেগুণে হালকা পত্রপত্রিকার ওপর টাকা প্রতি চার আনা বাট্টা থাকায় আমদানীকারকগণ পাঠ্যপুস্তকের পরিবর্তে হালকা পত্রপত্রিকা আমদানীকেই নীতি হিসেবে গ্রহণ করেছেন। ফলে, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক ছাত্র নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক ছাড়াই তাঁদের বার্ষিক পরীক্ষায় বসতে বাধ্য হন।
- গ. জাতীয় সংস্কৃতি চেতনায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার প্রেরণা যোগানো ও পুস্তক প্রকাশনায় অধিকতর আগ্রহী করে তোলার জন্য স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য-বহির্ভুক্ত দেশী লেখকের সাহিত্যপদবাচ্য পুস্তক-পুস্তিকাকে অন্ততঃ দশ বছরের জন্য আয়কর মুক্ত ঘোষণা করতে হবে। বর্তমানে পুস্তক শিল্পের ওপর শতকরা ৩০ থেকে ৩৫ টাকার মত আয়করের যে বিধান রয়েছে, তা সামগ্রিকভাবে এই শিল্পের মূলে কুঠাঘাতই করছে।
- ঘ. অন্যান্য শিল্পের মত পুস্তক-প্রকাশনা শিল্পকে ও শিল্পোন্নয়ন ব্যাংকের ঋণ প্রাপ্তির যোগ্য ঘোষণা করতে হবে।
- ঙ. প্রকাশনা-শিল্পের অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য প্রতি বছর কিছু কিছু প্রকাশককে বিদেশে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে।
- চ. আমদানী ও নিয়মিত পদ্ধতিতে বিদেশী পুস্তকের পুনর্মুদ্রণের প্রশ্নে পুস্তকের গুণাগুণ যাচাইর জন্য সরকারী তত্ত্বাবধানে একটি কেন্দ্রীয়-সংস্থা গঠন করতে হবে। বাংলা একাডেমী বা অন্য কোন সংস্থাকে এই মর্যাদা দেওয়া যেতে পারে।
- ছ. স্থানীয় স্বল্পবিত্ত প্রকাশক, লেখক মুদ্রাকর মিলে কেরালার অনুকরণে একটি সমবায়িক প্রকাশন-প্রতিষ্ঠানও গড়ে তোলা যেতে পারে।

ডক্টর কাজী দীন মুহাম্মদ ‘জাতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির সংকট কালে’ বিদেশী পুস্তকের অব্যাহ আমদানী ও পুনর্মুদ্রণে আমাদের সাংস্কৃতিক প্রতিক্রিয়ার আলোচনায় বলেন, পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ধাক্কায় সমাজের গতি ভিন্ন দিকে মোড় নিয়েছে ‘এবং এখন থেকেই সুব্যবস্থা না করতে পারলে এর ফল সুদূরপ্রসারী হবে সন্দেহ নেই।’ তিনি বলেন, বিদেশী উপাদান

আমাদানীর দরকার অবশ্যই আছে, কিন্তু গৃহণের আগে বাছাই করতে হবে। আর বিদেশের সবকিছু থেকে জ্ঞানের বস্তু কাজের বস্তু গৃহণীয় বস্তু যাচাই করে বাছাই করার ভার পাঠকসাধারণের ওপর ন্যস্ত করা কখনও বুদ্ধিমত্তার কাজ হবে না। বিনা নির্বাচনে অবাধে বিদেশীমাল আমদানী যেমন দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোতে ঘা দেয়, ঠিক তেমন বিদেশী সাহিত্য ও পত্রপত্রিকার অবাধ আমদানীর ধাক্কা গোটা সাংস্কৃতিক জীবনের বুনিয়াদে লেগে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। ফলে আমাদের সামাজিক ধর্মীয় ও নৈতিকজীবনের ধারা যায় বিফল হয়ে।

সৈনিক (৮ই জুন ১৯৫৬) থেকে পূর্বালী পুনর্মুদ্রণ করেছিল ডক্টর মাহফুজুল হকের একটি প্রবন্ধ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক মাহফুজুল হক ১৯৬৬ সনের ২ ফেব্রুয়ারি ফরিদপুরে এক মর্মান্তিক হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় নিহত হন। সম্পাদকীয় নোটে বিশেষভাবে বলা হয়, ‘আমাদের ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে... বক্তব্যের সারবস্তা আজকের দিনেও নিঃশেষিত কিংবা তাৎপর্যহীন হয়ে পড়েনি।’ এই নোটে বস্তুতপক্ষে পূর্বালীর দৃষ্টিকোণ প্রতিফলিত হয়েছে বলে তাঁদের সংস্কৃতি-চিন্তার স্বরূপ অনুধাবনের জন্য প্রবন্ধটির সারাংশ সংকলিত করা হল :

ভারতীয় মুসলমানদের পাকিস্তানদাবীর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট (দ্বিজাতিতত্ত্ব অনুযায়ী) বিশ্লেষণ করে লেখক বলেন, ‘পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরেই আমাদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে যে জীবন-স্পন্দন পাওয়া যাচ্ছিল তাতে স্বভাবতই আশা জেগেছিল যে, প্রাকস্বাধীনতা যুগের সে স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে। যেকোন আন্দোলনের প্রথম স্তরে সাধারণত একটু বাড়াবাড়ি পরিলক্ষিত হয়—এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হল না। পূর্ব পাকিস্তানের নতুন সংস্কৃতির পুরোধা হিসেবে যারা সেদিন সামনে এসে দাঁড়ালেন, তাঁদের কাছে আরবি হরফ ও উর্দু শব্দের আমদানীই একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াল। অন্যদিকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দেশের শাসন ভার যাদের হাতে ছিল, তাঁরা সবখানেই নিজেদের সুবিধামাফিক ইসলামের নাম ভাঙ্গিয়ে গোষ্ঠীগত স্বার্থ হাসিল করছিল।

...কিন্তু নব আজাদীর আন্দোলনসব থেকে যেতে না যেতেই ভাষার প্রশ্নে দারুণ মতভেদ ও দেশব্যাপী বিক্ষোভ জেগে উঠলো। সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রথম পদক্ষেপে বাধা পেয়ে পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যে গানে ও রাজনৈতিক সভাসমিতিতে ভাষার লড়াই চলল দীর্ঘ দিন ধরে। ...ভাষা-আন্দোলনের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক চেতনা নতুন পথে এগিয়ে চলল। রাষ্ট্র-ভাষা আন্দোলনের পরবর্তী দুবছর পূর্ব-পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক জীবনে যে প্রশ্নটি বড় হয়ে দেখা দিল, তা হচ্ছে ভাষার প্রশ্ন। রাষ্ট্রীয় জীবনে ইসলামী আদর্শকে রূপায়িত করা তো দুরের কথা, জনসাধারণের মৌলিক দাবী ও অভাব-অভিযোগের প্রতিকারে ব্যর্থ হয়ে সরকার গণ-সমর্থন হারিয়ে বসল। সংগে সংগে তাদের প্রচারিত ইসলামী রাষ্ট্রের জিগির জনসাধারণের কাছে হাস্যস্পন্দ এক রাজনৈতিক শ্লোগান ছাড়া আর কিছুই মনে হল না।

রাষ্ট্রীয় জীবনের এই ব্যর্থতার চেউ এসে লাগল আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে। ইসলাম, মুসলিম লীগ, সরকার-তিনটিই এখনও বাধক হয়ে পড়ল। তাই যে জীবনাদর্শ সামনে রেখে



পাকিস্তান আন্দোলন করা হয়েছিল, আমাদের শিল্প-সাহিত্যে তার প্রতিফলন করাকে প্রতিক্রিয়াশীলতা বলে একদল প্রচার শুরু করলেন। দুর্ভাগ্যবশত যাদের মুখে তখন সেই জীবনাদর্শের জয়গান শুনা যেত, তাদের প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকা মূল আদর্শ ও তার বিশ্বাসীদের সম্পর্কে এক বিরাট ভুল ধারণার সৃষ্টি করে। সুবিধাবাদী শ্রেণীর ব্যর্থতা ও ভিন্ন আদর্শের বিশ্বাসীদের অপ্রচারের ফলে আমাদের সংস্কৃতিসেবীদের মনে দেখা দিল অনিশ্চয়তা ও আত্মবিশ্বাসের অভাব। অন্যদিকে পশ্চিম বাংলা থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকায় দেশভাগজনিত আতর্নাদ এবং অখণ্ড সংস্কৃতির জয়গান এদেশের তরুণ সম্প্রদায়ের মনে দারুণ এক দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। তাই অনেকেই কোলকাতাকেন্দ্রিক বিভাগ-পূর্ব সংস্কৃতিকে আর্কড়িয়ে ধরে প্রগতিশীল (?) শিবিরে জায়গা করে নেয়ার প্রচেষ্টায় লেগে গেলেন।

পূর্বপাকিস্তানের সাংস্কৃতিক জীবনে আজ এমনি এক অনিশ্চয়তা, লক্ষহীনতা ও আদর্শের অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে, আমাদের শিল্পী সাহিত্যিকদের সামনে আজ কোন স্পষ্ট পথ নেই, তাদের নেই কোন বলিষ্ঠ মত। ও পথের অনিশ্চয়তা আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনের বর্তমান স্থবিরতা ও বন্ধ্যাত্বের জন্য দায়ী। একদল শিল্পী সাহিত্যিক সোজা পথ হিসেবে পশ্চিম বাংলার নেতৃত্ব মেনে নিশ্চিত্তে বসে আছেন, তাঁদের বক্তব্য বাংলা সংস্কৃতি এক ও অখণ্ড। পশ্চিমবঙ্গের শিল্পী সাহিত্যিকেরা যা লিখছেন বা বলছেন, তার চেয়ে উন্নততর কিছু সৃষ্টি করা পূর্ব পাকিস্তানী শিল্পীসাহিত্যিকদের পক্ষে সম্ভব হবে না।

... তাঁদের কাছে যুক্তি ও মর্যাদাবোধের চেয়ে অন্ধভক্তি ও হীনমন্যতাই বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু (পশ্চিমবঙ্গের) বহুতে যে রুচি ও সংস্কৃতির পরিচয়... যে মত ও পথের ইংগিত করা হয়েছে, তা কোন দেশপ্রেমিক পূর্ব পাকিস্তানী... মেতে নিতে পারবেন? ... কাজেই তাঁদের রচনায় আমাদের জীবনধারাকে পুরোপুরি রূপায়িত হতে দেখার আশা বাতুলতাই হবে। ... আর একদল লেখক আছেন, যাঁরা নিজেদের লেখায় ইসলামী ভাবধারাকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে Revivalism কেই আদর্শ হিসেবে ধরে নিয়েছেন। কিন্তু দেশের মাটি হতে যে সাহিত্য রস সংগ্রহ করতে পারেনা, দেশের লোকের কাছে তা কোনদিনই আকর্ষণীয় হয়ে উঠেনা এবং তা করে কোনদিনই মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি করা সম্ভব নয়।

কোন শিল্পকর্মে শূন্য মননশীলতাই সার্থক সৃষ্টির একমাত্র লক্ষণ নয়, তার সঙ্গে প্রয়োজন বাস্তবতার। ... দুর্ভাগ্যবশত এদলের লক্ষ্য পরিষ্কার থাকলেও তাদের রচনায় বর্তমানকালের প্রতিফলনের অভাব পরিলক্ষিত হয়, কেবল অতীতের পুনরুদ্ধারের কথাই তাঁরা বারবার বলে থাকেন। ভুলে গেলে চলবে না যে, ঐতিহ্যহীন সাহিত্যসৃষ্টির কথা বাতুলতা মাত্র। অতীত ঐতিহ্যকে বাদ দিতে গেলে আমাদের সাধনা হবে ব্যর্থ এবং জাতির অগ্রগতিও পদে পদে হাঁচট খাবে।

জাতির বর্তমান সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন অতীতের কাঁধে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এবং বর্তমান অবস্থাকে মূলধন করেই ভবিষ্যৎ গঠিত হবে। আমাদের বর্তমান সাংস্কৃতিক জীবনকে অতীত থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে তা হবে মস্ত বড় ভুল। অতীত

ভাবধারার ক্ষীণতম স্রোত আজও আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনের প্রাণকেন্দ্রকে বাঁচিয়ে রেখেছে। কাজেই নতুন সাংস্কৃতিক জীবন সৃষ্টি করতে চাইলে পুরাণকে অবজ্ঞা করলে নিজের পায়ে কুড়াল মারা হবে।

একথাও মনে রাখতে হবে যে, এক যুগের শিল্পরীতি অন্যযুগের যথাযথ সমাজচিত্র আঁকতে অক্ষম। কারণ সমাজটা স্থিতিশীল নয়... গতিশীল। তাই সমালোচনার কষ্টি-পাথরে যাচাই করে যেটুকু মহৎ শিল্পের অন্তর্ভুক্ত কেবল সেটুকু নিয়ে বাকীটুকু বর্জন করে চলাই হবে সংস্কৃতিসেবীর কাজ।

আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, শরৎচন্দ্রের প্রভাব থাকবেই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে... মুসলিম লেখকের রচনায় যে ভাবধারা ও জাতীয়তাবোধের পরিচয় পাই, তার থেকে নিতে হবে প্রেরণা ও আদর্শ। কিন্তু তাই বলে আমরা পুনর্জাগরণের কথা বলছি না। অতীতকে মূলধন করে নতুন সৃষ্টির প্রচেষ্টাই আমাদের উদ্দেশ্য। ...ঐতিহ্যের গোড়া কাটার ফল যেমন মৃত্যু, তেমনি অতীতে ফিরে যাবার পথ আত্মলুপ্তির পথ ছাড়া আর কি?

ভৌগোলিক অবস্থিতি ও ধর্মীয় অনুভূতি দুটোই আমাদের জীবনে অঙ্গঙ্গীভাবে জড়িত। আমরা একদিকে বাঙালি, অন্যদিকে মুসলমান। ... সামাজিক মূল্যবোধ ও যুক্তিবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত যে জীবনাদর্শ আমাদের লক্ষ্য, তার পথে জনসাধারণকে এগিয়ে নেয়াই হবে আমাদের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য।... ভাষা সম্পর্কে এক কথায় পাক-বাংলার জনসাধারণের মুখের ভাষাকে আমাদের সাহিত্য, গানে যথাযোগ্য স্থান দিতে হবে।<sup>১২</sup>

১৯৬০ সনের পরে বাংলা ভাষার স্বীকৃতি এবং বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির পর 'বাংলা'র প্রাধান্য কমাবার অসৎ-উদ্দেশ্যে একশ্রেণীর বাঙালী বুদ্ধিজীবী উর্দুর কথা না বলে ইংরেজির শ্রেষ্ঠত্ব ও অপরিহার্যতা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের পথ বেছে নিয়েছিলেন এই যুক্তিতে যে, বাংলা উর্দুর বিবাদে পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, তাই তাঁরা বাংলা ও উর্দুকে দ্বিতীয় স্তরে রেখে প্রথম গুরুত্বে ইংরেজী ভাষা-মাধ্যমকে গ্রহণের সুপারিশ করেছিলেন।

'সংলাপ'-এ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন 'ইংরেজীর কথা' লিখেছিলেন ঐ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই। কিন্তু বাংলাভাষী লেখকবুদ্ধিজীবী এবং সংস্কৃতিকর্মী তাঁর ঐ লেখার প্রতিক্রিয়ায় নবনব যুক্তি উপস্থাপন করে বাংলাকে প্রথম গুরুত্বে অধিষ্ঠিত দেখার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করতে থাকেন। পূর্বলীতে এ বিষয়ে ছোটখাটো 'আলোচনা' অনেক হয়েছে। তবে 'ইংরেজীর কথা' এবং 'ইংরেজীর কথা ও বাংলা প্রচলনের সমস্যা' শিরোনামে দুটো দীর্ঘ ও গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধও এতে ছাপা হয়েছে।

সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েনের বক্তব্যের সারহীনতা বা যুক্তির প্রতিক্রিয়া-শীলতাকে উন্মোচন করে বাঙালীর উন্নতি-অগ্রগতির সহায়ক ভাষা যে বাংলা সেকথাই জোর দিয়ে বলা হয়েছে অপর প্রবন্ধে। নূরুল ইসলাম খান 'ইংরেজীর কথা' শীর্ষক প্রবন্ধে বলেন :

'আমার বিবেচনায় এটি কোন মূল সমস্যা নয়। অনেকটা পোষণ করা ও সৃষ্টি সমস্যা।... সত্য কথা বলতে গেলে, আমাদের দেশে আজাদীর পরে ইংরেজির স্থান কি হতে পারে সে সম্পর্কে একটা সর্ববাদীসম্মত ধারণা থাকা সত্ত্বেও একটা অনুদার মতবাদ ক্ষমতার সুযোগ নিয়ে ঐ সমস্যটি পোষণ করে আসছে এবং আর কিছু অহেতুক সমস্যার সৃষ্টি করছে।'<sup>১৩</sup>

আবুল কাসেম ফজলুল হক 'ইংরেজীর কথা ও বাংলা প্রচলনের সমস্যা' শীর্ষক প্রবন্ধে সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন এর বক্তব্য খণ্ডন করে স্পষ্ট করেই বলেন :

'বাংলাই যে বাংলা ভাষা-ভাষীর শিক্ষার মাধ্যমে হবে এবং পূর্ব পাকিস্তানের অফিস-আদালতে যে বাংলার মাধ্যমেই কাজ চলবে—এ নিয়ে আর প্রত্যক্ষভাবে কেউ মতদ্বৈধ প্রকাশে সাহসী হচ্ছে না। তবুও মনে হয়, ইংরেজি ভাষা আমাদের সমাজ-জীবনে কি ভূমিকা গ্রহণ করবে, এ-নিয়ে অনেকেই আজও দুর্ভাবনার অস্পষ্টতায় হাবুডুব খাচ্ছেন। বাংলা প্রচলনের পাশে ইংরেজির ভূমিকা সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।'<sup>১৪</sup>

অর্থনৈতিক অবস্থার ফলে নৈতিক অবক্ষয়ের চিত্র সাহিত্যে রূপায়ণ প্রসঙ্গে একটি আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ—নজরুল হক পূবালীতে প্রকাশিত শওকত আলীর উপন্যাস 'পিঙ্গল আকাশ' পড়ে এই 'আলোচনাটা' লিখেছিলেন। 'নৈতিকমান ও সমকালীন সাহিত্য' শিরোনামের প্রবন্ধে বলা হয় : অর্থনৈতিক সংকটের দরুণ আমাদের সমাজ-জীবনের পরতে পরতে এক ভয়াবহ ক্ষত সবার অলক্ষ্যে পচনক্রিয়া চালিয়ে যাচ্ছে।...একটা অদৃশ্য দানবীয় শক্তি যেন আমাদের জীবনের সুন্দর স্বাস্থ্যকে বিকৃত করে দিচ্ছে। বিশেষ করে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী সমাজ—যারা আমাদের সমাজের মেরুদণ্ড, আজ সেই মেরুদণ্ড নৈতিক অধোগতির কারণে পঙ্গু হতে চলেছে।...জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত বেকার সমস্যা ও জীবনযাত্রার উর্ধগতি রোধ করা কোনক্রমেই সম্ভব হয়ে উঠছে না। ফলে বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্তসমাজ এক ভয়াবহ সংকটের সম্মুখীন হয়েছে। আর তার মারাত্মক প্রতিক্রিয়াস্বরূপ আমাদের সমাজের নৈতিকমান ক্রমাবনতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। যেন কোন অদৃশ্য শক্তির ইশারায় গোটা সমাজ এক অন্ধকারময় দুর্গম পথে অগ্রসর হচ্ছে।

কৃষিভিত্তিক সমাজব্যবস্থা শিল্পের অগ্রগতির দরুণ তার পূর্বের কাঠামো বদলাচ্ছে...এই সংকটের প্রথম সারিতে রয়েছে দরিদ্র কৃষক মজুর। আর দ্বিতীয় সারিতে রয়েছে মধ্যবিত্ত সমাজ...মধ্যবিত্ত সমাজের একটি অংশ মেহনতি কৃষক-মজুরের দলে মিশে যেতে বাধ্য হচ্ছে আর একটি অংশ...অর্থনৈতিক সংকটের মোকাবিলা করতে না পারায় বাধ্য হয়ে বিবেক-মানবতার ইতি করে নানা দুর্নীতির পথে পা বাড়াচ্ছেন। সমাজের একটি শ্রেষ্ঠ অংশ দিনে দিনে নৈতিক অধোগতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে। পাশ্চাত্য সমাজব্যবস্থার মত আমাদের সমাজজীবনেও তাই আত্মকেন্দ্রিক মনোভাব ক্রমশ প্রকট হয়ে উঠছে।

...যে সমাজে আত্মকেন্দ্রিক মনোভাব যত তীব্র হয়ে উঠেছে সে সমাজে নৈতিক অধঃপতন এবং পারস্পরিক সহানুভূতি ও মানবতাবোধ তত সীমিত হচ্ছে... প্রতিকূল স্রোতে গা ভাসিয়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে... সমাজের এই ভাঙনের মূলে রয়েছে আমাদের মানসিকতার দৈন্য। সমাজের কাঠামোর দ্রুত পরিবর্তন এবং পাশ্চাত্য ভাবধারার সস্তা অনুকরণের সঙ্গে আমাদের শিক্ষা ও সংস্কারের ভারসাম্য রক্ষা হচ্ছে না বলেই সমাজের অলিগলি পথে নানা বিশৃঙ্খলা দেখা দিচ্ছে।

ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং নরনারীর সমঅধিকারের প্রতি যোগ্য মর্যাদা দেওয়ার মত মানসিকতা আমাদের সমাজে আজও সুষ্ঠুভাবে গড়ে ওঠেনি। তার ফলে নানা সামাজিক ব্যধি

স্বাভাবিকভাবেই এসে যাচ্ছে।... সংস্কার ও রুচিবোধ বিভিন্ন সমাজে ভিন্ন ভিন্ন রূপ নিতে পারে। তবু তারও একটা মানদণ্ড আছে। সেই মানদণ্ড নির্ধারণে ও নিয়ন্ত্রণের জন্যে সমাজে সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়োজন দেখা দেয়।<sup>১৫</sup>

সাহিত্য, সংস্কৃতি, সমাজ, অর্থনীতি এবং বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য বা কার্যক্রম নিয়ে পূবালী যেসকল আলোচনা-সমালোচনা লিখেছে এবং এর ভেতর দিয়ে যে ভূমিকা পালন করেছে, সে সম্পর্কে পাকিস্তান-আমলে প্রকাশিত সংলাপের একটি সংখ্যায় পত্রিকাবিষয়ক এক আলোচনায় ডক্টর গোলাম সাকলায়েন মন্তব্য করেন :

একখানি সাহিত্য পত্রিকায় এতো বিষয়ের সমাবেশ থাকতো যা উন্নতমানের সাহিত্য-পত্রিকা হয়েও কিছুটা সংবাদ জগতের তথ্যাদি পরিবেশনে কুণ্ঠিত হতো না...এবং নিছক সাহিত্যরসের যোগান দিয়েও শিল্পতত্ত্ব ও জ্ঞানবিজ্ঞান বিষয়েও নতুন দিক উদঘাটিত করে দেয়। কিন্তু পূবালীর কোন সাহিত্যিকগোষ্ঠীর উদ্ভব হয়নি। তবু এটাই একমাত্র মাসিক কাগজ যেখানে একদিকে আকৃষ্ট করেছে বিশ্ববেদগ্নের দিকে এবং অন্যদিকে মুসলিম ঐতিহ্য ও ইতিহাস থেকে নানা বিষয়ের আমদানী করে তাকে একালের মানুষের কৌতূহলী দৃষ্টির সামনে তুলে ধরেছে নির্বিধায়। অর্থাৎ আমাদের সামাজিক গৌড়ামি অপসারিত করার আকাঙ্ক্ষায় দৃষ্টি দিয়েছে এবং সেই সঙ্গে সাহিত্যে নিরাভরণ পৌরুষের অবতারণা করেছে পত্রিকাখানি।<sup>১৬</sup>

### তথ্যপঞ্জি

১. গোলাম সাকলায়েন, আমাদের সাহিত্যপত্রিকা ও সাহিত্যিকগোষ্ঠী, সংলাপ, ১৯৭০, পৃ. ৮১।
২. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, সাক্ষাৎকার ০৭/০৬/১৯৯১।
৩. পূবালী, সম্পাদকীয়, ১ বর্ষ, ১ সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৬৭, পৃ. ৭৬-৬৮।
৪. প্রকাশকের নিবেদন, ১ বর্ষ, ১০ সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৬৮।
৫. লেখক সংঘ পত্রিকা, ১ বর্ষ, ৬ সংখ্যা, কার্তিক ১৩৬৮, সম্পাদকীয়, পৃ. ৩৮৮-৮৯।
৬. ডক্টর সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, সাহিত্যে রাষ্ট্রীয় সাহায্য, পূবালী ২ বর্ষ, ৯ সংখ্যা, পৃ. ৬৩০।
৭. আহমদ ফারুক, পুরস্কারের প্রহসন, পূবালী ৪ বর্ষ, ২ সংখ্যা, পৃ. ১১৭-১৮।
৮. অনেকেই প্রায় প্রতি সংখ্যায় অথবা দু'এক সংখ্যা পরপরই কবিতা লিখেছেন, কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।
৯. কবিতার নিয়ম গল্পেও প্রযোজ্য।
১০. সিরাজুদ্দীন হোসেন, কোলকাতার বই-এর পুনর্মুদ্রণ প্রসঙ্গে (আলোচনা), পূবালী, ৪ বর্ষ, ২ সংখ্যা, কার্তিক ১৩৭০, পৃ. ১৭৩-৭৭।
১১. ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ, বিদেশী পুস্তকের অবাধ আমদানী ও পুনর্মুদ্রণে আমাদের সাংস্কৃতিক প্রতিক্রিয়া, পূর্বাঙ্ক, পৃ. ১৭৮-৭৯।
১২. ড. মাহমুদুল হক, আমাদের সাংস্কৃতিক পুনর্গঠন, পূবালী ৭ বর্ষ, ৪-৫ সংখ্যা, পৌষ-মাঘ ১৩৭৩, পৃ. ৮৩৩-৩৫।
১৩. নূরুল ইসলাম খান, ইংরেজীর কথা, পূবালী, ৪ বর্ষ, ৩ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৭০, পৃ. ২৩৭-৪৩।
১৪. আবুল কাসেম ফজলুল হক, ইংরেজীর কথা ও বাংলা প্রচলনের সমস্যা, পূবালী ৫ বর্ষ, ১২ সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৭২, পৃ. ১১৭-২২।
১৫. নজরুল হক, নৈতিকমান ও সমকালীন সাহিত্য, পূবালী ২ বর্ষ, ৮ সংখ্যা (আলোচনা), বৈশাখ ১৩৬৯, পৃ. ৬৩৩।
১৬. গোলাম সাকলায়েন, পূর্বাঙ্ক, পৃ. ৮১।

## ৫. পূর্বমেঘ (১৯৬০-৭১)

পূর্ববাংলা থেকে প্রকাশিত সাহিত্যপত্রিকাগুলোর মধ্যে ‘পূর্বমেঘ’ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেকালেই এই পত্রটি নাম কিনেছিল। সমকাল, পূবালী, পরিক্রম, কণ্ঠস্বর, নাগরিক প্রভৃতি উন্নতমানের সাহিত্যপত্রে ‘পূর্বমেঘ’ এর বিজ্ঞাপন প্রায় নিয়মিতই ছাপা হতো। অবশ্য পূর্বমেঘেও ত্রৈমাসিক পত্রিকার বিজ্ঞাপ্তি আছে। আসল কথা হলো, বিদগ্ধ বুদ্ধিজীবীদের প্রগতিশীল অংশের সদস্য সম্পাদক—লেখকেরা তখন উপযুক্ত পত্রিকাগুলোকে একই স্তরের বলে মনে করতেন অথবা তাঁরা পারস্পরিক পৃষ্ঠপোষকতায় আস্থামূলক ছিলেন। তবে পূবালী পরিক্রম সওগাত থেকে পূর্বমেঘ ও কণ্ঠস্বর মাত্রাগতভাবে কিছুটা ভিন্ন ছিল। ওগুলো ছিল মাসিক পত্রিকা। কণ্ঠস্বর মাসিক বা দ্বিমাসিক, ত্রৈমাসিক কোনোভাবেই চিহ্নিত হতে পারে না। মাসিকের হিসেবে স্বাধীনভাবে ওটা প্রকাশিত হতো। নাগরিক ও পূর্বমেঘ ত্রৈমাসিক ছিল। বাছবাছা মানসম্মত রচনা এতে প্রকাশিত হতো।

পূর্বমেঘ ত্রৈমাসিক হলেও নিয়মিত প্রকাশিত হতে পারেনি। এগারো বছরে ত্রৈমাসিক হিসেবে প্রকাশিত হবার কথা ছিল  $8 \times 11 = 88$ টি। কিন্তু ২৩টি পুস্তিকা মাত্র প্রকাশিত হয়েছিল। সপ্তম বর্ষের তৃতীয় ও চতুর্থ বা তৃতীয়-চতুর্থ সংখ্যা পৃথক বা যুগ্ম সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হয়ে থাকলে ২৪ বা ২৫টিও হতে পারে। তবে সম্পাদকদের নিটক থেকেও না-পাওয়া সংখ্যাটি বা দুটি সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি। অতএব ২৩টির বেশী ‘পূর্বমেঘ’ প্রকাশিত হয়নি বলে ধরে নিতে হবে।

কিন্তু এই ২৩টি পুস্তিকা ১৯৬০ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত সময়ে রাজশাহী থেকে প্রকাশিত হয়েই পূর্ববাংলার সাহিত্য পত্রিকার ইতিহাসে উজ্জ্বল একটি স্থান সুদৃঢ় দখল করে আছে। এটা বলাবাহুল্য নয়, সম্পাদকদের সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বের কারণে বা প্রভাবেই তা সম্ভব হয়েছিল। এর সঙ্গে প্রকাশক ও মুদ্রাকর হিসেবে যঁারা যুক্ত ছিলেন—তাঁরাও এদেশের পণ্ডিতসমাজের সভ্য।

প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা পূর্বমেঘ প্রকাশিত হয় আষাঢ় ১৬৬৭ বঙ্গাব্দে, জুন ১৯৬০ খ্রীস্টাব্দে। সম্পাদক জিন্নুর রহমান সিদ্দিকী ও মুস্তাফা নূরউল ইসলাম। পত্রিকায় পরিচিতি বা বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক ঘোষণা ছিল—‘শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতিমূলক ত্রৈমাসিক পত্রিকা’। প্রকাশক ও মুদ্রাকর ডক্টর এ. আর. মল্লিক। ঠিকানা কাদিরগঞ্জ, রাজশাহী। প্রেস: মডার্ন প্রিন্টিং ওয়ার্কস, রাজশাহী। দাম একটাকা। সাদা উন্নতমানের কাগজে রয়েল সাইজে, রুচিশীল মুদ্রণ-সৌকর্য নিয়ে প্রকাশিত প্রথম সংখ্যার পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৯৬।

বলা দরকার, সমকালের খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ার পরেই পূর্বমেঘ প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৬০ সনে পূর্বমেঘ এর সঙ্গে নামে, ভাবে, আদর্শে অনেকটা মিল রেখে প্রকাশিত হয়েছিল ‘পূবালী’। তখনও ‘পরিক্রম’ বের হয়নি। সংলাপ, নাগরিকও না। উচ্চাদর্শের গুরুত্বপূর্ণ, খ্যাতিমান পত্রিকা হিসেবে তাঁদের সামনে ছিল এদেশের মোহাম্মদী, মাহেনও,

সমকাল এবং বাংলাসাহিত্যের ইতিহাস-খ্যাত সকল পূর্বসূরি সাহিত্যপত্রিকা। সম্ভ্রানেই তাঁরা দেশকাল সাহিত্য সংস্কৃতি ও সমাজের চাহিদার কথা স্মরণে রেখে এই পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। পত্রিকার নামটা ছিল একেবারে কালীদাসীয়—‘পূর্বমেঘ’। অর্থাৎ পূর্ববঙ্গের বার্তা নিয়ে যেনো ‘মাগরিবি-পাকে’ যাবার অভীশা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিল—।

তখন পূর্ববাঙলার জনগণের জীবন ও সাহিত্য-সংস্কৃতি পশ্চিমপাকিস্তানি আমলাদের হামলায় একেবারে অতিষ্ঠ। এই পত্রিকায় অতীষ্ঠ, বিক্ষুব্ধ, উৎপীড়নে শঙ্কিত বাঙালি জনগণের মননের বিচিত্র চিত্র তাই প্রতিফলিত হয়েছে এবং একারণেই একালের পত্রিকারাজির মধ্যে পূর্বমেঘ অতিশয় পরিদৃশ্যমান একটি নক্ষত্রস্বরূপ।

অন্যতর সম্পাদক মুস্তাফা নূরউল ইসলাম এক সাক্ষাৎকারে বলেন :

সুস্থ শিল্পসাহিত্য সংস্কৃতি ও মুক্তবুদ্ধি চর্চার লক্ষ্য-আদর্শ সামনে নিয়েই প্রকাশিত হয়েছিল পূর্বমেঘ। সেজন্য এর লেখক-শুভানুধ্যায়ী গোষ্ঠীর অধিকাংশই প্রগতিশীল, বামধর্মী তথা বাঙালি জাতীয়তাবাদী। সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী বাংলাদেশ-আন্দোলনের সপক্ষশক্তির সহায়ক, যোদ্ধা মসীজীবীরা এর প্রধান কন্ট্রিবিউটর।<sup>১</sup>

পত্রিকা প্রকাশের প্রেরণা সম্পর্কে জিন্নুর রহমান সিদ্দিকী বলেন : লেখক সংঘের প্রতিক্রিয়া থেকে নয় ; ইতিবাচক একটি ধারণা বা প্রেরণা থেকে আলোচনার মধ্য দিয়ে, কাজকর্মের পরও যে-সময়টুকু থাকে, সেটাকে কাজে লাগানোর জন্য (রাজশাহী থেকে) এই পত্রিকা আমরা প্রকাশের উদ্যোগ নিই।<sup>২</sup>

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য তখন প্রকাশক ও সম্পাদকগণ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনায় নিয়োজিত—একজন ইংরেজী, একজন বাংলা এবং একজন ইতিহাস বিভাগে। পত্রিকা প্রকাশের সুবিধা-অসুবিধা দুই-ই ছিল তখন। ঢাকার বাইরে থেকে ভালো পত্রিকা প্রকাশের প্রধান অন্তরায় উন্নতমানের লেখার অভাব। যে জন্য দেখা যায় এর অধিকাংশ লেখকই রাজশাহীকেন্দ্রিক তথা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, গবেষক, কিংবা প্রাক্তন ছাত্র।

চাঁদা তুলে এবং বিজ্ঞাপন সংগ্রহের মাধ্যমে পত্রিকার ব্যয় সংগ্রহ করে মফস্বল শহর রাজশাহী থেকে পত্রিকা প্রকাশের নেপথ্যে অবদান আছে অনেকের, জিন্নুর রহমান সিদ্দিকী বলেন :

পত্রিকা প্রকাশের জন্য অর্থ সংকটে পড়লেই স্থানীয় একজন ন্যাপ-নেতা মরহুম জনাব আতাউর রহমান বেরিয়ে পড়তেন, তিনি টাকা সংগ্রহ করতেন, বিজ্ঞাপনও। তা ছাড়া আমরাও চাঁদা নিতাম রাজশাহীকেন্দ্রিক সুধী-সমাজের কাছ থেকে। টাকার জন্য অসুবিধা হতো না। লেখার অভাবেই পত্রিকা অনিয়মিত হয়ে পড়ে। তা ছাড়া মুস্তাফা সাহেব বিলেত গেলেন, এসে জাহাঙ্গীর নগরে যোগদান করলেন। পত্রিকা অনিয়মিত হয়ে পড়ে।

বলা দরকার, জিন্নুর রহমান সিদ্দিকীও বিলেত যান এবং তাঁর ফলেও পত্রিকা অনিয়মিত হয়ে পড়ে। একজন এ.কে.এন. আহমেদ তখন পাকিস্তান শিল্প-ব্যংকের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ছিলেন। তিনি মাঝে-মধ্যে এতে বিজ্ঞাপন দিতেন। ফলে কিছু অর্থের সাশ্রয় হতো। আর তাই উদ্বৃত্ত পয়সা থেকে লেখকদেরকে কিছু কিছু করে সম্মানীও দেয়া হতো। তখন পত্রিকায় লিখে পয়সা পাওয়া যেতো কেবল মোহাম্মদী, মাহেনও ও পূবালী থেকে। পূবালীর প্রকাশক বিবিধ পুস্তকের প্রকাশক ও বিক্রেতা ধনশালী ব্যক্তি ছিলেন। ফলে পয়সা তিনি

দিতে পারতেন। আর পত্রিকা প্রকাশের প্রেরণারূপে ব্যবসায়িক প্রয়োজন বা স্বার্থও তাঁর কিছু ছিল। কিন্তু তৎকালীন সর্বপ্রধান সাহিত্যপত্রিকা সমকাল লেখার জন্য পয়সা দিত না।<sup>৩</sup>

কোনো ভালো পত্রিকাই (নামমাত্র ব্যতিক্রম ছাড়া) লেখকদের পয়সা দিয়ে লেখা চেয়েছে বলে ইতিহাসে জানা যায় না। বরং লেখার জন্য পয়সা যে সকল ব্যবসা-সফল পত্রিকা দিতে পেরেছে, তাদের থেকে বিনা পয়সার লেখা নিয়ে প্রকাশিত সাহিত্যপত্রিকাই ইতিহাসে খ্যাতি অর্জন করেছে, এর কারণ সম্পাদকের কৃতিত্বে পত্রিকা সাহিত্যজগতে মর্যাদাবান হয়ে ওঠায় সৃষ্টিশীল লেখকেরা স্বতন্ত্রগোদিত হয়েই প্রকাশের আকুলতা থেকে ঐসব পত্রিকায় লেখা দিয়েছেন (বা দিতেন)।

ফলে তা সৃষ্টিশীলতার ইতিহাসে বেশী আলোচনা-সমালোচনার বিষয়ে কিংবা বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। তবু বলা খুব দরকার, বিনা পয়সার পত্রিকার থেকে পয়সা দিতে পারা সাহিত্য-পত্রিকারই সাফল্য অর্জনের সম্ভাবনা সর্বাধিক। এর সঙ্গে দরকার সম্পাদকের যোগ্যতার সুসমন্বয়। যেমন বঙ্গদর্শনের কিংবা সবুজপত্রের অথবা সমকালের লেখকেরা আর্থিকভাবে পুরস্কৃত হবার সুযোগ পেলে সোনায় সোহাগা হতো। কিন্তু বঙ্গদর্শন, সবুজপত্র, কল্লোল, সমকাল বা পূর্বমেঘের লেখকেরা কিষ্টিং অর্থপ্রাপ্তির খেয়াল নিয়ে লিখতেন না, এর অধিকাংশ রচনাই ছিল লেখকদের মুক্তবুদ্ধি তাড়িত, বিবেকসঞ্জাত এবং সৃষ্টির বেদনার বহিঃপ্রকাশ।

মনীষী আবুল ফজল হচ্ছেন এইকালের একজন প্রধান চিন্তক। প্রায় সকল ভালো পত্রিকার ভালো রচনাটিই তিনি লিখেছেন। আবদুল হক, আহমদ শরীফ বা বদরুদ্দীন উমরও লিখেছেন। তবে আবুল ফজল বয়স, সরকারী চাকুরীর ধরন (সরকারী কলেজের অধ্যাপক, ১৯৫৮ সন থেকে অবসর প্রাপ্ত এবং মুক্তবুদ্ধির সাধক শিখা-গোষ্ঠীর সদস্য ছিলেন) প্রভৃতি দিক থেকে কিছু ভিন্ন ও স্বতন্ত্র চরিত্রের-বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। সাহিত্যিক খ্যাতির দিক থেকেও তিনি সর্বাগ্রগণ্য। ঐকালে তিনি যেসকল বক্তব্য বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশ করছিলেন, তা একদিকে ম্রিয়মাণ, নিষ্ক্রাণ, হতাশাগ্রস্ত বাঙালি শিক্ষিত সমাজকে প্রাণশক্তি যোগান দিচ্ছিল,—অপর দিকে শাসকশ্রেণীর আসনে কুঠারাঘাত হানছিল।

‘পূর্বমেঘেও তিনি লেখা পাঠাতেন। কোনো কোনো লেখা ছাপা হলেও একটি লেখা তাঁর (সম্পাদকরাই আবেদন জানিয়েছিলেন লেখা পাঠানোর জন্য তারপরও) সাহসের অভাবজনিত সীমাবদ্ধতার কারণে পূর্বমেঘের কর্ণধারগণ ছাপতে পারেননি।<sup>৪</sup> তবে তৎকালে বদরুদ্দীন উমর এর ন্যায় স্পষ্টবাদী, বাঙালি জাতীয়তাবাদী, বিপ্লবী চিন্তক-লেখকের রচনা প্রকাশের জন্যও সাহসের দরকার হতো এবং সে-সাহস পূর্বমেঘ হারায়নি। বদরুদ্দী উমরের বিতর্কিত ‘সাম্প্রদায়িকতা’; ‘মুসলিম জাতীয়তাবাদ ও মুসলিম সংস্কৃতি’; ‘আত্মনিয়ন্ত্রণ ও গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদ’ প্রভৃতি লেখা পূর্বমেঘে ছাপা হয়েছিল। এতে যেসকল বক্তব্য সেদিন উপস্থাপিত হয়েছিল—রীতিমতো তা ছিল পাকিস্তানের সংহতির জন্য মারাত্মক।

লেখকদেরকে তুষ্ট রাখার জন্য ‘পাকিস্তান রাইটার্স গিল্ড’ গড়ে তোলা হলেও রাজশাহীতে এর কোনো শাখা ছিল না। অতৃপ্ত, অতৃপ্ত, বিক্ষুব্ধ চিন্তের কিছু লেখক তাই ঐ

অঞ্চলে ছিলেন, এবং তাঁরা নিজেদের অভিব্যক্তি রূপ দিচ্ছিলেন পূর্বমেঘের পৃষ্ঠাতে। এতে মেজাজের দিক থেকে পূর্বমেঘের তাৎপর্যপূর্ণ তারতম্য সৃষ্টি হয়। তবে বি.এন. আর পূর্বমেঘকে মাঝেমাঝে পৃষ্ঠপোষকতা দান করতে বলে জানা যায়। কিন্তু এতে সরকারি কোপানলে পড়ার পথে কোনো প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়নি। কারণ অবশ্যই বদরুদ্দীন উমরের লেখা ছাপার অপরাধ।

তিনি তখন ‘কমিউনিস্ট’ হিসেবে পাকিস্তান সরকারের তালিকাভুক্ত। পূর্বমেঘের মুদ্রক ‘মডার্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস’এর উপর সরকারি চাপ সৃষ্টি করা হলো। অসামর্থ্য জানানলেন প্রেস মালিক। অতএব ছাপাখানা পরিবর্তন করতে হলো। পঞ্চম বর্ষ প্রথম সংখ্যা ছাপা হয় ইন্টারন্যাশনাল প্রিন্টিং ফার্ম, এবং শেষ সংখ্যা ছাপা হয় আইডিয়াল প্রিন্টিং ওয়ার্কস, গ্রেটার রোড, রাজশাহী থেকে। প্রকাশক এ. আর. মল্লিক। সপ্তম বর্ষে প্রকাশক ও মুদ্রাকর ড. এ.আর. মল্লিকের স্থলে অভিযুক্ত হন ডক্টর মুখলেসুর রহমান। প্রচ্ছদ আঁকতেন কামরুল হাসান, মুস্তফা শওকত কামাল প্রমুখ।

শেষের দিকে পত্রিকা যখন বছরে চার বা দুই বা তিন সংখ্যা একত্রে প্রকাশিত হতো তখন পৃষ্ঠা সংখ্যায় বেড়ে শতাধিক ১০৪, ১১২, ১১৪ ইত্যাদি হয়েছে। তৃতীয় বর্ষ থেকে পত্রিকার সাইজও ডিমাই হয়েছে (ডাবল ডিমাই ১/১৬ সাইজ)।

পূর্বমেঘের ২৩টি সংখ্যা বের হয়েছিল এই নিয়মে—আষাঢ় মাসে বর্ষ অরম্ভ, ১৩৬৭ প্রথম বর্ষ, চৈত্র ১৩৭৭ সনে একাদশ বর্ষে পত্রিকার কার্য সমাপ্ত। ১৩৬৭, ৬৮, ৬৯ তিন বছর নিয়মিত বের হয়েছে। তবে তৃতীয় বর্ষে দু’টো একত্রে, যুগ্ম সংখ্যা হিসেবে বের হয়েছিল। চতুর্থ বর্ষে (১৩৭০) পত্রিকা পুরো বন্ধ ছিল। পঞ্চম বর্ষে (১৩৭১, একটি যুগ্মসংখ্যা) তিনটি পুস্তিকা বেরোয়। ষষ্ঠ বর্ষে পুরো বন্ধ। সপ্তম বর্ষে প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা একত্রে প্রকাশিত হয়। তৃতীয়-চতুর্থ সংখ্যা প্রকাশের তথ্য জানা যায় না। অষ্টম বর্ষে চারটি সংখ্যাই বের হয়।

নবম ও দশমবর্ষে একেক খণ্ডে (চারসংখ্যা একত্রে) দুটি; একাদশ বর্ষে প্রথম ও দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ও চতুর্থ একত্রে দুটি মোট তিনবছরে চারটি পুস্তিকা বের হয়েছিল। ঘোষিত নিয়ম ছিল ‘বাংলা বছরের আষাঢ়, আশ্বিন, পৌষ, ও চৈত্র মাসে প্রকাশিত হবে। প্রতি সংখ্যার দাম এক টাকা। বৈদেশিক দুই শিলিং। বার্ষিক সডাক (পাকিস্তান ও ভারতে) সাড়ে চার টাকা। বছরের যেকোন সময় থেকে গ্রাহক হওয়া যায়।’

তবে উদ্দেশ্য ও আদর্শ সম্পর্কে ঘোষণা দিতে তাঁরা সজ্ঞানেই নারাজ ছিলেন। ১৯৬৩ সনের দিকে জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী বিলেতে গমন করেন। অল্পফোর্ড থেকে তিনি যে চিঠি লেখেন, তাতে বোঝা যায় ১৯৬৩ সনের জুন নাগাদ তিনি যখন দেশ ত্যাগ করেন, তখন পূর্বমেঘের তিন বছর পূর্ণ হয়নি। একপত্রে তিনি ‘পূর্বমেঘ’ নিয়ে যে ভাবনা বা ধারণা পোষণ করতেন, তা বিবৃত করেছিলেন। এতে তাঁর সমাজ সংস্কৃতি ও সাহিত্য সম্পর্কে চিন্তাধারার কিছু পরিচয় যেমন আছে, তেমন আছে পূর্বমেঘের কাঙ্ক্ষিত স্বরূপ বর্ণনা।

চতুর্থ বর্ষে বন্ধ থেকে পঞ্চম বর্ষে যখন পত্রিকা আবার মুস্তফা নূরউল ইসলাম এর একক উদ্যোগে প্রকাশিত হয় (যদিও সকল সংখ্যাতেই সম্পাদক হিসেবে জি.র.সি ও মু.নূ.ই



দুজনের নামই ছাপা হয়েছে) তখন এই চিঠি পূর্বমেষে (পঞ্চম বর্ষ প্রথম সংখ্যায়) ছাপা হয়েছিল। সম্পাদকগণ এই বক্তব্য দ্বারাই কি পত্রিকার উদ্দেশ্য-আদর্শ অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন? জিঞ্জির রহমান সিদ্দিকী লিখেছেন :

...ত্রৈমাসিক পত্র, সম্পাদনা থেকে শুরু করে ছাপা মফস্বল শহরে, সম্পাদনায় দুজন ব্যক্তি যাদের পেশা শিক্ষকতা, এবং পুঁজি বন্ধুজনের ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার হাত থেকে কুড়িয়ে নেওয়া (বা কেড়ে নেওয়া?) কিছু টাকা—এতে পূর্বমেষের পরিচয় কিছুটা থাকতে পারে; তবে আসল পরিচয় নেই। আসল পরিচয় দিতে গেলে পূর্বমেষ কোনজাতের পত্রিকা বা কোন জাতের নয়, বা কোন জাতের পত্রিকা হতে চায়, আর কোন জাতের নয়, সে আলোচনায় আসতে হয়। মুশকিল হল পত্রিকার জাতগুলি সবসময় পরিষ্কার ভাবে চিহ্নিত নয়; তাছাড়া বর্ণ সংকর ত আছেই। একটা পত্রিকা হুয়ায় একবার বেরুচ্ছে, না মাসে একবার, না তিনমাসে—এতে বোধ হয় তার প্রকৃতি সবটা ধরা পড়ে না। ঠিক যেমন, প্রত্যেক দিন বের হয় বলেই টাইমস আর নিউজ অব দি ওয়ার্ল্ড এক জাতের কাগজ নয়, যদিও অবশ্য দুটোই দৈনিকপত্র। মাসিক মোহাম্মদী যদি আগামীকাল থেকে ত্রৈমাসিক হয়ে বেরোয় তাহলে কি পূর্বমেষের সাথে তাকে এক বন্ধনীতে ফেলা যাবে? বা মুহাম্মদ আবদুল হাই সাহেবের সাহিত্যপত্রিকা যদি বছরে দুবার ছাপা না হয়ে চারবার হয়, তার সাথে?

এর থেকে কেউ যদি বুদ্ধিমানের মতো বলে বসে, মাসিকপত্র ওজনে হালকা, ত্রৈমাসিক একটু ভারী, আর ষন্মাসিক গুরুতর ভারী, তাহলেও জওয়াব ঠিক হলো না। এর মধ্যে কিছুটা সত্য থাকতে পারে, পূর্ণ সত্য নয়। আসলে আমরা কতোটা ভারী হতে চাই তার চাইতে জরুরী কথা আমরা কি ধরনের লেখা চাই, কেন চাই এবং কাদের চাই। মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষন্মাসিকের মধ্যে তফাৎটা বাহ্য হলেও যেটা মিথ্যা হয়ে যাচ্ছে না সে হল মোহাম্মদী, পূর্বমেষ ও সাহিত্যপত্রিকা তিন জাতের এবং যে সম্পাদকীয় প্রশ্ন তিনটি একটু আগেই আমি তুলেছি, সেগুলি তিন শ্রেণীর সম্পাদকের পক্ষেই খাটে এবং এদের সবাইকে এ-সব প্রশ্নের জওয়াব স্পষ্ট রাখতে হয়, নিজেদের চেতনায়। অবশ্য পত্রিকার শ্রেণীবিভাগ এখনই শেষ নয়। পশ্চিম মূলকে আপাততঃ আমি বিলেতের কথা ভাবছি, little magazine বলে আর একজাতের পত্রিকা আছে—এদের অবয়ব ছোট, আর হাঁক ডাক সেই অনুপাতে বড়। এবং প্রায় অনিবার্য নিয়মে ক্ষণস্থায়ী। এরা সাহিত্যে দুচার বৎসর অন্তরই একটা ছোট, সরব ও সৃষ্টিশীল গোষ্ঠীর মুখপত্র হিসেবে গজায়, এবং কদিন আসর জমিয়ে যেমন অতর্কিতে আসে তেমন অতর্কিতে অদৃশ্য হয়ে যায়। আমাদের বাংলা মূলকে এর সমগোত্রীয় পত্রিকার কথা ভাবতে গেলে কল্লোলের কথা মনে আসে। কিন্তু কল্লোল আমি স্বচক্ষে দেখিনি, তাই গোষ্ঠীবহির্ভূত রচনা এখানে কতটা থাকতে, তা জানিনে। সুতরাং প্রস্তাবটা সঙ্গে সঙ্গেই তুলে নিচ্ছি। তাছাড়া কল্লোলের কলেবর হয়তো আদৌ ক্ষুদ্র ছিল না। ক্ষুদ্র পত্রিকার সঙ্গে এর হয়তো এই টুকুই মিল ছিল যে এর পেছনের 'দলটি দল হিসেবে ছিল সুনির্দিষ্ট, এবং সেই দলের মধ্যে সৃষ্টিধর্মীতা ও কলহপ্রবণতার স্বাভাবিক মিলন ঘটেছিল। তুলনায় প্রথম চৌধুরীর 'সবুজপত্র' এ যদিও সাহিত্যের একটা ঋতু পরিবর্তনের আভাস মেলে, কিন্তু চৌধুরী মহাশয় ছিলেন মজলিশি ও দিল-দরাজ ব্যক্তি, তাই তিনি পত্রিকাটিকে ঠিক ঠিক দলীয় পত্রিকা হতে দেননি। একটু নীচু স্তরে নেমে, ঢাকার 'অগত্য'র কথা বলতে হয়। ক্ষুদ্র পত্রিকার অনেকগুলি লক্ষণ অগত্যায় বর্তমান ছিল কিন্তু সম্পাদকীয় বিচারবোধ এত টিলে ছিল যে বিস্তার সত্তা সাংবাদিকতার ভীড়ে পত্রিকাটি কোন তীক্ষ্ণ রূপ নিতে পারেনি। আমরা যখন প্রথম পূর্বমেষের কথা ভাবি তখন বোধ হয় শুধু এইটুকুই জানতাম যে আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা না মোহাম্মদী-সওগাত-মাহেনও-সমকালের সঙ্গে, না সাহিত্যপত্রিকার সঙ্গে। সত্যি বলতে গেলে আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী কোন পত্রিকাই তখন পূর্ববাঙলায় ছিল না। কথাটাকে আর একটু ঘুরিয়ে বলা যায়, 'পূর্বমেষ' শ্রেণীর পত্রিকা এদেশে আমরাই প্রথম—এবং শ্রেণী বলতে অবশ্য আমি উৎকর্ষ বা অপকর্ষের কথা ভাবছি না, প্রাণী-বিদ্যার শ্রেণী (Species) অর্থে শব্দটা ব্যবহার করছি। এখন কিভাবে এই শ্রেণীর পরিচয় দেওয়া যায়। অবশ্যই রচনার গুণাগুণ দিয়ে নয়। যদি বলি এই শ্রেণীর পত্রিকায় শুধু উত্তম রচনারই জায়গা আছে তাহলে শুধু যে হঠকারিতা হবে, তাই নয়। কথাটা অনর্থক হবে। উত্তম রচনা কি, কে তার বিচার করবে, কি তার যথার্থ লক্ষণ? ইত্যাদি জিজ্ঞাসার কোন সহজ জওয়াব নেই। না—শুধু উত্তম-রচনার আদর্শ পূর্ববাঙলায় পত্রিকা চালানোর দিন এখনও আসেনি, অফুরন্ত ঐশ্বর্য নিয়েও নয়। একটা বিশেষ লেখকগোষ্ঠীকে তুলে ধরাও

আমাদের লক্ষ্য ছিল না, বা একটা বিশেষ অঞ্চলের সাহিত্য চেষ্টাকে প্রতিফলিত করা নয়। পূর্বমেঘ রাজশাহীর আঞ্চলিক সাহিত্যপত্র নয়, বা হতে চায়নি।

এখানে আপনি হয়তো আমাকে থামিয়ে দেবেন। বলবেন, আমরা কখনও পূর্বমেঘের আদর্শ বা কর্মসূচী প্রস্তুত করিনি। কিন্তু সেটা যেমন সত্য, (যদিও অর্ধ সত্য), তেমন সত্য আমরা কতকগুলি সম্পাদকীয় নীতি সবসময় সামনে রেখেছি। কথাটা খুব পোষাকী শোনাচ্ছে, ‘সম্পাদকীয় নীতি’, যদি কিছু বোঝায়, তাহলে সেটা খুবই ঝরঝরে পরিষ্কার ব্যাপার হবে আর মাঝে মাঝে সে নীতির ব্যত্যয় ঘটছে এমনতরো নালিশের জন্য তৈরী থাকতে হবে। অবশ্যই হবে। তাই বলে নীতি ছিল না, বা নেই, এটাও নিশ্চয়ই আপনি মানেন না।

জিন্নুর রহমান সিদ্দিকীর পত্রের বক্তব্যগুলো পত্রিকা সংক্রান্ত গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ। তাই তাঁর কথাগুলো প্রায় সবই উল্লেখ করছি। তিনি আরও বলেন : এখানে আমি একটা প্রতিবাদের সম্ভাবনা দেখছি। আমরা কি শুধু সম্পাদকীয় নীতির উপরই আমাদের শ্রেণী-স্বাতন্ত্র্য দাবী করছি? আমরা কি অস্বীকার করি যে কোন পত্রিকাই কোন একটা সম্পাদকীয় নীতি ছাড়া চলতে পারে না?

বোধ হয় আমি বলতে চাই যে আমাদের সম্পাদকীয় নীতি একটু বিশিষ্ট। আমি খুব বিরত বোধ করছি কথাটাকে এইভাবে উপস্থাপিত করতে, কিন্তু এর চাইতে ভদ্রভাবে ব্যক্ত করার উপযুক্ত ভাষা বা কৌশল আমার জ্ঞান নেই। এবং এইটুকু বলে, সেই বিশিষ্টতার বর্ণনা দেওয়ার চেষ্টা না করা অশিষ্টতা হবে। এবং প্রথমেই আপনার কাছে মাপ চাইছি, এই ব্যক্তিগত অশিষ্টতার জন্য যে সম্পাদকীয় নীতি কখনই পত্রিকার পৃষ্ঠায় উপস্থাপিত করা হয়নি, এবং একটা বিশেষ নীতিবশতই করা হয়নি, এখন এককভাবে এতদূর থেকে সেটা করতে যাওয়া হয়তো অন্যায়। আমার আত্মপক্ষ সমর্থন এই বলে যে নীতিটি আমরা ঘোষণা করিনি বলেই যথাসাধ্য অনুসরণ করতে চেষ্টা করিনি, তা নয় এবং এখন, তিন বৎসরের অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে, নীতিটিকে নিজেদের সামনে টেনে এনে এর গুণাগুণ যাচাই করাই আমার উদ্দেশ্য, আর আমি আগেই বলেছি—এটা শুধু আমাদের ধারণাগুলি নিজেদের কাছে স্পষ্ট করার জন্যই।

আমরা প্রতিষ্ঠিত খ্যাতি বলতে যা বোঝায় তাকে মূল্য দিইনি। শুধু বয়সের ও খ্যাতির ভারে যঁারা কেটে যাচ্ছেন, যঁাদের ধার কেটে গেছে বলে সাম্প্রতিক রচনাগুলি সাক্ষ্য দেয়, বা যঁাদের ধার কোনদিনই ছিল না, কিন্তু যঁারা চর্চায় অলস, তাঁদেরকে আমরা আমাদের আসরে ডাকিনী। এতে অনেকে অসৌজন্যের আভাস পেয়েছেন।

আমরা যঁাদের ডেকেছি হাটে ঢাক পিটিয়ে ডাকিনি, বাড়ীতে যেয়ে ধর্ণা দিয়ে ডেকে এনেছি। অর্থাৎ আমাদের প্রথমে বুঝতে হয়েছে, কার কাছে সেই জিনিসটি মিলতে পারে, এবং প্রায়ই আমরা দেখেছি, যঁার কাছে মিলতে পারে, তিনি প্রচলিত অর্থে লেখক নন, অর্থাৎ তিনি নিয়মিত লেখেন না, তবু আমরা তাঁর লেখাই চেয়েছি।

আমরা নতুন, উঠতি লেখকদের উপর নজর রেখেছি, এবং তাঁদেরকে বারবার অনুবোধ করেছি পূর্বমেঘের জন্য লিখতে। তাঁদের মত বা রাজনীতি কি, তা নিয়ে মাথা ঘামাইনি। তাঁদের লেখায় প্রতিশ্রুতি আছে কিনা, শুধু সেইটা দেখেছি।

অজ্ঞাত ও অপরিচিত লেখকের রচনা শ্রদ্ধার সঙ্গে, বিনয়ের সঙ্গে আমরা বিবেচনা করেছি। আমরা কোন একটা দল নিয়ে শুরু করিনি। তবে ঘটনার চাপে যদি কোন দল গড়ে ওঠে, তাহলে সে সম্ভাবনায় আমরা সন্তুষ্ট। এখানে ‘দল’ বলতে আমরা বুঝি একটা ছোট গোষ্ঠী, যঁাদের ‘আনুগত্যের’ উপর আমরা আস্থা রাখতে পারি—দলাদলি অর্থে বুঝিনি।

পূর্বমেঘের সীমানা চিহ্নিত করেছে শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি। যদিও শিল্প ও সংস্কৃতির অর্থ নিয়ে গুরুতর মতান্তর নেই—অন্তত আমাদের গোচরে আসেনি—সাহিত্য

বলতে আমরা অনেকেই অনেক কিছু বুঝি। যেমন কেউ বুঝি সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক বাংলা সাহিত্য, কেউ বুঝি ঐতিহাসিক বাঙলার মুসলিম সাহিত্য, কেউ বুঝি পূর্ববাঙলার সাহিত্য, আবার কেউ বুঝি পূর্বপাকিস্তানের সাহিত্য। শেষ দুটি ঠিক এক বস্তু নয়। যিনি সাহিত্য বলতে শুধু পূর্বপাকিস্তানের সাহিত্য বোঝেন তিনি নিশ্চয়ই বলেন না যে ৪৭ সালের ১৪ই আগস্টের পর থেকে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলে যে সাহিত্য হচ্ছে, তাই সব,—তিনি বোঝেন যে সেইটুকুই আমাদের পক্ষে আপাতত সত্য, জলন্ত সত্য; এর বাইরে বা এর আগে যা হয়েছে তাতে তাঁর আগ্রহ নেই। আমরা প্রত্যেকেই এইভাবে সাহিত্যের একটা কার্যকরী সংজ্ঞা মনে মনে পুষছি। পূর্বমঘের তিন বৎসরের পাতাগুলি ওস্তালে যে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি বুঝতে পারবেন, আমরা যে শুধু এর মধ্যে সবচেয়ে ব্যাপক অর্থে বাংলা সাহিত্যিক বুঝেছি তাই নয়, আমরা যথাসম্ভব বাংলা সাহিত্য ও বিশ্বসাহিত্যের মধ্যে প্রভেদটাকেও গৌণ ভাবতে চেয়েছি। অর্থাৎ আমরা সাহিত্য শব্দটির আগেপিছে কোন সংকোচনসূচক বিশেষণ জুড়ে দিইনি।

অবশ্য স্বাভাবিক নিয়মেই, বাংলা সাহিত্য, বা আরও পরিষ্কারভাবে পূর্ববাঙলার সাহিত্য নিয়েই আমাদের আগ্রহ ও আলোচনা বেশী। কিন্তু আমরা মনে করি, পূর্বমঘের পৃষ্ঠায় আমরা যদি বাইরের পৃথিবীর সাহিত্য-কর্ম সম্বন্ধে মাঝেমাঝে দুটো একটা জানালা খুলে দিতে পারি, তাহলে বাংলা সাহিত্যের উপর তার ফল শূন্য হতে বাধ্য। উপমহাদেশের মধ্যে বাংলা সাহিত্যের উপর বাইরের হাওয়া যতোটা রয়েছে হয়তো আর কোন সাহিত্যেই ততোটা নয়; তবু, শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের মানদণ্ডে, বাংলা সাহিত্য এখনও প্রাদেশিকতার গণ্ডী পুরোপুরি কাটাতে পারেনি। এবং এর জন্য বেশীদূর যাওয়ার প্রয়োজন নেই। উপমহাদেশের পাঁচটি কি ছয়টি উন্নত সাহিত্যের কথা ধরুন, তালিকা যতোই বিচিত্র হোক, তিনটি বা চারটি সাধারণ নাম প্রতিটি তালিকায় থাকবে, আশা করা যায়—এদের সাথে বাংলা সাহিত্যের আত্মীয়তা কতোটা ঘনিষ্ঠ? যে অর্থে ইংরেজির সঙ্গে ফরাসির, ফরাসির সঙ্গে জার্মানের বা জার্মানের সঙ্গে ইতালিয়ার সাহিত্যের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ? যে কোন প্রধান যুরোপীয় সাহিত্যের সংগে বাকি সবকটি প্রধান যুরোপীয় সাহিত্যের যে দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্ক, বাংলার সঙ্গে সে সম্পর্ক কোন ভারতীয় সাহিত্যেরই নেই—না উর্দুর, না তামিলের, না গুজরাটীর। এটা একটা অস্বাভাবিক এবং অস্বাভাবিক পরিহিত্তি। এবং এ সম্বন্ধে, আমাদের বর্তমান সংস্কৃতির মূলধন নিয়ে বেশী কিছু করার নেই। কিন্তু পরিস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার সময় হয়েছে।

তাহলে কি পূর্বমঘের একটা কর্মসূচী থাকা উচিত? পরিষ্কার জওয়াব দিতে আমার বাধা। যে অর্থে সাহিত্য পত্রিকার একটা কর্মসূচি আছে, এবং এটা হয়তো প্রথম দৃষ্টিতেই পরিষ্কার, সে অর্থে নিশ্চয়ই না। যতোদূর মনে পড়ে তৃতীয় দশকের মাঝামাঝি, ফ্রাইটেরিয়নের ২য় কি ৩য় বৎসরে সম্পাদক এলিয়ট এই প্রশ্নটি তুলেছিলেন, এবং খুব সম্ভব বলেছিলেন, কর্মসূচি না থাকলেও একটা 'প্রবণতা' নিশ্চয়ই এই জাতীয় ত্রৈমাসিকের থাকা উচিত। যে কোন সাহিত্যে যে কোন সময়ে একই সঙ্গে কতকগুলি ধারা পাশাপাশি রয়। এর মধ্যে সম্পাদক একটি বা দুটি সম্বন্ধে উৎসাহী, বাকীগুলি সম্বন্ধে নন। তিনি পত্রিকাকে সেই একটি বা দুটি ধারার মুখপত্র হিসেবে ব্যবহার করবেন।

একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আমরাও পূর্ব বাঙলার সাহিত্যের কয়েকটি ধারাকে প্রাধান্য দিতে চেয়েছি। গল্প উপন্যাস ও কবিতার ক্ষেত্রে নতুন ধারা বলে আমরা যেগুলি চিনতে পেরেছি এবং যে ধারাগুলি আমাদের চোখে প্রতিশ্রুতির ইঙ্গিত দিয়েছে, আমরা তার সমর্থনে জায়গা দিয়েছি। কিন্তু এখনও, পূর্ববাঙলায়, সাহিত্যের ধারাগুলি খুব স্পষ্ট বা প্রখর নয়। এবং কারণ বোধহয় এই যে জাতীয় জীবনে বৃহত্তর চিন্তা-ভাবনা (ধর্ম, রাজনীতি, সমাজনীতি)—র ধারাগুলি এখনও ভালোভাবে পথ কেটে নিতে পারেনি। শেষ বিচারে, সাহিত্যের ধারা বাইরের ব্যাপকতার জীবনের গভীরতর ধারাগুলিকেই অনুসরণ করে। এই বৃহত্তর জীবনে এখনও কুয়াশাচ্ছন্ন অবস্থাটা কাটেনি, তাই সাহিত্যের অঞ্চলেও আমরা একটা নীতিগত অস্পষ্টতা দেখতে পাই।

ফলে, বাঞ্ছনীয় হলেও, পত্রিকার উপর সম্পাদকীয় ব্যক্তিত্বের ছাপ ইচ্ছে করেই আমরা চাপাইনি, কারণ আমরা মনে করি, সে সময় এখনও আসেনি। কিন্তু আমার মনে হয় এই অবস্থা বেশিদিন চলতে দেওয়া অনুচিত হবে। কারণ যদিও দল-মত প্রবণতা নির্বিশেষে ভালো লেখার সংগ্রহ নিয়ে যেসব পত্রিকা চলছে, তাদের নীতির সঙ্গে আমাদের কলহ নেই, কিন্তু সে নীতি আমাদের নয়। আমরা সাহিত্যের ঐতিহ্যে বিশ্বাস করি; এবং বিশ্বাস করি বলেই জানি, যে-সব নতুনধারা নতুন জীবন-বোধের পরিচয় বহন করছে, তারাই ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করবে, এবং আমরা সেই লেখকের জন্যই প্রস্তুত থাকব, যার মধ্যে এই জীবনবোধের প্রতিশ্রুতি আছে। আমরা পাঠকসমাজের প্রতি দায়িত্ব এইভাবেই পালন করতে চাই—পরোক্ষভাবে, প্রথমত ও প্রধানত প্রকৃত লেখকের অভ্যর্থনার জন্য নিজেদের প্রস্তুত রেখে।<sup>৫</sup>

‘চিঠিতে পত্রিকার তিন বছরের একটা পর্যবেক্ষণ আছে, এতে তরুণ সম্পাদকদের (তখন তাঁরা পয়ত্রিশ-ছত্রিশ বৎসরের; মুস্তাফা নূরউল ইসলামের জন্ম ১৯২৭, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর ১৯২৮) রোমান্টিক ভাবনারও বহিঃপ্রকাশ আছে। কিন্তু ‘রোমান্টিক’ কথাটা বোধ হয় ঠিক হলো না। এই ‘অভিলাষ’ বাস্তবায়নের জন্য তাঁরা কিছু তৎপর ছিলেন এবং একেবারে ব্যর্থ হননি বলেই পূর্বমেঘ সফল ও উত্তম সাহিত্যপত্রিকার প্রসঙ্গে এখনও প্রথমেই সমালোচকদের আলোচনায় আসে।

কিন্তু একটি বিষয় লক্ষণীয়, তৎকালে বিপুল খ্যাতি অর্জনকারী ‘পূর্বমেঘ’ ঐকালের সাহিত্য পত্রিকা বিষয়ক আলোচনা দিতে কোনো গুরুত্বই পায়নি। কেউ কেউ অতি সাধারণ পত্রিকার নাম হিসেবে তাদের গবেষণায় স্থান দিলেও ‘পূর্বমেঘ’ এর বিশিষ্ট চরিত্রের মূল্যে দননি। কেউ কেউ আবার অনিয়মের অভিযোগ আর নিয়মিত করার পরামর্শ বা ‘বিস্তৃত সম্পাদকদ্বয় পত্রিকাটিকে বাঁচিয়ে রাখবেন’ মর্মে সুপারিশ পেশ করেই আলোচনা শেষ করে দিয়েছেন। কোনো গভীর মূল্য বা মন্তব্য ঐকালে বা পরবর্তী দুই দশকে পূর্বমেঘ লাভ করেনি।<sup>৬</sup>

পূর্বমেঘ এ কবিতা লিখেছিলেন নির্বাচিত কবিগণ। অসংখ্য কবিতা তাঁরা ছাপেননি বটে, তবে উৎকৃষ্ট বহুসংখ্যক আধুনিক বাংলা কবিতা, আর বিশ্ব-সাহিত্যের মূল্যবান কাব্যসম্পদও কিছু তাঁরা অনুদিত করে এতে ছেপেছিলেন। পত্রিকার ধারাক্রম অনুসারে একবার মাত্র কবিদের নামোল্লেখ করে পার্শ্বে সংখ্যার নম্বর উল্লেখ করা হলো। সংখ্যার উল্লেখ থেকে বুঝা যাবে কে কতোটি, বা কোন্ কোন্ সংখ্যায় কোন্ কোন্ কবি লিখেছিলেন।

কবিতা : সৈয়দ আলী আশরাফ (১/১, ১/৩) ; আতাউর রহমান (১/১ ; ২/১ ; ২/৪ ; ৩/৩ ; ৩/৪ ; ৫/১) ; আবুল হোসেন (১/২ ; ১/৪) ; সৈয়দ নূরুদ্দিন (১/২) ; হাসান হাফিজুর রহমান (১/২ ; ২/৩) ; মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (১/২ ; ২/১ ; ২/২ ; ৮/৩ ; ১০/১-৪) ; জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী (১/২ ; ১/৩ ; ২/১ ; ২/৪ ; ৮/২) ; আবদুল হাফিজ (১/৩) ; জগলুল হোসেন (১/৩ ; ১/৪) ; নূরুল আরেফিন (১/৩ ; ১/৪ ; ৫/২) ; ফজল শাহাবুদ্দীন (১/৪ ; ২/২ ; ২/৩) ; মোহাম্মদ আজিজুল হক (১/৪) ; ফররুখ আহমদ (২/১ ; ২/২) ; জিয়া হায়দার (২/১ ; ২/৪ ; ৩/১-২ ; ৫/২, ৯/১-৪) ; শামসুর রাহমান (২/২ ; ৭/১-২ ৬টির একগুচ্ছ কবিতা) ; আবু বকর সিদ্দিক (২/২ ; ২/৪ ; ৮/২ ; ৮/৩ ; ৯/১-৪) ; বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর (২/২ ; ৩/৩) ; আবু হেনা মোস্তাফা কামাল (২/২ ; ২/৪ ; ১১/১ ; ১১/২-৪) ; সৈয়দ আলী আহসান (২/৩ ; ৩/৩ ; ৩/৪ ; ৮/৩ ; ৯/১-৪) ; আহসান হাবীব (২/৩ ; ৯/১-৪) ; গোলাম দস্তগীর (২/৪ ; ৫/৩-৪) ; ওমর আলী (৩/১-২ ; ৩/৪ ; ৫/৩-৪) ; হামিদুজ্জামান খান চৌধুরী (৩/১-২) ; রফিক আজাদ (৩/৩ ; ৩/৪ ; ৫/১ ; ৭/১-২) ; শামসুল হক কোরামশী (৩/৪) ; হয়াৎ সাইফ (৫/১ ; ৮/২ ; ৮/৩) ; ময়হারুল ইসলাম (৫/১ ;

৫/২; ৭/১-২); সেলিম আহমেদ (৫/১); দীনেশচন্দ্রপাল (৫/১); সিকদার আমিনুল হক (৫/১); জাহানআরা বেগম (৫/১); আবুল কাসেম (৫/২); নচিকেন্তা ভরদ্বাজ (৫/২); সানাউল হক (৫/৩-৪); জিনাত আরা মালিক (৫/৩-৪); অশোক সৈয়দ (সমস্ত ভাষায় দিলুম সমস্ত উড়াল ৫/১); সুব্রত বড়ুয়া (৫/৩-৪); হায়াৎ মামুদ (৭/১-২); এস.এম. লুৎফর রহমান (৭/১-২); রাজিব আহসান চৌধুরী (৮/২); আনোয়ারুল করিম (৮/৩); মহসিন রেজা (৮/৩); সেলিম সারোয়ার (৮/৩); ১০/১-৪); মহাদেব সাহা (৮/৪); ১০/১-৪); রেজাউল হক (৯/১-৪); জাহিদ হোসেন (১০/১-৪); মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১১/১); মঞ্জুরে মওলা (১১/২-৪);

গল্প লিখেছিলেন মুস্তাফা নূরউল ইসলাম (স্বাতী নক্ষত্রের শিশির, ১/২); আজীজুল হক (সীমানা, ১/৩); একজন চরিত্রহীনের সপক্ষে, ১/৪; পরবাসী, ৭/১-২; আমতু আজীবন, ৮/২; শোণিত সেতু, ৯/১-৪); জগলুল হোসেন (জন্মলগ্ন, ২/১), হুমায়ুন চৌধুরী (মৃত রাত, ২/২); ফজলুর রহিম (মেলা, ২/৩); আবু রুশদ (হারজিৎ, ২/৪); শেখ আতাউর রহমান (হঠাৎ দেখা, ৩/১-২); টেরোডাকটাইল, ১০/১-৪); আজীজুল হক (কান্নার মানে, ১/৩; উপেক্ষিত অঙ্ককার, ১০/১-৪); নুরুল আলম (খিসিস, ১/৪); শওকত আলী (বিদায় গোধূলী, ৩/৩); অশোক সৈয়দ (৬/৩-৪); আশরাফুল ইসলাম (কুয়াশার রং, ২/৪; স্বগত, ৫/১); আবদুল মান্নান সৈয়দ (অধঃপতন, ৫/২); আবুবকর সিদ্দিক (দেবদূতদের বিষয়ে, ৫/৩-৪); শহীদুর রহমান (দেয়ালের দাগ, ৫/৩-৪, পঞ্চম দিনের রাতে, ৮/৪); ফারুক আলমগীর (চন্দন চতুর্দালা, ৭/১-২); আবদুস শাকুর (বিচলিত প্রার্থনা, ৮/১); অসিত রায় চৌধুরী (নিবিড় তিমিরে, ৮/৪); সনৎ কুমার সাহা (সিদ্ধার্থ, ৮/৪);

অনুবাদের শৈল্পিক মানের দিক থেকে পূর্বমেঘ বিশেষ মর্যাদা লাভ করতে পারে। কারণ, পরিক্রম নাগরিক কণ্ঠস্বর ও দুচারটে আধুনিকমনস্ক সাহিত্যপত্রিকায় প্রকাশিত অনুবাদ-রচনার পাশাপাশি পূর্বমেঘের অনুবাদ পড়লে সুখপাঠ্যগুণে পূর্বমেঘকেই প্রশংসা করতে হয়। কবিতা, গল্প, নাটক প্রবন্ধ সবই কিছু কিছু অনুদিত হয়েছে। তার মধ্যে কবিতা ও নাটকই যেন বেশি। জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী অনুবাদ করেছিলেন বিশ্ববিখ্যাত আধুনিক কবি টি.এস. এলিয়ট এর কবিতা (১/১)। আলেক্স কমফোর্ট থেকে অনুবাদ (কবিতা) করেছিলেন আখতার হোসেন (২/১)। স্যাজন পোর্স এর থেকে এলিয়টকৃত ইংরেজিতে অনুদিত কবিতার বাংলায় ভাষান্তর করেন জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী (২/৩); ফখরুজ্জামান চৌধুরী ইতালিয় কবি গ্যিসেপ উনগোরিস্তির কবিতা অনুবাদ করেন ‘স্মরণে-প্রশান্তি’ শিরোনামে (২/৪)।

ইবন আর রুমী নামক আরবী কবি রচিত কবিতা অনুবাদ করেন ‘নারসিসাস’ শিরোনামে আবদুস সান্তার (৩/৩)। আরবী কবি হাতিম আততাই থেকে আবদুস সান্তার ৩ বর্ষ ৪ সংখ্যায় অনুবাদ করেন কবিতা ‘তোমার প্রেম’। ফ্রেডারিক হেন্ডার্লিন থেকে রফিক আজাদ অনুবাদ করেন ‘নিয়তিসঙ্গীত হাইপেরিয়ান’ (৫/১)। ফরাসি কবি পল ক্লদ এবং ফ্রঁসিস এর কবিতা অনুবাদ করেন এবনে গোলাম সামাদ (৮/১)। স্পেনীয় কবি ফেদেরিকো গারথিয়া লোরকা থেকে কবিতা অনুবাদ করেন হায়াৎ মামুদ (৮/১); নুরুল আরেফিন অনুবাদ করেছিলেন ইতালীয় কবি জিনো ক্যাম্পালা, জোসেফ আনগারেস্তি, ইউজিনো মনতেল প্রমুখের কবিতা (৮/১)। হার্বট রীড এর কবিতা ‘অভিজ্ঞতা বিপরীত’ অনুবাদ করেছিলেন গোলাম দস্তগীর (৮/৪)। এগারো বর্ষে (১ম সংখ্যা) এবনে গোলাম সামাদ অনুবাদ

করে দিয়েছিলেন আরও ফরাসি কবিতা। এর পরের সংখ্যাতে (১১/২-৪) জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী অনুবাদ করেন জন মিল্টনের কবিতা থেকে ‘শোকাচ্ছান শ্যামসন’।

অনূদিত গল্পের মধ্যে আছে; আলবার্তো মোরাভিয়ার অনুবাদ মেক্সিকোর মেয়ে। ৩১ পৃষ্ঠাব্যাপী দীর্ঘ গল্পের অনুবাদক হাবিবুর রহমান (১/১)। ভ্লাদিমির নবোকভ থেকে ‘অরেলিয়ান’ এর অনুবাদক মুখলেছুর রহমান (২/১)। আলবেয়ার কামু থেকে ‘সিসিফসের উপাখ্যান’ অনুবাদ করেন সারোয়ার মুর্শেদ (২/৩)। উইলিয়াম ফকনার এর গল্প ‘ওয়াশ’ অনুবাদ করেছিলেন মুখলেছুর রহমান (৩/৩)। আহমদ নদীম কাসমীর ‘আরেক আকাশ’-এর অনুবাদক মোহাম্মদ আজিজুল হক (৫/১)। জঁ্যাপল সার্তের গল্প ফরাসি থেকে অনুবাদ করেন এবনে গোলাম সামাদ (প্রাচীর, ৫/৩-৪)।

আলবার্তো মোরাভিয়ার গল্প থেকে ‘আত্মজ’ নামে অনুবাদ করেছিলেন অসিত রায় চৌধুরী (১১/১)। এছাড়াও মাইকেল পোলানীর ‘মানববিদ্যা প্রসঙ্গে’ প্রবন্ধ অনুবাদ করেছিলেন মফিজউদ্দিন আহমদ (২/১)। ব্রেটল্ট ব্রেখট এর প্রবন্ধ ‘ম্যাকবেথ ও এপিক থিয়েটার’ অনুবাদ করেন উমর হাবিব (৫/২); এবং জে. বি. প্রিন্সটলির ‘ডেঞ্জারাস কর্নার’ শীর্ষক নাটক এর অনুসরণে অনুবাদ করেন কবির চৌধুরী ‘অচেনা’ প্রথমবর্ষ চতুর্থ সংখ্যা থেকে।

ডব্লিউ বি ইয়েটস এর একাঙ্কিকা ‘ক্যাথলিস্ নিছলিয়ানও অনুবাদ করেছিলেন কবীর চৌধুরী (৫/১)। টলস্টয়ের নাটক থেকে ‘মাতাল’ রূপান্তরিত করেছিলেন মাহমুদ হাসান (৫/১)। আলী আনোয়ার জ্যা আনুইকৃত নাটকের অনুবাদ করেন ধারাবাহিক এর অষ্টম বর্ষ প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যায়।

পূর্বমেঘ এর কয়েকটি পুস্তিকায় স্থায়িত্ব লাভ করতে পেরেছে—এমন অনেক লেখাই প্রকাশিত হয়েছিল। এর মধ্যে হাসান আজিজুল হক প্রণীত উপন্যাস ‘বৃত্তায়ন’ দ্বিতীয় বর্ষ প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। তাঁর ‘শামুক’ প্রকাশিত হয় তৃতীয় বর্ষ প্রথম-দ্বিতীয় যুগ্মসংখ্যা থেকে। ‘জীবন ঘষে আগুন’ নামকরা একটি বই পূর্ববাঙলার কথাসাহিত্যে, এটিও এই পত্রিকায় (১১/২-৪) ছাপা হয়েছিল। এর প্রবন্ধ এবং আলোচনা-সমালোচনাসমূহও অতি-আধুনিক শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রভাবে উজ্জীবিত এবং সমকালীন রাজনীতি ও সমাজভাবনায় তাড়িত, সচকিত। শুধু বক্তব্যের দিক থেকেই নয়, শিল্পসুখমা এবং পূর্ববাঙলার আধুনিক সাহিত্যচিন্তার অকপট চিত্র বা বিশ্বস্তদলিলরাপেও এর গুরুত্ব অপরিসীম। ‘আলোচনা’ এবং ‘গ্রন্থ-সমালোচনা’ গুলোও প্রবন্ধের মানসম্মতই। বলাবাছল্য আলোচনার পটভূমি সুসাহিত্যিক এবং আকার-পরিসরের দিক থেকেও গ্রন্থালোচনা কিংবা বিভিন্ন প্রসঙ্গের ‘আলোচনা’ প্রবন্ধের কাছাকাছি বিবেচনা করে প্রবন্ধের সঙ্গে উল্লেখ করা হলো।

- \* আবদুল হাফিজ — জীবনানন্দ দাশ : একটি ভূমিকা (১/১); সুধীন্দ্রনাথের গদ্য (২/২); অসন্তুষ্ট বীট জেনারেশন (৩/৪);
- \* আতাউর রহমান—নজরুল ইসলাম প্রসঙ্গে (১/৩);
- \* আবুল কাসেম চৌধুরী—‘পূর্বপাকিস্তানের সাহিত্যে চিন্তাধারা’ (সাজ্জাদ হোসায়নের লেখার প্রতিক্রিয়ায়, ১/৩); মেঘনাদবধ কাব্যের শতবর্ষ (২/৩);

- \* আহমদ হোসেন—লিও টলস্টয়ের ৫০তম মৃত্যুবার্ষিকী (উদযাপিত হলে তার প্রতিক্রিয়ায় তাঁর জীবনদর্শন ও সাহিত্যালোচনা, ১/৩) ;
- \* আবুল ফজল—সাহিত্যে আধুনিকতা (২/৪) ;
- \* আবু জুন্দ—সমসাময়িক ঘটনাবিচার (৫/১) ;
- \* আশিকুর রহমান—ঔপন্যাসিক নজরুল (৫/২) ;
- \* আমানুল্লাহ আহমদ—পূর্বপাকিস্তানের উপন্যাসে সমাজচিত্র (৮/৩) ;
- \* এ. কে. তৌফিকুর রহমান—আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগার ইতিহাস আলোচনা, (১/৪) ;
- \* এ. বি. এম. মোশাররফ হোসেন—ফতেহপুর সিক্রির মর্মবাণী (৩/১-২) ;
- \* ওয়াহিদুল হক—প্রবাসী আয়াত আলী (ওস্তাদ-এর মৃত্যুতে সৎস্কৃতি ও সঙ্গীত সম্পর্কে ৩৫ পৃষ্ঠা ব্যাপী দীর্ঘতর পরিসরে বিস্তারিত আলোচনা, ৮/৩) ;
- \* কবীর চৌধুরী—আর্নেস্ট হেমিংওয়ে : সগ্রাম ও মৃত্যুর শিল্পী (২/২) ; জন স্টেইনবেক (৩/৩) ;
- \* খন্দকার সিরাজুল হক—হুমায়ুন কবিরের সাহিত্যচিন্তা (১১/১) ;
- \* গোলাম মুরশীদ—দুই পরাজিত বিদ্রোহী সৈনিক (মধুসূদন ও নজরুল প্রসঙ্গে, (৮/৪) ; মাইকেল ও সুবীন্দ্রনাথ (দীর্ঘ প্রবন্ধ ; ৩৭ পৃষ্ঠাব্যাপী, ১০/১-৪) ; বিদ্রোহী শ্রেমিক (নজরুল বিষয়ক, ১১/১) ;
- \* জিন্নুর রহমান সিদ্দিকী—কোম্পানী আমলে শিক্ষার সূচনা এবং মাধ্যম (১/৪) ; সৎস্কৃতি ও সমকাল (৩/১-২) ; চিঠি (৫/১) ; ইংরেজীর ভবিষ্যৎ (৭/১-২) ; রবীন্দ্রনাথ ও আমরা (৮/১, অ্যারিওপ্যাটিটিকা (মিল্টনবিষয়ক, ১১/২-৪) ;
- \* ডা. জাকিয়া—ইয়ুডের বৈশ্বিক মনোবিদ্যা (২/২) ;
- \* ফজলুর রহিম—মহাকবি কায়কোবাদ (২/৪) ;
- \* বখতিয়ার শাহ—সুবীন্দ্রনাথ দত্ত (১/২) ;
- \* বদরুদ্দিন উমর—আত্মনিয়ন্ত্রণ ও গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদ (৩/৩) ; সাম্প্রদায়িকতা (৫/১) ; মুসলিম জাতীয়তাবাদ ও মুসলিম সৎস্কৃতি (৫/৩-৪) ; সাম্প্রদায়িকতা : লেখকের জবাব (৭/১-২) ; মুসলিম সৎস্কৃতি (৮/১) ;
- \* মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম—কাজী নজরুল ইসলাম (১/১) ;
- \* মুখলেছুর রহমান—মুঘল চিত্রকলা (১/৩) ; ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব (১১/২-৪) ;
- \* মুহম্মদ হাবিবুর রহমান—ঐতিহাসিক সেমিয়ার (এ যুগের শ্রেষ্ঠ ইংরেজ ঐতিহাসিকের মৃত্যুতে, চিন্তাধারার পরিচয় (১/২) ;
- \* মুহম্মদ এনামুল হক—*Budhist Mystic Songs : Edited by Dr. Muhammad Shahidullah.*
- \* মুহম্মদ আনোয়ার—নজরুল প্রসঙ্গে (২/২) ; বাংলা ছোটগল্পের পটভূমি ও প্রাথমিক প্রচেষ্টা (২/৪) ; রবীন্দ্র ছোটগল্পে প্রকৃতি (৩/১-২ ও অন্যান্য) ; নতুন ও পুরাতন (৫/১) ; সাম্প্রতিক শ্রেণীসীমার সমালোচনা (৫/২) ;
- \* মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান—আধুনিক কাব্যে লোকসাহিত্যের প্রভাব (৩/১-২) ;
- \* মুহম্মদ শমসের আলী—রাজশাহীর শিক্ষাক্ষেত্রে জমিদারদের ভূমিকা (৫/১) ;
- \* মোহাম্মদ আলী—বাংলা নাটক ও শ্রেণীসীমার (৫/২) ;
- \* মুস্তফা নূরউল ইসলাম—মুসলিম বাঙলায় জনমতের উন্মেষ ও সাময়িকপত্র সাধনা (৮/২) ;
- \* মহাদেব সাহা—আনন্দের মৃত্যু নেই (রবীন্দ্রকাব্য ও কবিতার দীর্ঘ আলোচনা, ৯/১-৪) ;

- রফিকুল ইসলাম—যে হোক সে হোক ভাষা কাব্যরস লয়ে (২/৩) ; বাংলা ভাষাতত্ত্ব (৩/১-২) ;
- রমেন্দ্রনাথ ঘোষ—নৈতিক মতাদর্শের দার্শনিক পশ্চাৎভূমি (রবীন্দ্র-দর্শন বিষয়ক, ১০/১-৪) ; অস্তিত্ববাদ এবং নৈতিক মূল্যবোধ (১১/২-৪) ;
- শাহানারা হোসেন—প্রাথমিক মধ্যযুগে বাঙালী নারী (২/৩) ; সঙ্ঘায়কর নদীর 'বরেন্দ্রী' (৩/৪) ;
- শেখ আতাউর রহমান—দি লাষ্ট সামার : বোরিস পাস্তেরনাক (৯/১-৪) ;
- সুলতান আহমদ—দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ১৯৬০-৬৫ (১/১) ;
- সালাহউদ্দীন আহমদ—উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বাংলার নাগরিক সমাজ (২/১) ; ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি (৫/২) ; সাম্প্রদায়িকতা (৭/১-২) ;
- সুধেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য—কান্তকবি রজনীকান্ত সেন ২/৩) ;
- সনৎকুমার সাহা—কোয়েসলারের দর্শন (৩/৩) ; তুলনামূলক বিচারের রামায়ণ ও ইলিয়ড (৩/৪) ; রবীন্দ্রসাহিত্যে দ্বিতীয় দিগন্ত (৫/১) ; সাহিত্যের দুই পুরুষ শ্রী কৃষ্ণ ও ডনজুয়াল (স্প্যানিশ-সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ, ৭/১-২) ; শিক্ষা ও প্রগতি (৮/২) ; তিমিরাচ্ছন্ন কবিতাগুচ্ছ : রবীন্দ্রনাথ (হয়াৎ মামুদের লেখার প্রতিক্রিয়া, ৯/১-৪) ; জীবন ও সাহিত্যের ধারা (প্রাচীন সাহিত্যের ও ধর্ম-দর্শনের প্রেক্ষাপটে, ১১/১) ;
- সৈয়দ মুর্তাজা আলী—দৌলত কাজী (১/১) ;
- সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন—পূর্বপাকিস্তানের সাহিত্যে চিন্তাধারা (১/২), 'সাম্প্রদায়িকতা', (৭/১-২) ;
- হাসান আজিজুল হক—শোপেন হাওয়ার (ঠাঁর দার্শনিক চিন্তার পরিচয়, ১/২) ;
- হয়াৎ মামুদ—তিমিরাচ্ছন্ন কবিতাগুচ্ছ : রবীন্দ্রনাথ (৮/৪) ;

পূর্বমধ্যে তৃতীয় শ্রেণীর বা নিকৃষ্টমানের কোনো পুস্তক-পুস্তিকা, গৃহ-পত্রিকার আলোচনা দেখা যায় না। আবদুর রশিদ খান ও মোহাম্মদ মামুন সম্পাদিত 'প্রেমের কবিতার' আলোচনা করেন বখতিয়ার শাহ (১/১) ; সৈয়দ আলী আশরাফ প্রণীত 'চৈত্র যখন' এবং আবদুল গনি হাজারী প্রণীত 'সামান্যধন' এর আলোচনা করেন আজিজুল হক (১/১)। জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী লেখেন শামসুর রাহমানের 'প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে' এবং আতিকুর রহমান ডক্টর মযহারুল ইসলাম প্রণীত 'সাহিত্যপথের' পরিচয় দেন (১/২)।

প্রথম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যায় সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী প্রাসঙ্গিক মন্তব্য করেন রণেশ দাশগুপ্ত প্রণীত 'উপন্যাসের শিল্পরূপ' শীর্ষক গ্রন্থের ওপর। মাহমুদ মোকাররম হোসেন প্রণীত গল্প সংকলন 'সূর্য স্বপ্ন'র ওপর লেখেন মতিয়র রহমান ; এবং ফজলে রাব্বী খুব বিরূপ সমালোচনা লেখেন সৈয়দ শামসুল হক প্রণীত 'দেওয়ালের দেশ' উপন্যাসটির। প্রথম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যায় আজিজুল হক কর্তৃক আলোচিত হয় সৈয়দ আলী আহসান প্রণীত কাব্যগ্রন্থ 'অনেক আকাশ'।

পরের সংখ্যাতে (২/১) ৯ ভ. Priestly রচিত literature and westernman (প্রকাশক Harper and Brothers, New York) এর বিষয়বস্তুর বর্ণনা দেন সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ; এবং জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী বিশ্লেষণ করেছিলেন আবুল ফজলের 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি সাধনার' চিন্তার উৎকর্ষ। ফজলে রাব্বী এবারও একটি উপন্যাস প্রসঙ্গে আলোচনা করেন—তাহলো : রশীদ করীমের 'উত্তম পুরুষ'।



দ্বিতীয় বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় গ্রন্থপরিচয় প্রদান করেন রোকেয়া খাতুন ‘নজরুল রচনাসম্ভার’ এর। আবদুল হাফিজ মস্তব্য করেন ওমর আলীর কাব্য ‘এদেশে শ্যামল রঙ রমণীর সুনাম শূনেছির’ ওপর। আজিম উদ্দিন আহমদ, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ও রাজিয়া খানের বই যথাক্রমে ‘বহিষীরা’ ও ‘আবর্ত’র ওপর ; এবং ডক্টর ময়হারুল ইসলামের গল্পগ্রন্থ ‘তালতমাল’ এর ওপর লেখেন আবুল কাশেম চৌধুরী। পরবর্তী (২/৩) সংখ্যায় Vance Packard রচিত পেঙ্গুইন প্রকাশিত The Hidden Persuaders এর ওপর বদরুদ্দীন উমর ; আর সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন-এর পুস্তক Mixed Grill এর ওপর লেখেন আমানুল্লাহ আহমদ।

আবুল কাশেম চৌধুরী বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীরের গল্পগ্রন্থ ‘অবিচ্ছিন্ন’র উপরও লিখেছিলেন একটি (২/৪) সংখ্যাতে। দেখা যায় বদরুদ্দীন উমর কেবল প্রবন্ধই লেখেননি, পূর্বমেঘ-এ বেশকিটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের চিন্তাধারার স্বরূপ বিশ্লেষণের প্রয়াসও পেয়েছিলেন। আর্থার কোয়েসলারের ‘The Lotus and The Robot’ শীর্ষক গ্রন্থের ওপর লিখেছিলেন ২য় বর্ষ ১-২ সংখ্যায়। সালাহউদ্দিন আহমদ এবং ফজলে রাবিব ঐ সংখ্যাতে গ্রন্থ-পরিচয় লিখেছিলেন (কিন্তু পত্রিকাটি খণ্ডিত বলে গ্রন্থের নাম জানা যায়নি)।

তৃতীয় বর্ষ তৃতীয় সংখ্যায় আনোয়ার পাশা সমালোচনা করেছিলেন আলাউদ্দিন আল আজাদের ‘ভোরের নদীর মোহনায় জাগরণ’ ও সৈয়দ শামসুল হক প্রণীত ‘একদা এক রাজ্যে’ শীর্ষক কাব্যগ্রন্থের ওপর। আবদুল হাফিজ শওকত ওসমানের প্রখ্যাত উপন্যাস ‘ক্ৰীতদাসের হাসির’ ওপর লিখেছিলেন তৃতীয় বর্ষ চতুর্থ সংখ্যায় এবং ফররুখ আহমদ এর ‘লৌফেল ও হাতেম’ এর ওপর পঞ্চম বর্ষ প্রথম আঘাট ১৩৭১ সংখ্যায় (এতে বুঝা যায় বইটি ১৯৬৪ সনের মধ্যেই প্রকাশিত হয় ; কিন্তু বাংলা একাডেমী প্রকাশিত ‘বাংলাদেশের লেখক পরিচিতি’ তে ১৯৬৭ লেখা হয়েছে)।

পূর্বোক্ত সংখ্যায়ই (৫/১) হায়াৎ সাইফ লিখেছিলেন সানাউল হকের ‘সম্ভবা অনন্যা’ শীর্ষক কবিতাপুস্তকের ওপর। আবু হেনা মোস্তফা কামাল লিখেছিলেন আহসান হাবীবের তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ ‘সারা দুপার’ এবং খোন্দকার সিরাজুল হক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর ‘অন্বেষণ’ শীর্ষক প্রবন্ধসংগ্রহের ওপর।

আরও যে সমস্ত পুস্তক-পুস্তিকা সমালোচিত হয় মূল-লেখক, আলোচিত পুস্তক, আলোচক ও পত্রিকার বর্ষ সংখ্যা—এই ক্রমানুসারে নিম্নে উল্লেখ করা হলো ; আ. ন. ম. বঙ্গলুর রশীদ—‘উত্তর ফাল্গুনী’ (ক) ; নূরুল মোমেন—‘নয়া খন্দান’ (না) ; আনিস চৌধুরী —‘মানচিত্র’ (না) ; —আলোচক : ছদরুদ্দিন আহমদ (৫/৩-৪) ; রশীদ করীম—‘প্রসন্নপাষণ’ (ডে) —আবু হেনা মোস্তফা কামাল (৫/৩-৪) ; আহমদ শরীফ —‘মধ্যযুগের কাব্যসংগ্রহ’ (সম্পাদনা/সংকলন)—হায়াৎ সাইফ (৫/৩-৪) ; সানাউল হক—‘বরিস পাস্তারনাক’ (অনুবাদ)—হায়াৎ মামুদ (৫/৩-৪) ; সিকান্দার আবু জাফর—‘সমকাল কবিতা সংখ্যা’ (সম্পাদনা, পত্রিকা)—হায়াৎ সাইফ (৬/১-২) ; শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী—‘যশোর খুলনার ছড়া’ (সম্পাদনা, বা/এ) —আবদুল হাফিজ (ঐ) ; আলমগীর জলীল—‘রাজশাহীর ছড়া (ঐ,ঐ)। জ্যোতিপ্রকাশ দস্ত—‘দুর্দিনীত কাল’ (গ)—ইমরুল কায়েস (ঐ)। হাসান আজিজুল হক—‘সমুদ্রের স্বপ্ন শীতের অরণ্য—আবদুস শাকুর (৮/১) ; সাদত আলী আখন্দ—‘তেরো নম্বরে পাঁচ বছর’ (স্মৃতি)—ইমরুল কায়েস (ঐ) ;

শাহেদ আলী—‘একই সমতলে’; আজীজুল হক—‘হয়তো নক্ষত্র নয়’—কুলসুম চৌধুরী (ঐ) ; হাসান আজিজুল হক—‘আত্মজ্ঞা ও একটি করবীগাছ’—কুলসুম চৌধুরী (৮/৩) ; বদরুদ্দীন উমর—‘সংস্কৃতির সংকট’—সনৎ কুমার সাহা (ঐ) ; গণমুখী সাহিত্যের প্রচারক সঞ্জনী শিল্পী ও সাহিত্যিক গোষ্ঠীর অধিষ্ঠাতার জয়ধ্বনি, সঞ্জনী—তিনিটি পত্রিকার আলোচনা করেন ইমরুল কায়স (৮/৩) ; লুৎফর রহমান সরকার—‘দৈনন্দিন’—রাশেদ জামাল (ঐ) ; কাজী দীন মুহম্মদ—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম ও ২য় খণ্ড)—সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায় (৮/৪) ; সেলিনা হোসেন—উৎস থেকে নিরন্তর (গ)—মুহম্মদ আবদুল হাফিজ (ঐ) ; মুস্তাফা নূরউল ইসলাম—‘মুসলিম বাংলা সাহিত্য’—সনৎ কুমার সাহা (ঐ) ; জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত—বহেনা সুবাতাস—মহাদেব সাহা (৯/১-৪) ; নাজিম মাহমুদ—‘চেতনার সৈকতে’—ফজলে রাব্বী (৯/১-৪) ; আইনুদ্দীন আহমদকৃত ও মুহম্মদ আবদুল হাফিজ সম্পাদিত—অন্যদিন : অন্য কবিতা—মোহসিন রেজা (৯/১-৪) ; মুজিবুর রহমান অনুদিত—স্যার সৈয়দ আহমদের ‘রচনাবলী’ ও ‘পত্রাবলী’—এ. কে. এম. মহীউদ্দীন (১০/১-৪) ; আবুল হোসেন—বিরস সংলাপ ; শামসুর রাহমান—নিজ বাসভূমি ; ফজল শাহাবুদ্দীন—আকাঙ্ক্ষিত অসুন্দর—শিল্পুর রহমান সিদ্দিকী (১১/১) ;

গ্রন্থালোচনাগুলোতে বিভাগোত্তর পূর্ববঙ্গের সাহিত্য-পরিস্থিতির নানা প্রকার সমালোচনা আছে, সানাউল হকের ‘সম্ভবা অনন্য’ শীর্ষক কাব্যালোচনায় আলোচক উল্লেখ করেন ‘বিভাগোত্তর সাময়িক পক্ষাঘাত ও নৈরাজ্য আমাদের কাব্যসৃষ্টিতে যে ক্ষণিক স্থবিরতার চিহ্ন ঐকে দিয়েছিল তার অবলোপ আজকে ঘটেছে ; এবং সামাজিক ও ধর্মীয় উৎকেন্দ্রিকতার একটা শাখাকে অক্ষত রেখেও আমাদের এই অর্বাচীনকালে পূর্বপাকিস্তানের কাব্য-মানস বহুমুখী বিবর্তনের সম্ভাবনা সূচিত করেছে। এর মধ্যে বিভিন্ন বুদ্ধিদাহ্য বিশিষ্ট বিষয় কিঞ্চিৎ উদ্ভাপ বিতরণ করলেও অপেক্ষাকৃত আবেগ গ্রাহ্য ভাবপ্রবণ রোমান্টিকতা...উনিশশ তেষ্টির উপকণ্ঠেও অব্যাহত।’

আবদুল হাফিজ ফররুখ আহমদের ‘নৌফেল ও হাতেম’ শীর্ষক নাটকের সমালোচনাকালে বলেন :

পূর্ব বাঙলার সাহিত্যে নাটক রচনার ব্যাপারটি এমনিতেও খানিকটা দুঃসাহসের কাজ। সার্থক নাটক এ পর্যন্ত (১৩৭১) আমরা পাইনি, যার মধ্যে একাধারে মঞ্চধর্মিতা ও অন্যদিকে সাহিত্যিক উৎকর্ষের সমাবেশ ঘটেছে। ... কিন্তু পূর্ববাঙলায় ... কবিতা যেমন আমাদের হাতে,—অন্তত বিভাগোত্তর কালে একটা শ্রেষ্ঠ শিল্পে উন্নীত হয়নি—তেমনি হয়নি নাটক। গদ্যে রচিত নাটকের সংখ্যা কম—আর যা আছে তাও শিল্পকর্মের নব্বীর হিসেবে (নাটকের জটিল স্বভাবের কথা স্মরণে রেখে) উল্লেখযোগ্য নয়। সুতরাং এ মুহূর্তে ‘নৌফেল ও হাতেম’ হাতে নিয়ে বিপন্ন বিস্ময়ের সন্মুখীন হওয়া ছাড়া পথ থাকে না। ... ফররুখ আহমদ কবি—ঠাঁর কাছে আদর্শ কাব্য-নাটক আশা করি না—বিশেষ করে ঠাঁর সামনে কোনও বাংলা কাব্য-নাটকও উপস্থিত নেই। পূর্ববাঙলার কাব্য-নাটকের ইতিহাসে চিরকাল এক্ষেত্রে তিনি পথিকৃত বলে গণ্য হবেন।

... ফররুখ আহমদ ইসলামী জীবনধারায় বিশ্বাসী হলেও তিনি আসলে পূর্ববাঙলার প্রগতিসাহিত্যেরই ধারক ও বাহক। ঠাঁর সিদ্ধবাদ সমুদ্রবিহারী—নোনা পানির হাঙ্গামে সে করতে চায় সফল গোসল। ঠাঁর হাতেমতাসী গগন-বিহারী হয়েও ধূলিমলিনতাকে অস্বীকার করেনি। ফেরেশতা আর মানুষের হাড় দিয়ে তার অবয়ব গঠিত। ফররুখ আহমদের রাজনৈতিক সচেতনতা যদি আজ ঠাঁর কাব্যকে ছাড়িয়েও গিয়ে থাকে—তবু বলবো ঠাঁর জাতীয়তাবাদ সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত। নৌফেল-চরিতে রূপায়িত হয়েছে হীনমানসিকতার অধিকারী, অঙ্ক দেশপ্রেমের (Chauvinism) পূজারী, অপরিচ্ছন্ন রাজনীতির পাটোয়ারী ও এদেশের মুনাফাখোর ব্যবসায়ী রাজনৈতিক কর্মীর মনোভাব। মুসাফির সাদ্চাসচেতন নাগরিক (conscious citizen), বৃদ্ধ সং নাগরিক আর মুর্শিদ প্রজ্ঞার প্রতীক। ... আজকের মুসলিম দুনিয়াকে ফররুখ আহমদ চিত্রিত করেছেন... কিন্তু সে চিত্র অস্পষ্ট—শওকত ওসমানের মতো (ক্রীতদাসের হাসি) আরও বলিষ্ঠ হওয়ার অবকাশ ছিল ঠাঁর।’

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর 'অন্বেষণ' সম্পর্কে খোন্দকার সিরাজুল হক সর্বত্র প্রশংসা করতে পারেননি। স্পষ্ট উক্তিতে অনেক নিন্দা-মন্দ করা হলেও সমালোচকের উদ্দেশ্য মহত ও সদর্থক। আবু হেনা মোস্তফা কামাল 'সারা দুপুর' প্রসঙ্গে লিখেছিলেন : 'প্রকরণ সম্পর্কে অতিরিক্ত মনোযোগ কবিতার লাবণ্যকে নষ্ট করে কি? এই প্রশ্ন দিয়েই আলোচ্যগ্রন্থ সম্পর্কে বক্তব্যের অবতারণা করা যাক। ... আহসান হাবীবের...পড়তে গিয়ে এই সব পাশ্চাত্তি আমার চিত্তকে অধিকার করেছে। তার প্রথম কারণ সম্ভবত এই যে 'রাত্রি শেষের' স্মৃতি ও আহসান হাবীব যেন আমাদের কাছে, অভিন্ন। যে মধ্যবিত্ত চেতনা এবং উপলব্ধির আন্তরিক আবেগে 'রাত্রিশেষের' পাঠককে মুগ্ধ করেছিল—তার অনুপস্থিতি 'ছায়া হরিণে' স্পষ্ট। তৃতীয়তঃ 'সারা দুপুরের' প্রকরণ বাদ দিলে আহসান হাবীবকে চেনার মতো অন্য কিছু অবশিষ্ট নেই। একজন কবির ক্ষয়কে কিংবা মৃত্যুকে এমন স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করার মতো বেদনাদায়ক ব্যাপার সবসময় ঘটে না। সব সময় ঘটনা বলেই হয়তো তা এতো নিদারুণ।'<sup>৯৯</sup>

আলোচনা সমালোচনা বা পরিচিতিগুলো উন্নতমানের সাহিত্যদর্শ সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষী, ভালো। এই ধরনের সাহসী, প্রত্যয়ী সমালোচনা এবং প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়ে পাঠক ও লেখকদের নিয়ে যে সাহিত্যসমাজ—তাকে পুনর্গঠনের ও সংহত সৌন্দর্যময় করে তোলার জন্যে পূর্বমেঘ ভূমিকা পালন করেছে।

পূর্বমেঘ-এর সাহিত্য সংস্কৃতি ও সমাজচিন্তা বাংলাভাষা সাহিত্য এবং বাঙালির জাতীয়তাবাদী মূলধারার চিন্তার অগ্রগতির সহায়ক-পরিপোষক ছিল। এতে মুদ্রিত হয়েছে আধুনিক জীবনঘনিষ্ঠ অনুভূতির কাব্যিক অভিব্যক্তি। কবিদের মধ্যে যেমন আছেন দেশের প্রধান কবিগণ, তেমনি তাঁদের উৎকৃষ্ট রচনাটিই ছাপা হয়েছে পূর্বমেঘে।

ফররুখ আহমদ যখন এই পত্রিকায় লিখেছেন, তখন ইসলামী ভাবধারার পাকিস্তানী যোশের কবিতা না লিখে পত্রিকার চারিত্র স্মরণে রেখে লিখেছেন 'একটি প্রেমের কবিতা' : 'মেঘের আড়াল থেকে বিচ্ছুরিত দিনান্তের শিখা/বলে গেল অন্তমুখী প্রেমের কাহিনী : নদী, নারী/যে হও সে হও তুমি দেখ এ উজ্জ্বল তরবারি/শহীদের তাজা রক্তে লেখা এই প্রেমের কবিতা।'<sup>১০০</sup>

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান 'বর্ণমনি, শতবার্ষিক', 'ফাল্গুনের আসন্ন শৈশবে' ইত্যাদিতে একুশের প্রেরণা দ্বারা উদ্বুদ্ধ কবিতা লিখেছেন : "রেখে যাও হাতের সোনা হাতে,/খুলে নাও বর্ণমনি, সাথে/কি আছে কি নেই, অবহেলা/করে কি ঝরবে সারা বেলা।... যদিও হৃদয় পুরাতন/তবু এর প্রসন্ন বৈভবে জ্বলেছে নবীন আয়োজন/ফাল্গুনের আসন্ন শৈশবে।'<sup>১০১</sup>

আতাউর রহমানের কবিতায় সমাজচিত্র এবং সমকালীন ভাবনার প্রকাশ রয়েছে : "নতুন জগতে আমি বেছে নিই নতুন বন্ধুকে/ধর্মের দালাল কিংবা প্রকাশক কিংবা ঠিকাদার.../আমাকে ভোলায় নিত্য হেগের দ্বাস্থিক দর্শন—/ বিদেশের বড় ডিগ্রি কোনমতে বাগাতে পারলেই/উচ্চমার্গ অনিবার্য,—মাইনে বাড়ে, ভাতাও দ্বিগুণ—/ সে আসন্ন স্থায়ী হলে তৃপ্ত হই আল্লাহর দরগায়।'<sup>১০২</sup>

আহসান হাবীবের একটি কবিতার কিয়দংশ—“যৌবনে জীবনে তুমি, / তোমারই অভাব  
নিত্য নবরূপে তোমাকে দেখার/ আকাঙ্ক্ষার দীপ জ্বলে হৃদয়ে/ কৈশোর যৌবনের সারাপথ  
হেঁটেছি/ জীবন আমার একার নয় জেনেছি/ এবং তোমাতেই সমর্পণ করেছি/ রেখেছি একাগ্র  
দৃষ্টির আলোপথে ফেলে/ যে পথের ধূলি মেখেছি সর্বক্ষে।”<sup>১৩</sup>

সৈয়দ আলী আহসানের ‘আমার পূর্ববাংলা’ কবিতাটি পাকিস্তান আমলের মাধ্যমিক  
শিক্ষা বোর্ড প্রকাশিত দশম শ্রেণীর বাংলা বইয়ে এবং কলেজের বাংলা বইয়ে সংকলিত  
হয়েছিল বলে খুব নাম করেছিল। তাছাড়া কবিত্ত-সম্পদেও উক্তিগুলো চমৎকার ; যদিও  
জীবনানন্দ দাশের প্রভাব এর আবহে স্পষ্ট—“আমার পূর্ববাংলা অনেক রাত্রে গাছের/ পাতায়  
বৃষ্টির শব্দের মতো/ কখনও মৃদঙ্গ, হঠাৎ কখনও বেহালা—/ একসময় বাঁশীর সুর/ যখন  
রাত্রে একাকী ঘুম ভাঙ্গে/ অনবরত কোমল কোলাহলে/ স্বপ্নের মতো পাতায় পাতায়/ শব্দকে  
দেখি—”<sup>১৪</sup>

পূর্বমেঘের প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় সৈয়দ আলী আশরাফ শিরী ফরহাদের প্রেমলীলা  
অবলম্বনে আধুনিক কবিতা লিখেছিলেন “যাক/জান কোরবান—খাব খাবেই  
খাক/মিলাক/মিষ্ক নাইলনি অ্যাপায়নে/উন্মাসিক নাগরিক বিলাস—ব্যসনে। /...তবু  
জানি/এবং দেহমন দিয়ে মানি/(হায় ফয়েড)/আত্মরতির পালা/যেদিন ফুরুবে সেদিন সব  
জালা/ মিটেবে/ব্যাতকের/মোটো অংকের/চেক অথবা সম্মান—নির্বেদ ; / নির্বাক বিভেদ।”<sup>১৫</sup>

গল্প-উপন্যাস—নাটকগুলোর নামসমূহ লেখকদের সঙ্গে মিলিয়ে পড়লে একথা স্পষ্ট হয়  
যে পূর্বমেঘ কতিপয় উৎকৃষ্ট, স্থায়ী শিল্পমূল্যের রচনা প্রকাশের ক্ষেত্রে তৈরি করে দিতে  
সক্ষম হয়েছিল—যখন ভালো সাহিত্যপত্রিকা এদেশে ছিল হাতে গোণা। প্রবন্ধগুলোও ছিল  
বক্তব্য-গুণবিশিষ্ট এবং পঠনোপযোগী। এগুলো পাঠকের চিন্তা আর অনুভবের মাত্রাকে  
দিয়েছে ব্যাপ্তি। সংস্কৃতি-চিন্তার ক্ষেত্রেও তাঁরা বিশ্বনাগরিকত্বকে বিস্মৃত হননি। রুশ  
সাহিত্যিক বরিস পাস্তারনাক এর মৃত্যুতে পূর্বমেঘ শোকালোচনা করে : ‘... (তাঁর) মৃত্যুতে  
আধুনিক রাশিয়া বোধ হয় তার শ্রেষ্ঠ কবিকে হারাল। আধুনিক জগত হারালো শুধু একজন  
অত্যন্ত কুশলী গদ্য-কাব্য-অনুবাদক শিল্পীকে নয়, একজন বিস্ময়কর দ্রষ্টাকে, একটি  
আশ্চর্য কণ্ঠকে।’<sup>১৬</sup>

রাজশেখর বসুর মৃত্যুতেও (২৭ এপ্রিল ১৯৬০) পূর্বমেঘ বাণীবদ্ধ করেছে এই উক্তি :  
‘বাংলা ভাষার জ্যেষ্ঠতম সাহিত্যিকের দেহান্ত ঘটল... আর এই সাথে বিলুপ্ত হলো উনিশ  
শতকের বাংলার সংস্কৃতিচিন্তার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত শেষ অবলম্বনটি।’ নজরুল-  
রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কেও তাঁরা সজাগ সচেতন ভূমিকা পালন করেছেন। মনে রাখতে হয় বাংলার  
সাহিত্য-সংস্কৃতি ধ্বংসের সেই অন্ধকারযুগে বাঙালিপনা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। আইউবের  
স্বৈরচারী সামরিক শাসন দেশে প্রতিষ্ঠিত। নজরুলকে মুসলমানি খাতনার আর রবীন্দ্রনাথকে  
পাকিস্তান থেকে বিতাড়ন প্রচেষ্টার কালে পূর্বমেঘ রবীন্দ্র-নজরুলের শুধু নয় সুস্থ চিন্তা নিয়ে  
জীবনানন্দ দাশ, সুধীন দত্ত, সুকান্ত প্রমুখের সাহিত্যচিন্তা ও কাব্যচর্চা করেছে। ফয়েড,

ইয়ুঙ, সাঁত্রে প্রমুখ দার্শনকের মানববিদ্যা, মানবতাসংক্রান্ত ভাবনার সঙ্গে পরিচিত করাতে চেয়েছে বাঙালি পাঠকদের। রবীন্দ্র-নজরুল জন্মদিবস পালনের প্রেক্ষিতে পূর্বমেঘের প্রশ্ন :

এই গতানুগতিকতার চরিত্ররূপ বিচার করে দেখবার সময় কী আঙ্গুও আসেনি? বছরের বিশেষ একদিনে সভা সাজিয়ে এই দুই কবিকে স্মরণ করে তাঁদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করেই কী দেশবাসীর করণীয় সব শেষ হয়ে যায়? প্রশ্নটা সম্ভবতঃ এখন তলিয়ে দেখবার সময় এসেছে।... আশ্চর্য আত্মধিকারে আঙ্গো আমাদের চেতনা ফিরে এলোনা। তবু আমরা বছরের পর বছর ধরে রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তীউৎসব উদযাপন করে এসেছি। এঁদের কীর্তি সাধনা গেছে তলিয়ে, উৎসবের উল্লাসই দেখা দিয়েছে বড়ো হয়ে।...এ পর্যন্ত একটি সর্বাঙ্গীন ভাল আলোচনা পড়া গেল না নজরুল-সাহিত্য সম্পর্কে। প্রবন্ধ বা আলোচনামূলক গ্রন্থ যে গোটাকতক প্রকাশিত হয়নি ইদানীং তা নয়, কোন গ্রন্থের সংস্করণও হয়েছে একাধিক—কিন্তু সমালোচকের আন্তরিক দৃষ্টিতে নজরুল-সাহিত্যের পরিচিতি এবং নজরুল সাহিত্যের মূল্যময় একান্তই অনুপস্থিত। এমনকি নজরুল ইসলামের পূর্ণাঙ্গ এবং প্রামাণ্য জীবনী রচনার প্রয়াসও তেমন লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। সুর এবং সঙ্গীত রচয়িতা নজরুল ইসলামের পরিচয়ও কী পেয়েছি ভাল আলোচনার মাধ্যমে? <sup>১৭</sup>

সাহিত্য আলোচনার ক্ষেত্রে সমালোচকদের দৃষ্টি কতোটা মূল্যানুগ, তা জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর বক্তব্য থেকেও (আবুল ফজলের ‘সাহিত্য ও সংস্কৃতি সাধনা’ শীর্ষক গ্রন্থের আলোচনা প্রসঙ্গে) অনুধাবন করা যায় :

...আমার বিবেচনায় আমাদের পক্ষে বর্তমান যুগ সভ্যতা-সংকটের যুগ নয়, বন্য-বর্বরতার যুগ। আমাদের মূল্যবোধ এখনও বিপর্যস্ত। আমাদের চিন্তা-ভাবনা প্রধানত নেতিবাচক। আমরা একটা চারা লাগাতে যেয়ে দশটা গাছের মূলেপাটন করি। আমাদের ঐতিহ্য হয় বিকৃত কিংবা অস্পষ্ট। আমাদের মতান্তর সহজেই মনান্তরে দাঁড়ায়। আমাদের মধ্যে কৌতুক ও পরিহাসের অভাব। তাই শিষ্টাচারের ভাষা, গদ্যের ভাষা আমাদের এখনও অনায়ত্ব। সুতরাং দুঃখিত হয়ে বা অভিমান থেকে আবুল ফজল যখন অনুযোগ করেন, মননশীল সাহিত্যে আমাদের অনুরাগ নেই, বা মননশীলতার পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে না, তার কথায় আমরা সায় দিতে পারি। <sup>১৮</sup>

পূর্বমেঘে সমাজসংস্কৃতি ও সাহিত্য চিন্তা নিয়ে বুদ্ধিবৃত্তিক বিতর্ক হয়েছে এবং সেই সমস্ত বিতর্ক উচ্চস্তরের বুদ্ধিজীবীদের আদর্শবোধসমঞ্জাত দৃষ্টিরই প্রতিফলন বটে। বদরুদ্দীন উমরের ‘সাম্প্রদায়িকতা’ শীর্ষক প্রবন্ধটি (৫/১) সচেতন পাঠককে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তাছাড়া ‘সাম্প্রদায়িকতা’ শীর্ষক একটি বইও তাঁর প্রকাশিত হয়। এসবই প্রতিফলিত হয়েছে সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েনের আলোচনায়। তিনি বলেন :

জনাব বদরুদ্দীন উমরের প্রবন্ধগুলো পড়ে মনে হলো আমরা যেন ত্রিশ বছরের আগেকার অতীতে ফিরে গেছি। বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ দশকে-পাক-ভারত উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক হয়। এই বিতর্কের পেছনে মূল প্রশ্ন ছিল, ভারতবর্ষবাসীরা একজাতি কিনা এবং ভারতবর্ষে যে বিভিন্ন ধর্মীয়গোষ্ঠীর বাস তারা ইউরোপীয় অর্থে জাতি না সাম্প্রদায়? মুসলিম লীগের দ্বিজাতিতত্ত্বের খিউরী যখন প্রথম উত্থাপিত হয় তখন সমালোচক দল একথাই বলেছেন যে, লীগ একটা সাম্প্রদায়কে জাতি আখ্যা দিয়ে তার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করবার চেষ্টা করছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন হিন্দু-মুসলিম সমস্যা আর কোনভাবেই সমাধান করা গেলনা তখন দ্বিজাতিতত্ত্বের পাকিস্তান এবং ভারত এই দুই রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়।

বদরুদ্দীন উমরের ‘সাম্প্রদায়িকতা’র সারমর্ম সম্পর্কে তিনি বলেন : ...‘সারমর্ম এই যে, আমরা পাকিস্তানিরা জাতীয়তাবাদ যাকে বলছি সেটা আসলে সাম্প্রদায়িকতার নামান্তর। মুসলমানেরা একটা ধর্মীয় গোষ্ঠী। রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কোন অর্থেই তাদের জাতি

বলা যায় না। তিনি আরও দেখিয়েছেন যে, কতকগুলো ঐতিহাসিক কারণেই (যাকে এ্যাকসিডেন্ট বা দুর্ঘটনা হিসেবে বর্ণনা করা চলে) এই গোষ্ঠী নিজেদের স্বাভাবিক সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। এর পেছনে ছিল ইংরেজদের ভেদ-নীতি এবং মুসলমানদের শিক্ষাগত অনগ্রসরতা। সাম্রাজ্যবাদী শাসকের প্রশ্রয় এবং সমর্থন না পেলে এরা কখনও এভাবে প্রাধান্য লাভ করত না।' ইত্যাদি।

সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন বদরুদ্দীন উমরের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে আরও বলেন : বদরুদ্দীন উমরের বক্তব্যে জাতীয়তাবাদের সত্যকারের কোনো সংজ্ঞা নেই। বিশ্বের সকল রাষ্ট্র 'সংজ্ঞানুযায়ী জাতিত্বের দাবি করতে পারে না। 'সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা এই যে, ভাষাকে জাতীয়তাবাদের প্রধান মাপকাঠি হিসেবে স্বীকার করে নিয়েও ভারতবর্ষে সম্প্রতি তিনি কোন প্রশ্ন তোলেননি। ভাষার দিক থেকে ভারতবর্ষে কোন ঐক্য নেই এবং শুধু ভাষা নয়, নৃত্যের পরিপ্রেক্ষিতেও এদেশে রয়েছে বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর সমষ্টি। ...তবু বদরুদ্দীন উমর(দের) মনে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সত্যতা সম্পর্কে কোন সংশয় উপস্থিত হয় না। অথচ এঁরা বিনা দ্বিধায় বলছেন যে, পাকিস্তান অবাস্তুর বুনুয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত। ...ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে তফাৎ কোথায়? পাঞ্জাবি এবং বাঙালি মুসলমান মিলে যদি এক রাষ্ট্র গঠন না করতে পারে তবে পাঞ্জাবি হিন্দু এবং আসামি হিন্দু অথবা দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড়-ভাষী হিন্দু কোন্ যুক্তিতে এক রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকতে পারে তা স্পষ্ট নয়।... আসল কথা...বদরুদ্দীন উমরের বক্তব্য কোন যুক্তি বা তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়।<sup>১৯</sup>

বদরুদ্দীন উমর ডক্টর সাজ্জাদ হোসায়েনের সমালোচনার জবাবে বলেন : তিনি যে আলোচনা করেছেন "সেটা পড়ে মনে হয় তিনি একজন কাল্পনিক প্রতিপক্ষ খাড়া করে তাঁর কতকগুলি উদ্ভট মতামত খণ্ডন করতে উদ্যত হয়েছেন। তিনি প্রথমেই মন্তব্য করেছেন যে আমার প্রবন্ধগুলি পড়ে তাঁর মনে হয়েছে তিনি যেন তিরিশ বছর 'আগেকার অতীতে' ফিরে গেছেন। কিন্তু তাঁর এ আলোচনা পড়ে যে কোন সুবুদ্ধিসম্পন্ন পাঠকেরই মনে হবে যে আমরা প্রায় চৌদ্দশো বছর আগের পৃথিবীতে ফিরে গেছি। কাজেই এ নিয়ে আলোচনা নিষ্পয়োজন। বিশেষ করে সহজ হিসাবে চৌদ্দশোর কাছে তিরিশ বছর যখন নিতান্তই তুচ্ছ। তাঁর এই প্রাথমিক মন্তব্যের পর তিনি আমার বইয়ের মূল বক্তব্যের একটা সার দেবার চেষ্টা করে কিছু কথা বলেছেন যেগুলিকে অস্বীকার না করলেও তাকে বইটির একটা বিশৃঙ্খল সার বলে গ্রহণ করা চলে না।

কিন্তু পরবর্তী আলোচনায় আমার বক্তব্যের নামে তিনি মাঝে মাঝে স্বরচিত কিছু কিছু বক্তব্য আমার উপর যেভাবে আরোপ করেছেন সেটা আমার বইয়ের যে কোন সাধারণ পাঠকের কাছেই অত্যন্ত আপত্তিকর মনে হবে। তাঁর এই সমস্ত কাল্পনিক বক্তব্যগুলি সম্পর্কেই এখানে কিছু আলোচনা প্রয়োজন। সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন আলোচনাকালে নিশ্চিতভাবে ধরে নিয়েছেন যে বইটিতে আমি শুধু মুসলমান সাম্প্রদায়িকতার কথাই বলেছি, মুসলমানদেরকেই সবকিছু বিপর্যয়ের জন্য দায়ী করেছি। শুধু তাই নয়। আমার বক্তব্য তাঁর কাছে নাকি হিন্দু-মহাসভার বক্তব্যের মতই মনে হয়েছে। কার মনে কখন কি কারণে কোন

চিন্তার উদয় হয় সেটা মনস্তত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব এবং শিক্ষাতত্ত্বের বিচার্য বিষয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাঁর এই ধারণার যে ভিত্তি নেই সেটা আমার বইএর ১৬ ও ২২ পৃষ্ঠায় নজর দিলেই ধরা পড়বে।<sup>১০</sup>

এই বিতর্কে অংশ নিয়েছিলেন সালাহউদ্দীন আহমদও। তিনি বদরুদ্দীন উমরের বক্তব্যকেই সমর্থন করেছেন। তবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন ইতিহাসের আলোকে, বলেন মুসলমানদের জাতীয় আন্দোলনের এবং জাতীয়তাবাদের প্রধান ভিত্তি হলো স্বাতন্ত্র্যবোধ। এই স্বাতন্ত্র্যবোধ কেবলমাত্র ধর্মের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয় না। লিখেছেন : ‘...পাকিস্তান আন্দোলন ছিল মূলত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক। স্বাধীন ও অখণ্ড ভারতে হিন্দুদের রাজনৈতিক আধিপত্যের ফলে মুসলমানরা শোষিতশ্রেণীতে পরিণত হতে পারে, এবং তাদের সংস্কৃতির ক্ষতি সাধিত হতে পারে, এই আশঙ্কা মুসলমানদের পাকিস্তান দাবীর পেছনে সংঘবদ্ধ হতে সাহায্য করেছিল।

এই আন্দোলনের নেতৃত্ব যারা করেন, তাঁরা কেউ ধর্মীয় রাষ্ট্র স্থাপনের কথা চিন্তা করেননি। ...পাকিস্তান আন্দোলনের মাধ্যমে এই উপমহাদেশের মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্যের দাবী উত্থাপন করেছিলেন, যদিও ধর্মগত কারণ মুসলমানদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যবোধ জাগাতে অনেকখানি সাহায্য করেছিল, তথাপি পাকিস্তান আন্দোলনের মূল উৎস ছিল মুসলিম জাতীয়তাবাদ, ইসলাম নয়। ...পরিশেষে একটা কথা পরিষ্কারভাবে বলা প্রয়োজন। পাকিস্তান গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ফলে সৃষ্টি হয়েছে এবং গণতন্ত্রের ভিত্তিতে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারবে। পাকিস্তানের বর্তমান সমস্যাগুলি কেবলমাত্র ইসলামের ভিত্তিতে সমাধান করা সম্ভব নয়। ...পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে আজ পর্যন্ত পাকিস্তানবাদী জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বরূপ আলোচনার অন্ত নেই। দুর্ভাগ্যবশত এই আলোচনা বহুক্ষেত্রে নিছক যুক্তিহীন ভাবাবেগ দ্বারা চালিত হয়েছে। বদরুদ্দীন উমরের ‘সাম্প্রদায়িকতা’ একটি আশ্চর্য ব্যতিক্রম।<sup>১১</sup>

পূর্বমেঘ-এ গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা এবং চিন্তাচর্চার অজস্র উদাহরণ বিদ্যমান। জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী ঐকালে ইংরেজী-খেদাও আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠার পর লিখেছিলেন ‘ইংরেজীর ভবিষ্যৎ’ (৭/১-২)। তিনি তাঁর প্রবন্ধের উপসংহারে লিখেছেন :

এখন স্বাধীন দেশে আমরা নতুনভাবে বাংলাভাষার স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত হতে চাই। স্বচ্ছ ও সংস্কারমুক্ত মনে আমাদের এই কর্মে নিবিষ্ট হতে হবে। আমাদের অতীষ্ট বাংলাকে নির্মাণ-করে নিতে হবে। দেড়শ বছরের উত্তরাধিকারকে অস্বীকার করে নয়, আত্মস্থ করেই আমাদের এই সাধনা চলবে। ইংরেজী খেদার নেতিবাচক অঙ্কগলির পথে নয়—পৃথিবীর সমস্ত উন্নত ভাষার সাথে সহজ পরিচয়ের রাজপথ ধরেই আমরা অগ্রসর হবো।<sup>১২</sup>

উল্লেখ্য, সংলাপে (২/১) সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, ‘ইংরেজীর কথা’ লিখেছিলেন বাংলার দাবীকে দুর্বল করে দেবার জন্য। জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী বাংলার দাবীকে সুদীর্ঘ ঐতিহ্যের ভিত্তির ওপরে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন ইংরেজীর গুরুত্ব বিন্দুমাত্র বিস্মৃত না হয়ে ও। এ প্রসঙ্গে ‘পূবালী’র কথাও স্মরণযোগ্য। পূর্বমেঘে সাজ্জাদ হোসায়েন পূর্ব-পাকিস্তানের চিন্তাধারা সম্পর্কে এক প্রবন্ধ লিখলেও বেশ গুরুত্বপূর্ণ একটি বিতর্কের সূত্রপাত

হয়। তিনি পূর্ববঙ্গের 'লেখকসাহিত্যিকেরা বিদেশী সাহিত্য পড়েন কিনা' সন্দেহে ভুগে বলেন 'অন্যদিকে ক্লাসিক্যাল ভাষার সঙ্গে ত লেখকশ্রেণী সাধারণভাবে সম্পর্কিত। ... তবে ক্লাসিক্যাল ভাষার সঙ্গে আমাদের ব্যবধান যতই বাড়ছে এদেশের প্রাচীন ভাবধারার সঙ্গে আমাদের ব্যবধান যতই বাড়ছে এদেশের প্রাচীন ভাবধারার সঙ্গে আমাদের দূরত্ব ততই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এর ফলে আমরা আধুনিক হয়ে উঠছি বলে যদি কেউ মনে করেন, তিনি ভুল করবেন, কারণ আধুনিকতার অর্থ প্রাচীন ভাষার প্রতি অবহেলা নয়। এর একমাত্র সম্ভাব্য পরিণতি ঘোরতর প্রাদেশিকতা।'<sup>৩</sup>

উপর্যুক্ত প্রবন্ধের প্রেক্ষিতে পূর্বমেঘ প্রথম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যায় আবুল কাশেম চৌধুরী লিখেছিলেন পাল্টা-প্রবন্ধ 'পূর্বপাকিস্তানের সাহিত্যে চিন্তাধারা'। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আর যাঁরা লিখেছেন তাঁদের চিন্তায় ভর করেছিল প্রগতিশীলতা। যেমন, মুহম্মদ আনোয়ার লিখেছিলেন 'ইসলামে চিন্তার মুক্তি' (১/৪)। জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী লিখেছিলেন 'সংস্কৃতি ও সমকাল' (৩/১-২) ইত্যাদি। পূর্বমেঘের লেখকের রচনায় ঐকালের জাতীয়-সমস্যাগুলোই আলোচিত সমালোচিত-বিশ্লেষিত হয়েছে, একটি উদ্দেশ্য ছিল সমাজের সঠিক গতিপথ খুঁজে বের করা। পূর্বমেঘের সাধনা ব্যর্থ হয়নি। সমাজ আজও তাঁদের কাঙ্ক্ষিত পথেই অগ্রসর হতে অভিলাষী, যদিও এ পথে অন্তরায় পাকিস্তান আমলের থেকে আজও কোনো অংশেই কম দেখা যাচ্ছে না।

তবু জাতির সঠিক সত্য অনুেষণের সংগ্রামের এই সুদীর্ঘ পথ-পরিভ্রমায় 'পূর্বমেঘ' এর সাধনা জয়যুক্ত হবে বলেই আশা ব্যক্ত করা চলে। কারণ ঠাঁদের সবকিছুতে ছাপিয়ে উঠেছে যা—মুক্তবুদ্ধির চর্চা। আর কুসংস্কার, আড়ষ্টতা, গাঁড়ামী থেকে মুক্তি একদিন বাঙালির ঘটবে, শিক্ষিতের সংখ্যাবৃদ্ধির হারের দিকে লক্ষ্য রেখে এ আশাব্যঞ্জক মন্তব্যও করা চলে। শিক্ষা মনের ভূতকে আলোকের রাজ্যে দাবড়িয়ে নিয়ে যায়। আর আলোক হচ্ছে ভূতের সবচেয়ে বড় শত্রু। আলোকের নিকট মিথ্যার অন্ধকারের ভূত সব সময়ই পরাজিত হয়েছে। ভবিষ্যতেও হবে। কিন্তু অর্থনৈতিক সমস্যাক্রান্ত মানবগোষ্ঠী নিত্য নতুন সমস্যায়, সংকীর্ণ-চিন্তায় বদ্ধ হয়ে পড়ে; এই বদ্ধতাও ভূতের রাজ্যে 'কানা-ভোলার' দুর্দশা থেকে কম বেগতিক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে না। তবে সেই পরিস্থিতি কাটিয়ে ওঠার জন্য দরকার আরও নতুন নতুন 'পূর্বমেঘ' এর অব্যাহত প্রকাশ। কিন্তু সেদিকে সমাজের মনোযোগ আপাতত দেখা যাচ্ছে না বলেই দুশ্চিন্তার অবকাশ রয়েছে। কিন্তু নিরাশ হবারও কারণ নেই। সমাজের গতি স্তব্ধ হয়ে যায়নি। কখন কোন্‌দিকে মোড় ফিরবে, তা কি নিশ্চিত করে বলা যায়?

### তথ্যপঞ্জি

১. ডক্টর মুস্তাফা নূরউল ইসলামের সঙ্গে ৭/৬/৯১ তারিখের সাক্ষাৎকারে জানা যায়।
২. ডক্টর জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর সঙ্গে ৭/৬/৯১ তারিখের সাক্ষাৎকারে জানা যায়।
৩. ১নং পাদটীকা দ্রষ্টব্য।
৪. ২নং পাদটীকা দ্রষ্টব্য।



৫. জিন্নুর রহমান সিদ্দিকী, চিঠি, পূর্বমেঘ, ৫ বর্ষ ১, সংখ্যা আষাঢ় ১৩৭১।
৬. মোহাম্মদ আবদুল কাইউম আইউব খানের 'উন্নয়ন দশকে' বাংলা একাডেমী আয়োজিত সেমিনারে (১৯৬৮) পঠিত 'পূর্বপাকিস্তানের সাময়িকপত্র' শীর্ষক প্রবন্ধে পূর্বমেঘের নাম উল্লেখ করলেও গুরুত্ব দেননি। গোলাম সাকলায়েন সৎলাপের ১৯৭০ সনের জুন সংখ্যায় 'আমাদের সাহিত্যপত্রিকা ও সাহিত্যিক গোষ্ঠী' শীর্ষক প্রবন্ধে পূর্বমেঘ প্রকাশের সংবাদ দেন অনিয়মের অভিযোগ বা পূর্ববাঙলার সাহিত্যপত্রিকার অনিয়ম এর দৃষ্টান্তস্বত্ব। যেমন : 'তথাপি আশা করবো বিজ্ঞ সম্পাদকদ্বয় পত্রিকাটিকে বাঁচিয়ে রাখবেন পর্বতপ্রমাণ অসুবিধা সত্ত্বেও।' (পৃ. ৮৩)।
৭. হায়াৎ সাইফ, গ্রন্থ-প্রসঙ্গে, পূর্বমেঘ ৫ বর্ষ ১ সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৭১, পৃ. ১১৭।
৮. আবদুল হাফিজ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২২-৩০।
৯. আবু হেনা মোস্তফা কামাল, পূর্বোক্ত ৫ বর্ষ ২ সংখ্যা আশ্বিন ১৩৭১, পৃ. ৮২-৮৭।
১০. ফররুখ আহমদ, পূর্বোক্ত, ২ বর্ষ ১ সংখ্যা, পৃ. ১২।
১১. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪।
১২. আতাউর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬।
১৩. আহসান হাবীব, ২ বর্ষ ৩ সংখ্যা, পৃ. ১৯৩।
১৪. সৈয়দ আলী আহসান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯১।
১৫. সৈয়দ আলী আশরাফ, 'শিরী ফরহাদতত্ত্ব', ১ বর্ষ ১ সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৬৭, পৃ. ২৭।
১৬. পূর্বমেঘ ১ বর্ষ ১ সংখ্যা পৃ. ৮৩।
১৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৬-৮৭।
১৮. জিন্নুর রহমান সিদ্দিকী, গ্রন্থ-প্রসঙ্গে, পূর্বমেঘ ২ বর্ষ ১ সংখ্যা পৃ. ৮৪-৮৫।
১৯. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, সাম্প্রদায়িকতা, পূর্বমেঘ ৭ বর্ষ ১-২ সংখ্যা, বৈশাখ-আশ্বিন ১৩৭৩, পৃ. ৬৭-৬৯।
২০. বদরুদ্দীন উমর, উপর্যুক্ত, পৃ. ৭৫।
২১. সালাহউদ্দীন আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৩-৯০।
২২. জিন্নুর রহমান সিদ্দিকী, ইংরেজীর ভবিষ্যৎ, পূর্বমেঘ ৭ বর্ষ ১-২ সংখ্যা, বৈশাখ-আশ্বিন ১৩৭৩ পৃ. ১-১৫।
২৩. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, পূর্বপাকিস্তানের সাহিত্যে চিন্তাধারা, পূর্বমেঘ, ১ বর্ষ ২ সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৬৭।

## ৬. পরিক্রম

(১৯৬২-৭০)

পাকিস্তান সরকারের টাকায়, সরকারি নিয়ন্ত্রণ সম্প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান রাইটার্স গিল্ডের মুখপত্র লেখক সংঘ পত্রিকাই ‘পরিক্রম’ নাম ধারণ করে। ১৯৬২ সনের সেপ্টেম্বরে এর দ্বিতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (১৯৩৬) ও রফিকুল ইসলামের (১৯৩৪) যুগ্মসম্পাদনায়। ঐরা তখন তরুণ অধ্যাপক এবং লেখক হিসেবে সাহিত্যসমাজের দৃষ্টিতে এসেছেন। দুজনই অতি বাল্যাবস্থা থেকে ঢাকার আলো-বাতাসের সঙ্গে পরিচিত।

‘লেখক সংঘ পত্রিকা’র সম্পাদক কবি গোলাম মোস্তফা (১৮৯৭-১৯৬৪) সংঘের সদস্যদের মধ্যে মতবিরোধের আভাস ইতোপূর্বে দিয়েছিলেন। পত্রিকার নামকরণ এবং সংঘের কর্তৃত্ব নিয়েও সদস্যদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিল। প্রাচীনপন্থী ও অত্যাধুনিকদের মধ্যে বিরোধের পরিণতিতে অবশেষে প্রাচীনদের পরিবর্তে আধুনিক-তরুণদের প্রভাব ও ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে সংঘের মুখপত্র ‘পরিক্রম’ নাম গ্রহণ করেছিল।

অর্থাৎ পাকিস্তানের আদর্শ-প্রচারের সীমিত গণ্ডিতেই কেবল তাঁরা আবদ্ধ থাকতে চাননি। সাহিত্য সংস্কৃতিজগতের বিশ্বরূপ পরিদর্শনের অভিপ্সাও অভিযুক্ত হয়েছিল তাঁদের এই নামকরণের বা নাম পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে। ‘পরিক্রম’ শব্দের আক্ষরিক অর্থ কিছু হলেও সাফল্য লাভ করেছিল। কারণ পাকিস্তানবাদী ধ্যানধারণা এবং দুই দিগন্তের ঐক্যসাধনের ব্রত নিয়ে প্রথমে মুখপত্রটি (লে.স.প.) প্রকাশিত হলেও, কৃতিত্বের এবং আদর্শ-নিয়ন্ত্রণের ভার তরুণদের হাতে চলে আসায় বিশ্বজনীন সাহিত্য সংস্কৃতি-ভাবনার দ্যুতি এবং মাঝে-মাঝে পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদী চেতনাধারা এতে সচকিত হয়ে উঠেছিল। সমালোচনার ক্ষেত্রে স্বাধীন ও মুক্তবুদ্ধির চর্চার কিছু পরিচয় তাই এতে দুর্লক্ষ হয়নি।

লেখক সংঘের মুখপত্র প্রকাশের পরিকল্পনা ছিল মাসিক আকারে। কিন্তু তিনটি পর্বে, তিনটি নামে এই মুখপত্রটির মাত্র ৫২টি, অথবা ৫১ (১ + ৯ + ৪১ = ৫১) ও হতে পারে প্রকাশিত হয়। হবার কথা ছিল সাড়ে দশ বছরে ১২৬টি। চতুর্থ বর্ষ প্রথম সংখ্যা আগস্ট ১৯৬৫তে প্রকাশিত হয়। এবং ১৯৬৫র নভেম্বরে প্রকাশিত হয় চতুর্থ বর্ষ পঞ্চম সংখ্যা। চতুর্থ বর্ষ দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা অনুসন্ধান পাওয়া যায়নি। না-পাওয়া গেলেও সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর ১৯৬৫ তে দুটি সংখ্যা প্রকাশিত হবার কথা। কিন্তু মাসিকপত্রিকা দুই মাসে তিনটি প্রকাশিত হয় কিভাবে? চতুর্থ বর্ষ পঞ্চম সংখ্যার সম্পাদকীয়তে মাঝখানের সংখ্যাগুলো যথারীতি প্রকাশিত হয়েছিল বলে জানা যায়।

সম্পাদক জানান, আবদুল মান্নান সৈয়দ সুধীনদত্তের ওপর ঐ দুই সংখ্যায় ধারাবাহিক একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তবে দুটি সংখ্যাই হয়ত প্রকাশিত হয়ে থাকবে। এটি তাঁদের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী খেয়ালহীনতার জন্যে ঘটিত একটি অনিয়ম। যেমন অনিয়ম লঙ্ঘ্য করা যায় চতুর্থ বর্ষের কয়েকটি সংখ্যার প্রকাশের সন তারিখে এবং পত্রিকার গায়ে লিখিত

বর্ষ ও সংখ্যার নম্বরে। চতুর্থ বর্ষ প্রথম থেকে একাদশ সংখ্যা পর্যন্ত আবদুল গনি হাজারীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। এসময়ে ৮ম, ৯ম ১০ম, ১১শ ও ১২শ সংখ্যায় বিরাট অনিয়ম ঘটে। চতুর্থ বর্ষ প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ-সপ্তম (যুগ্ম) ৮ম ও ৯ম-১২শ (যুগ্ম) সংখ্যা প্রকাশিত হয় যথাক্রমে শ্রাবণ ১৩৭২ থেকে জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৩ পর্যন্ত সময়কালে। পঞ্চম বর্ষ প্রথম-দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হয় জুলাই-আগস্ট ১৯৬৮ অর্থাৎ আষাঢ়-শ্রাবণ ও শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩৭৫ বঙ্গাব্দে। কিন্তু মাঝখানে চতুর্থ বর্ষ অষ্টম, চতুর্থ বর্ষ নবম-একাদশ ও চতুর্থ বর্ষ দ্বাদশ সংখ্যা (তিনটি খণ্ডে) আবার প্রকাশিত হয় যথাক্রমে আশ্বিন-কার্তিক ১৩৭৪, পৌষ-ফাল্গুন ১৩৭৪ ও চৈত্র ১৩৭৪ এবং শ্রাবণ ১৩৭৫ বঙ্গাব্দে। এই সংখ্যাগুলো বিষয়বস্তুতে ডুপ্লিকেট নয়। কিন্তু সংখ্যার হিসাব এমন গরমিলে ভরা কেন তা বুঝা যায় না।

যাহোক, পরিক্রম নিয়মিত বের হয়নি। সম্পাদনার দায়িত্বও কেউ গুরুত্ব দিয়ে পালন করেন নি। সরকারি পত্রিকা বা দলীয় মুখপত্রে যাদের নাম ছাপা হয়েছে, তাঁরাই যে সবকিছু দেখাশোনা করেছেন সব সময়, তা নয়। সহযোগী, সহকারী এবং বেতনভুক্ত অথবা সৌখিন তরুণ অ্যামেচার সাহিত্যসেবী, সহকারীদের উপরই ন্যস্ত থেকেছে দায়িত্বাবলি। সেকারণে এবং অনিয়মিত অর্থ বরাদ্দের ফলে পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হয়নি। সম্পাদকীয়তেও কোনো গুরুতর উদ্দেশ্য আদর্শ ব্যক্ত করা হয়নি। অথবা গুরুত্ব দিয়ে সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সম্পাদকগণ প্রায়ই কোনো বক্তব্য উপস্থিত করেননি। ভালো লেখকদের পয়সার জন্য দেয়া অনেকগুলো লেখার মধ্য থেকে বেছেবেছে ভালো লেখাসমূহ মুদ্রণ করা হয়েছে। সেই কাজ হয়েছে অনেকটা অফিসিয়াল রুটিন ওয়ার্কের মতো, যেমন হয়েছে মাহেনও-এ। তবে মাহেনও খোদ সরকারি আর পরিক্রম বেসরকারী, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ছিল বলে এখানে কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত মতামত কার্যকরভাবে প্রয়োগের সুযোগ ছিল বলে মাত্রাগতভাবে তারতম্য ছিল দুই পত্রিকার কর্ম ও চিন্তাগত পদ্ধতিতে।

‘পূর্ববী’সহ ‘লেখক সংঘ পত্রিকা’র এগারোটি সংখ্যাকে মিলিয়ে একবছর ধরে, দ্বিতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যা হিসেবে ‘পরিক্রম’ নামের পত্রিকার প্রথম পত্রটি প্রকাশিত হয় ভাদ্র ১৩৬৯ সেপ্টেম্বর ১৯৬২ সনে। পরিচিতিতে লেখা হয়েছিল ‘পরিক্রম পাকিস্তান লেখক সংঘ পূর্বাঞ্চল শাখার মাসিক সাহিত্য ও সংস্কৃতিপত্র’। ইংরেজী মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রকাশিত হয়।

সাধারণত, এবং অধিকাংশত-বাংলা পত্রিকাসমূহ বাংলা মাস সনই অনুসরণ করেছে বা করে থাকে ; ঐরা ইংরেজী মাস অনুসরণ করতেন কেনো ? সেপ্টেম্বরে বর্ষ শুরু (পূর্ববী শ্রাবণ মাসে বেরিয়েছিল, কিন্তু সে হিসেবেও সেপ্টেম্বর বর্ষ শুরুর সঙ্গতি বা সূত্র পাওয়া যায় না। এই নিয়ম কেবল ‘পরিক্রম’ এর জন্যই প্রযোজ্য। অথচ পরিক্রম প্রথম বছরে দ্বিতীয় বর্ষ হিসেবেই যাত্রা আরম্ভ করলো সম্ভবত সরকারী হিসাব (অডিট) মিলানোর জন্য।

পরিক্রমের প্রতি সংখ্যার দাম ৫০ পয়সা। ‘প্রকাশিত মতামত লেখকদের ; লেখক সংঘের তাতে কোনো দায়িত্ব নেই। আসকার ইবনে শাইখ কর্তৃক বর্ধমান হাউস ঢাকা-২ থেকে প্রকাশিত ও পূর্ববঙ্গ প্রেস, ২ জিন্দাবাহার দ্বিতীয় লেন, ঢাকা-১ থেকে মুদ্রিত।

সম্পাদক ও প্রকাশক হিসেবে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, রফিকুল ইসলাম ও আশকার ইবনে শাইখ বেশীর ভাগ সময় দায়িত্ব পালন করেন। প্রকাশক ও মুদ্রকের ঠিকানাও বর্ধমান হাউস ও পূর্ববঙ্গ প্রেসই অধিকাংশ ক্ষেত্রে, মাঝেমাঝে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। দ্বিতীয়বর্ষ প্রথম সংখ্যা সেপ্টেম্বর ১৯৬২ থেকে তৃতীয় বর্ষ দ্বাদশ সংখ্যা জানুয়ারী ১৯৬৫ পর্যন্ত—দুই বছরের সম্পাদক ও প্রকাশক অপরিবর্তিত ছিলেন।

এ পর্বে তাঁরা মোট ২০টি পুস্তিকা প্রকাশ করতে পারলেও তাঁদের দুবছর ছিলো উনত্রিশ মাসের। এরপর ফেব্রুয়ারী থেকে জুলাই ১৯৬৫ পর্যন্ত পত্রিকা বন্ধ ছিল। অতপর সম্পাদনা পরিষদের পরিবর্তন ঘটে। চতুর্থবর্ষ প্রথমসংখ্যা শ্রাবণ ১৩৭২ আগষ্ট ১৯৬৫তে আবদুল গণি হাজারীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। তাঁর সম্পাদনায় জানুয়ারী ১৯৬৮ ফাল্গুন ১৩৭৪? (ফেব্রুয়ারী হলে সঙ্গত হয়) পর্যন্ত পরিক্রমের মাত্র ৯টি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়।

অতঃপর সম্পাদক হন হাসান হাফিজুর রহমান। গরমিল হিসেবের চতুর্থ বর্ষ দ্বাদশ সংখ্যা, চৈত্র ১৩৭৪ থেকে শ্রাবণ ১৩৭৫/ ফেব্রুয়ারী থেকে জুন ১৯৬৮ সংখ্যাটি প্রথম তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। এই সময় পরিক্রম ‘সমকাল মুদ্রায়ণ’ থেকে মুদ্রিত হতো। তাঁর সম্পাদকত্বে মাত্র চারটি পুস্তিকা (৪/১২ ; ৫/১-২ ; ৫/৩-৪ ; ৫/৫) প্রকাশিত হয়। সময়ক্ষেপণ হয় ফেব্রুয়ারী ১৯৬৮ থেকে নভেম্বর ১৯৬৮ পর্যন্ত দশ মাস।

এরপর পঞ্চম বর্ষ ষষ্ঠ-সপ্তম ডিসেম্বর ১৯৬৮ থেকে জানুয়ারী ১৯৬৯ পর্যন্ত সময়ের যুগ্ম সংখ্যা প্রকাশিত হয় সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর একক সম্পাদনায়। এই সময় পরিক্রমে দীর্ঘ সম্পাদনা-পরিষদের নাম ছাপা হয়। এই পরিষদের সদস্য ছিলেন হাসান হাফিজুর রহমান, সৈয়দ মুর্তাজা আলী, আহমদ শরীফ, আবদুল গণি হাজারী, আবদুর রশীদ খান, জাহানারা আরজু প্রমুখ। এর পরের সংখ্যাতে সম্পাদনাপরিষদ থেকে হাসান হাফিজুর রহমানের নাম বাদ দিয়ে বাদবাকীদের নাম ছাপা হয়। প্রথম থেকেই পরিক্রম আসকার ইবনে শাইখ সংঘের পক্ষে প্রকাশ করে আসছিলেন। ফেব্রুয়ারি-মে ১৯৭০ এ প্রকাশিত (৬/৮-১১) সংখ্যাটি সংঘের পক্ষে প্রকাশ করেন বজলুর রহমান।

পরিক্রম পত্রিকার শেষ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় দীর্ঘ বিলম্বে ১৯৭০ সনের ডিসেম্বরে (সম্ভবত জানুয়ারী ১৯৭১ হবে। ৬ষ্ঠ বর্ষ ১২শ এবং ৭ম বর্ষ ১ম-৬ষ্ঠ জুন-ডিসেম্বর ১৯৭০/আষাঢ়-পৌষ ১৩৭৭ ৭ সংখ্যা একত্রে)। অস্তিম-সংখ্যার সম্পাদক ছিলেন সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। নতুন নামও সম্পাদনা পরিষদে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। শেষটিতে সম্পাদনা পরিষদের সদস্য হিসেবে নাম ছাপা হয় সরদার ফজলুল করিম, বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর, রাজিয়া খান, নেয়ামাল বাসীর ও শামসুল হকের। এইবার কার্যালয়ও পরিবর্তিত হয় ; সংঘ অফিস ৩৭ তোপখানা রোড, ঢাকা-২ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। মুদ্রকও পরিবর্তিত হয়েছিল শেষকালে। কথাকলি প্রিন্টার্স এণ্ড প্যাকেজেস, ঢাকা-২ থেকে শেষ সংখ্যাটি মুদ্রিত হয়। পরিবর্তিত ষ্টাইলে এক কলামের পরিবর্তে দুই কলামে লেখা ছাপা হয়েছিল। পরিক্রমে সম্পাদনা সহযোগী হিসেবে নাম ছাপা হয়েছিল শাহাবুদ্দীন আহমদ, রশীদ হায়দার, কাজী মোঃ নুরুজ্জামান, প্রমুখের।

আবদুল গনি হাজারীর সম্পাদকত্বে প্রকাশের কালে পরিক্রমের ‘যুগ্ম সম্পাদনা’য় ছিলেন জাহানারা আরজু ও লুৎফুল হায়দার চৌধুরী। সহযোগী আবুল হাসানাত। সম্পাদনার মান যা-ই থাক—কাগজ, কভার, ছাপা, বাঁধাই উন্নতমানের ছিল। এর সাইজ প্রথমে রয়েল ডিমাই ১/৮ ছিল। পরে—আকারে বড় হয়েছিল আবদুল গনি হাজারীর সময়ে। পরিক্রমের প্রচ্ছদশিল্পী ছিলেন কালাম মাহমুদ, আবদুর রউফ, কাইয়ুম চৌধুরী, দেবদাস চক্রবর্তী, আমানুল হক প্রমুখ। পরিক্রমের পৃষ্ঠা সংখ্যা প্রতিবারে নতুন করে এক থেকে আরম্ভ করা হয়েছে। আবার ১২ সংখ্যার নম্বর ক্রমিক অনুসারেও দেয়া হয়েছে (হাজারীর কালে ১২ সংখ্যার পৃষ্ঠা ধারাবাহিক ছিল)। পুস্তিকাগুলো একশো পৃষ্ঠার উপরে পঁচিশ-ত্রিশ পর্যন্তও হতো, তবে মাঝেমাঝে কমও হয়েছে।

এইভাবে পাকিস্তান লেখক সংঘের মাসিক মুখপত্রটি সাড়ে দশ বছরে শ্রাবণ ১৩৬৭ থেকে পৌষ ১৩৭৭) ১২৬টি পুস্তিকার স্থলে মাত্র ৫১টি পুস্তিকা বহু সম্পাদকের সম্পাদনায় এবং নানা জনের নানারূপ সাহায্য-সহযোগিতায় প্রকাশিত হয়ে হয়ে অবশেষে মুক্তি-সংগ্রামের দ্বারপ্রান্তে এসে যাত্রা বন্ধ করতে বাধ্য হয়। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার বাঙালিদের প্রতি আর সবকাজে বিমাতাসুলভ আচরণের জন্য অভিযুক্ত হলেও বাঙালিবুদ্ধিজীবী ও লেখকদের প্রতি সদাচারের জন্য প্রশংসিত হওয়ার অধিকারী। সংঘের মধ্যে এতো দ্বন্দ্ব-বিরোধ, গণ্ডগোল, ষড়যন্ত্রের খবর জানা থাকলে সরকার সংযম প্রদর্শন করে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত—এমনকি গণঅভ্যুত্থানে (১৯৬৯) বাঙালিদের মানসিকতা সুস্পষ্ট হয়ে যাবার পরেও পূর্বাঞ্চল শাখার বুদ্ধিজীবীদের বাংলাসাহিত্য সাধনার তথা বাঙালি বুদ্ধিজীবী-তোষণের রসদ বন্ধ করে দেয়নি।

পুরবী বা লেখকসংঘের যে সম্পাদকীয়উদ্দেশ্য-আদর্শ ছিল-বস্তুগতভাবে তাই-ই পরিক্রমের নীতিগত দর্শন। তবে লেখার গুণ বিচার করতে গিয়েই নির্বাচকমণ্ডলী পাকিস্তানবাদী প্রাচীনদের পরিবর্তে নবীন এবং বয়স্ক অথচ অত্যাধুনিকমনস্ক লেখকদের রচনা নির্বাচন করেছেন বেশি। এই লেখকমণ্ডলী উচ্চশিক্ষিত, জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনেক উচ্চস্তরে তাঁদের গভীরতম এবং দেশবিশেষ পরিভ্রমণের অভিজ্ঞতাও আছে অধিকাংশের। ফলে পত্রিকার বৈশিষ্ট্যে আধুনিকতার রঙ বেশি ফুটেছিল। মাসিক পত্রিকার মধ্যে নিউজপ্রিন্টে ছাপা মোহাম্মদী, সওগাত, পূবালীর সংখ্যাগুলো তাঁদের আদর্শ হয়নি। পরিচয়, চতুরঙ্গ, সমকাল এঁদের সামনে ছিল। আর ছিল দেশের গবেষণাপত্রিকাসমূহ।

সম্পাদক ও লেখকেরা বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ প্রভৃতির গবেষণা জার্নালের এবং উত্তম বা প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকাগুলোর কথা সব সময়ই স্মরণে রেখেছেন। ফলে এতে বৈদগ্ধ ও সাহিত্যবৈশিষ্ট্যে মানগত উত্তরণ সম্ভব হয়েছিল। আবদুল গনি হাজারী যখন সম্পাদক হন তখন চতুর্থ বর্ষ প্রথম, কিন্তু পরিক্রমের তৃতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যায় একটি সম্পাদকীয় লিখেছিলেন। এতে পত্রিকার নীতি স্পষ্ট পুনর্ব্যক্ত হয়। সঙ্গে সঙ্গে পত্রিকার নানা সংকট সম্পর্কেও ব্যাখ্যা উপস্থিত করেন। পত্রিকার মান পড়ে যাওয়া সম্পর্কেও তাঁর মন্তব্যটি গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে, তিনি পূর্বপাকিস্তানের বাংলাসাহিত্যের সার্বিক প্রেক্ষাপট মনে রেখেই কথাগুলো উচ্চারণ করেছিলেন।

সাতচল্লিশের পরের পূর্ব বাঙলার সাহিত্যসংস্কৃতি সাধনার নানা ব্যাপারেও তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। মুক্তি সওগাত প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদনা ও সমালোচনার কথা এখানে স্মরণযোগ্য। পূর্ববাঙলার সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতির অধোগতি রোধ ও উন্নয়ন ঘটাবার লক্ষ্যে তাঁর প্রচেষ্টা ছিল প্রশংসনীয়। পরিক্রমের সম্পাদনার ভার গ্রহণ করার পরে বিষয় ও বস্তুতে কিঞ্চিৎ উন্নতি ঘটে ; সাহিত্যপত্রিকার আবহ তৈরী হয়। তিনি উল্লেখ করেন :

প্রথম থেকেই পরিক্রম কেন্দ্রীয় লেখক সংঘের আর্থিক বরাদ্দের ওপর নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু নানা কারণে এই অর্থ পরিক্রমের হাতে নিয়মিত আসেনি, ফলে তার নিয়মিত প্রকাশও বারবার ব্যহত হয়েছে... নতুন কার্যকরী সংসদ এবারে স্থির করেছেন বরাদ্দ অর্থের অনিয়মিত প্রাপ্তির ফলে পত্রিকার প্রকাশ যাতে পুনঃপুন ব্যাহত না হয় তার জন্য পত্রিকাটিকে যতদূর সম্ভব স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলার চেষ্টা করা হবে। এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে পরিক্রমের চতুর্থ বর্ষ শুরু হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা পেলে পরিক্রম এখন থেকে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হবে" (কিন্তু বলাবাহুল্য এরপর আরও অনিয়মিতই হয়ে ছিল)।

পত্রিকার 'মান কি হওয়া উচিত' এ প্রশ্নের ব্যাখ্যাদানকালে তিনি বলেন :

একটা কথা বলে রাখা প্রয়োজন যে, 'পরিক্রম' কোন বিশেষ সাহিত্যিকগোষ্ঠীর পত্রিকা নয়। মত নির্বিশেষে পূর্ব পাকিস্তানের সকল লেখকেরই প্রকাশের মাধ্যম এই পত্রিকা। এতে তাই প্রবীণ ও তরুণ সকল লেখকের প্রকাশযোগ্য রচনাই স্থান পাবে। তাছাড়া পরিক্রমের মারফত যাতে সারা পাকিস্তানের সাম্প্রতিক সাহিত্যসাধনার একটা পরিচয় পাওয়া যায়, সে চেষ্টা করা হবে। পূর্ব বাংলার সাহিত্যের সাম্প্রতিক মান অনুযায়ী পরিক্রমের মান যদি তাতে খানিকটা খাটে হয়ই তাতে বিব্রত বা নিরাশ হওয়া যুক্তিযুক্ত বলে সম্পাদকগণ মনে করেন না।'

পত্রিকার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্পাদক বলেন : 'আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের দেশের সাহিত্যিকর্ম এবং সাম্প্রতিক চিন্তাধারার সঙ্গে পাঠকসাধারণের যোগাযোগ সাধন করা। এই উদ্দেশ্য সাধিত হলে আমাদের দায়িত্ব পালিত হয়েছে বলে মনে করবো।' একটি বিজ্ঞাপনের ভাষা থেকে বোঝা যায় পরিক্রম 'বুদ্ধিজীবীদের পত্রিকা' হতে চেয়েছিল, গণমানুষের নয়। বল হয় 'পূর্ব পাকিস্তানের বুদ্ধিজীবীদের নিকট আপনার পণ্যকে পরিচিত করুন। বিজ্ঞাপনের জন্য' পরিক্রমকে লিখুন-ইত্যাদি।

পরিক্রম এ কবিতা লিখেছিলেন :

সৈয়দ আলী আহসান, শামসুর রাহমান, আবদুর রশীদ খান, আহসান হাবীব, সানাউল হক, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, জিয়া হায়দার, ফজল শাহাবুদ্দীন, আলাউদ্দীন আল আজাদ, সৈয়দ শামসুল হক, আ. ন. ম. বজলুর রশীদ, হেমায়েত হোসেন, সেবাব্রত চৌধুরী, হাসান হাফিজুর রহমান, আবদুস সাত্তার, মাসুদ আহমেদ, হায়াৎ সাইফ, আবদুল হাই মাসরেকী, শাহজাহান হাফিজ, রাজিয়া খান, ইমরুল চৌধুরী, জিনাত আরা মালিক, মোহাম্মদ মামুন, তরিকুল আলম, আজীজুল হক, আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ, আতাউর রহমান, ইজাজ হোসেন, সিকান্দার আবু জাফর, লতিফা হিলালী, সৈয়দ আলী নকী, সৈয়দ আকরম হোসেন, জাহানারা আরজু, নঈমা বেগম, মহহারুল ইসলাম, মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, নচিকেতা ভরদ্বাজ, আহমদ আবদুল গফুর আন্সার, জসীমউদ্দীন, আবদুল মান্নান সৈয়দ, সৈয়দ আলী আশরাফ, কাশীনাথ রায়, বন্দে আলী মিয়া, আবুবকর সিদ্দিক, মোহাম্মদ রফিকউজ্জামান, আবুল হাসান, মহাদেব সাহা, সুরত বডুয়া, রুবী চক্রবর্তী, ওমর আলী, নির্মলেন্দু গুণ, মশুকুর রহমান চৌধুরী, শহীদ কাদরী, আহসান আহমদ আশক, হুমায়ুন

আজাদ, হুমায়ুন কবির, আবদুল গনি হাজারী, মাহবুব সাদিক, কবিরুল ইসলাম, মুহম্মদ নূরুল হুদা, নীলুফার বানু, মনোমোহন বর্মণ, শাহজাদ ফিরদাউস, আবদুহ মাহমুদ, আখতার হুসেন, সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, আবদুল কাদির, বর্ণালী চৌধুরী, অসীম সাহা, দাউদ হায়দার প্রমুখ।

পরিক্রমের গল্পকারগণ হলেন :

শওকত ওসমান, আবদুল গাফফার চৌধুরী, হাসান আজিজুল হক, সৈয়দ শামসুল হক, শাহেদ আলী, আবদুল শাকুর, সানাউল হক, আহমদ রফিক, নূরুল ইসলাম খান, মিরজা আ. মু. আবদুল হাই, জিয়া হায়দার, হেমায়েত হোসেন, আনিস চৌধুরী, জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত, নাজমুল আলম, শহীদ আখন্দ, নূরুল আলম, শামসুন্নাহার, মজবুলুল হোসেন মিজরাব, জাহানারা হাকিম, ফাতেমা চৌধুরী, রশীদ হায়দার, মীজানুর রহমান, আবু জাফর শামসুদ্দীন, জিনাত আরা মালিক, আবদুল মতীন, জাহানারা হাকিম, রেজাউর রহমান, মোজাম্মেল সিদ্দিক, দিলারা হাশেম, শফিকুর রহমান, মিজানুর রহমান শেলী, রাবেয়া খাতুন, মুহম্মদ সিরাজ, এ. এন. সফিউদ্দীন আহমদ, সাইয়িদ আতীকুল্লাহ, আবদুল মামান সৈয়দ, শওকত আলী, মাহবুব তালুকদার, বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর, কাজী খায়রুল বাশার, আনোয়ার পাশা, হুমায়ুন কাদির, মাফরুহা চৌধুরী, সৈয়দ আকরম হোসেন, লায়লা সামাদ, নজরুল ইসলাম চৌধুরী, আফসারুন্নেসা, আহমেদ শামসুদ্দীন প্রমুখ।

পরিক্রমে কয়েকটি নাটক ও উপন্যাস লিখেছিলেন কিংবা অনুবাদ করেছিলেন প্রখ্যাত কথালিঙ্গী ও নাট্যকারগণ। জঁ জিরাদুর নাটক 'হেকটর' শিরোনামে ধারাবাহিক অনুদিত হয় দ্বিতীয় বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা থেকে। অনুবাদক কবীর চৌধুরী। আবু রুশদ প্রণীত উপন্যাস 'উদগম', দ্বিতীয় বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যা থেকে। লর্ড ভানসেনির নাটক 'চোখ' অনুবাদ করেন কবীর চৌধুরী দ্বিতীয় বর্ষ নবম সংখ্যা থেকে। 'দি থিং' নাটকের অনুবাদ করেন বজলুল করিম, এর ভূমিকা লেখেন সাঈদ আহমদ। রশিদ হায়দার এর উপন্যাস 'আমি জুলেখা ও মা' ছাপা হয় তৃতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যা থেকে। শওকত ওসমানের নাটক 'দুই পখিক' তৃতীয় বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে ধারাবাহিক ছাপা হয়। সৈয়দ শামসুল হকের উপন্যাস 'অচেনা' ছাপা হয় তৃতীয় বর্ষ চতুর্থ-সপ্তম যুগ্ম সংখ্যায়। শম ও কেসীর নাটক 'ব্যাচেলর ফ্লাট' অনুবাদ করেন হারুন অর রশীদ। ছাপা হয় উপর্যুক্ত সংখ্যায়। রাজিয়া খানের উপন্যাস 'চিৎরকাব্য' প্রকাশিত হয় তৃতীয় বর্ষ একাদশ সংখ্যা থেকে। দীর্ঘদিন ধরে ছাপা হয়।

ওবায়দ উল হকের নাটক 'ঘরোয়া' ছাপা হয় চতুর্থ বর্ষ প্রথম সংখ্যা থেকে। আশকার ইবনে শাইখের নাটক 'প্রচ্ছদ পট' চতুর্থ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে ছাপা হয়। জঁ ককতার নাটক অর্ফিযুস অনুবাদ করেন আমীর আলী (৪/৯-১২)। আহমদ আবু তাহেরের একাঙ্কিকা 'কাকতাড়ুয়া' রচিত হয় 'একটি মার্কিন একাঙ্কিকার অনুসরণে' (পূর্বোক্ত)। আশকার ইবনে শাইখের নাটক 'কর্ডোভার আগে' ধারাবাহিক ছাপা হয় উপর্যুক্ত সংখ্যা থেকে। মুনীর চৌধুরীর প্রখ্যাত অনুবাদ 'মুখরা রমণী বশীকরণ' (শেকস্পীয়র থেকে) পঞ্চম বর্ষ ষষ্ঠ-সপ্তম যুগ্ম সংখ্যা থেকে ক্রমশ ছাপা হয়। হাফেজুল খায়েরীর নাটক 'লোকটি' অনুবাদ করেন কাজী মাসুম (৬/৫-৭)। উপর্যুক্ত নাটকের বেশীরভাগই অনুবাদ।

প্রবন্ধ-উপন্যাস-কবিতা-গল্পও অনেক অনুদিত হয়েছে—যেসকল বিদেশীবিভাষী সাহিত্যিক-দার্শনিকের রচনা অনুদিত হয়েছে তাঁরা হলেন :

ডাঙ্কিনিয়া উল্ফ (মথটির মৃত্যু, গল্প, অনুবাদ : আহসানুল হক, ২/১) ; ই ই কামিংস (কবিতা, অনুবাদ, শামসুর রাহমান, ২/২) ; এ্যান্টনী হার্টলে (প্রবন্ধ, ইংলেণ্ডের বুদ্ধিজীবী, অনুবাদক : নূরুল ইসলাম, ২/৩) ; ওমর আবি রাবিয়াহ (কবিতা, অনু. আবদুস সাত্তার, ২/৩) ; জন স্টেইন বেক (গল্প, অনু. রেজাউর রহমান, ২/৪) ; জ্বাবরা জ্বাবরা (গল্প, অনুবাদ আহমদ মনজুর, ২/৫) ; রবার্ট ফ্রস্ট (কবিতা, অনুবাদ : শামসুর রাহমান, ২/৬) ; উইলিয়াম আর্নেস্ট হেনলি (কবিতা, অনুবাদ : মনোমোহন বর্মন, ২/৬) ; বরিস পাস্তার্নাক (কবিতা, অনুবাদ : সানাউল হক, ২/৭) ; কার্ল ম্যান হাইম (প্রবন্ধ, অনুবাদ : বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর, ২/৯) ; এ্যান্টনী খোয়েট (কবিতা, অনু. সন্তোষগুপ্ত, ২/১০) ; রুমি (কবিতা, হেমায়েত হোসেন, ২/১০) ; আর্টে মোরায়্যা (প্রবন্ধ : অনু. আবু জাফর শামসুদ্দীন, ২/১০) ; উইলিয়াম ম্যানসম (গল্প, অনুবাদ : আবদার রশীদ, ৩/২) ; ফয়েজ আহমদ ফয়েজ (বক্তৃতা, অনুবাদ, কাজী মাসুম, ৩/৩) ; রাজস্রে সিং বেদী (গল্প, অনুবাদ, কাজী মাসুম, ৩/৯) ; মাজরী রলিংস (গল্প, নীলিমা ইব্রাহীম, ৩/১০) ; মাইনার মারিয়া রিলকে (কবিতা, জহুরুল হক, ৩/১১) ; ফখরুজ্জামান চৌধুরী, ৪/৮) ; ডন মোরোস (কবিতা, আবু আহমদ আবদুল্লাহ, ৩/১১) ; রাজারাও (গল্প, অনুবাদ, মোহাম্মদ আজিজুল হক, ৪/৯-১২) ; আন্তন চেকভ (গল্প, অনুবাদ আবুল হাসানাত, ৪/৮) ; এইচ. জি. ওয়েসল (গল্প, অনুবাদ কাজী রফিকুল হক, ৪/১২) ; মুকতার লুবিস (গল্প, অনুবাদ আলমগীর রহমান, ৫/৬-৭) ; প্লেটো (রিপাবলিক, অনুবাদ : সরদার ফজলুল করিম ধারাবাহিক অনেক সংখ্যায়) ; বট্টিন্ড রাসেল (আত্মজীবনী, অনুবাদ : সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, ৫/১০-১২) ;

‘পরিক্রম’ যখন হাসান হাফিজুর রহমানের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়, তখন নভেম্বর ১৯৬৮ তে, (ছয় দফা আন্দোলন, সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের সঙ্গে পাকিস্তানের কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন ইত্যাদির পরে, সমাজের গতি যখন গণমুখী ভাবধারায় প্রবাহিত ; তখন) লেখক সংঘ কর্তৃক অনুষ্ঠিত ‘আফ্রো এশীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি উৎসব’ উপলক্ষে প্রকাশিত (উৎসব সংখ্যা) সংকলনের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব অপরিসীম বিবেচিত হবে কারণ বিশ্বসাহিত্যের চর্চার বিকাশে এটা সদর্থক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়। এই সংখ্যায় (৫/৫) হাসান আজিজুল হক প্রণীত ‘আফ্রো এশিয়ার গণমুখী সাহিত্যের ভূমিকা’ আহমেদ হুমায়ুন রচিত ‘আফ্রো এশীয় সাহিত্য আন্দোলন : একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা’ ; মোহাম্মদ সফদার মীর রচিত ও কাজী মোহাম্মদ নূরুজ্জামান অনূদিত ‘আফ্রো এশীয় সাহিত্য আন্দোলন’ শীর্ষক তিনটি প্রবন্ধ ছাড়া হয়েছিল।

‘আফ্রো-এশীয় কবিতাগুচ্ছ’ তে স্থান পায় ইয়েভগেনী ইয়েভততুশ্কে (রাশিয়া, হত্যার আজাদী, অনুবাদ : সিকান্দার আবু জাফর) ; জর্জ আউলোর উইলিয়ামস (ঘানা, বিস্মৃত কমরেডদের কোরাস, অনুবাদ : আবদুল গনি হাজারী) ; জোসেফ-ই কারিউকি (কেনিয়া, নবজীবন অনু: ঐ) ; আঁতয় বোজার বোলান্সা (কংগো-লিওপোল্ডভিল, একমুঠো সংবাদ, ঐ) ; জে ক্র্যাভি রিসহা (মোজাম্বিক, অজাত নাগরিকের কবিতা, ঐ) ; কাল্পানো (মোজাম্বিক, কালো মায়ের স্বপ্ন, অনুবাদ : শামসুর রাহমান) ; সিমহান (কোরিয়া, যখন আসবে সেদিন, ঐ) ; ই-সাঙ-হোয়া (ঐ, বসন্ত কি আসে অপহৃত মাঠে, ঐ) ; মুস্তফা মাহমুদ (লেবানন, সাদা রুমাল, অনুবাদ : আবদুস সাত্তার) ; আলফায়তুরী (মিশর, বৃষ্টির নীচে, ঐ) ; ইব্রাহীম তাউশন (ফেলিস্টিন, পারাবাত, ঐ) ; শাওকী বাগদাদী (সিরিয়া, আমাদের স্বপ্ন, ঐ) বুলন্দ আল হায়দারী (ইরাক, ধ্যানের নায়ক, ঐ) ; আবুল কাসেম শাবী (তিউনিস, বাঁচার মুহূর্তে, ঐ) ; মাওসেতুজ (চীন, বন্ধুর জ্বাবে ; সপ্তগ্রামী মহিলারা ; বসন্তে গাথা ; রূপকথার গৃহা ; শাওশানে ফিরে এসে ; অনুবাদক : ফজল শাহাবুদ্দীন) ; ইশিকাওয়া তাকুবোকু (জাপান, যৌবনের গাথা, অনুবাদ : শহীদ কাদরী) ; ইয়োসানো আকীকু (ঐ, আমার গানের, ঐ) ; নিকানো শিগে হারু, ঐ) ; নাকা হারা চুইয়া (ঐ, মৃত্যুর মুহূর্তে, ঐ) ; টাকামুরা কোতারো (ঐ, শীত এলো, ঐ) ; নাজিম হিকমত (তুরস্ক, প্রমিথিউসের ডাক ; জেলখানার চিঠি ; এখন প্রশ্ন ; অনুবাদক : সুভাষ মুখোপাধ্যায়) ;



হোচিমিন (ভিয়েতনাম, একটি অভিনয়, আমার কণ্ঠে সে গান, শ্বেত কবরী, কোন এক সুন্দর সকালে, ভিয়েতনামের মানুষ জাগছে, অনুবাদক : কমলেশ সেন); এবং হো চিংটি ডিও-ইর নাটক 'শ্বেতকুস্তলা' নামে অনুবাদ করেন আ.ন.ম. গোলাম মোস্তফা।

১৯৬৮ সনে হাসান হাফিজুর রহমানের সম্পাদকত্বে 'পরিক্রম' প্রকাশকালে পাকিস্তান লেখক সংঘের পূর্বাঞ্চল শাখা আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল, সেটি হচ্ছে 'মহাকবি স্মরণোৎসব'। এই সেমিনারে (বা উৎসবে) উপমহাদেশের উর্দু ও বাংলা সাহিত্যের পাঁচজন খ্যাতনামা কবির স্মরণে (১৯৬৮ সনের জুলাই মাসে) পাঁচদিনব্যাপী আলোচনা সমালোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

উৎসবে পঠিত প্রবন্ধ ও সভাপতির ভাষণগুলোর সমন্বয়ে প্রকাশিত হয়েছিল পরিক্রমের মহাকবি স্মরণোৎসব সংখ্যা (৫/১-২); এতে আনিসুজ্জামান (রবীন্দ্রনাথ); মনিরউদ্দীন ইউসুফ (ইকবাল); শওকত ওসমান (মধুসূদন দত্ত); মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (মধুসূদনের আধুনিকতা ও সমকাল); বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর (নজরুল ইসলাম); রফিকুল ইসলাম (নজরুল ইসলাম ও আমরা); আবদুল ওয়াহাব (গালিব); আহসান আহমদ আশক (গালিব); প্রমুখের প্রবন্ধাবলী ও অনুষ্ঠানের সভাপতিগণ যথা আবুল হাশিম (রবীন্দ্র দিবস); ড. মুহম্মদ এনামুল হক (ইকবাল দিবস); বিচারপতি এস. এম. মুর্শেদ (গালিবদিবস); মুনীর চৌধুরী (মাইকেল মধুসূদন দিবস); এবং আবদুল কাদির (নজরুল দিবস) এর বক্তৃতার সার-সংকলন করা হয়।

এই সমস্ত রচনায় কবিদের চিন্তাধারার সঙ্গে বর্তমান কালের সম্পৃক্ততা এবং সমাজের কল্যাণে তা চর্চার আবশ্যিকতা পরিস্ফুট হয়েছিল। পরিশিষ্টে ছাপা হয়েছিল সামাজিকভাবে সংশ্লিষ্ট কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার পরে লিখিত কয়েকটি প্রবন্ধ। যেমন : আবুল হাশিম—বাংলা সাহিত্য (পুনর্মুদ্রণ); ড. কাজী মোতাহার হোসেন—বাংলা ভাষা সমস্যা (পুনর্মুদ্রণ); ড. মুহম্মদ এনামুল হক—বাংলা ভাষার সংস্কার (পুনর্মুদ্রণ); মুনীর চৌধুরী—বানান সংস্কার (পুনর্মুদ্রণ) ইত্যাদি।

পরিক্রমের অপরাপর প্রবন্ধগুলোও অপরিসীম গুরুত্বের। এই প্রবন্ধগুলো বাঙালির মননসাধনার ইতিহাসে স্মরণীয়। লেখকগণের মধ্যে রয়েছেন বাংলা সাহিত্যের প্রধান প্রাবন্ধিকবৃন্দ। লেখকদের নামের সাথে রচনার শিরোনাম উল্লেখ করা হলো বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা গ্রহণের জন্যে।<sup>১</sup>

কবীর চৌধুরী—উইলিয়াম ফকনার (২/১); সিনক্লেয়ার লিউইস (২/৮); সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী—পনের বছরের সাহিত্য (২/১); হাউসম্যানের সাহিত্যসমালোচনা (৩/১০); কাজী আবদুল ওদুদ (৭/১-৬); হাসান হাফিজুর রহমান—নজরুল মানসের একদিক; একটি প্রশ্ন (২/১); মোহাম্মদ সিদ্দিক খান—গ্রন্থ, গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থবিক্রেতা (২/২); কক্সবাজারের প্রতিষ্ঠাতা হিরাম বক্স (২/১১-১২); ক্যানিহিল (৩/৪-৭); কাওয়ামাতার দুটি উপন্যাস (৬/৮-১১); আলাউদ্দীন আল-আজাদ—সাহিত্য ও অন্যান্য শিল্পকলা (২/২); আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ—কাজী দৌলত (২/২); এ্যান্টনী হার্টলে—ইংলেণ্ডের বুদ্ধিজীবী (অনুবাদ : নূরুল ইসলাম (২/৩); মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ—বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন (২/৩); নজরুলকাব্যের শিল্পরূপ : চিত্রকল্পের ব্যবহার (৫/৩-৪); আবু হেনা মোস্তফা কামাল—গীতিকার, তাঁর সমস্যা (২/৩); হসনে আরা হক—জন

স্টেইনবেক (২/৪) ; হারুনউর রশীদ—ফস্টকাব্যের কয়েকটি দিক (২/৪) ; তিনটি কবিতা প্রসঙ্গে (২/৭) ; আলী আনোয়ার—বৃটেনের বুদ্ধিজীবী (২/৪) ; মোহাম্মদ আজরফ—সাংস্কৃতিক সম্পদের উত্তরাধিকার (২/৪) ; ধর্মের সংকট (৩/৮) ; মেহরাব আলী—উইলিয়াম ফেরী ও দিনাজপুর (২/৪) ; আহসানুল হক—চসার ও আধুনিকতা (২/৬) ; আব্দুল ফজল—উপন্যাসে একটি নতুন উপলব্ধি (২/৬) ; মানবতার সৈনিক (৫/৮-৯) ; সৈয়দ মুজতবা আলী—সিলেটী (২/৬) ; বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর—আলবেয়ার কামু ও অস্তিত্ববাদ (২/৭) ; আধুনিক কবিতার জীবনাদর্শন (৪/৫) ; নিঃসঙ্গ যাত্রা (৪/৮) ; একজন সংব্যক্তির হৃদয় (কাজী আবদুল ওদুদ প্রসঙ্গে (৭/১৬) ; আবদুস সাত্তার—আধুনিক আরবী সাহিত্য (২/৭) ; আবুহেনা—আ্যারিস্টোফেনিসের কমেডি (২/৮) ; সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন—রবীট ফ্রস্ট, (অনুবাদ : রেজাউর রহমান (২/৯) ; কার্ল ম্যানহাইম—সংস্কৃতির গণতান্ত্রিকরণ, আনুবাদ : বো. উ. খা. জা. (২/৯) ; আমীর আলী—ইকবাল, শিকওয়া ও তার বাংলা অনুবাদ (২/১০) ; এস. এন. কিউ. জুলফিকার আলী—মাতৃভাষার ব্যবহার (২/১০) ; মনে পড়ে (৩/৯) ; কাজী আবদুল ওদুদ (৭/১-৬) ; পুর্ণেন্দু দস্তিদার চট্টগ্রামের প্রাচীন সাহিত্যসম্পদ (২/১০) ; আঁদ্রে মোরায়্যা—প্রস্তু এবং তাঁর শিল্পবোধ অনুবাদ : আ. জা. শামসুদ্দীন (২/১০) ; সাজ্জাদ ইউসুফ—অশ্রু নিয়ন্ত্রণ (২/১১-১২) ; আবদুল মান্নান—আজকের রাগ-সঙ্গীত (২/১২) ; রফিকুল ইসলাম—বাংলা বানান বাংলা একাডেমী (৩/১) ; শাহাবুদ্দীন আহমদ—আমীর হোসেন চৌধুরী (৩/২) ; আবদুল হাফিজ—কবিতা, ধর্ম ও সমাজ (৩/৩) ; হাসান আজিজুল হক—পূর্ব পাকিস্তানের কথাসাহিত্যে চিন্তার সংকট (৩/৯) ; হায়াৎ মামুদ—মৃত্যুচিন্তা : তিনজন অসবর্ণ কবি (৩/৯) ; সারওয়ার মুর্শিদ—তুলনামূলক সাহিত্যপ্রসঙ্গ (৩/১১) ; রাজেন্দ্রনাথ দাশ—শেক্সপিয়ার ও বাংলা নাটক (৩/১২) ; মাহফুজুল হক—বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা (৪/১) ; মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী—মধুসূদনের কবিমানস (৪/১) ; মুহম্মদ আবু তালিব—লালনশাহ ও লালনগীতির পুনর্বিচার (৪/১) ; লালনচরিতমানস ও শেষ জীবন (৪/৯-১২) ; খোদেজা খাতুন—পূর্ব পাকিস্তানের বিয়ের গান (৪/৮) ; আতোয়ার রহমান—পরিভাষা-সমস্যা (৪/৮) ; দিগদর্শন (৪/৯-১২) ; আবদুল মান্নান সৈয়দ—উত্তর বৈরিক ক্যারাতান (৪/৯-১২) ; ওবায়দ উল হক—নাটক প্রসঙ্গে দুচার কথা (৪/৯-১২) ; গোলাম সামদানী কোরায়সী—তৎসম্প্রীতির দৌরাত্ম্য (৪/৯-১২) ; বদিউজ্জামান—লোকসাহিত্য ও সমাজবিজ্ঞান (৪/৯-১১) ; শামসুল হক—হাবীবুল্লাহ বাহার ও বুলবুল পত্রিকা (৪/৯-১১) সৈয়দ মুর্তাজা আলী—(স্মৃতি) আমাদের কালের কথা (৪/১ ও অন্যান্য) ; কলকাতায় ছাত্রজীবন (৪/৯-১১) ; সুবোধ দাশগুপ্ত—খাদ্যপরিষ্কৃতি ও জমি-পরিচালনা (৪/৯-১১) ; আহমদ শরীফ—অন্ন ও আনন্দ (৪/১২) ; ইতিহাস পাঠকের দু'একটি জিজ্ঞাসা (৫/৩-৪) ; একটি প্রত্যয়ের পুনর্বিবেচনা (৫/৬-৭) ; জীবন সমাজ ও সাহিত্য (৬/১-২) ; খাদ্যসংকট ও বিশ্বসমস্যা (৭/১-৬) ; শওকত ওসমান—সংস্কৃতির অবেশা (৪/১২) ; আহমদ হুমায়ুন—আলোকিত বৃত্তে আত্মজিজ্ঞাসা (৪/১২) ; সানাউল হক—পাহাড় (৪/১২) ; মুনীর চৌধুরী—বাংলা বানান ও বর্ণমালা সংস্কার সমস্যা (৫/৩-৪) ; ওয়ালিক আহমদ—বাংলা ভাষা সংস্কার প্রসঙ্গ (৫/৩-৪) ; মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন—দৌলতকাজীর সতীময়না ও লোর চন্দ্রানী (৫/৮-৯) ; আবদুল হক—প্রাকৃতিক দুর্যোগ : সামাজিক প্রশ্ন (৫/১০-১২) ; সাহিত্য ও সরকার (৬/৩-৪) ; আবুল কাসেম ফজলুল হক—জ্ঞানতাপস মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (৬/১-২) ; আহসানুল হক—উইল্কিফ ও বাইবেল অনুবাদ (৬/৫-৭) ; আবুল কালাম—একটি বিষবস্তুর সমর্থন (৬/৫-৭) ; অজয় রায়—সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যবোধ ও আমাদের ভাষা (৬/৮-১১) ; আবু জাফর—সূক্তের কাব্যপরিচয় (৬/৮-১১) ; আনিসুজ্জামান—কাজী আবদুল ওদুদ (৭/১-৬) ; আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ—কাজী আবদুল ওদুদ (৭/১-৬) গোলাম মুরশীদ—বাংলা সন ও পহেলা বৈশাখ (৭/১-৬) ; ইত্যাদি।

পরিক্রমের প্রবন্ধসমূহ পূর্ব বাঙলার সমাজ, সংস্কৃতি ও সাহিত্য পরিস্থিতির আন্তরিক সমালোচক, দিকদর্শক ও উন্নতি অগ্রগতির সহায়ক হতে পেরেছিল। বাংলাভাষার ওপর ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদ-প্রতিরোধে মুনীর চৌধুরীর ভূমিকা স্মরণীয়। বাংলা একাডেমীর প্রস্তাবের বিপক্ষে মুনীর চৌধুরী দৈনিক 'পাকিস্তান' পত্রিকায় যে প্রবন্ধ প্রকাশ করেন তা পরিক্রম

পুনর্মুদ্রণ করে। রফিকুল ইসলামও লিখেছিলেন এ বিষয়ে। একুশে ফেব্রুয়ারির চেতনার যারা ধারক—বাহক তাঁদের অধিকাংশই পরিক্রমে লিখেছেন। মুক্তবুদ্ধির সাধক ও প্রচারক কাজী আবদুল ওদুদের মৃত্যুতে পরিক্রম বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে একটি সংখ্যা প্রকাশ করেছিল (৭/১-৬)। প্রকৃতপক্ষে পরিক্রমের পরিচালক ও লেখকমণ্ডলির সদস্যরাই ঐকালের প্রগতিশীল বলে আত্মপরিচয়দানকারী লেখক।

অতএব তাঁদের রচনায় গৌড়ামী কুসংস্কার এবং অন্ধ প্রতিক্রিয়াশীলতা, সাম্প্রদায়িকতা প্রশয় পায়নি; বরং বাঙালির স্বার্থসচেতনতার পরিচয় পাওয়া যাবে। এদিক থেকে পরিক্রমের পেছনে অর্থব্যয় সরকারের ক্ষতিরই কারণ হয়েছে। কিন্তু রচনার আদর্শ ও লেখকদের যাপিতজীবনের লক্ষ্য ও সামাজিক—রাজনৈতিক ভূমিকায় অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যাবে। এবং ঐদের উদ্দেশ্য করেছে পাকিস্তান সরকারের তথ্য সচিব ও লেখক সংঘের কেন্দ্রীয় কমিটির সেক্রেটারী জেনারেল, বিশিষ্ট লেখক, উর্দুভাষী কুদরতুল্লাহ শাহাব মস্তব্য করেছিলেন এই বলে যে, লেখকেরা একমত প্রচার করবেন অথচ অন্য মতবাদানুযায়ী জীবন যাপনের কবি সুলভ স্বাধীনতা নেবেন—এ চলতে পারে না।

আমলা মি. কুদরতুল্লাহ শাহাব আর জেনারেল আইউব খান শুধু নন, সেকালে বাঙালী সমালোচকদের দৃষ্টিও এই বৈশিষ্ট্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। আর এই বিষয়ে লিখিত প্রবন্ধও পরিক্রমেই ছাপা হয়েছে। অবশ্য তখন সম্পাদক ছিলেন আবদুল গনি হাজারী। সমাজের অবক্ষয় দেখে তিনি কবিতা ও নানা গদ্য—আলোচনায় এ বিষয়ে লিখেছিলেন। তাঁর হাত দিয়ে বুদ্ধিজীবীদের এই সমালোচনাও যে প্রকাশিত হবে—তাতে তাই বিস্ময়ের কিছু নেই।

কিন্তু এখানে বলে রাখা ভালো যে ইংলণ্ডের বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা বিষয়ে আলোচনার দ্বারা পরোক্ষভাবে সমাজ গঠনে বুদ্ধিজীবীদের দায়িত্ব—কর্তব্যের প্রতি সজাগ করা হয়েছিল। মাহফুজুল হক ‘বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা’ শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছিলেন :

আমাদের রাজনৈতিক জীবনের নীতিহীনতা ও লক্ষ্যহীনতা এবং অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে সোজা পথ হিসেবে আমরা রাজনীতিবিদদের উপর সকল দোষ চাপিয়ে পরিত্রাণ পেতে চাই। একথা অনস্বীকার্য যে, দেশের অনগ্রসরতা বা বিশৃঙ্খলার প্রধান দায়িত্ব নেতৃত্ববন্দের। দেশকে গড়ে তোলার প্রতিজ্ঞায় যারা জনগণের ভোটে ক্ষমতাসীন হয়েছিলেন তাঁদের দায়িত্ব সব চেয়ে বেশী এবং যাদের নীতিহীনতা ও স্বার্থবাদিতার জন্য দেশে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়েছে দেশ তাঁদের কোনদিনই ক্ষমা করতে পারে না। তাই দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অব্যবস্থার প্রধান দায়িত্ব রাজনীতিবিদদেরই কাঁধে; কিন্তু একথা আমরা যেন ভুলে না যাই যে, কোন একটি শ্রেণীর বিশ্বাসঘাতকতাই দেশের সমূহ ক্ষতি সাধন করতে পারেনা যদিনা তাদের দুষ্কৃতির পেছনে সমর্থন ও সাহায্য আসে অন্য শ্রেণী থেকে।

রাজনীতিবিদেরা নিজেদের দোষ স্খালন করতে গিয়ে অন্য আর এক শ্রেণীর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন, তাঁরা হচ্ছেন সরকারী কর্মচারী। পাকিস্তানের স্থিতিহীন রাজনৈতিক জীবনের সুযোগ গ্রহণ করে তাঁরাও এদেশের অশেষ ক্ষতিসাধন করেছেন। নিজেদের ব্যক্তিগত সুবিধা আদায়ের উদ্দেশ্যে ও শ্রেণীস্বার্থ বজায় রাখতে গিয়ে তাঁরাও রাজনীতিবিদদের মত সময় সময় দলীয় কোন্দলে অংশ নিয়েছেন এবং দুর্নীতিতে রাজনীতিবিদদের সাহায্য করেছেন। কিন্তু প্রশ্ন হল, আমাদের বর্তমান দুর্ববস্থার জন্য শুধু কি এ দুশ্রেণীই একমাত্র দায়ী?

লেখক বলেন : যে শ্রেণী নির্বিকারভাবে দায়িত্ব এড়িয়ে গেছে বা যারা এখনও জনসমক্ষে নিজেদের কৈফিয়ৎ দেয়ার প্রয়োজন বোধ করেননি সে শ্রেণী হল তথাকথিত বুদ্ধিজীবীশ্রেণী। রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক ব্যর্থতার চেয়েও যে ব্যর্থতা জাতি হিসেবে আমাদের প্রাণহীন ও মেরুদণ্ডবিহীন করে তোলার জন্য দায়ী তা হচ্ছে আমাদের বুদ্ধিজীবীদের ব্যর্থতা, আমাদের সংস্কৃতিসেবীদের স্বচ্ছ মত ও পথের অভাব।

অথচ অন্যের দোষ সম্পর্কে তাঁরাই সবচেয়ে বেশী উচ্চকণ্ঠ। রাজনৈতিক ব্যর্থতা কাটিয়ে ওঠা অসম্ভব কিছু নয় যদি সে জাতির প্রাণরস শুকিয়ে না যায়। জাতীয় জীবনের ফল্গু ধারা যেখানে নীতিহীন পথে দিশেহারা না হয়ে নির্দিষ্ট ঝাঁকে প্রবাহিত হয়, সেজাতি সাময়িক পরাজয় ও ব্যর্থতাকে জয় করে আবার মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে। লেখক ফরাসি ও জার্মানির উদাহরণ টেনে বলেন :

অতীতের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাব সত্ত্বেও আজকের ফরাসি দেশ অগ্রগতির পথে চলেছে, পূর্ণোদ্যম, দুদুটি মহাসমরে বিধ্বস্ত জার্মানি আজ সকলের ঈর্ষার বস্তু। কিন্তু আমাদের রোগমুক্তির যেন কোন আশাই নেই। তার কারণ কি? আমাদের শিরদাঁড়া কোথায় যেন বেঁকে বসেছে, আমাদের মত ও পথের কোন স্পষ্ট নিশানা ঝুঁজে পাওয়া যাচ্ছেনা। চিন্তার ক্ষেত্রে এ অরাজকতা এ অস্পষ্টতা ও দিকহীনতার জন্য দায়ী কে? এ ব্যাপারে আমাদের বুদ্ধিজীবীরা কি তাঁদের দায়িত্ব পালন করেছেন?...সামান্য লাভের জন্য বুদ্ধিজীবীশ্রেণীও দলীয়কেন্দ্রের সুযোগ গ্রহণ করেছে পুরোপুরী!...আজকের দিনে তাই আত্মজিজ্ঞাসার প্রয়োজন সবচাইতে বেশি; কর্তব্যের পথে জাতিকে সজাগ করার যে দায়িত্ব বুদ্ধিজীবীদের উপর ন্যস্ত সে দায়িত্ব সত্ত্বেও পূর্ণ আন্তরিকতার সঙ্গে আমরা পালন করেছি কি?°

আহমদ শরীফ, আবদুল হক, শওকত ওসমান প্রমুখ দেশের সাংস্কৃতিক সংকটকালে বিবেকের দংশনে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছিলেন। তখন তাঁরা লিখেছিলেন মুক্তবুদ্ধির তাড়নায় যেসমস্ত রচনা তার অনেকাংশ পরিক্রমেও মুদ্রিত। আহমদ শরীফের গুরুত্বপূর্ণ ৫/৬ টি প্রবন্ধ এতে প্রকাশ পায়। যেমন : অন্ন ও আনন্দ, ইতিহাসপাঠকের দুএকটি জিজ্ঞাসা, একটি প্রত্যয়ের পুনর্বিবেচনা, জীবন সমাজ ও সাহিত্য এবং খাদ্যসংকট ও বিশ্বসমস্যা ইত্যাদি। এগুলোর মর্ম ও দর্শন প্রগতিশীলতার পথে পাঠকশ্রেণীকে উদ্বুদ্ধ করে। ‘অন্ন ও আনন্দ’ শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি বলেন :

জীবনে সমাজে রাষ্ট্রে যখনই গ্লানি ও বিপর্যয় আসে, তখনই সাধারণ নায়কেরা মানুষকে স্বধর্ম তথা পিতৃপুরুষের ধর্মে নিষ্ঠ হতে উপদেশ দেন, তাঁদের মতে একমাত্র এ পথেই বিপদশূন্য সম্ভব। সবদেশে সবযুগেই সাধারণ মানুষের ধারণায় সংকট উদ্ধারের এ-ই একমাত্র উপায়। তাঁরা যদি নতুন ধর্মের প্রবর্তন চাইতেন, অন্তত গ্রহণ-বর্জনের মাধ্যমে সংস্কারের প্রয়োজন অনুভব করতেন, তাহলেই সুবুদ্ধির পরিচয় দিতেন। মোহগ্রস্তচিত্তে পুরানোই শ্রদ্ধেয়; নতুন মাত্রেরই অবজ্ঞেয় ও অনভিপ্রেত।°

‘জীবন সমাজ ও সাহিত্য’ শীর্ষক প্রবন্ধে সাহিত্যদর্শ বিশ্লেষণ করে আহমদ শরীফ বলেন : সাহিত্যে সমাজচিত্র দেয়া মানে যা আছে, কেবল তাই চিত্রিত করা নয়—যা হওয়া উচিত তারই সংকেত দেয়া—প্রেরণা দেয়া, নইলে রচনা নকশাই থেকে যায়। তেমনি ভাষা ও বাক-ভঙ্গি যেমনটি আছে তেমনটিই রক্ষার প্রয়াসেই লেখকের কর্তব্য সীমিত রাখলে চলেনা, তার উন্নয়ন ও বিকাশের চেষ্টাও করতে হয়। সংস্কৃতিও যা আছে তা নয়, যা কাম্য তারই দিশা দান সাহিত্যিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

অতএব, দেশের সমাজ ও সংস্কৃতির পরিচর্যা ও দেশের মানুষের জীবনের সঙ্গে শিল্পীসাহিত্যিকের জীবনের যোগসাধন মানে দেশের সমাজ-সংস্কৃতির বর্তমান স্বরূপ তুলে ধরা নয়, বাঞ্ছিত সমাজ সংস্কৃতির রূপ ঐকে দেয়া। এজন্য বাকজাল বিস্তার কিংবা কাল্পনিক অস্বাভাবিক পরিবেশ সৃষ্টির ও চরিত্রাঙ্কনের প্রয়োজন নেই। বর্তমান সমাজ ও সংস্কৃতির অসঙ্গত, অসুন্দর ও অকল্যাণপ্রসূ দিক উদঘাটিত হলেও এ উদ্দেশ্য সহজেই সিদ্ধ হয়।

শ্রীতি ও প্রত্যয়ই এ কর্মে সাফল্যের সম্ভব। কেননা শ্রীতিহীন হৃদয় ও প্রত্যয়হীন কর্ম দুই-ই অসার্থক। যারা দেশের সমাজ ও সংস্কৃতির অতীতরূপের ধ্যানে আসক্ত, কিংবা বর্তমান রূপের অনুরাগী ও অনুগত; তারা জীবনবিমুখ, প্রগতি-ভীরু। তাঁদের বুদ্ধিবল্লম্ব, দৃষ্টি ক্ষীণ ও বোধ অগভীর। শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে তেমন লোকের সংখ্যা যত কম ততই মঙ্গল।<sup>৫</sup>

পরিক্রমের পুস্তক সমালোচনাগুলো প্রবন্ধের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এর প্রতিটি পুস্তক-আলোচনাই ছোটখাটো প্রবন্ধের মতো। এস. এন. কিউ জুলফিকার আলী লিওনেল অলরয় প্রণীত *Sout of the Sun* ভোরের পাখির কাকলীর উপর লিখেছিলেন। জ্যোতির্ময় গৃহ ঠাকুরতা আলোচনা করেন ‘অনুল্লত দেশে বুদ্ধিজীবী’ শিরোনামে *The Intellectual between Tradition and Modernity : The Indian situation by Edward shils. Mouton & Co. The Hunge 1961* অবলম্বনে।

আমীর আলী লরেন্স ডারেল (*Justice : Farst part of Alexandira Quartirs by Lawrance Durrell*) অবলম্বনে লেখেন ‘চতুর্মাত্রিক বিচার’। গোলাম সাকলায়েন ড. অজিত কুমার ঘোষ প্রণীত ‘বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধারা’ শীর্ষক গ্রন্থের আলোচনা লেখক ‘বাংলায় হাস্যরসের সাহিত্য’ শিরোনামে। শাহাবুদ্দীন আহমদ লেখেন আহসান হাবীবের ‘ছায়া হরিণ’ সম্পর্কে। লতিফা হিলালীর ‘এক আকাশ অনেক তারা’র আলোচনা করেন মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ। আবদুল আহাদ প্রণীত ‘নবদিগন্তের গান’-এর উপর লেখেন রফিকুল ইসলাম।

‘সঙ্গীত ও সঙ্গীত সমালোচনা’ করেন ওয়াহিদুল হক। বিভাগীয় আলোচনায় বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর চিত্রপ্রদর্শণীর সমালোচনা লেখেন। ‘দুরূহ নাটকের মঞ্চ সাফল্য’ শিরোনামে নাট্যসমালোচনা করেন আতাউস সামাদ (২/১) ; C.P. Snow র *The Affair*-এর ওপর লেখেন এস.এন. কি. জুলফিকার আলী। Erich Maria Remarque প্রণীত *The Black Obelisk*-এর আলোচনা করেন ফখরুজ্জামান চৌধুরী। আহসান হাবীবের ‘আরণ্য নীলিমা’র ওপর লেখেন আনিসুজ্জামান। সৈয়দ শামসুল হকের বই ‘একদা এক রাজ্য’র আলোচনা লেখেন শাহাবুদ্দীন আহমদ।

সানাউল হক প্রণীত ‘পুতুল সৈনিক’ এর আলোচনা করেন মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ। বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর, হাসান হাফিজুর রহমান, রফিকুল ইসলাম ও সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ‘সাহিত্যের সমাজতত্ত্ব’ বিষয়ে প্রকাশিত প্রবন্ধের ওপর তর্ক-বিতর্ক করেন (২/২)। (পেঙ্গুইন প্রকাশিত P.G. wodehouse প্রণীত *Lord of the files* এর ওপর লেখেন আবু হেনা (পতনের ইতিহাস, ২/৩)। শওকত ওসমান প্রণীত ক্রীতদাসের হাসির ওপর

আলোকপাত করেন রফিকুল ইসলাম (২/৩)। বি.ডি. হাবীবুল্লাহ ঞ্ণীত শেরে বাংলার জীবনীর সমালোচনা করেন নীলিমা ইব্রাহীম।

রাজিয়া মাহবুব-এর ‘স্বনির্বাচিত গল্প’ সম্বন্ধে লেখেন আবু হেনা (ভাবানুতাহীন মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, ২/৩)। শংকর এর চৌরঙ্গীর আলোচনা করেন ফখরুজ্জামান চৌধুরী। আবদুল হকের ‘ক্রান্তিকাল’ সমালোচনা করেন লুতফুল হায়দার চৌধুরী আর মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহর ‘বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন’ শীর্ষক প্রবন্ধের ওপর তর্ক-বিতর্ক করেন আনিসুজ্জামান ও মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ (২/৩)।

এমনিভাবে প্রত্যেক সংখ্যায় চার-পাঁচ কিংবা ছয়-সাতটি গ্রন্থের ওপর আলোচনা-সমালোচনায় পরিক্রমও হয়ে উঠেছে পূর্ব বাঙলার সাহিত্য সংস্কৃতির ইতিহাসের দলিল। এই পত্রিকার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় গ্রহণ বিস্তৃত পরিসরের দাবি করে।<sup>৬</sup>

### তথ্যপঞ্জি

১. কবি ও গল্পকারদের নামগুলো পত্রিকার ক্রম অনুসারে আদি থেকে অন্ত পদ্ধতিতে সাজানো হয়েছে।
২. উপর্যুক্ত পদ্ধতিতে সজ্জিত।
৩. মাহফুজুল হক, বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা, পরিক্রম, ৪ বর্ষ, ১ সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৭২, পৃ. ১-৬।
৪. আহমদ শরীফ, অন্ন ও আনন্দ, পূর্বোক্ত, ৪ বর্ষ, ১২ সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি-জুন ১৯৬৮।
৫. পূর্বোক্ত, জীবন সমাজ ও সাহিত্য, পূর্বোক্ত, ৬ বর্ষ ১-২ সংখ্যা, জুলাই-আগস্ট, ১৯৬৯।
৬. পরিক্রমে শতাধিক গ্রন্থের পরিচয় ও প্রাসঙ্গিক মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছে নিবন্ধের আকারে। সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক আরও প্রায় অর্ধশত আলোচনা-সমালোচনা এতে প্রকাশিত হয়েছে। পরিক্রমের লেখকসূচিতে বাছবাছা লেখকদের নাম দেখা যায়। অতএব এই আলোচনাসমূহ সাহিত্যগুণে সমৃদ্ধ ছিল। কালের ছবিও ঐ সাহিত্যে ধরা পড়েছে। সাহিত্য, সংস্কৃতি মননসাধনা আর জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার চিত্রাঙ্কনের প্রচেষ্টায় ‘পরিক্রম’ তৎপর ছিল। উল্লেখ্য এইসকল আলোচনার প্রায় অর্ধেকটা বিদেশীসাহিত্য দর্শন ও বিজ্ঞানের ওপরে বা প্রসঙ্গে।

## ৭. কণ্ঠস্বর (১৯৬৫-৮৬)

পূর্ববাঙলার আলোড়ন সৃষ্টিকারী সাহিত্যপত্রিকা কণ্ঠস্বরের প্রথম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬৫ সনের শেষ নাগাদ, তবে তারিখবিহীনভাবে। প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬ সনে, কিন্তু এবারও এটিতে বলা হয় না এটি মাসিক, দ্বিমাসিক কিংবা ত্রৈমাসিক, কোন শ্রেণীর। কেবলমাত্র নিয়মাবলি থেকে অনুমান করতে হয় কণ্ঠস্বরের কর্তার মাসিক হিসেবেই চালাতে চেয়েছিলেন, তাই লেখা হয়েছিল (দ্বিতীয় সংখ্যায়) ‘প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে কণ্ঠস্বর প্রকাশিত হয়। দাম প্রতি সংখ্যা আট আনা।’

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ সম্পাদিত ‘কণ্ঠস্বর’ এদেশের সাহিত্যপত্রিকাগুলোর মধ্যে স্থায়ী মূল্য পেয়েছে যেকটি—তার মধ্যে অন্যতম। সমকালের এবং পরবর্তীকালের সাহিত্যসমাজ পত্রিকার আলোচনাকালে কণ্ঠস্বরকে পাশ কাটিয়ে যেতে পারেনি, নিকট ভবিষ্যতেও ইতিহাস থেকে এই নাম মুছে যাবে বলে মনে করার কারণ নেই। মোহাম্মদ আবদুল কাইউম, গোলাম সাকলায়েন, আবদুল মন্সুর সৈয়দ, হুমায়ুন কবির, মহাদেব সাহা, মুহাম্মদ আবদুল হাফিজ, আবুল কাসেম ফজলুল হক, মুনীর চৌধুরী—সকলেই এই পত্রিকার মূল্য সম্পর্কে মতামত দিয়েছেন।

পূর্ববাঙলার সাহিত্যপত্রিকার আলোচনায় এই পত্রিকাটির প্রসঙ্গ বিভিন্নজন নানানভাবে উপস্থাপিত করেছেন। মোহাম্মদ আবদুল কাইউম লিখেছেন (১৯৬৮) : ‘ঢাকা থেকে সম্প্রতি যে কয়েকটি সাহিত্যপত্র বেরিয়েছে তন্মধ্যে আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের ‘কণ্ঠস্বর’ বিশেষ উল্লেখের দাবিদার।’<sup>১</sup> গোলাম সাকলায়েন লিখেছেন (১৯৭০) :

‘অগত্যরই উত্তরসূরী কণ্ঠস্বর। কলকাতার ‘শনিবারের চিঠি’র মতো (প্রথম দিকের) অবয়ব নিয়ে ‘কণ্ঠস্বর’ তরুণ-সাহিত্যিক মহলের কণ্ঠস্বর শুনিয়ে আসছে। ... ‘কণ্ঠস্বরকে কেন্দ্র করে বিশ শতকের ষষ্ঠ দশকের কতিপয় প্রতিশ্রুতিশীল লেখক একটি সাহিত্যিক গোষ্ঠী গড়ার কাজে উৎসাহী, এ দশকেই আমাদের সাহিত্যক্ষেত্রে একটি নবতর সাহিত্যাদোলন জন্ম নেয়। শুরু হলো সাহিত্যের পালা-বদল। দুই যুগ পরে আজ সৃষ্টিপ্রয়াসী তরুণ লেখক ও সাহিত্যব্রতীদের রচনায় যুগধর্ম সোচ্চার হয়ে উঠেছে। বস্তুতান্ত্রিক রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে প্রকাশিত হতে চলেছে আজকের গল্প-কবিতা-উপন্যাস-প্রবন্ধ ও সমালোচনা। কণ্ঠস্বরের পৃষ্ঠাগুলিতে জীবনের স্পর্শবাদ অনুপস্থিত নয়। এবং সেই সঙ্গে ভাববাদী ঐতিহ্যকে ত্যাগ করে বাস্তব অভিধায় শাশ্বত সত্যের কথা প্রচারে ‘কণ্ঠস্বর’ আশ্চর্যভাবে মুখর।’<sup>২</sup>

আবদুল মান্নান সৈয়দ ‘কণ্ঠস্বর’কে ‘লিটলম্যাগাজিন’ বলতেই উৎসাহী। কারণ ‘লিটল ম্যাগাজিনের আত্মায় মিশে আছে বিদ্রোহ’। এর সম্পাদক ও লেখকগোষ্ঠীর মূল সদস্যের রক্তে মিশে থাকে ‘বিদ্রোহের তেজ ও জোশ’ প্রজ্জ্বলস্বরূপে। তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশের ষাটের দশকে গেছে লিটল ম্যাগাজিনের ভরা জোয়ার। অন্তত তিনটি লিটল ম্যাগাজিনের উল্লেখ অনিবার্য : ‘স্বাক্ষর’, ‘সাম্প্রতিক’ ও ‘কণ্ঠস্বর’। ‘স্বাক্ষর’ ছিলো ষাটের দশকের নূতন কবিদের মুখপত্র—ছয়টি মাত্র সংখ্যা (প্রকৃতপক্ষে ৪টি) প্রকাশ করেই সে একটি কবিতাকেন্দ্রী নূতন স্বরলিপি প্রযোজনা করে। ‘সাম্প্রতিক’ ছিলো অবিসংবাদী এক অভিনব গদ্যের জনক—

একটিমাত্র সংখ্যাতে অবসিত হয়, পরে চারিত্রচ্যুত অবস্থায় অবশ্য অনেকদিন বেরিয়েছে। ষাটের দশকে আরো অনেক ক্ষণজীবী লিটল ম্যাগাজিন বেরিয়েছিলো : কিন্তু ‘কণ্ঠস্বর’ই তার মধ্যে সর্বগ্রাসী ও মহত্তম ভূমিকা পালন করে। নবজাগৃত সমস্ত কণ্ঠস্বর সে গ্রহণ করে, ঘোষিতভাবেই বর্জন করে পূর্বজ লেখকদের, তিরিশ সংখ্যা (প্রকৃতপক্ষে ৩২) ব্যাপী সে এই অটুট চারিত্র্য রচনা করে। পরে, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সত্তরের দশকে এসে সে তার চরিত্র পাল্টানোর চেষ্টা করে এবং তা ঠিকই করে; কেননা এতোদিনে ‘কণ্ঠস্বরের’ মূল প্রয়োজন ফুরিয়েছে এবং সংগতভাবেই সে একদিন স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করে।<sup>১০</sup>

‘কণ্ঠস্বর’ পত্রিকার তৃতীয় পর্বের ‘সহকারী সম্পাদক’ আহমদ মাহহার লিখেছিলেন : সমকাল এর ন্যায় উচ্চমানসম্পন্ন পত্রিকা থাকা সত্ত্বেও সে সময়ের সৃষ্টিউন্মুখ তরুণ লেখকদের প্রকাশের জন্য ‘মুক্ত-স্বাধীন ক্ষেত্র প্রয়োজন হয়ে পড়েছিলো’। ‘এই মুক্ত স্বাধীন ক্ষেত্র সৃষ্টি করতে গিয়েই ... সৃজনশীলতার তখন নবজাতক অবস্থা। বড় হয়ে ওঠার, ওপরে ওঠার জন্য তাদের অবশ্যস্তাবী প্রয়োজন বাহন এবং পরিবেশ। এই প্রয়োজনের তাড়না থেকেই ... প্রকাশিত হতে থাকে সেই সময়কার সবচেয়ে তারুণ্যদীপ্ত সৃষ্টিস্পন্দিত অভিঘাত সৃষ্টিকারী এবং দীর্ঘজীবী পত্রিকা ‘কণ্ঠস্বর’। ... কণ্ঠস্বরের মূল লক্ষ্য ছিলো সৃষ্টি, নতুনতম সৃষ্টি। তার এই আকাঙ্ক্ষার মধ্যে কোনো ফাঁকি ছিলো না।<sup>১১</sup>

কণ্ঠস্বরের পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে মুনীর চৌধুরীর সভাপতিত্বে ১৯৬৯ সনে যে আলোচনা-উৎসবের আয়োজন করা হয়, তাতে মহাদেব সাহা, আবদুল মান্নান সৈয়দ, হুমায়ুন কবির, আবুল কাসেম ফজলুল হক, মুহম্মদ আবদুল হাফিজ প্রমুখ কণ্ঠস্বরের ভূমিকা নির্ণায়ক প্রবন্ধ বা আলোচনা পাঠ করেছিলেন। আবুল কাসেম ফজলুল হক সৃষ্টি বা গড়ার চেয়ে ধ্বংসোন্মুখ জ্বরাজীর্ণ-পুরনোকে প্রবল আঘাতে সহসা ভেঙ্গে দিয়ে নতুন পরিবেশ সৃষ্টি বা ক্ষেত্র তৈরীর কাজেই মধ্যেই এই পত্রিকার মহত্ত্ব দেখতে পেয়েছেন। তিনি লিখেছেন :

সাহিত্যের ক্ষীয়মাণ ধারার ক্ষয়কে কণ্ঠস্বর প্রবাহিত করে নিয়ে গেছে একেবারে ধ্বংসের সমুদ্রের মোহনায়। মুম্বুর্কে তাঁরা ঠেলে দিয়েছেন, অনেকটা সচেতনভাবেই, মৃত্যুর অঙ্ককার গহ্বরে। চতুর্দশ শতাব্দী থেকে ধ্বংসে যাচ্ছে দেখে কোন প্রকার আক্ষেপ প্রকাশ না করে কণ্ঠস্বরের উদ্যোগীরা নিষ্ঠুরতার সঙ্গে সেই সব কিছুকে নির্ধিকায় হত্যা করেছেন, ‘যাদের নিহত হওয়া অনিবার্য ছিল এবং প্রয়োজন ছিল।’ যে সব জিনিসের ধ্বংস ছিল অনিবার্য এবং ‘প্রয়োজনীয়’, কিন্তু যেগুলোর ধ্বংস ঘনাতো হয়তো বেশ সময় লাগত—কণ্ঠস্বর সেগুলোকে ধ্বংস করে দিয়েছে অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্ৰতায়।

কণ্ঠস্বরের ধ্বংস-যজ্ঞের অনুকৃতি ঘটেছে ক্ষুদ্রে সংকলন প্রকাশের মধ্য দিয়ে পূর্ব বাঙলার ক্ষুদ্রতম দূরতম মফস্বল শহরটি পর্যন্ত। অগ্রজ কবি লেখকদের রচনায়ও কণ্ঠস্বরের প্রভাব খুঁজে বেব করার জন্য, আমার মনে হয়, তেমন কোন অনুসন্ধানের প্রয়োজন হবে না। ধ্বংস যজ্ঞের মধ্য দিয়ে হয়তো অবাচেতনভাবেই, কণ্ঠস্বর সৃষ্টি করে দিয়েছে নতুন বীজ—বপনের উপযুক্ত ভূমি—যে-ভূমি তৈরী হতে কণ্ঠস্বরের আবির্ভাব না হলে, হয়তো আরও বেশ কিছুকালের প্রয়োজন হত। .... নৈতিকতার প্রচলিত আদর্শকে ভেঙ্গে দিয়ে সাময়িক শূন্যতা সৃষ্টি করে কণ্ঠস্বর যত অপরাধই করে থাকুক না কেন, কণ্ঠস্বর হচ্ছে পূর্ব বাঙলার প্রত্যাসন্ন সাংস্কৃতিক বিপ্লবেরই এক অচেতন অশ্রু। .... কণ্ঠস্বর সাহিত্যক্ষেত্রে পুরনো শৃংখলাকে ভেঙ্গে দিয়েছে। নৈতিকতার প্রচলিত আদর্শের আমূল উৎখাত ঘটিয়েছে। এর ফলে নতুন শৃংখলা ও নতুন সাহিত্যাদর্শের প্রতিষ্ঠার পথ সুগম



হয়েছে... আমার ধারণা অন্তঃসম্পদের দিক থেকে দেখলে কঠম্বরের লেখকদের নতুনত্ব এই জায়গায় যে অগ্রজ লেখকেরা যখন প্রচলিত মূল্যবোধসমূহকে সংস্কারের মধ্যদিয়ে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেছিলেন এবং 'চতুস্পার্শে সবকিছু যাচ্ছে ধ্বংস' বলে হাফাকার করছিলেন, কঠম্বরের লেখকেরা তখন বলিষ্ঠতার সঙ্গে এগিয়ে এসেছেন সেগুলোকে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য।

অগ্রজ লেখকদের রচনা পড়ে মনে হয় : ইতিহাসের অগ্রগতি ঘটে নতুনের দ্বারা পুরানোর স্থলাভিষিক্ত হবার মধ্যদিয়ে নয়, পুরনোকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করার মধ্য দিয়ে। আর কঠম্বরের রচনা পড়ে মনে হয়, ইতিহাসের অগ্রগতি ঘটে নতুনের দ্বারা পুরনোর স্থলাভিষিক্ত হবার ও পুরনোর বিলুপ্তির মধ্য দিয়ে। এইখানেই কঠম্বরেরা বেশিষ্ট্য ও নতুনত্ব।<sup>৫</sup>

'কঠম্বর' এর সরকারী রেজিস্ট্রেশন পাকিস্তান আমলে ছিল না। ১৯৭১ সনের পূর্বে (বা মধ্য) এই পত্রিকার ২০টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ২১ তম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় মার্চ ১৯৭২ এ অথবা তারপরে। এই সংখ্যায় সপ্তম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা 'এপ্রিল ১৯৭১—মার্চ ১৯৭২' চিহ্ন দেয়া হয়েছিল। এরপরে ১৯৭২ সনের জুন ও সেপ্টেম্বর ; ১৯৭৩ সনের মার্চ ও ডিসেম্বর ; ১৯৭৪ সনের সেপ্টেম্বর ; ১৯৭৫ সনের মার্চ, জুন ও ডিসেম্বর ; ১৯৭৬ সনের মার্চ এবং ১৯৭৬ সনের জুন এ মোট ১২টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

এই সংখ্যাগুলোতে কঠম্বরের পূর্বতন চারিত্র্য পাল্টে গেছে দেখা যায়। আকৃতি ডাবল ডিমাই একের আট স্থির হয়েছে। আগের সংখ্যাগুলোর আকার একরকম ছিল না, পৃষ্ঠা সংখ্যা শতের উপর, কখনও প্রায় দুইশো (১৮৫) হয়েছে। বিভিন্ন গোষ্ঠীর নবীন প্রবীণ লেখকদের লেখা এতে ছাপা হয়েছে। কঠম্বর তখন আর আপন গোষ্ঠীতে সীমাবদ্ধ থাকেনি। অবশ্য তখন স্বাধীনতা বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। সমাজ, সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে ; মোট কথা হাওয়াটাই গেছে বদলে।

এই কালে বিশালকায় একটি কবিতা সংখ্যা, মার্চ ১৯৭৬, এটি তখনকার সদ্যপ্রয়াত কবি আবুল হাসানকে উৎসর্গ করা—প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৭৫ সনের একটিকে 'গল্পসংখ্যা' আখ্যায়িত করা হয়েছিল। এই সংখ্যাতেই সম্পাদক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ 'কঠম্বরের একদশক' (১৯৬৬-৭৫) উপলক্ষে 'আত্মপক্ষ' লিখেছিলেন ; আর সংকলিত করেছিলেন কঠম্বরের প্রাসঙ্গিক বহু তথ্য।

'বিভিন্ন সময়ে কঠম্বরে প্রকাশিত কয়েকটি ঘোষণা', কঠম্বর সম্পর্কে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীতে রচিত বা উক্ত মুনীর চৌধুরী, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, অরুণকুমার ঘোষ, আবুল কাসেম ফজলুল হক, মুহাম্মদ আবদুল হাফিজ, আবদুল মান্নান সৈয়দ হুমায়ুন কবির প্রমুখের লেখা বা ভাষণ থেকে উদ্ধৃতি আছে। আরও আছে কঠম্বরে উপস্থাপিত লেখক ও তাঁদের রচনার তালিকা, যেসকল প্রেসে কঠম্বর ছাপা হয়েছে সেগুলোর নাম ঠিকানা, কঠম্বরের প্রচ্ছদ শিল্পীদের নাম, বিভিন্ন সময়ে কঠম্বরের সঙ্গে জড়িত কর্মীবৃন্দ ; কঠম্বরের সমসাময়িক অন্যান্য লিটল ম্যাগাজিনের উপর মন্তব্য ও তথ্য ইত্যাদি।

এর মধ্যে উল্লেখ্য যে কঠম্বর স্বাধীন বাংলাদেশ আমলে দুটি সংখ্যা শহীদ হুমায়ুন কবির এবং অকাল প্রয়াত তরুণ সাহিত্যিক, খান মোহাম্মদ ফারাবীকে (৮/৪, ডিসেম্বর ৭৩)

উৎসর্গ করা হয়েছিল। কণ্ঠস্বর পত্রিকার প্রথম থেকে শেষ সংখ্যা পর্যন্ত মিনেস খালেদা হাবিব কতৃক প্রকাশিত হয়। ইষ্ট বেঙ্গল বিউটি প্রেস, তাঁদের ছাপাখানা ছিল তবে মুদ্রণালয় পরিবর্তিতও হয়েছে। ৪৯ বীরেন বোস ষ্ট্রীট, ঢাকা-১১ থেকে প্রকাশিত হয় প্রথম সংখ্যা, দাম ৫০ পয়সা। পৃষ্ঠা সংখ্যা বিজ্ঞানসহ ৫২; মোটা সাদা কাগজ ক্রাউন ১/৪ সাইজ। সম্পাদক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, সঙ্গে কোনো সহকারী বা সহযোগী সম্পাদকের নাম মুদ্রিত হয়নি। দ্বিতীয় সংখ্যাতেওনা, যোগাযোগের ঠিকানা, ইত্যাদি ছিল না প্রথমে। তবে দ্বিতীয় সংখ্যায় যোগাযোগের ঠিকানা ১২ জগন্নাথ সাহা রোড, লালবাগ, ঢাকা উল্লেখ করা হয়েছিল।

প্রথম তিনটি সংখ্যার সাইজ একই ছিল। কিন্তু পৃষ্ঠা সংখ্যা কমে আসছিল। প্রথমটির ৫২, দ্বিতীয়টির ৪২, তৃতীয়টির ৩৪। এরপরই পত্রিকার আমূল পরিবর্তন ঘটে, সাইজ একের আট ডিমাই হয়। এবং পৃষ্ঠা সংখ্যা কমে চলে আসে ১৬ তে। চতুর্থ সংখ্যায় (মার্চ ১৯৬৭) নতুন ঠিকানা হয় ২৪৫ উত্তর শাহজাহানপুর, ঢাকা-১৪; এরপর এপ্রিল ১৯৬৭তে প্রকাশিত সংখ্যাটির পৃষ্ঠা সংখ্যা বেড়ে ৫০ হয়। কিন্তু ১৯৬৭র জুলাইয়ে আবার পত্রিকার আকার বড় হয়ে পূর্বতন অবস্থায় ফিরে যায়। আগস্ট ১৯৬৭তে প্রকাশিত সংখ্যায় সম্পাদক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের সঙ্গে ‘সহযোগিতায়’ তোফাজ্জল হোসেন সরকার, নির্মালেন্দু গুণ, গালিব আহসান খান, সাযাদ কাদির প্রমুখের নাম মুদ্রিত হয়।

সেপ্টেম্বর ১৯৬৮ সংখ্যায় সহযোগী সম্পাদক হিসেবে শফিক খান, প্রচ্ছদশিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী, প্রচ্ছদ-আলোকচিত্রী গোলাম মোস্তফা, প্রকাশক খালেদা হাবীব, মুদ্রণালয় গাংচিল প্রেস, ৪৯/৬ রামকৃষ্ণ মিশন রোড, ঢাকা-১ উল্লেখ করা হয়। মূল্য ৭৫ পয়সা করা হয়েছিল। অতপর ডিসেম্বর ১৯৬৮ সংখ্যায় আবার ঠিকানা পরিবর্তন। কার্যালয় ৯৭/২ সিদ্দিক বাজার, ঢাকা-২। পৃষ্ঠা ৩৬। সাইজ প্রথমটির অনুরূপ, দাম : ৭৫ পয়সা। খালেদা হাবীব ২১৬ ধানমণ্ডি, ঢাকা থেকে (তাঁর বাড়ীর ঠিকানা, তিনি সাহিত্যিক অধ্যক্ষ ইবরাহিম খাঁর) থেকে প্রকাশ করেছিলেন। মুদ্রণালয় শাহজাহান প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১০/২ সিদ্দিক বাজার, ঢাকা-২।

‘নিরীক্ষণশীল মাসিক সাহিত্যপত্রিকা’ কথাটা শীর্ষে লেখা হতো ১৯৬৮ সন থেকে। শফিক খানের নাম দীর্ঘদিন ‘সহযোগী সম্পাদক’ হিসেবে ছাপা হয়। কবিতা সংখ্যায় বিশেষ সহযোগী সম্পাদক ছিলেন কাজী আলী তারেক। ৬৪ পৃষ্ঠায় কবিতা সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আগস্ট ১৯৭০ সনে।

কণ্ঠস্বরের ঘোষণা ছিল :

যারা সাহিত্যের সনিষ্ঠ প্রেমিক, যারা শিল্পে উন্মোচিত, সং, অকপট, রক্তাক্ত, শব্দভাঙিত, যন্ত্রণাকাতর ; যারা উন্মাদ, অপচয়ী, বিকারগ্রস্ত, অসন্তুষ্ট, বিবরবাসী, যারা তরুণ, প্রতিভাবান, অপ্রতিষ্ঠিত, শ্রদ্ধাশীল, অনুপ্রাণিত ; যারা পদ্ম, অহংকারী যৌনতাম্পুষ্ট কণ্ঠস্বর তাদেরই পত্রিকা। প্রবীণ মোড়ল, নবীন অধ্যাপক, পেশাদার লেখক, মুখ সাংবাদিক, ‘পবিত্র’ সাহিত্যিক, এবং গৃহপালিত সমালোচক এই পত্রিকায় অনাহত।

দ্বিতীয় সংখ্যায় ঘোষণা ছিল : ‘কণ্ঠস্বর যেহেতু তরুণ ও প্রতিশ্রুতিশীলদের পত্রিকা সেহেতু কেবল প্রতিশ্রুতিশীল তরুণদের কাছ থেকেই লেখা আহ্বান করা হচ্ছে। কণ্ঠস্বর

কেবলমাত্র 'নতুন' দৃষ্টিভঙ্গীকে আহ্বান করে। যে উক্তি উচ্চারিত হয়ে গেছে বা ব্যবহৃত হয়েছে যে স্বর, তার যেসো পুনরাবৃত্তি এ পত্রিকায় অচল। রচনা প্রেরণে সংশয়চিন্ত্ত, স্বল্প পরিচিত সেইসব তরুণতমদের জানানো যাচ্ছে যে, এ পত্রিকাটি তাঁদের। বিনা দ্বিধায় তাঁরা রচনা পাঠাবেন। তাঁদের কোনো নতুন দৃষ্টি বা বিন্দুমাত্র প্রতিশ্রুতি লক্ষ্যযোগ্য হলেই তাদের সে সব রচনাকে প্রকাশিতব্য মনে করা হবে।'

কণ্ঠস্বরের প্রথম সংখ্যাটিতে আবুদল্লাহ আবু সায়ীদের পরবর্তীকালে প্রকাশিত প্রবন্ধ-পুস্তিকার নামপ্রবন্ধ 'দুর্লভতায় রবীন্দ্রনাথ' ছাপা হয়েছিল। কবিতা লিখেছিলেন—শহীদুর রহমান, রফিক আজাদ, ইমরুল চৌধুরী, মলয় রায় চৌধুরী, কামাল কাসেম (অনুবাদ) গল্প লিখেছিলেন—আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (নিঃশ্বাসে যে প্রবাদ) ও আবদুল মান্নান সৈয়দ (অতি ওয়ারিশ মাল)। প্রশান্ত ঘোষাল 'সাহিত্যিক দমননীতি; এবং 'আধুনিক কাব্য ও আত্ম চেতনতা' বিষয়ে বিতর্কমূলক আলোচনা লিখেছিলেন 'নতুন বিতর্কে' শিরোনামে। 'শিল্প ঈশ্বর প্রেম' নামে মোহাম্মদ রফিক অন্যতম প্রবন্ধ লিখেছিলেন।

১৯৬৬ থেকে ৭১ সন পর্যন্ত ১৯টি সংখ্যায় কবিতা লেখেন—আসাদ চৌধুরী, রফিক আজাদ, মোহাম্মদ রফিক, হায়াৎ সাইদ, আলতাফ হোসেন, আবুল হাসান, আফজাল চৌধুরী, আবদুল মান্নান সৈয়দ, রণপা চৌধুরী (রণজিৎ পাল চৌধুরী, স্বাক্ষরের অন্যতম সম্পাদক) রুবী রহমান, শহীদুর রহমান, শেখ আতাউর রহমান, হুমায়ুন কবির, আবুদল্লাহ আবু সায়ীদ, সায়যাদ কাদির, মাহমুদুল হক, মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, ফরহাদ, মজহার, কাজী সাহিদ হাসান, অনু ইসলাম, ফারুক আলমগীর, সুরত বড়ুয়া, সেলিম সারোয়ার, নির্মলেন্দু গুণ, রাজীব আহসান চৌধুরী, নূরুল হক, শহীদ কাদরী, হাসান আহমেদ কবির, নাজমুল আহসান চৌধুরী, মহাদেব সাহা, মুহাম্মদ নূরুল হুদা, মাহবুব সাদিক, শাহনূর খান, মখদুম-ই-মুলক-মাশরাফী, রবীন সমাদ্দার, মাহমুদ আবু সাইদ, দাউদ হায়দার, আবু কায়সার প্রমুখ।<sup>৬</sup>

গল্প লিখেছেন :

হাসান আজিজুল হক—আপন অঙ্ককারে (১/২); শহীদুর রহমান—আমার মৃতুর জন্য কেউ দায়ী নয় (১/২); আবদুল মান্নান সৈয়দ—মাংস (২/৩); আত্মহত্যা ব্যবসায়ী (২/৮); শুকতার সন্ধ্যাতারা (৩/৯); প্রত্নতথিহিংসা (৪/১২); ফারুক আলমগীর—স্বোপার্জিত নিষাদ (২/৩); সায়যাদ কাদির—রক্তের গন্ধ (২/৫); হেমাঙ্গ মৈনাক (২/১০); ফুলের সাথে বনলতা (৪/৬); আখতারুজ্জামান ইলিয়াস—নিরুদ্দেশ যাত্রা (২/৮); মাহমুদুল হক—মনসা মাগো (২/৯); বিষ (৩/১২); মুহাম্মদ সিরাজ—বিন্দ্র রজনী, সোনালী পিপাসা ও একটি নারীমুখ (২/৯); নির্মলেন্দু গুণ—মৃত সন্তার ধীপে (২/১০); সুরত বড়ুয়া—অপরাপের খোঁজে (২/১১); মাহবুব সাদিক—জলছলছল (২/১২); আবু কায়সার—গুহা (২/১২); আবুল খায়ের—একটি অস্বাভাবিক গল্প (৩/৯); শাহনূর খান—বৃশচক্রে অশোক প্রপাত (৩/১২); সন্তাব্য পতনের মুখে (৫/৫); মারসেল এমে—প্রাচীর পেরোনো (অনুবাদের নাম নেই, ৩/১২); ইমরুল চৌধুরী—আত্মহত্যা গোলাপ ও কালা সমুদ্রের নীচে (৪/৬); হুমায়ুন কবির—সদগতি (৪/১০); নূরুল করিম নাসিম—একটি দুপুরের পলায়ন (৪/১০); মুহাম্মদ আবদুল হাফিজ—এক হাজার আঁধি ও তিনলক্ষ অমিতাভ বেদনাগুচ্ছ (৪/১২); রবিউল আলম—একটি মৃতুর জন্ম (৫/৫); প্রতিবন্দী ছায়া (৫/১০); শেখ আতাউর রহমান—

বিপ্রতীপ (৫/৫) ; মুহম্মদ আবু সাঈদ—সমগ্র অবয়ব (৫/১০) ; আবদুস সেলিম—বিষণু অস্তিত্ব (৫/১০) ইত্যাদি।

প্রবন্ধ : আবদুল মান্নান সৈয়দ—শব্দের পাপ ও অন্যান্য অনুশঙ্গ (১/২) ; পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য (২/৫) ; কাব্যযাত্রায় অমাবস্যা পূর্ণিমা (২/৬) ; বন্ধু দরজায় থাকা (২/১০) ; এলোমেলো ভাবনা—বেদনা (২/১২) ; একশস্য পর্যায় : কবিতা (৪/১০) ; একালের কবিতা : রূপকথার অন্তর (৫/২) ; রাইনে মারিয়া রিলকে (৫/৫) ; আবদুল্লাহ আবু সাঈদ—বাংলা সমালোচনা প্রসঙ্গে (২/৩) ; কবিতার অনুশঙ্গ (৫/৮) ; মোহাম্মদ রফিক—কফিনে শাদা গোলাপ (২/৮) ; সাম্প্রতিক কাব্যকলা ও নজরুল ইসলাম (৫/১০) ; মঈনুদ্দীন শাহরিয়ার—ধূর্ত কবিতা (২/৯) ; হুমায়ুন কবির—বিনয়ী শিল্পী (২/১০) ; প্রেম কবিতা কুসুম (৩/৯) ; দুর্বল কণ্ঠস্বর (৪/১০) ; কবিতার যাদু (লেসলি অ্যাবারক্রফ্টির অনুবাদ, ৫/৮) ; প্রশান্ত ঘোষাল—নতুন বিতর্কে (এই নামে তিনি প্রথমাবধি বেশ কয়েক সংখ্যায় আলোচনা করেন) ; আলতাফ হোসেন—রবীন্দ্রনাথের গানের কথা ও অতিলৌকিক অনুভব (২/১১) ; আহমদ ছফা—ভবিষ্যতের জন্যে (২/১২) ; শেখ আতাউর রহমান—একটা ব্যক্তিগত প্রক্ষেপ (৩/৯) ; মুহম্মদ আবদুল হাফিজ—গিন্সবার্গের চিৎকার (৪/৬) ; কণ্ঠস্বর ও সাম্প্রতিক সাহিত্য (৪/১০) ; আবুল কাসেম ফজলুল হক—পূর্ববাঙলার সাহিত্য ও কণ্ঠস্বর (৪/১০) ; মহাদেব সাহা—অমিতাচারী কবিতা (৪/১০) ; মুনীর চৌধুরী—অভিভাষণ (সভাপতির, কণ্ঠস্বরের চতুর্থ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে, ৪/১০) ; মনসুর মুসা—রবীন্দ্রসাহিত্যের ভবিষ্যৎ (৪/১২) ; আদ্রে জিঁদ—সাহিত্যে প্রভাব (অনুবাদ ; মোহাম্মদ হারুন উর রশীদ, ৫/৫) ; মুহম্মদ নুরুল হুদা—ছন্দের নির্ঘন্ডে (৫/৫) ; আবদুস সেলিম—‘দি ওয়েস্টল্যান্ড’ একটি আধুনিক উপাখ্যান (৫/৮) ; লেসলি এবারক্রফ্টি—কবিতার যাদু (অনুবাদ : হুমায়ুন কবির, ৫/৮) ; মোহাম্মদ হারুন উর রশীদ—আমাদের সাহিত্যে বিদেশী প্রভাব (৫/১০) ;

এছাড়াও বিভিন্ন প্রসঙ্গে আলোচনা এবং গ্রন্থ-সমালোচনাও এতে ছাপা হয়। সকল আলোচনাই তারুণ্যের, আধুনিকতার স্ফূর্তিতে উজ্জ্বল। কাজী শাহিদ হাসান আলোচনা করেন ‘প্রতিষ্ঠার প্রতিভু’ শিরোনামে (২/৩) ; জ. জ. সংক্ষিপ্ত নামে বেশকিছু রচনা এতে প্রকাশিত হয়েছে। ‘চলচ্চিত্রের সীমাবদ্ধতা’ বিষয়ে আলোচনা যেমন আছে, তেমনি আছে সাম্প্রতিকতম কাব্য-প্রচেষ্টার ধারাবাহিক আলোচনা (করেন ‘আগস্তক ঋতু’ শিরোনামে)। জ. জ. মার্চ ১৯৬৭ সংখ্যায় ‘সমকাল’—প্রসঙ্গে আলোচনা করেন। মাহবুবুল আলম ফ্রিডরিখ নীৎশের কবিতা অনুবাদ আর কবি সম্পর্কে আলোচনা করেন ২/৬ এ। আবদুল্লাহ আবু সাঈদ আলোচনা করেন আবদুল মান্নান সৈয়দের ‘জন্মান্ত কবিতাগুচ্ছ’ বইয়ের ওপর (২/৮)। মোহাম্মদ রফিক সৈয়দ আলী আহসানের ‘উচ্চারণ’ কাব্যগ্রন্থের সমালোচনা লেখেন ডিসেম্বর ১৯৬৮ (৩/১২) সংখ্যায়। স্তেফান মালার্মে কর্তৃক অল্পফোর্ড ও কেপ্ত্বিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিল্পকলার নন্দনতাত্ত্বিক বিষয়ের ওপর প্রদত্ত ভাষণের অনুবাদ (‘সাহিত্য ও সঙ্গীত’) করেন মোহাম্মদ হারুন উর রশীদ।

সিরাজউদ্দিন আহমেদ প্রণীত ‘বন্ধুর জন্য শোক’ শীর্ষক গল্পগ্রন্থের ওপর লেখেন শরীফ হোসেন। শওকত ওসমান প্রণীত উপন্যাস ‘সমাগম’ এর ওপর আলোচনা করেন মনসুর মুসা। সৈয়দ আলী আহসান সম্পাদিত ‘পদ্মাবতীর বিরূপ একটি সমালোচনা লেখেন হাসান আহমেদ কবির। আবদুল্লাহ আবু সাঈদ লেখেন আফজাল চৌধুরীর বই ‘কল্যাণবৃত্ত’র ওপর ৫ বর্ষ ২ সংখ্যায়। পরের (৫/৩-৫) সংখ্যায় লিখেছিলেন আতাউর রহমান প্রণীতকাব্য ‘একদিন প্রতিদিন’ ও আবদুর রশীদ খানের প্রথম কবিতার বই ‘নিরন্তর স্বর’ এর ওপর।

মাহবুবুল আলম আলোচনা করেন ‘রফিক আজাদ : তাঁর অন্তরঙ্গ দীর্ঘশ্বাস’ শিরোনামে (৫/৮)। মোহাম্মদ হারুনউর রশীদ আলোচনা করেন শহীদ কাদরীর প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘উত্তরাধিকার’ এর ওপর (৫/৮)। আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ পূর্বে (৫/৮) সংখ্যাতেই সমালোচনা করেন আবদুল মান্নান সৈয়দের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ ‘জোৎস্না রৌদ্রের চিকিৎসা’র। আবদুল মান্নান সৈয়দ ‘সাময়িক প্রসঙ্গ’ শিরোনামে একটি ব্যঙ্গাত্মক আলোচনা করেন কণ্ঠস্বরের পাকিস্তানি যুগের শেষ সংখ্যা (অক্টোবর ১৯৭০) এ। এছাড়া সেলিম সারোয়ার ‘বৃন্ত’ নামে একাঙ্কিকা লেখেন মার্চ ১৯৬৭ (২/৫) সংখ্যায়। আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ অনুবাদ করেন এসকিলাস এর নাটক ‘শুষ্কখলিত প্রমিথিউস’ সেপ্টেম্বর—নভেম্বর ১৯৬৭ সংখ্যায়। আবদুল মান্নান সৈয়দ নাটক লেখেন ‘যুক্তিহীন যুগ’ শিরোনামে মে ১৯৬৮ সংখ্যায় (২/১২-৩/৫)। অনূদিত হয়েছে গিওম অ্যাপোলিনেসঅর থেকে, প্রসঙ্গ কথাসহ (৫/৮)।

বিষয়ের নাম থেকেই অনুমান করা যায় কণ্ঠস্বর সমকালীন আর সব পত্রিকা থেকে ভিন্নতর বৈশিষ্ট্যের রচনা প্রকাশ করেছে। সকল রচনা এর শিল্পোত্তীর্ণ নয়। সকল লেখক প্রতিষ্ঠাও পাননি। কিন্তু তবু সেকালে এগুলো ছিল নতুন চকচকে সোনার মত। তাঁদের অন্বিষ্টও ছিল ব্যতিক্রমী : তৃতীয় সংখ্যার ঘোষণা :

“সাহিত্যকে ঝরা অনুভব করতে চান, শততলে শতপথে, বিম্বিত রাস্তায়, আঙ্গিকের জটিলাক্ষরে, চিত্তার বিচিত্র সরণীতে, কটু স্বাদে ও লোনা আঘানে, শতভায়ে, শ্রদ্ধায়, বিস্ময়ে, অভিব্যুতীতে ও পাপে; মহত্ত্বে ও রিরংসায়, উৎকণ্ঠায় ও আলিঙ্গনে, কণ্ঠস্বর সেইসব পদপাতবিরল তরুণদের পত্রিকা।”

কেবলমাত্র তরুণদের পত্রিকাই যে কণ্ঠস্বর হতে চেয়েছিল লেখকসূচির দিকে দৃষ্টি দিলেই তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তবে তখনকার সব তরুণই যে কণ্ঠস্বরকে সদর্থকভাবে গ্রহণ করেছিলেন, তা নয়। ‘মৌনতাস্পষ্ট বিকারগ্রন্থ’দের লেখাও এতে অনেক ছাপা হয়েছে, আর কবরস্থান গোরস্থান, মৃত্যু, আত্মহত্যা, পলায়নপর মনোবৃত্তির অথবা আত্মরতির অকপট চিত্রলিপি ‘কণ্ঠস্বর’ হয়েছিলো বলে রাজনৈতিক সামাজিকভাবে তরুণসমাজকে আত্মগত ক্লেদাক্ত বিকৃত হতাশাগ্রস্ত অনগ্রসর অপ্রগতিশীল অনুভূতিপ্রবণ রচনায় অভিনিবিষ্ট করে রেখেছিল বলে এটাকে ক্ষতিকর সাহিত্য প্রয়াস হিসেবেও কেউ কেউ চিহ্নিত করে থাকেন। অবশ্য এসব কথার সপক্ষে প্রচুর নবীরও দেয়া যায়। দুতিন সংখ্যা কণ্ঠস্বর বাজারে এসেই আলোড়ন তুলেছিল। অথচ সেই প্রথম দিককার সংখ্যাগুলোতে কি পাওয়া যায়? প্রথম সংখ্যায় গল্প লিখেছিলেন আখতারুলজামান ইলিয়াস ‘নিশ্বাসে যে প্রবাদ’ এবং আবদুল মান্নান সৈয়দ ‘অতিওয়ারিশ মাল।’ দ্বিতীয় সংখ্যায় হাসান আজিজুল হক ‘আপন অঙ্ককারে’ এবং শহীদুর রহমান ‘আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়’।

এগুলোতে মধ্যবিত্ত পরিবারের অনুভূতিপ্রবণ হতাশাগ্রস্ত তরুণদের মৌন-বিক্ষোভ যতো প্রাধান্য পেয়েছে, ততোটা পায়নি সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবক্ষয় অধপতন ও অসৃষ্টিশীলতার রুদ্ধশ্বাস-পরিস্থিতি কাটিয়ে ওঠার কোনো শৈল্পিক প্রেরণা। কণ্ঠস্বর-সম্পাদক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের গল্প নির্বাচনের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত ‘সাম্প্রতিক ধারার গল্প’ শীর্ষক সংকলন-গ্রন্থের বিজ্ঞাপন থেকেও। এই সংকলনে যাদের লেখা গ্রথিত হয়েছে, তাঁরা কণ্ঠস্বরেরও লেখক ও গল্পকার।

এই সংকলনের উদ্দেশ্য আমাদের গল্পের বিশেষ একটা ধারা, তার নিঃসঙ্গ জনাকয় লেখক ও তাদের স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বর।' আধুনিক জীবন-জিজ্ঞাসায় রক্তাক্ত আমাদের যে-তরুণ গল্পকারেরা বুঝেছেন : 'সাহিত্য আত্মজীবনিক হওয়া উচিত', কেননা 'ডায়েরী আমাদের অন্তর্জীবনের সার্থকতম ইতিহাস'। বুঝেছেন যে, গল্প আমাদের ব্যক্তিগত রক্তের প্রথম যৌনতা বিষাদ আত্মহননের স্মারক ; এই ধারা সেই নিঃসঙ্গ জনাকয় লেখকের—তাদের স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বরের। এই নতুন ধারার গল্পকারেরা যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর সংযোজন করলেন বক্তব্যে ও আঙ্গিকে—তারই সার্থকতম উপস্থাপন আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ সম্পাদিত 'সাম্প্রদিত ধারার গল্প' যাদের গল্পে সমৃদ্ধ, তাঁরা : সৈয়দ শামসুল হক, শওকত আলী, হুমায়ূন চৌধুরী, মনিরুজ্জামান, জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত, আবদুল মান্নান সৈয়দ, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, শহীদুর রহমান, হাসান আজিজুল হক।

কবিতাগুলোতেও 'আত্মহননের অনাকিনী আক্রমণ' আর 'মহান মৃত্যুর দিকে, উদ্ধৃশ্বাসে ধাবমান জীবন'-বেদ চর্চিত হয়েছে।

শহীদুর রহমান গদ্যে কবিতা লিখেছেন : "আশ্চর্য কুঠুরিতে আমি/আত্মহননের অনাকিনী আক্রমণ চালিয়েছে ; /তরুণ কবির, শোন, ভূখা মিছিলে কতোদিন শরীক হয়েছি—/কতোদিন পালিয়ে ফিরেছি, কিন্তু শনিবারের দুপুর রাত পাড়ি দিতেই/আমি সেই আশ্চর্য সুন্দর ছোট আঁধার কুঠুরিতে ঢুকলাম। /অঙ্ককারের রাণী সেখানে কেলি করছিলো। /তরুণ কবির শোন, আমি অবাধ বিস্ময়ে পৃথিবীর/অতি পুরাতন অথচ উজ্জ্বল মসৃণ দেয়ালঅলা সেই/চোরাকুঠুরিকে দেখতে থাকলাম। /এবং তার বৈদ্যুর্ঘখচিত অশনিক কারুকার্যে মুগ্ধ হোলাম আমি।"<sup>১</sup>

রফিক আজাদ 'মৃত্যু : ২' শিরোনামে কবিতা লিখেছিলেন :

... উল্লসিত হে অমল বান্ধববৃন্দ, জীবনময় তোমরা কভু দ্যাখোনি মৃত্যুর মহান/প্রত্যাপ? দেখেছ কী, হে আমার চতুর্পার্শ্বে ঘূর্ণ্যমান মানবসকল?... তবে মৃত্যুর/ কথাই পরস্পরে বলাবলি কর, সর্বক্ষণ। হে মহিলা অন্মান গোলাপ, তুমি কী / জেনেছো মৃত্যুকেই সর্বশেষ প্রিয়জন বলে? / জানো নি কী তোমার দেহের কোমল / ও মোলায়েম স্থানগুলি একদিন শক্ত ও নীরস্ত / হবে।... তোমার অকৃত্রিম ওষ্ঠের অরুণিমা / একদা কাগজের মত শাদা হয়ে যাবে / ফ্লোরেসেন্ট নিতম্ব তোমার, ট্রান্সপ্যাক্ট / উরুসঙ্কি, হে মধুর মহিলা, কদর্য পুরুষকেও / আকর্ষণের ক্ষমতা হারাবে। / মৃত্যুর কথা, আশ্চর্য তোমরা কেউ / ভাবতে পারো না ; ভুলেও কখনো / স্মরণে আসে না তার নাম কী? / উৎসাহে তোমরা যে কাটাও দিন / ভুলে থেকে প্রকৃত প্রভুর কথা, স্তব / কর প্রতিদিন আপতরম্যের—উল্লসিত / গেয়ে যাও দৈনন্দিন জীবনের অচিরস্থায়ী / জীর্ণ-সঙ্গীত ! অথচ অকৃতজ্ঞ হে / ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী, একটি বাক্যও সাজাওনা / মহান মৃত্যুর স্তোত্রে।... / এই যে হস্তোড়ে মেতে থাকো দিবস রজনী, / লুটে নাও দুই হাতে যুগপৎ আনন্দ ও বিঘাদ, / এতো মৃত্যুরই পরোক্ষ দান। দৃশ্যমান / তোমাদের নৃত্যনাট্যের নেপথ্যে সর্বসর্বা / মৃত্যুর কী—যে অবদান, তা তোমরা / হে মূর্খ, বুঝতে পারো না !<sup>২</sup>

ইমরুল চৌধুরীর 'সৌরময় নাস্তিকতা' শীর্ষক কবিতার কয়েকটি পংক্তি :

যারা যৌবনকে যৌবনের উত্তাপকে / বিশল্যকরণী দিয়ে ঝাঁপতে চায় / কি তাদের শরীর হীনতা / বা যার দৃষ্টিতে করতে চায় বিলোকিত প্রতীকদের/ কি তাদের অপারগহীনতা/ কি সরল ও সহজলভ্য/ বিকোয় তারা স্বাস্থ্যহীন বাজারে বন্ধুদের চটল উপহাস/ কি তারা নিষ্ফল ধোঁকা দিচ্ছে নিজেকে / অবিদিত উদ্ভক্ত শাশালো অনমনীয় যৌবনকে/ যার নারীদেহে আলীঙ্গিত লুপ্ত ও বধির থাকতে চায় / ওইসব বপ্রক্রীডাময় যুবকের সংগে ক্ষমাহীন/ অধিকস্ত আপোষহীন আমি / ওইসব লিংগহীন পুরুষদের সংগে / যারা সদর্ঘ চরিত্রহীন নয় লম্পট নয়।<sup>৩</sup>

রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বিভিন্ন সময় বহুমাত্রিক বিতর্ক, আলোচনা সমালোচনা হয়েছে এখনও হচ্ছে। ১৯৬৫ সনে কণ্ঠস্বর যাত্রারস্ত্র আগে ১৯৬১ তে রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকীর আয়োজন করা দেখেছিলেন কণ্ঠস্বর-স্বাক্ষর গোষ্ঠীর তরুণেরা। রবীন্দ্র-বিতর্কের বিভিন্ন পর্যায়ে কমিউনিস্টরা এবং পরবর্তী প্রজন্মের কবি-সাহিত্যিকেরা তাঁকে বুর্জোয়া, গণমানুষের কবি নন—বলে, এবং তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের খুঁটিনাটি খুঁজে, গবেষণা করে তাঁকে দুর্বল কবি এবং গণবিরোধ, ব্যক্তিত্ব হিসেবে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন (‘উত্তর অল্পেয়ার’ আলোচনায় আবদুল হাফিজের বক্তব্য দ্রষ্টব্য; প্রসঙ্গত ‘সীমাস্ত’ ও ‘মুক্তির’ পর্যালোচনাও দেখা যেতে পারে)। এঁদের মধ্যে শিবনারায়ণ রায়, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। এঁদেরই প্রভাবে আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ লিখেছিলেন ‘দুর্বলতায় রবীন্দ্রনাথ’—যখন রবীন্দ্রনাথ ব্যবহৃত হচ্ছিলেন বাঙালির স্বাধীনতা-সংগ্রামের শক্তি-সাহস সংগ্রামের প্রতীকরূপে। বলাবাহুল্য হবে না, গোলাম সাকলায়েন কণ্ঠস্বরকে অগত্যর উত্তরসূরি হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন, কথটার মধ্যে সত্য আছে। ফজলে লোহানীর ন্যায় আবদুল্লাহ আবু সায়ীদও টিভি-ব্যক্তিত্ব হিসেবে এদেশে জনপ্রিয়তা পেয়েছেন এবং শিক্ষিতসমাজের চেনা-জানা হতে পেরেছেন। দৃষ্টি আকর্ষণের, সমালোচিত হবার কৌশল বা যোগ্যতা তাঁরও ফজলে লোহানীর মতো ছিল, আছে। আর এই দুইজনের পত্রিকার কথাবার্তা ও মূলসুরেও কিছুটা সঙ্গতি আছে। রবীন্দ্রপ্রসঙ্গে শিবনারায়ণ রায় ও সুধীনদত্তের চিন্তাধারা অবলম্বণ করে আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ কণ্ঠস্বরের প্রথম লেখায় রবীন্দ্রনাথের দুর্বলতাসমূহকে নিন্দনীয় করে তুলে ধরেন। তিনি বলেন :

রবীন্দ্রনাথ অসাধারণ সংবেদনশীলতা নিয়ে জন্মেও সম্পূর্ণ জীবনবাদী ছিলেন না।... আমার মনে হয় নিজস্ব দুর্বলতাকে মহত্ত্বের নামে বেনামি করার ব্যাপারে কেউ এযাবৎ এত অদ্ভুত সুন্দর ভাষায় এমন অদ্ভুত সপারগ কথা বলতে পারেনি। অসংখ্য ভুল মিথ্যাকথাকে মহৎ জীবিত সত্য বলে প্রমাণ করার সবচেয়ে মসৃণ ও তৈলাক্ত ভাষা এই দানবীয় প্রতিভাবান ঈর্ষাজনকভাবে জানতেন।...বোঝাতে চাচ্ছি যে, রক্তমাংসের সুস্থ জীবনের অস্বীকার আছে রবীন্দ্রনাথে, তাঁর অধিকাংশ প্রধান চরিত্র কোনো না কোনো মহৎ তত্ত্বের উপায়হীন শিকার। কামরিরংসা তাড়িত মানুষকেও তাঁর হাতে লোভ-কামনাহীন উন্নত জীবে পরিণত হতে হয়েছে, যা মানুষের দুঃখজনক মৃত্যু। এসব দৃষ্টান্ত অসংখ্য।...একথা সত্যি যে, রবীন্দ্রনাথ পারতেন অনেক কিছু, করেছেনও অনেক কিছু, এবং করতে চাইলে পারতেন না, এমন বিষয় কম। আমার বক্তব্য শুধু যে, শ্রদ্ধেয় হবার, প্রতিষ্ঠিত থাকার লোভ রবীন্দ্রনাথের জীবনবোধকে খণ্ডিত আত্মহত্যা দিয়েছিল।

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ আরও লিখেছেন :

সঠিক মনে পড়ছে না রবীন্দ্রনাথের মধ্যে জীবনবিমুখতার প্রতি এই পক্ষপাতকে সাক্ষী দাঁড় করিয়ে সুধীনদত্ত গোটিয় জীবনবোধের তুলনায় একে পশু বলেছিলেন কীনা। কিন্তু পশু হোক না হোক, লোকচক্ষু মহৎ হওয়ার দৃষ্টে তাঁর সুস্থ জীবনবোধকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। একথা বলছি এজন্যে যে, সামাজিকভাবে ভাল বা মহৎ হবার দুর্দমনীয় লোভ ছিল তাঁর। এইজন্যে যুগীয় রুচিবোধ ভেঙ্গে বৃহত্তর কোনো ভালোর আদর্শ তিনি গড়তে অক্ষম হলেন; নিজের প্রতিষ্ঠাকে কোনভাবে হয়ে দেখতে তিনি ভীত হতেন। ফলে তিনি ভূমিকা নিলেন সেই কারিগরের যিনি সমস্ত উনিশ শতকের দীর্ঘ সাধনায় সংগৃহীত সত্য শিব সুন্দরের নৈতিক প্রাসাদের শেষ গেঁথে দিয়ে বিদায় হয়েছিলেন। নিকট যৌবনের ক্ষুদ্র দায়িত্বহীনতায় হঠাৎ একবার বিদ্রোহী হলেও (কেডি ও

কোমল) অচিরেই ভুল বুঝলেন, স্বকীয় জীবনবোধকে পঙ্খু দিয়ে নিয়মিত আত্মক্ষয়ে নিজেকে ও যুগকে প্রতারিত করলেন এবং শ্রদ্ধায় আসনে ঋষিদের প্রতিষ্ঠা নিয়ে বিদায় হলেন।<sup>১০</sup>

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার যে ‘কণ্ঠস্বর’ ও ‘স্বাক্ষর’ কিংবা ‘সাম্প্রতিক’ প্রভৃতি লিটল ম্যাগাজিনের তরুণ কবি-সাহিত্যিকেরা প্রকারান্তরে একই গোষ্ঠীর সদস্য। আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, শহীদুর রহমান, ইমরুল চৌধুরী, প্রশান্ত ঘোষল, আবদুল মান্নান সৈয়দ স্বাক্ষরেও লিখেছিলেন আর স্বাক্ষর-এর সম্পাদক শুবানুধ্যায়ী রফিক আজাদ, ইমরুল চৌধুরী, রণজিৎ পাল চৌধুরী, আসাদ চৌধুরী প্রমুখ কণ্ঠস্বরেরও নিয়মিত লেখক। কণ্ঠস্বরেরই পূর্বতন প্রয়াস ওগুলো। ফলে কণ্ঠস্বরের বিভিন্ন সংখ্যায় স্বাক্ষরের পূর্ণ পৃষ্ঠার (অতি মনোযোগ দাবী করে—এমনভাবে) সুন্দর সুন্দর বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয়েছে।<sup>১১</sup>

এই গোষ্ঠীর তরুণ লেখকদের বিভিন্ন গ্রন্থের কিংবা সাহিত্য প্রয়াসের অত্যুজ্জ্বল পরিচয়ও কণ্ঠস্বরে পাওয়া যায়। নানান আলোচনায় অতি আধুনিক অতি তরুণ সাহিত্যিকগোষ্ঠীর সাহিত্যপ্রয়াসের পরিচয়দানে বা প্রচারে কণ্ঠস্বর নিরলস ভূমিকা পালন করেছে। নানা ধরণের সাহিত্যসভা, প্রচারপত্র এবং আলোচনা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই গোষ্ঠীর তরুণেরা প্রবীণদের, পুরানো বাতিল সব চিন্তাধারার ধ্বংস-সাধনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন।

একারণেই আবুল কাসেম ফজলুল হকও লিখেছিলেন :

পূর্ব বাঙলার সবচেয়ে গহীণ অন্ধকারময় দিনগুলোতে কণ্ঠস্বরের আন্দোলনই ছিল এখানকার প্রধান সাহিত্যআন্দোলন। যুগের অন্ধকারকে, হতাশাকে, চরিত্রহীনতাকে, আত্মদহনকে—শঠতা, কপটতা, জালিয়াতি-চালিয়াতি, আত্মহনন ও গ্লানিকে কণ্ঠস্বর গর্ভে ধারণ করেছে। কণ্ঠস্বরের ধারা থেকে স্বতন্ত্র—এমন ধারাও ছিল এখানে, কিন্তু তা ছিল এতই নিশ্চয় যে তা উল্লেখযোগ্য কোনো আলো ফ্লালেতে পারেনি। হতে পারে, কণ্ঠস্বরের সামনে কোন পঞ্জিটিভ লক্ষ্য ছিল না; তবু হৃদয়হীনতার যুগে হৃদয়ের জন্য আত্ননাদ করেছে কণ্ঠস্বর—দাঁড়াতে চেয়েছে হৃদয় নিয়ে, যদিও সে হৃদয় ছিল একেবারেই বিধ্বস্ত, বিস্কৃত। আন্তরিকতাহীনতার যুগে চরিত্রহীনতার যুগে আন্তরিকতা ও চরিত্র নিয়ে দাঁড়াতে চেয়েছিল আমাদের সাহিত্যঙ্গনে কণ্ঠস্বর। অন্ধকারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টি করতে একটুও সাহস করেনি কণ্ঠস্বর, কিন্তু অন্ধকারের নিকট আত্মসমর্পণ করেও, অন্ধকারের স্বরূপ উন্মোচন করে দিয়ে এর আসন্ন অবসানের অনিবার্যতাকে স্পষ্ট করে তুলেছে কণ্ঠস্বর।<sup>১২</sup>

### তথ্যপঞ্জি

১. মোহাম্মদ আবদুল কাইয়ুম, পূর্ব পাকিস্তানের সাময়িকপত্র, আমাদের সাহিত্য, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৬৯, পৃ. ২৪৪।
২. গোলাম সাকলায়েন, আমাদের সাহিত্যপত্রিকা ও সাহিত্যিকগোষ্ঠী, সংলাপ, ঢাকা জুন ১৯৭০, পৃ. ৭৮।
৩. আবদুল মান্নান সৈয়দ, লিটল ম্যাগাজিন, সাহিত্য সাময়িকী, সম্পাদক : শিরীন সুলতানা, ঢাকা, ডিসেম্বর ১৯৮৮, পৃ. ৫৫।
৪. আহমদ মায়হার, কণ্ঠস্বর : তিনপর্বে, পূর্বেক্ত পৃ. ১৮০।
৫. আবুল কাসেম ফজলুল হক, পূর্ববাঙলার সাহিত্য ও কণ্ঠস্বর, কালের যাত্রার ধ্বনি, ঢাকা ১৯৭৩, পৃ. ১১৫-২২।



৬. কবিদের নাম পত্রিকায় প্রকাশের ক্রম অনুসারে একবার করে উল্লেখ করা হলেও, প্রধান কবিগণ একাধিকবার লিখেছেন। ঐদের অনেকে গল্প, প্রবন্ধ, আলোচনাও লিখেছেন।
৭. শহীদুর রহমান, দুটি কবিতা, কণ্ঠস্বর, প্রথম সংকলন ১৯৬৫, পৃ. ১০।
৮. রফিক আজাদ, মৃত্যু : ২, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১-১২।
৯. ইমরুল চৌধুরী, সৌরময় নাস্তিকতা, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬ ১৭।
১০. আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, দুর্বলতায় রবীন্দ্রনাথ, পূর্বোক্ত পৃ. ১-৯
১১. কণ্ঠস্বরে মুদ্রিত স্বাক্ষরের একটি বিজ্ঞাপনের ভাষা এরূপ :  
 “মৃত্যু আমারণ সঙ্গী যাদের/তারা কখনও কখনও/ এক হয়/ মৃত্যুকে প্রতিরোধ করবার/দুর্মর সংকল্প নিয়ে নয়,/মৃত্যুকে শক্তি সঞ্চয়ের জন্যেও নয়—কিংবা নয় মসজিদে গীর্জায়/ব্যগ্র সমর্পণে.../ মিলিত হয় / মৃত্যুর ভয় করে দুর্ভাবনায় গভীর নৈরাজ্য্য/ একজোটে পালিয়ে পালিয়ে ফিরতে। এই / পালিয়ে পালিয়ে ফেরার মধ্যবর্তী অবিশ্বর সময়্যাংশগুলি/ ভয়ঙ্কর মধুর মদু করুণ/ঈশ্বরপ্রতীম শব্দ সমন্বয়ে/ ঘটনা হবে। আর সেই / অন্তরঙ্গ ঘটনাবলীর সাম্প্রতিক্য গ্রন্থ ‘স্বাক্ষর’ তৃতীয় সংকলন এ শীতেই বেরচ্ছে। দাম এক টাকা।
১২. আবুল কাসেম ফজলুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৫-২২।

## মানবতাবাদী ও বাঙালি জাতীয়তাবাদী ধারার কতিপয় অপ্রধান পত্রিকা

- [ ১. মেঘনা (ঢাকা ১৯৫৭) ; ২. সাহিত্য (১৯৬০-৬৩) ; ৩. যাত্রী (১৯৬০-৬২) ;  
৪. সুন্দরম (১৯৬৩-৬৪) ; ৫. স্বাক্ষর (১৯৬৩-৬৬) ; ৬. স্বদেশ (১৯৬৩-৭০) ;  
৭. পূর্বলেখ (১৯৬৬-৬৭) ; ৮. মেঘনা (চট্টগ্রাম, ১৯৬৭-৭০) ]

### ১. মেঘনা (১৯৫৭)

পূর্ব বাঙলার সাময়িকপত্রের ইতিহাসে আবদুল গাফফার চৌধুরীর নাম যতো ক্ষীণাকারেই হোক—জায়গা করে নিয়েছে। মাসিক মোহাম্মদীর সহযোগী সম্পাদক হিসেবে তিনি দীর্ঘদিন কাজ করেছিলেন। ১৯৫৮ সনে সাপ্তাহিক ‘চাবুক’ সম্পাদনা করেন। ‘মেঘনা’ নামের সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সরকারের কাছে আবেদন জানিয়ে রেজিস্ট্রেশন নম্বর ডিএ ৩২৮ গ্রহণ করেই মেঘনা ১৯৫৭ সনের সেপ্টেম্বর-এ মাসিক রূপে প্রকাশ করা হয়েছিল। পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৪০। প্রাপ্ত তৃতীয় সংখ্যার শেষ পৃষ্ঠার নম্বর ১২০।

নিউজপ্রিন্ট কাগজে সুন্দর গোট-আপ, মেক-আপ, প্রচ্ছদ, মুদ্রণ-পরিপাটি সবকিছু নিয়ে মেঘনা রুচিশীলতার দাবী করেছিল। সমকাল পত্রিকার একমাস পরে এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরীর আঁকা প্রচ্ছদে পূর্ববঙ্গের প্রথম দিককার অন্যতম সাহিত্য পত্রিকা ‘সংকেত’ এর সম্পাদক সিরাজুর রহমানের পরিচালনায় এই মেঘনা বের হয়েছিল স্মরণ করলে এর চেতনাগত স্ট্যান্ডার্ড মোটামুটি আঁচ করা যায়।

বলাবাহুল্য হবেনা, মেঘনার স্বত্বাধিকারী ছিলেন সিরাজুর রহমান। তৎকর্তৃক প্যারামাউন্ট প্রেস লি. ৯ হাটখোলা রোড, ঢাকায় থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। তবে এই পত্রিকা ১৯৫৮ সনে যে আর প্রকাশিত হয়নি—সেটা অনুমান করতে কষ্ট হয়না। ফলে ১৯৫৮ তে গাফফার চৌধুরী পুনরায় ‘সাপ্তাহিক চাবুক’ বের করার জন্য সরকারের কাছে রেজিস্ট্রেশন নম্বর চেয়ে আবেদন জানান আর নম্বর প্রাপ্তির পূর্বেই তাঁরা কয়েকটি (৯টিরও বেশী) চাবুক প্রকাশ করেছিলেন।

বুলবুল খানম নামের জনৈক পাঠিকা গোপালগঞ্জ (তৎকালের ফরিদপুরের মহকুমা) থেকে লিখেছিলেন :

মেঘনার প্রথম সংখ্যা দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। ভালো লাগলো সাহিত্যের আসরে ‘মেঘনা’কে। এক কথায় মেঘনা আমাকে খুশী করেছে, আনন্দ দিয়েছে প্রচুর। সাময়িকীতে যথার্থই লিখেছেন : ‘এদেশে নতুন পত্রিকা প্রকাশ একটি দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা... স্বল্প পরিসরের মাঝেও মেঘনাতে চেষ্টা করা হয়েছে অনেক বিষয় জানানোর। ‘পূর্বশা’ মনে দাগ কাটল। ওয়ায়দুল হক ও আহসান হাবীবের লেখা দুটো আমাকে মুগ্ধ করেছে। দুটো লেখাই বাস্তবধর্মী। ‘খেলাধুলা’ ‘সাময়িকী’ ‘পাঁচমিশালী’ তে আমার মনের কথাগুলোরই প্রতিধ্বনি শুনতে পেলাম। অন্যান্য সব বিভাগই আমাকে খুশী করেছে।

অপর এক পাঠক, হাফিজউদ্দীন—ঢাকা থেকে লিখেছেন : ‘প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা দেখলাম। ‘প্যারিসে দুসপ্তাহ’ লেখাটি বিশেষ আনন্দ দিয়েছে। রচনাটিতে ভ্রমণকাহিনী, দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী ও রস-রচনার যে অপূর্ব আনন্দ-গুণের সমন্বয় হয়েছে, তা আমাকে একান্তভাবে দোলা দিয়েছে। নূরুল মোমেন সাহেবকে অনুরোধ তিনি যেন, কাহিনীর সঙ্গে প্যারিসের দর্শনীয় স্থানসমূহের কিছু ছবি দেবারও ব্যবস্থা করেন।’

পত্রিকার নিয়মাবলীতে বলা হয় : মেঘনা সচিত্র সাহিত্যপত্র। ভালো ও সুলিখিত যে কোন রচনাই সাদরে গৃহীত হবে। বার্ষিক চাঁদা সাড়েচার টাকা। যান্মাসিক দুই টাকা পাঁচ আনা। প্রতি সংখ্যা সাত আনা। পত্রিকায় ‘সাময়িকী’, ‘যৎকিঞ্চিৎ’ ‘দেশবিদেশ’, ‘বেতার’, ‘খেলাধুলা’, চলচ্চিত্র ও ‘রঙ্গমঞ্চ’ প্রভৃতি বিভাগ ছিল আলোচনার জন্য। ছন্দ, শব্দচয়ন, উপমায় উৎকৃষ্ট একটি ভালো কবিতা লিখেছিলেন কাইয়ুম চৌধুরী। হুমায়ুন কাদির লিখেছিলেন গল্প ‘রোগ’। নূরুল মোমেন ভ্রমণকাহিনী লিখেছিলেন ধারাবাহিকভাবে ‘প্যারিসে দু সপ্তাহ’। মুকাদ্দাস হোসেন লিখেছিলেন চিত্রপ্রদর্শনীর উপর আলোচনা ‘দক্ষিণ আফ্রিকার চিত্রকলা’। একটি ইংরেজী প্রবন্ধ অবলম্বনে লিও টলস্টয়ের ব্যক্তিত্ব চরিত্র, সাহিত্য-প্রতিভা, আদর্শবোধ ও জীবনকাহিনী লিখেছিলেন ফখরুজ্জামান চৌধুরী। আনিসুজ্জামান গল্প লিখেছিলেন ‘দশ টাকার নোট’। পঞ্চাশ দশকের বিভিন্ন পত্রিকায় ডক্টর আনিসুজ্জামানের লেখা কবিতা, গান ও গল্প ছাপা হয়েছে দেখতে পাওয়া যায়। ভিক্টোর হুগোর ‘প্রেম’ শীর্ষক গল্প সংকলন থেকে উদ্ধৃত করা হয় ‘অবিস্মরণীয় প্রেম’ নামে।

নীলু দাস পঞ্চাশ-ষাট দশকের পত্র-পত্রিকায় অনেক গল্প লিখতেন, কিন্তু তাঁর কোনো পয়-পরিচিতি একালের সাহিত্যের ইতিহাসে পাওয়া যায় না। নীলু দাসের একটি গল্প মেঘনাতেও দেখা যায় (মিনুক লতা, ১/৩)। চলচ্চিত্র ও রঙ্গ-মঞ্চের আলোচনার বিভাগে সংস্কৃতিক পরিস্থিতির সমালোচনা আছে। আর পুস্তক সমালোচনার বিভাগ ‘পুঁথিপত্রে’ মহিউদ্দীন আহমদ অনুদিত অ্যালানপোর শ্রেষ্ঠ গল্প ১ম ও ২য় খণ্ড আলোচিত হয়।

## ২. সাহিত্য

(১৯৬০-৬২)

‘প্রথম শ্রেণীর মাসিক পত্রিকা’র দাবি করলেও ‘সাহিত্য’কে প্রথম শ্রেণীর অর্থাৎ সমকাল, সংলাপের মর্যাদা দেয়া যায় না। কিন্তু অতি তুচ্ছ পত্রিকাও ‘সাহিত্য’ ছিল না। দ্বিতীয় শ্রেণীর পত্রিকাগুলোর মধ্যে ‘সাহিত্য’ উচ্চ মানের ছিল। আর আইউব খানের লেখক সংঘ সংগঠনের ‘লেখক সংঘ পত্রিকা’, ‘পরিক্রমের’ প্রথম দুতিন বছরের সমকালে প্রকাশিত হলেও হিন্দু-মুসলিমের মিলিত প্রয়াস বলে এতে উৎকট সাম্প্রদায়িকতা স্থান পায়নি। পৃষ্ঠপোষক এবং লেখক-সূচিতে হিন্দু মুসলমান আর পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের উভয়াঞ্চলের লেখকই ছিলেন।

পশ্চিম-বঙ্গের সাহিত্যিকদের নিকট থেকে এঁরা প্রশংসা কামনা করতেন (পেয়েছেনও) বলে হিন্দু-বিদ্বেষ প্রকাশের সুযোগও ছিল এতে কম। ‘চতুরঙ্গ’ থেকে হুমায়ুন কবিরের লেখা

রবীন্দ্রনাথের উপর প্রবন্ধও সাহিত্য পুনর্মুদ্রিত করেছে। এদেশের বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত উৎকট মতাদর্শের পক্ষপাতিও উদ্যোক্তারা ছিলেন না। ফলে একটা মুক্ত মন ও মানবতাবাদী সুর এই পত্রিকায় ফুটে উঠেছে। দুর্নীতি অবক্ষয় ইত্যাদির পরিবর্তে তাঁরা আনুগত্য প্রকাশ করেছেন সুনীতি, সুস্থ সাহিত্যচিন্তার পক্ষে। কিন্তু যুগের হুজুগে ‘পাকিস্তান লেখক সংঘের’ সংস্পর্শ এঁরা পরিহার করতে পারেননি। হয়তো সম্ভবও ছিল না।

তখন প্রধান সাহিত্যিক, লেখক সবাই সংঘের তথা সরকারের সুদৃষ্টি কামনা করে এর সদস্যপদ গ্রহণ করেছেন। অল্প শক্তিদ্র লেখকদের একাংশতো লালায়িতই ছিলেন লেখক সংঘের সুদৃষ্টি এবং প্রশংসা পাবার জন্য। অবশ্য শক্তিতে হীন হলেই যে সকল লেখক ঐ সংঘের প্রচ্ছায়া কামনা করতেন বা যেতেন সেখানে, তাও নয়। নীতিগতভাবে পরিহার করে চলেছেন আইউব খানের ব্যক্তিগত উদ্যোগে গঠিত লেখক সংঘকে—এমন লেখকও (কিছু তরুণ) খুঁজে পাওয়া যাবে। তাছাড়া ওর ভেতরে হানাহানি ছিল। বড়বড় হোমরা—চোমরাদের ভয়ে কিছু বলবার সাহস না পেয়ে আবার অনেকে সেখানে ঘেঁষতেও সাহস পেতেন না।

সেমাই হোক, লেখক সংঘের সদস্যদের এবং লেখক সংঘের সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধের মুদ্রণ ‘সাহিত্যে’ ঘটলেও এবং ‘পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের সেক্রেটারী ও পাকিস্তান লেখক সংঘের সাধারণ সম্পাদক জনাব কুদরৎউল্লাহ শাহাব—এর ‘শুভেচ্ছা’ বাণী (There is always from and to spare for good literary and cultural magazines. Let us hope, ‘Shahitaya’ will Set a new and healthy standard in the field of literary journalism. I wish this new venture the best of luck.) নিয়ে যাত্রারস্ত করলেও চিন্তার দিক থেকে কর্তৃপক্ষ শৃংখলিত ছিলেন না।

নারায়ণগঞ্জের মতো ঢাকা থেকে দূরে অবস্থিত একটি মহকুমা শহরের এবং হিন্দু প্রধান অঞ্চলের অধিবাসী, হিন্দু সাহচর্যে পত্রিকা চলতো বলে এর অবস্থান ভিন্নতর, গণতান্ত্রিক, মানবতাবাদী ধারাতোই হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাছাড়া পত্রিকার কোথাও আঞ্চলিকতা ও সাম্প্রদায়িকতা নাই। সাহিত্যিক মানদণ্ডই প্রধান হয়ে উঠেছে।

‘সাহিত্য’ সম্পাদনা করেছিলেন ‘জাগরী’ পত্রিকার সম্পাদক এবং তখনকার একজন সক্রিয় সাহিত্যিকর্মী, সংগঠক হেমায়েত হোসেন। এঁর পরিচয়-পরিচিতিও একালে হারিয়ে যেতে বসেছে। তখনকার পত্র-পত্রিকায় তাঁর গল্প-কবিতা বেশ ছাপা হতো। তিনি নারায়ণগঞ্জের ব্যবসায়ী আইনজীবী এবং সংকৃতিসেবীদের সমন্বিত করে বিজ্ঞাপন ইত্যাদির মাধ্যমে অর্থের সংকুলানপূর্বক ‘সাহিত্য’কে একটি নিয়মিত মাসিকরূপে প্রকাশের ইচ্ছা নিয়েই মাঠে নেমেছিলেন।

এঁদের শুভার্থী-গ্রুপ মোটামুটি শক্তিশালীই ছিল। নারায়ণগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটির পাবলিক লাইব্রেরি হলের একটি কক্ষে দিনাজপুরের বা সিলেটের নওরোজ বা আল-ইসলাহর মতো সুযোগ-সুবিধা নিয়ে যাত্রারস্ত করেছিলেন। তাঁদের পক্ষে এনেছিলেন নারায়ণগঞ্জ সাহিত্য-পরিষদ—এর কর্মকর্তাদের এবং মিউনিসিপ্যালিটির অ্যাডমিনিস্ট্রেটর জনাব মতিনউদ্দীন আহমদকে।

তাঁদের পত্রিকার প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয় থেকেই উদ্ভূত করা যাক পত্রিকার ইতিহাসের খানিকটা—

সাহিত্য ও সংস্কৃতি জীবনেরই প্রতিচ্ছবি; জীবনেরই প্রতিরূপ...প্রতিফলিত হয় সামগ্রিক জীবন—মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা দ্বন্দ্ব-সংগ্রাম, প্রেম-জিজ্ঞাসা। আমাদের সাহিত্যেও তাই আমাদের সত্যিকার জনজীবনের প্রতিফলন থাকা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু আজাদী-উত্তর আজ প্রায় ১৩ বছর পরেও দেখছি সাহিত্য-চর্চার উপযুক্ত মাধ্যম এখানে বিরল। আমাদের লেখকদের এখানে ভাবতে হয় কোথায় তাঁরা লিখবেন এবং কি লিখবেন। রুচিবান প্রকাশক ও এখানে অত্যন্ত বিরল। ফলে এখানে সাহিত্যের নামে যা হচ্ছে তা প্রায়শই দল নিরপেক্ষ সত্যিকার সাহিত্য সৃজনী নয়...

সাহিত্যের নামে কোন্দল চর্চাই বেশী। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্যি। আমাদের সাহিত্যিক, সাহিত্য-সমাজ এবং জীবন একসূত্রে গাঁথা নয় যেন। কেন যেন আলাদা আলাদা খাপছাড়া। একের সাথে অন্যের যোগ তত দৃঢ় নয়। অথচ এসব সূত্রের নিগূঢ় মিলন না-ঘটলে সত্যিকার সাহিত্যসৃষ্টি সম্ভব নয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে সামান্য শক্তি ও সামর্থের কথা জানা সত্ত্বেও অনেক আশা ও স্বপ্ন নিয়ে 'সাহিত্য' প্রকাশের যখন উদ্যোগ করি—তখন সাহিত্য-রসিক, স্থানীয় শিক্ষিত, সংস্কৃতিবান ব্যবসায়ীগণ—সাহিত্যের প্রতি যে অকুণ্ঠ দরদ ও সহযোগিতার মনোভাব প্রদর্শন করেন, তাই-ই আমাদের এই-পত্রিকা প্রকাশের সাহস জোগাচ্ছে।...

ইতিমধ্যে নানারকম ঝাঁপা এসেছে...কিন্তু তবু আমরা দমে যাইনি। সৎকটকালে যে-সকল বন্ধু স্বজন ও শূভানুধ্যায়ী আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন—স্বনামখ্যাত সাহিত্যিক মতিনউদ্দীন আহমদ; বিশিষ্ট ব্যবসায়ী অকৃত্রিম দরদী প্রাণ বাবু বাদল চন্দ্র সেন, প্রবীণ আইনজীবী ও সাহিত্যরসিক বাবু কামাক্ষাপাদ চন্দ্র (প্রথম প্রস্তাবক ও পরিপোষক) নারায়ণগঞ্জ সাহিত্য পরিষদের সভাপতি রইসউদ্দীন আহমদ ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী সত্যরঞ্জন সাহা—নারায়ণগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটির...মতিনউদ্দীন আহমদ অত্যন্ত অনুগ্রহপূর্বক 'সাহিত্য'র অফিস হিসাবে মিউনিসিপ্যালিটির পাবলিক লাইব্রেরি হলের একটি কক্ষ ব্যবহারের অনুমতি দিয়ে... 'সাহিত্য' প্রকাশের পথ সুগম করেছেন।

সম্পাদকীয়তে সাহিত্যের উদ্দেশ্য আদর্শ সম্পর্কে বলা হয় :

সাহিত্যক্ষেত্রে আমরা কোন বিশেষ দলের সমর্থক নই। সাহিত্যের মাধ্যমে সামগ্রিক ভাবে মানবতার কল্যাণ সাধনই আমাদের লক্ষ্য এবং আমাদের সৃষ্টিশীল প্রতিভার সৎ-বিকাশের দ্বারা জাতিকে গড়ে তোলা এবং দেশ ও সমাজের কল্যাণসাধনের প্রচেষ্টাই আমাদের আদর্শ।...দলমত নির্বিশেষে সবার জন্যই আমাদের এ দুঃস্বপ্ন প্রচেষ্টা।...আগ্লাহ আমাদের সহায়। আদর্শ আমাদের পথের দিশারী।

একটি বিজ্ঞাপনে বলা হয় :

সাহিত্য খ্যাতনামা ও শক্তিশালী নবীন-প্রবীণ লেখকদের উচ্চাঙ্গের প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, রম্য-রচনা, অনুবাদ, সাহিত্যলোচনা, পত্রধারা, ভ্রমণকাহিনী, স্মৃতিচারণ, ধারাবাহিক উপন্যাস, দেশ-বিদেশের সমকালীন সাহিত্যের খবর, বইপত্র সমালোচনা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে মূল্যবান রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে নিয়মিত প্রকাশিত হয়।

'সাহিত্য বিষয়ক উচ্চাঙ্গের মাসিক পত্রিকা চিহ্নিত করে এতে বিজ্ঞাপন দিয়ে সাহিত্য সৃষ্টিতে সহায়তা' করার আহ্বান জানানো হয়।

'সাহিত্য' এর প্রথম পৃষ্ঠায় শিরোনামের সঙ্গে 'প্রথম শ্রেণীর মাসিক পত্রিকা' এবং 'সাহিত্য ও সংস্কৃতিমূলক মাসিক পত্রিকা' ইত্যাদি কথা ব্যবহার করা হতো। এর প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা বৈশাখ ১৩৬৭ তে প্রকাশিত হয়। সম্পাদকের কার্যালয়, নারায়ণগঞ্জ পাবলিক লাইব্রেরী হল থেকে হেমায়েত হোসেন কর্তৃক জিনাত প্রেস, কায়েদে আজম রোড, নারায়ণগঞ্জ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

বৈশাখ ১৩৬৯ সংখ্যায় বলা হয় হেমায়েত হোসেন কর্তৃক নারায়ণগঞ্জের পাক প্রিন্টিং প্রেস থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। কভার ছাপা হয় নিউনেশন প্রেস, ১নং রামকৃষ্ণ মিশন রোড, ঢাকা-৩ থেকে। নিউজপ্রিন্ট ১ বাই ৮ ক্রাউন সাইজ, পৃষ্ঠা ৫০, দ্বিতীয় সংখ্যার পৃষ্ঠা ৭২, তৃতীয় সংখ্যা ১৪৮ পৃষ্ঠা, ১৯৬০ সনের বিপ্লব সংখ্যার পৃষ্ঠা ১৮২। এই রকম এক এক সংখ্যা এক এক সাইজে প্রকাশিত হতো।

মোহাম্মদী বা সওগাতের মতো ১২ সংখ্যার পৃষ্ঠার ক্রমিক ধারাবাহিক ভাবে রক্ষা হতো না। অর্থাৎ নিয়মিত প্রকাশের ব্যাপারে তাঁরা নিশ্চিত ছিলেন না, পত্রিকা নিয়মিত বেরও হয়নি। ১৩৬৯ পর্যন্ত বেরিয়ে থাকবে। প্রাপ্ত দ্বিতীয় বর্ষ তৃতীয়-চতুর্থ সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৩৬৯ সনের আশ্বিন-কার্তিক মাসে অর্থাৎ ১৯৬২ সনের নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে। তাহলে পত্রিকার আয় ছিল মোটামুটি এপ্রিল ১৯৬০ থেকে ১৯৬২ সনের ডিসেম্বর, বেশী হলে ১৯৬৩ সনের এপ্রিল পর্যন্ত।

পত্রিকায় প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নাম প্রকাশিত হতো মতিনউদ্দিন আহমদের। ‘প্রধান পৃষ্ঠপোষক’ ছিলেন বাবু বাদলকৃষ্ণ সেন। বিপ্লব সংখ্যায় (১৯৬০) কামাক্ষাপদ চন্দর নাম তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে ছাপা হয়। সহকারী সম্পাদক মধুসূদন মিত্র ও সিরাজুল ইসলাম ভূঁইয়া। প্রচ্ছদ শিল্পী রশীদ আহমদ। মূল্য দশ আনা। প্রচ্ছদ রুচিশীল হয়েছিল। বিজ্ঞাপন তাঁরা ভালোই পেতেন। সাহিত্যের সঙ্গে অনেককে সংশ্লিষ্ট করতে পারার সুবাদে বিজ্ঞাপনও সহজলভ্য হয়েছিল। আবার ঘুরিয়ে বলা যায়—বিজ্ঞাপনের সুবিধার জন্যই বেশী লোককে পত্রিকার সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছিল।

পশ্চিম বাঙলার সাহিত্যিকদের কাছেও সাহিত্য আদৃত হয়েছিল বলে ‘সাহিত্য’ গর্ববোধ করতো। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোজ বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, সুবোধ ঘোষ প্রমুখ খ্যাতনামা সাহিত্যিকগণ ‘সাহিত্য’ কে অভিনন্দন জানিয়ে পত্র লিখেছিলেন। সাহিত্যে তা ছাপাও হয়েছে। তাছাড়া স্বনামখ্যাত সাহিত্যিক ড. সৈয়দ মুজতবা আলীর উৎসাহমূলক পত্রে তাঁরা অত্যন্ত ‘অনুপ্রাণিত’ হন বলে জানান। ‘দেশবিদেশের এহেন অভিনন্দন, উৎসাহ, প্রেরণা ও স্নেহলাভে আমাদের বৃক্কে নতুন শক্তি এসেছে, আমাদের উদ্যম আরও প্রাণবন্ত হয়েছে।’<sup>১২</sup>

‘সাহিত্যের প্রথম সংখ্যায় প্রবন্ধ লেখেন :

ইব্রাহীম খাঁ (পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য); অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ (মানবজীবনের গতি ও নৃতন জীবনাদর্শের প্রয়োজনীয়তা); সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (আধুনিক কবিতার সমস্যা); ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক (আমাদের সাহিত্যিক—ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সম্পর্কে); ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন (পাক-বাংলার প্রবন্ধ-সাহিত্য); ইত্যাদি।

কবিতা লিখেছিলেন :

ফররুখ আহমদ, সুফী মোতাহার হোসেন, বেগম সুফিয়া কামাল, শামসুর রাহমান, আশরাফ সিদ্দিকী, আজিজুর রহমান (গান); শ্রী তারাশ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়; বানভট্ট; আখতার জাহান প্রমুখ।

গল্প লিখেছিলেন :

আহমদ মীর, আলাউদ্দীন আল আজাদ, শ্রী ধ্রুব চট্টোপাধ্যায়, রাজিয়া মজিদ প্রমুখ এবং উপন্যাস লিখেছিলেন দীপঙ্কর (চৈতালী মন, ক্রমশ) ; মতিনউদ্দিন আহমদ লিখেছিলেন রম্য-রচনা—এজমালী কবিতা। ‘আমাদের চলচ্চিত্র শিল্প’ বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন ওবায়দুল হক। আর ছিল ‘সমকালীন সাহিত্য সমাচার’—অর্থাৎ সাহিত্যের খবরাখবর। দ্বিতীয় সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘একটি অপ্রকাশিত কবিতা’ ছাপা হয়। কাজী নজরুল ইসলামের ‘অভিযান’ শীর্ষক কবিতা এতে মুদ্রণ করা হয়। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে প্রকাশিত বলেই এতে মঈনুদ্দীনের ‘আমাদের সাহিত্যে নজরুলের স্থান’ শীর্ষক প্রবন্ধ ছাপা হয়। নজরুলের কয়েকটি চিঠিও ‘সাহিত্য’ (১/২) ছাপে।

প্রথম সংখ্যার লেখক ছাড়াও প্রাপ্ত সংখ্যাগুলোতে যারা কবিতা লিখেছিলেন :

আবদুস সাত্তার, আবদুল মজিদ, এ. কে মকবুল আহমদ, আজহারুল ইসলাম, আবুল কাশেম শাব্বী, মোজ্জাফফর হোসেন, আবদুল মান্নান হাওলাদার, বিষ্ণু দে, আহসান হাবীব, সিকান্দার আবু জাফর, আবদুর রশীদ খান, মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, আবদুর রশীদ ওয়াসেকপুরী, মীর আবুল খায়ের, কে. এম. শমসের আলী, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, হেমায়েত হোসেন, মধুসূদন মিত্র, লতিফা হিলালী, আ. কা. শ নূর মোহাম্মদ, জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য, দিনেশ দাশ, জাহানারা বেগম, বিকাশ দাস, আবদুল্লাহ ইউসুফ ইমাম, মাসুদ আহমেদ, মুহম্মদ শামসুর রহমান, মনোয়ারা আরিফ প্রমুখ তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

যারা গল্প লিখেছিলেন :

খালেক দাদ চৌধুরী, নূরউল আলম, মনোজ বসু (টিফিনের ঘন্টা ১/৩, শ্রাবণ ১৩৬৭) ; অশোক বড়ুয়া (শেষ বেসতি, ১/৩) ; বনফুল (কৃতজ্ঞতা, ১/৩) ; প্রেমেন্দ্র মিত্র (ছায়াকায়ী, ১/৩) ; কলিম আনওয়ার (বড়গল্প স্পেসিস, ১/৩) ; রাজিয়া মজিদ (দেনা-পাওনা ; ১/৩) ; শওকত ওসমান (কালির আখর, বিপ্লব সংখ্যা ১৯৬০) ; সুবোধ ঘোষ (যাযাবর, পূর্বোক্ত) ; জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী (পিতা, পূর্বোক্ত) ; আলাউদ্দীন আল আজাদ (পাশবিক, পূর্বোক্ত) ; হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় (ঘৃগণিরা, পূর্বোক্ত) ; সুধীররঞ্জন মুখোপাধ্যায় (কথায় কথায়, পূর্বোক্ত) ; মধুসূদন মিত্র (পদ্মকলির মত) ; হেমায়েত হোসেন (অতনুর কান্না, পূর্বোক্ত, পলাশের তৃষ্ণা, ২/২) ; আবদুল গাফফার চৌধুরী (বয়তি, পূর্বোক্ত) ; শওকত আলী (বনটির প্রশ্ন, পূর্বোক্ত) ; বিজ্ঞকুমার ঘোষ (ফুলের সাধ, পূর্বোক্ত) ; নূরুল ইসলাম খান (ছক, পূর্বোক্ত) ; শহীদ আখন্দ (এই ঘর ; এই গান, পূর্বোক্ত) ; অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত (জারিজুরি, পূর্বোক্ত) ; আনোয়ারা চৌধুরী (নায়িকার বয়স চৌদ্দ, ২/৩-৪) ;

দীপঙ্কর লিখিত উপন্যাস ‘চৈতালী মন’ প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা থেকে ‘সাহিত্য’-এ ধারাবাহিক বেরিয়েছিল। মতিনউদ্দীন আহমদ এর দীর্ঘ উপন্যাস (২৯ অনুচ্ছেদে) ‘বুদ্ধদ’ সাহিত্যেই প্রথম প্রকাশিত হয় এবং পরে হেমায়েত হোসেনের ‘সাহিত্য’ থেকেই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। সুকুমার ভট্টাচার্যের ‘বস্ত্র পেরিয়ে’-ও সাহিত্যে প্রকাশিত হয়।

এছাড়া মহিউদ্দীন লিখিত ‘মসনদ’, প্রখ্যাত মার্কিন উপন্যাসিক সিন ফ্লেয়ার এর নিগো সমস্যার উপর লিখিত আলোড়ন সৃষ্টিকারী (নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত) উপন্যাস Kings Blood Royal এর কবীর চৌধুরীকৃত অনুবাদ এবং সৈয়দ মুজতবা আলীর ‘স্মৃতিচিত্রণ’ (‘মনি’) ইত্যাদি এতে প্রকাশিত হয়। বেশ কিছু পুস্তকের আলোচনা সমালোচনাও সাহিত্য প্রকাশিত করে। আবদুস শাকুর প্রণীত গল্পগ্রন্থ ‘ক্ষীয়মান’ এর আলোচনা করেন নূরুল ইসলাম খান, মুহম্মদ শামসুর রহমান প্রণীত কাব্যগ্রন্থ ‘বৃষ্টিকরা গান’ এর আলোচনা লেখেন শ-র-ভূঁ। মোকাররম হোসেনের গল্পগ্রন্থ ‘সূর্য-স্বপ্ন’র ওপর রনেশ দাশগুপ্ত ; আবুল হাসান

শামসুদ্দীনের গল্প-গ্রন্থ ‘মুখর প্রান্তর’ এর ওপর মোকাররম হোসেন, আ. কা. শ নূর মোহাম্মদের ‘বুনো মেঘ কথা কয়’ এবং হানিফ খান প্রণীত ‘ভাঙা বাঁশীর ওপর যথাক্রমে ইবনে সান্তার এবং মোঃ নূরুল আমিন আলোচনা লিখেছিলেন (২/২)।

দ্বিতীয় বর্ষ তৃতীয়-চতুর্থ সংখ্যায় (আশ্বিন কার্তিক ১৩৬৯) একগুচ্ছ পুস্তক আলোচিত হয়। আলোচ্য গ্রন্থগুলো : আবুল হাসান সংস্পাদিত গল্পগ্রন্থ ‘অফুরন্ত গল্প’; মুহম্মদ শামসুর রহমান ‘প্রণীত সাঁঝ আকাশের তারা’; কবীর চৌধুরী অনূদিত নাটক ‘বালিভিত’ এর আলোচনা লেখেন যথাক্রমে নূরুল ইসলাম, মুহম্মদ মোকাররম হোসেন, মোঃ নূরুল আমিন, রনেশ দাশগুপ্ত প্রমুখ। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যসাময়িকী ‘ইন্দ্রপ্রস্থ’ ও ‘মানসী’, ‘মানস’, ‘অনন্য’ প্রভৃতি এবং ঢাকার ‘রঙ্গন’ (প্রধান সম্পাদক সৈয়দ আসাদুজ্জামান, মাসিক পত্রিকা) এর আলোচনাও এতে প্রকাশ পায়। ড. মুহম্মদ এনামুল হক আবদুর রশীদ ওয়াসেকপুরীর কাব্য-গ্রন্থ ‘আমীর সওদাগর’ এবং অধ্যাপক আবুল ফজল নূরউল আলম প্রণীত ‘পুতুলের কান্না’ প্রসঙ্গে লিখেছিলেন।

সাহিত্যের প্রবন্ধগুলোও কম গুরুত্বের নয়।

অধ্যক্ষ মোহাম্মদ আজরফ (আমাদের কথাসাহিত্যের পরিবেশ ও প্রতিশ্রুতি, ১/২); সৈয়দ মুজতবা আলী (সাহিত্য সংস্কৃতি, ১/৩ থেকে ক্রমশ); আবু তালিব (কবি বুরহানুজ্জাহ, ১/৩); সৈয়দা রাজিয়া বেগম (রম্য রচনা ও সৈয়দ মুজতবা আলী, ১/৩); ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য, বিপ্লব সংখ্যা ১৯৬০); সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় (সাহিত্য প্রসঙ্গে, পূর্বোক্ত, ক্রমশ); ফখরুজ্জামান চৌধুরী (হারমান হেস ও ‘সিন্ধু’, পূর্বোক্ত); ড. কাজী মোতাহার হোসেন (মন সাহিত্য, পূর্বোক্ত); ড. নীলিমা ইব্রাহিম (সেনেটের কবি মধুসূদন, পূর্বোক্ত); আবদুল জব্বার খান (পূর্ব পাকিস্তানের চলচ্চিত্র শিল্প, বিপ্লব সংখ্যা ১৯৬০); মতিনউদ্দীন আহমদ (পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যের বর্তমান ধারা, ফাল্গুন ১৩৬৭); ঈদসংখ্যা); শিশির কুমার দাশ (লেডিচ্যাটার্লির বিচার, পূর্বোক্ত); অধ্যাপক মাহমুদ মোকাররম হোসেন (সাহিত্য ও সৌন্দর্যবাদ, ২/২); জগলুল হায়দার আফরিক (ছোটগল্পের শিল্পরূপ, পূর্বোক্ত); মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ (বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ, পূর্বোক্ত) এবং আদিত্য ও -হৃদেদার (রবীন্দ্রনাথের জীবন-দেবতা, ২/৩-৪); প্রবন্ধ লিখেছিলেন।

‘সাহিত্য’ বৈশাখ ১৩৬৯ সনে ‘পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যে দুর্নীতি’ সম্পর্কে বিশেষ ‘অসাধারণ’ সংখ্যা প্রকাশ করে পূর্ব-বঙ্গবাসী সাহিত্যিকদের প্রতিভাহীনতার সঙ্গে-সঙ্গে বিভিন্ন ক্ষেত্রের খ্যাতিমান লেখকগণ বিদেশী সাহিত্যের কোথা থেকে চুরি বা ছবছ নকল করেছেন ইত্যাদি সব সবিস্তারে ফাঁস করে দিয়েছেন। সম্পাদক এটা করেছিলেন সমাজ ও সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতি বিশেষ একটা দায়িত্ববোধ থেকেই। পূর্ববঙ্গের সাহিত্য-সাধনায় প্রকৃতপক্ষে মহত্তম কোনো ফসল বিভাগ-পরবর্তী দুই যুগেও ফলেনি।

অথচ এখানকার কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে মহৎ-সৃষ্টির কোনো প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়নি। যেনো-তেনো প্রকারে এক একখানা সাহিত্য সৃষ্টি বা সাহিত্যসমালোচনামূলক গ্রন্থ লিখে সমাজ থেকে নানা ফায়দা সংগ্রহের রীতি-নীতি দেখে বিক্ষুব্ধ-সম্পাদক সাহিত্যসমাজের অবক্ষয়রোধে দুর্নীতি দমনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এই সংখ্যাতে নজরুলের সমকালীন মুসলিম-রেনেসাঁর কবি বেনজীর আহমদ লিখেছিলেন একটি নীতি-প্রচারমূলক উপদেশাত্মক প্রবন্ধ ‘সাহিত্যে দুর্নীতি ও জাতীয় চরিত্রে তার প্রভাব’।



মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসানকৃত এদেশের বহুলপঠিত গ্রন্থ ‘বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত’ তে কোথা থেকে কতো চুরি ও নকল রয়েছে কিংবা ভুল তার বিবরণমূলক রচনাটি ১৩৬৩ সনের ১০ই ভাদ্রের দৈনিক আজাদ থেকে পুনর্মুদ্রিত করা হয়েছিল। গোলাম সাকলায়েন ‘পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য’ শিরোনামে ‘সাপ্তাহিক দেশ’ পত্রিকার ২৭ বৈশাখ ১৩৬৫ তারিখের সংখ্যায় লিখেছিলেন যে প্রবন্ধটি—তা আবুল কাসেম প্রণীত এবং মাহেনও—এ প্রকাশিত প্রবন্ধেরই নকল বা চুরি ;—এই সম্পদ দিয়ে আবুল কাসেম দৈনিক সংবাদ এর ২৩-৮-১৯৫৮ তারিখের সংখ্যায় যা লিখেছিলেন তাও চুরি বিষয়ক উক্ত সংকলনে সাহিত্য প্রকাশিত করে।

অধ্যাপক মীর আবুল হোসেনও লিখেছিলেন ‘বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত প্রসঙ্গে’। তাঁর রচনার বক্তব্য সৈয়দ আলী আহসান যে J.C. Ghosh লিখিত Bengali literature (১৯৪৮ সনে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত) গ্রন্থের আক্ষরিক অনুবাদ তার উপযুক্ত প্রমাণ দেওয়া। এই রচনাটি ২৩/৭/৬১ তারিখের ইন্তেফাক থেকে সংকলিত। ‘মাহেনও’ এর ফেব্রুয়ারী ১৯৬১ সংখ্যায় প্রকাশিত ‘কাকে বলি’ শীর্ষক কবিতার নকল ‘বেগম’ (৩০/৪/৬১) এর জাহানারা বেগম রচিত ‘প্রিয়তমেশু’—কবিতা দুটো উদ্ধৃত করে তার প্রমাণ দেওয়া হয়েছে।

সৈয়দ আলী আহসানের ‘অনেক আকাশ’ (১৩৬৬) বইয়ের কবিতাগুলো ইভানগলের কবিতার অনুবাদ। তাঁর Our Heritage বইটিও Heroes and Heroines of Islam” শীর্ষক গ্রন্থের অনুসরণ। ‘দুর্মুখ’ ছদ্মনামে ‘সাহিত্যে দুর্নীতি’ শীর্ষক আলোচনায় এ সব তথ্য তুলে ধরেছিলেন। ১৫-৯-৬১ তারিখের ইন্তেফাকে প্রকাশিত হয় শামসুল আরেফিন এর প্রবন্ধ—‘বিদেশী ভাষায় পূর্ব পাকিস্তানের কবিতার অনুবাদ’, এতেও সৈয়দ আলী আহসান ও সৈয়দ আলী আশরাফের কবিতা যে কবিতা হয়নি তাই প্রমাণ করা হয়েছে। অথচ ইউনেস্কোতে অনুবাদের জন্য বাংলা একাডেমীর পক্ষ থেকে এই দুজনের কবিতাই বাংলা একাডেমীর পরিচালক হিসেবে ক্ষমতার জোরে সৈয়দা আলী আহসান কর্তৃক পাঠানো হয়েছিল।

টেক্সট বুক বোর্ডের বইয়ের লেখা নির্বাচনে দুর্নীতি ও বয়স কমানো—বাড়ানো ইত্যাদি বিষয়ে লিখেছিলেন এম. এইচ. আলী ‘সাহিত্যে দুর্নীতি প্রসঙ্গে’। ‘সাহিত্যে অসাধুতা’ শিরোনামে ১৬.১০. ১৯৬১ তারিখের ইন্তেফাকে প্রকাশিত মকব্বলা খাতুন এর লেখার পুনর্মুদ্রণ করা হয়। এর বক্তব্য গোলাম সাকলায়েন চুরি করেছেন পূর্বালীতে (২/১, আশ্বিন, ১৩৬৮) প্রকাশিত বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীরের বেনামী রচনা ‘সওজা বাংলা’ আবিষ্কার প্রসঙ্গে লেখা থেকে। দেশ এ (১৩৫৯) প্রকাশিত বিকাশ দাস এর কবিতা ‘সাহিত্য’ থেকে চুরি করেছেন আবদুল্লাহ ইউসুফ ইমাম (গোধূলী, ইন্তেফাক, ১৩৬৬)।

জসীমউদ্দীনের কবিতা চুরি করে লিখেছেন করাচী থেকে আবদুর রহমান ভূঁইয়া। এরকম অনেক নকল ও চুরির বিবরণ পাওয়া যায় সাহিত্যের এই সংখ্যায়। সৈয়দ আলী আহসানের চুরি, দুর্নীতি ও আত্মসাতের বিরবণই দীর্ঘ ও লোমহর্ষক। অনেক অপ্রধান অশিক্ষালী লেখকের কথা ধর্তব্যের মধ্যে না—আনলেও চলে। কিন্তু নিরপেক্ষভাবে শীর্ষ

স্থানীয় ব্যক্তিত্ব আলী আহসানের কৃতিত্ব বিচার করতে গেলে চুরির ধনে বড় লোক ছাড়া তাঁকে আর কিছু বলা চলে না। উল্লেখ্য, বুদ্ধি ও কৌশল জানা না থাকলে চুরি করে সারা যায় না। সেই মেধা ও প্রতিভা অবশ্যই তাঁর ছিল।

পূর্ব পাকিস্তানের পত্র-পত্রিকায় সৈয়দ আলী আহসানের যে চরিত্র ফুটে উঠেছে তা অনন্যসাধারণ গুরুত্ব দাবি করে। কারণ তিনি নকল, চুরি, তোয়াজ-তোষামোদ করে সাহিত্যিক জীবনের ভিত্তি তৈরী করেছিলেন এবং ঔপনিবেশিক সরকারের প্রীতিভাজন হয়ে বিভিন্ন উচ্চপদে আসীন হয়েছিলেন। ধিকৃত ভূমিকা অবলম্বনের সুযোগ বাংলাদেশেও তাঁর ঘটেছিল। কারণ জনগণের কল্যাণকামী সরকার ব্রিটিশের রাজত্বকালের পরে এদেশে এখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। গণস্বার্থ-বিরোধী, অসৃষ্টিশীল লোকেদের প্রাধান্য দুর্নীতিবাজ সরকারের কাছে যে হবেই—সেটাই স্বাভাবিক।

‘দুর্নীতি’ সংক্রান্ত সংখ্যার (আমাদের কথা) সম্পাদকীয়তে লেখা হয়—পূর্ব পাকিস্তানের গত ১৫ বছরের সাহিত্যের খতিয়ান নিলে নিরাশ হতে হয়। নিষ্কলুষ মৌলিক নয় এখানকার সাহিত্য-শিল্প।

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক প্রভৃতি সকল দিক দিয়েই জাতীয়-জীবনে যে দুর্নীতি ও অসাধুতার কালে-ছায়া ঘণীভূত হয়েছিল, আমাদের সাহিত্যও তার করালগ্রাস থেকে রেহাই পায়নি। কিছু সংখ্যক তথাকথিত ‘সাহিত্যিক’ আমাদের সাহিত্যক্ষেত্রে দুর্নীতি, অসাধুতা, বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার সৃষ্টি করে চলেছেন। অথচ তাঁদের অনেকেই উচ্চশিক্ষিত। উচ্চপদে ও মর্যাদায় সমাসীন।... সুস্থ ও সং-সাহিত্য সৃষ্টির কল্যাণচিন্তায়ই সেইসব অসৎ ও অসাধু ‘সাহিত্যিক’ পদলোভীদের সাহিত্যিক দুর্নীতির প্রতি অঙ্গুলী নির্দেশ এবং সে সাথে আমাদের সাহিত্য ক্ষণতে সুস্থতা, সত্যতা ও স্বচ্ছতার পরিবেশ সৃষ্টিতে সাহায্যই আমাদের এই বিশেষ সংখ্যার উদ্দেশ্য।—এই ধরনেই অভিযোগ আগেও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়—আরও অভিযোগ হয়তো আছে—কিন্তু কোন লেখক প্রতিবাদ করেননি।<sup>২</sup>

‘যাঁরা জাতিরই খেয়ে পরে সে-জাতিরই ধ্বংস সাধন কার্যে লিপ্ত রয়েছেন... জাতির যাঁরা চিন্তাবিদ, লেখক ও অধ্যাপক ; এবং যাঁরা নানারূপ শিক্ষা ও সংস্কৃতি সংস্থার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি তাঁদের কার্যকলাপে, চিন্তাধারায় ও মত প্রকাশের বাধানিষেধ সম্পর্কে কুদরুতুল্লাহ শাহাবের (লেখক সংঘের ‘লেখক ও তাঁর স্বাধীনতা’ শীর্ষক) প্রবন্ধের বস্তুব্য উদ্ধৃত করে বেনজীর আহমদ বলেন :

লেখক কোনক্রমেই আইনের উর্ধ্বে নন। তিনি একদেশে থাকবেন অথচ অন্যদেশের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করবেন—এ কিছুতেই হতে পারে না। তিনি একমত প্রচার করবেন অথচ অন্য মতবাদাদুষ্টায়ী জীবন-যাপনের কবি-সুলভ স্বাধীনতা নেবেন—এও চলতে পারে না।<sup>৩</sup>

মতিনউদ্দীন আহমদ ১৩৬৭ সনের ঈদ সংখ্যায় লিখেছিলেন ‘পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যের বর্তমান ধারা’ শীর্ষক একটি প্রবন্ধ। এতে তিনি বলেন : বেশী করে উর্দু, আরবি ফার্সি শব্দ বাংলায় প্রবেশ করালে উর্দুভাষিরা বাংলার স্বাদ গ্রহণে সক্ষম হবে এবং দ্রুত নৈকট্য আসবে। কারণ,

কোরান মজিদ পড়তে গিয়ে প্রত্যেক বাঙালি মুসলমান লেখকের আরবি হরফের সঙ্গে পরিচয় হয়ে যায়... কিছু উর্দু পড়ে ফেলতেও পারেন।... এই সুবিধা উর্দু দানিশগণের নাই।... বাংলাভাষী উর্দুতে কথা বলেন... উর্দুর সঙ্গে

মোহারেবা আরো ভালো হয়ে উঠে, অথচ অপর পক্ষের বাংলা শেখা হয়ে উঠে না। এইসব কারণে বাংলাভাষী যত সহজে উর্দু শিখে নিতে পারেন, উর্দুভাষী তত সহজে বাংলা শিখতে পারেন না। তাঁদের বেশীর ভাগই বাংলা শেখার দিকে মোটেই খেয়াল করেন না। রাইটার্স গিল্ডের বদৌলতে উর্দু ও বাংলা ভাষার লেখকগণ এক মহফিলে এসে বুক মিলিয়েছেন। তাঁরা যেন উর্দু ও বাংলা ভাষার দিলকেও তেমনি এক করে দেন, তাঁদের খেদমতে এই আমার আরজ।

তিনি উর্দু ও বাংলা ভাষার পত্র-পত্রিকাতে উর্দু ও বাংলার তর্জমা প্রকাশের ব্যবস্থা করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। তর্জমার সময় ‘সহজবোধ্য শব্দগুলোকে’ মূলরূপে রেখে প্রকাশ করলে ‘উভয় ভাষার ভাণ্ডারেও নতুন নতুন শব্দ এসে জমা হতে থাকবে।’ তিনি বলেন, আজাদীর পর প্রধান লেখকেরা ‘খুব বেশী কিছু দান করেন নি।’ পরবর্তীদের নিকট থেকেই আশা করা হচ্ছে। তিনি বলেন ‘প্রবীণরা জিন্দেগীর বন্দোবস্ত’তেই ব্যস্ত। সওগাতে আবদুল গনি হাজারীও প্রবীণ সাহিত্যিকদের অসৃষ্টিশীলতার অভিযোগ করে বলেছিলেন, প্রবীণরা পাকিস্তান হাসিল করে স্বাধীন রাষ্ট্র থেকে নানানভাবে সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করার ধাক্কায় অন্ধ হয়ে ছুটোছুটি করে বেড়িয়েছেন, মৌলিক সাহিত্য সৃষ্টিতে তাঁরা কেউ মন দিতে প্রস্তুত ছিলেন না।<sup>৪</sup>

মতিনউদ্দীন আহমদের ‘পাকিস্তানী’ ভাষা সৃষ্টির প্রস্তাবমূলক উপর্যুক্ত রচনাটির আদর্শ পাকিস্তানবাদী পত্রিকা নওবাহার, মাহেনও এর অনুরূপ। কিন্তু এই প্রবন্ধে প্রবীণদের সাহিত্য সৃষ্টি সম্পর্কে প্রবীণের সঠিক উক্তি খুব মূল্যবান। এর সঙ্গে সঙ্গতি আছে তরুণদের অভিযোগের বা মূল্যায়নের। সেযাই হোক, মতিনউদ্দীন আহমদ ছিলেন পত্রিকার প্রধান উপদেষ্টা। তাঁর রচনা না-ছেপে উপায় ছিল না। তবে তাঁর সহযোগিতায় এবং স্নেহানুকূল্যে যে সাহিত্য বের হতে পেরেছিল—তাতে জনগণের স্বার্থের সপক্ষে অনেক বক্তব্য আছে এবং তার বহুলাংশই অসাম্প্রদায়িক ও প্রকৃত সৃষ্টিশীল সাহিত্যের প্রত্যায়ী।

পত্রিকার অলংকরণ, চিত্রণ রুচিশীল ছিল। বিভিন্ন সময় তাঁরা নানান ভালো প্রেস থেকে কভার ছেপে নিতেন, আর প্রচ্ছদ আঁকাতেন ভালো শিল্পীদের দিয়ে। ১৯৬১ তে খ্যাতনামা লেখকের ছবিসহ সাহিত্যের একটি ‘গল্প সংকলন’ প্রকাশের সংবাদ জানা যায়—কিন্তু সেই সংখ্যাটি অনুসন্ধান পাওয়া যায়নি। আরও পাওয়া যায়নি প্রকাশিত অনেক সংখ্যা। কিন্তু যা পাওয়া গেছে—তাতেই ‘সাহিত্য’ কে একটি উল্লেখযোগ্য পত্রিকা হিসেবে চিনে নিতে কষ্ট হয় না।

### ৩. যাত্রী

(১৯৬০-৬২)

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র (বাংলা) খোন্দকার সিরাজুল হক, তাঁর অগ্রজ খোন্দকার আমিনুল হক এবং তাঁদের সুহৃদ দ্বিজেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও প্রাণজিৎ শর্মা প্রমুখ মিলে গড়ে তুলেছিলেন ‘ত্রিভুজ সাহিত্য সংস্থা’। তাঁদেরই উদ্যোগে বেরিয়েছিল ‘যাত্রী’ নামে সাহিত্য সাময়িকী।

প্রথম সংখ্যা বেরিয়েছিল বৈশাখ ১৩৬৭ এপ্রিল ১৯৬০ সনে। দুবছর চলেছিল, প্রথম বছরে মাসিক এবং দ্বিতীয় বছরে ত্রৈ-মাসিক হিসেবে। যাত্রীকে কেন্দ্র করে প্রগতিশীল তরুণদের একটি গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। কিন্তু রাজশাহীর মতো একটি মফস্বল শহর থেকে পত্রিকার প্রকাশ অব্যাহত রাখা অত্যন্ত কষ্টকর ছিল। কারণ শিল্পনগরী না হওয়ায় বিজ্ঞাপন সুলভ ছিল না ফলে অর্থনৈতিক কারণেই যাত্রীর অকাল মৃত্যু ঘটেছিল। তবে যাত্রীর সঙ্গে যারা যুক্ত ছিলেন তাঁদের অনেকেই আজও সাহিত্য-সংস্কৃতি জগতে সক্রিয় আছেন।<sup>৭</sup>

যাত্রী-প্রকাশক ছিলেন শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। প্রকাশস্থল সাগরপাড়া, (কোনও সংখ্যায় কুমার পাড়া) ঘোড়ামারা, রাজশাহী। সম্পাদক খন্দকার আমিনুল হক ও খন্দকার সিরাজুল হক, তবে বিভিন্ন সংখ্যায় কয়েকজন তরুণ সাহিত্যকর্মীর নাম সহযোগী হিসেবে ছাপা হয়। প্রকাশের উদ্দেশ্য ছিল তরুণসমাজে সাহিত্যচর্চার পথ সুগম করা এবং একটি সংস্কৃতি-সচেতন গোষ্ঠী গড়ে তোলা। নিউজপ্ৰিন্টের সাধারণ ছাপা-বাধাই, মানসম্মত এই পত্রিকার সাইজ ছিল ৯ × ৭ ইঞ্চি। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩২। ইন্টারন্যাশনাল প্রিন্টিং ফার্ম থেকে মোঃ মাজেদ আলী কর্তৃক মুদ্রিত (১/৭-৮ সংখ্যায়, তবে বিভিন্ন সংখ্যা বিভিন্ন প্রেসে মুদ্রিত হয়েছে)।

প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় লিখেছিলেন : প্রবন্ধ—মহহারুল ইসলাম, শ্রী সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়, আবুল কাশেম চৌধুরী, খন্দকার সিরাজুল হক, শ্রী প্রাণজিৎ শর্মা, আবদুল হাফিজ প্রমুখ। স্মৃতিকথা লিখেছিলেন প্রমথনাথ বিনীশ কনিষ্ঠ সহোদর প্রফুল্লনাথ বিনীশ।

ছোটগল্প : নূরউল আলম, আজিজুল হক, আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, দ্বিজেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, অন্নদা মোহন বাগচী, আমিনুল হক, আখতার বানু প্রমুখ।

কবিতা ও গান লিখেছিলেন, মহহারুল ইসলাম, আলমগীর জলীল, আবদুল মান্নান হাওলাদার, শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী, আহমদ সান্তার, হুমায়ুন খান আশরাফ সিদ্দিকী (আমি স্বামী) ; আবু হেনা মোস্তাফা কামাল (সেই ক্লাস্ত নাগরিক) ; বন্দে আলী মিয়া (গান) প্রমুখ। প্রথম বর্ষ সপ্তম-অষ্টম সংখ্যায় 'সমকালীন সাহিত্য-চিন্তা' শিরোনামে প্রবন্ধ লিখেছিলেন অধ্যাপক সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়। গল্প লিখেছিলেন অধ্যাপক নূরউল আলম (ম্যাডোনা) ; অন্নদামোহন বাগচী (তামসী) ; আমিনুল হক (ভুল) প্রমুখ। মিলু ইসলাম লিখেছিলেন রম্যরচনা—আড্ডা ; আর রওশন আরা লিখেছিলেন 'কাশবনের কন্যা' শীর্ষক উপন্যাসের আলোচনা।

সম্পাদকীয়তে ১৯৬১ সনের ফেব্রুয়ারির পরের চেতনা নিয়ে লেখা হয়েছিল : 'বস্তুত মাতৃভাষার মাধ্যম ব্যতীত কোন শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা হতে পারে না, অপরপক্ষে সে শিক্ষা পোষাকি হয়ে দাঁড়ায়... আমরা বাংলাভাষার উত্তরোত্তর বিকাশ ও সমৃদ্ধি কামনা করি।'

সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায় পাকিস্তানি নাগরিক হিসেবে পাকিস্তান অর্জনের পর দেশের প্রেক্ষাপটে পাক-বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির পক্ষেই মত দেন। তিনি সাম্প্রদায়িক সাহিত্যিক ধ্যানধারণা সম্পর্কের আলোচনা করেন :

একথা অস্বীকার করে কোন লাভ নেই যে পূর্ব পাকিস্তানের বিরূপ জনশ্রেণীর সঙ্গে সে সাহিত্যের (পাক-পূর্ব বাংলা) আত্মীয়তা যতটা ছিল মৌখিক, ততটো আন্তরিক ছিল না।...বিশেষ করে সংখ্যাগুরু ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবনের বিশেষ কোন পরিচয়ই সে-সাহিত্য বহন করতো না। ফলে এদেশের জনজীবনে সে সাহিত্যের প্রসার খুব বেশী ঘটেনি।

তাঁর আলোচনার মূল কথা ছিল—পাকিস্তান অর্জনের পরে তা হয়েছিল। ‘পাকিস্তানের জনসাধারণের জন্য বিশিষ্ট এক সাহিত্যসম্পদ গড়ে তোলার একটা প্রচেষ্টা সর্বত্রই লক্ষণীয়।’

তাঁর লেখায় এদেশের সাহিত্যের তিনটি ধারা—১. ধর্মীয় দৃষ্টিকোণের (মুসলিম নবজাগরণের আন্দোলন এঁদের মূল প্রেরণা হলেও) রচয়িতা গোলাম মোস্তফা, ফররুখ আহমদ, মুফাখ্খারুল ইসলাম, তালিম হোসেন প্রমুখ মূলত পুনরুজ্জীবনবাদী—Revivalist. ২. ইসলামী আদর্শ মূলভিত্তি, কিন্তু আধুনিক যুগের পরিপ্রেক্ষিতে রেনেসাঁসপন্থী যুগসচেতন মুসলমান। ৩. ধর্মীয় চিন্তাধারার গণ্ডিতে বদ্ধ দেখতে চান না—যুগধর্মই তাঁদের সাহিত্যের চিন্তার নিয়ামক। পরিপার্শ্ব সচেতন, পুরাতন ঐতিহ্যকে বড় করে দেখতে নারাজ, হিন্দুসৃষ্ট বাংলা সাহিত্যকে সমগ্ররূপ বলে মানেন না, সঙ্গে সঙ্গে ইসলামী ঐতিহ্যবাদী সম্পূর্ণ আলাদা ধারার সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াসকেও পূর্বপাকিস্তানী সাহিত্যের যথার্থ প্রতিনিধিত্বমূলক ধারা বলে মেনে নিতে প্রস্তুত নন। এঁদের বক্তব্য হচ্ছে :

সম্প্রদায় ও বহুবিচিত্র ধর্ম ও সমাজব্যবস্থার অধিকারি মনুষ্যঅধুষিত পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যে বৈচিত্রের স্বীকৃতি আনতেই হবে, সেখানে হিন্দু মুসলমান বড় নয়, এদেশের মানুষই বড়। এরা সাহিত্যে ইসলামের দৈন্য মোচনের প্রয়োজনীয়তার উপর খুবই জোর দেন, কিন্তু স্বাতন্ত্র্যের দাবীকে প্রাসঙ্গিক মনে করেন না। এরা নবজাগরণের মন্ত্রকে গ্রহণ করেছেন—সংস্কারমুক্তির বাণীরূপে। এরা অধিকাংশ তরুণ—শিক্ষিত, আধুনিক, পাশ্চাত্য সাহিত্য জানেন, প্রাচীন ও আধুনিক ঐতিহ্য সমভাবে গ্রাহ্য করেছেন, ধর্মীয় অপেক্ষা, জীবনের বিচিত্র দিকে (সাহিত্য, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, রাজনীতি) এঁদের ঝোঁক—আহসান হাবীব, শওকত ওসমান, শামসুর রাহমান, আলাউদ্দীন আল আজাদ, শামসুদ্দীন আবুল কালাম, সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ, আবু ইসহাক, সরদার জয়েনউদ্দীন প্রমুখ এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এদেশে বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন আত্মস্বাতন্ত্র্যবাদী সাহিত্যিকও আছেন—যেমন জসীমউদ্দীন, বন্দে আলী মিয়া ইত্যাদি।<sup>৬</sup>

## ৪. সুন্দরম

(১৯৬৩-৬৪)

এই কালের (১৯৪৭-৭১) তরুণদের সাহিত্য-প্রয়াস হিসেবে নানাকারণেই ‘সুন্দরম’ উল্লেখযোগ্য। ষাটের দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে সমবেত হয়েছিলেন কোথা থেকে, কিভাবে জানি না, বাংলাদেশের সাহিত্য-সংস্কৃতিজগতের উজ্জ্বল সব ব্যক্তির। এই বিভাগের ছাত্র-শিক্ষকেরা ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ করে (সেপ্টেম্বর ১৯৬৩) পাকিস্তান আমলের পাক-বাংলা সংস্কৃতির বিপক্ষে প্রতিরোধে সোচ্চার হয়েছিলেন, আর দেশের মানুষের সামনে তুলে ধরেছিলেন বাঙালি-সংস্কৃতির, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ঋণী নিদর্শনসমূহ।

এইকালে, ঐ বিভাগের ছাত্রদের দ্বারাই প্রকাশিত হয়েছিল ‘কবিতা’ পত্রিকার অনুসরণে বাংলাদেশের শুধু কবিতাবিষয়ক ম্যাগাজিন ‘স্বাক্ষর’ এবং ‘পূর্বলেখ’। আর ষাটের দশকের

আলোড়নসৃষ্টিকারী ‘কণ্ঠস্বর’ পত্রিকাও বেরিয়েছিল প্রধানত এই বিভাগের ষাটের দশকেরই একদল শিক্ষার্থীর উদ্ভাবনী উদ্যোগে। ‘পলিমাটি’র তরুণতর সংস্কৃতিসেবীদের অধিকাংশ এই বিভাগেরই ছাত্র। এ কিসের ফল? সমকালীন দেশ সমাজ এবং মানুষের সার্বিক জীবন-ভাবনারই দ্যোতক এগুলো। নতুন সুখী-সুন্দর সমাজ এবং সৃষ্টিশীল আধুনিক সাহিত্য রচনার স্বপ্নকামনা জাগ্রত হয়েছিল তাঁদের মধ্যে যুগেরই প্রভাবে। বাংলা বিভাগের ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ উদযাপনের সমকালে অধ্যয়নরত ছাত্রদের সর্বকনিষ্ঠ দলের উদ্যোগে গঠিত ‘সুন্দরম্ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সংস্থা’।

এঁদের প্রিয় জীবনবেদ ছিল এই শাস্ত্র উক্তি-সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্। সুন্দরমগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে যে সংকলনটি প্রথম বের হয় (আগস্ট ১৯৬৩) তাতে অবশ্য কেবল তরুণদের উচ্ছ্বাস ও আবেগই ব্যক্ত হয়নি। প্রবীণ চিন্তকদের সমাজ-ঘনিষ্ঠ বক্তব্য বা চিন্তাসংবলিত রচনাও তাতে গুরুত্বের সঙ্গে ছাপা হয়েছিল। ফলে স্বাক্ষর-কণ্ঠস্বর ইত্যাদির তরুণ উদ্যোক্তাদের থেকে স্বতন্ত্র বোধের পরিচয় সুন্দরম্-এ পাওয়া যায়। এঁরা বিশ্বাস করতেন কেবল তারুণ্য ও আবেগ দিয়ে সমাজের বৃহত্তর কল্যাণ সাধন সম্ভব নয়। এর সঙ্গে প্রয়োজন প্রবীণের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের সংযোগ। ইমরুল চৌধুরী, রফিক আজাদ, ফারুক আলমগীর, আহমদ ছফার মতো তরুণতর লেখকদিগের সঙ্গে ‘সুন্দরম্’ এ ছাপা হয়েছে তাই ড. গোবিন্দচন্দ্র দেব, ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েনের ন্যায় প্রবীণদের চিন্তাপ্রধান রচনাবলী।

‘সুন্দরম্’ এর তিন-চারটি সংখ্যা প্রকাশিত হলেও সবগুলো কপি পাওয়া যায়নি। প্রাপ্ত প্রথম সংখ্যার তথ্যানুযায়ী এর সম্পাদক ছিলেন আবুল কাসেম ফজলুল হক (তখন আ. কা. ম. ফজলুল হক লেখা হত)। তিন রঙের সুন্দর প্রচ্ছদটি ঐকেছিলেন কাজী গোলাম মোস্তফা। প্রচ্ছদের সঙ্গে পরিচ্ছন্নরুচির মুদ্রণ-সৌকর্য সঙ্গতি রক্ষা করেছিল। মুদ্রণক্রটি তুলনামূলক-ভাবে ঐকালের অন্যান্য পত্রিকা থেকে কম, চোখে পড়ার মতো নয়। ঐ কালের আর দশটি পত্রিকা থেকে এর স্বাতন্ত্র্য সহজেই যেকারো চোখে পড়বে। ঐ সময় এদেশ থেকে প্রকাশিত হচ্ছিল ঐকালের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যপত্রিকা ‘সমকাল’। এর ছাপা, কাগজ, প্রচ্ছদ ও সম্পাদনার বৈশিষ্ট্য উন্নত রুচির ও উন্নত চিন্তার ফসল সকলকে আকৃষ্ট করেছিল। এর প্রভাব সৃজনশীল সাহিত্যপ্রয়াসে দুর্লক্ষ নয়। সুন্দরম্-এর উদ্যোগী তরুণদের আদর্শও কি ছিল সমকাল?

‘সুন্দরম্’ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সাংস্কৃতিক সংগঠন ছিল। এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন একালের প্রখ্যাত কিছু ব্যক্তি : রফিক আজাদ, মালেকা বেগম, আহমদ ছফা, বুলবুল খান মাহবুব, রশীদ আল-ফারুকী, কিসুওয়ার জাহান প্রমুখ বাংলা বিভাগের তখনকার ছাত্রছাত্রীবৃন্দ। অন্যান্য বিভাগের উৎসাহী ছাত্রছাত্রীদের সংশ্লিষ্টতাও ছিল এর সঙ্গে।

মানবতাবাদী দার্শনিক, শহীদ, ড. গোবিন্দচন্দ্র দেব বঙ্কিমচন্দ্রের (১৮৩৮-১৮৯৪) ‘উদরদর্শন’ শীর্ষক প্রবন্ধের অনুসরণে (বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন জন স্টুয়ার্ট মিলের প্রভাবে) ড. দেব নোট দিয়েছেন : বঙ্কিম মিলের ইউটিলিটারিয়ানিজমের নাম দিয়েছিলেন উদরদর্শন।

মিলের মতে ব্যক্তির নিজের সুখের জন্যেই বহুজনের সুখসন্ধান তার অপরিহার্য কর্তব্য।—কমলাকান্তের দপ্তর দ্রষ্টব্য) লিখেছিলেন ‘আলু দর্শনের ভূত ও ভবিষ্যৎ’। এতে তিনি সমকালীন সভ্যতার ভাববাদ ও বস্তুবাদের বিরোধের সরস বর্ণনা দিয়ে উল্লেখ করেছেন যে ভাববাদ ও বস্তুবাদের সংশ্লেষণে গঠিত নতুন জীবনদর্শনের আশ্রয়েই মানবজাতির সভ্যতার সঙ্কট কাটতে পারে। এই দর্শনকে সরসভঙ্গিতে তিনি ‘আলুদর্শন’ নামে অভিহিত করেছিলেন। দর্শন আলোচনায় ভাষার সাহিত্যসম্পদও কি অনন্য-সুন্দর :

বঙ্কিমচন্দ্রের উদরদর্শন ঝাঁরা পাঠ করেছেন, আলু-দর্শন নাম শুনে তাঁরা চমকে যাবেন না আশা করি। উনিশ শতকের শেষের দিকে এই উদার বাস্তববাদী জীবন-দর্শন মানুষের মনে যে আশার সঞ্চার করেছিল, দুঃখের বিষয় তা আজ নস্যং হতে চলেছে। এই খাদ্যাভাব ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির দিনে অনেক অনুন্নত দেশে উদরদর্শনের পরিণতি হতে চলেছে উদর দংশনে। এই দংশন থেকে অব্যাহতি পাবার মহৌষধ নিহিত রয়েছে নব আবিষ্কৃত আলু-দর্শনে।<sup>১</sup>

ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়নের প্রবন্ধের নাম ‘শিক্ষকের দায়িত্ব’। তিনি যথাার্থে লিখেছিলেন : ‘আমার বিশ্বাস, যা অজ্ঞাত এবং রহস্যময় তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে শিক্ষকের এমন কতকগুলো দায়িত্ব রয়েছে যা কোন যন্ত্রপাতি দ্বারা পালন করা সম্ভব নয়। শিক্ষক যে সমবেদনা এবং অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে শিক্ষার কার্য করেন, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির মধ্যে তার সন্ধান করা বাতুলতা।’<sup>২</sup>

লেখকদের মধ্যে আর ঝাঁরা ছিলেন, তাঁরা হলেন : শামসুল আলম চৌধুরী, আবুল কাসেম ফজলুল হক, আল মাহমুদ, কামরুল আহসান, রফিক আজাদ, আবদুস সান্তার, রফিক ইসলাম, ইমরুল চৌধুরী, মালেকা বেগম, দিলারা রহমান, শাহ ফজলে রাবিব, আবিদুর রহমান, রশীদ আল ফারুকী, আহমদ ছফা, ফারুক আলমগীর প্রমুখ।

শামসুল আলম চৌধুরী তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের প্রভাষক। তাঁর প্রবন্ধের নাম ‘রবীন্দ্রনাথ : উত্তরকাব্যে ইমেজ ও উক্তি।’ এ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের পুনর্নত থেকে শেষ লেখা পর্যন্ত কাব্যসমূহের আলঙ্কারিক বিশ্লেষণ আছে। আবুল কাসেম ফজলুল হকের ‘আমাদের জাতীয় ভাবনা ভাবতে হবে আমাদেরকেই। অদৃশ্য নিয়তির হাতের ক্রীড়ানক হয়ে যদি এখনও আমরা আমাদের বহু যুগের সংস্কারের বন্ধন ছিন্ন করতে না পারি, তবে আমি কামনা করি—যত শীঘ্র পৃথিবী থেকে আমরা নিষ্কিছু হয়ে যাই ততই মঙ্গল।... আর ঝাঁচতে যদি আমাদের হয়ই, তবে নামেমাত্র পাকিস্তানি অথচ স্বভাবে সেই-চিরদুর্বল বাঙালি হয়ে বেঁচে থাকা কোন যুক্তিতেই উচিত নয়।’

কবি আবদুস সান্তার-এর ‘সে এক নারীর প্রেম’ উৎকৃষ্ট কবিতা। কবি হিসেবে রফিক আজাদ তখনও পরিচিতি লাভ করেননি। তরুণ রফিক আজাদ লিখেছিলেন ‘জনৈক প্রেমকাতর যুবকের সম্ভাব্য বক্তব্য’। রফিক আজাদের কবিতায় তখনকার সামাজিক হতাশার সুস্পষ্ট প্রকাশ আছে। তাঁর কবিতার কয়েকটি পংক্তি :

জ্যোৎস্নার বিখ্যাত ভিতরে আমারও একদা যাতায়াত ছিল/অবিশ্বাস্য অলৌকিক জ্যোৎস্নায় আবার ফিরিব কি?/ ফিরিবার বাসনা প্রবল, অথচ পথ জানা নেই। অন্ধকার অন্ধকার ;—চৌদিকে অন্ধকার ব্যতিরেকে অন্য

শব্দ/ মর্গাশ্রিত। বিষণ্ণতা ছাড়া দ্বিতীয় রাস্তা নেই কোন।/ এ সর্বগাঙ্গী বিষণ্ণ ইতর অঙ্ককার থেকে বুঝি আর/ মুক্তি নেই। সকলেই মুখোমুখি একেকটা সূতীক্ষ্ণা চাঁৎকার ছুঁড়ে দেয়। জনে জনে ব্যক্তিগত শিল্পকথনে ক্রমাগত/ অঙ্ককার জনিত দীর্ঘ দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে!

কবি আল মাহমুদের 'তৃষ্ণার ঋতুতে' শীর্ষক কবিতা কাব্যপ্রেমিকদের আনন্দ দিয়েছিল। তিনি তখন আধুনিক কবি হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছেন। তাঁর কবিতার কটি চরণ—

'শুধু কি ধূলোর পথ? কত দূর যাব আর হেঁটে/ এও তো রৌদ্রের দিন, ঝকমকে পিপাসার ঋতু/ জীবিকা বিজয়ী প্রাণ আজ যেনো মনে হলো ভীতু/ বিন্দুও পাবে না আর ব্যর্থ জ্বিভে জলপাত্র চেটে।/ মায়ের দেহের মতো চিরচেনা এই সে শহর।'<sup>৯</sup>

'শনিবারে নয়' আহমদ ছফার প্রথম পর্যায়ের মুদ্রিত লেখাসমূহের একটি। পরবর্তীকালে কথাসাহিত্যিক এবং প্রাবন্ধিক হিসেবে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। আবিদুর রহমান এই কালের পত্রপত্রিকায় অনেক লিখেছেন, দেখতে পাওয়া যায়। তিনি সুন্দরম 'ছায়াবৃত্ত' নামে একটি দীর্ঘ ছোট গল্প লিখেছিলেন। সাদাত হাসান মাস্টার গল্প 'একটি অবচেতন মুহূর্ত' অনুবাদ করেছিলেন রশীদ আল ফারুকী। সমারসেট মম থেকে 'সেই লোকটি' নামে গল্প অনুবাদ করেছিলেন ফারুক আলমগীর।

তরুণ সাহিত্যপ্রয়াসীদের সংকলন ছিল সুন্দরম। কিন্তু এটি কেবলই তারুণ্যজাত ক্ষণস্থায়ী বুদ্ধি ছিল না, আবেগও ছিল না কেবল, সাহিত্য-শিল্প ও সমাজনিষ্ঠ চিন্তার সম্পদেও তা সমৃদ্ধ ছিল। পাকিস্তানের রাষ্ট্রকাঠামোতে পূর্ব বাঙলার স্বতন্ত্র জাতীয়-চেতনার প্রতিফলন ঘটেছে এর রচনাবলির চেতনাগত নির্যাসে।

সম্পাদকীয়তে উদ্দেশ্য সম্পর্কে লেখা হয়েছিল :

তরুণ প্রাণের কর্মম্পৃহা আমাদের মনে সঙ্কলন প্রকাশ করার প্রবণতা জাগিয়েছিল। সম্প্রতি প্রকাশিত অসংখ্য সাময়িকী ও সঙ্কলন বিভিন্ন গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক মানসের পরিচয় বহন করে। আমাদের চিন্তা-ভাবনাকেও প্রকাশ করে আমাদের মধ্যে যেটুকু সাংস্কৃতিকচেতনা ও স্বজনক্ষমতা রয়েছে তার বিকাশ সাধন করব—এ উদ্দেশ্য নিয়েই বিভিন্ন সময়ে সঙ্কলন প্রকাশ করার ইচ্ছা আমাদের। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণে আমাদের সাংস্কৃতিক জীবন আজ বিপর্যস্ত। এ শুধু আমাদের দেশেই নয়, পৃথিবীর সব অনগ্রসর দেশের বেলায়েই একই কথা। শিল্প সাহিত্যে শুধু মানবজীবনের এবং ব্যক্তিমানসে বাহ্যশক্তির, প্রতিক্রিয়ার প্রতিচ্ছবি হিসাবেই আজ বিচার্য নয়। অর্থনৈতিক চাপের ফলে জীবনের সম্ভাবনা ব্যাহত হতে থাকলে ব্যক্তির মনে যে প্রতিক্রিয়া সূচিত হয়, তাই যেন আজ সাহিত্যে সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দিতে চাইছে। করণ বৃহত্তর গণজীবনের সমগ্র সত্তাকে আজ ঐ একটি জিনিসেই জড়িয়ে আছে। সমস্যাকে শুধু তুলে ধরার প্রবণতাই সর্বক্ষেত্রে প্রবল দেখতে পাচ্ছি। সমাধানের প্রতি ইঙ্গিতও আমরা করব বাঙলা সাহিত্যে। সুন্দরম আমাদের প্রথম প্রচেষ্টার ফল। আমাদের পূর্বসূরীদের লেখাও এতে সংযোজিত হয়েছে। একে সুন্দর করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছি। তবু যদি কারও চোখে অসুন্দর কিছু ঠেকে তবে তাঁর কাছ থেকে আশা করব ক্ষমা সুন্দর সহানুভূতি।

সুন্দরম এর প্রকাশক ছিলেন, সংস্থার পক্ষে মুহাম্মদ সাদুল্লাহ, বিজ্ঞাপন ব্যবস্থাপক শাহ ফজলে রাব্বী। কাজী মামুনুর রশীদ কর্তৃক দি মোনালিসা ফাইন আর্ট এণ্ড প্রিন্টিং প্রেস, ৫৫ পাতলা খান লেন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে অর্থ সংগৃহীত হতো। এব্যাপারে পত্রিকা কতজ্ঞতা স্বীকার করেছিল জনাব রেজা আলী, দিলারা রহমান, হাবিবুল ইসলাম



ভূয়া, রফিক আজাদ, এ.টি. এম. হাসান, আলম সিদ্দিকী, কাজী মামুনুর রশীদ, বুলবুল খান মাহবুব, নুরুল ইসলাম, কিসওয়ার জাহান, এস. এম. ফরিদ, কামরুল হুদা প্রমুখের প্রতি।

‘সুন্দরম্’ নামে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর ফেরদৌস সাজেদীনের সম্পাদনায় (৯৭২-৭৫ সময়কালে পাঁচ-ছয়টি সংকলন প্রকাশিত হয়। ‘তবু অনন্তজাগে’ নামে ফেরদৌস সাজেদীনের একটি উপন্যাসের ভূমিকায় আবুল কাসেম ফজলুল হক লিখেছেন : “মনে পড়ে, বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে... ফেরদৌস সাজেদীন ‘সুন্দরম্’ নামে একটি সাহিত্যপত্রিকা কিছুকাল ধরে প্রকাশ করেছিলেন।’ কিন্তু এই ‘সুন্দরম্’ও আজ দুশ্রাব্য।

## ৫. স্বাক্ষর

(১৯৬৩-৬৬)

চার বছরে মাত্র চারটি সংকলন প্রকাশিত হলেও সাহিত্যিক ও সামাজিক অগ্রগতির ইতিহাসে ‘স্বাক্ষর’-এর ঐতিহাসিক মূল্য কম নয়। সাতচল্লিশের পরে একান্তর পর্যন্ত এদেশ থেকে নিছক কবিতার নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার একটি পত্রিকার অভাব কোন প্রতিষ্ঠিত কবির দ্বারা পূর্ণ হয়নি। তাছাড়া তখনকার সৃষ্টিমুখর ‘সাহিত্যউদ্ভাস’-তরুণেরা তাঁদের প্রবল সৃষ্টি-আকাঙ্ক্ষার বাহন নির্মাণ করতে গিয়ে স্বাক্ষর প্রকাশ করেছিলেন। ‘স্বাক্ষর গোষ্ঠী’র তরুণেরাও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের ছাত্র। তাঁদের উচ্চাশা ছিল গগনচুম্বী। তাই উদ্যোগ নিয়েছিলেন ‘স্বাক্ষর প্রকাশনী’র পক্ষ থেকে পরে-পরে বিচিত্র বিষয়ের সমন্বয়ে নানান পত্রিকা প্রকাশের।

‘স্বাক্ষর’ এর দ্বিতীয় সংকলনের একটি বিজ্ঞাপনে বলা হয় : ‘ত্রৈমাসিক কবিতা পত্রিকা কণ্ঠস্বর’ প্রকাশিত হবে ইমরুল চৌধুরী ও রফিক আজাদের সম্পাদনায়। ‘ত্রৈমাসিক গল্পপত্রিকা শব্দরূপ’ প্রকাশিত হবে শহীদুর রহমান ও আসাদ চৌধুরীর সম্পাদনায়। মাসিক সমালোচনা পত্রিকা ‘বক্তব্য’ প্রকাশিত হবে চিত্ত হালদার ও মোহাম্মদ মোজাহ্দের এর সম্পাদনায়। ত্রৈমাসিক প্রবন্ধ পত্রিকা ‘সূচীপত্র’ প্রকাশিত হবে প্রশান্ত ঘোষাল ও আফজল চৌধুরীর সম্পাদনায়। ‘কণ্ঠস্বর’, ‘বক্তব্য’ ইত্যাদি প্রকাশিত হয়েছিল কিন্তু অন্য সম্পাদকের নামে ও নেতৃত্বে।

‘সাম্প্রতিক’ নামে ‘তরুণতম লেখকদের একমাত্র ব্যক্তিগত সাময়িকী’ প্রকাশের একটি বিজ্ঞাপনও ছাপা হয়েছিল স্বাক্ষরের তৃতীয় সংকলনে। এবং সত্যিই একটি সংকলন তখন (১৯৬৩-৬৫) প্রকাশিত হয়েছিল।<sup>১০</sup> এগুলোর ইতিহাসও একালের সমালোচকদের দ্বারা (ত্রৈমাসিক পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কবি-সাহিত্যিক, যারা একালে প্রতিষ্ঠিত লেখক) উন্মোচিত হয়ে থাকে। লিটল ম্যাগাজিনের ইতিহাসে, অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে স্বাক্ষর তার উল্লেখ দাবি করে। কারণ ষাটের দশকের প্রতিনিধিত্বশীল লিটল-ম্যাগাজিনের অন্যতম—বলা চলে, পথিকৃৎদের অন্যতম স্বাক্ষর। এঁদের উদ্যোগ পটভূমি তৈরী করেছিল ‘কণ্ঠস্বর’ কে দীর্ঘস্থায়ী একটি সাহিত্য প্রয়াস হিসেবে স্বার্থক হতে।

আবদুল মান্নান সৈয়দ 'লিটল ম্যাগাজিন' শীর্ষক একটি আলোচনায় বলেন : 'লিটল ম্যাগাজিন বৃহৎবপু নয়, জনপ্রিয় নয়, প্রাতিষ্ঠানিক নয়, সর্বাধিক নয়—এমন পত্রিকা।... লিটল ম্যাগাজিন মানে তারুণ্যের বিস্ফোরণ, অপ্রতিষ্ঠানিক চীৎকার, নূতন জয়মিতি ও ইশতিহার। সবসময় অবশ্য চীৎকৃত নয়—শান্ত নিঃশব্দ বিস্ফোরণও কখনো। সবসময় তরুণদের হাতে নয়—বৃদ্ধ কিন্তু অপ্রতিষ্ঠিত বা অস্বীকৃত অথবা বিদ্রোহী লেখকদের প্রয়োজনায়ও। কিন্তু লিটলম্যাগাজিনের আত্মায় মিশে আছে বিদ্রোহ। লিটলম্যাগাজিনের সম্পাদক ও তার দুচারজন মূল লেখকের রক্তে বিদ্রোহের তেজ ও জোশ আদিপ্র প্রজ্জ্বলন্ত না থাকলে সে লিটল ম্যাগাজিন থাকে না আর। প্রতিষ্ঠা বা প্রতিষ্ঠানলোলুপ সম্পাদক লেখক দিয়ে লিটলম্যাগাজিন হয় না। আপতবিদ্রোহী বা ছদ্মবিদ্রোহীদের দিয়েও হয় না। লক্ষ্যহীন লেখকদের দিয়েও হয় না। তার মানে প্রত্যেকটি প্রকৃত লিটলম্যাগাজিনের একটি নিজস্ব চরিত্র থাকে, বক্তব্য থাকে, লক্ষ্য থাকে। কিন্তু বক্তব্য বা লক্ষ্য, আদর্শ বা উদ্দেশ্য দিয়েই আবার লক্ষ্যভেদ করা যাবে না। তার সাহিত্যিক চরিতার্থতা চাই।'<sup>১১</sup>

ড. জিঞ্জুর রহমান সিদ্দিকী পূর্বমেঘ এ একটি 'চিঠি'তে পত্রিকার চরিত্র-বৈশিষ্ট্য প্রকারভেদ সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করেছিলেন। লিটলম্যাগাজিন প্রসঙ্গে তিনি বলেন : 'পশ্চিম মূলুকে—আপাততঃ আমি বিলেতের কথা ভাবছি—Little magazine বলে আর এক জাতের পত্রিকা আছে—এদের অবয়ব ছোট, আর হাঁকডাক সেই অনুপাতে বড়। এবং প্রায় অনিবার্য নিয়মে ক্ষণস্থায়ী। এরা সাহিত্যে দুচার বৎসর অন্তরই একটা ছোট, সরব ও সৃষ্টিশীলগোষ্ঠীর মুখপত্র হিসেবে গজায়, এবং কদিন আসর জমিয়ে যেমন অতর্কিতে আসে তেমন অতর্কিতে অদৃশ্য হয়ে যায়। আমাদের বাংলা মূলুকে এর সমগোত্রীয় পত্রিকার কথা ভাবতে গেলে কল্লোলের কথা মনে আসে।'<sup>১২</sup>

লিটলম্যাগাজিনের স্ট্যান্ডার্ড এর সেই বিবেচনায় মান্নান সৈয়দ গৎ যে সমস্ত ঐতিহাসিকতা আরোপ করে বিরাট কিছু বিদ্রোহ সংঘটিত করে ফেলার কথা বলেন ; এবং সেইসব প্রসঙ্গে 'স্বাক্ষর', 'কণ্ঠস্বর', 'সাম্প্রতিক' ইত্যাদি এবং 'লিটলম্যাগাজিন' এর উল্লেখ করে থাকেন—তাতে খুব অতিরঞ্জন আছে বলে মনে করার সঙ্গত কারণ আছে। কল্লোলের ভূমিকা এখনও বিতর্কিত। তবু 'কল্লোল' একটি লিটলম্যাগাজিন এর পরিমাপক হলে উপরোক্ত পত্রিকা সে তুলনায় খুবই সামান্য বলে স্বীকৃত হবে। তবু পূর্ব বাংলায় 'নাই মামার থেকে কানা মামা ভাল' কথাটার চল আছে বলেই স্বাক্ষর, সাম্প্রতিক, কণ্ঠস্বর কিছুছবনি প্রভৃতির গুরুত্ব 'অপরিসীম'।

'স্বাক্ষর' এর প্রথম সংকলন ১৯৬৩ তে বেরিয়েছিল 'পূর্ব বাংলার সাম্প্রতিক কবিতা আন্দোলনের প্রথম সংকলন' হিসেবে। ১৯৬৩ সনে এদেশ থেকে অনিয়মিত হলেও প্রকাশিত হচ্ছিল মাহেনও, দিলরুবা, আল-ইসলাহ, মোহাম্মদী, সংলাপ, পরিক্রম, সওগাত, সমকাল, পূর্বমেঘ, পূবালী প্রভৃতি পত্রিকা। সাহিত্যজগতে এমনসব উচ্চমানপত্রিকাবলি থাকা সত্ত্বেও সেই সময়ের সৃষ্টিশীল আবেগকাতর প্রতিষ্ঠাপ্রত্যাশী বিদ্রোহী, ভাঙনে বিশ্বাসী এবং নিজেদের রুচি-অভিরুচি-স্বপ্নকল্পনার চরিতার্থতায় অভিলাষী তরুণেরা অস্বস্ত হয়ে উঠেছিলেন এই

কারণে যে এই সমস্ত পত্রিকার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—‘ভারসাম্যময় ঐতিহ্যানুসরণকারী’। ঐরা প্রথাবিরুদ্ধতায় তেমন বিপ্লবী বেশ নিয়ে অগ্রসর হন না। তরুণেরা প্রথাগত আনুগত্যে অস্থিতিশীল। নতুন পরিবেশের প্রত্যাশী। তাই তাঁদের ঘোষণা হয় এই রকম :

একথা আজ বিনা দ্বিধায় বলা যায় যে, পূর্ববাঙলার সাহিত্যের এই ক্রান্তিকালে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার মতো দুঃসাহসিক পত্রপত্রিকা একটাও নেই। যাও দু চারটে সাহিত্যপত্রিকা আছে, তাতে তথাকথিত প্রতিষ্ঠিত মোড়লদেরই আধিপত্য। সেখানে তরুণতম অথচ নিরীক্ষণশীলদের প্রবেশাধিকার নেই। এই সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতেই তরুণতম নিরীক্ষণশীলদের মুখপত্র ‘স্বাক্ষরের’ আত্মপ্রকাশ। পরবর্তী সংকলন বর্ধিত কলেবরে মূল্যবান প্রবন্ধ, কবিতা, ছোটগল্প, ব্যক্তিগত বিস্ফোরণ এবং অল্পমধুর সাহিত্যোচ্চারণ নিয়ে আগামী তিন মাসের মধ্যেই বের হচ্ছে।

স্বাক্ষরে ঘোষণা দেওয়া হয় :

মানসিক পরিণতির দিক দিয়ে যারা নিকটশেষে বাস করছে—তেমন পাঠক-পাঠিকা, অভদ্র বিজ্ঞাপনদাতা, অসং এজেন্ট এবং স্বাক্ষর-গোষ্ঠী বহির্ভূত লেখকদের কোনরূপ সহযোগিতার প্রয়োজন নেই।<sup>১০</sup>

গোষ্ঠীর বাইরের কোনো-কোনো তরুণ লেখকের রচনা প্রকাশ করলেও কোনো প্রবীণের রচনা স্বাক্ষরে প্রকাশিত হয়নি। অভদ্র বিজ্ঞাপনদাতার বিজ্ঞাপনও নিশ্চয়ই তাঁরা প্রকাশ করেননি।

বলা দরকার, স্বাক্ষর বিজ্ঞাপন-ভিত্তিক পত্রিকা ছিল না। দুএকটি বিজ্ঞাপনের পয়সা আর নিজেদের গাঁট তাঁদের ভরসা ছিল। প্রথম সংকলনে একটাও বিজ্ঞাপন নেই। দ্বিতীয় সংকলনে আজিজিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা ও এফডিসি-র দুটো বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছিল। তৃতীয় সংকলনেও কোনো বিজ্ঞাপন নেই।

চতুর্থ সংকলনে ‘ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান’, ইস্টার্ন মার্কেটাইল ইন্সিওরেন্স, পিকাদেলী পেপার প্যারাডাইস, মল্লিক ব্রাদার্স, দিলদার, হোমিও হল, ইনাস করপোরেশন, ইস্টার্ন ফেডারেল ইউনিয়ন ইন্সিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড, এবং অলিমপিয়া জুয়েলার্স এর কয়েকটি বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছিল। পয়সা ঠিকমতো পাওয়া গিয়েছিল কিনা সেটাই প্রশ্ন।

তবে অনেক বিজ্ঞাপনদাতা তখন এবং এখনও লিটলম্যাগাজিন বা সাহিত্যপত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বিল ঠিকমতো পরিশোধ করেননা বলে রেওয়াজ আছে। ‘সুন্দরম’ এ বেশ কিছু বিজ্ঞাপন ছাপা হলেও সবগুলোর পয়সা পাওয়া যায়নি বলে সম্পাদক জানিয়েছিলেন। বিজ্ঞাপনের বিল পরিশোধে গড়িমসি, বড় অফিসে কমিশনিং প্রথা চালু আছে এখনও। এক্ষেত্রে বড় ব্যতিক্রম বোধ হয় ‘উত্তরণ’। অসংখ্য বিজ্ঞাপন ঐ পত্রিকায় রুচিশীল ভাষায় শিল্পসম্মতরূপে ব্লকডিজাইন, ছবি দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে। এবং ঐ পত্রিকার সম্পাদক বিজ্ঞাপনের পয়সা না-পাওয়ার কথা বলেননি, আর বিজ্ঞাপন ভালোই পেতেন বলে জানিয়েছিলেন। তাঁদের সামাজিক সংযোগ বড় মাপের ছিল।

স্বাক্ষরের ঘোষণা ছিল যে, তিনমাস অন্তর পরবর্তী সংকলন প্রকাশিত হবে। কিন্তু চার বছরে চারটি হয়েছে। তৃতীয় সংকলন ১৯৬৫ তে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় ও চতুর্থ সংকলন প্রকাশের তারিখ উল্লেখ করা হয়নি। মাঝখানে ১৯৬৪তে এবং পয়ষটি-পরবর্তীকালের

সংকলনটি ছেষ্ট্রিতে প্রকাশিত হয়েছিল বলে ধরে নিতে হবে। স্বাক্ষর কবিতাপত্রিকা, বুদ্ধদেব বসুর ‘কবিতা’র প্রভাব ঐদের ওপর সুস্পষ্ট। বুদ্ধদেব বসুর কবিতা পত্রিকার কথা ঐরা নানান আলোচনায় উচ্চারণ করতে খুব পছন্দ করেন। এবং ঐদের দাবি যে ‘কবিতা’র পূর্ববঙ্গীয় উত্তরসূরি ‘স্বাক্ষর’, ‘কণ্ঠস্বর’ ‘পূর্বলেখ’ প্রভৃতি। কিন্তু প্রথম সংকলনে কেবল ‘কবিতা’ ও কবিতা-বিষয়ক রচনা ছাড়া হলেও ঘোষণায় তাঁরা গল্প ইত্যাদি ছাপবেন বলে জানিয়েছিলেন।

তবে কিছু রচনা গদ্যে আছে, সেগুলোকে তাঁরা নিরীক্ষাধর্মী গল্প বলতে চাইলেও প্রকৃতপক্ষে তা শিল্পগুণসম্পন্ন কিছু হয়নি এবং এইগোষ্ঠীর তরুণেরা কবি হিসেবে উত্তরকালে প্রতিষ্ঠিত হলেও গল্পকার হিসেবে স্বার্থকতা লাভ করেননি।

রফিক আজাদ ও সিকদার আমিনুল হক প্রথম সংকলনের সম্পাদনা করেছিলেন। প্রকাশক ছিলেন সিকদার মোসাদ্দেকুর রহমান এবং প্রশান্ত ঘোষাল ১৫০ জগন্নাথ হল, ঢাকা থেকে। মুদ্রাকর : কে. এম. আহমেদ, অভিযান প্রিন্টিং হাউস, ৫৪ আগামসি লেন, ঢাকা-২। দাম পঞ্চাশ পয়সা। কোনো প্রচ্ছদকারের নাম লেখা ছিল না। তেমন জমকালো প্রচ্ছদও নয় তাঁদের। সাদা সিম্পলকাগজে লেখকদের নাম ১৮ পয়েন্ট অক্ষরে সাজিয়ে কবিতার স্তবকের মত করা হয়েছিল। পিছন কভারে সম্পাদকীয় ছাপা হয়েছিল। দেখতে তিন স্তবকের একটি কবিতার মতো। প্রথম কবিতার লেখক ইমরুল চৌধুরী। তারপর সিকদার আমিনুল হক, রফিক আজাদ, আসাদুল ইসলাম চৌধুরী, অশোক সৈয়দ, শহীদুর রহমান, মুশফিকুর রহমান, বুলবুল খান মাহবুব ও প্রশান্ত ঘোষাল, কাজী সিরাজ, আর মফিজুল আলম।

স্বাক্ষরের পরিচিতিরূপে পরবর্তী সংকলনে লেখা ছিল—‘পূর্বপাকিস্তানের তরুণতম কবি ও বুদ্ধিজীবীর সাম্প্রতিক রচনাবলীর দ্বিতীয় সংকলন’। এখানে ‘বুদ্ধিজীবী’ শব্দটির প্রয়োগ লক্ষণীয়। ষাটের দশকে এদেশে বুদ্ধিজীবী নিজেদেরকে ‘বুদ্ধিজীবী’ ভাবতে গর্ববোধ করতেন। ভারতের সমাজে তাঁরাই সেরা। এ থেকে তরুণীদের বুদ্ধিজীবী হবার সাধ। শিশুরা যেমন বাবার নকল করে। অর্থাৎ মুরব্বীদের ভূমিকাই এমন শব্দ প্রয়োগে উদ্বুদ্ধ করেছিল। বিস্তৃত ব্যাখ্যা করলে নানা মনস্কতার পরিচয় উদঘাটন করা সম্ভব হবে, তবে এখানে তার প্রয়োজন নেই। স্বাক্ষর একক সম্পাদকের পত্রিকা ছিল না। দ্বিতীয়টির সম্পাদনায় ছিলেন ইমরুল চৌধুরী ও প্রশান্ত ঘোষাল। স্বাক্ষর প্রকাশনার পক্ষে আসাদ চৌধুরী এটি প্রকাশিত করেন এবং তাঁর দ্বারাই শাহজালাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস ৯৭/২ সিদ্দিক বাজার, ঢাকা-২ থেকে মুদ্রিত হয়েছিল। প্রচ্ছদশিল্পীর নাম এবারে ছাপা হয় : আশীষ চৌধুরী। পৃষ্ঠা ৬৪। দাম ৫০ পয়সা।

স্বাক্ষরের সকল সংখ্যার সাইজই ১/১৬ ডাবল ডিমাই সাদা কাগজ, কোনোকোনোটর মান আরও উন্নত। দ্বিতীয়টির প্রচ্ছদ রুচিসম্মত, রচনাবলী মোটামুটি পরিচ্ছন্ন পঠনোপযোগী ছিল। কিন্তু প্রবীণ কবিসাহিত্যিকেরা এর ভাষা ও বক্তব্য অনুধাবনে অপারগ্ন ছিলেন (দূর্বোধ্য? বলে)। কল্লোলের যেমন বিরূপ সমালোচনা ছিল, ঐদের এবং ঐদের গ্রুপের কণ্ঠস্বর ও অপরাপর পত্রিকাগুলোকেও তেমনি পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তবে মাত্রাগত প্রভেদ অবশ্যই রয়েছে। ঐরা বাংলাদেশের পরিস্থিতিতে একটা নতুন স্বষ্টির প্রয়াস পেলেও তেমন কিছু করেননি বাংলা সাহিত্যে, তবে হাতেখড়ি দেবার জন্য, নিজেদের স্বকীয়

আবেগের মুক্তি সাধনের জন্যে, স্বাধীনতাভোগের জন্যে স্বাক্ষরের উদ্যান কার্যকর ভূমিকা রেখিছিল। বিদ্রোহ, বিক্ষোভ এবং কবিতার কাঠামো, ছন্দ, রূপক ইত্যাদি অলঙ্কার ও শব্দপ্রয়োগের ব্যাপারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা তথা অনুশীলনের অবকাশ স্বাক্ষর এনে দেয়ায় ষাটের দশকের প্রধান কবিগণ এতে আত্মপ্রকাশিত করতে পেরেছিলেন।

বলাবাহুল্য এদেশের প্রধান কবিগণ—ফররুখ আহমদ, আবুল হোসেন, সৈয়দ আলী আহসান সাতচল্লিশ-পূর্বকালেই আত্মপ্রতিষ্ঠ হবার সুযোগ পান। শামসুর রাহমান, হাসান হাফিজুর রহমান, আলাউদ্দীন আল আজাদ, আবুজাফর ওবায়দুল্লাহ, মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, আবুহেনা মোস্তফা কামাল প্রমুখ পঞ্চাশ দশকের প্রসূণ। আল মাহমুদ, শহীদ কাদরী পঞ্চাশ-ষাটের সন্ধিক্ষণেই বেড়েছিলেন। এরপর কবি হিসেবে খ্যাতি ও স্থিতি লাভের অধিকারী রফিক আজাদ, আসাদ চৌধুরী, সিকদার আমিনুল হক প্রমুখ স্বাক্ষরেরই কর্ণধার। রফিক আজাদই প্রধান উদ্যোক্তা, তাঁর উৎসাহী-উদ্যোগে ঘণীভূত হয়েছিলেন স্বাক্ষরের লেখক সম্প্রদায়, তথা ‘গোষ্ঠী’। আসাদুল ইসলাম চৌধুরীর নাম সংক্ষেপ করে আসাদ চৌধুরী করা—সেটাও রফিক আজাদেরই খেয়ালীসিদ্ধান্ত। কিন্তু সেদিনের খেয়াল আজ চরম সত্যে পরিণত, আসাদুল ইসলাম চৌধুরী স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকর্ডপত্রে আর অফিস-আদালতের কাগজেই সীমাবদ্ধ। কাব্যরস-পিপাসুদের মন-মনান্তরে ব্যপ্ত কেবল ‘আসাদ চৌধুরী’।

দ্বিতীয় সংকলনে যেসকল তরুণের কবিতা ছাপা হয়েছিল তাঁরা হলেন : সিকদার আমিনুল হক, রফিক আজাদ, অশোক সৈয়দ, ইমরুল চৌধুরী, আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, আসাদ চৌধুরী, শহীদুর রহমান, মফিজুল আলম, আফজাল চৌধুরী, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (অনুবাদ), হায়াৎ মামুদ (অনুবাদ) ; শাহজাহান হাফিজ (অনুবাদ) ও মোহাম্মদ রফিক (অনুবাদ)। প্রশান্ত ঘোষাল (পুস্তক পরিচিতি) ও ইমরুল চৌধুরীর ‘সাম্প্রতিক কবিতা : চকিত দৃষ্টি’ দুটো গদ্য ছিল। এতে স্বাক্ষরের সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। তাছাড়া ডিলান টমাস থেকে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, ফেদারিকো গারথিয়া থেকে হায়াৎ মামুদ, বার্নার্ড স্পেন্সার থেকে শাহজাহান হাফিজ, রাইনাক মারিয়া থেকে মোহাম্মদ রফিক (কবিতার) অনুবাদ করেছিলেন।

তৃতীয় সংকলনের সম্পাদক ছিলেন আসাদ চৌধুরী ও প্রশান্ত ঘোষাল। ১৯৬৫ সনে মুহাম্মদ মুজাহিদে ২৫৭ নং এলিফ্যান্ট রোড সাউথ ধানমণ্ডী থেকে প্রকাশ করেছিলেন। মুদ্রক ছিলেন প্রবাহ মুদ্রায়ণ ৩৭ আগামসি লেন ঢাকার আবদুস সালাম। মূল্য পঞ্চাশ পয়সা, পৃষ্ঠা ৫৬। এতে কবিতা লিখেছিলেন মফিজুল আলম, আফজাল চৌধুরী, হায়াৎ মামুদ, শাহজাহান হাফিজ, রফিক আজাদ, আসাদ চৌধুরী, শওকত আনোয়ার, শহীদুর রহমান, মোহাম্মদ রফিক, জিনাত আরা মালিক, আবদুল মান্নান সৈয়দ, সিকদার আমিনুল হক, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, সাযাদ কাদির, হায়াৎ সাইফ, সন্তোষ হালদার, প্রশান্ত ঘোষাল, আবু কায়সার ও ইমরুল চৌধুরী। অ্যালেন গীন্সবার্গ, লরেন্স ফার্লিং

হেটি থেকেও অনুবাদ ছাপা হয়। একজন অনুবাদক মাহবুবুল আলম। জাবেদ চুঘতাই-র সাহিত্যসংক্রান্ত ভাবনার একটি অনুবাদও ছাপা হয় এতে (অনুবাদক অনুষ্ঠ)।

চতুর্থ সংকলনের সম্পাদক ছিলেন রফিক আজাদ ও রণজিৎ পাল চৌধুরী। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস কর্তৃক ১ অক্ষয় দাস লেন, ঢাকা-৪ থেকে প্রকাশিত এবং হক্কানী আর্ট প্রেস, ১/৩ দেবেন্দ্র দাস লেন, ঢাকা-১ থেকে জয়নাল আবেদীন আহমদ কর্তৃক মুদ্রিত। এটির প্রচ্ছদ ঐক্যেছিলেন প্রাণেশ মণ্ডল। মূল্য পঞ্চাশ পয়সা। পৃষ্ঠা ৪৮। কবিরী হলেন : আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, জিনাত আরা রফিক, সাযাদ কাদির, মোহাম্মদ রফিক, মফিজুল আলম, আবু কায়সার, আলতাফ হোসেন, আবুল হাসান, হুমায়ুন কবির, আফজাল চৌধুরী, মুস্তফা নূরউল আমিন, আসাদ চৌধুরী, কাজী সাহিদ হাসান, মাহবুব হোসেন খান, সিকদার আমিনুল হক, সৈয়দ আবু আকরাম, ফরহাদ মজহার, শওকত আনোয়ার, আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, আবদুল মান্নান সৈয়দ, রফিক আজাদ, রণজিৎ পাল চৌধুরী।

স্বাক্ষরের তরুণ কবিদের রচনায় আবেগের অভিব্যক্তি ঘটেছে বিভিন্ন ছন্দ-প্রকরণ ও আঙ্গিকে। তবে এতে সমকালীন অবক্ষয় ও হতাশার পরিচয় পাওয়া যায়।

শহীদুর রহমানের 'রুগ্ন আত্মার ভাষণ' শীর্ষক কবিতার কটি চরণ :

আমরা যাদের নেই কিছুতে বিশ্বাস শূন্যভক্তি  
মিথ্যের মোড়ক বিপন্ন বিষণ্ণ যারা বন্ধুতা  
নেই একদিন মরণের ঐহু মম শ্যাম সমান  
এতেক জেনেও তবু বেঁচে থাকতে চাই এবং আমরা  
কতকগুলি নরনারী পরস্পরকে যৌন প্রহার কোরে  
বুকে হাত রেখে নিজেই বুকের ধুকপুকুনি শুনি  
এবং অনন্তকাল শূনে যেতে চাই আমরা আরো জানি  
অদ্যাবধি আমাদের বর্তমান ব্যাখ্যানবিহীন যেহেতু  
অতীত থেকেও নেই ভবিষ্যত দর্শনীয় নয়  
আমরা জেনেছি যারা করজোড়ে একদিন  
সত্যগ্রহ মৃত্যু পাওয়া যাবে।<sup>১৪</sup>

তৃতীয় সংকলনের রফিক আজাদকৃত একটি কবিতা (জরাগ্রস্তদের স্বগোতোক্তি) :

ডাক্তার ও নাসহীন এই চিকিৎসা আলয়ে  
আমিও রয়েছি পড়ে একুশ বছর :  
আমার শরীরে হয়, লুকিয়ে রয়েছে এক দুরারোগ্য  
রোগের জীবাণু, শিরা-উপশিরাব্যাপী, রক্তকণিকায়—  
জাগ্রত অবস্থায় কিংবা ঘুমথোর বেদনায়  
আকণ্ঠ তৃষ্ণায় কাংরে বহুবীর  
শীর্ণহাত বাড়িয়েছি যাহাদের প্রতি—  
অস্পষ্ট ছায়ার মত তারা সব শব্দহীন দূরত্ব গড়েছে :  
সঁগাতসঁগাতে পরিপার্শ্বে, ঘণাহত, বমির নোংরায়  
আজীবন পড়ে আছি  
কারো বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত হয়নি আমার দিকে  
এমনকি, পাইনি শীতল জল, এক ফোঁটা।<sup>১৫</sup>

‘নভেম্বরের পূর্ণিমায় রচিত আত্মাবিষয়ক গদ্য’ শিরোনামে আসাদ চৌধুরী ঐকে দিয়েছিলেন তরুণমনের প্রকৃতচিত্র—

আজ্ঞা সে বিশ্বাস করে  
শিশুগণ অমলিন আত্মার ইশ্বর  
তাহাদের বুকে  
গোলাপের উদ্যান রয়েছে  
একদা তাহারও ছিল  
কখনো, যদি, তাহার বিশ্বাস  
অধুনা সে আত্মাহীন বিমর্ষ যুবক  
অবিস্ট আত্মাহীন রমণীর প্রেম,  
তাহার নিঃশ্বাসে  
যে কোনো পুষ্পের মৃত্যু হতে পারে  
তো সে এতদিন মৃত ভাতে  
বাসী তরকারীতে ভরেছে উদর তার  
এমনকি নিজস্ব শিল্পবোধও উচ্ছিন্ন  
সে তার বিকৃত আকাঙ্ক্ষার দিকে  
মৃত বিমাতার রক্তহীন, উত্তাপহীন, শীতল হাত বাড়ায়  
সে তার উদ্যানকে খোঁজে পাগলের মত  
দেহহীন, গন্ধহীন, কোন যুবতীর খন্দরের শাড়ী  
যদি পেয়ে যায়,—যদি, কপালের ভাজ থেকে  
মুঁচিবে ঘামের চিহ্ন, সযতনে।<sup>১৬</sup>

### ৬. স্বদেশ

(১৯৬৩-৭০)

‘স্বদেশ’ নামে দুপর্নায় বহুর চারেক একটি সাহিত্য সাময়িকী প্রকাশিত হয়েছিল। ঐরা নানা বিষয়ে বহু রচনা প্রকাশ করেছিলেন, আর বাঙালিদের সামনে স্বদেশপ্রেমের আবেদন— আকৃতি নিয়ে উপস্থিত হয়ে সামাজিক দায়িত্ব কিছু হলেও পালন করতে চেয়েছিলেন। সাময়িকপত্রের ইতিহাস থেকে ঐদের উদ্যোগকে তাই নির্বাসন দেয়া চলে না। প্রথম পর্যায়ের ‘স্বদেশ’ এর প্রথম সংখ্যা ‘সাহিত্য বার্ষিকী’ হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিল মফিজউদ্দিন আলী মহাম্মদ চৌধুরীর সম্পাদনায়। এটি প্রকাশিত হয় ভদ্র-আশ্বিন ১৩৭০ সনে। কালাচাঁদ বসাক কর্তৃক নারায়ণ মেশিন প্রেস, ১৩৪ নবাবপুর রোড, ঢাকা-১ থেকে মুদ্রিত ও সম্পাদক কর্তৃক ৩৪ জিন্নাহ এভিনিউ, ঢাকা ২ কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছিল। নিউজপ্রিন্ট কাগজ, ভালো ছাপা-বাঁধাই ডিমাই ১/১৬ সাইজ পৃষ্ঠা ১৫৬।

এতে মহিউদ্দীন কবিতা লিখেছিলেন (ভিক্ষু)। কামালউদ্দীন লিখেছিলেন একটি উত্তম প্রবন্ধ ‘ধর্মের বিপক্ষে ও স্বপক্ষে’। আরও লিখেছিলেন কাজি আম্ফসারউদ্দীন আহমদ (গল্প, চাওয়া-পাওয়ার ফুল) ; দিলদার খান (ছড়া, শ্যালিকার পূর্বরাগ) ; ফররুখ আহমদ (মহাকবি ইকবাল থেকে অনুবাদ) ; সৈয়দ আলী আহসান (কবিতা, স্বপ্নের জটলা) ; রথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী (কবিতা, কুকুরটা) ; পাক দ্য জিন (গল্প, নীল আকাশের নীচে ; অনুবাদ—জামসেদ চৌধুরী) ; আবদুস সাত্তার (কবিতা, আমার এ-দেশ) ; শফিক চৌধুরী (ছোট

কবিতা); মুহাম্মদ সফিযুল্লাহ (রম্যরচনা, গুরুচণ্ডালী); আবদুর রহমান (রম্যরচনা, ঢাকা); প্রজেশকুমার রায় (ব্যক্তিগত নিবন্ধ, যেকথা যায় না তোলা); মুহাম্মদ সিদ্দিক খান (প্রবন্ধ, ফারায়জী আন্দোলন); মুহাম্মদ মনসুরউদ্দীন (প্রবন্ধ, মোহাম্মদ কাসেম-জৈনক লেখক); এস. ওয়াজেদ আলি (স্মৃতি, ছেলেবেলার কথা); নূপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় (প্রবন্ধ, কবি নজরুল); পারভীন তাহমিনা খানম (ভ্রমণ, নতুন জীবনের পথে); আহমদ পারেছউদ্দীন (গল্প, নারী চরিত্র); অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, (প্রবন্ধ, ধর্ম ও নৈতিকতা); খাজা আহমদ আকবাস (গল্প, লক্ষ্মী, অনুবাদ : কাজী মাসুম); রথীন্দ্রঘটক চৌধুরী ও সুকেন্দ্রনাথ ঘটক (সনেটের ইটপাটকেল); টমাস ম্যান (গল্প, সেই অসাধারণ মেয়েটি); আবদুল জব্বার খান (আলোচনা, চলচ্চিত্র ও প্রতিক্রিয়া); কাজী আবুল হোসেন (গল্প, যেদিকে তাকাই); তালিম হোসেন (কবিতা, আমার দেশ); শাহেরজাদা (কবিতা, বিকেল পাঁচটা); এস. কবিরুল ইসলাম (কবিতা, মৃত্যুক্ষণ); আহমদ আলতামাস (কবিতা, ছোট কবিতা); নানা শামসুল ইসলাম (কবিতা, আমার কথা); কাজী জহুরুল হক (কবিতা, প্রেম); দুর্গেশ পত্র নবিশ (গল্প, একটি সঙ্গীত); শেখ নঈম (কবিতা, ওরা); খলিল জিবরান (কবিতা, আত্মার আর্তনাদ); সুবোধ কুমার রায় (কবিতা, মানভঞ্জন) প্রমুখ। 'সমকালীন সাহিত্য সংবাদ' কলামে ১৯৬৩ সনের সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত বাংলাবিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ-র উপর আলোচনা আছে।

নতুন বই বিভাগে 'নৌফেল ও হাতেম', 'ছায়াহরিণ', 'চরভাঙাচর', 'দৃষ্টি', 'শিবির জীবনের দিনগুলি', 'আলোছায়া', 'নাথিংনেস' প্রভৃতি বইয়ের উপর আলোচনা ছাপা হয়েছে। এগুলো লিখেছিলেন অরুণ আহমদ, শামসুদ্দীন হায়দার, আমীর আহমদ, ফরিদ চৌধুরী প্রমুখ।

এই সংকলনের 'বাংলা ভাষা' শীর্ষক রচনায় ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর প্রখ্যাত উক্তিসমূহ উদ্ধৃত করে বাংলাভাষার চিরস্থায়িত্ব সম্পর্কে, মাতৃভাষার চর্চার পক্ষে এবং ভাষা-বিতর্কে পাক-বাংলা সৃষ্টির মতকে খণ্ডন করে আরবি-ফার্সি ও সংস্কৃত শব্দবহুল প্রচলিত বাংলাভাষার পক্ষে মতামত দেওয়া হয়েছে। এবং সংস্কৃত এবং আরবি-ফার্সি শব্দ গ্রহণ-বর্জনে সংস্কৃতপন্থী ও মুসলমানি বাংলার স্বপক্ষদের উদ্দেশ্য করে মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর মতামত তুলে ধরা হয়।

ভাষা-রীতি সম্বন্ধে পত্রিকার মতে এটাই শেষ কথা এবং এই সমস্ত বিতর্কের প্রেক্ষিতে বলা হয় : 'বাস্তবিক আমরা এক অর্জুত আহাম্মকের স্বগেই বাস করছি বটে।'

'স্বদেশ'-এর পরবর্তী সংখ্যা বের হয় ১৩৭১ সনের কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে দ্বিমাসিক সাহিত্য পত্রিকা হিসেবে বর্ষ ও সংখ্যাচিহ্ন ধারণ করে। প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩৭১, দ্বিতীয় সংখ্যা পৌষ-মাঘ ১৩৭২; তৃতীয় সংখ্যা ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৭১; চতুর্থ সংখ্যা বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৭২ সনে। পঞ্চম ও ষষ্ঠ সংখ্যা প্রকাশিত হয় যথাক্রমে আষাঢ়-শ্রাবণ ও ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৭২ সনে। এই পর্যায়ে দি আইডিয়াল প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১১৮ ঋষিকেশ দাস রোড, ঢাকা-১ থেকে মীর হাসান আলী কর্তৃক মুদ্রিত ও সম্পাদক কর্তৃক 'কপোতাক্ষী' ৩৪ জিন্নাহ এভিনিউ, ঢাকা-২ থেকে প্রকাশিত হয়। ডাবল ডিমাই ১/১৬ নিউজ প্রিন্ট; প্রচ্ছদশিল্পী কাজী শামসুল আহসান।



তবে পত্রিকার মান সাধারণ মাপের ও স্ট্যান্ডার্ডের হয়েছিল। অনেক রচনা এই ছয়টি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। যদিও এঁদের ঘোষিত কোন আদর্শ ছিল না। তবে সমকালীন চিন্তাধারা থেকে তাঁরা দূরে সরে থাকতে চাননি।

সে যাহোক, স্বদেশের অন্যান্য সংখ্যাতে রবীন্দ্রনাথের রচনা পুনর্মুদ্রণ (সৃষ্টির আত্মগ্লানি) ছাড়াও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা প্রকাশিত হয়েছিল।

টাইফাস আন্তন শেকভ এর অনুবাদ; আর মুহম্মদ সফিযুল্লাহ (চীনা উপকথা থেকে); মবিনউদ্দীন আহমদ (ধারাবাহিক উপন্যাস—মায়াকাননের ইতিহাস); জাহাঙ্গীর চৌধুরী, কামাল চৌধুরী, মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, আহমদ পারেছউদ্দীন (উপন্যাস, জীবন থেকেও বড়); জহরুল হক, লালা এস. ইসলাম, মহিউদ্দীন, জঁয়াল সার্ত, রিচার্ড রগেন, আজহারুল ইসলাম, সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র, সৈয়দ আলী আহসান, মোহিতলাল মজুমদার, স্যা জঁ পের্স, মকফী, হামেদ আহমদ, শামসুদ্দীন আবুল কালাম, জাস্টিস এ. এস. চৌধুরী, ফয়জুল্লাহ মতিয়া বানু, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, কাজী আবুল কাসেম, সেন জায়ম্যে দে শ্রে, আহসান হাবীব, সমারসেট মম, ম্যাক্সিম গোর্কী, কে. এম. শমসের আলী, বেগম জেবু আহমদ, আ.ন.ম. বজলুর রশীদ, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় (পুনর্মুদ্রণ), শ্রীপদ জোসী (পুনর্মুদ্রণ); আতাউর রহমান, আবদুল করীম (গান), মুহম্মদ আবদুল হাই প্রমুখ লেখকের বিভিন্ন ধরনের অনেক রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। আহমদ পারেছ উদ্দীনের জীবন থেকে বড়; মবিনউদ্দীন আহমদ—এর ‘মায়াকাননের ইতিহাস’ এবং হামেদ আহমদ এর ‘কল-কল্লোল’, মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনের শিরণী এবং কামাল চৌধুরী ও জাহাঙ্গীর চৌধুরীর গুচ্ছ-গুচ্ছ কবিতা আর অসংখ্য স্মরণীয় বাণীতে স্বদেশ ভরা থাকতো।

তবে পত্রিকার ভাষাতে সাধু-চলিতের, শুদ্ধ-অশুদ্ধের মিশ্রণ থাকতো। লেখা ও লেখকের নামের বিন্যাসেও ঐক্য নেই। লেখকের নাম কোথাও শিরোনামের নীচে, কোথাও উপরে। রচনার পরিসর ছোট্ট, বৈচিত্র্য আনতে চায় এবং সাহিত্যের আনন্দ ও মনের খাদ্য সরবরাহ করতে চায় পাঠককে।

তাই বলে রাজনীতির ব্যাপারে তাঁরা একেবারে সরকার ঘেঁষা ছিলেন না। শিক্ষা-কমিশন, ছাত্র-রাজনীতি, পাকিস্তানি শাসক ও শোষকদের নিয়ে মুহম্মদ সফিযুল্লাহর ব্যঙ্গাত্মক একাঙ্কিকা ‘ঝকমারী’ এর উদাহরণ। পত্রিকা নতুন নতুন লেখার পরিবর্তে ধারাবাহিক এবং একই লেখকের পৌনপুনিক উপস্থিতি ক্লাস্তিকর। পত্রিকা হিসেবে নিম্নমানের হবার কারণ এটাই। তাছাড়া কামাল চৌধুরী ও জাহাঙ্গীর চৌধুরীর গাদা-গাদা অতি সাধারণ রচনাও এতে ক্লাস্তিকর।

অন্যশিল্পীর আঁকা ডি. এইচ. নরেন্দ্রের ছবি ও উজ্জি, জয়নুল আবেদীনের আঁকা রঙীন ছবি, পিকাসোর ছবি, আছে। জেমস জয়েস, আলবেয়ার কামু, আর্দ্রেজিড, স্টিফেন স্পেন্ডার, আলডায়াস, হার্লি, জঁয়াল সার্ত, ঠাকুরদাস মখোপাধ্যায়, মহাত্মাগান্ধী, গুস্তাভ ফ্লবেয়ার, বেগম রোকেয়া, ইউজিন আয়োনেস কো, হজরত মুহম্মদ (দঃ), পি. সি. রায় প্রমুখের বাণী, উজ্জি উদ্ধৃত করে, প্রতি সংখ্যায় বিচিত্র ছবি ও ইংরেজী-বাংলা উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁরা মানবতা ও শিল্প সাহিত্যের আদর্শ প্রচার করেছিলেন।

আসকার ওয়াইল্ড গ্লীল-অগ্লীল সম্বন্ধে বলেন : ‘গ্লীল, অগ্লীল? জানি নে, জানি নে! কিছু বই সুলিখিত, কিছু বই কুলিখিত, এইমাত্র আর কিছু নয়।’<sup>১৭</sup>

### প্রিন্স ওকাকুজোর উক্তি

প্রত্যেক জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ আত্মপ্রকাশ হচ্ছে শিল্পকলায়। কেননা শিল্পকলার মধ্য দিয়েই মানুষের অন্তর প্রকাশিত—শিল্পের বাণী সর্বলোকে বরণীয়।

—উদ্ধৃত করা হয়। আরও বলা হয় :

জীবনের অসীম কর্মব্যস্ততা, অনন্তজালা ও ঝঞ্জাটের মাঝে আমাদের কাব্যলক্ষ্মী যে ক্ষণিকের তরে এসে তার ঝিলিক দিয়ে যান, এইত জীবনে চরম পাওয়া। এ আনন্দ দীর্ঘ। ক্ষণস্থায়ী শূধু তাদেরই কাছে যারা মামুলী। জীবনের কোন এক প্রভাতে যদি ক্ষণিকের তরেও আলোর স্পর্শ পেয়ে থাকি—সুন্দরের গান গেয়ে আজ্ঞেও আমরা সেই পথে চলবো। লক্ষ্যহীন হবোনা, দিশাহারা হবো না, এই আমার প্রতিজ্ঞা। শূধুমাত্র আমারই কেন, আমাদের সকলেরই প্রতিজ্ঞা।

স্বদেশে প্রসিদ্ধ উদ্ধৃতিটি কার? এজরা পাউন্ডের? আরও অনেক উদ্ধৃতিতে তাঁদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন—যেমন :

স্বদেশের প্রতি সামান্য অনুরাগ থাকিলেই যে দেশানুরাগ হয়, তাহা নহে; স্বদেশের প্রতি বিশেষ অনুরাগ চাই : সেই বিশেষ অনুরাগই দেশানুরাগ ব্যাচ। স্বদেশের প্রতি সামান্য অনুরাগ কি? না স্বদেশকে অন্যান্য দেশের সহিত সমানভাবে ভালবাসা। স্বদেশের প্রতি বিশেষ অনুরাগ কি? না অন্যান্য দেশ অপেক্ষা স্বদেশকে অধিক করিয়া ভালবাসা। স্বদেশের প্রতি এই যে বিশেষ অনুরাগ ইহাই প্রকৃতরূপে দেশানুরাগ শব্দে ব্যাচ্যে।<sup>১৮</sup>

### রবীন্দ্রনাথের উক্তি :

আর কিছু না পার যে কোন একটি পল্লীর মাঝখানে বসিয়া যাহাকে কেহ কখনও ডাকিয়া কথা কহে নাই, তাহাকে জ্ঞান দাও, আনন্দ দাও, আলো দাও, তাহাকে সেবা কর। তাহাকে জানিতে দাও মানুষ বলিয়া তাহার মাহাত্ম্য আছে।<sup>১৯</sup>

Love I mankind can only be reached through love of ownes country. Yevgeny yevtushenks. জঁয়া পল সার্ভ—এর উক্তি—প্রথম কর্তব্য : এর দুটি লাইন : “আমার মতে আজকের দিনে সংস্কৃতির জগতে সহ-অবস্থান-নীতির আরোপ হলো প্রথম কর্তব্য। প্রাচ্য আর পাশ্চাত্যের মিলন হবে প্রধান উদ্দেশ্য। এদুয়ের সংস্কৃতিতে হওয়া উচিত নয় সংঘর্ষ। হওয়া চাই মিলন।’ আবার সার্ভেরই অপর উক্তি ;

আমি নিজেকে সমাজতাত্ত্বিক বলে মনে করি এবং সমাজতত্ত্ববাদের প্রতিষ্ঠায় আমার সহানুভূতি থাকবে সব সময়। তার জন্যে আমরা যদি কেউ দোষ দেয় তাতে আমি কিছুই মনে করব না। সমাজতত্ত্ববাদের প্রতি আমার আগ্রহ ও সহানুভূতি থাকবে চিরকাল।

জঁদের উক্তি : ‘শ্রেষ্ঠ শিল্পী মাত্রেই বিদ্রোহী, তাঁরা উজান বেয়ে চলেন।’

এই সব দ্বারা তাঁরা সমাজতন্ত্রের প্রতি আস্থা ব্যক্ত করেছেন। পাশাপাশি সাহিত্য সংস্কৃতি ক্ষেত্রে পাকিস্তানকে ভালবাসা এবং স্বদেশ হিসেবে একে গ্রেম করা, ইসলামি আজানের গানকে ভাললাগা, এবং যৌনতাকে নিন্দা করার রীতিও লক্ষণীয়।

পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের প্রখ্যাত পণ্ডিত-বুদ্ধিজীবীদের ব্যাপক উদ্ধৃতি চয়ন থেকে এবং রচনাংশ উদ্ধৃত করার প্রবণতা থেকে বোঝা যায় এঁরা উদার মানবতাবাদী। তবে রচনার সাহিত্যিক পরিবেশন, শৈল্পিক মান অত্যন্ত গতানুগতিক। মোহাম্মদী, সওগাত ও অপরূপ সাহিত্যপত্রিকার মাপকাঠিই এঁদের কাম্য। কিন্তু তাও হয়নি। সমকালীন সাহিত্য-স্বন্দেহে

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার রোমান্টিক বা যৌনাত্মক অংশ উদ্ধৃত করে ব্যঙ্গ বা আক্রমণ করেন অগত্যার মতো—যেমন : ‘সমস্ত ভাষান দিলুম সমস্ত উড়াল’ শীর্ষক কবিতার (অশোক সৈয়দ পূর্বমেঘ, এর) ‘বেশ্যারা একমাত্র বেশ্যারাই প্রতিটি শিল্পের দাম দিতে জানে’ উদ্ধৃত করে বলেছেন : ‘রাজশাহীতে এত কাণ্ড চলিতেছে, জানিতাম না। এখন জানিতে বাসনা ইনি কি কখনও পাবনায় ছিলেন?’

যৌনাত্মক রচনাংশ নিয়ে অপসংস্কৃতি প্রতিরোধের পরিবর্তে অশ্লীলতা, যৌনতা নিয়ে তামাশা করতে এঁরা আনন্দ পান বলে মনে হয়। প্রাক পাকিস্তান যুগের ইসলামি ধারার কবি কামাল চৌধুরীর এই কবিতাটি স্বদেশের প্রিয়?

‘পাকিস্তানের নরম মাটির বড় ভালবাসি মোরা  
ভালোবাসিতাম জামদানী শাড়ী, আউশ আমন, বোরো  
তারি বুকু রাখি আমাদের বুক শূনি ফজরের গান;  
চুমু দিয়ে এই মাটির অধরে শুরু হয় অভিযান।’

সমকালীন সাহিত্যসমালোচনার বিভাগে (সাহিত্য সন্দেশ) আবদুল হকের ‘জাতীয় চরিত নামা’র প্রসঙ্গে : ‘খালেদ, মুসা, অথবা তারেক মহাবীর, ইকবাল মনীষী। কিন্তু তাঁরা বাঙালীর বীর ও বাঙালীর মনীষী নন। খালেদ মুসা তারেকের চাইতে বরিশালের এ.কে. ফজলুল হক চট্টগ্রামের কাজেম আলী আমাদের অনেক আপন।’—বেশ কথা। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থা, বাঙলা একাডেমী এবং বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড কি তাহা মানিবেন? ব্যঙ্গ-রঙ্গাত্মক অনেক সমালোচনা আছে—যার অর্থ অনেকটা নিছক হাসিরই কারণ বটে।

তবে এই সমস্ত চুটকী জাতীয় উদ্ধৃতি ও সেসম্পর্কে মন্তব্য দ্বারা নিরুৎসাহিত করা হয়েছে মহিলা লেখকদের অকৃত্রিম ভাব-প্রকাশের প্রবণতাকে, যেমন :

‘কথায় আছে মেয়েদের সবকিছু বলিতে নাই। তবু এক মহিলা-কবি দেখিতেছি লিখিয়াছেন ;

আমি কি পারি না,  
ঝরিয়ে ছিটিয়ে ছড়িয়ে দিতে আমার  
বেহিসেবী ফুলে আর সুগন্ধে আমাকে?...  
মনে করি এঞ্চুপি এই মাটির টবটাকে ভেঙ্গে চুরে  
মিশে যাই বনে প্রান্তরের সহস্রের দলে,  
আমার বুকু যে অরণ্যের গান।

তাছাড়া বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত ভালোভালো লেখার অংশ উদ্ধৃতিসহ মন্তব্য দ্বারা পাঠকদের আনন্দ দেওয়ার উদ্দেশ্যে অনেক পুরাতন রচনার পুনর্মুদ্রণ স্বদেশ করা হয়েছে। ‘সাহিত্য স্বদেশ’-এর একটি উক্তি :

বিখ্যাত সাহিত্যপত্রিকাসমূহের সম্পাদকেরা এখন অধিকতর তরুণ সাহিত্যপ্রয়াসীদের নিকট নিরেট হাসির পাতে পরিণত হয়েছেন। প্রগতিশীল সাহিত্য পত্রিকাসমূহের কোন প্রকার প্রভাব নেই পাকিস্তানের সাম্প্রতিক সাহিত্যদোলানের উপর। মাহেনও মোহাম্মদীর কথা বলিতে পারি না। কিন্তু সমকাল, পূবালী, পলাশ? হায় পরিক্রম?

## স্বদেশ দ্বিতীয় পর্যায়

(১৯৬৯-৭০)

‘স্বদেশ’ নামে মাসিক সাহিত্যপত্রিকা ঢাকা থেকে আবার চার বছর পর ফাল্গুন ১৩৭৬, ফেব্রুয়ারী ১৯৭০ সনে আহমদ ছফার সম্পাদনায় পুনঃ প্রকাশিত হয়। এর প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা চিহ্নিত হয়ে প্রকাশিত হলেও মূল ঠিকানা একই। দীর্ঘ সম্পাদনাপরিষদের সদস্য ছিলেন : জাহাঙ্গীর চৌধুরী, সরদার ফজলুল করিম, সন্তোষ গুপ্ত, আবদুল হালিম, সৈয়দ আকরম হোসেন, মুহম্মদ নুরুল হুদা, কাজী সিরাজ এবং সম্পাদনা ‘সহযোগী’ ছিলেন : মুনতাসীর মামুন, আবদুল হাদী, নওফেল আলম বিল্লাহ ও ফারুকুল ইসলাম। প্রচ্ছদ শিল্পী হারাধন বর্মণ। প্রকাশনা দফতর : ৩৪ বাংলা বাজার, ঢাকা ১। ডা. এম. এ. এম. চৌধুরী ও এম. এ. আলীম কর্তৃক ৩৪ বাংলা বাজার ঢাকা থেকে প্রকাশিত। মীর শফিকুর রহমান কর্তৃক ২৪, মোহিনী মোহন দাস লেন এর গ্রীনল্যাণ্ড প্রেস থেকে মুদ্রিত। দাম ১ টাকা, পৃষ্ঠা ৮৭। সাইজ ১/৮ ডাবল ক্রাউন।

এই সংখ্যায় প্রবন্ধ লিখেছিলেন ডক্টর আহমদ শরীফ (মিলন ময়দানের সন্ধানে) ; সত্যেন সেনের উপন্যাস ‘জননী জন্মভূমি’ ধারাবাহিক প্রকাশ হতে আরম্ভ করে। গল্প লেখেন সৈয়দ আকরম হোসেন, কবিতা লিখেছিলেন শামসুর রাহমান, আবুল হাসান, নির্মলেন্দু গুণ, মুহম্মদ নুরুল হুদা, আবুল কাসেম, সায়াদ কাদির প্রমুখ। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর ‘মধ্যবিস্ত সংস্কৃতি’ শীর্ষক প্রবন্ধটিও এতেই প্রকাশিত হয়। অরুণ মৈত্র লেখেন আর্নেস্ট চে’ গুয়েভারার জীবন কথা। আবদুল মান্নান সৈয়দ গল্পের নাট্যরূপ দিয়েছিলেন— চন্দ্রমল্লিকা।

জাহাঙ্গীর চৌধুরী নিবন্ধ লেখেন, নাম—‘তরুণ বিদ্রোহ ও জিজ্ঞাসা’। এছাড়া শামসুর রাহমানের ‘নিরালোকে দিব্যরথ’ ; ডক্টর আহমদ শরীফের ‘সাহিত্য ও সংস্কৃতি চিন্তা’ ; সত্যেন সেনের ‘পুরুষ মেধ’ ; সুবোধ লাহিড়ীর ‘ভস্মার বিল’ ; আজহার ইসলামের ‘বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রসঙ্গ’ ; অজয় রায়ের ‘বাঙলা ও বাঙালী’ এবং ‘পরিচিতি কাহিনী’—আর আহমদ ছফার ‘নিহত নক্ষত্র’ শীর্ষক গ্রন্থের আলোচনাও ছাপা হয়েছিল। পুস্তক-সমালোচনার ক্ষেত্রে স্বদেশের ওপর ‘নাগরিকের’ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

এই আলোচনাগুলো লিখেছিলেন যথাক্রমে জমিল শরাফী, সরদার ফজলুল করিম, শাহাবুদ্দীন আহমদ, মুনতাসীর, খালিকুজ্জামান ইলিয়াস ও মকবুল আহমদ। নবপর্যায়ের, প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা পাওয়া যায়নি। তৃতীয় সংখ্যায় সহযোগী কেবলমাত্র অসীম সাহা। পৃষ্ঠা ৯৩, দাম ১ টাকা। মানিয়া আর্ট প্রেস ঢাকা থেকে মুদ্রিত। এই সংখ্যা প্রকাশিত হয় জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩৭৭, ১৯৭০ এর জুন নাগাদ।

এতে লিখেছিলেন প্রবন্ধ : আহমদ শরীফ (জাতিগঠনে ভাষার প্রভাব) ; মনসুর মুসা (আমাদের ভূমিকা) ; মফিজ চৌধুরী (সমকালীন ছাত্র-বিদ্রোহ) ; সরদার ফজলুল করিম (একটি কবিতা সম্পর্কে), আকরম হোসেন (রবীন্দ্রনাথ : একাল এবং আমরা) প্রমুখ।

কবিতা লিখেছিলেন শহীদ সাবের, শামসুর রাহমান, সেলিম সারোয়ার, হুমায়ুন কবির, মুহম্মদ নূরুল হুদা, মাহবুব সাদিক, সায্যাদ কাদির, ল্যাংস্টন হিউজ (অনুবাদ রবীন সমদার, নিগ্রো কবিতা) ; জামাল উদ্দীন হোসেন প্রমুখ।

গল্প লিখেছিলেন : রাজিয়া খান (সূর্যাস্ত) ; রিওনুসুকে আকুত্তাগওয়া (নরকচিত্র, অনুবাদ মুস্তাফিজুর রহমান) ; বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর (ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯) ; অসীম সাহা (ব্যথিত বিলয়)। গ্রন্থ-পরিচিতি বিভাগে শামসুর রাহমানের ‘নিজবাসভূমের’ আলোচনা লেখেন করুণাময়ী গোস্বামী এবং আনোয়ার পাশা লেখেন সত্যেন সেনের ‘বিদ্রোহী কৈবর্ত’ গ্রন্থের ওপর।

উল্লেখ্য ১৯৬৯ এর গণ-অভ্যুত্থানের পরে ১৯৭১ সনের মার্চের কয়েক মাস পূর্বের সময়কালে প্রকাশিত স্বদেশের সমাজ সমালোচনায় লেখকেরা অনেকটা আলোর দিশা পেয়েছিলেন। পাকিস্তানি শাসকদের কঠোর চোখ-রাঙানিকে তখন বাঙালি বেশি ভয় পাচ্ছে না, আর বুদ্ধিজীবীদের চারিত্র্যও অনেকটা পরিষ্কার হয়ে ধরা পড়েছে। তখন বুদ্ধিজীবীরাই বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা নিয়ে সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছেন। স্বদেশে, সাহিত্য ও সংস্কৃতিক্ষেত্রে বাঙালি জাতীয়তাবাদ জয়ী হবার চূড়ান্ত লগ্ন উপস্থিত। এই ভাবসমূহ ফুটে উঠেছে স্বদেশের পরের সংখ্যাগুলোতে।

বট্রাণ্ড রাসেল সত্তর সালের ফেব্রুয়ারিতে মৃত্যুমুখে পতিত হন। স্বদেশ লিখেছিল : ‘চলতি মাসে বিশ্বের অন্যতম খ্যাতিমান দার্শনিক মহামনীষী বট্রাণ্ড রাসেল লোকান্তরিত হয়েছেন। সুদীর্ঘকাল পরমায়ু তিনি পেয়েছিলেন। তবু শোক প্রকাশ করছি—আগামী সংখ্যায় রাসেল সম্পর্কিত রচনা প্রকাশিত হবে।’ হিসাব মতে যে সংখ্যাটি পাওয়া যায়নি—সেটাই রাসেলসংখ্যা ছিল।

ফেব্রুয়ারী ১৯৭০ সংখ্যায় একটি বিজ্ঞাপনে বলা হয় :

রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রথম পাকিস্তানি রেকর্ড ১৬ই জানুয়ারী ১৯৭০ থেকে বাজারে ছাড়া হয়েছে। ঝারা গেয়েছেন—সন্জিদা খাতুন, মাহমুদা খাতুন, বিলকিস নাসিরুদ্দীন, আফসারী খানম, রাখী চক্রবর্তী, কলিম শরাফী প্রমুখ তাঁদের অন্যতম। দি গ্রামোফোন কোম্পানী অব ইস্ট পাকিস্তান লি. এটা প্রকাশ করে।

আহমদ ছফা সম্পাদিত স্বদেশ এর প্রথম সংখ্যার (ফাল্গুন ১৩৭৯) সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছিল :

‘খুন রাঙা ফালগুনের রক্তবেগ তরঙ্গিত মরণহীন সুরেলা আহ্বান বেজেছে পূর্ব বাঙলার ঘরে ঘরে। শহীদী প্রাণের মরণবিহীন আকাশলা এক সুর, এক ছন্দে, এক তালে লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। শহর থেকে বন্দর, গঞ্জ থেকে গ্রাম, দেশের আনাচ সব ঠাই সমুদ্র গর্জনের মতো উদাত্ত গভীর অথচ চিত্তহারী এক বলবন্ত সঙ্গীতের সুরে স্পন্দিত শিহরিত। দিনের পর দিন যাচ্ছে—মাসের পর মাস, গড়িয়ে যাচ্ছে বছরের পর বছর। কিন্তু ফালগুনের খুন ঝরা সঙ্গীতের রক্তিম বেদনা প্রতিবার আমাদের গণচিত্তে বপন করে নতুন বেদনার বিজুলী, জাগিয়ে তোলে পেলব আশার রক্তমুকুল, প্রেরণা দেয় দুর্জয় মরণপ্রাণ সংগ্রামের।

আটাই ফালগুন তথা একুশে ফেব্রুয়ারী তারিখটি বাঙলা ভাষা-ভাষী মাত্রেই হৃদয়ের রক্ত-রঙীন পলাশ ফোটান দিন। আমাদের নেই এর চাইতে মহত্তর কোনো পর্বদিন—না আনন্দের, না বেদনার, না আকাশক্ষার। আমাদের অতীত ইতিহাসের স্বেচ্ছাচারিতা, অন্যায়-জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে উন্মুখব, সংঘাতে

সংস্কৃত দিনটির প্রতিটি মিনিট, প্রতিটি সেকেন্ড আমাদের কাছে ফুসফুসের নিশ্বাস বায়ুর মতো দামি আর পবিত্র। এ দিনে হৃদযন্ত্রকে হাতে নিয়ে কড়া সূর্যের আলোকে জাতির রক্তস্রাব নতুন করে পাঠ করি, হাওয়ার সাথে বুকের ধুকপুক মিশিয়ে কান ভরে শুনি কোটি মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার মধুর গুঞ্জন। এই দিনেই তাজা প্রাণ বলি দিয়ে আমাদের জাতি অমৃত নিব্বার মাতৃভাষায় দখল নিয়েছে। মাতৃভাষা আর মাতৃভূমির নিয়ত নিবিড় চেনাশোনার মাধ্যমে মানুষ নতুন সৃষ্টিলাভের জীবনের ফণা উচিয়ে তুলছে। এ বিচিত্রমুখী সংগ্রামী কমপ্রয়াসের মধ্যদিয়ে মাতৃভূমি আপন অনন্ত যৌবনাস্বরূপ প্রকাশ করে চলেছেন। আমাদের ভাষায় সঞ্চারিত হচ্ছে তেজ, সাহিত্যে ধ্বনিত হচ্ছে জীবন, সঙ্গীতে লহরিত হচ্ছে আনন্দ বেদনা সংগ্রাম, আভা আসছে চিত্রকলায়। আমাদের ভারী ইতিহাসের তোরণদ্বার আটাই ফালগুন তথা একুশ ফেব্রুয়ারী আমাদের তাবৎ সৃষ্টিকর্মের উৎস। এমন মহান দিনকে সামনে রেখেই আত্ম প্রকাশ করলে 'স্বদেশ'।<sup>২০</sup>

## ৭. পূর্বলেখ

(১৯৬৬-৬৭)

‘তারুণ্যের উৎসাহে কিছু একটা করার প্রেরণা থেকেই’ পূর্বলেখ প্রকাশিত হয়েছিল ভূঁইয়া ইকবালের সম্পাদনায়। ১৯৬৬ সালে ঢাকায় কোনো নিয়মিত কবিতাপত্র ছিলো না। এই অভাববোধ থেকে পূর্বলেখ প্রকাশের পরিকল্পনা। তবে বুদ্ধদেব বসুর ‘কবিতা’ পত্রিকার স্মৃতিচারণ পড়ে খুব উদ্বুদ্ধ হয়েছিলাম। নামকরণ করেছিলেন শামসুর রাহমান। প্রথম সংখ্যা পেয়ে বুদ্ধদেব বসু আমাকে উৎসাহ দিয়ে একটি সুন্দর চিঠি লিখেছিলেন।<sup>২১</sup>

উল্লেখ্য যে, সুনির্দিষ্ট কোনো উদ্দেশ্য-আদর্শের তাগিদে কোমর বেঁধে কোনো লক্ষ্য নিধারণ করে পূর্বলেখ প্রকাশিত হয়েছিল বলে মনে হয় না। এতে কোন সম্পাদকীয় বা বক্তব্যও নেই। এর আগে কবিতা পত্রিকা ‘স্বাক্ষর’ বেরিয়েছিল। স্বাক্ষরের সমকালেই ‘পূর্বলেখ’ বের হয়। কিন্তু পূর্বলেখে তরুণ প্রবীণ উভয়েরই জায়গা হয়েছিল।

তবু বলতে ইচ্ছে করে, পূর্ববেঙ্গ আধুনিক সাহিত্যপ্রকাশের ক্ষেত্র যেখানে খুবই সঙ্কুচিত ছিল, সেখানে সেইকালে একগুচ্ছ আধুনিক কবিতা, কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ এবং কতিপয় কাব্য-গ্রন্থের আলোচনা নিয়ে পূর্বলেখের ৩টি সংকলন প্রকাশিত হয়ে সাময়িকপত্রের ইতিহাসে নাম লিখিয়েছিল এই বলে যে, সাতচল্লিশ সনের পরে শুধু কবিতার চিন্তা নিয়ে ‘স্বাক্ষর’; ‘কবিকণ্ঠ’ এবং ‘পূর্বলেখ’ মাত্র বেরিয়েছিল। যুদ্ধপূর্ববর্তীকালে আর কোনো নিছক কবিতাপত্র প্রকাশের ঘটনা এখন আর জানা যায় না।

পরিচিতিতে বলা হয় ‘সমকালীন কবিতা পুস্তিকা’। পূর্বলেখ এর প্রথম সংকলনটি ‘কবিতা ত্রেমাসিক’ পরিচিতি দিয়ে মাঘ ১৩৭২ জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬ সনে প্রকাশিত হয়েছিল। ‘সহযোগী’ ছিলেন আলী মনোয়ার, আলী ইমাম। প্রচ্ছদ ঐকৈছিলেন জয়নুল আবেদিন ও কাইয়ুম চৌধুরী। অঙ্গসজ্জায় সবিহউল আলম ও মুহম্মদ জাহাঙ্গীর প্রমুখ। ভূঁইয়া ইকবাল কর্তৃক ৮৭, বিসিসি রোড, ঢাকা ৩ থেকে প্রকাশিত ও পাকিস্তান প্যাকেজেস, চট্টগ্রামে মুদ্রিত; ডাবল ডিমাই ১/১৬ সাইজ ৩২ পৃষ্ঠা। দাম এক টাকা।

দ্বিতীয় সংকলন প্রকাশিত হয় ভাদ্র ১৩৭৩ এবং তৃতীয় সংকলন প্রকাশের তারিখ নেই। কিন্তু অনুমান করা যায় ১৯৬৬ সনের শেষের দিকে অথবা ৬৭ সনের প্রথম দিকে প্রকাশিত হয় কোনো সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যহীনতার কারণে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। ‘দ্বিতীয় সংকলনে’

‘কবিতা ত্রৈমাসিক’ কথাটি লেখা ছিল না, বলা হয় ‘দ্বিতীয় সংকলন’। তৃতীয়বারে সংকলন না বলে বলা হয় ‘তৃতীয় পুস্তিকা’।

সে যাই হোক, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুস্তকে কবিতা লিখেছিলেন পূর্ববঙ্গের কবিবৃন্দ : শামসুর রাহমান, আহসান হাবীব, সৈয়দ আলী আহসান, আবদুল গনি হাজারী, হাসান হাফিজুর রহমান, আল মাহমুদ, সিকানদার আবু জাফর, ফজল শাহাবুদ্দীন, মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, সন্তোষ গুপ্ত (অনুবাদ, শেকসপীয়র থেকে) ; হুমায়ূন আজাদ, মশুকুর রহমান চৌধুরী, সৈয়দ আলী আশরাফ, সুফী মোতাহার হোসেন, আতাউর রহমান, হায়াৎ মামুদ, মনিরুজ্জামান, আবদুল মাল্লান সৈয়দ, রফিক আজাদ, ওমর আলী, মোহাম্মদ রফিক, সুরত বড়ুয়া, জিনাত আরা মালিক, মফিজুল আলম, আবুল হাসান, সানাউল হক, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, আনোয়ার পাশা, আবু বকর সিদ্দিক, ইমরুল চৌধুরী, আবু কায়সার, সাযযাদ কাদির, জিনাত আরা রফিক, সৈয়দ আকরম হোসেন, মোহাম্মদ রফিকুজ্জামান, শেখ আবদুর রহমান, ফজলুর রহমান, আহমদ নূর আলম, হুমায়ূন কবির, রফিক সন্যামত, আলতাফ হোসেন, আলী ইমাম, আলী মনোয়ার, মোহাম্মদ শরীফ হোসেন প্রমুখ।

আবুল ফজল (আধুনিক কবিতা প্রসংগে) এবং সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়নে (‘আধুনিক কবিতা প্রসঙ্গে’) প্রবন্ধ লিখেছিলেন যথাক্রমে প্রথম ও তৃতীয় সংকলনে। প্রশান্ত ঘোষাল ই ই কামিংসের ; এবং জিয়া হায়দার যেন সিয়াং জেন এর ; এবং ফজলে রাবিব কেনেথ শ্লেড এলিং এর কবিতা অনুবাদ করেছিলেন। আনিসুজ্জামান সুফী মোতাহার হোসেন এর ‘সনেট সংকলন’ এর উপর লিখেছিলেন (প্রথম সংকলনে) : মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ লিখেছিলেন ফজল শাহাবুদ্দীনের ‘তৃষ্ণার অগ্নিতে একা’ গ্রন্থের ওপর দ্বিতীয় সংকলনে।

শামসুর রাহমান সম্পাদিত ও অনূদিত ফ্রস্টের কবিতার ওপর (পূর্বোক্ত) হায়াৎ মামুদ ও সরদার ফজলুল করিম লিখেছিলেন সানাউল হক অনূদিত ‘বরিস পাস্তারনাক এর কবিতা’র ওপর (পূর্বোক্ত) ; সিকানদার আবু জাফরের ‘তিমিরাস্তিক’, ‘বৈরীবৃষ্টিতে’ ও প্রসন্নপ্রহর’ এর ওপর এবং আনোয়ার পাশার কবিতার বই ‘নদী নিঃশেষিত হলে’-র ওপর লিখেছিলেন হুমায়ূন আজাদ। জিয়া হায়দার কবি ইয়েভতু শেংকোর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছিলেন তৃতীয় সংকলনে।

বিজ্ঞাপনের ভাষায়ও তাঁরা কবিতার শব্দ ও ছন্দ ব্যবহার করেছিলেন। বিজ্ঞাপন তাঁরা মোটামুটি ভালোই পেতেন। সরদার ফজলুল করিম বরিস পাস্তারনাকের বইয়ের প্রশংসা করেছিলেন। পূর্বমধ্যে এই বইয়ের নিন্দা করা হয়েছিল। পূর্বলেখ এর কর্মীবৃন্দ স্বাগত জানান শামসুর রাহমান ও ফজল শাহাবুদ্দীন সম্পাদিত কবিতা ও কবিদের পত্রিকা-‘কবিকণ্ঠ’ কে। ‘কবিকণ্ঠ’ পত্রিকাও ঐসময় প্রকাশিত হয়েছিল। কবিদের সংগঠন বা সংসদ গড়ে তোলা এবং কবিতার জন্য স্বতন্ত্র সংকলন প্রকাশের একটা প্রেরণা তখন সৃষ্টি হয়েছিল। তবে এই ধরনের পত্রিকা খুব বেশী ছিল না বলে ‘পূর্বলেখ’ এর একটা গুরুত্ব আছে বৈকি।

## ৮. মেঘনা

(চট্টগ্রাম, ১৯৬৭-৭০)

আঞ্চলিক সাহিত্যপত্রিকাগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে চট্টগ্রামের ‘দৈনিক সমাচর’ পত্রিকার যুগ্ম-সম্পাদক সেকান্দার হায়াত মজুমদার সম্পাদিত ‘মাসিক মেঘনা’। বাংলাদেশের প্রখ্যাত,

প্রথমশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী, পণ্ডিতলেখক, মস্তি-মিনিস্টার-ব্যাংকার-বুর্জোয়া-ব্যবসায়ী, বীমা কোম্পানীর উচ্চপদাধিকারী, অধ্যাপক-গবেষকদের, আর নতুন তরুণ উদ্যোগী সাহিত্য-শিল্পপ্রয়াসী ও সংস্কৃতিকর্মীদের জড়ো করে উদ্যোগ নিয়েছিলেন মেঘনাকে নিয়মিত মাসিকরূপে চালিয়ে যেতে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় নিয়মিত মাসিকরূপে মেঘনা দীর্ঘদিন বের হতে পারেনি। বছর তিনেক অনিয়মিত মাসিকরূপে প্রকাশিত হয়েছিল। তবে প্রথম দিকে কয়েক সংখ্যা নিয়মিতই বের হয়। কারণ বিজ্ঞাপন ভালোই পাওয়া যাচ্ছিলো। বিভিন্ন ব্যক্তির নাম ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যবসায়িক ক্ষেত্র তাঁরা প্রস্তুত করে নিতে পেরেছিলেন। কিন্তু এদেশের ব্যবসায়ীদের সমাজসেবকমনস্কতা থাকলেও তা স্ফুলিগের ন্যায়। দীর্ঘদিন ধরে কোনো সামাজিক কাজ তাঁরা চালিয়ে যাবার মানসিকতা ধরে রাখতে পারেন না। কেনো পারেন না সমাজতাত্ত্বিক, মানসিক, নৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে তা বিচার বা অনুসন্ধান করা যেতে পারে বটে; তবে, সত্য হলো মেঘনার সঙ্গে বহু লোক জড়িত থাকলেও দুটো বছর ২৪ টি সংখ্যাও নিয়মিত প্রকাশিত হতে পারেনি।

বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৬, এপ্রিল-মে ১৯৬৯ সনে (হয়ত জুনেই বের হয়েছিল) প্রকাশিত তৃতীয় বর্ষ প্রথম-দ্বিতীয় যুগ-সংখ্যায় সম্পাদক বলেন (সম্পাদকীয়) :

অনিয়ম বিশৃঙ্খলা আর প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে আমরা দুটি বছর অতিক্রম করে আজ তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করলুম। মেঘনাকে নিয়মিত প্রকাশের ব্যাপারে গত দুবছর আমরা আমাদের শুদ্ধেই পাঠক-পাঠিকা ও শুভানুধ্যায়ীদেরকে একাধিকবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলুম। কিন্তু নানা প্রতিকূল পরিবেশ তথা পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে সে প্রতিশ্রুতি সর্বত্র রক্ষা করতে পারিনি বলে আমরা লজ্জিত। তাই তৃতীয় বর্ষের যাত্রা শুরুতে আর প্রতিশ্রুতি নয়—হৃদয়তাপূর্ণ সহযোগিতাই আমাদের কাম্য। বাংলা পত্রপত্রিকার উন্নতি-অবনতি আর অপমৃত্যুর ইতিহাসে আমাদের দেশ কোন পর্যায়ে তা আজকে অন্তত আমাদের পাঠকশ্রেণীর অজানা নয়। সেক্ষেত্রে মাসিকপত্রিকা, তাও আবার নগ্নহবিবিবর্জিত সাহিত্যপত্রিকার নিয়মিত প্রকাশ যে কি দুরূহ ব্যাপার তা একমাত্র ভুক্তভোগীদেরই জানার কথা। এতোসব প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সুহৃদদের শুভেচ্ছকেই সম্বল করে আমরা অগ্রসর হচ্ছি। আমাদের পাঠকশ্রেণীর সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রেখে তৃতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যা থেকে মেঘনার দাম ষাট পয়সার পরিবর্তে চল্লিশ পয়সা রাখা হলো। সেসঙ্গে আকর্ষণীয় কিছু নতুন বিভাগও খোলা হলো। আমাদের নব উদ্যোগ পাঠক সম্প্রদায়ের আনন্দ জোগাতে সক্ষম হলে আমরা সুখী হবো। মেঘনার জন্মলগ্নে বাংলা সাহিত্যের দুজন মনীষী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলামকে (যেহেতু তাঁদেরও জন্মোৎসবের মাস) সশ্রদ্ধভক্তি সহ স্মরণ করে, আমাদের যাত্রা অব্যাহত রাখার নতুন করে শপথ নিচ্ছি।

মেঘনার শীর্ষে লেখা থাকতো 'জাতিগঠনমূলক সাহিত্য মাসিক'। সহকারী সম্পাদক : এইচ. এম. রফিকুল ইসলাম, প্রচ্ছদ করেছিলেন সবিহউল আলম। অঙ্গসজ্জা : মুহম্মদ জাহাঙ্গীর। মুদ্রাকর ও প্রকাশক সেকান্দার হায়াত মজুমদার। সিগনেট প্রেস, জুবিলি রোড, চট্টগ্রাম থেকে মুদ্রিত। যোগাযোগের ঠিকানা : মেঘনা কার্যালয়, পোঃ বক্স ৬৪৬ চট্টগ্রাম। দ্বিতীয় সংখ্যা ছাপাঘর, দেওয়ান বাজার থেকে মুদ্রিত ও ১২০/এ চন্দনপুরা পশ্চিম গলি, চট্টগ্রাম হতে প্রকাশিত। ডাবল ডিমাই ১/৮ সাইজ এর ৫৬ পৃষ্ঠায়, সাদা কাগজ, হার্ডবোর্ড কভার এ প্রথম সংখ্যা বেরিয়েছিল।



সম্পাদক লিখেছিলেন :

নদীর নামে নাম, কিন্তু নাম নদী হবে আর তাতে আমাদের ঝড়ের নৌকার মতো ক্ষত-বিক্ষত হতে হবে— ছাড়পত্র পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত একথা আমরা ভাবিনি। তবু সাক্ষ্যনা, পর্বত পরিমাণ প্রতিকূলতা সত্ত্বেও আমাদের পত্রিকা প্রকাশ পেলো। পত্রিকা প্রকাশ এবং তার অকাল মৃত্যু আমাদের দেশে নতুন কোনো ঘটনা নয়। বরং বলা চলে পত্রিকার বেঁচে থাকারটাই একটা উল্লেখযোগ্য নতুন ঘটনা হতে পারে। আমাদের পত্রিকা বেঁচে থাকবেই এ—দস্তোক্তি করার সাহস নেই—কারণ, সেখানে পদে পদে বাধা, অসহযোগিতা, দীর্ঘমূলকতা— সেখানে অর্থ আন্তরিকতা কোনটাই নিশ্চিত মূলধন হতে পারেনা। তবু বেঁচে থাকার আশা নিয়েই আমাদের যাত্রা—আন্তরিকতার অভাব থাকবেনা এইটুকুই আমাদের ভরসা—এর সঙ্গে যদি যোগ হয় আপনাদের সহযোগিতা তবেই হবে আমাদের শুভ সূচনা।

মেঘনায় শুভেচ্ছা বা বাণী পাঠিয়েছিলেন ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, আবুল ফজল, এম. খালেদ (ব্যংকার) ; খোদা বখশ (বীমা কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার) ; আবদুল জব্বার খান (পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের স্পীকার) ; নূরুল আবছার খান (ডাইরেক্টর, ইন্সটিটিউট রিজিওন্যাল ল্যাবরেটরিজ, ঢাকা) ; এস. এম. জাফর (আইনমন্ত্রী, পাকিস্তান) ; এস, এম. আমজাদ হোসেন (শিক্ষামন্ত্রী, পূর্বপাকিস্তান) শ্রী প্রবোধবর্মা প্রমুখ। কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা হয় : চৌধুরী জহুরুল হক, সব্বিহউল আলম, বাবু সত্যরঞ্জন সিংহ, আলহাজ্ব নিজামউদ্দীন, আবদুল মান্নান পাটোয়ারী, প্রিয়লাল রায় ; মৌলভী মোহাম্মদ সিরাজুল হক ; এম. হাসমতউল্লাহ প্রমুখের প্রতি। সহায়তায় ছিলেন : এম. সফিউল্লাহ, জয়নুল আবেদিন, কাজী কাশেম, মঈনউল আলম, মীর মোশাররফ হোসেন, নূরুল্লাহ চৌধুরী, মকবুল আহমদ পাটওয়ারী, মোহাম্মদ মোসলেম খান, অমলেন্দু বড়ুয়া, আজিজুল হক।

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তাঁর বাণীতে লিখেছিলেন :

প্রথমেই মনে হলো আজও এই পাকিস্তানে সাবেক হিন্দু-রাজত্বের সময়ের শহরগুলির নাম কেন? চট্টগ্রাম কেন ইসলামাবাদ, ঢাকা কেন জাহাঙ্গীর নগর, সিলেট কেন জালালাবাদ হয় না? রামচন্দ্র বলে কোন হিন্দু মুসলমান হয়ে আবদুল্লাহ নাম নিলে এখন তার নাম জিজ্ঞাসা করলে সেকি বলবে রামচন্দ্র, না আবদুল্লাহ? ২২

আবুল ফজল লিখেছিলেন :

চট্টগ্রাম থেকে ‘মেঘনা’ নামে একটি সাহিত্যমাসিকী প্রকাশিত হচ্ছে শুন খুব আশান্বিত হলাম। সাহিত্যের সঙ্গে সাহিত্যসাময়িকীর সম্পর্ক অত্যন্ত নিবীড়। কারণ এসব সাময়িকীকে কেন্দ্র করেই নতুন নতুন লেখক গড়ে ওঠে—তাঁরা পেয়ে থাকে নিজেদের প্রকাশ করার একটা মাধ্যম। আর সাহিত্যের আধুনিক ধারা, উপধারা বিচার বিশ্লেষণ ইত্যাদির পরিচয় ফুটে ওঠে সুসম্পাদিত সাময়িকীর পৃষ্ঠায়। এ কারণে সাহিত্যের অগ্রগতিতে সাহিত্যমাসিকীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সবদেশের সাহিত্যেই এ ভূমিকা স্বীকৃত। আমাদের দেশে সুসম্পাদিত, স্বাধীন ও নিতীক সাহিত্য-মাসিকীর সংখ্যা অতি নগণ্য। বিশেষ করে চট্টগ্রামে সাহিত্যমাসিকের একটা অভাব রয়েছে। আশা করি মেঘনা আমাদের সে অভাব পূরণ করতে সক্ষম হবে। আমি সর্বান্তকরণে মেঘনার দীর্ঘায়ু ও সুসমৃদ্ধি কামনা করি। ২৩

স্পীকার আবদুল জব্বার খান লিখেছিলেন : ‘জাতি গঠনের মহা উদ্দেশ্য নিয়ে চট্টগ্রাম হতে মাসিক ‘মেঘনা’ নামে একখানি সাহিত্যপত্রিকা শীঘ্রই আত্মপ্রকাশ করছে শুনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।’

‘দৈনিক সমাচার’ পত্রিকার যুগ্ম-সম্পাদক জনাব মোঃ হায়াত মজুমদারের সম্পাদনায় মাসিক মেঘনা যে আদর্শ ব্রতী হয়ে প্রকাশিত হচ্ছে, আমি তার সাফল্য কামনা করি।<sup>২৪</sup>

খুদা বখশ লিখেছিলেন :

সাহিত্যই জাতির আত্মা। সাহিত্যিকেরাই জাতির প্রাণ, এ-আত্মাকে, এ-প্রাণকে যারা অস্বীকার করে তারা জাতীয় জীবনে সূর্যকে পশ্চাতে রেখে অন্ধকারকেই টেনে আনে। সমাজ ও ব্যক্তিজীবনে সাহিত্য নিয়ে যতই চর্চা হবে দেশ ও দশের মংগল সাধন ততো সহজ হবে। সাহিত্যকে সমৃদ্ধ ও পরিপুষ্ট করার প্রশংসনীয় অণুপ্রেরণা যাদের আছে, তারা নিঃসন্দেহে জাতির মহান সেবায় নিয়োজিত।<sup>২৫</sup>

লেখকদের নামের আগে অধ্যাপক লেখা হতো। পত্রিকার অনেক লেখক সব বড় বড়, খ্যাতনামা কবি-সাহিত্যিক-অধ্যাপক। বিজ্ঞাপন সংগ্রহের প্রতি ঐদের মনোযোগ ছিল বেশী। প্রথম সংখ্যায় ‘জাতি গঠনমূলক সাহিত্যপত্রিকা’; দ্বিতীয় সংখ্যায় ‘নতুন চিন্তাধারায় পরিপুষ্ট একটি অনন্য সাহিত্য মাসিক’ এবং পঞ্চম-ষষ্ঠ সংখ্যায় : ‘নতুন চিন্তাধারায় পরিপুষ্ট একটি প্রগতিশীল সাহিত্য মাসিক’ এবং তৃতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যায় ‘মাসিক সাহিত্যপত্র’ কথাটা লেখা হয়েছিল।

মেঘনার প্রথম বর্ষ সংখ্যাতে (মে ১৯৬৭) ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ প্রবন্ধ লিখেছিলেন ‘পাকিস্তান আন্দোলনের দার্শনিক পটভূমি’ শিরোনামে। আবুল ফজলের প্রবন্ধের নাম ‘খাতার একটি পাতা’। মুহম্মদ সিকন্দার হায়াত খান লিখেছিলেন ‘চোঙ্গা গল্প প্রসঙ্গে’।

গল্প লিখেছিলেন মাহবুব উল আলম (মানুষ সাপ); আনিস চৌধুরী (প্রত্যাশা); চৌধুরী জহরুল হক (পুঞ্জ পুঞ্জ কুয়াশা); সবিহউল আলম (সাঁকে); বিপ্রদাশ বড়ুয়া (একটি অসমাপ্ত গল্প); নীলুফার খান (পায়ে পায়ে বেদনা); জহুর উশ শহীদ (একজন একাকী); ফিরোজা বেগম (অনেক আশ্বাসের আলো) প্রমুখ। আলাউদ্দীন আল আজাদ লিখেছিলেন নাটক ‘বেলনা বিদায়’; মনিরুজ্জামান গদ্যে প্রবচন—‘ক্ষণবাক’; দিলওয়ার হোসেন—নকস—‘বাংলাভাষা; সূর্যের আলো: পাখীর গান’; বেলাল মোহাম্মদ (ইতিহাস) ‘স্মৃতিসৌধে ভরা চট্টগ্রাম’; এবং কবিতা লিখেছিলেন : আবদুর রশীদ ওয়াসেকপুরী, সেলিম আহমদ, শামসুল্লাহার বেগম; এ. কে. এস. আমীর খসরু প্রমুখ।

প্রাপ্ত সংখ্যাতে অন্যান্য কবিতা লিখেছিলেন যারা তাঁরা : সৈয়দ আলী আহসান, দিলওয়ার হোসেন; বিপ্রদাশ বড়ুয়া মেহবুবা মোখলেস; আবদুল কাদির, আল মাহমুদ, মুরশেদ নূর শাহরিয়ার, শামসুর রাহমান, মাহমুদুর রহমান চৌধুরী, হাবীবুর রহমান, শামসুল ইসলাম, জামাল উদ্দীন হোসেইন, বেলাল মোহাম্মদ, কল্পনা মোহরের, জাহাঙ্গীর তারেক প্রমুখ।

অন্যান্য রচনাকার—মাহবুবউল আলম (গল্প, শেষে মোতার রোম্যান্স; ডর করে); মোহাম্মদ আবু তাহের মজুমদার (প্রব, আধুনিক ইংরেজী কবিতা ও টি. এস. ইলিয়ট); আবুল কালাম শামসুদ্দীন (প্রবন্ধ, পুঁথি সাহিত্য); চৌধুরী জহরুল হক (গল্প, পাক; বিনিপয়সার বিজ্ঞাপন; অনুভব); মঈনউল আলম (গল্প, মোহন হাসি; অন্ধকার উপত্যকায়); আলাউদ্দীন আল আজাদ (পুস্তক-সমালোচনা, ফজল শাহাবুদ্দীন প্রণীত ‘তুষার অগ্নিতে একা’ এবং সৈয়দ আলী আহসান প্রণীত ‘সহসা চকিত’); মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (প্রবন্ধ; দুই জিহাদ); আবুল ফজল (প্রবন্ধ, ভারতের প্রধানমন্ত্রী যদি দ্য-গলে হতে পারতেন); আল মাসুদ (গল্প, প্রতিচ্ছবির অন্তরালে); কে. এম. আমীর খসরু (প্রবন্ধ, শাহরিয়ার); দিলওয়ার হোসেন (নাটিকা, ওয়ায়দুল হকের কমেডি অব ননসেন্স অবলম্বনে রচিত বাজে কথার বিলাস; সৈয়দ আলী আহসানের কবিতার কথা ও অন্যান্য বিবেচনার আলোচনা); রশীদ আল ফারুকী (প্রবন্ধ, নববর্ষ সংবাদ; একক আত্মার স্ফোপ); সুবির (আলোচনা, অন্যান্য কথা); আবদার রশীদ (গল্প, অভিসার, হেরফের); ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (প্রেম

ও সৌন্দর্যের কবি নজরুল) ; শামসুল ইসলাম (প্রবন্ধ, রবীন্দ্রকাব্যে ব্যক্তি ও সমাজজীবনে নারীর স্থান) ; পূর্ণেন্দু দস্তিদার (প্রবন্ধ, সাহিত্য জিজ্ঞাসা-ম্যাগ্লিন গোকারি অন লিটারেচার এর অনুবাদ) ; আবুল ফজল (নাটক, হরিষে বিবাদ ; প্রবন্ধ, সংস্কৃতি ও মুক্তচিন্তা) ; আহমেদ সাইফুদ্দীন খালেদ (গ্রন্থালোচনা, ইবনে বতুতার সফরনামা, মোহাম্মদ নাসির আলী প্রণীত ; এবং আবুল হাসান শামসুদ্দীন অনুদিত ও বাংলা একাডেমী প্রকাশিত। 'মওলানা মোহাম্মদ আলীর আত্মজীবনী') ; নাজমুল আলম (একাঙ্কিকা, তুচ্ছ) ; নাজমাতুল আলম (গল্প, গাড়ী), কঙ্কন নন্দী (গল্প, মোম) প্রমুখ।

এছাড়াও পেন্দোদো আলবর্ক'র প্রবন্ধ থেকে 'দুই গৌরব' শিরোনামে অনুবাদ করেছিলেন জাহাঙ্গীর তারেক। ব্যঙ্গ রচনা লিখেছিলেন মনিরুজ্জামান 'অথ নজরুল বিবাদ সমাচার' শিরোনামে।

এই পত্রিকার রচনা ও রচয়িতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আবুল ফজলের 'সংস্কৃতি ও মুক্তচিন্তা'। কবিতার থেকে গদ্য বেশী ছেপেছেন মেঘনার সম্পাদক। এতে সমাজের চিত্র এসেছে। গল্পগুলোতে মানবতাবাদী জীবনবাদী সৃষ্টি ও সুর মূর্ত হয়েছে। প্রথম বর্ষ পঞ্চম-ষষ্ঠ যুগ্ম সংখ্যার সম্পাদকীয়তে যে সমাজচিত্র ফুটে উঠেছে তা উল্লেখযোগ্য :

'আমাদের জনজীবনে দুর্নীতি, দারিদ্র্য, অনৈক্য আর পাশ্চাত্যমুখি ভাবধারা যেভাবে প্রভাব বিস্তার শুরু করেছে, এ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য দেশের শিক্ষাবিদ ও বিজ্ঞব্যক্তিগণকে এগিয়ে আসা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। পাশ্চাত্যের নগ্ন ভাবধারা মুক্ত সমাজগঠনে ব্যর্থ হলে মুসলিম জাতির নিজস্ব ঐতিহ্য বলে কিছুই থাকবে না। পঙ্গু হয়ে যাবে আমাদের সমাজব্যবস্থা। শুধু সরকারি প্রচেষ্টার প্রতি নির্ভর না-করে দেশের সাহিত্যিক, বিজ্ঞ ও পণ্ডিত ব্যক্তিগণকে আমাদের তরুণ-তরুণীদের মুক্ত ও স্বচ্ছল জীবন গঠনের জন্য নিজেদের জাতীয় ভাবধারাকে তাদের সামনে ফুটিয়ে তুলতে এগিয়ে আসা দরকার। দেশের মানুষকে সুন্দর ও সরল পথের সন্ধান দেওয়া আমাদের নৈতিক কর্তব্য।'<sup>২৬</sup>

মেঘনার যোগাযোগের ও প্রকাশের ঠিকানা পরবর্তীতে পাল্টে গিয়েছিল। প্রথম বর্ষ পঞ্চম-ষষ্ঠ সংখ্যা (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৬৭ ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৭৪) ২৮৮ চন্দনপুরা থেকে প্রকাশিত ও দি টেম্পেস্ট প্রিন্টিং প্রেস লিমিটেড থেকে মুদ্রিত হয়। আঞ্চলিকপত্রিকা হলেও মেঘনা পূর্ব বাঙলার সাহিত্যপত্রিকার ইতিহাসে জায়গা করে নিতে পেরেছিল, কারণ সম্পাদক একটি দৈনিক পত্রিকার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিজ্ঞতা ও সামাজিক সংযোগের সুযোগ-সুবিধাও মেঘনা প্রকাশের কাজে লাগিয়েছিলেন।

### এ ধারার কিছু পত্রিকাপ্রয়াস

- [ ১. অন্ন চাই আলো চাই (১৯৪৯) ; ২. দিশারী (১৯৫০) ; ৩. প্রাচী (১৯৫৭) ; ৪. পরিচিতি (১৯৫৯) ; ৫. বিবর্তন (১৯৬০) ; ৬. পরিচয় (১৯৬০) ; ৭. বইবিচিত্রা (১৯৬০) ; ৮. যুববাণী (১৯৬০) ; ৯. বর্তমান (১৯৬২) ; ১০. বিচিত্রিতা (১৯৬২) ; ১১. গণমন (১৯৬৩) ; ১২. সৈকত (১৯৬৩) ; ১৩. মৌসুম (১৯৬৪) ; ১৪. বর্ণালী (১৯৬৪) ; ১৫. বই (১৯৬৫) ; ১৬. বনালী (১৯৬৬-৬৯) ; ১৭. সুনিকেত মল্লার (১৯৬৭-৭০) ; ১৮. একান্ত (১৯৬৭) ; ১৯. ছোটগল্প (১৯৬৭) ; ২০. সুরভি (১৯৬৮) ; ২১. কিছুধ্বনি (১৯৭০) ; ২২. পূর্বাশা (১৯৭০) ; ২৩. সাম্প্রতিক (১৯৭০) ; ২৪. বালার্ক (১৯৭০) ]

মনে রাখতে হবে যে, ব্যক্তিক উদ্যোগের কোনো পত্রিকা আলোচ্যকালে নিয়মিত প্রকাশিত না হলেও অনিয়মিতভাবে অথবা সংকলন আকারে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে বহু সাহিত্য

পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। এক সংখ্যা বা দুই, তিন, চার—কিংবা পাঁচটি সংখ্যাও বের হয়েছে কোনো কোনোটার। এর কোনোটা ব্যক্তিক উদ্যোগ, কোনোটা কোনো না কোনো সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংস্থার মুখপত্র।

এসবে কখনো—কখনো ভালো রচনাও প্রকাশিত হয়েছে। এ রকম কয়েকটি পত্রিকা অন্নচাই আলো চাই, দিশারী, প্রাচী, পরিচয়, পরিচিতি ইত্যাদি আরো কত কি। মহীউদ্দীন সম্পাদিত ‘অন্নচাই আলো চাই’ শীর্ষক ‘মাসিক সাহিত্যপত্র’টি ১৯৪৯ সনে প্রকাশিত হয়েছিল এবং ৪টি সংখ্যায় অনেক ভালো ভালো লেখা ছাপা হয়েছিল; কিন্তু ইতিহাস আজ অনেকটা বিস্মৃত এই পত্রিকাটি সম্পর্কে। এর বিষয়সূচীতে ছিল অর্থনীতি, রম্য-রচনা, গল্প, কাব্য-নাট্য, কবিতা, শিক্ষা, রাষ্ট্রনীতি সংক্রান্ত রচনা ইত্যাদি। লেখকদের মধ্যে আছেন মাহমুদ জালাল, আহাদ, আবিদ, মহিউদ্দীন, মকবুল জালাল, আবদুল গফুর, আজিজ প্রমুখ। পদবী ছাড়া নামে আজ এঁদের চেনার উপায় অনেকটা সঙ্কুচিত। ১৯৫০ সনে হাবীবুর রহমান ও একরামুল হক সম্পাদিত মাসিক ‘দিশারী’র ছয়টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল।

‘সীমান্ত’ পত্রিকার অন্যতম সহযোগী সম্পাদক সূচরিত চৌধুরী ও ওয়ালী আহমেদ চট্টগ্রাম থেকে ১৯৫৭ সনের পয়লা মে’তে ‘প্রাচী’ সাহিত্য সংকলন প্রকাশ করেন। মানের দিক থেকে এটি প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যপ্রয়াস ছিল। প্রচ্ছদ আঁকেন পূর্ণেন্দু পত্রী। ওয়ালী আহমেদ কর্তৃক ৫৪৬ টেরী বাজার চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয়।

আবদুল করিম সাহিত্যবিহারদ, অন্নদাশংকর রায়, সৈয়দ মুজতবা আলী, মোতাহের হোসেন চৌধুরী, আবুল ফজল, পূর্ণেন্দু দস্তিদার, সৈয়দ মুর্তাজা আলী, জসীমউদ্দীন, রমেশ শীল, বেগম সুফিয়া কামাল, ওহীদুল আলম, গোলাম কুদ্দুস, মতিউল ইসলাম, শূভাশীষ চৌধুরী, রামবসু, মাহবুবুল আলম, অনিল কুমার সিংহ, রমাপদ চৌধুরী, জিন্নাত আলী, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, ফরিদউদ্দিন আহমেদ, সূচরিত চৌধুরী, ওয়ালী আহমেদ, সুলতানা রহমান, আবদুস সালাম, সাগরময় ঘোষ, শক্তি প্রসাদ ঘোষ, অচিন্ত্য চক্রবর্তী প্রমুখ ছিলেন এর লেখক।

অন্নদাশংকর রায়ের ব্যক্তিগত রচনাটি (আত্মজীবনীমূলক) মূল্যবান। মোতাহের হোসেন চৌধুরীর ‘জনমত ভীতি, শীর্ষক গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধটিও এতে মুদ্রিত হয়। মৃত্যুর পরবর্তীকালে প্রকাশিত প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রণ কিনা উল্লেখ করা হয়নি। তবে ১৯৫৭ সনে স্বৈরাচারের দেশে ‘জনমত ভীতি’ নামের প্রবন্ধ টাইটেল-গুণেই চমৎকার এবং সমকালীন সমাজ-সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগে, দায়িত্ববোধে সমৃদ্ধ।

আবুল ফজলের রচনার শিরোনাম ‘সাহিত্য ও সংস্কৃতি সাধনা’। মুদ্রণ পারিপাটে, প্রচ্ছদে, সৌন্দর্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। সাদা কাগজে ১/১৬ ডাবল ডিমা ই সাইজের ‘প্রাচী’র পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ২০০।

ত্রৈমাসিক পরিচিতি (১৯৫৯) র সম্পাদক ছিলেন সুবোধ দাশগুপ্ত। সহ-সম্পাদক বারীন মিত্র। গৃহ জগতের মুখপত্ররূপে প্রকাশিত হয়। লেখক সংঘ পত্রিকা যে প্রেস থেকে প্রকাশিত হতো—সেই পূর্ববঙ্গ প্রেস, ২ জিন্দাবাহার ২য় লেন, ঢাকা থেকে মুহাম্মদ ওবায়াদুল হক কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত।<sup>২৭</sup>

মোট চারটি সংখ্যা বের হয়। প্রথম সংখ্যার পৃষ্ঠা ছিল ৫১টি। দ্বিতীয় সংখ্যার ৯৭ পর্যন্ত। তৃতীয় সংখ্যায় ৯৮ থেকে ১৩৯ পৃষ্ঠা। শেষ সংখ্যায় সহকারী সম্পাদকরূপে শামসুল হকের নাম ছাপা হয়। পরে মাসিক রূপে একটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল যার সম্পাদক ছিলেন আলাউদ্দীন আল আজাদ। প্রাপ্ত প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা শ্রাবণ, ১৩৬৬ তে 'সাপ্তাহিক দেশ' (ভারত) থেকে পুনর্মুদ্রণ করা হয় 'জনসেবায় সাহিত্য' শীর্ষক প্রতিমা সেনগুপ্তের একটি প্রবন্ধ।

আবদুস শাকুর ব্যক্তিগত নিবন্ধ লিখেছিলেন 'পড়ার নেশা'। হামেদ আহমদ ও মেহেদী গল্প লিখেছিলেন যথাক্রমে 'কিনে পড়ুন' ও 'বন্ধন' শিরোনামে। তাছাড়া তৎকালে প্রকাশিত পুস্তকাদির পরিচয় আর বইয়ের মান সম্পর্কে লেখা সম্পাদকীয়তে সাহিত্য জগতের সার্বিক উন্নয়ন-প্রচেষ্টায় ঐদের আন্তরিকতার পরিচয় সুপরিষ্কৃত।

পরের সংখ্যাতোও অনুরূপ সরোজ আচার্যর 'বইলেখা' ; অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের 'তোষামোদের ভাষা' ; বি. বি. দাস-এর 'উপজাতীয় এলাকায় শিক্ষার আলো' এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি' শীর্ষক প্রবন্ধ সংকলিত হয়। মুসী কুদ্দুস লেখেন 'পাঠাগার ও তার প্রয়োজন'। ডা. গিরিশচন্দ্র সরকার-এর নাটিকা 'বিচার করে দেখুন' ; আর বেরসিকের গল্প—'অন্ধকারের হাসি' এবং গ্রন্থজগতের বিবরণ-বিবৃতি ছাপা হয়েছিল।

১৯৬২ সনে ইউনেস্কো ও পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা বিভাগের সহযোগিতায় 'ন্যাশনাল বুক সেন্টার অব পাকিস্তানের' প্রতিষ্ঠা হয় দেশে অধিকতর ভালো বই প্রচুর পরিমাণে প্রকাশ এবং যারা পুস্তক প্রকাশনার কাজে নিযুক্ত আছেন, তাঁদের 'প্রকাশনা সম্পর্কে সামগ্রিক সাহায্য করার উদ্দেশ্য। এই সংস্থা থেকে 'বই' নামে যে মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয় ১৯৬৫ সনে তার প্রথম সম্পাদক ছিলেন সরদার জয়েনউদ্দীন। সহযোগী সম্পাদক ছিলেন রশীদ হায়দার। এই পত্রিকা ছিল 'গ্রন্থজগতের মুখপত্র'। ঐদের দ্বারাও সাহিত্য ক্ষেত্রে কিছু সদর্থক অবদান রাখার চেষ্টা হয়েছিল। বিশেষ বিষয়ের নতুন ধরনের পত্রিকা হিসেবে এর মূল্য কিঞ্চিৎ হলেও রয়েছে।

'বই বিচিত্রা' (১৯৬০) নামেও গ্রন্থাগার লেখক-পাঠক-বিজ্ঞেতা ও প্রকাশনা-শিল্প সংক্রান্ত একটা পত্রিকা প্রকাশিত হয় ১৯৬০ সনে যারা বলেছিলেন 'পত্রিকা ক্ষেত্রে তাঁরা অভিনবত্বের দাবিদার'।<sup>২৮</sup>

'পরিচয়' নামে ঢাকা থেকে (১৯৬০) 'সাহিত্য ও সংস্কৃতিমূলক মাসিকপত্র' বেরিয়েছিল একাটি ; সম্পাদিকা ছিলেন রোকেয়া সুলতানা। রইসউদ্দিন আহমদ কর্তৃক, মুদ্রিত ও প্রকাশিত হতো। মাসিক সাহিত্যপত্রিকা 'যুববাণী' (১৯৬০) ছিল 'পাকিস্তান কাউন্সিল অব ইয়ুথ-এর মুখপত্র'। প্রধান সম্পাদক ছিলেন মুহম্মদ ওসমান গনি। পরে সম্পাদক হন সৈয়দ আবু তৈয়ব।

আবদুল মান্নান ভূঁইয়া 'বিবর্তন' (১৯৬০) নামে মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। মুদ্রিত হয়েছিল বেঙ্গল প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৩/৪ পাটুয়াটুলী লেন এবং প্রকাশিত হয়েছিল

৩৮/১১ বাংলা বাজার, ঢাকা-১ থেকে। চট্টগ্রাম থেকে খালেদা রহমান সম্পাদনা করেছিলেন ‘বিচিত্রিতা’ মাসিক (১৯৬২)। ‘মৌলিক গণতন্ত্রীদেব মুখপত্র’ হলেও ফরিদপুর থেকে প্রকাশিত মাসিক ‘গণমন’ (১৯৬৩) সাহিত্যসেবীদের নিকট প্রিয় হয়েছিল আর অনুন্নত জেলাশহরের সাহিত্য-স্রষ্টাদের প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে কাজ করেছিল। প্রথম দিকে সম্পাদক ছিলেন আবদুর রাজ্জাক।

চট্টগ্রাম থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত আর একটি সাহিত্যপত্রিকা কাজী মোহাম্মদ ইউসুফ সম্পাদিত মাসিক ‘সুরভি’ বিচিত্র বিষয়ের লেখা নিয়ে প্রকাশিত হতো ১৯৬৮ সনের দিকে। ‘জাতির গঠন মূলক ঐতিহ্যবাহী চট্টলার নিরপেক্ষ সাহিত্য পত্রিকা’ কথাটি তাঁরা যত্নের সঙ্গে পত্রিকায় উদ্ধৃত করেছিলেন। টাঙ্গাইল থেকে ১৯৭০ সনে ‘বার্কার’ প্রকাশিত করেছিলেন তরুণ সাহিত্যকর্মী শাহ্ ম. শ. আরেফিন বাদল (সম্পাদক), এবং অসিওর রহমান খান (প্রকাশক)—টাঙ্গাইলের ‘বার্কার সাহিত্যগোষ্ঠী’র সহযোগিতায়। মুদ্রিত হয় কল্লোল মুদ্রায়ণ টাঙ্গাইল থেকেই।

আমিনুল ইসলাম বেদুর সম্পাদনায় ১৯৭০ সনে ‘সাম্প্রতিক’ এর ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা শ্রাবণ ১৩৭৭ এ প্রকাশিত হয়, অবশ্য সাম্প্রতিক নামে ১৯৬৩-৬৪ তে গদ্যের একটি লিটল ম্যাগাজিন বেদুর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় কণ্ঠস্বর ও স্বাক্ষরের সমকালে, স্বাক্ষরগোষ্ঠীর তরুণদের দ্বারা। বলা হয় : ‘সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক মাসিক পত্রিকা’ সাম্প্রতিক—এর উদ্দেশ্য :

‘সাম্প্রতিক একটি নির্ভেজাল সাহিত্যপত্র। সকল মতবাদে সাম্প্রতিক নিরপেক্ষ ভূমিকা নিতে চায়। লেখা উচ্চমানের হলেই তা পত্রস্থ করা হয়। একমাত্র বিশুদ্ধ মননশীল লেখাই পাঠ্য হতে হবে। সমালোচনা সাহিত্যের বিন্যাস সাম্প্রতিক বিশেষ ভাবে কামনা করে।’<sup>২৯</sup>

সাম্প্রতিক স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে বেশ ক বছর যাবত অনিয়মিত ভাবে হলেও অনেকগুলো সংখ্যা প্রকাশিত করে। সাহিত্যক্ষেত্রে ‘সাম্প্রতিক’ পরিচিতি অর্জন করেছিল। আবদুল মান্নান সৈয়দ, আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ প্রমুখ এদেশের লিটল ম্যাগাজিনের আলোচনায় সাম্প্রতিকের প্রথম সংখ্যাটির ঐতিহাসিকতা স্বীকার করেন।

আবদুল জব্বার সম্পাদিত মাসিক ‘পূর্বাশা’ একবছর চলে। যুদ্ধের সময় (১৯৭১) বন্ধ হয়ে যায়। এটি প্রকাশিত হতো ঢাকার হাটখোলা থেকে। মাহবুব জামিল এবং আহমদুজ্জামান (যথাক্রমে সম্পাদক ও সহযোগী সম্পাদক) সম্পাদনা করেছিলেন দ্বিমাসিক সাহিত্যপত্র ‘বর্তমান’ ১৯৬২ সনে। ঢাকা থেকেই এটি প্রকাশিত হয়েছিল মোঃ মীজানুর রহমান কর্তৃক। ‘সৈকত’ নামে একটি দ্বিমাসিক ডাইজেস্ট পত্রিকার প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা গ্রীষ্ম ১৩৭০ (১৯৬৩) এ প্রকাশিত হয় মাসুদ আহমেদ এর সম্পাদনায়। মোটমুটি ভালো স্টাণ্ডার্ডে প্রকাশিত হতে চেয়েছিল। তাঁদের দুটি কথা উল্লেখযোগ্য :

‘পূর্ব পাকিস্তানের বিক্ষিপ্ত সাহিত্য আন্দোলনের সৃষ্টিধর্মী শিল্প প্রকরণকে সংবদ্ধকরণ ও বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে যোগসাধন উদ্দেশ্যে আমরা সৈকতে সমবেত।’

ঐদের গদ্যভঙ্গীতে ষাটের দশকের নতুন অনুকৃত আড়ষ্টতা ও দুর্বোধ্যতার চং সৃষ্টির প্রয়াস লক্ষণীয়। এই ধরনের গদ্য পাওয়া যায় কণ্ঠস্বরে এবং ঐগোষ্ঠীর লেখকদের রচনায়। মীজানুর রহমান শেলীর (ড.) সম্পাদনায় ১৯৬৪ সনে (জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী) ‘মৌসুম’ দ্বিমাসিক পত্রিকার ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। রাজশাহী থেকেও নির্ভেজাল সাহিত্যানুরাগী তরুণদের দ্বারা সম্পাদিত হয়েছে ছোট ছোট সাহিত্যপত্রিকা।

‘সুনিকেত মাল্লার’ ‘একটি বীতকণ্ঠ সাহিত্য ত্রৈমাসিক’ সম্পাদনা করতেন মোহসিন রেজা। এই পত্রিকার অনেক সুন্দর বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছে ডক্টর ময়হারুল ইসলাম সম্পাদিত ‘উত্তর অন্বেষণ’ পত্রিকায়। ১৯৬৭ থেকে সন পর্যন্ত পত্রিকাটি চলেছিল। তরুণ কবিসাহিত্যিকদের সঙ্গে প্রবীণ এবং অধ্যাপকদের লেখাও ছাপা হয়েছে তাতে। এই মোহসিন রেজা উত্তর-অন্বেষণ সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

অধ্যাপক বদরুদ্দীন উমরের উৎসাহে রাজশাহী থেকে বের হয়েছেন ‘বনানী’ ডিসেম্বর ১৯৬৬ তে ; ১৯৬৯ সন পর্যন্ত চলে। এটির সম্পাদক ছিলেন তাজুল ইসলাম এবং মোহাম্মদ নরুল আমিন। বদরুদ্দীন উমর তখন রাষ্ট্র বিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম কর্তৃক বনানী কার্যালয়, কাজিরগঞ্জ, রাজশাহী থেকে প্রকাশিত এবং মোহাম্মদ আবদুর রশীদ খান কর্তৃক আইডিয়াল প্রিন্টিং ওয়ার্কস, গ্রেটার রোড, কর্তৃক মুদ্রিত হয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮৬।

একান্ত নামে ‘পূর্ব পাকিস্তানের সাম্প্রতিক ধারার গল্প সংকলন’ প্রথম প্রকাশিত হয় জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৪ মে ১৯৬৭ সনে। সম্পাদক ছিলেন : মোঃ আবদুল মান্নান। মোঃ মোহসিন রেজা কর্তৃক জয়নব ভিলা নবাবগঞ্জ, ঘোষণাড়া, রাজশাহী থেকে একান্ত প্রকাশিত হয় এবং মোঃ আবদুর রশীদ খান কর্তৃক আইডিয়াল প্রিন্টিং ওয়ার্কস, গ্রেটার রোড, কাজিরগঞ্জ, রাজশাহী থেকে মুদ্রিত হয়েছিল। পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৬১। দাম এক টাকা। এটি পরে ‘শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতি মূলক ত্রৈমাসিক পত্রিকা’ রূপে প্রকাশিত হয়। প্রথম বর্ষ ২য় সংখ্যা প্রকাশিত হয় চৈত্র ১৩৭৪ সনে।

১৯৬৪ সনের জুলাই মাসে ‘বর্ণালী’ নামে সাহিত্য সংকলন এর ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ওসমান গনির সম্পাদনায়। এটি আওয়ামী লীগের বর্তমানকালের অন্যতম নেতা মোঃ মোজাফফর হোসেন পল্টু প্রকাশ করেছিলেন ২২ শান্তিনগর, ঢাকা-২ থেকে। ‘ছোট-গল্প’ নামের সংকলনটি প্রকাশ পায় ১৪ আগষ্ট ১৯৬৭ তে। সম্পাদক কামাল বিন মাহতাব। এই পত্রিকাটি ১৯৭০ সনের নভেম্বর এর দিকে ‘গল্প আন্দোলনের মাসিক মুখপত্র’ রূপে প্রকাশিত হয়। ১৯৭১ সন পর্যন্ত কয়েকটি সংখ্যা বের হয়।

পরবর্তীতে ১৯৭২ সনেও পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। মাহতাব এর সঙ্গে সম্পাদকীয় সহযোগী হিসেবে ছিলেন আলমগীর রহমান। ১৯৭০ সনে আনওয়ার আহমদ কর্তৃক ৮/ডি, আরামবাগ, ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় বেবী আনওয়ার সম্পাদিত ‘কিছুধ্বনি’। ১৯৭১ সনের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ৩টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। সাহিত্য শিল্প সঙ্গীত সিনেমা বিষয়ক মাসিক পত্রিকা ‘পরিচয়’ একটি পাঠক-প্রিয় পত্রিকা ছিল। টক-বাল-মিষ্টি সবই ছিল তাতে। অনেক

বিজ্ঞাপন আর ‘দলমত নির্বিশেষে সবার লেখাই ছাপা হবে’—এই ঘোষিত লক্ষ্যে ৯২ পৃষ্ঠার ‘পরিচয়’ ১৯৬০ সনে প্রকাশিত হয়েছিল। শামসুল হকের তথ্য অনুযায়ী এর সম্পাদিকা সুলতানা এবং প্রকাশক রইসউদ্দিন আহমদ ঢাকা। তবে প্রাপ্ত সংখ্যায় প্রচ্ছদ পৃষ্ঠা না থাকায় সম্পাদকের নাম নিশ্চিত করে জানা যায় না।

‘একটি নৃত্য ও সঙ্গীত সম্মেলন’ এর প্রতিবেদন আছে পরিচয়-এ। এটি ১৯৫৯ সনে অনুষ্ঠিত ঢাকার নিখিল পাকিস্তান দ্বিতীয় সঙ্গীত সম্মেলনের বিবরণ বলেই মনে পড়ে। গল্প লিখেছিলেন সেবাবত চৌধুরী (ত্রিবেণী); আনোয়ার মিজান (কথা ছিল); জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত (অচেনা); দেবব্রত চৌধুরী (বিষামত); বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর (পিংপংবল); এবং কবিতা লিখেছিলেন সৈয়দ শামসুল হক (কি এক মুহূর্ত); ওমর আলী (সাজান বাগান); তাহের চৌধুরী (একটি চীনা কবিতার অনুকরণে)।

হাসান হাফিজুর রহমান ‘উনিশশ উনষাট সালের কয়েকটি বই’ শিরোনামে একগুচ্ছ পুস্তকের পরিচয় দিয়েছিলেন। রনেশ দাশগুপ্ত লিখেছিলেন শামসুর রাহমানের (প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে) কবিতার বইয়ের সমালোচনা। পরিচয় কি সিনে-মাসিকে সাহিত্য-সংলগ্নতা? নাকি সাহিত্যপত্রিকায় সিনেমা বিষয়ের সংযোজন? এই প্রশ্নের উত্তরে পত্রিকায় বলা হয় “বাস্তবিক, সিরিয়াস সাহিত্য সৃষ্টির সুস্থ প্রয়াসে একটি সিনেমা পত্রিকা কি করে বিশেষ মানের মর্যাদায় পৌছানোর অভিলাষ পোষণ করতে পারে ‘পরিচয়’ তারই দুঃসাহসিক ঘোষণা।”<sup>৩০</sup>

### তথ্যপঞ্জি

১. মাসিক সাহিত্য, সম্পাদক : হেমায়েত হোসেন (নারায়ণগঞ্জ), বিপ্লব সংখ্যা ১৯৬০।
২. সাহিত্য, পূর্বপাকিস্তানের সাহিত্যে দুর্নীতি সম্পর্কে বিশেষ অসাধারণ সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৬৯, পৃ. ১৮৬।
৩. বেনজীর আহমদ, ‘সাহিত্যে দুর্নীতি ও জাতীয় চরিত্রে তার প্রভাব’; পূর্বোক্ত পৃ. ১৬০।
৪. মনিউদ্দীন আহমদ, পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যের বর্তমান ধারা, (লেখক সংঘের দ্বিতীয় সভায় পঠিত) সাহিত্য, মাঘ-ফালগুন ১৩৬৭ সংখ্যা, পৃ. ৪; এবং আবদুল গনি হাজারীর বক্তব্যের জন্য দেখুন সওগাত, অগ্রহায়ণ ১৯৫৯ পৃ. ৫০-৫১।
৫. খন্দকার সিরাজুল হকের ০৬/০৭/১৯৯১ তারিখের পত্র থেকে।
৬. সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়, সমকালীন সাহিত্যচিন্তা, যাত্রী, ১ বর্ষ, ৭-৮ সংখ্যা (যুগ্ম), মার্চ-এপ্রিল ১৯৬০, পৃ. ২৮।
৭. ড. গোবিন্দচন্দ্র দেব, আলু দর্শনের ভূত ও ভবিষ্যত, সুন্দরম ১ বর্ষ, ১ সংখ্যা, আগস্ট ১৯৬৩, পৃ. ১১।
৮. ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, শিক্ষকের দায়িত্ব, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯।
৯. আল মাহমুদ, তুম্বার ঋতুতে, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪।
১০. আমিনুল ইসলাম বেদু লিখেছেন :

“সাম্প্রতিকের প্রথম প্রকাশ ১৯৬৩ সনে বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎসাহী কয়েকজন তরুণের প্রচেষ্টায়। চাঁদার টাকায় একটি মাত্র সংখ্যাই বের হয়েছিল। যাদের চাঁদায় সাম্প্রতিক বের হয়, তাঁরা হলেন : জনাব



আলতাফ হোসেন জোয়ারদার, শাহজাহান হাফিজ, আবদুল মান্নান সৈয়দ, মফিজুল আলম, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস। এঁদের মধ্যে আলতাফ হোসেন ১৯৭১ সনে পাকবাহিনীর দ্বারা নিহত হন। সাম্প্রতিক আবার ১৯৬৯ (প্রকৃত প্রস্তাবে ১৯৭০ সন থেকে) মাসিক পত্রিকা হিসেবে অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে।”

দ্র. সাম্প্রতিক, ৪ বর্ষ ১ সংখ্যা জুন-জুলাই ১৯৭৩ পৃ. ৪৭।

১১. আবদুল মান্নান সৈয়দ, পূর্বোক্ত।
  ১২. জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, চিঠি, পূর্বমেঘ, ৫ বর্ষ ১ সংখ্যা ১৩৭২।
  ১৩. স্বাক্ষর, প্রথম সংকলনের শেষ প্রচ্ছদের উক্তি থেকে। এই কথাগুলো রফিক আজাদের বলে আসাদ চৌধুরীর নিকট থেকে প্রাপ্ত ‘স্বাক্ষর’-এর সংখ্যাগুলোতে ‘নোট’ লিখিত রয়েছে।
  ১৪. শহীদুর রহমান, রুগ্ন আত্মার ভাষণ (কবিতা) স্বাক্ষর, দ্বিতীয় সংকলন ১৯৬৪ পৃ. ৪১।
  ১৫. রফিক আজাদ, ছরাগ্রস্তদের সগতোক্তি, পূর্বোক্ত, তৃতীয় সংকলন ১৯৬৫, পৃ. ৭।
  ১৬. আসাদ চৌধুরী, ‘নভেম্বরের পূর্ণিমায় রচিত আত্মা বিষয়ক পদ্য’ শীর্ষক কবিতা ১৯৬৪-র দ্বিতীয় সংকলনের ৩৮ পৃষ্ঠায় আছে। কবিতাটি আসাদ চৌধুরী স্বাক্ষরে সহস্রে পরিমার্জনা করে রেখেছেন।
  ১৭. স্বদেশ, ১ বর্ষ ৪ সংখ্যা, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৭২।
  ১৮. পূর্বোক্ত, ১ বর্ষ, ১ সংখ্যা, কার্তিক-ভাদ্র ১৩৭১।
  ১৯. পূর্বোক্ত।
  ২০. মফিজউদ্দিন মহামেদ চৌধুরী বা মফিজ চৌধুরী (১৯২২-৯৪) স্বাধীন বাংলাদেশে মুজিব-মন্ত্রীসভায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী ছিলেন। বড় ব্যবসায়ী ছিলেন। ঢাকার ইন্দিরা রোডে তাঁর বাড়ী। কবিতা উপন্যাস ও গল্প লিখতেন। অর্থাৎ সাহিত্যের ব্যাপারে উৎসাহী, সংস্কৃতিসেবীর মন তাঁর ছিল। প্রগতিশীল প্রবীণ ও তরুণ লেখক বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল। তিনিই স্বদেশের মূল প্রবর্তক ও প্রযোজক। ১২০০০ হাজার টাকা পুঁজি দিয়ে বেকার তরুণ সাহিত্যসেবক আহমদ ছফাকে ‘স্বদেশ’ চালাবার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু আহমদ ছফার ব্যবস্থাপনায় ১২০০০ হাজার টাকায় তিন-চারটে স্বদেশ বের করার পর মূলধন সব ফুরিয়ে যায়। আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ‘স্বদেশ’ও বন্ধ হয়ে যায়। স্বাধিকারীর আশা ছিল উক্ত টাকা খাটিয়ে আহমদ ছফা স্বদেশকে নিয়মিত এবং বিকশিত করবেন। রাসেল সংখ্যা অনুসন্ধানে পাওয়া যায়নি।
- সূত্র : অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হকের সঙ্গে ২০/৬/১৯৯২ তারিখের সাক্ষাৎকার।
২১. ভূঁইয়া ইকবালের ২৯/৭/৯১ তারিখের পত্র থেকে।
  - ২২-২৫. মেঘনা, ১ বর্ষ ১ সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৭৪।
  ২৬. পূর্বোক্ত, সম্পাদকীয়, ১ বর্ষ ৫-৬ সংখ্যা (যুগ্ম) ; সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৬৭।
  - ২৭-২৯. শামসুল হক, বাংলা সাময়িকপত্র, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৬।
  ৩০. এখানে শামসুল হকের উপর্যুক্ত গ্রন্থ এবং বিভিন্নভাবে অনুসন্ধানের তথ্যাবলম্বনে ‘সাহিত্য পত্রিকা’ হিসেবে প্রকাশিত কতিপয় সাময়িকের আলোচনা করা হলেও, এই তালিকা যে দীর্ঘতর করা যায়না, তা নয়। তবে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে এদেশের আলোচ্যকালের সকল প্রধান পত্রিকার আলোচনাই স্থান পেয়েছে।

## পঞ্চম অধ্যায়

# মাকসীয়া মতবাদ প্রভাবিত কতিপয় সাহিত্যপত্রিকা

## প্রস্তাবনা

এ-ধারার পত্রিকাগুলো নিয়মিত নয় বলে স্বল্প ও পুষ্ট নয় ইসলামী ধারার মতো; অনিয়মিত বলে ক্ষীণ কিন্তু স্ফুলিঙের ন্যায় উজ্জ্বল এবং প্রতিভার দীপ্তিতে ভাস্বর। চল্লিশের দশকে পাকিস্তান-আন্দোলনকে মুসলিম লীগ প্রাণবান করলেও এই আন্দোলনের ধারাকে গতিশীল করেছিলেন প্রগতিবাদী সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্মীনেতৃবৃন্দ। তাঁরা জনগণের সামনে নতুন স্বদেশে জীবনের বহুমাত্রিক স্ফূর্তি ও বিকাশের কথা বলেছিলেন বলেই জনগণ পাকিস্তানকে এরকম মনে-প্রাণে প্রত্যাশা করেছিলেন।

এই প্রত্যাশা-জাগ্রতকারী সংগঠক ও কর্মীদের মধ্য থেকেই আজাদীলাভের পরবর্তী সংবাদ ও সাহিত্যবিষয়ক সায়িকপত্রসমূহ সম্পাদিত ও প্রকাশিত হয়েছিল বলে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে পূর্ববাঙলার পত্র-পত্রিকাসেবীগণ উন্নততর সমাজ-ব্যবস্থা এবং স্বদেশহিতের সহায়ক প্রশাসনিক ব্যবস্থাদি প্রবর্তনের পক্ষে জোরালো বক্তব্য উপস্থাপন করেছিলেন।

তমদ্বন্দ্ব মজলিশের মুখপত্র 'সৈনিক' (১৯৪৮-৫৭) :: বঙ্কিমচন্দ্র সাহা সম্পাদিত ও প্রকাশিত 'চাবুক' (১৯৩৩-৪৯), এবং 'কৃষ্টি' (১৯৪৭); চট্টগাঁর 'সীমান্ত' (১৯৪৭-৫৩)—সকল পত্রিকার বক্তব্যই প্রগতিশীল, জড়তা-আড়ষ্টতা ও সংস্কারমুক্ত, উন্নত সমাজব্যবস্থার সপক্ষে নিরপেক্ষ মনোভাব নিয়ে উচ্চারিত, কিন্তু ক্রমে মুসলিম লীগের দক্ষিণ পন্থীদের ক্ষমতা দৃঢ়ীকরণের পদক্ষেপ হিসেবে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের কমিউনিস্ট কার্যক্রম কঠোর ভাবে দমন করা হয়।

ননকমিউনিস্ট অথচ বাঙালি জাতীয়তাবাদীদের বাঙলা ও বাঙালি-সংস্কৃতি-চিন্তাচর্চার আগ্রহেরও উচ্ছেদসাধনপূর্বক তদস্থলে পাকিস্তানী একজাতীয় ভাষা-সংস্কৃতি ইত্যাদি চিন্তাধারার বাস্তবায়ন করার যাবতীয় প্রশাসনিক পদক্ষেপের ফলে ইসলামি-পাকিস্তানবাদী ধারা সচল-সক্রিয় ও বেগবান হয়ে ওঠে। আইউবী সামরিক শাসনামলে এবং পরবর্তী অবক্ষয়ী-ব্যবস্থার ফলে প্রগতিশীল কার্যবলি একদম স্তিমিত হয়ে আসে।

এ অবস্থায় ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৩-৫৪ পর্যন্ত বেশ কিছু মাকসীয়া মতাদর্শ প্রভাবিত পত্রিকা পূর্ববাঙলা থেকে প্রকাশিত হয়। তবে ১৯৫৩-৫৪ থেকে প্রগতিশীল ও মাকসীয়া প্রচেষ্টা 'আগার গাউণ্ডে' চলে যায়। সামরিক শাসন উঠে গেলেও এধারা আর বেগবান হতে পারেনি। বলা বাহুল্য, সেজন্য পাকিস্তানি-পররাষ্ট্রীয় নীতির পরিবর্তনই অধিকাংশ কৃতিত্বের দাবিদার। ছয় দফা আন্দোলনের বুর্জোয়া, মধ্যশ্রেণীর আদর্শ অনুযায়ী একধরনের প্রগতিশীলতা অনেকটা ফ্যাশন-স্বরূপ হলেও অতঃপর এদেশে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল।

১৯৪৭-৭১ পর্বে প্রকাশিত সাহিত্য পত্রিকাগুলোর মধ্যে মোটামুটিভাবে যোগ্যভাবে মাকসীয়া মতাদর্শের কিছু না কিছু প্রভাব আছে—অন্তত নিজেদেরকে 'প্রগতিশীল' বলে আত্মপরিচয় দিতে ধারা পছন্দ করতেন, তাঁদের পত্রিকাগুলো হলো : ১. কৃষ্টি (১৯৪৭); ২. সীমান্ত (১৯৪৭-৫৩); ৩. সংকেত (১৯৪৮); ৪. অগত্যা (১৯৪৯-৫৩); ৫. মুকুতি (১৯৫০); ৬. পরিচিতি (১৯৫১-৫৩); ৭. যাত্রিক (১৯৫৩); ৮. স্পন্দন (১৯৫৩); ৯. উত্তরণ (১৯৫৮-৬০); ১০. পলিমাটি (১৯৬৩-৭১) ও ১১. নাগরিক (১৯৬৪-৭০) প্রভৃতি।

লক্ষ্য করা যাবে, এর কোনো কোনোটাতে কয়েদে আজম ও পাকিস্তানের প্রতি লক্ষণীয় আনুগত্য রয়েছে। অথচ তাঁরা প্রগতিশীলতার কথা বলেছেন। এর কারণ তৎকালের রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য। কয়েদে আজম মুহাম্মদ আলি জিন্নাহ ১৯৪৮ সনেই হঠাৎ ইন্তেকাল করেছিলেন। তাঁর কপটতা জনসাধারণ ভালো করে বুঝবার আগেই মৃত্যু তাঁকে ঠাঁয়েছিল কিছুটা। তাছাড়া ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হবে বলে কয়েদে আজমের ঘোষণাও ছিল—সেজন্য কয়েদে আজম আর ধর্মনিরপেক্ষতাকে একত্রে মিলানো সম্ভব হয়েছিল।

## ১. কৃষ্টি

(১৯৪৭)

আজাদী-উত্তর কালে ১৯৪৮ সন পর্যন্ত (প্রথম বছরে) ঢাকা থেকে কোনো সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয়নি বলে যে-ধারণা গবেষকেরা পোষণ করেন<sup>১</sup> তা যে সঠিক নয়—তার প্রমাণ একাধিক রয়েছে। সাপ্তাহিক ‘চাবুক’ ৪৭-পূর্বকাল থেকে ঢাকা থেকেই নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছিল। তাছাড়া আরও পত্র-পত্রিকা তখন বের হতো বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। ঢাকা থেকে প্রকাশিত আজাদী-উত্তর সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশের ঐতিহ্য খুঁজতে গেলেও নিরাশ হওয়া চলে না। কারণ ‘সীমান্ত’ এবং ‘কৃষ্টি’ বাঙলা মাস-সনের হিসাবে একই কালে প্রকাশিত হলেও পত্রিকার গায়ে লিখিত খ্রীস্টীয় সন তারিখের হিসাবে ‘সীমান্ত’ থেকে ‘কৃষ্টি’কে পূর্ববর্তী বলে ধরে নিতে কষ্ট হয় না। কৃষ্টি প্রকাশের তারিখ অক্টোবর-নভেম্বর ১৯৪৭, কার্তিক ১৩৫৪। ‘সীমান্ত’ নভেম্বর ৪৭ এ প্রকাশিত হয় যদিও কার্তিক ১৩৫৪ তাতে লেখা আছে।

একটি ‘সাহিত্য পত্রিকা’য় যে-সমস্ত বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত—কৃষ্টিতে তা বহুল পরিমাণেই পাওয়া যায়। যদি বলা যায় আজাদী-উত্তর উন্নত মানের প্রথম সাহিত্য পত্রিকা ‘কৃষ্টি’ তাতে অত্যুক্তি হয় না। নিয়মিত প্রকাশের, দীর্ঘ যাত্রার উদ্দেশ্য ও আয়োজন কৃষ্টি কর্তৃপক্ষের ছিল। কিন্তু ‘কৃষ্টি’ স্পষ্টত মার্কসীয় মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিল বলে এবং এর সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সকলেই হিন্দু-সম্প্রদায়ের ছিলেন বলে প্রথম সংখ্যার পরে আর প্রকাশের সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায়নি।

অনুमानে করে বলা চলে, মুসলিম লীগ সরকারের কর্ণধারের এর কষ্ট চেপে ধরেছিলেন। নচেত দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত না হবার কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রথম সংখ্যায় কটি লেখা আছে যার পরবর্তী অংশ পরের সংখ্যায় প্রকাশের পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু সমাজতন্ত্র, সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা ইত্যাদিকথা পত্রিকায় ছিল বলে পাকিস্তানের প্রথম দিকে একে ঘোরতর সন্দেহের মধ্যে পড়তে হয়েছিল।

তাছাড়া বাংলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতির পক্ষে স্পষ্ট সুপারিশ এবং সংগ্রামের প্রত্যয় কৃষ্টিকে পাকিস্তানী প্রশাসনের কোপানলে নিক্ষেপ করেছিল। এরপর ১৯৫০ এর দাসার ভয়াবহতা দেখে সকলেই হয়তো উদ্বাস্ত হয়ে দেশত্যাগ করেছিলেন। পরবর্তীকালে কৃষ্টি সম্পর্কে কোনো স্মৃতিকথাও সেকারণে এদেশ থেকে প্রকাশিত হয়নি।

তবে কৃষ্টির একটি সংখ্যা মাত্র প্রকাশ পেলেও (তথ্য দৃষ্টে তাই মনে হয়, আরও দু’একটি সূত্রে প্রথম সংখ্যার পর ‘কৃষ্টি’ আর বের হয়নি বলে মন্তব্য করা হয়েছে)<sup>২</sup> একটি সংখ্যা দিয়েই ‘কৃষ্টি’ পূর্বপাকিস্তান বা পূর্ব বাঙলার কৃষ্টির ইতিহাসে নিজের মূল্য ও অবস্থান উজ্জ্বল ও স্থায়ীরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে। কারণ এই পত্রিকার বক্তব্য এবং সাহিত্যিক শৈল্পিক মান উন্নত ধরনের ছিল। একটি যথার্থ সাহিত্য পত্রিকা যে সমাজ সংস্কৃতি ও সাহিত্য-শিল্পের উন্নতি সাধনের মহান ব্রত নিয়েই প্রকাশ পেয়ে থাকে,—সেই সচেতন সক্ষমতার বোধ বুদ্ধি ও স্বদেশ হিতেষণা তাঁদের ছিল।<sup>৩</sup>

‘কৃষ্টি’ প্রকাশিত হয় গোদনাইল, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা থেকে (কৃষ্টির ‘অফিস’ বলে উল্লিখিত)। প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যার গায়ে পরিচালকমণ্ডীর সদস্যরূপে : সুধাংশু রায়, প্রভাত সরকার, সাধন চ্যাটার্জী, ফুলদা রায়, জীবন গোস্বামী প্রমুখের নাম মুদ্রিত আছে। সম্পাদক প্রকাশক মুদ্রকের কোনও তথ্যের উল্লেখ নেই। পরিচালক বলতে তাঁরা সম্পাদকমণ্ডলী বুঝিয়ে থাকবেন।

প্রাপ্ত সংখ্যার সাইজ ডিমাই ১/৪ সাদা কাগজ পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৫। এর মধ্যে বিজ্ঞাপন ১০ পৃষ্ঠা। কৃষ্টির নিয়মাবলীতে বলা হয় : “প্রতিবাংলা মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রকাশিত হইবে। কার্তিক মাস হইতে বর্ষ আরম্ভ। প্রতি সংখ্যার মূল্য আট আনা এবং বিশেষ সংখ্যা এক টাকা। বার্ষিক সডাক চাঁদা ছটাকা এবং ষাণ্মাসিক তিন টাকা। কবিতা, গল্প, নাটক, প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। রচনার মৌলিকত্ব রক্ষা করিয়া প্রয়োজনবোধে উহার সংশোধন বা অংশ বিশেষ বর্জন অথবা প্রকাশভঙ্গি পরিবর্তন করিবার অধিকার সম্পাদকের থাকিবে।”

পত্রিকার মুদ্রণ পারিপাট্য ভালো। এই পত্রিকার একটি মাত্র প্রাপ্ত (বা প্রকাশিত) সংখ্যার সূচীপত্র নিম্নরূপ :

কৈফিয়ৎ (সম্পাদকীয়—কয়েকটি উপশিরোনামে : ‘উল্লসিত সাম্রাজ্যবাদী’, ‘বাঙালি বিদ্রোহ’, ‘শিক্ষার ভাবী মাধ্যমে’, ‘পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকা শহর’; শ্রী শীলা দেবী (প্রবন্ধ) রবীন্দ্রনাথের ঠিঠি; শ্রী অনিমেষ দাশগুপ্ত (কবিতা) দুটি গান; শ্রী প্রভাতকিরণ সরকার (গল্প) স্মৃতিতীর্থ; শ্রী সুরেন্দ্রমোহন পঞ্চতীর্থ (জীবনী-আলোচনা) চন্দ্রাবতী; শ্রী কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত (কবিতা) স্তব্ধতা; অরুণোদয় (একঘটকাকালে অভিনয়যোগ্য নাটক) সাইরেন (১২ পৃষ্ঠার বড় লেখা; লেখকের নাম অনুজ) শ্রী বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (কবিতা) মানোরমা; মুহম্মদ (ডক্টর) এনামুল হক (প্রবন্ধ) পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার পরিপ্রেক্ষিতে উর্দু ও বাংলা; পরিচালক (অর্থাৎ সম্পাদকদের কেউ; প্রবন্ধ) পূর্ব পাকিস্তানের শিল্প-সত্তার : বস্ত্রশিল্প; আবদুল মামান (কবিতা) স্বাধীনতার ঝাণ্ডা উড়াও; শ্রী গোপাল ব্যাণার্জী (কবিতা) জাতীয় পতাকা।

কৈফিয়ৎ—এ পত্রিকার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয় :

কৃষ্টি-পূর্ব পাকিস্তানের সংস্কৃতিমূলক বাংলা মাসিক পত্রিকা। অনেকেই নামের উপর জোর দিয়ে থাকেন....এরপরও যদি অর্থ খাঁজেন, বলবো, কিছু আছে। চলতি সাময়িকপত্রিকার মতো গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা, নাটক ইত্যাদি দিয়ে পাঠকদের মনোরঞ্জন করতে পারলেই হোল। পাঠক খুশী হলেই আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হোল। কিন্তু এটা হলো মুখ্য উদ্দেশ্য। এর পরে যুগের দাবি অনুযায়ী আমরা সাধ্যমত চেষ্টা করবো সুধী পাঠক সমাজকে বিশুদ্ধ সাহিত্য রস পরিবেশন করতে। হয়ত তাতে মানসিক উৎকর্ষ বিধানে সাহায্য করবে। কতটুকুই বা পারবো?

বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে যে ‘কালচার’ গড়ে উঠেছে আমরা তারই অনুশীলন করে যাবো। অনেকে প্রশ্ন করে থাকেন ভাষাগত ‘কালচার’ কি ভৌগোলিক সীমারেখা দ্বারা নির্দেশিত হবে? কিন্তু কালচারের বাস্তবসত্তা ঝুঁজতে গেলে আমরা ভুল করবো।...সমগ্র বাংলা ভাষা-ভাষী ব্যক্তির মাঝে যে বিশেষ মনোবৃত্তি যুগ-যুগ ধরে ফল্পনদীর মতো অন্তর্নিহিত হয়ে আসছে তারই পরিষ্ফটনকে বলবো ‘কালচার’। আমরা তাকেই প্রকাশ করতে চেষ্টা করবো। তাকেই সহজভাবে অনুবাদ করতে গিয়ে নামের সাথে সত্তার সামঞ্জস্য রাখতে পারিনি, বলেছি ‘কৃষ্টি’। রসিকসমাজ একে ‘সংস্কৃতি’ বলেও আখ্যা দিতে পারেন। তাতে আমাদের কোনও আপত্তি নেই। পত্রিকার বিষয়বস্তুই নামকে জাগিয়ে তুলবে।

কৃষ্টি সাহিত্যিক পত্রিকা'। বিশেষভাবে সাহিত্যই এর উপজীবী। কিন্তু এ সাময়িকপত্রিকা। তাই বর্তমানকে আলোচনা করতে গিয়ে রাজনীতি বা সমাজনীতির ছোঁয়াচ একেবারে এড়াতে হয়ত পারব না। কিন্তু রাজনীতি বা সমাজনীতির কোন বিশেষ মতবাদের সমর্থক আমরা নই। তাই আমরা সাময়িক রাজনীতি বা সমাজনীতি-নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করব।...নতুন লেখক গোষ্ঠীকে (প্রতিভা বিকাশের জন্য) সাহায্য করবো তাঁদের সাহিত্যিক প্রচেষ্টাকে অব্যাহত রাখবার জন্যে। এতে করে যদি আমরা একজন সাহিত্যিককে বাংলা সাহিত্যের আসরে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি তাহলে আমাদের এই উদ্যম সার্থক হবে।...দেশের চঞ্চল পরিস্থিতির জন্য...আপ্রাণ চেটায়...অত্যন্ত অল্প সময়ে বের করেছি...ক্ৰটি পরের সংখ্যায় ঘটতে দেবো না।

'কৃষ্টির' লেখাসমূহ ঐতিহাসিক বিবেচনায় আজ সেকালের এক মূল্যবান সমাজ দর্পণ হয়ে পড়েছে। এর বিজ্ঞাপনগুলোর মধ্যে অধিকাংশই বস্ত্রমিলের এবং প্রেসের। এ-থেকে অনুমান করা যায় পত্রিকা প্রকাশের নেপথ্যে বস্ত্রমিলের মালিক-পুঁজিপতিদের পৃষ্ঠপোষকতা রয়েছে এবং একারণেই সমাজতান্ত্রিক ভাবনা এবং শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ বিবেচনাকালে বস্ত্র মালিকদের স্বার্থকে তাঁরা অগ্রাহ্য করতে পারেননি। অথবা বস্ত্র শিল্পের মালিকদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করে পত্রিকাটি শ্রমিকদের স্বার্থের অনুকূলে বক্তব্য উচ্চারণ করতে পারেনি।

বস্ত্রমিলের বিজ্ঞাপন দিতে গিয়ে যেসব কথা লেখা হয়েছে, তাতে যেমন তৎকালীন সমাজের একটি চিত্র পাওয়া যায়, তেমনি বস্ত্রশিল্পের এবং শ্রমিক শ্রেণীর বিভিন্ন দাবি-দাওয়া প্রসঙ্গে সমালোচনীয় সমাজতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণায় অসঙ্গতি বা মালিক স্বার্থের প্রতি আনুকূল্যও প্রকাশ পেয়েছে। সম্পাদক গোষ্ঠীর কোনো-কোনো সদস্য কি বস্ত্রমিলের মালিকদের কেউ?—এ-ধারণাও করা অসঙ্গত মনে হয়না। লক্ষ্মী স্পিনিং এ্যাণ্ড উইভিং মিল্‌স লিঃ, নারায়ণগঞ্জ-এর বিজ্ঞাপনে লেখা হয়েছে : 'অন্ন ও বস্ত্রের দারুণ দুর্ভিক্ষ আজ আমাদের সকল উৎসবকে ম্লান করিয়া দিয়াছে।' আরও লেখা হয়েছে : 'ভারতবর্ষ আজ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে কিন্তু আজও আমরা পরিধেয় বস্ত্রের জন্য বিদেশী আমদানীর মুখাপেক্ষী। আজ এই বৈপ্লবিক যুগেও যদি আমরা স্বাবলম্বী হবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা না করি, তবে আমাদের বহু বৎসরের আত্মত্যাগ ব্যর্থ হয়ে যাবে।'

'পূর্ব পাকিস্তানের শিল্প সম্ভার : বস্ত্রশিল্প' শীর্ষক নিবন্ধে জনৈক 'পরিচালক' লিখেছেন : 'সমাজ ও সাহিত্যে শিল্পের স্থানকে অস্বীকার করা চলেনা। তাই শিল্পের সম্বন্ধে যে কোন প্রবন্ধ সাদরে গৃহীত হবে।' এই পার্থিব জগতে সমস্ত সমস্যার মূলে রয়েছে দুটি একটি প্রশ্ন। অপরটি বস্ত্র। বস্ত্র-সমস্যা পূর্বপাকিস্তানের অত্যাবশ্যকীয় সমস্যা। এর সমাধান করতে হলে বস্ত্রশিল্পের সার্বিক পর্যালোচনা করা দরকার। দেখা যাবে বস্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রে যান্ত্রিকযুগের একাধিপত্য।

আলোচনায় পূর্ব পাকিস্তানের বস্ত্রমিলগুলোর উৎপাদনের অবস্থা, আলোচনায় তুলে ধরা হয়েছে—যা তথ্য হিসেবে উল্লেখযোগ্য :

বস্ত্রকলসমূহ	তাঁত সংখ্যা	উৎপাদনের হার
১. ঢাকেশ্বরী কটন মিল (১নং মিল)	৭৮০	৩৩,০০,০০০, গজ
২. ঢাকেশ্বরী কটন মিল (২নং মিল)	৫১১	.
৩. চিত্তরঞ্জন কটন মিল	১৫০	৪,০০,০০০ গজ
৪. লক্ষ্মী নারায়ণ কটন মিল	২২২	৪,২৫,০০০ গজ
৫. ঢাকা কটন মিল	১২৪	২,২৫,০০০ গজ
৬. মোহিনী মিল (১নং)	৫১৭	১৫,০০,০০০ গজ
৭. আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্রকটন মিল	১১০	২,০০,০০০ গজ
৮. ন্যাশনাল কটন মিল	৩০০	৬,০০,০০০ গজ
৯. ভাগ্যলক্ষ্মী কটন মিল	৬	১২,০০০ গজ
১০. আবুবকর সিদ্দিক কটনমিল	১০০	২,০০,০০০ গজ
১১. লক্ষ্মী স্পিনিং মিল	x	x
	মোট ২৮২০	মোট ৬৮,৬২,০০০ গজ

পর্যালোচনায় বলা হয় : এইসব মিল থেকে উৎপাদনের সঠিক তথ্য পাওয়া না-গেলেও সম্ভাব্য উৎপাদনকে গণনা করেই আমরা আলোচনা করেছি। এতে দেখা যায়, পূর্ব-পাকিস্তানের সমস্ত কল থেকে মাসে মোট প্রায় ৬৮,৬২০০০ গজ কাপড় পাওয়া যায়—অর্থাৎ বছরে প্রায় ৮,২৪,৬৪০০০ গজ কাপড় পাওয়া যায়। পূর্ব পাকিস্তানের লোক সংখ্যা প্রায় ৩,৯১,১১,৯১২। বছরে ১টি লোকের অন্যান্য ৩০ গজ কাপড়ের প্রয়োজন পড়ে। ২০ গজ ধরলেও... উৎপাদিত কাপড়ের পরিমাণ থেকে সোয়া দুই গজ কাপড় মাথা পিছু পেতে পারি। এত বড় সমস্যা সমাধান করতে হলে উৎপাদিত কাপড়ের পরিমাণে দশগুণ বাড়তে হবে। শুধু কলের সংখ্যা বাড়ালে চলবেনা—তার সঙ্গে প্রয়োজন হবে সুদক্ষ কারিগরের। মিল মালিকগণকে শুধু কল উৎপাদন এবং লাভের অঙ্ক দেখলেই চলবেনা। যে শ্রমিক এ উৎপাদন ও লাভের অঙ্ক বাড়িয়ে চলেছে তাদের উপরও দৃষ্টি দিতে হবে। তাদের দক্ষতার (EFFICIENCY) বিরুদ্ধে নালিশ জানালেই চলবেনা তাদের দক্ষতা বাড়াবার জন্য তাদের জীবন ধারণের মাস বাড়িয়ে তুলতে হবে—বুঝিয়ে দিতে হবে দায়িত্ববোধকে।

...শ্রমিকের জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। শ্রমিকদেরও একটা দায়িত্ব আছে। সে দায়িত্ব কতটুকুন তাঁরা পালন করবেন তাও তলিয়ে দেখতে হবে। একদিকে যেমন সস্তা সাম্যবাদী বুলি আওড়িয়ে শ্রমিকদের অস্বাভাবিক দাবী পূরণের আশায় বিভ্রান্ত করে দেওয়া উচিত নয়, তেমন শ্রমিকদের অশিক্ষিত রেখে তাদের জীবন মান কমিয়ে, তাদের দক্ষতাকে পঙ্গু করে রাখা উচিত নয়।...শ্রেণী সংগ্রাম বা class struggle-এর যুক্তি দেখিয়ে মার্কসীয়পন্থীরা যেমন দেশের শিল্পকে পঙ্গু করে তুলছে, তেমনি Burganing মাস্টারের মত অনেক পুঁজিপতি দরকমাকমি করে মানুষের জীবন ধারণের সবচেয়ে নীচু মানকে উপেক্ষা করে শিল্পের প্রসার ক্ষুণ্ণ করে তুলছেন।<sup>৪</sup>

কৃষ্টি-র 'রাষ্ট্রীয় আদর্শ'বোধের প্রতিফলন ঘটেছে সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী চিন্তার সপক্ষে অবস্থান নেয়াতে। ঐতিহ্যের প্রশ্নেও বাঙালির অবিভাজ্য সাংস্কৃতিক সত্তাকেই তাঁরা প্রাধান্য দিয়েছেন। পাকিস্তানি সংস্কৃতি অর্থাৎ একজাতি, একধর্ম, একরাষ্ট্র, এক স্বার্থ—এই চিন্তাকে সর্বাত্মকভাবে সমর্থন করেননি কৃষ্টির কর্ণধারেরা। তাঁরা কটাক্ষ হেনেছেন আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদকেও। 'উল্লসিত সাম্রাজ্যবাদী' শীর্ষক সম্পাদকীয় নিবন্ধে লেখা হয় :

জটিল কটনীতির দুর্ভেদ্য চক্রান্ত ও সুদীর্ঘ দু শতাব্দীব্যাপী শ্রম ও সাধনার ফলে ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনে যে সার্থক সাম্প্রদায়িক কলহের সুদৃঢ় ভিত্তি রচনা করা হয়েছে তাতে করে চার্চিল যে অত্যধিক প্রলুব্ধ হয়েছেন তা তাঁর সম্প্রতি প্রদত্ত এলেক্স শহরের বন্ধুত্বতেই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।... কুচক্রী বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এতদিন নির্বিবাদে যাদের শোষণ করে আসছিল, আজ তারা বৃটিশ নাগপাশ ছিন্ন করেও সুস্থ বোধ করতে পারছে না এটুকুই কি সাম্রাজ্যবাদীদের আজ সান্ত্বনার কারণ নয়? আজ আমাদের একথা কিছুতেই ভুলে চলবেনা যে সাম্প্রদায়িক অশান্তি যদি এখনও প্রশ্রয় প্রায়, তাহলে আমাদের সর্বনাশ অনিবার্য। দেশের সাংস্কৃতিক ঐক্যবোধকে সৃষ্টি ও সম্মত রাখবার গুরুদায়িত্ব আজ আমাদেরই ওপর ন্যস্ত। যারা এখনও মধ্যযুগীয় দুর্নীতি সমর্থন করে, তারাই যে নিঃসংশয়ে নবজাত পাকিস্তান এবং ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের শত্রু, একথা উপলব্ধি করবার সময় আমাদের সম্মুখীন।

'বাঙালি বিদ্বেষ' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে বলা হয় : 'বিহার ও আসামের বিভিন্নস্থানে বাঙালি বিদ্বেষ অত্যন্ত প্রকট হয়ে দাঁড়িয়েছে। ... বাঙলা ও আসামের মধ্যে বিদ্বেষের প্রশ্ন নিতান্তই অব্যাহতনীয়, যুক্তিহীন ও বিশ্বয়কর; বরং বাঙালি ও অসমিয়াদের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্ব ও অকুষ্ঠ নৈকট্যের প্রসারই সমধিক কাম্য।'

'শিক্ষার ভাবী মাধ্যম' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে বলা হয়।... 'আজ আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি; পরকীয় প্রভাব-জর্জর-সংস্কৃতিক মোহ থেকে নিস্কৃতি লাভ করবার এই-ই প্রকট সময়। ইংরেজি ভাষার সাংস্কৃতিক মূল্য অস্বীকার না-করলেও রাষ্ট্রীয় জীবনের গঠনমূলক সম্পর্কে ইংরেজি ভাষার মূল্য আমরা অস্বীকার করবো বৈকি! শুধু শিক্ষা-সংক্রান্ত ব্যাপারেই নয়। শাসনকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রেও বাংলার মাধ্যম সুপ্রবর্তিত হোক আমরা এ কামনাই করবো।'

পত্রিকাটি হিন্দু সম্পাদিত বলে কমিউনিস্ট, পাকিস্তান-বিরোধি এবং ভারতের দালাল খ্যাতি পেয়ে থাকবে সমকালে, কিন্তু তাঁরা যে দেশপ্রেমিক স্বদেশহিতৈষী ছিলেন এবং পূর্ব বাঙলার সার্বিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা শহরেরও শ্রীবৃদ্ধি চাইতেন, তার পরিচয় পাওয়া যায় 'পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকা শহর' শীর্ষক সম্পাদকীয় মন্তব্যে। নতুন রাজধানীকে উন্নত করার এবং রাজধানীর সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আবাসিক বাসস্থানের ব্যবস্থা করা যে জরুরি সে বিষয়ে পত্রিকাটি যুগোপযোগী প্রস্তাব উত্থাপন করে এবং প্রসঙ্গত রেখে-ঢেকে তাঁরা যে-কথাটি বলতে চেয়েছেন, তাহলো সংখ্যালঘু হিন্দুদেরকে জোর করে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে/উঠিয়ে দিয়ে সরকারি কর্মচারীদের বাসস্থান সমস্যা দুরিকরণের প্রয়াস হীন পদ্ধতি। পরিত্যক্ত বাড়ি দখল সম্পর্কে পত্রিকার বক্তব্য : 'সরকারপক্ষও যেমনি বাড়ি দখল করবার মনোভাব রাখবেন না, জনসাধারণও তেমনি বাড়ি আটক রাখবার মনোভাব রাখবেন না।'

সরকারি মনোভাবকে কটাক্ষ করা হলেও চাপের মুখে এ ব্যাপারে খোলাখুলি মতামত ব্যক্ত করতে পারছিলেন না বলে কমিউনিস্ট বা মার্কসীয় মতাদর্শের পত্রিকার তথা সংখ্যালঘুদের বাক্য, ব্যক্তি ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা যে কতোটা হুমকির সম্মুখীন ছিল মানসচক্ষু সামান্য উন্মীলন করলেই তা সহজে উপলব্ধি করা যায়।

ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ, উন্নতির চিন্তা করে সকল বিষয়েই যেনো আদর্শ-স্থানীয় হয়ে ওঠে পাকিস্তানের সকল নাগরিক—সেজন্য অবতারণা করেছিলেন রাষ্ট্রভাষার পরিপ্রেক্ষিত। এই প্রবন্ধে তিনি উর্দুকে একটি অপরিচিত বিদেশি ভাষা বলে বর্ণনা করেন এবং এই ভাষাকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন, ‘এই ভাষাকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা রূপে স্বীকার করিয়া লইলে, বাংলা ভাষার সমাধি রচনা করিতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানবাসীরও জাতি হিসাবে ‘গোর’ দেওয়ার আয়োজন করিতে হইবে।’ রাষ্ট্রভাষার সঙ্গে জাতীয় মর্যাদা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন জড়িত। উর্দু ইসলামি সাহিত্যে সমৃদ্ধ, উত্তর-ভারতীয় মুসলমানদের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করা দরকার—এইসব যুক্তির অসারতা প্রদর্শন করে লেখক পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য উর্দু এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেবার প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন :

‘এক রাষ্ট্রে একাধিক রাষ্ট্র ভাষা অচল এই শ্রেণীর ধারণা সাম্রাজ্যবাদের পরিপোষক।’ উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রমাত্র করার সম্ভাব্য ফলাফল বিশ্লেষণ করে তিনি বলেন : ‘ইহাতে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় সর্বনাশ ঘটিবে।...উর্দু বাহিয়া আসিবে পূর্ব-পাকিস্তানবাসীর মরণ,— রাজনৈতিক, রাষ্ট্রীয়, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক মৃত্যু। এই রাষ্ট্রীয় ভাষার সূত্র ধরিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি সর্ববিষয়ে পূর্ব-পাকিস্তান হইবে উত্তর ভারতীয় এবং পশ্চিম পাকিস্তানী উর্দুওয়ালাদের শাসন ও শোষণের ক্ষেত্র, যেমন ভারত ছিল ইংরেজি রাষ্ট্র ভাষার সূত্রে ইংরেজদের শাসন ও শোষণের ক্ষেত্র—এই বক্তব্যে উর্দুকে বিদেশি ইংরেজির মত রাষ্ট্রভাষার সমপর্যায়ে স্থাপন এবং একমাত্র উর্দুকে রাষ্ট্রভাষার প্রস্তাবকে ঔপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণের হাতিয়ার হিসেবে বর্ণনা লক্ষণীয়।’<sup>৭</sup>

মুহম্মদ এনামুল হকের প্রবন্ধটি ঐতিহাসিক গুরুত্ব লাভ করার সাথে সাথে ‘কৃষ্টি’ও স্মরণীয়ের মর্যাদা লাভ করেছে। প্রবন্ধের মূল্যবান অংশটা উদ্ধৃত করা হলো :

‘পাকিস্তান একটি বিশাল রাষ্ট্র। পূর্ব ও পশ্চিম—এই দুই অঞ্চলে ইহা বিভক্ত।...এক অংশের সহিত অপর অংশের যোগাযোগ রক্ষা করা একটা জটিল সমস্যায় পরিণত হইয়াছে।... দেশে অশান্তি দেখা দিলে যোগাযোগ রক্ষা করা একরূপ কঠিন। এই সমস্যার সূচারু সমাধান কখন সম্ভবপর হইবে, তাহা একমাত্র ভবিষ্যৎই বলিতে পারে।

সংস্কৃতির দিক হইতেও পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের অবস্থা একরূপ নহে।...প্রকৃতিই এই অঞ্চলের লোককে এমনভাবে সৃষ্টি করিয়াছে যে, ইহাদের মধ্যে...সাংস্কৃতিক দিক হইতে কোন প্রকার সামঞ্জস্য নাই।

তবে ধর্মীয় দিক হইতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান একসূত্রে আবদ্ধ—বলা বাহুল্য, এই অঞ্চলদ্বয়ের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কথা বাদ দিয়াই চিন্তা করা হইতেছে। মনে রাখা উচিত, ধর্ম মানব-সংস্কৃতির একটি প্রধান অংশ বটে, কিন্তু ইহা তাহার সমস্তটুকু নয়। একমাত্র ধর্ম ব্যতীত মানব সংস্কৃতির অন্যান্য দিক, যেমন, ভৌগোলিক



প্রভাব, মানব-গোষ্ঠীগত বৈশিষ্ট্য, জীবন-যাপন-প্রণালী, শিক্ষা-দীক্ষা, আচার-ব্যবহার প্রভৃতি দিক হইতে পাকিস্তানের উভয় অংশে সাদৃশ্যের চেয়ে বৈসাদৃশ্যের ভাগই বেশী।

ধর্ম-বন্ধনও অচ্ছেদ্য বন্ধন নহে।... ভাষার বন্ধনও অচ্ছেদ্য বন্ধন নহে।... ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক প্রেরণাকে যাহারা এই নবীন রাষ্ট্রের অন্তঃসলিলা ফল্গু বলিয়া মনে করেন, কিংবা প্রকৃত রাষ্ট্রীয় বন্ধন বলিয়া নির্বিচার স্বীকার করেন, তাহাদের রাষ্ট্রীয় দৃষ্টি স্বচ্ছ ত নহেই; বরং অদূরদর্শিতার ঘোর কুয়াশাজলে সমাচ্ছন্ন।... পাকিস্তান রাষ্ট্রগঠনে ধর্ম বা সাম্প্রদায় বড় নহে, আত্মনিয়ন্ত্রণই বড়। কেননা, আত্মনিয়ন্ত্রণ-নীতির ভিত্তিতেই এই রাষ্ট্র পরিকল্পিত ও পরিমূর্তিত। মনে রাখিতে হইবে, আত্মনিয়ন্ত্রণ-নীতি স্বার্থপরতার নীতি,—নিঃস্বার্থতার নীতি নহে। এইজন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে আত্মনিয়ন্ত্রণের অর্থ আত্মপ্রাধান্য স্থাপন;—আত্মবিসর্জন নহে। কারণ আপন-আপন ধর্ম-কর্ম, শিক্ষা-দীক্ষা, ভাব-ভাষা, সভ্যতা-সংস্কৃতি, জীবন-যাপন প্রণালী প্রভৃতির ন্যায় বিষয়গুলো সন্মানজনকভাবে রক্ষা ও পুষ্ট করিয়া স্বাধীনভাবে ঐচ্ছিয়া থাকার নামই আত্মনিয়ন্ত্রণ। যেখানে আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন, ধরিয়া লইতে হইবে, সেখানে নিজেদের চিন্তাই প্রবল, অপরের চিন্তা দুর্বল। এই নীতিতে পাকিস্তান-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত বলিয়া এই রাষ্ট্রাঙ্গগত দেশগুলি বিশেষ করিয়া পূর্বপাকিস্তান যদি নিজেদের কথাই বেশী করিয়া চিন্তা করে, তাহাতে অন্তাভাবিকতা দেখিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই।

প্রকৃত পক্ষে, পূর্বপাকিস্তান বর্তমানে নিজেদের কথাই বেশী করিয়া ভাবিতেছে। ইহার একমাত্র কারণ,—নানাদিক হইতে আজ তাহার আত্মনিয়ন্ত্রণনীতি আক্রান্ত। অধিকন্তু ভাষার দিক হইতে এই নীতি আক্রান্ত হইবার যে সম্ভাবনা সম্প্রতি দেখা দিয়াছে, তাহাতে পূর্বপাকিস্তানের পক্ষে বিচলিত হইবারই কথা। পূর্বপাকিস্তানের আপন ভাষা বাংলা। আত্মনিয়ন্ত্রণনীতি অনুসৃত হইলে, পাকিস্তানের দিক হইতে বাংলা ভাষার উপর হস্তক্ষেপ করা যায়না। কিন্তু চতুর্দিকের হাব-ভাব দেখিয়া মনে হইতেছে, রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে বাংলা উদূর দ্বারা স্থানান্তরিত হইবে। এই সম্ভাবনাই পূর্ব-পাকিস্তানের জীবনী-শক্তির মূলে আঘাত করিয়াছে। সুতরাং পূর্বপাকিস্তান বিচলিত না হইয়া পারে না।

সম্প্রতি অনেকেই উদূরকে সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা রূপে চালাইবার কথা চিন্তা করিতেছেন।... তবে, একথা একমুহূর্তেই সত্য যে, যদি তাঁহারা উদূরকে রাষ্ট্রভাষা রূপে গ্রহণ করেন, তাঁহাদের মাতৃভাষা বাংলাকে উৎসর্গে মারিবার ব্যবস্থা পূর্বাঙ্কেই করিয়া রাখিতে হইবে। কেননা, রাষ্ট্রভাষার পক্ষাভেদে থাকিলে এক বিরাট রাষ্ট্র-শক্তি। এই ভাষার সহিত সন্তোষ করিয়া ঐচ্ছিয়া থাকার শক্তি যে বাংলাভাষার নাই, সে কথা মনে করি। কিন্তু তাহা জীবনমুখ অবস্থায় ঐচ্ছিয়া—আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতিতে ঐচ্ছিয়া নয়। এই জাতীয় ঐচ্ছার চেয়ে আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতিতে ঐচ্ছার মূল্য অনেক। আমার দেশে আমি ঘরে বাহিরে আমার ভাষায় কথা বলিতে পারিব না, আমার ভাষায় লিখিতে পড়িতে পারিব না, ব্যবসা-বাণিজ্য চালাইতে পারিবনা, মনের মত করিয়া সুখ দুঃখ প্রকাশ করিতে পারিব না;—ইহার চেয়ে বৃহৎ আত্মপ্রবন্ধনা ও আত্মহত্যা আছে কি? সত্যই আমার আত্মপ্রবন্ধনা ও আত্মহত্যাকে যদি আত্মনিয়ন্ত্রণ বলিয়া স্বীকার করিয়া লই, তবে কে আমাদিগকে, ঐচ্ছিয়াইবে?'

...লেখক উদূর পক্ষের যুক্তিগুলো খণ্ডন করেন একে একে। যেমন : 'উদূরকে রাষ্ট্রভাষা রূপে পাকিস্তানে চালু করিবার পক্ষে আর একটি যুক্তি দেখান হইয়া থাকে; তাহা ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে যোগাযোগ ও ভাব আদান-প্রদানের অজুহাত। ইহার ন্যায় এমন দুর্বল যুক্তি সচরাচর খুব বেশী দেখা যায় না।... ধর্মের নামে যাহারা অকারণে উদূর-প্রীতি পোষণ করিয়া থাকেন, তাহারা একান্তই ভ্রান্ত।' নানা দিক থেকে তিনি উদূর সপক্ষ সুপারিশগুলোর পর্যালোচনা করে বাংলার বিপক্ষ যুক্তিগুলো খণ্ডন করে উপসংহারে তিনি বলেন :

'মোটের ওপর, বাংলাকে ছাড়িয়া উদূরকে রাষ্ট্রভাষারূপে পূর্ব-পাকিস্তানবাসী গ্রহণ করিলে, তাহাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মৃত্যু অনিবার্য। ইংরেজ আমলের প্রথমদিকে বাংলার মুসলমান ইংরেজী ভাষাকে গ্রহণ না করিয়া যে-জাতীয় আত্মঘাতী ভুল করিয়াছিলেন, পূর্ব-পাকিস্তানবাসী এইবার উদূরকে গ্রহণ করিলে অবিকল ঐ জাতীয় আর একটি রাজনৈতিক ভুলের পুনরাবৃত্তি করিবেন। এখনও এই ভুল করা হয় নাই, এখনও সাবধান হইবার সময় আছে।

মাহাতে এই জাতীয় আত্মঘাতী এবং জাতিঘাতী ভুল অদূর ভবিষ্যতে না হইতে পারে, এখন হইতে সেই বিষয়ে সকলের সজাগ ও সচেতন হওয়া অত্যন্ত আবশ্যিক।' (পৃ-৩৮)

পত্রিকার সার্বিক চারিত্রের সঙ্গে ভাব-বক্তব্য ও চিন্তার সঙ্গে মুদ্রিত কবিতা গল্প, নাটকের বক্তব্য ও চিন্তাধারার সঙ্গতি রয়েছে। বালাবাহুল্য, রচনাগুলো নির্বাচনের মধ্য দিয়েও চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হয়েছে।

আবদুল মান্নান একজন কিশোর কবি (৮ম শ্রেণীর ছাত্র)। তার ঝাণ্ডা উড়াও শীর্ষক কবিতায় অসাম্প্রদায়িক ভাবটি স্পষ্ট ফুটে উঠেছে :

'আশার তরী বেয়ে রে আজ জিন্না জহর পেল ফুল,/উচ্চ করি আজকেরে তোর স্বাধীনতার ঝাণ্ডা  
তোল/জাতির বিচার ভেদ ভুলিব,/সবার সাথে হাত মিলাবো,/হিন্দু-মোসলেম ভাই বলিয়া বুকে দিব কোল'  
(পৃ-৪২)

শ্রী গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জাতীয় পতাকা' শীর্ষক কবিতায় সাম্যবাদী চিন্তা প্রকাশ পেয়েছে নতুন দেশের পরিবর্তিত নতুন পরিস্থিতিতে সর্বশ্রেণীর সর্বহারাদের প্রতি নতুন ভাবে মনোযোগের দাবি নিয়ে :

দুশো বছরের শেত জঞ্জির খোল/জাতীয় পতাকা উর্ধ্ব গগনে বী দর্পে তোল। /নীচতায় ভরা হিংসা বিষের  
হানাহানি ভোল,.../নব আদর্শে গঠনের কাজে লাগো,/পুরানো সমাজে গাণ্ডীব হাতে বিপ্লব নিয়ে জাগো।  
/পুণ্য লগনে বিপ্লবী বীর নওজোয়ান,/স্বাধীন পতাকা দলে দলে সবারে তোরো ডাকিয়া আন।

সর্বহারা মজদুর সাথে কাঁধে কাঁধ দিয়ে আয় কমাণ,/ত্যাগের মস্ত্রে দৃঢ় বিশ্বাসে এই  
পতাকার রাখিতে মান।' (পৃ-৪৩)

কিরণশংকর সেনগুপ্ত 'স্বল্পতা' শীর্ষক কবিতায় মানুষের হৃদয়দৈন্য দূর করার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ। তাঁর দুঃখ হলো, জিজ্ঞাসা-চিহ্নিত সামাজিক ব্যাধিগুলোর এখনও নিরাময় হলো না—  
“হৃদয়ের গভীর কোণে প্রশ্ন জাগে আর কতকাল,/পৃথিবীতে নেমে এসে স্বল্পতা কেবল/বাড়াবে হৃদয় দৈন্য বেদনা অতল ;’

'রবীন্দ্রনাথের চিঠি' শীর্ষক প্রবন্ধ তৎকালীন সমাজ, সাহিত্য ও সমকালকে জানবার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। চিঠির মূল্য সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে রবীন্দ্রনাথের চিঠি বাংলা সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের আলোচনা পাকিস্তানে তখন প্রায় ছিলই না যখন, তখন 'কৃষ্টি'র প্রয়াস ছিল ব্যতিক্রমী,-অবশ্য এর কারণও ছিল। ক্রমে দেখা যাবে, পূর্ব বাঙলার পত্র-পত্রিকায় রবীন্দ্র-বিষয়ক আলোচনা খুব কমে আসবে। এক সময় থাকবেই না। ১৯৬১ও ১৯ ৬৭-র পরে বৃদ্ধি পাবে আবার। রাজনীতিও-সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য চিন্তায় রবীন্দ্র-প্রসঙ্গও পরিবর্তনের ইতিহাসকে স্বীকার করে আছে।

নাটক 'সাইরেন'এ জীবন-নাটকের পাঠ এবং জীবনের প্রতি অঙ্গীকার ব্যক্ত হয়েছে। 'স্মৃতি-তীর্থ' শীর্ষক গল্প বিশ শতকের প্রথম দিককার রাজনীতির প্রেক্ষাপটে সোস্যালিস্ট রেভলুশনার্যারি পার্টির কর্মী উচ্চ শিক্ষিত দুই তরুণ-তরুণীর প্রেমের ঘটনা ব্যক্ত হলেও এতে দেশ সেবার ব্রতই মুখ্য আদর্শ রূপে উপস্থাপিত। নায়ক নতুন প্রেমিকা তনুশ্রীর নামে তার

পৈত্রিক জমিদারি বাড়িটিকে পার্টির অফিসের জন্য দান করে তার নামকরণ করে 'তনুশ্রী-ভবন', তথাপি দুজনে বিয়ে করেনা। দেশপ্রথমে উদ্বুদ্ধ ত্যাগী চারিত্রিক দৃঢ়তা ও মনোবল সৃষ্টি করাই গল্পের উদ্দেশ্য।

পত্রিকাটির পরিচয়ে দুটো বিষয় স্পষ্ট—একটি হচ্ছে—কম হলেও মুসলিম লেখক এতে আছেন, তাঁদের চিন্তাও প্রাগ্রসর, বৈপ্লবিক, দূরদর্শী। আর অধিকাংশ লেখকই হিন্দু। পূর্ববঙ্গের বসত্রকলগুলোর মালিকও হিন্দু-শিল্পপতিগণ নাম থেকে বোঝা যায়। সাতচল্লিশ-সংলগ্ন সময়কালে হিন্দু-সমাজের বর্ণাঢ্যতার পরিচয় আছে এ পত্রিকায় আর আছে বেদনাদায়ক চিত্র—সরকারি কর্মকর্তাদের দ্বারাও হিন্দুদের আবাসগুলো একে একে দখল হয়ে যাচ্ছে। এই দখল বা অধিগ্রহণের কালে কতো যে জীবন-বিরোধী অমানবিক ঘটনার অবতারণা হয়েছিল তাও অনুমেয়। সমাজ পরিবর্তিত হতে হতে নতুন মাত্রা লাভ করবে যে কৃষ্টি তারই সাক্ষ্য দিচ্ছে।

১৯৪৭ সনে প্রকাশিত মাসিক 'কৃষ্টি' সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সমাজ-ভাবনার ক্ষেত্রে এক অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালনের ব্রত নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিল। কিন্তু সামাজিক সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতিই তাঁদেরকে বেশীদূর অগ্রসর হতে দেয়নি। তবু যে অভিপ্রায় ফুটে উঠেছে একটি সংখ্যার মধ্য দিয়েও তা অত্যন্ত উজ্জ্বল এবং ঐতিহাসিক গুরুত্বের দাবিদার।

### তথ্যপঞ্জি

১. মোহাম্মদ আবদুল কাইউম, 'পূর্ব পাকিস্তানের সাময়িকপত্র', আমাদের সাহিত্য, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৬৯, পৃ. ২৩৯।
২. আবদুল হক, 'ভাষা-আন্দোলনের পটভূমি', ভাষা-আন্দোলনের আদিপর্ব, মুক্তখারা, ঢাকা ২য় সংস্করণ ১৯৮৪, পৃ. ৬৩।
৩. বাংলা ভাষার রাজনীতি ও তৎকালীন সামাজিক অবস্থার আলোচনার প্রথম সূত্রেই 'কৃষ্টি'উল্লেখিত হয়ে থাকে। বিশেষ করে 'ভাষা-আন্দোলন' শুরু হবার আগেই বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার সুপারিশমূলক ড. মুহাম্মদ এনামুল হকের প্রবন্ধ ('পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার পরিপ্রেক্ষিতে উর্দু ও বাংলা')-টির কথা মূল্যবান আলোচনা-গ্রন্থ/ গবেষণা এবং ইতিহাসে গুরুত্বের সঙ্গে উল্লিখিত হয়ে থাকে।
৪. কৃষ্টি, কার্তিক ১৩৫৪, পৃ. ৪১।
৫. আবদুল হক, ভাষা আন্দোলনের আদিপর্ব, পৃ. ৪৯।

## ২. সীমান্ত

(১৯৪৭-৫২)

দেশের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার সৌভাগ্য হয় না সকল কর্মের। কিন্তু ১৯৫২ সনের একুশে ফেব্রুয়ারিতে ঢাকায় গুলিবর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে লেখা প্রথম কবিতা ‘কাদতে আসিনি, ফাঁসীর দাবী নিয়ে এসেছি’র তা হয়েছিল। বাজেয়াপ্ত হলেও (১৯৫২ সনে) হাতে হাতে কবিতাটি পূর্ব বাঙলার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে গিয়েছিল। ড. আনিসুজ্জামান লিখেছেন :

‘একুশের প্রথম কবিতা যে মাহবুব উল আলম চৌধুরী লিখলেন, তা হয়তো এক আকস্মিক ঐতিহাসিক ঘটনা। কিন্তু একুশে ফেব্রুয়ারি নিয়ে কবিতা তাঁকে লিখতেই হতো—তঁার সমগ্র জীবনাচরণ ও সাহিত্য চর্চার ধারায় তা ছিল অনিবার্য। নিতান্ত অল্প বয়স থেকেই রাজনীতি ও সংস্কৃতিকে তিনি মিলিয়েছিলেন একই স্রোতে।’

মাহবুব উল আলম চৌধুরীর (জ. ৭ নভেম্বর ১৯২৭) ‘সীমান্ত’ পত্রিকা এবং পত্রিকার মাধ্যমে গড়ে ওঠা ‘সাংস্কৃতিক বৈঠক’ থেকে সৃষ্ট ‘প্রান্তিক নবনাট্য সংঘ’ এবং এগুলোর মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক সম্মেলন (১৯৫১) প্রভৃতি পূর্ব বাঙলার বৈপ্লবিক রাজনৈতিক-আন্দোলনের সম্পূর্ণ প্রগতিশীল গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ধারার মূল সূত্রও বৈধ দিয়েছিল। এর সবই আজ ঐতিহাসিক ঘটনা। এর সঙ্গে জড়িত সকল ব্যক্তি, পত্র-পত্রিকা, পুস্তক, কবি-সাহিত্যিকদের অসংখ্য কার্যাবলিও বিশেষ ‘মর্যাদার’ অধিকারী হয়ে আছে। ‘সীমান্ত’ও তাই ‘মর্যাদাবান মাসিক সাহিত্য পত্রিকা’ হিসেবে বাঙলাদেশের সাহিত্যের ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে আছে। সীমান্ত-সম্পাদক মাহবুব উল আলম চৌধুরীর জীবন-সাধনার সঙ্গে পত্রিকা ও সাহিত্য-সংস্কৃতির সাধনা একাত্ম হয়ে আছে। একটার কথা বলতে গেলে অপরটা চলে আসে সঙ্গত কারণে।

তরুণ কুমার, মার্কসীয় মতাদর্শে দীক্ষিত অথচ রোমান্টিক ভাব-প্রবণতায় উজ্জ্বল, আবেগদীপ্ত মাহবুব উল আলম চৌধুরী পিতৃহীন (পিতা আবদুর রহমান চৌধুরী, গহিরা, চট্টগ্রাম) হয়ে মামা আহমদ সগীর চৌধুরী (মুসলিম লীগের চট্টগ্রাম অঞ্চলের প্রভাবশীল নেতা)-র পৃষ্ঠপোষকতায় লেখাপড়া করে (গহিরা হাইস্কুল, চট্টগ্রাম থেকে) ১৯৪৫ সনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২টি লেটার নিয়ে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৪৭ সনে তিনি চট্টগ্রাম কলেজে ভর্তি হন। ১৯৪৮ সনে উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণীর দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। তখন মৌলো টাকা সরকারী বৃত্তিও তিনি পেতেন। কিন্তু তখনকার পূর্ব বাঙলার গভর্নর কলেজ পরিদর্শনে এসে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে কলেজ-মিলনায়তনে বক্তৃতাকালে বাংলা ভাষা সম্পর্কে কটু মন্তব্য করে আরবি হরফে বাংলা প্রচলনের পক্ষে মতামত ব্যক্ত করলে মাহবুব-উল আলম চৌধুরী প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে এ নিয়ে শেষ পর্যন্ত লেখাপড়া অসমাপ্ত রেখেই কলেজ ছাড়তে বাধ্য হন। চট্টগ্রাম কলেজের অধ্যক্ষ আবু হেনা ক্ষমা চাইবার পরামর্শও দিলেন, কিন্তু তাতে তিনি সম্মত হলেন না, কারণ ডিগ্রির প্রতি তাঁর মোহ ছিল না। নচেত কলকাতা গিয়ে পড়াশুনা করাও তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল—সে ইচ্ছা ও প্রেরণা বশে তিনি কলকাতা গিয়েওছিলেন। কিন্তু কমরেড মুজফফর আহমদ নিরুৎসাহিত করলেন। সীমান্ত

সম্পর্কে মুজফ্ফর আহমদ বলেছিলেন—এটাকে ‘কমিউনিস্ট পার্টির পত্রিকা করবেন না’। মাহবুব উল আলম চৌধুরী নিজেও কমিউনিস্ট পার্টির কার্ড হোল্ডার কমরেড ছিলেন না বটে, কিন্তু খাটি কমিউনিস্ট বলতে যা বোঝায়, তিনি ছিলেন মনে-প্রাণে তাই।

মুক্তবুদ্ধির চর্চা আর রোমান্টিক মানস-প্রবণতা তাঁকে অনেক দুঃসাহসী কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। সরকারের খাতায় কমিউনিস্ট হিসেবেই তাঁর নাম ছিল। রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে পরিবর্তন এলেই তাঁকে আগুর গ্রাউণ্ডে চলে যেতে হত। বাসা, মালপত্র খানা-তল্লাসী হতো। এজন্য সুশৃঙ্খলভাবে সাহিত্য-চর্চা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। লিখেছেন অনেক, কিন্তু নমুনা নেই। বই-পুস্তক প্রচার করে খ্যাতি অর্জনের জন্যও পরে আর তেমন উৎসাহী হতে দেখা যায় না তাঁকে। ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু অনুরুদ্ধ হয়ে কিছু কিছু বলতে ও প্রকাশ করতে উদ্যোগী হন বলেই বাঙালির ও বাঙলাদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির জন্য কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তাঁর থেকে জানা সম্ভব হয়েছে। তা থেকে দেখা যায়—ইতিহাসের পাতায় সংযুক্ত হয়েছে অজানা অনেক তথ্য<sup>২</sup> ও উপাদান।

মাহবুব উল আলম চৌধুরীর কর্মজীবন সাহিত্য চর্চার আর সংস্কৃতি সেবার মাধ্যমেই শুরু হয়েছিল ১৯৪৫ সনে যখন তিনি সপ্তদশ বা অষ্টাদশ বর্ষীয় তরুণ মাত্র। তখনই (১৯৪৫) তিনি প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের চট্টগ্রাম জেলা শাখার নির্বাচিত সহকারী সম্পাদক। ১৯৪৫ সনে চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের জন্মজয়ন্তী উৎসবের অন্যতম সংগঠক ছিলেন তিনি। ১৯৪৬ সনে চট্টগ্রামে নজরুল ইসলামের জন্মজয়ন্তী উৎসবের আয়োজন প্রথম হয় যে-পরিষদের উদ্যোগে, মাহবুব উল আলম ছিলেন তার সাধারণ সম্পাদক। বিশ্বশান্তির পক্ষে বাঙলাদেশে প্রথম প্রচারক ও স্বাক্ষরসংগ্রহের কৃতিত্বও তাঁকে দিতে হবে। সীমান্ত পত্রিকায় তিনি বিশ্বশান্তি পরিষদের (১৯৫০) ডাকে আগবিক বোমা নিষিদ্ধকরণের দাবিতে ব্যাপক প্রচার করেন ও স্বাক্ষর সংগ্রহের জন্য চট্টগ্রামেও বিশ্বশান্তি পরিষদের শাখা স্থাপন (১৯৫০) করেন। সীমান্তের মাধ্যমে গণস্বাক্ষর সংগ্রহের ও প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। তিনি বলেছেন :

‘আমরা শুধু সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী ছিলাম না, আন্তর্জাতিকতাবাদেও আস্থাশীল ছিলাম। দেখবেন প্রায় প্রতি সংখ্যায় যুদ্ধের বিরুদ্ধে (১৯৫০ এর পরের সংখ্যা গুলোতে) শান্তির সপক্ষে—আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন লেখকদের লেখার অনুবাদ এবং ভারত ও পূর্ববাঙলার উভয় সম্প্রদায়ের প্রগতিশীল লেখকদের লেখা, কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প, বক্তৃতা ইত্যাদি সীমান্তে প্রকাশিত করেছি। ‘বিশ্বশান্তি’ বলে আমাদের একটা আলাদা বিভাগই ছিল—সেখানে বিশ্বশান্তির সহায়ক ও যুদ্ধ-বিরোধী লেখাগুলো প্রকাশ করতাম। চট্টগ্রাম থেকে আমরা প্রায় পাঁচ লক্ষ স্বাক্ষর সংগ্রহ করি এবং তা স্টকহোমে যথাসময়ে পাঠিয়ে দিই।’<sup>৩</sup>

বিশ্বশান্তির সপক্ষে কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯৪৮ সনে মাহবুব উল আলম চৌধুরীকে কলকাতায় অনুষ্ঠিত বিশ্বশান্তি সম্মেলনে নিমন্ত্রণ জানানো হয় এবং পূর্ব পাকিস্তান প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসেবে তাতে তিনি যোগদান করেন। এছাড়া তিনি ১৯৪৮ সনে গঠিত চট্টগ্রামের জেলা কবি সমিতির (সভাপতি রমেশ শীল, কবিয়াল) সংগঠক, ১৯৫০ এর দাঙ্গা-বিরোধী সংগঠন শান্তিফৌজ (চট্টগ্রাম) এর অধিনায়ক হিসাবে কলকাতার বিভিন্ন উপদ্রুত এলাকায় শূভেচ্ছা-সফর করেন।

এছাড়া তিনি গুরুত্বপূর্ণ এবং একালে ঐতিহাসিক তাৎপর্যে বিশ্লেষিত বহু সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। যেমন : চট্টগ্রাম অগ্রণী সংঘের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি (১৯৫০) এবং সাংস্কৃতিক বৈঠকের আহ্বায়ক ; চট্টগ্রাম জেলা শান্তি কমিটির প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক (১৯৫১) এবং প্রদেশব্যাপী আণবিক যুদ্ধ-বিরোধী-স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযানের পরিচালক ; চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান সংস্কৃতি সম্মেলনের অন্যতম উদ্যোক্তা ও সাংগঠনিক সম্পাদক (১৯৫১) ; পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগের অন্যতম সংগঠক ও জেলা কমিটির প্রথম আহ্বায়ক ; ১৯৫২ সনে চট্টগ্রাম জেলা রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির আহ্বায়ক ; ১৯৫২-তে কুমিল্লায় অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান সংস্কৃতি সম্মেলনের অন্যতম উদ্যোক্তা ও সংগঠক মাহবুব উল আলম চৌধুরী আরও যে-সমস্ত সংগঠনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন : তা এইরূপ : ১৯৫৩—পূর্ব পাকিস্তান গণতন্ত্রীদলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও জেলা কমিটির সম্পাদক ; ১৯৫৪—যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন পরিচালনার উদ্দেশ্যে গঠিত চট্টগ্রাম জেলা কর্মী শিবিরের আহ্বায়ক ; ১৯৫৪—ঢাকায় অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনে চট্টগ্রাম সংস্কৃতি প্রতিনিধি দলের দলনেতা ; ১৯৫১/১৯৫৫—চট্টগ্রাম প্রান্তিক নবনট্য সংঘ ও কৃষ্টি কেন্দ্রের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ; ১৯৫৫—নজরুল নিরাময় সমিতির সহকারী সম্পাদক ; ১৯৫৫—চট্টগ্রাম লোক সঙ্গীত সম্মেলনের সংগঠক ও যুব উৎসবের সভাপতি ; ১৯৫৭—চট্টগ্রাম সংস্কৃতি প্রতিনিধি-দলের নেতা হিসাবে কাগমারী সম্মেলনে যোগদান ; ১৯৫২-৫৪ মাসিক উদয়ন পত্রিকার অন্যতম উদ্যোক্তা অন্যতম ; ১৯৭২-৭৮—চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত দৈনিক স্বাধীনতার প্রধান সম্পাদক ; ১৯৬৭—গহিরা কলেজের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক, ইত্যাদি।

তাঁর কতিপয় গ্রন্থ প্রবন্ধ পুস্তক-পুস্তিকায় প্রগতিশীল চিন্তা ও শিল্পকর্মের নমুনা আছে। ১৯৪৫ সনে হুমায়ুন কবিরের ভূমিকা সম্পর্কিত 'দারোগা' শীর্ষক নাটক প্রকাশিত হয়। ১৯৪৬ সনে প্রকাশিত মাহবুব উল আলম চৌধুরীর পুস্তিকা-'বিপ্লবের প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন' বাজেয়াপ্ত হয়। ১৯৫৬ সনে 'মিশরের মুক্তি আন্দোলন' শীর্ষক পুস্তিকা রচিত হয়। 'সীমান্ত' পত্রিকায় 'আগামী কাল' শীর্ষক নাটক ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৫২ সনে মুসলিম লীগ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত কবিতা-পুস্তিকা 'কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবী নিয়ে এসছি'-র রচয়িতা মাহবুব উল আলম চৌধুরী সওগাত, সোনার বাংলা, পরিচয়, নতুন সাহিত্য, দৈনিক সত্যযুগ, অগ্রণী, ডাক, ইম্পাত, পরিচিতি, পূর্বাশা, সাপ্তাহিক নওবেলাল, সাপ্তাহিক আওয়াজ, উদয়ন ও প্রগতি পত্রিকায় প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প ইত্যাদি অনেক লিখেছেন।<sup>৪</sup>

'সীমান্ত' পত্রিকার প্রথম দুবছরের অন্যতর সম্পাদক সুচারিত চৌধুরী (১৯৩০-৯৪) চট্টগ্রামের সংস্কৃতি-অঙ্গনের অন্যতম সাধক, লোক-সাহিত্য সংগ্রাহক আশুতোষ চৌধুরীর (১৮৮৮-১৯৪৪) পুত্র। সুচারিত চৌধুরী গল্প, কবিতা ও সঙ্গীতে উৎসাহী ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থাদির মধ্যে রয়েছে শুধু চৌধুরীর সেরা কবিতা, সুবাইয়া চৌধুরীর শুধু গল্প ; সুচারিত চৌধুরীর শ্রেষ্ঠ গল্প প্রভৃতি।

তিনি ১৯৫৭ সনে চট্টগ্রাম থেকে উৎকৃষ্ট সাহিত্য সংকলন 'প্রাচী'রও যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন (এ-গ্রন্থে 'প্রাচী' সম্পর্কে আলোচনা দ্রষ্টব্য)।

সম্পাদকদের এই সাংগঠনিক ও শৈল্পিক প্রতিভা যোগ্যতা ‘সীমান্ত’ পত্রিকা প্রকাশে কার্যকর ছিল বলেই বছর পাঁচেক ধরে অনিয়মিত হলেও নিয়মিত মাসিকের বৈশিষ্ট্যে প্রকাশিত হতে পেরেছিল। মার্কসীয় মতাদর্শ প্রভাবিত কোনো পত্রিকাই পূর্ববাঙলায় এতগুলো সংখ্যা প্রকাশ করতে পারেনি—সাংগঠনিকভাবে খুব অল্প লোকই তখনকার রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক সাহিত্যিক কার্যাবলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হবার সুযোগ পেয়েছিলেন। সীমান্ত এসমস্ত নানা কারণে সমসাময়িক কালের রাজনীতি, সংস্কৃতি, সমাজ, সভ্যতা, শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতির উন্নতি-অগ্রগতির ইতিহাসের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী হয়ে গিয়েছে।

সীমান্ত পত্রিকার প্রথম সংখ্যা (১৩৫৪, কার্তিক) ১৯৪৭ সনের নভেম্বর মাসে প্রকাশিত হয় সীমান্ত কার্যালয়, যতীন্দ্রমোহন এভিনিউ চট্টগ্রাম হতে। ইম্পেরিয়াল প্রেস চট্টগ্রাম থেকে মুদ্রিত হতো। প্রথম দুবছর সহযোগী সম্পাদক ছিলেন সুচরিত চৌধুরী। অতএব প্রথম দিকে প্রকাশকও ছিলেন দুজন মাহবুব উল আলম চৌধুরী ও সুচরিত চৌধুরী। সাদা কাগজে মোটামুটি মুদ্রণ সৌষ্ঠবে ১/১৬ ডিমাই সাইজের ৭৪ পৃষ্ঠার আকার নিয়ে পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। সকল সংখ্যায় সমান পাতা থাকত না। নিয়মিত পত্রিকার মত ধারাবাহিক পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল না। সব সময় একই কাগজও ব্যবহৃত হতোনা। কার্যালয়ও তাঁদের পরিবর্তন হতো।

প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা (অগ্রহায়ণ ১৩৫৪)—র গায়ে প্রকাশস্থল লেখা আছে সীমান্ত কার্যালয়, নিভৃত নিলয়, নন্দন কানন, চট্টগ্রাম। ‘প্রতি বাঙলা মাসের ১৫ তারিখে (পরের দিকে ১৫ তারিখ কথটা আর উল্লেখ করা হতোনা) প্রকাশিত হয়’ নিয়মাবলীতে লেখা থাকত। প্রতি সংখ্যার মূল্য আট আনা, বার্ষিক ৬ টাকা। ১৩৫৭ মাঘ সংখ্যায় বলা হয় : ‘প্রতি সংখ্যার দাম ছয় আনা। বার্ষিক সডাক সাড়ে চার টাকা। ষম্মাসিক দুটাকা চার আনা। দেশ ও বহুস্তর জনতার মঙ্গল-সূচক রচনা সাদরে গৃহীত হয়।’

সীমান্ত তৃতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যা ১৯৫০ সনের এপ্রিল ১৩৫৭-র বৈশাখ মাসে প্রকাশিত হয় ‘নবপর্যায়’ কথাটি শীর্ষে ধারণ করে। এই সংখ্যায় সম্পাদক হিসেবে মাহবুব উল আলম চৌধুরীর একক নাম নাম পাওয়া যায় এবং এই সংখ্যা ১৯৫০ এর দাজ্জার প্রেক্ষিতে দাজ্জ-বিরোধী ভাব-চিন্তা আবেদন নিয়ে বিশেষ সংখ্যারূপে প্রকাশিত হয়, যা উভয় বাঙলায় আলোড়ন তুলেছিল।

৪র্থ বর্ষ প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৯৫১ সনের এপ্রিল-মে বৈশাখ ১৩৫৮ সনে। এটি চট্টগ্রাম সংস্কৃতি সম্মেলন (১৯৫১) সংখ্যা এবং ১৯৫২ সনের জুন মাসে (বাঙলা সনের উল্লেখ নেই, শুধু, ‘আষাঢ়’ কথাটা লিখিত আছে) প্রকাশিত সংখ্যাকে চিহ্নিত করা হয়েছে সপ্তম বর্ষ প্রথম সংখ্যা হিসেবে। কিন্তু এটা ভুল হবারই কথা, হবে পঞ্চম বর্ষ।

পঞ্চম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় আবার প্রথম প্রচ্ছদে লেখা আছে “সীমান্ত নতুন ব্যবস্থাপনায় আবার আত্মপ্রকাশ করলো। বারবারই আমরা একে নিয়মিত প্রকাশ করার আশ্বাস দিয়ে আপনাদের হতাশ করেছি। কিন্তু আপনাদের বিচার করে দেখা দরকার এটা কি আমাদের ইচ্ছাকৃত ?”

পত্রিকার সম্পাদকেরা একে ‘প্রগতিশীল কাগজ’ বলে আখ্যায়িত করেছেন। সীমান্ত পত্রিকার একজন কর্মকর্তা, একান্তরের শহীদ, শহীদুল্লাহ সাবের সীমান্ত প্রকাশের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে এর উদ্দেশ্য-আদর্শ সম্পর্কে (দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যায়, পৌষ, ১৩৫৫, বলেন : বিভাগোত্তর কালের লেখক-শিল্পীদের আগমন ও বাস্তবত্যাগ করে পলায়নের ব্যাপক সাংস্কৃতিক সংকটের প্রেক্ষাপটে সীমান্তের আবির্ভাব ঘটে।

‘কিন্তু আজকের দুনিয়ায় সংস্কৃতির প্রত্যেকটি শাখা রাষ্ট্রিক ও সামাজিক আঘাতে বিপর্যস্ত। এই আঘাত থেকে ‘সীমান্ত’ও রেহাই পায়নি। কাগজের অভাবে সীমান্ত অনির্দিষ্ট কাল বন্ধ থাকে।...সীমান্ত সেই সাহিত্যই সৃষ্টি করবে যা শূণ্য সমাজের ছবি ঐকেই ফাস্ত থাকবে না, সামাজিক প্রগতির পথেরও সন্ধান দেবে। সমাজের প্রত্যেকটি শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীকে সীমান্তের পাশে সংহত কোরে, সমাজের মানুষের দাসত্বমুক্তির পথেই সীমান্তের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অভিযান সার্থক হবে একথা আজ জ্বরের সঙ্গেই বলা যায়। শিল্পী সাহিত্যিকদের পক্ষ থেকে এটা নিশ্চয়ই আশা করা যেতে পারে যে সাহিত্য-ক্ষেত্রে সীমান্তের ভূমিকা হবে প্রগতিশীল মুখপত্রের ভূমিকা।’

১৯৫২ সনের জুন সংখ্যায় মরহুম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের উপর প্রবন্ধ আছে। এরপর আর সীমান্ত প্রকাশ পেয়েছে কিনা বলা চলে না। ‘সিনেমা’ পত্রিকার (বাংলার বাণী গ্রুপের) সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে মাহবুব উল আলম চৌধুরী বলেন : “১৯৫২ সালে একশুরের প্রথম কবিতাটি (কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবী নিয়ে এসেছি) বাজেয়াপ্ত হওয়ার পরপরই পত্রিকার (সীমান্ত) প্রকাশনা সরকার বন্ধ করে দেয়।”

‘সীমান্ত’ অনিয়মিত ছিল একথা নিঃসন্দেহ। কিন্তু মোট কতগুলো সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল আজ আর তা নিশ্চিত করে বলার উপায় নেই। সম্পাদক বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে ৭২, ৬০ ইত্যাদি সংখ্যা বলেন, কারণ তাঁর কাছেও কোনও ডকুমেন্ট নেই। তবে ৫ বছরে গোটা ত্রিশেক সংখ্যা প্রকাশ পেয়েছিল বলে ধরে নিতে পারি। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও ১৩টির বেশি সংখ্যা উদ্ধার করা যায়নি। তবে এই কয়টি সংখ্যার মাধ্যমেই সীমান্তকে চিনে নিতে বেগ পেতে হয়না।

‘চট্টগ্রামে সাংস্কৃতিক আন্দোলন : প্রগতিশীল ধারা’ (চট্টগ্রাম, ১৯৯১) শীর্ষক গ্রন্থে সীমান্ত-সম্পাদক মাহবুব উল আলম চৌধুরী স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে লিখেছেন : ১৯৪৬ সনে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কালে জাতি যখন বিভ্রান্ত, তখন কজন তরুণ মিলে সর্ব প্রথম নজরুল জয়ন্তী উদযাপনের জন্য একটি প্রস্তুতি কমিটি গঠন করা হয়—যার সভাপতি অধ্যাপক আবুল ফজল এবং সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন মাহবুবউল আলম চৌধুরী।

জয়ন্তী...উপলক্ষে আমরা বেশ কিছু তরুণ কর্মী খুরশীদ মহল সিনেমা হলের তিন তলায় মহড়ায় মিলিত হতে থাকি...খাঁরা আসতেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন ভেঞ্জন সেন, বঙ্কিম সেন, সুচরিত চৌধুরী, চিত্তরঞ্জন দাস, চিরঞ্জীব দাসশর্মা, তখনকার চট্টগ্রাম জেলা জজ শৈবাল গুপ্তের ছেলে পার্থ সারথি প্রমুখ।... আমাদের এ ধরনের কার্যকলাপ তখন তরুণ ও প্রবীণদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল। আমরা এই উৎসাহ-উদ্দীপনাকে ধরে রাখার এবং চলমান করার প্রচেষ্টায় সিদ্ধান্ত নিলাম যে, একটি মাসিক পত্রিকা বের করবো। এই মাসিক পত্রিকার মূলনীতি হবে, অসাম্প্রদায়িক ধর্ম নিরপেক্ষ বাঙালি জাতীয়তাবাদ—এবং আমরা এর চেয়ে বেশি কিছু চেয়েছিলাম—‘সবার উপরে মানুষ সত্য’ কথাটিকে মানবতাবাদের এবং শ্রেণীগত বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে...এও দাবী করেছিলাম যে, শিল্প সাহিত্যকে রাজনীতির হাতিয়ার হতে হবে।...এ দাবী তখনকার উদারনৈতিক সাহিত্যিকেরা স্বচ্ছন্দচিত্তে গ্রহণ করতে পারেননি।...কিন্তু আমাদের বুকে যে আগুন



ছিল, সে আগুনের উত্তাপকে... তাঁরা অস্বীকার করতে পারেননি। একটা নতুন সমাজ তৈরী যেখানে শ্রেণীভেদ থাকবেনা, কোন বর্নভেদ থাকবে না, হিন্দু মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী থাকবে না—এই ধরনের সমাজ ব্যবস্থার পক্ষে কাজের একটা চিন্তা-ভাবনা নিয়ে আমরা 'সীমান্ত' পত্রিকা প্রকাশে আগ্রহী হই।'

তিনি বলেন, আমাদের এই আগ্রহকে বিশেষভাবে সহায়তা করেছিলেন আমাদের কিছু পুরনো কর্মী। ১৯৪৭ সনে পশ্চিমবঙ্গ থেকে বেশ কজন শিল্পী সাহিত্যিক চট্টগ্রামে চলে আসেন—শওকত ওসমান, মোতাহের হোসেন চৌধুরী, এবনে গোলাম নবী প্রমুখ—তাঁদের এবং চট্টগ্রামের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সম্পাদক নবী সেনগুপ্ত, চট্টগ্রাম প্রগতি লেখক সংঘের সম্পাদক শূধাংশু সরকার ও কবি আশুতোষ চৌধুরীর জ্যেষ্ঠ পুত্র শূভাশীষ চৌধুরী—তাঁদের উৎসাহ এবং সহযোগিতায় সীমান্ত প্রকাশনা শুরু করি। ...ইম্পেরিয়াল প্রিন্টিং হাউজ ( মাহবুব উল আলম চৌধুরীর মামার) থেকে সীমান্ত ছাপান হতো।'

তিনি আরও লিখেছেন : যেদিন সীমান্ত-এর প্রকাশনা উৎসবের আয়োজন করা হয়, সেদিন চট্টগ্রামে উপস্থিত ছিলেন... কবি বিভূতি চৌধুরী... তিনি প্রকাশনা উৎসবে সভাপতিত্ব করেছিলেন... মম্বথ দাশ... সঙ্গীত পরিবেশন করেছিলেন... সুরেন রায়... বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, কাজী নজরুল ইসলাম, মীর মোশাররফ হোসেন—প্রমুখের প্রতিকৃতি ঐকে প্রকাশনা-কক্ষটিকে তাঁরা সুসজ্জিত করেছিলেন। সীমান্ত প্রকাশনার পেছনে যাঁদের প্রচুর অবদান ছিল, তাঁদের মধ্যে অন্যতম গোপাল বিশ্বাস! এছাড়া আহমেদুল কবির, সানাউল হক, কবির চৌধুরী, এস. এ. জামান, সায়ীদুল হাসান পরোক্ষভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছিলেন। 'সীমান্ত'... বাজারে আসার পরপরই প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী কমিউনিস্টদের মুখপত্র বলে... প্রচার করতে শুরু করে... বাড়ীওয়ালা ভীত হয়ে 'সীমান্ত' অফিস (লাল দীঘির পশ্চিম পাড়ে, ব্যাংক ভবনের দোতলা থেকে) স্থানান্তরের নোটিশ দেন।... আর্থসঙ্গীত সমিতির অন্যতম... বিধুভূষণ... বুদ্ধমন্দির সড়কে অবস্থিত তাঁর বাড়ীটি ১৫ টাকা ভাড়ায় তাঁদেরকে দেন।

'যতদূর মনে পড়ে ১৯৪৮ সালের মাঝামাঝি আমরা বুদ্ধমন্দির সড়কে 'সীমান্ত'র অফিস স্থানান্তরিত করি। এখন বলে রাখা ভাল যে, 'সীমান্ত' পত্রিকায় যে কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাব ছিল তখন অস্বীকার করলেও এখন গর্বের সঙ্গে স্বীকার করি। যে কোন একটি মাসিক পত্রিকা চালাতে হলে তার জন্যে একটা গোষ্ঠী সৃষ্টি করতে হয়। এই রকম একটা গোষ্ঠী হয়েছিল সীমান্তকে কেন্দ্র করে। তখন সাংস্কৃতিক বৈঠক বলে একটা সংস্থা আমরা গঠন করি।'

সম্পাদক এক সাক্ষাৎকারে পত্রিকার উদ্দেশ্য আদর্শ চরিত্র সম্পর্কে জানান : ১৯৪৭ এর আগেও জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলো হিন্দু-মুসলমানের সমন্বয় বা মিলন ঘটাতে পারেনি। আমরা চেয়েছিলাম হিন্দু-মুসলিম নবীন-প্রবীণ সকলকে সীমান্তে মিলাতে। যৌথ উদ্যোগে একটি প্রগতিশীল পত্রিকা প্রকাশই আমাদের লক্ষ্য ছিল। প্রগতিশীলতা বলতে আমরা বুঝতে চেয়েছি মানবতাবাদী এবং সাধারণ মানুষের কল্যাণে বিশ্বাসী। সেদিক থেকে আমরা অনেকটা সফল হয়েছিলাম। কারণ উভয়বঙ্গের নবীন প্রবীণ হিন্দু-মুসলিম, মানবতাবাদী এবং গণমানুষের কল্যাণে, প্রগতিশীল আন্দোলনে বিশ্বাসীদের লেখায় সীমান্তকে সমৃদ্ধ করতে আমরা সক্ষম হই।

তিনি আরও বলেন, সাহিত্য পত্রিকার ইতিহাস লক্ষ্য করলে আপনি দেখবেন, সাতচল্লিশ পূর্ববর্তীকালে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মুখপত্ররূপে সোচ্চার বসুমতি, ভারতবর্ষ, প্রবাসী প্রভৃতি পত্রিকাগুলো উভয় সম্প্রদায়ের লেখকদের বাঙালি জাতির ঐতিহ্যের ভিত্তিতে রচিত লেখা দ্বারা এবং দুই প্রধান সম্প্রদায়ের ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য এবং উৎসবগুলিকে তুলে ধরার কোনও প্রচেষ্টা নেয়নি বললেই চলে। একমাত্র নব পর্যায়ে ‘পরিচয়’ কিছুটা করেছিল। আমরা চেষ্টা করেছি প্রবীণ শিল্পী-সাহিত্যিকদের দিয়ে অতীতের উভয় সম্প্রদায়ের যুক্ত সাধনার তথ্যগুলো জনসমাজে প্রকাশ করে দুই প্রধান সম্প্রদায়ের ঐক্যকে সুদৃঢ় করতে। এতেও আমরা কতোকটা সার্থকতা লাভ করেছি বলে মনে হয়। সমকালে বা অপরাপর প্রখ্যাত পত্রিকাগুলোতেও দুই বঙ্গের লেখকদের জড়ো করার চেষ্টা তেমন করা হয়নি।

অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন : সুকান্ত ভট্টাচার্য সম্পর্কে বহু কথাবার্তা বলা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে, কিন্তু তাঁর মূল্যায়নের ব্যাপারে সীমান্তই অগ্রগামী ভূমিকা পালন করে। জীবন চক্রবর্তীর দীর্ঘ প্রবন্ধে সুকান্তকে সীমান্তে উজ্জ্বলতর রূপে প্রথম উপস্থাপিত করা হয়।

তিনি আরও বলেন : ব্যক্তিগতভাবে দেশ বিভাগটা আমার নিকট ভয়াবহভাবে বেদনার কারণ হয়ে ওঠে। এবং এর কোনো যৌক্তিকতা আমি খুঁজে পাইনি। কারণ যেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমস্যার সমাধান হিসেবে পাকিস্তানকে অনেকে মেনে নিয়েছিলেন আমি পাকিস্তানের মধ্যে সেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমস্যার কোন সমাধান খুঁজে পাইনি। ভারত থেকে সমস্ত মুসলমানকে পাকিস্তানে এবং পাকিস্তান থেকে সমস্ত হিন্দুকে ভারতে পুনর্বাসিত করা সম্ভব হয়নি।

কাজেই সংখ্যালঘু সমস্যা তো থেকেই গেলো। বরঞ্চ এটা করতে গিয়ে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যে ভয়াবহ দাঙ্গা ক্রমান্বয়ে সংঘটিত হয়ে চলেছিল—তাতে উভয় সম্প্রদায়ের পরস্পরের ওপর বিশ্বাস, আস্থা এবং শ্রদ্ধা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ১৫ যার ফলে অতীতের ইতিহাসের উজ্জ্বল দিকগুলোও অন্ধকারে ঢেকে যায় এবং অনুজ্জ্বল দিকগুলো কয়েকটি স্বার্থবাদীরা প্রকাশ্যে নিয়ে আসে। এর ফলে মুসলমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দীর্ঘায়িত হয়। তাঁদের আত্মানুসন্ধান বা স্বরূপ উপলব্ধিতে সময় লাগে, দীর্ঘদিন বিভ্রান্তির মধ্যে নিমজ্জিত থাকে। দেশকে দ্বিখণ্ডিত করতে গিয়ে যে ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছিল সেই ক্ষত এখনও শূকায়নি বলে বাঙালি-প্রশ্নে এখনও আমরা বিভ্রান্তির মধ্যে বাস করছি। বলা বাহুল্য, এই বিভ্রান্তি দূর করে সঠিক স্বরূপের সন্ধান, শিকড়ের সন্ধান, ঐতিহ্যের সন্ধান এবং নির্ধারিত মানুষের মুক্তির সন্ধানই ছিল আমাদের পত্রিকা এবং সাহিত্য চর্চার মূল উদ্দেশ্য, আদর্শ ও লক্ষ্য।

তিনি জানান, সীমান্তে মুদ্রিত লেখার জন্য সম্মানী দিতাম, কিন্তু সকলকে নয়, খাঁরা আর্থিক ভাবে দুর্বল, অভাবী ছিলেন, তাঁদেরকে কিছু দেয়া হতো—তবে সবটাই আমার ব্যক্তিগত সঞ্চয় থেকে, পত্রিকার আয় থেকে নয়, আয় হতো কই? আমাকে বাড়ী থেকে মোটা অংকের মাসোহারা দেয়া হতো। এ থেকে সীমান্তের মুদ্রণ ব্যয় মাসে মাসে সাড়ে তিনশত টাকা খরচ হতো এবং অবশিষ্ট টাকা সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক ক্রিয়া-কর্মে ব্যয় করতাম।

পত্রিকার চরিত্র প্রসঙ্গে অপর এক প্রশ্নের জবাবে জনাব মাহবুবউল আলম চৌধুরী বলেন, পাঁচবার আমাকে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ অফার করা হয়, কিন্তু গ্রহণ করিনি। অশ্রদ্ধা, অবিশ্বাস, এবং অসমর্থন—এর কারণে নয়, আমি নিজেকে তার যোগ্য বলে মনে করতাম না। তবে কমিউনিস্ট আন্দোলনে আমি যতোটা পারি আন্তরিকভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছি—প্রতিষ্ঠানিক সদস্য যদিও ছিলাম না। লক্ষ্য করবেন আপনি, সীমান্তের আর একটি ইন্টারেস্টিং বিষয় এর ফিচার বিভাগ এর কৃষ্ণ চন্দর, খাজা আহমদ আব্বাস, মুলকরাজ আনন্দ, ক্রিস্টফার কডওয়েল, নাজিম হিকমত আরও এমনিতর অনেক লেখক—সাহিত্যিকদের সম্পর্কে লেখা সীমান্তে পাবেন।’

তিনি আরও বলেন : কলকাতার নতুন সাহিত্য এবং পরিচয়—গোষ্ঠীর সঙ্গে আমাদের সৌভ্রাতৃত্ব ও সহযোগিতামূলক সম্পর্ক ছিল। তাঁদের জন্য এখানকার লেখা সংগ্রহ করে দিতাম আমরা। আর ওখানকার লেখা তাঁরা সংগ্রহ করে দিতেন। পশ্চিমবঙ্গে সীমান্ত বিক্রয় এবং বিতরণের দায়িত্ব পরিচয় নিত। সেখানকার কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র দৈনিক নতুন স্বাধীনতা, পরিচয়, নতুন সাহিত্য অন্যান্য পত্রিকা এবং ন্যাশনাল বুক এজেন্সীর পুস্তিকা গোপনে এখানে আমরা বিতরণ ও বিক্রির ব্যবস্থা করতাম।’

‘সীমান্ত’র প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যার ‘সূচীপত্র’-র দিকে তাকালেই পত্রিকার গাভীর্য এবং সম্পাদকের উপর্যুক্ত বক্তব্যসমূহের যথার্থ উপলব্ধি করা যায় :

মুহম্মদ হবীবুল্লাহ বাহার—শুভেচ্ছা বাণী; আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ (প্রবন্ধ) পদ্মাবতী সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ; আশুতোষ চৌধুরী (গীতা—চিত্র) স্বপ্নের জয়; অন্নদাশংকর রায় (কবিতায়) বাণী; ওহীদুল আলম (কবিতা) একটি কবিতা; স্বীকৃতকুমার চক্রবর্তী (কবিতা) নববধু; মাহবুবউল আলম চৌধুরী (কবিতা) স্বাধীনতা; সুবোধরঞ্জন রায় (কবিতা) প্রতীক্ষা; সুশান্ত স সরকার (কবিতা) ভয়াল; সায়ফুল আলম (কবিতা) টিকটিকি; রেবতীমোহন চৌধুরী (কবিতা) রূপ; আবুল ফজল (গল্প) পুত্রার্থে ভার্য; শূভাশীষ চৌধুরী (গল্প) জীবন ও আর্ট; পরিমলকান্তি রায় (গল্প) আবরণ; ননী সেনগুপ্ত (প্রবন্ধ) বাংলা ভাষার রূপান্তর।

শুভাশীষ চৌধুরী সিনেমা শিল্প নিয়ে সচিত্র আলোচনা করেন রূপায়ণ বিভাগে; প্রভাতকুমার সেন, বেতার প্রসঙ্গ ও শারদীয়ার রেকর্ড (রেডিও ও অডিও গানের রেকর্ড) সংক্রান্ত সমালোচনামূলক প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। আরও ছিল কিশোর—কানন (ছোটদের বিভাগ) : নতুন লেখা (পুস্তক—সমালোচনার বিভাগ—কিরণশংকর সেনগুপ্ত প্রণীত) স্বপ্ন কামনা শীর্ষক কাব্য—গ্রন্থের আলোচনা করেন জীবন কুমার চক্রবর্তী) এবং আলোচনা।

আলোচনা—বিভাগে সম্পাদকীয় বক্তব্য ছাপা হত। প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়তে সাহিত্য ও সাংবাদিকতার সুবিধা অসুবিধা ও এ—সম্পর্কে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে আলোচনা আছে। পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী ডা. প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এর একটি বক্তব্য ‘উপদেশ’ শিরোনামে এবং ‘চট্টগ্রামে আবার দুর্যোগ’ ইত্যাদি সম্পর্কে পর্যালোচনা রয়েছে।

এখানে মন্তব্য করা সংগত যে, মাহবুব উল আলম চৌধুরী ‘চট্টগ্রামে সাংস্কৃতিক আন্দোলন : প্রগতিশীল ধারা’ শীর্ষক গ্রন্থে মুদ্রিত স্মৃতিকথায় লিখেছেন : ‘সীমান্ত-র প্রথম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়েছিল আমার যতদূর মনে পড়ে, তদানীন্তন মন্ত্রী সাহিত্যিক হবীবুল্লাহ

বাহার, ড. মুহম্মদ এনামুল হক, আবদুল করিম সাহিত্যবিহারদ, কথা-শিল্পী মাহবুবউল আলম, অনন্যদাশংকর রায়, কিরণশংকর সেনগুপ্ত, সুভাষীশ চৌধুরী, এবনে গোলাম নবী, ননী সেনগুপ্ত, মুনীর চৌধুরী ও আমার একটা কবিতা 'স্বাধীনতা' নিয়ে। —দেখা যাচ্ছে এর মধ্যে কিছু বিস্মৃতিও কাজ করেছে।

পাকিস্তানের প্রাদেশিক স্বাস্থ্যমন্ত্রী মুহম্মদ হবীবুল্লাহ বাহার তাঁর বাণীতে বলেন :

পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্ত থেকে 'সীমান্ত' নাম দিয়ে মাসিক কাগজ বের হচ্ছে শুনে তিনি আনন্দিত। তিনি বাণীতে আশা প্রকাশ করেন যে,

'সীমান্তবর্তী চট্টগ্রাম সাহিত্যে আবার নতুন পথ সৃষ্টি করবে...বাঙ্গলা সাহিত্যের কারবার এখনো মধ্যবিন্দু সমাজকে নিয়ে। জনগণমনকে সাহিত্যে প্রতিকলিত করার জন্যে পথ রচনা করুক সীমান্তের অগ্রপথিকেরা।'

প্রথম সংখ্যার সীমান্তে মুদ্রিত কবিতাগুলোর মধ্যে দেখা যায় ওহীদুল আলম 'দুইটি অম্লের লাগি' যে জীবনকে 'ছিন্নভিন্ন করি' দেবার ইচ্ছা জাগে, সে জীবনকে পছন্দ করতে পারেননি। 'মরণেরে তুচ্ছ করি' 'মিটাইব হৃদয়ের আশ'—এই উক্তির মধ্য দিয়ে তিনি প্রাণের (জীবনের) মুক্তি কামনা করেছেন।

মাহবুবউল আলম চৌধুরী 'স্বাধীনতা' শীর্ষক কবিতায় স্বাধীনতার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, আর 'দুর্জয় অভিযান/ জাল জুয়াচুরি শোষণের প্রতিশোধ' এর অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। তিনি বুঝেছেন : স্বাধীনতার অর্থ হলো : "স্বাধীনতা নয় শাসন মুক্ত হওয়া/স্বাধীনতা বুদ্ধি শোষণের অবসান ; / তাজা তাজা প্রাণ, খুশি চঞ্চল হাওয়া—/কোটি কোটি মুক মানুষের জয়গান।'

গল্পগুলোতে বাঙালি মধ্যবিত্তের সমস্যা, শ্রেম ভালবাসা ও গ্রামীণ সমাজ চিত্রিত হয়েছে। পড়তে মন্দ লাগে না—যদিও শিল্পের বিচারে সবখানি উত্তীর্ণ হয়নি। চট্টগ্রাম জেলা কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সম্পাদক ননী সেনগুপ্ত 'বাংলা ভাষার রূপান্তর' শীর্ষক প্রবন্ধে উর্দু আরবি-ফার্সী শব্দবহুল (মুসলমানী) সাম্প্রদায়িক বাংলা সাহিত্য সৃষ্টির সেই জোর জ্বলম সন্ত্রাসের রাজত্বে বসে একটি জ্ঞানগর্ভ আলোচনা উপস্থাপিত করেন। লেখকও সচেতন ছিলেন, হিন্দু হয়ে এই ধরনের আলোচনায় শিল্পীর স্বাধীনতার চেয়ে মরণের ঝুঁকি বেশি। দীর্ঘ পটভূমিকায় তাই তিনি বলেন, সংস্কৃতি বা উর্দু ফার্সী শব্দবহুল বাংলা সাহিত্যকে শৈল্পিক দিক থেকে খাটো করে ফেলবে।

তিনি বলেন 'বিষাদ সিঁধু' হিন্দুর নিকটও প্রিয়। বঙ্কিম বিদ্যাসাগরের রচনা মুসলমানও পড়েন। কিন্তু কি জন্য? সাহিত্যিক শৈল্পিক গুণের জন্য। তবে দেশ ভাগ এবং সমাজতান্ত্রিক চেতনার বিকাশের ফলে 'গণসাহিত্য' ও মুসলমানদের জীবনভিত্তিক সাহিত্য সৃষ্টি যে হবে—সেটা স্বাভাবিক এবং যুগের দাবি ই তাই। কারণ পূর্ব বাঙলার মুসলমান-হিন্দু নির্বিশেষে সাহিত্যিকেরা সমাজ-ঘনিষ্ঠ বা দরিদ্র জনসাধারণের জীবন-ভিত্তিক সাহিত্য সৃষ্টি করতে গেলে সেখানকার জনগণের ভাষাকেই অবলম্বন করতে হবে। আর এ-অঞ্চলে মুসলমান বেশি বলে তাদের মুসলমানি ভাষা কেবল সাহিত্যের সুচিতার দাবিতে বর্জন করা যুক্তিসঙ্গত হবে না।

আবার গণসাহিত্যের ক্ষেত্রে দেখা যাবে কৃষক ও দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে হিন্দু মুসলমান সকলেই আছেন। হিন্দুরা সংখ্যায় কম বলে পূর্ববঙ্গের মুসলমানি সভ্যতা-সংস্কৃতি ও ইসলামি শব্দবহুল ভাষা ব্যবহারে তারা (হিন্দুরা) অভ্যস্ত। এখানকার সাহিত্যে এই এলাকার ভাষাই স্থান পাবে। তবে সেটাকে স্বাভাবিক হতে হবে। অস্বাভাবিক প্রয়োগ প্রক্ষিপ্ত বলে দৃষ্টি কটু এবং শিল্প ধ্বংসকারী হবে। লেখক বলেন :

‘যদি তাই হয় তবে নবজীবনের এই প্রকাশ হবে কোন ভাষায়? কোন ভঙ্গিতে? গণ আন্দোলন ও মুসলমান জনতার জাগরণের রূপ দিতে হলে জনগণের টুকরা টুকরা চরিত্র অঙ্কনের ভিতর দিয়েই দিতে হবে। ফলে তাদের হাসিকান্না, সুখ দুঃখ, প্রেম ঘৃণা তাদেরই নিজস্ব ভাষায় রূপ পাবে। এর অন্যথা হতে পারে না। এখন মুসলমান চরিত্র অঙ্কনের জন্য মুসলমানি শব্দ ও ভাষার আমদানি যে অপরিহার্য তা কে অস্বীকার করবে? কে অস্বীকার করবে যে বাঙলাদেশের মুসলমান মূলত বাংলায় কথা বললেও তার মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে উর্দু ও আরবি ফার্সি শব্দ? তেমনি ‘গণ’ বলতে ও আমরা যাদের বুঝি তার বিরাট অংশও মুসলমান বাঙলার চাষী। আমরা লক্ষ্য করছি পূর্ববঙ্গে হিন্দু চাষীদের ভাষায়ও মুসলমানী ঢংয়ের প্রভাব বেশ সুস্পষ্ট। তেমনি পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান চাষীও হিন্দু চাষী ভাইদের থেকে অনুকরণ করে তাদের ভাব ও ভাষা। যেদিক থেকেই দেখা যাকনা কেন নতুন জীবন রূপায়ণে যে নতুন সাহিত্যের আবির্ভাব হবে তার উপর বাঙলাদেশের কোটি কোটি নরনারীর বিশাল একটি অংশের নিত্যব্যবহার্য ভাষার প্রাধান্য থাকবেই। কাজেই উর্দুভাষা ও শব্দের দাবি বাংলা সাহিত্যে উপেক্ষণীয় নয়।

যুগের দাবিকে বাঙলা সাহিত্য কখনও উপেক্ষা করেনি।...মোটের উপর, আমাদের বক্তব্য হচ্ছে এই যে, বাঙলা সাহিত্য আজ সমাজের মতই দুভাগে বিভক্ত। এক ভাগে আছে তারা যারা ক্রমাগতই এগিয়ে যেতে চায়, নবনব প্রকাশের মধ্যে নিজেকে বারবার নতুন করে দেখতে চায়। অন্য দল চায় কায়মীকে ধরে রাখতে, নতুনকে যুক্তি দিয়ে নস্যাত্ন করে দিতে। প্রথম দলের সাহিত্যে রূপ নিচ্ছে সমাজের যারা প্রাণবন্ত, যারা অগ্রগামী... আর দ্বিতীয় দল পুরাতনকেও রূপ দিতে পারছেননা, নতুনকেও সঠিকভাবে আঁকড়ে ধরতে পারছেননা। তাই তাদের সৃষ্টির অবকাশ ফুরিয়ে গেছে। তাঁরা বনিয়াদি চালে, বনিয়াদি ঢংয়ে সাহিত্যকে ধরে রাখার যত চেষ্টাই করুননা কেন, ইতিহাসের গতি রোধ করার সাধ্য তাদের নাই। সুতরাং ইতিহাস আপন পথ করে নেবেই এবং সেই কাহিনী রচিত হবে যে ভাষায় সে-ভাষা হিন্দু মুসলমান গোটা জনতার ভাষা। বাঙলা ভাষার এই রূপান্তর সমাজ বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক নিয়মেই আসবে। আসবে সমাজ বিপ্লবের চারণদের কণ্ঠ থেকে। এমনই স্বাভাবিক নিয়মে বাঙলা সাহিত্যে এসেছে ইংরাজি, জার্মানি, ফরাসি, রাশিয়ান, আরবি, ফার্সি, উর্দু। সাহিত্যের এই রূপান্তরকে গ্রহণ না করে শুধু জাতীয় অহমিকা চরিতার্থ করার জন্য এবং সম্ভবত রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সাম্প্রদায়িক জিগিরকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সংস্কৃত-উর্দু সমস্যাকে নিয়ে জলঘোলা করলে তার ফলে, আর যাই হোক, সাহিত্য ও সাহিত্যিক কারও দাবি মিটান হবে না। চাকরিতে শতকরা হার কমান সম্ভব, কিন্তু লেখকের পক্ষে কি শব্দের শতকরা হার নির্ণয় করে লেখা কখনও সম্ভব হবে?\*

প্রবন্ধে উর্দুর দাবি উপেক্ষণীয় নয়—মস্তব্যের যথার্থ কালের প্রেক্ষিতে ঠিক ছিল। নতুন জীবন রূপায়ণে যে নতুন সাহিত্য সৃষ্টি হবে—এটা দূরদর্শী মস্তব্য। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ‘বাঙলাদেশের সাহিত্য’ হিসেবে স্বতন্ত্র সংযোজন তার প্রমাণ। সীমান্তের সম্পাদকীয় আলোচনায় পত্র-পত্রিকা প্রকাশের অন্তরায় বা সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কে যে সমস্ত বক্তব্য উপস্থাপিত হয়েছে—তাও যেমন অধিকার সচেতন বলে দুঃসাহী, তেমনি তৎকালের সমাজচিত্র হিসেবেও আজও গুরুত্বপূর্ণ।

একটি সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে :

প্রকাশককে প্রথমে পুলিশের ছাড়পত্র সংগ্রহ করতে হয়। ছাড়পত্র পেলে তবেই অনুমতি পাওয়া যায়। জনমতের উপর পুলিশী কর্তৃত্ব যুদ্ধের সময়কার কুখ্যাত ভারত-রক্ষা আইনের দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। আজকের

পরিবেশে জনমতের উপর এইরূপ কর্তৃত্ব অবাঞ্ছিতই শুধু নয়, গণস্বার্থ বিরোধী। আজ আমরা সার্বভৌম ক্ষমতা লাভ করেছি কিনা এবং কতদূর করেছি তার পরীক্ষা হবে জনমত প্রকাশের নিরঙ্কুশ অধিকারের কঠিণপাথরে। কাজেই আমরা দাবি করি সংবাদ-পত্র প্রকাশের পথে যে-সমস্ত আমলাতান্ত্রিক অন্তরায় এখনও বর্তমান সেগুলি প্রত্যাহার করা হোক। এবং সেই সঙ্গে আরও দাবি করি, যেসমস্ত সংবাদপত্রের কঠরোধ করা হয়েছে গণ-আন্দোলনের সেবা করার জন্য সেগুলি রাহমুক্ত হোক।<sup>৮</sup>

প্রথম সংখ্যাতোই সীমান্ত তখনকার গণতান্ত্রিক ও মুক্তবুদ্ধির দ্বারা সমর্থিত প্রগতিশীল সাহিত্য আন্দোলনের প্রধান মুখপত্র হিসেবে নিজেকে চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছিল এবং সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। প্রাপ্ত সংখ্যাগুলোতে প্রবন্ধ পাওয়া যায় যে সমস্ত লেখকের, তাঁরা হলেন :

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ (পদ্মাবতী সম্পন্ধে যৎকিঞ্চিৎ ১/১) ; প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য ও মুসলমান ১/২ ; বড়োয়ীর পুঁথি ২/২ ; সংস্কৃতি সম্মেলনে (১৯৫১) প্রদত্ত মূল সভাপতির ভাষণ ৪/১ ; রোসাঙ্গ শহর কোথায় ? ৫/১)। ননী সেনগুপ্ত (বাংলা ভাষার রূপান্তর ১/১ ; এ যুগের কবিগুরু ২/৫) ; যোগেশচন্দ্র সিংহ (ধর্মের গুণি ১/২ ; যুগের সীমান্ত ৩/১) ; জীবনকুমার চক্রবর্তী (ছাড়পত্র : সূকান্ত ভট্টাচার্য ১/৩) ; সুভাষী (পরিচালক বড়ুয়া—কুমার প্রমথেশ বড়ুয়ার সিনেমা পরিচালনের কৌশল ও শিল্প-দক্ষতা বিষয়ে আলোচনা, ১/৩) ; ইলিয়া ইলেন বর্গ (এর বক্তৃতা, অনুবাদ করেন সৈয়দ জামাল আহমেদ 'সাহিত্য সংস্কৃতি ও বিশ্বশান্তি' শিরোনামে, ২/১) ; 'যুদ্ধকে আমরা ঠোকাবোই' অনুবাদ করেন গোপাল বিশ্বাস, ৩/৫) ; মোতাহের হোসেন চৌধুরী ('পশ্চিমবঙ্গের কবি, শিল্পী-সাহিত্যিকদের নিকট একটি আবেদন'—সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ১৯৫০ নিবারণের জন্য, ৩/১ ; কাব্যে সমাজ চেতনা ও ঐতিহ্যবোধ ৪/১ ; নজরুল ইসলাম ও রেনেসাঁস, ৫/১) ; আবুল ফজল ('ইতিহাসের আস্থান' সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা—১৯৫০-এর প্রেক্ষিতে, ৩/১ ; সংস্কৃতি, ৪/১) ; গোপাল বিশ্বাস ('ইতিহাসের অপ্রতিরোধ্যগতি (দাঙ্গা সংখ্যা ৩/১) ; কৃষনন্দর (কোরিয় রণাঙ্গনে আমেরিকার প্রথম নিহত সৈনিকের প্রতি খোলা চিঠি' অনুবাদক মাহবুবউল আলম চৌধুরী ৩/২) ; জন স্ট্রাচি ('কডওয়েল ও গণতন্ত্র' ; কডওয়েলের Studies in a dying culture এর ভূমিকার অনুবাদ করেন সন্তোভ আহমেদুল কবির', ৩/৩) ; ক্লাড মরগ্যান (পল বরমনের ভাষণ, অনুবাদিকা—সুমিতা মুংসুন্দি ৩/৪) ; দীপক আচার্য (তুর্কী-কবি নাজিম হিকমত, ৩/৪) ; শ্রীযুক্ত সত্যেন মজুমদার (সংস্কৃতি সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ, ১৯৫১, ৪/১) ; বেগম সুফিয়া কামাল (সংস্কৃতি সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ, ১৯৫১, ৪/১) ; মোহাম্মদ ফেরদাউস খান (মাতৃভাষার মর্যাদা, সংস্কৃতি সম্মেলনে পঠিত প্রবন্ধে, ১৯৫১, ৪/১) ; চৌধুরী হারুনর রশিদ (মাননীয় লিয়াকত আলী খান, মৃত্যুপর্বর্তী রচনা, ৫/১) ; ইত্যাদি।

যাঁরা কবিতা লেখেন তাঁরা হলেন : বেগম সুফিয়া কামাল (১/২) ; মাহবুব উল আলম চৌধুরী (১/২ ; ১/৩ ; ২/১ ; ৩/২) ; বক্কিম সেন (১/২) ; সুধাংশু সরকার (১/২) ; অচিন্ত্য চক্রবর্তী (১/২) ; আবদুস সালাম (১/২) ; বিভূতি চৌধুরী (১/৩) ; রবীন্দ্র মজুমদার (১/৩) ; ওহীদুল আলম (১/৩ ; ৩/১) ; সুচরিত চৌধুরী (১/৩ ; ২/১) ; শওকত ওসমান (২/১) ; অচিন্ত্য চক্রবর্তী (২/১ ; ৩/১ ; ৩/২) ; মোসফেকা রহমান (২/১) ; নুরুননহার (২/১) ; এস. এম. বাজলুল হক (২/২) ; সবুজ চৌধুরী (২/২) ; চলন্তিকা রায় (২/২ ; ২/৫ ; ৩/১) ; চঞ্চল চট্টোপাধ্যায় ২/৫) ; সুশান্ত চৌধুরী (২/৫) ; মোহাম্মদ শাহেদ উদ্দিন (২/৫) ; অন্নদা শংকর রায় (৩/১) ; শওকত ওসমান (৩/১) ; মতিউল ইসলাম (৩/১ ; ৩/২) ; প্রাথমিকা প্রামাণিক (৩/১) ; আলমগীর (৩/৩) ; সমরেন্দ্র দত্ত (৩/৩) ; (৪/১) ; দেবপ্রিয় বড়ুয়া (৩/৩) ; রুধির ভট্টাচার্য (৩/৩) ; উইলিয়াম হাইউট (সানান্ডেল হর্ক (?) অনুবাদিত, ৩/৩) ; আলাউদ্দিন আল আজাদ (৩/৪ ; ৪/১) ; শফিকউদ্দিন আহমেদ (৩/৪) ; জামালুদ্দিন (৩/৪) ; হাওয়ার্ড ফাস্ট (সানান্ডেল হর্ক? মা. আ. চৌ? ৩/৫) ; আতাউর রহমান (৩/৫ ; ৫/১) ; আজম চৌধুরী (৩/৫) ; চিরঞ্জীব শর্মা (৩/৫) ; শামসুর রাহমান (৪/১) ; নাজিম হিকমত (অনুবাদক—রামবসু, ৪/১) , অমিয়ভূষণ চক্রবর্তী, (৫/১) ; ইমামুর রশিদ (৫/১) ; পূর্ণেন্দুশখর পত্নী, ৫/১) ; প্রমুখ<sup>৯</sup> তাছাড়া নিগ্রো লোকসঙ্গীত মনোয়ার চৌধুরীর (ছদ্মনাম?) অনুবাদে ছাপা হয়েছে (৩/২)।

সীমান্তে গল্প লিখেছেন : আবুল ফজল (১/২) ; এ. বারী ওয়ারেসী (১/২, ওয়ারেসী বুক সেন্টার-এর মালিক) ; এবনে গোলাম নবী (১/২ ; ২/১) ; মাহবুব উল আলম চৌধুরী (১/৩) ; মুনীর চৌধুরী (১/৩) ; শূভাশীষ চৌধুরী (১/৩) ; গোপাল বিশ্বাস (২/১ ; ৩/২ ; ৩/৪) ; সমরেন্দ্র দত্ত (২/২) ; দিলীপ মুখোপাধ্যায় (২/৫) ; শুধু চৌধুরী (সুচরিত চৌধুরীর ছদ্মনাম, ২/৫) ; কৃষ্ণ চন্দর (শওকত ওসমানের অনুবাদে, ৩/১) ; সায়ফুল আলম (৩/১) ; বলবন্ত সিং (অনুবাদক শওকত ওসমান ৩/৩) ; সিরাজুল ইসলাম (আজিজ মিহির, ৩/৩ ; ৩/৫) ; দিলদার চৌধুরী ছদ্মনামে সানাউল হক (৩/৫) ; সু. র. আখতার (৩/৫ ছদ্মনাম ?) ; শওকত ওসমান (৪/১) ; সুলেখা সান্যাল (৫/১) ; বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর (৫/১) প্রমুখ।

ধারাবাহিক ভাবে বিভিন্ন সংখ্যায় ‘আগামীকাল’ শীর্ষক নাটক লিখেছেন সম্পাদক মাহবুবউল আলম চৌধুরী (২/২ থেকে) : আমেরিকার প্রতিভাবান কথাসিঙ্গী এ্যালব্যট ম্যালুজ এর গল্পের সোভিয়েত লেখক এম. লেভিনা কর্তৃক নাট্যরূপের বাংলা-‘সুখী মানুষ’ অনুবাদ করেন গোপাল বিশ্বাস। একাঙ্কিকা লিখেছেন এবনে গোলাম নবী (৩/১)। শওকত ওসমান ‘লাল বানু’ উপন্যাস ধারাবাহিক ভাবে লিখেছেন ২/২ থেকে বিভিন্ন সংখ্যায়। তিনি পি. লুকানিৎস্কি থেকে ‘নিশো’ শীর্ষক উপন্যাসও ৩/২ থেকে ধারাবাহিকভাবে অনুবাদ করেন। বলা বাহুল্য, সমাজতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণায় আস্থাশীল বিদেশী সাহিত্যিকদের রচনা থেকে অনুবাদের প্রয়াসের মধ্যে মার্কসীয় মতাদর্শে আনুগত্য প্রকাশের নজীর আছে। মৌলিক বাঙলা-রচনাগুলোর মূল সুবণ্ড পত্রিকার আকর্ষণীয় চরিত্রের সম্পূরক। লেখক-গোষ্ঠীর মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক, প্রগতি লেখক সংঘের সম্পাদক এবং যুগলীগ প্রভৃতি বামপন্থী সংস্থার সদস্য-পরিাপ্ত সংখ্যায় ছিলেন বলে এই ধারণা ভ্রান্ত হতে পারেনা।

এসব ছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ে সীমান্তে লিখেছেন কিংবা আলোচনা-সমালোচনা, চিঠিপত্র, মতামত লিখে পত্রিকার মিশনারী-কাজে অংশ নিয়েছেন সুচরিত চৌধুরী, এবনে গোলাম নবী, আবুল ফজল, মুহাম্মদ মনসুরউদ্দীন, শহীদুল্লাহ সাবের, সৈয়দ জামাল আহমেদ, মাহবুবউল আলম চৌধুরী, দৌলতর রহমান, এ.টি.এম. শামসুদ্দিন, আকবর হোসেন, ইব্রাহিম খাঁ, ইরশাদ হোসেন, আবিদ আলী, আবদুল গনি, অমিয় ভূষণ চক্রবর্তী, ইয়াকুব খান, প্রাণ গোপাল নাথ প্রমুখ।

বাণী পাঠিয়েছেন সীমান্তে পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, অন্নদাশংকর রায়, ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, ড. মুহাম্মদ এনামুল হক প্রমুখ। বিচিত্র বিষয় নিয়ে আলোচনা, সমালোচনা মন্তব্য হয়েছে। সমকালের রাজনীতি, সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রভাষার বিতর্ক, সিনেমা, চিত্রপ্রদর্শনী, সঙ্গীত, রেকর্ড, সাহিত্য, পুস্তক পত্র-পত্রিকা, গল্প-উপন্যাস-নাটক-কবিতার বই ইত্যাদি কিছুই বাদ পড়েনি সীমান্ত থেকে।

১৯৫০ সনের হিন্দু-মুসলমানের ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, এতদসংক্রান্ত বিভিন্ন ভাষার গল্প কবিতার অনুবাদ, সংস্কৃতি সম্মেলন, গণনাট্য ও গণসঙ্গীত এবং সমাজতান্ত্রিক বা মার্কসীয় সাহিত্যের অনুবাদ, চর্চা, সমালোচনা ; বিশ্বশান্তি ও আণবিক বোমা নিষিদ্ধকরণ, যুদ্ধবিরোধী প্রচারণা—প্রভৃতি বিষয়ে উৎসাহী আবেদনশীল, নিরাপোষ, ঝুঁকিপূর্ণ অনেক লেখা ছেপে, বক্তব্য প্রচার করে সেকালে জনগণের সপক্ষে এবং প্রশাসন বা স্টাবলিশমেন্টের বিপক্ষে দাঁড়িয়েছিল সীমান্ত। পশ্চিমবঙ্গেও সীমান্ত ব্যাপকভাবে আদৃত হয়।

গোপাল হালদার ‘পরিচয়’ পত্রিকায় সীমান্তর দাঙ্গা-বিরোধী সংখ্যা সম্পর্কে লিখেছিলেন (১৯৫০) :

...পূর্ব বাংলার সুদূর চট্টগ্রাম থেকে এমনি সময়ে হাতে এসে পৌঁছলো ‘সীমান্ত’ নামের মাসিক পত্রিকার দাঙ্গা-বিরোধী—তৃতীয় বর্ষের প্রথম বৈশাখ সংখ্যা। পূর্ব বাঙলায় দাঙ্গা-বিরোধী মানুষ আছেন এবং তাঁরা তাঁদের সেই মতামত প্রকাশ করতে ভীত নন। এই সংবাদ আমরা পশ্চিম বাঙলার মানুষেরা কজননা জানি। আমরা কজন না তা বিশ্বাস করি? পশ্চিম বাঙলা থেকে এমনি কোন দাঙ্গা বিরোধির আশ্বাস দিয়ে কোন সাময়িক সংখ্যা পূর্ব বাঙলায় গিয়েছে কিনা জানি না। এ-প্রশ্ন তুলতেই ভয় পাই, কারণ তৎক্ষণাৎ উঠবে এই ভরক, কোন বাঙলা কতটা দাঙ্গামুখী। তারপর কে টিল ছুঁড়েছিল প্রথম? কবে?...।<sup>১২</sup>

তৎকালের পূর্ব বাংলার অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্ম, চিন্তা ও সাহিত্যের অগ্রগতির লক্ষ্যে সীমান্ত কি ধরনের ভূমিকা অবলম্বন করেছিল বা তার দৃষ্টিভঙ্গিই বা কী ছিল—তা বোঝার জন্য উপরের মন্তব্যের সঙ্গে পত্রিকায় মুদ্রিত রচনার কিঞ্চিৎ উদ্ধৃতি সহযোগে সামান্য আলোচনা বোধ করি অপ্রাসঙ্গিক হবে না। মনে রাখতে হবে যে, ১৯৪৭-৫২-র ভাষা আন্দোলন-এর সমকালে সীমান্তের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন চলছিল। ৪৮-এর ভাষা আন্দোলন তখনও শুরু হয়নি। কিন্তু সীমান্তের নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৪৭ সংখ্যায় ‘রাষ্ট্রভাষা’ এবং ‘সাংস্কৃতিক সংকট’ সম্পর্কে স্পষ্ট বক্তব্য উচ্চারিত হয়েছিল।

প্রখ্যাত সাহিত্যিক আবদুল হক ‘ভাষা আন্দোলনের আদিপর্ব’ গ্রন্থে লিখেছেন—১৯৪৮ সনের মার্চ মাসে সক্রিয় ভাষা আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার পূর্বে লেখক সম্প্রদায় রাষ্ট্রভাষার তত্ত্বগত দিক নিয়ে আলোচনা শুরু করেছিলেন। জুন মাস থেকে তাঁরা ক্রমাগত লিখে ‘ভাষা আন্দোলনের মানসিক প্রস্তুতি সম্ভব’ করে তুলেছিলেন। প্রস্তুতি-পূর্বে (কেউ একমাত্র রাষ্ট্রভাষা বাংলা, কেউ উর্দু ও বাংলা উভয় ভাষার সুপারিশপূর্বক) যারা লিখেছিলেন তাঁদের মধ্যে আবদুল হক তাঁর লেখা পাঁচটি প্রবন্ধের (প্রথমটি ২২ শে জুন ১৯৪৭) কথা উল্লেখ করেছেন।

আরও বলেছেন, মাহবুব জামাল জাহেদী, ফররুখ আহমদ, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ড. কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল মনসুর আহমদ, আবুল কাসেম, ড. মুহম্মদ এনামুল হক, ইত্তেহাদ, আজাদ, প্রভৃতি পত্রিকায় অনেক লিখেছেন। গণ আজাদী লীগ (জুলাই ৪৭), তমদ্দুন মজলিশ (সেপ্টেম্বর ১৯৪৭) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানও বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার কথা বলেছেন। কলকাতা ও ঢাকা থেকে বাংলা ভাষার সপক্ষে উচ্চারিত এইসব বক্তব্য প্রেরণা জুগিয়েছিল ১৯৪৮-এর ভাষা আন্দোলনকে। আবদুল হক আরও লিখেছেন : ‘মনে হয় আরও কেউ কেউ লিখেছিলেন যাদের কথা এখনও কোথাও উল্লেখ করা হয়নি।’<sup>১৩</sup>

এখানে তাই উল্লেখযোগ্য যে : সীমান্ত পত্রিকার ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যায় (অগ্রহায়ণ ১৩৫৪, নভেম্বর ১৯৪৭) এখানে গোলাম নবী উর্দু ভাষাকে বাঙালিদের উপর জগদ্দল পাথরের মত চাপিয়ে বাঙালি জাতির মানসিক বিকাশকে রুদ্ধ করে দেয়ার ষড়যন্ত্রে ফোভ প্রকাশ করে লিখেছিলেন :

...এত উৎকর্ষিত হতে হতো না যদি মুষ্টিমেয় কয়েক জনের চাপে পড়ে গণের ভাষা রাষ্ট্রে স্থান না পায়... তবে গণতন্ত্রের দুর্দিন বলে বলতে (ভাবতে?) হবে। গণতন্ত্রের বুলি আওড়ালেই গণতন্ত্রের মর্যাদা দেওয়া হয় না। ভাষার দিক থেকে... বাংলা অপাংক্তেয় নয়... যদি রাষ্ট্র জনসাধারণের হয় তবে জনগণের ভাষাই রাষ্ট্রে স্থান



পাবে।... কারণ এই ভাষাতেই রাষ্ট্রের মঙ্গল নিহিত।... একজনের ঘাড়ে বিদেশী ভাষার জগদল পাথর চাপিয়ে দেওয়ার মধ্যে কোন সদুদ্দেশ্য থাকতে পারে না।... রাষ্ট্রের দৈনন্দিন কাজ যদি আজও কোন বিদেশী ভাষায় চালাতে হয় তবে স্বাধীনতা শুধু ইতিহাসের পাতাই উজ্জ্বল করবে, জনসাধারণের সঙ্গে তার চাক্ষুস পরিচয় হবে না।

‘সাংস্কৃতিক সংকট’ শীর্ষক আলোচনায় এবনে গোলাম নবী সাংস্কৃতিক ভাবনায় উন্নতি-প্রগতির দিকে না গিয়ে পশ্চাৎধাবনের জন্য আশংকা প্রকাশ করে বলেন, এই পরিস্থিতির পরিবর্তন আবশ্যিক। কারণ, সংস্কৃতি হলো মানুষের বিবেক। এর বিকাশকে প্রতিহত করার অর্থই হলো মানুষের বিবেককে ধ্বংস করে দেয়া।<sup>১৩</sup>

দ্বিতীয় বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় (মাঘ ১৩৫৫) দৌলতুর রহমান ‘আণবিক ভবিষ্যত’ শীর্ষক নিবন্ধে আমেরিকার আণবিক শক্তি বৃদ্ধির কুফল ও পারমাণবিক পৃথিবীতে মানুষের শান্তির সম্ভাবনা কতোটা ক্ষীণ সে-সম্পর্কে মূল্যবান আলোচনা করেন।

‘আমাদের সাহিত্য’ প্রসঙ্গে মাহবুব উল আলম চৌধুরীর বক্তব্য : রাষ্ট্রনায়কদের প্রকৃত মানসিকতা হলো কম্যুনিজম ও কমিউনিস্টদের প্রতাপ কমানো যায় কিভাবে তারই ষড়যন্ত্র করা। কিন্তু প্রগতিশীল তরুণেরা জনগণের ভাত কাপড়, চাকরী-সমস্যা এবং দুর্নীতি, দুর্ভিক্ষের অবসান চায়। তাই সরকার প্রগতির সাহিত্য ও সেই সাহিত্যের শক্তি দেখে ভীত হয়ে ধনিক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার জন্য প্রগতির পক্ষ নিয়ে যেসব তরুণ সাহিত্য সংস্কৃতির চর্চা করতে চায়—তাদেরকে কমিউনিস্ট বলে দমন করতে চায়।

লেখক এই পরিস্থিতিতে মন্তব্য করেন :

কিন্তু তারা যাই করুন, যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিবর্তনে পৃথিবী ঘুরছে তার প্রগতি রোধ করার পক্ষে আমেরিকার আণবিক শক্তিও যথেষ্ট নয়। কারণ আধুনিক সমাজবাদ ও সাম্যবাদ কোন রাষ্ট্র কোন রাষ্ট্রের ঘাড়ে তুলে দেয় না। জনসাধারণের প্রয়োজনে অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণে আপনা আপনি তার উদ্ভব হয়। এই সত্য কথাটি রাষ্ট্র-নায়কেরা জানেন না বলেই মরণ-কামড় দেবার আশায় তারা আজ এত চঞ্চল।

১৯৫০ সনের দাঙ্গার উপর প্রায় সকল পত্রিকায় (সমকালে) কমবেশী মতামত/ মন্তব্য প্রকাশ করা হয়েছিল। শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের একক এবং সমবেত বক্তব্যও প্রচারিত হয়েছিল। মূল বক্তব্য দাঙ্গার অমঙ্গল বর্ণনা। কিন্তু সীমান্তের দাঙ্গা বিরোধী সংখ্যা ছিল সেকালে ব্যতিক্রম। এই পত্রিকায় সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট গভীরভাবে বিশ্লেষণপূর্বক মনুষ্যত্ব ও মানবতার জয়গান করে যে মর্মস্পর্শী বক্তব্য ও চৈতন্য তুলে ধরা হয় এবং দাঙ্গাবিরোধী চৈতন্য জাগ্রতকরণের কার্যকর পন্থা অবলম্বন করেন উদ্যোক্তারা—তার সামাজিক সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক মূল্য অপরিসীম।

উল্লেখ করা হয়েছে পূর্বে যে, দাঙ্গা-প্রতিরোধে চট্টগ্রামে সীমান্ত-র উদ্যোগে ‘শান্তিফৌজ’ গঠন, শান্তি সম্মেলন-এর আয়োজন ইত্যাদি আন্তরিকতার সঙ্গেই হয়েছিল। সীমান্তের দাঙ্গা-বিরোধী এই সংখ্যাটি না দেখলে এইসব কর্মী, ভাবুক, সাহিত্যিকদের যুগোপযোগী, কালের চাহিদার সম্পূরক ভূমিকা যথার্থ উপলব্ধি করা যায় না। বৈশাখ ১৩৫৭ সংখ্যায় (৩য় বর্ষ ১ম সংখ্যা, নব পর্যায়) সীমান্ত ৮৪ পৃষ্ঠাব্যাপী<sup>১৪</sup> যে-সমস্ত লেখা প্রকাশ করেন, তা

দাঙ্গা-নিবারণার্থ বিংশ শতাব্দীর যাবতীয় লেখার মধ্যে গুণে, মানে আন্তরিকতায় শ্রেষ্ঠ নিঃসন্দেহে।

বাঙালি মুসলমান লেখকদের মধ্যে প্রধান মানবতাবাদী সাহিত্যিক এবং মুক্তবুদ্ধির আন্দোলনের একজন প্রধান সৈনিক মোতাহের হোসেন চৌধুরী “পশ্চিম বঙ্গের কবি, শিল্পী-সাহিত্যিকের নিকট একটি আবেদন”<sup>১৫</sup> শীর্ষক প্রবন্ধে বলেন : ‘সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নিবারণের ব্যাপারে কবি, শিল্পী, সাহিত্যিকদেরও কর্তব্য রয়েছে। সে সম্বন্ধে তাঁদের সচেতন হওয়া দরকার। কবি, শিল্পী ও সাহিত্যিকরা সবচেয়ে বেশী ভালবাসেন মনুষ্যত্বকে।...সেই মনুষ্যত্বের অপমানে তাঁদের চুপ করে থাকা অশোভন। সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত আবহাওয়া যে মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতিকূল, মনুষ্যত্বপ্রেমিক হিসাবে তাঁরাই তা সবচেয়ে বেশী উপলব্ধি করেন। ...এতে শুধু মানুষ মারা যায় বলে যে দুঃখ তা নয়, যারা মারতে আসে তাদের মনুষ্যত্ব মরে যাওয়ার দুঃখও অপরিসীম। বিকৃত বুদ্ধি মনুষ্যত্বহীন মানুষ সমূহ দিয়ে জাতির ক্ষতি ছাড়া লাভ হয়না।

তাই তাদের পুনরায় সহজ মনুষ্যত্বে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা প্রয়োজনীয় এবং সে দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে কবি শিল্পী সাহিত্যিকদের।...যাতে সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ডের পুনরাভির্নয় না হয়, সে জন্যে মনুষ্যত্বে পূর্ণ আস্থাবান তরুণ সম্প্রদায়ের দ্বারা একটি শান্তিফৌজ গড়ে তোলা আবশ্যিক।...একথা মনে রাখা দরকার, দেশের মুক্তি আমরা পেয়েছি, কিন্তু মানুষের মুক্তি এখনো হয়নি, আর মানুষের মুক্তি না হলে দেশের মুক্তির কোন মানেই হয়না। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা মানুষের মুক্তির পথে প্রবল অন্তরায়।...দাঙ্গা...যে আসলে প্রগতিবিরোধেরই সজাগ চেষ্টার ফল, তা উত্তমরূপে বিশ্লেষণ করে দেখাতে না পারলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে নিশ্চিহ্ন করা কঠিন হবে।’

এই ‘বিশ্লেষণের’ কাজ করেন শ্রী যোগেশচন্দ্র সিংহ, ‘যুগের সীমান্তে’ নিবন্ধে। তিনি বিশেষ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির আলোকে ভারতের আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক গতিধারার দীর্ঘ পর্যালোচনা করে বলেন, দাঙ্গার মূল কারণ সামাজিক ও রাজনৈতিক সংকটকে প্রগতিবিরোধীদের এড়িয়ে যাবার কৌশল বা ষড়যন্ত্র মাত্র। সমাজ-বিপ্লবকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা হচ্ছে ‘দাঙ্গা’।

অন্নদাশংকর রায় এসংখ্যাতাই লিখেছিলেন ‘নজরুলকে’ শীর্ষক কাব্যাংশ-

“ভুল হয়ে গেছে বিলকুল  
সবকিছু আজ ভাগ হয়ে গেছে  
ভাগ হয়নি নজরুল  
এই ভুলটুকু আমাদের জীবনে বেঁচে থাক  
এই ভুল নিয়ে দুর্গত কবির  
দুর্গতি মুছে যাক।”

শওকত ওসমান ‘হুঁশিয়ার’ শীর্ষক কবিতায় দাঙ্গার সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক সংকট এড়াবার তথা সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদী ষড়যন্ত্রের কথা ফাঁস করে দেন :

এক হও দুনিয়ার মজলুম/চোখ থেকে মুছে ফেলো ঘুম॥  
 আমরা দুনিয়ার এক মজহাবী/সমাজ-কলের চাকা আর চাবী।  
 বহু জাতি মজহাবের বেড়া/ তুলেছে যত দুনিয়ার লুঠেরা।  
 শোষণের কালো পিচকারী ভরি। আমাদের খুন খেলে হোরি॥

‘স্মৃতি নেই : হাসিনা নেই : কাকাবাবু’ শীর্ষক কবিতা দাঙ্গা, দেশ ভাগ ও ‘উদ্ধাস্ত’-সমস্যার প্রেক্ষাপটে রচিত। সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রই যে দাঙ্গার মূল কারণ, তা মাহবুবউল আলম চৌধুরীর কবিতারও বিষয়—

‘ভাঙা বাঙলার ক্ষুব্ধ বাঙ্গালী আবার/শক্তি সঞ্চয় করছিল ধীরে ধীরে,/ভাঙা বাঙলার ক্ষুব্ধ বাঙ্গালী আবার/মিলিত হচ্ছিল রাম-রহিমের প্রশ্ন ভুলে, /ভাঙা বাঙলার ক্ষুব্ধ বাঙ্গালী আবার/জেগে উঠছিল-মসজিদ মন্দিরের প্রভেদ ভুলে.../বিদেশী শয়তান বাঙালীর ঐক্যে/আবার সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল, আদেশ দিল/প্রভুভক্ত দালালদের কাছে—’

এ সংখ্যার সমস্ত কবিতা দাঙ্গা বিরোধী, মনুষ্যত্বের উদ্বোধক। কবিরী উদ্ধাস্ত জনগণের দৃগুখ বৃকে চেপে রাখতে পারেননি—পারেননি উপর্যুক্ত কবিও—“এই ভিটে মাটি তোমাদের তরে রেখে গেলাম,/রেখে গেলাম ছোট ছোট অনেক আশা অনেক স্বপ্ন,/অনেক দীর্ঘশ্বাস/এই মাঠ ঘাট শ্যামল পৃথিবী রেখে গেলাম/রেখে গেলাম ফোটা ফোটা চোখের জল, বুকের ঢল /এই স্বদেশের নীল আকাশ॥”

সবকিছু দেবার পরও যদি দেশবাসীর মনে একটি মর্মবাণী জেগে থাকে, তবেই উদ্ধাস্তর সাজান—“...সেই বেদনায় অনুশোচনায়/তোমার বক্ষে যদি জেগে ওঠে একটা মর্মবাণী ‘সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই’/সেদিন বন্ধু তোমার ও বৃকে আবার লইব ঠাই।’

এবনে গোলাম নবী ‘নাটকের অন্তরালে’ একাঙ্কিকায় স্পষ্ট উচ্চারণ করেন দাঙ্গার কারণ—‘আপাতত দৃষ্টিতে দাঙ্গা সম্প্রদায়গত হলেও এর মূল কারণ স্বার্থ। এক শ্রেণীর লোকের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য আজ হাজার হাজার নিরীহ মানুষকে আত্মহত্যা দিতে হচ্ছে...।’ দেশের রাষ্ট্রের কল্যাণ চাইলে শাস্তি প্রতিষ্ঠা করা দরকার—এই হলো ১৯৫০ সনের দাঙ্গার প্রেক্ষিতে পূর্ববঙ্গের শিল্পীসাহিত্যিকদের বক্তব্য।

কৃষণ চন্দ্রের দাঙ্গাবিষয়ক একটি গল্প অনুবাদ করেন শওকত ওসমান (‘দুই অমৃতসর’)—যার বক্তব্য হলো দেশ ভাগের পর একই মানুষ কিভাবে পাশ্চাত্য অন্য মানুষ হয়ে গেলো, একই অমৃতসর দুই রূপ দেখালো। হিন্দু-মুসলিম-শিখদের সাম্প্রদায়িক চেতনার বীভৎসতম চিত্রের পাশাপাশি ঐগল্পে মানবতার প্রতি আর্তিও ব্যক্ত হয়েছে।

‘জনসাধারণ এবং প্রগতিশীল শিল্পী সাহিত্যিকদের ভূমিকা’ বিষয়ে ‘আলোচনা’য় বলা হয় প্রগতিশীল শিল্পী সাহিত্যিকেরা ‘জনসাধারণের থেকে একচুলও বিচ্ছিন্ন হতে চান না। জনসাধারণের যে কোন অবস্থার মধ্যে প্রগতিশীল সাহিত্যিক শিল্পীরা নির্বিকার থাকতে পারেন না।...সাম্রাজ্যবাদী দালাল সাহিত্যিকরা মুক্তি-আন্দোলনকে পিষে মারার জন্য কলম ধরেছেন, শোষিত মানবকে ঘণ্য জীবের পর্যায়ে নামিয়ে দাবিয়ে রাখার সাহিত্য তৈরি করছেন। সুতরাং দেখতে গেলে, সাহিত্যিক ও শিল্পী রাজনীতিকে বাদ দিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করছেন না।’

আবুল ফজল দাস্গার প্রেক্ষিতে 'ইতিহাসের আহবান' জানিয়ে বলেছিলেন মনুষ্যত্ববোধের জাগরণ দরকার আর এক্ষেত্রে ছাত্র ও যুব-সমাজের ভূমিকা প্রধান। তিনি পরিস্থিতিতে অগ্নিসম গণ্য করে বলেন : 'এরকম কাণ্ডজ্ঞানহীন সর্বনাশা আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকা, নিজের মনুষ্যত্ব, ধর্ম ও রাষ্ট্রের প্রতি বিশ্বসঘাতকতা ছাড়া আর কিছুই নয়। নিজের প্রতি রাষ্ট্র ও মানুষের প্রতি ছাত্র ও তরুণসমাজ কখনো এমন বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে না। যে ছাত্র প্রকৃত ছাত্র, যে তরুণের আছে প্রকৃত তারুণ্য, আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে সে কখনো চুপ করে থাকতে পারে না, সে কখনো নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকায় অভিনয় করতে পারেনা।' তিনি তরুণ সমাজের দাস্গা, মনুষ্যত্বহীনতা ও বর্বরতাকে রুখে দাঁড়াবার নৈতিক শক্তির উজ্জীবন কামনা করে পাঁচ পৃষ্ঠার এই গুরুত্বপূর্ণ রচনাটি সীমান্তে লিখেছিলেন। ফলে সীমান্তের আবেদনে সার্বজনীন হতে পেরেছিল। যে-সমস্ত কারণে সীমান্ত তৎকালীন পূর্ববাঙলার সমাজে 'সাড়া' জাগিয়েছিল এবং ইতিহাসের পাতায় নিজে স্থায়ী আসন করে নিতে পেরেছে—এই দাস্গা বিরোধী সংখ্যাটি তার মধ্যে অন্যতম।

এছাড়া ১৯৫১ সনের মার্চ মাসে চট্টগ্রামের হরিখোলা মাঠে অনুষ্ঠিত সংস্কৃতি সম্মেলনে পঠিত রচনাবলি এবং সম্মেলনের বিস্তৃত বিবরণী সংকলন করে যে-সংখ্যাটি সীমান্ত (৪/১) প্রকাশ করে তাও গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাসের নানান আকর তথ্য হিসেবে আজ বহুমূল্য বিবেচিত হবে সন্দেহ নেই। কারণ, সম্মেলনে কারা কি বিষয়ে বলেছিলেন বা লিখিত প্রবন্ধ পড়েছিলেন, তা কোনো আলোচনায় পূর্ণাঙ্গ বিবৃত হয় না।

প্রায় কোথাও উল্লেখ করা হয়না যে, আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ, সত্যেন মজুমদার, সুফিয়া কামাল, মোতাহের হোসেন চৌধুরী, আবুল ফজল প্রমুখ ব্যতীত মোহাম্মদ ফেরদাউস খানও 'মাতৃ-ভাষার মর্যাদা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ ঐ প্রগতিশীল সংস্কৃতি-সম্মেলনে পাঠ করেছিলেন। পরবর্তীকালে দক্ষিণপন্থী পাকিস্তানবাদী ধারায় আত্মসমর্পন করায় আজ আর কেউ-ই ফেরদাউস খানের এই ভূমিকার কথা স্মরণে আনেন না।

বাঙলা দেশের বহু বিকৃত বীভৎসতম সাম্প্রদায়িক সংস্কৃতির কলুষতায় সমাজ-জীবন যখন স্থবির হয়ে পড়েছিল তখন অনুষ্ঠিত ঐ সংস্কৃতি-সম্মেলনের গুরুত্ব যেমন অপরিসীম হয়ে দেখা দিয়েছিল, তেমনি সংস্কৃতি সম্মেলনের লিখিত রূপটিও সেইকালে অশেষ ফলপ্রসূ হয়েছিল। এই সংখ্যাটির যে মূল তাৎপর্য তাহলো সম্মেলনের বক্তাদের বক্তব্য ও রচনা দ্বারা তুলে ধরা হয়েছে এই শাস্ত তত্য যে—জীবন, মানুষ ও সমাজকে বাদ দিয়ে সাহিত্য শিল্প সৃষ্টি সম্ভব নয় এবং মানুষের প্রতি মমত্ববোধই সেই সৃষ্টির প্রেরণা।

সম্মেলনে যে চিত্রপ্রদর্শনী হয়, তাতে জয়নুল আবেদিন, শফিউদ্দিন আহম্মদ, কামরুল হাসান, আজহারুল হক প্রমুখের চিত্র উপস্থাপিত হয়েছিল। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেছিলেন বিভাগীয় কমিশনার মি. এন. এম. খান। গীতানুষ্ঠানে সলিল চৌধুরীর সুর-সংযোজনায় নতুনত্বের সন্ধান পেয়ে দর্শকবৃন্দ মুগ্ধ হয়েছিলেন।

“যখন প্রশ্ন ওঠে যুদ্ধ কি শান্তি/আমাদের বেছে নিতে হয় নাক ভ্রান্তি ;/ আমরা জবাব দেই শান্তি, শান্তি/”—

এই গানের সুরের মুর্ছনায় শোভাভাও গেয়ে ওঠেন—শান্তি, শান্তি। বিশ্বশান্তি সম্মেলন ও পারমাণবিক অস্ত্র বন্ধের দাবির এবং হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সমকালে এই গান, তথা সংস্কৃতি সম্মেলন এবং সীমান্তর সংখ্যাটি বাঙলাদেশের সংস্কৃতি জগতে বিরাট প্রভাব ফেলেছিল। শান্তির সপক্ষে প্রচার সীমান্তর একটি প্রধান ও ব্যতিক্রমি সামাজিক দায়িত্ব পালনের প্রচেষ্টা।

সাহিত্য-জগতের সমালোচনায় সীমান্ত তার চরিত্র অনুযায়ী একটি দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে চেয়েছিল। পাকিস্তান আমলের পত্রিকাসমূহের আলোচনার জন্য ‘পত্রিকা প্রসঙ্গ’ বিভাগের ভূমিকাটি দ্রষ্টব্য :

পাকিস্তান হওয়ার পর থেকে ঢাকায় ও পূর্ববঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় অনেক সাময়িকী, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা বের হয়েছে। এই উদ্যম সত্যিই প্রশংসনীয়। কিন্তু সম্পাদক ও পরিচালকমণ্ডলীর জ্ঞান উচিত যে, এই ক্ষেত্রে তাঁদের দায়িত্ব অপরিসীম। কিন্তু অনেক মাসিক পত্রিকার কোন সৃষ্টি আদর্শ নেই। তার ফলে অনেক কাগজ থাকা সত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক অঙ্ককার বেড়েই চলেছে। এমন দায়িত্বহীনতার পরিচয় আমরা সহযোগীদের কাছ থেকে আশা করি নাই। এ সম্পর্কে আমরা প্রতি মাসেই আলোচনার বন্দেবস্ত রাখব।<sup>১৬</sup>

মোহাম্মদী, তাহজিব, নওবাহার প্রভৃতি প্রতিক্রিয়াশীল পত্রিকার বিরুদ্ধে তাঁরা লিখেছেন। এতে বুঝা যায়, স্পষ্টতই ‘সীমান্ত’ সেকালে প্রগতির পক্ষে দাঁড়িয়েছিল।

### তথ্যপঞ্জি

১. মাহবুবউল আলম চৌধুরী, কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবী নিয়ে এসেছি, ঢাকা ১৯৮৫; আনিসুজ্জামান লিখিত ভূমিকা।
২. মাহবুবউল আলম চৌধুরীর সঙ্গে ২২-০৫-১৯৯২ তারিখে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য।
৩. পূর্বোক্ত।
৪. মাহবুবউল আলম চৌধুরী স্বাক্ষরিত ‘বায়োডাটা’ থেকে।
৫. সিনেমা (সাপ্তাহিক), ৪ঠা ফাল্গুন ১৩৯৫, পৃ. ৯।
৬. ৭ সংখ্যক পাদটীকা দ্রষ্টব্য।
৭. ননীসেন গুপ্ত, বাংলা ভাষার রূপান্তর (প্রবন্ধ), সীমান্ত, ১ বর্ষ, ১ সংখ্যা, কার্তিক ১৩৫৪, পৃ. ৫৬।
৮. সীমান্ত পূর্বোক্ত, সম্পাদকীয়-আলোচনা, পৃ. ৭২।
৯. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের সময় সম্পাদক মাহবুব উল আলম চৌধুরী স্মৃতি থেকে সানাউল হক এর অনুবাদ বলে উল্লেখ করেছিলেন। শওকত ওসমান ‘চট্টগ্রামে সাংস্কৃতিক আন্দোলন : প্রগতিশীলধারা’ শীর্ষক বই-এর স্মৃতিকথায় লিখেছেন : “সংস্কৃতি-আন্দোলনের সহায়করূপে নানাভাবে বর্তমান দৈনিক ‘সংবাদ’ পত্রিকার সম্পাদক আহমেদুল কবিরের নাম স্মরণ না করে উপায় নেই। চল্লিশ বছর পূর্বের কথা। তখন চালচুলোহীন কুমার তিনি। পাকিস্তানের সরকারী অফিসার আমদানী-রফতানী বিভাগে।... সাংস্কৃতিক নানা পর্ব-অনুষ্ঠানে তাঁর সাহায্য পাওয়া যেত। সরকারী অফিসার তাই নেপথ্যে থাকতেন। সীমান্ত পত্রিকায় ছদ্মনামে ক্রিষ্টফার কডওয়েল এর বই থেকে এক প্রবন্ধ তিনি অনুবাদ করে দিয়েছিলেন। অন্য ধরনের সাহায্যের কথা বাদ দিলাম” (পৃ-৫৩) প্রকৃত তথ্য হয়ত আরও অনুসন্ধানের পর জানা যাবে।

১০. প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় সূচীপত্র সম্পূর্ণ উল্লেখ করা হয়েছে বলে এখানে পুনরুক্তি করা হয়নি। মাহবুব উল আলম চৌধুরী জানান প্রাথমিক প্রামাণিক, মোহাম্মদ শাহেদ উদ্দিন, সবুজ চৌধুরী, মোসাফেকা রহমান, আলমগীর প্রভৃতি ছদ্মনামে তিনিই লিখতেন। চলন্তিকা রায়, শুধু চৌধুরী বিভিন্ন ছদ্মনামে লিখতেন সুচরিত চৌধুরী। আজম চৌধুরী, দিলদার চৌধুরী প্রভৃতি নামে লিখেছেন কবি সানাউল হক। খোদা সরকারী আমলা-অফিসার ছিলেন তিনি। সিরাজুল ইসলাম নামে লিখতেন আজিজ মিছির। ইমামুর রশিদ ময়মনসিংহের লোক ছিলেন।
১১. উদ্ধৃত, চট্টগ্রামে সাংস্কৃতিক আন্দোলন : প্রগতিশীল ধারা ; পৃ. ৭।
১২. আবদুল হক, 'ভাষা-আন্দোলনের আদিপর্ব' ঢাকা, ১৯৭৩, পৃ. ১৩।
১৩. সীমান্ত, ১ বর্ষ, ২ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৫৪।
১৪. সীমান্ত-সম্পাদক মাহবুব উল আলম চৌধুরী বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে এই সংখ্যাটির কথা প্রসঙ্গে ২০০ পৃষ্ঠার কথা বলে থাকেন, কারণ দীর্ঘ দিন পর তিনি প্রকৃতপক্ষে কি করেছিলেন, তা ঠিক ঠিক মনে করতে পারেননি। দাঙ্গা বিরোধি সংখ্যাটিও তাঁর নিষ্কের কাছে নেই।
১৫. মোতাহের হোসেন চৌধুরীর এই লেখাটি 'সংস্কৃতি-কথা' (১৯৫৮) গ্রন্থে সংকলনের সময় প্রধান উদ্যোক্তা লেখকের ভগ্নি-পুত্র, পাকিস্তানের সিভিল সার্ভেন্ট, প্রয়াত প্রখ্যাত কবি, সানাউল হক (এবং তাঁর সহোদর কবি ইমাদুল হক প্রমুখ) পাকিস্তানের তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে স্পর্শকাতর (পাকিস্তান সরকারের সমীপে, পশ্চিমবঙ্গের লোকদের সঙ্গে আত্মীয়তা বন্ধির অনুরোধ আছে) বিবেচনায় ৫ পৃষ্ঠা বাদ দিয়ে পরিমার্জনপূর্বক মুদ্রিত করেন। 'সংস্কৃতি কথায়' প্রবন্ধের শিরোনামও পরিবর্তিত হয়েছে—'একটি নিবেদন'। 'সংস্কৃতি কথায় ৬ পৃষ্ঠা ছাপা হয়েছে। কিন্তু মূল লেখাটি ১২ পৃষ্ঠার।
১৬. সীমান্ত, কার্তিক ১৩৫৭, পৃ. ১৩।

### ৩. সংকেত (১৯৪৮-১৯৪৯)

‘সংকেত’ মাত্র দুবার বের হয়েছিল। পূর্ব-বাঙলার সাময়িকপত্রের ইতিহাসে ‘বড়দের জন্য পূর্ব-পাকিস্তানের প্রথম সাহিত্যপত্র’ হিসেবে সংকেত উচ্চ আসন অধিকার করে আছে।

ডক্টর মোহাম্মদ আবদুল কাইউম ‘পূর্ব পাকিস্তানের সাময়িকপত্র’ শীর্ষক প্রবন্ধে (১৯৬৮) উপর্যুক্ত মন্তব্য কিভাবে করলেন, তা বোঝা যায় না। কারণ ঐ প্রবন্ধে তিনি আজাদী পরবর্তীকালের কতিপয় সাময়িকপত্রের নামের পরই ‘সীমান্ত’র তথ্য উল্লেখ করেছিলেন। তিনি সম্ভবত ‘পূর্ব পাকিস্তান’ বলতে ঐ মুহূর্তে ঢাকাকেই বুঝেছিলেন, অথবা চট্টগ্রাম কে ‘পূর্ব পাকিস্তান’ বিবেচনা করেননি।

পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম সাহিত্য পত্রিকা কোনটি—নতুন তথ্য না—পাওয়া পর্যন্ত এর জবাব হলো ‘কৃষ্টি’। কৃষ্টির সমকালে অথবা অত্যাঙ্গকাল পরেই সীমান্ত প্রকাশিত হয়েছিল বলে সীমান্তকে দ্বিতীয় এবং পরবর্তী মাসে প্রকাশিত বলে ‘সংকেত’কে তৃতীয় সাহিত্য পত্রিকা হিসেবে মেনে নেয়া সঙ্গত।

এর অঙ্গকাল পরেই ঢাকা থেকে এক ঝাঁক মাসিকপত্রিকা বাঙলার সাহিত্য-গগনে আবির্ভূত হয়েছিল। মোহাম্মদী ১৩৫৬ সনে ঢাকা থেকে নব-পর্যায়ে পুনরায় প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে। এ ধারায় প্রায় এক মাস অন্তর-অন্তর পাকিস্তানবাদী ইসলামপন্থী গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় পত্রিকা প্রকাশ পায়। মাহেনও বের হয় চৈত্র ১৩৫৫ তে। দিলরুবা বৈশাখ ১৩৫৬, নওবাহার ও দ্যুতি ভাদ্র ১৩৫৬, ইমরোজ আশ্বিন ১৩৫৬ ; মোহাম্মদী অগ্রহায়ণ ১৩৫৬, তাহজিব বৈশাখ ১৩৫৭ ইত্যাদি।

প্রগতিপন্থী ধারার ঐতিহ্য রক্ষা করতে এসময়ে অগত্যা মুকতি যাত্রিক স্পন্দন প্রভৃতি বের হয়। লক্ষণীয় যে, এই ধারার পত্রিকার নামগুলোও ঈঙ্গিতময়। ‘সংকেত’ নাম এবং এর সঙ্গে তখনকার প্রখ্যাত তরুণ বামপন্থী লেখক আলাউদ্দীন আল আজাদ এর সংশ্লিষ্টতা স্মরণ ও বিবেচনাযোগ্য। তাছাড়া পত্রিকায় ঘোষিত উদ্দেশ্যের মধ্যে ‘প্রগতিশীল’ কথাটিও লক্ষণীয়।

ডক্টর আবদুল কাইউম মন্তব্য করেছেন : “দ্বিতীয় সংখ্যার পর আর পত্রিকাটি বেয়েয়নি। সুদীর্ঘকাল পরে এখন মাত্র প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা (পৌষ ১৩৫৫) টি পাওয়া যায়। এই সংখ্যার তথ্য অনুযায়ী সংকেত-এর সম্পাদক সিরাজুর রহমান। বিভাগীয় সম্পাদক চৌধুরী মমতাজ হোসেন এবং আলাউদ্দীন আল আজাদ। সংকেত এর সাইজ ছিল সাড়ে নয় ইঞ্চি বাই আট ইঞ্চি। পৃষ্ঠা সংখ্যা বিয়াল্লিশ, নিউজপ্রিন্ট। পত্রিকার শীর্ষে লেখা আছে ২৪ পয়েন্ট টাইপে “পূর্ব পাকিস্তানের একমাত্র প্রগতিশীল বাংলা মাসিক”।

‘আমাদের কথা’ শীর্ষক সম্পাদকীয়তে পত্রিকার ‘যাত্রা’ সম্পর্কে বলতে গিয়ে সম্পাদকগণ তৎকালের চিত্র ঐকেছেন :

‘বহু বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে আমাদের যাত্রা শুরু হলো। পাথেয় অদৈম্য-আশা, সুদৃঢ় আত্মবিশ্বাস আর কর্মপ্রেরণা। যাত্রা পথে আজ তলিয়ে দেখতে ইচ্ছে করে বিগত দেড় বছরের (আগস্ট ১৯৪৭-জানুয়ারি ১৯৪৯) ঐতিহাসিক ১৫ই আগস্টের বুনিন্দায় নিয়ে পূর্ব বাঙলা পশ্চিমবাঙলা থেকে পৃথক হয়ে এলো। সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য ও সংস্কৃতিক্ষেত্রে এক নতুন দায়িত্ববোধের সূচনা হলো। প্রথমত দেশ ভাগের ফলে বাঙ্গালী মুসলমানদের অধিকাংশই পড়লেন পূর্ববাঙলার আওতায়। সাহিত্যের পূর্ণতার প্রয়োজনে এদের জীবন ও মননকে ফুটিয়ে তোলা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়লো। তারপর সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বসমর ও মন্বন্তরে যদিও পূর্ববাঙলাই ধুকে ধুকে মরেছে সবচেয়ে বেশি, তবুও কলকাতা-কেন্দ্রিক বাংলা সাহিত্যে তার কোন হিঙ্গসই মেল না...আজাদীর এ দেড় বছরে কি চোখে পড়ে?

শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির জমার ঘরে শূন্য। সাহিত্যের এক তামস যুগের মহড়া চলছে। চারিদিকে ঘন-ঘোর আঁধার, সাড়া-শব্দ নেই, এমনকি শাওন-রাতের বিজলীও না। অন্নহীন, বস্ত্রহীন, নিঃসাড় পঙ্গু জীবনেরই প্রতীক এ দেড় বছর। ব্যারাক, মালগাড়ী আর পোড়ো-বাড়ীর আস্তানার মতোই ছন্নছাড়া এর সংস্কৃতি। এদেশে মানুষ আছে, তাদের সুখ আছে, দুঃখ আছে...নেই শুষু তাদের ভাষা। সভ্যতা হতবাক। এর কারণ এ নয় যে প্রতিভার দুর্ভিক্ষ লেগেছে পূর্বপাকিস্তানে, এ নয় মানুষ আজ ঐচ্ছতে চায় না সুন্দরের পথে, সুখের সাথে। সংস্কৃতি শিল্পের প্রতি সরকারি বেসকারি হত্যাদর ও অবহেলাই এর জন্য মূলত দায়ী।...নবজাগৃত বুদ্ধিজীবী-সমাজ বিশ্বের ভাবধারার সাথে নিজেদের ভাবধারার সমন্বয় সাধনের জন্যে উদগ্রীব হয়ে আছেন কিন্তু সেপথ কোথায়? ষাঁদের হাতে অর্ধ...যাঁরা এদের ঐচ্ছতে রাখতে পারেন, তাঁরা ভুলেই গেছেন যে সমাজ সংস্কৃতি শিল্প ছাড়া ঐচ্ছতে পারেনা।

...সাহিত্যপত্রিকায় লাভের কোটাটা টনটনে নয় তত। কাজেই কি প্রয়োজন তাতে? আর যাঁরা ভালোবাসেন সাহিত্যকে প্রাণ দিয়ে, তাঁরাও যে পরিচালনা করবেন একটা সাহিত্যপত্রিকা তার যো নেই। বাজারে কাগজ নেই। যা আছে কালোবাজারির দৌলতে দরটা তার এতই জমকালো...কাগজ কেনা...অসাধ্য। তারপর ব্যবসায়ী-সমাজ বিজ্ঞাপন দেবেন না। তাঁরা ভুলে যান সমাজে যাঁরা বুদ্ধিজীবী মাসিক পত্রিকার মারফত তাঁদের সওদা গিয়ে হাজির হবে তাঁদেরই হাতে।

সংকেতে বলা হয়—উচ্চমূল্যের (স্ট্যাণ্ডার্ড বোঝাচ্ছেন) পত্রিকা এখানে চলে না।

‘তবু আজ শ্রুতায়িত পূর্বের আকাশের সংকেত নিয়ে আমাদের যাত্রা শুরু হলো কুসুম ছাওয়া ছায়াঘেরা অপরূপ রাজপথে নয়, সাহিত্য সংস্কৃতির বিয়ু-বহুল সর্পিলা পথে। দৈনন্দিন জীবনের যে সংগ্রাম তার যে সংহতির সংকেত—এদের সবটুকু জ্বহর নিতে হবে শুষে। আরো কতো জানা-অজানা বিয়ুর ঝোড়ো মেঘ ভিড় জমায়ে আকাশে। গতিপথে বন্ধু পাভো অনেক। ছেড়েও যাবেন অনেকে। যারা চাইবে এগুতে হাত ধরে তাদের নেভো টেনে। এ চলার বিরাম নেই...শিল্প সংস্কৃতির গতিতে যতিপাত হবার নয় কোন দিন।’

প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যার সূচীপত্র : এডলিন রেঞ্চ (প্রবন্ধ) সাংবাদিকের দৃষ্টিতে মি. জিন্নাহ (অনুবাদক চৌধুরী মমতাজ হোসেন—পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগের একজন); আলতাফ হোসেন (প্রবন্ধ) এযুগের সেরা যাদুকর (ডন-সম্পাদক এর লেখার অনুবাদ করেন মিস লুৎফুন্নিসা বেগম লায়লী, রচনার বিষয়বস্তু কায়দে আয়ম)। সুলতানউজ্জামান খান (কবিতা) স্ট্রটা নও তুমিই এক ইতিহাস; হাসান হাফিজুর রহমান (কবিতা) কায়দে আজমকে; আশরাফ সিদ্দিকী (কবিতা) স্মরণ; আনার চৌধুরী (কবিতা) পৌষের কাব্য; শাহাদউল্লাহ (গল্প) পঁয়চ; আলাউদ্দীন আল আজাদ (গল্প) একটা বুকের ঢেউ; ছায়াছবি (সিনেমার আলোচনা) আমাদের কথা (সম্পাদকীয়)।

লক্ষণীয় যে প্রায় সব লেখাই কায়দে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহকে নিয়ে। ১৯৪৮-এর ১১ই সেপ্টেম্বরে কায়দে আজমের পরলোক গমন করার মাস দুই পরেই এই পত্রিকার



যাত্রা শুরু হয়েছিল। কয়েকদিনে আজম ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের ঘোষণা দিয়েছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে নিন্দিত হবার সুযোগ কম পাওয়ায় তখনকার প্রগতিশীল পত্রিকাও কয়েকদিনে আজম-চর্চা করতে। তখনও পূর্ববাঙলার জনগণ কয়েকদিনে আজমকে কট্টর প্রতিক্রিয়াশীলতার প্রতীকরূপে গ্রহণ করেনি। অথবা আত্মনুসন্ধান প্রবৃত্তি হয়ে দেখেনি যে পাকিস্তান আন্দোলনে যে সমস্ত বাঙালি নেতৃবৃন্দ অংশ নিয়েছিলেন, তাঁদের থেকে কয়েকদিনে আজমের মাহাত্ম্য এবং বিরাটত্ব বেশি কিছু ছিল না। পশ্চিমারা বাঙালিকে মনস্তাত্ত্বিকভাবে ‘কাঙাল’ করার জন্য ইকবাল ও কয়েকদিনে আজমের ভাবমূর্তি বড় করে তুলে ধরেছিল সচেতন পরিকল্পনার দ্বারা। আর বাঙালির যে কিছু নেই—, বিরাটত্ব, মহত্ত্ব, বংশ ও কুল গৌরব—এমনকি জাতীয় নিরাপত্তার কাজে সহায়ক পর্যাপ্ত বীরত্বও যে বাঙালির নেই, এমন সব হীনত্ব প্রচারের মূলে—যে ছিল বাঙালিকে পাশ কাটিয়ে সকল ক্ষেত্রে পশ্চিম-পাকিস্তানিদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্র— তা বাঙালি জাতি তখনও স্পষ্ট করে উপলব্ধি করতে পারেনি বলহেঁ একুশের প্রথম সংকলনের (১৯৫৩) সম্পাদক হাসান হাফিজুর রহমানও কয়েকদিনে আজমের ছবিসহ কবিতা লিখেছিলেন; আর

‘স্মৃতির মিনার ভেঙেছে তোমার? ভয় কি বন্ধু, আমরা এখনো/চারকোটি পরিবার/খাড়া রয়েছে তো।/ যে-  
ভিৎ কখনো কোনো রাজ্য প্যারেনি ভাঙতে.../ইটের মিনার ভেঙেছে ভাঙুক।/ একটি মিনার গড়েছি  
আমরা/চারকোটি পরিবার’—

বায়াম্লোর একুশের পরে লেখা এই অমর কবিতার রচয়িতা আলাউদ্দীন আল আজাদের স্ব-সম্পাদিত (বিভাগীয় সম্পাদক) পত্রিকায় কয়েকদিনে আজম এতটা গুরুত্ব পেতে পেরেছেন। তবু একথা সত্য যে গল্পগুলোতে যে দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্টতা পেয়েছে তা ইসলামপন্থীদের দৃষ্টি নয় এবং পত্রিকার রচনায় গাঁড়ামী নেই।

সাহিত্যের মাধ্যমে পূর্ব বাঙলার জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করতে গিয়ে তাঁরা বাঙালির অন্তর্জীবনকে যথার্থভাবে প্রতিফলিত করতে চেয়েছিলেন। তখনও বায়াম্লোর ভাষা আন্দোলন সংঘটিত হয়নি। বাংলা-উর্দুর বিতর্কে সচেতন বাঙালিরাও তখনও দ্বিধামুক্ত হতে পারেননি যে উর্দুর পরিবর্তে বাংলা একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবার আইনগত ও গণতান্ত্রিক অধিকার বা যোগ্যতা রাখে।

সবকিছু মিলিয়ে বিবেচনাপূর্বক বলতে হয় যে, কয়েকদিনে আজমের ছবি ছাপলেও মুসলিম লীগের শাসনকালীন প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রধানতম ব্যক্তির যারা তখন ক্ষমতায় আসীন ছিলেন—তাঁদের সুনজর ছিল না এই পত্রিকার কর্মকর্তাদের উপর, এবং ঠাঁও তখন ক্ষমতায় ভাগ বসাবার যোগ্য ছিলেন না; ফলে পত্রিকা চালানোর মতো আর্থিক সমর্থন পাননি। দু সংখ্যার পর তাই পত্রিকা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। নইলে পত্রিকা সম্পাদনের যোগ্যতা, প্রধান বাঙালি লেখকদের সঙ্গে যোগাযোগ এবং মুদ্রণসৌকর্য সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞান তাঁদের যা ছিল তাতে একটি মাসিক পত্রিকা চালানো যেতো এবং সে সামর্থ্য ছিল বলে তাঁদের প্রাথমিক উদ্যোগের মধ্যেও প্রমাণ পাওয়া যায়।

## ৪. অগত্যা

(১৯৪৯-৫২)

চট্টগ্রাম ও ঢাকা থেকে সীমান্ত, কৃষ্টি, সংকেত ইত্যাদি প্রকাশিত হলেও কৃষ্টি ও সংকেত এক-দুসংখ্যার বেশি প্রকাশিত হয়নি ; আর সীমান্ত মাসিক হলেও অনিয়মিতভাবে বের হচ্ছিল এবং তাও চট্টগ্রাম থেকে। অতএব ঢাকার প্রগতিপন্থী লেখক-সাহিত্যিকদের ভাব ও বক্তব্য প্রকাশের মাধ্যম তখনও সৃষ্টি হয়নি। মোহাম্মদী, মাহেনও, দিলরুবা প্রভৃতিতে প্রগতিবাদী প্রতিবাদীদের স্থান ছিলনা। এমত অবস্থায় তরুণ-প্রাণের অকৃত্রিম হৃদয়াকৃতি এবং সামাজিক দায়িত্ব পালনের একটি উপযুক্ত পত্র প্রকাশের তাগিদ থেকেই আষাঢ় ১৩৫৬, জুন ১৯৪৯ সনে ১০৭ ইসলামপুর, ঢাকা থেকে অগত্যা প্রকাশিত হলো-যার কর্নধার প্রতিভাদীপ্ত একদল সমবয়সী তরুণ ; পরবর্তীকালে ঐদের অধিকাংশই বাংলাদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে এক একটি স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছিলেন। কেউ কেউ বুদ্ধিজীবী-সমাজের অগ্রগণ্য হয়ে ব্যাপক পরিচিতি লাভে সমর্থ হয়েছেন। প্রখ্যাত টিভি ব্যক্তিত্ব ফজলে লোহানী (১৯২৮-৮৫), সাংস্কৃতিক তারকা ফতেহ লোহানী, সাংবাদিক-কলামিস্ট খন্দকার আবদুল হামিদ, তাসিকুল আলম খাঁ, সাবেররেজা করীম, শিল্পী কামরুল হাসান, সিদ্দবাদ ; সঙ্গীতজ্ঞ আবদুল আহাদ, কাজি আলাউদ্দিন, আবুসদ্দ নাসির, মাহবুব জামাল জাহেদী ; ডক্টর মুস্তাফা নূরউল ইসলাম (১৯২৭-), কবি আতাউর রহমান (১৯২৫-২০০০) নাট্যকার আনিস চৌধুরী (১৯২৯-৮৯) প্রমুখ 'অগত্যা'র আড্ডায় একত্রিত হয়েছিলেন এবং এই পত্রিকাকে ধিরেই ঐদের উচ্ছ্বাস, আনন্দ, চিন্তা-ভাবনা এবং কর্মকাণ্ড আবর্তিত হতে শুরু করেছিল। বলাবাহুল্য তা ব্যাপকভাবে আলোড়ন সৃষ্টি করতে পেরেছিল।

প্রকাশকাল ১৯৪৯ থেকে বর্তমান ২০০৩ পর্যন্ত—এই দীর্ঘকালের ব্যবধানেও 'অগত্যা' যে বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যায়নি, নানা প্রসঙ্গে এখনও স্মরণীয় হয়ে ওঠে—তাতেই বোঝা যায় এই পত্রিকা প্রকাশকালে কতোখানি স্থায়ী পরিচিতি অর্জন করেছিল। এটা সম্ভব হয়েছিল তখনকার মেধাবী, প্রগতিশীল, উচ্চাভিলাষী তরুণেরা এর প্রাণকেন্দ্রে ছিলেন বলে। রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক আইডেন্টিটির ক্ষেত্রে ঐদের অবস্থান ছিল মুসলিম লীগের পাকিস্তানপন্থী ও প্রতিক্রিয়াশীল প্রতারক ইসলামী ধারার বিপক্ষে। সোজা কথায়, স্টাবলিশমেন্টের বিরোধিতা করা ছিল তাঁদের উৎসাহী কার্যবালির মূল প্রেরণা। স্টাবলিশমেন্টের ভণ্ডামি, প্রতারণা এবং অপকীর্তির মুখোশ উন্মোচন করতে গিয়ে তাঁরা যে পদ্ধতি, পন্থা ও ভাষাকে আশ্রয় করেছিলেন, তাতে ছিল তীক্ষ্ণ হুঁল, শ্রীলতাবর্জিত ব্যঙ্গ-কৌতুক ও হাস্যরস। এইসব বৈশিষ্ট্যের কারণেই 'অগত্যা' ব্যাপকভাবে পঠিত, বহুল পরিচিত হতে পেরেছিল, সঙ্গে সঙ্গে কুখ্যাতি অর্জন করেছিলো 'ভদ্রলোকের পত্রিকা নয়' বলে।

বলা হতো, ভদ্রলোকের অপাঠ্য, অশ্রীল কিন্তু বিষয়বস্তুর কারণেই তা প্রতিষ্ঠিত অপ্রতিষ্ঠিত, খ্যাত-অখ্যাত, সরকারি-বিরোধি সকল প্রবীণ-তরুণের পাঠ্য হয়েছিল। এর সমালোচনার বিষয় ছিল মুসলিম লীগ সরকারের রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক অর্থনৈতিক

প্রশাসনিক অপপ্রয়াস ; আর প্রতিষ্ঠিত, প্রবীণ কবি সাহিত্যিক এবং তাঁদের অনুগত অনুসারী হবু-খ্যাত ডানপন্থী তরুণ কবি-সাহিত্যিক। ফলে অশ্লীল বলে পড়ব না—এমন ভাব দেখিয়ে পাশ কাটিয়ে যাওয়া চলতো না। যেমন এককালে চলতো না কল্লোল (১৯২৩) শনিবারের চিঠি, অগ্রগতি (১৯৩৫) অচলপত্র না-পড়ে অবজ্ঞা করা। অবশ্য একথা বলতে হবে যে, জনপ্রিয় হবার ও পরিচিতি অর্জনের কৌশল ও মেধা, আর সাহস উদ্যোক্তাদের দলপতির (ফজলে লোহানী) ছিল। ফজলে লোহানীর কথা স্মরণ করলেই কিছুটা অনুমান করা যায় ; তিনি স্বাধীনতা পরবর্তী কালে দীর্ঘদিন বিরতির পর লণ্ডন থেকে প্রবাস-জীবন সমাপ্ত করে দেশে এসে মৃত্যুর পূর্বে আশির দশকে বি.টি. ভি.তে ‘যদি কিছু মনে না করেন, ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান করে কিভাবে অতি অল্প সময়ে একালের তরুণ-সমাজের কাছেও ব্যাপকভাবে জনপ্রিয়-ব্যক্তিত্বে পরিণত হতে সমর্থ হয়েছিলেন। অতএব দৃষ্টি আকর্ষণের কৌশল ছিল তাঁর স্বভাবগত। একজন সমালোচক লিখেছেন :

ধরে প্রচারিত... তাঁর অননুকরণীয় ভংগী এই অনুষ্ঠানকে সর্বস্তরের দর্শকের কাছে জনপ্রিয় করেছে। ...তৈরী ছক থেকে বের হয়ে নতুন ধরনের অনুষ্ঠান করেছিলেন... টিভিমাধ্যম যে কেবল সাংস্কৃতিক বিনোদনের মাধ্যম নয়, এর যে আরও কার্যকর ভূমিকা পালন করার কথা... তা তিনি প্রমাণ করেছিলেন... দীর্ঘদিন মুদ্রণ সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলেই তাঁর পক্ষে টিভি সাংবাদিকতা করা সহজ হয়েছিল... তাঁর স্মার্টনেস, বাকচাতুর্য, উপস্থিত বুদ্ধি, হিউমার দিয়ে এধরনের শো শ্রোগ্রামের মাধ্যমে যেভাবে জনগণকে মাতিয়ে রাখতেন তার জুড়ি মেলা ভার।<sup>২</sup>

কবি আতাউর রহমান ‘অগত্যা এবং আমরা কয়েক জন’ শীর্ষক এক স্মৃতি কথায় লিখেছেন : ফজলে লোহানীর ‘ব্যঙ্গ বিক্রম করার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তাসিকুলেরও সেটা ছিল। অগত্যায় ব্যঙ্গাত্মক লেখাগুলো ওদের যৌথ রচনা। মোস্তাফা (মুস্তাফা নূরউল ইসলাম) সাহেবের কিছু অবদান আছে তাতে। ওদের ভাষার কিছু নিজস্ব কোড ছিল—সেটা ওরাই বুঝতো। সেই কোডের ভাষায় কথা বলতো আর হাসতো।’

...লোহানী ভ্রাতৃত্ব ধাক্কা আঞ্জিমপুরে বোন-ভগ্নিপতির বাসায়।—আমরা দল বেধে যেতাম—আমি, আনিস চৌধুরী, তাসিকুল আলম খাঁ, মুস্তাফা নূরউল ইসলাম... আড্ডা জমাতাম... দেশের মূল স্রোতধারা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকিনি... বুঝলাম (১৯৪৯ সনে) ফজলে লোহানী বামের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। তখন মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে কড়া সমালোচনা অগত্যা ছাড়া কেউ করতো না—যদিও সে সমালোচনার চরিত্র ছিল ভিন্ন। ছাত্র আন্দোলন, যুব আন্দোলনের সঙ্গে লোহানীর যোগ ছিল। মথুর রেস্টুরেন্টের সাহিত্য সভায় পঠিত প্রবন্ধ গল্প-কবিতা অগত্যা প্রকাশ করতেন। আর্থিক টানাটানি ছিল। তাই তিনি মাঝে মাঝে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় আংশিক সময় কাজ করতেন। অনেক সময় রাতে কাজ করে তাসিকুলের সঙ্গে ইকবাল হলে আসতেন। আমার এবং তাসিকুলের বেড়ে শুষে পড়তেন।

ফজলে লোহানীর ছিল তীক্ষ্ণ কাণ্ডজ্ঞান আর দ্রুত কাজ করার ক্ষমতা। ‘অগত্যা’ অফিসের কাজ তিনিই করতেন বেশি। নিজের হাতে চিঠিপত্র টাইপ করতেন। ‘সবুজ’ (আবু সঈদ নাসির, প্রকাশক ও মুদ্রাকর, অগত্যা) করতো বাইরের কাজ। লোহানী আনিস চৌধুরীর সঙ্গে বিজ্ঞান বিভাগে পড়ত। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখাপড়ার দিকে তাসিকুলের মতো ঠাঁরও অনীহা ছিল। প্রচলিত সামাজিকতা আর বাধাধরা জীবনের প্রতি

অবজ্ঞাই ছিল। অগত্যায় অনেক লেখায় তার তীব্র ছাপ আছে। অনেক সমস্যার ভারের মাঝেও লোহানী প্রাণবন্ত, হাসিখুশি থাকতেন।... ১৯৫২ র ২১শে ফেব্রুয়ারির ঘটনার পরপরই লোহানী কবিতা লিখলেন।<sup>৩</sup>

সে কবিতা সত্যিই বেশ ভাল হয়েছিল। ঔ হাত দিলে সব রকম লিখতে পারতেন। অগত্যার বেনামী লেখাগুলো বেশীর ভাগ লোহানীই লিখতেন। বহু অনুবাদ করেছেন। তাঁকে অনায়াসে সব্যসাচী বলা যায়।<sup>৪</sup>

আনিস চৌধুরী সম্পর্কে মুস্তাফা নূরউল ইসলাম লিখেছেন :

সাতচল্লিশের পার্টিশনের পর ওরা তিনজন এসেছিল কলকাতা থেকে। সবুজ, লোহানী, আর আনিস। প্রথম তারুণ্যের আমরা কয়েকজন মিলেছিলাম,... তখনকার দুর্দান্ত 'অগত্যাকে নিয়ে। কত অজস্র লেখা যে আনিস লিখেছে অগত্যায় স্বনামে, বেনামে, ছদ্মনামে। একটা কম্পিটিশনের মতো ছিল—কে কতো হুঁল—ফোর্টানো লেখা লিখতে পারে, কতো ঠ্যাড়া করে লিখতে পারে। হামলার লক্ষ্যবস্ত তখনকার পাকিস্তানি প্রভুরা। লেখায় কেউ কারুর চাইতে কম যেত না, তবে আমাদের মধ্যে সবচাইতে নির্বিরোধী, সবচাইতে সরল চেহারার, স্বল্পবাক আনিস চৌধুরী যে ঐ বিশেষ কর্মটিতে অমন ধারালো হয়ে উঠতে পারত, বাজ-পাখির মতো হয়ে যেত, ভেতরের আমরাই কেবল তা জানতাম। আনিসের লেখার একটা বিশেষ ভঙ্গি ছিল। ঐ ভঙ্গিটা যে কেমন করে রপ্ত করেছিল, বিনা আয়াসে তরতরিয়ে সে লিখে যেতে পারত। লেখার উপকরণের ব্যাপারে ভারি সৌখিন ছিল আনিস—সেই আমলেই রেডিওবণ্ড কাগজ আর চাই পাইলট পেন। অগত্যার জন্য গল্প লিখতো, আর সম্পাদক লোহানী, আনিস, আমি তিনে মিলে আমরা 'প্রশ্নোত্তর' লিখতাম।

বিচিত্রায় প্রকাশিত হাসান হাফিজ লিখিত একটি প্রতিবেদনে মুস্তাফা নূরউল ইসলাম বলেন,

একই ছদ্মনামে আমরা তিনজন—লোহানী, আনিস, আমি ঘুরে ফিরে লিখতাম। অগত্যার কিছু কলাম যেমন 'আদ্যোপান্ত', 'ইত্যাদি', 'প্রশ্নোত্তর', রেডিও বিষয়ক একটি কলাম—এসব আমরা একসঙ্গে বসে লিখতাম। কখনো পাইওনিয়ার প্রেসে বসে, কখনো হ্যাপী রেস্টুরেন্টে, সলিমাবাদ রেস্টুরেন্টে বা মধুর দোকানে এসব লেখা হত। এখন আর বলতে বাধা কী, প্রশ্নগুলো বানানো হত। ঐ কাজ মূলত আনিসই করত। চট জলদি এত অদ্ভুত অদ্ভুত প্রশ্ন ওর মাথায় কোথা থেকে যে আসত। তারপর যৌথ প্রয়াসে জবাব তৈরী করা। লক্ষ্য ঐ একই—শিশুরাষ্ট্র পাকিস্তানের দাঁতাল দখলদার মুকুব্বিরা, যারা কথায় কথায় ইসলামের নামে, দুই পাকিস্তানের ঐক্যের নামে, পাঁচ হাজার বছরের (বানোয়াট) ঐতিহ্যের নামে ছবক বিতরণ করতেন, ফরমান জারি করতেন।

বিশেষ করে আরো ছিল—বাংলা ভাষা, হরফ, রবীন্দ্র-নজরুল এবং আমাদের বাঙালিত্ব নিয়ে করাচি-ঢাকার ক্ষমতাধর সেই মাতব্বরদের রক্তচক্ষু নির্দেশ। সবারত জানা রয়েছে তাদের দুশমনি অভিযানকে রাজপথে রুখেছিল আটচল্লিশ-বায়ামোর তরুণ ছাত্র আর সাধারণ মানুষ, সেই সঙ্গে একটু যোগ করি সীমিত সাধে 'অগত্যা' নামের পত্রিকাটিও কিছু কাজ করেছিল। সেসব কথা তখনকার পাঠকরা এখনো সম্ভবত স্মরণ করতে পারবেন।

মুস্তাফা নূর উল ইসলাম বলেন, অগত্যার একেবারে ভেতর বাড়ির চারজনের অন্যতম ছিলেন আনিস চৌধুরী। 'না, প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে আনিসকে তেমন দেখিনি—মিছিলে সমাবেশে কিংবা মঞ্চে; তবে প্রতিরোধী এবং প্রতিবাদী লেখালেখিতে কতো অজস্র-বার যে ঝলসে উঠতে দেখেছি তাকে। তখন আমাদের ঠাই ছিল পুরানো রেললাইনের পাশে বাখারির বেড়া-বাঁধা দোচালা টিনের শেডে। সারিসারি শেড-কে বা কারা যেন নামকরণ করেছিল 'ইকবাল হল'—বর্তমান সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের (ঢা. বি.) আদি চেহারা। সামনের সারির ঘরগুলোতে কেমন করে যে জুটেছিলাম আমরা কয়েকজন। এতদিন পরেও স্মরণ করতে

পারছি সহবাসীদের কারুকে কারুকে—আখলাকুর রহমান, কে.জি মোস্তফা, শহীদ খোন্দকার আবু তালেব, একদা কবি আতাউর রহমান, খালেক নওয়াজ (৫৪-র নির্বাচনে যিনি ক্ষমতাসীন মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিনকে পরাজিত করেছিলেন) ছাত্রলীগ নেতা শামসুল হক, সাংবাদিক কবি তাসিকুল আলম খাঁ, আর সেই সঙ্গে আনিস চৌধুরী। সবাই আমরা ছাত্র সে-সময়টায়। ৪৮ থেকে ৫২ কাল পর্বের খানিকটা হয়ত ধারণা করা যেতে পারে এইসব মানুষের উল্লেখ থেকে। বলব কী, নানান ঝড় ঝাঁপটার ভেতর দিয়ে আনিস এবং আমরা হয়ে হয়ে উঠেছি এই কাল-ইতিহাসের পরিবেশে।...

বিজ্ঞানের ছাত্র আনিস যে শেষ অবধি সাংবাদিকতায় জড়িয়ে পড়ল এবং জীবন ভর সাংবাদিকই রয়ে গেল, বিস্মিত হইনি তাতে। কেননা বিশেষ ঐ কাল-পরিবেশ লালন করেছিল তাকে, আর আমরা ত দেখেছি কী গভীর সচেতন, সংবেদনশীল ছিল তাঁর চিত্ত। লেখার কলম ছিল দখলে, সমকালে মানুষ হয়ে ওঠা আনিসের জন্যে সম্ভবত অন্যতম বিকল্প কর্ম কিছু ছিল না। কিন্তু আরো একটি লেখা যে ভবিষ্যৎ তাঁর ললাটে লিখে রেখেছেন খুব কাছের জন আমরা কিন্তু তখন তা আন্দাজও করতে পারিনি। বলেছি প্রচুর গল্প লিখেছে আনিস—সংলাপ রচনায় হাতটি ছিল পাকা। ঐটেই পাঠককে টানত আগে। পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি অকস্মাৎ আবিষ্কার করা গেল আমাদের সেই আনিস রীতিমতো শক্তিশালী নাট্যকার।... এই প্রজন্মও জানুক—একদা আমাদের সেই সময় গেছে, একদা আমরা প্রতিবাদী অমন একটা পত্রিকা বার করেছিলাম, নাম ‘অগত্যা’; আর আনিস চৌধুরী নামের লেখক মানুষটি ছিল সেই প্রতিবাদের অন্যতম হাতিয়ার।<sup>৫</sup>

## ২

অগত্যের প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় আত্মপরিচয় দেয়া হয়—‘বিচিত্র মাসিকপত্র’ বলে। বর্ষ আরম্ভ হয় আষাঢ় ১৩৫৬ থেকে। প্রতি বাংলা মাসের প্রথম এবং ইংরেজী (খ্রীষ্টীয়) মাসের তৃতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হবে বলে ঘোষণায় বলা হয়। মূল্য প্রতি সংখ্যা আট আনা। বার্ষিক ছ টাকা নয় আনা। ষাণ্মাসিক তিনটাকা আট আনা এবং ত্রৈমাসিক একটাকা বার আনা। ডাক মাসুল অন্তর্ভুক্ত। ‘অগত্যের প্রচার সূরুচিসম্পন্ন পাঠক এবং সুসংস্কৃত ছাত্র সমাজ—এ’ আরও বলা হয় :

অগত্যা একমাত্র প্রগতিশীল সাহিত্য পত্রিকা। জীবন, সাহিত্য চলতি ঘটনা, বিশ্বপরিস্থিতি, সিনেমা, বেতার, দর্শন, বিজ্ঞান, কারুকলা, সমালোচনা এবং আমাদের কৃষ্টি ও অগ্রগতির একমাত্র পরিচায়ক। মননশীল রুচিসম্পন্ন সাহিত্য রচনাই অগত্যের উদ্দেশ্য। রাজনীতির সঙ্গে অগত্যের কোন সম্পর্ক নেই। কোন দল বা গোষ্ঠীর প্রচারপত্র অগত্যা নয়। অগত্যা, আপনার আমার সকলের মুখপত্র। পৃষ্ঠা সংখ্যা চৌষটি। প্রতি পৃষ্ঠার মূল্য আধ পয়সা। চৌষটি পৃষ্ঠা অন্তত চৌষটিবার পড়তে ইচ্ছে করবে আপনার। অগত্যা টাকা থেকে প্রকাশিত। দ্বিবার্ষিক ও প্রয়োজনবোধে বহুবার্ষিক মুদ্রিত হবে।

অগত্যের প্রকাশক ও মুদ্রাকর হিসেবে নাম ছাপা হত আবু সঈদ নাসির এর। সাধারণ উপদেষ্টা ফতেহ লোহানী। সম্পাদক—সমবায় (মণ্ডলী)—তে ছিলেন—বিশ্বপরিক্রমায় খোন্দকার আবদুল হামিদ; সংস্কৃতি সংবাদে—তাসিকুল আলম (খাঁ); প্রচারে—সাবের রেজা করীম; সৌষ্ঠব রচনা ও আঙ্গিক পরিকল্পনায়—কামরুল হাসান এবং সিদ্দবাদ; সঙ্গীতে—আবদুল আহাদ, স্টুডিওর সংবাদ—এ—কাজি আল-মুদ্দিন; এবং সম্পাদক : ফজলে লোহানী।

সপ্তম সংখ্যা প্রথম বর্ষ থেকে সম্পাদক সমবায়ের সদস্য সংখ্যা কমে যায়, নিশ্চয়ই অগত্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকতে চাননি অনেকেই—কারণ নিরাপোষ নিন্দুক ছিল অগত্যা ; সরকার-বিরোধী ভূমিকায় ভয় পেয়ে যাবেন কেউ কেউ। ফলে খোন্দকার আবদুল হামিদ, কাজি আলাউদ্দিন, আবদুল আহাদ এর নাম মুদ্রিত হয় না। তবে প্রথম বর্ষ সপ্তম সংখ্যায় ফতেহ লোহানী, তাসিকুল আলম, সাবের রেজা করীম, কামরুল হাসান, সিদ্দাবাদ এবং হামিদুর রহমান—এর নাম বলবৎ থাকে এবং নতুন আসে।

অগত্যের যে বৈশিষ্ট্যটি লক্ষণীয় তাহলো—কায়েদে আজম বা ইকবালের কোন স্তুতি না নিয়ে রবীন্দ্রনাথের উক্তি পুরোভাগে উদ্ধৃত করে এবং ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-চিন্তা বিষয়ক প্রবন্ধ (‘পৃথিবীর কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর’) ছেপে যাত্রা শুরু করেছিল। এরপরও মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম প্রণীত ‘রবীন্দ্রনাথের মানবতাবোধ ও বুর্জোয়া সাহিত্যিকের আত্মবিরোধ’ শীর্ষক প্রবন্ধ ছাপা (৪/২) হয়। সোভিয়েত সাহিত্যিক আন্তন শেকভ সম্পর্কে আলোচনা ও মার্কসীয় মতাদর্শে বিশ্বাসী সাহিত্যিক খাজা আহমদ আব্বাস এর রচনার অনুবাদ এতে গুরুত্বের সঙ্গে ছাপা হয়। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ইলিয়া ইলেনবুর্গ, এ্যালান মরে, আনাতোল ফ্রান্স, বালজাক, বার্নাডশ, হেমিংওয়ে, এ গ্রিনিন, গোর্কী প্রমুখ বিদেশী প্রগতিপন্থী লেখকদের সাহিত্যের অনুবাদ অগত্যা বিশেষ মর্যাদায় ছাপা হয়।

এদেশের পত্রপত্রিকায় এই শ্রেণীর সাহিত্যের প্রকাশ অনেকটা নতুন ছিল। এদিক থেকে প্রসঙ্গত মন্তব্য করা সঙ্গত যে বিদেশী সেরা সাহিত্যের বিশেষজ্ঞ প্রগতিবাদী চিন্তাধারার সঙ্গে বাঙালি পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে সাহিত্যিকপরিমণ্ডলে অগত্যা নতুন মাত্রা সংযোজন করেছিল। এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় সৈয়দ আলী আহসানের ‘পূর্ব পাকিস্তানের শিল্পক্ষেত্রে নির্দেশ’ শীর্ষক একটি প্রবন্ধও ছাপা হয়।

বোঝা যায় আলী আহসান তখনও ততোটা চিহ্নিত পাকিস্তানবাদী ইসলামপন্থী রবীন্দ্রবিরোধী বলে প্রগতিশীলদের কাছে পরিহার্য লেখকরূপে চিহ্নিত হননি। এক পর্যায়ে তিনি যে বাঙালি সংস্কৃতি ও রবীন্দ্রবিরোধী, প্রতিক্রিয়াশীলতার জলজ্যস্ত প্রতীকে পরিণত হন, তখনও পর্যন্ত তাঁর স্বরূপ পরিপূর্ণ উন্মোচিত হয়নি। কিন্তু অগত্যের আদর্শের সঙ্গে এই প্রবন্ধের বক্তব্য সংগতিপূর্ণ ছিলনা। তিনি পাকিস্তানি-ইসলামি সাহিত্যের শিল্পের নতুন আদর্শের কথা বলছিলেন।

‘আমাদের চিত্রনাট্য’ সম্পর্কে আলোচনা করেন আল্ নাসির। আন্তন শেকভ থেকে অনুবাদ করেন মনসুর মুসা। ‘রাজদ্রোহী’ শরীক গল্প লেখেন ফতেহ লোহানী। ‘আলেকজান্ডার কেন এগোলেন না’ শীর্ষক ব্যঙ্গ-গল্পের রচয়িতা সম্পাদক ফজলে লোহানী। খাজা আহমদ আব্বাসের ‘বারো ঘন্টা’ শীর্ষক গল্পের অনুবাদ করেন মুস্তাফা নূরউল ইসলাম। কবিতা ‘আশিবর্বাণী’ লেখেন শাহাদাত হোসেন। ‘অগত্যা’ নামে কবিতা লেখেন ফররুখ আহমদ।

আরও কবিতা লেখেন—শামসুল হুদা, বদরুল হাসান, নাজির আহমদ, তাসিকুল আলম খাঁ, উত্তীয় সেন, ইরফান প্রমুখ।

উল্লেখযোগ্য যে ‘বিদ্রোহী’র স্টাইলে ‘নাস্তিক’ শীর্ষক কবিতা লিখেছিলেন ইরফান—হে বদ্ধচক্ষু ভগবান, ...‘বজ্রের অসি নামিয়ে রাখো, প্রাচুর্যের সন্ধানে চাছি.. অনন্তের প্রতি কোষ পানে, ধরণী কক্ষচ্যুত হলো বুঝি তাই।’ (প্রথমবর্ষ প্রথম সংখ্যা আষাঢ় ১৩৫৬, পৃ. ৬২)

মার্কসবাদী লেখক-কবি আতাউর রহমান লিখেছিলেন ‘হিন্দু-মুসলমান’ শীর্ষক কবিতা (১/১০-১১)। ফ্রেডারিক এঙ্গেলস—এর কথা উদ্ধৃত করে কবিতা রচনার স্টাইল এদেশে সচরাচর দেখা যায় না। কিন্তু অগত্যায় তা ছিল। আতাউর রহমান এই স্টাইল অনুসরণ করেন। প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যার ‘আদ্যোপাস্ত’ বিভাগে ১৯৪৯ সনে প্রকাশিত সাহিত্য-পত্রিকার পটভূমিরূপে তখনকার সাহিত্যিক পরিস্থিতিটাও লক্ষণীয় :

‘বহু শতাব্দী পর আজ আমাদের বুক থেকে পরাধীনতার গ্লানিময় জগদ্বল পাথর নেমে গেছে। আজ আমরা মুক্ত, স্বাধীন হয়েছি। আজ আমাদের সাহিত্য মুক্ত হওয়া দরকার। সাহিত্যিককেও সব রকম অনাচার থেকে আজাদ হওয়া প্রয়োজন। আজ আপনার উচিত দেশে সবল সুস্থ ঈঙ্গিত দিয়ে, নতুন শ্রেণর দিয়ে, ভবিষ্যতের শক্ত ভিত্তিমূল তৈরী করার কাজে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা। আজ সাহিত্যকে নিতে হবে সংস্কারক আর সংগঠকের কঠিন ভূমিকা। যা মিথ্যা, যা সত্য নয়, যা বাস্তবের অপলাপ, তাকে আপনার তুলে ধরতে হবে সকলের চোখের সামনে। জীবনের রঙ্গে-রঙ্গে যে দুর্নীতির সামান্য ছোঁয়া লেগে জীবনমূল ভেঙ্গে যেতে পারে তার প্রবহমান গতিকে প্রতিরোধ করতে হবে দুর্জয় বিক্রমে। আজ সামান্য খ্যাতির তাড়নায় তাড়াহুড়ো করা বা সামান্য স্বীকৃতির জন্যে বা দুটো পয়সার জন্যে সাহিত্যিকের লেবেল গলায় ঝুলিয়ে বাজারে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ঘুরে বেড়ান আপনার উচিত নয়। আজ সাহিত্যিকের গুরুদায়িত্ব, সাহিত্যের সত্যিকার কাজ আপনার স্কন্ধে তুলে নিতে হবে। সাহিত্যের স্রষ্টাকে জানতে হবে কি করে তার সৃষ্টিকে অন্তরঙ্গ করা যায়, তার সৃষ্টিকে দেশের অন্তরের অন্দর মহল ঘুরিয়ে আনার উপায় কি! জীবনদর্শনকে নিয়ে যারা শিল্প গড়েন তাঁদের দৃষ্টিটা খ্যাতির ব্যাপ্তি বা লাভ লোকসানের ওপর নিবদ্ধ থাকলে চলবে না।

কিন্তু আজ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রায় পৌনে দু বছর অতিবাহিত হতে চললো—তবুও বাংলা ভাষায় একখানি উৎকৃষ্ট মাসিক পত্রিকা কিংবা দু একখানা ভালো সাময়িকপত্রিকাও এখানে প্রকাশিত হলো না। আর মুসলিম সাহিত্যের যারা দিকপাল সেজে বসে আছেন তাঁদের কথা ছেড়েই দিন—একখানা সত্যিকার সাহিত্যিক মর্যাদা-সম্পন্ন ভালো সৃষ্টি তাঁদের হাত থেকে পাওয়া গেল না। বরঞ্চ সাহিত্যের গুরুত্বকে, মর্যাদাকে অনেক ধুরন্ধর আজ বাজারে টেনে এনে যে-ভাবে লাঞ্ছিত আর হাস্যকর করে তুলেছেন তাতে মুখ বুজে থাকা সম্ভব নয়।

বিভাগপূর্ব বাংলায়...যে কজন মুসলমান সাহিত্যিক স্বকীয়তা অর্জন করেছিলেন...তা নিছক নিজেদের গুণেই।...ফাঁকির অবকাশ থাকত না...কিন্তু, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর আমাদের সাহিত্য এখানে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে কয়েকজন তথাকথিত স্তাবকদের সংকীর্ণ গোষ্ঠীর মধ্যে। তাঁরা স্বল্প প্রচারিত কুখ্যাত কয়েকটি সাময়িকে আর মাঝে মাঝে প্রকাশিত অল্প সংখ্যক মুদ্রিত কবিতা ও সাহিত্য সংগ্রহেই তাঁদের কার্যকলাপ আবদ্ধ রাখছেন। সত্যিকার মননশীল শিক্ষিত মহলে কিংবা বিদগ্ধ সাহিত্যানুরাগী মহলে তাঁরা আস্তে আস্তে অপাঙ্কতে হয়ে পড়ছেন।...এসব অসঙ্গতি, স্বেচ্ছাচার আর বিপর্যয়ে দূর করার জন্যে আজ ‘অগত্য’র আত্মপ্রকাশ অবশ্যস্বাবী হয়ে দাঁড়িয়েছিল।... অগত্যা কোনো গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের মুখপত্র নয়, অগত্যা সকলের মুখপত্র। (পৃ. ৭-৮)

অগত্যার নিয়মিত বিভাগে আলোচনা হতো সমসাময়িক ঘটনাবলি। এগুলোর নাম ছিল—‘আদ্যোপাস্ত’, ‘ইত্যাদি’ ‘অপ্রাসঙ্গিক’ ‘সিনেমা’ ‘বেতার’ ‘চিঠিপত্র’ ‘রোজ-নামচা’ ইত্যাদি প্রভৃতি। এক নজরে অগত্যার লেখকদের তালিকাটা দেখে নিতে পারি :

রবীন্দ্রনাথ (উদ্ধৃতি, পুনর্মুদ্রণ), ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ; সৈয়দ আলী আহসান; আল নাসির; মুসা মনসুর; ফতেহ লোহানী; ফজলে লোহানী; রাজা আহমদ আব্বাস (অনুবাদক : মু. নূ ই), মুস্তাফা নূরউল ইসলাম; শাহাদাৎ হোসেন, ফররুখ আহমদ; শামসুল হুদা; বদরুল হাসান; নাজির আহমদ; তাহিকুল আলম খাঁ (স এবং ছ দুই বানানই লেখা হয়েছে পত্রিকায়); উত্তীয় সেন; ইরফান; হামিদুর রহমান; কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত; হাশমত আজীজ; জয়েনউদ্দীন (সরদার); ইলিয়া ইলেনবুর্গ (ইঙ্গিত, নাটক; অনুবাদক : ব্রজেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য); হাবীবুর রহমান; ম্যাক্সিম গোর্কী (অনুবাদক ফজলে লোহানী/আবুসঈদ নাসির); আনিস চৌধুরী; এ. গ্রিনি (আমেরিকায় চিন্তার স্বাধীনতা, প্রবন্ধ, অনুবাদক, ফজলে লোহানী); আবদুর রশিদ চৌধুরী; শামসুর রাহমান; মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান; মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়; ইলিয়া ইলফ এবং ইউজেন পেট্রভ (কেনস্কসের আমেরিকা সফর, অনুবাদ); শাহাদাৎ উল্লাহ; আইউব হোসেন সিদ্দিকী; সত্যদাস; কোহিনূর ইউসুফ জয়ী; আবু সঈদ নাসির; শফিকউদ্দিন আহমদ; আলাউদ্দীন আল আজাদ; আতাউর রহমান, বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, আবু তায়েব সাদিদ, সমরেন্দ্র দত্ত; এ্যালান মরে; আবদুল গনি; আনওয়ারুল হাফিজ; রশিদ আনওয়ার (আখলাকুর রহমানের ছদ্মনাম); আখলাকুর রহমান; আনাতোল ফ্রান্স (গল্প, অনুবাদ আ. স. নাসির); সিরাজুল ইসলাম; দৌলতননেসা খাতুন (নাটক—খিচুড়ী); আবু হাইয়ান (গ্রন্থ পরিচিতি); মনোজরায় চৌধুরী; মোহাম্মদ আবদুল মোমেন; খান আবদুর রশীদ; হোসেন আরা; মোহাম্মদ শহীদ; সলিমুল হক; সাইয়িদ আতীকুল্লাহ; ফয়েজ আহমদ; মোহাম্মদ শহীদ; রাশেদ জামাল; ওমর খান; আবদুল মোহীত; মাহবুব জামাল জাহেদী; কাজী হাসান ইমাম; আবদুল্লাহ জয়নুল আবেদীন (উপন্যাস অভিসারিকা), আবদুল গাফফার চৌধুরী; দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়; বালজাক; হাসান হাফিজুর রহমান, আর্নেস্ট হেমিংওয়ে; নেয়ামাল বাসির; জহিরুল আলম; মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম; মোহাম্মদ কায়সুল হক; আহমদ-উজ্জামান।

বাংলাদেশের সাহিত্যের পর্যায় বিভাগ করলে সাতচল্লিশ-পরবর্তী সাহিত্যের যে-স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যগোচর হবে—তা সৃষ্টি করেছিলেন পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের কবি সাহিত্যিকেরা। একালের সাহিত্যের মূল ধারায় নতুন সংযোজন বাঙালি সংস্কৃতির উজ্জীবন এবং অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদের চেতনা। জাতীয়তাবাদী অসাম্প্রদায়িক আধুনিক সাহিত্যের প্রভাবান্বিত বাংলাদেশের মানবতাবাদী বুর্জোয়াতাবাদশের সাহিত্য-সংস্কৃতির সৃষ্টা ঝাঁরা সেই কবি-সাহিত্যিকেরা অগত্যা স্বাধীনভাবে সাহিত্য-চর্চার সুযোগ পেয়েছিলেন, এদিক থেকে তাই এর সাহিত্যিক অবদান গৌণ নয়। কবিতা, গল্প প্রবন্ধ, উপন্যাস এবং রম্য-ব্যঙ্গ-বিদ্রপাত্মক সংলাপ সৃষ্টিতে আর সাহিত্যের মাধ্যমে রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন, অধিকাংশ মুসলিম জনঅধ্যুষিত একটি দেশের আলাদা অর্থনীতি-পররাষ্ট্রনীতির শৃঙ্খলে আবদ্ধ ও ভাবিত শৈল্পিক জীবন-ভাবনা রূপায়নে পূর্ববাঙলার কবি সাহিত্যিকেরা যে-যাত্রা সাতচল্লিশ-পরবর্তীকালে আরম্ভ করেছিলেন, পঞ্চাশ-পূর্ববর্তী দশকে সীমান্ত অগত্যা ইত্যাদি পত্রিকা তখন রথ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল। সাহিত্যের অগ্রগতির ক্ষেত্রে অগত্যার ভূমিকা তাই গুরুত্বের সঙ্গেই বিবেচ্য হতে পারে।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯); শাহাদাৎ হোসেন (১৮৯৩-১৯৫৩); ফররুখ আহমদ (১৯১৮-৭৪); সৈয়দ আলী আহসান (১৯২২-২০০৫); (সরদার) জয়েনউদ্দীন (১৯১৩-৮৬); হোসেন আরা (১৯১৬-); দৌলতুননেসা খাতুন (১৯২২-) প্রমুখ বিভাগ-পূর্ববর্তীকালের লেখকেরা 'অগত্যা' তরুণদের সঙ্গে লিখলেও পত্রিকাটি ছিল প্রধানত তরুণদের উচ্ছ্বাস-আনন্দ-উদ্বেজনা, রাগ-ক্ষোভ-প্রেম-ভালবাসা মনের বিচিত্র অভিব্যক্তি প্রকাশের মাধ্যম।



পঞ্চাশের দশকের প্রধান সাহিত্যিক-সংস্কৃতিকর্মীদের মধ্যে শামসুর রাহমান (২৯২৯) ; মুস্তাফা নূরউল ইসলাম (১৯২৭) ; আতাউর রহমান (১৯২৫-২০০০) ফয়েজ আহমদ (১৯২৫-২০০) ; আলাউদ্দীন আল আজাদ (১৯৩২) ; সাইয়িদ আতীকুল্লাহ (১৯৩৩-১৯৯৯) ; বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর ; আবদুল গাফফার চৌধুরী (১৯৩১) ; নেয়ামাল বাসির (১৯৩৫-১৯৮৬) ; মাহবুব জামাল জাহেদী ; সিরাজুল ইসলাম (আজিজ মিছির) ; আনিস চৌধুরী (১৯২৯-৮৯) ; ফজলে লোহানী (১৯২৫-৮৫) ; হাসান হাফিজুর রহমান (১৯৩২-৮৩) প্রমুখ অগত্যার ঘনিষ্ঠ শুবানুধ্যায়ী লেখক সম্প্রদায়।

কবিতা, গল্প, উপন্যাস তাঁরা অনেক লিখেছেন, যা লিখেছেন তা সাহিত্য-শিল্প হিসেবে উত্তীর্ণ হয়নি সবগুলো—কিন্তু এজাতীয় রচনা মুসলিম সম্পাদিত পত্রিকায় আগে প্রকাশিত হয়নি। বিদেশি সাহিত্যের অনুবাদ এবং সমকালীন জীবন চেতনার প্রতিফলক (সঙ্গে সঙ্গে এতদেশীয় তরুণ লেখকদের সমকালীন জীবন চেতনার প্রতিফলন) এতদেশীয় লেখকদের এই রচনাভাণ্ডার বাংলা সাহিত্যের গতি-পরিবর্তনে যেমন সাহায্য করেছে, তেমনি সংযোজন ঘটিয়েছে এক নতুন ভাণ্ডারেরও।

মুসলমান সম্পাদিত পত্রিকায় মানবতাবাদী বালজাক, ফ্রান্স, শ, গ্রিনিনি, হেমিংওয়ে, রবীন্দ্রনাথ—গোকী প্রমুখের রচনা এবং, বামপন্থী সাহিত্যিক, মার্কসীয় মতাদর্শে প্রভাবিত বাঙালি সংস্কৃতি ও বাঙলাদেশের সামাজিক রাজনৈতিক অগ্রগতিতে সহায়ক প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা তরতাজা সাহিত্য ছেপে পূর্ব বাঙলার জনগণের স্বার্থ-সংক্ষণের জন্য অগত্যার প্রয়াস ছিল প্রশংসনীয়।

একুশে ফেব্রুয়ারির মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের পর অগত্যা বিরোধে, বিষাদে, বিক্ষোভে স্পর্ধিত হয়েছিল। ‘একুশের সংকলন’—এ ফজলে লোহানীর একুশ-সংক্রান্ত মুদ্রিত কবিতার সূতিকাগার অগত্যা। ১৯৫১ (১৩৫৮) তে অগত্যার ‘প্রথম অসাধারণ সংখ্যা’ প্রকাশিত হয়। সংকলনটি আজকের প্রথম শ্রেণীর ‘ঈদসংখ্যা’র মত—গল্প উপন্যাসে—কবিতা—রম্যরচনায় পড়বার উপযোগী একগুচ্ছ সাহিত্যের সমাহার। মধ্যবিত্ত, নব্য-নাগরিক জীবনের এবং বুর্জোয়া মানবতাবাদী মানসিকতার প্রতিফলন ঘটেছে লেখাগুলোতে। বাঙলাদেশের সাহিত্যের প্রধান ধারাওতো ওটাই।

এই ধারার বিকাশেও অগত্যা সহযাত্রীর ভূমিকা পালন করেছে। এই সংখ্যায় উপন্যাস লিখেছিলেন—আনিস চৌধুরী (প্রশ্নজাগে) ; মুসা মনসুর (আবর্ষে) ; আবদুল্লাহ জয়নুল আবেদীন (‘অভিসারিকা’) ; এখনও এগুলো অগ্রস্থিত। এতে তখনকার সমাজচিত্র ও রাষ্ট্রীয়-ভাবনার পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে, আছে অনেক ঐতিহাসিক তথ্য। মুস্তাফা নূরউল ইসলাম ‘উপন্যাস’ এবং আলাউদ্দীন আল আজাদ, ‘এক হাজার এক রাত্রি’ শিরোনামে গল্প লেখেন।

ম্যাক্সিম গোকীর ৯ই জানুয়ারী (Nineth January) শীর্ষক গল্প অনুবাদ করেন রওশন জাহান বেগম। বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর এবং সমরেন্দ্র দত্ত—র কবিতার শিরোনাম যথাক্রমে ‘যোদ্ধার গান’ ; এবং ‘কিষণ কন্যার জন্য’। এইসব নামের ধরণ বা বৈশিষ্ট্য

লক্ষণীয়। গোলাম মোস্তফাকে ব্যঙ্গ করে লেখা কাজী নজরুলের (ছদ্মনাম হলাম মস্ত বাহু, ইয়ে, ইটি)—‘গৰ্ভবান’ শীর্ষক কবিতাও এই সংখ্যায় ছাপা হয়।

উল্লেখ্য, নজরুল-রবীন্দ্র-গোবর্ধন-একুশে ফেব্রুয়ারির প্রতি আনুগত্য ও আকর্ষণ আর গোলাম মোস্তফা, আকরম খাঁ, আশরাফ সিদ্দিকী, আলী আহসান (প্রথম সংখ্যায় তাঁর লেখা ছাপলেও) প্রমুখ পাকিস্তানবাদী সাহিত্যিকদের প্রতি ঘৃণা ও নিসঙ্কোচ আক্রমণ (হামলা)—প্রচেষ্টা অগত্যায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

অগত্যার প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যার প্রথম লেখা ছিল নজরুল বিষয়ক। কাজী নজরুল ইসলামের জন্মদিন ১১ই জ্যৈষ্ঠ বা ২৫ শে মে কে ‘জাতির জন্য চরম লজ্জার দিন’ নামে আখ্যায়িত করে লেখা হয় :

হে নজরুল, তোমার জন্মদিন ঘিরে আজ যে আঞ্জাম কলকোলাহল আর আলোড়ন জাগছে দেশময়—তাতে ‘তুমি আছ কি নেই সেই প্রশ্নই বারবার লাঞ্চার মতো উচ্চকিত হচ্ছে...কতদিন আর বাঁচবে তুমি? দেখছে না তোমার জীবন আজ আমাদের কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছে। ব্যাপক আয়োজন আর সমারোহ সব-কিছুর মধ্যেই রয়েছে তোমার অস্তিত্বের প্রতি একটা নিরঙ্কুশ ব্যঙ্গ। তুমি বেঁচে আছ তবু তোমাকে ছাড়াই আজ তোমার জন্মতিথি উদযাপন (করি)। অঙ্কার কক্ষে তুমি পঙ্গু-জীবনের শেষ দিন গুণছো, হয়ত তুমিও জাননা আজ তোমার জন্মদিন,... কিন্তু বাইরে দেখ আমরা কি ঘটনা করে তোমার জন্মদিন পালন করছি। তুমি আমাদের প্রিয় কবি, তাই তোমাকে ছাড়াই কত আনন্দ, উচ্ছলতা আর কত অনুপ্রেরণা!... কত মাতামাতি করছি আজ তোমার সাহিত্য, দর্শন, কাব্য নিয়ে সভাসমিতিতে। যারা তোমার লেখা এক পাতাও পড়েনি এমন কত নেতা আজ অভিনেতার বাকচাতুর্যে সভায় দাঁড়িয়ে তোমার দর্শন আর কাব্যের বুলি কপচাচ্ছে; চেয়ে দেখ মঞ্চের পেছনে আরো কত জন দাঁড়িয়ে আছে তোমার জীবন তত্ত্বের উপর আলোচনা করার জন্যে। হাজার হোক আমরা প্রতিভার দাম দিতে জানি। তুমি এবার তাদের সুযোগ দাও! কি হবে আর বেঁচে :

হে আমাদের অমর কবি, জানি তুমি বিদ্রোহী, জানি তুমি সৈনিক, জানি তুমি অত্যাচারীর খড়গ কৃপাণ রোধ করার জন্যে উদাস্ত কণ্ঠে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলে। কিন্তু আজ আর কেন? তুমিতো ভালো করেই চেন এ জাতিকে... জানোই ত আমরা ছেঁড়া জুতোর দাম দিই না। তোমার মৃত্যু হোক, আর এক মাইকেলের জন্ম দাও তুমি। নেতারা পাক সুযোগ তোমার উপর কিছু বলবার—করবার যখন কিছু তাদের নেই—ই আর তোমার বেঁচে থেকে লাভ কি? কৃতঘ্নতা ও নির্লজ্জতার শেষ তুমি কখনই দেখতে পাবে না?

গোলাম মোস্তফা নজরুল ইসলামের রচনাবলির মধ্যে পাকিস্তানের ধ্যান-ধারণা, তমদ্দুন তাহজিব-বিরোধী কাব্য্যাংশ, উপমা, অলঙ্কার সংস্কার সংশোধন, পরিমার্জন করার প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। তাঁদের ‘নওবাহার’ ছিল এর মিডিয়া। নজরুলকে জাতীয় কবির মর্যাদা দেয়ার তিনি ছিলেন ঘোর বিরোধী। তাই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতেন অতি-উৎসাহে নজরুলের কাব্যে হিন্দুয়ানীর, অনৈসলামিক উপমারূপক কাব্যালংকারের। তাঁর শখ ছিল পাকিস্তানের জাতীয় কবি হিসেবে স্বীকৃতি লাভের। এইসব হাস্যকর প্রয়াসের নির্লজ্জ সমালোচনা করতো অগত্যা, আর গোলাম মোস্তফাকে ব্যঙ্গ করা হত ‘গোলমাল’ বা ‘গোলাম কবি’ বলে। মৌলানা আকরাম খাঁ কে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করা হতো ‘হুজুরে আকরম’ বলে। পাকিস্তানি মিনিষ্টারদেরকেও ঐরূপ ব্যঙ্গ করা হতো।

বই-পুস্তক প্রসঙ্গে সমালোচনার স্টাইল এর একটি নমুনা পাওয়া যায়—আশ্বিন-কার্তিক ১৩৫৬ সংখ্যার ‘আদ্যোপাস্ত’ বিভাগে। গোলাম মোস্তফার (১৮৯৪-১৯৬৪) ‘বুলবুলিস্তান’ কাব্য-সংকলনের সমালোচনা প্রসঙ্গে লেখা হয় :

‘সম্প্রতি গোলাম কবির ‘বুলবুলিস্তান’ বাজারে দেখা দিয়েছে। ‘বুলবুলিস্তান’ গোলাম কবির সঞ্চয়িতা, তাঁর পর্যত্রিশ বছরের কুর্কীতির একটি লোক হাসানো সংকলন। ‘বুলবুলিস্তানে’ ১৯১৫... থেকে... হালে লেখা কবিতার দর্শন পাওয়া যায় এবং এ সঙ্গে এই সুদীর্ঘ পর্যত্রিশ বছরের প্রতিটি স্তরে স্তরে বিকলাঙ্গ যৌনক্ষিপ্ত মানসিক অপ্রকৃতিস্থ মনোভাবের নিদর্শন দেখতে পাই। এক রকম লোলুপ কামনা, উদগ্র বাসনায় ছিড়ে খাওয়া-ভাব প্রতিটি ছত্র ছত্র ছত্রাকার হয়ে আছে গোলাম সাহেবের ‘বুলবুলিস্তানে’।’

‘অগত্যা’ ‘ভদ্রলোকের পত্রিকা ছিল না’—একথা কেন বলা হতো বা হয় তার কারণ অনুসন্ধানের জন্য ‘আদ্যোপান্ত’ বিভাগ থেকে কবি গোলাম মোস্তফা সম্পর্কে আলোচনার কিছু নমুনা দেয়া যাকঃ “ইদানিং আবার বাংলা সাহিত্যে এক ডাগর ডোগর বাস্তব ঘুঘুর আনাগোনা শুরু হয়েছে। অনেক বনবাদাড় বেঁটিয়ে অনেক আবর্জনা কুড়িয়ে ইনি আবার নোতুন করে পুনর্জন্মলাভের চেষ্টায় যে আজকাল একটু তৎপর হয়ে উঠেছেন, ঐর সাম্প্রতিক কার্যলাপে তা স্পষ্ট ধরা দিয়েছে..। এই ঘোমটা ঢাকা হ্যাংলা প্রতিভা, যৌনক্ষিপ্ত জনাব গোলাম মোস্তফাকে পাঠকদের কাছে introduce করতে চাই.. ঐর উৎপাত বাংলা সাহিত্যে আজকে নোতুন করে নয়...” ইত্যাদি। (পৃ-৬)

মৌলানা আকরম খাঁর সমালোচনার একটা উদাহরণ প্রথম বর্ষ চতুর্থ-পঞ্চম সংখ্যা (আশ্বিন-কার্তিক ১৩৫৬) থেকে নেয়া যাচ্ছে : ‘আমাদের হুজুরে আকরাম দূসরা মুসলীম নীগের অযৌক্তিকতা সম্বন্ধে বক্তৃতাদানকালে উদাহরণ স্বরূপ জানাচ্ছেন, যে এমামের অনুপযুক্ততার জন্য মস্জেদ পরিত্যাগ করে নোতুন মস্জেদ স্থাপন করা অযৌক্তিক এবং শরা মতে নাজায়েজ।’ (পৃ-১৪)

‘চিঠিপত্র’ বিভাগে নিজেদের প্রস্তুতকৃত প্রশ্নের মধ্য দিয়ে অগত্যার সাহিত্য শিল্প-ভাবনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। মাঝে মাঝে এই রকম প্রশ্নে সমাজ-সংস্কৃতি ও সাহিত্য-শিল্পের সমালোচনা করা হতো :—‘বাংলা সাহিত্যের এক যুগ ছিল যখন গল্প উপন্যাস কবিতার বই বা মাসিক পত্রিকার নাম নিয়ে হৈচৈ হত। কিন্তু আজকের দিনের বিদগ্ধ পাঠক নামের চাইতে বিষয়বস্তুর বাহার এবং রংএর চাইতে আভ্যন্তরীণ সৌগন্ধের জন্যই লালায়িত বেশি। বর্তমান সময়ে পূর্ব বাঙলায় শিল্প সংস্কৃতিকে গতিহীন করে তোলার যে হীন চক্রান্ত এবং সর্বোপরি পাঠক ঠকাবার যে জঘন্য মনোবৃত্তি কাজ করে চলেছে তার মূলোৎপাটন করার কাজে অগত্যা একনিষ্ঠ হোক। তাহলেই অগত্যার স্বীকৃতি নিশ্চিত। অগত্যা জিন্দাবাদ।’

অগত্যার জবাব : ‘আমাদের সাধনা সত্যের সাধনা। আজ পূর্ববাঙলার বিষাক্ত নাগিনীর ছোবল বাঁচিয়ে চলতে হচ্ছে অগত্যাতে। পূর্ববাঙলার মুখতা এবং অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে বীরশক্তি দ্বারা পরিপুষ্ট হয়ে যে কটা ব্যবসায়ী কাগজ হস্তমৈথুন আর করাচীর লাট-বেলাট আর ঢাকার পেয়াদা বরকন্দাজদের ছবির বাহার নিয়ে হৈ চৈ বাঁধিয়ে বেড়াচ্ছে তাদের আয়ু বেশি দিন নেই.. রবীন্দ্র-নজরুল-চণ্ডীদাস-আলাওল-এর প্রাণের ভাষা, কৃষ্টি এবং ঐতিহ্য নিয়ে নোতুন পথের যাত্রী অগত্যা।... নজরুলের সংগ্রামের সমাপ্তি ঘটেনি। কবিগুরু ডাক দিয়ে গেছেন অসমাপ্ত কাজের সম্পূর্ণতার জন্য।’

চিঠিপত্র বিভাগের আর এক প্রশ্ন (বলাবাহুল্য যে এগুলো নিজেদেরই প্রশস্ত) : ‘নাম শুনে মনে হয় পয়সার অভাবে ‘অগত্যা’ নাম রেখেছেন ; ভবিষ্যতে পয়সা হলেও কি অগত্যার নাম ‘অগত্যা’ই থাকবে?’

এর জবাবে পত্রিকার কর্মীদের পরিচয় দেয়া হয়েছে : ‘স্বীকার করতে কোন দ্বিধা নেই পয়সার অভাব আমাদের যথেষ্ট রয়েছে। অগত্যা বেরোবার আগে ফজলে লোহানী, আবু সঈদ নাসির, তা আ খাঁ এঁরা সবাই জর্জেট পরে ঘুরে বেড়াত ; আর এখন লোহানীর প্যান্টে তালি উঠেছে। নাসিরের জুতোয় ফাটল ধরেছে। তা আ খাঁ লুকিয়ে লুকিয়ে পয়সার অভাবে বিড়ী খায়। প্রেসের মালিক দু বেলা টাকার জন্য ধন্য দেয়, বিজ্ঞাপনদাতারা পয়সা মারার জিকির তোলে, সিআইডি পেছনে পেছনে রাষ্ট্র-দ্রোহীতার গন্ধ শূঁকে বেড়ায়। কাজেই নাম শুনে তোমার যাই মনে হোক অগত্যার অবস্থা আশান্বিত।’

‘কদর্য ব্যবহার’ সম্পর্কিত এক প্রশ্ন ‘ইচ্ছে করলেই আর একটু ভদ্রতার সঙ্গে উত্তর দিতে পারেন’—এর জবাবে বলা হয় : ‘ভদ্রতা ? ছিঃ ওসব ফরমালিটি কেন আমরা করতে যাব ? ভাল ভাল কথা, মিষ্টিমিহি সখিসখিভাব দেখাবেন তারা যারা আগামীতে ব্যালট বাস্তবের আশায় দিন গুণছেন। যেদিন আমি আপনার কাছে ভোট নিতে গিয়ে হাজারো প্রতিশ্রুতি দেব বড় একজন দেশ সেবক সাজব, মানবতার নামে কেঁদে ফেলবো, ধর্মের নামে শহীদ হয়, বিশ্বপ্রেমিকের পাট প্লে করবো—সেদিনই আজকের এই কদর্য মানসিকতা ছেড়ে আরেকটু ভদ্র হব, বিনয়ী সেজে গলবস্ত্র হয়ে উপযাচক বলে আপনার পা জাপটে ধরে বলবো—জোড়া পায়ে নাথি মারো বাবা, জোড়া পায়ে নাথি মারো, তার আগে আর নয়।’

সাহিত্যের মাধ্যমে সামাজিক চাহিদা নিবৃত্তির প্রশ্নে অগত্যার পরোক্ষ বক্তব্য : প্রশ্ন—‘সাহিত্যকে যেভাবে আপনারা ঘোষণা করে রাজনীতি থেকে বাদ দিয়েছেন তাতে আমার কিছু বলবার আছে। আরবি হরফে বাংলা ভাষার চর্চা সম্বন্ধে আপনার মতামতটা সম্পদকীয় প্রবন্ধাকারে দেখতে পেলে খুশি হব।’

জবাবে বলা হয়, ‘আমাদের জীবনের সাথে যে রাজনীতি আজ জড়িয়ে রয়েছে সেইটুকুই আমরা অগত্যা মারফত পরিবেশন করতে পারি। আরবি হরফে বাংলা চর্চা আযৌক্তিক, অবাস্তব, এবং অগণতান্ত্রিক।’

অগত্যা পূর্ব পাকিস্তানের একমাত্র নিউজপ্রিন্টে ছাপা পত্রিকা। এতে বলা হতো যে ‘সবচেয়ে কম ছাপা হয়, কিন্তু সবচেয়ে বেশী লোকে পড়ে।’ এই পড়ার কারণ উপরের নমুনা থেকে বোঝা যায়। ‘অপ্রাসঙ্গিক’ বিভাগের শিরোভাগে বন্ধনীমধ্যে লেখা থাকতো—“শুরু হইতে আখের তক্ তামদুনিক জবানে লিখিত”। এতে ঢাকার বিচিত্র জীবন ও সমাজব্যবস্থা পর্যালোচিত হয়েছে। ফলে এগুলোর মধ্যে তৎকালের সমাজচিত্র পাওয়া যায়। পাকিস্তান হবার পর ঢাকা শহর কর্পোরেশনে রূপ লাভ করে, কিন্তু ঢাকার রাজধানীর অবস্থা ছিল তখন ক্যামন ? ‘রেডিও পাকিস্তানের’ সমালোচনায় তামদুনিক অনুষ্ঠানের সমালোচনা করা হতো।

অগত্যার দুটি চরণ এর মধ্যেই রেডিওর সমালোচনা সম্পূর্ণ করা যায় :

আপনি যদি কাউকে রাগাতে চান তবে রেডিও তে ঢাকা কেন্দ্রের প্রোগ্রাম খুলে ধরুন।' কেন? "রেডিও পাকিস্তানের পরিবেশনায় আমাদের পাকিস্তানকে একেবারে গলায় দড়ি দিয়ে খুলিয়ে দেয়া হয়েছে। হালে যেসব অকাল-প্রস্তুত আর্টিষ্ট হালে পানি না পেয়ে অযথা শ্রেষ্ঠত্বের দাবীতে খাবি খাচ্ছিল তাদের খেদিয়ে নিয়ে এসে বোধ করি 'আমাদের পাকিস্তান' নামক খোঁয়াড়ে ঢোকানো হয়েছে। কারণ এদের প্রতিদিনকার অনুষ্ঠানে, যে-কর্তনিনাদ আমরা শুনতে বাধ্য হই তাতে করে সেই ধারণা হওয়াই স্বাভাবিক। বেতারে অভিনয় উপযোগী কর্তের এমন অপূর্ব সমন্বয় আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ! (১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, পৃ-৩৪)।

রেডিওতে উর্দু-অনুষ্ঠানের বাহুল্যকে মাহেনও-এর উর্দুবহুল পাক-জবান-এর মতো কঠোর সমালোচনা করা হতো।

'সিনেমা' বিভাগে শধু সিনেমার শিল্পমান নিয়ে আলোচনাই হতো না। সিনেমার নামে ভণ্ডমী করার জন্য সংশ্লিষ্টদের উদ্দেশ্যে খোলাচিঠি লিখে কুকীর্তির মুখোশ উন্মোচনও করা হত।

সকালে বিকেলে তোমরা ইন্টারভিউ করতে বাঙলার সেরা সুন্দরীদের। তোমাদের সকাল আর বিকেল কাটত বেশ আরামে। তোমাদের সে দিনগুলো হয়ত ফিরে পাবার জন্য তোমরা আজ উম্মুখ...কিন্তু সে সঙ্গে Swindler-এর দল, এও মনে রেখ যে বাঙলার যে সব ছেলে-মেয়ের জীবন নিয়ে তোমরা ছিনিমিনি খেলেছে, তারা তোমাদের পালাতে দেবে না, তাদের হাতে তোমাদের কপালের লিখন নির্ভর করছে। (১/১, পৃ-৪৩)

অবশ্য নিয়মিত বিভাগগুলোতেই এরকম ব্যঙ্গাধিক্য ছিল।

গল্প-উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধের এবং অনুবাদের ভাষা ছিল সাহিত্য-শিল্প গুণান্বিত। তবে সৈয়দ আলী আহসানের প্রবন্ধ 'পূর্ব-পাকিস্তানের শিল্পক্ষেত্রে নির্দেশ'-এর (প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৫৬) বক্তব্যটি পত্রিকার চরিত্র-বিরোধী হয়ে পড়েছিল। মাহেনও (তৃতীয় বর্ষ পঞ্চম সংখ্যা আগস্ট ১৯৫১) পত্রিকায় তিনি পাকিস্তানের সংস্কৃতির পক্ষে ওকালতি করতে গিয়ে প্রয়োজনে রবীন্দ্রনাথকে বর্জন করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। এই বক্তব্য অতঃপর খুব উদ্ধৃত হয়।

কিন্তু ১৯৪৯ সনেই তিনি সাহিত্য, শিল্প, স্থাপত্য-ভাস্কর্য সমস্ত ক্ষেত্রে ইসলামি-ঐতিহ্য নবরূপায়নের পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, সে-তথ্যটি উদ্ধৃত হয় না মনে হয় অগত্যার ভূমিকার কারণেই। এতে যে তিনি হিন্দু-সভ্যতা-সংস্কৃতি বর্জনের কথা বলেছিলেন তা দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি। হয়তো রবীন্দ্রনাথের উল্লেখ স্পষ্ট করে নেই বলেই—এই প্রবন্ধ দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। অথবা রবীন্দ্রনাথকে বর্জনের প্রস্তাব সরকারি পত্রিকায় স্পষ্ট করে উচ্চারিত হয়েছিল বলেই মাহেনও-এর লেখাটি বিরোধিতার সন্মুখীন হয়েছিল।

এমনও হতে পারে পাকিস্তানি জোস্ ১৯৪৯ সনেও তীব্র ছিল এবং বায়াম্নোর ঘটনা ঘটতে দেরী ছিল। বাঙালির অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবোধের চেতনা তখনো জাগ্রত হয়নি বলেই তাঁর এই রচনাটির কথা পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক চিন্তার ইতিহাসে যোগ হয়না।

সৈয়দ আলী আহসান বলেন :

নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে জীবনের বিভিন্নদিকে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হওয়া স্বাভাবিক এবং হওয়া উচিত। এতদিন যে জীবন-প্রথা আমরা মেনে আসছিলাম, যে নির্ধারিত পথে চলছিলাম এখন নতুন

পটভূমিতে তা নতুনভাবে যাচাই করে নিতে হবে। যে উত্তরাধিকার শুধু এক সময়ের জন্য নয়, চিরকালের জন্য আমাদের হতে পারতো সে উত্তরাধিকার আমাদের সৃজন করতে হবে। জীবন-ক্ষেত্রের পরিচিত দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন আবশ্যিক হয়ে পড়েছে—বিশেষ করে মানবজীবনের বিভিন্ন আদর্শের ধারার। সাহিত্য, শিল্প, স্থাপত্য, সঙ্গীত সমস্ত কিছুই নতুনভাবে আমাদের গ্রহণ করতে হবে এবং নতুন পরিপ্রেক্ষিতে তাকে নতুন আদর্শে পরিপুষ্ট করতে হবে। এতদিন আমরা পরাধীন ছিলাম এবং সে কারণে স্বভাবতই আমাদের অন্তর্নিহিত সমস্ত শিল্প-প্রতিভার স্ফূরণ সম্ভবপর হয়নি। আমাদের গতির পথে বাধা এসেছে, আমরা সহজভাবে অগ্রসর হতে পারিনি।

সৈয়দ আলী আহসান দীর্ঘ আলোচনায় স্পষ্ট করেই বলেন : সাহিত্য ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনটি বড় বেশী স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ। সাহিত্যিকরাই জাতির জীবনের মান নির্ণয় করে ও নতুন পথের নির্দেশ দেয়।... রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আগে সাহিত্য ক্ষেত্রে যে সমস্যা ছিলো, নতুন পরিপ্রেক্ষিতে তার সমাধান করতে হবে। সাহিত্য ক্ষেত্রে পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পক্ষেত্রের পরিবর্তনের কথা এসে পড়ে। ভারতে মুসলমানরা এক সময় শিল্প ও স্থাপত্যে যুগান্তর এনেছিলো। সে-যুগান্তর সম্ভবপর হয়েছিল এ কারণে যে জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে তাদের ধারণা ও নির্দেশ ছিলো স্পষ্ট। স্বাধীন মুক্ত আবহাওয়ায় তারা আপনাদের বিকাশ (আপনাদেরকে বিকশিত) করেছিল নানাভাবে। ... পূর্ব পাকিস্তানের বিস্তৃত সীমারেখার মধ্যে শিল্পের প্রসার ঘটেছে জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে। মৃৎ-শিল্পের হিন্দুয়ানী বৈশিষ্ট্য বর্জন করে মুসলমানি বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলতে হবে। ... সে যুগকে সেই অবস্থায় ফিরিয়ে আনা কারো পক্ষেই সম্ভবপর নয় এবং কেউ তা কামনাও করেনা তবে অতীতের গৌরবের কাহিনী আমাদের জন্য নতুন নির্দেশ বহন করবেই। বিদেশি স্থাপত্যের সেই সহজতা আমরা গ্রহণ করে তার মধ্যে কিছুটা পরিবর্তন যদি আনতে পারি, তবে নতুন কিছু করা হবে।... আমাদের বিশিষ্টতা আমাদের প্রকাশ করতেই হবে, কেননা সেই বিশিষ্টতা প্রকাশের মধ্যেই আমাদের নিজস্ব রূপ ফুটে উঠবে। প্রাচীনকে মুসলমানেরা কখনও অস্বীকার করেনি কিন্তু তার সংস্কার করেছে ও নতুন রূপে তাকে পরিদৃশ্যমান ও পরিবর্ধমান করেছে।... মোঘল উত্তরাধিকার আমাদের রয়েছে, কিছুদিন আগেকার ব্রিটিশ আমলের স্থপতিগত চেতনা আমাদের রয়েছে এবং বর্তমানে নতুনভাবে নতুন পথ অনুসরণের স্পৃহা আমাদের রয়েছে। সমস্ত কিছু মিলে আমাদের জন্য একটা নতুন নির্দেশ সৃজিত হবেই। এতদিন এটা সম্ভবপর হয়নি কেননা নিজের করে আমরা কিছু ভাবতে পারিনি। এখন নতুন পৃথিবীতে আমাদের জন্য যে নতুন আলো এসেছে সেই আলোতেই আমাদের-সবকিছু প্রত্যক্ষ করতে হবে। তখন দেখতে পাবো যে শুধুমাত্র সাহিত্যক্ষেত্রে নয় শিল্প ক্ষেত্রে এবং জীবনের অন্যান্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের স্বাধীন সত্তা নতুনভাবে জাজ্বল্যমান হয়েছে। (পৃ ১০-১২)

যে দৃষ্টিভঙ্গিতে অগত্যা সমাজ-সংস্কৃতি ও সাহিত্যের সমালোচনা করেছে—তার দলিল হয়ে আছে অগত্যের পাতা। কাজী নজরুল ইসলাম, জসীমউদ্দীন, আবুল মনসুর আহমদ, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, আশরাফ সিদ্দীকী, মাহেনও পত্রিকার সম্পাদক মীজানুর রহমান, গোলাম মোস্তফা, আকরম খাঁ, কবি মঈনউদ্দীন, বেদুইন শমসের, আকবর হোসেন প্রমুখ কবি-সাহিত্যিক সম্পর্কে

(শেষ পর্যন্ত অনেকের স্বার্থের পক্ষে যায়, আবার কারো বা বিপক্ষে যায়) কৌতূহকর বিদ্রোহাত্মক সমালোচনা অগত্যা বিভিন্ন প্রসঙ্গে প্রকাশ করেছে। অনেক মতামত তাঁদের অত্রান্ত ! কিন্তু ত্রান্ত, বাচালতাও প্রকাশ পেয়েছে কোথাও কোথাও।

আবুল মনসুর আহমদ প্রণীত ‘আয়না’ (২য় সং)-র সমালোচনা ছাপা হয়েছে (রেডিও পাকিস্তান ঢাকার সৌজন্যে। এটির রচয়িতা অধ্যাপক অজিত কুমার গুহ। সমালোচকের মতামত পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং ভারসাম্য রক্ষাকারী, অনেকাংশে যথাযথ ছিল। কিন্তু সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর ‘লালসালু’ সম্পর্কে যে মন্তব্য করা হয়, তা কি সর্বাংশে অত্রান্ত, যথার্থ ছিল?—

উপন্যাস হিসেবে অনবদ্য এবং সার্থক হতে পারত ‘লাল সালু’। কিন্তু তা হয়নি। লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি সতেজ নয় : বিশেষ কোন বৈজ্ঞানিক দর্শনের ওপর ভিত্তি করেও তিনি ‘লাল সালু’ লেখেননি। উপন্যাসের প্রাণবন্ত হচ্ছে অভিজ্ঞতা। অভিজ্ঞতার প্রসারতা এবং ব্যাপকতার ওপরেই নির্ভর করে স্বার্থক উপন্যাস সৃষ্টির। লেখকের অভিজ্ঞতা আছে যথেষ্ট কিন্তু তা খুব বলিষ্ঠ নয় বলে ‘লাল সালু’ দ্বিতীয় শ্রেণীর উপন্যাস হতে পারেনি।...

ওয়ালীউল্লাহ সাহেব কসরত করে অনেক ঘটনা প্রবাহ বের করেছেন ময়মনসিংহ জেলার সাধারণ মুসলমানের জীবন যাত্রা থেকে। ধর্মের নামে মজিদ যে ধর্মতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করল তা গ্রহণ করল গ্রামের প্রতিটি মানুষ যারা আজ ওয়ালীউল্লাহ সাহেবের চাইতে অনেক এগিয়ে গেছে সংগ্রামী আহ্বানে। উপন্যাস এখানেই হয়েছে ব্যর্থ। সচেতনভাবে হোক বা অচেতনভাবে হোক লেখক গতমুগের ফটোগ্রাফিক-সাহিত্য রচনা করেছেন। এবং তারশঙ্কর, অচিন্ত্য, বনফুলের দলে ভীড় জমিয়ে আগামী দিনের সবল কৃষককে পঙ্গু করে দেবার কাজে হাত দিয়েছেন। ধর্মতন্ত্রের কাছে সত্যিই কী আজ ময়মনসিংহ জেলার তাহের কাদের হুমিরুদ্দীনরা আত্মসমর্পণ করেছে? শৃঙ্খলে তারশঙ্কর বাবুর মাষ্টারপিস্ হাঁসুলি ঝাঁকের উপকথা’ আজ ব্যর্থ উপন্যাসে পরিণত। ওয়ালীউল্লাহ সাহেবের ‘লালসালু’ও ব্যর্থতার গর্ভে বিলীন হয়ে যাবে দুদিন বাদে।’

সমালোচক তাসিকুল আলম খাঁর আরও মন্তব্য : ‘লেখকের চরিত্র সৃষ্টির ক্ষমতা নেই বললেই চলে। ১৪৮ পৃষ্ঠার মধ্যে একটি চরিত্রও মেলেনা যার ওপর দু কলম লেখা যায়।’ ১/৩ সংখ্যা, পৃ ২২) এই ধরনের দায়িত্বজ্ঞানহীন অদূরদর্শী সমালোচনা পত্রিকার দুর্বলতার দিক। পাশাপাশি আরবি হরফে বাংলা লেখার বিরোধিতা এবং মীজানুর রহমান সাহেবের (মাহেনও-এর) তামদ্দুনিক জবানের সমালোচনা অব্যর্থ হয়েছে। ‘চিন্তার স্বাধীনতা’য় বিশ্বাসী ছিল বলেই অগত্যা বহু বিষয়ে স্বাধীনভাবে মতামত ব্যক্ত করেছে, তাঁরা প্রত্যশা করতেন ‘কৃষ্টি আর প্রগতির ব্যাপক প্রসার’। তাই সমালোচনার সবগুলো অব্যর্থ না-হলেও সফল হয়েছে অনেকগুলো। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিরোধ যে পুঁজিপতিদের সৃষ্ট তাও কবিতা, প্রবন্ধে ব্যক্ত করা হয়েছে। আতাউর রহমান-এর কবিতা ‘হিন্দু-মুসলমান’-এর কটি লাইন :’

‘বুঝেছি তোমরা স্বার্থের তরে সকলি করিতে পার/দাস্তা যুদ্ধ আকালে সৃষ্টিয়া ভূখা জনগণে মার, বুঝেছি আজিকে তোমাদের যত ভণ্ডামি/চালবাজি তোমার জীবনে সত্য কেবল মুনাফার কার সাজি/ভণ্ডামি আর চালাকি শঠতা ধরা পড়িয়াছে আজ,/তোমার মাথায় ভেঙ্গে পড়ে তাই জনতার ক্রোধ-বাজ্জ।’ (১/১০-১১ চিত্র ৫৬-বৈশাখ ১৩৫৭ যুগসংখ্যা পৃ-৩৭)।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি-চিন্তায়, সামাজিক-ভাবনার গভীর প্রতিফলন অগত্যার আলোচনা, প্রবন্ধ, উপন্যাস ও গল্পগুলোর প্রধান উপজীব্য। ১৯৪৩ সনের (১৩৫০) দুর্ভিক্ষ ; দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ (১৯৩৯-৪৫) ; সাম্প্রদায়িক দাস্তা (১৯৪৬) ; নির্বাচন (১৯৪৬) ; দেশ বিভাগ

(১৯৪৭) এবং বিভাগান্তর কৃষ্টি-গত ও অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদী হামলা; আরবী হরফে বাংলা লিখন প্রচেষ্টা (১৯৪৯), রাষ্ট্রভাষারূপে উর্দুকে প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ (১৯৪৮, ৫২), লবণ সংকট (১৯৫১); সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা (১৯৫০) উদ্ধাস্ত সমস্যা, রেডিও-সংবাদপত্রে বিশুদ্ধ বাংলার পরিবর্তে উর্দু প্রধান পাক-বাংলার প্রচলন, এমনকি—ঢাকার বেতারেও অধিকাংশ সময় উর্দু অনুষ্ঠানের বাহুল্য—সবকিছু অকপটে অগত্যা সমালোচিত হয়েছে।

বাঙালির কৃষ্টি, সভ্যতা, ভাষা ও জাতির নিজস্বতা রক্ষার জন্য আশ্রয় চেষ্টা তাঁরা করেছেন। উদ্যোক্তারা বয়সে তরুণ ছিলেন, সীমান্তের সম্পাদক প্রমুখও তরুণ। অধিকাংশ মুসলিম লীগার, পাকিস্তানবাদী, ভণ্ড ইসলামপন্থীদের মধ্যে এঁদের প্রচেষ্টাকে দৃষ্টিগ্রাহ্য করার জন্য যে ব্যঙ্গ-কৌতুকের সাহায্য নেয়া হয়েছিল, তার অজুহাতে একে ‘অভদ্র’ বলে পাশ কাটিয়ে যেতে চাইলেও এই ‘অভদ্রতা’ করার সং সাহসটুকুই বা কজন তখন দেখাতে স্বীকৃত ছিলেন। অভদ্রতা, বেয়াদবির একটা দায় আছে। সেই দায় বহনের কষ্ট কে নিতে রাজি ছিলেন? হিসেবী, কেতাদুরস্ত ভদ্র-লোকেরা নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে সব দেখছিলেন, আর কোন দিকে গেলে ক্ষতির সম্ভাবনা—সেই অংক কষছিলেন যখন, তখন কতিপয় তরুণ যে উৎসাহ নিয়ে সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সমাজের বিভিন্ন সমস্যাকে যাচাই করে দেখতে চেয়েছিলেন এবং তখনকার পরিস্থিতিতে লেখকদের অতৃপ্ত শিল্প-সৃষ্টির এবং গ্রহীতার শিল্পরসপিপাসার আকাঙ্ক্ষা পূরণের সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়ে অগত্যা যুগের দাবি পূরণ করেছিল, কালের চাহিদা মেটাতে প্রয়াসী হয়েছিল—এই অভিপ্রায়ের মূল্যই তো অনেকখানি। কতোটা করেছিল সেটার পরিমাপ না করলেও তাই ক্ষতি নেই। মার্কসবাদের ডেডিকেটেড কর্মী, প্রখ্যাত কবি ও গবেষক, অধ্যাপক আতাউর রহমান লিখেছেন :

‘অগত্যা একটা কারণে স্বরণ করতে হবে। মুসলিম জাতীয়তাবাদ এর ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দেশবিভাগের পর সেই জাতীয়তাবাদ আমাদের রাজনীতিতে সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাহজিব ও তমদ্দুন ছিল সেদিনের স্বাভাবিক ভাষা। সেই সময়ে আমরা অগত্যা লিখতাম—বাঙালি মনোভাব নিয়ে ধর্ম-নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে। দ্বিতীয়, পূর্ব বাঙলায় তখন যারা বামপন্থায় ভাবতো, লিখতো তাদের লেখা প্রকাশের সুযোগ তখন ছিল না। অগত্যা এই সুযোগ সৃষ্টি করেছিল। আজকে যারা বাংলাদেশে সাহিত্যে সংস্কৃতিতেও শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত ও উজ্জ্বল তাঁরা প্রায় সবাই অগত্যের মাধ্যমেও আত্মপ্রকাশ করেছেন। কবি শামসুর রাহমান; মুস্তফা নূরউল ইসলাম; হাসান হাফিজুর রহমান, আলাউদ্দীন আল আজাদ; বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর—এঁদের প্রথম জীবনের অনেক লেখাই অগত্যা প্রকাশিত হয়েছে। আমাদের আত্মপ্রকাশের দুটো মাধ্যম ছিল—একটা অগত্যা-আর একটা সাহিত্য বৈঠক-যা প্রথমে বসতো মধুর রেটুরেন্টে।’<sup>১৩</sup>

## তথ্যপঞ্জি

১. কবি আতাউর রহমান এবং ড. আহমদ শরীফ এর সঙ্গে ‘অগত্যা’ প্রসঙ্গে আলোচনা কালে গবেষককে তাঁরা আন্তরিকভাবে অকপটে বলেন : ‘অগত্যা ভদ্রলোকের পত্রিকা ছিলনা।’ দৈনিক বাংলার (৯ কার্তিক ১৩৯৮) সাহিত্যের পাতায় প্রকাশিত আতাউর রহমান-এর ‘অগত্যা এবং আমরা কয়েকজন শীর্ষক স্মৃতিকথায় লেখা হয়েছে প্রথম পরিচয়-কালে পত্রিকার কর্মী তাসিকুল আলম খাঁকে তিনি বলেছিলেন : ‘ফাজলামিতে ভরা আর নামটাতেই আমার আপত্তি আছে।’



২. মুহম্মদ জাহাঙ্গীর, বাংলাদেশে সাংবাদিকতা, ঢাকা ১৯৮৭, পৃ. ১৩৩।
৩. হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত একুশের প্রথম সংকলন 'একুশে ফেব্রুয়ারি (১৯৫৩) তে ফজলে লোহানী, আতাউর রহমান, আনিস চৌধুরীর কবিতা রয়েছে।
৪. আতাউর রহমান, পূর্বোক্ত।
৫. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, আনিসকে দেখছি, ইন্সেফাক ৩০শে কার্তিক ১৩৯৭।
৬. বাংলাদেশের জনগণের নিকট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্যবাহী মধুর রেইক্রেটের পরিচয় প্রদানের প্রয়োজন পড়ে না। এদেশের রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক ইতিহাসের সঙ্গে মধুর রেইক্রেট অঙ্গঙ্গী হয়ে আছে।

## ৫. মুক্তি

(১৯৫০)

বাঙলাদেশের সাময়িক সাহিত্যের ইতিহাসে প্রায়-বিস্মৃত ও অনালোচিত একটি পত্রিকা-মুক্তি। মুক্তির সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম ছিলেন কবি সাংবাদিক আবদুল গনি হাজারী (১৯২৫-৭৬)। তাঁর উচ্চ-সাহিত্যিকবোধ এবং সম্পাদনাকার্যে দক্ষতা ছিল। এসব গুণের সমন্বয়ে তরুণ বয়সে সম্পাদিত ‘মুক্তি’ লেখা ও লেখক নির্বাচনে এবং পত্রিকার মুদ্রণ-সৌকর্যে প্রথম শ্রেণীর একটি মাসিক সাহিত্য পত্রিকার তালিকায় সংযুক্ত হবার যোগ্যতা অর্জন করেছিল। কিন্তু চারটি সংখ্যা প্রকাশিত হবার পর কেন হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেলো—তা কেউ আর আজ বলতে পারবেন না, সে-ইতিহাস লেখাও হয়নি।

মুক্তির যুগ্ম সম্পাদক হিসেবে হাজারীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন চল্লিশ ও পঞ্চাশ দশকের বিশিষ্ট লেখক মাহবুব জামাল জাহেদী। সম্পাদক-মণ্ডলীর সদস্য ছিলেন অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা (১৯২০-৭১) ; অধ্যাপক হাবীবুর রহমান (১৯১৬-৬২) ; সরদার জয়েনউদ্দীন (১৯১৮-১৯৮৬)। দ্বিতীয় সংখ্যায় সম্পাদকমণ্ডীর সদস্য-তালিকা থেকে হাবীবুর রহমান এর নাম বাদ পড়ে। বেগম রোকাইয়া আনওয়ার অন্তর্ভুক্ত হন। প্রচ্ছদ আঁকেন শিল্পী কামরুল হাসান (১৯২১-৮৯)। মুদ্রক ও প্রকাশক ছিলেন সরদার জয়েনউদ্দীন।

পত্রিকার কর্মকর্তা, কর্তৃপক্ষ যেমন ছিলেন সেকালের সম্ভাবনাময় তরুণ সাহিত্যিক-শৈল্পিক-সাংবাদিক-ব্যক্তিত্ব, লেখকসূচিও দখল করেছিলেন দেশের সেরা মেধাবী শব্দ-সৈনিকেরা। একনজরে যদি লেখকদের নামগুলোর দিকে চোখ বুলানো যায় তাহলে দেখা যাবে, সেইসব সম্ভাবনাময় তরুণ, খ্যাত ও হবু-খ্যাত লেখকদের নির্বাচিত মানসম্পন্ন লেখাগুলো ‘মুক্তি’তে ছাপা হয়েছিল। লেখাগুলো বস্তুব্য ও মর্মগত দিক দিয়ে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। এবং সমাজ, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের কালের দাবির প্রেক্ষিতে অর্থপূর্ণ, সুনির্বাচিত ছিল সন্দেহ নেই।

সাহিত্য পত্রিকা হিসেবে মুক্তি হাতে নিলেই এর গুরুত্ব মূল্য ও লক্ষ্য সহজেই যে-কারো উপলব্ধিতে স্পষ্ট ধরা পড়বে। যারা সমকালে ‘মুক্তি’ দেখেছেন এবং পড়েছেন—তাঁরা সকলেই একটা উন্নতমানের পত্রিকা হিসেবে মুক্তির নাম উল্লেখ করে থাকেন। সমসাময়িক অপরাপর সাহিত্য পত্রিকাতেও ‘মুক্তি’ যে একটি প্রগতিশীল, উচ্চাভিলাষী, সুনির্দিষ্ট সামাজিক দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে প্রকাশিত পত্রিকা ছিল,—তা ব্যক্ত করা হয়েছে। ‘দ্যুতি’, ‘তাহজিব’ এবং ‘সীমান্ত’ পত্রিকায় ‘মুক্তি’কে উচ্চমূল্য দিয়ে লেখা আলোচনা বা সমালোচনা ছাপা হয়েছিল।

‘মুক্তি’তে আলাদাভাবে কোনো সম্পাদকীয় বিভাগ নেই—যাতে পত্রিকার ‘যাত্রা’ উপলক্ষে উদ্দেশ্য, আদর্শ ও লক্ষ্য সম্পর্কে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। তবে কেন, কী কারণে এই পত্রিকা প্রকাশ করা হয়েছিল—পত্রিকার সম্পাদক প্রকাশক লেখক ও শিল্পী শূভানুধ্যায়ীদের পরিচয়, শ্রেণীগত অবস্থান বা মতাদর্শের সন্ধান নিলেই পত্রিকার চরিত্র কিছুটা উপলব্ধি করা যায়।

দ্বিতীয়ত, পত্রিকার লেখার বিষয় এবং বক্তব্যের ‘পয়েন্ট অব ভিউ’ বা দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণ করলেও তা বোঝা যায়। লক্ষ্য রাখতে হবে, বিভাগ-পূর্বকালের পাকিস্তান আন্দোলন এর পক্ষে বা সঙ্গে যুক্ত লেখকেরা এই পত্রিকার লেখকসূচি বেশি দখল করেন নি। তবে অগত্যের মতো মুক্তিরও প্রথম সংখ্যাতে পাকিস্তানবাদী, ইসলামি ঐতিহ্যের পুনর্জাগরণকারী, রবীন্দ্র-বিরোধী লেখক ও চিন্তাবিদ সৈয়দ আলী আহসানের (১৯২২-২০০২) ‘নজরুল ইসলাম’ শীর্ষক লেখা ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত হিসেবে মুক্তিতে ছাপা হয়েছিল।<sup>১</sup>

এই ব্যতিক্রমের কারণ কী—তা আর এখন বিশ্লেষণ করে লাভ নেই। তবে বিষয়গত বিবেচনায় এই রচনায় প্রগতি-বিরোধী কোনো সংকেত বা বক্তব্য নেই। কাজী নজরুল ইসলামের কাব্য ও সাহিত্যের পরিচয়মূলক (পাদটীকায় বলা হয়েছিল : ‘লেখকের প্রকাশিতব্য ‘নজরুল ইসলাম’ গ্রন্থের একটি অধ্যায়ের অংশবিশেষ।’) প্রবন্ধে পাকিস্তানি আদর্শ বেশি ব্যক্ত করার অবকাশ ছিল না। কিন্তু নজরুল ইসলামের উক্ত-আলোচনায় কবির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও প্রকাশ পায়নি। সমালোচকের ভাষায় আবশ্যিকীয় পর্যাণ্ড অনুরাগ ও সহানুভূতির অভাব আছে বলেই মনে হয়। বরঞ্চ আছে পাণ্ডিত্যের অহমিকা—যাতে মনে হয় সমালোচক কবির থেকে বিরাট ও মহান কলাকার। কাব্য-রচনার পূর্বে তাঁর (সৈ. আ. আ) নিকট থেকে তালিম নিয়ে নিলে সাহিত্য-সাধনায় নজরুল ইসলাম উন্নতি করতে পারতেন।

আবদুল গনি হাজারী পাকিস্তান ‘সাহিত্য সংসদ’ (১৯৫২) এর একজন কর্মী ছিলেন এবং ১৯৫৪ তে ঢাকায় অনুষ্ঠিত ‘পূর্ব-পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনের’ কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব (যুগ্ম-সম্পাদক) ছিলেন। তাঁর রচনায় চল্লিশের দশকের বামপন্থী লেখকদের ন্যায় ভাব-ভাবনা ও সামাজিক-চেতনা প্রকাশিত হয়েছে। তিনি সমাজ এর অবক্ষয় অধঃপতন সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং তাঁর সাহিত্যে এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ও বিতুষ্টা প্রকাশ পেয়েছে। তিনি সমকালীন রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন। ‘আলোড়ন’ নামে একটি পত্রিকা তিনি মুক্তির আগে সম্পাদনা করেছিলেন। তদানিন্তন নিখিল ভারত মুসলিম লীগের ছাত্র শাখার যে-অংশটি প্রগতিশীল ধ্যান-ধারণায় আস্থাশীল ছিল তার সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। র্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট মানবেন্দ্রনাথ রায়ের আদর্শবাদ দ্বারাও তিনি পরবর্তীকালে প্রভাবিত হয়েছিলেন। বাংলা একাডেমী, ঢাকা প্রকাশিত ‘চরিতাভিধান’ (১৯৮৫)—এ লেখা হয়েছে প্রথমে ‘চন্দ্রবিন্দু’ ও পরে ‘মুক্তি’ নামে যে দুটি পত্রিকা এ সময়ে আবদুল গনি হাজারী বের করেছিলেন তাতে মানবতন্ত্রী আদর্শের স্পষ্ট ছাপ আছে। ইংরেজি সাপ্তাহিকী ‘দি রিপাবলিক’ও তিনি প্রকাশ করেছিলেন এবং মানবতন্ত্রের প্রচার অব্যাহত রেখেছিলেন।<sup>২</sup>

বলাবাহুল্য আবদুল গনি হাজারী সংবাদপত্র ও সাহিত্য-জগতের (সাংবাদিক, সম্পাদক, প্রকাশক প্রভৃতি হিসেবে) ‘তারকা’ হিসেবে ঊচ্চ মর্যাদার আসন অলংকৃত করেছিলেন। রাষ্ট্রীয় সাহিত্য পুরস্কারও তিনি লাভ করেছিলেন। তাঁর চেতনায় জনগণ এবং দেশের প্রতি প্রেম ও সাহিত্যের প্রতি আন্তরিকতার পরিচয় আছে।

মাহবুব জামাল জাহেদী বিলেতে প্রবাস-জীবন যাপন শুরু করার পর দেশের মানুষের স্মৃতি থেকে অনেক দূরে চলে গেলেও, চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকের পত্রপত্রিকায় তিনি

বাঙলা ও বাঙালির স্বার্থের সপক্ষে অনেক লিখেছিলেন। তখনকার প্রগতিশীল পত্র-পত্রিকায় তাঁর লেখা দেখতে পাওয়া যায়। অনেক ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য তিনি সেকালে সাহিত্য ও শিক্ষিত-সমাজে গুরুত্বের সঙ্গে উপস্থাপিত করেছিলেন।

প্রখ্যাত চিন্তাবিদ ও লেখক আবদুল হক ‘ভাষা-আন্দোলনের আদিপর্ব’ শীর্ষক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, ১৯৪৭ সনের ১৪ই আগস্টে পাকিস্তান সৃষ্টির আগেই কলকাতার বাঙালি মুসলমান সম্পাদিত সাহিত্য ও সংবাদ সাময়িক পত্রিকায় ‘পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা’ প্রশ্নে যারা আলোচনা করে ভাষা-আন্দোলনের উর্বর পরিপ্রেক্ষিত তৈরি করেছিলেন,— তাঁদের মধ্যে মাহবুব জামাল জাহেদী অন্যতম।

তিনি ২০শে জুলাই ১৯৪৭ সনের ‘ইস্তেহাদ’ (কলকাতা) পত্রিকায় ‘রাষ্ট্রভাষা বিষয়ক প্রস্তাব’ শীর্ষক প্রবন্ধে বলেন, সমগ্র পাকিস্তানের জন্য একমাত্র উর্দু এবং একমাত্র বাংলা রাষ্ট্রভাষার প্রস্তাব উভয়ই অযৌক্তিক হবে। উর্দু বাঙালিদের কাছে প্রায় বিদেশি ভাষা; এবং এ ভাষা বিশেষভাবে মুসলমানি ভাষা তাও নয়। উর্দু, অধিকন্তু তুলনামূলকভাবে জটিল অথচ অনুন্নত ভাষা। পূর্বপাকিস্তানের জন্য বাংলা রাষ্ট্রভাষা এবং পশ্চিমপাকিস্তানের জন্য উর্দু রাষ্ট্রভাষা গ্রহণ করা হলেই সুবিচার হবে।

কেন্দ্রীয় সরকারের ভাষা কি হবে, সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোনো সিদ্ধান্তে আসতে না পারলেও<sup>৩</sup> বাংলা ভাষা সম্পর্কে তাঁর এই সচেতনতাও ছিল তখন অনেকটা বৈপ্লবিক এবং প্রগতিবাদী। দীর্ঘদিন যাবত তাঁর এই (প্রস্তাব) প্রবন্ধকে ‘রাষ্ট্রভাষা বাংলার সপক্ষে প্রথম প্রকাশিত প্রবন্ধ’ হিসেবে গণ্য হয়েছে। যদিও তথ্যগতভাবে আবদুল হক-এর উপর্যুক্ত গ্রন্থ প্রকাশের পর সঠিক নয় বলে প্রমাণিত হয়েছে; তথাপি তাঁর লেখার ঐতিহাসিক মূল্যও কম নয়। কিন্তু তাঁর (জনাব জাহেদী) সম্পর্কে ব্যাপকভাবে কোনও কিছু এখনও জানা যায় না।<sup>৪</sup>

সম্পাদক-মণ্ডলীর আর একজন সদস্য একান্তরের শহীদ অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা (১৯২০-৭১) এম. এন. রায়ের র্যাডিক্যাল হিউম্যানিজমে বিশ্বাসী ছিলেন। অধ্যাপনার ফাঁকে ফাঁকে (জগন্নাথ কলেজ ১৯৪৬-৪৯; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইংরেজী বিভাগ ১৯৪৯-৭১) লেখা-লেখি করে বাংলাদেশের সাহিত্য সংস্কৃতি অঙ্গনে বিচিত্রবিদ্যায় উৎসাহী, সজ্জন সংস্কৃতিবান, বাঙালি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী বুদ্ধিজীবী হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন বলে স্বাধীনতা-সংগ্রামের (১৯৭১) কালরাত্রিতে পাকিস্তানের সরকারী হানাদার-বাহিনীর গুলিতে মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

অধ্যাপক হাবীবুর রহমান (১৯১৬-৬২) অর্থনীতিবিদ হিসেবে প্রখ্যাত ছিলেন এবং পাকিস্তান সরকারের অর্থমন্ত্রণালয়ের অধীনে বিভিন্ন বিভাগে সক্রিয় জীবনে কর্মরত ছিলেন। সরকারি চাকুরি করা সত্ত্বেও তিনি পূর্ব বাঙলার আঞ্চলিক অর্থনৈতিক বৈষম্যের কথা তুলে ধরে সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন।<sup>৫</sup>

সরদার জয়েনউদ্দীন (১৯১৮-৮৬) পূর্ববঙ্গের প্রধানতম জনঘনিষ্ঠ কথামিশ্রী এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিভাগের সরকারী কর্মজীবী হিসেবে সমাজের প্রথম সারির লোক ছিলেন। পত্রিকার কর্ণধারদের এই পরিচয় ছাড়াও দেখা যায়, এতে প্রখ্যাত মার্কসবাদী, র্যাডিক্যাল-

হিউম্যানিস্ট এম.এন. রায় (১৮৮৭-১৯৫৪) এর রচনার অনুবাদ এবং এম. এন. রায়ের র্যাডিক্যাল হিউম্যানিজমের অনুসারী ও প্রচারক ভারতের সাহিত্যিক, অধ্যাপক শিবনারায়ণ রায়ের (১৯২১) লেখাও ছাপা হয়েছিল। তাছাড়া বিদেশী মানবতাবাদী আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন লেখক সাহিত্যিকদের রচনাবলিও অনূদিত হয়ে ছাপা হয়েছে। এ থেকে পত্রিকার চারিত্র সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা করা যায়।

পত্রিকার নিয়মাবলিতে অবশ্য বেশি কিছু বলা হয়নি। আষাঢ় থেকে বর্ষ শুরু (১৩৫৭, আষাঢ়) হবে। আর লেখা অমনোনীত হলে ফেরত দেয়া হবে না এবং যেকোন মাস থেকে গ্রাহক করা হয়, দশ কপির কম এজেন্সী দেয়া হয় না। রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখতে হবে ইত্যাদি গতানুগতিক এইসব কথা বলা হয়। যোগাযোগের জন্য ম্যানেজার, মাসিক মুক্তি ১ মনওয়ার খান বাজার রোড, নবাবপুর, ঢাকার ঠিকানা দেয়া হয়। ক্যাপিট্যাল প্রিন্টিং প্রেস, ৫০ বেগম বাজার থেকে মুদ্রিত হয়ে ১, মনওয়ার খান রোড, মুক্তির কার্যালয় থেকে প্রকাশিত হত সরদার জয়েনউদ্দীন কর্তৃক। সাধারণ সাদা কাগজে পাকসি ক্রাউন সাইজে, দুই কলামে ঝকঝকে ছাপায় মুক্তি প্রথম সংখ্যা ১ থেকে ৫৯ পৃষ্ঠা, দ্বিতীয় সংখ্যা ৬০ থেকে ১১৮ এবং তৃতীয় সংখ্যা ১১৯ থেকে ১৭০ পৃষ্ঠাব্যাপী ছাপা হয়।

চতুর্থ সংখ্যা অনুসন্ধানের বের করতে পারিনি কিন্তু ‘সাঁকো’ পত্রিকার ‘আবদুল গনি হাজারী স্মৃতি সংখ্যায়’ (১৯৭৮) খালেক বিন জয়েনউদ্দীন চতুর্থ সংখ্যা প্রকাশের কথা উল্লেখ করে লেখক-সূচিরও বর্ণনা দিয়েছেন।

মুক্তির মূল্য প্রতি সংখ্যা আট আনা ; ঋম্বাসিক তিন টাকা, বার্ষিক সাড়ে পাঁচ টাকা। এঁরা বেশী বিজ্ঞাপন পেতেন বলে মনে হয় না। তবে সবধরনের বিজ্ঞাপন তাঁরা গ্রহণ করতেন না। ‘কোন বিজ্ঞাপন গ্রহণ করা বা না করা ম্যানেজারের ইচ্ছাধীন’ ছিল।

প্রাপ্ত তিনটি সংখ্যায় চিত্তরঞ্জন কটন মিলস্ লিমিটেড নারায়ণগঞ্জ ; ইণ্ডিয়া ফ্যানস্ কোম্পানীর পাকিস্তানী পরিবেশক M/S Gossen & Co. Ltd. ৩ জনগণ রোড, ঢাকা ; ক্যাপিটাল প্রিন্টিং প্রেস (মুক্তির ছাপাখানা) ও ফয়েজ আহমদ সম্পাদিত ‘ছোটদের সচিত্র মাসিক’ ‘হুল্লোড়’ ; ইস্ট পাকিস্তান কো-অপারেটিভ ব্যাংক লি. ঢাকা ; এবং পূর্ববঙ্গ সরকারের সিভিল সাপ্লাইজ ডিপার্টমেন্টের ‘আরও বেশী আটা খান’ এর বিজ্ঞাপন আছে।

প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় ১ পৃষ্ঠার ২টি ; দ্বিতীয় সংখ্যায় দেড় পৃষ্ঠায় ৪টি এবং তৃতীয় সংখ্যায় আড়াই পৃষ্ঠায় ৫টি বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছিল। প্রাপ্ত ফাইলে ছিড়ে বাঁধাই করার ফলে দুই সংখ্যার কভার নেই বলে অনুমান করা যাচ্ছে না যে, আরও দু-একটি বিজ্ঞাপন ছিল কী না। না-থাকলেও অসুবিধা নেই, তাতে না হয় আরও দু’চার পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন থাকতো। তাতেও অনুমান করা যায় এটা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে প্রকাশিত সাহিত্যপত্রিকা ছিল না। মুক্তির ‘বিজ্ঞাপনের হার’ ছিল ; “পূর্বপৃষ্ঠা দ্বিতীয় কভার ১২৫ টাকা ; তৃতীয় কভার ১০০ টাকা ; চতুর্থ কভার ১৫০ টাকা ; সূচিপত্রের পৃষ্ঠায় (কেবল অর্ধপৃষ্ঠা নেয়া হবে) ৫০ টাকা ; প্রথম পৃষ্ঠার বিপরীত পৃষ্ঠা-৯০ টাকা ; এবং সাধারণ পৃষ্ঠা ৮০ টাকা”।

খালেক বিন জয়েনউদ্দিন জানিয়েছেন মুক্তির প্রথম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা সম্বন্ধ রচনাসম্বন্ধে বের হয়েছিল।<sup>৬</sup>

সমকালের প্রথমবর্ষের সংখ্যাগুলোর সমালোচনা করে 'উত্তরণ' পত্রিকায় (ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৬৫ সংখ্যায়) ড. রফিকুল ইসলাম যা লিখেছিলেন তার মূলকথা হলো সমকাল-পূর্ববর্তীকালে মুসলমান লেখকেরা যে কবিতা-গল্প-প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তার অধিকাংশ উন্নতমানের সাহিত্য-শিল্পগুণান্বিত ছিল না, অর্থাৎ সর্বাংশে পঠনোপযোগী ছিল না। তিনি বলেন, সে তুলনায় সমকালের কবিতা-গল্প-উপন্যাস 'আধুনিক সাহিত্যের' মর্যাদাসম্পন্ন হয়। এবং একারণেই সমকাল মুসলিম সম্পাদিত সাময়িকপত্রিকার ইতিহাসে একটি মাইল স্টোন স্বরূপ দিক নির্দেশ করেছিল।

বাংলাদেশের সাহিত্যের অগ্রগতিতে তাঁর মতে প্রধানত এটাই হচ্ছে সমকালের সাহিত্যিক-অবদান। ড. রফিকুল ইসলাম সমকালের উচ্চমূল্য দিতে গিয়ে যা বলেছেন,<sup>৭</sup> তাতে অতিরঞ্জন হয়তো নেই, কিন্তু তথ্যগত ভ্রান্তি কিছু আছে বলে মনে হয়। যখন কৃষ্টি-সীমান্ত-অগত্যা-মুক্তি-যাত্রিক প্রভৃতি পত্রিকায় মুদ্রিত কবিতা-গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধ-আলোচনা-অনুবাদগুলো চোখে পড়ে, তখন বলতেই হয়—বিভাগোত্তর কালে এইসমস্ত পত্রিকা আধুনিক অসাম্প্রদায়িক মানবতাবাদী 'শিল্পগুণসম্পন্ন সাহিত্য' প্রকাশ করে বাংলাদেশের সাহিত্যের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিলো—সমকাল যখন প্রকাশিতই হয়নি। অদূর ভবিষ্যতে প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে মাত্র।

মুক্তির সাহিত্য-প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। এর সকল পৃষ্ঠা, সকল স্তবক, সকল চরণ পঠনোপযোগী—এটাই হচ্ছে এর প্রথম ও প্রধান কৃতিত্ব। লেখকসূচির দিকে তাকালেই দেখা যায় 'মুক্তির কবিগণ তখন তরুণ এবং সাহিত্যঙ্গনে নবাগত হলেও ছিলেন সম্ভাবনাময়।

কবি ফররুখ আহমদ (১৯১৮-৭৬) বিভাগপূর্ব কালেই খ্যাতি অর্জন করেছিলেন কবি হিসেবে। জিন্নুর রহমান সিদ্দিকী (১৯২৮) ; শামসুর রাহমান (১৯২৯) ; হাবিবুর রহমান (১৯২২-৭৬) ; মনোজ রায় চৌধুরী এবং হাবিব ইজাদ প্রমুখের মধ্যে প্রায় সকলেই স্থায়ী কবি-খ্যাতি অর্জন করেছেন এবং ১৯৫০ সনে রচিত এঁদের কবিতাবলী শিল্প, ছন্দ, অলঙ্কার, ভাষাগত দিক দিয়ে সমৃদ্ধ।

আধুনিক জীবনের ছায়া এবং সমাজ-সচেতন বস্তুব্যগত দিক দিয়ে বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ছিল এগুলোর কবিতা, যা তৎকালীন অপরাপর পত্রিকায় খুব অল্পই পাওয়া যায়।

মুক্তির চারটি সংখ্যার মধ্যে শামসুর রাহমান দুইসংখ্যায় ; জিন্নুর রহমান সিদ্দিকী তিন সংখ্যায় ; মনোজরায় চৌধুরী এক সংখ্যায় ; হাবিবুর রহমান দুই সংখ্যায়, ফররুখ আহমদ তিন সংখ্যায় ; হাবিব ইজাদ ও আবদুর রশীদ খান এক সংখ্যাতে কবিতা লিখেছিলেন এবং অনুবাদ করেছিলেন। (চতুর্থ সংখ্যার বিস্তারিত সূচি না পাওয়ার জন্য কিঞ্চিৎ ভুল থাকতে পারে)। ফররুখ আহমদ ইসলামি-ঐতিহ্যের পুনর্জাগরণবাদী কবি হলেও 'বুদ্ধির শাণিত দীপ্তি' শীর্ষক কবিতায় শব্দ-চয়নে পত্রিকার আদর্শকেই অনুসরণ করেছিলেন।

বুদ্ধির শাণিত দীপ্তি যে মুহূর্তে হল উগ্র উদ্যত নখর  
স্বার্থক, তখন আমি চেয়েছি তোমাকে

হে হৃদয়, ঘুমন্ত হৃদয়।/ চেয়েছি তোমার স্পর্শ... (পৃ-৮)

জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর ‘সনেট-গুচ্ছ’তে কবিত্বশক্তির পরিচয় দুর্লক্ষ নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মারণাস্ত্র প্রয়োগের স্মৃতি কবি কাব্য রচনাকালে ভুলতে পারেননি।

তাহলে ক্রকুটি ভোল। দেশে দেশে নগরে বন্দরে/ বহু মারণাস্ত্র আছে। তার মাঝে ক্রকুটি তোমার/ সবচেয়ে মারাত্মক। শব্দহীন তীরগতি তার,/ মুহূর্তে আঘাত হানে মর্মের নিগূঢ়তম স্তরে। (পৃ-৯৮)

শামসুর রাহমান ‘একটি ঐতিহাসিক চরিত্র’ আঁকতে বসে কবিতায় ১৩৫০ সনের দুর্ভিক্ষের (১৯৪৩) কথা বিশ্মৃত না হয়ে সচেতনভাবেই খুশি হয়ে উল্লেখ করেছেন—

‘পৃথিবীর অনেক আকাশ

আর অনেক হেমস্তের ধূসর গোধূলি পিছনে রেখে

একদিন আমার রক্তে ছায়া ফেলেছে

রুগ্ন চাঁদের হাসি আর বিশীর্ণ পঁজরের বুক...

‘তেরোশ’ পঞ্চাশের নির্মম ঘুম’ (পৃ-২৩)

হাবিবুর রহমানের ‘প্রত্যয়া—

‘এই অনন্তের মাঝে জীবনের বিচিত্রতা জানি,।

আপনারে ক্ষুদ্র করা, যেন এক নিষ্ঠুর বঞ্চনা,—

ব্যক্তির অস্তিত্ব নিয়ে আপনার সম্পূর্ণ ঠিকানা।

পিছে ফেলে আসা—সব মূল্য ভুলি’ সব মিছে জানা ;

মনে হয় ভুলে যেন আপনারে না করি বঞ্চনা ;।

একদিনের তরে যেন নিজেই বিরাট করে মানি।’ (পৃ-৪৩)

আবদুর রশীদ খান অনুবাদ করেছেন বিদেশী কবিতা। ১-৩ সংখ্যায় মোট পাঁচটি গল্প ছাপা হয়েছে যার দুটোর লেখকই সরদার জয়েনউদ্দীন ; একটির হাসান হাফিজুর রহমান, এবং দুটির লেখক ও অনুবাদক যথাক্রমে দেবব্রত সুর চৌধুরী এবং কল্যাণ দাশগুপ্ত। গল্পগুলো রসোত্তীর্ণ এবং সমাজ ও বাঙালীর জীবন-ঘনিষ্ঠ, যথার্থ সাহিত্য মর্যাদায় এতে নরনারীর জীবনের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি রূপলাভ করেছে।

প্রবন্ধগুলোর দিকে তাকালেই একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে—মুক্তি বক্তব্য ও প্রবন্ধ-প্রধান পত্রিকা ছিল। প্রথম দ্বিতীয়ও তৃতীয় সংখ্যায় ১৪ টি এবং চতুর্থ সংখ্যায় অন্তত ৪টি আনুমানিক প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিল মোট ১৮টি। আলোচনা, সমালোচনা এবং সম্পাদকীয়-নিবন্ধগুলো যদি অন্তর্ভুক্ত করা হয় তাহলে আরও চৌদ্দ-পনেরটি প্রবন্ধ-জাতীয় রচনা এতে ছাপা হয়েছিল সর্বমোট প্রায় ৩২টি। এবং এই প্রবন্ধ নিবন্ধ, আলোচনা, সমালোচনার বিষয়রূপে গণ্য হয়েছে সমকালীন সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিকভাবে স্পর্শকাতর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি।

আলোচনায় মানবতাবাদের জয়গান, সমাজতন্ত্রের প্রতি গভীর অনুরাগ এবং বাঙালির জাতীয় ও সাংস্কৃতিক সাহিত্যিক স্বার্থকে কঠোরভাবে সংরক্ষণ ও সমর্থন—এর দলিল লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। এর মধ্যে পাঁচটি মূল্যবান প্রবন্ধ অনূদিত রচনা। ১৬জুন ১৯৪৯ তারিখে ইউনেস্কোর প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষাবিষয়ক সম্মেলনে ইউনেস্কোর ডিরেকটর জেনারেল জেম

টরেন্স বোডেট-এর উদ্বোধনী ভাষণের অনুবাদ-এ শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব অত্যন্ত আবেদনশীল ভাষায় ও অকাট্য যুক্তিতে উপস্থাপিত হয়েছে। এতে গুরুত্ব পেয়েছে ‘মানবতা’। যে ‘মানবতা বলতে’ লেখক বুঝেছেন ‘ব্যক্তি-মানবের সঙ্গে বৃহত্তর মানবত্বের সমন্বয় সাধনের আদর্শ’।

এম. এন. রায় প্রণীত ‘বৃটিশ সমাজতন্ত্রের ব্যর্থতা ও ইউরোপের ভবিষ্যত’ বিষয়ের আলোচনার অনুবাদ-রচনায় সমাজতন্ত্রের উজ্জ্বল দিকগুলো প্রতিফলিত হয়েছে। এলিয়ো ভিন্তেরিনি প্রণীত ‘রাজনীতি ও সংস্কৃতি’ শীর্ষক প্রবন্ধের বক্তব্য নামেই প্রকটিত। ‘যুদ্ধ থেকে দূরে থাকার রাজনীতি’, ‘ইবনে সিনা’ প্রভৃতি প্রবন্ধের বিষয়বস্তুর গুরুত্ব ও অনস্বীকার্য। জ্ঞানচর্চা ও মানববিদ্যার পরিচয় প্রদানে প্রবন্ধগুলোর বক্তব্য মর্মস্পর্শী। এমন প্রবন্ধ এবং এইসব বিষয়ের চর্চা তখন এদেশের সাময়িকীগুলোতে ছাপা হতনা। এদেশের জ্ঞানচর্চার ইতিহাসে ‘মুক্তির’ প্রকাশনা তাই অশেষ গুরুত্ববহ।

আলাউদ্দীন আল আজাদের ‘প্রাণবন্যার’ দুকিস্তি মুক্তিতে ছাপা হয়েছিল। সম্পূর্ণ রচনাটি এতে প্রকাশিত হয়নি। জিহ্মুর রহিমের ‘কলিয়ুগের শেষ’ ও আর্নস্ট টল এর ‘জনতা ও মানুষ’ নাটকের উচ্চমানও বাংলা সাহিত্যে মূলবান সংযোজন। বুদ্ধদেব বসুর ‘কবিতা’ থেকে পুনর্মুদ্রিত প্রবন্ধ—বীরবল সম্পর্কে এদেশের পাঠকদের সাহিত্যরস-পিপাসার তীব্রতা বাড়িয়েছে। ‘সাধক কবি দাদ আলী’ শীর্ষক প্রবন্ধ পরিচিতিমূলক। সৈয়দ আলী আহসানের ‘নজরুল ইসলাম’ ও দাদ আলীর কবি-কীর্তির সাহিত্যিক আলোচনা ইতিহাসের একটি অধ্যায়কে সমৃদ্ধ করেছে সন্দেহ নেই।

‘ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের নতুন মোড়’ এবং ‘ফরাসী বিপ্লবে দার্শনিকদের দান’ ; কবিগুরু গ্যেটের দুইশততম জন্মদিনে কাজী আবদুল ওদুদের গ্যেটে-সংক্রান্ত আলোচনা, জনতা ও মানবতার প্রতি পাঠকদের দৃষ্টিকে নতুনভাবে আকৃষ্ট করেছে। বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীরের ‘বিছানা’ শীর্ষক আত্মগত প্রবন্ধ ইঙ্গিতময়, প্রতীকী রচনা—যাতে সাহিত্য-শিল্প রচনার শৈল্পিক কলা-কৌশলই বিশ্লেষিত।

পরেশ ভট্টাচার্যের প্রবন্ধ ‘আমাদের ভাষা ও সাহিত্য’ ; আবদুর রশীদ খান ও আশরাফ সিদ্দিকী সম্পাদিত ও সংকলিত ‘নতুন কবিতার’ আলোচনা এবং অন্যান্য পুস্তক সমালোচনা, ইত্যাদি প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ের পর্যালোচনায় গুরুত্ব পেয়েছে জীবনবাদী, বস্তু বা বাস্তববাদী, সাধারণ মানুষের প্রতি আস্থাশীল সাহিত্য ও শিল্প-দৃষ্টি। নিছক কলাকৈবল্যবাদী কবিতা, গল্প ও সাহিত্য প্রকাশ লাভ করতে পারেনি মুক্তিতে।

‘আমাদের ভাষা ও সাহিত্য’ শীর্ষক প্রবন্ধ এবং ঐ প্রবন্ধের প্রতিক্রিয়ায় লিখিত বক্তব্য বা প্রবন্ধে ‘ভাষা’ ও ‘সাহিত্য’ প্রসঙ্গে দেশের জন্য কল্যাণকর উন্নত, আদর্শ অনুসন্ধানের প্রয়াস লিপিবদ্ধ আছে। পরেশ ভট্টাচার্য ‘আমাদের ভাষা ও সাহিত্য’ শীর্ষক প্রবন্ধে বলেন, ‘পূর্ববঙ্গের সাংস্কৃতিক জীবনে আজ যে সমস্যা প্রকট হয়ে উঠেছে...এ প্রদেশের সাহিত্য ও ভাষা... সমস্যাই অন্যতম। পূর্ববঙ্গের ভবিষ্যত সাহিত্যের গতিপথ কি হবে, ভাষার রূপ কি হবে এ সমস্যা আজ পূর্ববঙ্গের জনগণকে ভাবিয়ে তুলেছে। পশ্চিমবঙ্গকে এ-নিয়ে বেশী মাথা



ঘামাতে হবে না। পরিপক্ক ফলটি তারা পেয়েছেন। কিন্তু পূর্ববঙ্গের এ দুটি সমস্যা আজও অসীমার্থসিত আছে, অবশ্য এ নিয়ে আলোচনা হয়েছে অনেক এবং আজও হচ্ছে। তিনি বলেন—‘সাংস্কৃতিক মুক্তিই মানুষের প্রকৃত মুক্তি এবং সে সংস্কৃতি গড়ে উঠবে ভাষা ও সাহিত্যের মাধ্যমেই।...বাংলা সাহিত্য গড়ে উঠেছে একটা সার্ববঙ্গিক রূপ নিয়েই। এ সাহিত্যের উপর পড়েছে উভয় বঙ্গের প্রভাব। কাজেই বঙ্গ যখন বিচ্ছিন্ন হলো, তখন বাংলা সাহিত্যও উভয় অংশে সমভাবে গৃহীত হবে—এরকম আশা গোড়াতে অনেকেই করেছিলেন। এটা যে একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে অনেকেই এ চিন্তাকে মনে স্থান দিতে পারেননি। কিন্তু কার্যত এ রকমটাই হয়ে দাঁড়ালো। এর বিশ্লেষণ করা অপ্ৰাসঙ্গিক হবে না।’

আলোচক বলেন, কলকাতার সঙ্গে ‘নাড়ীর যোগ ছিন্ন’ হবার পর অবিভাজ্য বাঙলা সাহিত্যের ঐতিহ্য ‘আমরা একান্তভাবে আমাদের বলেই গ্রহণ করতে পারবো কি না’ বা তার বীজ থেকে ‘পূর্ববঙ্গে নূতন চারা রোপন করা হবে’, অথবা বাংলা সাহিত্য বৃক্ষের কোণ শাখা থেকে ‘কলম বেধে নূতন চারা লাগাতে হবে’—এস্তার চিন্তা—ভাবনার সময় এসেছে—, ‘মুসলিম প্রধান পূর্ববঙ্গে তথা ইসলামিক রাষ্ট্র পাকিস্তানে নূতন পরিবর্তিত আদর্শকেই স্বীকার করে নেয়া হবে এটাই স্বাভাবিক, কিন্তু সমৃদ্ধ আধুনিক বাংলা সাহিত্যকে ‘গলাধাক্কা দিয়ে বিদায় করে একটা মধ্যযুগীয় সাহিত্যকে আদর্শ করে নেওয়াও কি জাতীয় উন্নতির পক্ষে সহায়ক হবে?’

উগ্র জাতীয়তাবোধ এবং উৎকট ভাবালুতাকে প্রশয় না—দিলে প্রশ্নটা সত্যিই গুরুতর। তবে ভেবে দেখতে হবে—বর্তমান বাংলা সাহিত্যে কি আমাদের দাবী নেই? সে দাবী আমরা ছাড়বোই বা কেন? একমাত্র উগ্রজাতীয়তাবোধ কিংবা অভিমান ছাড়া এমন কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে না যার জন্যে একটা তৈরী—করা সাহিত্যের ঐতিহ্য থেকে আমরা নিজেদের বঞ্চিত করতে পারি। একটা নতুন রাষ্ট্রের ভিত্তি পত্তন করতে গিয়ে যদি আমরা অভিমানের বশে একটা ঐশ্বর্যকে অস্বীকার করে বসি, তবে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণ কিছুতেই আমাদের ক্ষমা করবে না।...কাজেই বর্তমান বাংলা সাহিত্যের ভাষাকেও আমরা অনায়াসে গ্রহণ করতে পারি। পারি বাংলা সাহিত্যকে আপনার বলেই গ্রহণ করতে। কিন্তু তা বলে আমি আমাদের স্বাধীনতা বর্জন করে বা প্রয়োজনকে অস্বীকার করে পরের ধনে পোন্দারী করার পরামর্শ দিচ্ছিনে।

বর্তমান বাংলা ভাষাকেই আমরা প্রয়োজনানুযায়ী একটু অঁদল—বদল করে নেবো। পূর্ববঙ্গে বসে সাহিত্য রচনা করতে গেলে বাংলা ভাষাকে কিছুটা মার্জিত করা অবশ্য প্রয়োজন। ...কাজেই পূর্ববঙ্গে যে সাহিত্য রচিত হবে, তাতে স্থানীয় পরিবেশের (Local Colour) প্রভাব পড়বেই। প্রধানত মুসলিম জীবনকে কেন্দ্র করেই পূর্ববঙ্গে সাহিত্য রচিত হবে। কাজেই মুসলিম জীবনের প্রতিচ্ছবি যদি সাহিত্যে পড়ে, তবে মুসলিম সংস্কৃতির পরিচায়ক আরবী শব্দ কিছু ঢুকবেই...মুসলিম সংস্কৃতি এবং ভাবধারাও সাহিত্যে রূপলাভ করবে এ স্বাভাবিক এবং বাঞ্ছনীয়। কাজেই পূর্ব বাংলার মাটিতে যে সাহিত্য গড়ে উঠবে তা অনেকাংশে পশ্চিম বাংলার সাহিত্য থেকে একটা বিশিষ্টতা লাভ করবেই।...আধুনিক বাংলা

সাহিত্যকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করলেও আমাদের বিশিষ্ট সাহিত্য সৃষ্টি হবে, তার জন্যে পশ্চিম বাংলার কাছে ঋণ স্বীকারের কিংবা হিন্দু প্রভাবের কথা অবাস্তব হয়েই দাঁড়াবে।

‘তারপর আসে সংস্কৃত শব্দের কথা... মুসলিম সংস্কৃতি কিংবা ভাবধারার (প্রতিফলনের জন্য) আরবি ফারসি শব্দ একটু বেশি ঢুকবে (হি)... কিন্তু তাই বলে অপ্রয়োজনীয় শব্দ, শুধু আরবি ফারসি বলেই ঢোকাতে হবে কেন? প্রচলিত বাংলার শতকরা ৪৪টা শব্দ তৎসম, ৫০/৫২টি শব্দ তদ্ভব, বাদবাকী দেশী এবং বৈদেশিক। এতগুলি সংস্কৃত এবং সংস্কৃত-ভব শব্দকে গলাধাক্কা দেওয়া কি সম্ভব? আর সম্ভব হলেও কি এটাকে বাংলা ভাষা বলা চলবে? আর, তর্কের খাতিরে যদি স্বীকার করতেই হয় যে মুসলিমদের সুবিধার জন্যে আরবি ফারসি শব্দের বহুল ব্যবহার প্রয়োজন, তাহলে প্রশ্ন করবো—পল্লী বাংলার মুসলমান, যারা অধিকাংশই মূর্খ তারাও কি এতে উপকৃত হবে? বিদেশি ভাষা গ্রহণ করে ভাষার সম্পদ বাড়ানো যেতে পারে, কিন্তু এতে উপকার হবে কার, মুসলিম গণজীবনের সঙ্গে এর কোন যোগ থাকবে কি? অথচ ভাষায় অপরিচিত আরবি ফারসি শব্দ ঢোকানোর চেষ্টার কসুর নেই, ওকালতিও যথেষ্ট চলছে।

১৯৪৯ সনে বাংলাভাষার সংস্কার প্রস্তাব বা এতদুপলক্ষে আকরম খাঁর নেতৃত্বে গঠিত ভাষা কমিটির কথা এখানে স্মর্তব্য। পাকিস্তানবাদীরা ‘পাক-জবানের’ পক্ষে প্রচারণাসহ বাস্তব কর্মদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। এইসব বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে মুক্তির লেখক মন্তব্য করেন—

একদল ব্যক্তি বাংলাকে উর্দুর একটা বাংলা সংস্করণ করবার চেষ্টায় আছেন। এর প্রতিক্রিয়া (য়)... সংখ্যালঘু হিন্দু... পশ্চিম বাংলার ধাচে অতিরিক্ত মাত্রায় উৎকট সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার দ্বারা ভাষাকে (যদি) সমৃদ্ধ করতে চেষ্টা শুরু করেন, তবে বাংলা ভাষার অবস্থাটা কি হবে, অনুমান করতে বলি। এটা রেষারেষির কথা হচ্ছে না। পরস্পরের সম্মিলিত চেষ্টায় একটা নতুন রাষ্ট্রের প্রয়োজনানুযায়ী তাগিদ মেটানোর জন্য সাহিত্য তৈরী হবে, তারই জন্য একটা গঠনমূলক প্রচেষ্টার প্রয়োজন। তাই পরমতসহিষ্ণু হয়ে ভাষার একটা সচল অথচ সহজবোধ্য রূপ বার করতে হবে যার সাহায্যে আমরা—কী হিন্দু, কী মুসলমান প্রত্যেকেই নিজেদের ভাবধারা প্রকাশ করতে পারি।

ডক্টর শহীদুল্লাহ বক্তব্য উদ্ধৃত করে তিনি মন্তব্য করেন—“ভাষা গ্রহণ ব্যাপারে শুধু প্রয়োজনকেই স্বীকার করবো যদি নতুন, অপরিচিত বিদেশী শব্দই গ্রহণ করতে হয়, তবে এর বাঙ্গালীয়ানা রূপটিই (Naturalised Bengali) গ্রহণ করা সমীচীন হবে। আমরা যদি এই ভাবেই অগ্রসর হই, তবে ধীরে ধীরে যে ভাষা পূর্ববঙ্গে গড়ে উঠবে, তা পশ্চিমবঙ্গের ভাষা থেকে অনেকাংশেই স্বতন্ত্র হবে। আমাদের আর লঘিমাভাব (Inferiority Complex) মনে পোষণ করবারও দরকার হবে না। অপর পক্ষে, একটা তৈরি ভাষা নিয়ে সাহিত্য ক্ষেত্রে নামবারও সুবিধে পাবো। এতে সময় এবং শক্তির অপচয় বারিত হবে, অথচ পরীক্ষা-সমীক্ষার উদ্বেগও থাকবে না।’ লেখক উপসংহারে মন্তব্য করেন :

এতাবৎকাল যে বাংলা সাহিত্য গড়ে উঠেছে, তাকে কি আমরা স্বীকার করবো? কোন ক্রমেই নয়। কারণ, যদিও তা হিন্দু-ভাবধারায় প্রভাবিত, তবু এর মধ্যে এমন অনেক অংশ রয়েছে যা প্রকৃতই সাহিত্য। এ পড়লে জ্ঞাত হরানোরও ভয় নেই। যেমন ইংরেজি সাহিত্য পড়লেই ব্রীস্টান হবার আশংকা থাকবে না, তেমনি হিন্দুদের রচিত সাহিত্য পড়লেই নিজেদের বৈশিষ্ট্য হারাতে হবে, এমন আশঙ্কারও কারণ থাকে না। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করলেই আমার এ উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হবে।<sup>৮</sup>

মুক্তির একটি প্রধানতম অংশ জুড়ে আছে অনুবাদ সাহিত্য। ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির অগ্রগতিতে অনুবাদ-সাহিত্যের ভূমিকা সম্পর্কে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া

যায় অধ্যাপক পরেশ ভট্টাচার্য-র উপর্যুক্ত প্রবন্ধের একটি অনুচ্ছেদে এবং আবদুল গনি হাজারী, জ্যোতির্ময় গৃহ ঠাকুরতা প্রমুখের নামী-বেনামী অনুবাদগুলোতে। পরেশ ভট্টাচার্য অনুবাদ-সাহিত্য সম্পর্কে বলেন : “অবাস্তুর হলেও এ প্রসঙ্গে একটি কথা বলবো। আমাদের সাহিত্যের একটা মস্ত অংশ জুড়ে রাখা উচিত অনুবাদ দিয়ে।”

অবশ্য তিনি পাকিস্তানের তৎকালের অবস্থাকে এড়িয়ে যেতে চাননি এবং প্রকৃতপক্ষে একটি আবশ্যকীয় বিষয়ের প্রতিই দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছিলেন, ইসলামের দর্শন বিজ্ঞান এবং কবি ইকবালের সম্বন্ধে জানার জন্য তাঁর অনুবাদ দরকার। এ প্রদেশের হিন্দু-মুসলমান সকলের জন্যই এসমস্ত উপকরণ কাজে আসবে কারণ ইসলামী বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সভ্যতা, দর্শন, জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধে গভীর-গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা কম পাওয়া যায়। হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতির জন্যও মুসলিম সাহিত্যের অনুবাদ হওয়া দরকার। কারণ বাঙালি মুসলমান হিন্দু সভ্যতা ও ভারতীয় দর্শন-ধর্ম-সংস্কৃতি সম্পর্কে যতোটা পরিচিত, হিন্দুরা মুসলিম সংস্কৃতি দর্শন ইত্যাদি সম্পর্কে ততোটা জ্ঞাত, কৌতূহলী এবং অভিজ্ঞ নন।<sup>১৬</sup>

তৃতীয় সংখ্যায় সৈয়দ মোহাম্মদ আলী উপর্যুক্ত প্রবন্ধের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে তখনকার একটি সাহিত্য-প্রবণতার রূপায়ণ ঘটিয়েছিলেন। এখানে একটি কথা বলা দরকার যে, ১৯৪৮ সনে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি হঠকারী এক নীতি গ্রহণ করে ‘ইয়া আজাদী কঁট হায়, লাখে ইনসান ভূখা ইয়া’,-শ্লোগান তুলেছিল এবং তদানীন্তন পশ্চিমবঙ্গ কমিউনিস্ট পার্টির প্রদেশিক সম্পাদক ভবানী সেন রবীন্দ্রগুপ্ত ছদ্মনামে ‘প্রগতি সাহিত্যের আত্ম-সমালোচনা’ শীর্ষক একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন এবং সেখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূল্যায়ণ করে তাঁর স্থান নির্ণয় করেন ইতিহাসের ডাস্টবিনে। এর বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরে যথেষ্ট ক্ষোভের সঞ্চার হলেও পার্টি-শৃঙ্খলার খাতিরে কেউ এর প্রকাশ্য প্রতিবাদ করতে সাহস করেননি। কিন্তু অন্যেরা এর প্রতিবাদ অব্যাহত রাখেন।<sup>১৭</sup>

তবু বামপন্থীদের কারো-কারো মধ্যে সৃষ্টিশীল সাহিত্যে খুব বেশি-বেশি প্রগতিশীলতার উপাদান খোঁজা শুরু হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গিতেই পরেশ ভট্টাচার্যের প্রবন্ধের মধ্যে বুর্জোয়া সাহিত্যের প্রতি সমর্থনমূলক মনোভাব আবিষ্কার করে পূর্ব বাংলার সাহিত্যের গতি-প্রকৃতিতে গণ-সাহিত্যের প্রাধান্য ঘোষিত হবে—নাকি, অথও বাংলা সাহিত্য—যার অধিকাংশ তথাকথিত বুর্জোয়া সাহিত্য বলে বর্জনযোগ্য (?) তাই-ই হবে পূর্ববঙ্গের ভবিষ্যত বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্য,—সেই প্রশ্ন উত্থাপন করে বলেন :

‘পূর্ববঙ্গের ভবিষ্যত ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে আলোচনা যে দিক থেকেই চালানো যাকনা কেন, একটি প্রশ্নকে এড়িয়ে গেলে আলোচনাটা অসম্পূর্ণ থেকে যায়।...প্রশ্নটা হচ্ছে, পূর্ববঙ্গের ভবিষ্যত সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে গণসাহিত্যের দাবীদাররূপে আমাদের কর্তব্য কি অথবা রাজনৈতিক যথেষ্টাচার ও ধর্মজ্ঞতার কবল থেকে মুক্তি দিয়ে কিভাবে পূর্ববঙ্গের সাহিত্যকে দুনিয়ার অথও সমাজতান্ত্রিক সাহিত্যের এক অংশরূপে গড়ে তোলা যায়। আর শুধু সাহিত্য বা সংস্কৃতির ক্ষেত্রেই নয়, মানব জীবনের যে কোন সমস্যাই আলোচনার বিষয়বস্তু হোকনা কেন, এই প্রশ্নকে ফাঁকি দেয়া চলে না অর্থাৎ আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে আমাদের বারবারই ঘুরে ফিরে দেখতে হবে সমাজতান্ত্রিক সভ্যতা কিভাবে আমাদের ‘আলোচ্য সমস্যার সমাধান করতে পারে। মোদ্দাকথা হচ্ছে, কমিউনিস্ট বিরোধী তৃতীয় শিবিরপন্থীরাও যা স্বীকার করেছেন, “ধর্মতান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক সভ্যতা

থেকে আমাদের দৃষ্টি ফিরে এসে নিবন্ধ হয়েছে শ্রমতান্ত্রিক সভ্যতার উপর, যে সভ্যতা ভবিষ্যতের অনন্ত সম্ভাবনায় আঙ্গ রত্ন-গর্ভা। এই মূল প্রশ্নকে এড়িয়ে গিয়ে একদল সাহিত্যিক গত দু-তিন বছর থেকেই পূর্ববঙ্গের ভবিষ্যত ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করেছেন এবং রাজনৈতিক যথেষ্টাচার ও ধর্মশাস্ত্রতার বিরুদ্ধে তাঁদের সমালোচনা যতই কড়া হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত সত্যিকারের কোন স্বর্ণোজ্জ্বল ছবি তাঁরা তুলে ধরতে পারেননি। বুর্জোয়া সাহিত্যের দেউলিয়াপনা বারবার সাহিত্য ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে নানা অবাস্তব সমস্যার (যেমন, উর্দুভাষার প্রবর্তন, আরবি হরফ প্রবর্তনের পরিকল্পনা) সৃষ্টি করেছে, সেই দেউলিয়াপনাই আঙ্গ অন্যভাবে তাদের আক্রমণ করেছে। তা নাহলে তারা এত সহজে গণসাহিত্য সৃষ্টির মূল প্রশ্নকে এড়িয়ে যাবেন কেন বা অন্যের লেখায় গণসাহিত্যের ছায়া দেখলেই আতঙ্কগ্রস্ত হবেন কেন?...

পরেশ ভট্টাচার্যের বিভিন্ন বক্তব্যের সমালোচনা করে আলোচনার শেষাংশে সৈয়দ মোহাম্মদ আলী বলেন, “কথাগুলো আপত্তিকর এই জন্যে যে হিন্দু-ভাবধারার প্রভাব বঙ্গ সাহিত্যের বিরুদ্ধে সত্যিকারের মুসলমান সাহিত্যসেবীর কাছে বিশেষ কোন ক্ষোভের কারণ হতে পারে না। আর যদি সত্যিকারের কোন ক্ষোভের কারণ হয় তবে ত দুদিন পরে যখন পূর্ববঙ্গীয় সাহিত্যে মুসলিম ভাবধারার প্রভাব পড়বে তখন শ্রী ভট্টাচার্যের মতো আপোষ-রফার পথই খুঁজতে হবে। সাহিত্যে কোন বিশেষ ভাবধারা মাপ-জোক করে, অন্যান্য ভাবধারার সঙ্গে ভারসাম্য বজায় রেখে তার প্রভাব বিস্তার করে না, করতে পারে না।”<sup>১১</sup>

মুক্তির সামাজিক ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য। ১৯৫০ (জানু-মার্চ) সনের হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার পর পাকিস্তান ও ভারতের প্রধানমন্ত্রীগণ লিয়াকত-নেহেরু দিল্লীতে ‘দাঙ্গা-নিরোধক চুক্তি’তে স্বাক্ষর করেন ৮ই এপ্রিল ১৯৫০ তারিখে। লিয়াকত আলীর একটি সংকর্ম এই চুক্তি।<sup>১২</sup>

কিন্তু এতেও দুই দেশের মুসলমান-হিন্দুর মনে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। মুক্তির আলোচনায় স্পষ্ট হয় যে, হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের একমাত্র প্রতিষেধক হিসেবে রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে গুরুত্ব দিয়ে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা করলেও এই একচুফ রাজনৈতিক স্বাধীনতা শান্তি স্বস্তি কায়ম করতে পারবে না। “পাকিস্তান ও ভারতের সামাজিক আদর্শে মূল ভ্রুটি এই যে দুই পক্ষই রাজনৈতিক ক্ষমতাকে চরম মূল্য মনে করে। অথচ রাজনীতি সমাজ-জীবনের একটি অংশ মাত্র। সাংস্কৃতিক জীবনে আদান-প্রদানের মূল্য যত বেশি বিরোধের মূল্য তত নয়। এই দুটি জগতকে আলাদা করে যারা দেখতে পেরেছেন তারা এই দুদিনে মনুষ্যত্বে অধিষ্ঠিত থাকতে পেরেছিলেন।

সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য রক্ষা করার জন্য কোন Iron Curtain দরকার হয় না; যদি তার দরকার হয় তবে সেই সংস্কৃতি অচিরেই ধ্বংসোন্মুখ হয়। অন্যের সঙ্গে মিলনের মধ্য দিয়েই নিজের বৈশিষ্ট্য ভাল করে ফুটে ওঠে। সাধারণভাবে দেখতে গেলে হিন্দু ও মুসলমানে কতই না তফাত; কিন্তু ভিতরে রয়েছে মিল এবং সে মিল মনুষ্যত্বের মিল। এই গভীর মিলের কথা যতদিন না আমরা বুঝব ততদিন আমরা ধ্বংসের পথেই চলবো। আর যতই আমরা এই মনুষ্যত্বের মিলকে ভিত্তি করে সমাজ গঠন করার চেষ্টা করব ততই আমরা আলাদা থেকেও বন্ধু থাকতে পারব এবং সাংস্কৃতিক আদান প্রদান মারফত আমাদের লুপ্ত মিলিত ঐতিহ্যিক নতুনরূপে জীবন্ত করে তুলতে সক্ষম হবো। ঐতিহ্যকে পূর্ণতরো করা ও মিলনকে

গভীরতরো করাই বিপ্লবের সাধনা। বিদ্রোহ-মূলক বিদ্রোহ শুধু ধ্বংসেই বিশ্বাসী তাই তাতে অমঙ্গলই বেড়ে চলে। দিল্লীচুক্তির ফলে উপযুক্ত আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু দৃষ্টি এখনও মোহমুক্ত হয়নি। দৃষ্টি স্বচ্ছ না হলে প্রেম শুধু বিলাসই হয়, পথের ধূলিতেই তার অকাল অবসান ঘটে।”<sup>১০</sup>

রাজনৈতিক বা রাষ্ট্রীয়-ভাবনার ক্ষেত্রেও মুক্তি স্বচ্ছদৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে পূর্ববঙ্গের স্বার্থের অনুকূলে নিরাপোষ কথা বলেছে—এমন স্পষ্ট বক্তব্য ; ১৯৫০ সনেই পূর্ববাংলার স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে সুউচ্চ পর্যায়ে যুক্তিতর্কের অবতারণা—মুক্তিকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ঐতিহ্যের সঙ্গে সংগ্রথিত করে রেখেছে। মূল লাহোর প্রস্তাবের বক্তব্য অনুযায়ী পূর্ববঙ্গের সার্বিক স্বাধীনতার ঘোষণা ব্যক্ত হয়েছে ১৯৪৮ সনে ঘোষিত পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রের ‘মূলনীতি-রিপোর্ট’ এর সমালোচনায়—

‘পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ তিন বছর পর গত ২৮শে সেপ্টেম্বর (১৯৫০?) প্রধানমন্ত্রী জনাব লিয়াকত আলী খান শাসনতন্ত্র রচনার প্রাথমিক উপাদান হিসাবে মূলনীতি নির্ধারণক কমিটির সুপারিশ পেশ করেছেন গণপরিষদে। রিপোর্টের পূর্ণবিবরণী পাঠে... পূর্ববঙ্গের জনসাধারণ সন্তুষ্ট ; বিশ্বেয় বিমূঢ় ও সর্বোপরি আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে। কারণ এই সুদীর্ঘ তিন বছর যাবৎ শাসনতন্ত্রের কর্তৃপক্ষ জনসাধারণকে পূর্ণ গণতন্ত্রের ও ইসলামী সমাজতন্ত্রের যে লোভনীয় ও আকর্ষণীয় রূপ সম্বন্ধে আশাবিত্ত করে আসছিলেন, উক্ত রিপোর্টের ফলে সে-সব সম্পূর্ণ ভাঙতায় পরিণত হয়েছে। কমিটির সুপারিশ নিয়মতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের ছদ্মবেশে উপস্থিত করা হয়েছে একতন্ত্রী সাম্রাজ্যবাদের মূলনীতিগুলোকে। ...সমগ্র প্রদেশব্যাপী জনসাধারণের মধ্যে যে অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশিত হয়ে উঠেছে, এ তারি একটি আভাষমাত্র। প্রস্তাবিত এই স্বৈরাচারী শাসনতন্ত্রের ওপর জনগণ কোনকালেই আস্থা আনবে না। তাদের ন্যূনতম দাবী হল :

১. লাহোর প্রস্তাবকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হোক—প্রদেশকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেওয়া হোক ;
২. রাষ্ট্রের শাসনকর্তা গণভোটে নির্বাচিত হবেন ;
৩. এক পরিষদমুক্ত আইন সভার বিধান করা হোক ;
৪. গণপরিষদ ব্যতীত শাসনতন্ত্র রহিত করার বা পরিবর্তন করার অধিকার আর কারও থাকবে না ;
৫. রাষ্ট্রের বা প্রদেশের শাসনকর্তা, কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার সদস্যগণের সকলেই আদালতে অভিযুক্ত হতে পারবেন এবং
৬. বাংলাকেও অন্যতম রাষ্ট্রভাষারূপে স্থান দেওয়া হোক। নিখিল ভারত মুসলিম লীগের ত্রিংশ অধিবেশন (২৪শে এপ্রিল, ১৯৪৩) সভাপতির অভিভাষণে কয়েদে আজম যে কথা বলেছিলেন জনগণ আজ সে কথাই প্রতিধ্বনি করে বলছে : The Constjution and the Government will be What the people will decide.”<sup>১১</sup>

‘মুক্তি’ হচ্ছে পঞ্চাশ দশকের প্রথম বছরের অন্যতম একটি প্রগতিশীল পত্রিকা—যাতে সমকালীন সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ধার ও ভারওয়াল্লা, যুক্তি-প্রধান বক্তব্য পঠনোপযোগী ভাষায় উপস্থাপিত করে বাংলাদেশের স্বার্থে জনমত গঠনের চেষ্টা করেছিল।

সীমান্ত পত্রিকার কার্তিক ১৩৫৭ সংখ্যায় ‘মুক্তি’র দীর্ঘ সমালোচনায় ‘অধ্যাপক লেখক সম্পাদক’-দেরকে ব্যঙ্গ করে কম বিপ্লবী, সরকার ঘেঁষা (?) বলে আত্মভরিতা প্রকাশ করা

হলেও ঐ পত্রিকার মাঘ ১৩৫৭ সংখ্যায় আবার এর প্রতিবাদও ছাপা হয়। সবকিছু মিলে মুক্তি যে তখনকার একটি আলোড়ন-সৃষ্টিকারী সাহিত্যপত্রিকা ছিল—তাতে সন্দেহ করা চলে না।

কার্তিক সংখ্যায় লেখা হয় : ‘মুক্তি আমাদের সবচেয়ে নতুন সহযোগী। আজকের সমাজের বিভিন্ন দিকে বেড়ীর মহড়া চলেছে। সুতরাং ‘মুক্তি’ নামটি সত্যিই আশাশ্রম। এতে যেসব লেখা পরিবেশন করা হয়েছে তার মধ্যে প্রগতির লেবেল অন্তত আছে। কিন্তু সমস্ত বিবেচনার পর দেখা যায় আসলে সম্পাদকরা পাঠকদের খুব চালাকির সংগেই ঠকিয়েছেন। প্রগতির খোলস পরে যে রক্ষণশীলতার দালালী করা যায়—তা হয়তো সম্পাদকগণ জানেন অথবা জানেন না। কিন্তু ফল একই। কাজেই তাঁদের এই ক্রটি এড়িয়ে যাওয়া চলে না।’

এর শ্রেণিক্তে মাঘ ১৩৫৭ সংখ্যার ‘মতবাদ’ বিভাগে প্রাণ গোপাল নাথ এবং ইয়াকুব খান সীমান্তর উপর্যুক্ত হঠকারী সমালোচনার নিন্দা করে স্পষ্ট করেই বলেন যে : “সীমান্ত প্রগতিশীল তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই প্রগতিশীলতা যখন সংকীর্ণ, অন্ধ আত্মস্তরিতায় পরিণত হয় তখন সবচেয়ে দৃষ্টি-কটু লাগে” (ইয়াকুব খান) এবং...সমালোচক সম্ভবত নিজের অজান্তেই এমনসব মন্তব্য করেছেন যাতে আপনাকে পর করে দেবার সম্ভাবনা এখানেও রয়েছে।” (প্রাণগোপাল নাথ)।

‘তাহজিব’ পত্রিকায় (১/৬, আশ্বিন ১৩৫৭) তরীকুল আলম ‘মুক্তি’ সম্পর্কে আলোচনা শুরু করেছেন এই ভাষায় :

..আগেই শংকিত হয়ে উঠতে হচ্ছে, কেননা আমাদের এই নিতান্ত দুর্ভাগা দেশে ভালো সাময়িকপত্রের আয়ু অত্যন্ত ক্ষীণ। এই ক্ষীণ আয়ুর থেকে ‘মুক্তির’ মুক্তিলাভ সংস্কৃতি-অনুরাগী মাত্রেরই কাম্য। সাহিত্যক্ষেত্রের গতানুগতিকতার বেদনাদায়ক অনুভূতি থেকে রেহাই পাবার একটা পথ-সংকেত মুক্তি দিয়েছে। তাছাড়াও বিভিন্ন বিভাগীয় আলোচনাগুলো মুক্তির বৈশিষ্ট্য। প্রগতি-বিরোধী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের তথাকথিত আওয়াজে মুখড়ে যাওয়া মন মুক্তির প্রগতি অনুসারী আন্দোলনকে অভিনন্দিত করেছে। প্রসঙ্গক্রমে একটা জিনিসের উল্লেখ...বিতর্কিতা, পুস্তিকা বিভাগগুলিতে একরোখা মনোবৃত্তি-সম্পন্ন কথার যে প্রতিরোধী, অগ্নিকণার ফলঝুরি ছড়ান হচ্ছে সেগুলোর দিকে সম্পাদকদ্বয়ের আশু দৃষ্টিপাত করা উচিত...সাহিত্যিক মান নির্ধারণের একটা সুস্পষ্টতা প্রদর্শনে মুক্তির শূভ প্রচেষ্টা আন্তরিক ধন্যবাদার্থ। পূর্ববাঙলার এই নবতম অন্যতম বিশিষ্ট সাহিত্য পত্রিকাটি সাহিত্য-সংস্কৃতির সত্যকার মুক্তি-সাধনে দীর্ঘজীবী হোক।<sup>১৫</sup>

## তথ্যপঞ্জি

১. সৈয়দ আলী আহসান রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত ধারণা পরবর্তীতে বর্জন করেছিলেন বলে ড. আনিসুজ্জামান ‘স্বরণের সন্ধান’ে শীর্ষক গ্রন্থে (পাদটীকায়, পৃ. ১০৯) উল্লেখ করলেও এই বক্তব্য সমর্থন করা যায়না এই কারণে যে, ব্যবসায়িক কারণে বা রাজনৈতিক পরিস্থিতি-পরিবর্তনের ফলে, অথবা যুগের হাওয়া বদলের সঙ্গে সঙ্গে ভোল-পাল্টানোর অর্থ আন্তরিকভাবে কোনও মতাদর্শ গ্রহণ বা ‘বর্জন’ বোঝায় না। সার্বিকভাবে লেখক-ব্যক্তিত্ব বা চরিত্র এবং কর্ম ও চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্র-সংক্রান্ত মত পরিবর্তন (বর্জন) এর তথ্য সংগতিপূর্ণ নয়। বরং দীর্ঘকালের কর্ম ও চিন্তা এবং সামাজিক সাংস্কৃতিক অবস্থান বিবেচনা করলে তাঁকে ‘চলতি হাওয়ার পন্থী-ই বলতে হয়।
২. চরিত্রাভিধান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৫, পৃ. ২১।

৩. আবদুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ ৪৭।
৪. বাংলা একাডেমীর লেখক পরিচিতিতে মাহবুব জামাল জাহেদীর নাম নেই। মুস্তাফা নূরউল ইসলামের স্মৃতিকথা-‘আনিসকে দেখছি’তে জনাব জাহেদীর উল্লেখ আছে কিন্তু কোনো পরিচয় নেই; যা আছে তাহলে মুস্তাফা নূরউল ইসলাম প্রমুখের ‘অগত্যা’-গোষ্ঠীর সঙ্গে মাহবুব জামাল জাহেদীও যুক্ত ছিলেন। তিনি যে, ‘দীর্ঘকাল প্রবাসী’ এবং হৃদরোগাক্রান্ত—তা উক্ত স্মৃতিকথাতেই উল্লিখিত আছে। তাঁর সঠিক জন্ম-সন সন্ধান করেও জানতে পারিনি। কোথাও কোনো স্মৃতিকথায়ও তাঁর পরিচয় দেয়া হয় না।
৫. চরিতাভিধান, পূর্বোক্ত, পৃ ১১২ ও ২৯১।
৬. খালেদ বিন জয়েনউদ্দীন, ‘আবদুল গনি হাজ্জারী এবং মুক্তি’, আবদুল গনি হাজ্জারী স্মৃতি সংখ্যা : ১৯৭৮ ; সম্পাদক : আবু হেনা মোঃ কামাল (ঢাকা), পৃ. ১১৫-১৭। মুক্তির ঐ সংখ্যায় কে কি লিখেছেন, তা বলা নেই এবং মুক্তির ঐ সংখ্যা দেখতে পাওয়া যায়নি বলে বিস্তারিত বলা গেল না।
৭. রফিকুল ইসলামের আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য : উত্তর দ্বিমাসিক পত্রিকা, সম্পাদক : এনামুল হক, ১ বর্ষ ১ সংখ্যা, ঢাকা ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৬৫।
৮. মুক্তি, সম্পাদক : আবদুল গনি হাজ্জারী ও মাহবুব জামাল জাহেদী ; ১ বর্ষ, ১ সংখ্যা ঢাকা, আষাঢ় ১৩৫৭, পৃ. ৩৯-৪২।
৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২-৪৩।
১০. সীমান্ত-সম্পাদক মাহবুব উল আলম চৌধুরীর সঙ্গে ২২,০৫,৯২ তারিখে সাক্ষাৎকার গ্রহণকালে তিনি একথা উল্লেখ করেন যে, তিনিও কমিউনিস্ট পার্টির রবীন্দ্র সাহিত্যকে বুর্জোয়া ভাবধারার বলে বর্জনের নীতির বিরোধিতা করে ‘দৈনিক সত্যযুগ’ পত্রিকায় তিন কিস্তিতে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছিলেন। ১৯৫০ সনের স্বাধীনতা দিবসের পূর্বদিন ১৩ আগস্ট তারিখে ঢাকায় দুই বাঙলার কবি সাহিত্যিকদের এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ‘কলিকাতা পোয়েট্রি গ্রুপের’ উদ্যোগে কলকাতা থেকে বুদ্ধদেব বসু, শিবনারায়ণ রায় প্রমুখ কয়েকজন সাহিত্যিক ঢাকায় আসেন। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, গোলাম মোস্তাফা, সৈয়দ আলী আহসান, সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়ন, মুনীর চৌধুরী, জিন্নুর রহমান সিদ্দিকী প্রমুখ ঢাকার উল্লেখযোগ্য প্রায় সকল কবি-সাহিত্যিকদের উপস্থিতিতে ঐ সভায় বাংলা সাহিত্যের তৎকালীন বিতর্কের (পূর্ব বাঙলার সাহিত্য কি প্রাক-বিভাগ যুগের বাংলা সাহিত্যকেই অনুসরণ করে চলবে, না নতুন রাষ্ট্র গঠনের ফলে উজ্জ্বল সমস্যাগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে নতুন পথে চলবে—মোটামুটি এই হল বিতর্কের বিষয়) পরিপ্রেক্ষিতে খোলাখুলি অনেক আলোচনা হয়। ঐ আলোচনা-সভার সর্গক্ষিপ্ত বিবরণ মুক্তির-২ দ্বিতীয় সংখ্যায় (শ্রাবণ ১৩৫৭) ‘সংস্কৃতি-সংবাদ’ বিভাগে প্রকাশিত হয় (পৃ. ১০৯-১০)। প্রতিবেদনে বলা হয়, বুদ্ধদেব বসুর বক্তব্য সমর্থন করে শিবনারায়ণ রায় ‘সাহিত্যে মতবাদ’ প্রচারের প্রচেষ্টাকে নিন্দা করে বলেন যে, কোন একটি বিশিষ্ট মতবাদকে ভিত্তি করে সাহিত্যের উৎকর্ষতার বিচার করা মোটেই শোভনীয় নয়। স্বীয় মূলেই সাহিত্যের বিচার করা উচিত। অবশ্য তিনি এ কথাও বলেন নি যে, মতবাদ প্রচার করলেই সে-সাহিত্য উৎকৃষ্ট সাহিত্য হবে না বা সাহিত্য-বিচারে তা উতরোবে না। তবে সাহিত্যের বিচারে সে মতবাদের প্রয়োগ উচিত্য-বিরোধী। উদাহরণ স্বরূপ তিনি সম্প্রতি কলকাতায় প্রকাশিত একখানি পুস্তিকার কথা উল্লেখ করেন, যাতে কোন একটি বিশিষ্ট রাজনৈতিক দলের মতবাদের ভিত্তিতে সাহিত্য-বিচারের জন্য বলা হয়েছে। এবং সে-মতবাদ অনুসারে রবীন্দ্রনাথকেও বর্তমান যুগের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় একজন বুর্জোয়া কবি হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে।’
১১. মুক্তি, ১ বর্ষ, ৩ সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৫৭, পৃ. ১৫৫-৫৮।
১২. আহমদ শরীফ, বাংলার বিপ্লবী পটভূমি, ঢাকা ১৯৮৯, পৃ. ৩৫।
১৩. মুক্তি, সাময়িকী, ১ বর্ষ, ১ সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৫৭, পৃ. ৫৮।
১৪. পূর্বোক্ত, ১ বর্ষ, ১ সংখ্যা, পৃ ১৭০।
১৫. তাহজিব, সম্পাদক : সৈয়দ আবদুল মান্নান, ১ বর্ষ, ৬ সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৫৭, পৃ. ৩৯১।

## ৬. পরিচিতি

(১৯৫১-৫৩)

ত্রৈমাসিক ‘পরিচিতি’ চট্টগ্রাম প্রবর্তক প্রেস থেকে শ্রীশশাঙ্ক মোহন চৌধুরী কর্তৃক মুদ্রিত হয়ে ইস্ট বেঙ্গল রেলওয়ের সদর দফতর চট্টগ্রামের পাহাড়তলীস্থ ওয়াজিউল্লাহ ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে মোসলেমউদ্দিন আহমদ কর্তৃক (‘পরিচিতি কার্যালয়’ থেকে) প্রকাশিত হতো। সম্পাদনা-পরিষদ এর সদস্য ছিলেন সমরেন্দ্র দত্ত, সিরাজুল ইসলাম (আজিজ মিছির), রুস্তম খান, এরশাদ হোসেন এবং মফিজ-উল হক (পরিষদ-এর সভাপতি) মফিজ-উল হক বঙ্গীয় রেলওয়ের কলকাতা হেড-অফিসে বিভাগ-পূর্বকালে কর্মরত এবং কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী ছিলেন। সাতচল্লিশের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তিনি চট্টগ্রামে পোশ্টিং পেলেন। বাম-ভাবাপন্ন আরও কতিপয় সংস্কৃতিকর্মী, কর্মজীবীর সম্মিলনে স্বাধীনতার সংকটকালে উদ্বাস্তু হিসেবে (চট্টগ্রামের সংস্কৃতি ও সাহিত্য অঙ্গনের প্রধান ব্যক্তিবর্গ ছিলেন হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা) দেশ-ত্যাগের ফলে শূন্য, বঙ্গ্য সাংস্কৃতিক অবস্থার পরিবর্তন লক্ষ্যে তিনি কাজ শুরু করলেন।

বলাবাহুল্য নয়, ইতিপূর্বে সীমান্ত পত্রিকা এবং একে ঘিরে গড়ে ওঠা ‘সাংস্কৃতিক বৈঠক’ ও ‘প্রান্তিক নবনাট্য সংঘ’ প্রভৃতির কিছু কিছু সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক কর্মোদ্যম চট্টগ্রামে দানা বেঁধে উঠেছিল। তবে পাকিস্তানি শাসনামলে পর্যাপ্ত সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক কর্মচঞ্চল ছিল না পূর্ববঙ্গ কখনোই। সবসময় একটা মানসিক-সামাজিক চাপ বোধ করতে হয়েছে এখানকার সমাজ সংস্কৃতি ও সাহিত্যের বাঙালি নেতা-কর্মীবৃন্দকে। ফলে হাঁফিয়ে উঠেছিলেন তাঁরা। স্মৃতিকথায় মফিজউল হক লিখেছেন :

‘চট্টগ্রামে শিক্ষা সংস্কৃতির ধারক বাহক যারা ছিলেন, তাঁরা প্রায় সবাই ছিলেন হিন্দু। তাঁরা তখন অনেকেই কলকাতা চলে গেছেন। ফলে চট্টগ্রাম হঠাৎ করেই যেন সাংস্কৃতিক-বঙ্গ্যভেদে অতল-তলে তলিয়ে গেল। পথে ঘাটে যাদের সাথেই দেখা হয় তারাই কেমন যেন অবজ্ঞাভরে কথা বলে। অনেকের সব কথাও আমরা বুঝি না; কিন্তু আমরা যারা এই বঙ্গ্যত্ব মেনে নিলাম না, তারা সবাই মিলে চিন্তা করতে লাগলাম, কি করে আমাদের হারানো দিনগুলো ফিরে পাওয়া যায়। আমরা তখন একদিন একটি ত্রৈ-মাসিক সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিলাম। কিন্তু লেখা পাব কোথায়? লিখবেন কে? পত্রিকার নামকরণ করা হলো ‘পরিচিতি’।... সম্পাদকমণ্ডলীও গঠিত হলো। প্রথম সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ছিলেন গোলাম রসুল (কৃষক আন্দোলনের অন্যতম নেতা); নৃত্যালাল লাহিড়ী; সিরাজুল ইসলাম (আজিজ মিছির) সঁমকেন্দ্র দত্ত এবং আমি। প্রথম সংখ্যায় লেখা দিয়েছিলেন আবুল ফজল, শওকত ওসমান, আল-উদ্দীন আল আজাদ, শামসুর রাহমান, অমিয়ভূষণ চক্রবর্তী, মুনীর চৌধুরী, মিশীর সেন, সলিল চৌধুরী, চিরঞ্জীব দাশশর্মা, গোপাল বিশ্বাস, সমরেন্দ্র দত্ত প্রমুখ। এই সংখ্যায় আমি একটি চীনা গল্প অনুবাদ করেছিলাম।’

১৩৫৮-র বৈশাখ-আষাঢ় সংখ্যা ‘পরিচিতি’ প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যারূপে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৫১ সনের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক সম্মেলনের পরে-পরে প্রকাশিত এই পত্রিকার আদর্শ উদ্দেশ্য সীমান্ত ও চট্টগ্রামের প্রগতিশীল কর্মোদ্যমসমূহের সুরে সুর মিলানো ছিল। ওয়াজিউল্লাহ ইনস্টিটিউট তথা রেল অফিসকে ঘিরে বামপন্থী-কমিউনিস্টদের কার্যাবলি



তখন বেশ সক্রিয় ছিল। ঐদেরই উদ্যোগ-আয়োজনে প্রকাশিত কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন ‘পরিচিতি’ সরকারি কোপানলেও চিহ্নিত পত্রিকা ছিল।

ফলে “পত্রিকা প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে একটা সাড়া পড়ে গেল। কোর্ট থেকে সম্পাদকের নামে সমন জারি করা হলো। পত্রিকার প্রকাশক ওয়াজিউল্লাহ ইনস্টিটিউট (রেলওয়ে ইনস্টিটিউট)। তখন ইনস্টিটিউটের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন জনাব মোসলেমউদ্দীন আহমদ। বস্তুত তাঁর সহযোগিতার জন্যই পত্রিকা প্রকাশ সম্ভব হয়েছিল। আমরা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যরা মোসলেমউদ্দীন আহমদকে সাথে করে কোর্টে গেলাম। এস-ডি. ও সাহেব আমাদেরকে তাঁর খাস কামরায় ডেকে নিয়ে মিহির সেনের একটি কবিতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, ‘দেখুন আপনারা একটু সাবধান হবেন, এ ধরণের লেখা যেন আর প্রকাশিত না হয়।’ কিন্তু তারপরও পত্রিকাটি নিয়মিত প্রায় তিন বছর প্রকাশিত হয়।

তৃতীয় বর্ষ ১ম সংখ্যার সম্পাদকীয়তে বলা হয় : “আমাদের উদ্দেশ্য মহৎ এবং উদ্যমের মধ্যে যথেষ্ট আন্তরিকতা থাকলেও নানারকম অসুবিধার জন্য আশানুরূপ কাজ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি।” পত্রিকার উদ্দেশ্য ব্যক্ত হয়েছে এই উক্তিতে যে “সমাজ-চেতনা সম্পন্ন যে-কোন ভাল লেখা প্রকাশ করতে ‘পরিচিতি’ সর্বদাই তৎপর থাকবে।”

‘পরিচিতি’তে আবুল ফজলের ‘বুদ্ধির মুক্তি’ শীর্ষক প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল। নূরউল আলম ‘আমাদের লোকসাহিত্য’; সুলতানা রহমান ‘পল্লীসংস্কৃতি’; আসহাবউদ্দীন আহমদ ‘লোকসঙ্গীত প্রসঙ্গে’; কামেলা শরাফী ‘সাংস্কৃতিক জীবনে নারীর ভূমিকা’ শীর্ষক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। ‘সাহিত্য ও জীবন’ শীর্ষক একটি প্রবন্ধ ‘ইউনিটি’ পত্রিকা থেকে অনুবাদ করেছিলেন অধ্যাপক এস. এহতেশাম হোসেন। আতাউর রহমান, মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, আবুহেনা মোস্তফা কামাল, রুস্তম খান, মীর আবুল খায়ের, মোহাম্মদ আজিজুল হক, দেবব্রত সেন, সমরেন্দ্র দত্ত প্রমুখ কবিতা লিখেছিলেন, আর চিরঞ্জীব দাশশর্মা সুরারোপ করেছিলেন বিপুবী গানে।

লক্ষণীয় আতাউর রহমান, শামসুর রাহমান প্রমুখ প্রথম শ্রেণীর কবিরা তখনকার প্রায় সকল প্রগতিশীল পত্রিকায় লিখছিলেন। আবুহেনা মোস্তফা কামাল, মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ প্রমুখ সম্ভাবনাময় তরুণদের কাব্যচর্চার ক্ষেত্র হয়েছিল পরিচিতির পাতা। মিহির আচার্য, মফিজউল হক, সিরাজুল ইসলাম প্রমুখ গল্প লিখেছেন বা বিদেশি গল্পের অনুবাদ করেছেন। বিদেশি গল্পের, প্রবন্ধের, নানা ধরণের রচনা ‘পরিচিতি’-তেও ছাপা হয়েছে এবং এর সমস্ত পাতাই পঠনোপযোগি ছিল। যুগোপযোগি আলোচনায়, শিল্পচিন্তা বা চর্চায় ব্যয়িত হয়েছে এর প্রতিটি পৃষ্ঠা। ওলাইডিস্ক্রিনার, লিন য়ুতান এর রচনার অনুবাদ আর স্টালিনের মৃত্যুতে শোকসঙ্গাপন পত্রিকার একটি চরিত্র নির্দেশ করে। চট্টগ্রামের বা বাঙলাদেশের সংস্কৃতি অঙ্গনের খবরাখবর প্রদান ও প্রতিবেদন ছাপানো এবং বই-পুস্তকের আলোচনা-সমালোচনায় দেশের হিতের প্রশ্নটি উচ্চকিত হয়েছে। পরিচিতির পাতায় পূর্ব বাঙলার স্বাধীনতা পরবর্তী

সাত বছরের প্রগতিশীল চিন্তাচর্চার দলিল লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। অতএব এই পত্রিকাও বাংলাদেশের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসে মূল্যবান দলিল সন্দেহ নেই।

কামেলা শরাফী এবং মনি ইমাম প্রমুখ কয়েকজন বঙ্গ-ললনা এ-ভূখণ্ডের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে নারীদেরকে কর্মচাঞ্চল্যে এবং সামাজিক-দায়িত্বে-কর্মে অগ্রণী ভূমিকা নিতে উদ্বুদ্ধ করে আসছিলেন। ১৯৫০ সন পর্যন্তও এদেশের মেয়েদের নাটকে মঞ্চে অভিনয় করতে দেখতে পাওয়া যেতো না। পুরুষ দ্বারাই নারী-চরিত্রে অভিনয় করানো হতো। ১৯৫১ সনে 'প্রান্তিক নবনাট্য সংঘ' সুসংগঠিত করার পর 'জ্বানবন্দী' নাটকে কামেলা শরাফী আর মনি ইমাম প্রথম মঞ্চনাটকে অভিনয় করে সামাজিক বিধি-নিষেধ ও সংস্কারের বেড়ি ভাঙেন। 'তৎকালীন নাটকে সৌখিন মহিলা শিল্পীর এটাই ছিল সর্ব প্রথম মঞ্চবতরণ।'<sup>১</sup>

পরিচিতির তৃতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যায় কামেলা শরাফীর (কামেলা খান মজলিস) প্রান্তিক নবনাট্য সংঘ-র বার্ষিক সম্মেলনে পঠিত 'সাংস্কৃতিক জীবনে নারীর ভূমিকা' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। নারী-প্রগতি বা নারী-স্বাধীনতার আন্দোলনের ইতিহাসে এই প্রবন্ধটি অবশ্যই ঐতিহাসিক মর্যাদার দাবিদার তিনি বলেন :

'...সমাজের যুগকাণ্ডে বর্তমানে নারী তার ব্যক্তিত্বকে সম্পূর্ণভাবে বলি দিচ্ছে। সভ্যতা এগিয়ে যাচ্ছে, মানুষের উন্নতি হচ্ছে, অথচ নারী-মর্যাদা কোন অংশে বর্ধিত হয়নি। কিন্তু কেন? তার মূলগত কারণ হচ্ছে অর্থনীতি।'

লেখিকা সংস্কৃতি-ক্ষেত্রে নারীদের পশ্চাত্পদতার কথা উল্লেখ করে বলেন-জীবনের সবচেয়ে যেটা প্রয়োজন তাকে (নারীও) উপেক্ষা করতে পারে না। তাই আমাদের মহিলাদের নিকট আমার আবেদন যে তাঁরা আরও সচেতন হয়ে তাদের স্বার্থ অর্থাৎ নারীদের নিজস্ব অধিকার সম্বন্ধে বুঝে-নানাভাবে এগিয়ে আসুন কাজের ভেতর দিয়ে। সাংস্কৃতিক জীবনে রয়েছে আমাদের অধিকার। কারণ এই অধিকারই আমাদেরকে বেশি ভাবে বুঝিয়ে দেবে বা সচেতন করবে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের অধিকার সম্বন্ধে। আজ আর বিধিনিষেধের দোহাই দিয়ে চুপ করে থাকার সম্ভব নয়। শিল্পের বা সাহিত্যের অনাবিল আনন্দ আমরাও গ্রহণ করতে ইচ্ছুক। আমাদের সে পিপাসু মন ভরে উঠবে এই জীবন-আনন্দে। আমাদের মহিলাবৃন্দের নিকট আমার অনুরোধ তাঁরা যেন সচেতনভাবে নাটক, সঙ্গীত প্রভৃতি শিল্পকলায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। নারী সমাজের শিক্ষা দেবার ভার আমাদের। এই দায়িত্ব পালন করে নিজেদের স্বাধিকার অর্জনের পথে এগিয়ে আসুন।<sup>২</sup>

পরিচিতির মতো একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল সেই ভাষা-আন্দোলন এবং যুক্তফ্রন্ট (১৯৫৪) নির্বাচনের পূর্বে ১৯৫১-৫৩ সময়ে। বাঙালী জাতীয়তাবাদ, অসাম্প্রদায়িক ভাবধারা এবং বাংলা ভাষা, সঙ্গীত, নাটক, নানা কলা ও সংস্কৃতির বিকাশে পরিচিতির অবদান তাই ঐতিহাসিকতার দাবিদার। আজিজ মিছির (সিরাজুল ইসলাম) লিখেছেন : 'সীমান্তর মত পত্রিকা একদিকে-আর অন্যদিকে রেলওয়ের ওয়াজিউল্লাহ ক্লাব থেকে আর একটি পত্রিকা 'পরিচিতি'...পাশাপাশি দেখলেই বোঝা যায় যে চট্টগ্রামে তখন প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলন কিভাবে চলছিল। এই পত্রিকা দুটির কপি যদি এখন কারো কাছে থেকে থাকে তবে দেখা যাবে যে আজকের যঁারা ঢাকার প্রতিষ্ঠিত লেখক তাঁদের অনেকেরই গল্প-

কবিতা—এদুটি পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। ঢাকা থেকে তাঁরা লেখা পাঠাতেন আর আমরা ছাপাতাম, এতে বোঝা যায় যে ঢাকায় তখন এধরণের পত্রিকা ছিল না।<sup>৪</sup>

কখনও কখনও কৃষ্টি, অগত্যা, মুক্তি, যাত্রিক সে চাহিদা পূরণ করলেও আজিজ মিছির সাহেবের মস্তব্যে উপর্যুক্ত সত্য আছে। ‘সীমান্ত’ মোটামুটি পাঁচ বছর এবং ‘পরিচিতি’ তিন বছর চট্টগ্রাম থেকে বের হয়েছিল বলে ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৩ সন পর্যন্ত প্রগতিশীলদের রচনা প্রকাশের মাধ্যম রূপ সুযোগ তখন চট্টগ্রামে ছিল এবং এতে গোটা পূর্ববাঙলার প্রাণ-প্রবাহ অন্তত কিছুটা ধ্বনিত হয়েছিল। অতপর ‘মোসলেম উদ্দীন সাহেবের রেলওয়ে ইনস্টিটিউটের সম্পাদকের কার্যকাল শেষ হলে পত্রিকা ও তিন বছর চলার পর ১৯৫৩ সনের শেষ নাগাদ বন্ধ হয়ে যায়। চট্টগ্রামের সাংস্কৃতিক জীবনেও তখন থেকেই কেমন একটা ভাটা পড়লো। কারণ সে সময়ে চট্টগ্রামের প্রাণকেন্দ্র ছিল রেলওয়ে অধ্যুষিত এলাকা।<sup>৫</sup>

### তথ্যপঞ্জি

১. মফিজ উল হক, ‘স্মৃতির সায়েরে চট্টগ্রাম’, চট্টগ্রামে সাংস্কৃতিক আন্দোলন : প্রগতিশীল ধারা, পৃ. ৬৭।
২. আজিজ মিছির (সিরাজুল ইসলাম), পঞ্চাশ দশকের শুরুর : প্রগতিশীল আন্দোলন, চট্টগ্রামে সাংস্কৃতিক আন্দোলন : প্রগতিশীল ধারা, পৃ. ৪০।
৩. পরিচিতি, সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি মফিজউল-হক, ৩ বর্ষ, ১ সংখ্যা, বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৬০, পৃ. ১০।
৪. আজিজ মিছির, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮।
৫. মফিজ উল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৭-৬৮।

## ৭. যাত্রিক (১৯৫৩)

বাঙালি জাতীয়তাবাদে আস্থাশীল, বায়াম্মোর ভাষা-আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী, পঞ্চাশ দশকের ছাত্র রাজনীতির একজন পুরোগামী সৈনিক, বিশিষ্ট চক্ষুচিকিৎসক, সমাজনিষ্ঠ চিন্তক, একান্তরের মুক্তি-সংগ্রামের অন্যতম শহীদ, ডাক্তার আবদুল আলীম চৌধুরী (১৯২৮-৭১) এবং তাঁর আর এক সতীর্থ পূর্ববাঙলার পঞ্চাশ ও ষাট দশকের বিশিষ্ট সাহিত্যিক আহমদ কবির এর যৌথ উদ্যোগে প্রকাশিত হয়েছিল ‘যাত্রিক’।

বায়াম্মোর ভাষা আন্দোলনের অব্যবহিত পরে, প্রাগ্রসর চিন্তার বাহন হয়ে যাত্রিক সমাজ-পরিবর্তনের অঙ্গীকার নিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল বলে ঔপনিবেশিক শোষক দ্বারা কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে মৃত্যুর মুখ দেখেছিল শীঘ্রই—মাত্র চার সংখ্যা প্রকাশিত হবার পরেই। (চার সংখ্যা পুরো প্রকাশিত হয়েছিল কিনা তাও জানা যায় না—কিন্তু তিনটি সংখ্যা যে প্রকাশিত হয়েছিল, তা নিশ্চিত, কারণ নমুনা পাওয়া যায়)।

প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় পৌষ ১৩৫৯ সনে। ‘প্রত্যেক ইংরেজী মাসের প্রথম সপ্তাহে ও বাঙলা মাসের মাঝামাঝি প্রকাশিত’ হবার অঙ্গীকার ঘোষণা করে নিয়মাবলীতে বলা হয়, ‘গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, আলোচনা এবং শিল্প ও সংস্কৃতিমূলক রচনা আমরা সাদরে গ্রহণ করবো।’ প্রতি সংখ্যার মূল্য আট আনা, বার্ষিক চাঁদা সাড়ে পাঁচ টাকা এবং বাৎসরিক পৌনে তিন টাকা।

বলা হয়, যে-কোন মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যাবে। ‘কার্যধ্যক্ষ’র ঠিকানা ছিল ২৭ নং কাজী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা। উইট-হিউমারের ভাষায় ‘অগত্যা’ লিখেছিল তাদের পত্রিকা নিউজপ্রিন্টে ছাপা পূর্ববঙ্গের একমাত্র সাহিত্যপত্রিকা। কিন্তু যাত্রিকের প্রাপ্ত সংখ্যাগুলোর কাগজও নিউজপ্রিন্ট। কাগজের অভাব এবং মূল্যবৃদ্ধির জন্য অনেক পত্রিকাই নিউজপ্রিন্টে ছাপা হয় তখন। এমনকি মোহাম্মদী, সওগাত সমকালও—তবে মাঝেমাঝে সাদা কাগজেও বের হয়েছে অনেক পত্রিকা, এমনকি উপযুক্ত পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা।

আলোচ্য পত্রিকার সাইজ ১/৪ ক্রাউন ; পৃষ্ঠা ৫০ করে, তৃতীয় সংখ্যার শেষ পৃষ্ঠার নম্বর ১৫০। যাত্রিকে বিজ্ঞাপন মোটামুটি ভালোই পাওয়া যেতো। ঔষধ-কোম্পানী, ফার্মেসী, বই এর লাইব্রেরী, তেলের মিল, চা, সিনেমা, হোটেল, কাগজের বিক্রেতা, প্রভৃতির বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছে। সামাজিক প্রভাব বা সংযোগ যাত্রিকের উদ্যোক্তাদেরও ছিল।

দেখা যায় যাত্রিকের শুভানুধ্যায়ীগ্রুপের তরুণেরাও পরবর্তীকালে বাঙলাদেশে সাহিত্যিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জগতের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছিলেন। একমাত্র কাজী মোতাহার হোসেন ছাড়া আলীম চৌধুরী, আহমদ কবির, আহমদ রফিক, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, সৈয়দ নুরুদ্দীন, বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর, আনিস চৌধুরী, শামসুর রাহমান, আশরাফ সিদ্দিকী, আবদুল গনি হাজারী, হাসান হাফিজুর রহমান, আবদুল গাফফার চৌধুরী, আনিসুজ্জামান, এনেব গোলাম সামাদ, আলাউদ্দীন আল আজাদ, জহির রায়হান, ফজলে

লোহানী, আবদুর রশীদ, সিরাজুল ইসলাম, মোহাম্মদ সফিযুল্লাহ প্রমুখ পঞ্চাশ দশকের প্রধান তরুণ কবি সাহিত্যিক লেখকগণ যাত্রিকের লেখক সম্প্রদায়ের সদস্য ছিলেন।

পত্রিকা সম্পর্কে সম্পাদকদের বন্ধু, সতীর্থ, বিশিষ্ট লেখক ভাষা-সৈনিক ডা. আহমদ রফিকের (১৯২৯-) কাছ থেকে জানা যায় : 'যেমন প্রগতিশীল রাজনীতিতে, তেমন প্রগতি-সাহিত্যের চর্চায়ও আলীমের উৎসাহ ছিল আন্তরিক। এই উভয়দিকেই তাঁর ঝাঁক ক্রমেই বাম-চেতনার দিকে প্রসারিত হতে থাকে। ঢাকা মেডিকেল কলেজ ইউনিয়নের প্রকাশিত দ্বিতীয় ম্যাগাজিনটিতে সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর লেখাটিতেও এই আভাস মেলে।'

যাত্রিক সম্পর্কে তিনি লিখেছেন : 'সেকালে ঢাকায় সাহিত্য পত্রিকার সংখ্যা ছিল নিতান্ত কম। এর মধ্যে মেডিকেল-ছাত্রদের হাত দিয়েই দুই-দুইটি সাহিত্য মাসিক প্রকাশিত হয়। আমাদের সহপাঠী মঈদুর রহমানের 'খাপছাড়া' আর কবির-আলীমের 'যাত্রিক'। কিন্তু খাপছাড়ার তুলনায় যাত্রিক ছিলো পুরোপুরি প্রগতিশীল সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রসারে নিবেদিত। যাত্রিক এর প্রতিটি সংখ্যার লেখা বিচারে একথার প্রমাণ মিলবে। সেই সঙ্গে আরো প্রমাণ মিলবে রাজনীতি ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে তাঁর চেতনার গুণগত উত্তরণের। তাই একসময়ের ছাত্রলীগেরা আলীম তাঁর যাত্রিকে—স্বচ্ছন্দে প্রকাশ করতে পেরেছেন ঘোষণা স্তালিনের মৃত্যু উপলক্ষে কবিতা, প্রবন্ধ, আলোচনা। সম্পাদকীয় লিখেছেন 'স্তালিনের মৃত্যু নেই... ছেপেছেন স্তালিনের পূর্ণ পৃষ্ঠা ছবি। মুসলিম লীগের স্বৈরতন্ত্রী শাসনে এই প্রত্যেকটি কাজ ছিলো রীতিমতো ঝুঁকির, এমনকি বিপজ্জনকও বটে।

যাত্রিক প্রকাশের তাড়নায় অস্থির হয়ে উঠেছিলেন আলীম, সঙ্গে ছিলেন আহমদ কবির—পত্রিকা বোরোবে, কবে বোরোবে, এই সব নিয়ে দিনের পর দিন কতই না হিসাব-নিকাশ... যোগ দিয়েছে জহির রায়হান... সে তখন সবে লেখায় হাত দিয়েছে। ছটফটে অস্থির প্রকৃতির জহিরের তখন সাংবাদিক-সাহিত্যিক হওয়ার স্বপ্ন। এই জহির যাত্রিকের প্রকাশনায় যথেষ্ট সাহায্য করেছে। শুধু লেখা দিয়ে নয়, মূলত কাজকর্মের মাধ্যমেই। পরবর্তীকালে জহির 'প্রবাহ' নামে একটি সাময়িকী প্রকাশ করেছিলেন, সম্পাদক ছিলেন কবি আহসান হাবীব।

ডাক্তার আহমদ রফিক আরও জানান, যাত্রিক প্রকাশের পরিকল্পনা, লেখা সংগ্রহ, ছাপার সমস্যা, অর্থনৈতিক সাচ্ছন্দ্য, এইসব নিয়ে সারাক্ষণ আলীমের মগ্নতা দেখে মনে হয়েছে... যাত্রিক বৃষ্টি তাঁর মানসসন্তান।... প্রকাশনায় সফল আলম। সব মিলে যেন একটা যৌথ সংসারের কাজ। উদ্দেশ্য, কাগজটির মান ধরে রাখা, সেই সঙ্গে আর্থিক স্বচ্ছন্দ্য বজায় রাখতে চেষ্টা করা। নর্থব্রুক হল রোডের রেনেসাঁস প্রিন্টার্স থেকে ছাপা এই কাগজটির জন্য ছাপাখানার মালিক জাকিউল্লাহও (ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর ছেলে) কম পরিশ্রম করেনি, অবশ্য আমাদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতার কারণে। মনে পড়ে সদ্য ছাপা যাত্রিক এর প্রথম সংখ্যার (পৌষ ১৩৫৯) কয়েকটা কপি হাতে নিয়ে খুশিতে উচ্চকিত আলীম যখন ব্যারাকে এসে পৌঁছলো, তখন সেই কাগজের কাঁচা গন্ধ নাকে টেনে আমাদেরও খুশির শেষ ছিল না।

ছাত্র জীবনে, বিশেষ করে চিকিৎসাবিজ্ঞানের মত জটিল ও শ্রমসাধ্য বিষয়ের ছাত্র হয়ে সাহিত্য পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশ তখনকার জন্য যেমন বিরল ঘটনা, তেমনি গবেরেও বিষয়। অর্থনৈতিক ঝুঁকি যেমন ছিল, তেমনি ছিল পড়াশোনা যক্ষতির ভয়। সব ঝুঁকি, সব ভয় হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়ে মনে হয় সাহিত্য চর্চার জাদুকরী টানে আলীম এই দায়িত্ব নির্দিধায় কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। আর সাহিত্য অঙ্গনে যাত্রিক সেসময় মোটামুটি ভালোই নাম কিনেছিলো। যাত্রিক প্রকাশনার মধ্য দিয়ে একটি বিষয় বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিলো ; আর তা হলো সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি আলীমের বিশ্বস্ততা। দেখা গেল, এদিক থেকে অনেকটা পথ পেরিয়ে এসেছে আলীম। পরবর্তী সময়ে এই বিশ্বাস আরো সুনির্দিষ্ট, আরো দৃঢ়মূল হয়ে ওঠে। যাত্রিক-এর সংখ্যাগুলো মিলিয়ে দেখলে এসত্য বোঝা যাবে।<sup>১</sup>

প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যার 'চলতি সাহিত্য' বিভাগে মুসলমানি বাঙলা সাহিত্য বনাম হিন্দু বাঙলা সাহিত্যের আলোচনার ধারায় এটা স্পষ্ট হয় যে, বাংলা ও বাঙালিদের স্বার্থ সংরক্ষণের প্রচেষ্টা কেবল লেখা নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সম্পাদকগণ ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেননি, সজ্ঞানে তাঁরা এবিষয়ে মতামত জ্ঞাপন করে সাহিত্যের আদর্শ প্রচারে ছিলেন অকুণ্ঠ।

...তাই যে সাহিত্য সৃষ্টি হচ্ছে তা আকার-বিহীন, পানীয় পদার্থের মত। জাতীয় কৃষ্টি এবং সভ্যতাকে ফুটিয়ে তোলার মূলে যে সাহিত্য,—সভ্যতার মাপকাঠি যে সাহিত্য, তা সাহিত্য—পিপাসুদের দিনে দিনে শঙ্কিত করে তুলছে। পূর্ববাঙলার সাহিত্য যে বাংলাভাষার উপর ভিত্তি করেই দাঁড়িয়ে আছে, একধা অনস্বীকার্য...সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান সবারই স্থান এক।...বিনা প্রয়োজনে ধার করা শব্দ ব্যবহারের উদ্ভট পরিকল্পনা জনসাধারণের বিরক্তিরই উদ্ভেদ করবে।...বাংলা সাহিত্য যে মহান গৌরব বহন করছে, তাকে অক্ষুণ্ণ রাখার দায়িত্ব নিতে হবে আমাদের। সাহিত্যে সংকট সৃষ্টির উদ্ভট খেয়াল পরিত্যাগ করে গঠনমূলক কাজে নিজেকে নিয়োজিত করাই হবে প্রত্যেক সংবুদ্ধিপরায়ণ সাহিত্যিকের প্রধান কর্তব্য। যে সাহিত্য আমাদের প্রেরণা যুগিয়ে আসছে এতকাল, সেই বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন দিকে, বিভিন্ন ভাবধারার প্রবর্তন করে একে, রূপে-রসে-গন্ধে অতুলনীয় করে গড়ে তুলবার দায়িত্ব আমাদেরই। সে দায়িত্ব পালন করার জন্য আজ এগিয়ে আসতে হবে সমস্ত সাহিত্যদরদীদের।<sup>২</sup>

প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যাতে যাদের রচনা ছিল তাঁরা হলেন :

প্রবন্ধ : সৈয়দ নূরুদ্দীন—পাকিস্তানের জাতীয় মুখশ্রী ; মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী—কাব্যে চলিত ভাষা ; কাজী মোতাহার হোসেন—নজরুল কাব্য পরিচিতি (ধারাবাহিকভাবে তিন সংখ্যাতেই ছাপা হবে) ; মাস্তানা—ভারতীয় নৃত্যের আদিকথা ;

গল্প : বোরহান উদ্দীন খান জাহাঙ্গীর—পটভূমি ; আনিস চৌধুরী—পরিক্রমা ; ডিগ্‌মেন্ট মরিজ—হাসি (অনুবাদ : আজিজুল হক) ;

কবিতা : শামসুর রাহমান—রূপালি স্নান ; আশরাফ সিদ্দিকী—একটি কি দুটি পাখি ; আবদুল গণি হাজারী—কি বুনছো ; হাসান হাফিজুর রহমান—উদার চরিতনামাকে ।

এছাড়া সংগ্রহ, চলিত সাহিত্য, গ্রন্থ-পরিচয়, খেলাধুলা, মঞ্চ, সম্পাদকীয় প্রভৃতি বিভাগ ছিল মাসিক পত্রিকার ন্যায়। বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 'সংগ্রহ' বিভাগে শ্রেষ্ঠ কথামালা জড়ো করেছেন। চলতি বিভাগে বাঙলা সাহিত্যের ঐতিহ্য বিষয়ে তখনকার প্রধান বিতর্কিত বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে। আহসান হাবীব প্রণীত 'রাত্রিশেষ' কাব্যগ্রন্থের আলোচনা করেছেন আবদুল গাফফার চৌধুরী এবং Military and Political Consequences of

Atomic Energy' গ্রন্থের আলোচনা করেছেন আবদুল্লাহ আল মুতী। 'পাক-ক্রিকেট দলের ভারত সফর' শিরোনামে 'খেলাধুলা'র খবর পর্যালোচনা করেছেন জামালুদ্দিন। জহির রায়হান ২৮ ডিসেম্বর ১৯৫২তে কার্জন হলে অভিনীত 'নার্সিংহোম' শীর্ষক নাটকের মঞ্চায়নের সাফল্য-ব্যর্থতার আলোচনা করেছেন এবং 'পাট' নিয়ে পূর্ববাঙলার কৃষকদের স্পর্শকাতর ইস্যুর আলোচনা হয়েছে সম্পাদকীয় বিভাগে।

সকল গল্প কবিতা প্রবন্ধ আলোচনা সমালোচনা—বিষয়, বক্তব্য ও ভাষা-সৌন্দর্যে হৃদয়গ্রাহী, পঠনোপযোগী উন্নতমানের সাহিত্য-পত্রিকার মর্যাদার অধিকারী যাত্রিক। কাজী ফজলুর রহমান লেখেন—'সমালোচনা প্রসঙ্গে' (১/২)। মুজতবা নকীবুল্লাহ—ইউরোপীয় জীপসী (১/২) ; এবনে গোলাম সামাদ—জীববিজ্ঞানীর দর্শন (১/২) ; মাস্তানা—ভারতীয় নৃত্যে অভিনয় ও মুদ্রার ভাষা (১/২-৩) ; মুহম্মদ সফিয়ুল্লাহ—ধনতান্ত্রিক কাঠামোতে অর্থনৈতিক বাজেট (১/৩) ; এবং রফিক আহমদ (আহমদ রফিক?)—যোশেফ স্টালিন (১/৩)। শ্রী তামসরঞ্জন রায় প্রণীত 'অপরাধ প্রবণতার সমস্যা' শীর্ষক প্রবন্ধটি পুণমুদ্রিত হয় (কোথা থেকে, তা উল্লেখ নেই) দ্বিতীয় সংখ্যায়।

পরের (১/৩) সংখ্যায় সুধীররঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের 'লগুন রঙ্গমঞ্চ' শীর্ষক রচনা প্রকাশিত হয়। গল্প লেখেন ; আলাউদ্দীন আল আজাদ (ছায়ামগ ১/২) ; জহির রায়হান (হারানো বলয় ১/২) ; আহমদ কবির (নোনা ১/২) ; সিরাজুল ইসলাম (কয়েকটি লালুফুল, ১/৩) ; আনিস চৌধুরী (রঙ ১/৩) এবং মোপাঁসার গল্প 'উইলা' অনুবাদ করেন জিয়াউদ্দীন আহমদ।

কবিতার রচয়িতা : ফজলে লোহানী (গলি ১/২) ; আবদুর রশীদ (অবাস্থিত ১/২) ; দিলদার চৌধুরী (শবযাত্রা ১/২) ; আহমদ রফিক (কমরেড স্টালিন ১/৩) ; জামালুদ্দিন (একটি মহৎ স্মরণ ১/৩) এবং আলাউদ্দীন আল আজাদ (জলরং ১/৩) প্রমুখ।

নিয়মিত বিভাগে চলতি সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। 'মঞ্চ' (১/২) ও 'চলচ্চিত্র' (১/৩) বিষয়ে আলোচনা করেন যথাক্রমে তপতী মিত্র এবং জহির রায়হান। 'গ্রন্থপরিচয়' দেন আনিস চৌধুরী। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের সিগনেট বুকস প্রকাশিত টেনেসী উইলিয়ামস এর এ স্ট্রীট কারনেমড ডিজ্যায়ার (১/২) এবং আবদুল গনি হাজারী সরদার জয়েনউদ্দিন প্রণীত 'নয়ান ঢুলি' শীর্ষক গল্পের বইয়ের আলোচনা করেন।

আনিসুজ্জামান তরুণ বয়সে গান লিখতেন, যাত্রিকের পাতা আজ সাক্ষী দিচ্ছে। প্রথম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যায় তিনি 'নতুন শপথের গান' লেখেন—যার মূল সুর বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র মোতাবেক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার অঙ্গিকার। পূর্ববাঙলার প্রগতিশীল সংস্কৃতির অগ্রগামী সৈনিক, তরুণ আনিসুজ্জামানের এই গানে বিপ্লবের প্রেরণা মূর্ত—

সাম্যবাদী আর শান্তিকামী সব মানুষের সাথে

মানুষের গান, জীবনের গান, গাইবো যে এক সাথে।

এতে সুর সংযোজন পূর্বক স্বরলিপি তৈরি করেন আবদার রশীদ।

উপরোক্ত গানটিতে শুধু নয়, গোটা পত্রিকার সমস্ত লেখার মূল সুবই মার্কসীয় ধ্যান ধারণায় পুষ্ট। গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, সমালোচনা, সম্পাদকীয় ও সঙ্গীতে ‘কঠিন মাটির বুক চিরে ফের ফসল জন্ম’ দিয়ে ‘কৃষকের ক্লান্তি, শ্রমিকের শ্রান্তি’ দূর করবার এবং দেশে ‘নব পরিবেশ/নতুন জীবন-স্রোত’ আনবার, ‘শান্তির গান’ গাওয়ার প্রত্যয়-শপথের অঙ্গীকার দৃঢ়ভাবে অভিব্যক্ত ও পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

ঝরঝরে ছাপা, পরিচ্ছন্ন-সম্পাদনা পত্রিকার মানকে প্রতিষ্ঠিত করেনি কেবল, সম্পাদকদের কাঙ্ক্ষিত সমাজ-ভাবনা, সাহিত্য-চিন্তা ও লালিত সংস্কৃতির স্বরূপ পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছে। পত্রিকাটি দীর্ঘদিন প্রকাশিত হতে পারলে অসাম্প্রদায়িক, শোষণমুক্ত, সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উপযুক্ত সাহিত্যাদর্শ ও সাংস্কৃতিক রুচি বিনির্মাণে সক্ষম হতো।

যাত্রিকের সাহিত্য চিন্তা গল্প কবিতা প্রবন্ধ সমালোচনা প্রভৃতিতে প্রকাশিত হয়েছে। লক্ষ্য করলে দেখা যায়, তখনকার উদীয়মান যুবসমাজের বামপন্থী অংশের লেখকেরা এর সূচি দখল করেছিলেন। অতএব পরবর্তীকালে যারা বাংলাদেশের সাহিত্য সমাজের রথী মহারথী হয়েছেন, তাঁদেরই আত্মপ্রকাশের মাধ্যমরূপে যাত্রিক আবির্ভূত হয়েছিল। এতে যে চারিত্র আদর্শ ফুটে উঠেছে—তৎকালের অধিকাংশ সাহিত্য-পত্রিকাই তা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়নি।

ড. কাজী মোতাহার হোসেন ‘নজরুলের কাব্য পরিচিতি’ প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে নবীনদের জেগে ওঠার জন্য ‘ডাক’ দিয়েছেন। প্রবন্ধকার লক্ষ্য করেছিলেন, নজরুল-কাব্যে প্রধানভাবে পরিস্ফুট হয়েছে ‘বঞ্চিত মানবতার উদ্ধারের জন্য... (উদাত্ত) আহ্বান। এখানে হিন্দু মুসলমানের প্রশ্ন নাই। নজরুল-কাব্যে তিনি লক্ষ্য করেছেন সংগ্রামের জন্য জেগে ওঠার আহ্বানের প্রবলতা এবং ‘বেপরোয়া যৌবনের সাহসিকতা ও উদ্দামতা’।

তিনি লিখেছেন : কবি নজরুল তরুণ-তরুণী ‘সবাইকে ডাকছেন, আর বলছেন, সব বাধা ঠেলে অগ্রসর হতে হবে, বীরের মত বসুন্ধরার রত্নসম্ভার লুটে নিয়ে ভোগ করতে হবে ; আর শ্রমহান বিচিত্র সুন্দর জগৎ সৃষ্টি করতে হবে। অতীতের জন্য আফসোস করে লাভ নেই।... যাকরে তখত তাউস/জাগরে জাগ বেহুশ।’

রাষ্ট্রভাষা-সংগ্রামের পরে ১৯৫২ সনের নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে প্রণীত এবং ১৯৫৩ র জানুয়ারি মাসে প্রকাশিত যাত্রিকের নজরুল প্রসঙ্গের আলোচনায় তরুণ-সমাজকে জাগরণ-মত্তে উদ্বুদ্ধ করার প্রচেষ্টা গুরুত্বপূর্ণ। একুশের প্রথম সংকলন হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত ‘একুশে ফেব্রুয়ারী’ (মার্চ, ১৯৫৩) প্রকাশের আগেই একুশের ভাষা-আন্দোলনের পটভূমিতে প্রথম শ্রেণীর গল্প ‘ছায়ামৃগ’ প্রণয়ন করেছিলেন আলাউদ্দীন আল আজাদ। জহির রায়হানও ‘হারানো বলয়’ লিখেছিলেন, যার একটি নারী-চরিত্র ‘আপত্তিকর প্রচারপত্র’ বিলি করার অপরাধে পুলিশের হাতে বন্দী হয়েছিল।

অপরাপের লেখাগুলোতেও একুশে ফেব্রুয়ারির রাষ্ট্র-ভাষা আন্দোলন এবং পুলিশি হত্যাকাণ্ডের প্রভাব স্পষ্ট। বাংলাদেশের সাহিত্যে একুশে ফেব্রুয়ারির চেতনার বা প্রভাবের



ইতিহাস খুঁজতে গেলে যাত্রিকের রচনাগুলোর মূল্য পূর্বেই স্বীকার করে নিতে হবে। সাহিত্যের অগ্রগতিতে উন্নতমানের সমালোচনার গুরুত্ব অপরিসীম এবং সাহিত্যের অবনতি বা উন্নতির সহায়ক বা অন্তরায় যে সমালোচনা সাহিত্যের কারণেই সৃষ্টি হয় তা কাজী ফজলুল রহমানের ‘সমালোচনা প্রসঙ্গে’ (১ বর্ষ, ২ সংখ্যা, মার্চ ১৩৫৯) শীর্ষক প্রবন্ধে যুক্তিগ্রাহ্য ভাষায় আলোচিত হয়েছে—যার তাৎপর্য আজও পূর্ববাঙলার সাহিত্যজগতে অফুরন্ত। লেখক সমালোচনার ব্যাকরণ, প্রকরণ ও প্রচলনগত অর্থ ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে, আমাদের সমালোচনা-সাহিত্য যে অবক্ষয়কবলিত হয়ে পড়েছে—তা নিদ্বিধায় উচ্চারণ করেছেন। পিছনের ঐতিহাসিক সূত্র টেনে তিনি বলেন :

‘গত অর্ধ শতাব্দী যাবৎ (অর্থাৎ বিশ শতকের গোড়া থেকেই) সমালোচনা সাহিত্যের মান বিশেষ উন্নত হয়নি।’ অথচ ‘সমালোচনাও সাহিত্যের একটা বিশিষ্ট অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। একে অন্যান্য সাহিত্যরূপ হতে বিশেষ পৃথক করে দেখা চলে না। সাহিত্যের সামগ্রিক উন্নতির জন্য সমালোচনা-সাহিত্যের মানউন্নয়ন অপরিহার্য।’

লেখক লক্ষ্য করেন, উন্নতমানের সমালোচনার অভাবেই সাহিত্যের কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি সাধিত হচ্ছে না। কারণ,

‘প্রথম শ্রেণীর সমালোচনা-সাহিত্যের অভাব সাহিত্যের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির গতিতে মন্থন করেছে। সুষ্ঠু সমালোচনা-সাহিত্য যদি সাহিত্যের অন্যান্য শাখার পাশাপাশি গড়ে উঠত, তবে নিশ্চয়ই স্বাস্থ্যকর প্রভাব সাহিত্যের অন্যান্য শাখাকে সমৃদ্ধতর করত। আর সমালোচনা যখন সাহিত্যেরই একটা বিশিষ্ট অঙ্গ তখন সার্থক সমালোচনাকে অবশ্যই সার্থক সাহিত্য হতে হবে। তা না-হলে কোন আলোচনাই যথার্থ অর্থে সাহিত্য-সমালোচনার মর্যাদা পেতে পারে না। তাই আলোচকের প্রাথমিক লক্ষ্য হতে হবে তার লেখা যেন সাহিত্য-পদবাচ্য হতে পারে। তারপর দেখতে হবে তা যতদূর সম্ভব নিরপেক্ষ কিনা।’<sup>৩</sup>

নিরপেক্ষ সমালোচনার অসীম গুরুত্ব প্রদানের ওপর লেখক সমকালীন সাহিত্য-পরিস্থিতিতে আশু-পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখেছিলেন। সাহিত্য-জগতে যাত্রিকের সমকক্ষ চিন্তাধারার পরিচয় কুচিৎ মেলে। পূর্ব বাঙলার তৎকালীন অধঃগামী সাহিত্য-পরিস্থিতিতে সাহিত্যের সামগ্রিক উন্নতির লক্ষ্যে তাঁদের সাহিত্য-ভাবনা ছিল যুগোপযোগী। যাকে বলে কালের দাবীর পরিপূরক। গতানুগতিক সাহিত্যের ঐতিহ্য নিয়ে বিতর্কের চর্চিত চর্চণ তাঁদের রুচিকে বিশ্বাসিত করে তুলেছিল। তাই রুচির গঠনের জন্য উপযুক্ত সৃষ্টির তথা সমালোচকের আবির্ভাব কামনা করেছে যাত্রিক। কারণ, ‘সমালোচক পাঠকের রুচিবোধকে উন্নত করবেন ... দরদের সাথে তার সাংস্কৃতিক বিকাশের সহায়তা’ করবেন।

লেখক তাঁর সমকালের সমালোচক সম্প্রদায়কে কটাক্ষ করে লিখেছেন : ‘সমালোচকদের আজ আত্মজিজ্ঞাসার দিন এসেছে, তাঁরা তাঁদের গুরুদায়িত্ব যথাযথ বহন করতে সক্ষম হচ্ছেন কিনা তা তাঁদের নিজেদেরই প্রমাণ করতে হবে। যে, সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁরা অবাচনীয় আগন্তুক নন। তাঁদের দেখাতে হবে যে, “ব্যর্থ লেখকই হন সমালোচক”—এই কথাটা ভুল। আজ তাই সমালোচকদের এক নতুন ধরনের সমালোচনায় হাত দিতে হবে,— তা হচ্ছে ‘সমালোচনা—সাহিত্যেরই সমালোচনা।’

‘চলতি সাহিত্য’ এবং পুস্তক-সমালোচনায় যাত্রিকের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় লক্ষণীয়। ‘দ্যুতি’ (অগ্রহায়ণ ১৩৫৯) পত্রিকায় প্রকাশিত আবদুর রশীদ খানের ‘পূর্ব

পাকিস্তানের আধুনিক কাব্য সাহিত্য' এবং 'মোহাম্মদী' পত্রিকায় (কার্তিক ১৩৫৯) মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ প্রণীত 'বাঙলা ভাষায় আরবী ফারসী শব্দ' শীর্ষক প্রবন্ধসমূহের আলোচনা করে পূর্ব বাঙলার সার্বিক সাহিত্যিক অগ্রগতির প্রতিবন্ধক রূপে এগুলো যে বিশেষ উদ্দেশ্যবাদী ভ্রান্ত বক্তব্যপূর্ণ, অন্তঃসারশূন্য আলোচনা তা বোঝাতে পত্রিকা যত্নশীল হয়েছে।

আবদুর রশীদ খান সাম্যবাদ ও সাম্রাজ্যবাদকে একই দৃষ্টিতে 'দুই অসুর' রূপে চিহ্নিত করেছিলেন। 'যাত্রিক' এর প্রতিবাদ করে লিখেছে : 'শোষণকে বিলুপ্ত করার জন্য যে সাম্যবাদের সৃষ্টি, গরীবকে ধনীর রাহুগ্রাস থেকে মুক্তি দিতে যে সাম্যবাদের সৃষ্টি—তাকেই লেখক সজ্ঞানে শোষণ-শ্রেণীভুক্ত করে আত্মপ্রসাদ লাভ করছেন।'

প্রসঙ্গত যাত্রিক-এর মন্তব্য : 'সাম্যবাদ বাতিল করে কোন 'বাদে' দেশের অর্থনৈতিক অচলাবস্থাকে দূর করতে পারবে তার কান ঠিকিত রশীদ খানের প্রবন্ধে নেই। শুধু এক্ষেত্রে নয়, সাহিত্যের আসরেও নানারকম সংকট এবং বিপন্নবাদের ধূয়া তুলে এরা পাঠক সাধারণকে বিভ্রান্ত করছেন।'

কবিতাগুলোতেও শ্রমজীবী মানুষদের সপক্ষে (ফজলে লোহানী, গলি, ১/২) ; পথের ধূলায় নিষ্পেশিত মানবতার জয়গানে (আবদুর রশীদ, অব্যক্তি ১/২) ; 'মৌন পূর্ববাঙলা'কে সবাধে করার লক্ষ্যে (দিলদার চৌধুরী, শবযাত্রা ১/২) কবিরা শব্দচয়নে তৎপর হয়েছেন। আলাউদ্দীন আল আজাদ 'জলরং' কবিতায় লিখেছেন 'নগর বাসীরা/জলুক এবার/লাল টুকটুক/আগুনের রং/তোমাদের মুখে।'

কমরেড স্টালিনের (জ.২১ ডিসেম্বর ১৮৭৯—ম. ৫ মার্চ ১৯৫৩) মৃত্যুর পরে প্রকাশিত যাত্রিকের প্রথম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যায় রফিক আহমদ 'যোশেফ স্টালিন' শীর্ষক প্রবন্ধে সমাজতন্ত্র, রাশিয়ার অভ্যুত্থান ও স্টালিনের ভূমিকা বিষয়ে আলোচনা করেন। আহমদ রফিক 'কমরেড স্টালিন' নামে কবিতা লেখেন। (রফিক আহমদ ও আহমদ রফিক একই ব্যক্তি। একটি স্বনামে, অন্যটি বেনামীতে প্রকাশ করা হয়)।

'স্টালিনের মৃত্যু নেই' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে বলা হয় 'স্টালিন অমর', অর্থাৎ তাঁর আদর্শ সমাজতন্ত্র অমর। এই দৃষ্টিতে 'এ স্ট্রীট কার নেমড ডিজ্যায়ার' এর সমালোচনা প্রসঙ্গে আনিস চৌধুরীর ক্ষোভ : 'ঐ বইয়ে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার আলোচনা এবং অবক্ষয়কবলিত জনসমাজের প্রকৃত চিত্র নেই! দেশ বিভাগের ফলে অবিভাজ্য বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্যকে 'ভিনদেশি বলে আখ্যায়িত করবো কোন বিদ্বৈষ নিয়ে?'—ঐতিহ্য সম্পর্কে যাত্রিকের সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল এই রকম।

সংস্কৃতি ভাবনায়ও 'যাত্রিক' তাঁদের প্রদর্শিত সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গির মতোই বাঙালিয়ানা তথা ভারতীয় শিল্প-কলার পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেছেন 'ভারতীয় নৃত্যে অভিনয় ও মুদ্রার ভাষা' শীর্ষক প্রবন্ধে। 'মঞ্চ' বিভাগে তপতী মিত্রের মঞ্চ ও নাটক সংক্রান্ত আলোচনাগুলোতে 'সংস্কৃতি সংসদ' কর্তৃক প্রয়োজিত 'পথিক' ; কৃষ্টিসংঘের 'পোষ্যপুত্র' ; বিজন ভট্টাচার্যের 'অবরোধ' শীর্ষক নাটকের মঞ্চায়নের উপর সমালোচনাকালে পত্রিকার উচ্চ-সংস্কৃতিবোধ প্রকটিত হয়েছে।

ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাতেও সাংস্কৃতিক চিন্তাধারার বিশেষ পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে। 'ইউরোপীয় জীপসী' প্রবন্ধে মুক্ততবা নকীবুল্লাহ বলেন : 'ইউরোপীয় জীপসীরা ইজিপসীয়ান, তাতার বা বহেমিয়ান নয়। বরং তাহারা নিম্নশ্রেণীভুক্ত ভারতীয় হিন্দু যাহারা দ্বাদশ শতাব্দীর পরে কোনও কারণবশত ভারত ত্যাগ করিয়া যাযাবরের ন্যায় নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া অবশেষে চতুর্দশ শতাব্দীতে বলকানে উপস্থিত হয় এবং উক্ত স্থান হইতে সারা ইউরোপে ছড়াইয়া পড়ে।'

বিজ্ঞান-চিন্তাও যাত্রিক করেছে। এবনে গোলাম সামাদ—'জীব বিজ্ঞানীর দর্শন' শীর্ষক প্রবন্ধে আধুনিক দর্শন ও বিজ্ঞানের আলোচনায় জ্ঞানগত উৎকর্ষের পরিচয় দিতে চেষ্টা করেছেন। সমাজ-ভাবনায় 'যাত্রিক' সামাজিক-সমস্যার কারণ অনুসন্ধানে সমস্যার গভীরে যেতে চেয়েছিল। ফরাসি-বিপ্লবোত্তর পৃথিবী শ্রেণী-সংগ্রামের পরিণতিতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। 'Haves and Haves not-দের বিশ্বে অপরাধপ্রবণতাও বৃদ্ধি পায়। এই প্রেক্ষিতে 'প্রোল্টেম চাইল্ড'দের কথা আলোচনা করা হয়। এতে সমাজ-ভাবনায় যাত্রিকের ব্যতিক্রমধর্মী চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায়।

কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতা-সংস্কৃতির সংজ্ঞা এবং কেন্দ্রও যেমন পরিবর্তিত হচ্ছে, মানবের ভবিষ্যৎ বিকাশ এবং সম্ভাবনা সম্পর্কেও শিক্ষাজগতে নতুন আশার বাণী উচ্চারিত হচ্ছে।... (অপরাধপ্রবণ শিশুরা) অনুকূল পরিবেশে বর্ধিত হলে, যথোপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা লাভ করলে এদের অধিকাংশেরই জীবন-স্রোত সম্পূর্ণ ভিন্নধারে প্রবাহিত হতো।

রুশ দেশের উদাহরণ দিয়ে লেখক দেখাতে চেয়েছেন অর্থনৈতিক সমস্যাই কেবল অপরাধ-প্রবণতার কারণ নয়, সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক সমস্যারূপে এটাকে বিবেচনা করতে হবে। কারণ যে সমস্ত উচ্ছৃঙ্খল যুবক-যুবতী নিজেদের নষ্ট করে তারা কেবল নিজেদের শক্তি ও সম্ভাবনাই নষ্ট করে না—এটা জাতীয় সম্পদেরই অপচয়। এই ধরণের বক্তব্য প্রকারান্তরে পাঠকদের স্ব-সমাজের প্রতি তাকাতে উদ্বুদ্ধ করে থাকবে। যাত্রিক এর রচয়িতারও সেই বক্তব্য :

এদেশের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষও নতুন প্রেরণা নিয়ে এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসরণ করে অন্যান্য প্রগতিশীল দেশের মত সাহসের সঙ্গে অগ্রসর হবেন এবং বিরাট অপচয়ের হাত থেকে সামাজিকে রক্ষা করে নিজেরা কৃতার্থ হবেন, জাতিকেও সমৃদ্ধ করবেন।<sup>৬</sup>

আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ভাবনায় যাত্রিকের স্পষ্ট মতামত দেখে পরিষ্কার বোঝা যায় তাঁদের পক্ষ ও বিপক্ষ। মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইসেন হ্যাওয়ারের ফরমোজা থেকে মার্কিন সপ্তম নৌবহর প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তকে সমালোচনা করে যাত্রিক লিখেছে :

'মুখে—যতই শান্তির বুলি আওড়াক না কেন, এদের যুদ্ধ-লিপ্সা (আমেরিকার) যে ক্রমেই বেড়ে চলেছে তা আজ সবার কাছেই স্পষ্ট। এরা চায় যুদ্ধকে জঁইয়ে রেখে এশিয়ার বুকে সাম্রাজ্যবাদী শোষণকে কয়েম রাখতে... এশিয়াতে এরা সাম্রাজ্যবাদী শোষণ অব্যবহত রাখার জন্য যে ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে তা আজ উদ্ঘাটিত হয়ে পড়েছে। শান্তির মুখোশ পরা যুদ্ধবাজদের প্রকৃত স্বরূপ যতই প্রকাশ পাচ্ছে সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে জনমতও ততই দিন দিন দানা বেঁধে উঠছে।'<sup>৭</sup>

নেহেরুর “যুদ্ধ নয়” ঘোষণার প্রেক্ষিতে দেশের রাষ্ট্রনীতি ও রাষ্ট্রীয় সমস্যা নিয়ে যাত্রিক দৃষ্টিকোণ গ্রহণ হয়ে ভেবেছে আন্তরিকভাবে। ‘পাক-ভারত মৈত্রী’র আবশ্যিকতার পক্ষে মত দিয়েও যাত্রিক বলেছে নেহেরুর ‘যুদ্ধ নয়’ ঘোষণার প্রস্তাবটি আন্তরিকভাবে সমর্থন করা যায় না। কারণ দেশে বিরাজমান পাঞ্জাবের খালের পানি সমস্যা, বাস্তবত্যাগীদের সম্পত্তি-বটনের মতো নানা সমস্যা জীবন্ত রেখে মৈত্রী চুক্তি আন্তরিক প্রমাণিত হয় না। বস্তুত গভীরভাবে অনুধাবন করলে দেখা যায় যে, কাশ্মীর সমস্যাই মূলত অন্যান্য সমস্যাপুলিকে জীইয়ে রেখেছে। নেহেরু-সরকার কাশ্মীর-সমস্যাকে সবিশেষ গুরুত্ব না-দিয়ে ‘এড়িয়ে চলা’ নীতি গ্রহণ করেছেন।

তবে এই পরিস্থিতি কোনো দেশের জন্যেই মঙ্গলকর হবে না। ‘সংকটাপন্ন রাষ্ট্র দুটিকে যুদ্ধ আরও ভয়াবহ সংকটের মুখে টেনে নিয়ে যাবে। আর তারই সুযোগ গ্রহণ করে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলো রাজনৈতিক দাবাখেলার খুঁটি হিসেবে আমাদের ব্যবহার করুক—এটা আমাদের কাম্য নয়।’ কালে দেখা যায় কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে যাত্রিকের ভবিষ্যতবাণী যথার্থ ফলেছিল :

পাক-ভারতের মধ্যে বিভিন্ন সমস্যাকে কেন্দ্র করে যে স্নায়ুযুদ্ধ বর্তমানে চলছে, অদূর ভবিষ্যতে তার বহিঃপ্রকাশ কিছুই আশ্চর্যের বিষয় নয়।... ভারত সরকার যদি হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করে আন্তরিকতার সঙ্গে কাশ্মীর সমস্যা সমাধানকল্পে আশোষমূলক মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসেন, তবেই স্নায়ু-যুদ্ধের মূল অবসান হবে এবং একমাত্র তখনই নেহেরুর ‘যুদ্ধ নয়’ ঘোষণা দু’ দেশের শান্তি-পিপাসু নাগরিকদের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় সাফল্যমণ্ডিত হবে।<sup>৮</sup>

দেশের কৃষি, অর্থনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি সব ব্যাপারেই ‘যাত্রিক’ উচ্চকণ্ঠ ছিল এবং মতামতের মধ্যে বেদন্ব ও পরিপক্বতা ছিল। পূর্ববাঙলা পাটচাষের প্রধান উর্বর ক্ষেত্র হলেও ১৯৫২ পর্যন্ত দেশে পাটকল পর্যাপ্ত সংখ্যায় গড়ে ওঠেনি। এবং কৃষকদের পাটের ন্যায্যমূল্য পাবার কোনো ব্যবস্থাও নতুন দেশের সরকার করতে পারেনি। অবিভক্ত বঙ্গের সরকারও ঔপনিবেশিক আমলে কৃষকদের জন্য পাটের নিশ্চিত, নির্ধারিত ন্যায্য মূল্যের ব্যবস্থা করতে পারেনি। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় এ নিয়ে অনেক বাক-বিতণ্ডা হয়েছে। কিন্তু কোনো ফল হয়নি। তখন সমস্যা ছিল প্রধানত পার্লামেন্টে কংগ্রেসদলীয় ও অন্যান্য দলের জমিদার-শ্রেণীর সদস্যরা কায়েমী স্বার্থ রক্ষায় সচেষ্ট ছিলেন।

সাতচল্লিশের পর পশ্চিম পাকিস্তানের পুঁজিপতিদের হীনস্বার্থে পাট ও কৃষিপণ্যের মূল্য ওঠেনি। সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক পুঁজিবাদী ষড়যন্ত্রতো ছিলই। বঙ্গবিভক্ত হয়েছে, কিন্তু পূর্ববঙ্গের উৎপাদিত পাটের প্রক্রিয়াকরণ-এর কোনও ব্যবস্থাদি গৃহিত হয়নি :—এই প্রসঙ্গে ‘যাত্রিক’ এর পৌষ ১৩৫৯, ডিসেম্বর ১৯৫২ সংখ্যায় সম্পাদকীয়-তে মন্তব্য করা হয় :

পাটের বাজারে মন্দাবস্থা দেখেই আজ পূর্ববাঙলায় কয়টি চটকল আছে, তার হিসাবের প্রশ্ন উঠেছে। নিজের জমিতে পাট তৈরী করে, সে-পাট বিক্রি করবার জন্য অপরাপর রাষ্ট্রের তোয়াজ করার নীতি আমরা তখনই পরিহার করতে পারবো যখন আমাদের দেশের মাটিতে পাটকে finished goods হিসেবে তৈরী করবার মত যথেষ্ট চটকল আমাদের থাকবে। সরকার এ সম্বন্ধে যত শীঘ্র অবহিত হন ততই দেশের এবং দশের মঙ্গল।

পাটের মূল্য কমে যাওয়ার প্রেক্ষিতে জনগণের স্বার্থ নিয়ে মাথা ঘামিয়েছে খুব কম পত্রিকাই। যাদের শ্রেণীগত অবস্থান এবং চিন্তাধারায় জনগণ আছে, তাঁরাই এই ধরনের চিন্তা করতে পারেন। পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের ১৯৫৩-৫৪ সনের বাজেটে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৫ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা। অর্থমন্ত্রী আশা করেন যে নূতন ট্যাক্স বসিয়ে ঘাটতির পরিমাণ পূরণ করেও উক্ত বাজেটে ১৪ লক্ষ টাকা উদ্ধৃত দেখানো যাবে। এই পরিস্থিতিতে যাত্রিকের সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলা হয় :

দেশ সমূহ অর্থনৈতিক সংকটের মুখে চলছে। বৈদেশিক বাণিজ্যে আমাদের লোকসান হয়েছে প্রচুর। পাটের বাজার মন্দা। কাজেই বাজেটে বিপুল পরিমাণ ঘাটতিতে আমরা শঙ্কিত হইনি। সরকারের বর্তমান অর্থনীতির দিকে চোখ ফেরালে বরং এরকম অবস্থাই অত্যন্ত স্বাভাবিক মনে হতে বাধ্য।

কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থমন্ত্রী অর্থনৈতিক সংকটের কথা বলে ব্যয়-সংকোচের পরামর্শ দিলে তার জ্বাবে যাত্রিক বলে :

এবারকার বাজেটে দেশরক্ষা বাবদ বরাদ্দ হয়েছ ৬০ কোটি ১০ লক্ষ টাকা। পূর্বেকার তুলনায় এই বরাদ্দের পরিমাণ ৫৯ লক্ষ টাকা বেশী। দেশরক্ষা দফতরের গুরুত্ব আমরা অস্বীকার করতে চাই না। কিন্তু তাতে করে দেশের অত্যাবশ্যকীয় খাতে নিদয় হস্তে ব্যয় কমিয়ে দিতে হবে, এটা কিভাবে যুক্তিগ্রাহ্য? শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতে কেন্দ্রীয় সরকার যে ২ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছেন তাকে বরাদ্দ না বলে দান বললেও অত্যুক্তি হয় না। রাষ্ট্র শিল্পায়নের খাতে বরাদ্দের পরিমাণ ১২ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা মাত্র।

বাজেট সম্পর্কে আলোচনার শেষে মন্তব্য :

দেশের জনসাধারণের স্বার্থ সর্বাগ্রে বিবেচিত হয়েছে যে বাজেটে সেটাই সর্বতোভাবে অভিনন্দনযোগ্য। কিন্তু আলোচ্য বাজেট সে দিক দিয়ে হতাশাব্যঞ্জক। শিল্পপতিদের অধিকতর সুবিধা দিয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে কর-জর্জরিত করার নীতি ব্রিটিশ আমলেই ছিল। এখনও দেখছি সে চেহারার পরিবর্তন হয়নি।

চারদশক পূর্বে উচ্চারিত বা আলোচিত মত-মন্তব্য ও সাহিত্যে বিধৃত সমাজচিত্র আজও আকর্ষণীয় এবং মূল্যবান। এর সবই এখনও সহজে আগ্রহ সহকারে পঠনযোগ্য—এটাই এ পত্রিকাটির (যাত্রিক) সার্থকতা বা সাফল্য। কালের দাবি মিটিয়ে ভবিষ্যৎ-প্রজন্মের পাঠোপযোগিতা অর্জনের ভাগ্য কটি পত্রিকার হয়?

তথ্যপঞ্জি

- আহমদ রফিক (ডাক্তার, সাহিত্যিক), যে স্মৃতি রক্ত ঝরায়, শ্যামলী নাসরীন চৌধুরী প্রণীত 'একান্তরের শহীদ ডাক্তার আলীম চৌধুরী' শীর্ষক গ্রন্থের পরিশিষ্ট, পৃ. ৭৪-৭৫।
- যাত্রিক, ১ বর্ষ, ২ সংখ্যা, পৌষ ১৩৫৯, পৃ. ৩৭।
- কাজী মোতাহার হোসেন প্রণীত 'নজরুল কাব্য পরিচিতি' এবং কাজী ফজলুর রহমান প্রণীত 'সমালোচনা প্রসঙ্গে' শীর্ষক প্রবন্ধের জন্য দ্রষ্টব্য : যাত্রিক, ১ বর্ষ, ২ সংখ্যা, মাঘ ১৩৫৯, পৃ. ৫২-৫৪ ও ৬৩-৬৭।
- যাত্রিক, ১ বর্ষ ৩ সংখ্যা মাঘ ১৩৫৯ পৃ. ৯১ এবং ৯১-৯৬।
- যাত্রিক, ১ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা ফাল্গুন ১৩৫৯, পৃ. ১৩০।
- পূর্বোক্ত, পৃ. ৯০।
- পূর্বোক্ত, পৃ. ১০০।
- পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৯।

## ৮. স্পন্দন

(১৯৫৩)

মার্কসীয় মতাদর্শ প্রভাবিত পত্রিকার তালিকায় ‘স্পন্দন’ এর অন্তর্ভুক্তি প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা দরকার যে, ঘোষিত ‘কমিউনিস্ট’ ১৯৫৪ সনের পূর্বে পূর্ব বাঙলায় টিকতে পারতো না। কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র প্রকাশের সুযোগও প্রকাশ্যে দেয়া হতোনা। সাহিত্য-বিষয়ক পত্রপত্রিকায় রাজনীতি করার অধিকারও সীমিত-নিয়ন্ত্রিত ছিল। প্রচ্ছন্নভাবে কমিউনিস্টরা যে কাজ করতেন তাকেই মার্কসীয় মতাদর্শের বলে গণ্য করতে হতো। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে মতামত প্রচার করার সীমিত সুযোগের সেই স্বৈরশাসনের কালে ‘স্পন্দন’ স্পষ্ট ভাষণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ‘পূর্ব পাকিস্তানের একমাত্র প্রগতিশীল পত্রিকা’ রূপে সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিল ‘কিমিয়ে পড়া ম্লান বাংলা সাহিত্যকে আবার রূপেরসে পূর্ণ উদ্ভাসিত করার ও বাঙলার মুক-বধির জনতার প্রাণে স্পন্দন জাগানোর একমাত্র লক্ষ্য’ নিয়ে।

তাঁদের ইচ্ছা ছিল ‘পূর্ব পাকিস্তানের প্রত্যেকটি জেলায় ও বড় বড় শহরে স্পন্দন বিক্রি হবে এবং ‘প্রচেষ্টা’ ছিল—‘পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিটি ঘরে... নিয়মিত ভাবে’ স্পন্দন পৌঁছে দেবার। লক্ষণীয় পূর্ববাঙলার সকল সাময়িকপত্রই এরূপ উচ্চাকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেই সামাজিক সাংস্কৃতিক ‘সংকট’ দূর করার কিংবা শূণ্যতা পূরণের জন্য আবির্ভূত হতো। প্রগতিশীল কোনো পত্রিকাই ধারাবাহিকভাবে নিয়মিত দীর্ঘদিন ধরে প্রকাশিত হতে পারেনি।

কৃষ্টি, সীমান্ত, সংকেত, অগত্যা, মুক্তি, যাত্রিক, পরিচিতি সব বন্ধ অথবা অনিয়মিত অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে, ওদিকে মোহাম্মদী-সওগাত, মাহেনও-দিলরুবা-নওবাহার কয়েকটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়ে চললেও সবধরনের কথা, বিশেষত বাংলা ও বাঙালির দুঃখ-কষ্ট বঙ্কনার কথা অকপটে প্রকাশ করা যেতো না, প্রকাশ করা হতো না। অথবা পত্রিকার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী লেখকদেরকে আপোষ করে বলতে হতো। এই পরিস্থিতিতে ১৯৫৩র এপ্রিল-মে বৈশাখ ১৩৬০ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের ছাত্র, বিশিষ্ট সাহিত্যসেবক মহিউদ্দিন আহমদ এই পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। রেজিষ্টেশন নম্বর ডিএ ২৪৫ গ্রহণ পূর্বক নিয়মিত প্রকাশের সকল আয়োজন সম্পন্ন করে ‘স্পন্দন’ যাত্রা শুরু করেছিল।

পত্রিকাটির সকল সংখ্যা এখন পাওয়া যায় না। প্রথম বর্ষ পঞ্চম, অষ্টম-নবম, দ্বিতীয় বর্ষ পঞ্চম ও ষষ্ঠ-সপ্তম-এই মাত্র চারটি সংখ্যা পাওয়া যায় এবং এর উপর ভিত্তি করে অনুসন্ধানের অভিজ্ঞতা থেকে ধারণা করা যায় যে, যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের ফলাফল বাতিলের ষড়যন্ত্র, ৯২-ক ধারা প্রবর্তন এবং দমন-নিপীড়ন ইত্যাদি পরিস্থিতি উদ্ভাবনের পর বছর-দুয়েক চলে (বৈশাখ ১৩৬০ থেকে চৈত্র ১৩৬১ নাগাদ) পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।

এই পত্রিকায় তখনকার যুক্তিবাদী, প্রগতিশীল লেখকগণ লিখতেন। অগত্যার সম্পাদক ও প্রধান নিয়ন্ত্রক ফজলে লোহানী, আনিস চৌধুরী, শামসুর রাহমান, হাসান হাফিজুর রহমান এবং অন্যান্য লেখকগণ যেমন : আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী, আহমদ শরীফ, সৈয়দ শামসুল হক, জহির রায়হান, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, সিকান্দার আবু জাফর (পরবর্তীতে যিনি

নিজেই 'সমকাল' প্রকাশ করবেন) ; আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, আবু হেনা মোস্তফা কামাল, বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর প্রমুখ এতে লিখেছিলেন।

আর মোহাম্মদী-মাহেনও-দিলরুবা ও নওবাহার প্রভৃতি পত্রিকার দক্ষিণপন্থী লেখকদের রচনা এতে কম প্রকাশিত হয়েছে। ... যদিও আ.ন.ম বজলুর রশীদের কবিতা আছে। তিনি রবীন্দ্র-বিরোধিতার কালে রবীন্দ্র-চর্চার বিপক্ষে বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেছিলেন। বরঞ্চ হরেন ঘোষ, রমেন্দ্র কুমার রায়, মদন ঘোষ, যতীন্দ্রমোহন সিংহ, অনঙ্গ মিত্র, রামপ্রসাদ দেবনাথ, সুশীলকুমার দত্ত, সুবোধ কুমার রায় প্রমুখ হিন্দু লেখকদের রচনা প্রকাশিত হয়েছে অনেক, আর কবি জীবনানন্দ দাশের (জন্ম : ১৭-২-১৮৯৯—মৃত্যু : ২২-১০-১৯৫৪) মৃত্যুর পরে 'স্পন্দন' শোক ও শ্রদ্ধার সঙ্গে 'বনলতা সেন' কবিতা পুনর্মুদ্রিত করে (২/৬-৭, আশ্বিন-কার্তিক ১৩৬১) এবং কবি শামসুর রাহমান জীবনানন্দের স্মরণে কবিতা লেখেন 'পুরানের নতুন জন্ম'।

স্পন্দনের প্রবন্ধগুলোর বিষয় ও নামকরণের বৈশিষ্ট্যও লক্ষণীয়। সাহিত্যে বাস্তবতা, স্টাইল, দুর্বোধ্যতা, সাহিত্যের নানা সমস্যা প্রভৃতি নিয়ে পূর্ব বাঙলার প্রধান লেখক-সাহিত্যিকদের রচনাসমূহ স্পন্দন প্রকাশিত করেছিল। মোপাঁসা, লুসুন, এমিলি জোলা, ফ্রেডেরিক বুটেট প্রমুখের রচনার অনুবাদ প্রকাশ এবং উর্দু-প্রীতির প্রতি ব্যঙ্গ, আর বাংলাভাষার প্রতি অকৃত্রিম সমর্থন—সবকিছু মিলিয়ে 'স্পন্দন'কে সীমান্তর ধারারই একটি পত্রিকা বলে গণ্য করা সঙ্গত। নিয়মের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল নবীন লেখক-লেখিকাদের প্রকাশযোগ্য রচনা প্রকাশের আশ্বাস।

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক প্যারামাউন্ট প্রেস লিমিটেড, ৯ হাটখোলা রোড ঢাকা থেকে মুদ্রিত ও ৪ ফোল্ডার স্ট্রীট ওয়ারি থেকে প্রকাশিত হতো। পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৬২। মোটামুটিভাবে (৬০, ৬২, ৬৪ পৃষ্ঠার) ৪ ফর্মা ডিমাই আটের এক সাইজ ভালো নিউজপ্রিন্টে ছাপা হতো। মূল্য ছয় আনা। নিউজপ্রিন্টে ছাপা 'স্পন্দন' সরকারের নিউজপ্রিন্ট-বরাদ্দনীতি নিয়ে অনেক সমালোচনা করেছে, যাতে প্রবল প্রতিবাদ ব্যক্ত হয়েছে উর্দু ও বাংলা পত্রিকায় কাগজ বরাদ্দের বৈষম্য-নীতির বিরুদ্ধে।

স্পন্দন' এর আবির্ভাব সম্পর্কে প্রথম বর্ষ পঞ্চম সংখ্যা ভাদ্র ১৩৬০ সংখ্যায় লেখা হয় পত্রিকার জগতে বিরাট শূন্যতা বা সাংস্কৃতিক সংকটের কালে স্পন্দন-এর আবির্ভাব হয়েছিল 'নেহাত অচেনা, নূতন বেশে।

পূর্বপাকিস্তানে বাংলা-সাহিত্যের জগতে বা আরো স্পষ্ট করে বলতে গেলে সাময়িক পত্রিকার রাজ্যে এ এক অভূতপূর্ব ঘটনা। রাজ্য বটে, তবে এ রাজ্যে প্রজা বা রাজার বলাই যাওয়া ছিল ইদানীং তাও প্রায় নিঃশেষের শেষ সীমায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল—এমনি নিদারুণ দুঃসময়ে বা আমাদের সাংস্কৃতিক সংকটের ঠিক মাহেস্ত্রুশটিতেই আবির্ভাব হয়েছিল স্পন্দনের।

পূর্ব পাকিস্তানে বাংলা পত্রিকার সংখ্যা ১৯৫৩ মনের দিকে একেবারেই কমে গিয়েছিল। এমনিতির সাংস্কৃতিক সংকট ও সাহিত্যিক শূন্যতার সময় 'স্পন্দন' প্রকাশিত হয় বলে পত্রিকার দাবি ছিল। বলা হয় :

‘বর্ষ শেষের গ্লানিভরা ব্যথা যখন বর্ষশুরুর বৈশাখেও মলিনতা ও মানসিক মৃত্যুর নির্মম পদধ্বনি শুনিয়েছিল, ঠিক সেই সময়টিতেই শান্ত সাবধান পায়ে এখানকার বাংলা সাহিত্যের রাজ্যে, নেহাত অচেনা নূতন বেশেই এসেছিল স্পন্দন।

প্রথম বর্ষের প্রথম চারটি সংখ্যা প্রকাশের অভিজ্ঞতা পঞ্চম সংখ্যায় ব্যক্ত করে বলা হয় :

তার সেই অনাড়ম্বর অথচ গভীরপূর্ণ জীবন, চঞ্চল অথচ বাচালতাবিহীন, প্রতিশ্রুত অথচ অহমিকানু্য রূপ অনেকের মনে জাগিয়েছিল উদ্দীপ্ত আশা। আর অনেককে দিয়েছিল ঈর্ষার জ্বালা, শাসনের কষাঘাত। এমনি নানা মনের নানা প্রতিক্রিয়ার মধ্যে দিয়েই স্পন্দনের এই এগিয়ে আসার ছোট পথটুকু পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য-সেবীদের পরম লক্ষণীয় হয়ে উঠেছিল। সাহিত্য-সেবীদের বিশেষ করে যারা আমাদের বাংলা সাহিত্যকে নতুন করে নতুন রূপে সাজাবেন, সেই নবীন সাহিত্যগোষ্ঠী অতি আগ্রহের সাথে, অতি সহানুভূতির সাথে তার চলা লক্ষ্য করেছিলেন। এবং মাত্র এই ছটা মাসের ক্ষুদ্র এই জীবন তার, সে যতটা পেয়েছে বিক্রপ বা হতাশার বাণী, তার চেয়ে ঠেকে থাকার আশীর্বাদ অনেক অনেক বেশী জুটেছে তার ভাগ্যে।

পত্রিকার অভিজ্ঞতায় আরো বলা হয় যে, যশোলিন্সু অথচ পরিশ্রমবিমুখ সাহিত্যিকদের চোখঠারানি বড় গাত্রদাহের সৃষ্টি করেছিল। ফলে স্পন্দনের সং-সাহিত্য প্রয়াসে ঈর্ষান্বিত হয়েছেন অনেকে, আর ঠকবাজরা হয়েছিলে আহত ও শঙ্কিত। নিজেদের অস্তিত্ব বিপন্ন দেখে অপরের কবরের উপর প্রাসাদ গড়তে আগ্রহীরা যে জঞ্জাল সৃষ্টি করছিলেন, সেই ‘আকাশ-কুসুম রচনা... সাহিত্যকে এতটুকু এগিয়ে যেতে’ দিচ্ছিল না। অত্যন্ত পরিতাপের সঙ্গে এ-ও লক্ষ্য করা যাচ্ছিল যে, তরুণ সমাজের একটি অংশ আবার সস্তা সিনেমা পত্রিকা ও আমদানি করা আরো নানা মুখরোচক ইংরেজি পত্রিকার মধ্যে নিজেদেরকে ডুবিয়ে রেখে ক্ষণিকের উন্মত্তজনা লাভটাকেই আজকে চরম লাভ বলে মনে করেছেন। এর প্রতিক্রিয়া যা হবার তাই হচ্ছে। সাহিত্যে নতুন চিন্তার খোরাক বা নতুন কোনো কিছুই আর আসছে না। যে কোন সাহিত্য পত্রিকার আবির্ভাবও এই কারণেই ব্যর্থ হচ্ছে। আমাদের রুচিবিকারই এর প্রধান কারণ। নবীন সাহিত্যসেবী এবং সাহিত্যমোদীদের উৎসাহ যদি সিনেমার পত্রিকায়... সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েই থাকে, তাহলে বলব, স্পন্দনের আবির্ভাব ব্যর্থ হয়েছে।

কিন্তু স্পন্দন এবং প্রগতিশীল সাহিত্যচর্চার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়নি। তাঁর আত্মসচেতন প্রশ্নটি লক্ষণীয় : ‘কিন্তু তাই কি হয়েছে? আমরা কি আমাদের সাংস্কৃতিক ব্যভিচার থেকে ধীরে ধীরে উঠে এসে নতুন আলোতে মুক্ত বাতাসে, নবীন আশা নিয়ে সম্পূর্ণ নতুন এক পরিবেশের মধ্যে এসে দাঁড়াতে শুরু করিনি?’

১৯৫৪-র যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে মুসলিম লীগ-বিরোধীদের বিজয়লাভের পর স্পন্দনের বক্তব্য ছিল : ‘এ প্রশ্নের জবাবের জন্যে বেশিদূর যেতে হবে না, বেশি ভাবতেও হবে না,... স্পন্দন শতশত নতুন পাঠক, শূভাকাঙ্ক্ষী লাভ করেই চলেছে।’

বায়াম্মোর ভাষা আন্দোলনের পর ‘চিত্রালী’ প্রভৃতি সিনেমা-সাপ্তাহিকের প্রকাশ ও হামিদুল হক চৌধুরী প্রমুখের উদ্যোগে অপসংস্কৃতির হলিউডী-উপকরণ আমদানির ঘটনার প্রেক্ষিতে স্পন্দনের সমালোচনা যুগোপযোগী ছিল। এসব উদ্যোগ যে যথার্থ সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল,—সেই ইতিহাসই স্পন্দনের পাতায় বিধৃত রয়েছে। (উত্তরণের সম্পাদকীয়তেও দেখা যাবে এ প্রসঙ্গে কটাক্ষ আছে)।



‘স্পন্দন’-এ গল্প লিখেছিলেন, আনিস চৌধুরী (রূপালী মৃত্যু, ১/৫ ; আঙ্গুর, ১/৮-৯) ; সৈয়দ শামসুল হক (রোগ, ১/৫) ; আবিদুর রহমান (সংঘাত, ১/৫) ; নেয়ামাল ওয়াকিল (জীবন ও জীবিকা, ১/৫) ; খেয়ালী (ছদ্মনাম, না, ১/৫) ; খণ্ডিতলয়, ১/৮-৯) ; মপাসী (অনুবাদ আবদার রশীদ, দ্বৈরথ, ১/৫) ; ফজলে লোহানী (চরমুরালী, ১/৮-৯) ; এমিল জেলার গল্প (অনুবাদ, ২/৫) ; জিয়াউল হক (অপঘাত, ১/৮-৯) ; আহমদ মোয়েদ (উর্দু কি ‘দুহরি ছবক’, ১/৮-৯) ; মনজুর রশীদ (দৃশ্যসন, ১/৮-৯) ; আহমদ মীর (মেয়ে স্কুলের মোড়ে, ২/৫ ; পুনশ্চ : ২/৭) ; লুৎফা রহমান (প্রাগৈতিহাসিক, ২/৫) ; শরীফা খাতুন (দর্পণ, মাসিমো বটে পল্লী থেকে, ২/৫) ; রামপ্রসাদ দেবনাথ (ঘড়ি, ২/৫) ; আবদুর রউফ (একটি ঝড়ের রাতে, ২/৫) ; সুশীল কুমার দত্ত (চোর, ২/৫) ; আবদুল গাফফার চৌধুরী (বৃষ্টি, ২/৬-৭) ; জহির রায়হান (ভাসাচোর, ২/৬-৭) ; বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর (গ্রামীণ, ২/৬-৭) ; রাজা হুসেন (ছাবিশ অক্টোবর, ঢাকা, ২/৬-৭) ; মোহাম্মদ আজিজুল হক (পরিস্থিতি, ফ্রেডারিক বুটে এর অনুবাদ, ২/৬-৭) ; আফলাতুন (অস্তরাল; ল্যুসুন থেকে অনুবাদ, ২/৬-৭) ; সারওয়ারী আহমদ (ছবি, ২/৬-৭) ; মাহমুদ শাহ কোরেশী (রূপান্তর, ২/৬-৭) প্রমুখ।

উপন্যাস ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়েছিল সিকানদার আবু জাফর এর জীবনের মানচিত্র এবং সৈয়দ শামসুল হকের অন্যজন। গল্প-উপন্যাসে মধ্যবিস্ত ও নিম্নমধ্যবিস্তের দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় জীবনের বিচিত্র রূপ ফুটে উঠেছে। প্রেমের গল্প ও প্রেমচিন্তার মধ্যে গল্পকার সচেতনভাবে উচ্চবিস্ত ও নিম্নবিস্তের জীবনের প্রেমানুভূতি ও অর্থনৈতিক-সামাজিক সংকট ও চিন্তাকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। জীবন ঘনিষ্ঠতা আছে এবং মানব-হৃদয়ের বিচিত্র চাওয়া-পাওয়ার রূপায়ণে গল্প, উপন্যাসসমূহ পূর্ববাঙলার তৎকালীন পাঠকসমাজের শিল্প-সাহিত্যের ক্ষুধাতৃষ্ণার পানাহার রূপে কালের দাবি মিটিয়েছে। কোনো-কোনো গল্পকার শ্রেণী-চেতনাবশত সমাজ-ভাবনার ক্ষেত্রে শ্রমবিমুখ পুঁজিপতিশ্রেণীর ধ্বংস কামনা করেছেন। জাগ্রত হোক নিম্নমধ্যবিস্ত, শ্রমিক, কৃষক, কারিগরশ্রেণী—এই হচ্ছে মূল অভিপ্রায়। নারী স্বাধীনতার, নারী-জাগরণের অভিপ্রায় ব্যক্ত হয়েছে অনেক গল্পে। সামাজিক কুসংস্কার এবং বাঙালির গ্রামীণ কৃষিভিত্তিক সমাজের নানান মিথ, সামাজিক চিত্র এবং নাগরিক জীবনের, মধ্যবিস্তের ‘টনটনে প্রেস্টিজ জ্ঞান’ প্রভৃতি নিয়ে চমকপ্রদ পঠনোপযোগী হয়েছিল স্পন্দনের গল্পসমূহ।

তবে কাঁচা-গল্পও এতে অনেক ছাপা হয়েছে। আবিদুর রহমান (সংঘাত, ১৭৫) ; লুৎফা রহমান (প্রাগৈতিহাসিক, ২/৫) ; রামপ্রসাদ দেবনাথ (ঘড়ি, ২/৫) ; আবদুর রউফ (একটি ঝড়ের রাতে, ২/৫) ; সুশীল কুমার দত্ত (চোর, ২/৫) ; আহমদ মীর (পুনশ্চ, ২/৬-৭) ; রাজাহুসেন (ছাবিশ অক্টোবর, ঢাকা, ২/৬-৭) প্রমুখের গল্পগুলো শৈল্পিক-বিচারে অপরিপক্ব। তবে তাতে যৌনতা ও নাংরামী নেই। বরং চিন্তায় সমাজ-সংলগ্নতা আছে। রচনাধারণ লেখাগুলোকে সাহিত্য হিসেবে গড়ে তুলবার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছিলেন। ‘খেয়ালীর ছদ্মনামে ‘না’ (১/৫) এবং ‘খণ্ডিত লয়’ (১/৮-৯) গল্পদুটোতে রাজনীতি-সংলগ্নতা, রাজনীতিতে নারীদের আগ্রহ ও স্বাধীনতা-সংগ্রামে মেয়েদের আগ্রহ এবং পাকিস্তান অর্জন-এর সামাজিক ঘটনা প্রেমের কাহিনীর অস্তরালে ব্যক্ত হয়েছে।

বিষয়বস্তুতে প্রগতিশীল স্পন্দনের গল্পগুলো পূর্ব বাঙলার সাহিত্যের ভাণ্ডারে মূল্যবান সংযোজন সন্দেহ নেই।

স্পন্দনের কবিদের তালিকায় আ.ন.ম বজলুর রশীদ (নবজাতক, ১/৫) ; আবুহেনা মোস্তফা কামাল (বিকেলের কবিতা ১/৫) ; মুসা মনসুর (দিন মজুরী, ১/৮-৯) ; রাবেয়া খান (জলছবি, ১/৮-৯) ; নজরুল হক (চিরদিন মনে রবে, ১/৮-৯) ; আহমদ মীর (আজও তুলিনি, ১/৮-৯) ; অনঙ্গ মিত্র (অকাল মেঘ, ২/৫) ; আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ (ছড়া, ২/৫) ; প্রিয়তমাসু, ২/৬-৭) ; এম, আহমদ আলী (বন্যা ১৩৬১, ২/৬-৭) ; মুস্তফা জামাল (তার কবরের পাশে, ২/৬-৭) ; সৈয়দ শামসুল হক (দুটি কবিতা, ২/৬-৭) ; আতাউল হক (পিকনিক, ২/৬-৭) ; আবদুল জব্বার (হকার, ২/৬-৭) ; সুবোধকুমার রায় (জীবনানন্দ, ২/৬-৭) প্রমুখ রয়েছেন।

এর মধ্যে জীবনানন্দ দাশের মৃত্যু-উপলক্ষে ‘পুরানের নতুন জন্ম’ শীর্ষক নিম্নোক্ত কবিতাটি স্মরণীয় :

জানা ছিল তাঁর কথা। কিশোর বয়সে যখন  
পালে লেগেছিল নতুন হওয়া, অজানা মাটির গন্ধে মন  
আলো অন্ধকারে উন্মন;  
সেই শিশির-স্নিগ্ধ পায়রা নরম জীবনের থাকে  
মনের ক্ষমতায় বলা চলে—আবিষ্কার করেছিলাম তাঁকে।

\* \* \* \* \*

এখন তিনি মূল্যবান গ্রন্থ হয়ে জ্বলছেন আমাদের ধ্যানে, শুধু  
মহাশূণ্য সময়ের অনন্ত বালি কাঁপছে ধূ ধূ  
আর সময় সময় আজীবন নাগরিক কলরবে  
কিন্নরের ভাষা পড়বে মনে—নির্জনে নীরবে।  
মাঝে মাঝে ভাবি, আমিও, সে পরাণ পুরুষের মতো :  
আমার গলা বেয়ে ওঠে গান, হৃদয়ে অঙ্গার-ক্ষত।<sup>২</sup>

স্পন্দনের সাহিত্য-সংস্কৃতি-ভাবনা ‘ভাষার’ প্রশ্নে উচ্চকিত হয়েছে। বলা হয় দেশবিভক্তির ফলে দুটি দেশের বাসিন্দাদের আচার-ব্যবহার রীতি-নীতি আজ নাহোক, কালে পরস্পরের থেকে পৃথক হবেই। কিন্তু এসব মেনে নেওয়া সত্ত্বেও আমাদের মাতৃভাষাকে কেটে ছেটে দুটো সম্পূর্ণ বিভিন্ন ভাষায় দাঁড় করাবার প্রয়োজন কেমন করে ঘটে সেটাই বোঝা শক্ত। কালের চাকা ঘুরতে ঘুরতে পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গের মানুষের জীবনে অনেক পরিবর্তন আসবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু... মাতৃভাষাকে স্বেচ্ছায় বিসর্জন দিয়ে বা তার অঙ্গহানির আয়োজন করে দিয়ে আমরা আর যাই লাভ করি না কেন, মনের মতো কিছুই পাবো না। এর চেয়ে কালের উপরে নির্ভর করে সব ছেড়ে দেওয়াই ভালো মনে হয়।

কিন্তু একটি সমাজ বা জাতির পক্ষে, এইভাবে কালের উপরে নির্ভর করে থাকা কখনোই যুক্তি-সঙ্গত নয়। সেইজন্যেই আমাদের উচিত এ বিষয়ে নিজেদের মধ্যে একটা চিন্তার, ভাবের ও বুদ্ধির আদান-প্রদান করে নিয়ে পরস্পরের সাথে যথাসম্ভব শিগগীর বোঝা-পড়া করে নেওয়া। ‘বোঝাপড়া’ কথাটা শুনে চমকে উঠবারই কথা। যেন নিজেদের মধ্যেই আমাদের ঝগড়া বেধে বসে আছে। অনুমান একটুও মিথ্যে নয়। আমরা নিজেরাই আজ পর্যন্ত

ঠিক করতে পারিনি আমাদের মাতৃভাষার রূপ কি হবে? এবং নিজেদের এই অক্ষমতা ঢাকবার জন্যেই আমরা বর্তমানে এর-ওর এমনকি সরকারের ঘাড়েও দোষ চাপিয়ে মাতৃভাষার প্রতি উন্নাসিকতার চরম করে ছাড়ছি।

এটা শুধু মাতৃভাষার প্রতি নয়—সমস্ত জাতি বা দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া আর কিছু নয়। এই বিশ্বাসঘাতকতার চরম প্রমাণ পাওয়া গেছে সম্প্রতি—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা পাঠ্য-তালিকা সম্বন্ধে বাক-বিতণ্ডার মধ্যেই।

‘আজাদ’ পত্রিকায় প্রকাশিত বাদ-প্রতিবাদের মোদা কথা হলো এক পক্ষ চান, পুরাতন যা কিছু সবকে রাতারাতি ভেঙে চুরমার করে দিয়ে তার ওপরে নতুন প্রাসাদ গড়ে তুলতে। আর অপর পক্ষ চান, পুরাতনকে যথাসম্ভব বজায় রেখে ধীরে ধীরে তার সংস্কার করে যেতে। যারা হঠাৎ সবাইকে চমকে দিয়ে নতুন প্রাসাদ গড়ে তুলতে চান, তাঁরা যে মোটেই চিন্তাশীল বা মাতৃভাষার প্রতি একবিন্দুও দরদী নন, তা তাদের চিঠির ভাষা, যুক্তি ও কার্যকলাপ লক্ষ্য করলেই বেশ পরিষ্কার বোঝা যায়। এবং এও বোঝা যায় যে, মাতৃভাষার প্রতি অকৃত্রিম মমত্ববোধ বা হৃদয়ের টানটুকু এঁদের আসরে নামায়নি। এঁরা এসেছেন নিজের নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যেই।

যেহেতু আমার শত্রু সে, সুতরাং সে যা বলবে সবই খারাপ বা প্রতিবাদ-যোগ্য; এই মনোভাবটুকু আজকের ভাষা-আন্দোলনের যে কতোখানি ক্ষতি করেছে তা ভেবে দেখবার সময় এসেছে।... তুচ্ছ ব্যক্তিগত স্বার্থকে পুঁজি করে (বই পাঠ্য তালিকায় স্থান পায়নি কিংবা, পরীক্ষার খাতা দেখবার সুযোগ পাইনি এমন) যদি আমরা মাতৃভাষার কালো বাজারী করতে বসি, তাহলে বলতে লজ্জা নেই আমাদের (জাতির) চরম দুর্গতি আসন্নপ্রায়। একমাত্র সৃষ্টিকর্তাই তাঁর অলৌকিক শক্তি দিয়ে আমাদের রক্ষা করতে পারেন অন্যথায় পূর্ব-পাকিস্তানের বাঙালি বলে আর কাউকে খুঁজেই পাওয়া যাবে না।<sup>৩</sup>

‘একান্ত আমাদের’ শীর্ষক সম্পাদকীয়তে সমাজের একটি চিত্র ফুটে উঠেছে :

এখন গাল-ভরা শ্লোগান আছে কিন্তু বহু বিঘোষিত সেই আদর্শের ধারে কাছে কাউকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। কলকারখানা স্থাপনের বিজ্ঞাপন দেখি, কিন্তু নতুন কোনো কিছু তৈরি হয়েছে বা হচ্ছে তা দেখিনে। আমাদের মানুষের দৈনন্দিন জীবনে অনেক সুখ-সুবিধার হাজার আশ্বাস, নাথো প্রতিশ্রুতি ও বীরত্বব্যঞ্জক সচিত্র প্রবন্ধ পড়ি আমরা কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সাড়ে চার আনা দাম দিয়ে একখানি ব্রেড কিনতে না পেরে আমরা সকলেই, এক একজন মহাকবি বা সক্রোটস জাতীয় দার্শনিকে পরিণত হয়ে চলেছি। বাঙালি পাঠক আছে, বই নেই। আমাদের টাকা আছে, নিউজপ্ৰিন্ট নেই। বাঙালি নেতা আছেন, মুখে তাঁর বাংলা ভাষা নেই। বাংলার জন্যে আমরা জান কোরবান করতে পারি, কিন্তু বাংলা কাগজ বা বই কিনে পড়িনে। বাংলা ভাষার জন্যে আমরা চিৎকার করে গলা ফাটিয়ে ব্লাকমার্কেটে বিদেশী যাবতীয় গলার ওষুধের দাম বাড়িয়ে দিই, কিন্তু কাজের কাজ করতই পারিনে, ড্রাগ-কন্ট্রোল এবং প্রাইস-কন্ট্রোল আছে, কিন্তু ওষুধ বিক্রেতার যাবতীয় নিরুদ্ধি ওষুধ অতি পরিচিত লোকদের সামনে পাঁচগুণ দামে ঠিক বের করে দেন, মৌরি হাসি হেসে।

স্পন্দনে সঙ্কোচে বলা হয় : ‘পূর্ব পাকিস্তানে সাড়ে চারকোটি বাঙালি মিলে আমরা ‘রাষ্ট্রভাষা বাঙলা চাই’ বলে খুব চিৎকার করেছি; কিন্তু মুষ্টিমেয় কয়েকজন উর্দু ভাষাভাষী

ঢাকায় এবং এদেশের সর্বত্র উর্দু ভাষার উন্নতি বিধানের নানা পরিকল্পনাকে কার্যকরি করে গড়ে তোলার জন্যে উর্দু অ্যাকাডেমী, আঞ্জুমানে তারাক্বীয়ে উর্দু সুচারুরূপে গড়ে তুলেছেন, এবং আরো সুষ্ঠুভাবে নিজেদের মাতৃভাষার জন্যে তারা চিৎকারের চেয়ে বেশি কাজই করে যাচ্ছেন।

আমরা বলি ‘বাংলা চাই; কিন্তু ঐ মুখেই সার। কার্যক্ষেত্রে দেখি, পড়তে পারি আর না পারি বেশ রঙ্গচঙ্গ একটা আমদানী করা মোটা উর্দু-মাসিক পত্রিকা হাতে নিয়ে বাসে স্টীমারে ভ্রমণ করতে গৌরবে এবং অ্যারিস্টোক্রেসিতে আমরা চরম শিখরে উঠে বসে আছি বলে নিজেদের মনে করি। বাংলা মাসিক পত্রিকা বা বই হাতে রাখাটাকে বা এই বাঙালি-ধরনের জিনিসের সাথে আমাদের নাড়ীর যোগ আছে, একথাটাকে গলায় প্রকাশ করলেও কাজে কর্মে প্রকাশ করতে আমরা রীতিমত লজ্জিত। ঠিক এই কারণেই পূর্ব-পাকিস্তানে বাঙলা সাময়িক পত্রিকা বা গল্প-প্রবন্ধের বইয়ের চেয়ে আমদানী করা উর্দু সাময়িক পত্রিকা ও বইগুলো বেশী পরিমাণে বিক্রী হচ্ছে। সুতরাং এখানেও সেই মুখে বড় বড় বুলি আছে, কিন্তু দোয়াতের মধ্যে কালি নেই। চরম সুখের কথা এই যে, এই কালি না থাকার পেছনে আমাদের ছোট-বড় সকলেরই যথেষ্ট সাহায্য ও সহানুভূতি রয়েছে।’

পাকিস্তান সরকারের নিউজপ্ৰিন্ট বরাদ্দ-ক্ষেত্রে বৈষম্য-নীতির সমালোচনা করা হয়েছে ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে—

‘হাত কচলে, বলতে যাচ্ছিলেম, ‘ওরা অতো কাগজ পায় মাত্র দুইম ছাপিয়ে পত্রিকা বের করে বাকীটা ব্লাক করে, অন্ততঃ আমাদের পত্রিকার চাহিদা মতো কাগজ দিন!... কিন্তু বলতে পারলেম না!... কিন্তু এমনটি কেন হচ্ছে? আমাদের চারিদিকে এ কিসের অসামঞ্জস্য, এ কিসের অভাব, এ কিসের আধিক্য? (পার্থক্য?) খোলসা করে বিস্তারিত সব বলতে বসলে সে হবে আর এক কেছা। এবং সে কেছা ব্যয়ন করতে গেলে আমাদের সীমা ছাড়িয়ে রাজনীতির বর্ডার ক্রস করে যাবে আমরা, অতএব আঙ্কের মতো এখানেই থেমে যেতে বাধ্য হলেম।’<sup>৪</sup>

কয়েকটি প্রবন্ধে সাহিত্য-শিল্পের এবং আধুনিক কবিতার দুর্বোধ্যতা প্রসঙ্গে আলোচনা আছে। দুর্বোধ্যতা উৎকর্ষ ও অভিজাত্যের প্রধান লক্ষণ মনে করে বুঝুক আর না বুঝুক একশ্রেণীর লোক ভাসা-ভাসা আলোচনা করে কিংবা ডুইংক্রেমে ছবি টাঙিয়ে ‘এ্যারিস্টোক্রেসি’ ‘ইন্টেলেকচুয়াল’-ভাব দেখাতে চান। এটা যেন ‘ফ্যাশন’ হয়ে গেছে।

কিন্তু একথাতো ঠিক যে সাহিত্যের প্রসাদগুণই প্রধান। দুর্ভাষ ও অনধিগম্য সাহিত্য খুব কমক্ষেত্রেই কালজয়ী হয়। সেজন্য অকারণ দুর্বোধ্যতাকে তারিফ করার কোন অর্থ হয়না। প্রাঞ্জলতা যেমন গুণ, অস্পষ্টতা তেমনই দোষ। তবে এও মনে রাখতে হবে : ‘বড় বড় কবির উৎকর্ষ কাব্যে যে জটিলতা, তা প্রায়সই বুদ্ধি, অনুভূতি ও ভাবের গভীরতার দরুন, ভাষার (কৃত্রিম) মারপ্যাচের জন্য নয়।

যেহেতু কবি-সাহিত্যিকেরা সাধারণ মানুষের চেয়ে গভীরতর অনুভূতি ও সূক্ষ্মতর চিন্তার অধিকারী, সেহেতু এটা খুবই স্বাভাবিক যে, তাঁদের সব ভাব ও চিন্তা পাঠক সহজে হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেনা, এজন্য তাকে খানিকটা অভিনিবেশ প্রয়োগ করে কবির ভাবধারার

সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতে হবে। কবি যখন নিজের মধ্যে মগ্ন হয়ে সব ভুলে গিয়ে তাঁর অন্তরের কথা বলতে থাকেন, তখন লোকে তাঁর চিন্তা ও ভাবধারার সঙ্গে সহজে চলতে পারবে কিনা এ সম্বন্ধে সচেতন থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তাঁর রচনার যেটুকু অস্পষ্টতা তা অন্তর্নিহিত অর্থ ও ভাবের, শব্দার্থ কিংবা বহিরঙ্গের নয়।<sup>১৫</sup>

আহমদ শরীফ ‘আধুনিক কবিতা কি দুর্বোধ্য?’ শীর্ষক প্রবন্ধে বলেন, সমাজ-শঙ্খলার ন্যায় সাহিত্য-সমাজেও ‘মাতব্বর’, ‘জিম্মি’ প্রভৃতি রয়েছে। লেখক-সমালোচকগণ এই সমাজের ‘মাতব্বর’ আর পাঠকগণ ‘জিম্মি’। নেতৃত্বের কামেলাও এখানে আছে। “অর্থাৎ এখানেও মন জাগিয়ে ও মন-মানিয়ে চলতে হয়। এ যিনি না-পারেন, হয় তাকে পাঠক দ্বারা অস্বীকার করা হয়, অথবা পাঠক তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বা নিন্দা-নৈরাশ্য মুখর হয়ে ওঠে। পাঠকদের মধ্যে যারা বুদ্ধি-বোধিতে শ্রেষ্ঠ—তাঁরা এ-সমাজে পতি, সর্দার। তাঁদেরই নাম হচ্ছে সমালোচক। তাঁরা একাধারে বিচারপতি ও বিরোধি দলপতি। তাঁরা কখনো কারো প্রতি প্রশংসায় মুখর, আবার কখনো নিন্দায় ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠেন। তাঁরা কখনো করুণ, আবার কখনো দারুণ।

...সুতরাং সমালোচনা হচ্ছে মনুষ্য জীবনের অন্তর ও বাহ্য প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে কোন কিছুই মূল্যমান। বৃহত্তর ক্ষেত্রে সমালোচনার কাজ হচ্ছে অতীত-বর্তমান ও ভবিষ্যতের জাত-অজাত বিধি-ব্যবস্থা বিশ্বাস-সংস্কার রীতি ; গত-আগত নীতি—রুচি অমনোযোগী পরমুখাপেক্ষী মনুষ্য সাধারণকে অবহিত করা, প্রয়োজন-বুদ্ধিকে উস্কিয়ে দেওয়া।”

সমালোচকের নিন্দাবানে জর্জরিত হয়েছেন সকল বড় বড় সাহিত্যিকই। লেখক আরও বলেন :

...এসব ঘটনা দেখিয়ে ইতিহাস আমাদের বলে যে সমাজে ধর্মে রাষ্ট্রে সাহিত্যে শিল্পে কোন নতুন মত পথ আদর্শ বা সৃষ্টিকে স্রষ্টার সমকালীন বায়োজ্যেষ্ঠরা পূর্বলব্ধ সংস্কার বশত বুঝতে পারে না, ফলত স্বীকার করতেও তাদের চরম আপত্তি। নবীন প্রবীণে দ্বন্দ্ব এখানেই, নবীন মাত্রের উদার ও প্রগতিশীল ; প্রবীণতা মানেই রক্ষণশীলতা। উভয়দলই সমাজের তথা মানুষের কল্যাণ কামী ; উভয় দলই তর্ক-বিতর্ক, বাদ-প্রতিবাদ, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব যা কিছুই করেন সমাজের হিতার্থেই। আজ যারা প্রবীণ হয়ে বিজ্ঞতার দোহাই দিয়ে নবীনদের মতে বা কাজে বাধা দিচ্ছে, তারা কিছুকাল আগে নবীন বয়সে প্রবীণদের সঙ্গে লড়েছে। পুরুষ পরম্পরায় এভাবেই চলেছে। কিন্তু নবীন-প্রবীণ কেউ আজো বিজ্ঞতা দ্বা বুদ্ধি-বোধিতে হার মানতে রাজী হয়নি। জয় পরাজয় শেষ পর্যন্ত প্রাকৃতিক নিয়মেই সংঘটিত হচ্ছে। তবু চৈতন্য উদয় হয় না।<sup>১৬</sup>

মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী ‘প্রবন্ধ সাহিত্য’ শিরোনামের আলোচনায় বর্তমানের সাহিত্য-পরিস্থিতিতে ‘মনন সাহিত্য’ চর্চার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে বলেন : আমাদের প্রবন্ধ... বা মনন সাহিত্য বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে কাব্যের উপেক্ষিতা। এর উপযুক্ত যত্ন নেওয়া হয়নি। বোধ করি বাঙালির হৃদয়বৃত্তিই এর অনুকূল নয়। বাঙালির মনে ভাব বেশি, চিন্তা কম। ভাব আর চিন্তায় কি তবে কিছু পার্থক্য আছে? কিছুটা যেন আছে। গুড় আর মিছরির মধ্যে যে পার্থক্য—সেই পার্থক্য। ভাব যখন পরিণতি লাভ করে বা সংহত হয়ে দানা বাঁধে—তখন সে যে

আকার ধারণ করে—তাই চিন্তা। মনের মধ্যে ভাবকে এমনি খিতিয়ে নেওয়ার নামই আমরা দিয়েছি ‘মনন’ বা ‘চিন্তন’। এইটে যেন বাঙালি পারে কম। অন্তরের উচ্ছ্বাসে সে উদ্বেল হয়ে উঠতে পারে—হৃদয়াবেগের বন্যায় সে ভেসে যেতে পারে, কিন্তু খুব স্থিতধী হয়ে, ভাবটাকে বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে, তারপর পরিপাটি করে বলা—এটি যেন তার ধাতে সযনা। হয়ত তাই বাংলার মনন সাহিত্যের দৈন্য।... পৃথিবীর বিভিন্ন সাহিত্যের যাবতীয় রচনাই প্রায় এই শ্রেণীর (প্রবন্ধ) ; এবং এটিই হচ্ছে মানবজাতির সমস্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার। মানুষ যাকিছু ভেবেছে, বুঝেছে, মানুষের মনীষা যা কিছু আবিষ্কার করেছে—তা সবই সে জমা করে রেখে গেছে—এই (প্রবন্ধ-সাহিত্য) ভাণ্ডারে।

সেই হিসাবে প্রবন্ধ সাহিত্যই মানব-জাতির, সামগ্রিক চিন্তাধারার বাহন। অতএব আপনারা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন প্রবন্ধ সাহিত্যের মূল্য কতো বেশী এবং এর প্রয়োজন কি অপরিসীম। অথচ এই সাহিত্যের মূল্যই কেউ দেয়না... প্রবন্ধের মধ্য-দিয়ে লেখক নিজের ভাবনা চিন্তাকে প্রকাশ করেন বলে... এই রচনার মধ্যদিয়ে লেখকের নিজের ব্যক্তিত্বটি ফুটে ওঠে। এই ব্যক্তিত্বই তাঁর রচনাকে দেয় ষ্টাইল (Style) বা ভঙ্গি। Style is the expression of the writer himself ষ্টাইল হচ্ছে লেখকেরই ব্যক্তিত্বের সৌভ যা তাঁর রচনায় সঞ্চারিত হয়। যার ব্যক্তিত্ব যতো মহান এবং সেই ব্যক্তিত্ব যে পরিমাণে রচনার মধ্যে ব্যঞ্জিত হয়ে উঠে তাকে বিশেষ চরিত্র দান করে—রচনা সেই পরিমাণে চিত্তাকর্ষক ও মহৎ হয়ে ওঠে। অবশ্য অনেকে মনে করেন যে, প্রবন্ধের মধ্যে লেখক নিজেকে গোপন রেখে নৈর্ব্যক্তিকভাবে Objective দৃষ্টিতে বস্তুকে আলোচনা করবেন। কিন্তু এতে আমরা বিশ্বাস করতে পারিনা, কেননা, কোনো লেখকই লেখার মধ্য থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ গোপন করতে পেরেছেন বলে মনে হয় না।<sup>১</sup>

মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর প্রবন্ধ-সাহিত্যের বিস্তৃত আলোচনাটি জ্ঞানগর্ভ এবং জ্ঞানোদ্দীপক। ইংরেজী সাহিত্যের কোন প্রবন্ধের অনুসরণে ‘ষ্টাইল’ সম্পর্কে আলোচনা করেন নাজমুল হক (১/৮-৯) এবং ‘সাহিত্যের পাত্র-পাত্রী’ বিষয়ে আলোকপাত করেন মদন ঘোষ (১/৮-৯)। এসমস্ত আলোচনায় টাইপ-চরিত্র বর্জন করে স্বকীয়-বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল নতুন সাহিত্য তথা চরিত্র সৃষ্টির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সমাজ-সমালোচনায় ‘স্পন্দন’ কালের প্রেক্ষিতে সাহিত্য পত্রিকার যথার্থ ভূমিকা গ্রহণ করতে চেয়েছিল। কবিতার থেকে গদ্য প্রকাশের প্রতি আগ্রহ দেখিয়ে গল্প-উপন্যাস কথা-সাহিত্যের চর্চার দ্বারা স্পন্দন বাঙলাদেশের সাহিত্যের এবং সমাজ-সংস্কৃতির অগ্রগতির ক্ষেত্রে যে ভূমিকা পালন করেছিল, তাকে হেলায় পাশ কাটিয়ে যাওয়া চলে না বলেই ইতিহাস থেকেও ‘স্পন্দন’ এর নাম মুছে যাওয়া উচিত নয়।

## তথ্যপঞ্জি

১. আনিস চৌধুরীর ‘রূপালী মৃত্যু’ (১/৫) ; আবদুল গাফফার চৌধুরীর ‘বৃষ্টি’ (২/৬-৭) ; সৈয়দ শামসুল হকের ‘রোগ’ (১/৫) ; জহির রায়হানের ‘ভাঙাচোরা’ (২/৬-৭) ; বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর এর ‘গ্রামীণ’ (২/৬-৭) ; নেয়ামাল ওয়াকিল-এর ‘জীবন ও জীবিকা’ (১/৫) গল্পগুলো স্পন্দন-এর এ প্রসঙ্গে বিবেচ্য।

২. শামসুর রাহমান, পুরানের নতুন জন্ম, স্পন্দন, ২ বর্ষ, ৬-৭ যুগ্ম-সংখ্যা, আশ্বিন-কার্তিক, ১৩৬৯, পৃ. ৭।
৩. স্পন্দন, ১ বর্ষ, ৫ সংখ্যা ('সাহিত্যের পসরা'); সম্পাদক : মহিউদ্দীন আহমদ, ভাদ্র ১৩৬০।
৪. স্পন্দন, ১ বর্ষ, ৮-৯ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩৬০ পৃ. ১-৩।
৫. রৈবত (ছদ্মনাম ?), দুর্বোধ্য, স্পন্দন, ১ বর্ষ ৫ সংখ্যা, পৃ. ১৫।
৬. আহমদ শরীফ, আধুনিক কবিতা কি দুর্বোধ্য ? ; স্পন্দন ২ বর্ষ -৭ যুগ্ম-সংখ্যা আশ্বিন-কার্তিক ১৩৬১, পৃ. ৫৮।
৭. মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, প্রবন্ধ সাহিত্য, স্পন্দন, ২ বর্ষ, ৬-৭ যুগ্মসংখ্যা, আশ্বিন-কার্তিক, ১৩৬১, পৃ. ২০।

## ৯. উত্তরণ

(১৯৫৮-৬১)

তৎকালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-সংসদ এবং সংস্কৃতি-সংসদের প্রথম সারির পুরোধা, বাঙলাদেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনের পরিচিত ব্যক্তিত্ব, ড. এনামুল হক ১৯৫৮ সনে আইউব খানের সামরিক শাসন জারির (অক্টোবর ১৯৫৮) সন্ধিক্ষণে পূর্বপাকিস্তানে প্রথম শ্রেণীর একটি সাহিত্যপত্রিকা প্রকাশের সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন করেছিলেন, কিন্তু সামরিক শাসনের হঠাৎ আবির্ভাবের ফলে আত্মগোপন করতে হলো বলে পিছিয়ে গেলো। পাঠকদের হাতে যথাসময়ে পৌঁছাতে পারলো না কালের দাবি, মনের মুক্তি ইত্যাদি সাংস্কৃতিক সংকট মোকাবিলার অভিনাষী, সাহিত্যের উন্নতি অগ্রগতির শব্দ-সৈনিক—দ্বিমাসিক উত্তরণ।

যে অবক্ষয়-ব্যবস্থার অজুহাতে সামরিক শাসন জারি করা হয়েছিল—সেই পরিস্থিতি সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক-প্রচেষ্টার মাধ্যমে পরিবর্তনের লক্ষ্যই ছিল যে পত্রিকা প্রকাশের মূল প্রেরণা; সেই পত্রিকা উত্তরণ অবশ্য কিছুদিনের মধ্যে সামরিক শাসনের তীব্রতা কমে এলেই বাজারে এলো। দু বছর দুমাস চলে শেষে আবার বন্ধ হয়ে গেলো।

এর প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৬৫ সনে, আর শেষ সংখ্যা ১৩৬৭ সনের ভাদ্র, ১৯৬০ সনের সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়েছিল। তৃতীয় বর্ষের 'বর্ষশুরু সংখ্যা' রূপে দুই বাঙলার প্রায় পঁচাত্তর জন প্রতিশ্রুতিশীল, খ্যাত ও হবু-খ্যাত, তরুণ, প্রবীণ কবি-সাহিত্যিকের রচনা, শিল্পকর্ম (চারু শিল্পসহ) ও সাহিত্যিক প্রয়াসের ফসল ২৭৫ পৃষ্ঠার সাড়ে নয় ইঞ্চি বাই সাড়ে সাত ইঞ্চি সাইজের স্পেশাল ইস্যুটিই যে এর অন্তিম সংখ্যা হবে তা কেউ এর আয়োজন, অবয়ব, উদ্যম, সম্পাদকীয় ইত্যাদি দেখে কল্পনাও করেননি। বরঞ্চ 'মাসিক' করার ঘোষণায় খুশি হয়েছিলেন সৎ সংস্কৃতিসেবীগণ। কিন্তু সামরিক প্রশাসক আইউব খানের প্রেস-সংক্রান্ত নতুন আইনের (প্রেস এণ্ড পাবলিকেশনস এ্যাক্ট) আঘাতে হারিয়ে গেলো পূর্ববাঙলার সর্বেৎকষ্ট, পরিপূর্ণ সম্ভাবনাময় একটি সাহিত্য পত্রিকা।

তবে যে-কটি সংখ্যা (৬×৬× ১ = ১৩টি?) এর প্রকাশিত হতে পেরেছিল এবং এতে ফে-সমস্ত লেখা প্রকাশিত হয়, তৎকালে পূর্ববাঙলার শিক্ষিত, বুদ্ধিজীবী লেখক সম্প্রদায়ের মানস-মুক্তির লক্ষ্যে সে-ছিল এক অপূর্ব প্রয়াস। কালের দাবী যেটানো বলে যে-কথাটি সাহিত্যের সমাজতাত্ত্বিক সমালোচনায় মানদণ্ডরূপে সর্বত্র গুরুত্ব, মূল্য-নির্ধারণ ও ভূমিকা-বিচারের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়—সে-বিবেচনায় উত্তরণ প্রকৃতপক্ষে যথার্থভাবেই তা পালন করতে পেরেছিল। সেজন্য বাঙলাদেশের সাহিত্য সংস্কৃতি ও সমাজের অগ্রগতিতে উত্তরণের উচ্চ-মূল্য (ভূমিকা) অস্বীকার করা যাবে না।

আইউব খানের সামরিক শাসনে শিল্পী-সাহিত্যিক-রাজনীতিবিদদের সর্বপ্রকারের (বাক্-ব্যক্তি-সংবাদপত্র) স্বাধীনতা অপহৃত হলে দেশে অবক্ষয় কবলিত অন্ধকার এক বন্ধা ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়। সকল সৃষ্টি প্রয়াস অপরূহ হয়ে পড়েছিল। বিশেষত পূর্ব বাঙলার জনগণের মানসিক সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক রুচি ও চিন্তাকে বিকৃতির যে ষড়যন্ত্র



অক্টোপাশের মতো চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল—১৯৫৮-পরবর্তী সময়ে তা চরম আকার ধারণ করে। আর এই যুগ-সঙ্কীর্ণণের কালে ‘উত্তরণ’ সরবরাহ করেছিল পূর্ববাঙলার জনগণের সাংস্কৃতিক-মানসিক ক্ষুধা-তৃষ্ণার একমাত্র পানাহার—সাহিত্য, তথা সাহিত্যপত্রিকা। এই দেশের অর্থনৈতিক শোষণ-বঞ্চনার, বন্ধনের নানারূপের—বহু সমালোচনা, আর বাঙালিরই বুদ্ধি, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও শিল্পচর্চার স্বাধীনতা হরণের গ্লানি ও পরিণতি সংক্রান্ত বহু রচনা; বিশেষত চিন্তাবিদ আবুল ফজলের (১৯০৩-৮৩) ‘শিল্পীর স্বাধীনতা’ শীর্ষক প্রবন্ধ—যাতে বলা হয় : ‘পোষা বাঘ যেমন পুরোপুরি বাঘ নয়, তেমনি পোষা শিল্পীও খাঁটি শিল্পী নয়’,—উত্তরণ ছেপেছিল বা প্রকাশের ঝুঁকি নিয়েছিল।

আইউব খান যখন ‘লেখক সংঘ’ তৈরি করে লেখক-সাহিত্যিক-কবি-শিল্পীদের সরকারিভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করার অর্থাৎ শিল্পী-সাহিত্যিক স্রষ্টা রূপকারদের বশ্যতা স্বীকারের মায়াজাল বিস্তার করলেন, মনের ও অর্থের দিক দিয়ে দরিদ্র, ক্ষীণযোগ্যমনস্ক বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা তাতে জড়িয়ে পড়ে জাতির চিন্তাকেই প্রকারান্তরে শৃঙ্খলিত করার কাজে পরম উৎসাহে ও বিপুল উদ্দীপনায় নিয়োজিত হয়েছিলেন।

সেই কালের প্রেক্ষাপটে জাতীয় স্বার্থে, দেশের বিবেক বুদ্ধি ও চিন্তার শৃঙ্খল মোচনের লক্ষ্যে আবুল ফজল লিখেছিলেন দুঃসাহসী বিবেকী প্রতিধ্বনির সেই ঐতিহাসিক প্রবন্ধ, আর উত্তরণ-সম্পাদক এনামুল হক তা প্রকাশ করেছিলেন সব রকমের ঝুঁকি মেনে নিয়ে। শুধু শিল্পীর স্বাধীনতার বিষয়ে পরাধীনতার কঠোর শৃঙ্খলের মধ্যে বসে লেখা এই প্রবন্ধই নয়, সাহিত্য-শিল্পের, সংস্কৃতি-অর্থনীতির তৎকালীন সংকট, শূন্যতা ও নৈরাজ্যের কালে ‘উত্তরণ’ সমাজ সংস্কৃতি ও সাহিত্যের সমস্যাসমূহকে পাঠকসমাজে উপস্থাপন করে মনের দিগন্ত উন্মোচন আর সংস্কারের, নিশুতি অন্ধকারে আলো ফেলবার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল।

আবুল ফজল-এর এই রচনাটি (শিল্পীর স্বাধীনতা) প্রকাশিত হয় দ্বিতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যা, ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৬৬, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৫৯ সনে, আইউব খানের সামরিক শাসন প্রবর্তনের এক বছর, প্রেসিডেন্ট আইউব কর্তৃক করাচীতে ‘পাকিস্তান রাইটার্স গিল্ড’ বা ‘পাকিস্তান লেখক সংঘ’ প্রতিষ্ঠার (জানুয়ারী ১৯৫৯) ৮/৯ মাস পরে। তখন এই লেখা প্রকাশ এবং মত প্রকাশের দায়িত্ব স্বীকার করা সমূহ-বিপদের কারণ ছিল। খ্রীষ্টপূর্ব ৪১২-৩২২ অব্দের চিন্তাবিদ ডায়োজিনিস এর উক্তির সাহায্যে তিনি ঘোষণা করেন ‘মানুষের নিজস্ব বলতে একমাত্র জিনিস হচ্ছে মনের চিন্তা।’ আর সেই চিন্তা প্রকাশ করতে গিয়ে সব সময় রাষ্ট্রীয় কর্ণধারদের আরোপিত সুরে কণ্ঠ মিলাতে না পারলেও সব সময় খুব দোষের হয় না। তিনি বলেন : ‘রাষ্ট্রের সুরে সুর না মেললেই মানুষ রাষ্ট্রদ্রোহী হয় না, হয় না রাষ্ট্রের দুঃমন বা সমাজের শত্রু’।

আরও বলেন : ‘যে সব বস্তু মানুষকে পশু থেকে পৃথক করেছে তার মধ্যে সবার সেরা হচ্ছে Reason বা যুক্তি।... reason এর চর্চা অব্যাহত রাখতে, আর সমাজকে নৈতিক ও মানসিক দাসত্বের হাত থেকে বাঁচাতে হলে—স্বাধীনভাবে চিন্তা করার ও সেই চিন্তাকে প্রকাশ

ও গ্রহণ করার অধিকার মানতেই হবে—সমাজকে দিতেই হবে সেটুকু স্বাধীকার। নইলে স্বাধীনতার কোন মানেই থাকে না।’

প্রসঙ্গত লেখক উল্লেখ করেন—‘বাংলাভাষার প্রায় সব বড় কবি শিল্পী সাহিত্যিকের জন্ম পরাধীনতার যুগে’ হলেও তাঁদের রচিত সাহিত্য নোবেল প্রাইজ পর্যন্ত জয় করে আনতে সক্ষম হয়েছে, অর্থাৎ তিনি অঙ্গুলি নির্দেশ করেন এই দিকে যে, এখন স্বাধীন যুগের লেখকেরা পরাধীন যুগের নৈতিক মানসিক সাহস ও স্বাধীকারটুকুও ভোগ করতে পারছেন না। জাতির মননচাঁর বিকাশে স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রশাসকদের হিটলারী মনোভাবকে সমালোচনা করে আবুল ফজল উচ্চারণ করেন এই শাস্ত্র উক্তি :

‘সাহিত্য-শিল্পের ঐতিহ্য এত সুদীর্ঘ ও মানুষের আত্মার সঙ্গে তা এমনভাবে জড়িয়ে আছে যে তার মূলোৎপাটন করতে হলে গোটা মানব-বংশের মূলোৎপাটন করতে হবে। যা করা কোন হিটলার বা তাঁর অনুকারকের পক্ষেই সম্ভব নয়। মানুষ বিকাশধর্মী জীব—তার বিকাশের জন্য এযাবত যত উপায়-উপকরণ আবিষ্কৃত হয়েছে তার মধ্যে নিঃসন্দেহে সাহিত্য-শিল্প শ্রেষ্ঠতম। এই বিকাশ-ধর্ম মানুষের এত সহজাত যে—মানুষকে মানুষ রেখে এর লোপ-সাধন কিছুতেই সম্ভব নয়। বলা বাহুল্য পোষা বাঘ যেমন পুরোপুরি বাঘ নয়, তেমনি পোষা শিল্পীও ঋটি শিল্পী নয়। শিল্পীর জন্য স্বাধীনতা—বিকাশের স্বাধীনতা, প্রকাশের স্বাধীনতা অপরিহার্য। যেমন অপরিহার্য পুরোপুরি বাঘ হওয়ার জন্য স্বাধীন অরণ্য-জীবন। সার্কাসের রয়াল বেঙ্গল টাইগারের চেয়ে বনের কেঁদো বাঘ যে অনেক বেশী বাঘ তা বোধ করি সকলেই স্বীকার করবেন। দুর্দান্ত শাসকেরা চিরকালই শিল্পীর স্বাধীনতাকে হরণ করতে ও দমন করতে চেয়েছে। আজও বহু দেশে তার দৃষ্টান্তের অভাব নেই। কিন্তু এসব দুঃশেষ বারবারই ব্যর্থ হয়েছে, সামনেও হবে। একচক্ষু হরিণের মত ক্ষমতার নেশায় পাওয়া শাসকেরা কিন্তু তা দেখতে পান না বা দেখেও না-দেখার ভান করেন।’

লেখকের জন্য স্বাধীনতা কেন অত্যাবশ্যিক তা প্রখ্যাত সাহিত্যিক ই এম. ফরস্টার এর উক্তি উদ্ধৃত করে আবুল ফজল বলেন, তিনটি কারণে লেখকের স্বাধীনতা লেখক ও দেশের জনসাধারণের জন্য অত্যাবশ্যিক। ই এম. ফরস্টার যে তিনটি কারণে লেখকের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন লেখক তা উদ্ধৃত করেন—

‘প্রথমত লেখককে নিজে বোধ করতে হবে তিনি পুরোপুরি স্বাধীন, তা না হলে সৃষ্টির জন্য ভাল কিছু রচনার তিনি প্রেরণাই পাবেন না। তিনি যদি নির্ভয় হতে পারেন, মনে মনে আত্মস্থ হতে পারেন, সহজ হতে পারেন ভিতরে ভিতরে, একমাত্র তখনই তাঁর জন্য সৃষ্টির অনুকূল পরিবেশ রচিত হবে। দ্বিতীয়ত লেখক শুধু নিজে স্বাধীন এ বোধ করলে চলবে না। স্বাধীনতা হলো লেখকের জন্য প্রাথমিক শর্ত। কিন্তু লেখক ও শিল্পীর আরো কিছু চাই। অর্থাৎ লেখক যা বোধ করছেন তা অন্যকে বলার স্বাধীনতাও তাঁর থাকা চাই। তা নাহলে তাঁর অবস্থা হবে বন্ধমুখ ব্যতলের মতো। লেখক শূন্য বিহার করতে পারেন না—প্রোতা বা পাঠক না হলে তাঁর চলে না। তাঁর প্রকাশের পথে অন্তরায়ঘটতে পারে এ আশংকা থাকলে তিনি একদিন অনুভব করতেই ভুলে যাবেন। অনেক সময় শুবুঙ্কি-সম্পন্ন রাজকর্মচারিরাও এই সত্যটা বুঝতে পারেন না। ফলে তাঁরা অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভাল রচনার অন্তরায় হয়ে দাঁড়ান। তৃতীয়ত যদি পড়ার স্বাধীনতা জনসাধারণের না থাকে, লেখকের অনুভূতি যদি তাঁরা গ্রহণ করতে অক্ষম হন তাহলে তাঁদের নিজের অনুভূতি বা অনুভব করার শক্তিও চাপা পড়ে যাবে এবং তাঁরা থেকে যাবেন অপরিণত—চির immature. কাজেই লেখকের স্বাধীনতা যে শুধু লেখকের জন্যই প্রয়োজন তা নয়। দেশের জনসাধারণের জন্যও তা অত্যাবশ্যিক।... অফিসিয়াল পয়েন্ট অব ভিউ-র রোলার চালাতে গেলেই শিল্প স্বধর্ম হারাতে বাধ্য। শিল্প ও শিল্পী স্বধর্ম হারালে সমাজও স্বধর্ম তথা মানবধর্ম না হারিয়ে পারে না। সাহিত্যের প্রাণবায়ু ও তার বিচিত্র অনুভূতি থেকে যে সমাজ বক্ষিত, সেই সমাজ

অপরিণত মানুষের সমাজ তথা 'ছোট লোকের সমাজ'। সে সমাজের চাওয়া-পাওয়া: বাসনা কামনাও হবে তেমনি ক্ষুদ্র ও সামান্য। সে সমাজের পক্ষে বড় কিছু করা, মহৎ কিছু গড়া, এমনকি বৃহৎ কিছু আকাঙ্ক্ষা করাও সম্ভব নয়।

লেখক গুরুত্ব দিয়েছিলেন সামরিক শাসনের তথা সাতচল্লিশের স্বাধীনতা-পরবর্তী অসৃষ্টিশীল সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনের প্রতি। তিনি শিল্পী সাহিত্যিকে সাংবাদিক তথা সৃষ্টিশীল ব্যক্তিদের জাতীয় বৃহত্তর স্বার্থে সরকারি নিয়ন্ত্রণমুক্ত থাকার আবশ্যিকতা ব্যাখ্যা করে বলে, 'ইংরেজ শাসনামলে আমাদের লেখকেরা অনুভূতি-প্রকাশের ক্ষেত্রে অনেক বেশি নিঃশঙ্ক ছিলেন। তাই মধুসূদনের পক্ষে রামের পরিবর্তে রাবণকে বীর বানানো সম্ভব হয়েছিল এবং নজরুলের পক্ষে, 'খোদার আসন আরশ ছেদিয়া' মাথা তুলে দাঁড়ানো যতো কষ্টই হোক শেষ পর্যন্ত সম্ভব হয়েছিল। 'বল বীর আমি চির উন্নত শির' এ ধরনের উক্তি কি পাকিস্তান আমলে বিশেষত সামরিক শাসনের সময়ে কোনো লেখকেরা পক্ষে উচ্চারণ করা সম্ভব ছিল ?

মনের উপর, আত্মার উপর কী প্রচণ্ড জুলুম এই দেশে? এই অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য একজন বিবেকবান সাহিত্যিক, জাতির অলঙ্কার একজন সং-বুদ্ধিজীবী এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতির সংকট মোকাবিলা করার সামাজিক দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে প্রকাশিত একটি পত্রিকার কর্নধারেরা কি করে নিশ্চুপ বসে থাকতে পারেন? তাই তাঁদের উচ্চারণ করতে হয় বলিষ্ঠ কণ্ঠ :

এ অসহ্য কৃপমণ্ডুকতার হাত থেকে সমাজকে বাঁচাতে হলে শিল্পীকে অভিব্যক্তির স্বাধীনতা দিতে হবে—  
মেনে নিতে হবে সাহিত্য-শিল্পের এ প্রাথমিক শর্তটুকু।<sup>১০</sup>

উপর্যুক্তরূপ প্রগতিশীল সামাজিক ভূমিকার কারণেই 'উত্তরণ' পরে প্রকাশের অনুমতি না পেয়ে অকাল মৃত্যুবরণ করেছিল। সম্পাদক ডক্টর এনামুল হক বলেন : তখন প্রগতিশীলতা, নতুন চিন্তা ছিল পত্রিকা প্রকাশের প্রধান অন্তরায়। বিজ্ঞাপন যতো কষ্টই হোক, পাওয়া যেতো। কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীলতার প্রতিবন্ধকতাই তখন ভালো পত্রিকা প্রকাশের প্রধান অন্তরায় ছিলো।<sup>১১</sup>

গতানুগতিক পত্রিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে কোনো অন্তরায় ছিল না, নেই এখনও। সবকালের অবস্থাই এক। কিন্তু কোনো পত্রিকা বিশ বছর প্রকাশিত হয়ে যা করেছে উত্তরণ দুবছরেই তা করতে পেরে ইতিহাসের পাতা উজ্জ্বল করতে সক্ষম হয়েছে। বলা বাহুল্য, দু বাঙলার পাঠক সমাজেই উত্তরণ আলোড়ন তুলতে সক্ষম হয়। কাজী আবদুল ওদুদ থেকে আবুল ফজল, শামসুর রাহমান, আবদুল মান্নান সৈয়দ এবং পরিচয়, নতুন সাহিত্য—প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদক—সকলেই একবাক্যে উত্তরণের প্রশংসা গেয়েছেন।<sup>১২</sup>

কিন্তু আইনের বাধা অতিক্রম করে তখন ঐ বয়সে আবুল ফজল সাহেবের দুঃসাহসী ভাষণের জন্য শঙ্কিত হলেন তাঁর বন্ধুরা। তিনি সদ্য চাকুরীজীবন থেকে অবসর নিচ্ছেন (২২ শে নভেম্বর ১৯৫৯... অবসর উপলক্ষে সংবর্ধনা জানানো হয়)। এদিকে সামরিক শাসনের ভরা জোয়ার—ভয় ভাবনায় সারা দেশের মানুষের এক মুমূর্ষু অবস্থা। এ প্রবন্ধ (শিল্পীর

স্বাধীনতা) বের হওয়ার পর ব্যস্ত সমস্ত হয়ে ঢাকা থেকে অধ্যাপক আহমদ শরীফ লিখে পাঠালেন :

আপনি দেশের উচু স্তরের বুদ্ধিজীবীদের মনের কথাই বলেছেন। কিন্তু এসব কথা বলা বা লেখায় আইনের বাধা দুলত। এ বয়সে সে দায় আপনার দেহ ও মনের অনুকূল নয়। কথায় বলে 'পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গ ভাঙ্গে হীরার ধার।' আমাদের তো তার চাইতেও ক্ষণ্য অবস্থা। জ্ঞানি বক্তব্য প্রকাশের একটা বেদনা-মধুর আকৃতি রয়েছে। আপনি আপনার বক্তব্য লিখে রাখুন কিন্তু কাগজে দেবেন না। উত্তর পুরুষ বা ভাবীকাল আমাদের ভাব-ভবনের বিচার করবে। তারা উপলব্ধি করবে আমরা পাথুরে প্রতিমা নই, বুদ্ধি আমাদের ছিল, অনুভব করবার মতো একখানা হৃদয়ও ছিল।<sup>৬</sup>

২

সম্পাদক এনামুল হক—এর সঙ্গে প্রথম সংখ্যার কার্যকরি সম্পাদক হিসেবে মোহাম্মদ ইউনুস এর নাম ছাপা হয়েছিল। পত্রিকার প্রায় সব সংখ্যার প্রচ্ছদ-শিল্পীই কাইয়ুম চৌধুরী। সম্পাদক এনামুল হক কর্তৃক বেঙ্গল প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৩/৪ পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা হতে মুদ্রিত ও 'উত্তরণ প্রকাশনী', গ্রীণ হাউস, সিদ্ধেশ্বরী, রমনা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত হতো। পরে বেঙ্গল প্রিন্টিং ওয়ার্কস থেকে খাজা হাবিবুল্লাহ কর্তৃক মুদ্রিত ও উত্তরণ প্রকাশনীর নতুন কার্যালয়, ৮০ কুলন বাড়ী লেন, ঢাকা ১ থেকে প্রকাশিত হত। পৃষ্ঠা ৬৮।

পরের দুটো সংখ্যায় অন্য কারো নাম সম্পাদকমণ্ডলীতে উল্লেখ না থাকলেও দ্বিতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যায় 'সহ-সম্পাদক' হিসেবে নাম ছাপা হয় জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত—র। দ্বিতীয় বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় জ্যোতিপ্রকাশের সঙ্গে হুমায়ুন চৌধুরীর নামও ছাপা হয়। তৃতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যার প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা করেন শিল্পী পাশা। কার্যনির্বাহক সম্পাদক ছিলেন মওলা চৌধুরী।

নিয়মাবলীতে বলা হয় :

উত্তরণ দ্বিমাসিক-সাহিত্যপত্র। প্রত্যেক ইংরেজী দ্বিতীয় মাসের পহেলা তারিখে উত্তরণ প্রকাশিত হয়। দাম বার্ষিক সডাক তিন টাকা, প্রতি সংখ্যা আট আনা। পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য বার্ষিক সডাক চার টাকা, প্রতি সংখ্যা দশ আনা। বছরের যে কোন সময়ে গ্রাহক হওয়া চলে। দাম অগ্রিম দেয়। নমুনা সংখ্যার জন্য দশ আনার ডাক টিকটি পাঠাতে হয়। উত্তরণে প্রকাশের জন্য প্রেরিত রচনা সম্পাদকীয় কার্যালয়ে গৃহীত হবার এক মাসের মধ্যে মতামত জানানো হয়। উপযুক্ত ডাক টিকিট সঙ্গে থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরত দেওয়া হয়।

একটি বিজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয় : 'মতভিন্নতা নির্বিশেষে নবাগত ও প্রতিষ্ঠিত লেখকদের একত্র সমাবেশ' উত্তরণে হবে। ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারেও সম্পাদক বলেছেন : 'উত্তরণ ছিল প্রগতিশীল নবীন এবং প্রবীণদের সমন্বিত উপস্থাপন ফোরাম। অপ্রচলিত ধরণের লেখাও উত্তরণে প্রকাশ করা হয়।'<sup>৭</sup>

তৃতীয় বর্ষের প্রথম (বর্ষ শুরুর বিশেষ) সংখ্যার 'সম্পাদকীয়'তে বলা হয় :

সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতির মুখপত্র হিসেবে উত্তরণ-এর আত্মপ্রকাশ। কোন আন্দোলন বা মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্যে উত্তরণ-এর আগ্রহ নেই। মতামত নির্বিশেষে নতুন পুরনো এবং প্রতিষ্ঠিত ও প্রতিশ্রুতিশীল যে-কোন লেখকের পরিচ্ছন্ন লেখা প্রকাশের জন্যে উত্তরণ আত্মগত। আর এই প্রচেষ্টায় যদি কোন মহৎ প্রেরণা তার মুক্ত-বুদ্ধির আশ্রয়ে এক্যবদ্ধ হয়ে ওঠে, তবে তাকে উপেক্ষা না করে তার সহযোগিতাই উত্তরণ-এর উদ্দেশ্য।

সম্পাদকীয়তে তৎকালের সাংস্কৃতিক-সামাজিক পরিস্থিতির কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। সম্পাদক যা অক্ষুণ্টে বলতে চেয়েছেন ব্যাখ্যা করলে তার সামাজিক প্রেক্ষাপট বোঝা যায় :

একেই পত্রিকা-প্রকাশের পরিবেশ যেখানে নিরাপদ ও লাভজনক নয় এবং সাহিত্য-সংস্কৃতির বিকাশধারা যেখানে স্পষ্ট অথচ সামগ্রিক এক সংকেটে আবর্তিত সেখানে কোন সাহিত্যপত্র নিয়মিত প্রকাশ করতে যে-সব অসুবিধে এবং প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়, সচেতন পাঠক মাত্রেই তা অনুধাবন করতে পারবেন। এসব সত্ত্বেও উত্তরণ যে তৃতীয় বর্ষে উত্তোরিত হোল তা সম্ভব হয়েছে একমাত্র লেখক, পাঠক ও শূভানুধ্যায়ীদের সক্রিয় এবং অকুণ্ঠ সহযোগিতায়।

আরো একটা সুখবর বলতে হবে—দ্বিমাসিক হিসেবে দু বছর চলবার পর এখন থেকে উত্তরণ প্রতি মাসে প্রকাশিত হচ্ছে। আর্থিক স্বচ্ছলতা ছাড়া কোন পত্রিকাই বাঁচতে পারে না। আর সেটা নির্ভর করে বিষয়বস্তুর পরিবেশনা, প্রকাশনার মান এবং আগ্রহ ও আর্থিক সঙ্গতির ওপরে। একথা না বললেও চলে, এধরনের সাহিত্য-পত্র সব পাঠককে আকৃষ্ট করেনা এবং এর প্রতিষ্ঠাও তেমনি সময় সাপেক্ষ। তাই ক্রমাগত ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে এখানকার প্রকাশকরা সীমিত পাঠকের বিচিত্র চাহিদা মেটাবার তাগিদ অনুভব করেন। আর তাতে করেই একই পত্রিকার ভেতরে শিশু থেকে শুরু করে ফুটবল-ক্রিকেট, সচিত্র-সিনেমা এমনকি যৌন-বিষয়াদি পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত করতে দ্বিধা করেন না। আমরা মনে করি, প্রতিটি বিষয়ের সুষ্ঠু পরিবেশনার জন্য পৃথক পৃথক মুখপত্রের প্রয়োজন।

সম্পাদকীয়র কথাগুলো তাৎপর্যপূর্ণ বিধায় দীর্ঘ উদ্ধৃতি দেয়া হলো। বলা হয় :

বাংলা সাহিত্যের সাময়িকী প্রকাশের ক্ষেত্রে এমনিতর সংকেট যেমন নতুন নয় তেমনি পরিব্রাণের পথ কটকিত হোলেও একেবারে দুর্ধিগম্য নয়। আন্তরিক ও সং-প্রচেষ্টার সফলতায় আমরা বিশ্বাস হারাইনে। তার প্রমাণ উত্তরণের তৃতীয় বর্ষে পদাপণ। কিন্তু এই সংকেট আরো জটিলতর হচ্ছে তথাকথিত কতক সংস্কৃতিসেবীর নিছক ব্যবসায়ী মনোবৃত্তির জন্যে। অনেক নতুন পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। দেশে পত্র-পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি সাধারণত সংস্কৃতির পরিপূষ্টি ও সমৃদ্ধির লক্ষণ। আর সব পত্রিকাই যে নির্ভেজান সাহিত্যের বাহন হবে এমনও আশা করা যায় না। ব্যক্তি প্রচেষ্টা হোলেও এদের অভিনন্দন জানাতে হয়। কিন্তু রুচির বিকৃতির সঙ্গে পসারের বিস্তৃতিই যদি কারো লক্ষ্য হয় তবে তাকে প্রশয় দেবার কোন কারণই নেই। সস্তা পর্নোগ্রাফী ও উদ্দেশ্য এবং আদর্শহীন নিম্মমানের অসংখ্য সিনেমা-পত্রিকার প্রকাশ (এখানে উল্লেখযোগ্য, ঢাকা থেকে প্রকাশিত সিনেমা-পত্রিকা সংখ্যায় এ পর্যন্ত ঢাকা থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত সবাকচিত্রের সমষ্টির কয়েকগুণ বেশী) সুস্থ সমাজমন গঠনের পক্ষে অসম্ভব রকমের ক্ষতিকর। এহেন অপচেষ্টার প্রতিরোধের জন্যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মহল থেকে দাবী উঠেছে। সূরীজনের আগ্রহশীল প্রচেষ্টা এবং সর্বোপরি সরকারের অশ্রীলতা-প্রতিরোধ আইনের অবমাননা করে কিভাবে এগুলোর প্রসার দিনদিন বেড়ে উঠছে ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়।<sup>৮</sup>

উপরের বক্তব্যে পত্রিকার দৃষ্টিভঙ্গি উপলব্ধি করা যায়। সঙ্গে সঙ্গে ১৯৬০ সনের বাংলাদেশের সামাজিক-সাংস্কৃতিক-সাহিত্যিক পরিস্থিতির কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। তাছাড়া পত্রিকায় প্রকাশিত রচনাবলিও তৎকালে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। যেমন প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যাতেই সাংস্কৃতিক সংকেটের ও ধর্ম, জাতীয়তা এবং পূর্ববাঙলার মানুষের জাতিসত্তার গুরুত্বপূর্ণ বিতর্কের কালে 'ধর্ম জাতি আমরা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। লেখক দ্বিজেন শর্মা 'সমকাল' পত্রিকার প্রথম বর্ষ সপ্তম-অষ্টম সংখ্যায়ও মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম প্রণীত 'পূর্ব বাঙলার সংস্কৃতি সমস্যা' শীর্ষক প্রবন্ধের সমালোচনা করে বলেন :

ধর্মের পরিমাপে জাতির পরিচয় হয় না। কিংবা ধর্মকে জাতীয় চরিত্র বিকাশের সহযোগী উপাদান বলেও স্বীকৃতি দেয়া যায় না। যদিও বহুল প্রচারিত। তবুও এ-প্রসঙ্গে স্বাধীনতা-উত্তরকালে পাকিস্তানি জাতির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কায়েদে আজমকৃত উক্তির পুনঃস্মরণ অপ্রাসংগিক নয়। যুক্ত নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে পার্লামেন্টে জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দী তাঁর বক্তৃতায়ও এই সত্য অস্বীকার করতে পারেননি।

ধর্ম জাতীয় চরিত্রের নিয়ন্তা নয়। জাতীয় চরিত্র ইতিহাস নির্দিষ্ট বিশেষ কালের জীবন-সংগ্রাম ও পরিপার্শ্বের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফল। ধর্মের ঐতিহাসিক ভূমিকার গুরুত্ব অস্বীকারের প্রশ্ন অবাস্তব। ধর্মকে বর্জন করে সভ্যতার পরিচয় পূর্ণ হয় না। কিন্তু সভ্যতা সংস্কৃতি গতিশীল। গতির অস্তিত্ব অস্বীকার করে এ সম্পর্কে কোন বিশ্লেষণই শূন্য হতে পারে না। কারণ গতিই সত্যের আত্মা। সভ্যতা সংস্কৃতির গতিশীলতার রহস্য সূধীজনের সুপরিজ্ঞাত।

উৎপাদন শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের দ্বন্দ্বই ঐতিহাসিক গতির মৌল উৎস। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই অসভ্য সমাজ থেকে আজকের সর্বাধুনিক সমাজব্যবস্থার ক্রমবিবর্তন ব্যাখ্যা সম্ভব। বিরোধী-শক্তি প্রবাহের দ্বন্দ্ব পুরাতনের বিলোপ আর নতুন আবির্ভাবের হেগেলীয় তত্ত্ব বিজ্ঞানসিদ্ধ এই সূত্র থেকে ইতিহাস-ব্যাখ্যা মার্গের মহৎ কীর্তি।

...জাতি আধুনিক কালের সৃষ্টি। ধনতন্ত্রের বিকাশের সঙ্গে জাতির আত্মপ্রকাশ অবিত। ধর্মের সামাজিক ভূমিকা যখন শেষ, জাতি অভ্যুদয়ের তখন শুরুর। তাই ধর্ম জাতিগঠনের কারণ হতে পারেনা। জাতি সমস্যা পর্যালোচনায় অধুনা নির্দিষ্ট জে. ডি. স্ট্যালিনের খ্যাতি অনন্য সাধারণ। তাঁর সিদ্ধান্তের উদ্ধৃতি এখানে অপ্রাসঙ্গিক নয়। ‘ধর্মীয় আচরণ কিংবা অতীতের স্মৃতি জাতীয় ভাগ্যের নিয়ামক নয়। জাতীয় বৈশিষ্ট্য, জীবন শর্ত ও পরিপার্শ্বের প্রতিফলন’।

তাই পূর্ব পাকিস্তানে জাতিগঠনের কারণ আমাদের ধর্মীয় ঐতিহ্য নয়। রাষ্ট্র, অর্থনীতি, ভাষা, সংস্কৃতি, জাতীয় বংশানুক্রম এবং ঐতিহাসিক নিয়মে নির্দিষ্ট বিশেষ কালই আমাদের জাতি গঠনের মুখ্য উপাদান এবং এদের বিকশিত অবস্থাই জাতি গঠনের কারণ।<sup>১০</sup>

৩

প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় ‘অনুবাদ সাহিত্য প্রসঙ্গে’ প্রবন্ধ রচনা করেন টিপু সুলতান। বিশিষ্ট সমাজ-বিজ্ঞানী প্রফেসর এ. কে. নাজমুল করিম এর লেখা একটি প্রবন্ধ ‘উনবিংশ শতাব্দী ও স্যার সৈয়দ আহমদ’ এবং একাত্তরের শহীদ বুদ্ধিজীবী, শহীদুল্লাহ কায়সার ছদ্মনামে একটি রচনা (লেখকের ছোট্টাই শহীদ জহির রায়হানের মাধ্যমে উত্তরণ সম্পাদক এনামুল হক সংগ্রহ করেছিলেন লেখাটা)<sup>১০</sup> লিখেছিলেন পাকিস্তানের ‘প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ব্যর্থতা কোথায়?’

কবিতা লিখেছিলেন : সানাউল হক, আতাউর রহমান, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান এবং ‘ব্যক্তিগত’ শিরোনামে নিবন্ধ লিখেছিলেন আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ। জহির রায়হান এবং শওকত আলী লিখেছিলেন গল্প। টি. এস. এলিয়ট এবং তাওসুজো ইশিকওয়ান-র কবিতা ও গল্প অনুবাদ করেছিলেন যথাক্রমে মাহমুদ হাসান ও আনোয়ার জাহিদ। এই পত্রিকায় প্রথম সংখ্যা থেকেই ধারাবাহিক প্রকাশিত হয় আলাউদ্দীন আল আজাদের প্রখ্যাত নাটিকা, ‘মরক্কোর জাদুকর’।

আলাউদ্দীন আল আজাদ প্রণীত গল্প-গ্রন্থ ‘অন্ধকার সিঁড়ি’ (১৯৫৮) র সমালোচনা লেখেন মাহমুদ শাহ কোরেশী এবং রফিকুল ইসলাম লেখেন ‘সমকাল’ পত্রিকার প্রথম বর্ষের সংখ্যাগুলোর ওপর বিশ্লেষণধর্মী একটি সমালোচনা।

ফাইন আর্টসের আলোচনা এবং অনেক ছবি ছাপা হতো এ পত্রিকায়। প্রায় নিয়মমতো একটি না একটি শিল্প অথবা শিল্পসংক্রান্ত আলোচনার বিষয় প্রতি সংখ্যাতৈই থাকতো। ‘ত্রয়ো শিল্পীর চিত্রপ্রদর্শনী’ শিরোনামে প্রথম সংখ্যায় সাদেক খান লিখেছিলেন পূর্ববাঙলার চিত্র শিল্পের পর্যালোচনা।

অন্যান্য সংখ্যাতে প্রবন্ধ লেখেন কবীর চৌধুরী (আমাদের নাটকের কথা, ১/২) ; রণেশ দাশগুপ্ত (উপন্যাসের শিল্পকলাগত গতিপ্রকৃতি, ১/২) ; যার নাড়ীতে বাজে সুর—সাহিত্য শিল্প সমালোচনা, ২/১) ; কবিতার রহস্য ভাষা—মাতৃভাষা, ২/৩) ; দীননাথ সেন (পূর্ব পাকিস্তানের লোকসঙ্গীতের ধারা, ১/২) ; আতাউর রহমান (বাঙালী মুসলিম সাহিত্যিকদের ধারা, ১/৫-৬) ; হাবীবুর রশীদ (আধুনিক কবি ও কবিতা, ১/৫-৬) ; আবুল ফজল (শিল্পীর স্বাধীনতা, ২/১) ; এ. কে. নাজমুল করিম (সাম্প্রতিক বাঙলা সাহিত্যে অশ্লীলতা, ২/২) ; আহমদ শরীফ (নর—সুন্দর, ব্যক্তিগত প্রবন্ধ, ২/২) ; আব্বাস উদ্দীনের জীবন ও সংস্কৃতি চেতনার উপর লিখেছিলেন কামরুল হাসান এবং জয়নুল আবেদীন (২/৩)।

প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের প্রাপ্ত সংখ্যাগুলোতে কবিতা লেখেন হাসান হাফিজুর রহমান (১/২) ; ২/২) ; ডি.এইচ. লারেন্সের অনুবাদ করেন সেবাব্রত চৌধুরী (১/২) ; আবদুস সাত্তার (১/২) ; আল মাহমুদ (১/২) ; সৈয়দ শামসুল হক (১/৫-৬) ; ২/৩) ; আবদুর রশীদ খান (১/৫-৬) ; ফয়েজ আহমদ ফয়েজ (অনুবাদক রণেশদাশ গুপ্ত (১/৫-৬) ; ২/৩) ; হামিদুজ্জামান খান চৌধুরী (১/৫-৬) সেবাব্রত চৌধুরী (২/১) ; হাবীবুর রহমান (২/১) ; আবদুল গনি হাজারী (২/১) ; শামসুর রাহমান (২/১) ; আহসান হাবীব (২/২) ; আবুবকর সিদ্দিক (২/২) ; নূ-সুয়ান (অনুবাদ, ২/২) ; নূরুল আরেফিন (২/২) ; বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর (২/৩) ; কমলেশ সেন (২/৩) ; প্রমুখ।

গল্প লেখেন : শওকত ওসমান (১/২) ; জনস্টেইনবেক (অনুবাদ রেজাউর রহমান (১/২) ; মনিরুজ্জামান (১/২) ; ২/২) ; জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত (১/৫-৬) ; আরস্কিন কডওয়াল (অনুবাদ?, ১/৫-৬) ; আবদুস শাকুর (১/৫-৬) ; আহমদ মীর (১/১) ; হুমায়ুন কাদির (২/১) ; টিপু সুলতান (২/৩) প্রমুখ।

জহির রায়হানের প্রখ্যাত উপন্যাস ‘বরফগলা নদী’ (১৯৬৯) উত্তরণের কয়েক সংখ্যাতে ধারাবাহিক ভাবে প্রথমে প্রকাশিত হয়,—যার বিষয়বস্তু প্রণয়নে লেখককে সমকালীন সমাজব্যবস্থাই প্রধানত উদ্বুদ্ধ করেছিল। এতে বিবৃত হয়েছে :

‘ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্ত পরিবারের সামগ্রিক ধ্বংসের কাহিনী।..বিষম অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় মধ্যবিত্ত পরিবারের সংকট বহুমুখী। আর্থিক দুর্বস্থার সঙ্গে উন্নত জীবন কামনার সংকট, পুরনো মূল্যবোধের সঙ্গে নতুন মূল্যবোধের সংঘাত, শ্রেণী উত্তরণ প্রয়াসের সঙ্গে কল্যাণকামী আদর্শবোধের দ্বন্দ্ব মধ্যবিত্তপরিবারে ব্যাপক আকারে পরিলক্ষিত...। এসব দ্বন্দ্ব রূপায়িত করে ‘বরফগলা নদী’র কাহিনী গড়ে উঠেছে।’<sup>১১</sup>

গল্পগুলোতেও সমাজ-ব্যবস্থার অকপট রূপায়ণ আছে। কিন্তু শহুরে, শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত জীবনের প্রতিচ্ছবি আঁকতে লেখকেরা যতোটা মনোযোগী, ততোটা নন মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তের আর শহর ও গ্রামের বিভিন্ন এলাকার খেটে খাওয়া মানুষের জীবনচিত্র অঙ্কনের ক্ষেত্রে। তবু এইসব গল্প, উপন্যাস পূর্ববাঙলার সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ বলে বিবেচিত হয়।

‘মরক্কোর যাদুকর’ নাটিকা ছাড়াও এনামুল হকের বহু-খ্যাত নৃত্য-নাট্য ‘উত্তরণের দেশ’ (১৯৬১) প্রথম প্রকাশিত হয়েছে ‘উত্তর -এ। দেশপ্রেম, জাতীয়তাবাদ ও বিপ্লবী ভাবে-অনুভবে-উদ্দীপিত এই নৃত্যনাট্য ভোক্তাদের শিল্পরস-পিপাসা নিবৃত্তির জন্য তখন ছিল পূর্ববাঙলার একমাত্র পূর্ণাঙ্গ নৃত্যনাট্য। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুপ্রেরণায় লেখক যখন পূর্ণাঙ্গ নৃত্য-নাট্য ‘উত্তরণের দেশে’ রচনা করেন, তখন পর্যন্ত দুই বাঙলায় কোনও লেখক তা করেন নি। গ্রন্থ-চিত্র-প্রভৃতি শিল্প-সাহিত্যের সমালোচনায় উত্তরণে অংশ নিয়েছিলেন পূর্ববাঙলার প্রধান সমালোচক প্রাবন্ধিক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, আনিসুজ্জামান, আনোয়ার জাহিদ, মুহম্মদ আবদুল হাই, বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, আবদুল গনি হাজারী, মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, আবদুস সান্তার, ড. কাজী মোতাহার হোসেন, হাবিবুর রহমান, খান আতাউর রহমান, কামরুল হাসান প্রমুখ।

উত্তরণের তৃতীয় বর্ষের আরম্ভ-সংখ্যাটি সাময়িক সাহিত্যের ইতিহাসে এক বিশেষ সংযোজন। সম্পাদক যা সম্পাদকীয়তে লিখেছেন তাতে ‘প্রয়োজন বোধ’ কথাটা অত্যন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বিবেচনায় আনলে পত্রিকার সমাজ-সচেতনতার মাত্রা উপলব্ধি করা যায় : ‘প্রয়োজনবোধে পরিকল্পিতভাবেই উভয় বাঙলার লেখকদের লেখা নিয়ে বর্ধিত কলেবরে বর্ষশুরুর সংখ্যা বের হোল। উল্লেখযোগ্য অনেক লেখকের লেখাই সময় ও স্থানাভাবে প্রকাশ করা গেলো না।’

পত্রিকাটি সাহিত্যের স্বাতন্ত্র্য ও ঐতিহ্য সম্পর্কে কি মনোভাব পোষণ করতো সম্পাদকীয় থেকেই একটি উজ্জ্বল উন্নত করে তার পরিচয় নেয়া যায় :

একথা নতুন করে বলতে হবে না যে, স্বাধীনতা-উত্তর কালে বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা দুই স্বতন্ত্র জীবনবোধ এবং মূল্যায়ণে প্রবাহিত। এই স্বাতন্ত্র্য হয়তো ক্ষীণ এবং অনেকের মানসিকতায় তা বিসদৃশ্য ঠেকবে। কিন্তু এই সত্যকে অস্বীকার করা নিতান্তই বাস্তববর্জিত মনের পরিচায়ক হবে। তবে ভাষার ঐক্যবোধে রাষ্ট্রের পরিধি পেরিয়ে সাহিত্যের যে আত্মীয়তা তা খুবই স্বাভাবিক। আর সে জন্যই পরস্পরকে জানবার এবং জানাবার প্রয়োজনে এধরনের ‘সংকলন-জাতীয়’ বিশেষ-সংখ্যা প্রকাশের আয়োজন।<sup>২২</sup>

একনজরে এর বিষয়-অনুসারী শ্রেণীবিন্যাসিত সূচিপত্রের দিকে তাকালেই বোঝা যায় ঐদের আয়োজনের, আন্তরিকতার—মূল্য কতটা। উত্তরণ সাহিত্যপত্র বর্ষ শুরুর সংখ্যা। তৃতীয় বর্ষ। ভাদ্র ১৩৬৭ সেক্টেম্বর ১৯৬০ ; পৃ ২৭৫ + বিজ্ঞাপন ৪১ ; দাম দুই টাকা ; নিউজপ্রিন্ট, সাইজ সাড়ে নয় ইঞ্চি x সাড়ে সাত ইঞ্চি। এসংখ্যায় লিখেছিলেন বাংলাদেশের বর্তমানের সেরা লেখকগণ।

এর চিত্রগুলোকে স্বতন্ত্রভাবে বিবেচনা করলেও একটি এ্যালবাম-এর মূল্য দিতে হয়। পূর্ববাঙলার প্রধান দশজন শিল্পীর একগুচ্ছ চিত্রের একটি সংগ্রহ এটি। কবিতা, গল্প, প্রবন্ধও তাই। এটি একটি সংকলন যেন। পূর্ববাঙলার একটি প্রধান পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস ‘সীমানা ছাড়িয়ে’ (১৯৬৪) প্রথম এই পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। বাঙলাদেশের প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক সৈয়দ শামসুল হকের লেখা ঐ উপন্যাসের বিষয়বস্তুও স্বাধীনতাউত্তর সমাজ রাজনীতি আর সাংস্কৃতিক অবক্ষয় জনিত জীবন যন্ত্রণা ও বোধের প্রকাশ।



উপন্যাসের শেষে লেখক পাদটীকায় সংযোজন করেছেন এই মন্তব্য : ‘বর্তমান উপন্যাসে আজাদীর পরবর্তী এক বিশেষ সময়ের (১৯৪৭-৬০) উপলব্ধিকে রূপ দেবার চেষ্টা করা হয়েছে।’ ‘রাজনৈতিক আদর্শের ব্যর্থতা প্রেমের ব্যর্থতা ও শিল্পীর ব্যর্থতা—এই তিনটি ব্যর্থতার কাহিনী নিয়ে সীমানা ছাড়িয়ে, যদিও কাহিনী পরিচর্যায় সংহতি ও সুসংবদ্ধতার অভাব আছে বলে সমালোচকেরা<sup>৩</sup> উল্লেখ করেন, কিন্তু সমকালীন রাজনীতি ও সমাজ-সমালোচনার শিল্প-সাহিত্যকে কালের প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করেই সার্থক কিছু মূল্য দিতে হয় বলে পত্রিকার অবদানকেও গুরুত্বপূর্ণ বলে মেনে নিতে হয়।

উত্তরণের প্রাবন্ধিকেরা—বিশেষ করে আবুল ফজল, রণেশ দাশগুপ্ত, আতোয়ার রহমান, গোপাল হালদার, এ. কে. নাজমুল করিম, অজিত কুমার গুহ, কাজী মোতাহার হোসেন, টিপু সুলতান প্রমুখ যে-সমস্ত আলোচনা করেছেন, তাতে পূর্ব বাঙলার সাহিত্য-পরিস্থিতির তৎকালীন সমস্যাসমূহ প্রকটিত হয়েছে। কেউ কেউ সমাধানও নির্দেশ করেছেন। ফল যা-ই হোক, বড় প্রাপ্তি হলো পাঠকদের সম্মুখে জাতীয় অভাবটাকে, শূন্যতা, ক্ষীণতাকে তুলে ধরে যে হতাশার সৃষ্টি করেছিলেন উত্তরণ-কর্তৃপক্ষ—তাতে পাবার, গড়বার, সৃষ্টি করবার তথা সংগ্রামের আকৃতি ও প্রেরণা তৈরি হয়েছিল। লেখক-শিল্পী সাহিত্যিকদের মনের গভীরতর স্তরে যে ক্ষত সৃষ্টি হয়েছিল তখন তা ব্যর্থ হয়নি।

পরবর্তীকালে যে উন্নতর সমাজ ও জীবন ঘনিষ্ঠ, সৃষ্টি-মনস্ক সাহিত্য শিল্প সৃষ্টি হয়েছে বাংলাদেশে—তার সূচনা পটভূমি এবং গৌরচন্দ্রিকা রচনায় উত্তরণের অবদান কালিক মাপকাঠিতে অতুলনীয় বিবেচিত হবে, সন্দেহ নেই। উত্তরণ এর প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যায় টিপু সুলতান সাংস্কৃতিক-প্রশ্নে উচ্চকিত হয়ে লেখেন :

সাংস্কৃতিক চেতনার মাধ্যমে আমরা জানতে চাই নিজেদের মানস সম্পদকে।... আজকের দিনে তাই সাহিত্য সংস্কৃতি আমাদের কাছে একটা ব্যাপক আবেদন এনে হাঙ্গির করেছে। তাকে সঠিকভাবে বিচার করতে গেলে আমাদের উদার মনোভাবের প্রয়োজন দেখা দেবে। নিরপেক্ষতার আদর্শে তাকে বিশ্লেষণ করতে গেলে আমাদের সংকীর্ণতাকে পরিহার করে মুক্ত বুদ্ধির আশ্রয় নিতে হবে। বর্তমান কালের সাহিত্য সংস্কৃতির মৌলিক প্রশ্নগুলোও আজ শ্রেণী ও জাতীয় স্বার্থের উর্ধ্ব স্থান পাওয়ার দাবী জানাতে শুরু করেছে। একথা অবশ্য স্বীকার করতেই হবে যে মানবের সামগ্রিক মঙ্গল কামনার শূভবুদ্ধির উপর যে মহতি সাহিত্য-সংস্কৃতির ভিত্তিভূমি রচিত হতে চলেছে শ্রেণী ও জাতীয় স্বার্থের সংকীর্ণতায় আজ আমাদের নিরবচ্ছিন্ন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মন তার সাথে হিংসাত্মকভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। একথাও সত্য যে বিশ্বের প্রত্যেকটি জাতি হয়তো সামাজিক প্রয়োজনের খাতিরেই ইতিহাসের একটি বিশেষ কালে তার সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে স্বাদেশিকতার কঠিন প্রাকারের মাঝে আবদ্ধ রাখতে চেষ্টা করেছিলো। কিন্তু সাহিত্য সংস্কৃতি তার ভেতরের আপন শক্তিতেই সেই প্রাকার ভেঙে ফেরারী কয়েদীর মত ছুটে চলেছে দূর হতে দূরের পানে। গ্রীক-সাহিত্য-সংস্কৃতি বন্দী হয়ে থাকেনি গ্রীক নগর-রাষ্ট্রের ছোট সীমানার মাঝে। (উত্তরণ, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, পৃ. ৬)

লেখক আরও বলেন : পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলবার পথে সবচেয়ে বড় সহায় হলো উভয় অংশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির পরস্পর আদান প্রদান। এই সাহিত্য সংস্কৃতির বিনিময়ের মাধ্যমে আমাদের মাঝে গড়ে উঠবে নিবিড় আন্তরিক

সম্পর্ক, জাগ্রত হবে বৃহত্তর জাতীয়তাবোধ, নতুন রাষ্ট্রের ভিত্তিমূল হবে দৃঢ়তর। জাতীয় সাহিত্যের মহতি উৎসবের দিন আজো আমাদের আসেনি। তারই প্রতীক্ষায় আমাদের সাহিত্য-সাধনায় লিপ্ত মনের পিপাসা যেদিন সাহিত্য সঙ্গীত ও চিত্রকলার প্রাচুর্যের সমাহারে নিবৃত্ত হবে সেদিন দেশের বৃকে প্রবাহিত হবে উচ্ছল প্রাণধারা আর মানুষের মুখে ফুটবে অজস্র হাসি। আমরা সেই সোনালী যুগের সাধক।<sup>১৪</sup>

সমাজ অর্থনীতি এবং রাষ্ট্রীয় সমস্যা নিয়ে ভাবনায়ও উত্তরণ কখনও পিছিয়ে থাকতে চায়নি। ১৯৫৮ সনের শেষের দিকে পাকিস্তানের সামরিক শাসনের দীর্ঘ দশকের শুরুতে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ব্যর্থতা এবং পূর্ববাঙলার, তথা পূর্ব-পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের প্রতি পাকিস্তানি-ঔপনিবেশিক শোষকদের অর্থনৈতিক আচরণের (বা শোষণের) চিত্র তুলে ধরে পাঠক-সমাজের চৈতন্যবোধের জাগরণ সৃষ্টিতে উত্তরণ যে দায়িত্ব পালন করেছিল, বলাবাহুল্য গুরুত্বের সংগেই—তাও উল্লেখযোগ্য।

অর্থনৈতিক বিষয়ের আলোচক বলেন, পাকিস্তানের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার কথা মনে রেখে, প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাফল্য বা ব্যর্থতা বিচার করতে হবে। লক্ষণীয় যে দেড় শতাধিক বৎসর কাল বিদেশী শোষণ ও শাসনধীনে থাকার ফলে পাকিস্তানের অর্থনীতি শিল্পে অনগ্রসর, কৃষি প্রধান। আজাদী প্রাপ্তিকালে জাতীয় অর্থনীতির মূল চাবিকাঠি বিদেশীদের হাতে থাকার দরুন স্বাধীন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ জাতীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গৃহণের ঐতিহাসিক পদক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কৃষি-অর্থনীতির উপর সামন্তবাদী ভূমি-ব্যবস্থার প্রাধান্য আছে।

তাছাড়া পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে ভৌগোলিক ব্যবধানের কথাও মনে রাখা দরকার কোনো পরিকল্পনা প্রণয়ন বা কার্যকরীকরণ-এর পন্থা ও লক্ষ্য নির্ধারণের সময়। এই প্রেক্ষিতে 'প্রতিবাদের আশংকা না করেই বলা চলে যে পাকিস্তানের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছে। বিশেষভাবে পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষেত্রে এই পরিকল্পনার সীমিত লক্ষ্যটুকুও বাস্তবায়িত হতে পারেনি। দেশের রাজনীতিবিদ, সমাজকর্মী, বুদ্ধিজীবী প্রত্যেককেই এই ব্যর্থতার কারণগুলো সঠিকভাবে নির্ধারণে যত্নবান হতে হবে এবং সে কারণ দূর করতে সচেষ্ট হতে হবে।'

আলোচক আরও মস্তব্য করেন : পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রণয়ন, লক্ষ্য নির্ধারণ ও বাস্তবায়িতকরণের জন্য নির্ধারিত পন্থার মধ্যেই যে বর্তমান বিফলতার বীজ লুকানো রয়েছে তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ব্যর্থতার অন্য একটি কারণ হোল বৈদেশিক পুঁজি, ঋণ ও বৈদেশিক সাহায্যের উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা। এই নির্ভরশীলতার পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে বাংলাদেশের প্রকৃত স্বাধীনতা কতোটা ক্ষুণ্ণ হয়েছে, তা সকল দৃষ্টিক্ষমই অনুভব করতে পারেন।

উত্তরণ এ ব্যাপারে সতর্ক করতে চেয়েছিল তখনই। তাঁরা পরিকল্পনায় নির্ধারিত অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা দেখিয়ে এই নির্ভরশীলতার ছবি পরিস্ফুট করেন। সংশোধিত পরিকল্পনার অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা নিম্নরূপ :

উৎস	পরিমাণ (কোটি টাকায়)
সরকারী সঞ্চয়	১০০.০০
বেসরকারী সঞ্চয়	৫৬০.০০
মোট সঞ্চয়	৬৬০.০০
বৈদেশিক পুঁজি ঋণ ও সাহায্য	৪২০.০০
	১০৮০.০০

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সর্বমোট ব্যয়ের এক তৃতীয়াংশের বেশি অংশ অর্থাৎ শতকরা প্রায় ৩৯ ভাগ অর্থই বিদেশি পুঁজি, ঋণ বা সাহায্য লব্ধ অর্থ থেকে আসছে। কোন দেশের জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনার এক তৃতীয়াংশে ও বেশি বৈদেশিক অনুগ্রহের উপর নির্ভরশীল—এ কল্পনাও করা যায় না। বাস্তব অভিজ্ঞতায় লক্ষ্য করা গেছে যে, বৈদেশিক সাহায্যের উপর এই অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা প্রতি পদে পদে পরিকল্পনা রূপায়ণে দুর্লভ্যনীয় বাধার সৃষ্টি করেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ দফতর কর্তৃক নিয়োজিত বিশেষজ্ঞ কমিটির সম্প্রতি প্রকাশিত রিপোর্টে স্বীকার করা হয়েছে যে বৈদেশিক সাহায্যের অনিশ্চয়তা ও শর্তাবলী অনেক বড় পরিকল্পনার রূপায়নে বাস্তব অসুবিধার সৃষ্টি করেছে। তাঁদের আলোচনায় একথা স্পষ্ট করে বলা হয় যে, পাকিস্তানের দুই অংশের ভৌগোলিক ব্যবধানজনিত যে বৈশিষ্ট্য, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় তা সম্পূর্ণভাবেই অস্বীকৃত হয়েছে। ফলে দুই অংশের অসম বিকাশ জাতীয় অর্থনৈতিক কাঠামোর ভারসাম্য বিনষ্ট করে এক জটিল প্রক্রিয়ার সূচনা করেছে। বৈষম্য-নীতির পরিচয় দিয়ে লেখক আরো বলেন :

পাকিস্তানের মোট লোক-সংখ্যার শতকরা ৫৬ ভাগ পূর্ব-পাকিস্তানে। পাকিস্তানের মোট আয়তন হোল ৩৬৫ হাজার বর্গমাইল। এর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের আয়তন হোল ৫৪ হাজার ১৪১ বর্গমাইল। পূর্ব পাকিস্তানে প্রতি বর্গমাইলে লোক সংখ্যা হোল ৩১৫। এ অবস্থায় উভয় অংশের সম-বিকাশের স্বার্থে সমগ্র পরিকল্পনার শতকরা ৬০ ভাগই পূর্ব পাকিস্তানে কেন্দ্রীভূত হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু বাস্তবে সামগ্রিক জাতীয় উন্নয়নমূলক ও শিল্প-গঠনের শতকরা ৮০ ভাগই কেন্দ্রীভূত হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানে। দুই অংশের বিরাট ভৌগোলিক ব্যবধানের জন্য এক অংশ থেকে অন্য অংশে মাল ও শ্রম চলাচলের পূর্ণ স্বাধীনতা নেই। ফলে এক অংশের উন্নতি বা শ্রী বৃদ্ধি অন্য অংশে প্রতিফলিত হয় না। এক অংশের উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা অন্য-অন্য অংশের আয়বৃদ্ধিতে সহায়তা করে না। বস্তুত আজাদীর পর হতে দুই অংশের অর্থনৈতিক কাঠামো ভিন্ন ধরনে ও ভিন্ন গতিতে বেড়ে উঠছে। অন্য কোন দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থায় এমন বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় না।

পাকিস্তানের ক্ষেত্রে এ বৈশিষ্ট্য অস্বীকার করার ফলে আজাদী-উত্তরকালে পূর্ব পাকিস্তানের জীবন-যাত্রার মান ক্রমশঃ নিম্নমুখী হয়ে পড়েছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রাথমিক কাজ শুরু হয়েছে। পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় পাকিস্তানের সামগ্রিক ও সুসম বিকাশের স্বার্থে, স্বাধীন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতি গঠনের জন্য উপরোক্ত দুর্বলতাগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী কার্যকরী হবে বলে সকলেই আশা করেন। বিশেষ করে পূর্ব

পাকিস্তানের বিশেষ পশ্চাৎপদতার প্রতি লক্ষ্য রেখে নয়া পরিকল্পনা রচনা আজ অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।<sup>১৫</sup>

সার্বিকভাবে পত্রিকায় যে সুৰ ফুটে উঠেছে তা হলো উত্তরণ অসাম্প্রদায়িকতা, অবিভক্ত বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্যে আস্থাশীলতা, সাম্যবাদ, মানবতাবাদ এবং সাহিত্য শিল্পে উচ্চতর আদর্শের অনুরাগী সৃষ্টিশীলতার প্রবর্তক। সেকালে এরূপ সাহিত্য পত্রিকা প্রায়ই প্রকাশিত হতো না। পাকিস্তান আমলে যে মুষ্টিমেয় বাংলা সাহিত্যপত্রিকা জাতির গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাবলী নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে চেয়েছে—উত্তরণ তাদের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে।

### তথ্যপঞ্জি

১. সম্পাদক ডক্টর এনামুল হক ১৫.০৬.৯১ তারিখের এক আলোচনায় বর্তমান গবেষককে জানান ‘১৯৬১ সনের প্রেস এণ্ড পাবলিকেশনস রুলস-এ পত্রিকা প্রকাশের জন্য নতুন করে পারমিশন নেবার দরকার হলো। আমাকে পাকিস্তান-বিরোধী প্রগতিশীল (বামপন্থী) সাহিত্য-সাংস্কৃতিক কর্মী মনে করা হতো (সরকারী দৃষ্টিতে) বলে ডিআইবি রিপোর্টের প্রতিবন্ধকতার কথা বলে উত্তরণের ডিক্লিয়ারেশন নবায়ন করা হলো না। পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেলে।’ এই ঘটনার পর তিনি ব্যারিস্টার ড. আলীম আল রাজ্জীকে আইনজীবী নিয়োগ করে ‘রীট’ এর জন্য নোটিশ দিলেন যে প্রকাশক অর্থাৎ আলীম আল রাজ্জীকে পাক, পাশ, যোগ্য ব্যক্তি—কেনো পত্রিকার ডিক্লিয়ারেশন দেয়া হবে না। ইন্তেফাকে সিরাজউদ্দিন হোসেন সাহেবের নিকট গেলেন ‘উত্তরণ’ বন্ধের একটা সংবাদ প্রকাশের জন্য—কিন্তু তিনিও বললেন : “আমাদের পত্রিকাটি (এই ধরনের নিউজ প্রকাশের, সরকারের সমালোচনা করার অপরাধে) বন্ধ হয়ে যাক, এটা চাই না।” ডি. আই. বি.-র লোকেরা সম্পাদককে ডেকে নিয়ে মামলা না-করার জন্য চাপ সৃষ্টি করলেন। বঙ্গেন, “রাজনীতি না-করলে জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে লড়াই সমীচীন হবে না।”
২. আবুল ফজল এর এই রচনাটি তাঁর ‘নির্বাচিত প্রবন্ধ সংকলন’ (১৯৮১) গ্রন্থে সংকলিত আছে। ‘উত্তরণ’ ২ বর্ষ, ১ সংখ্যা, ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৬৬ তে প্রথম মুদ্রিত হয়।
৩. উত্তরণ, ২ বর্ষ ১ সংখ্যা ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৬৬, পৃ. ৮।
৪. সম্পাদকের সঙ্গে (২১. ৬.৯১) আলাপ থেকে।
৫. ‘তের নশ্বরে পাঁচ-বছর’ গ্রন্থের লেখক সাদত আলী আখন্দ ‘শ্রিয় ডক্টর সাহেব’ সস্বোধনপূর্বক চিঠি লিখে ‘উত্তরণ’ এ তাঁর ‘তের নশ্বরে পাঁচ বছর’ ছাপার জন্য অনুরোধ জানান। উল্লখ্য, তখন ‘উত্তরণ’ সম্পাদক এনামুল হক ‘ডক্টর’ হননি। আখন্দ সাহেব মনে করতেন এই পত্রিকার সম্পাদক প্রখ্যাত ভাষাতাত্ত্বিক, কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের এককালীন মহা-পরিচালক (তখন ‘পরিচালক’ বলা হতো) ‘মুসলিম বাংলা সাহিত্য’ গ্রন্থের প্রণেতা ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক। তাছাড়া এমন উন্নততর পত্রিকা আর কোন্ এনামুল হক সম্পাদনা করতে পারেন? সম্পাদক এনামুল হক সাক্ষাৎকারে, গল্পচ্ছলে একথা জানান।

কাজী আবদুল ওদুদ আবুল ফজল সাহেবকে ব্যক্তিগত চিঠিতে লিখে জানান, ‘চমৎকার হয়েছে। (লেখা চিত্র, বইঘর, চট্টগ্রাম, ১৯৬৫, পৃ ৩৫৩ প্রঃ)। আবদুল মান্নান সৈয়দ ‘শিল্পতরু’ পত্রিকায়, আর শামসুর রাহমান ‘মূলধারা’ পত্রিকায় (‘জনাস্তিক’ শামসুর রাহমানের কলাম, মূলধারা, প্রধান সম্পাদক শামসুর রাহমান, বর্ষ ১, সংখ্যা ১১, ১১ মার্চ, ১৯৯০, রবিবার) লিখেছেন : “সত্যি কথা বলতে কী সেকালে ‘উত্তরণ’ের মতো সাহিত্য সংকলন পূর্ব বাঙলায় প্রকাশিত হয়নি। তরুণ সম্পাদকের শ্রম ও নিষ্ঠার জন্যই অমন সুন্দর এবং উন্নতমানের সংকলন ছাপা হয়েছিলো। রীতিমতো সাড়া জাগিয়েছিলো ‘উত্তরণ’।”

৬. আবুল ফজল 'রেখাচিত্র' (১৯৬৫) তে উত্তরণকে প্রগতিশীল মাসিক পত্রিকা উল্লেখ করে 'শিল্পীর স্বাধীনতা' প্রকাশের কাহিনী বিবৃত করেছেন ৩৫৪ পৃষ্ঠায়।
৭. ড. এনামুল হক তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকার কালে বলেন।
৮. তৃতীয় বর্ষের বর্ষশুরু বিশেষ সংখ্যার সম্পাদকীয়, 'উত্তরণ' ভাদ্র, ১৩৬৭।
৯. দ্বিজেন শর্মা, 'ধর্ম জাতি আমরা'; উত্তরণ, ১ বর্ষ ১ সংখ্যা, ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৬৫।
১০. সাক্ষাৎকার (২১.০৬.৯১)-এ সম্পাদকের প্রদত্ত তথ্য অবলম্বনে।
১১. মনসুর মুসা, পূর্ব বাংলার উপন্যাস, ঢাকা ১৯৭৪, পৃ. ৯২।
১২. সম্পাদকীয়, উত্তরণ, বর্ষ শুরুর সংখ্যা, ৩ বর্ষ, ভাদ্র ১৩৬৭।
১৩. মনসুর মুসা, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০২।
১৪. টিপু সুলতান, 'অনুবাদ সাহিত্য প্রসঙ্গ'; উত্তরণ, ১ বর্ষ ১ সংখ্যা পৃ. ৬-৯।
১৫. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, (শহীদুল্লাহ কায়সার), প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ব্যর্থতা কোথায়? উত্তরণ, ১ বর্ষ, ১ সংখ্যা, পৃ. ৪২-৪৫।

## ১০. পলিমাটি

(১৯৬৪-৯৪)

ষাটের দশকের তরুণ কবি, ফজলুল হক সরকার (১৯৪৪) সম্পাদিত ব্যতিক্রমী সাহিত্যসাময়িকী ‘পলিমাটির’ প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৭৩ বঙ্গাব্দের ‘বসন্ত’ ঋতুতে ; একুশে ফেব্রুয়ারির ভাষা-শহীদদের স্মৃতি-সংখ্যারূপে ‘কালের যাত্রার ধ্বনি’ শোনাবার ব্যাকুল আগ্রহে। কালের হিসাবে কবে তৎকালীন পূর্ববঙ্গের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সামাজিক পরিবেশ লক্ষ্য করলে দেখা যায়, ১৯৬৬ সনের ফেব্রুয়ারিতে ছয় দফা আন্দোলন আরম্ভের সমকালে প্রচলিত সমাজব্যবস্থা, রীতি নীতি, বৈষম্যে বিক্ষুব্ধ দেশ প্রেমিক প্রতিবাদী তরুণ সমাজের মুখপত্ররূপে যখন ‘পলিমাটি’ আবির্ভূত হলো,—তখন, এদেশে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র রাশিয়া ও চীনের লাল-হলুদ মলাটের বই প্রচুর আমদানী হচ্ছে, আর মার্কসীয় মতাদর্শের প্রভাব বাঙলার তরুণ সমাজে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

এদেশের তরুণ সমাজ স্বপ্ন দেখছেন শোষণহীন, সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থায় স্বস্তির-শান্তির-সৃষ্টিশীল একটি আধুনিক রাষ্ট্রের। মার্কস এঙ্গেলস মাওসেতুঙের মহান আদর্শ অনুসরণ করে তরুণতর রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক কর্মীদের যে-অংশের মধ্যে শ্রেণী-সংগ্রাম আর উৎপাদন ব্যবস্থার এবং জনগণের সাংস্কৃতিক স্বাধিকারের প্রশ্নের বিশ্লেষণ-সমালোচন প্রবল উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল—তাদেরই কতিপয় আবুল কাসেম ফজলুল হক, রফিক আজাদ, রফিকুল আলম খান, গোলাম সারোয়ার, মাহবুবউল্লাহ, বুলবুল খান মাহবুব, হুমায়ুন আজাদ, হুমায়ুন কবীর, মনসুর মুসা, আলাউদ্দীন খান, আজিজুল হক প্রধান, জুলফিকার মতিন, আকরম হোসেন, আহমদ ছফা প্রমুখ পলিমাটিকে ঘিরে আপন আপন স্বকীয় অনুভূতি উপলব্ধিজাত কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প প্রভৃতি প্রকাশের মাধ্যমে স্বদেশহিতের লক্ষ্যে এককালে সংঘবদ্ধ হয়েছিলেন।

এর উদ্যোক্তা রচয়িতাদের সকলেই প্রায় তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা বিভাগের মেধাবী ছাত্র। কেউবা সদ্য সমাপ্ত করেছেন ছাত্রত্ব। এঁদের তেমন মুরব্বী ছিলেন না। কিন্তু কতিপয় শিক্ষক (শহীদ মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী প্রমুখ) সসুহ-উৎসাহ দিতেন তাঁদের মনের, বিবেকের স্বতঃস্ফূর্তসারিত প্রেরণাবশে। তবে সাধারণভাবে পলিমাটির কবি-লেখকেরা সমাজের মুরব্বী-প্রবীণ, কায়েমী স্বার্থী, প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদদের ভূমিকার প্রতি পোষণ করতেন প্রবল ঘৃণা, বিতৃষ্ণা আর অশ্রদ্ধা। ফলে পাকিস্তান সরকারের তৎকালীন পরবাস্তব নীতিতে আমূল পরিবর্তন সংঘটনের ফলে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের সঙ্গে সৌহার্দ্য-বন্ধুত্ব স্থাপনের কার্যধারা গহিত হলেও এই তরুণেরা প্রবীণ বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা সাদরে অভিনন্দিত হননি, প্রকৃত সমাজ-সমালোচনামূলক প্রতিবাদী রচনা প্রকাশের জন্য তাঁদের কাছে ওঁরা পরিহার্য হয়ে পড়েছিলেন। কারণ, বুদ্ধিজীবী-সমাজে আত্মবিক্রয়, আপোষকামিতা এবং সামাজিক স্বার্থে যথোপযুক্ত ভূমিকা পালনে চরম ব্যর্থতা আর যুগোপযোগী উন্নতমানের সাহিত্য সৃষ্টি করতে অক্ষম লেখকদের মেধা শূন্যতার স্বরূপ উন্মোচন পূর্বক সংগ্রামের

মাধ্যমে সুখী, সুন্দর শোষণহীন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দৃঢ় শপথ উচ্চারিত হয়েছিল পলিমাটিতে।

জনমনের হতাশা ব্যর্থতা এবং সামাজিক অবক্ষয়ের চিত্র এতে তুলে ধরতে প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধিজীবীদের নিন্দনীয়-ভূমিকা প্রকট হয়ে উঠেছিল। তাতে তাঁদের সামাজিক অবস্থান নড়বড়ে হয়ে পড়বার সম্ভাবনা দেখা দেয়। এঁদেরই ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা এবং অযোগ্যতার ফলে সমাজের অভ্যন্তরে চিন্তা, বুদ্ধিবিবেক যুক্তি, নৈতিকতা, চারিত্রদৈন্য, স্থলন পতন সমাজকে ধ্বংসের মুখোমুখি নিয়ে গিয়েছিল। অথচ এ অবস্থার অবসানের লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ, মহৎ, সৃষ্টিশীল কোনো সামাজিক, সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক উদ্যোগ মাথা চাড়া দিয়ে উঠছিলো না। এমনি পরিস্থিতিতে পলিমাটির আবির্ভাব আন্তরিক উদ্যোগ হিসেবে অবশ্যই মহৎ। কিন্তু ক্ষীণ-সামর্থের বিলম্বিত প্রকাশের অনাড়ম্বর আয়োজনের পলিমাটি অনেকের কাছে হয়ত অনভিজাত পত্রিকা বিবেচিত হতে পারে।

পলিমাটির লেখকেরাই ছিলেন এর প্রধান উদ্যোক্তা। সবাই প্রায় নিম্ন ও মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান। কেবল প্রবল উৎসাহের ফলেই কারো পকেটের পয়সায়, কারো উপর্যুপরি পীড়াপীড়ির ফলে সংগৃহীত ক্ষুদ্র-ব্যবসায়ী এবং সাধারণশ্রেণীর সমাজসেবীদের দেয়া সৌজন্যমূলক বিজ্ঞাপনের পয়সায় পলিমাটি প্রকাশিত হয়েছিল। অবশ্য স্বাধীন বাংলাদেশ আমলে সম্পাদক ফজলুল হক সরকার নিজস্ব যোগ্যতায় একক উদ্যোগে পলিমাটিকে সুন্দর স্বাস্থ্যোজ্জ্বল করে দীর্ঘ-বিলম্ব অনিয়মিতভাবে হলেও পলিমাটি প্রকাশ করে ছিলেন।

উদ্যোক্তারা উপলব্ধি করেছিলেন নিজস্ব পত্রিকা ছাড়া স্বকীয় চিন্তা প্রকাশ করা যায় না। আর লেখকের নিজের ও স্ব-সমাজের যুগ-চাহিদার কথা অকপটে প্রকাশের জন্য চাই একটি নিজস্ব প্রকাশ-মাধ্যম। ক্ষীণকায় পলিমাটি তাই একদল তরুণের অভিপ্রায়ে জন্ম নিয়েছিল। সদস্যরা কেউ লেখা দিয়ে, কেউবা পরামর্শ, উৎসাহ, মুদ্রণকাজে এবং অর্থসংগ্রহে সহযোগিতা দিয়েছিলেন।

‘কণ্ঠস্বর’ এর সমসাময়িক কালে প্রকাশিত ‘পলিমাটি’ চিন্তা-চেতনা ও আদর্শগত দিক দিয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের ছিল। সমাজ ভাবনা ও সাহিত্যচিন্তার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টি ভঙ্গির পরিচয় দিলেও পত্রিকাটির মূল্য-নির্ধারণের কোনো প্রয়াস এ পর্যন্ত চোখে পড়েনি। পলিমাটির প্রয়াসকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু ১৯৬৬ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত প্রকাশিত পাঁচটি সংখ্যা<sup>১</sup> একত্রে মিলিয়ে পড়লে যে কথাটি স্পষ্ট হয়, তা হচ্ছে—পূর্ববাঙলার তৎকালীন বুদ্ধিজীবী সাংস্কৃতিকর্মী ও সাহিত্যসমাজের তরুণকর্মীদের ভাবনা-চিন্তার একটি দলিল হয়ে রয়েছে পলিমাটি। বুদ্ধিজীবী, চিন্তাশীল বাঙালি নাগরিক সদস্যরা ষাটের দশকের শেষার্ধে বাংলাদেশের মুক্তি ও অগ্রগতির জন্য কিছু চিন্তা করেছিলেন কিনা অথবা করলো, তাঁদের চিন্তার স্বরূপ কী ছিল—তার চিত্র তুলে ধরে বলেই আজ পলিমাটির স্বতন্ত্র গুরুত্ব স্বীকৃত হবে। আজকের পাঠকের কাছে তথ্যের কারণেই পলিমাটি অশেষ কৌতূহলের ও অনুসন্ধানের বিষয় হয়ে উঠেছে।

সাধারণ প্রচ্ছদ, সাদা কাগজের (৪৮ পৃষ্ঠার ১/১৬ ডিমায়ে সাইজ) ক্ষীণাকৃতির পলিমাটির প্রথম সংখ্যায় বলা হয় এটি 'একটি সাহিত্য সংকলন। ভাবে বেদনায় উজ্জীবনে অন্তঃসার প্রার্থনায় উন্মোচিত স্বাধিকারের প্রার্থক মড়কতুর আলিঙ্গনে বছরে বার কয়েক ফসলী'। কিন্তু একবারের বেশি বছরে কখনোই প্রকাশিত হতে পারেনি। লক্ষণীয় পলিমাটিতে কথা বলার স্বতন্ত্র স্টাইল ছিল অনেকটা কণ্ঠস্বরের মতো। কিন্তু এর বক্তব্য ও উদ্দেশ্য ছিল আরও উন্নত এবং সমাজতান্ত্রিক আদর্শে উচ্চকিত। পলিমাটির লক্ষ্য-আদর্শ সম্পর্কে কাব্যের ভাষায় সর্বপ্রথম সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠাতেই বলা হয় :

'পলিমাটি তাদের সাথে আপোষহীন/ যারা কাব্য কলাকে/ যৌন-সর্বস্ব টেডিনীরূপে দেখতে চায়। অথবা যারা কালো বোরখা পরিয়ে পর্দানশীল করতে চায়'।

'যে বিশ্বাস পলিমাটিতে উত্ত' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে (গদ্য-কবিতার মত সাজিয়ে) বলা হয় :

যারা আদর্শহীন উর্গামী/ যারা কম্পনায় জরগন্ত বিবস্ত্র/ চিন্তায় পারস্পর্ষহীন লেখায় অসংযত/ যারা আত্মহনে উন্মুখ/ সদা চঞ্চল এবং অভিপ্রায়হীন/ যান্ত্রিকতায় ক্ষতবিক্ষত পংগু/ যারা জীবন বিমুখ দুর্বোধ এবং উন্নাসিক/ সেসব বিকৃত লেখকদের জন্য পলিমাটি নয়/—যারা অনাদৃত অপ্রতিষ্ঠিত অথচ অকপট প্রতিশ্রুতিশীল/ যারা চিন্তায় ধ্যানে কর্মে সমন্বিত স্বনিষ্ঠ/ যারা জীবন জিজ্ঞাসায় উদ্বুদ্ধ উত্তপ্ত অথচ সংযত/ যারা উৎসাহিত আহত অথচ সংগ্রামী/ যারা প্রেমে ব্যর্থ অথচ অকুণ্ঠ/ যারা স্বভাবে উন্মত্ত কিন্তু/ আত্মবিশ্বাসী এবং অধিকার-সচেতন/ যারা স্বাধীন এবং নিষ্ঠীক/ তারাই পলিমাটির লেখক।

সূচীপত্রের পৃষ্ঠায় আরো লেখা ছিল :

এদেশ আমার গর্ব/ এ মাটি আমার কাছে সোনা/ এখানে মুক্তির লক্ষ্যে হয় মুকুলিত/ আমার সহস্র সাধ সহস্র বাসনা।

পলিমাটির প্রথম সংখ্যায় (১৩৭৩) আবুল কাসেম ফজলুল হক লিখেছিলেন প্রবন্ধ, 'ক্রান্তিকাল : সংস্কৃতি ও সাহিত্য' এবং মাহবুব উল্লাহ 'সংস্কৃতি ও শ্রেণীসংগ্রাম'। কবিতা লিখেছিলেন বুলবুল খান মাহবুব, ফজলুল হক সরকার, হুমায়ুন আজাদ, অজামিল বণিক, আলাউদ্দিন খান এবং আজিল হক প্রধান। প্রকাশনায় রফিকুল আলম খান, প্রচ্ছদ অঙ্কনে গোলাম সারোয়ার এবং সহযোগিতায় বেগম আসমা রব্বানী, সাব্বির আহমদ চৌধুরী এবং আবুল কাসেম ফজলুল হক। মুদ্রণে আল ইসলাম প্রেস, ১৪ ফ্রি স্কুল স্ট্রিট, ঢাকা। পৃষ্ঠা ৪৮। দ্বিতীয় সংখ্যার (১৩৭৪ ; বর্ষা) প্রচ্ছদ আঁকেন আবদুল হাই। মুদ্রিত হয় স্বপন আর্ট প্রেস, হাজী ওসমান গনি রোড, নওয়াবপুর, ঢাকা-১ থেকে। প্রকাশের ঠিকানা দেওয়া হয় ৭ সার্কুলার রোড, ধানমণ্ডি, ঢাকা-২। স্বপন আর্ট প্রেস ও আলম প্রিন্টিং প্রেস, ২১, মীরপুর রোড, ঢাকা থেকে কে. এম. বদরুদ্দোজা কর্তৃক মুদ্রিত।

দ্বিতীয় সংখ্যার মূল্য ছিল পঞ্চাশ পয়সা। পৃষ্ঠা ৪৮। প্রথম সংখ্যার কোন মূল্য ধরা হয়নি। দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রবন্ধ লেখেন আবুল কাসেম ফজলুল হক—'প্রত্যশার পৃথিবী'। একমাত্র গল্পকার জিয়াউল হক (নিরুত্তাপ অঙ্ককারে) ; নাটক লেখেন সাদিকীন (বিষুব রেখা) ; আর কবিতা লেখেন : সৈয়দ আকরম হোসেন ; আজিজুল হক প্রধান, আলাউদ্দিন খান, ফজলুল হক সরকার, আবু জাফর আবদুল্লাহ এবং বুলবুল খান মাহবুব।



তৃতীয় সংকলন (১৩৭৫) টি ৭৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়। দাম এক টাকা। এবারও মুদ্রণালয় পরিবর্তিত হয়। মুদ্রক সাদিকীন, অন্তরীপ মুদ্রণালয়, ২৫৫ জগন্নাথ সাহা' রোড, ঢাকা-১। আবুল কাসেম ফজলুল হকের 'কালের যাত্রার ধ্বনি' শীর্ষক বিখ্যাত দীর্ঘ প্রবন্ধটি এই সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। গল্প লেখেন জিয়াউল হক, সাঈদুর রহমান সাঈদ। গ্রন্থ সমালোচনা করেন মনসুর মুসা ও ফজলুল হক সরকার (যথাক্রমে বুলবুল খান রচিত 'রক্তের কারুকার্য' শীর্ষক কবিতার সংকলন এবং মুহম্মদ হাবীবুর রহমান সম্পাদিত 'রবীন্দ্রনাথ ও পূর্ব পাকিস্তান' শীর্ষক সাম্প্রদায়িক মনোভাব পুষ্ট পুস্তিকার। কবিদের তালিকায় রয়েছে : মোহাম্মদ রফিকউজ্জামান, নাসিরুল ইসলাম, জিয়াদ আলী, হুমায়ুন কবীর, আহমদ ছফা, কে. মুশতাক এলাহী, সাদিকীন, এবং ফজলুল হক সরকার।

পলিমাটির পঞ্চম সংকলন প্রকাশ পায় ১৩৭৭ সনের বসন্তে। প্রকাশনায় বেগম খালেদা সরকার, ৫১ ফ্রি স্কুল স্ট্রীট, কাঁঠাল বাগান, ঢাকা-২। প্রচ্ছদের শিল্পী : গোলাম সারোয়ার। মুদ্রণে লতিফ আর্ট প্রেস, ২২/২ শেখ সাহেব বাজার, ঢাকা-২। দাম এক টাকা। পৃষ্ঠা ৮৫। ফজলুল সরকারের দীর্ঘ নাটক 'দাবী' ; সেলিনা হোসেন (বিমূর্ত) ও নূরউদ্দীন আহমদ (শুভলগ্ন) এর গল্প এবং আবুল কাসেম ফজলুল হকের 'পূর্ব বাঙলার সাংস্কৃতিক অঙ্গন', সামসুল আলম এর 'একুশের প্রেক্ষিতে কতিপয় প্রসঙ্গ' শীর্ষক প্রবন্ধ এতে ছাপা হয়। কবিতা লেখেন জুলফিকার মতিন, প্রদীপ বড়ুয়া, রাবেয়া বেগম রোজী এবং রাজিয়া মীর।

'পলিমাটির' রচনাগুলোতে পূর্ববাঙলার প্রচলিত সমাজব্যবস্থাকে অবক্ষয়াক্রান্ত ক্রান্তিকাল চিহ্নিত করে সচকিত হয়েছে এই বক্তব্যে : জীবনের এই প্রলয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সর্বনাশের মুখোমুখি হয়ে আমাদের আজ করণীয় কী? মানব জীবনের স্বাভাবিক ধর্ম এবং বৈশিষ্ট্যসমূহ বজায় রেখে জীবনধারণ করতে গেলে সমাজ প্রবাহের আশ্রয় ছাড়া বিচ্ছিন্ন হয়ে ব্যক্তির পক্ষে এককভাবে বসবাস করা সম্ভব নয়। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষেরা 'ক্রান্তিলগ্নের অস্থিরতায় দাঁড়িয়ে প্রায় সকলেই সমাজ রক্ষার প্রয়োজনকে অস্বীকার করে ব্যক্তিগতভাবে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছে। কেউই বুঝতে চেষ্টা করছে না যে, ব্যক্তিজীবনের সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনা তথা জীবন-উপলব্ধি ও জীবন-ভাবনা সমাজ-প্রবাহের বিভিন্ন স্তরের অবস্থা-ব্যবস্থা দ্বারাই কালে কালে নিয়ন্ত্রিত হয়ে আসছে। আমাদের বর্তমান জীবন-যন্ত্রণা ও জীবন-বিকৃতির কারণও সমাজ-প্রবাহের বর্তমান স্তরের অব্যবস্থাই।'

সমগ্র বিশ্বজুড়েই যুগ-সংক্রান্তির সংকট সম্প্রসারিত হয়েছে। এবং "বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে মুক্তিকামী জনগণের সংগ্রামের রূপ নিয়ে এই সংকট আজ অস্তিত্বশীল। মুক্তি-সংগ্রামে শোষিত জনগণের চূড়ান্ত জয় লাভের পূর্ব পর্যন্ত এই সংকটের কালো মেঘ দূর হবে না।...সমাজ বিকাশের যে স্তরে এখন আমরা আছি তাতে মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞান যতটুকু অগ্রসর হয়েছে তার ওপর নির্ভর করে এটা উপলব্ধি করা যায় যে মানুষের সুখ শান্তি এবং কল্যাণের জন্য শ্রেণীহীন সমাজের প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য।"<sup>২</sup>

শ্রেণী সংগ্রামের জন্য সংস্কৃতির অপরিহার্যতা প্রসঙ্গের আলোচনায় মাহবুবউল্লাহ বলেন :

স্বাধীনতা উত্তরকালে পাকিস্তানের ঐতিহাসিক বিকাশের দিকে লক্ষ্য করলে আমরা সেই একই সত্যকে উপলব্ধি করতে পারি 'সংস্কৃতি শ্রেণী সংগ্রামের শক্তি হাতিয়ার'। স্বাধীনতা লাভের পর এদেশের শাসন ক্ষমতা চলে যায় পুঁজিপতি ও সামন্ত শ্রেণীর হাতে। তাও আবার অবাঙালি পুঁজিপতি ও সামন্ত শ্রেণীর প্রত্যক্ষ কর্তৃত্বে। ফলত বাঙালি পুঁজিপতিদের আশা-আকাঙ্ক্ষা অনেকাংশেই অপূর্ণ থেকে যায়। এই শ্রেণীর অর্থনৈতিক স্বার্থ ও পূর্ব বাঙলার আপামর শোষিত জনগণের পুঞ্জীভূত ক্রোধই ভাষা-আন্দোলনের বাস্তব ভিত্তি জুগিয়েছিল। ভাষার সংগে সমগ্র বাঙালি সংস্কৃতির অস্তিত্বের প্রশ্নটি জড়িত। যে জাতির সংস্কৃতি বিকৃত হয়ে যায়—সে জাতি নিবীৰ্য ও ম্রিয়মান হয়ে পড়ে। উপনিবেশবাদের যুগে সাম্রাজ্যবাদীরা উপনিবেশিক জাতিগুলোর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিনষ্ট করেই তাদের শাসন ও শোষণ অব্যাহত রেখেছে যুগযুগ ধরে। ঠিক একই কারণে বাঙালি জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার ও স্বায়ত্তশাসনের সংগ্রামে বাঙালি সংস্কৃতি এক সুমহান প্রেরণার উৎস। শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর নেতৃত্ব ভিন্ন সংগ্রামে চূড়ান্ত বিজয় অসম্ভব। এখানকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থনৈতিক শ্রমিকশ্রেণীর আদর্শের হাতিয়ার মার্কসবাদ ও লেনিনবাদের সৃজনশীল প্রয়োগেই এ সংগ্রামের বিজয় সুনিশ্চিত হতে পারে।<sup>৩</sup>

পত্রিকাটি সমাজ এর প্রতি লক্ষ্য রেখে উচ্চারণ করে,—প্রত্যাশার পৃথিবীর সৃষ্টিকে অবশ্যজ্ঞাবী করে তুলতে হলে সুস্পষ্ট আদর্শকে বাস্তবায়িত করার জন্য সংগ্রাম করতে হবে—যে কোন প্রকারের চূড়ান্ত সংগ্রামের মধ্যদিয়ে অগ্রসর হতে হবে। সাম্রাজ্যবাদী ধনবাদী সামন্তবাদী পাপসমূহের সঙ্গে এই প্রশ্নে কোন প্রকার আপোষ চলতে পারেনা। সুস্পষ্ট আদর্শের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে, অতীত আবর্জনার বোঝা মাথায় তুলে নিয়ে প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের সঙ্গে আপোষ করলে তা আদর্শের প্রতি, বিশ্বাসের প্রতি ঘাতকতারই নামান্তর। প্রতিক্রিয়াশীল চক্র কোনদিনই এমন উদার হতে পারে না যে ঔদার্যবশত তারা প্রগতির শাস্তির হাতে তাদের ক্ষমতাকে তুলে দেবে। প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে সত্যিকার প্রগতির সংগ্রাম আপোষহীন।<sup>৪</sup>

'কালের যাত্রার ধ্বনি' প্রবন্ধে লেখক বাংলাদেশের সাহিত্যের সমালোচনায় উচ্চকিত হয়ে বলেন :

পূর্ববাঙলার সাহিত্য পরিবেশের পরিবর্তন সাধন করতে হবে—আমূল পরিবর্তন। বাঙলা সাহিত্যে নতুন ধারা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে কল্পনালব্ধ প্রচেষ্টা ও Sad generation-এর প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে থাকলেও বিশেষত Sad generation এর প্রচেষ্টার ফলে পূর্ব বাঙলার অভিজাত সাহিত্যের অঙ্গনে বর্তমানে এমন একটি সামাজিক মনোভূমি প্রস্তুত হয়েছে যে, এই শ্রেণীর তরুণ সাহিত্যিকেরা সাম্রাজ্যবাদী সামন্তবাদী পুঁজিবাদী ও অবিশ্বাসবাদী ধ্যান-ধারণার মোহ থেকে সম্পূর্ণ রূপে মুক্ত হয়ে জীবনের অন্তর্নিহিত শিল্পানুসন্ধিৎসাকে চরিতার্থ করার সুস্পষ্ট লক্ষ্য নিয়ে নতুন ধারার সাহিত্যের গোড়া পত্তন করতে পারেন। কিন্তু নতুন ধারার গোড়া পত্তন করতে হলে অবশ্যই তাঁদের শ্রেণীগত ভূমিকা বদলাতে হবে এবং বিগত যুগের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণরূপে পরিহার করে এ যুগের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে। যুগে ধরা অভিজাত শ্রেণী ত্যাগ করে তাঁদের নেমে আসতে হবে জনগণের ভূমিকায়। অভিজাতের ভূমিকায় দাঁড়িয়ে জনগণের কল্যাণ সাধনের কথা বললে চলবেনা। অভিজাত শ্রেণীর আশা-আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে লালন করে জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিনিধিত্ব করতে চাইলে জনগণ গ্রহণ করবে না, বর্জন করবে।<sup>৫</sup>

লক্ষ্য করলে দেখা যায়—পূর্ব বাঙলার সাহিত্যের উন্নতির জন্য 'পলিমিটির' রচয়িতাদের চিন্তার মূল্য অপরিমীম। উপযুক্ত প্রবন্ধে লেখক পূর্ববাঙলার সাহিত্য-পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে

মন্তব্য করেন সৎ সমালোচনা বড় সমালোচক ও নতুন মানদণ্ড খুব আবশ্যিক ; আমাদের সাহিত্যকে সঠিক পথে বিকশিত করার সহায়ক হিসেবে সৎ-সমালোচনার প্রয়োজন আজ প্রকট। শিল্প সাহিত্যের মূল্য বিচারের বেলায় সব সময়ই দুটো দিকের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। একটি শিল্পকর্ম ও সাহিত্য কর্মের আদর্শগত দিক এবং অপরটি তার শৈল্পিক দিক। আদর্শগত দিককে বাদ দিয়ে কেবলমাত্র শৈল্পিক দিক বিচার করলে সে সমালোচনা হবে অসম্পূর্ণ। কোন বিশেষ আদর্শকে কোন ব্যক্তি অস্বীকার করতে পারেন,—কিন্তু এই অস্বীকারের পরও নতুন আদর্শকে অবলম্বন করার কিংবা নতুন আদর্শের অনুসন্ধান করার প্রয়োজন থেকে যায়।

প্রত্যেক শিল্পকর্মেই কোন না কোন আদর্শের কিংবা আদর্শের অনুসন্ধানের কিংবা অবিশ্বাসবাদের পরিচয় প্রকাশ পায়। তাই তার মূল্যায়নের সময় সেই প্রচ্ছন্ন কিংবা স্পষ্ট আদর্শেরও মূল্যায়ন অপরিহার্য। যে সাহিত্য আদর্শগত দিক থেকে প্রতিক্রিয়াশীল অথচ শৈল্পিক বিচারে উৎকৃষ্ট তা কখনও উৎকৃষ্ট সাহিত্যের মর্যাদা লাভ করতে পারেনা। তেমনি যে সাহিত্য শৈল্পিক দিক থেকে নিকৃষ্ট অথচ আদর্শগত দিক থেকে প্রগতিশীল তাও উৎকৃষ্ট সাহিত্যের মর্যাদা লাভ করতে পারে না। আমাদের যা কাম্য তা হচ্ছে যথার্থ আদর্শ ও শৈল্পিক সৌন্দর্য—এ দুয়ের সার্থক সমন্বয়। এই সমন্বয় সাধনের জন্য আবশ্যিক মূল্যবিচারের নতুন মানদণ্ড নির্ধারণ, পুরাতন মানদণ্ড বর্জন। আমাদের সমাজে মূল্য বিচারের পুরোনো মানদণ্ড এখন আর কার্যকরী থাকার যোগ্য নয়।—একথা সমাজ ও ব্যক্তি জীবনের আর সব ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য তেমনি সাহিত্যের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য।<sup>৬</sup>

পূর্ব বাঙলার সাংস্কৃতিক জগতের ঐতিহাসিক চিত্র অঙ্কিত আছে পলিমাটির পঞ্চম সংকলনে। ‘পূর্ববাঙলার সাংস্কৃতিক অংগন’ বিভক্ত ছিল সাম্প্রদায়িক ও অসাম্প্রদায়িক দুইটি দলে। উপযুক্ত প্রবন্ধের লেখক বলেন, যারা পাকিস্তান সরকারের সহযোগী হিসেবে বাঙালির স্বার্থের বিরুদ্ধে ধর্মের নামে সবকিছু করেছেন তাঁরা নিজেরাই ছিলেন না যথার্থ ধার্মিক। ইসলামকে তাঁরা ব্যবহার করেছেন হীন উপায়ে নিজেদের স্বার্থ হাসিলের একটা হাতিয়ার হিসেবে। স্বাধীনতার (১৯৪৭) পরে দীর্ঘকাল ধরে তাঁরা জনবিরোধী, প্রতিক্রিয়াশীল সরকারের উচ্ছিষ্ট লাভের জন্য ছুটোছুটি করেছেন।

অসাম্প্রদায়িক দল প্রথম পর্যায়ে সাম্প্রদায়িকদের সহযোগিতায় পাকিস্তানি সরকারের অপকর্মের বিরুদ্ধে গৌরবজনক ভূমিকা গ্রহণ করলেও ‘আইউব-মোনেম আমলে’ তাঁদের ভূমিকা মোটেই প্রশংসার যোগ্য নয়। আইউবী-সৈরাচার, পাশবিক নিপীড়ন-নির্যাতনের সময় এঁরা কোনো প্রতিবাদ জানানো তো দূরের কথা, কোন প্রকার অসহযোগিতা পর্যন্ত প্রদর্শন করেননি... তাঁদের সহযোগিতা ভিন্ন স্বৈরশাসন দীর্ঘদিন টিকে থাকত পারত না। বিবেকের বাণী যারা এই সময় উচ্চারণ করেছেন, তাঁদের সংখ্যা ছিল নগণ্য এবং তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন তরুণ। এই জন্যই তা কোন সংগঠিত প্রয়াস হিসেবে দাঁড়াতে পারেনি।

কিন্তু পূর্ব বাঙলার নতুন জীবন-প্রবাহ, সৃষ্টিশীল সুখী সমাজ-ব্যবস্থা ‘প্রবর্তনের জন্য দরকার নতুন সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন’। পূর্ববাঙলার জনগণের কঠোর

তুলে ধরে বলা হয় তাদের আজ মূলত দুটি দাবী—“এক. সাম্রাজ্যবাদী ও অপর সকল বহিরশক্তির রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সকল প্রকার শোষণ ও নিয়ন্ত্রণ থেকে পূর্ব বাঙলাকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করতে হবে। অপরটি হল—পূর্ব বাঙলার বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার বিলুপ্তি ঘটিয়ে এমন একটি সমাজব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে যাতে মানুষের ওপর মানুষের শোষণ নিপীড়ন আধিপত্যও বিলুপ্ত হবে এবং অন্যায়মুক্ত, অভাবমুক্ত এক নতুন সমাজ ও জীবন প্রতিষ্ঠিত হবে।” জনগণের এই দুটি দাবী কিভাবে বাস্তবায়িত হতে পারে তার জন্য সমাজের চিন্তাশীল অংশের ‘সামাজিক দায়িত্ব’ পালন করার জন্য পলিমাটির সাহিত্যপ্রয়াস ছিল তৎপর। তাঁরা স্পষ্টতই উচ্চারণ করেন : “আমাদের বাংলা ভাষা চর্চা এবং চর্চার সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা অবশ্য কর্তব্য।” তবে, ‘ইংরেজসী (ও) আমাদের শিখতে হবে এবং উচ্চশিক্ষা-ক্ষেত্রে ইংরেজির প্রতি আরো গুরুত্ব দিতে হবে। ইংরেজি বর্জনের প্রশ্নটি নেহাত বাতুলতা।... শিক্ষার মাধ্যম হবে মাতৃভাষা।”

গদ্য রচনাগুলোর চেতনার সমধর্মী বক্তব্য ও অনুভব—এ পত্রিকার কবিতা ও গল্পগুলোতেও সমভাবে উচ্চকিত। ক্রান্তিকালের প্রশ্নটিকে অবজ্ঞা করে যারা উন্নয়ন দশকের প্রশস্তি গান—তাদের উদ্দেশ্যে পলিমাটির কবি-সম্পাদক প্রশ্ন রাখেন : “ওগো ক্রান্তিকাল তোমার উৎকর্ষের নন্দীপাঠ আর কতকাল শুনবো।”

পূর্ব বাঙলার মুক্তি-সংগ্রামের পূর্বক্ষেণে পলিমাটির সাহিত্যিক সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ভূমিকা ছিল যুগোপযোগী, উন্নত সমাজব্যবস্থার পক্ষে। তাই যত ক্ষীণ ও নিম্নভই হোক—এই পত্রিকার ভূমিকা ছিল প্রগতিশীল, স্বতন্ত্র জীবন ভাবনায় সচকিত। রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় জীবনের ক্রান্তিকালের গুরুতর প্রশ্নগুলো উত্থাপনের ক্ষেত্রে এর সমমানের চিন্তাচর্চা তৎকালের পূর্ববাঙলায় ছিল দুর্লভ।

### তথ্যপঞ্জি

১. পলিমাটির একটি সংখ্যা গ্রেস থেকেই কি কারণে ধ্বংস হয়ে যায়। ফলে পাকিস্তানপর্বে প্রকাশিত পলিমাটির চারটি সংখ্যা এখন পাওয়া যায়। পলিমাটির একজন নিয়মিত লেখক, আবুল কাসেম ফজলুল হক এই তথ্য উল্লেখ করে বলেন, ঐ সংখ্যতে তাঁরও একটি লেখা ছিল, ফলে খোঁয়া যাবার কথাটি মনে আছে। তিনি জানান ১৯৭১ সনের পূর্বে পলিমাটির চারটি সংখ্যাই বাজারে এসেছিল।
২. আবুল কাসেম ফজলুল হক, ক্রান্তিকাল : সংস্কৃতি ও সাহিত্য, পলিমাটি, ১ম সংকলন, ১৩৭৩, পৃ. ১৫।
৩. মাহবুবউল্লাহ, সংস্কৃতি ও শ্রেণীসংগ্রাম, পলিমাটি, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩।
৪. আবুল কাসেম ফজলুল হক, প্রত্যাশার পৃথিবী, পলিমাটি, দ্বিতীয় সংকলন, ১৩৭৪, পৃ. ১৯।
৫. পূর্বোক্ত, কালের যাত্রার ধ্বনি, পলিমাটি তৃতীয় সংকলন ১৩৭৫, পৃ. ৩৬।
৬. পূর্বোক্ত, পৃ ৪৬-৪৮।
৭. পূর্বোক্ত, পূর্ববাঙলার সাংস্কৃতিক অঙ্গন, পূর্বোক্ত, পঞ্চম সংকলন, ১৩৭৭, পৃ. ১০-১৫।
৮. সামসুল আলম, একুশের প্রেক্ষিতে কতিপয় প্রসঙ্গ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭-২০।
৯. পলিমাটি পঞ্চম সংকলনের প্রচ্ছদে উদ্ধৃত কবিতার প্রথম চরণ।

## ১১. নাগরিক

(১৯৬৪-৭০)

‘নাগরিক-এর আসা যাওয়া’ শীর্ষক একটি স্মৃতিচারণমূলক রচনায় ডা. আহমদ রফিক (১৯২৯) লিখেছেন : “পঞ্চাশের দশকের শেষ দিকের কথা। আমাদের রাজনীতি তখন আঞ্চলিক ও রাষ্ট্রীয় উভয় স্তরেই চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলার পরিণতি বহন করে চলছে। এবং এর প্রভাব সংস্কৃতি ক্ষেত্রেও কম পড়েনি।...দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লেখাজোখার পরিকল্পনা নিতে নিতে মনে হলো, একটা কাগজ বের করলে কেমন হয়? সাহিত্যের কাগজ, মাসিক অথবা ত্রৈমাসিক। মেডিকেল ব্যারাকে পঞ্চাশের প্রথমদিকে কবির-আলীমের (আহমদ কবির ও শহীদ আলীম চৌধুরী) ‘যাত্রিক’ পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিজ্ঞতা বার বার ইঁশিয়ারী উচ্চারণ করতে ভোলে না। মনে পড়িয়ে দেয় মাসিক পত্রিকার ত্রৈমাসিক চরিত্র অর্জনের কথা।

...(অতএব) ধীরগামী ত্রৈমাসিকই ভালো। তাড়াছড়োর ঝামেলা নেই। সবদিক থেকেই স্বস্তির অবকাশ থেকে যায়। এইসব চিন্তায় সময় যত গড়িয়ে যায় কাগজ বের করার ইচ্ছা ততই তীব্র হতে থাকে। কিন্তু অর্থনৈতিক সংকটের ভয় সে ইচ্ছাকে দুমড়ে মুচড়ে ফেলতে থাকে। পকেটহীন মধ্যবিত্ত। তবু স্বপ্ন দেখাটাই তার রীত। হোকনা তা শুধু একটি কাগজ বের করার স্বপ্ন।

শেষ পর্যন্ত ভয়ে ভয়েই পরিকল্পনাটাকে একটা ছকে ফেলা গেল। এমনকি সেই সঙ্গে যুৎসই আধুনিক ধরনের একটা নামও। সমাজ ও সংস্কৃতির প্রেক্ষাপট মনে রেখে। শহর ঢাকার চেহারা তখন বড় একটা আধুনিক না হলেও তার চরিত্রে আধুনিকতার ছোঁয়া লাগতে শুরু করেছে। একপা দুইপা করে সেদিকেই তাঁর যাত্রা শুরু। মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা এতটা জমজমাট হয়ে উঠেনি। গাছগাছালি ও ঝোপঝাড়ের আড়ালে দিলকুশা নবাব বাড়িটা তখনও শ্যাওলাধরা আভিজাত্য নিয়ে টিকে আছে। সেই উঠতি ঢাকার বর্ধমান নাগরিক চরিত্রের কথা মনে রেখে পত্রিকার নাম দাঁড়ালো ‘নাগরিক’।

এক কথায় গড়ে উঠতে থাকা নাগরিক সংস্কৃতির দর্পণ ও মুখপত্র। এই সাংস্কৃতিক আকাঙ্ক্ষা নাগরিক-এর সাত বছরের স্বল্পায়ু জীবনে কতখানি ধরা পড়েছে বা আদৌ পড়েছে কিনা সে মূল্যায়নের দায় সম্ভবত সচেতন পাঠকের।...তৎকালীন ঢাকার বিশিষ্ট লেখকদের মধ্যে দুই চারজন ছাড়া কমবেশী সবাই এই পত্রিকায় লিখেছেন।...যাঁদের লেখা ছাপা হয়নি তাঁদের সাথে যোগাযোগের অভাবই ছিল বড় কথা।

আহমদ রফিক তখনকার ঢাকার সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক পরিস্থিতির বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন :

সেই সময় ঢাকায় কয়টাই বা সাহিত্যের কাগজ। সরকারী কাগজ বাদ দিলে পুরনো আমলের দুই একটা কাগজ বছরে ছমাসে একবার চেহারা দেখায়। আর সমকাল তখন কালের সঙ্গে তাল মেলাতে না-পেরে ভয়ানকভাবে অনিয়মিত। একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের আশীর্বাদপুষ্ট ‘লেখক সংঘ পত্রিকা’ মোটামুটি নিয়মিত বেরকচ্ছে (‘পরিক্রম’ হবে আসলে, কিন্তু পরিক্রমও নিয়মিত বের হয়নি)।... অই লেখক সংঘ পত্রিকায় লেখার সুবাদেই

শাহাবুদ্দীনের সাথে পরিচয় ... কাগজ বের করার টানা খাটুনিতে শাহাবুদ্দীন খুবই উৎসাহবোধ করে।... বরাবরই সঙ্গে ছিল।... নিয়মিত সংখ্যা 'নাগরিক' বের হওয়ার পর থেকে লেখকদের সাথে যোগাযোগের দায়িত্বটা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিল শাহাবুদ্দীনের। বাকী সব দায় আমার কাঁধে। অবশেষে ক্ষীণঙ্গ সংকলন সংখ্যা 'নাগরিক' বেরিয়ে এল পূর্ববঙ্গ প্রেস থেকে।

কিন্তু নিয়মিত পত্রিকার অনুমতি পাওয়া গেলো না আহমদ রফিকের রাজনৈতিক চরিত্রের জন্যই। সরকারের খাতায় লালকালিতে তাঁর নাম লেখা। অতএব কৌশল হিসেবে 'কম্বিনকালেও সাহিত্যের ত্রিসীমানা মাড়ায়নি' এমন একজন—বোরহানুদ্দীন ভুঁইয়ার নামে ডিক্লিয়ারেশন এর জন্য আবেদন করে তবে সদুস্তর পাওয়া গেলো। রেজিস্ট্রেশন নম্বর ৯৭/৬৩। 'শাহাবুদ্দীন মহাখুশী। এবার সত্যি সত্যি কাগজ বের হতে যাচ্ছে। ঠিক হলো, ধারালো অথচ ওজনদার সাহিত্য ত্রৈমাসিক হিসাবে নাগরিক—এর প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করতে হবে। নামের ভার, খ্যাতি, মত পথ ইত্যাদির উর্ধ্বে লেখার গুণেই লেখা ছাপাতে হবে। সেক্ষেত্রে প্রবীণ-নবীনের প্রশ্ন উহ্য।' এই নীতি মেনে চলার জন্য 'চেপ্টার ফ্রন্ট ছিল না নাগরিক সম্পাদকের পক্ষ থেকে।... নানান অসুবিধা সত্ত্বেও নাগরিক তার সাহিত্যবৈশিষ্ট্য গড়ে তুলেছিল প্রধানত প্রবন্ধ ও সমালোচনা বিভাগের মাধ্যমে। তখনকার মননশীল লেখকপাঠকদের একাংশের মতামতে আমাদের এই উক্তির সমর্থন মেলে। এক্ষেত্রে আমরা লাইনচ্যুত হইনি। নিজেদের রচনার উপর লেখা কঠোর সমালোচনাও আমরা পত্রস্থ করেছি। তেমনি ছাপিয়েছি নিকট বন্ধুদের লেখার ব্যবচ্ছেদধর্মী আলোচনা।'

উপর্যুক্ত ভাষ্যে স্পষ্ট যে, ডা. আহমদ রফিকই নাগরিকের মূল ব্যক্তি ছিলেন। যদিও সম্পাদক এবং প্রকাশক হিসেবে বোরহানউদ্দিন ভুঁইয়ার নাম মুদ্রিত হয়েছিল। প্রকাশের ঠিকানা ছিল ১১৮/২ আরামবাগ, ঢাকা-২। মহিউদ্দীন আহমদ কর্তৃক ইণ্ডাস্ট্রিয়েল প্রেস, ৪৯ ডিআইটি মার্কেট, ঢাকা থেকে মুদ্রিত হতো। কভার ছাপা হতো ফ্রেণ্ডস ট্রেড প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা-১ থেকে। মূল্য একটাকা। পৃষ্ঠা ৪৮, ৫৮ ইত্যাদি। কার্টিজ পেপারে রুচিশীল প্রচ্ছদ মুদ্রণ ছিল। সেকালে নাগরিকের ন্যায় ত্রৈমাসিক পত্রিকা হয়তো ছিল (যেমন সংলাপ, উস্তর অন্তর্ভুক্ত) কিন্তু বক্তব্য ও সাহিত্যশিল্পগুণান্বিত হবার সঙ্গে সঙ্গে চেতনার সমন্বয়ে যে স্টাণ্ডার্ড গড়ে উঠেছিল তেমন আর দ্বিতীয়টি ছিল না। সমকাল ছিল মাসিক পত্রিকা। এ প্রসঙ্গে সেটা বিবেচ্য নয়। প্রথম দিকে সহযোগিতায় শাহাবুদ্দিন আহমদ ছিলেন। পরে সহযোগী সম্পাদকীয় পরিষদ গঠিত হয়। তাজুল্লাহ আহমদ; আনোয়ারুল হক খান সিএস. পি; আহমদ রফিক; বুলবুল ওসমানের নাম ছিল তাতে। বুলবুল ওসমানও অল্প দিনেই বিদায় নেন। চতুর্থ বর্ষের প্রথম সংখ্যায় আহমদ রফিক বুলবুল ওসমান শাহাবুদ্দিন আহমদের নাম ছাপা হয় 'সহযোগী সম্পাদনা পরিষদে'। চতুর্থ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় সৈয়দ আবুল মকসুদ অন্তর্ভুক্ত হন এবং ক্রমান্বয়ে তিনি পত্রিকার কার্যকর কাণ্ডারীতে পরিণত হন। চতুর্থ বর্ষ তৃতীয় সংখ্যায় সহযোগী সম্পাদক এককভাবে সৈয়দ আবুল মকসুদ।

আহমদ রফিক অর্থকরী এবং আবুল মকসুদ আনুষঙ্গিক বিষয়াদির তদারকি করতেন। ষষ্ঠ বর্ষ প্রথম সংখ্যা ১৯৭০ সনের শেষ নাগাদ প্রকাশিত হয়। তারপর আর বের হয়নি। ত্রৈমাসিক হিসেবে ১৯৬৪ সনের ফেব্রুয়ারি থেকে প্রকাশিত হলেও হিসেব মতো সবকটি

সংখ্যা প্রকাশিত হয়নি। সাত বছরে  $৭ \times ৪ = ২৮$  টি সংখ্যা প্রকাশিত হবার কথা থাকলেও অপ্রাপ্তবয় ৩য় বর্ষের ৪টি এবং দ্বিতীয় বর্ষের ২য় সংখ্যা সহ নাগরিকের মোট  $৫ + ১৪ = ১৯$  টি খণ্ড প্রকাশিত হয়। যুগ্ম সংখ্যা আছে দুটি। পঞ্চম বর্ষে যুগ্ম সংখ্যা হিসেবে দুটি খণ্ডে চারসংখ্যা প্রকাশিত হয়। বাদবাকী সময় পত্রিকা প্রকাশিত হয়নি। অনিয়মের অভিযোগ থেকে নাগরিক ত্রৈমাসিক হয়েও অব্যাহতি পায়নি।

আহমদ রফিক স্বত্বাধিকারী হলেও কেন তার নাম সম্পাদনা-সহযোগীদের তালিকায় ছাপা হতো তার বর্ণনা নিজেই দিয়েছেন পূর্বোক্ত রচনায় : ‘কোন সন্ধানী পাঠক নাগরিক-এর সংখ্যাগুলো উলটে-পালটে দেখলে অবাক হবেন যে, এর নিয়মতান্ত্রিক প্রকাশক-সম্পাদক হিসেবে পত্রিকার পরিকল্পনাকারী-প্রকাশক-সম্পাদক তথা সমগ্র দায়বহনকারী ব্যক্তির নাম মুদ্রিত নেই। পরে গঠিত সহযোগী সম্পাদনা পরিষদে তার নামটি সদস্য হিসেবে গুঁজে দেওয়া হয়েছিল।...উত্তরকালের সাময়িকপত্রের সংকলন গ্রন্থটিতে লেখক শামসুল হক [বাংলা সাময়িকপত্র ১৯৪৭-৭১] শীর্ষক বইখানার কথা বলা হচ্ছে] নাগরিক-এর পরিচিতির মধ্যে ছোট্ট একটি পাদটীকা যোগ করেছিলেন এই বলে যে ‘প্রকৃতপক্ষে পত্রিকাটি সম্পাদনা করতেন ডা. আহমদ রফিক’। ‘সম্পাদনা সহযোগী’দের সম্পর্কে আহমদ রফিক লিখেছেন : ...শাহাবুদ্দীনের পর বুলবুল ওসমান স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই পত্রিকা দেখাশোনায় সহযোগিতার হাত নিয়ে এগিয়ে এসেছে। অবশ্য বেশীদিন অবস্থান করা সম্ভব হয়নি তার পক্ষে। ও তখন যাই যাই করছে। এর মধ্যেই এসে পড়েছে সৈয়দ আবুল মকসুদ। শুরু হয়েছে নাগরিক সম্পাদনায় ‘মকসুদ পর্ব’।

মকসুদ নাগরিক-এর সান্নিধ্যে প্রথম আসে ‘কুকুর হইতে সাবধান’ গল্প নিয়ে।... প্রয়োজনীয় দরজাটি নাগরিকই তার জন্য খুলে দিয়েছিল। সাহিত্যের টানে সরকারি চাকুরি ছেড়ে ভেসে পড়া, নাগরিক সম্পাদনার সাথে সংযুক্ত হওয়া এবং চার বছরেরও অধিককাল সেখানে লেগে থাকা ইত্যাদি আরও কিছু বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে মকসুদের জীবনে পটপরিবর্তনের সূচনা। জীবনে প্রতিষ্ঠা ও সাহিত্যে স্বীকৃতির জন্য যে নিরন্তর লড়াই তাঁকে চালিয়ে যেতে হয়েছে সেকাহিনী আর কেউ জানে না। ...তরুণ মকসুদকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন যে সাহিত্যরসিক ভদ্রলোক, তাকে সাহিত্য জগতে ঠেলে দেবার পেছনে অই ভদ্রলোকের অবদানও নেহাৎ কম নয়। মকসুদের প্রথম গল্পটি হাতে এসেছিল ঐ ভদ্রলোকের প্রশংসাপত্র গায়ে এঁটে। অবশ্য ছাপা হয়েছিল নিজগুণে।

মকসুদের সাহিত্যকর্মের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা বিষয়ে বরাবরই উঁচু ধারণা পোষণ করেছেন অই জিয়াউল হক সাহেব। করেছেন হোম ডিপার্টমেন্টে চাকুরী। কিন্তু তার পড়াশোনা সাহিত্যরুচি ও সাহিত্যবোধ আমাকে বরাবর মুগ্ধ করেছে।...পত্রিকাটিকে আকর্ষণীয় ও আধুনিকতায় সমৃদ্ধ করে তোলার জন্য তাঁর ভাবনা ও চেষ্টার ক্রটি ছিল না। এর আগে অন্যকোন সহযোগী নাগরিক সম্পর্কে এতটা ভাবেনি। তাঁর চেষ্টায়ই সে সময়কার তরুণ, অতিতরুণদের লেখা, বিশেষ করে কবিতা নাগরিক এর পাতায় উল্লেখযোগ্য স্থান পেয়েছে। দূই কবি বন্ধু নির্মলেন্দু গুণ ও আবুল হাসানের একেবারে প্রথম দিককার বেশ কিছু কবিতা

মকসুদের মাধ্যমেই ‘নাগরিক’-এ ছাপা হয়। আবু কায়সার প্রমুখ এমনি আরো কয়েকজনের কবিতাও স্থান পায়। তেমনি ছোট গল্পের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা।

সত্তরে পৌঁছে সমস্যার নানামুখি আঁচ নাগরিক প্রকাশনা স্পর্শ করতে থাকে। কারণ অবশ্য ভালো লেখার দুর্ভিক্ষ নয়। বরং বলা যায় আগের তুলনায় সত্তরে এসে বেশ কয়েকজন শক্তিমান লেখকের প্রকাশ লক্ষণীয়। আসলে সমস্যাটা নিতান্তই ব্যক্তিগত, সময় দিতে না পারার সমস্যা। মকসুদ তখন প্রায়ই বলতো : ‘এবার একটা জমকালো ‘সান্ত্বনা সংখ্যা’ বের করে নাগরিকের মৃত্যু ঘোষণা করে দিলে কেমন হয়।’ কিন্তু একান্তরের অশুভ পদধ্বনিতে ওর এত সাধের সান্ত্বনা সংখ্যা আর বের করতে পারেনি। তবু শেষ সংখ্যাটি তার হাত দিয়ে বেশ সমৃদ্ধি নিয়েই বেরিয়েছিল। কলকাতার সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের দুটো কবিতাও সে এতে যোগ করতে পেরেছিল সম্ভবত দৈনিক ‘পূর্বদেশ’ এর সাহিত্যসম্পাদক শহীদ গোলাম মোস্তফার সহযোগিতায়। সংখ্যাটি আমার সংগ্রহে নেই। অনেকগুলোই নেই। কোনো সহদয় পাঠকের কাছে যদি থাকে...’।

ডাক্তার আহমদ রফিকের স্মৃতিকথার বক্তব্য যথার্থ। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘তিনটি কবিতা’—১. ইন্দিরাগান্ধীর প্রতি ; ২. বন্দী জেগে আছো, এবং ৩. দ্বারভাঙা জেলার রমণী, নাগরিক-এর ষষ্ঠবর্ষ প্রথম, ভাদ্র-কার্তিক ১৩৭৭ চিহ্নিত সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল। ঐ সংখ্যায় তারাপদ রায়-এর ‘একুশ তলা বাড়ীর কানিশে’ শীর্ষক একটি, আর সিকান্দার আবু জাফর এর ‘সন্দেহ’ এবং একলিমুর রেজার (এক মুঠো আকাশ) এবং আহমদ রফিক-এর ‘দুটি কবিতা’—১. ‘আলো গান নিসগরে রূপসী প্রান্তরে এসো’ ; ও ২. ‘ভিয়েৎনামে মার্কিন বর্বরতায়’—ছাপা হয়েছিল। ‘নাগরিক’ এ অনেক কবিতা ছাপা হলেও, কবির সংখ্যা বেশী নয়। নির্বাচিত কবিদের ভালো-ভালো কবিতা গুচ্ছাকারে প্রকাশ করা হয়েছে অনেক সময়। নতুন কবিদের রচনার সংখ্যা এক বা দুই। প্রথম সংখ্যায় কবিতা লিখেছিলেন শামসুর রাহমান ও রুহুল খেয়াম।

পরবর্তী বিভিন্ন সংখ্যায় আর খাঁরা লিখেছিলেন, তাঁরা হলেন : মীজানুর রহিম, সানাউল হক, আহসান হাবীব, হারুনঅর রশীদ, এস. এম. লুৎফর রহমান, শাজাহান কবির, সৈয়দ আলী আহসান, হায়াৎ মামুদ, আবদুল মান্নান সৈয়দ, নূরুল হক, নির্মলেন্দু গুণ, আবুল হাসান, শহীদ আজাদ, আবুবকর সিদ্দিক, সৈয়দ আবুল মকসুদ, আবদুল গনি হাজারী, আনোয়ারুল করীম, মহীউদ্দীন, মহাদেব সাহা, মিরজা শরফুল হোসেন প্রমুখ।

অনেক অনূদিত কবিতাও ছাপা হয়েছে। তৃতীয় বর্ষ তৃতীয়-চতুর্থ সংখ্যায় মুদ্রিত সকল কবিতাই অনুবাদিত। নাজিম হিকমত, ডি. এইচ. লরেন্স, রবার্ট ফ্রস্ট, ওয়াই. এ. ইয়েঙতু শেক্তো প্রমুখের কবিতা অনুবাদ করেছিলেন আহমদ রফিক, মোহাম্মদ সারওয়ার জাহান এবং সৈয়দ আবুল মকসুদ। বিভিন্ন সংখ্যায় মিখাইল নুয়েম, জোশ মালিহাবাদী, আমীর মিনাই প্রমুখের কবিতার অনুবাদ ও ছাপা হয়েছে।

অনুবাদের মধ্যে আরও আছে-আলবেয়ার কামুর উপন্যাস প্লেগ (এটির অনুবাদের নাম অনুজ্জ, ‘অতিথি’ অনুবাদক আবদুল হাই) ; এবং লিউনিদ আন্দ্রেয়েভ, আলেকজাণ্ডার



কুপরিন, ও, হেনরী, আহমদ নদীম কাসমীর গল্প। মনিরুজ্জামান প্রবন্ধ লিখেছিলেন ‘লেবেডফের ভাষা’ শিরোনামে নাগরিকের শেষ-ষষ্ঠ বর্ষ প্রথম সংখ্যায়। (পঞ্চম বর্ষ প্রথম-দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত তাঁর অপর প্রবন্ধের নাম ‘বাক্য’)।

বার্ট্রাণ্ড রাসেলের The war crimes in vietnam পুস্তকের ‘সংবাদপত্র ও ডিয়েৎনাম যুদ্ধ’ শীর্ষক প্রবন্ধের অনুবাদ করেছিলেন নেয়ামাল বাসির। রাসেলের একই গ্রন্থের ‘ডিয়েৎনামে যুদ্ধ ও নির্যাতন’ প্রবন্ধটি এর পূর্ববর্তী সংখ্যায় (৫/৩-৪) উপযুক্ত অনুবাদের ভাষায় ছাপা হয়েছিল। রাসেলের মৃত্যুর পর (১৯৭০) সারা বিশ্বের মানবতাবাদী বুদ্ধিজীবী, কবি-সাহিত্যিকেরা শোকে কাতর হয়েছিলেন। বাংলা পত্র-পত্রিকার লেখকসম্পাদকেরাও যথাসম্ভব শ্রদ্ধানিবেদনের প্রয়াস পেয়েছিলেন। কোনো পত্রিকায় সংবাদ পরিবেশন করে, কোনো পত্রিকায় তাঁর ব্যক্তিত্ব, দর্শন, চিন্তা ও জীবন-সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপনপূর্বক নিবন্ধ-প্রবন্ধ, সম্পাদকীয় লিখে; কোথাও বা তাঁর রচনার অংশবিশেষ অনুবাদ করে। নাগরিকও এই মহান মানবতাবাদী, দার্শনিক ও বুদ্ধিজীবীর প্রতি গভীর অনুরাগের পরিচয় দিয়েছিল। উপযুক্ত রচনা ছাড়াও বশীর আল হেলাল লিখেছিলেন বার্ট্রাণ্ড রাসেল-এর চিন্তা কর্ম ও রচনাবলীর মর্মজ্ঞাপক একটি সার্বিক প্রবন্ধ ‘বুদ্ধি ও বিবেকের কাণ্ডারী রাসেল’।

চিন্তাচর্চায় ‘নাগরিক’ পূর্ববঙ্গের পত্রপত্রিকার মধ্যে আধুনিকতার পরিচয় দিয়েছিল। এগুলোর মানও উন্নত। বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর ‘আধুনিক কবিতার জীবন দর্শন’ বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেছিলেন এবং এটাই ছিল নাগরিকের প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যার প্রথম লেখা। তাছাড়া আহমদ রফিক লিখেছিলেন সাহিত্যে দর্শন (১/১); আধুনিক কবিতায় বিষাদ (১/২); এবং নজরুল গীতি প্রসঙ্গে (৪/৪)। আনোয়ারুল হক খান চলচ্চিত্রের শিল্পরূপ বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন (১/২)। শামসুর রাহমান কবিতার পাশাপাশি প্রবন্ধও লিখেছিলেন নাগরিকে। নিঃসঙ্গবোধ ও আধুনিক বাংলা কবিতা (১/৩); এলিয়ট ও আমরা (১/৪) তাঁর রচনার শিরোনাম।

কবি গোলাম মোস্তফার মৃত্যুর (১৯৬৪) পরে শাহাবুদ্দীন আহমদ লিখেছিলেন তাঁর জীবন কর্ম ও চিন্তার ওপরে (১/৩)। লেখক সংঘ পত্রিকা সম্পাদনাকালে গোলাম মোস্তফার সহযোগী ছিলেন তিনি। একালে সাহিত্যপত্রিকার সঙ্গে শাহাবুদ্দীন আহমদ ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন বলে অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার তাঁর পূর্ণ। সাহিত্য ও সাময়িকপত্র সংক্রান্ত তাঁর (সাহিত্যপত্রিকা প্রকাশের সমস্যা, ৪/১) আলোচনায় তাই পূর্ববঙ্গের সাহিত্যপত্রিকা-পরিস্থিতি যা বর্ণিত হয়েছে—তাতে কিছু সত্য ধরা পড়েছে। জিয়াউল হকের নামে এবং স্বনামে সাহিত্যপত্রিকা সম্পর্কে সৈয়দ আবুল মকসুদও কিছু আলোচনা লিখেছিলেন; তাতে এবং মোহাম্মদ বদরুল আমীন খানের ‘পাঠকের বক্তব্য’তে পাকিস্তান কালের পত্রিকা-পরিস্থিতির উপর আলোচনা আছে। এগুলো আজ কালের দর্পণ।

বুলবুল ওসমান দুটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন—দ্বিতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যায় ‘সমকালীন ছোটগল্পে পূর্ব পাকিস্তান’ ও তৃতীয় সংখ্যায় ‘শিল্প ও শিক্ষাতত্ত্ব’ বিষয়ে। ‘অতিআধুনিকতার নৈরাশ্য; সঙ্গতি ও সুরস্রোতে নাটক’ লিখেছিলেন আশরাফউদ্দৌলা (যথাক্রমে ২/৪ ও ৪/১)

সংখ্যায়)। ‘গোকী ও সাহিত্যের আদর্শ’ শিরোনামে প্রবন্ধ লিখেছিলেন আহমেদ হুমায়ূন (৪/১)। অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন—‘সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী’ (৪/৩) ; নেয়ামাল বাসীর—‘ফয়েজ আহমদ ফয়েজ’ (৪/৪) সম্পর্কে দুটো আলোচনা লিখেছিলেন। নজরুল সম্পর্কে প্রকাশিত দুটি ব্যক্তিগত রচনার লেখক সিদ্দিকুর রহমান (দ্বিতীয় চিন্তার আলোকে নজরুল ৪/৪) ও সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী (বেতারে কবি নজরুল, দৈনিক যুগান্তর থেকে পুনর্মুদ্রণ, ৫/৩-৪)।

আবু জাফর শামসুদ্দীন মুক্তবুদ্ধির প্রচারক ও সাধক ই.এম. ফরস্টার সম্পর্কে এবং সরদার ফজলুল করিম লেনিনের মেটেরিয়ালিজম এণ্ড এমপিরিওক্রিটিসিজম গ্রন্থ প্রসঙ্গে আলোচনা করেছিলেন পঞ্চম বর্ষ তৃতীয়-চতুর্থ যুগা সংখ্যায়। ঐ সংখ্যাতই আবদুল গনি হাজারী ‘ঐতিহ্যচিন্তার ভূমিকা’ শিরোনামে প্রবন্ধ লিখেছিলেন। লেনিন-উৎসব এর ওপর প্রতিবেদনধর্মী রচনা লিখেছিলেন বিপিন্দি চাকমা (৫/১-২)।

নাগরিকে গল্প লিখেছিলেন :

সাইয়িদ আতীকুল্লাহ (উলু খাগড়া, ১/১) ; প্রেমের গল্প, ২/১ ; একটি গল্প ৫/৩-৪) ; শওকত ওসমান (একটি ট্রাজিডি, ১/১ ; কয়েকটি ছোটগল্প, ২/৩) ; হাসান আজিজুল হক (আবর্তের সম্মুখে, ১/২ ; উটপাখি, ১/৩ ; সারা দুপুর ২/১ ; রোদে যাবো, ৪/২) ; মীর নূরুল ইসলাম (অনুশ্রুতি, ১/২) ; লিউনিদ আন্দ্রেয়েভ (মিথ্যা, আবদুল হাই অনূদিত, ১/২) ; বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর (আমরা দুজন, ১/৩ ; প্রেম, ২/৪) ; আহমদ রফিক (গ্রহণের আলোয়, ১/৩ ; মায়া হরিণ ৪/২ ও ৪/৩) ; জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত (লৌহ বেটনী, ১/৩ ; ক্রীতদাসী বাসনা, ২/১) ; আবদুল মান্নান সৈয়দ (অভিভূত চাষা, ১/৪) ; আলেকজান্ডার কুপরিণ (প্রলোভন, অনু. আবদুল হাই, ১/৪) ; ও, হেনরী (আপ্যায়ন, অনু. আশরাফউদ্দৌলা, ১/৪) ; আলবেয়ার কামু (অতিথি, অনু. আবদুল হাই, ২/১) ; শাহাদৎ চৌধুরী (হত্যাকাণ্ড, পূর্বানুবৃত্তি, ২/৩) ; আহমদ নদীম কাসমী (মগয়া, অনুবাদ তাজাকলম, ২/৩) ; বশীর আলহেলাল (চুরির লগ্ন, ৪/১ ; ফালতু, ৪/৩, কীটনাশক, ৪/৪) ; সৈয়দ আবুল মকসুদ (কুকুর হইতে সাবধান, ৪/১ ; কারফিউ, ৫/১-২ ; সোনালী শোধ, ৬/১) ; জাহানারা হাকিম গহর, ৫/১-২) ; আলফাঁসো আলায়াস (দূরভাষিণী, অনু. কালীপ্রসাদ ভৌমিক, ৫/১-২) ; এবং ই.এম. ফরস্টার এর গল্প ‘স্বর্গ হতে বিদায়’ অনুবাদ করেছিলেন বশীর আল হেলাল, (৫/৩-৪)। আস্তন শেখভের নাটক ‘চেরী বাগিচার’ অনুবাদ করেছিলেন শাহাবুদ্দীন আহমদ। আঁদ্রে জঁঁদ এর রচনা ‘স্ট্রেট ইজ দি গেট’ অনুবাদ করেছিলেন রেজাউর রহমান। ‘বিশ্বসাহিত্য : এবারের নায়ক শোলঝোনিং সিন’ শিরোনামে তাঁর নোবেলপুরস্কার প্রাপ্তির শ্রেণিতে প্রবন্ধ লেখেন গৌতম উদয়ন বড়ুয়া।

কতিপয় বইয়ের আলোচনাও তাঁরা প্রকাশ করেছিলেন। আলোচিত গ্রন্থের প্রণেতা, আলোচ্যগ্রন্থ ও আলোচক—এই ক্রমিকে ১৪টি সংখ্যার আলোচিত পুস্তকসমূহের উল্লেখ করা হলো। বলা প্রয়োজন, প্রতিটি বইয়ের আলোচনাই প্রবন্ধের স্টাইলে ভিন্ননামে বিস্তৃত আকারে প্রকাশিত হয়েছে। যার মূল্য ও গুরুত্ব হলো আলোচনাগুলোতে সার্বিকভাবে পূর্ববাঙলার সমকালীন সাহিত্যপরিস্থিতি আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে বিম্বিত হয়েছে। এতে সাহিত্যবোধের পরিশীলনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল :

মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ প্রণীত ‘নজরুল ইসলাম ও আধুনিক বাংলা কবিতা’—হুমায়ূন আহমেদ ; শামসুর রাহমান প্রণীত ‘রৌদ্র করোটতে’—শাহাবুদ্দীন আহমদ ; আবু রুশদ প্রণীত Songs of Lalan Shah জরীন কলম ; হাসান হাফিজুর রহমান প্রণীত ‘বিমুখ প্রান্তর’—শাহাবুদ্দীন আহমদ ; বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর

প্রণীত 'অবিচ্ছিন্ন'—জাবালী ; আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ সম্পাদিত 'আবুজাফর শামসুদ্দীনের শ্রেষ্ঠ গল্প'—মীর মহসিন আলী ; আতাউর রহমান খান প্রণীত 'ওজারতির দুই বছর'—জরীন কলম ; সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী প্রণীত 'অন্বেষণ'—আহমেদ হুমায়ুন ; আহসান হাবীব প্রণীত 'সারা দুপুর', আবদুল গনি হাজারী প্রণীত 'সূর্যের সিঁড়ি', আল মাহমুদ প্রণীত 'লোক লোকান্তর'—শাহাবুদ্দীন আহমদ ; বুলবুল ওসমান প্রণীত 'কানামামা', হুমায়ুন কাদির প্রণীত 'একগুচ্ছ গোলাপ ও কয়েকটি গল্প'—জাবালী ; আহমদ রফিক প্রণীত 'নির্বাসিত নায়ক' ও আবদুল মাল্লান সৈয়দ এর 'জন্মাক্ষ কবিতাগুচ্ছ'—শাহাবুদ্দীন আহমদ ; রশীদ হায়দার প্রণীত নানকুর বোধি—জুহাইর ; আবদুল হক প্রণীত রোকেয়ার নিজের বাড়ী—সাহানা বেগম ; আবুজাফর শামসুদ্দীন প্রণীত 'শেষ রাত্রির তারা', এবং 'এক জোড়া প্যান্ট ও অন্যান্য গল্প'—জাবালী ; আবদুল কাদির প্রণীত 'উত্তর বসন্ত'—শাহাবুদ্দীন আহমদ ; 'আনোয়ার পাশা প্রণীত 'সাহিত্য শিল্পী আবুল ফজল'—মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন—গোলাম রহমানের 'ক্যাফে দ্য খোরাসান', মুজীবুর রহমান খাঁ প্রণীত 'সাহিত্যের সীমানা'—অজাতশত্রু ; আবদুল হক প্রণীত 'সাহিত্য ঐতিহ্য মূল্যবোধ'—জাবালী ; অধ্যক্ষ আনোয়ারুল করিম প্রণীত 'বাউল কবি লালন শাহ'—আহমদ রফিক ; মোহাম্মদ নাসির আলী প্রণীত 'লেবু মামার সপ্তকণ্ঠ' ও 'যোগাযোগ'—আবদুল হক ; মেরী ম্যাকাথীর 'ভিয়েতনাম' বার্ট্রাও রাসেলের ওয়ার ক্রাইমস্ ইন ভিয়েতনাম—জাবালী ; কুদরতুল্লাহ শাহাবুদ্দীন প্রণীত ও নেয়ামাল বাসির অনূদিত গল্প 'ধূপছায়া'—বিপক্ষি চাকমা ; সিকান্দার আবু জাফর অনূদিত রুবাইয়াৎ ই ওমর খৈয়াম—আহমদ রফিক ; আবদুর রশিদ খান প্রণীত 'বিম্বিত প্রহর'—সৈয়দ আবুল মকসুদ ; আজহারুল ইসলাম প্রণীত 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রসঙ্গ'—আবু জাহেদ সালাহউদ্দীন, নেয়ামাল ওয়াকিল প্রণীত 'রঙ ও রূপো' (নাট্য)—সুরাইয়া মজুমদার ইত্যাদি।

জ্যাক দুখরে নামের দীর্ঘকায় ফরাসি সাংবাদিক ঢাকায় এসেছিলেন ১৯৬৯ সনের প্রথম দিকে। 'সাংবাদিক ও সাহিত্যানুরাগী দুখরে ছিলেন মুক্তচিন্তার মানুষ। ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া ঘুরে' তখন তিনি ঢাকায়, 'বিশ্বরাজনীতি ও সাহিত্যসম্পর্কে বেশ ওয়াকিবহাল'। দুখরেকে দিয়ে আধুনিক ফরাসি সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ আহমদ রফিক লিখিয়ে নিয়ে বশীর আল হেলালের দ্বারা অনুবাদ করিয়ে 'নাগরিক' এ ছেপেছিলেন (ফরাসী সাহিত্যের গতি প্রকৃতি, ৪/৩, ফাল্গুন-বৈশাখ ১৩৭৫-৭৬)। আবদুল হক লিখেছিলেন 'সাম্রাজ্যবাদের অস্তিম মুহূর্তে' শিরোনামে উপনিবেশগুলোর অধিবাসীর চিন্তাধারার বিকৃতিসাধনে সাম্রাজ্যবাদীদের গৃহীত কৌশল সম্পর্কে। তবে উপনিবেশগুলোর জাগরণবাদী ধারার কথাও তিনি প্রবন্ধে ব্যক্ত করেন।

১৯৬৮-র গণঅভ্যুত্থানের ক্রান্তিকালে 'সাম্রাজ্যবাদের অস্তিম মুহূর্তে' শিরোনামের প্রবন্ধে আবদুল হক আবেগে, মনের ও চিন্তার বিকাশ, বিকৃতি অবমোচন ঘটাবার মতো আনন্দদায়ক একটি প্রবন্ধে যে আলোচনা করেন তা অত্যন্ত তাৎপর্যবহু এবং সমকালীন সামাজিক-রাজনৈতিক চিন্তার দ্যোতক :

কোনো সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যতদিন তার পদানত দেশে ক্ষমতাসীন থাকে ততদিন প্রবল প্রতিরোধের মুখেও তার মনে হয় সে সর্বস্বা, সে চিরঞ্জীব, পদানত জাতিকে শাসন করাই তার স্বাভাবিক অধিকার। প্রজ্ঞার উদয় না হওয়া পর্যন্ত এই রকম মনে হয় এবং প্রজ্ঞার উদয় কখনো হয় কখনো হয় না ; হলে সময় থাকতে সরে পড়ে, না হলে শেষ পর্যন্ত বিতাড়িত হয়। তথাপি শুধু বিদেশি শাসক নয়, কখনো কখনো কিছুসংখ্যক দেশী মানুষও ভাবতে ভরসা পায় না তাদের দেশে একদিন স্বাধীনতার সূর্যের উদয় হবে। দাস মনোভাবাপন্ন কেউ কেউ স্থায়ীভাবেই স্বদেশে চিরস্থায়ী বিদেশী শাসক কামনা করে ; যেমন অবিভক্ত অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানরা করতো। বৃটিশরা তাদের স্বধর্মী এবং তাদের শরীরের রক্তের একাংশ ঐ ব্রিটিশ ও অন্যান্য ইউরোপীয়দের অবদান, এই

হিসাবে বৃটিশদের তারা মনে করতো স্বজাতি ; আর এই কারণে তারা অবিভক্ত ভারতে চিরস্থায়ী বৃটিশ শাসন কামনা করতো। স্বধর্ম রক্তের ঈষৎ সংমিশ্রণের জন্য স্বদেশে বিদেশী শাসন কামনা এই প্রথম নয় এবং শেষও নয়।

ধর্ম ও মিশ্রিত রক্তের আত্মীয়তা যেখানে নেই, সেখানেও অন্য অনেক জটিল কারণে দেশী মানুষ বিদেশী শাসন কামনা করে। মীর জাফর ও কুইসলিংশ্রেণীর লোক বিদেশী শক্তির ভাড়াটের সংখ্যা পৃথিবীর রাজনৈতিক ইতিহাসে খুব কম নয় (মীর জাফর অবশ্য ছিলেন আরবের লোক)। এরা যেসব কারণে বিদেশী শক্তির ভাড়াটে অথবা পঞ্চম বাহিনীর কাজ করে, ভারতীয় লেখক নীরদচন্দ্র চৌধুরী অথবা সিঙ্গাপুরের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী অথবা আরব উপদ্বীপের পূর্ব উপকূল-অঞ্চলের ক্ষুদ্র সুলতানেরা একটু অন্য কারণে বিদেশী অভিভাবকত্ব কামনা করেন।

আজকের প্রখ্যাত নীরদচন্দ্র চৌধুরীর মানসিকতা বিশ্লেষণ করে আবদুল হক লিখেছিলেন নীরদচন্দ্র চৌধুরী বৃটিশ শাসনের অবসানে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন কারণ তাঁর কাছে বৃটিশরা শিক্ষায় সভ্যতায় সংস্কৃতিতে বিজ্ঞানে বীরজাতি। 'তাঁর মানসের মূল অনুভূতিটা বীর পূজার অনুভূতি।... তাঁদের মনোভাবটা, সংক্ষেপে, 'বিদেশী ভাল, তবু প্রতিবেশী বা স্বজাতি নয়'। পদানত জাতির মানসকে যদি এতটা অধঃপতিত করে না থাকতে পারে, তবে বৃথাই বৃটিশ কটনীতি।' দাসমনোভাবের কারণ বিশ্লেষণ করে লেখক আরও বলেন, 'এই দাস মনোভাবের মূল উৎসটা হচ্ছে বৈদেশিক শক্তির আনুকূল্যে উপজাত ও বর্ধিত কায়েমী স্বার্থবাদী শ্রেণীর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থবোধ। বৃটিশ বাহিনীর প্রহরায় ক্ষুদ্র সমস্ত 'সুলতান' যতটা সার্বভৌম এবং নিরাপদ বোধ করেন, অনেকগুলি সুলতানের যৌথ সম্বন্ধ স্বভাবতই ততোটা সার্বভৌম এবং অনেকগুলি সুলতানের সম্মিলিত প্রজাবাহিনীর দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে ততোটা নিরাপদ বোধ করার ভরসা পান না।...'<sup>৩</sup>

আহমেদ হুমায়ুন 'গোর্কি ও সাহিত্যের আদর্শ' শীর্ষক প্রবন্ধে এদেশে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার বিপ্লবসহায়ক চেতনার লেখক গোর্কির সাহিত্যাদর্শের পরিচয় করাতে গিয়ে রাজনীতির সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক স্থাপন করিয়ে এদেশের লোকেদের সামনে সমাজ গঠনে সাহিত্যের ভূমিকার গুরুত্বই বর্ণনা করেছেন প্রকারান্তরে—'রাজনীতির সঙ্গে সাহিত্যের কোন সম্ভাব নেই, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে জীবনকে বিচার করলে এবং সাহিত্য রচনায় প্রবৃত্ত হলে চিরায়ত সাহিত্য সম্ভব নয়—এই প্রচারণার মাধ্যমে রক্ষণশীল গণিতরা সাহিত্যের অঙ্গন থেকে বস্তুকে চিরকাল নির্বাসিত করে রাখার প্রয়াস পেয়েছেন।' কিন্তু গোর্কি তাঁর লেখনীর মাধ্যমে এই অসত্যকে ধুলিসাৎ করে দিয়েছেন, তিনি সবল হাতে প্রতিষ্ঠা করেছেন এই আদর্শ যে, সাহিত্য ব্যক্তিবিশেষ অথবা শ্রেণী বিশেষের সম্পত্তি নয়, সাহিত্য সমষ্টির কল্যাণের জন্যে সাধারণের জন্যে।

গোর্কি তাঁর সৃষ্টিতে শিল্পসাহিত্যের ক্ষেত্রে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের জয়গান, আজিক সর্বস্বতা এবং শব্দের অর্থহীন যাদুকরীর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ রেখে গেছেন। উনিশ শতকী রুশ সাহিত্যে ব্যক্তির একক প্রতাপশালী ভূমিকাকে খর্ব করে গোর্কি সেখানে প্রতিষ্ঠিত

করেছেন সমষ্টির শাসন! আঙ্গিক সর্বস্বতাকে বিসর্জন দিয়ে সাহিত্যের অঙ্গন বন্যার স্রোতধারার মত তিনি ডেকে নিয়ে এসেছেন নীচুতলার আধারচাষী মানুষের দৃষ্ট মিছিল। জীবন সম্পর্কে গোর্কির অপরিমিত অভিজ্ঞতা, তীক্ষ্ণ গভীর উপলব্ধির এবং সর্বোপরি তাঁর প্রতিভা একদিকে তাঁকে যেমন গতানুগতিক প্রচারসাহিত্যের হাত থেকে রক্ষা করেছে, অন্যদিকে তেমনি এই গুণাবলী তাঁর সাহিত্য ও আদর্শকে দিয়েছে অবিসংবাদী প্রতিষ্ঠা।

আজকের দিনে শিল্পসাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যখন নতুন করে বিশ্বাসের সংকট দেখা দিয়েছে, হিঙ্গির হল্লা ও বীটলদের বীভৎস ব্যাভিচারে যখন শিল্প-সাহিত্যের জগত কলুষিত হয়ে উঠেছে তখন গোর্কির শিক্ষা ও আদর্শকে নতুনভাবে স্মরণ করার প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বিপ্লবপূর্ব রাশিয়ার আত্মকেন্দ্রিক দেউলিয়া সাহিত্য-জগতের সঙ্গে বর্তমান পরিস্থিতির সুস্পষ্ট তুলনা রয়েছে। সংকট কবলিত তৎকালীন রুশ সাহিত্যের কদাকার ছবির সঙ্গে সমকালীন সাহিত্য প্রতিকৃতির সাদৃশ্য মোটেই দুর্লভ নয়। সাহিত্যের ‘শিব-সুন্দর’ ক্ষেত্র থেকে রাজনীতিকে বিসর্জন দেবার নামে, আধুনিকতার অজুহাতে ও চিরায়ত সাহিত্যের ধূয়া তুলে বিকৃত মূল্যবোধের পূজারীরা সাহিত্যক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট ক্রোধ জমা করে তুলেছেন। দ্বিতীয় মহামুদ্ধান্তের যুগের ক্লাস্তি অবসাদ ও হতাশা এই অবক্ষয়ী সাহিত্যধারাকে দিয়েছে অবাকিত প্রশ্ন ও প্রতিষ্ঠা। সাহিত্যকে এই গ্লানি থেকে মুক্ত করে স্বধর্মে প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা এখন আবার নতুন ভাবে অনুভূত হচ্ছে। সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার উদগাতা বরণীয় সাহিত্যিক ম্যাকসিম গোর্কির জন্মশত-বার্ষিকী সেই প্রয়োজনীয়তাকে আবার নতুনভাবে স্মরণ করিয়ে দিল।<sup>৪</sup>

আবদুল কাদির ‘শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি’ শীর্ষক প্রবন্ধেও কুসংস্কার থেকে মুক্ত চিন্তার যুগোপযোগী ধারাকে চিনিয়ে দেবার জন্যে মানবগোষ্ঠীর সর্বপ্রাচীন শিল্পকলা নৃত্য ও সঙ্গীত সম্পর্কে বাঙালি মুসলমানের সমাজমনস্কতার পরিচয় উদঘাটন করে বলেন সাহিত্যও হবে ‘স্বাধীন ও স্বতঃস্ফূর্ত’; তার প্রকরণ আত্মপ্রকাশের প্রয়োজনে সৃষ্টি—তাতে লেখা হয় প্রাণময়। বাইরের ফরমাসে তার প্রকরণ তৈরি হলে লেখা হয় কৃত্রিম ও প্রাণহীন। চারপাশের জনগণের সুখ-দুঃখ ও আশা-আশঙ্কার সঙ্গে চিত্তের গভীর যোগ স্থাপনেই হবে সরস ও সতেজ, প্রাণস্পর্শী ও প্রাণপ্রদ; এ সত্যটি সদা স্মর্তব্য।

সাহিত্যের মতো সঙ্গীত-চর্চার আদর্শ সম্বন্ধেও আজ আমাদের নতুন করে ভাবতে হবে। মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ তাঁর ‘সমস্যা ও সমাধান’ পুস্তকের ‘সঙ্গীত সমস্যা’ প্রবন্ধে বহু প্রামাণ্য দলীল উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন যে, গীতি-বাদ্য হারাম হওয়ার অনুকূলে একটিও ছহি হাদিস বিদ্যমান নাই। তবে শর্ত এই যে, সঙ্গীত হবে নির্দোষ ও সদ্ভাবপূর্ণ—মানুষের মনে কুরূচি ও কুপ্রবৃত্তির উদ্রেক করে তেমন সঙ্গীত সর্বদা পরিত্যাজ্য।—কিন্তু এই শর্তটি সম্পর্কে আলবেয়ার কাম্যুর কথায় বলা যেতে পারে যে, : it was not invented to bring evil into the world. (Resistance. Rebellion and Death, p-18)।

সর্বদেশে ও সর্বকালে শিল্পের উদ্দেশ্য সৌন্দর্য ও আনন্দ সৃষ্টি। এই মহৎ উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হয়েই পৃথিবীর সকল রাজ্যের মুসলমানও সঙ্গীতানুশীলন করেছেন।... পাশ্চাত্য

দর্শন ও বিজ্ঞান আমাদের চিন্তায় আজ আলোড়ন এনেছে ; কিন্তু ইউরোপীয় সঙ্গীতের মেলডী (Melody) ও হারমনি (harmony) আমাদের সঙ্গীতে কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে কি !... সে-মহিমাকে কতোদূর উন্নত ও প্রসারিত করা চলে তারই পরীক্ষা অতঃপর আমাদের সঙ্গীত-শিল্পীদের করতে হবে। শুধু প্রস্তুতির স্তরে যে সাধনা, তা সাধারণের রুচিকেই তৃপ্ত করে। কিন্তু একটা জাতির সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করতে হলে চাই অসামান্য প্রতিভার আবির্ভাব। প্রতিভা বিধাতার দান ; কিন্তু তার উদ্ভব ও বিকাশের জন্য চাই সমাজ-ব্যবস্থার আনুকূল্য।' আবদুল কাদির চিত্রকলা অভিনয় প্রভৃতি সম্পর্কেও দীর্ঘ আলোচনা করে বলেন, 'সঙ্গীতের মতোই সংস্কৃতির একটা বড় অঙ্গ চিত্রকলা। মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ তাঁর 'চিত্রকলা ও এছলাম' প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে, ইসলামে সকল প্রকার ছবি ও মূর্তির ব্যবহার হারাম করা হয়নি ; হজরত রসুলে করিম জীবজন্তুর চিত্র সমন্বিত কোনো কোনো জিনিস স্বয়ং ব্যবহার করেছেন এবং তাঁর পরিজনগণের মধ্যে এ প্রকার চিত্রিত পর্দার এবং জীবজন্তুর মূর্তির ছবি ও প্রতিমূর্তি ব্যবহার করার অনুমতিও হজরত রসুলে করিম দিয়েছেন (মা. মোহাম্মদী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭ সন, পৃ-৫৬৫)।...

প্রাচীন আরবে চিত্রাঙ্কনের প্রথা প্রচলিত ছিল। সারাসেন সাম্রাজ্যে লিথোগ্রাফ ও অলঙ্করণ শিল্পের চরমোৎকর্ষ ঘটে। মোগল চিত্রকলা এই উপমহাদেশের এক গৌরবের বস্তু। আবদুর রহমান চুয়াই সেই ধারা অনুসরণ করে যে স্বকীয়তার অধিকারী হয়েছেন, তা চিত্রশিল্পে তুলনাহীন। কিন্তু পিকাসোর Culism-এর অনুসরণ করে আমাদের সাম্প্রতিক শিল্পীগণ তেমন কৃতিত্বের দাবীদার হতে পারছেন কি ? স্থাপত্যে মুসলমানেরা একদা পুরোগামী হলেও ভাস্কর্যে চিরদিনই একেবারে অনুপস্থিত...গোড়াতেই বলেছি, নৃত্য মানুষের আদিম শিল্প। আধুনিক কালে নৃত্যও যে একটা জাতির চিৎপ্রকর্ষ মহিমময় রূপ লাভ করতে পারে, তার সার্থক প্রমাণ এ প্রদেশে দিয়ে গেছেন মরহুম বুলবুল চৌধুরী। কিন্তু 'তাঁর আরদ্ধ কাজ' অসম্পূর্ণ রয়ে গেল। আজ এ প্রদেশেও ছায়াছবি নির্মাণের প্রবল প্রতিযোগিতা চলেছে। সিনেমা ও থিয়েটারের একটা বড় আকর্ষণ নৃত্যে কোনো নূতন আঙ্গিক বা জাতীয় বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টির কোনো উদ্যম এখানে হচ্ছে কি ?<sup>২৫</sup>

নাগরিক 'সাহিত্য' বা 'সাহিত্যপত্রিকা' বিষয়টিকে সিরিয়াসলিই নিয়েছিল। সচেতনভাবে সামাজিক দায়িত্ব বুঝে পত্রিকা চালালে তার মধ্যদিয়ে কর্মকর্তাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য মনোভাব ও মেধার পরিচয় পাওয়া যায়। আহমদ রফিক ১৯৫০-৫২ সন থেকেই সাহিত্য ও রাজনীতিক্ষেত্রের সক্রিয়কর্মী। পত্রপত্রিকায় রচনা প্রকাশ-এর অভিজ্ঞতাও তাঁর ছিল। পত্রিকাটি সচেতনভাবে প্রকাশিত হতো। এতে বাঙালির সংস্কৃতি, সাহিত্য সমাজ এবং রাজনীতির ব্যাপারে বার্ট্রান্ড রাসেল থেকে শুরু করে একালের আবদুল হক পর্যন্ত সমাজঘনিষ্ট চিন্তক লেখকদের রচনা—যাই প্রকাশিত হয়েছে, তাতে ফুটে উঠেছে গণ-মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার আর গণমনবিধৃত সাহিত্যের প্রতি আস্থা। সাহিত্যপত্রিকার বিকাশ অর্থাৎ বহু ব্যাপক পত্রিকার নিয়মিত প্রকাশের নিশ্চয়তা তাঁরা কামনা করেছিলেন। এসবের উন্নতির চিন্তা থেকেই সাহিত্যপত্রিকার সমস্যা ও সম্ভাবনা বিষয়ে তিন-চারটি রচনা থেকেও এঁদের

উদ্দেশ্যে অভিব্যক্ত হয়েছে। ঐকালের সাহিত্যপত্রিকায় সাহিত্যপত্রপত্রিকার সমস্যা কি ছিল তার কিঞ্চিৎ উল্লেখও যুক্তিযুক্ত হবে, কারণ সামাজিক অগ্রগতির ইতিহাসে এসব রচনা অনেকটা মাইলফলকের কাজ করে থাকে। শাহাবুদ্দীন আহমদ লিখেছেন :

আমাদের এখানে ভাল সাহিত্যপত্রিকার অভাব। পত্রিকা যে দু'একটা বেরায় না, এমন নয়। কিন্তু কোন পত্রিকাই দীর্ঘায়ু পায় না। আধিকাংশ পত্রিকাই অল্প সময়েই প্রাণ হারায়। এই অপমৃত্যুর কারণ কি ?

লেখক কারণ অনুসন্ধান করে পেয়েছেন, প্রথমত ভালো পত্রিকার জন্য ভাল লেখা চাই। কিন্তু ভাল যাঁরা আমাদের এখানে লেখেন তাঁদের সংখ্যা কম। এবং তাঁরা এত কম যে মাত্র একটি পত্রিকার জন্যে বাছাই করা লেখা পেতে গেলে অন্য পত্রিকার উপোসে মরা ছাড়া গতি নেই। উপোস এজন্যে যে ভাল লেখকেরা বেশি লেখেন না ; কিংবা লিখবার অবসর পান না। দ্বিতীয়ত অর্থ সমস্যা। আমরা যারা এখানে পত্রিকা বের করি তারা লেখকদের পারিশ্রমিক দিতে অপারগ। আমাদের যাঁরা ভালো লেখক তাঁরা কখনো পরম স্বচ্ছলতার মুখ দেখেন না, এবং অভাবের হা পূরণ করার জন্যেও তাঁরা অনেক সময় লেখেন এবং অনেক সময় মৌলিক রচনাকে বাধ্য হয়ে দূরে সরিয়ে অনুবাদের আশ্রয় নেন। সুতরাং অর্থ দিয়ে রচনা কিনতে না পারার জন্যেই যথাসময়ে লেখা সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। তৃতীয়ত পাঠক-সমস্যা... ফলে সাহিত্যপত্রিকার... বাজার (এ)... ভীড় নেই.. প্রকাশক নিরুৎসাহে...(পত্রিকা বন্ধ করে দেন)... আর একটি (কারণ)... বিজ্ঞাপন... বিজ্ঞাপন কে দেয়? আর বিজ্ঞাপন সময় সময় দিলেও পয়সা কে দেয়?... মোটকথা সর্বব্যাপারে সহানুভূতির অভাব। এবং হৃদয়ের এই আন্তরিক অভাব একা শুধু বিজ্ঞাপনদাতার নয়, শুধু লেখকের নয়, এমনকি প্রকাশকেরও।... পত্রিকা প্রকাশের জন্যে প্রকাশকের মনে যদি ক্ষণিকের উচ্ছাদনা প্রশ্রয় পায় তবে তার বিলুপ্তি অবধারিত।

প্রসঙ্গক্রমে লেখক এও উল্লেখ করেন : অর্থকরী সমস্যা নিদারুণ সন্দেহ নেই। কিন্তু নেশা যদি আত্মার একাত্ম না হতে পারে তার অকাল মৃত্যু অনিবার্য। কেবল আত্মরক্ষার জন্যে সৃষ্ট নেশা বাস্তব হতে পারে। এবং বাস্তবতাই একমাত্র মরণের পথ আগলাতে সক্ষম। ... অর্থাৎ পত্রিকা বের করার আগে আমরা প্রথমে ভাবব আমরা ভাল লেখা ছাপব কিনা ; ভাল লেখা ছাপলে (ছাপতে হলে) ভাল লেখক পাব কিনা, আমরা ভাল লেখক পেলে তাকে ভাল পয়সা দিতে পারব কিনা ! পয়সার কথাটা এত বেশী করে বলার কারণ এই যে পয়সা লেখককে প্রকৃতিস্থ করতে পারে, তাঁকে অবসর দিতে পারে, আর সাহিত্যের এবং শিল্পের জন্যে অবসর অত্যাবশ্যিক।

বিশেষ করে. উন্নতমানের শিল্প-সাহিত্যের... জন্যেত বটেই। (আবার) পয়সাটা সাহিত্যের জন্যে যে সর্বশ্ব তা বলব না। যেমন অনেক সময় স্বচ্ছলতা সাহিত্যিকের সর্বনাশ করেছে। কিন্তু বলতে দ্বিধা নেই সেই সব লেখক সত্যিকার লেখক নন। লেখাটা সে লেখকের নেশা নয়, জীবন মরণ নয়।... প্রকৃত লেখকের লোভটা অর্থের উপর কেন্দ্রীভূত না হয়ে হবে লেখার ওপরে। অর্থাৎ তার কাছে মুখ্য হবে না। মুখ্য না হলেও তবু অর্থের প্রয়োজন আছে। পয়সা দিয়ে যে সাহিত্যের উন্নতি অসম্ভব নয় তা আমরা অস্বীকার করি কি

করে? তারপর একথাও সত্যি যে... যারা পত্রিকা বের করেন... তাঁরা একটা দায়িত্ব সম্পর্কে খুব বেশী সচেতন নন। এখানে যখনই কোনো পত্রিকা বের হয়, দেখা যায় সেই পত্রিকার মালিকেরা একটি নিজস্ব গোষ্ঠী সৃষ্টি করেন এবং পুনঃপুন নিজেদের মনঃপুত ব্যক্তির লেখা ছাপেন। এতে সুবিধা অসুবিধা দুই-ই আছে। সুবিধা হল এতে সাহিত্যপত্রিকার একটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বা চারিত্র্যের জন্য বিশেষ গোষ্ঠীরও প্রয়োজন... কিন্তু অসুবিধা যেটা তা হল, স্বাতন্ত্র্যের দিকে এমনি কড়া নজর রাখতে গিয়ে নতুন লেখক তৈরির কাজটা সম্পূর্ণ সিদ্ধ হয় না। অথচ পত্রিকার নতুনত্বের জন্যে নিরন্তর নতুনের সন্ধান একান্ত আবশ্যিক। কেননা নতুন নতুন লেখকই পত্রিকাকে নতুন জীবন দিতে পারে। তাতে পত্রিকার একঘেয়েমী নষ্ট হয় এবং পত্রিকা মাঝে মাঝে পুরনো খোলস পাল্টে উজ্জ্বল চেহারা ফিরে পায়।

শাহাবুদ্দীন আহমদ সম্পাদকদের নতুন লেখক সৃষ্টির জন্যে উদার এবং কষ্টসহিষ্ণু মনের সম্পাদকের অভাব লক্ষ্য করেন। বিপরীত বা প্রতিপক্ষগোষ্ঠী বা দলের লেখকের ‘সুন্দর’ ও সৌন্দর্যের উদ্বোধক রচনা যে-কোনো সম্পাদকের ছাপা উচিত বলে মনে করেন। এরপর তিনি পত্রিকার কাটটি হয়না মর্মে আক্ষেপ করে বলেন, দেশে কি এক হাজার সামর্থবান শিক্ষিত রুচিশীল ব্যক্তিও (পাঠক) নেই যে একটি সাহিত্যপত্রিকার একহাজার কপিও বিক্রি হয় না। ‘নিশ্চয় কোথাও একটা গলদ আছে।’ লেখক ও পাঠকদের চাহিদার বা সম্পর্কের ঘনিষ্ঠ সম্মিলন ঘটছে না বলেই হয়তো এমন হচ্ছে। এ দেশের লেখকেরা উৎকর্ষের জন্য সাধনা করছেন। কিন্তু পাঠকেরা উৎকৃষ্ট বা উত্তম নয় বলে তা ছুঁয়ে দেখছেন না। ফলে পত্রিকা ষ্টলেই পড়ে থাকে। ‘একটা ব্যাপ্ত চাহিদার অভাবে, আকুল পিপাসার অভাবে বন্ধপানির নিষ্কৃতি ঘটছে না এবং সাহিত্য তার যৌবনের সঙ্গী না পেয়ে বিষণ্ণ মুখে দিনাতিপাত করছে।’

লেখক এবং সম্পাদকগণ যে পত্রিকার ‘ভূমিকা’ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন, শাহাবুদ্দীন আহমদের আলোচনার উপসংহারের এই বক্তব্যই তার প্রমাণ :

সাহিত্যপত্রিকা সম্বন্ধে এত কথা বলার কারণ সাহিত্য সাহিত্যপত্রিকা ভিন্ন দ্রুত গতিতে উন্নতির পথে পা বাড়াতে পারে না। লেখকের চিন্তা-সুরাকে পরিবেশনের জন্য ভূঙ্গারের প্রয়োজন। সে ভূঙ্গার সাহিত্যপত্রিকা। এবং ভূঙ্গারবহনের জন্য প্রয়োজন শাকীর। সে শাকী হলেন সম্পাদক অথবা পত্রিকা প্রকাশক। এদের অভাব মানাই সাহিত্যের স্বগপ্রাপ্তি। পূর্বপাকিস্তানের সাহিত্য কি সেই স্বর্গের সিঁড়িতে পা রেখেছে? তাহলে আর আশা কি? ৬

নাগরিকের ঘোষণা ছিল যে ‘প্রতি তিন মাস অন্তর প্রকাশিত হয়। যে কোন ভালো লেখা, লেখকের খ্যাতি, অখ্যাতি, গোত্র, মত নির্বিচারে প্রকাশ করা হয়। প্রতি সংখ্যার দাম এক টাকা, বার্ষিক সডাক পাঁচ টাকা। লেখার অন্তর্নিহিত মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।’

আহমদ রফিক ‘নাগরিকের আসা-যাওয়া’তেও লিখেছেন : ‘নাগরিক নির্দিষ্ট কোনো গোষ্ঠীর কক্ষে সীমিত জীবন যাপন করেনি। গোষ্ঠীবহির্ভূত স্বাধীন, স্বচ্ছল জীবন যাপনই ছিল তার আকাঙ্ক্ষিত। উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল সুস্থ এবং সুস্থ সংস্কৃতির শিকড় ছোঁয়া রূপের নির্মাণে সহায়তা করা। অবশ্য আধুনিকতা ও প্রগতি-চেতনার সমন্বিত পদযাত্রায়।’ জনাব



রফিক বলেন, ‘নাগরিকের এই উদ্দেশ্য ও নীতি সহ-সম্পাদক মকসুদের লেখায় নতুন করে ফুটে উঠেছিল পঞ্চম বর্ষ প্রথম-দ্বিতীয় সংখ্যায়।’

সৈয়দ আবুল মকসুদ—লিখিত নাগরিকের নীতি ও উদ্দেশ্যসংক্রান্ত সেই রচনাটি : ‘আন্তর্জাতিকতায় পুরোপুরি আস্থাবান হওয়া সত্ত্বেও স্বদেশের সংস্কৃতির গভীরে যাদের শেকড়, চিরায়ত মূল্যবোধে বিশ্বাসে ও সত্যানুসন্ধানী চেতনায় যারা দীপ্যমান,—যারা রুগ্নভাববিলাসিতা ও রাগসর্বস্বতার বিরুদ্ধে সোচ্চার এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর জীবনের জটিলতা, পংকিলতা ও যন্ত্রণায় ভয়-বিহ্বল না—হয়ে গভীরতর বেদনায় যারা সৃষ্টিশীল, সর্বোপরি মানবজাতির কল্যাণসাধনে যেসব শিল্পী-সাধক উৎসর্গীকৃতপ্রাণ ও মানবতার বাণী নিয়ে দ্রুত অগ্রসরতর—নাগরিক তাদেরই মুখপত্র এবং একই সঙ্গে নাগরিকে ক্লাসিক, রোমান্টিক, সর্বাধুনিক ও লোকায়তিক শিল্পীবৃন্দের যে কোন সুচিন্তিত ও সুলিখিত রচনা প্রকাশ করা হয়।’

নাগরিকের প্রচ্ছদ ঠেকেছেন ইমদাদ হোসেন, নিতুন কুণ্ডু, আশীষ চৌধুরী, হাশেম খান, কাইয়ুম চৌধুরী প্রমুখ। ‘শেষ দিককার সংখ্যাগুলোতে আমরা নিজেরাই প্রচ্ছদের পরিকল্পনা করে নিয়েছিলাম। কখনও প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতার শিল্পকর্মের উপর নির্ভর করে, কখনও বা মকসুদ তার মেজাজমর্জিমত প্রচ্ছদ তৈরী করে নিয়েছে।’<sup>৭</sup>

কার্টিজ কাগজে একের আট সাইজে নাগরিকের স্বপ্ন ছিল চতুরঙ্গের সুখ্যাতি কেনার, কিন্তু তা হয়নি বটে, তবে তাঁদের দোড়, অনুশীলন ব্যর্থ হয়নি। পূর্বাঞ্চলার সাহিত্যপত্রিকার ইতিহাসে এর নাম উজ্জ্বলরূপে শোভিত হবে।

### তথ্যপঞ্জি

১. আহমদ রফিক, ‘নাগরিক’-এর আসা যাওয়া, ‘সাহিত্য সাময়িকী’ সম্পাদক শিরীণ সুলতানা, প্রকাশক : রূপম প্রকাশনী, বর্ষ, শীত সংকলন, ডিসেম্বর ১৯৮৮, পৃ. ১৯১।
২. পূর্বোক্ত, পৃ ১৯৯। সৈয়দ আবুল মকসুদও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এক সাক্ষাৎকারে বলেন, পাকিস্তান আমলের ঐ সন্ত্রাসের রাজত্বে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের চাকুরে জিয়াউল হক আমাদেরকে সরকারি মনোভাব পূর্বাঙ্কেই জানিয়ে সতর্ক করে দিতেন। পুলিশের, গোয়েন্দা বিভাগের কর্মচারীরা মাঝে-মাঝে, প্রেসে এবং বিভিন্ন জায়গায় হানা দিয়ে আমাদেরকে সন্ত্রস্ত রাখতো। পত্রিকাটির প্রতি জিয়াউল হকের আন্তরিকতা এবং ব্যক্তিগত ঋণের স্বীকৃতিস্বরূপই সৈয়দ আবুল মকসুদ জিয়াউল হকের ছদ্মনামে দু’একটি আলোচনা লিখেছিলেন। জিয়াউল হক কিছুদিন পূর্বে দেহত্যাগ করেন।
৩. আবদুল হক, সাম্রাজ্যবাদের অস্তিম মুহূর্তে, নাগরিক ৪ বর্ষ, ২ সংখ্যা, ১৩৭৫, পৃ. ৫। সংখ্যাটিতে মাসের নাম উল্লেখ নেই। তবে আবদুল হকের রচনায় ১৯৬৮ সনের তথ্য রয়েছে বলে ১৯৬৯ এর রচনা বলে মনে হয়।
৪. আহমেদ হাম্মান, গোর্কি ও সাহিত্যের আদর্শ, নাগরিক, ৪ বর্ষ, ১ সংখ্যা, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৭৫, পৃ. ৩।
৫. আবদুল কাদির, শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি, নাগরিক ২ বর্ষ, ৪ সংখ্যা, কার্তিক-পৌষ, ১৩৭৪, পৃ. ৭।
৬. শাহাবুদ্দীন আহমদ, সাহিত্যপত্রিকা প্রকাশের সমস্যা, নাগরিক, ৪ বর্ষ, ১ সংখ্যা, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৭৫, পৃ. ২৭-৩২।
৭. আহমদ রফিক, নাগরিকের আসা-যাওয়া, পূর্বোক্ত।

## ষষ্ঠ অধ্যায় উপসংহার

বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের বিকাশের চূড়ান্ত পর্যায়ে ১৯৪৭ সনে সৃষ্টি হয়েছিল পাকিস্তান। তার আগেই লক্ষ্য করি যে, রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩) ; ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-৯১) ; মাইকেল মদুসূদন দত্ত (১৮২৪-৭৩) ; বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-৯৪) ; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) ; দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩) ; প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬) ; শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮) ; সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২) ; রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪-১৯১৯) ; রাজশেখর বসু (১৮৮০-১৯৬০) ; মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২) ; কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০) ; বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০) ; কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) ; জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪) ; আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৭-১৯৭৯) ; তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১) ; সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-৬০) ; জসীমউদ্দীন (১৯০৩-৭৬) ; আবুল ফজল (১৯০৩-৮৩) ; বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-৭৪) ; আবু সয়ীদ আইউব (১৯০৬-৮২) ; মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯১০-৫৬) ; ফররুখ আহমদ (১৯১৮-৭৪) ; সুকান্ত ভট্টাচার্য (১৯২৭-৪৭) প্রমুখ কবি-সাহিত্যিক এবং বঙ্গদর্শন, ভারতী, সাধনা, সবুজপত্র, সওগাত, কল্লোল, শিখা, কালিকলম, কবিতা, পরিচয়, বুলবুল, অগ্রগতি, মোহাম্মদী, চতুরঙ্গ প্রভৃতি সাহিত্যপত্রিকার সাধনায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এমন উৎকর্ষ ঘটে যে বিংশ শতাব্দীর প্রথম চার দশকের মধ্যেই বিশ্বসাহিত্যের বিচারে কয়েকটি ভাষা ও সাহিত্যের সমকক্ষ হতে না পারলেও ভারতের সকল ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্টতো হয়েছিল বটেই, জাপান, চীন, ইন্দোচীন, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশের ভাষা ও সাহিত্যের থেকে উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল।

এদেশে ইংরেজ শাসন ও সে সুবাদে ইউরোপীয় দর্শন ও সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রভাবেই এই ফলাভাষ ঘটেছিল সন্দেহ নেই ; কিন্তু ইংরেজ-শাসনের প্রভাব বিশ্বের আরো বহু দেশে এবং অঞ্চলেই পড়েছিল বা ঘটনার অবকাশ সৃষ্টি হয়েছিল ; কিন্তু সাধনার ঐকান্তিকতায় এবং মেধার কৌলীণ্যে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ; এমনকি নোবেল প্রাইজ লাভের সৌভাগ্যও হয়েছিল। বিষয় চিন্তা ও প্রকরণগত দিক থেকে বিশ্বসাহিত্যের প্রায় সর্বপ্রকারের নিদর্শন উজ্জ্বল না-হলেও বাংলায় পাওয়া সম্ভব হচ্ছিল। এই সময় কলকাতাই ছিল বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সংস্কৃতির মূলকেন্দ্র। সমাজে ব্যক্তিস্বাধীনতা, দেশপ্রেম, জাতীয়তাবাদী ধ্যান-ধারণা এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা কিংবা আর্থিক নিশ্চয়তার দাবিও

সোচ্চার হয়েছিল। এই রাজনৈতিক সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক বিকাশের পূর্বে পাক-ভারত উপমহাদেশের 'হিন্দু' ও 'মুসলমান' ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে ভারতের অঞ্চলগুলোকে পুনর্বিন্যাসিত করে 'পাকিস্তান' সৃষ্টি করে নিয়েছিল বা ভারত বিভক্ত করে দিয়েছিল। ফলে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির নতুন রাজধানী 'ঢাকা' কে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্য আবার একটি গাছের নতুন কাণ্ডের মতো বিকশিত হতে আরম্ভ করে।

বস্তুত সূচনাপর্বে ঢাকা কেন্দ্রিক সাহিত্যের স্ট্যাণ্ডার্ড পূর্বসৃষ্ট সাহিত্যের সমমানের না-হলেও নিম্নতম পর্যায় থেকেই 'বাংলাদেশের সাহিত্যের' যাত্রা আরম্ভ হয়। 'বাংলাদেশের সাহিত্য' অভিধায় একান্তরের স্বাধীনতা সংগ্রামের অব্যবহিত পরে গড়ে উঠলেও সাতচল্লিশের পরবর্তী পূর্ববাঙলায় পূর্ববঙ্গবাসী লেখকসাহিত্যিকদের সার্বিক প্রয়াসকে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। কিন্তু সাতচল্লিশ-একান্তর সময়কালে 'বাংলাদেশের সাহিত্য' বা পূর্ববাঙলার বাংলা সাহিত্যের স্বরূপ বা বৈশিষ্ট্য নিয়ে যে বিতর্ক হয়েছে, তাতে স্পষ্টতই দ্বিধা-দ্বন্দ্ব এবং চিন্তার অস্পষ্টতা লক্ষ্য করা যায়।

'পূর্বপাকিস্তানের সাহিত্যের ধারা সম্পূর্ণ বাংলার সাহিত্যের ধারা থেকে হবে ভিন্ন' এই উক্তির মধ্যে ব্যাখ্যার অনেক অবকাশ থাকলেও তৎকালে স্পষ্ট করে এই কথা খুবই কম বলা হয়েছে যে, স্বতন্ত্র পররাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক নিয়মরীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বা পরিচালিত পূর্ববাঙলার সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ, নৈতিক মানদণ্ড এবং সাহিত্যের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত জনজীবনের প্রকৃতি ভিন্নতর বৈশিষ্ট্যেরই হবে। তাই প্রায় সকল পত্রিকার অনেকাংশ আলোচনায় সমগ্র বাংলার সাহিত্যের ধারাকে স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতি দানের স্থূল বক্তব্যই প্রাধান্য পেয়েছে। বঙ্গবিভাগের পর দুটি স্বতন্ত্র আধুনিক সংজ্ঞায় বিবেচ্য রাষ্ট্রের আওতায় পড়ে বাংলা সাহিত্য যে দুটি স্বতন্ত্র কাণ্ডের অভিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় পল্লবিত হয়ে চলবে এই সত্যটি তখন সহজভাবে মেনে না নিলেও বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর এ ব্যাপারে আর সংশয়ের অবকাশ নেই।

কারণ এতদিনে এই সাহিত্য প্রায় অর্ধশতাব্দীর প্রৌঢ়ের পরিপক্ব, স্বতন্ত্র, স্পষ্টিকৃত ব্যক্তিত্ব নিয়ে স্বমহিমায় দাঁড়িয়ে গেছে। পূর্ববঙ্গ থেকে রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলনের চেতনাজাত যে সাহিত্য, মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় সম্প্রুখ-সমরে প্রবৃত্ত হবার উদাস আহ্বান সমৃদ্ধ বিপ্লবীসাহিত্য, এসবই সৃষ্টি হয়েছে পূর্ববাঙলার কবি সাহিত্যিকদের হাতে। কারণ তাঁরা সাতচল্লিশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করলেও সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক অপরূদ্ধদশার মোচন দেখতে পাননি ; পক্ষান্তরে ভারতের অঙ্গরাজ্য, পশ্চিম বঙ্গের বাংলাভাষী কবি-সাহিত্যিকদের সম্প্রুখে এই বাস্তব সমস্যা-সংকুল সামাজিক পরিস্থিতি ছিল না। তাঁদের স্বার্থ এবং অগ্রগতির ভাবনা সংশ্লিষ্ট হয়ে গিয়েছিল গোটা ভারতবর্ষের প্রায় শতকোটি অধিবাসীর স্বার্থের সঙ্গে।

অবশ্য বাংলাদেশ যে সৃষ্টি হয়েছে সেই সৃষ্টির প্রেরণা যুগিয়েছে এতদাঞ্চলের বাংলাসাহিত্য পত্রিকাগুলো। এসবের মধ্যে আবার ষাটের দশকের আগে প্রকাশিত সাহিত্যপত্রিকা যেমন মোহাম্মদী, মাহেনও, দিলরুবা, নওবাহার, তাহজিব, লেখক সংঘ

পত্রিকা, পরিক্রম, সংলাপ প্রভৃতিতে পাকিস্তানি আদর্শে বিশ্বাসী ধ্যান ধারণাই স্বেচ্ছার ছিল। সাহিত্যপত্রিকাগুলোর মধ্যে তুলনামূলকভাবে এই ধারাই প্রবল দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু ১৯৫৮ সনের সামরিক শাসনের পরে, ১৯৬৪ সন থেকে রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্ম পুনরুজ্জীবিত হলে বা ১৯৬৫র নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এবং কিছুকাল পরে পাক-ভারত যুদ্ধ, সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের সংগে সাংস্কৃতিক চুক্তি ও তৎপরবর্তী ছয়-দফা আন্দোলনের ফলে পাকিস্তানবাদী, ইসলামী পুনরুজ্জীবনকামী ধারা দুর্বল হতে থাকে, সবল সক্রিয় ও সম্মানীয় প্রগতিশীল ধারারূপে বিকশিত হতে থাকে মানবতাবাদী বাঙালি জাতীয়তাবাদী ধারা।

ইমরোজ, সওগাত, সমকাল, পূবালী, পূর্বমেঘ, কণ্ঠস্বর, পলিমাটি, উত্তরণ, নাগরিক এবং এতদানুসারি অসংখ্য অনিয়মিত ক্ষুদ্র পত্রিকা ও সংকলন প্রভৃতির বক্তব্য এবং বিকাশের প্রক্রিয়া লক্ষ্য করলেই একথা প্রমাণিত হয়। ষাটের দশকে হঠাৎ করে একসঙ্গে একঝাঁক পত্রিকা প্রকাশিত হয়—যেগুলো মানবতাবাদী বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনাধারাকে পৃষ্ঠপোষকতা দান করেছিল। সমকালের ধারার পরিণতি লক্ষ্য করলে, এটা যেমন স্পষ্ট হয়, তেমনি বিপরীত দিকে পাকিস্তানের আদর্শে বিশ্বাসী ধর্মীয় ধারার পত্রিকাগুলোর পরিণতি দেখলেও তা প্রকটিত হয়। মাহেনও, মোহাম্মদী, আল-ইসলাহর ধারায় ১৯৬৫ সনের পরে আর কোনো ধার ছিল না, ক্ষয়িষ্ণু মৃত প্রায়, পত্রিকা ধরলেই তা মনে হয়।

উপরন্তু পাকিস্তানি আদর্শে বিশ্বাসী পত্রিকাগুলোর মধ্যে ষাটের দশকের দ্বিতীয়ার্ধে যেগুলো প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলোর রচনার বক্তব্যের মধ্যেও ব্যাপক পরিবর্তন দেখা যায়। পাকিস্তান সরকার যে পূর্ববঙ্গবাসীদের অবিশ্বাসীর বা সন্দেহের চোখে দেখে, তা তাঁরাও অভিযোগ আকারে প্রকাশ করতে থাকেন এবং চাপা বিক্ষোভ কিছু কিছু প্রকাশ করছিলেন, তবে বাঙালি জাতীয়তাবাদকে সমর্থন তাঁরা করতে পারছিলেন না ; এক্ষেত্রে তাঁরা হতে পেরেছিলেন ‘মানবতাবাদী’। কারণ মানবতাবাদী হতে কারোরই বাধা নেই। পাকিস্তানবাদী হয়েও যেমন মানবতাবাদী হওয়া যায়, বাঙালি জাতীয়তাবাদী হয়েও তেমনি মানবতাবাদী হওয়া যায়।

পক্ষান্তরে পাকিস্তানবাদি হলেও মানবতাবাদী নন এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদী হলেও মানবতাবাদী হতে পারেন না—এমনও দেখতে পাওয়া যায়। তবে পাকিস্তানবাদী ধারা নিষ্ক্রিয় হয়ে অথবা মানবতাবাদী চারিত্র্য ধারণ করার ফলে ষাটের দশকের শেষার্ধে গিয়ে অধিকাংশ পত্রিকা বাঙালি জাতীয়তাবাদী অথবা এই ধারার সহায়ক-সহযোগী মানবতাবাদী হয়ে পড়ে। মার্কসীয় মতাদর্শের অনুসারী-অনুরাগীরাও মার্কসবাদের প্রতি ধর্মভীরু বাঙালিদের আনুগত্য হালকা বলে মানবতাবাদী ধারাকেই পুষ্ট করেছেন। ১৯৭০-৭১-এ বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে যে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়, তার মূলে এই ধারার চিন্তার বিকাশে সহায়ক হয়েছে যেসকল সাহিত্যপত্রিকা—সেগুলোর কৃতিত্বই সর্বাধিক।

কিন্তু সাহিত্যিকদের ব্যর্থতা হচ্ছে পাকিস্তান আমলে সাহিত্যপত্রিকার যে ধারাটি সচল রেওয়াজের ন্যায় গড়ে উঠেছিল বাংলাদেশ-আমলে তা প্রায় একেবারে স্তব্ধ হয়ে যায়। বাংলাদেশের সাহিত্য সংস্কৃতি ও সমাজের অগ্রগতিতে সাতচল্লিশ-একাত্তর পর্বের

সাহিত্যপত্রিকাগুলো যতো অনিয়মিত, বিক্ষিপ্ত, স্বল্পায়ুই হোকনা কেন, যে অনন্যসাধারণ ভূমিকা রেখেছিল, বাংলাদেশ আমলে তা রক্ষা করতে অনেকটা ব্যর্থ হয়। পাকিস্তান আমলের সাহিত্যপত্রিকার কর্ণধারেরা বাংলাদেশ আমলে সাহিত্যপত্রিকা কিংবা বাঙালি জাতীয়তাবাদী মানবতাবাদী সাহিত্য-সংস্কৃতিচিন্তার গতিধারাকে সক্রিয় রাখতে ব্যর্থ হন, প্রবল করার প্রস্নই ওঠে না।

এখন সাতচল্লিশ থেকে সত্তর যতোদূর, সত্তর থেকে ততোখানি দূরত্বে এসে একাত্তরের ক্ষয়িষ্ণু ধারাটিই পুনরুজ্জীবিত হয়েছে, পত্রপত্রিকা যা বের হয়, তাতে মোহাম্মদী-মাহেনও-দিলরুবাই যেনো নতুন নামে বিচিত্র রূপে প্রকাশিত হচ্ছে বলে মনে হয়। সমকালের ধারাটি এখন অবরুদ্ধ। চাপের মধ্যে মৃতপ্রায় ক্ষীণায়ু কৃশকায়। ঔপনিবেশিক আমলে এদেশ থেকে একই সঙ্গে একগুচ্ছ মাসিক দ্বিমাসিক ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল।

পাকিস্তানের প্রায় সমানবয়সী স্বাধীন বাংলাদেশ আমলে একটি দুটি মাসিক সাহিত্যপত্রিকাও নিয়মিত প্রকাশিত হয়নি। দুই তিনটি পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের আশ্বাস দিয়েও পৃষ্ঠপোষকতার অথবা পাঠক এর অভাবে মৃত্যুবরণ করেছে। এমনকি সাহিত্য সংস্কৃতির চর্চা এখন নিতান্তই অপাৎক্রেয় পেশা রূপে গণ্য হয়েছে। বৈশ্যবৃত্তির সাফল্য নেই যে সাহিত্যকর্মে—তা এখন অবজ্ঞার শিকার। সাহিত্যপত্রিকার প্রতি সমাজের আগ্রহ বর্তমানে স্তিমিতপ্রায়।

এই অবস্থা কাটিয়ে ওঠার জন্য দরকার সমকাল-পূর্বমেঘের মতো একদল নিয়মিত মাসিক দ্বিমাসিক-ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্রিকার আবির্ভাব। এ ঘটনা যতো দেরিতে না ঘটবে, ততোই সমাজের জন্য কল্যাণকর হবে।

## পরিশিষ্ট—ক

প্রথম প্রকাশের সন ও সম্পাদকের নামসহ  
আলোচিত পত্রিকার নাম (বর্ণানুক্রমিক)

অগত্যা ১৯৪৯ ফজলে লোহানী  
অন্ন চাই আলো চাই ১৯৪৯ মহীউদ্দিন  
অভিযান ১৯৫৪ মোঃ আকবর হোসেন বি. এ.  
অতএব ১৯৬০ মহসিন আলী দেওয়ান  
আল-ইসলাহ্ ১৯৩২ মওলবী মুহম্মদ নূরুল হক  
ইমরোজ ১৯৪৯ মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ  
উত্তরণ ১৯৫৮ এনামুল হক  
উত্তর-অন্বেষা ১৯৬৭ ময়হারুল ইসলাম  
একান্ত ১৯৬৭ মোঃ আবদুল মান্নান  
কৃষ্টি ১৯৪৭ সুধাংশু রায়, প্রভাত সরকার প্রমুখ  
কণ্ঠস্বর ১৯৬৫ আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ  
কিছুধ্বনি ১৯৭০ বেবী আনওয়ার  
গণমন ১৯৬৬ আবদুর রাজ্জাক  
ছোটগল্প ১৯৬৮ কামাল বিন মাহতাব  
জাগরী ১৯৫৬ হেমায়েত হোসেন  
তাহজিব ১৯৫০ সৈয়দ আবদুল মান্নান  
দ্যুতি ১৯৪৯ আবেদ আলী  
দিলরুবা ১৯৪৯ কাজী মোতাহার হোসেন  
দিশারী ১৯৫০ হাবীবুর রহমান ও একরামুল হক  
দিগন্ত ১৯৫৩ বেগম এম. ই. খান  
দিগন্ত ১৯৬৬ আবদুল কাদির মাহমুদ  
নওরোজ ১৯৪২ মোহাম্মদ দেলওয়ার হোসেন বি. এল.  
নওবাহার ১৯৪৯ মাহফুজা খাতুন  
নাগরিক ১৯৬৪ বোরহান উদ্দিন ভূঁইয়া  
পরিচিতি ১৯৫১ মফিজিউল হক (সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি)

প্রাচী ১৯৫৭ সুচরিত চৌধুরী ও ওয়ালী আহমেদ  
 পরিচিতি ১৯৫৯ সুবোধ দাশগুপ্ত  
 পূর্বমেঘ ১৯৬০ জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী ও মুস্তাফা নূরউল ইসলাম  
 পরিচয় ১৯৬০ রোকেয়া সুলতানা  
 পূবালী ১৯৬০ মোঃ নূরুল ইসলাম  
 পূর্ববী ১৯৬০ গোলাম মোস্তফা ও মুহম্মদ আবদুল হাই  
 প্রবাহ ১৯৬১ এস. এম. রহমান  
 পরিক্রম ১৯৬২ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ও রফিকুল ইসলাম  
 পূর্বলেখ ১৯৬৬ ভুঁইয়া ইকবাল  
 পলিমাটি ১৯৬৪ ফজলুল হক সরকার  
 পূর্বাশা ১৯৭০ আবদুল জব্বার  
 বিবর্তন ১৯৬০ আবদুল মান্নান ভুঁইয়া  
 বই বিচিত্রা ১৯৬০  
 বর্তমান ১৯৬২ মাহবুব জামিল  
 বিচিত্রিতা ১৯৬২ খালেদা রহমান  
 বর্ণালী ১৯৬৪ ওসমান গনি  
 বই ১৯৬৫ সরদার জয়েনউদ্দীন  
 বনানী ১৯৬৬ তাজুল ইসলাম ও মোহাম্মদ নূরুল আমিন  
 বালার্ক ১৯৭০ শা. ম. শ. আরেফিন বাদল  
 মোহাম্মদী ১৯২৭ মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ  
 মাহেনও ১৯৪৯ আবদুর রশিদ  
 মুক্তি ১৯৫০ আবদুল গনি হাজারী ও মাহবুব জামাল জাহেদী  
 মেঘনা ১৯৫৭ আবদুল গাফফার চৌধুরী  
 মৌসুম ১৯৬৪ মীজানুর রহমান শেলী  
 মেঘনা ১৯৬৭ সেকান্দার হয়াৎ মজুমদার  
 যাত্রিক ১৯৫৩ আবদুল আলীম চৌধুরী ও আহমদ কবির  
 যাত্রী ১৯৬০ খোন্দকার আমিনুল হক ও খোন্দকার সিরাজুল হক  
 যুববাণী ১৯৬০ মুহম্মদ ওসমান গনি  
 লেখক সংঘ পত্রিকা ১৯৬১ গোলাম মোস্তফা  
 সওগাত ১৯১৮ মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন  
 সীমাস্ত ১৯৪৭ মাহবুব উল আলম চৌধুরী ও সুচরিত চৌধুরী  
 সৎকেত ১৯৪৮ সিরাজুর রহমান  
 সমকাল ১৯৫৭ সিকান্দার আবু জাফর  
 স্পন্দন ১৯৫৩ মহিউদ্দীন আহমদ

সংলাপ ১৯৬১ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন ও আবুল হোসেন

সাহিত্য ১৯৬০ হেমায়েত হোসেন

সুন্দরম্ ১৯৬৩ আবুল কাসেম ফজলুল হক

স্বাক্ষর ১৯৬৩ রফিক আজাদ ও সিকদার আমিনুল হক

স্বদেশ ১৯৬৩ মফিজউদ্দিন আলী মহামেদ চৌধুরী

সৈকত ১৯৬৩ মাসুদ আহমেদ

সুনিকেত মল্লার ১৯৬৭ মহসিন রেজা

সুরভি ১৯৬৮ কাজী মোহাম্মদ ইউসুফ

সাম্প্রতিক ১৯৭০ আমিনুল ইসলাম বেদু



## পরিশিষ্ট-খ

### সাহিত্যপত্রিকা ও সাময়িকপত্র বিষয়ে গবেষণার ঐতিহ্য ও সাম্প্রতিক প্রবণতা (তথ্যসূত্র বা গ্রন্থপঞ্জির পরিবর্তে)

আজ যা সাহিত্য পত্রিকা হিসেবে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত, একশ বছর আগেও তা পরিচায়িত হতো 'সাময়িকপত্র' অভিধায় ; এবং আরও কিছু আগে 'সাহিত্য', 'সংবাদের' সঙ্গে মিশে একই আধারে প্রকাশিত হওয়ায় সাহিত্য পত্রিকার আলোচনায় সাময়িকপত্রের প্রসঙ্গ অনিবার্যভাবে চলে আসে। উদ্ভব-বিকাশের ইতিহাস পর্যালোচনায় সংবাদপত্র প্রকাশের আদি কাহিনী দিয়েই সকল গবেষক তাই কথা আরম্ভ করেন।

সাহিত্য পত্রিকার ওপরে গবেষণার ধারা সম্প্রতি সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু প্রথমে সাময়িকী ও সংবাদপত্র নিয়েই গবেষণার সূত্রপাত হয়। সংবাদপত্র প্রকাশের ন্যায় ভারতবর্ষের সংবাদ-সাময়িকপত্র নিয়ে গবেষণারও পথ প্রদর্শন করেন একজন বিদেশী, এবং তা ইংরেজি ভাষায়। রেভারেণ্ড জেমস্ লঙ প্রণীত 'The Return of the names of 515 persons connected with the Bengali literature during the last fifty years' (কলকাতা ১৮৬৮?) এক্ষেত্রের একটি অবিস্মরণীয় কীর্তি। 'Returns Relating to publications in the Bengali language, in 1857 ; to which is added a list of the native Press with the Books Printed of each, their price and charecter, with notice of the past condition and Future prospective of the vernacular Press of Bengal, Calcutta 1859 এর ভূমিকাংশ 'Report on the native Press in Bengal' 'বাংলা ছাপাখানা ও প্রকাশনা' নামে অনূদিত হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা বিভাগের 'সাহিত্য পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয়। বাকী অংশ বাংলা ছাপাখানা ও পুস্তকের তালিকাটি সংকলিত হয় 'লঙ সাহেবের ক্যাটালগ' নামে। মুহম্মদ হাবিবুর রশিদ অনূদিত 'আদিপর্বে বাংলা প্রকাশনা ও সাংবাদিতা' শিরোনামে এটা প্রকাশিত হয়েছে (১৯৮৮) বাংলা একাডেমী, ঢাকা থেকে।

প্রকৃতপক্ষে বাংলা ভাষায় বাংলা সাময়িকপত্র নিয়ে গবেষণার পথিকৃত কেদারনাথ মুজুমদার (বঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য, প্রথম খণ্ড ১৩২৪ ; ১৯১৭)। তাঁকে অনুসরণ করেন ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর 'বাংলা সাময়িকপত্র' (১ম ও ২য় খণ্ড) এবং 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' (১ম ও ২য় খণ্ড) প্রকাশের পর সমাজবিজ্ঞানী ও বিশিষ্টগবেষক বিনয় ঘোষ অনুপ্রাণিত হয়ে 'সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র' (৫ খণ্ড) প্রকাশ করেন। এর পর

পত্রপত্রিকা নিয়ে গবেষণার একটা ধারা সৃষ্টি হলো। অতঃপর বিভিন্ন গবেষক ও লেখক সাময়িকপত্র নিয়ে গবেষণার তথ্য তথ্য সংকলন ও সংগ্রহের ব্যাপারে উৎসাহী হয়ে ওঠেন। ফলে, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠান থেকে অধ্যাপক, গবেষকদের দ্বারা বিশেষ সময়ের ও বিশেষ পত্রিকা অবলম্বন করে গবেষণার ধারা সৃষ্টি হয়।

পূর্ব বাঙলা থেকে বিশেষ করে মুসলিম সম্পাদিত পত্র-পত্রিকার ইতিহাস ও তথ্য সংকলনের আগ্রহ দেখা যায়। সাম্প্রতিক কালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার অনুসন্ধান এবং গবেষণার প্রবণতাও দেখা যাচ্ছে। পশ্চিম বাঙলায় ১৯৪৭ পূর্ববর্তীকালের প্রধান সাহিত্য ও সাময়িকপত্রিকা নিয়ে অনেক কাজ হয়েছে। এই সমস্ত কাজের উদ্দেশ্য ও প্রকৃতিতে অন্তত চারটি ধরণ লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত বিশেষ পত্রিকার ইতিহাস ও সূচীপত্র সংকলন এবং বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতির ক্ষেত্রে প্রতিফলিত ভূমিকা বিশ্লেষণ। দ্বিতীয়ত কোনো বিশেষ বিশেষ পত্রিকার ভূমিকা নির্ধারণ। তৃতীয়ত ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে উনিশ ও বিশ শতকের পত্র-পত্রিকার অবলম্বন ও বিচার বিশ্লেষণ। এবং চতুর্থত উনিশ শতকের পত্র-পত্রিকা অবলম্বন করে কলকাতা ও ঢাকা শহরের ইতিবৃত্ত রচনা এবং বিশেষ ব্যক্তিত্বের জীবনী প্রণয়ন ইত্যাদি। এ পর্যন্ত সাময়িকী বা সাহিত্যপত্রিকা নিয়ে যে সমস্ত গবেষণা কিংবা পুস্তক প্রণীত হয়েছে এক নজরে তা দেখা যেতে পারে :

১. কেদারনাথ মজুমদার—বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য, ঢাকা ১৯১৭।
২. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—বাংলা সাময়িকপত্র, ১ম ও ২য় খণ্ড কলকাতা ১৩৪৬ ও ১৩৫৮।
৩. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম ও ২য় খণ্ড, কলকাতা, ১৩৩৯ ও ১৩৪০।
৪. বিনয় ঘোষ—সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ১-৫ খণ্ড, কলকাতা (১৯৬৩/১৯৮১)।
৫. পার্থ চট্টোপাধ্যায়—বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙ্গালীর নবজাগরণ (১৮১৮-১৮৭৫) কলকাতা ১৯৭৭।
৬. আনিসুজ্জামান—মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র, ঢাকা ১৯৬৯।
৭. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম—সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত, ঢাকা ১৯৭৭।
৮. মুনতাসীর মামুন—উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদসাময়িকপত্র (৯ খণ্ড), ঢাকা ১৯৮৫-২০০২।
৯. তারাপদ পাল—ভারতের সংবাদপত্র, কলকাতা ১৯৭২।
১০. কাজী আবদুল মান্নান—আধুনিক সাহিত্যে মুসলিম সাধনা, ঢাকা ১৯৬১ ; ২য় সং ১৯৬৯।
১১. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—সাময়িকপত্র সম্পাদনে বঙ্গনারী, কলকাতা ১৩৫৭।
১২. রথীন্দ্রনাথ রায়—বাংলা সাহিত্যে প্রথম চৌধুরী, কলকাতা ১৯৫৮।
১৩. মাহেন্ড—সংকলন, পাকিস্তান পাবলিকেশনস, ঢাকা ১৯৫৩।
১৪. মুসলিম বাংলা সাময়িকপত্র, ঐ, ঢাকা ১৯৬৬।

১৫. সত্যনারায়ণ দাশ—বঙ্গদর্শন ও বাঙালির মনন-সাধনা, কলকাতা ১৯৭৪।
১৬. অমিত্রসুন্দর ভট্টাচার্য—বঙ্কিমচন্দ্র ও বঙ্গদর্শন, কলকাতা ১৩৭৮।
১৭. ইন্দুমিত্র—ইতিহাসে আনন্দবাজার, কলকাতা ১৯৭৫।
১৮. আনন্দসঙ্গী (২য় সং, আনন্দবাজার এর নির্বাচিত সংবাদ-সংকলন), আনন্দবাজার প্রকাশন, কলকাতা ১৯৭৫।
১৯. নির্মলেন্দু ভৌমিক—সাহিত্য পত্রিকার পরিচয় ও রচনাপঞ্জী, কলকাতা ১৩৮৩।
২০. সুনীল দাস—ভারতী : ইতিহাস ও রচনাপঞ্জী, কলকাতা ১৯৮৪।
২১. আতোয়ার রহমান—বাংলাদেশের শিশুপত্রিকা, ঢাকা ১৯৭৭।
২২. হিরণ কুমার স্যামাল—‘পরিচয়’ এর কুড়িবছর ও অন্যান্য স্মৃতিচিত্র, কলকাতা ১৯৭৮।
২৩. প্রভাতকুমার দাস—‘কবিতা’ পত্রিকা : সৃষ্টিগত ইতিহাস, কলকাতা ১৯৮৯।
২৪. সুনীল দাস (সম্পাদক)—জয়শ্রী সুবর্ণ জয়ন্তী গ্রন্থ, কলকাতা ১৯৮৩।
২৫. অশোককুমার কুণ্ডু—পত্রিকাপঞ্জী, কলকাতা ১৩৮৯।
২৬. নরহরি কবিরাজ—উনিশ শতকের বাঙলার নবজাগরণ ও তর্ক-বিতর্ক (সম্পাদনা), কলকাতা ১৯৮৪।
২৭. হরিপদ ভৌমিক—সেকালের সংবাদপত্রে কলকাতা, ১ম ও ২য় খণ্ড, কলকাতা ১৯৮৭ ও ১৯৮৮।
২৮. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত—কল্লোল যুগ, কলকাতা ১ম সং ১৩৫৭, সপ্তম প্রকাশ ১৩৯৫।
২৯. জীবেন্দ্র সিংহ রায়—কল্লোলের কাল, কলকাতা ১ম সং ১৯৭৩ ; পরিবর্ধিত দেজ সং ১৯৮৭।
৩০. জীবেন্দ্র সিংহ রায়—প্রমথ চৌধুরী (সবুজপত্রের ইতিহাস), কলকাতা, ১৯৫৪/১৯৮৬।
৩১. সোনা মনি চক্রবর্তী—শনিবারের চিঠি ও আধুনিক বাংলা সাহিত্য, কলকাতা ১৯৯২।
৩২. আশু চট্টোপাধ্যায়—কল্লোল যুগের পরে, কলকাতা ১৯৯৩।
৩৩. খন্দকার সিরাজুল হক—মুসলিম সাহিত্য সমাজ : সমাজচিন্তা ও সাহিত্যকর্ম, ঢাকা ১৯৮৪।
৩৪. লায়লা জামান—সওগাত পত্রিকার সাহিত্যিক অবদান ও সামাজিক ভূমিকা, ঢাকা ১৯৮৯।
৩৫. রবিন পাল—কল্লোলিত ছোট্টগল্প, কলকাতা ১৯৮৮।
৩৬. রবিন পাল—কল্লোলের কোলাহল ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, কলকাতা ১৯৮০।
৩৭. প্রাণকম্ব দত্ত—কলিকাতার ইতিবৃত্ত, কলকাতা ১৯৮১।
৩৮. রাধারমণ মিত্র—কলিকাতা দর্পণ, ১৯৮০/১৯৮৮।
৩৯. অতুল সুর—৩০০ বছরের কলকাতা : পটভূমি ও ইতিকথা, কলকাতা ১৯৯১।
৪০. কানাইলাল চট্টোপাধ্যায়—সাময়িকপত্রে সমাজচিত্র : সঞ্জীবনী, (সম্পাদনা ও সংকলন), কলকাতা ১৯৮৯।

৪১. শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ—পরিচয় এর আড্ডা, কলকাতা ১৯৯০।
৪২. মোহাম্মদ আবদুল কাইউম—সাময়িকপত্রে সাহিত্যিক-প্রসঙ্গ, ঢাকা ১৯৯০।
২৩. সৌম্যেন্দ্রনাথ বসু—বিদেশী ভারত সাধক, কলকাতা ১৩৬৮।
৪৪. নন্দরাণী চৌধুরী—সাময়িকপত্রে রবীন্দ্র প্রসঙ্গ ; শান্তিনিকেতন (?)
৪৫. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান—সাময়িকপত্রে সাহিত্য চিন্তা : সওগাত, ঢাকা ১৯৮১।
৪৬. সাময়িকপত্রে রবীন্দ্র প্রসঙ্গ : প্রবাসী (১৩০৮-১৩৪৮) (?)।
৪৭. সৌম্যেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়—স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য, কলকাতা ১৯৬০।
৪৮. মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন (সংকলিত, সম্পাদিত)—বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ, ঢাকা ১৯৮১।
৪৯. শামসুল হক—বাংলা সাময়িকপত্র (১৯৪৭-৭১) ঢাকা ১৯৭৩।
৫০. শামসুল হক—বাংলা সাময়িকপত্র—(১৯৭২-৮৩) ঢাকা ১৯৮৪।
৫১. আমিরুল মোমেনিন—একুশের সংকলন : গ্রন্থপঞ্জী (১৯৫৩-৮৯), ঢাকা ১৯৯১।
৫২. মুহাম্মদ মজিরউদ্দিন মিয়া—বাংলাদেশের গবেষণা-পত্রিকা, ঢাকা জুন ১৯৯২।
৫৩. মুহাম্মদ আবদুর রাজ্জাক—বাংলা একাডেমী গবেষণা পত্রিকা : ত্রিশ বছরের প্রবন্ধপঞ্জী, ঢাকা ১৯৮৯।
৫৪. গৌতম ভট্টাচার্য—কল্লোলে রবীন্দ্রনাথ, কলকাতা ১৩৯৪।
৫৫. গৌতম ভট্টাচার্য—বিচিত্রায় রবীন্দ্রনাথ, কলকাতা, ১৯৯৩।
৫৬. মীনাক্ষী দত্ত—‘কবিতা’ সংকলন (১,২,৩), কলকাতা ১৯৮৯।

এসব পুস্তক ব্যতীত সুকুমার সেন, শশীভূষণ দাশগুপ্ত, প্রমথনাথ বিশী, গোপাল হালদার, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, আশুতোষ ভট্টাচার্য, অতিকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূদেব চৌধুরী প্রমুখ গবেষকের সাহিত্যের ইতিহাস, ইতিবৃত্ত এবং সমালোচনামূলক গ্রন্থগুলোতে সাময়িকপত্রিকা বা সাহিত্য পত্রিকার ওপর স্বতন্ত্র ও প্রাসঙ্গিক আলোচনাগুলোর কথা এখানে স্মরণ করতে হবে। এইসব লেখকের পরবর্তী অনুসারীদের কোনো না কোনো ভাবে উনিশ ও বিশ শতকের সংবাদ, সাময়িকী ও সাহিত্য-পত্রিকাগুলোর ওপর আলোকপাত লক্ষ্যযোগ্য। সমস্ত আলোচনার তালিকা প্রস্তুতও এক স্বতন্ত্র গবেষণার দাবি করতে পারে।

এছাড়া একগুচ্ছ প্রবন্ধও প্রকাশিত হয়েছে। সাময়িকী, সাহিত্য-পত্রিকার ওপর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগ-এর ছাত্র-ছাত্রীরা ও কিছু গ্রন্থপঞ্জী তৈরি করেছেন। এসব মিলিয়ে একটি তালিকা করলে এরকম দাঁড়ায় :

১. আবদুল হক—ঢাকার মুসলিম সাহিত্য সমাজ, সাহিত্য ঐতিহ্য মূল্যবোধ, ১৯৬৮।
২. আবদুল হক—‘সমকাল’-এর ভূমিকা, নিঃসঙ্গ চেতনা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, ঢাকা ১৯৮৪।
৩. আবদুল কাদের—ঢাকা থেকে প্রকাশিত সাময়িকপত্রিকার পরিচিতিমূলক গ্রন্থপঞ্জী (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগের থিসিস)।
৪. হাসান হাফিজুর রহমান—‘সওগাত থেকে সমকাল’ ও ‘সওগাতের অর্ধ শতাব্দী’ আলোকিত গহবর, ঢাকা ১৯৭৭।

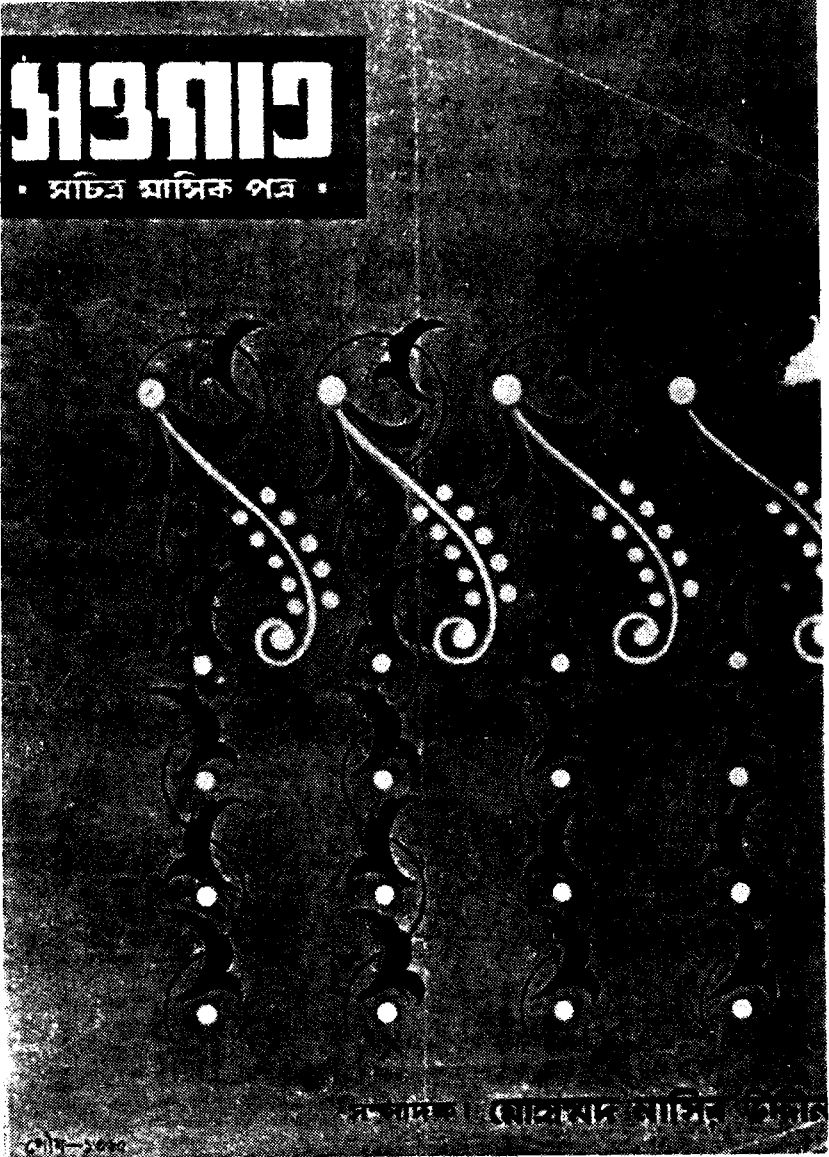
৫. গোলাম সাকলায়েন—আমাদের সাহিত্যপত্রিকা ও সাহিত্যিক গোষ্ঠী (সংলাপ, ৩ বর্ষ ৩ সংখ্যা ১৯৬৯)।
৬. মোহাম্মদ আবদুল কাইউম—পূর্ব পাকিস্তানের সাময়িকপত্র, আমাদের সাহিত্য, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৯।
৭. আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ—সমকাল প্রসঙ্গে, দুর্বলতায় রবীন্দ্রনাথ, ঢাকা ১৯৭৬।
৮. আবুল কাসেম ফজলুল হক—পূর্ব বাঙলার সাহিত্য ও কণ্ঠস্বর, কালের যাত্রার ধ্বনি, ঢাকা, ১৯৭৩।
৯. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, ইসলাম প্রচারক, সাহিত্য পত্রিকা ১৩ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৩৭৬।
১০. মনিরুজ্জামান—পূর্ব পাকিস্তানের পত্রপত্রিকায় সংস্কৃতি চিন্তা, সাহিত্য পত্রিকা, ১২ বর্ষ, ২ সংখ্যা, শীত ১৩৭৫।
১১. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম—মুসলিম বাংলায় জনমতের উন্মেষ ও সাময়িকপত্র সাধনা, পূর্বমেঘ, ১৩৭৪।
১২. ঐ—জগদুদ্দীপক ভাস্কর, পরিক্রম, ১৯৬৪।
১৩. ঐ—অগত্যা ও আমরা কয়েকজন (ইত্তেফাক) ; আনিসকে দেখছি (অগত্যা—সম্পর্কে, ইত্তেফাক)।
১৪. শাহাবুদ্দীন আহমদ—সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশের সমস্যা, নাগরিক, ১৩৭৫।
১৫. জিয়াউল হক—পূর্ববাংলার সাহিত্য পত্রিকা ও নাগরিক, নাগরিক, ১৩৭৬।
১৬. মোহাম্মদ বদরুল আমিন খান—পাঠকের বক্তব্য, নাগরিক, ১৩৭৬।
১৭. সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশের সংকট ও শাসক গোষ্ঠীর মনোভাব (লেখকের নাম নেই), সাম্প্রতিক, ৪বর্ষ : ১ম সংখ্যা, ১৩৮০।
১৮. মুহম্মদ নূরুল হুদা—সিকান্দার আবু জাফরের প্রাসঙ্গিকতা (দৈনিক ইত্তেফাক)।
১৯. আহমদ কবির—সাহিত্য বিষয়ক পত্রিকা (দৈনিক বাংলা)।
২০. শাহানা হুদা রঞ্জনা—সংবাদপত্রের ভূমিকা—মাটের দশকের প্রেক্ষাপট, দৈনিক জনতা। এছাড়া বাংলা একাডেমী গবেষণা পত্রিকাতেও বেশ কিছু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে :
১. আতোয়ার রহমান—‘আঙুর’ (৯ বর্ষ : ৪র্থ সংখ্যা : ১৩৭২) ; ‘তোষিণী’ (১০ বর্ষ ১৩৭০)
২. আলমগীর জলীল—বিস্মৃত শিশুপত্রিকা ফুল—বাগিচা, (২২ বর্ষ, ৩-৪ সং ১৩৮৪)।
৩. মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর—‘সংবাদপত্রে ভাষা—আন্দোলন : নওবেলাল’ (২৯ ব : ১ম সং, ১৩৯২)।
৪. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম—মুসলিম বাংলা সাময়িকপত্রে ভাষা ও সাহিত্য (১৪ বর্ষ, ২য় সং ১৩৭৬)।
৫. ঐ, সমাচার সভারাজেন্দ্র (৮ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা ১৩৭১)।
৬. মোহাম্মদ আবদুল কাইউম—সাময়িকপত্রে সেকালের ঢাকা (১৫ শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা ১৩৭৭)।

৭. রেভ. জেমস লঙ্ক—বাংলা সাহিত্য ও সংবাদপত্রের আদিপর্ব, হাবিবুর রশিদ অনূদিত (২৪ বর্ষ, ২য়-৩য় সং, ১৩৮৬)।
৮. শফিউল আলম—একটি বিস্মৃত পত্রিকা : সাপ্তাহিক ‘মোসলেম জগৎ’ (২৩ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৩৮৫)।
৯. সুকুমার বিশ্বাস—সাময়িকী বুলবুল : ভিন্নমত (২২শ বর্ষ; ২য় সংখ্যা ১৩৮৪)।
১০. সৈয়দ মুর্তজা আলী—‘কোহিনূর’ (৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৩৬৭)।
১১. হেলাল মুহম্মদ আবু তাহের—‘বাঙালী’ একটি সাহিত্য সাময়িকী (২১-২২শ বর্ষ, ৪র্থ-১ম সংখ্যা ১৯৮৩-৮৪)।
১২. হেলাল মুহম্মদ আবু তাহের—সাহিত্যপত্রিকা ‘মোয়াজ্জিন’ (২৫ শ বর্ষ, ৪র্থ সং ১৩৮৭)।
১৩. হেলাল মুহম্মদ আবু তাহের—সাহিত্য সাময়িকী ‘জয়তী’ (২৯ বর্ষ ৩য় সং, ১৩৯৬)।

‘ভাষা-সাহিত্যপত্র’ ৫ম সংখ্যা ১৩৮৪তে মোহাম্মদ আবদুল কাইউম প্রণীত ‘ঢাকার সাময়িকপত্র’; ও ‘পরিবর্তন’ শারদীয়া সংখ্যা ১৩৮৮/১৯৮১তে মুদ্রিত সৈয়দ খালেদ নোমান প্রণীত প্রবন্ধ ‘প্রাক-স্বাধীনতায়ুগের মুসলিম সম্পাদিত সাময়িকপত্রিকা’ এবং সমজাতীয় আরো অনেক গ্রন্থের প্রবন্ধের নাম এখানে উল্লেখ করা যায় (যেমন : মুহম্মদ জাহাঙ্গীর প্রণীত বাংলাদেশে সাংবাদিকতা, ঢাকা ১৯৮৭ এবং সুব্রত শংকর ধর প্রণীত বাংলা দেশের সংবাদপত্র, ঢাকা ১৯৮৫ ইত্যাদি), কিন্তু তালিকা দীর্ঘতর করে প্রকৃতপক্ষে লাভ হবে সামান্য।

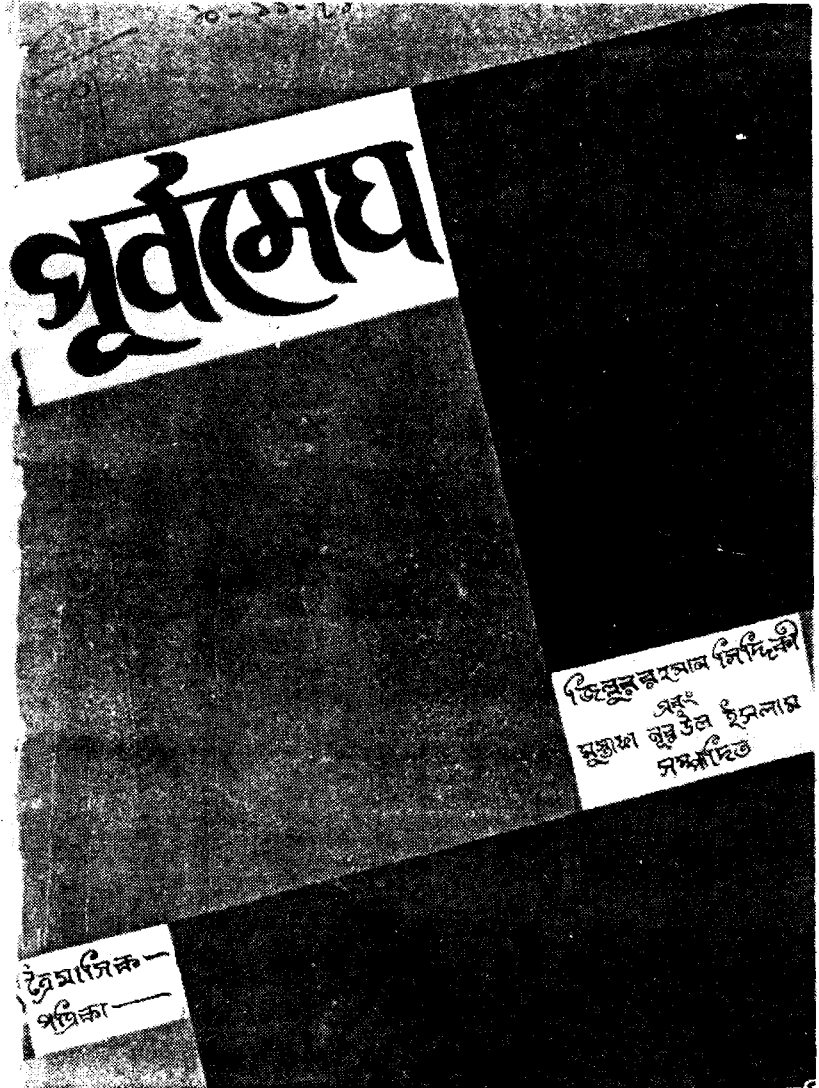
তবে এতে একথাটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে সংবাদ ও সাহিত্য বিষয়ক পত্রিকার ঐতিহ্য প্রায় দুশ বছরের হলেও এই বিষয়ে গবেষণার ঐতিহ্য দীর্ঘ নয়।

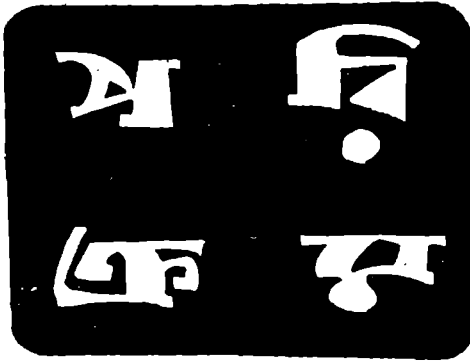
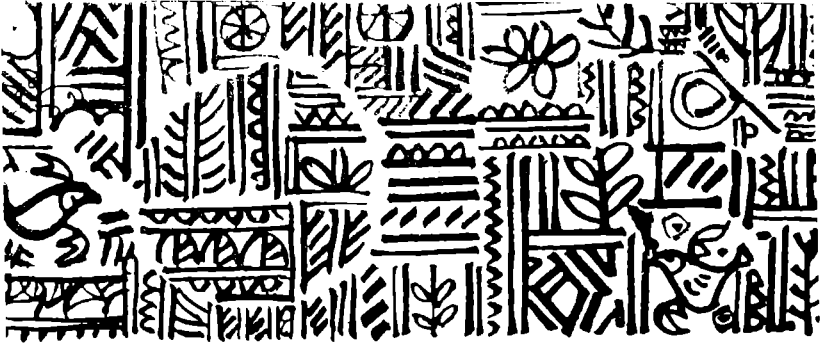
প্রচ্ছদচিত্র



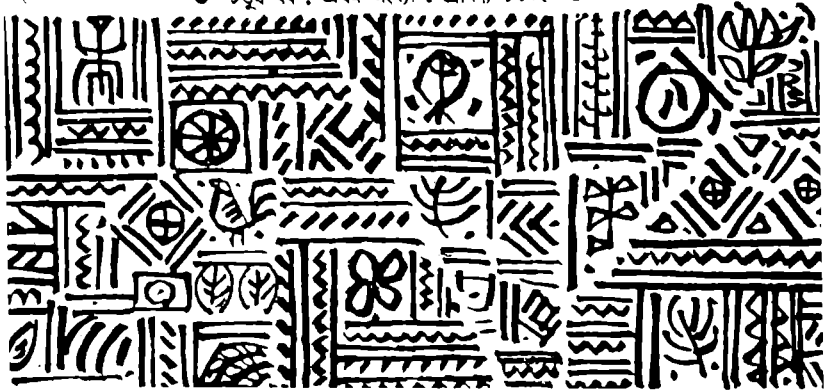








● চতুর্থ বর্ষ : প্রথম সংখ্যা : গ্রীষ্ম, ১৩৭২ ●





# কণ্ঠস্বর

প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৬



## সূচীপত্র

প্রবন্ধ :

আবদুল মান্নান সৈয়দ শব্দের পাপ ও অজ্ঞান অনুবন্ধ

কবিতা :

আসাদ চৌধুরী বিষয় বন্দন

রফিক আজাদ ডাক

মোহাম্মদ রফিক দুটো কবিতা

আফজাল চৌধুরী দুটো কবিতা

হারান সাইফ নগরী : কৃষক : সমূহ

গল্প :

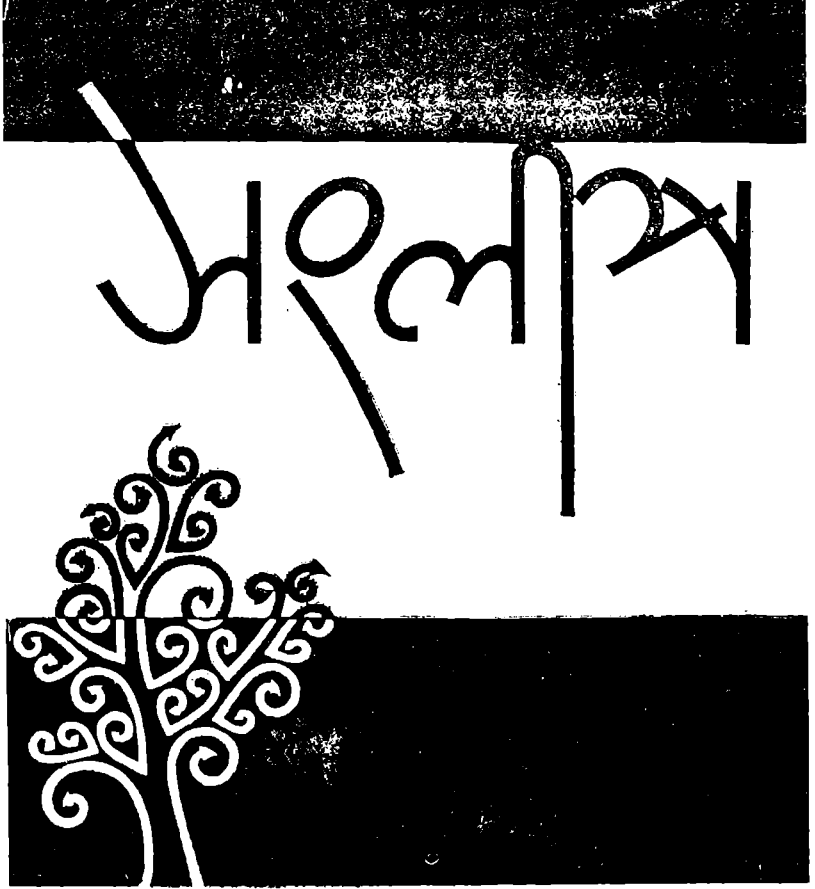
হাসান আজিজুল হক আপন অন্ধকারে

শহীদুল রহমান আমার হৃদয়ের ভেত্রে কেউ দারী নয়

আলোচনা :

প্রশান্ত ঘোষাল নতুন বিতর্কে ২

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ সম্পাদিত



সম্পাদনা :  
মৈয়দ আজ্জাদ হোসাইন  
আবুল হোসেন

# ইম্ভাৰাজ

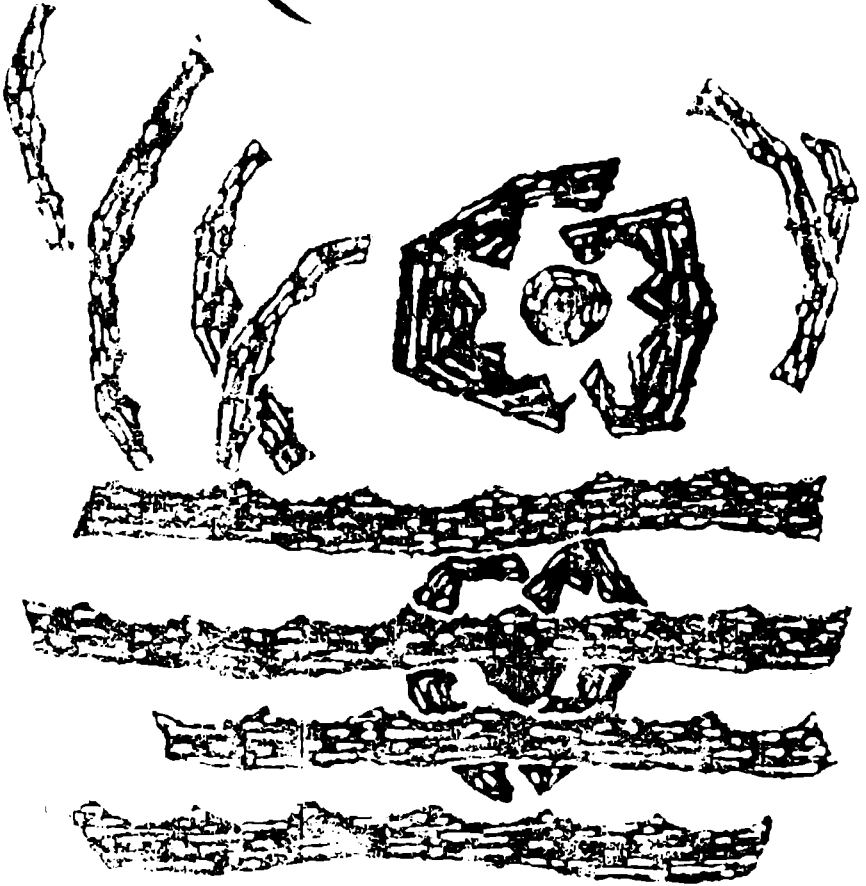
১ম সংখ্যা

আধিন : ১৩৫৩

১ম বর্ষ

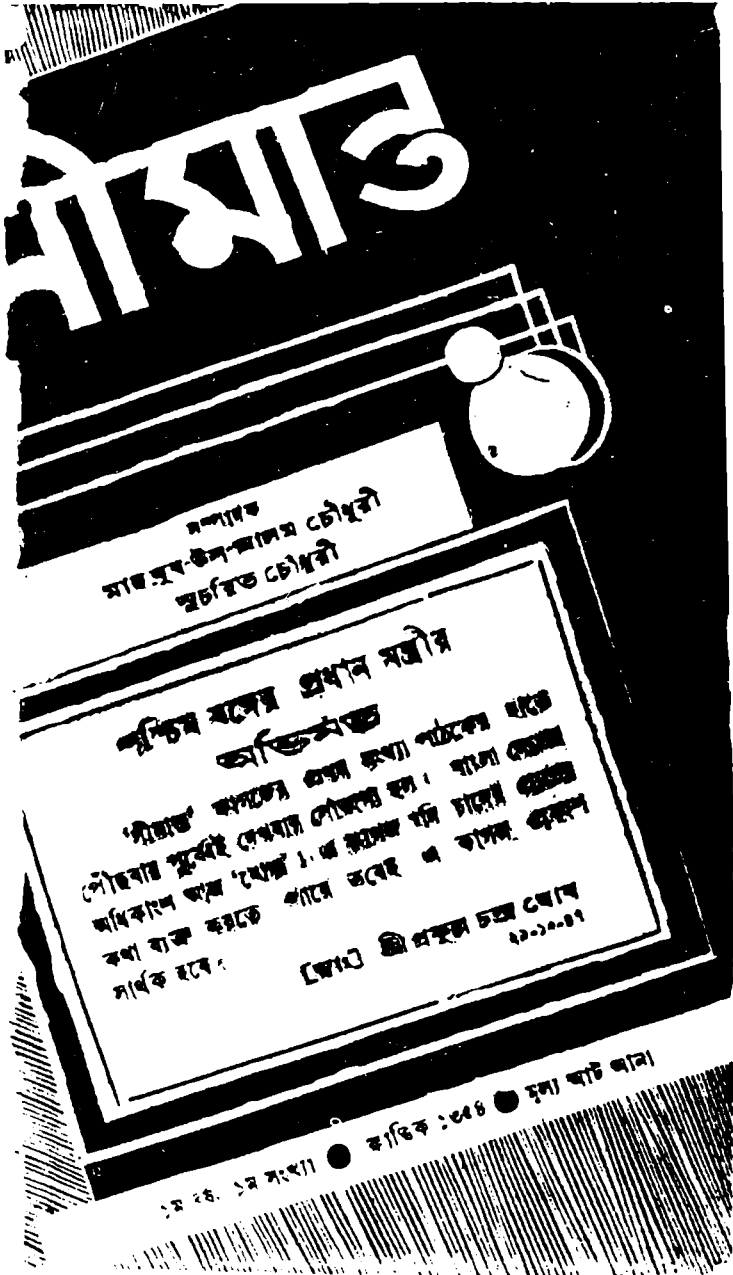


# স্বাধীনতা









# সামান্য

সম্পাদক  
মহারসুখ-উল-আলম চৌধুরী  
স্বচরিত চৌধুরী

শ্রুতিময় যদের প্রধান মন্ত্রীর  
অভিমন্যু  
‘পীতাম্বর’ অঙ্গুষ্ঠের জন্য কখনো পড়কের হাতে  
সৌজবার সুবেই দেখবার সৌজসর হল। বাংলা দেশের  
অধিকাংশ অংশ ‘খোলা’ ১-এ রয়েছে যদি চারের গল্পের  
কথা বাক করতে পারে তবেই এ কালের গল্পের  
সার্থক হবে।

[স্বাক্ষর] শ্রী প্রফুল্ল চন্দ্র বোষ  
১৯৬৬-৬৭

১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা ● কালিক ১৩৪৪ ● দ্বিতীয় খণ্ড

১৯৭১



# প্রগতি

## কৃতজ্ঞতা

জীবনের পরিধিতে যা'রা  
আজ বহিঃকেন্দ্রিক শক্তির  
আঘাতে ছিটকে পড়ে  
কোন এক অজানা পথে পা  
বাড়ালো, সেই লক্ষ কোটি  
ক্লিষ্ট মানুষের শান্তির  
আহ্বান যেন জরমুক্ত হয়।

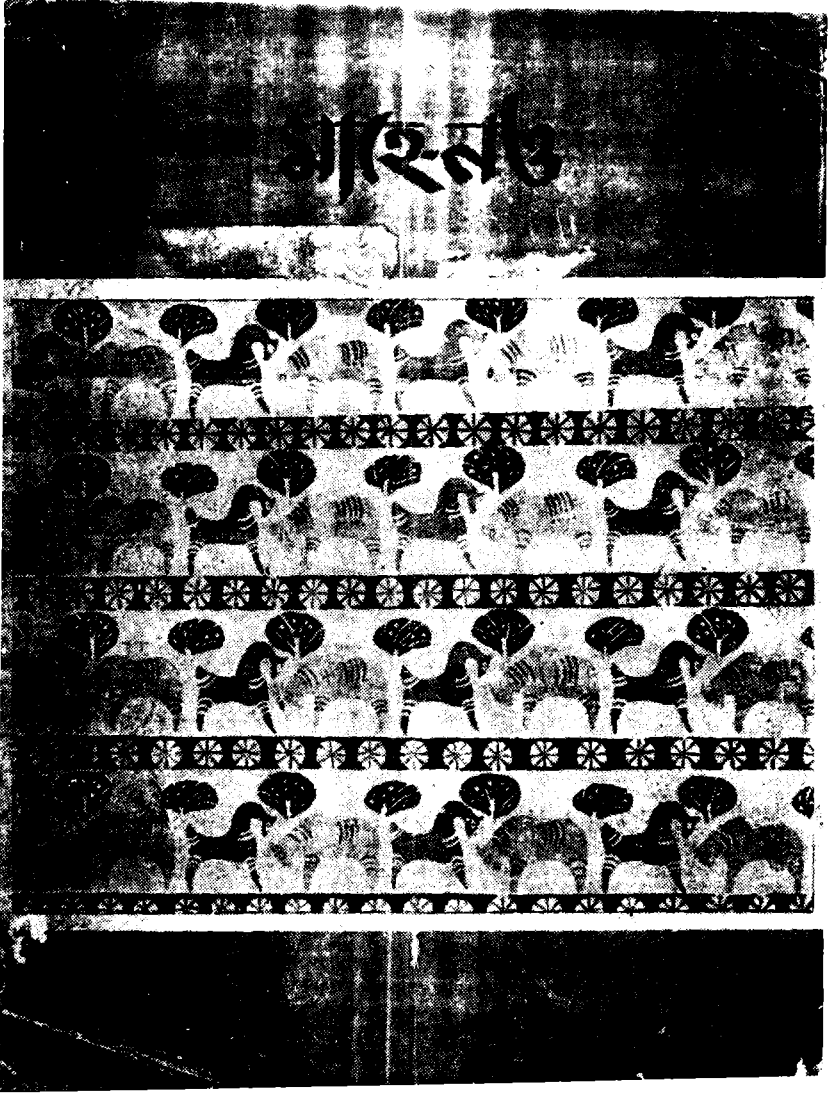
# পাঠিমাটি

✽ সঙ্গর্গনশুনগুটিভদ্বিগুঅনিয়মিতসাহিত্যসংকলনপাঠিমাটিরউন্মোচিতবিভীপ্রয়াসকর্ষাভেরশতচরান্তর✽

উপক্রমত ক্রান্তি লগ্নে দুবিনীত হাওয়ার প্লাবন  
জীবনের অর্থ খুঁজি সত্ত্বাসের বিবত্র প্রেচ্ছায়  
জানিনা উন্নীলিত জীবনের স্বর্গ কারুকাঙ্ক  
সৃষ্টি-সুখ অহকারে পৃথিবীর কোথায় অঙ্কিত  
জানিনা মনুষ্যব্ধের ঘরে কেন বিপন্ন বাসর  
বঞ্চিত প্রেমের জন্ত অহরহ হাতড়ায় মন  
এখানে আদিম সূখে শাপদ সংকুল জনপদে  
সন্দিক পৌরুষ তাই নিরন্তর তোলে বিধ ফণা  
বিদ্রোহী আত্মাঃ আঙ্গ বিদ্রোহের মত্ত জ্বলে আছে  
চৈতন্য মগ্ন বৃষ্টি বিনাশ্রম ঘূমের আবাদে

✽ ঘননেচিত্তা যকল্পনাঃ ওকর্মেপাঠিমাটিরার্থভৌমজীবনের জয়গানযারসঙ্গপাঠকঅনির্ভরতার একান্তহবেন ✽

উপক্রমকে • মনতদেদুহনহকমহকল্প



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

# আল-ইছলাহ্

(মাসিক পত্র)

—সম্পাদক—

মোহাম্মদ নূরুল হক্ দশযবরী

প্রথম বর্ষ (ভদ্রা) : আঃ জমাঃ উঃ গিঃ—১৩৫৭ হিঃ : প্রথম সংস্করণ—১৩৫৬ সন : ১৯৩৫, ১৯৩৬ সনক

## দি আনোয়ারা উড্ ওয়াকস

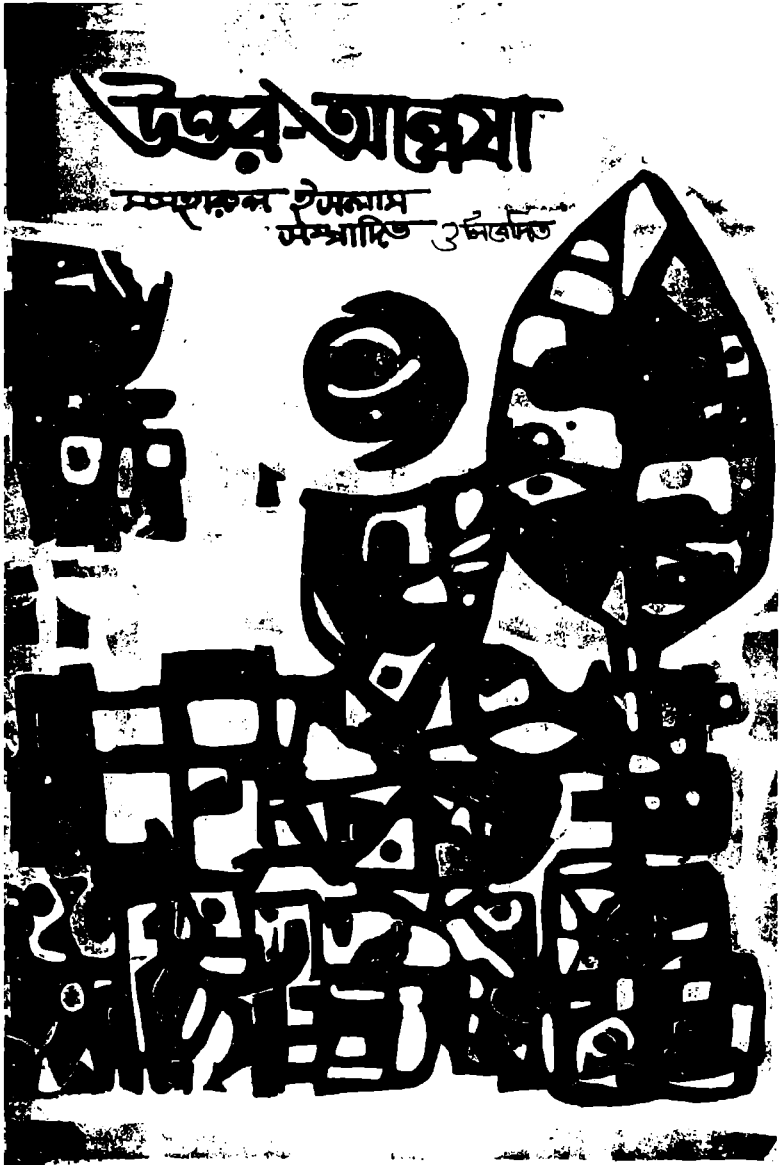
প্রোগ্রামার :- মোহাম্মদ ছিকন্দর আলী

সর্বপ্রকার ফার্নিচার, চেয়ার, টেবিল, ড্রেসিং টেবুল আলমিরে, টেকি, পালং মটর সর্বর বট ইত্যাদি উত্পাদন করিয়া দেওয়া হয়।  
টাজ্জ নিত্যস্থ সুলভ। বকস্বেরে অর্ডার কর্তি যাহার সন্তুত  
সময় সময়ে সবববার করা হয় পরীক্ষা প্রাপ্তি হয়।

## দি আনোয়ারা উড্ ওয়াকস

শেখনাইট, হিঃ হেঃ

"আল-ইছলাহ্" অফিস—দেহগাঃ হেঃগাঃ, হিঃ হেঃ

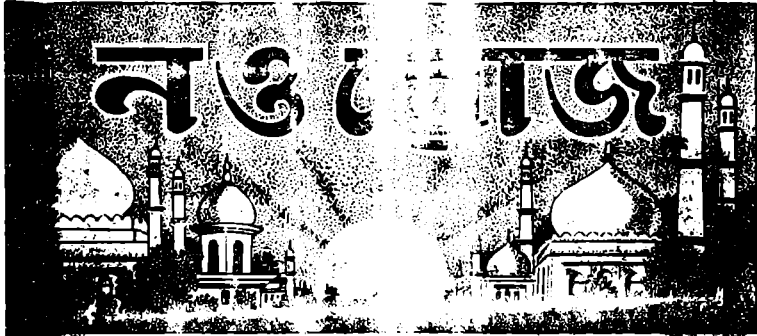




৪র্থ বর্ষ

পেশাবার

১৩৫২



মাজিম উদ্দীন মুসলিম হল ও একবাল সেসিটি



—এট প্রলাব—

গবেষণা বিভাগ

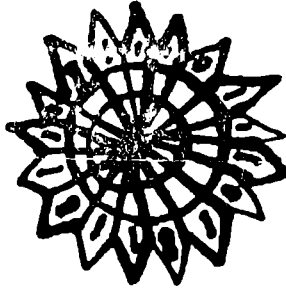
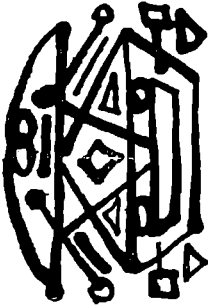
বিচ মাস্টার্স ডয়েক গ্রামোফোন ও রেডিও এবং সবজামাদির  
একমাত্র ডাপ গ্রাপ বিফ্রেড

গাজলী বাদার্স

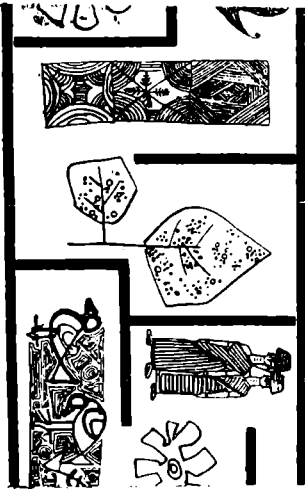
বাহা নৌব প্রতিষ্ঠান, দিনাজপুর।

Printer—Q. Zaman. At the Sen-Press, Dinajpur. (North Bangal)

Editor Hassan Alf Ahmed M. A. B. C. প্রি: সংখ্যা ১০, বার্ষিক ৩০



স্বাধীনতা



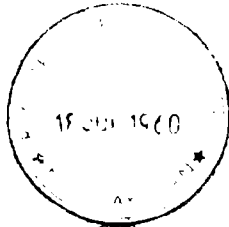
স্বাধীনতা



পঞ্চম বর্ষ : ক্রম-দ্বিতীয় সংখ্যাঃ ভাদ্র-মাঘ ১৩৭৬



দ্বি-মাসিক  
সাহিত্য-পত্র



# উদ্ভরণ

বিত্তীয় নম্বর : ৩৩৫৫ সংখ্যা : ১১ পৌষমাঘ : ১৩৩৬





# অন্ন চাই আলো চাই

এবান্নকার লেখা :

সিফিলিস্

এহেবাবে আনাড়ি

কুজুর ভয়

স্বাধীনতা না গোলামী

উজ্বুক মণ্ডল

তুণ তরু লতা

আম্বাডি ১৩৫৬

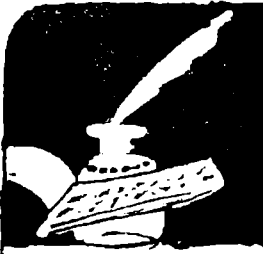
প্রথম বছর

তৃতীয় সংখ্যা

মূল্য পাঁচ আনা

সম্পাদক :

## মহীউদ্দীন



# পরিচিতি

৩য় বর্ষ : ২য় সংখ্যা

শ্রাবণ-আশ্বিন

১৩৬

১৩৮

১৩৯

১৪০

১৪১

১৪২

১৪৩

১৪৪

১৪৫

১৪৬

১৪৭

১৪৮

১৪৯

১৫০



সম্পাদক মণ্ডলী :

- মফিজ-উল হক (সভাপতি)
- সনবেহুল দত্ত
- সিরাজুল ইসলাম
- মল্লিকরাম শান
- আবদুল হেঃসেন

সংগ্রহ ফলস্র

আবদুল উল্লাহ আহমদ

মফিজ আচার্য

মফিজ উল হক

ওলাইত ক্বিনার

আবদুল রহমান

মোঃ আজিজুল হক

মাহফুজ উল্লাহ

মুলাতান রহমান

নূরউল আলম

সমরেশ্বর দত্ত

খালেদুল আমিন

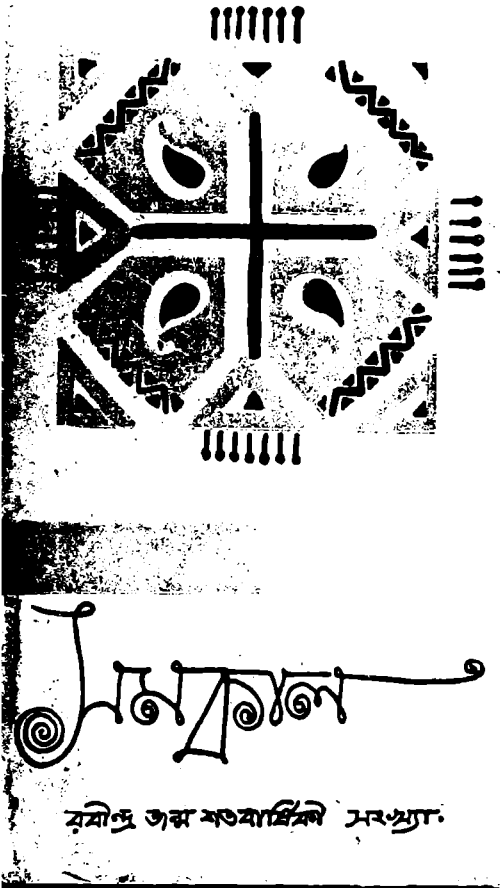
ফুদুন কান্তি আইচ

'পরিচিতি' পত্রিকার গৃহদ। ৩য় বর্ষ : ২য় সংখ্যা। শ্রাবণ - আশ্বিন ১৩৬০

(সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি মফিজ-উল হকের সৌজন্যে)।







## নির্ঘণ্ট

অ

অক্ষয় গুপ্ত ৬  
অগ্রণী সংঘ ৮৭  
অচিন্ত্যকুমার চক্রবর্তী ৮৬  
অচিন্ত্য চক্রবর্তী ২২৮, ৪৮৬  
অজিত গুহ ৮৭, ৯৬, ২০১, ২০৫, ৫৬১  
অতুলচন্দ্র গুপ্ত ১৬  
অতুলরঞ্জন দে ৩৬৭  
অনুদাশংকর রায় ২৩৭, ৪৮৩, ৪৮৬, ৪৯০  
অনিল রায় ১৫, ৩৭২  
অনিলচন্দ্র ঘোষ ৩১৭, ৩২৩  
অনিমেঘ দাশগুপ্ত ৪৬৮  
অনু ইসলাম ৪১৯  
অমলেন্দু বড়ুয়া ৪৫৭  
অমলেন্দু বিশ্বাস ৮৬  
অমিয় চক্রবর্তী ৩৬৮  
অমিয়ভূষণ চক্রবর্তী ৮৭, ২০৬, ২৩০, ২৩৩,  
৪৮৬  
অমূল্যকুমার দাশগুপ্ত ২২৭  
অরুণিমা স্যান্নাল ৩৪৪  
অরুণকুমার ঘোষ ৪১৭  
অরুণকুমার সরকার ৩৬৮, ৩৬৮  
অরুণ তালকর্দার ৩৪৫  
অলি আহাদ ৭২  
অশনি মজুমদার ২৯৪  
অশোক বড়ুয়া ৩৪৫, ৪৩১  
অশোক সৈয়দ ৪৪৪  
অসিত রায় চৌধুরী ২৬৩  
অসীম সাহা ৪০৭  
অর্থনৈতিক পুনর্বিদ্যাস ৩১৪  
অনুক্রমণপ্রিয়তার সাইক্লোজি ১৬১  
অধিবেশন মূলতবি ৬৮  
অরুণোদয়ের পথে ৯২  
অসাম্প্রদায়িক মানবতাবাদী গণচেতনা ৯৫  
অগ্রগতি ৯, ১৯  
অবজারভার ৩০  
অমৃতবাজার ২০

অভিযান ২০, ১০৯  
অতএব (১৯৬০) ১০৯,  
অগত্যা ২৩, ২১২, ২৩০, ২৮৭  
অন্নু চাই আলো চাই ২৮৭

আ

আইনস্টাইন ২৪৫  
আইনুন নাহার ৯৩  
আইনুল ইসলাম ২০  
আইয়ুব খান, প্রেসিডেন্ট ২৩, ৬০, ৯৭, ৯৯,  
১০০, ১০১, ১০৩, ১৩৫, ৩৯৬, ৪১১,  
৪২৭, ৫৫২  
আইয়ুব হোসেন সিদ্দিকী ৫০৪  
আওরঙ্গজেব (সম্রাট) ১৯২  
আকবর (মহামতী, সম্রাট) ১৯২  
আকবরউদ্দিন ১১৬  
আকবর হোসেন ৫১০  
আ কা মু আদমউদ্দিন ১০৬  
আ কা শ নূর মোহাম্মদ ১১৭, ৪৩২  
আকাদ্দাস সিরাজুল ইসলাম ৩৬৮  
আখতার উল আলম ১০৬, ১৭০, ২৫১  
আখতার হামিদ খান ৩৫১  
আখতার হুসেন ৩৪৪, ৩৬৮  
আখতারুজ্জামান ৩৭২  
আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ২৯৪, ৩৪৫, ৪১৯,  
৪৪৫  
আখলাকুর রহমান ৫০৪  
আজহারুল ইসলাম ১১৬, ২০৪, ৩৬৮  
আজিজুর রহমান ১১৫, ২৩৫  
আজিজ মিছির (সিরাজুল ইসলাম) ৮৫, ৮৬  
আজিজুর রহমান মল্লিক ১০৩  
আজিজুল করিম ৩৭২  
আজিজুল জলিল ২৩১  
আজিজুল হক ১৭৮, ২৩৬, ৩৪৪, ৩৬৮,  
৩৯৪, ৪০৬  
আজিজুল হক প্রধান ৫৬৬

আজিমউদ্দিন আহমদ ৩৯৩  
 আতা মোহাম্মদ ৭২  
 আতাউর রহমান, কবি ৯৬, ১১৬, ১৭৮,  
 ২৬২, ২৭৪, ২৯৪, ২৯৫, ৩৪৪, ৩৬৭,  
 ৩৯০, ৩৯৫, ৪০৬, ৪৪৯, ৪৫৫, ৫০২,  
 ৫২৯, ৫৫৯  
 আভোয়ার রহমান ৯৬, ১০১, ১১৮, ২২৫,  
 ২৩৬, ২৯৫, ৩৬৮, ৪১০, ৫৬১  
 আতাউর রহমান খান ৫১, ৫৩, ৫৮, ৯৮  
 আন্তন শেখত ৫৭৮  
 আর্দ্রে জিঁদ ৪৪৯  
 আনাতোল ফ্রাস ৫০৪  
 আর্নেস্ট হেমিংওয়ে ৫০৪  
 আনোয়ার আহমেদ ৩৬৫  
 আনোয়ার পাশা ৯৯, ৩৬১, ৩৬৭, ৩৬৮,  
 ৪০৭, ৪৫৩, ৪৫৫  
 আনোয়ারুল হক খান সিএসপি ৫৭৪  
 আফজাল চৌধুরী ২৬২, ৩৪৪, ৪১৯  
 আফজালউল হক ২৭১  
 আফসারুল্লাহ ৩৭২, ৪০৭  
 আফলাতুন ৩৪৫, ৫৪৫  
 আফাজউদ্দীন আহমদ ৩৬৮  
 আব্বাসউদ্দিন আহমদ ১৭৬, ২১৯, ৫৫৯  
 আবিদ আলী ২২৯  
 আবিদুর রহমান ৫৪৫  
 আবদার রশীদ ২৬২, ৩৬৮, ৪৫৮  
 আবদুর রউফ ১১৫, ৩২১, ৫৪৫  
 আবদুর রশীদ ৫৩৩  
 আবদুর রশীদ ওয়াসেকপুরী ১১৭, ২৩৬,  
 ৩৬৭, ৪৩১, ৪৫৮  
 আবদুর রশীদ খান ১১৫, ২০৫, ২২৭, ২২৮,  
 ২৩৬, ২৫১, ২৬২, ৩৪৪, ৩৬৭, ৪০৪,  
 ৫১৯, ৫৩৮  
 আবদুর রশীদ চৌধুরী ৫০৪  
 আবদুর রহমান ২৩৬, ৪৪৮  
 আব্দুর রাজ্জাক ৩৪৫  
 আবদুল ওয়াজ্জিদ ১৮৬  
 আবদুল আজিজ আল নোমান ৩৬৮  
 আবদুল আলীম চৌধুরী ২৩, ৫৩২  
 আবদুল আহাদ ২৫৬, ২৯৫, ৫০১  
 আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ ৮৬, ৮৭, ৯১,  
 ১৭০, ২০৫, ২০৮, ২১৭, ৪৮৩, ৪৮৬

• আবদুল কাদির ৯৯, ১০৬, ১৭৯, ২৫১,  
 ২৯৪, ৩২১, ৩৪৪, ৩৬১, ৩৬৭, ৩৭২,  
 ৪০৭, ৪৫৮  
 আবদুল কাদির খান ২৯৫  
 আবদুল কাদির মাহমুদ ২৮২  
 আবদুল কাদের ৩৬৮  
 আবদুল কুদ্দুস সাদী ২৫  
 আবদুল গণি মাহমুদ ২২৮  
 আবদুল গণি হাজারী ৯৬, ৯৯, ১১৮, ১২৩,  
 ৩৬১, ৪০৩, ৪৫৫, ৫১৫, ৫২৭, ৫৩২,  
 ৫৫৯, ৫৭৬  
 আবদুল গফুর ২২৭, ২৩৫, ২৩৭  
 আবদুল গফুর সিদ্দিকী ২১৯, ৩৭৫  
 আবদুল গাফফার চৌধুরী ৯৬, ১১৮, ২০৬,  
 ২৩৬, ২৯৪, ৩৪৫, ৩৬৭, ৪০৭, ৪৩১,  
 ৫০৫, ৫৪৫  
 আবদুল জব্বার ৮৬, ৩৪৫, ৫৪৬  
 আবদুল জব্বার খান ৪৪৮  
 আবদুল জব্বার খান (স্পিকার) ৪৫৫  
 আবদুল বাসেত (শিল্পী) ৩৪৭  
 আবদুল মওদুদ ১০৬, ২০৫, ২১৯, ২৯৫,  
 ৩৭২  
 আবদুল মজিদ ৩৬৭, ৪৩১  
 আবদুল মতিন ৪০৭  
 আবদুল মান্নান ৪১০, ৪৬৮  
 আবদুল মান্নান খান ৩৬৮  
 আবদুল মান্নান তালিব ১১৯  
 আবদুল মান্নান ভূঁইয়া (বিবর্তন) ৪৬১  
 আবদুল মান্নান সৈয়দ ৩৪৪, ৩৬৮, ৪০২,  
 ৪১০, ৪১৫, ৪২০, ৪৪৫, ৪৫২, ৪৫৫,  
 ৫৫৫, ৫৭৬  
 আবদুল মান্নান হাওলাদার ৪৩৬  
 আবদুল মালেক খান ২৬৩  
 আবদুল মোহিত ৫০৪  
 আবদুল রাজ্জাক ৩৪৫  
 আবদুল হক ১১৬, ১১৭, ১৪৪, ২৯৫, ৩০৬,  
 ৩২৯, ৩৩২, ৩৩৯, ৩৬৮, ৪১০, ৪১২,  
 ৪১৪, ৫১৬, ৫৭৯  
 আবদুল হক দোভাষ ৮৭, ৩৮৩  
 আবদুল হাই ১১২  
 আবদুল হাই মাশরেকী ২৩৬, ৩৬৭, ৩৬৮,  
 ৪০৬

আবদুল হাকীম, স্পিকার ৫৫  
 আবদুল হাকীম খান ১১২  
 আবদুল হাফিজ ২৬৩, ২৬৮, ৩২১, ৩৯০,  
 ৩৯৩, ৪১০, ৪৩৬  
 আবদুল হামিদ ৮৬, ৪৯৮  
 আবদুল হামিদ খান ভাসানী ৩০, ৬০  
 আবদুল হালিম ৪৫২  
 আবদুহ মাহমুদ ৪০৭  
 আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ ৪০৯, ৪২০, ৪২৩,  
 ৪৪৫  
 আবদুল্লাহ আল মুতী শরফুদ্দীন ৯৬, ১০১,  
 ২০৪, ২৯৫, ৩৪৩  
 আবদুল্লাহ ইউসুফ ইমাম ৪৩১  
 আবদুস সবুর খান ১০২  
 আবদুস সাত্তার ১০৬, ৩৪৪, ৩৬৮, ৪০৬,  
 ৪৩১, ৪৪৭, ৫৫৯  
 আবদুস সালাম ৩৬৮  
 আবদুস সেলিম ৪২০  
 আবদুস শাকুর ২৬৩, ৩৯৩, ৪৩১, ৫৫৯  
 আবু আহমেদ আবদুল্লাহ ৪০৮  
 আবু আহসান ৩৩২  
 আবু ইসহাক ২১৯, ৩৪৫, ৩৬৮  
 আবু কায়সার ৩৬৮, ৩৭২, ৪১৯, ৪৪৫,  
 ৪৫৫  
 আবু জাফর ৪১০  
 আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ ৯৬, ২৫৪, ২৯৪,  
 ৩৪৪, ৪০৬, ৪৪৫, ৫৪৬  
 আবু জাফর আবদুল্লাহ ৫৬৮  
 আবু জাফর শামসুদ্দীন ১০১, ১১৬, ১৮৯,  
 ২৫১, ৩৪৪, ৪০৮  
 আবু জাহাঙ্গীর ৩৪৫  
 আবু জোহা নূর আহমদ ২১৯, ২৩৩, ২৫২  
 আবু জুন্দ ৩৯১  
 আবু তালিব, অধ্যাপক ২২৭, ২৩৬  
 আবু তাহের ২১৯, ২৬২  
 আবু ফাতেমা মোহাম্মদ ইসহাক ১৭০  
 আবু বকর সিদ্দিক ২৬২, ২৯৪, ৩৪৪, ৪০৬,  
 ৫৭৬  
 আবু রায়হান ৩৩২  
 আবু রুশদ ১১৬, ১১৮, ২২৫, ৩৪৫, ৩৫১  
 আবু শাহরিয়ার ৩৬৮  
 আবু সঈদ নাসির ৫০৪  
 আবু সয়ীদ আইয়ুব ১, ১৭০, ১৭৫, ৫৮৬

আবু সঈদ ২৬৩  
 আবু হেনা ৪১০  
 আবু হেনা মোস্তফা কামাল ১৭৮, ২০৫,  
 ২৩৫, ২৩৬, ৩৬৮, ৩৯৩, ৪০৯, ৪৩৬,  
 ৪৪৫, ৫২৯, ৫৪৩, ৫৪৬  
 আবু হেনা মোহাম্মদ কামাল ৫২৭  
 আবু হোসেন সরকার ৫৮  
 আবুল এহসান ৩৬৮  
 আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ ৩৬৮, ৪৩৬  
 আবুল কালাম মোস্তফা ২১৯, ৩৭২  
 আবুল কালাম শামসুদ্দীন ৯৯, ১০১, ১০৬,  
 ১১৬, ১১৮, ১৮৬, ২২৫, ২৯৫, ৩৪৫,  
 ৩৬৯, ৪৫৮  
 আবুল কাসেম, অধ্যাপক ২৩৩, ২৩৬, ৩৭২  
 আবুল কাসেম চৌধুরী ৩৯০  
 আবুল কাসেম ফজলুল হক ১০৬, ১০৯,  
 ১৩৭, ২৫৯, ৩৭৯, ৪১০, ৪১৭, ৪২০,  
 ৪২৪, ৫৬৬  
 আবুল কাসেম রহিমুদ্দীন ৩৪৪  
 আবুল কাসেম শাব্বি ৪৩১  
 আবুল কাসেম চৌধুরী ৩৯৩, ৪৩৬  
 আবুল খায়ের ৯১  
 আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দীন ২৩৩, ২৩৬  
 আবুল মনসুর আহমদ ৫১, ৫৬, ১০৬, ১১৬,  
 ২১৮, ৫১০, ৫৮৬  
 আবুল মোমেন ৩৪৫  
 আবুল ফজল ৮৬, ৯৩, ১৭০, ১৭৮, ১৯৫,  
 ২০৫, ২১৯, ২৫২, ২৯৩, ৩১৮, ৩৩২,  
 ৩৫১, ৩৬১, ৩৬৯, ৩৮৩, ৩৯১, ৩৯২,  
 ৩৯৭, ৪১০, ৪৫৫, ৪৫৮, ৪৮৩, ৪৮৬,  
 ৪৮৭, ৪৯২, ৫৫৩, ৫৬১, ৫৮৬  
 আবুল ফারাহ ১৮৪  
 আবুল হাশিম ৩, ১৬৩  
 আবুল হাশেম ২১৯, ৩২১  
 আবুল হাসান ২৬২, ২৯৪, ৩১৪, ৩৪৪,  
 ৪০৬, ৪১৯, ৪৫৫  
 আবুল হাসান শামসুদ্দীন ৩৬৮, ৪৫৯  
 আবুল হাসানাত ২৯৫, ৩৪৫  
 আবুল হোসেন, করি ৯৯, ২৫৪, ২৯৪, ৩৪৩,  
 ৩৪৪, ৩৯৪, ৪৪৫  
 আবুল হোসেন চৌধুরী ২০১  
 আবুল হুসেন ১৯, ১৬৬, ২৯৫  
 আল আজাদ ৩৪৪

আলফাসো আলায়াস ৫৭৮  
 আল নাসির ৫০৪  
 আল মাহমুদ ২০৫, ২৩৬, ২৬২, ৩৪৪,  
 ৩৬৭, ৪৪৫, ৪৫৫, ৫৫৯  
 আলম কোরায়শী ৩৭২  
 আলতাফ হোসেন ৪৯৬  
 আলমগীর জলিল ৩৯৩, ৪৩৬  
 আলাউদ্দিন আল আজাদ ৮৭, ৯৬, ১১৫,  
 ১১৭, ২০৬, ২৫৭, ২৯৪, ৩৪৩, ৩৪৪,  
 ৩৬৮, ৪০৬, ৪০৯, ৪৩১, ৪৪৫, ৪৫৮,  
 ৪৮৬, ৪৯৬, ৫০৫, ৫২০, ৫৫৯  
 আলাউদ্দিন খান ৫৬৬  
 আলী আনোয়ার ২৬৩, ৪১০  
 আলী আসগর ১১৫  
 আলী আশরাফ ৩৪৪  
 আলী আহমদ, মৌলভী ১১৭  
 আলী ইমাম ৪৫৫  
 আলী মনোয়ার ৪৫৫  
 আমজাদ হোসেন ৩৪৪  
 আমজাদ হোসেন (মন্ত্রী) ৪৫৭  
 আমানুল হক (শিল্পী) ৪০৫  
 আমানুল্লাহ আহমদ ৩৯১  
 আমিনা খাতুন ২১৯  
 আমির আলী ৪১৩  
 আমিনুর রহমান ৩৭২  
 আমিনুল ইসলাম ৯৩, ৯৬, ২০৪, ৩৬৮,  
 ৩৭২  
 আমিনুল ইসলাম (শিল্পী) ৩৪৭  
 আমিনুল ইসলাম বেদু ৪৬৪  
 আমিনুজ্জামান ৩৬৮  
 আ ন ম বজলুর রশীদ ১০৬, ১১৫, ১১৬,  
 ২০৫, ২৫১, ২৫৪, ৩২১, ৩৪৪, ৩৬৮,  
 ৩৯৩, ৪০৬, ৫৪৬  
 আনোয়ার এনায়েতউল্লাহ ৩৭২  
 আনোয়ারা চৌধুরী ৪৩১  
 আনোয়ারা বেগম ১১৫, ২৩৬  
 আনোয়ার মিজান ৪৬৪  
 আনোয়ারউদ্দীন ২৩৫  
 আনোয়ারুল হক ২০৪  
 আনিস চৌধুরী ৯৬, ৩৪৫, ৩৯৩, ৫০৫,  
 ৫৩২, ৫৪৫

আনিসুজ্জামান ৯৬, ১০০, ১০১, ১০৬, ১৩৫,  
 ২৫৭, ২৯৫, ৩০২, ৩৪৩, ৩৬৮, ৪০৯,  
 ৪২৭, ৫৩৫  
 আনিসুল ইসলাম ৩৫১, ৩৬৮  
 আনিসুল হক চৌধুরী ১০৬  
 আরেফিন বাদল ৪৬২  
 আল ডায়াস ৪৪৯  
 আলতাফ হোসেন ৪১৯, ৪৫৫  
 আলফাতুন নিসা ২৬২, ২৬৩  
 আলবেয়ার কামু ৪৪৯  
 আশকার ওয়াইস ৪৪৯  
 আশকার ইবনে শাইক ৯৯, ২২৭, ২৩৬,  
 ২৫৭, ৩৬৪, ৩৬৮, ৩৬৯, ৪০৩  
 আশরাফ আলম ৩৬৮  
 আশরাফউজ্জামান ১১৬, ১১৮, ৩৬৮  
 আশরাফুজ্জামান খান ২৫০, ৩২১  
 আশরাফউজ্জামান চৌধুরী ২১৯  
 আশরাফ সিদ্দিকী ১০৬, ১১৫, ২০৫, ২২৫,  
 ২৩৬, ২৫১, ২৭৪, ২৯৪, ২৯৫, ৪৩৬,  
 ৫১০, ৫৩২  
 আশিকুর রহমান ৩৯১  
 আশ চট্টোপাধ্যায় ১৯  
 আশুতোষ চৌধুরী ৪৭৮  
 আশুতোষ পাল ২৯৪  
 আশীষ কুমার লোহ ৩৪৪, ৩৬৮  
 আশীষ চৌধুরী ৪৪৫  
 আসফউদ্দৌলা ৩৪৪  
 আসহাবউদ্দিন আহমদ, অধ্যাপক ৯১  
 আসাদ চৌধুরী (আসাদুল ইসলাম চৌধুরী)  
 ৩৪৪, ৪১৯, ৪৪৪  
 আসাদুল্লাহ খান গালিব ৩৬৭  
 আহমদ কবির ২৩, ৩৪৫, ৫৩২  
 আহমদ আবদুল গফুর আজার ৪০৬  
 আহমদ ছফা ২৯, ৪২০, ৪৩৮, ৪৫৩, ৫৬৬  
 আহমদ জামাল ৩  
 আহমদ নূরে আলম ৪৫৫  
 আহমদ পারেছউদ্দিন ৩২২, ৪৪৮  
 আহমদ ফরিদউদ্দিন ২৩৬  
 আহমদ ফারুক ৩৬৫, ৩৭২  
 আহমদ মীর ৪৩১, ৫৪৬, ৫৫৯  
 আহমদ মুয়ীদ ৫৪৫  
 আহমদ রফিক, ডা. ২৫১, ২৫৩, ৩৬৮,  
 ৪০৭, ৫৭৪

আহমদ শরীফ ৮৬, ৯১, ৯৯, ১০৬, ১১১,  
 ১২০, ১২৫, ১৭৮, ২০৫, ২০৭, ২২০,  
 ২২৬, ২৯৫, ৩৬১, ৩৬৪, ৩৬১, ৩৬৯,  
 ৩৮৩, ৩৯৩, ৪১০, ৪১২, ৪৫২, ৫৫৯  
 আহমদ শামসুল ইসলাম ২৩০  
 আহমদ সাত্তার ৩৬৭, ৪৩৬  
 আহমদ হাসান দানী ৩৪৩  
 আহমদ হুমায়ূন ৪১০, ৫৭৯  
 আহমেদ শামসুদ্দীন ৪০৭  
 আহমেদ সাইফুদ্দিন খালেদ ৪৫৯  
 আহমদজ্জামান ৩৭২  
 আহমদ হোসেন ৩৯১  
 আহমদ সগীর চৌধুরী ৮৬  
 আহমেদুর রহমান ৩৪৫  
 আহমেদুল কবির ৮৬, ৪৮১  
 আহসান আহমদ আশক ৪০৬  
 আহসান হাবীব ১০৬, ১১৫, ১১৬, ১২৪,  
 ২২৫, ২২৮, ২৫৩, ২৫৪, ২৬২, ২৭৪,  
 ২৯৪, ৩৪৪, ৩৬৭, ৩৯৬, ৪০৬, ৪৪৯,  
 ৪৫৫, ৫৫৯, ৫৭৬  
 আহসানুল হক ৪০৮, ৪১০  
 আওয়ামী লীগ ৫৯-৬৬  
 আওয়ামী লীগ (পি ডি এমপহী) ৬৬  
 আইয়ুব খানের বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম ১৬০  
 আইয়ুব সরকার ৬৩  
 আকরম খাঁ বনাম গোলাম মোস্তফা ২১২  
 আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ৬৪, ৬৬  
 আজাদ প্রেস ১১২  
 আজাদ ভার্ভেস নওবাহার ২১২  
 আদমজী পুরস্কার ১০০  
 আফ্রো এশীয় সাহিত্য সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান  
 ১০৪  
 আফ্রো এশীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি উৎসব ৪০৮  
 আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর ৫১  
 আমাদের সাহিত্য ১০০  
 আঞ্জুমানে এসলাহুল মুসলিমীন ১৭৫  
 আন্ডারগ্রাউন্ডে কমিনিস্ট পার্টি ৭৪  
 আধুনিক মন ২৪২  
 আর্বসঙ্গীত সমিতি (চট্টগ্রাম) ৮৬  
 আমাদের সাংস্কৃতিক সমস্যা ১৪৮  
 আমাদের মাতৃভাষার আলোচনা ১৮১  
 আমাদের গোজারেশ ১৮১  
 আমাদের ইঁশিয়ারী ১৮৯

আমাদের রাষ্ট্রভাষা ২৪০  
 আনসার ১৬১  
 আজাদ ২০, ২১২  
 আল ইসলাম ২৩, ১০৮, ১০৯, ৩১৯  
 আল বশির ১৯৬

ই

ইউজিন আয়োনেসকো ৪৪৯  
 ইকবাল, কবি মুহম্মদ ৪৪, ১৪৩, ১৭৯, ২৫২  
 ইবনুল হাসান ২৫  
 ইবসেন ১৩  
 ইনাম আহমদ চৌধুরী ২৭  
 ইউসুফ আলী চৌধুরী ৫৮  
 ইউসুফ সাদেক ২৯৪  
 ইজাবউদ্দীন আহমদ ২০৪  
 ইজাজ হোসেন ৪০৬  
 ইবনে জামান ৩৭২  
 ইবনে রউফ ৩৪৪  
 ইবরাহীম খলিল ২১৯  
 ইব্রাহিম, কমরেড ৭২  
 ইব্রাহিম বাঁ, অধ্যক্ষ ৯৯, ১০৬, ১১৬, ২০৩,  
 ২০৫, ২১৯, ২৫২, ৪১৮  
 ইদ্রিস মীনা ৮৬  
 ইমরুল কায়েস ৩৯৩  
 ইমরুল চৌধুরী ৩৪৪, ৩৬৭, ৪০৬, ৪১৯,  
 ৪২২, ৪৩৮  
 ইমামুর রশীদ ২৯৪  
 ইমউল হক ৩৪৪  
 ইসমাইল মোহাম্মদ ৩৪৪  
 ইসরাইল হোসেন ২০৩  
 ইসহাক চৌধুরী ৩৬৮  
 ইস্কান্দার মীর্জা ৫৩, ৫৬  
 ইহসানুল হক ২৩১  
 ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ৩৫  
 ইস্ট এন্ড ক্লাব (চট্টগ্রাম) ৯১  
 ইসলামের চিন্তার মুক্তি ৪০০  
 ইসলামী সাংস্কৃতিক সম্মেলন (কার্জন হলে,  
 ১৯৫২) ২৪১  
 ইসলামিক একাডেমী ২০০  
 ইসলামিক প্রজাতন্ত্র ৫৭  
 ইয়ং পিপলস এসোসিয়েশন ২৩১  
 ইয়ং বেঙ্গল ৭  
 ইংরেজীর কথা ২৫৯, ৩৯৭

ইংরেজীর কথা ও বাংলা প্রচলনের সমস্যা

৩৭৯

ইখওয়ানে আদব ১৯৬

ইয়াহিয়ার অভ্যুদয় ৬৫, ৬৭, ৬৯

ইসলামের আদর্শ ১৫৯

ইয়াহিয়ার ভাষণ ৬৭

ইমরোজ ২৪, ২২৪, ২৮৭

ইত্তেফাক ৩০, ৬৩, ৩১৩

ঙ

ঙশ্বরগুণ্ড ৬

উ

উইলিয়াম কেব্রী ১৯

উর্দুর প্রসার ১২০

উত্তরণ ২৩, ২৮

উত্তর-অধেষা ২৪, ১০৯

এ

এজরা পাউন্ড ৪৫০

এনামুল হক ২৩, ২৮, ২৩৫, ৩৪৪, ৩৬৭

এ এইচ এম আবদুল কাদের ২০৪

এইচ এস সোহরাওয়ার্দী ৩৮, ৪১, ৫৪, ৫৬,  
৬২

এইচ এম আজিজুর রহমান ১১৫, ২১৯

এম আবদুল কাদের ১১৮

এবনে গোলাম নবী ৮৬

এবনে গোলাম সামাদ ২৬২

এ কে ভৌফিকুর রহমান ৩৯১

এ কে ফজলুল হক ৩৮

এ কে মান্নান ৮৬

এ কে এম আহসান ২৩৫

এ কে এম আতোয়ার রহমান (আতোয়ার  
রহমান) ২১৯

এ কে নাজমুল করিম ৩৪৩

এ কে এ নূর মোহাম্মদ বিদ্যাবিনোদ ২১৯,  
২২৭, ৩২১

এ কে নূরুল ইসলাম ২১৯

এ বি এম আবদুল্লাহ ৮৭

এ বি রাজপুত ৩৪৬

এ বি এম মোশাররফ হোসেন ৩৯১

এ মুকতাদির, শিল্পী ৩৪৭

এ এফ আবদুর রহমান ১০৬

এ এফ এম আবদুল হক ২১৯

এ মালেক, ডা. ২১৯

এ টি এম শামসুদ্দীন ৩৭২

এম ওয়াজেদ আলী ২১৯

এম রহমান, মিসেস ১১৬

এম এ বারী ১০৬

এমদাদুল হক ৮৬

এম এ আজম ২১৯

এম এ জামান ৮৬

এম এ সামাদ ৮৬

এম এ আজম ১০১

এম আমিনুল ইসলাম ২৬২

এম আর আখতার (মুকুল) ৯৬

এম নূরুল ইসলাম ১০৬

এ জেড এম শামসুল আলম ১৭০

এম আবদুল কাদের, ১৭০

এম আবদুল কাদের, ড. ২১৯, ২২৭

এম আখলাকুর রহমান ১৭০

এরশাদ হোসেন ১৯৯, ২৩৬

এবনে গোলাম সামাদ ১৪৩

এম এন রায় ১৫৭

এস রহমান ২০৪

এস এম আবদুল জলীল ২৩৬

এস এম হাবিবুর রহমান ৩৭২

এস ওয়াজেদ আলি ৪৪৯

এস সি ভৌমিক ৩৭২

এস হেদায়েতউল্লাহ ২০১

এস এন কিউ জুলফিকার আলী ৩৫১

এহসান চৌধুরী ৩৪৫

এন ডি এফ ৬৩

এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম,

এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম ৬৯

এক সাগর রক্তের বিনিময়ে ৬৯

একুশে ফেব্রুয়ারি ৯৬

একুশ দফা ৫১, ৯৭

একুশের স্মৃতি ২৬৯

একুশে ফেব্রুয়ারি আন্দোলন ৪৮, ৭৩, ৯৫,

৩৪৭, ৪১১

এছলামী সাহিত্য ১৩৩

একান্ত ২৮৮

এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা ২



গ

ওবায়দুল হক সরকার ২৯৫  
 ওয়াকিল আহমদ ৪১০  
 ওয়াহিদুল হক ৩৯১  
 ওমর আবু বীশা ৩৬৮  
 ওমর আলী ২৯৪, ৩২৩, ৩৪৫, ৩৬৭, ৪০৬  
 ওসমান গণি ১০৬, ১১৬  
 ওহীদুল আলম ৮৬, ৩২১  
 ওয়াজীউল্লাহ ইনস্টিটিউট (চট্টগ্রাম) ৮৫  
 ওয়ার্ল্ড বুক ডিকশনারী ২  
 ওয়েবস্টার থার্ড নিউ ইন্টারন্যাশনাল  
 ডিকশনারী ২

ক

কমলেশ সেন ৩৪৪  
 কবির চৌধুরী ৯৯, ১০৬, ৩৯১, ৪৩২, ৫৫৯  
 কবির আহমদ ১১৫  
 কবিরুল ইসলাম ৪০৭  
 কবিরউদ্দিন আহমদ ২৩৬  
 করিমউদ্দীন আহমদ ২১৯  
 কর্ডওয়েল (আর স্কিন) ১১৬, ৪৮৬, ৫৫৯  
 কফিলউদ্দিন চৌধুরী ৫৬  
 কলিম আনোয়ার ৩৬৮  
 কলিম শরাফী ৮৬, ৯০, ৯৩  
 কণিকা দে ২১৯  
 কর্ভোভার আগে ২৪৬  
 কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ৩১৭  
 কলকাতার বইয়ের পু.মু. ৩৭২  
 কল্লোল যুগ ১৯  
 কল্লোল গোষ্ঠী ১২, ১৯  
 কল্লোলের বিশ্বকর্মা ১৯  
 কংগ্রেস ৩৯  
 কনভেনশন মুসলিম লীগ ৫৯  
 কন্যাভিভ অপোজিশন পার্টি (কপ) ৬০  
 কমরেড ৭১  
 কণ্ঠস্বর গোষ্ঠী ১৯  
 ক্লাইভ, লর্ড ৩৫  
 কবিতা ১৯, ৩৩২  
 কল্লোল ৮, ১১, ১৯, ১৩৯, ৩৩২  
 কমলালয় ১৬  
 কণ্ঠস্বর ২৫, ২৯৩  
 কবি মুহম্মদ ইকবাল সোসাইটি, দিনাজপুর  
 ২৭১

কামরুদ্দীন আহমদ ৭২

কায়সুল হক ২৫, ৩৪৪, ৩৬৮  
 কাজী আফসারউদ্দীন আহমদ ৩২১, ৩৭২,  
 ৪৪৭  
 কাজী নজরুল ইসলাম ৮৮, ১৩৯, ১৪৩,  
 ১৮১, ২০৫, ২৯৪, ৩৪৪, ৩৭৩, ৩৯৭,  
 ৪৩০, ৪৩১, ৪৮৬, ৫৮৬  
 কাজী নূরুল ইসলাম ২৭৪, ২৯৪, ৩১৮,  
 ৩২১,  
 কাজী দীন মুহম্মদ ১০১, ১০৬, ১৩৫, ১৫২,  
 ৩৪৩, ৩৫২, ৩৫৫, ৩৭২, ৩৯৪  
 কাজী আবদুল ওদুদ ১৩, ১৯, ৯২, ১৩১,  
 ১৬৬, ১৭০, ১৭৮, ৩১৮, ৩৪৫, ৪১০,  
 ৫৫৫, ৫৬৪, ৫৮৬  
 কাজী আবদুল আলীম ৩৬৮  
 কাজী আবদুল মান্নান ২৫৬, ২৬৩  
 কাজী আবদুল ওয়াদুদ ১০৬  
 কাজী আবুল কাসেম ১০৬  
 কাজী আবুল হোসেন ১১৫, ৩৬৮, ৪৪৮  
 কাজী আলাউদ্দিন ৯৪৮, ৫০১  
 কাজী আলী ইমাম ৮৬, ৯৩  
 কাজী গোলাম আকবর ২১৯  
 কাজী জহরুল হক ৪৪৮  
 কাজী ফজলুর রহমান ৫৩৭  
 কাজী মামুনুর রশীদ ৪৪০  
 কাজী মুস্তাফিজুর রহমান ৩৬৮  
 কাজী মোতাহার হোসেন ৮৫, ৮৭, ৯৬, ১০৬,  
 ১২৩, ১৮৭, ২০১, ২০৫, ২৩৬, ২৩৮,  
 ২৫২, ২৭৪, ২৯৫, ৩২৯, ৩৪৩, ৪০৯,  
 ৪৩২, ৫৩২, ৫৩৬, ৫৬১  
 কাজী মাসুম ২৭৮  
 কাজী আনোয়ারুল হক ১০১  
 কাজী শামসুজ্জামান ২৩১, ২৩৩  
 কাজী শামসুল হাসান ৪৪৮  
 কাজী সাহিদ হাসান ৪৪৬  
 কাজী সিরাজ ৪৪৪, ৪৫২  
 কাজী হাসান ইমাম ১১৫  
 কাজী আমিনা বেগম ১১৯  
 কাজী মুস্তাফিজুর রহমান ২৫১  
 কামালউদ্দিন ৪৪৭, ৪৪৮  
 কামাল চৌধুরী ৪৪৯  
 কাদের নওয়াজ ১১৫, ২৫১  
 কালীপ্রসাদ জৈমিক ৫৭৮

কাইয়ুম চৌধুরী ১০৬, ৩৪৭, ৫৫৬  
 কামাল বিন মাহতাব ৩৬৮  
 কামরুল হাসান, পটুয়া ৯৬, ২৩৬, ২৯৫,  
 ৩৪৩, ৩৬৮, ৪৯৮, ৫০১  
 কামরুল ইসলাম ২২৮  
 কামেলা শরাফী ৫৩০  
 কার্লাইল ১৫৮  
 কালোবাজার ৩১৩  
 কয়েদে আজম জিন্দাবাদ ১০৯  
 কাউন্সিল মুসলিম লীগ ৬৩  
 কাশ্মীর সমস্যা ১৫৬, ৩০৭  
 কাগমারী সম্মেলন ৯৩  
 কালিকলম ৯  
 কিরণশংকর রায় ১৬  
 কিরণশংকর সেনগুপ্ত ২০৫, ২২৫, ৩২১,  
 ৪৭৪, ৪৮৪  
 কিশোরী জাহান ৪৪০  
 কিছুধ্বনি ২৮৮  
 কুমার মিত্র ৭৩  
 কুমার প্রমথেশ বড়ুয়া ৪৮৬  
 কুমারী রওশন আরা বেগম ২১৯  
 কুদরতউল্লাহ শাহাব ৯৯, ২৫১, ৪১১  
 কুলসুম চৌধুরী ৩৯৪  
 কুসুম কর ৩৪৪  
 কুমিল্লা পল্লী উন্নয়ন একাডেমী ১৬০  
 কে এম এ মুনিম ১০৬  
 কে এম শমসের আলী ১১৫, ১১৬, ২১৯  
 কে জি মোস্তফা ৩৬৭  
 কোহিনুর ইউসুফ জয়ী ৫০৪  
 কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সমিতি ১৬৬  
 কৃষ্ণ চন্দর ৪৯১  
 কৃষ্টি কেন্দ্র ৯৩  
 কৃষ্ণবিনোদ রায় ৭২  
 কৃষক আন্দোলন ৬৫  
 কৃষক শ্রমিক পার্টি ৫২  
 কৃষ্টি ২৮৭

খ

খলিল জিবরান ৪৪৯  
 খলিলুর রহমান চৌধুরী ২১৯  
 খাজা নাজিমউদ্দিন ২৪০  
 খালেদ চৌধুরী ৯৬  
 খালেদা রহমান ৪৬২

খালেদা হাবীব ৪১৮  
 খান মোহাম্মদ ফারাবী ৪১৭  
 খান সরওয়ার মুর্শেদ ৯৬  
 খামুরাবি ৩৫৯  
 খায়রুল ফয়েজ ১১৯  
 খাদেমুল এনছান সমিতি ১৯, ১৬৬  
 খোকা রায় ৭২  
 খোদেজা খাতুন ২৫২  
 খোরশেদ আনোয়ার জিলানী ৩৬৮  
 খোন্দকার আবদুর রহিম ২৬২, ২৭৪  
 খোন্দকার আলী আশরাফ ৩৭২  
 খোন্দকার মাসুদার রহমান ৩২১  
 খোন্দকার মোশতাক আহমদ ৬৩  
 খোন্দকার সিরাজুল হক ২৬৩, ৩৯১

গ

গজনফর আলী ২৭৩  
 গলির ধারের ছেলেটি ২২০  
 গণসাহিত্য ১২৬  
 গণতন্ত্রী দল ৫২, ৭৩  
 গণমন ২৮৮  
 গালিব আহসান খান ৪১৮  
 গাজী শামসুর রহমান ২৯৩  
 গুলিস্তাঁ ৮, ৯, ১০৮  
 গোলাম মুরশিদ ৩৯১  
 গোলাম মোস্তফা ৯৭, ৯৯, ২০৬, ২১২, ২১৯,  
 ২৫০, ২৫১, ৪৩৭

গোলাম মোস্তফা রহমান ৩৪৫  
 গোলাম মোহাম্মদ ৫৩  
 গোলাম রহমান ৩৬৮  
 গোকী ১৩, ৪৪৯  
 গোগোল ১৩  
 গোলাম সাকলায়েন ১০৬, ৩২৯  
 গোপাল বিশ্বাস ৮৬, ৯১, ৩৪৫  
 গোবিন্দ চন্দ্র দেব ৪৩৮  
 গোলমাল মোস্তফা ২১২  
 গোয়ানিজ হল ৯৯  
 গৃহশ্রী ২৭  
 জ্ঞানাবেষণ ৬

চ

চর্যাপদ ১০২  
 চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ৮৫

চট্টগ্রাম মাদারবাড়ী ক্লাব ৮৭

চতুরঙ্গ ৮, ৯, ১০৮, ৩৩২

চরিতাভিধান ১০০

চাবুক ২০, ২১

চিলড্রেন্স ওন ক্লাব ২৩১

চিরঞ্জীব দাসশর্মা ৮৬

চিত্রালী ৩০

চেখভ ১৩

চৌধুরী ওসমান ১১৫, ২১৯, ২৬২

চৌধুরী মোহাম্মদ আলী ৫৩

চৌধুরী মোহাম্মদ গোলাম আকবর  
সাহিত্যভূষণ ১১৬

চৌধুরী লুৎফর রহমান ২৩৩, ২৩৬

চৌধুরী হারুনর রশীদ ৮৬, ৯০

চন্দ্রীগড় মন্ত্রীসভা ৫৪

চন্দ্রীগড় কোয়ালিশন সরকার ৫৪

ছ

ছদরুদ্দীন ১১৫, ৩২১

ছয়দফা ৬২

ছয়দফা আন্দোলন ১৬১

ছয়ই সেপ্টেম্বর পুরস্কার ১০০

ছাত্রলীগ ৫৭, ৬৬

ছাপ্তানুর শাসনতন্ত্র ৫৭

ছাত্র ইউনিয়ন ৫২, ৫৭, ৬৬

ছায়ানট ১০২

ছোটগল্প ২৮৮

ছোহেলউদ্দিন আহমদ (শাহ ছহিলউদ্দিন  
আহমদ) ১৭৭, ২১৯

জ

জগলুল হায়দার আফরিক ২৫২

জনলিউদ্দীন আহমদ ৮৬

জহুরুল হক ১০৬, ২৩৬

জহুরুল আলম ১১৬

জয়নাল আবেদীন ৩৭২

জয়নুল আবেদীন, শিল্পাচার্য ৯৫, ১০৬, ৪৪৯

জসীমউদ্দীন ৯৯, ১১৫, ১৫৪, ১৭০, ২৫১,

২৫২, ৩২১, ৩৬১, ৩৬৮, ৪০৬, ৪৩৩

জহুর আহমদ চৌধুরী ৬৩

জহির বিন কুদ্দুস ১১৯

জহির রায়হান ২৯৪, ৩৪৫

জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ৬৩

জয়দেব ৯

জয়শ্রী ১৪

জয়ন্তী ২৮৭

জাবিদ জামাল ৩৭২

জাহানআরা হাকিম ৩৪৪, ৪০৭

জাহানারা আরজু ১০৬, ২১৯, ২২৮, ২৫১,  
৩৪৪

জামালুদ্দীন বুখারা ৭২

জাহিদ হোসেন ২৬২

জাসিন্তা ১৩

জামালুদ্দীন মোহ্লা ২৯৪

জালালুদ্দীন রুমী ১৪৩

জাতীয় মুক্তি আন্দোলন ৭৫

জাতীয় সংহতি কাউন্সিল ১৪১

জাতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির সংকট ৩৭৫

জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা ১৫৭

জাতীয় ভাষা ১০৩

জাতীয় ছাত্র ফেডারেশন (এন এস এফ) ৬১

জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থা (বি এন আর) ৩০,

১০৩, ১০৪, ২৭২

জামাতে ইসলামী ৬৩

জাগরণ ২৮৭

জাগরী ১০৯

জ্যা পল সার্ভে ৩৯৭, ৪৪৯

জিন্নাহ, মোহাম্মদ আলী ৩৯, ৪১, ৪৩,

১০৮, ১৭৯, ২২৯

জিল্লুর রহমান ৩৪৪

জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী ২১৯, ২২৫, ২৮২,

৩৮১, ৩৯১, ৩৯২, ৩৯৪

জিয়া হায়দার ১০১, ১১৬, ২৬২, ৩৪৫,

৩৬৭, ৪০৬

জিয়াউল হক ৩৪৫

জিয়াউদ্দিন আহমদ ৩৬৮

জিনাত আরা মালিক ৩৪৪, ৪০৭, ৪৫৫

জিনাত আরা রফিক ৪৫৫

জিন্দেগী ২০

জীবনানন্দ দাশ ৩৯৬

জুলফিকার আলী ভুট্টো ৬৪

জুলফিকার মতিন ২৬২

জেরিনা আলিম

জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত ৩৪৫, ৩৯৩, ৩৯৪, ৪০৭,

৪৬৪

জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা ৩৫১

জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য ৩৬৭  
 জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ৪৩১  
 জোলা ১৩  
 জোৎস্নেন্দু চক্রবর্তী ৩৪৫, ৩৬৮  
 জোহান ১৩  
 জে এস সেন হল ৮৭  
 জিম্মি সমস্যা ২৪২

## ট

টলস্টয় ১৩  
 টি এস এলিয়ট ৩৪৭  
 টিপু সুলতান ৩৬৮

## ঠ

ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় ৪৪৯

## ড

ড. খান ৫৪  
 ড. জনসন ১৫৮  
 ডা. জাকিয়া ৩৯১  
 ডি বি চৌধুরী ৮৬  
 ডেমোক্রাটিক অ্যাকশন কমিটি ৬৬

## ঢ

ঢাকা আর্ট কাউন্সিল ৯৮  
 ঢাকা প্রগতি লেখক সংঘ ৯৩  
 ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১০৬, ৩১৩  
 ঢাকা সাহিত্য সম্মেলন (১৯৪৮) ২১৭  
 ঢাকা প্রকাশ ২০

## ত

তকবীর ২০  
 তবিবর রহমান ৩৪৪  
 তরিকুল আলম ২২৫, ২৩৬, ৩৬৮, ৪০৬  
 তপন ভট্টাচার্য ৩৪৫  
 তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া ৩০  
 তমদ্দুন মজলিশ ৯৪  
 তমদ্দুন মজলিশের প্রস্তাব ১৭১, ২৩৫, ২৪০  
 তরুণপত্র ২০  
 তত্ত্ববোধিনী ৬, ৩৩২  
 তারাপদ ঘোষ ৮৬  
 তালিম হোসেন ১০৬, ১১৫, ১২৪, ১৭৯,  
 ২৫১, ২৫৭, ৩৬৭, ৪৩৭

তালুকদার মনিরুজ্জামান ২৩৫  
 তাজউদ্দিন আহমদ ৬৩, ৭২  
 তাহজিব ২৪, ১০৯  
 তাহের চৌধুরী ৪৬৪  
 তারানা ই পাকিস্তান ২১২  
 তাহজিব- তমদ্দুন ২১২  
 তাহজিব ২২৪, ৩১৯, ৫৮৭  
 তুর্গোনিভ ১৩

## দ

দস্তয়ভস্কি ১৩  
 দত্তরীর ভাষারূপে বাংলা ১১৯  
 দরদী ২০  
 দাউদ হায়দার ২৯৪, ৪০৭  
 দাউদ পুরস্কার ১০০  
 দ্বিজেন শর্মা ৩৫৫  
 দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৮  
 দিলারা হাশেম ৩৬৮, ৪০৭  
 দিশেন্দ্র স্যান্নাল ৯২  
 দিলওয়ার, কবি ১৭০, ২৮২, ৩৬৭  
 দিলওয়ার হোসেন ২৬২  
 দিগন্ত ১০৯  
 দিশারী ২৮৭  
 দিলরুবা ২১, ২৪, ১০৯, ৫৮৭  
 দীননাথ সেন ৯৩  
 দিনেশরঞ্জন দাশ ১৯  
 দ্যুতি ১৯, ২৪, ১০৯, ২৩৫, ৩১৯  
 দুইনীতি ৭৫  
 দুর্নীতির উৎস সন্ধানে ১৬১  
 দেবদাস চক্রবর্তী (শিল্পী) ৩৪৭  
 দেবব্রত চৌধুরী ৪৬৪  
 দেবব্রত দত্ত ৩৪৪  
 দেবব্রত বিশ্বাস ৮৭  
 দেবেন্দ্রনাথ ৬  
 দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ৯৩  
 দেওয়ান মাহবুব আলী ৫৫  
 দেওয়ান আবদুল হামিদ ২৫১  
 দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ ২০, ৯৯, ১৭০,  
 ১৭৭, ২৩৫, ২৩৬, ২৯৫, ৪৩২  
 দেওয়ান আবদুল হামিদ ১৭০  
 দেওয়ান গোলাম মর্তুজা ৩২১  
 দৌলতননেছা খাতুন ৯৬  
 দৌলতননেছা খাতুন ২০৪, ২২৮, ৩২১

দেওয়ান একলিমুর রেজা চৌধুরী ১৭০  
দোহাই দর্শন ৩৪৩

ধ

ধর্মের প্রয়োজন ১৫৮  
ধূর্বাটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ১৬  
ধুব চক্রবর্তী ৪৩১  
ধূপছায়া ৯  
ধূমকেতু ২৮৭

ন

নঈমা বেগম ৪০৭  
নঈমুদ্দীন আহমদ ৭২  
নচিকেতা ভরদ্বাজ ৩৪৪, ৩৬৮  
নজরুল হক ১১৭, ৩৭৯  
নলডেক ১৫৮  
নতুন অধ্যায় ২৪২  
নতুন সাহিত্য ১৮৯  
নন্দনকাননের শক্তি সংঘ, চট্টগ্রাম ৮৭  
নয়জন নেতা ৫৮  
নজরুল একাডেমী ৩০, ১০১, ১৩৬  
নজরুল ও আমরা ২১২  
নজরুল খ্রীতি ২১২  
ননী সেনগুপ্ত ৮৬  
নরেশচন্দ্র চক্রবর্তী ২০৬  
নতুন সাহেব ও বেগম সাহেবা ১৬১  
নওবাহার ২৪, ১০৯, ১১৯, ২০৭, ৩১৯,  
৫৮৭  
নওবেলাল ২০  
নওরোজ ১০৮, ১০৯, ২৮৭  
নয়া জামানা (সাপ্তাহিক) ২২৩  
নাজমুল আলম ৩৬৮  
নাজমুল হক ২৩৬  
নাজিম মাহমুদ ৩৯৪  
নাজিরুল ইসলাম মোঃ সুফিয়ান ১১৭  
নাস্তিকতা ১০৯  
নারী সমিতি ৯৪  
নাগরিক ২৩  
ন্যাপ ৫৮, ৬০, ৬১, ৬৩, ৭৪, ৯৩  
ন্যাপ (মস্কোপন্থী) ৬৫  
ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট ৫৯  
ন্যাশনাল ব্যাংক পুরস্কার ১০০  
নির্মল চট্টোপাধ্যায় ৩৬৮

নির্মল মিত্র ৮৬

নির্মলেন্দু গুণ ৩৪৪, ৪০৭, ৪১৭  
নিরোদচন্দ্র চৌধুরী ২৬৯  
নিজামী ১৪৩  
নিত্য চক্রবর্তী ৩৬৮  
নিখিল পাকিস্তান সঙ্গীত সম্মেলন ৯৮  
নিম্বলুখ আনন্দ ১৮৯  
নিহিলীজম ১৫৮  
নীতি ও নেতৃত্ব ৩০৭  
নীলরতন সেন ২৭৮  
নীলিমা ইব্রাহিম ১০১, ১০৬, ৪১৪, ৪৩২  
নীলিমা বসু ৩২৩  
নীলু দাস ৩৪৫  
নীলুফার খান ৪৫৮  
নূরুন্নাহার ৯৩, ১১৫, ২২৮  
ন্যুড হ্যামসুন ১৩  
নূরুদ্দিন আহমদ মওলানা ২৫১  
নূর মোহাম্মদ ১১৫  
নূর মোহাম্মদ মিয়া ২৫১  
নূরুল আফছার ২৩৭  
নূরুল আমীন, মন্ত্রী ৫৮, ৬৮, ৩১১  
নূরুল আলম ২৩৬, ৪০৭, ৪৩৬  
নূরুল ইসলাম ২১৯  
নূরুল ইসলাম খান ১২৯, ২৭৫, ৩৬৮, ৪০৭  
নূরুল ইসলাম সন্ত্র ২৯৪  
নূরুল মোমেন ২০৫  
নূরুল হক ৪১৯  
নূরুল হক ভূঁইয়া ২৩৫  
নূরুন্নাহার বেগম ২৩৬  
নূরুর রহমান খান ১৭৩  
নূতন সাহিত্য ১২৬  
নেহেরু ৩৯  
নেয়ামাল বাসির ১১৫  
নেজামে ইসলাম ৬০, ৬৩, ৬৬  
নেপাল নাগ ৭২  
নেতাজী সুভাষ ১৫  
নূপেন্দ্র কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ৪৪৯

প

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় ৯২  
পরিচয়ের আড্ডা ১৯, ২০  
পলাশীর যুদ্ধ ৩৫  
পলাশীর পাপ ৩৫

পরিচিতি ২৩, ৮৮, ২৮৭  
 পলিমাটি ২৩  
 পরিক্রম ২৪, ১০৯, ২৫০, ২৮৮, ২৯৩  
 পরিচয় ৯, ১৪, ১৯, ২৮৮, ৩৩২  
 পার্কের কোণ থেকে ৯১  
 পাক হুকুমত ২২৫  
 পাক মার্কিন সম্পর্ক ৩১৩  
 পাকিস্তান ৩৮, ৭২, ১১০  
 পাকিস্তানী ও পাক-বাংলা সাহিত্য ১৩৪  
 পাকিস্তান : দেশ ও কৃষ্টি ১০৩  
 পাকিস্তান জিন্দাবাদ ১০৯  
 পাকিস্তান কাউন্সিল ৩০  
 পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন ৭৩  
 পাকিস্তান তমদ্দন মজলিশ ১৯, ৩৭৩  
 পাকিস্তান প্রবীণ হিতৈষী ২৭  
 পাকিস্তান লেখক সংঘ ৯৪, ৯৯, ১৪১, ২৪৬  
 পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ ১৯, ৯৪, ৯৫  
 পাকিস্তানের বাজেট ১৯৩  
 পাকিস্তানের রক্ত্রাষা ১৭১  
 পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদের প্রচার ১০৩  
 পাকিস্তান পিপলস পার্টি ৬৪  
 পাটের কথা ৩০৭  
 পাকিস্তানের সংস্কৃতি ও পূর্ব পাকিস্তানের  
 সাহিত্য ১৫৭  
 পাকিস্তানী সাহিত্যের পুনর্জাগরণ ৯৮  
 পাঁচমিশালী ২৫  
 পিকাসো ৪৪৯  
 পিরিয়ডিক্যালস ২  
 প্রজেশ কুমার রায় ২৩৬, ২৫১, ৩২১, ৩৬৭  
 প্রবোধ চট্টোপাধ্যায় ১৬  
 প্রবোধ বর্মণ ৪৫৭  
 প্রভাত কিরণ সরকার ৪৬৮  
 প্রমথ চৌধুরী ৯, ১০, ১৬  
 প্রশান্ত ঘোষাল ৩৪৪, ৩৬৮, ৪১৯  
 প্রগতি মজলিশ ৯১  
 প্রগতি লেখক সংঘ ৮৬, ৯৪  
 প্রবাহ ১০৯  
 প্রগতি ১৯  
 প্রবাসী ৯  
 প্রভাকর ৬  
 প্রান্তিক নবনাট্য সংঘ ২২, ৮৭, ৯০, ৯১  
 প্রাইভেট টিউশনি ২০৯  
 প্রাচী ২৮৭

পুঁথিপত্র প্রকাশনী ৯৬  
 পূর্বাশা ২৮৮  
 পূরবী ২৪, ১০৯  
 পূবালী ২৪, ২৮, ১০৯, ১৭৯, ২৮৭, ২৯২  
 পূর্বমেঘ ২৪, ১০৯, ২৮৭, ২৯২, ৩৪৭  
 পূর্বলেখ ২৫, ২৮৮  
 পূর্বাণী ৩০  
 পূর্ণেন্দু দস্তিদার ৪৫৯  
 পূর্ণেন্দু পত্নী ৪৬০  
 পূর্ববঙ্গ লেখক সংঘ ২৪৬  
 পূর্ব বাঙলা ৫৪  
 পূর্ব বাঙলার সংস্কৃতিসেবী ৯৯  
 পূর্ব বাঙলার সাংস্কৃতিক আন্দোলন ৯২  
 পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য মহাফিল ৯৯  
 পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি ১৯, ৯৪  
 পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ ৯৪  
 পূর্ব পাকিস্তানের মাধ্যমিক শিক্ষা সমস্যা ১৮৯  
 পূর্বাশার বৈঠক ১৯  
 পূর্ব পাকিস্তান ৫৪  
 পূর্ব বাঙলার সাহিত্য ১২২, ১২৯  
 পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন ৭৪  
 পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন ৯২, ৯৮, ৯৯  
 পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যের ইতিহাস ৩২৩  
 পূর্ব পাকিস্তানের সাময়িকপত্র ২৮  
 পূর্ব বাঙলার সাহিত্য পরিবেশ ১৪০  
 প্রেমেন্দ্র মিত্র ৪৩১  
 প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী ৩১৭  
 প্রেসিডেন্ট'স এ্যাওয়ার্ড ফর প্রাইড এ্যান্ড  
 পারফরমেন্স ১০০  
 পৃথিবী ২৬

## ফ

ফয়েড ১২, ১৩  
 ফজল এ খোদা ২৬২  
 ফজল শাহাবুদ্দীন ১০৬, ২৫৪, ২৬৩, ৩৪৪,  
 ৩৬৭, ৩৬৮, ৩৯৪, ৪০৬  
 ফজলুর রহিম ৩৯১  
 ফজলে রাফি ৩৯২, ৩৯৪  
 ফজলে লোহানী ৯৬, ২৭৬, ৩৪৪  
 ফজলুর রহমান খাঁ ৩০৫  
 ফওজুল করীম ৩৭২  
 ফজলুল করীম ৩৭২  
 ফজলুল সালাম ২১৯

ফজলুল হক সরকার ২৬২, ৫৬৯  
 ফজলুল হাসান ইউসুফ ৩৪৫  
 ফতেহ লোহানী ৩৬৮  
 ফয়েজ আহমদ ৯৬, ১০০, ২০৪, ২৯৪  
 ফণি বড়ুয়া ৮৬, ৯০  
 ফররুখ আহমদ ১০৬, ১২৪, ১৯৫, ২০৫,  
 ২১৯, ২২৫, ২৩৬, ২৫৪, ২৬২, ২৭৪,  
 ২৯৪, ৩৪৫, ৩৬১, ৩৬৭, ৩৯৪, ৪৩৭  
 ফরহাদ মজহার ৩৪৪, ৪১৯  
 ফরিদা বেগম ৩২৩  
 ফরিদা হাসান ৮৬  
 ফাতেমা চৌধুরী ৪০৭  
 ফারুক মাহমুদ ১০৬, ২৯৪, ৩৬৮  
 ফারুক আলমগীর ৩৪৪, ৪১৯  
 ফেরদৌসী বেগম ২৩৫  
 ফৌজিয়া সামাদ ৯৪  
 ফিরোজ খান নূন ২৩১  
 ফোর আর্টস ক্লাব ১১

ব  
 বই  
 বই বিচিত্রা  
 বর্ণালী  
 বনানী  
 বর্তমান  
 বঙ্গবন্ধু ৬৭  
 বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১, ৬, ৯, ৩৪৭  
 বঙ্কিমচন্দ্র সাহা (চাবুক) ৪৬৬  
 বখতিয়ার শাহ ৩৯১  
 বনফুল ৪৩১  
 বর্ণালী চৌধুরী ৪০৭  
 বনমালী গোস্বামী ৩৪৫  
 বন্দে আলী মিয়া ১১৫, ২৫১  
 বদরুন্নেসা আবদুল্লাহ ২৫১  
 বরিস পাস্তারনাক ৪৫৫  
 বসুধা চক্রবর্তী ১৪৩  
 বদরুদ্দীন উমর ৫০, ১১১, ১১৯, ২৩৫,  
 ২৩৬, ২৬১, ২৬৪, ৩৮৩, ৩৯১, ৩৯৩,  
 ৩৯৭  
 বদরুদ্দিন মুনির ২৩৬  
 বদরুল হাসান ১১৫, ২২৮  
 বরদাচরণ গুপ্ত ১৬

বঙ্কিম কি শিল্পী ? ২২০  
 বঙ্কিম অপাঙ্গেয় ৩০৩  
 বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ৩০৭  
 বর্ণাঢ্য রাজকীয় রঙ্গমঞ্চ, কুমিল্লা ৯১  
 বঙ্গাল গেজেট ৫  
 বঙ্গদর্শন ৫, ৩৩২, ৩৪৭  
 বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা ৯  
 বাট্টাও রাসেল ৪৫৩  
 বারীণ মিত্র ৪৬০  
 বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড ১৪১  
 বাংলা একাডেমী ৯৭, ১০৩, ১৪১, ২০০,  
 ২২৭, ২৭২, ২৭৬  
 বাংলা একাডেমী লেখক অভিধান ১০০  
 বাঙলা লেখক সমিতি ১০৬  
 বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য সঞ্জাহ উদযাপন ১০৪  
 বাঙলার জনগণ ৪৮  
 বাঙলার জাগরণ  
 বাঙালি ৬৯  
 বাংলাদেশ ৬৯  
 বাংলা ভাষা সংস্কার ৯৭  
 বাঙলা ভাষা কমিটির রিপোর্ট ১১৯  
 বাইশ পরিবার (ধনী) ৭৮  
 বালার্ক  
 বিমল চন্দ্র ঘোষ ৩৪৪  
 বিবেকানন্দ পাল ২১৯  
 বিশ্বপতি চৌধুরী ১৬  
 বিদ্যাপতি ৯  
 বি ডি হাবীবুল্লাহ ৪১৪  
 বিপ্রব ৭৫  
 বিশ্বযুদ্ধ, প্রথম ১২  
 বিরানকই (৯২-ক) ধারা ৫২, ৯৩, ৩১৩  
 বিশেষজ্ঞদল, ভিয়েনা ৮২  
 বিদ্রোহী বাংলা ৮  
 বিবর্তন ২৮৮  
 বিচিত্রিতা  
 বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৩৬৭, ৪৬৮  
 বুদ্ধদেব বসু ১, ১৯  
 বুলবুল ওসমান ৩৫৮, ৩৬৮, ৩৭২  
 বুলবুল খান মাহবুব ৫৬৬, ৫৬৮  
 বুলবুল চৌধুরী ৯৬  
 বুঁস্তাব ফুবেয়ার ১৩, ৪৪৯  
 বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা ১৬১  
 বুলবুল ললিতকলা একাডেমী ৯৬

## বুদ্ধির যুক্তি ১৩

বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা ৪১১

বুলবুল ৮, ২৮৭, ৩৩২

বেগম এম ই খান ২৮২

বেগম জেবু আহমদ ৩২৩

বেগম শাহনওয়াজ ১৪৫

বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদ ৯৯

বেগম শেফালী আহমদ ২৭৩

বেনাভাস্তে ১৩

বে-নজীর আহমদ ১০৬, ১১৫, ২৫১, ৩৪৪,

৩৬৮

বেলা রায় শ্রীমতি ২১৯

বেলাল মোহাম্মদ ৩৪৪

বেগম হাসমত রশীদ ১১৮

বেবী আনওয়ার ৩৭২

বেবী মওদুদ ৩৭২

বেঙ্গল গেজেট ৫

বেঙ্গল স্পেস্টিটর ৬

ব্রজেন্দ্রনাথ ১৫

বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর ৯৩, ৯৬, ১০০,

১১৮, ১৭৮, ২২৫, ২৫৭, ২৯৫, ৩৪৫,

৩৬৭, ৩৬৮, ৩৭২, ৩৯৩, ৪০৭, ৪৩৩

বোয়ার ১৩

ব্যবহারিক শব্দকোষ ৩১৮

বৃটিশ বিরোধী বিদ্রোহ ৮৪

## ভ

ভবেশ মুখোপাধ্যায় ১৪৩

ভারতচন্দ্র ৯

ভারত বিদেশী শ্রোগান ৬১

ভারতী ৬, ৮, ১৮

ভাষা ও সাহিত্যের সংস্কার ১২৮

## ম

মঈনুদ্দীন, কবি ১০৬, ১১৫, ২০৬, ৩১৭

মঈনুদ্দীন শাহরিয়ার ৪২০

মওদুদী, মওলানা ২২০

মকফী ৪৪৯

মকবুলা ইউসুফ ৩৬৮

মকসুদ চৌধুরী ৩৭২

মকসুদ জামিল ৩৭২

মকসুদুর রহমান হেলালী ৩৭২

মণি সিংহ, কমরেড ৭২

মতিউল ইসলাম ১১৫

মতিয়র রহমান ৩৯২

মর্তুজা রেজা চৌধুরী ১১৯

মতিউর রহমান চৌধুরী ২৩৩

মতিনউদ্দীন আহমদ ৯৯, ২৫১, ২৯৫, ৪৩৫

মফিজউদ্দিন আহমদ ১০৬, ২৩৬

মফিজ চৌধুরী, মন্ত্রী ৪৬৪

মফিজুল আলম ৩৪৪

মফিজউল হক ২৩

মবিনউদ্দীন আহমদ ২১৯, ৩২১, ৩৬৮

মহিউদ্দীন আহমদ ২৩, ২১৩

মনসুর মুসা ৪২০, ৪৫২, ৫৬৫, ৫৬৯

মনসুর হাবীব ৭২

মনোজ বসু ৯২

মনোজরায় চৌধুরী ২৩৩, ৩২১

মনি ইমাম ৯৩

মনিরুউদ্দীন ইউসুফ ৩৬৮

মনিরুজ্জামান ৩৪৪, ৫৫৯

মনোমোহন বর্মণ ১৭০, ২১৯, ২৯৪; ৪০৭

মমতাজউদ্দীন আহমদ ৩৪৫

মমতাজ বেগম ২২৭

মমতাজ শিরীন ৩৬৮

মমতাজুর রহমান ১১৫

মধুসূদন দত্ত, মাইকেল ৯, ৫৮৬

মধুসূদন মিত্র ২৭৩

মনজুরে মওলা ৩৪৪

মনাথ নন্দী ৩৪৫

মনাথনাথ সরকার ২২৮

ময়হারুল/ মুয়হারুল ইসলাম ১০১, ১১৫,

২১৯, ২২৮, ২৩৬, ২৫৪, ২৭৬, ২৭৮,

২৯৫, ৩৪৪, ৩৬৮, ৩৯৩, ৪০৬, ৪৩৬

মহাত্মা গান্ধী ৪৪৯

মহসিন আলী দেওয়ান ২৭৪

মহসিন রেজা ২৬১, ৩৯৪

মহাদেব সাহা ২৬২, ৩৪৪, ৩৯১, ৩৯৪,

৪২০, ৫৭৬

মহিউদ্দিন ২৯৫

মহিলা সাপ্তাহিকী (লাবণী) ২৭

মতিয়া ফ্রপ ৭৫

মার্কস, কাল ১৩

মানিক চৌধুরী ৩৬৮

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ১, ১৩৯

মাফরুহা চৌধুরী ১০৬, ২৫৩, ৪০৭



মারুফ হোসেন ৭৩  
 মালেকা বেগম ৪৩৮, ৪৩৯  
 মাশুকুর রহমান চৌধুরী (মাশুক চৌধুরী) ৪৫৫  
 মার্সম্যান ৫  
 মাসুদ আহমেদ ৩৪৪  
 মাহফুজা খাতুন ২১৩  
 মাহফুজুল হক ১৪৩, ২৩৫, ৩৭৬  
 মাহবুব জামাল জাহেদী ৩২১  
 মাহবুব সাদিক ৪০৭  
 মাহবুব তালুকদার ৩৪৪, ৩৬৮, ৪০৭  
 মাহবুবুল আলম ১৭৬, ২৩৬, ৩৬৮  
 মাহবুব উল আলম ৮৬, ৪২০  
 মাহবুব উল আলম চৌধুরী ২২, ৮৬, ৮৭,  
 ৯০, ৯২, ৯৩  
 মাহবুবউল্লাহ ৫৬৬  
 মাহবুব হাসান ৮৬, ৯৩  
 মাহবুবুল আলম ১৭০  
 মাহবুব আবু সাইদ ৪১৯  
 মাহমুদ আলম বেগ ২২০, ২২৭, ৩৭২  
 মাহমুদ আলী ৫৮, ৭৩  
 মাহমুদ মোকাররম হোসেন ৩৯২  
 মাহমুদ শাহ কোরেশী ৩৪৪, ৫৪৫  
 মাহমুদ হাসান ২৩১, ২৩৩  
 মাহমুদুল হক ২২৮, ৪১৯  
 মাহমুদ যকীমুল্লাহ ২০৫  
 মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা ২০৪, ২১৯, ৩২১,  
 ৩৪৫, ৩৬৮  
 মাকসুদ চিত্তাচর্চা ৭৬  
 মানবতাবাদী ধারার পত্রিকা ২৪  
 মার্শাল ল রেগুলেশন ৫৬  
 মাহেনওয় ২১, ২৩, ১০৯, ২০০, ৩১৯, ৫৮৭  
 মিউ হিসি ৩৬৯  
 মিন্নাত আলী ২৭৪, ২৯৪  
 মীজানুর রহমান ১৭০, ১৭৯, ১৮২, ১৮৫,  
 ২১৯, ২২৫, ২৩৬, ৩৬৮, ৩৭২  
 মীর আবুল খায়ের ২৯৪, ৩৪৫  
 মীর আবুল হোসেন ৩৬৮, ৩৭২  
 মীর খুরশেদ আলম ২২৮  
 মীর মোশাররফ হোসেন ১৪৩  
 মীরা সেন ৯৩  
 মীর্জা আবদুল হাই ১৭০, ২২০, ২২৮, ২৩৬,  
 ৩৬৮, ৪০৭

মুনীর চৌধুরী ৯৪, ৯৬, ৯৯, ১০১, ১০৬,  
 ২৫২, ২৫৭, ২৯৩, ৩৬১, ৩৭২, ৪১৭,  
 ৪২০  
 মুক্তি ২৩, ২২৫, ২৮৭  
 মুফাখখারুল ইসলাম ১০৬, ১১৫, ২০৫,  
 ২১৯, ২২৫, ২৯৫, ৪৩৭  
 মুর্তজা বশীর ৩৪৫, ৩৪৭  
 মুস্তফা আনওয়ার ২১৯  
 মুস্তফা জামাল ৩৬৮  
 মুস্তফা মাহমুদ ২৯৪  
 মুস্তাফা নূরউল ইসলাম ৮৭, ৯৬, ৩০২,  
 ৩৪৬, ৩৬১, ৩৮২, ৩৯১, ৩৯৪  
 মুখলেসুর রহমান ১৬০, ৩৯১  
 মুজীবুর রহমান খাঁ ২৮, ১০১, ১০৬, ২৫১  
 মুনতাসির মামুন ৪৫২  
 মুস্তাক আহমদ ৩৭২  
 মুহম্মদ আখতার ৩৪৫  
 মুহম্মদ আজিজ ৩৬৮  
 মুহম্মদ আনোয়ার ৩৯১  
 মুহম্মদ আবদুল খালেক ২৬৩  
 মুহম্মদ আবদুল হাই ১৮১, ২২৮, ২৫০,  
 ২৯৫, ৪৩৩  
 মুহম্মদ আবদুল হাফিজ ৩৯৪, ৪২০  
 মুহম্মদ আবু তাহের ৩৭২  
 মুহম্মদ আবু তালিব ২৭৮  
 মুহম্মদ এনামুল হক, ড. ৮৫, ১০১, ১৭০,  
 ৩৬১, ৩৯১, ৪০৯  
 মুহম্মদ ওসমান গণি ৪৬১  
 মুহম্মদ কুদরত ই খুদা ১০৬, ৩৫১  
 মুহম্মদ জাহাঙ্গীর ৪৫৪, ৪৫৬  
 মুহম্মদ নূরুল হক ১৬৬, ১৭০  
 মুহম্মদ নূরুল হুদা ২৫৬, ২৬২, ৪০৭, ৪২০  
 মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন ১৭০, ১৭৯, ২৫২,  
 ২৯৫, ৫৭৯  
 মুহম্মদ মুসলিম চৌধুরী ১৭০  
 মুহম্মদ রফিকুজ্জামান ২৬২  
 মুহম্মদ শমসের আলী ৩৯১  
 মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ড. ২০, ৮৫, ৯২, ৯৭,  
 ৯৮, ১৩৩, ১৬০, ১৭০, ১৭৮, ১৮৩,  
 ২৬২, ২৭২, ২৯৫, ৩২৩, ৩৫১, ৩৬১,  
 ৪১৯, ৪৩২  
 মুহম্মদ শামসুল হক ১৭০  
 মুহম্মদ সফীমুল্লাহ ৩৬৮

মুহম্মদ সিরাজ ৩৪৫  
 মুহম্মদ হাবিবুর রহমান ৩৯১, ৫৬৯  
 মুহম্মদ হাবিবুল্লাহ ১৮৫, ২১৯, ২৩২, ৩২৩  
 মুহীযুদ্দীন, ড. ২১৯  
 মুসলমান ৭২  
 মুজাহিদ বাহিনী ৬১  
 মুসলিম লীগ ৩৭, ৪১  
 মুসলিম সাহিত্য সমাজ ১৩, ১৪  
 মুক্তি-সংগ্রাম ১০৯  
 মুসলিম লীগের সমালোচনা ৩০৭  
 মুসলিম সাহিত্য সমাজ ১৬৬, ৩২৯  
 মেনন গ্রুপ ৭৫  
 মেটারলিঙ্ক ১৩  
 মেঘনা ২৫, ২৮৭  
 মৈত্রেয়ী দেবী ৩৭২  
 মোজাম্মেল সিদ্দিক ৩৬৮  
 মোতাহের হোসেন চৌধুরী ৮৬, ৯৩, ১৫৮,  
 ২৩৬, ২৩৮, ২৫৭, ২৯৪  
 মোপার্সা ২৭৪  
 মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী ৯৯, ১০১, ১০৬,  
 ৩৫১, ৫৪৯  
 মোবারক আলী আখন্দ ২১৯  
 মোনাজ্জাতউদ্দীন ৩৬৮  
 মোরশেদা হক ৩৭২  
 মোশাররফ হোসেন ৩৭২  
 মোসলেমউদ্দীন ২২৮, ২৩৩  
 মোসলেহউদ্দীন ৮৬, ৫৩১  
 মোসলেহউদ্দীন আহমদ ২৩১  
 মোস্তফা কামাল ১০৬  
 মোস্তফা কামাল (বার এট ল) ২২৮, ২৩৫,  
 ২৩৬, ২৫১  
 মোহসীনউদ্দিন দুদুমিয়া, পীর ৫৮  
 মোহাম্মদ গুসমান গনি ২০৬  
 মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী ১১৯, ১২৭, ১৪৮,  
 ১৭০, ১৮৬, ১৮৯, ২১৯, ২৯৫, ৩৭৫  
 মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মওলানা ১৯, ৩৮, ৯৭,  
 ১১০, ১৩৫, ১৫৯, ১৬৩, ২১২  
 মোহাম্মদ আবদুর রহিম ১১৯, ২২৮  
 মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল ১১৯  
 মোহাম্মদ আবদুল কাইউম ২৮, ১০১, ৩২৯,  
 ৪১৫  
 মোহাম্মদ আবদুল বাহার খালেক ৩১৭  
 মোহাম্মদ আবদুল হাই ৯৯, ১০৬

মোহাম্মদ আবদুল হাফিজ ৪১৭  
 মোহাম্মদ আজিজুল হক ১১৫, ২৩৬, ৩৬৮  
 মোহাম্মদ আলী ৩৬৮  
 মোহাম্মদ আলী (নওবেলাল) ৮৭  
 মোহাম্মদ আতিয়ার রহমান ২১৯  
 মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন সাহিত্যরত্ন ১৭০  
 মোহাম্মদ আহবাব চৌধুরী ১৭০, ১৭৭  
 মোহাম্মদ ইব্রাহীম ৯৮  
 মোহাম্মদ কাসেম ২৯৪  
 মোহাম্মদ গোলাম আকবর চৌধুরী ১৭০  
 মোহাম্মদ দানেশ, হাজী ৭৩  
 মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম ৩৯১  
 মোহাম্মদ নাসির আলী ১০১, ১০৬, ১১৭,  
 ৫৭৯  
 মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন ১৯, ২৪, ৮৫, ৯৫,  
 ২৮৯  
 মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম ১১৫, ২১৯, ৩০৬,  
 ৩৬১  
 মোহাম্মদ ফরিদউদ্দিন ২২৮  
 মোহাম্মদ বদরুল আনাম খাঁ ১১২  
 মোহাম্মদ বরকতউল্লাহ ৯৯, ১০৬, ১১৭,  
 ১১৯, ২৯৫, ৪৩২  
 মোহাম্মদ মতিউর রহমান ১০৬  
 মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ১০০, ১০১, ১০৬,  
 ২০৫, ২০৬, ২৬৩, ২৮২, ২৯৪, ২৯৫,  
 ৩৪৪, ৩৫১, ৩৬৭, ৩৯১, ৩৯৫  
 মোহাম্মদ মামুন ২২৮, ২৩৬, ৩৬৭, ৩৬৮  
 মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ ২৮, ১০১, ১০৬,  
 ১১৭, ১৭৯, ২০৫, ২৩৩, ২৩৫, ২৩৬,  
 ২৫৯, ২৯৪, ২৯৫, ৩৪৪, ৩৬২, ৩৬৭,  
 ৩৭২, ৪১৪  
 মোহাম্মদ মুজীবুর রহমান ১১৯  
 মোহাম্মদ মোকাররম হোসেন ৪৩২  
 মোহাম্মদ মোর্তজা ২৯৫, ৩০৪  
 মোহাম্মদ মোদাফের ১০১, ১০৬, ২৩০,  
 ২৩৩  
 মোহাম্মদ মোহর আলী ১০৬  
 মোহাম্মদ রফিক ৩৪৪, ৪২০  
 মোহাম্মদ রফিকুজ্জামান ৫৬৯  
 মোহাম্মদ সাদেক আলী ৮৬  
 মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন কাশিমপুরী ২১৯  
 মোহাম্মদ সুলতান ৭৪  
 মোহাম্মদ সুফিয়ান ৩৭২

মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান ১৭০  
 মোহাম্মদ হারুন উর রশীদ ৪২০  
 মোহাম্মদ হেমায়েত আলী ২৭১  
 মোহাম্মদ হোসেন. ডা. ২১৯, ২২৭  
 মোঃ মোজাফফর হোসেন পল্টু ৪৬৩  
 মোহিতলাল মজুমদার ৫৮৬  
 মোহিনীমোহন দত্ত ১৪২  
 মোয়াজ্জেম হোসেন ৩৬৮  
 মোহাম্মদী-আজাদ গ্রুপ ১৯  
 মোহাম্মেডান লিটারেরি সোসাইটি ৩০৭  
 মোয়াজ্জিন ৯, ১৯, ১০৮, ১৬৬, ২৮৭  
 মোসলেম ভারত ৯  
 মোহাম্মদী ৮, ৯৪, ১০৯, ১১০, ৩১৯, ৩২৯,

৫৮৭

মোহাজের ১৬১  
 মৌলিক গণতন্ত্র ৫৭  
 মৌসুম  
 ম্যাগাজিন ২, ৩

য

যমুনা ২৭  
 যাত্ৰিক ২২, ২৮৭  
 যাত্রী  
 যুগবাণী  
 যুদ্ধ বনাম শান্তি ৯১  
 যুক্তফ্রন্ট ৫২  
 যোগেশচন্দ্র ঘোষ, অধ্যক্ষ ২৩২  
 যৌবনে দাও রাজটীকা ৯

র

রওনক ৯৮  
 রওশন আরা জামান ৩৪৪  
 রওশন ইজদানী ১১৫, ২০৫, ২১৯, ২২৫,  
 ২৩৬, ২৫২  
 রকফেলার ফাউন্ডেশন ৯৯  
 রণেশ দাশগুপ্ত ১৫৪, ২৯৫, ৩৯২, ৪৬৪  
 রথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী ১১৫, ২৯৪  
 রফিক আজাদ ২৯৫, ৩৪৪, ৩৬৮, ৪২২,  
 ৪৩৮  
 রফিকুল ইসলাম ২৮, ১০০, ১০৬, ২৫১,  
 ২৯৫, ৩৯২  
 রবার্ট ফ্রন্ট ৩৬৯

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১, ৯, ১০, ১৬, ৪৮, ৯২,  
 ২০৫, ২০৭, ২৯৪, ৩১৩, ৩২৩, ৩৪৪,  
 ৩৫২, ৩৯৭, ৪৩১, ৪৭৪

রবীন্দ্র বিরোধিতা ১৪২  
 রবীন্দ্র বিদ্যে ১৪২  
 রবীন্দ্র বিতর্ক ১৯৬  
 রবীন্দ্র জনশতবার্ষিকী ১৪৩  
 রনজিৎ পাল চৌধুরী ৪১৯  
 রমেন মজুমদার ৮৬  
 রমেন্দ্রনাথ ঘোষ ৩৯২  
 রমেশ দেবনাথ ২৯৪  
 রমেশ শীল ৮৭, ৯০, ৯১, ১৫৪  
 রশীদ আল ফারুকী ২৯৫, ২৯৩, ৪৩৮  
 রশীদ করীম ৩৯২  
 রশীদ হায়দার ৪০৭  
 রশীদা বেগম ২১৯  
 রশ্মি ২৭  
 রাই গোপাল ৯১  
 রাইসুল জুহালা ৩৪৫  
 রাজশেখর বসু ৩৯৬  
 রাজিয়া খান ৩৪৪, ৩৯৩, ৪০৭  
 রাজিয়া মাহবুব ৪১৪  
 রাজীব আহসান চৌধুরী ৪১৯  
 রাজেন্দ্র সিংবেদী ৩৬৯  
 রাশিদা জামান ২৫১  
 রাজা ত্রিদিব রায় ৬৮  
 রাজা নবাব আলী খান ৩৬৯  
 রাবেয়া খাতুন ২১৯, ২৯৪, ৩৩৬, ৩৪৫,  
 ৪০৭

রাবেয়া চৌধুরী ২০৫  
 রামমোহন ৬  
 রাশিদুল হাসান ২০৫  
 রঞ্জনী আরাবী ২১৬  
 রাস্তা প্রভাত ১৯৫  
 রাইজিৎ অব দি মুন ৯২  
 রাজকাপুর লেন ৯৩  
 রাওয়ালপিণ্ডি ষড়যন্ত্র মামলা ৭৩  
 রিচার্ড রগেন ৪৪৯  
 রিপাবলিকান পার্টি ৫৪  
 রুবী চক্রবর্তী ৪০৭  
 রুবী রহমান ৪১৯  
 রূপান্তরের মুখে আমাদের সাহিত্য ১৩৭  
 রূপকথা ২৫

রেনে ক্রেয়ার ৩৬৯

রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন ৪৪৯

রোকেয়া সুলতানা ৪৬১

রেনেসাঁ সোসাইটি ৯৭

ল

লরেন্স সার্জেন্ট হল ৩৬৯

লতিফা রশীদ ১১৫

লতিফা হিলালী ১১৭, ৩৪৪, ৩৬৮

ললনা ২৭

লালা শামসুল ইসলাম (লালা এস ইসলাম)  
৪৪৯

লায়লা সামাদ ৯৬, ৪০৭

লাহোর প্রস্তাব ৬২

লিয়াকতপন্থী ৩৮

লিটারেরি জার্নাল ২

লীগ রাজনীতি ২১০

লীলাবতী নাগ, লীলা রায় ১৫

লুৎফর রহমান ২৩৬

লুৎফর রহমান সরকার ২৭৬, ২৭৮, ৩৯৪

লুৎফুল হায়দার চৌধুরী ২৩৬, ৪১৪

লেখক সংঘ পত্রিকা ২৪, ১০৯

শ

শওকত ওসমান ৮৬, ৯০, ৯১, ৯৩, ১১৬,

১৭৮, ১৯৫, ২১৯, ২৫১, ২৯৪, ৩৪৩,

৩৫১, ৩৬১, ৩৬৮, ৩৯৩, ৪০৬, ৪০৭,

৪৩১, ৪৮১, ৪৯০

শওকত আলী ৩৪৫, ৩৬১, ৩৬৮, ৩৭২,

৩৭৯, ৪১০, ৪৩১

শইখ আবদুর রহিম ২০৫

শফিউল ইসলাম ২৩৩

শফিক খান ৪১৮

শফিকউদ্দিন আহমদ ৫০৪

শফিকুর রহমান ২৩৩, ৩৭২, ৪০৭

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১, ৯

শশাংক পাল ৩৬৮

শশীভূষণ দাস ১১৫

শহীদ আখন্দ ১০১, ৪০৭, ৪৩১

শহীদ কাদরী ২৫২, ২৯৪, ৩৫১, ৩৬৮,

৪০৬, ৪১৯

শহীদ সাবের ২৯৪

শহীদুর রহমান ৩৬৮, ৪১৯

শহীদুল ইসলাম ২৬২

শহীদুল্লাহ কায়সার ২৮৩

শরৎ সাহিত্য ১৪৩

শহীদ মিনার ১৬

শনিবারের চিঠি ৮

শান্তিরঞ্জন বন্দোপাধ্যায় ৯২

শামসুদ্দীন ১১৫

শামসুন্নাহার মাহমুদ ২০৫, ৩৪৪, ৪০৭

শামসুর রাহমান ৯৬, ১০০, ১২৫, ১৭৮,

১৯৫, ২৫৪, ২৬২, ২৯৪, ২৯৫, ৩৪৩,  
৩৪৪, ৩৫১, ৩৬৭, ৩৯৪, ৪০৬, ৫০৪,  
৫১৯

শামসুল আবেদীন ৩৭২

শামসুল আলম ৩৪৫

শামসুল ইসলাম ২৩৩

শামসুল হক ৭২, ১০১, ২৯৫, ৪৩১

শামসুল হক কোরাযশী ২৫১

শামসুল হুদা ৫০২

শামসুল হুদা আল কাজী ৩৪৫

শাহ্ আজহার আলী ২১৯

শাহ্ আনিসুর রহমান ২৭৮

শাহ্ আবদুল হালিম ২৭৮

শাহজাদ ফিরদাউস ৪০৭

শাহজাহান হাফিজ ৩৪৪

শাহনুর খান ২৬২, ৪১৯

শাহানারা হোসেন ৩৯২

শাহাবুদ্দীন আহমদ ২৫৩, ৩৭২

শাহাদৎ হোসেন ১১৫, ২০৫, ৩২১, ৫০৪

শাহাদৎউল্লাহ ৫০২

শাহেদ আলী, স্পিকার ৫৫

শাহেদ আলী ১০১, ২২৫, ২৩৬, ২৯৫, ৩৬৮,  
৩৯৪

শাহেদা খানম ১১৫

শ্বাশ্বতবঙ্গ ৪৪

শিব নারায়ণ রায় ২৬৯

শিব প্রসন্ন লাহিড়ী ৩৯৩

শিল্পী সংঘ ৯৪

শিখা গোস্টী ১৯, ৩৩০

শিখা অনিবার্ণ ২৪

শিক্ষা-সংস্কার ৩১৫

শিক্ষার সংস্কার ১৯০

শিখা ৮, ১৪, ২৭, ২৮৭, ৩২৯, ৩৩২

শীলা দেবী ৪৬৮

শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন ১০২  
 শ্রী নরেশচন্দ্র চক্রবর্তী ১১৫  
 শ্রীপদ যোশী ৪৪৯  
 শ্রী মনোমোহন বর্মণ ১১৫  
 শ্রী করুণাময়ী বর্মণ ১১৫  
 শুধু চৌধুরী ৪৮৭  
 শেক্সপীয়র ৩০৩, ৩৬৯  
 শেখ আতাউর রহমান ৩৯২, ৪১৯  
 শেখ আবদুল হাকিম ৩১৭, ৩২১  
 শেখ মুজিবর রহমান ৩০, ৫৬, ৫৮, ৫৯, ৬১-  
 ৬৪, ৬৭, ৬৯  
 শেখ লুৎফর রহমান ৯৬  
 শেখ শরফুদ্দীন, অধ্যক্ষ ২০৫  
 শেখ সাদী ১৪৩  
 শেখ শরফুদ্দীন, অধ্যক্ষ ১০৬  
 শেন সুঙ ওয়েন ৩৬৯  
 শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ৩২১  
 শোএব আহমদ ১১৫

স

সজল বন্দোপাধ্যায় ৩৪৫  
 সন্তোষ গুপ্ত ৩৬৮, ৪৫২  
 সবিহ উল আলম ৪৪৪  
 সঞ্জয় বড়ুয়া ৩৬৮  
 সঞ্জীবচন্দ্র ৮  
 সলিল চৌধুরী ৮৭, ৯০, ৯২  
 সতীশচন্দ্র ঘটক ১৬  
 সত্যেন সেন ৩৪৫  
 সত্যেন্দ্রনাথ বসু ১৬  
 সত্য মৈত্র ৭৩  
 সত্য রঞ্জন সিংহ ৪৫৭  
 সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ৮৭  
 সনৎকুমার সাহা ৩৯২, ৩৯৪  
 সমরেন্দ্র দত্ত ৯১, ৫০৪  
 সমারসেট মম ৪৪৯  
 সফিউল ইসলাম ২৩১  
 সয়ীদুল হাসান ৮৬, ৯০  
 সমাজতন্ত্র ১৫৭  
 সওগাত সাহিত্য মজলিশ ১৯, ৯৫  
 সর্বদলীয় সাহিত্য সম্মেলন ১৩১  
 সম্মেলনের উদ্দেশ্য ১৩২  
 সম্মেলনের প্রতিপাদ্য বিষয় ১৩২  
 সংস্কৃতি সংসদ ৯৫

সংগ্রাম চলবেই ৩৪৭, ৩৫২  
 সঙ্গীত পরিষদ (চট্টগ্রাম) ৮৬  
 সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ৩৬  
 সরদার আবদুর রাজ্জাক ২৯৪  
 সরদার জয়েনউদ্দীন ৯৬, ১০১, ১৯৫, ৩৪৫,  
 ৩৬৮, ৫১৬  
 সরদার ফজলুল করিম ২৯৫, ৪০৮, ৪৫২  
 সওগাত ৮, ৯, ২১, ২৪, ১০৯, ২৭৩, ২৮৭,  
 ৩২৯, ৩৩২  
 সমকাল ১৯, ২১, ২৪, ১০৯, ২৮৭, ২৯৩  
 সংলাপ ২৪, ১০৯, ২৯৩, ৩৯৯  
 সংবাদ প্রভাকর ৩৩২  
 সংকেত ২২, ২৮৭  
 সঞ্চয় ২০, ২৮৭  
 স্পন্দন ২৩, ২৮৭  
 সবুজপত্র ৮, ৯, ১০, ১৬, ৩৩২  
 সবুজপত্রী ২০  
 সবুজ বাংলা ৯৭  
 সবুজসভা ১৬  
 সবার পত্রিকা ২৫  
 সমাচার দর্পণ ৫, ৩২৯  
 সত্যযুগ ৮৭  
 স্বদেশ ২৫, ২৮৮  
 সাইফুল ইসলাম ৩৪৫  
 সাইয়ীদ আতীকুল্লাহ ৯৬, ১২৫, ২০৫, ২৩৩,  
 ২৯৪, ৩৪৫, ৪০৭, ৫০৫  
 সাঈদ উর রহমান ৯২, ১০১  
 স্টানলি ম্যারন ৩৬৯  
 স্টালিন ৭৫  
 সার্জেইভাসেনৎ সেভ ৩৬৯  
 সার্জি এনতোনভ ৩৬৯  
 সাজ্জাদ ইউসুফ ৪১০  
 সাজ্জাদ ক্বাদির ৪১৮, ৪৪৫  
 সাজ্জাদ জাহির ৭২  
 স্যাজ্জঁপের্স ৪৪৯  
 সাদিকীন ৩৬৭  
 সানাউল্লাহ নূরী ১০৬, ২৩৩, ২৩৬  
 সানাউল হক ১৭০, ৪১০, ৪৮১  
 সায়েমা চৌধুরী ১১৫  
 সাইদুল হাসান ৪৮১  
 সাদত আলী আখন্দ ৩৯৩  
 সাদত হাসান মার্টো ৩৬৯  
 সাদেক নবী ৮৬

সাদিক আনওয়ার ২৭৮  
 সাদিকা সাইদ ৩৬৮  
 সাধন চ্যাটার্জি ৪৬৮  
 সাবের রেজা করিম ৫০২  
 সাবেরা মুস্তাফা ১০১  
 সানজিদা খাতুন ২০৪  
 সানাউল হক, কবি ৮৬, ২৫৪, ৩৪৫, ৩৯৩,  
 ৪০৬, ৪৪৫  
 সারোয়ার আলতাফ  
 সারোয়ার ই আহমদ ৫৩৪  
 সারোয়ার জাহান ২৬৩  
 সালাহউদ্দিন ৯১  
 সালাহউদ্দিন আহমদ ৩৯২, ৩৯৩  
 সালেহ আহমদ ২৯৪, ৩৪৫  
 সাতবভ ১  
 সাধু ও সঙ্জন ১৭৫  
 সাম্য ও স্বাধীনতা ১৭৫  
 সাম্প্রদায়িকতা ৩৯৭  
 সাংস্কৃতিক বৈঠক ৮৬, ৮৭, ৯০  
 সাহিত্য সমাজের সুপারিশ ৩৭৫  
 সাহিত্য ও জাতীয় চেতনা ৩০৫  
 সাহিত্য ও সাহিত্য পত্রিকার গুরুত্ব ৩০৫  
 সাহিত্যিক গোষ্ঠী ১৯৬  
 সাহিত্যিকদের শ্রেণীগত সম্পর্কের অবস্থা  
 ৩০৭  
 সাহিত্যে স্বাভাবিকতা ১৩০  
 সাহিত্যে সর্বদলীয়তা ১৩১  
 সাহিত্যে বিপ্লববাদ ১২৩  
 সাহিত্যে হিন্দু প্রভাব ১২১  
 সাহিত্যের সঙ্কট ৩৩৩  
 সাহিত্য ১, ২, ২০, ২৪, ২৫, ২৮১, ২৮৮  
 সাহিত্য পত্রিকা ১-৪  
 সামরিক শাসন ৭৪  
 সাম্যবাদী ২৮৭  
 সাম্প্রতিক ২৮৮  
 স্বাধীন বাংলা ১০৯  
 স্বাক্ষর ২৫, ২৮৮  
 স্যার ফ্রেডারিক চেমারস বোর্ণ ২৩২  
 স্যার সৈয়দ আহমদ ৩৯৪  
 স্যার নাজিমউদ্দিন মুসলিম হল ২৭১  
 স্যার নাসিম আলী মোমোরিয়াল ফুটবল  
 প্রতিযোগিতা ২২৯  
 স্টিফেন ক্রোন ৩৬৯

সিকদার আমিনুল হক ৪৪৫  
 সিকান্দার আবু জাফর ১৯, ২৪, ১০৬, ১১৫,  
 ২৬২, ৩৩১, ৩৪৪, ৪০৬, ৪৪৫  
 সিকান্দার দারা শিকোই ৩৬৮  
 সিকান্দার হায়াত মজুমদার ৪৪৫  
 সিদ্দিক আহমদ খান ১১৫, ১৮৯, ২২৮  
 সিদ্দিক জামাল ৩৭২  
 সিন্দাবাদ ৫০২  
 সিরাজুদ্দীন আহমদ ৩৪৫  
 সিরাজুদ্দীন হোসেন ৩৭৩, ৩৭৪  
 সিরাজুদ্দৌলা চৌধুরী ৩৪৫  
 সিরাজুর রহমান ২২  
 সিরাজুল ইসলাম ১০৩, ৩৪৫, ৫০৪, ৫৩৪  
 সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ৩০, ১০০, ১৭৮,  
 ২৩৩, ২৩৫, ২৫৪, ২৫৭, ৩৪৫, ৩৯২,  
 ৩৯৫, ৪০৯, ৪৫২  
 সিরাজুল হক ২৭৩  
 সি এম রোজারিও ৯৩  
 স্টিফেন স্পেন্ডার ৪৪৯  
 সীমান্ত ২২, ৮৬, ৮৭, ২৮৭  
 সুকান্ত ৩৯৬  
 সুলতান আহমদ ১২৫, ৩৯২  
 সুফী মোতাহার হোসেন ১১৫, ২৯৪, ২৯৫  
 সুরাইয়া কামাল ৩৪১৪  
 সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৬  
 সুরেন্দ্র মোহন পঞ্চগীর্ষ ৪৬৮  
 সুলতানুজ্জামান খান ৪৯৬  
 সুকান্ত ভট্টাচার্য ১৩৯, ৫১০, ৫৮৬  
 সুকুমার সেন, ড. অধ্যাপক ২২০  
 সুধাংশু রায় ৪৬৮  
 সুধেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ৩৯২  
 সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ৫৮৬  
 সুনীল চক্রবর্তী ৮৬, ৯১, ৯৩  
 সুনীলকুমার গুপ্ত ৩৬৮  
 সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় ২৬৩, ২৭৪, ২৯৫,  
 ৩৯৪, ৪৩৬  
 সুফিয়া কামাল, কবি ৮৭, ৯৬, ১০৬, ১১২,  
 ১৭৮, ২০১, ২০৫, ২১৯, ২৫০, ২৫১,  
 ৩২১, ৩৪৫, ৩৬৭  
 সুফিয়া মিরজা ৩৬৮  
 সুমিতা মুৎসুদ্দী ৪৮৬  
 সুশীল কুমার দত্ত ৫৪৫  
 সুবোধ কুমার রায় ৩২১, ৪৪৮

সুব্রত বড়ুয়া ২৯৪, ৩৪৫, ৪১৯  
 সুভাষ মুখোপাধ্যায় ৯২, ১৩৯  
 সুধাংশু দেবনাথ ৩৪৪  
 সুধাংশু সরকার ৮৬, ৪৮১  
 সুধীন দত্ত ৩৯৬  
 সুধীর এন ঘোষ ৩৬৯  
 সুধীর চৌধুরী ৩৬৮  
 সুচিত্রা মিত্র ৮৭  
 সুস্মিতা আনোয়ার ২১৯  
 সুচরিত চৌধুরী ২২, ৮৬, ৯১, ৯৩, ৪৬০  
 সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৬  
 সুন্দরম ২৫, ২৮৮  
 সুনিকেত মোল্লার ২৮৮  
 সুরভি ২৮৮  
 সূর্যদীঘল বাড়ী ৩১৭  
 সূর্যসেন ৮৪  
 সেনজ্যায়মে দে শ্রে ৪৪৯  
 সেবান্নেত্র চৌধুরী ৩৪৫, ৪০৬, ৪৬৪  
 সেলিম আল দীন ২৯৫  
 সেলিমউদ্দিন আহমদ ৩৬৮  
 সেলিম সারোয়ার ৩৬৮, ৪১৯, ৪৫৩  
 সেলিনা হোসেন ১৭৮, ২৬৩, ২৯৪  
 স্নেহময় রক্ষিত ৮৬  
 সৈকত ২৮৮  
 সৈনিক ১৯, ২৩৫, ৩৭৬  
 সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ৯৯, ১৯৫, ২৫৬, ২৯২,  
 ২৯৪, ৩২১, ৩৪৫, ৩৬৮, ৩৯৩, ৫১০  
 সৈয়দ এমদাদ আলী ২১৯  
 সৈয়দ আবুল মকসুদ ৫৮৫  
 সৈয়দ আকরম হোসেন ৪০৬, ৪৫২  
 সৈয়দ আজিজুল হক নান্নামিয়া ৫৮  
 সৈয়দ আবদুর রব ১৯  
 সৈয়দ আবদুল মান্নান ২২০  
 সৈয়দ আবদুস সুলতান ৩৪৫  
 সৈয়দ আলী আহসান ১০১, ১১৫, ১৭৮,  
 ১৮৭, ২০৫, ২১৭, ২১৯, ২৫০, ২৫৭,  
 ২৬২, ৩০১, ৩৪৫, ৩৫১, ৩৬৮, ৩৯২,  
 ৩৯৬, ৪০৬, ৪৩৩, ৪৪৭, ৫০৪, ৫০৯,  
 ৫২০  
 সৈয়দ আলী আশরাফ ১১৯, ২০১, ২০৫,  
 ৩৪৫, ৩৯৬, ৪৩৩, ৪৪৫  
 সৈয়দ আলী নবী ৪০৬  
 সৈয়দ নুরুদ্দীন ৩৪৫

সৈয়দ বদরুদ্দিন হুসেন ২৩৬  
 সৈয়দ বেলায়েত হোসেন চৌধুরী ১১৫  
 সৈয়দ মকসুদ আলী ২২৮, ২৩৬  
 সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম ৪০৭  
 সৈয়দ ম্যান্নান বস্তু ১১৯  
 সৈয়দ মুজতবা আলী ১৭০, ১৭৫, ২১৯,  
 ৪১০, ৪৩০  
 সৈয়দ মুর্তজা আলী ১৭০, ২৫২, ৩৯২, ৪১০  
 সৈয়দ মুজিবুল হক ২১৩, ২১৯  
 সৈয়দ মোস্তফা আলী ২৮২  
 সৈয়দ রেদওয়ানুর রহমান ৩৭২  
 সৈয়দ শাহজাহান ৩৭২  
 সৈয়দ শাহাদত হোসেন ১০১  
 সৈয়দ শামসুল হক ২৫৭, ২৯৪, ৩৪৫, ৩৬৮,  
 ৩৯২, ৪০৬, ৫৪৬  
 সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, অধ্যাপক ৯৯,  
 ১৯১, ২৫২, ২৫৪, ২৯৫, ৩১৪, ৩৫১,  
 ৩৬৫, ৩৭৯, ৩৯২, ৩৯৮, ৪১০, ৪৩৯,  
 ৪৫৫  
 সৈয়দা সুলতানা আরা ২৫, ৩৬৪  
 সৈয়দা জাহান আরা লাইজু ২৫  
 সৈয়দ জাহাঙ্গীর (শিল্পী) ৩৪৫  
 সৈয়দ আলী আহসানের চিন্তার অপরিচ্ছন্নতা  
 ৩০১  
 সোফিয়া মিরজা ৩৬৮  
 স্কোয়াড, শান্তিকের গানের, চট্টগ্রাম ৯১  
 সিলেট কেন্দ্রীয় মুসলিম সমিতি ১০৮  
 সোমপ্রকাশ ৬

## হ

হবিবুল্লাহ বাহার ৯৮  
 হযরত আজরাইল (আঃ) ২১৮  
 হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ২১৮  
 হযরত ইউসুফ (আঃ) ২১৮  
 হযরত মুহম্মদ (আহম্মদ) মোস্তফা (দঃ)  
 ২১৮, ৪৪৯  
 হরিনাথ দে (ডা.) ২৩৩  
 হরিপদ দে ২৩১  
 হরিখোলা মাঠের সম্মেলন, চট্টগ্রাম ২২, ২১৭  
 হস্তীদর্শন ৩৪৩  
 হাজেরা তালুকদার ২৭  
 হাজেরা মার্শরুর ৩৬৯  
 হাফিজ ৩৬৯

হার্বাট রীড ৩৬৯  
 হাবিব আকবর ২৯৪  
 হাবিবুর রহমান ১০১, ১১৫, ২১৯, ২৩৩,  
 ২৫১, ৩৬৭  
 হামিদুল হক ৩০  
 হামিদুল হক চৌধুরী ৫৮  
 হারিতকৃষ্ণ দেব ১৬  
 হাল ৩৬৯  
 হাশেম খান ১১২  
 হাসান আজিজুল হক ৩৬৮, ৩৯২, ৩৯৩,  
 ৪০৭  
 হাসান আবদুল গোফরান ৩৪৪  
 হাসনাত আবদুল হাই ১০১  
 হাসান আলী মাহমুদ ২৭১  
 হাসান ইকবাল ২৩৫  
 হাসান জামান ১০৩, ১০৬, ২২৫, ২৩৬,  
 ২৫১, ২৯৫  
 হাসানুজ্জামান ২৮  
 হাসান হাফিজুর রহমান ৯৫, ৯৬, ১০০,  
 ১০৬, ১৭৮, ২০৫, ২২৫, ২৬২, ২৮৯,  
 ২৯৪, ২৯৫, ৩২৯, ৩৪৪, ৩৫১, ৩৬১,  
 ৩৬৭, ৪০৬  
 হামেদ আহমদ ১১৬, ২১৯, ২৫১, ৩২১,  
 ৩৬৮  
 হামিদুজ্জামান খান চৌধুরী ৩৪৪, ৩৬৮  
 হায়াশি ফুমিকো ৩৬৯  
 হায়াৎ দারাজ খান ৩৬৯

হায়াৎ মামুদ ২৬২, ৩২৯, ৩৪৪, ৩৬৮, ৩৭২,  
 ৩৯২  
 হায়াৎ সাইফ ২৬২, ৩৪৪, ৩৯৩  
 হাতিয়ার ফ্রপ ৭৫  
 হাসান শফি স্মৃতি ফুটবল লীগ ২২৯  
 হিন্দু ৭২  
 হিন্দু জাগরণ ৩৭  
 হিন্দুরা কি পাকিস্তানের নাগরিক? ২১৪  
 হিন্দুস্থান ৭২  
 হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা ৩৭  
 হিন্দুস্থানে মুসলমানের সংখ্যা ১৫৬  
 হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক ১৫৭, ২১৬  
 হুমায়ুন আজাদ ৩৬৮, ৪০৭  
 হুমায়ুন কবির ২৬২, ৪০৭, ৫৬৯  
 হুমায়ুন কাদির ২৯৩, ২৯৪, ৩৪৫, ৩৬৮,  
 ৪০৭  
 হুমায়ুন খান ৩৬৮  
 হুসান আল খতিব ৩৭০  
 হেমায়েত হোসেন ২৬২, ২৭৩, ২৮১, ৩৪৪,  
 ৩৬৮  
 হেমেন্দ্রকুমার মঞ্জুমদার ২১৯  
 হেনা বর্মণ ৮৭  
 হেনা হাসনাত ৩৪৪  
 হোসনে আরা, বেগম ১০৬  
 হোসনে আরা কামাল ১০১  
 হোসেনউদ্দিন হোসেন ৩৪৪  
 হোসেন মনসুর ৩৭২



1875

